ঢাকা রিভিউ
ও
সম্মিলন।

১ম খণ্ড। | ঢাকা, বৈশাখ, ১৩১৮ সাল। | ১ম সংখ্যা।

মঙ্গলাচরণম্।

যস্যানুকম্পামবলম্বমানা
সজীবলোকেহ বিভাতি ভূমিঃ।
সুখান্যনন্তানি হি যৎপ্রসাদাৎ
স পাতু নিত্যং জগতামধীশঃ॥ ১

যদাজ্ঞয়া বাতি সদৈব বায়ু
র্যদাজ্ঞয়া ভাতি শশী চ ভানুঃ
যদাজ্ঞয়া যাতি নদী চ সিন্ধুং
স পাতু নিত্যং জগতামধীশঃ॥ ২

যস্য স্মিতং কোমল পুষ্পবৃন্দে
যৎস্নেহবিন্দু র্গলদম্বুপাতে।
যৎকোপবহ্নি র্বিপুলে চ বজ্রে
স পাতু নিত্যং জগতামধীশঃ॥ ৩

যমাশ্রিতং জ্ঞানমনিন্দনীয়ম্
যেনাবৃতং ধর্ম্মমনন্তরূপম্।
যস্যাশিষো মৃত্যু রথামৃতং চ
প্রসীদতাম্নঃ স মহাবিভূতিঃ॥ ৪

অবতরণিকা।

জ্ঞান-বিজ্ঞান যাঁহার অন্ত না পাইয়া, অন্ধের ন্যায়, অন্ধকারে আত্মহারা; ধ্যান, যাঁহার ধারণায় অসমর্থ হইয়া, অনন্যগতি ও তন্ময়; কর্ম্ম, যাঁহার উদ্দেশে, ফলানপেক্ষ ও নিষ্কাম; এবং ভক্তি, যাঁহার অন্বেষণে ঊর্দ্ধস্থিত দেবধামে স্বর্ণপ্রসূ মন্দাকিনী, পাতালের অনল-গহ্বরে সুখ-শীতল ভোগবতী, আর মর্ত্ত্যের ভস্মরাশিতে মৃতসঞ্জীবনী, পতিতপাবনী ভাগীরথী, "সম্মিলন", আজি সেই জ্ঞান-বিজ্ঞানের আদিপ্রস্রবণ, ধ্যান-ধারণার চরমলক্ষ্য ও ভক্তির প্রাণারাধ্য জগজ্জীবন জগদীশ্বরের মঙ্গলময় নাম স্মরণ করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইল। "সম্মিলন" যাহার নাম,—মিলন যাহার সঙ্কল্পিত জীবনব্রত, প্রীতি যাহার প্রাণগত মূলমন্ত্র, প্রেমময়ের প্রেমসূত্রে গ্রথিত এই বিরাট বিশ্ব-রাজ্যে সেই ক্ষুদ্র বুদ্‌বুদের একটু স্থান হইবে না কি?

কাব্যে যেমন বন্দনা বা কাব্যসূচনা, নাটকে যেমন নান্দী বা প্রস্তাবনা, কীর্ত্তনে যেমন কীর্ত্তনগুরু গৌরাঙ্গের আবাহন বা গৌরচন্দ্রিকা, মাসিকাদি সাহিত্য-পত্রে, তেমন মুখবন্ধ বা অবতরণিকা। উহা না থাকিলেই নয়। ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সমস্ত মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রেরই, সূতিকা গৃহে, হয় ললাট-পট্টে অবতরণিকার লাঞ্ছন, না হয়, শিরোদেশে মুখবন্ধনের রাখিবন্ধন দৃষ্ট হইয়া থাকে। সুতরাং, এই চির-চলিত রীতিরক্ষার্থ অগ্রে এই নবজাত

সাহিত্য-শিশুর আত্ম-পরিচয়ে দুটি কথা বলিয়া লওয়া আবশ্যক। আপনার নাম ও পরিচয় যথাযথরূপে বিজ্ঞাপিত না করিয়া, অপরিচিত আগন্তুকের ন্যায়, পাঠকের নির্জ্জন কক্ষে প্রবেশ করিতে যাওয়া ধৃষ্টতা,—সর্ব্বথা শিষ্টাচারবিরুদ্ধ নিন্দনীয় অনুষ্ঠান। আত্ম-পরিচয়ে বলিবার কথা তিনটি—নাম, অবয়ব এবং সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর কথা উদ্দেশ্য বা প্রয়োজন।

নাম সম্মিলন। নামের পরিচয় পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে। সাহিত্য-পত্রের এই নাম সম্ভবতঃ সকলের কাছে ভাল লাগিবে না। সাহিত্যরসজ্ঞ শাব্দিক, হয়ত, ইহাকে ভাবশূন্য শুষ্ক রব মনে করিয়া, মুখ ফিরাইয়া বসিবেন। বস্তুতও জ্ঞানের গাম্ভীর্য্য, বিজ্ঞানের ঐন্দ্রজালিক রহস্য, দর্শনের অন্তর্দর্শিনী দৃষ্টি, তাত্ত্বিকের তত্ত্ববোধিনীশক্তি বা তত্ত্ব কৌমুদীর স্নিগ্ধরশ্মি, প্রতিভার স্ফুরন্ত প্রভা, প্রদীপের প্রদীপ্তশিখা, সাহিত্যের ধারাবাহিক প্রবাহ, নব্যভারতের প্রবীণ উচ্ছ্বাস, ভারতীর বীণা, আরতির শঙ্খ ঘণ্টা, অথবা বিরহক্লিষ্ট প্রবাসীর অশ্রুমাখা আশা ও প্রীতির আবেগ-সঙ্গীত, এ নামের সহিত এ সকলের কোনটিরই কোনরূপ সংস্রব বা সম্পর্ক নাই। ইহাতে না আছে, সন্দর্ভের গান্ধার গ্রাম বা "প্রত্নকম্র নন্দিনীর" অশনি-নিনাদ, না আছে "সমালোচনীর" উৎকট মদগন্ধ বা কুসুম-প্রসূনের বাসন্ত সৌরভ। সুতরাং, নামের ঝনৎকার বা ঝঙ্কারে নিদ্রিতের নিদ্রাভঙ্গ হইবে, কিংবা মধুলুব্ধ মধুকর তৃষাকুলপ্রাণে অপনি ছুটিয়া আসিয়া গুণগানে প্রবৃত্ত হইবে, রসবৈভবশূন্য সম্মিলনের সে দুরাশা নাই।

শৈশবে পরিস্ফুট আকৃতি বা প্রকৃতিগত কোন বিশেষত্বের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, শিশুর নামকরণ হয়, কখনও বা শিশু, কালে যেমনটি হইবে বলিয়া আশা, উহার তদনুরূপ নাম নির্দ্দেশ হইয়া থাকে। মধ্যম পাণ্ডবের বৃকোদর নাম তদীয় উদরের পরিচায়ক। কিন্তু রাজা দশরথ, পুত্রমুখ দর্শনের পূর্ব্বেই, তাঁহার স্নেহের ধন, একদিন রূপ-গুণে ভুবনমোহন ও জগতের আনন্দস্বরূপ হইবে, এই আশায় জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম রাখিয়াছিলেন, রাম। সাহিত্য-পত্র সম্বন্ধেও এই কথা। আশার প্ররোচনায় মুগ্ধ হইয়াই অভিভাবক উহার নাম নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

সম্মিলন নামের অন্য কোন মাহাত্ম্য থাকুক আর না থাকুক, একটা অতি উচ্চ আশা ও আকাঙ্ক্ষার সহিত উহার সম্পর্ক। সম্মিলন নামের তন্তুতে তন্তুতে প্রীতির লুক্কায়িত অঙ্গুলি-সঙ্কেত, প্রণয়ের মৃদুমধুর আমন্ত্রণ চির-অনুস্যূত। সাহিত্যে সম্মিলন, নন্দনকাননে পীযুষ উৎসের ন্যায়, একদিন সহৃদয় সাহিত্যসেবীর চিত্তহারী হইতে পারে, এই আশার ছলনায়ই ইহার এই নামকরণ। সমস্ত ভেদ, ব্যবধান ও অন্তর ভুলিয়া গিয়া, এস আমরা সকলে প্রাণে প্রাণে মিলিয়া সাহিত্য-সেবারূপ আনন্দময় অমল ধর্ম্মে দীক্ষিত হই। আছ আছ তুমি অনল, আছি আছি আমি জল, এস আমি আমার শীতল সংস্পর্শে তোমার হৃদয়ের জ্বালা প্রশমিত করি; তুমিও তোমার প্রাণপ্রদ তেজোমহিমায়, আমার শৈত্যসঙ্কোচ দূর করিয়া দাও। আছ আছ তুমি আলোক, আছি আছি আমি অন্ধকার, এস আমরা পরস্পর প্রীতিভরে আলিঙ্গন করি। আঁধারের ছায়াপাতে আলোকের প্রখরপ্রভা স্নিগ্ধ ও নেত্রপ্রীতিকর হউক, আঁধারও আবার আলোকের সংস্পর্শে জ্যোৎস্না হইয়া যাউক। সাহিত্যে সম্মিলন নামের ইহাই স্বাভাবিক ভাব, ইহাই উহার প্রাণগত কামনা। এই হেতুই আমরা আশা করি, বান্ধবের প্রিয় জন্মভূমিতে, সুহৃদের হৃদয়িক অভিধানে, সাহিত্য পত্রের সম্মিলন নাম একবারেই অনাদরের বস্তু বা অবহেলার সামগ্রী হইবে না।

দ্বিতীয় কথা, অবয়ব। নামে সম্মিলন; অবয়বেও ইহা সম্মিলন। ইংরেজী Dacca Review ঢাকা রিভিউর সহিত ইহা এক দেহবদ্ধ:—একাসনে হর-হরির যুগল সংযোগ; একই ধারে গঙ্গাযমুনার মিশ্রিত প্রবাহ; রবির আলো ও চাঁদের জ্যোৎস্না একাধারে বিন্যস্ত। এক শরীরে একই আবরণে ইংরেজী ও বাঙ্গালা সাহিত্যের এইরূপ একত্র সমাবেশ কেন? অনেকের মনে এই প্রশ্নের উদয় হওয়া সম্ভবপর। এ প্রশ্নের উত্তরে আমরা এইমাত্র বলিব যে, ইহা ইহার অবশ্যম্ভাবি নিয়তি,—অনায়ত্ত কর্ম্মসূত্রের অপরিহার্য্য পরিণাম। তবে কথা

এই, ইংরেজী ও বাঙ্গালার ঈদৃশ প্রীতিসম্মিলন আমরা কোন অংশেও অস্বাভাবিক বা অসমীচীন মনে করি না।

ইংরেজী বাঙ্গালার রাজভাষা। প্রজার অর্দ্ধস্ফুরিত বালভাষিতও, স্নেহের চোকে, রাজার নিকট আদরের বস্তু। একদিকে এই কথা। অন্যদিকে বাঙ্গালার সম্পর্কে ইহা একান্তই শ্লাঘনীয় সম্পদ্। ইংরেজী বাঙ্গালার এক প্রধান অবলম্ব ও আশ্রয়। ইংরেজীর ছায়ায় বাঙ্গালার অবস্থান, ইংরেজীর পার্শ্বদেশে বাঙ্গালার আনন এবং এইরূপে ইংরেজী ভাষায় অভিজ্ঞ ও বাঙ্গালার প্রতি অনুরাগী, সুবিজ্ঞ পাঠককে ভোজ্য যোগাইবার অধিকার লাভ, বাঙ্গালার পক্ষে, বস্তুতই বড় গৌরবের কথা ও আনন্দের বিষয়। ধ্রুপদের গগনগামী স্বর-তরঙ্গ ও পাখোয়াজের তদনুসারী জলদগম্ভীর নিনাদের পরে, যেমন টপ্পার মৃদুবাহিনী ললিত-লহরী, ইংরেজী গজলের পরে, তেমন বাঙ্গালার ঠুংরি বা আদ্ধা, অপ্রীতিপ্রদ বা অরুচিকর হইবার কথা নহে। আমরা এই ভরসায়ই ইংরেজী ও বাঙ্গালার সংযোগ-উৎপন্ন ঢাকা রিভিউ সম্মিলন করে লইয়া দণ্ডায়মান। একদিকে ইংরেজীর মর্ণি মুক্তা, অন্যদিকে বাঙ্গালার বন-ফুল, আমাদিগের এই নূতন ধরণের বিচিত্র উপহার, সহৃদয় পাঠকসমাজের সকরুণ ও সানুরাগ দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইবে কি?

এ বিষয়ে বলিবার কথা আরও আছে। বাঙ্গালার মূল প্রস্রবণ,—আর্য্যভাষা, —সংস্কৃত। সংস্কৃত ভাষা মা, বাঙ্গালা তাহার আদরে মেয়ে। সংস্কৃতের সহিত উহার অস্থি-মজ্জাগত শোণিত-সম্বন্ধ। বাঙ্গালা অনায়াসেই সংস্কৃতের সঙ্গে মিশিয়া চলিতে পারে। মেয়ে মায়ের গলা ধরিয়া কোলে চড়িয়া বসিবে, ইহা যেমন সুন্দর, তেমনই স্বাভাবিক। কিন্তু ইংরেজীর সহিত বাঙ্গালার সম্বন্ধ অন্যরূপ। ইংরেজী ও বাঙ্গালা গুরুশিষ্যভাবাপন্ন। এ সম্পর্কও অবহেলার বস্তু নহে। গুরু-শিষ্য ভাবের অর্থ,—প্রাণে প্রাণে দুশ্ছেদ্য বন্ধন, মর্ম্মে মর্ম্মে অন্তর্গূঢ় আকর্ষণ।

বাঙ্গালীজাতি ও বাঙ্গালা ভাষা, উভয়ই ইংরেজজাতি ও ইংরেজী ভাষার নিকট ওষ্ঠে পৃষ্ঠে ললাটে ঋণী। বাঙ্গালীজাতি বাঙ্গালার বিজনবনে ফুটিয়া আপনার মধুমাখা কাব্যসৌরভে আপনি আকল ছিল, পৃথিবীর চক্ষু সেদিকে আকৃষ্ট হয় নাই। ইংরেজী শিক্ষার গুণেই বাঙ্গালী আজি নানা গুণের পরিচয় দিয়া, জগতে আদরের আসন লাভে অধিকারী হইয়াছে। বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য সম্বন্ধেও এই কথা। এ দেশে ইংরেজ-শাসন-প্রতিষ্ঠা ও ইংরেজী ভাষা শিক্ষা প্রচলনের পূর্ব্বে, বাঙ্গালায় একখানি গদ্য গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে কিনা, সন্দেহ। কিন্তু এক্ষণ বাঙ্গালীর বাঙ্গালা ভাষা এক জগন্মোহিনী শক্তিরূপে জগতের সর্ব্বত্র পরিচিত। উচ্চশিক্ষায় সমুন্নত বাঙ্গালার অনেক উচ্চ শ্রেণীস্থ গ্রন্থকার এক্ষণে বাঙ্গালার 'স্কট্' 'কার্লাইল' প্রভৃতি উপাধিতে দেশ দেশান্তরে সম্মানিত। বাঙ্গালী বক্তা এখন দশ সহস্র লোককে একসঙ্গে সভাস্থলে আমন্ত্রণ করিয়া বাঙ্গালা বক্তৃতায়, মন্ত্রমুগ্ধবৎ স্তম্ভিত রাখিতে সমর্থ। এ সমস্তই যে ইংরেজী শিক্ষার প্রসাদাৎ কেহই ইহা অস্বীকার করিতে পারেন না।

বাঙ্গালা এক দিকে সংস্কৃতের স্বাস্থ্যপ্রদ, সুখদ স্তন্যে পরিপুষ্ট, সংস্কৃতের শুভ্র আলোকপাতে সুধাসিক্ত, মধু-মাখা ও জ্যোৎস্নাময়; অন্যদিকে ইংরেজীর ভাবোচ্ছ্বাস ও প্রাণবলে উজ্জীবিত ও শক্তিমন্ত। সংস্কৃতের অপেক্ষা-কৃত তরলিত ও এলায়িত উপাদানে বাঙ্গালা ভাষার সুকুমার তনুর কমনীয় গঠন ও সংস্কৃতের ভাবোচ্ছ্বাসে উহার হৃদয়িক সম্পদ্, আর সেই ক্ষীণ তনুর মৃদু মাধুরী ও সেই ঋষি-প্রদর্শিত উদার হৃদয়ে ইংরেজীর প্রাণে নূতন প্রাণ-প্রতিষ্ঠা। ইহাই আমাদিগের বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্য।

সংস্কৃত ও বাঙ্গালার একাধারে অবস্থান যেমন কাহারও নিকট অস্বাভাবিক বা অসুন্দর প্রতীয়মান হয় না; ইংরেজীর পার্শ্বে বাঙ্গালার,—গুরুমাতা, রাজ-রাণীর সমীপে, চিরমুখপ্রেক্ষিণী অন্তেবাসিনীর সসম্ভ্রম স্থিতিও তেমন, আমরা যতটুকু বুঝি, কাহারও চোকে অসঙ্গত বা অসমঞ্জসরূপে প্রতিভাত হইবার কথা নহে। বস্তুতঃ সংস্কৃত, ইংরেজী ও বাঙ্গালার একত্র সম্মিলন, এ দেশে সাহিত্যের পুণ্যক্ষেত্রে ত্রিবেণী স্বরূপ এবং ইংরেজী ও বাঙ্গালার একত্র সমাবেশ গঙ্গা যমুনার সঙ্গম—

প্রয়াগ। আমরা আজি এই নবসংঘটিত প্রয়াগের তটে, সম্মিলনের বিনীত আমন্ত্রণ লিপিকরে, দণ্ডায়মান হইয়া, করযোড়ে ও অবনতমস্তকে প্রার্থনা করিতেছি, বাঙ্গালার চিরকৃতী আনন্দময় সাহিত্যিক সাধকগণ. ইহার প্রতি প্রীতির চক্ষে দৃষ্টিপাত করুন। আপনারা কৃপা করিলে, আপনাদিগের তপোমহিমায়, পূর্ব্ববঙ্গের ক্ষুদ্র প্রয়াগ,—নব আশা ও উৎসাহে উৎফুল্ল এই ক্ষুদ্র "সম্মিলন", অচিরেই সাহিত্যিক মহাতীর্থে পরিণত এবং কালে, ইহার কুলেও সাহিত্যিক কুম্ভমেলার বিরাট অধিষ্ঠানে দেশের চক্ষু আকৃষ্ট হইতে পারে। সম্মিলনের এই আশা কখন সফল হইবে কি না, কে বলিবে?

তৃতীয় কথা—উদ্দেশ্য বা প্রয়োজন। প্রয়োজন—সাহিত্য চর্চ্চা। বাঙ্গালা সাহিত্যের নাম করিলেই কত কি কথা মনে পড়ে. অতীতের কত কি কাহিনী আপনি স্মৃতিপটে উদিত হইয়া মনঃপ্রাণ অধীর ও আকুল করিয়া তুলে।

মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের সময় হইতে অদ্য পর্য্যন্ত, যুগে যুগে, কত ভাবে, কত সুরে, বাঙ্গালা সাহিত্যের কত প্রকার বন্দনা ও আরতি হইয়াছে, তাহা গণনা করা দুঃসাধ্য। কিন্তু সমস্ত সাহিত্যিক মঙ্গল-সূচনাই ভাষার অঙ্গে ও লোকের মানসপটে আদরের আসন প্রাপ্ত হইয়াছে, এমন কথা, আমরা বলিতেছি না। কিন্তু তৎসমস্তই যে বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যের গঠন-বিষয়ে অল্পাধিক মাত্রায় কার্য্য করিয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

ঈশ্বরচন্দ্রের প্রতিভা, 'রামময়জীবিতা' বনবাসিনী জনকনন্দিনীর প্রেমাশ্রুসিক্ত জীবনযজ্ঞ, পতিপ্রত্যাখ্যাতা প্রেমোন্মাদিনী শকুন্তলাকৃত প্রেমের তপস্যা এবং আরও বহুবিধ মনোবিনোদ আখ্যানযোগে বঙ্গভারতীর আরাধনায় প্রবৃত্ত হয়। বিদ্যাসাগরের সুমার্জ্জিত স্বরলহরী সেই অনাবিল কণ্ঠের সরস ঝঙ্কারে তদানীন্তন বাঙ্গালা সাহিত্যে এক নূতন যুগের অবতারণা হইয়াছিল। সেই সময় হইতেই বাঙ্গালা গদ্যের প্রতি লোকের সানুরাগ দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। 'সে অনেক দিনের কথা। তপোবনের সেই করুণ বিলাপ, আদর্শ সতীকৃত প্রেম সাধনার সেই মহামন্ত্র, এখনও যেন, সাহিত্য-কাননে প্রতিনিয়ত প্রতিধ্বনিত হইতেছে। ঈশ্বরচন্দ্র-প্রদত্ত পূজার নির্ম্মাল্য,—সেই গঙ্গাজলে ধোয়া মন্ত্রপূত পারিজাতপুষ্প সাহিত্য-সেবিগণ এখনও, আন্তরিক প্রীতি ও শ্রদ্ধা সহকারে মস্তকে ধারণ করিয়া, আপনাদিগকে কৃতার্থ জ্ঞান করিতেছেন।

ইহার পরে বঙ্কিমের 'বঙ্গদর্শন'। 'বঙ্গদর্শনের' আনন্দময় রসোচ্ছ্বাস ও প্রাণমনোহারিণী সাহিত্যিক বন্দনায়, মাধুরীর তারে অন্য একসুর বাজিয়া উঠিল। সীতা শকুন্তলার নীরব তাপসাশ্রমে বঙ্কিমের সৃষ্টি,—আয়েসা, তিলোত্তমা, মৃণালিনী ও দেবী চৌধুরাণী প্রভৃতি নূতন বেশে ও নূতন সাজে আসিয়া অভ্যাগতরূপে দণ্ডায়মান হইলেন; এবং অযোধ্যার রাম ও ইন্দ্রপ্রস্থের পাণ্ডবরাজ্যে, একদিকে প্রতাপ প্রেমযজ্ঞে আত্মপ্রাণ আহুতি দিয়া, আর একদিকে প্রশান্তচিত্ত ধীমান্ চন্দ্রশেখর, দয়া ও ক্ষমাধর্ম্মে পর্ব্বতবৎ অটল ও অচল রহিয়া, আর একভাবে জনসাধারণের মন প্রাণ কাড়িয়া লইল। বঙ্গদর্শনের রসমাধুরীপূর্ণ মধুর কূজনে বঙ্গের আবালবৃদ্ধবনিতা প্রীত, মুগ্ধ ও বিস্মিত। সকলেই সমস্বরে,—'মা তুমি এতই মধুর,' এই বলিয়া যেন মাতৃভাষাকে সুধামাখা কুসুম-মালিকার ন্যায়, প্রীতিভরে কণ্ঠে গাঁথিয়া রাখিতে সমুৎসুক হইয়া উঠিলেন।

একদিকে 'বঙ্গদর্শন,' অন্যদিকে 'বান্ধব'। 'বান্ধব' ধীর গম্ভীর ভাবে আত্মপরিচয় দিয়া, মাতৃভাষার সেবাব্রতে দীক্ষিত হইলেন। বান্ধবের প্রভাতী বন্দনা, এবং নিভৃত ও নিশীথ সাধনায় বিশুদ্ধ গঙ্গোদকে পদ্মের মধু মিশ্রিত হইল; আর সেই অভিনব মধুর লহরে লহরে, যেন মনোমাদিনী মদিরার উচ্ছ্বাস উছলিয়া ছুটিল। বাঙ্গালার তদানীন্তন ভ্রমরগুঞ্জিত, কোকিলকূজিত কুসুমকুঞ্জে 'মন্দ্রে গম্ভীরে' লয় মিশাইয়া, কালীপ্রসন্ন, সর্ব্বপ্রথম, বাঙ্গালা গদ্যে মেঘমল্লার ও দীপকের আলাপ করিলেন। বঙ্গভারতী, ক্রমে প্রভাত-চিন্তা, নিভৃত ও নিশীথ চিন্তা প্রভৃতি চিন্তামণি-হার গলে দোলাইয়া, 'হরিদাসের জীবনযজ্ঞে' ভক্তির জয় গাইয়া, 'জানকীর অগ্নি পরীক্ষায়' ভাবমুগ্ধ পাঠককে নয়নজলে ভাসাইয়া, এবং 'মা না মহাশক্তির, উদ্বোধনে সাধককে মহাসাধনার পথ দেখাইয়া,

গৌরবের পদবিতে যেন আরও একস্তর উর্দ্ধে অধিষ্ঠিত হইলেন। বঙ্গীয় পাঠক সমাজ, বান্ধবের অশ্রুতপূর্ব্ব ধ্রুপদের তান ও মূর্চ্ছনায় নূতন আনন্দে আত্মহারা হইয়া, —'মা তুমি শুধুই মৃদুবাহিনী পীযুষ-নির্ঝরিণী নও, 'তুমি আবেগতরঙ্গময়ী গভীরনাদিনী প্রসর পয়স্বিনী,' এই বলিয়া, মাতৃভাষার পবিত্রপীঠে ভক্তিভরে নমস্কার করিলেন

শুধু ইহাই নহে। বাঙ্গালা গদ্য রচনায় ঈশ্বরচন্দ্র, বঙ্কিম ও কালীপ্রসন্নের সময়ে, বঙ্গের আরও বহু কৃতবিদ্য, স্বনামধন্য, কৃতী সন্তান লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ ও অর্জ্জুন, সকলেই মহারথী। কাহাকে ফেলিয়া কাহার কথা বলিব? সকলেই রচনাবিষয়ে আপন আপন বিশেষ বিশেষ চিহ্নে চিহ্নিত হইয়া রহিয়াছেন। তাঁহাদিগের প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য, অগাধ বিদ্যা ও অপ্রতিম প্রতিভাবলে ক্রমশঃ বাঙ্গালাসাহিত্য, উহার এই বর্ত্তমান সুখ-সমুজ্জ্বল মধুর মূর্ত্তিতে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে।

এই সময়ে, অক্ষয়কুমার, রাজা রাজেন্দ্রলাল, দ্বারকা নাথ, রমেশ, যোগেন্দ্র, অক্ষয়চন্দ্র, ইন্দ্রনাথ, প্রফুল্ল, রাজকৃষ্ণ, হরপ্রসাদ, চন্দ্রনাথ, দামোদর, যজ্ঞেশ্বর, মহর্ষি দেবেন্দ্র, দ্বিজেন্দ্র, রাজনারায়ণ এবং শিশিরকুমার প্রভৃতি স্বনাম-প্রসিদ্ধ প্রতিভান্বিত পুরুষেরা, এক এক দিকে এক একটি দিক্‌পালের ন্যায় অবস্থিত রহিয়া, মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রে, ঐতিহাসিক, সামাজিক, ঔপন্যাসিক ও পৌরাণিক প্রবন্ধ রচনা, এবং অন্যবিধ উপাদেয় গ্রন্থ প্রণয়ন দ্বারা বাঙ্গালাভাষার শোভাসম্পদ্ ও শক্তিসামর্থ্যের সংবর্দ্ধন করিতেছিলেন।

তখন কৃত্তিবাস, কাশীদাস ও ভারতচন্দ্রের বিনোদ-কুঞ্জে মধুসূদনের ভেরী, হেমের বীণা, নবীনের বাঁশী, রবির সুরবীণ, দীনেশের বেণু ও রাজকৃষ্ণের জলতরঙ্গ নানাতানে বাজিয়া উঠিয়াছিল। নাট্য সাহিত্যে দীনবন্ধু, উপেন্দ্র, মনোমোহন, গিরীশ ও অমৃতলাল প্রভৃতি হাস্য, করুণ, ভক্তি ও বীর রসের বিবিধ দৃশ্য ফলাইয়া, বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। বঙ্গের সাহিত্য-কানন একসঙ্গে কোকিল, দয়েল, শ্যামা ও বুলবুলের মধুর কূজনে উল্লসিত ও উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিল। বলিতে কি, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে ইহা বস্তুতই চিরস্মরণীয় গৌরবের এক অভূতপূর্ব্ব পরিচ্ছেদ। রোমান্ সাহিত্যে যেমন অগাষ্টাস্ সাজারের যুগ, ইংরেজী সাহিত্যে যেমন এলিজাবেথের যুগ, বাঙ্গালা সাহিত্যেরও, তেমন এই ভিক্টোরিয়া যুগ। বাঙ্গালা সাহিত্যে এই শুভদিনের সুপ্রভাত ভারতরাজরাজেশ্বরী, প্রাতঃস্মরণীয়া মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বকালেই সংঘটিত হইয়াছে।

কিন্তু হায়! বাঙ্গালার সে সম্পদসৌভাগ্যের দিন অস্তমিত হইয়াছে! বাঙ্গালার সে দেবসঙ্গীত,— সুধা-মাখা সামগান, দীপকের সেই উচ্ছ্বসিত কণ্ঠ, সেই বেণু, বীণা ও ভেরী নীরব হইয়া গিয়াছে। রবির সুরবীণ, এখনও সেই কালের সেই সুখস্মৃতির স্ফুরণে, মাঝে মাঝে, উহার চিরপরিচিত বিনোদ-তানে বিনাইয়া বিনাইয়া শোকগাথা গাইতেছে, তাঁহার নূতন ছাঁদের তরল ও সরল গদ্য, এখনও মাঝে মাঝে প্রতিভার ক্ষণিক চমক দেখাইতেছে এবং এখনও, সেই কালের দুই একটি সাহিত্যিক মহারথী এখানে সেখানে পুরাতন গৌরবের প্রতিভূ স্বরূপ দণ্ডায়মান আছেন। একথা সত্য, কিন্তু সে তরঙ্গ, সে মধুরনাদী কলকল্লোল এখন কোথায়?—বাঙ্গালার সে সুদিন কি আবার ফিরিয়া আসিবে?

এক্ষণ জিজ্ঞাস্য এইঃ—যে সাহিত্যক্ষেত্র উল্লিখিত মহাপুরুষদিগের পুণ্যপ্রতিভায় সমুজ্জ্বল থাকিয়াও, এখন অদৃষ্ট দোষে শ্মশানবৎ নিস্তব্ধ ও নীরব, সেখানে সম্মিলনের ন্যায় এই নবোদ্গত সাহিত্য শিশুর প্রয়োজন কি?

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি প্রয়োজন সাহিত্য-চর্চ্চা;— প্রয়োজন,— পুরাতন স্মৃতির সন্ধুক্ষণ,— প্রয়োজন,— অতীতের পানে তাকাইয়া, যদুবংশের বজ্র বা কুরুকুলের যযুৎসুর ন্যায়, অশ্রুতর্পণ,— প্রয়োজন—পূজাবসানে পূজামণ্ডপে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত আশীর্ব্বাদী নির্ম্মাল্যের যথাশক্তি আহরণ,—আর প্রয়োজন—সাহিত্যিক সমবায় ও সামঞ্জস্য বিধানে আত্মসমর্পণ।

বিনা প্রয়োজনে জগতে কিছুই ফোটে না, কিছুই থাকে না। প্রয়োজন না থাকিলে, চন্দ্র সূর্য্যের নিত্য

বিলাসভূমিতে কখনও খদ্যোতের সৃষ্টি হইত না। বঙ্গদর্শন ও বান্ধব প্রভৃতির লীলাকুঞ্জে 'সম্মিলন', চন্দ্র সূর্য্যের দেশে তুচ্ছ খদ্যোত ভিন্ন আর কিছুই নহে। এই নগণ্য খদ্যোতের এই মাত্র আশা ও আকাঙ্ক্ষা যে, ইহার এই সাহিত্যিক সেবাব্রতে, এই শোকাচ্ছন্ন স্মৃতির তপস্যায়, বিজ্ঞ সাহিত্যিকগণ কৃপাকণা দানে কুণ্ঠিত হইবেন না; সহৃদয় পাঠক সমাজও সদয় কর-প্রসারণে ইহাকে আশ্রয় দান করিবেন। বলা বাহুল্য যে, খদ্যোতের ক্ষীণালোকে মেঘাবৃত অতীত গৌরবের এক বিন্দুও যদি লোক-লোচনের গোচরীভূত হয়, তাহা হইলেই ইহার জন্ম সার্থক ও জীবন সফল হইবে।

সৃষ্টি জগতে অণু-পরমাণু তুচ্ছ ও নগণ্য। কিন্তু প্রেমময়ের বিশ্বব্যাপী প্রেমের কি যেন মহিমায় এমনই ভাবে অনুপ্রাণিত যে উহারা কখনও একা থাকিতে পারে না। স্বভাবের টানেই একটি আর একটির সহিত মিলিত হয়। তুচ্ছ অণু-পরমাণুর মিলন ও সংযোগেই, এক দিকে আকাশের চন্দ্র সূর্য্য, পৃথিবীর অভ্রভেদী উন্নতশীর্ষ অদ্রিমালা, এবং সমুদ্রের অনন্ত বিস্তার, অন্য দিকে আবার সেই অণু-পরমাণুর প্রেম-সংযোগেই বনের বনযুথিকা, বাগানের প্রস্ফুট গোলাপ ও সরোবরের প্রফুল্ল পদ্ম। ঢাকার এই ক্ষুদ্র সাহিত্যিক অণুর অন্য কিছু থাকুক্ আর না থাকুক্ আমরা আরম্ভেই বলিয়াছি, প্রেম ইহার সম্বল ;—মিলন ইহার জীবন-ব্রত। ইহার আণবিক আকর্ষণে,—অণু-পরমাণুর যোগে জাহ্নবীর পুণ্য প্রবাহ প্রবাহিত না হইলেও, সাহিত্য-কাননে একটি গোলাপ বা যুথিকাও প্রস্ফুটিত হইতে পারে না, এমন নহে। আমরা পুনরপি করযোড়ে সহৃদয় সাহিত্যিক-গণের নিকট প্রার্থনা করি, আপনারা আশীর্ব্বাদ করুন :—আপনাদিগের সদয় সহানুভূতি ও সাহায্য পাইলে, ক্ষুদ্র অণুর এই সামান্য আশা কখনও দুরাশায় পরিণত হইবে না।

গীত-গৌরাঙ্গ।

উপক্রম।

পূর্ব্ববঙ্গের বেগবিহ্বলা কীর্ত্তিনাশিনী পদ্মা আপনার ভাবে আপনি চিরলীলাময়ী ও উন্মাদিনী। ভাঙ্গন ও গড়ন, ইহাই উহার নিত্য অনুষ্ঠিত কর্ম্ম। কত জনপদ, কত স্থান, পদ্মার কুক্ষিগত হইয়াছে, আবার উহার অগাধ জলে কয়টি তৃণশষ্প বুকে লইয়া কত নূতন চড়া জাগিয়া উঠিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই।

পদ্মার তটে, স্থানে স্থানে 'ছায়াশীতল' ও 'বৃক্ষবহুল' বহু জনপদ বা গ্রাম ছিল, এখনও আছে। বাঙ্গালার চিন্তা-শীল দার্শনিক ও ভাবুক কবি, কালীপ্রসন্ন, এক সময়ে পদ্মার তটবর্ত্তী ঈদৃশ কোন গ্রামে এক বন্ধুর গৃহে গমন করিয়াছিলেন।

বসন্ত কাল। পূর্ণিমা তিথি। আকাশ নির্মেঘ ও নির্ম্মল। বাসন্তী পূর্ণিমার প্রফুল্ল জ্যোৎস্নায় জগৎ হাস্যময়। জ্যোৎস্নার সুখ-শীতল রজতধারায়, জল, স্থল, লোকালয়

* বান্ধব-সম্পাদক স্বর্গীয় রায় বাহাদুর কালীপ্রসন্ন বিদ্যাসাগর সি, আই, ই, মহোদয় "গীত-গৌরাঙ্গ" নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। উহার কিয়দংশ মাত্র পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়াছিল। সমস্ত গ্রন্থ মুদ্রিত বা প্রকাশিত হয় নাই। আমরা "সম্মিলনে" সেই কবিত্বপূর্ণ ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি ক্রমশঃ প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। 'প্রভাতচিন্তা, নিভৃতচিন্তা ও নিশীথচিন্তার সুপরিচিত লেখনী, তেজোদীপ্ত গম্ভীর ভাষায়, দার্শনিক তত্ত্বে কাব্যের মধু ফলাইয়াই নিরস্ত হয় নাই, উহা সর্ব্বথা প্রাঞ্জল ও মধুর অক্ষরে সর্ব্বসাধারণের চিত্তহারি সরল রচনায়ও কিরূপ সমর্থ ছিল, "গীত-গৌরাঙ্গ" পাঠে পাঠক তাহার বিশদ পরিচয় পাইবেন।

গীত-গৌরাঙ্গ কএকটি স্তবকে বিন্যস্ত। গ্রন্থের প্রারম্ভে 'উচ্ছ্বাস' নামে একটি ক্ষুদ্র পরিচ্ছেদ ছিল। উচ্ছ্বাস প্রকৃতই উচ্ছ্বাস। উহা বর্ণনার পারিপাট্য ও কাব্যের ঢল ঢল জোৎস্নায় আওট-পূর্ণ। কিন্তু ঐ টুকু বান্ধবে একবার প্রকটিত হইয়াছে বলিয়া, আমরা নিতান্ত দুঃখের সহিত উহার পুনর্মুদ্রণে ক্ষান্ত রহিলাম। "উচ্ছ্বাস" পুনর্মুদ্রিত না করিলেও প্রসঙ্গ-সঙ্গতির জন্য, উহার মূল কথা কয়টি, সংক্ষেপে বলিয়া লওয়া আবশ্যক। আমরা এই হেতু, আমাদিগের ভাষায় ইহার উপক্রম লিপিবদ্ধ করিলাম। এস্থলে ইহা বলিয়া রাখা সঙ্গত যে, কোটেশন চিহ্নের অন্তর্ভুক্ত অংশ সেই উচ্ছ্বাস হইতেই অবিকল উদ্ধৃত হইল। সঃ সঃ

ও বনভূমি সমস্ত উচ্ছ্বসিত ও প্লাবিত। ঘোষ মহোদয়, জ্যোৎস্নালোকে পদ্মার শোভা দর্শনার্থ পদ্মার তটে গমন করিলেন।

তিনি দেখিলেন, বাসন্তী পূর্ণিমার জ্যোৎস্নারাশি পদ্মার জলে ভাসিতেছে। পদ্মার প্রসারিত বক্ষে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীচিমালার বিলাস-নৃত্য যেন একটা জ্যোৎস্নার সমুদ্র সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছে। একদিকে দিগন্তবিস্তৃত পদ্মার জ্যোৎস্নামাখা তরঙ্গরাশি, আর একদিকে গ্রামের জ্যোৎস্নাধৌত বনরাজী। এই দৃশ্য দর্শনে তাঁহার মনঃপ্রাণ, ভয়, বিস্ময় ও সেই এক প্রকার বিষাদময় আনন্দে ডুবিয়া গেল। রাত্রি ক্রমে গভীর হইতে গভীরতর হইয়া উঠিল। তিনি কিছুই টের পাইলেন না।

"বাসন্তী পূর্ণিমা ভগবৎভক্তদিগের চিরপ্রার্থিত পুণ্যরাত্র।" গ্রামে সঙ্কীর্ত্তন হইতেছিল। সঙ্কীর্ত্তনের একটি দূরশ্রুত পদ তদীয় কর্ণে প্রবেশ করিয়া, প্রাণ স্পর্শ করিল। তিনি অনন্য মনে শুনিতে লাগিলেন,—

"জানি কার,—জানি কার রূপসাগরে ঝাঁপ দিয়ে সে গৌর হয়েছে।"

কোন বিশেষ অবস্থায়, কোন বিশেষ মুহূর্ত্তে, সামান্য একটি কথায় অথবা নিত্যশ্রুত গীতের সামান্য একটা তানেও ভাবপ্রবণ প্রাণে ভাবের সমুদ্র উথলিয়া উঠে। তাঁহার তাহাই হইল। সম্মুখস্থ জ্যোৎস্না-ঢলঢল পদ্মা, দূরশ্রুত ঐ গীতের পদ-মাহাত্ম্যে, তাঁহার চক্ষে, অমনি রূপ-সাগরে পরিণত হইল। তিনি আপনার রোগ, শোক, ক্লেশ ও দুঃখ সমস্ত ভুলিয়া গিয়া, একবারে আত্মহারা হইয়া পড়িলেন। কল্পনা-নেত্রে বাঙ্গালার একটি পুরাতন দৃশ্য বর্ত্তমান ও প্রত্যক্ষবৎ প্রতিভাত হইতে লাগিল।

দৃশ্য, গঙ্গার তট, নবদ্বীপের ঘাট। অসংখ্য লোক লক্ষ লক্ষ মৃদঙ্গ ও মন্দিরার ধ্বনি সহকারে যেন নাচিয়া হরিনাম গাইতেছে। সকলেই কি মধুর ভাবে উন্মত্ত। আর সেই লোক-সমুদ্রের মধ্যভাগে, "কার জানি কেমন একখানি মোহনমূর্ত্তি, ঘনীভূত জ্যোৎস্না অথবা স্থির বিজলীর মত বিরাজিত রহিয়া, সকলের প্রাণে আপনার সেই রূপের তরঙ্গ ঢালিয়া দিতেছে।"

"চকোর যেমন জ্যোৎস্নী রাত্রিতে, আকাশে উড়িয়া উড়িয়া, চন্দ্রের জ্যোৎস্না পান করে, চারিশত বৎসরের কিছু অধিক হইল, বঙ্গের বহু কোটি হৃদয়, সেই প্রকার, সে রূপের জ্যোৎস্না পান করিয়া প্রাণে শীতল হইয়াছিল। সেই অপ্রমিত রূপ ও রূপনিহিত অপরূপ চিত্ত-চরিত্রের প্রভাবে বঙ্গে যে প্রেমভক্তির প্রবল স্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল, তাহা আজও ক্ষীণতোয়া নদীর ন্যায়, অল্প অল্প বহিতেছে; এবং নিতান্ত নীরস-নিঠুর, কঠোরমতি বিষয়ীকেও নয়নজলে ভাসাইয়া ভক্তির দিকে আকর্ষণ করিতেছে।"

তিনি হৃদয়ে এই ভাব লইয়া পদ্মার তট হইতে বিশ্রাম-গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু এই দৃশ্য তাঁহার চিন্তার স্রোত হইতে অপসারিত হইল না। "প্রেমভক্তির অলৌকিক গুরু, রূপের নিধি শ্রীগৌরাঙ্গের" জীবন-কাহিনী তাঁহার স্মৃতিপটে জাগিয়া উঠিল। "বঙ্গের সংগীত ও সাহিত্য, কবিতা ও ইতিহাস, শুধু যাঁহার কথা লইয়া, বাসন্তী জ্যোৎস্নার সুখ-সুধা-মুগ্ধ শ্যামা ও কোকিলার মত, এই চারিশত বৎসর কাল, মনুষ্যের হৃদয়কে কল-কূজনে মোহিত রাখিয়াছে," তিনি তাঁহার রস-উচ্ছলিত মধুর ভাষায় সেই গৌরাঙ্গের সংক্ষিপ্ত কাহিনী "গীত-গৌরাঙ্গ" নামে প্রচার করিতে প্রয়াসী হইলেন। পাঠক, বঙ্গের এই পুরাতন কথায় তোমার কোমল হৃদয়টিও অমনি উছলিয়া উঠিবে কি?

সংক্ষিপ্ত কাহিনী।

প্রথম স্তবক।

"এ বালকে জানিও কেবল পরানন্দ,
ইহাকে বলিবে লোকে নবদ্বীপ-চন্দ্র।"

ভক্তির পুতুল শ্রীগৌরাঙ্গ, বাঙ্গালা ৮৯২ সনে, ২৩শে ফাল্গুন তারিখে, বঙ্গদেশের পুরাতন রাজধানী নবদ্বীপ নগরে, বাসন্তী পূর্ণিমায় জন্মগ্রহণ করেন। এক্ষণকার নবদ্বীপ গঙ্গার পশ্চিম তটে। যে সময়ে গৌরাঙ্গদেব জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সে সময়ে উহা গঙ্গার পূর্ব্ব তটে অবস্থিত ছিল।

গৌরাঙ্গের পিতার নাম জগন্নাথ মিশ্র। মাতার নাম শচী। শচী নবদ্বীপের সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিত নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর কনিষ্ঠা কন্যা।

"শচীর জনক নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী,
জ্যোতিষ শাস্ত্রেতে তেঁহ সাক্ষাৎ গর্গমূর্ত্তি।" (অ)

শচী বড় সুন্দরী, সুশীলা ও মধুর-স্বভাবা মেয়ে ছিলেন; এবং স্বভাবের গুণে, শিশুকাল হইতেই, নবদ্বীপের ছোট বড় সকলের কাছে সুপরিচিত হইয়াছিলেন। নবদ্বীপের অনেকেই, নানা কার্য্য উপলক্ষে নীলাম্বরের বাড়ী যাইতেন। তাঁহারা সেখানে সুকুমারী শচীরে সর্ব্বদা নীলাম্বরের কাছে দেখিতে পাইতেন, এবং সকলেই শচীর মিষ্ট ব্যবহারে ও মধুর কথায় মোহিত হইতেন। সকলেই বলিতেন, শচী বড় সৌভাগ্যবতী হইবে। শচী সকলের কাছেই সতত প্রফুল্ল। শচীর মুখে কেহ কখনও কটু কথা কিংবা মিছা কথা শুনিতে পাইতেন না। শচী আপনি না খাইয়া, পাড়ার শিশুদিগকে আদর করিয়া খাওয়াইতেন,—গুরুজন দেখিলেই পায়ে পড়িয়া প্রণাম করিতেন;—এবং নারায়ণের দুয়ারে ভক্তির সহিত মাথা নোয়াইতেন। পণ্ডিতেরা বালিকা শচীর এ সকল সুলক্ষণ দেখিয়া শচীরে আশীর্ব্বাদ করিতেন, এবং সকলেই মুক্তকণ্ঠে বলিতেন, শচীর গুণে নীলাম্বরের নাম সুধন্য হইবে।

কথাটা সার্থক হয় নাই কি? নীলাম্বরের পুত্র ছিল। পৃথিবীতে তাহার নাম নাই। কিন্তু নীলাম্বর, শচীর নামে, অদ্যাপি সংসারে সুকীর্ত্তিত। শচীর প্রতি নীলাম্বরেরও বড় বেশী ভালবাসা ছিল। নীলাম্বর যখন, শুভ—দিনে, শুভ—ক্ষণে, সুরূপ, সুচরিত্র, সৎকুলীন এবং শান্তমূর্ত্তি জগন্নাথ মিশ্রের হস্তে, তাঁহার প্রাণের ধন শচীবালারে সম্প্রদান করিলেন, তখন তাঁহার প্রাণটা প্রকৃতই আনন্দে একবারে গলিয়া গেল।

জগন্নাথ মিশ্রের পূর্ব্ব নিবাস শ্রীহট্ট। তাঁহার পিতার নাম উপেন্দ্র মিশ্র। উপেন্দ্র মিশ্র একজন সদ্গুণ-প্রধান ও ধন-মান-সম্পন্ন বৈষ্ণব পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার সাত পুত্র। এই সাত পুত্রের মধ্যে পঞ্চম পুত্র, প্রসিদ্ধনামা জগন্নাথ মিশ্র, বিদ্যাশিক্ষার অভিলাষে, প্রথম বয়সে, নবদ্বীপে চলিয়া যান, এবং সেখানে শচীর পাণিগ্রহণের পর, নবদ্বীপের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে, গঙ্গার অতি নিকটে, মায়াপুর নামক পল্লীতে, রীতি-মত ঘর বাড়ী করিয়া উপনিবিষ্ট হন। জগন্নাথ, মিশ্র পুরন্দর বলিয়াই, পুথি পত্রে পরিচিত। এই পুরন্দর কি তাঁহার বিদ্যার উপাধি, না বংশের পদবী, তাহা বলা যায় না।

পাঠক, তুমি কখনও নদীর তটে বকুল কিংবা শেফালিকা ফুলের গাছ দেখিয়াছ কি? এক একটি ফুল, বোঁটা হইতে স্খলিত হইয়া, গড়াইয়া গড়াইয়া জলে পড়ে, এবং জলের প্রখর স্রোতে এক দিকে ভাসিয়া যায়। কোথায় যায় কেহ আর জানিতে পায় না। বড় শোকাবহ দৃশ্য! দেখিলেই প্রাণটা আকুল হয়! জগন্নাথ ও শচীর সুখ-শান্তিময় জীবনও, সুহৃৎ স্বজনের প্রাণে, কিছু কাল ঠিক এমনই শোকাবহ দৃশ্যের মত, চিত্রিত রহিয়াছিল। তাঁহাদিগের প্রথমে ক্রমে আটটি কন্যা জন্মিল।

"জগন্নাথ-মিশ্র-পত্নী শচীর উদরে
অষ্ট কন্যা ক্রমে হৈল; জন্মি জন্মি মরে।"

প্রত্যেকটিই ফুলের মত সুন্দর, ফুলের মত নয়ন ও মনের প্রীতিকর। কিন্তু, ঐ আটটি কন্যাই, একে একে, ফুলের মত কালের স্রোতে গড়াইয়া পড়িল, এবং কেহ দেখিতে না দেখিতে, পিতা মাতার চিত্তপটে, রূপের একটুকু ছায়া মাত্র রাখিয়া, কালের স্রোতে ভাসিয়া গেল। যাঁহারা ঘরের লোক, তাঁহাদিগের আর কথা কি? পরের চক্ষুও শচীর দুঃখে অশ্রুজলে আর্দ্র হইল। প্রতিবেশিনীদিগের মধ্যে অনেকেই শচীর জন্য কাঁদিল।

এই আট কন্যার পর শচীর গর্ভে এক পুত্র জন্মিলেন। তাঁহার নাম বিশ্বরূপ। বিশ্বরূপ, ফলতঃই, রূপে ও গুণে, বিশ্বরূপ নামের যোগ্য ছিলেন। অমন শান্ত, সুস্থির, সুশীল ও সুরূপ বালক পৃথিবীতে প্রায়শঃ মানুষের চক্ষে পড়ে না।

বিশ্বরূপের বয়স যখন আট কিংবা নয় বৎসর, সেই সময়ে শ্রীগৌরাঙ্গ, দোল পূর্ণিমার দিবস, সন্ধ্যার একটুকু পূর্ব্বে কি পরে, শচীর ঘর সমুজ্জ্বল করিয়া, জন্ম গ্রহণ করিলেন। দোল পূর্ণিমার দিনে, নবদ্বীপে চিরকালই নানাবিধ আনন্দের উৎসব হইত। ঐ দিন চন্দ্র গ্রহণ

ছিল বলিয়া, নবদ্বীপের নগর-পথে ও গঙ্গার তটে, লোকে লোকারণ্য। নবদ্বীপের সহস্র সহস্র লোক, গঙ্গার জলে স্নান করিয়া, হরিধ্বনি করিতে করিতে ঘরে ফিরিতেছে, হরি নামের কাঙ্গাল, দীন-দয়াল গৌরাঙ্গ ঠিক এমনই সময়ে ভূমিষ্ঠ হইলেন। ইহা অবশ্যই একটি বিচিত্র ঘটনা।

"ফাল্গুন পূর্ণিমা সন্ধ্যায় প্রভুর জন্মোদয়;
সেই কালে দৈব-যোগে চন্দ্র গ্রহণ হয়।
'হরি' 'হরি' বলে লোক হরষিত হঞা;
জন্মিল চৈতন্য প্রভু নাম জন্মাইয়া'। (চৈ, চ)

নবদ্বীপ, বঙ্গীয় হিন্দু রাজার শেষ রাজধানী বলিয়া, চির দিনের তরে ইতিহাসে প্রসিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। উহা এখনও, পণ্ডিতের স্থান বলিয়া, সকল দেশে সুপ্রসিদ্ধ। কিন্তু যাঁহারা বঙ্গে, ভক্তির তরঙ্গে, জীবনের তরী ভাসাইয়াছেন, উহা তাঁহাদিগের চক্ষে, শ্রীগৌরাঙ্গের জন্ম ও জীবনের লীলা সম্পর্কে, প্রেম-ভক্তির সুরভি-কুঞ্জ, পুণ্যপুঞ্জময় পবিত্র তীর্থ। নবদ্বীপের এই গৌরব ও এই সৌরভ কোন কালেও বিলুপ্ত হইবার নহে।

দ্বিতীয় স্তবক।

"শচী পুণ্যবতী জগন্নাথ ভাগ্যবান্।
সাদরে নিরখে দোঁহে পুত্রের বয়ান॥"

গৌরাঙ্গ যখন ছয় মাসের শিশু, তখন তাঁহার নাম-করণ হইল। শচী ও জগন্নাথ, নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর উপদেশ অনুসারে, সুহৃৎ স্বজন ও পাড়ার সকলকে লইয়া, গৌরাঙ্গের জন্ম মাস হইতে ছয় মাসের মধ্যেই, তাঁহার নাম-করণ ও অন্ন-প্রাশন-উৎসব সম্পাদন করিলেন। জগন্নাথ মিশ্র, সম্পত্তিশালী না হইলেও, একবারে দরিদ্র ছিলেন না। তিনি তাঁহার সেই সোনার পুতুল, অতুলমূর্ত্তি শিশুকে, নাম-করণ-উৎসবের দিবস, নানা-বিধ স্বর্ণাভরণে সাজাইলেন। শচী সেই সুসজ্জিত সোনার পুতুল বুকে তুলিয়া লইয়া, অতীত জীবনের সকল দুঃখ তখনকার সে আনন্দের উচ্ছ্বাসে একবারে ভুলিয়া গেলেন।

'ক্ষণে হাসে, ক্ষণে কান্দে, ক্ষণে নতি করে।
ক্ষণে কোলে, ক্ষণে দোলে, হিয়ার উপরে॥
শচী-স্তন-যুগে দুই চরণ রাখিয়া।
দোলে যেন সোনার লতিকা বায়ু পাঞা॥"

নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীই, শচীর ক্ষুদ্র সংসারে, সমস্ত বিষয়ে সর্ব্বপ্রধান অধ্যক্ষ। শচী ও জগন্নাথ উভয়েই তাঁহাকে যার-পর-নাই সম্মান করেন, এবং সকল কার্য্যেই তাঁহার উপদেশ লইয়া চলেন। নীলাম্বর শচীর জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম রাখিয়াছিলেন বিশ্বরূপ; তিনি বড়ই প্রীত-প্রফুল্ল-চিত্তে শচীর কনিষ্ঠ পুত্রের নাম রাখিলেন বিশ্বম্ভর।

নামে নামে বড় সুন্দর মিলিল; এবং শিশু বিশ্বম্ভরের অতুল রূপ, বিশ্বরূপের শান্তশীতল সুনির্ম্মল রূপের আভায়, শতগুণ বেশী ঝল-মল করিতে লাগিল। কিন্তু ভক্তের গুরু শ্রীগৌরাঙ্গ, বিশ্বম্ভর নামে যত পরিচিত, নিমাই, গৌরাঙ্গ, গৌর রায় ও চৈতন্য প্রভৃতি নানাবিধ ভক্ত-বাঞ্ছিত মধুর নামে, ক্রমে ক্রমে, তাহা হইতে অনেক বেশী পরিচিত হইলেন। তাঁহার প্রতি যেন কখনও ডাকিনী, শাঁখিনী এবং অপদেবতা প্রভৃতির দৃষ্টি না পড়ে, এজন্য শচী ডাকিতেন তাঁহাকে নিমাই বলিয়া। তিনি বড়ই অপরূপ-সুন্দর ও গৌরবর্ণ ছিলেন; এই জন্য, পাড়ার মেয়েরা কেহ ডাকিত তাঁহাকে গৌরহরি, কেহ ডাকিত গোরাচাঁদ, এবং কেহ ডাকিত শুধুই গোরা বলিয়া। গৌরাঙ্গ, গৌররায়, গৌরসুন্দর ও গৌরমোহন প্রভৃতি নাম গুলিও সেই নয়ন-মোহন গৌর রূপেরই পরিচায়ক। তিনি, তাঁহার নবদ্বীপ-লীলার শেষ সময় হইতে, চৈতন্য নামেই সমধিক পরিচিত। তাঁহার সম্পর্কে কবির সুপ্রসিদ্ধ কথা সর্ব্বাংশেই সার্থক হইয়াছে;—

সুরভি কুসুমে অলি আপনি গুঞ্জরে।
গোলাপ, যে নামে ডাক, মধু বিতরে॥

শচী, একে একে, আটটি কন্যাকে, কালের গ্রাসে ডালি দিয়া, অনেক কাঁদিয়াছিলেন; অনেক দিন অশ্রু-জলে ভাসিয়াছিলেন। তিনি সম্প্রতি, বিশ্বরূপ ও বিশ্বম্ভর এই দুইটি সোনার পুতুল শিশু লইয়া, প্রকৃতই একটুকু সুখী হইলেন। শিশির-সিক্ত প্রস্ফুট পদ্ম যেমন, প্রভাত-সূর্য্যের সোনালি কিরণে, মৃদু মৃদু হাসিতে থাকে, তাঁহার সেই অশ্রুসিক্ত বদন মণ্ডলেও, বহুদিনের পর

সুখ-শান্তির মৃদু-মধুর হাসি ফুটিল। প্রতিবেশীরা ইহা দেখিয়া যার-পর-নাই সুখী হইল। কারণ, যে তাঁহাকে জানিত, সেই তাঁহার নিঃস্বার্থ-নির্ম্মল, স্নেহ-শীতল উদার চরিত্রে মোহিত হইয়া, তাঁহাকে দেবতা জ্ঞানে ভক্তি করিত,—এবং তিনি তাঁহার প্রাণের দুঃখ প্রাণের মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়া, পরের সুখে সুখিত ও পরের দুঃখে দুঃখিত হইতেন বলিয়া, প্রতিবেশিনীদিগের মধ্যে সকলেই তাঁহাকে অন্তরের সহিত ভালবাসিত।

শচীর মুখে যেমন হাসি ফুটিল, শচীর অঙ্গনও সেইরূপ, শিশুর সহাস্য-সুমধুর কল-কল কোলাহলে, আনন্দময় হইয়া উঠিল। বিশ্বরূপ, শিশুকাল হইতেই, আপনাতে আপনি একক। তাঁহার প্রশান্ত জীবনে, কেহই কোন দিন তাঁহার জীবনের পথে সাথী হয় নাই। শিশুরা যে বয়সে, পাঁচ জনে মিলিয়া মিশিয়া, খেলার আমোদে দিন কাটায়, তিনি তখনও, বাড়ীর কোন এক নিভৃত স্থানে, একা বসিয়া, শিশুসমুচিত লেখাপড়ায় নিবিষ্ট থাকিতেন; এবং যখন টোলে যাইয়া লেখা পড়া করিতে আরম্ভ করিলেন, তখনও পুঁথি পত্র খানি কাঁকে লইয়া, বাড়ী হইতে নিঃশব্দে একা চলিয়া যাইতেন। তিনি কোন দিনও পিতা মাতার উপর কোন রূপ আখুটি আবদার কিংবা ভালবাসার অত্যাচার করেন নাই; এবং তিনি কখন টোলে রহিতেন, কখন বা বাড়ী থাকিতেন, তাহা পিতা মাতাকেও আপনা হইতে জানিতে দেন নাই।

কিন্তু, তাঁহার অনুজ গৌরাঙ্গ—বিশ্বম্ভর সর্ব্বাংশেই তাঁহার বিপরীত হইয়া উঠিলেন। গৌরাঙ্গের মুখে যে সময়ে কথা ফুটিল, সেই সময় হইতেই, শচী তাঁহার নিত্য নূতন আখুটি ও আবদার লইয়া অধীর ও অস্থির;—এবং যে সময়ে তিনি প্রথম পাদ-চারণা শিখিলেন, সেই সময় হইতেই তিনি, পাড়ার কচি কচি বহু শিশু লইয়া, দিগম্বর-শিশু-সেনার অধিপতি। শচী, ঘরের দুয়ারে বসিয়া, দুই চারিটি প্রতিবেশিনী লইয়া, তামাসা দেখিতেন; এবং গৌরাঙ্গ, কিবা প্রাতে, কিবা সায়ং সময়ে, সমান-বয়স্ক বহু শিশু লইয়া, আঙ্গিনায় নানারূপ আমোদ করিয়া, সকলের আনন্দ জন্মাইতেন।

"শচীর অঙ্গনে নাচে বিশ্বম্ভর রায়।
হাসি হাসি—ফিরি ফিরি—মায়েরে লুকায়॥
বয়ানে বসন দিয়া, বলে লুকাইনু।
শচী বলে বিশ্বম্ভর আমি না দেখিনু॥
* * * *
নাচে গোরা শচী-দুলালিয়া।
চৌদিকে বালক মেলি দেয় তারা করতালি,
হরি-বোল হরি-বোল—বলিয়া।"

গৌরাঙ্গ যখন চারি বৎসর বয়সে ভালরূপ চলা ফিরা করিতে সমর্থ, তখন আর শচীর গৃহে তাঁহার সংকুলন হয় না। তখন হইতে, সমস্ত নবদ্বীপই তাঁহার ক্রীড়াক্ষেত্র; এবং নবদ্বীপ-নিবাসী নর-নারীদিগের মধ্যে, প্রায় সকলেই তাঁহার আনন্দ লীলাময় অত্যাচারের পাত্র। তিনি কখনও বাড়ীর অঙ্গনে, কখনও গঙ্গার তটে,—কখনও বা নবদ্বীপের উত্তর প্রান্তে, মাতুলালয়ের সন্নিকটে। তিনি যতক্ষণ বাড়ীর আসে পাশে থাকিতেন, ততক্ষণ শচী, হাতে একখানি সাট লইয়া, পাছে পাছে যাইতেন। কিন্তু দূরে চলিয়া গেলে, শচী আর সঙ্গে যাইতে পারিতেন না।

শচীর গৃহে ঈশান নামক একটি সেবক ছিলেন। যত দূর জানা যায়, তাহাতে বোধ হয়, ঈশান শচীর বিবাহ সময়েই শচীর সঙ্গে আসিয়াছিলেন। ঈশান, নিম্ন শ্রেণীর লোক হইলেও, চরিত্রের গৌরবে, সকলের কাছেই যার-পর-নাই সম্মানিত ছিলেন। শচী ক্লান্ত হইয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিতেন। ঈশান গৌরাঙ্গের পাছে পাছে ধাবিত হইতেন। ঈশান আগে সেবা করিয়াছিলেন শান্ত-মূর্ত্তি শচীর; তারপর লালন-পালন করিয়াছিলেন অধিকতর শান্তমূর্ত্তি বিশ্বরূপের; এখন ঠেকিয়াছেন অশান্তের শিরোমণি গৌরাঙ্গকে লইয়া। কিন্তু ঈশান হটিয়া যাইবার লোক ছিলেন না। নবদ্বীপের যেখানে গৌরাঙ্গের শিশু-সেনা, সেখানেই স্নেহ-পূর্ণ ঈশান।

"সেবিলেন সর্ব্বকাল আইরে ঈশান।
চতুর্দ্দশ লোক মধ্যে মহাভাগ্যবান্॥
শচী দেবী ঈশানে যতেক স্নেহ কৈল।
কহিতে কি জানি তাহা সাক্ষাতে দেখল॥"
"ওহে বাপু কহিতে কি জানি ক্রিয়া তান।
নিমাই চাঁদের অতি প্রিয় সে ঈশান॥

ঈশানের প্রাণ শচীনন্দন নিমাই।
ঈশান বিহনে না যায়েন কুন ঠাঁই॥
বাল্যকালে নিমাই চঞ্চল অতিশয়।
যে আখুটি করে তা ঈশান সমাধয়॥" (চৈ-ভা)

এইরূপ চঞ্চলতার মধ্যেও, গৌরাঙ্গ মাঝে মাঝে, তাঁহার মায়ের কাছে, অকস্মাৎ দুই একটি অতি গভীর তত্ত্বকথা কহিতেন; এবং শচী তাহা শুনিয়া, কখনও মনের সুখে, মুচ্‌কে হাসি হাসিতেন, কখনও বা অবাক্ ও অপ্রস্তুত হইয়া, গালে হাত দিয়া, বসিয়া থাকিতেন।

এক দিন শচী, গৌরাঙ্গকে খৈ আর সন্দেশ খাইতে দিয়া, গৃহকার্য্যে স্থানান্তরে গিয়াছেন। গৌরাঙ্গ, কেন জানি, মায়ের উপর বিরক্ত হইয়া, খৈ আর সন্দেশে উপেক্ষা করিয়া, ধীরে ধীরে, অল্প অল্প, মাটি খাইতেছেন। শচী তাহা দেখিতে পাইয়া দৌড়িয়া আসিলেন, এবং গৌরাঙ্গের হাত দুখানি ধরিয়া, আদর করিয়া কহিলেন,—"ছি বাছা! ও কি করিতেছিস? মানুষ কি কখন মাটি খাইয়া থাকে?" গৌরাঙ্গ বলিলেন,—"মা! মাটিতে আর অন্য বস্তুতে প্রভেদ কি? কিবা খৈ সন্দেশ, কিবা অন্ন ব্যঞ্জন, সমস্তই ত মাটির মত। এও মাটি, সেও মাটি; এমন অবস্থায় আর মাটি লইয়া ভেদ-বিচার করিব কেন?"

"খৈ সন্দেশ অন্ন যত মাটির বিকার।
এহ মাটি, সেহ মাটি, কি ভেদ বিচার॥" (চৈ-চ)

শচী, বালকের কথায় বিস্ময় মানিয়া, গালে হাত দিয়া, অভব্যের মত দাঁড়াইয়া রহিলেন, এবং ক্ষণপরে হাসিয়া হাসিয়া বলিলেন,—হাঁরে নিমাই! তুই এখনও দুধের শিশু,—আমার কোলের ধন। তুই এই বয়সে, কার কাছে, এইরূপ জ্ঞান-যোগ শিক্ষা করিলি?

"অন্তরে বিস্মিত শচী বলিল তাহারে।
মাটি খেতে জ্ঞান-যোগ কে শিখাল তোরে॥"

পাঠকের মনে রাখিতে হইবে, শচী গৌরাঙ্গকে কোন দিনও নিমাই ভিন্ন অন্য নামে সম্ভাষণ করেন নাই।

আর একদিন শচী, গৌরাঙ্গের চঞ্চল ব্যবহারে চিত্তে একটু বেসী ক্লেশ পাইয়া, তাঁহাকে মারিবার জন্য পিছে পিছে দৌড়াইতেছেন; এবং গৌরাঙ্গও, তাঁহাকে এড়াইয়া চলিবার জন্য, এদিক ওদিক সরিয়া পড়িতেছেন! গৌরাঙ্গ যখন বুঝিতে পাইলেন যে, আর ধরা না দিয়া রক্ষা নাই, তখন তিনি—একটা উচ্ছিষ্টের গর্ত্তের মধ্যে,—কতকগুলি অপবিত্র, পরিত্যক্ত হাঁড়ির উপর যাইয়া, বসিয়া রহিলেন। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস আছে, শচী নিতান্ত শুচিস্বভাবা; তিনি কখনও ঐ প্রকার অশুচি স্থানে যাইয়া তাঁহাকে ধরিবেন না। ফলেও তাহাই হইল। শচী, ঐ গর্ত্তের কাছে যাইয়া, আড়ষ্টভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। শচী কহিলেন,—"বাছা! ছি ছি! তুই এই প্রকার অশুচি স্থানে গিয়া বসিয়া রহিয়াছিস? এই কি তোর উপযুক্ত কাজ? তুই যাঁর ঘরে জন্মিয়াছিস, তিনি দেখিলে কি কহিবেন? তুই এখনিই যাইয়া গঙ্গাস্নান করিয়া আয়।"

গৌরাঙ্গ, মায়ের আজ্ঞা-পলানার্থ, গঙ্গাস্নান করিলেন বটে; কিন্তু গঙ্গাস্নানে যাইবার পূর্ব্বে, মাতার দিকে চাহিয়া, চোখ দুটি বাঁকাইয়া, বৃদ্ধের মত দুই একটা আশ্চর্য্য কথা কহিলেন। বলিলেন,—"মা! শুচি আর অশুচিতে প্রভেদ কি? এ জগতে কোথায় এমন স্থান আছে, যেখানে জগদীশ্বর হরি নাই।"

মাতা পুত্রে মাঝে মাঝে এইরূপ তত্ত্ব-কথার আলাপ হইত, এবং শচী বিস্মিত হইয়া মনে মনে বলিতেন, "হা আমার কপাল! এ ছেলে কি মানুষ? এ ছেলে কি ঘরে থাকিয়া গৃহস্থালী করিবে?" (ক্রমশঃ)

বিশ্বকর্ম্মা

প্রাচীন সাহিত্যে দেখিতে পাওয়া যায়,—পুরাকালে ভারতবর্ষে অসংখ্য অট্টালিকা নির্ম্মিত হইয়াছিল। বাঙ্গালা দেশেও তাহার অসদ্ভাব ছিল না। এখনও কোন কোন স্থানে তাহার কিছু কিছু ধ্বংসাবশেষ বর্ত্তমান আছে। নিরক্ষর বাঙ্গালীর বিশ্বাস,—স্বয়ং বিশ্বকর্ম্মা ঐ সকল অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। এই বিশ্বাস কেবল বাঙ্গালা দেশে কেন, ভারতবর্ষের অনেক প্রদেশেই প্রবল। সকল স্থানেই ইহা "অশিক্ষিতের" অবলম্বন; "সুশিক্ষিতের" উপহাসের বিষয়॥

ইহা অবশ্যই জনশ্রুতি মাত্র। কিন্তু তাহার মূল কি, তাহার অনুসন্ধান না করিয়া, এই প্রবল জনশ্রুতিকে হাসিয়া উড়াইয়া দিলে, বিজ্ঞতার পরিচয় প্রদান করিতে পারা যায় না। বরং অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হইলে অনেক ঐতিহাসিক তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইতে পারে। একটি প্রবাদ আছে,— "নষ্টমূলা জনশ্রুতিঃ"। সুতরাং জনশ্রুতির মূলানুসন্ধান করাই কর্ত্তব্য। সে চেষ্টা সর্ব্বাংশে সফল হইবার সম্ভাবনা না থাকিলেও, যথাসাধ্য মূলানুসন্ধান করিতে পারিলে, কিছু না কিছু ঐতিহাসিক তথ্যের সন্ধান লাভ করা যাইতে পারে।

অনেকের নাম কেবল জনসমাজের মুখে মুখেই পরিভ্রমণ করে; সাহিত্যে তাহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। বিশ্বকর্ম্মার নাম সেরূপ নয়। এক সময়ে বিশ্বকর্ম্মার নাম অনেক বাস্তু শাস্ত্রের গ্রন্থে সুপরিচিত ছিল। এখনও সেরূপ গ্রন্থ একেবারে দুষ্প্রাপ্য হয় নাই। এক খানি গ্রন্থ (বিশ্বকর্ম্মা-প্রকাশঃ) এখনও প্রচলিত আছে। তাহার দুইটি সংস্করণ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। একটি সংস্করণ খেমরাজ শ্রীকৃষ্ণদাস কর্ত্তৃক বোম্বাই নগরে শ্রীবেঙ্কটেশ্বর মুদ্রণালয়ে মুদ্রিত, আর একটি সংস্করণ কিশনলাল দ্বারকাপ্রসাদ কর্ত্তৃক মথুরা নগরে প্রকাশিত। একই গ্রন্থ উভয় স্থান হইতে উভয় প্রকাশক কর্ত্তৃক হিন্দী টীকা সহ প্রচারিত হইতেছে। গ্রন্থের মঙ্গলাচরণটি এইরূপ,—

"জয়তি বরদমূর্ত্তি র্মঙ্গলং মঙ্গলানাং
জয়তি সকলবন্দ্যা ভারতী ব্রহ্মরূপা।
জয়তি ভুবনমাতা চিন্ময়ী মোক্ষরূপা
দিশতু মম মহেশো বাঙ্‌ময়ঃ শব্দরূপম্‌॥"

এই গ্রন্থের সূচনায় দেখিতে পাওয়া যায়,—বাস্তু শাস্ত্র একটি পুরাতন শাস্ত্র; অনেকে অনেকবার তাহার প্রচার করিয়া গিয়াছেন। সকলের পূর্ব্বে এই শাস্ত্র শম্ভু কর্ত্তৃক প্রচারিত হইয়াছিল। কালক্রমে পরাশর বৃহদ্রথকে তাহার উপদেশ করিয়াছিলেন। বৃহদ্রথ আবার বিশ্বকর্ম্মাকে উপদেশ করায়, জগতের হিত সাধন কামনায় বিশ্বকর্ম্মা ইহার প্রচার করিয়া গিয়াছিলেন। সেই শেষ;— তাহার পর আর কাহারও দ্বারা বাস্তু শাস্ত্রের প্রচার করিবার কথা এই গ্রন্থে উল্লিখিত নাই। যথা,—

"প্রবক্ষ্যামি মুনিশ্রেষ্ঠ শৃণুম্বেকাগ্রমানসঃ।
যদুক্তং শম্ভুনা পূর্ব্বং বাস্তুশাস্ত্রং পুরাতনম্‌॥
পরাশরঃ প্রাহ বৃহদ্রথায় বৃহদ্রথঃ প্রাহ চ বিশ্বকর্ম্মণে।
স বিশ্বকর্ম্মা জগতাং হিতায় প্রোবাচ শাস্ত্রং বহুভেদযুক্তম্‌॥"

এই বিবরণ বিশ্বকর্ম্মাকে একজন শাস্ত্রবক্তা বলিয়াই বিঘোষিত করিতেছে; সুতরাং তাঁহার নামটি অশিক্ষিত জনসাধারণের কল্পনা-প্রসূত বলিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিবার উপায় নাই, বরং সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে—পরাশরাদির ন্যায় বিশ্বকর্ম্মাও প্রাচীন ভারতে একজন শিক্ষাগুরু বলিয়া সুপরিচিত ছিলেন। কেবল বিশ্বকর্ম্মাই বাস্তুশাস্ত্রের একমাত্র শিক্ষাগুরু ছিলেন না। আরও অনেক শিক্ষাগুরুর অনেক গ্রন্থ বর্ত্তমান ছিল। গ্রন্থগুলির সংখ্যা এত অধিক ছিল যে তাহা এক সময়ে চতুঃষষ্টি শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছিল; তন্মধ্যে অর্দ্ধ সংখ্যক গ্রন্থ "মুখ্য" এবং পশ্চার্দ্ধ "উপ" শাস্ত্র নামে কথিত হইত। কালক্রমে এই সকল গ্রন্থ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। কেবল পরলোকগত পণ্ডিত রামরাজ সংকলিত হিন্দু স্থাপত্য বিষয়ক ইংরেজী প্রবন্ধে (১) মানসার (২) ময়মত (৩) কাশ্যপ (৪) বৈখানস (৫) অগস্ত্য (৬) সনৎকুমার (৭) সারস্বত্য এবং (৮) পঞ্চরাত্র নামধেয় কএকখানি গ্রন্থের কিছু কিছু পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

এই সকল গ্রন্থে সকল বিষয়ে এক শ্রেণীর রচনা-রীতির পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তাহাতেই বুঝিতে পারা যায়,—ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের ন্যায় শিল্পিগণের মধ্যেও নানা সম্প্রদায় প্রচলিত ছিল। সম্প্রদায় ভেদেই নানা শ্রেণীর রচনা-রীতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। প্রবর্ত্তকগণের নামানুসারে সেই সকল রচনা-রীতি ভিন্ন ভিন্ন নামে কথিত হইত। যাঁহারা যে শ্রেণীর রচনা রীতির অনুসরণ করিতেন, তাঁহারা (রীতি-প্রবর্ত্তকের নামানুসারে) সেই-রূপ কুলোপাধি ধারণ করিতেন। এইরূপে এক সময়ে এক শ্রেণীর স্থপতিগণ "বিশ্বকর্ম্মা" উপাধি লাভ করিয়া, জনসমাজে বিশ্বকর্ম্মা নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। এই উপাধিযুক্ত স্থপতিগণের নাম কোন কোন স্থানের প্রাচীন

শিলাফলকে উৎকীর্ণ থাকা দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। সুতরাং বিশ্বকর্ম্মার নাম এখনও লোকে বিস্মৃত হইতে পারে নাই কেন, তাহাতে বিস্মিত হইবার কারণ নাই।

কোন্ সম্প্রদায়ের রচনা-রীতি কিরূপ ছিল, এখনও তাহার অনুসন্ধান চেষ্টা আরব্ধ হয় নাই। সে চেষ্টা আরব্ধ হইলে, কোন্ প্রদেশে কোন্ যুগে কিরূপ রচনা-রীতি প্রচলিত ছিল, তাহার সন্ধান লাভের আশা করা যাইতে পারে। ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন রচনা-রীতির নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায় কেন, তাহাও বুঝিবার সুবিধা ঘটিতে পারে। এই অনুসন্ধানকার্য্য আরব্ধ ও সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বে, ভারতবর্ষের পুরাতন স্থাপত্য সম্বন্ধে নিঃসন্দেহে কোনরূপ সিদ্ধান্ত স্বীকার করিয়া লইবার উপায় নাই। তথাপি একটি বিষয় ভাবিয়া দেখিবার প্রয়োজন আছে। যে প্রদেশ হইতে এখনও বিশ্বকর্ম্মার নাম একবারে বিলুপ্ত হইতে পারে নাই, তথায় যে এক সময়ে বিশ্বকর্ম্মার প্রবর্ত্তিত রচনা-রীতি প্রচলিত ছিল. তাহা কি অনুমান করা যাইতে পারে না?

বাঙ্গালা দেশ এইরূপ দেশ। এখানে এখনও বিশ্বকর্ম্মার নাম বিলুপ্ত হয় নাই। বরং এ দেশে আর কোনও বাস্তুশাস্ত্রের শিক্ষাগুরুর নাম জনসমাজে সুপরিচিত নাই। সুতরাং এখানে যে এক সময়ে বিশ্বকর্ম্মার প্রবর্ত্তিত রচনা-রীতিই প্রচলিত ছিল, এরূপ অনুমান একবারে অশ্রদ্ধেয় বলিয়া কথিত হইবার আশঙ্কা নাই। বাঙ্গালা দেশের পুরাতন স্থাপত্যের ধ্বংসাবশিষ্ট নিদর্শনগুলির যথাযোগ্য পরীক্ষা করিয়া, তাহার সাহায্যে ইতিহাস রচনা করিতে হইলে, বিশ্বকর্ম্মার প্রবর্ত্তিত রচনা-রীতি কিরূপ ছিল, তাহার অনুসন্ধান করিতে হইবে। কিন্তু সে চেষ্টা প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বেই, বাঙ্গালা দেশের স্থাপত্যের ইতিহাস আলোচিত হইতেছে। এরূপ উচ্ছৃঙ্খল আলোচনায় ঐতিহাসিক তথ্যের সন্ধান লাভের সম্ভাবনা থাকিতে পারে না বলিয়াই, এত দিনেও আমরা আমাদের দেশের প্রাচীন স্থাপত্যের পরিচয় প্রকাশিত করিতে পারি নাই। বিশ্বকর্ম্মা-প্রকাশ মুদ্রিত হইয়া অনায়াসলভ্য হইলেও, তাহার মর্ম্ম ইংরেজী গ্রন্থে অনূদিত হয় নাই। তজ্জন্য তাহার নাম পর্য্যন্ত সুপরিচিত হইতে পারে নাই।

আজ কাল আমাদের পুরাতন বাস্তুবিদ্যার ইতিহাস সংকলনের জন্য কিছু কিছু আগ্রহ প্রকাশিত হইতেছে। তজ্জন্য নানাস্থানে পুরাতন স্থাপত্য নিদর্শন আবিষ্কৃত ও সংগৃহীত হইতেছে। কিন্তু এখনও তাহার যথাযোগ্য পরীক্ষাকার্য্য আরব্ধ হইতে পারিতেছে না। যে সকল লেখক আমাদের পুরাতন বাস্তুবিদ্যা সম্বন্ধে নানা কথা লিখিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা কেহই আমাদের বাস্তুশাস্ত্র অধ্যয়ন করিবার জন্য আয়াস স্বীকার করিতে পারেন নাই। তজ্জন্য আমাদের পুরাতন বাস্তুবিদ্যা সম্বন্ধে অনেক অপ-সিদ্ধান্তই ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া প্রকাশিত ও প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছে;—তাহা কণ্ঠস্থ করা এবং উদ্ধৃত করাই আমাদের পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক হইয়া দাঁড়াইয়াছে! বলা বাহুল্য, ইহাতে আমাদের অবস্থা হইয়াছে,—"অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ।' সত্যানুসন্ধানের জন্য স্বাধীন চেষ্টা প্রকাশিত হইতেছে না, বরং খ্যাতনামা লেখকবর্গের মতামত সংকলনের আগ্রহই আমাদিগকে বিমূঢ় করিয়া রাখিয়াছে। পাঠ্যগ্রন্থ রচনা করিবার সময়ে সেই সকল পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট অপ-সিদ্ধান্তের অনুবর্ত্তী হইয়া চলিবার জন্য বাধ্য হইয়া, আমাদের লেখকবর্গ ভবিষ্যতের অনুসন্ধানচেষ্টাকেও প্রতিহত করিয়া ফেলিতেছেন। এই সকল কারণে, আমাদের পুরাতন বাস্তুবিদ্যার মূল প্রকৃতি নির্ণয়ের চেষ্টা পরিত্যক্ত হইয়াছে;— তাহা গ্রীসের বা মিশরের বা বাবিলনের বা পারস্যের অথবা কাহারও না কাহারও অনুকরণ-লব্ধ বলিয়াই প্রচারিত হইতেছে!

আমাদের পুরাতন বাস্তুবিদ্যাকে পরানুকরণ-লব্ধ বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়া যে পাশ্চাত্য সিদ্ধান্ত জগদ্বিখ্যাত হইয়া পড়িয়াছে, তাহাকে অভ্রান্ত সিদ্ধান্ত বলিয়া স্বীকার করিবার উপযুক্ত অকাট্য প্রমাণ বড় অধিক আবিষ্কৃত হইতে পারে নাই। যাহা কিছু "প্রমাণ" বলিয়া উপন্যস্ত হইয়া থাকে, তাহা আদৌ প্রমাণ বলিয়া মর্য্যাদা লাভ করিতে পারে কি না, তাহাতেও সংশয়ের অভাব নাই। সকল সভ্যদেশে একই কারণে মানব সমাজ বাস্তুবিদ্যার আলোচনা করিতে বাধ্য হইয়াছিল। কেবল বাস্তুবিদ্যা কেন, মানব সমাজের বিবিধ প্রয়োজন সাধনের জন্য,

নানা বিদ্যার আলোচনাই প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। সুতরাং অট্টালিকা নির্ম্মাণের প্রণালীর মধ্যে কোন কোন বিষয়ে একদেশের সহিত অন্য দেশের কিছু না কিছু সাদৃশ্য বর্ত্তমান থাকা বিচিত্র নহে। সেরূপ সাদৃশ্য অপরিহার্য্য। তাহার মূল মানব প্রকৃতিতে নিহিত হইয়া রহিয়াছে, সুতরাং সাদৃশ্য থাকিলেই পরানুকরণ থাকিতে হইবে,— এরূপ সিদ্ধান্ত সকল স্থলে সমীচীন বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারে না। বরং যে সকল বিষয়ে সাদৃশ্য নাই, সেই সকল বিষয়ের আলোচনায় ব্যাপৃত হইলে, কোন্ দেশের বাস্তুবিদ্যার মূল প্রকৃতি কিরূপ ছিল, তাহার সন্ধান লাভের সম্ভাবনা আছে।

আমাদের দেশের অতি পুরাতন স্থাপত্যকীর্ত্তি কিরূপ ছিল, তাহার অধিকাংশ নিদর্শনই ভূগর্ভে প্রোথিত হইয়া রহিয়াছে। ভারতবর্ষের ন্যায় পুরাতন সভ্যদেশের অতি পুরাতন অট্টালিকাদির নিদর্শন ভূপৃষ্ঠে বর্ত্তমান থাকিবার সম্ভাবনা নাই। যে সকল অতি পুরাতন প্রধান নগরে তাহার সন্ধান লাভের সম্ভাবনা আছে, সেরূপ অল্প স্থানেই খনন কার্য্য আরব্ধ হইয়াছে। এরূপ অবস্থায়, যাহাকে আমরা অতি পুরাতন নিদর্শন বলিয়া ব্যক্ত করিতেছি, তাহা যে সত্য সত্যই অতি পুরাতন কি না, তাহাতে স্বভাবতই সংশয় উপস্থিত হয়। এই সংশয় দূর না করিয়া, অতি পুরাতন প্রধান নগরগুলির অবস্থান-ভূমির অনুসন্ধান না করিয়া, তথায় ভূগর্ভে কিরূপ নিদর্শন প্রোথিত হইয়া রহিয়াছে, তাহার আবিষ্কার সাধনের চেষ্টা না করিয়া, ভারতবর্ষের পুরাতন বাস্তু-বিদ্যাকে পরানুকরণলব্ধ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না।

বাঙ্গালা দেশের পুরাতন স্থাপত্যের মূল প্রকৃতি কিরূপ ছিল, তৎসম্বন্ধে এখনও কোনরূপ সদুত্তর দিবার উপায় আবিষ্কৃত হয় নাই। কিন্তু বাঙ্গালা দেশে বিশ্বকর্ম্মার নাম চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে এবং তাঁহার পূজাও অদ্যাপি প্রচলিত আছে। এই একটি মাত্র কারণে মনে হয়,—বাঙ্গালা দেশের পুরাতন স্থাপত্য বিশ্বকর্ম্মার প্রবর্ত্তিত রচনা-রীতির অনুসরণ করিত। সে রীতি কিরূপ ছিল, দুইটি উপায়ে তাহা নির্ণীত হইতে পারে। এক উপায়—বিশ্বকর্ম্মার গ্রন্থ হইতে বিবরণ সংগ্রহ। অন্য উপায়,—পুরাতন স্থাপত্যের যে সকল নিদর্শন আবিষ্কৃত হইতেছে, তাহার যথাযোগ্য পরীক্ষা।

বিশ্বকর্ম্মার যে গ্রন্থখানি বিশ্বকর্ম্মা-প্রকাশ নামে প্রচলিত আছে, তাহা ত্রয়োদশ অধ্যায়ে সমাপ্ত। তাহাকে সমগ্র গ্রন্থ বলিয়া স্বীকার করিতে সাহস হয় না। কারণ, তাহাতে বাস্তুবিদ্যা অপেক্ষা বাস্তুযাগাদির কথাই অধিক স্থান লাভ করিয়াছে। এরূপ ঘটিবার কারণ কি, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। বাস্তু-যাগাদি এখনও অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। সুতরাং যাহা লোক সমাজে প্রচলিত আছে, তাহার বিধিব্যবস্থাগুলি যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিবার জন্য বিশ্বকর্ম্মার গ্রন্থের সেই সকল অংশই পুনঃ পুনঃ নকল করিয়া রাখা হইয়াছে। এখন আর মন্দিরাদি যথাশাস্ত্র নির্ম্মিত হয় না বলিয়া, তাহার বিধিব্যবস্থা (প্রয়োজনাভাবে) নকল করিয়া রাখা হয় নাই। গ্রন্থখানি পাঠ করিলে, এই সিদ্ধান্তই প্রতিভাত হয়। যাহা নকল করিয়া রাখা হইয়াছে, তাহাতে প্রসঙ্গক্রমে যাহা কিছু বাস্তুবিদ্যার কথা উল্লিখিত আছে, তাহাই এখন বিশ্বকর্ম্মার প্রবর্ত্তিত রচনারীতির যৎসামান্য আভাস প্রকাশিত করিতেছে।

যাহা নাই, তাহার কথা ছাড়িয়া দিয়া যাহা আছে, তাহার আলোচনা করিলেও বুঝিতে পারা যায়, সেকালের স্থপতিগণকে নানা বিদ্যায় পারদর্শী হইতে হইত; কেহ সহজে "বিশ্বকর্ম্মা" উপাধি লাভ করিতে পারিতেন না। অট্টালিকা নির্ম্মাণের পূর্ব্বে ভূমিপরীক্ষা করিতে হইত, দিঙ্ নির্ণয় করিতে হইত, ইষ্টকশিলাদি নির্ব্বাচন করিতে হইত। সকল কার্য্যেই অভিজ্ঞতার প্রয়োজন ছিল।

"মনোরমা চ যা ভূমিঃ পরীক্ষেত প্রযত্নতঃ॥"

যত্নপূর্ব্বক ভূমি পরীক্ষা করিয়া, যে ভূমি "মনোরমা," তাহাই নির্ব্বাচন করিয়া লইবার ব্যবস্থা ছিল। এই কার্য্য নানা উপায়ে সাধিত হইত; প্রথম উপায় দর্শন,— ভূমির বর্ণ কিরূপ, তাহা দর্শন করিয়া, ভূমি কোন্ শ্রেণীর, তাহা নির্ব্বাচন করা।

"শ্বেতা রক্তা তথা পীতা কৃষ্ণা বর্ণানুপূর্ব্বতঃ।"

জনসমাজ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র নামক বর্ণচতুষ্টয়ে বিভক্ত থাকায়, ভূমির শ্রেণী বিচারেও সেই সুপরিচিত সংজ্ঞা ব্যবহৃত হইত। শ্বেতবর্ণের ভূমির নাম ব্রাহ্মণী ভূমি, রক্তবর্ণের ভূমির নাম ক্ষত্রিণী-ভূমি, পীতবর্ণের ভূমির নাম বৈশ্যাভূমি এবং কৃষ্ণবর্ণের ভূমির নাম শূদ্রিণী ভূমি বলিয়া কথিত হইত। কোন্ বর্ণের ভূমি উৎকৃষ্ট, কোন্ বর্ণের ভূমি অপকৃষ্ট, ইহাতেই তাহার সংকেত নিহিত রহিয়াছে। দর্শনের ন্যায় ঘ্রাণ লইয়াও ভূমি নির্ব্বাচন করিবার ব্যবস্থা ছিল।

"সুগন্ধা ব্রাহ্মণী ভূমি রক্তগন্ধা তু ক্ষত্রিণী।"
মধুগন্ধা ভবেদ্বৈশ্যা মদ্যগন্ধা শূদ্রিণী॥

শ্বেতবর্ণবিশিষ্টা সুগন্ধা ভূমির নাম ব্রাহ্মণী ভূমি; রক্তবর্ণবিশিষ্টা রক্তগন্ধা ভূমির নাম ক্ষত্রিণী-ভূমি; পীতবর্ণ-বিশিষ্টা মধুগন্ধা ভূমির নাম বৈশ্যা-ভূমি; এবং কৃষ্ণবর্ণ-বিশিষ্টা মদ্যগন্ধা ভূমির নাম শূদ্রিণী-ভূমি। দর্শন ও ঘ্রাণ গ্রহণ করিয়াই পরীক্ষা শেষ হইত না, স্বাদ গ্রহণ করিয়া পরীক্ষা করিবারও ব্যবস্থা ছিল।

"মধুরা ব্রাহ্মণীভূমিঃ কষায়া ক্ষত্রিয়া মতা।
অম্লা বৈশ্যা ভবেদ্ভূমি স্তিক্তা শূদ্রা প্রকীর্ত্তিতা

ব্রাহ্মণী-ভূমির স্বাদ মধুর, ক্ষত্রিণী-ভূমির স্বাদ কষায়, বৈশ্যা-ভূমির স্বাদ অম্ল, এবং শূদ্রিণী-ভূমির স্বাদ তিক্ত। এই সকল উপায়ে ভূমি পরীক্ষার যে ব্যবস্থা ছিল, তাহা বাহ্য পরীক্ষা। তাহাতেই পরীক্ষাকার্য্য পরিসমাপ্ত হইত না। প্রথমে বাহ্য-পরীক্ষায় ভূমি নির্ব্বাচন করিয়া লইয়া আরও কতকগুলি পরীক্ষা-প্রণালী অবলম্বন করিতে হইত। যথা,—

"নিখনেদ্ধস্তমাত্রেণ পুনস্তেনৈব পূরয়েৎ।
পাংশুনাধিকমধ্যোনা শ্রেষ্ঠা মধ্যাধমা ক্রমাৎ
জলেনাপূরয়েচ্ছ্বভ্রং শীঘ্রং গত্বা পদৈঃ শতং।
তথৈবাগম্য বীক্ষেত ন হীনসলিলা শুভা॥
অরত্নিমাত্র শ্বভ্রে বা হ্যনুলিপ্তে চ সর্ব্বতঃ।
ঘৃত মামশরাবস্থং কৃত্বা বর্ত্তিচতুষ্টয়ম্॥
আলয়েদ্ভূপরীক্ষার্থং সম্পূর্ণং সর্ব্বদিঙ্মুখং।
দীপ্তা পূর্ব্বাদি গৃহ্ণীয়া দ্বর্ণানামনুপূর্ব্বশঃ॥
হলাকৃষ্টে তথোদ্দেশে সর্ব্ববীজানি বাপয়েৎ।
ত্রিপঞ্চ সপ্তরাত্রেণ ন প্ররোহন্তি তান্যপি॥
উপ্তবীজা ত্রিরাত্রেণ সাঙ্কুরা শোভনা মহী।
মধ্যমা পঞ্চরাত্রেণ সপ্তরাত্রেণ নিন্দিতা॥"

এক হস্ত পরিমিত গর্ত্ত খনন করিয়া, পুনরায় (সেই খনিত মৃত্তিকাদ্বারা) গর্ত্ত পূরণ করিতে হইবে। (খনিত) মৃত্তিকা গর্ত্ত পূরণ করিয়া উদ্বৃত্ত (অধিক) হইলে ভূমিকে শ্রেষ্ঠা বলিয়া জানিবে; সমান হইলে, মধ্যমা বলিয়া জানিবে, কম হইলে অধমা বলিয়া জানিবে। ঐরূপ গর্ত্ত খনন করিয়া, তাহা নির্ম্মল জলে পূর্ণ করিয়া ত্বরিত-পদে একশত পদ গমন করিবে এবং শীঘ্র প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া দেখিবে,—যদি গর্ত্ত জলে পরিপূর্ণ থাকে, তাহা হইলে ভূমিকে শুভা বলিয়া জানিবে। ঐরূপ গর্ত্তের চতুর্দ্দিকে অরত্নি পরিমিত স্থান লেপন করিয়া "আম শরাতে" (কাঁচা মাটির সরাতে) ঘৃত ঢালিয়া, চারিদিকে চারিটি বর্ত্তী (বাতি) জ্বালিয়া দিবে। বাতি জ্বলিতে থাকিলে, পূর্ব্বাদি দিক্ অনুসারে ভূমিকে ব্রাহ্মণাদির বাসযোগ্য বলিয়া জানিবে। হলের দ্বারা ভূমিকর্ষণ করিয়া, সর্ব্ববিধ শস্য বীজ বপন করিয়া দেখিবে; তাহাতে তিন দিনে, পাঁচ দিনে বা সাত দিনে অঙ্কুরোদ্গম হয় কি না? তিন দিনে বীজ হইতে অঙ্কুর বহির্গত হইলে, ভূমিকে "শোভনা" বলিয়া জানিবে; পাঁচ দিনে অঙ্কুর বহির্গত হইলে, "মধ্যমা;" এবং সাত দিনে অঙ্কুর বহির্গত হইলে, "নিন্দিতা" বলিয়া জানিবে।

এইরূপে ভূমি পরীক্ষা করিবার ব্যবস্থা থাকিলেও, কতকগুলি ভূমি একেবারে বর্জ্জন করিবার নিয়ম ছিল। সেরূপ ভূমির পরীক্ষা করিবার প্রয়োজন হইত না; তাহা "মনোরমা" হইলেও, তাহাকে বর্জ্জন করিতে হইত। ভূমি পরীক্ষার এই সকল ব্যবস্থা প্রায় সকল সম্প্রদায়ের বাস্তু শাস্ত্রের গ্রন্থেই উল্লিখিত আছে। ইহাতে বুঝিতে পারা যায়,—এই সকল ব্যবস্থা স্মরণাতীত পুরাকাল হইতে সুপরিচিত থাকায়, সকল সম্প্রদায়ের গ্রন্থেই স্থান লাভ করিয়াছে। যে সকল ভূমি "মনোরমা" হইলেও "বর্জ্জনীয়া' বলিয়া পরিত্যক্তা হইবার ব্যবস্থা ছিল, তন্মধ্যে কএকটি উল্লেখযোগ্য।

"নদী খাতাশ্রিতাং তদ্বৎমহাপাষাণসংযুতাং।
পর্ব্বতাগ্রেষু সংলগ্নাং গর্ত্তাং বিবরসংযুতাম্॥"

যে ভূমির নদীস্রোতে ভাঙ্গিয়া যাইবার আশঙ্কা আছে, যাতাতে মহাপাষাণ বিদ্যমান, যাহা পর্ব্বতাগ্রে অবস্থিত অথবা গর্ত্তাদিসংযুক্ত, সেরূপ ভূমি "বর্জ্জনীয়া" বলিয়া পরিচিত ছিল। ভূমি পরীক্ষা হইতেই আমাদের বাস্তুশাস্ত্রের আরম্ভ। অন্য কোনও দেশে এরূপ ভাবে ভূমি পরীক্ষা করিবার ব্যবস্থা, এবং "মনোরমা" হইলেও কোন কোন ভূমিকে "বর্জ্জনীয়া" বলিয়া পরিত্যাগ করিবার ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল বলিয়া প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এইরূপে যে সকল ব্যবস্থা কেবল আমাদের দেশেই প্রচলিত হইয়াছিল, বাস্তুশাস্ত্রের সেই সকল ব্যবস্থার বিচার করিয়া দেখিলে, আমাদের বাস্তুবিদ্যার মূল প্রকৃতি কিরূপ ছিল, তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। সে প্রকৃতিকে পরানুকরণলব্ধ বলিয়া সপ্রমাণ করিবার উপায় নাই। তাহা আমাদিগের স্বাধীন প্রতিভা-প্রসূত এবং অভিজ্ঞতা-লব্ধ।

বিশ্বকর্ম্মীয় বাস্তুশাস্ত্রে এইরূপ স্বাধীন প্রতিভা-প্রসূত ও অভিজ্ঞতা-লব্ধ অনেক রচনা-ব্যবস্থার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই সকল ব্যবস্থার আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়,—পুরাকালে সমগ্র উত্তর-ভারতে এক শ্রেণীর রচনা-রীতি এবং দক্ষিণ-ভারতে আর এক শ্রেণীর রচনা-রীতি প্রচলিত ছিল। সম্প্রদায়ভেদেই এরূপ রীতিভেদ প্রচলিত হইয়াছিল। বাঙ্গালা দেশে পুরাতন অট্টালিকা বর্ত্তমান নাই। উৎকলের কোন কোন স্থানে তাহার কিছু কিছু নিদর্শন এখনও বর্ত্তমান আছে। তাহার সঙ্গেও বিশ্বকর্ম্মার স্মৃতি জড়িত হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু তাহা আধুনিক লেখকগণের গ্রন্থে "উৎকল-রীতির" নিদর্শন বলিয়া পরিচিত। প্রকৃতপক্ষে দেশের নামানুসারে কোনরূপ রচনা-রীতি প্রচলিত ছিল না,—সম্প্রদায়ের নামানুসারেই প্রচলিত ছিল। এক সময়ে বাঙ্গালা দেশেও যে উৎকলের দেবমন্দিরের ন্যায় দেবমন্দির নির্ম্মিত হইত, তাহার কিছু কিছু নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহাতেই বুঝিতে পারা যায়,—উৎকলে কোনরূপ স্বতন্ত্র রচনারীতি প্রচলিত ছিল না। উৎকলের ইতিহাসেও তাহারই প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এখন উৎকলে যে সকল পুরাতন দেবমন্দির বর্ত্তমান আছে, কেশরী নরপতিগণের শাসন সময়ে তাহার সূত্রপাত হইয়াছিল।

এই রাজবংশের প্রথম নরপতির নাম যযাতি কেশরী, তিনি খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর শেষভাগ হইতে ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্য্যন্ত (৪৭৪—৫২৬ খৃষ্টাব্দ) উৎকলের রাজসিংহাসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। প্রথমে বৈতরণী তীরে যাজপুর নগরে তাঁহার রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল। পরে ভুবনেশ্বরে রাজধানী সংস্থাপিত হইয়াছিল। তথায় তাঁহার প্রাসাদাবলীর কিছু কিছু ধ্বংসাবশেষ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। তাহার নিকটে যে পুরাতন দেবমন্দিরটি দেখিতে পাওয়া যায়, এই প্রবন্ধে তাহার চিত্র সংযুক্ত হইয়াছে। একখানি তাম্রশাসনে যযাতি কেশরীর পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তিনি মগধাধিপতি ভবগুপ্তের সামন্তরূপে উৎকলে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। সুতরাং উত্তর ভারতের বাস্তুবিদ্যাই উৎকলে প্রচলিত হইয়াছিল। উৎকলের দেবমন্দিরে সেই জন্য বিশ্বকর্ম্মার রচনা-রীতির পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়, এবং সেই জন্যই উৎকলের সকল স্থানেই বিশ্বকর্ম্মার নাম চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে।

অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ এবং মগধে বিশ্বকর্ম্মার নাম এবং তাঁহার রচনা-রীতির নিদর্শন লক্ষ্য করিলে, এই যুক্ত প্রদেশকে তাঁহার সম্প্রদায়ের প্রধান বিজয়ক্ষেত্র বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। এই ক্ষেত্রই এক সময়ে সমগ্র এসিয়াখণ্ডের শিক্ষাক্ষেত্র বলিয়া সমাদর লাভ করিয়াছিল। এই পুণ্যক্ষেত্রের তীর্থ সমূহে বহুদেশের তীর্থযাত্রী সমবেত হইত, ইহার বিদ্যালয়ে বহুদেশের বিদ্যার্থী অধ্যয়ন করিত, ইহার স্থাপত্যরীতি এবং ভাস্কর্য্য কৌশল বহুদেশের মানব সমাজকে বিস্ময়াবিষ্ট করিত। এই সকল কারণে বিশ্বকর্ম্মার রচনা-রীতি এ দেশে সমুদ্ভূত হইলেও, এ দেশের চতুঃসীমার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না,—এখান হইতে বহুদূর দূরান্তরেও তাহা প্রচলিত হইয়াছিল। ভারতবর্ষের বাহিরে (উত্তরাঞ্চলে এবং পূর্ব্বাঞ্চলে) কতদূর পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের প্রভাব বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল, তাহার অনুসন্ধান কার্য্য এখনও সমাপ্ত হয় নাই। যতদূর জানিতে পারা গিয়াছে,
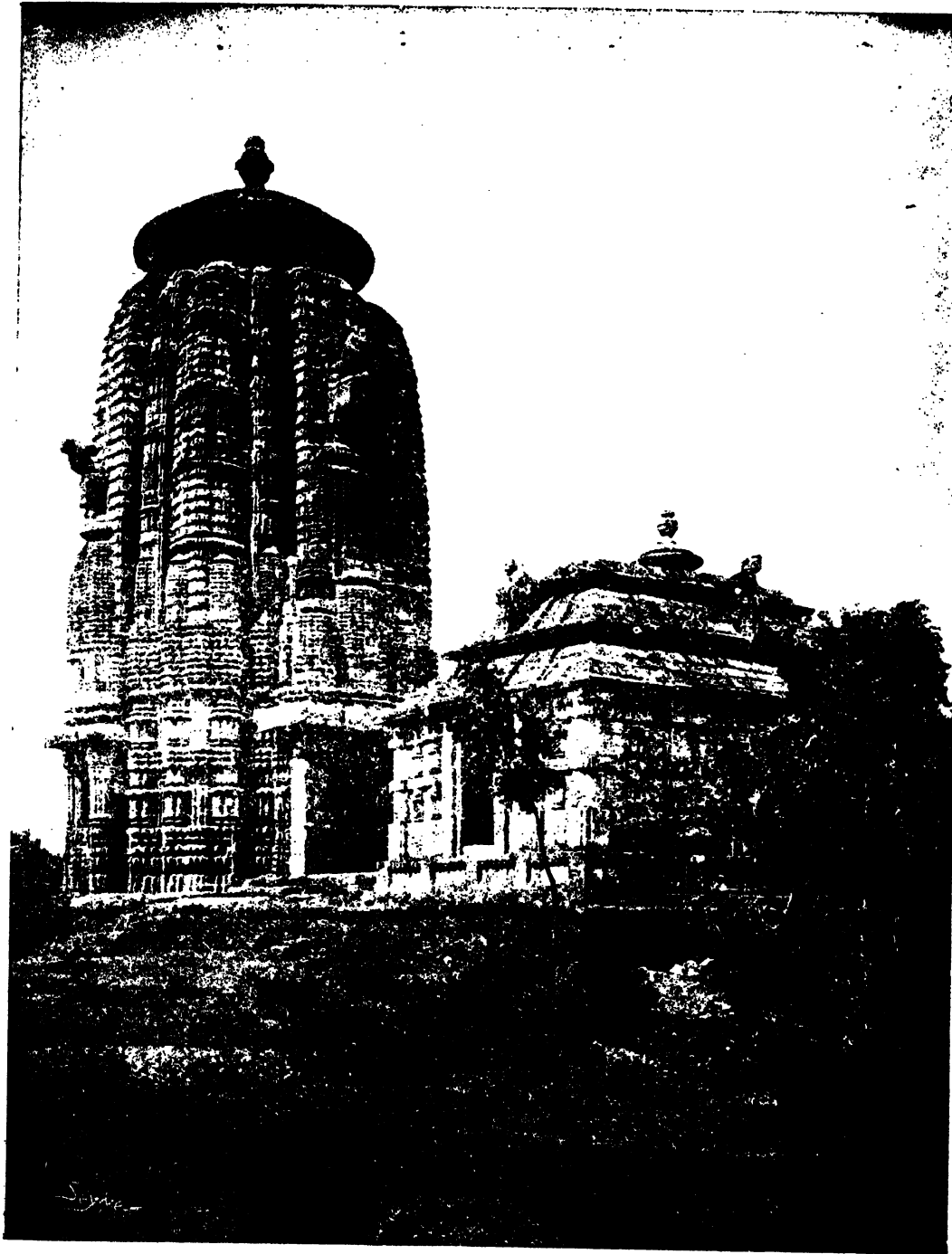
ভুবনেশ্বরের মন্দির

শ্রীনাথ-প্রেস, ঢাকা।

তাহাতে প্রাচ্যভারতের সহিত অনেক দূরদেশের সংস্রব থাকা প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। যাহাদের সহিত এইরূপে আমাদের সংস্রব সংস্থাপিত হইয়াছিল, তাহাদের সাহিত্যে, তাহাদের স্থাপত্যে, তাহাদের ভাস্কর্য্যে, তাহাদের ধর্ম্মবিশ্বাসে, তাহাদের আচার অনুষ্ঠানে এখনও সে পুরাতন সংস্রবের যথেষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। সুতরাং আমাদের বিশ্বকর্ম্মার প্রভাব যে কতদূর পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল, তাহার অনুসন্ধান করিতে কৌতুহল স্বভাবতই প্রবল হইবার কথা। কিন্তু এখনও সে কৌতুহল সম্পূর্ণরূপে চরিতার্থ করিবার সময় উপস্থিত হয় নাই,—এখনও স্থাপত্য নিদর্শনের যথাযোগ্য পরীক্ষাকার্য্য অরব্ধ হয় নাই।

বিশ্বকর্ম্মার নাম এবং বিশ্বকর্ম্মার রচনারীতি তাঁহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে যথেষ্ট পরিচয় প্রদান করিলেও, বিশ্বকর্ম্মা কে,—কোন্ সময়ে কোন্ বংশে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন,—তাহার যথেষ্ট পরিচয় লাভের উপায় নাই। সে কালের অন্যান্য চিরস্মরণীয় মহাপুরুষের ন্যায় বিশ্বকর্ম্মাও আমাদের নিকট নামমাত্রে পর্য্যবসিত। প্রাচীন সাহিত্যে যাহা কিছু পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা যৎসামান্য। মহাভারতে (১।২১২।১০) বিশ্বকর্ম্মার উল্লেখ আছে।

"দৃষ্ট্বা চ বিশ্বকর্ম্মাণং ব্যাদিদেশ পিতামহঃ।"

মৎস্যপুরাণে (পঞ্চম অধ্যায়) বিশ্বকর্ম্মার একটু অধিক পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহাতে লিখিত আছে,—প্রভাসের পুত্র বিশ্বকর্ম্মা শিল্প-প্রজাপতি ছিলেন, তিনি স্বর্গলোকের বর্দ্ধকি, তাঁহার নাম প্রাসাদাদি নির্ম্মাণ প্রসঙ্গে স্মৃত হইয়া থাকে। যথা,—

"বিশ্বকর্ম্মা প্রভাসস্য পুত্রঃ শিল্প-প্রজাপতিঃ।
প্রাসাদভবনোদ্যানপ্রতিমাভূষণাদিষু।
তড়াগারামকূপেষু স্মৃতঃ সোঽমর-বর্দ্ধকিঃ॥"

বিশ্বকর্ম্মা যে বহু পুরাকালের ব্যক্তি, এই সকল প্রমাণে তাহার বিলক্ষণ আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। পৌরাণিক সাহিত্যে তাঁহার নাম পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত হইয়াছে। বিষ্ণুপুরাণে (১।২৫ অধ্যায়?)* বিশ্বকর্ম্মার উৎপত্তি বিষয়ক একটি পুরাকাহিনী বর্ণিত আছে। বৃহস্পতির ভগিনীর সহিত অষ্টবসুর অন্যতম প্রভাস নামধেয় ব্যক্তির বিবাহ হইয়াছিল। প্রভাসের ঔরসে বিশ্বকর্ম্মার জন্ম হয়। তিনি শিল্পিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া, দেবগণের শিল্পী হইয়াছিলেন; মনুষ্যগণ তাঁহার শিল্পেরই অনুসরণ করিয়া আসিতেছে। যথা,—

"বৃহস্পতেস্তু ভগিনী বরস্ত্রী ব্রহ্মচারিণী।
যোগসিদ্ধা জগৎকৃৎস্নমসক্তা বিচরত্যুত॥
প্রভাসস্য তু ভার্য্যা সা বসূনামষ্টমস্য তু।
বিশ্বকর্ম্মা মহাভাগ স্তস্যাং জজ্ঞে মহামতিঃ॥
কর্ত্তা শিল্পসহস্রাণাং ত্রিদশানাঞ্চ বর্দ্ধকিঃ।
ভূষণানাঞ্চ সর্ব্বেষাং কর্ত্তা শিল্পবতাং বরঃ॥
যঃ সর্ব্বাসাং বিমানানি দেবতানাং চকার হ
মনুষ্যা শ্চোপজীবন্তি যস্য শিল্পং মহাত্মনঃ॥"

বিশ্বকর্ম্মা যে কাল্পনিক পুরুষ ছিলেন না, প্রত্যুত একজন ঐতিহাসিক স্মরণীয় ব্যক্তি ছিলেন, পৌরাণিক সাহিত্যে তাহারই পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। যে সকল মহাপুরুষের নাম লোকসমাজে চিরস্মরণীয় হইবার উপযুক্ত, পুরাণকার সেই সকল নামের সঙ্গে বিশ্বকর্ম্মার নামটিও গ্রথিত করিয়া রাখিয়াছেন। গরুড় পুরাণে (ষষ্ঠ অধ্যায়) তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

"প্রত্যূষস্য বিদুঃ পুত্রমৃষিং নাম্না তু দেবলম্।
বিশ্বকর্ম্মা প্রভাসস্য বিখ্যাতো দেববর্দ্ধকিঃ॥"

এই সকল প্রমাণে বিশ্বকর্ম্মা ঋষিকুলোৎপন্ন বলিয়াই প্রতিভাত। অমরকোষে বিশ্বকর্ম্মা "দেবশিল্পী" বলিয়া উল্লিখিত। হেমচন্দ্রের অভিধান-চিন্তামণিতে "ত্বষ্টা" নামে একটি প্রতিশব্দও দেখিতে পাওয়া যায়। প্রভাসপুত্র বিশ্বকর্ম্মা এবং ত্বষ্টা একই ব্যক্তি ছিলেন। বিশ্বকর্ম্মা উপাধি থাকায়, হেমচন্দ্র বিশ্বকর্ম্মার পর্য্যায়ে ত্বষ্টা নামের উল্লেখ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। এই পৌরাণিক কাহিনী বিস্মৃত হইয়া, অনেকে বিশ্বকর্ম্মাকে ও ত্বষ্টাকে পৃথক ব্যক্তি বলিয়াও ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। কিন্তু বহ্নিপুরাণের (গণভেদ নামক অধ্যায়) বচনে বুঝিতে পারা যায়,—পুরাকালে দুইজন ব্যক্তি বিশ্বকর্ম্মা উপাধি

* বিষ্ণুপুরাণের ১ম অংশ ২২ অধ্যায়ে শেষ হইয়াছে। ১।২৫ অধ্যায় এইরূপ সংখ্যা নির্দ্দেশ ভ্রমহেতুক বলিয়া বোধ হয়। সঃ সঃ

লাভ করিয়া ভারতবিখ্যাত হইয়াছিলেন। একজনের নাম ময়, অন্যের নাম ত্বষ্টা, যথা,—

"দ্বৌ প্রোক্তৌ বিশ্বকর্ম্মাণৌ ময়স্ত্বষ্টা চ যোগবিৎ।
দ্বৌ ধাতা চ বিধাতা চ পৌরাণৌ জগতঃ পতী॥"

ময় নামক যে শিল্পীর কথা শুনিতে পাওয়া যায়, তিনি দানবকুলোৎপন্ন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। সুতরাং বহ্নিপুরাণোক্ত দুইজন বিশ্বকর্ম্মার মধ্যে ময় নামক বিশ্বকর্ম্মাকে ছাড়িয়া দিলে, ত্বষ্টা নামক বিশ্বকর্ম্মাকেই ঋষিকুলোৎপন্ন প্রভাস-পুত্র বিশ্বকর্ম্মা বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। ময় দানব শিল্পকৌশলে বিশ্বকর্ম্মা উপাধি লাভে কৃতকার্য্য হইলেও, তাঁহার সে উপাধি লোকে বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিল। তজ্জন্য অভিধান-চিন্তামণিতে বিশ্বকর্ম্মা পর্য্যায়ে ময়দানবের নাম স্থান লাভ করিতে পারে নাই। ময়দানবের শিল্পশাস্ত্র (ম য় ম ত) এখনও দক্ষিণ ভারতের কোন কোন স্থানে প্রচলিত আছে। সুতরাং তিনিও একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তি ছিলেন বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে।

বিশ্বকর্ম্মা কেবল স্থাপত্য বিদ্যারই শিক্ষাগুরু ছিলেন না,—অন্যান্য নানা শিল্পেরও শিক্ষাগুরু ছিলেন। তজ্জন্য নানা শ্রেণীর শিল্পী তাঁহাকে পূজা করিয়া থাকে। স্থাপত্যের এবং ভাস্কর্য্যের সঙ্গে প্রতিষ্ঠা-পদ্ধতির বিবিধ ক্রিয়াকলাপের সংস্রব থাকায়, বিশ্বকর্ম্মা-বিরচিত কোন কোন ব্যবস্থা এখনও প্রচলিত আছে; এবং তাহার অনুরোধেই লোকে তাঁহার শিল্পগ্রন্থের সেই সকল অংশ নকল করিয়া রাখিয়াছে। অন্যান্য অংশ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

পুরাণে বিশ্বকর্ম্মার পিতা মাতার উল্লেখ আছে। মানসার নামক শিল্পশাস্ত্রে বিশ্বকর্ম্মার চারিটি পুত্রেরও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম বিশ্বকর্ম্মা, দ্বিতীয় পুত্রের নাম ত্বষ্টা, তৃতীয় পুত্রের নাম ময়, এবং চতুর্থ পুত্রের নাম মনু। ইঁহারা প্রত্যেকে শিল্পের এক একটি বিভাগে কৃতিত্ব লাভ করিয়াছিলেন। তদনুসারে প্রথম পুত্র "স্থপতি", দ্বিতীয় পুত্র "সূত্রগ্রাহী", তৃতীয় পুত্র "বর্দ্ধকি", এবং চতুর্থ পুত্র "তক্ষক" নাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। প্রতিষ্ঠা পদ্ধতিতে স্থপতিকে পরিতুষ্ট করিবার ব্যবস্থা উল্লিখিত আছে।

"পুরোহিতঞ্চ দৈবজ্ঞং স্থপতিং পরিতোষ্য চ।
দীনান্ধকৃপণেভ্যশ্চ দদ্যাদ্দানঞ্চ ভোজনম্॥"

ইহাতে বুঝিতে পারা যায়,—সে কালের স্থপতিগণ জনসমাজে কিরূপ সমাদর লাভ করিতেন। বাঙ্গালার স্থপতিগণ যে এক সময়ে রাজানুকম্পায় বিলক্ষণ উৎসাহ লাভ করিয়া শিল্পকীর্ত্তিতে জগদ্বিখ্যাত হইয়াছিলেন, তাহার অনেক পরিচয় প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহার উল্লেখ করিবার স্থান নাই।

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

পদ্ম।

জলেতেই জন্মে পদ্ম জলেই তাহার বাস,
জল-ই তাহার জীবন স্বরূপ জলেই মহোল্লাস!
শিকড়ে সে জল টেনে লয় নালেতে জল শোষে,
জলেরি হিল্লোলে ভাসে পরম পরিতোষে!
এক মিনিটও জল ছাড়া তার তিষ্ঠে থাকা দায়,
কাদায় পাঁকে লুটিয়ে মরে দারুণ দুর্দ্দশায়!
শূয়রে তার বংশ মজায় ধ্বংস করে কুল,
মাটীর তলে খুঁড়িয়ে তোলে শিকড়—শিকা-মূল!
কিন্তু তাহার পত্রে পুষ্পে পড়্‌লে জলের ফোটা,
নির্জ্জলা নিষ্কামীর মত গায়ে লাগান্ না ওটা!
জলে যেন স্পৃহাশূন্য, জলে নাই তার রুচি,
কেমন মজার ব্রহ্মচর্য্য শুদ্ধি শান্তি শুচি!
বোকা ভ্রমর ভুলেছে তার মুখের মধু পেয়ে,
গুণ্‌গুণায়ে জগৎ বেড়ায় তাহারি গুণ গেয়ে!
কিন্তু ও সব সাধুগিরি বৈরাগ্য ভণ্ডামী,
পদ্ম, তোমার ছদ্মবেশ ও অনেক জানি আমি।

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস।

উ কার বনাম ও কার

সকলেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন, পূর্ব্ববঙ্গের পূর্ব্বাঞ্চলে, বিশেষতঃ পূর্ব্ব-ময়মনসিংহ, ত্রিপুরা ও শ্রীহট্ট জেলায়, শব্দের উচ্চারণে উকার স্থলে ওকারের এবং ওকার স্থলে উকারের উৎকট আধিপত্য বদ্ধমূল। অনেকেরই ধারণা, এবম্প্রকার "ভোল ওচ্চারণ" বা রসনার "রুগ" কেবল পূর্ব্ববঙ্গেই সীমাবদ্ধ, অন্যত্র নহে। এই ধারণা সঙ্গত কিনা তাহা সংক্ষেপে এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়। ভরসা করি এই লঘু প্রস্তাবের উত্থাপন দ্বারা সাহিত্যোচিত গাম্ভীর্য্যের অগৌরব সূচিত হইবে না।

উ এবং ও এই স্বরবর্ণদ্বয়ের পরস্পর আত্মবিনিময় ন্যূনাধিক সর্ব্বত্রই বিদ্যমান। উদাহরণ যথা, ইংরেজী শান্তি-রক্ষক police শব্দ বাংলায় রক্তরাগরঞ্জিত মস্তক "পুলিস" মূর্ত্তিতে অবতীর্ণ হইয়া আতঙ্ক উৎপাদন করিতেছে। পুলিসের নিত্যসহচর যে মোক্তার, তিনি "muktear" ও "মোক্তার", সাহিত্যের ধর্ম্মাধিকরণে এরূপ দ্বন্দ্ববেশে আবির্ভূত। ডাক্তার poultice এর ব্যবস্থা করিলে আমাদের "পুলটিস" এর আয়োজনে ব্যতিব্যস্ত হইতে হয়। কুমিল্লাবাসীদের মুখে শুনিয়া ইংরেজী Comillah বানান গঠিত হইয়া থাকিবে, কিন্তু Cawnpore, Serampore, Singapore প্রভৃতি স্থানবাচক নামের অন্তভাগে সাহেবদের উচ্চারণের স্বাধীনতা দেদীপ্যমান। তদ্রূপ যাবনিক শব্দ গুলাব, গুলাম, দুকান, খুরাক, উজর উস্তাদ (বাংলায় গোলাপ, গোলাম, দোকান, খোরাক, ওজর, ওস্তাদ), হিন্দি রোটী, টোপী (বাংলায় রুটী, টুপী) দেশ ভেদে রসনার স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করিতেছে। আমাদের হিন্দুস্থানী ভ্রাতৃগণ খুব "হোস্-ইয়ার", আমরা "বেহুস"। তাঁদের দিল খুস, আমাদের দেল খোস। আমরা বলি "উড়িয়া", কিন্তু উৎকল বন্ধুগণ স্বয়ং বলেন "ওড়িয়া"। আমরা বলি দুই বা দু, দেশওয়ালী ভাই বলেন "দো"। আমরা বলি নরমে, "চুপ" কর ভাই; শান্তি প্রয়াসী অর্দ্ধচন্দ্রদানোন্মুখ আদালত গৃহের দেশ-ওয়ালী চাপরাসী চরমে হাঁকে "চোপ, চোপ"।

আরও কএকটী বাংলা ও ইংরেজী বানান লক্ষ্য করুন। ছোটনাগপুর Chuta Nagpur, কোচবেহার Cooch-Behar, ভুপাল রাজ্য Bhopal.

কথিত স্বরবর্ণদ্বয়ের সখ্যভাব নূতন নহে। অতি প্রাচীন কালে ভক্ত শিষ্যদের মুখে গদ্‌গদ কণ্ঠে উচ্চারিত হইত, হে প্রভো! হে গুরো! অধুনা এই পতিত কালে সে ভাবপ্রবণতা ও গভীরতা নাই। সম্বোধন এখন রসনাগ্র হইতেই উৎপন্ন হয়, হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে নহে; সুতরাং বাংলায় ঐরূপ গুরুগম্ভীর সম্বোধন ধ্বনি বিলুপ্ত হইবে আশ্চর্য্য কি!

প্রাচীনকালে অ কার প্রতিবেশী উ কারকে সম্মুখে দেখিতে পাইলেই আনন্দে আত্মহারা হইয়া আলিঙ্গন করিত। স্বরের এই সন্ধিতে কণ্ঠের স্বরও বদলিয়া যাইত। যথা;—অরুণ্-ওদয়, কাক্-ওদর, নর্-ওত্তম, বৃক্-ওদর ইত্যাদি।

এখনও সন্ধি হয়। যেমন post ছিল office, দুই মিলে "পোষ্টাফিস"। একখানি চিঠির ঠিকানাঃ—"জিলা শ্রীহট্ট সোনামগঞ্জের পুষ্টাফিস হইয়া কৃষ্ণপুর কোষ্টাফিসের (কোষ্টা = পাট) কেরাণী শ্রীমান আশোতুষ গোহ বাবাজীবনের নিকট পহুঁচে।

সন্ধির কথা বলিতে গিয়া সমাসের কথা মনে পড়িল। "দ্বিগু" সমাস নামটীর ব্যুৎপত্তি কি? দ্বি (দুই) + গো (গরু)। দ্বি প্রভৃতি সংখ্যাবাচক শব্দের সহিত গো শব্দ প্রভৃতির সমাস হয় বলিয়া এই সমাসের নাম দ্বিগু। আর্য্য ভাষা যখন সংস্কৃত হয়, সেই সংস্কার কালে দ্বিগো শব্দটী বোধ হয় অনবধান বশতঃ "দ্বিগু"ই রহিয়া গিয়াছিল, মাজাঘসা হইতে পারে নাই। পরবর্ত্তীকালে কোন বৈয়াকরণিক পণ্ডিত মন্ত্রপূত করিয়া ঐ অবস্থায়ই উহাকে গৃহে তুলিয়া লইয়া থাকিবেন।

আধুনিক কালে এরূপ অসঙ্গতি অনেক। যাহার ঢোল আছে, সে ঢোলী না হইয়া ঢুলী। যে মাথায় "মোট" (অর্থাৎ জিনিস পত্রের সমষ্টি) বহে, সে মোটিয়া না হইয়া মুটিয়া বা মুটে। চক্ষু লজ্জার খাতিরে, ব্যুৎপত্তি বজায় রাখিবার জন্য, যাহার রোগ আছে, কাগজে কলমে তাহাকে রোগী লিখি বটে, কিন্তু উচ্চারণে পূর্ব্ববঙ্গের কথা

ছাড়িয়া দিউন, পশ্চিম বঙ্গেও রোগী শব্দ ক্ষীণকায় দুর্ব্বল "রুগী"। যথা,—ডাক্তার রুগী দেখ্‌তে গেছেন। অন্যে পরে কা কথা, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ (য়ুরোপ প্রবাসীর পত্রের পাতা খুলিয়া দেখিতে পাইতেছি) কথ্য ভাষায় রুগী শব্দ ছাপার অক্ষরেও ব্যবহার করিয়াছেন। রোগী যদি রোগের ভারে দুর্ব্বল "রুগী" হইলেন, তবে উপবীত ধারী সন্ন্যাসী, পণ্ডিত, নাথ প্রভৃতি উপাধি ব্যাধিগ্রস্ত যোগী যে "যুগী" হইবেন, ইহাতে বিস্ময়ের বিষয় কি! কিন্তু কি দোষে দোষী "দুষী" হইল, বলিতে পারি না।

এমন যে বৃহৎ রোহিত মৎস্য, ভাষায় তাহার পরিণতি (পূর্ব্ববঙ্গে) রুইৎ মাছ বা (পশ্চিমবঙ্গে) রুই মাছ! ওকারই যখন অসহ্য, তখন ঔকারের ধাক্কা লাগিয়া যে ঔষধ ও অশৌচ হাড়গোড় ভাঙ্গা "অসুদ" ও "অসুচ" হইয়া পড়িবে, তাহা বিচিত্র কি?

ঘোড়া-ঘুড়ী, মোরগ-মুরগী, খোকা-খুকী প্রভৃতি স্থলে লিঙ্গ পরিবর্ত্তনে অসঙ্গতি গুলিও লক্ষ্যের বিষয়। ঐরূপ উচ্চারণ সৌকর্য্যে কোলাকুলি, মোটামুটি, সোজাসুজি ইত্যাদি।

যেটা বড় সেটা "গোলা," যেটী ছোট সেটী "গুলি।" যেটা বড় সেটা "কোশা", যেটী ছোট সেটী "কুশী।" তদ্রূপ লোটা, লুটী; পোঁটলা, পুঁটলি। আবার অবজ্ঞার্থে ঝোলা; যেমন, তোর ঝোলাটার ভেতর কি? অসম্ভ্রম না বুঝাইলে ঝুলি, যথা ঠাকুরদাদার ঝুলি।

"গুপী" বাবু, "রুহিণী" বাবু ইঁহারা শ্রীহট্ট হইতে মেদিনীপুর—সর্ব্বত্র সমভাবে বিদ্যমান। আরও দেখুন, "ছাদের ওপর ওঠা নাবা," "আকাশে ওড়া" ইত্যাদি। কলিকাতা অঞ্চলে উপরস্থলে "ওপর," উঠ স্থলে "ওঠ।" উড়া স্থানে "ওড়া", জুচ্চুরি অথচ "জোচ্চোর" প্রভৃতি "ওলোট-পালট" লেখা কায়েমী ভাবে বহালি পরোয়ানা প্রাপ্ত হইয়া গিয়াছে। নব্য উচ্চারণের নির্দ্দয় আক্রমণে প্রাচীনতম বানান গুলির বনিয়াদ ক্রমশঃ ধ্বংস প্রাপ্ত হইতেছে। পশ্চিমবঙ্গের লেখকগণ আর কেহ পূর্ব্বের ন্যায় শ্রবণ কর এই অর্থে "শুন" লেখেন না; উচ্চারণানুযায়ী "শোন" লেখেন (ল্যাখেন?)। অধুনা 'কর' 'বল' প্রভৃতি স্থলে "করো" "বলো" লেখা চলিতেছে। যেরূপ দ্রুতগতিতে Fonetik spelling এর আদর হু হু করিয়া বাড়িয়া যাইতেছে, তাহাতে শীঘ্রই "কেন" স্থলে ছাপার অক্ষরে "ক্যানো" এবং "কেমন" স্থলে "ক্যামন" দেখিতে পাইব, বোধ হয়। এখন 'উঠে' লেখা উঠিয়া গিয়াছে। যথা, "শিশু" পুস্তকে রবীন্দ্রনাথ:—

(১) "বাইরেতে মেঘ ডেকে ওঠে সৃষ্টি ওঠে কাঁপি।"

(২) "দেবতা যখন ডেকে ওঠে থর্‌থরিয়ে কেঁপে।"

(৩) "জলে পাক ঘুরে ঘুরে ওঠে,
কেন পাগলের মত ছোটে।"

(৪) সেথায় যখন জোয়ার ছোটে,'
নদী ফুলিয়ে ফুলিয়ে ওঠে।"

কিন্তু শব্দের বনিয়াদ বড় শক্ত, ধ্বংস করা দুই এক দিনের কর্ম্ম নয়। ঐ শিশু-কবিতাগ্রন্থেই রবীন্দ্রনাথ আবার—লিখিতেছেন:—

(১) "কোকিল কুহু কুহু গেয়ে উঠে।"

(২) "ধারে ধারে উঠে বেত
দুধারে গমের ক্ষেত॥"

(৩) "ফুল ফুটে তারো মুখ ফুটে
পাখী গায় সেও গান গায়।"

(৪) "কেন ফুল কেন সে ফুটেনা?
চপল মলয় সমীরণ
বনে বনে কেন সে ফুটে না?"

আজ কাল এক পুস্তকে এবং একই শীর্ষক বিষয়ে এই জাতীয় শব্দের বহুরূপী বানান বিরল নহে। দৃষ্টান্ত যথা:—

"তোদের রোদন বিদারি গগন
দিক্ হ'তে "ছোটে" না দিশি?"

আবার কএক ছত্র পরেই:—

"শিথিল হৃদয়ে "ছুটে" না শোণিত?
কেমনে নীরবে রহিস্ ঘরে?"

যদি আদেশ করি উত্তোলন কর, তবে বলিব "তোল।" যদি নিষেধ করি তাহা হইলে সেই মুখেই আবার বলিব "তুলো" না। বানান গোষ্ঠী (বংশ), উচ্চারণ গুষ্টি। যথা বিবাহ-বিভ্রাটের "গুপী" বাবু ঝিকে বলিতেছেন, "তোর গুষ্টির পায় পড়ি, তুই এখান থেকে যা।" "উহার" এই শব্দে পূর্ব্ববঙ্গে মধ্যবর্ণ হয়ের অর্দ্ধ-লোপ (উয়ার), পশ্চিমে পূর্ণলোপ হইয়া হইল "ওর।"

প্রথমতঃ উকারে ওষ্ঠদ্বয় সংযুক্ত ও সঙ্কুচিত। অতঃপর ওকারে সঙ্কোচের হ্রাস এবং ওষ্ঠদ্বার ঈষৎযুক্ত। অবশেষে আকারে ওষ্ঠদ্বার অবারিত। একদিকে উ, অপর দিকে আ, এবং মাঝামাঝি ও। উ কিম্বা আ অপেক্ষা ও উচ্চারণ অল্প আয়াসসাধ্য। ও অপেক্ষা উ কিম্বা আ দ্বিগুণ বলবান। এই জন্য ইংরাজীতে ডবল O দিলে তবে একটা উ (oo) কিম্বা আ হয়। যথা, food, flood, book, blood. উচ্চারণের আয়াস জন্য অনেক সময়ে উকারকে ওকার করিতে হয়। পুত্র শব্দের সংক্ষেপ পুৎ, তস্য সংক্ষেপ পু। পু স্থলে অনায়াসে পো। সেইরূপ "বসু" হইতে "বসো" পরে সমধিক আরাম প্রত্যাশায় "বোস।"

পূর্ব্বেই বলিয়াছি একপ্রান্তে উ, মধ্যপথে ও এবং অপর প্রান্তে আ। ওকার অতিক্রম না করিয়া উ হইতে আ একটানে পঁহুছান দুঃসাধ্য। বিশ্রামার্থী পথিক ওকারের গৃহে যাত্রাভঙ্গ করিবেন; কিম্বা পূর্ণ বিশ্রামান্তে পুনর্যাত্রা করিবেন। এইজন্য উআ স্থলে উও কিম্বা ওআ হওয়া অনিবার্য্য। যথা; জুতা, মুলা শব্দাদি স্থলে পশ্চিমপ্রান্তে জুতো, মূলো প্রভৃতি; পক্ষান্ত র পূর্ব্বপ্রান্তে বা ময়মনসিংহ-শ্রীহট্টে জোতা, মোলা ইত্যাদি। একদিকে প্রথম-মধ্যম, অন্যদিকে মধ্যম-চরম, প্রথম-চরম আয়াস সাধ্য। Avoid extremes.

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত 'নবদ্বীপ পরিক্রমা' নামক প্রাচীন বৈষ্ণব গ্রন্থে আধুনিক কোন শব্দের স্থলে সর্ব্বত্র "কুন" ব্যবহৃত হইয়াছে।

এ-হেন বালক না দেখিনু কুনু খানে।
হইয়া—অধৈর্য্য কহে মনে মনে॥ ১২০
জগন্নাথ মিশ্রে এথা কহে শচী আই
নিমাই রহিব ঘরে কুন চিন্তা নাই॥ ২০২

'কুন' হইতে বর্ত্তমান কোন শব্দের গঠন অসম্ভব নহে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, সংস্কৃত 'কুত্র' শব্দ হইতে 'কোথা' শব্দের উদ্ভব। তুমি শব্দের বহুবচন 'তুমরা' স্থলে 'তোমরা' উল্লেখ করা যাইতে পারে।

সংস্কৃত বোধ-বুদ্ধ, রোধ-রুদ্ধ, লোপ-লুপ্ত প্রভৃতি অসংখ্য শব্দে উকার ওকারের হরি-হরের ন্যায় ঘনিষ্ট সম্বন্ধের ইঙ্গিত আছে।

স্বরবর্ণদ্বয়ের এইরূপ ঘনিষ্ঠতা সূত্রে পরস্পরের গৃহে অযাচিত গতিবিধি দেখিয়া কে বলিতে সাহস করিবে, পশ্চিম বঙ্গে প্রচলিত মোজা, বোতাম, পোল, চোঙ্গা, তোরঙ্গ প্রভৃতি দেশজ শব্দগুলি শুদ্ধ, আর পূর্ব্ববঙ্গের মুজা, বুতাম, পুল, চুঙ্গা, তুরঙ্গ ইত্যাদি (গঙ্গাজলের ছিটা পায় নাই বলিয়া) একবারে অশুদ্ধ এবং অশ্রাব্য।

শ্রীপরমেশপ্রসন্ন রায়।

ঈশাখাঁর কামান।*

দেওয়ান বাগ বা মনোহর খাঁ বাগ নারায়ণগঞ্জ মহকুমার ৭ মাইল উত্তর পূর্ব্বকোণে অবস্থিত; ঐ স্থানে বিগত ১৯০৯ সনের ১২ই ফেব্রুয়ারি কএকজন কৃষক ক্ষেত্র খনন করিতে করিতে ভূগর্ভে ৭টী যুদ্ধ-কামান প্রাপ্ত হয়।

এই আকস্মিক আবিষ্কার বার্ত্তা প্রচারিত হইলে নারায়ণগঞ্জের Sub Divisional Officer কামান গুলি হস্তগত করেন এবং পরীক্ষার জন্য ঢাকা পাঠাইয়া দেন।

কামান ৭টীই পিত্তল-নির্ম্মিত। আমরা নিম্নে কামান গুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় লিপিবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিলাম। (১)

১ম কামানটী ৫ ফুট ৯ ইঞ্চি লম্বা, উপরিভাগ ব্যাঘ্রের মুখের ন্যায়, নিম্ন ভাগ দীর্ঘাকৃতি ও সরু। মুখের নিকট কামানের পরিধি ৯১/২ ইঞ্চি; কোন স্থানে বা ১ ফুট

* পূর্ব্ববঙ্গ সাহিত্য-সমাজের এক বিশেষ অধিবেশনে পঠিত।

(১) এই কামানগুলি পরীক্ষার জন্য ঢাকা বিভাগের স্কুল ইন্সপেক্টর মিঃ এইচ্, ই, ষ্টেপলটন্ বি, এস-সি মহোদয়ের হস্তে প্রদত্ত হইয়াছিল।

অপেক্ষাও কিছু অধিক। মুখের ব্যাস ১½ ইঞ্চি। মধ্য ভাগে কামানটীকে অন্য কোন পদার্থে স্থাপন করিয়া রাখিবার উপযোগী একটী ৬ ইঞ্চি পরিমাণ দণ্ড সংলগ্ন। এই কামানটীতে পারস্য ভাষায় নিম্ন লিখিত বিবরণ খোদিত রহিয়াছে। অক্ষরগুলি দেড় ইঞ্চি অপেক্ষাও অধিক চওড়া।

"দর আহ্‌দে বাদসাহা আদেল শেরসাহ্‌
খেলেদাল্লাহু মুলকুহু ও সুলতানুহু দরতারিখে
নাহ্‌ছদ চেহেল নাহ্‌ আমল সৈয়দ আহাম্মদ
রুমী।"

অর্থাৎ—ন্যায় পরায়ণ রাজা সের সাহার রাজত্ব সময় ৯৪৯ হিজিরা অব্দে সৈয়দ আহাম্মদ রুমী কর্তৃক এই কামান নির্ম্মিত হয়।

এই বিবরণ কামানটীর যে স্থানে লিখিত হইয়াছে তাহার বিপরীত দিকে আরও কতিপয় অক্ষর ও সংখ্যা ক্ষোদিত আছে। তাহার একটী এইরূপ, '৩।৪', অপরটী এইরূপ—'IXI'। কামানের নালির নীচে পারস্য ভাষায় 'রফৎগাজি' লিখিত আছে। এই নামের উপরেও IXI এই চিহ্ন ক্ষোদিত আছে। চুঙ্গির নিম্নে বাঙ্গালা অক্ষরে লিখিত আছে——'তরপ রাজা'। তরপ রাজার নীচে বঙ্গাক্ষরে——২।৬ এইরূপ চিহ্ন ক্ষোদিত।

৩।৪ ও ২।৬ এই দুইটী সাঙ্কেতিক চিহ্নের অর্থ কি তাহা এখন স্থির করা দুঃসাধ্য। বোধ হয় নির্ম্মাণ কালে কামানটীকে ওজনে ৩ মণ চৌদ্দসের করিয়া প্রস্তত করা হইয়াছিল, সময়ে ইহার কোন অঙ্গহানি প্রযুক্ত তাহা ২ মণ ষোল সেরে পরিণত হইয়াছিল। কামানটীর বর্ত্তমান ওজন কিন্তু তাহাও নহে—১ মণ সাতাইশ সের মাত্র। ৩০০ বৎসর ক্রমান্বয়ে ভূগর্ভে প্রোথিত থাকিলে এইরূপ ক্ষয় প্রাপ্ত হওয়া অসম্ভব বলিয়া মনে হয় না। তবে বর্ত্তমান সময়ে কামানটীর ক্ষোদিত লিপি লক্ষ্য করিলে উহা যে এতটা ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে তাহা বুঝা যায় না।

এই কামানে ক্ষোদিত অপর দুইটী নাম 'রফৎ গাজি' ও 'তরপ রাজা' সম্বন্ধেও বিশেষ সন্তোষজনক কোন সিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়া যায় না।

কামানের উপরে পারস্য ভাষায় লিখিত শের সাহ সম্বন্ধীয় বিবরণ হইতেই যদি এই কামানের ঐতিহাসিক তত্ত্বের গণনা করা যায়, তবে রফত গাজির নাম পরবর্ত্তী কালে, ক্রমে ক্ষোদিত হইয়াছে ইহা অনুমান করা যাইতে পারে। শের সাহার মৃত্যুর পর কোন ক্রমে রফৎগাজি নামক কোন ব্যক্তি এই কামানের স্বত্বাধিকার গ্রহণ এবং কামানে নিজ নাম অঙ্কিত করেন। ক্রমে রফৎগাজি হইতে শ্রীহট্টের অন্তর্গত তরপের হিন্দু রাজা এই কামান অধিকার করেন ও বাঙ্গালী হিন্দু-প্রিয় বঙ্গাক্ষরে কামানে নিজ নাম চিহ্নিত করিয়া রাখেন। ইহার পর ত্রিপুর-রাজ অমরমাণিক্য যখন তরপ রাজাকে পরাজিত করিয়া তাঁহার পুত্রকে বন্দী করিয়া নিয়া যান সেই সময় অন্যান্য দ্রব্যের সহিত 'তরপ রাজা' কামানটীও ত্রিপুর রাজধানীতে আনীত হয়। অতঃপর ঈশা খাঁ মোগল সৈন্যাধ্যক্ষ সাহাবাজ খাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অগ্রসর হইয়া যখন ত্রিপুর রাজের সাহায্য প্রার্থনা করেন তখন ত্রিপুরেশ্বর ঈশা খাঁর অনুরোধ রক্ষার্থ এই কামান (তরপ রাজা) ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সাহায্য প্রদান করিয়াছিলেন। ঈশা খাঁর মৃত্যুর পর তৎপ্রপৌত্র দেওয়ান মনোহর খাঁর সময় পর্য্যন্ত কামানটি তাঁহাদের দেওয়ান বাগের * শোভা বর্দ্ধন করিয়াছিল। অযত্নহেতু কালক্রমে উহা ভূগর্ভে প্রোথিত হইয়া গিয়াছে।

আমাদের এই বিবরণ ঐতিহাসিক ভিত্তিমূলক—তাহা ঈশা খাঁর বিবরণ আলোচনায় দেখাইতে চেষ্টা করিব, কিন্তু কামান সম্বন্ধীয় এই অনুমান নিঃসন্দেহে গ্রহণ করা যাইতে পারে কি না, বিজ্ঞ পাঠক তাহার বিচার করিবেন।

২য় কামানে একটী ত্রিশূলের ন্যায় দাগ অঙ্কিত। ইহা কামানের চিহ্ন বলিয়াই মনে হয়। এই কামানে এই চিহ্নটী ব্যতীত অন্য কোন অক্ষর বা নাম দৃষ্ট হয় না। আকারে ইহা ১ম কামানের সমান ছিল বলিয়াই

* যে স্থানে কামানগুলি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে সেই স্থানের নামও দেওয়ান মনোহর খাঁর বাগ। দেওয়ান মনোহর খাঁ সময় সময় ঢাকাতে থাকিতেন। ঢাকায় মনোহর খাঁর বাজার, দেওয়ান সাহেবের হাউলি প্রভৃতি তাঁহারই নামের স্মৃতি বহন করিতেছে।

ইশা খাঁর কামান।

শ্রীনাথ-প্রেস, ঢাকা।

বোধ হয়। নিম্ন ভাগের অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম অংশটী ভগ্ন হইয়া যাওয়ায় এক্ষণ প্রথমটী অপেক্ষা দ্বিতীয়টী আকারে ছোট হইয়া পড়িয়াছে। ২য় কামানের বর্ত্তমান ওজন ১মণ ৩০¾ সের।

৩য় কামানটী ৫ ফুট ২ ইঞ্চি লম্বা। ছিদ্রের ব্যাস ২ ইঞ্চি, বর্ত্তমান ওজন ১মণ ৩৬½ সের। এই কামানে পারস্য ভাষায়—'সরকার মহব্বত খাঁ' এই নাম অঙ্কিত। কামানের ঊর্দ্ধ দিকে ১০ ও মধ্যভাগে ২।৬ এইরূপ সংখ্যা বাচক চিহ্ন অঙ্কিত। '১০' নম্বর নির্দ্দেশক সংখ্যা ও ২।৬ তৎকালীন ওজন বলিয়াই বোধ হয়!

৪র্থ কামানটীও প্রথম তিনটীর ন্যায় ব্যাঘ্র সদৃশ মস্তক বিশিষ্ট। ইহার আকার ৪ ফুট ৮ ইঞ্চি লম্বা; ছিদ্রের ব্যাস ১½ ইঞ্চি। ইহার হাতলের নীচে কেবল নিম্ন লিখিত কয়েকটী বঙ্গাক্ষর ক্ষোদিত আছে।

নি ৩৯১ ২॥৮॥

নি চিহ্ন দ্বারা নম্বর ও ৩৯১ সংখ্যা দ্বারা বর্ত্তমান কামানের নম্বর বুঝাইতেছে এবং পরবর্ত্তী সংখ্যাবাচক চিহ্নগুলি দ্বারা কামানটীর প্রস্তুত কালীন ওজন ২ মন ২৮½ সের বুঝাইতেছে। কিন্তু ইহা অনুমান মাত্র—কামানটীর বর্ত্তমান ওজন ১ মণ ২০½ সের।

৫ম কামানটী বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। প্রথম কামানটীর ন্যায় এই কামানটীতেও একটী অমূল্য ঐতিহাসিক বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই অমূল্য ঐতিহাসিক তত্ত্ব বাঙ্গালার ইতিহাসের একটী মহামূল্য অধ্যায় রচনার বিচিত্র উপকরণ।

এই কামান গাত্রে বঙ্গাক্ষরে লিখিত আছে

সরকার শ্রীযুক্ত ইশা খাঁ

ন মসনন্দবন্দি সন হাজার

১০০২

এই কামানটীর আকার ৩ ফুট ১১ ইঞ্চি দীর্ঘ,—
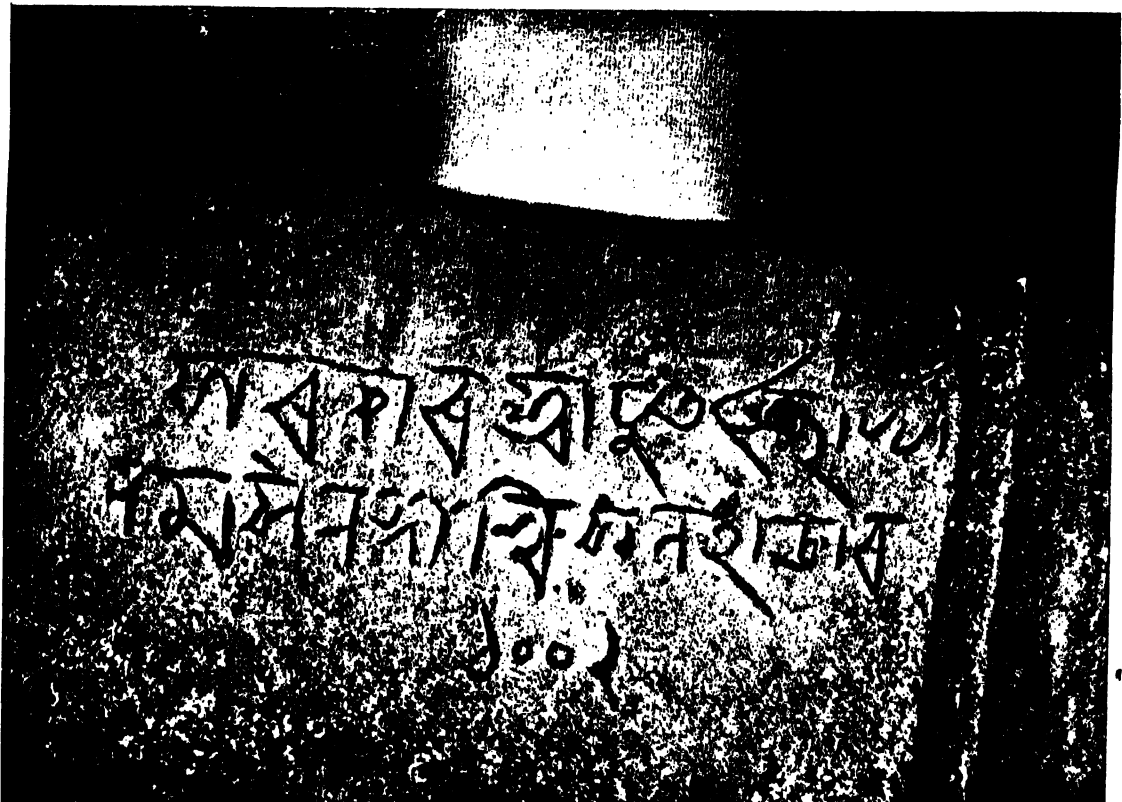
ঈশাখাঁর ৫ম কামানের বঙ্গলিপি।

মুখের ব্যাস ১½ ইঞ্চি। বর্ত্তমান ওজন ১ মণ ১½ সের।

৬ষ্ঠ কামানটীর আকৃতি পঞ্চমটীর অনুরূপ। মুখের ব্যাস ১¾ ইঞ্চি এবং ওজন ১ মণ ৭ সের; ইহার ঊর্দ্ধ-দিকে এইরূপ সংখ্যা ক্ষোদিত S+১২৬। ইহা কামানের চিহ্ন ও নম্বর বলিয়াই বোধ হয়। কামানের এক স্থানে ১॥৩' এইরূপ সংখ্যা ক্ষোদিত; এ গুলিকেও তৎকালীন, ওজন জ্ঞাপক সংখ্যা বলিয়াই মনে করা যাইতে পারে। এই কামানটীর আরও ২১ স্থানে পারস্য ভাষায় ২১টী শব্দ ক্ষোদিত আছে—কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাহার পাঠোদ্ধার হয় নাই।

৭ম কামানটীতে কোন প্রকারের দাগ বা চিহ্ন নাই। উহা ৪ ফুট ৬ ইঞ্চি লম্বা, মুখের ব্যাস ১¼ ইঞ্চি, ওজন ১ মণ ৩০ সের।

ইহাই প্রাপ্ত কামান ৭ টীর সংক্ষিপ্ত পরিচয়। এই কামানগুলি এখন ঈশা খাঁর কামান নামে পরিচিত হইয়া কলিকাতা মিউজিয়মে সযত্নে রক্ষিত হইয়াছে।

সাতটী কামানের মধ্যে মাত্র একটী কামানে ঈশা খাঁর নামযুক্ত; তাহাও তৎকালীন রাজভাষায় নহে, বঙ্গাক্ষরে খোদিত। এইরূপ অবস্থাতেও কামানগুলি ঈশা খাঁর নামে পরিচিত হইল কেন? এই বিষয়টী অবগত হইতে হইলে বাঙ্গালার ইতিহাসের একটী অপরিচিত অধ্যায় আলোচনা করিতে হইবে।

শ্রীকেদারনাথ মজুমদার।

ভোগই মৃত্যু।

মক্ষিকা যতই পশে মধুর কলসে
তত‌ই উদ্ধার-আশা যায় দূরতর।
পতঙ্গ যতই আসে প্রদীপ-পরশে,
নিকটে ততই আসে দাহন প্রখর।
কুসুমের বুকে কীট আকুল, গভীর,
যতই প্রবেশে তত পথ সে হারায়।
মানব ভোগের রাজ্যে যতই নিবিড়
বিনাশ নিকটে তত দু'কর বাড়ায়।

শ্রীকালিদাস রায়।

পাপের ফল।

ফতেপুরের রহিম সেখের বড় ছেলে করিম সেখের সহিত প্রতিবেশী এনাতুল্লা পরামাণিকের ছেলে বসিরদ্দীর ছেলেবেলা হইতেই খুব ভাব। করিম ও বসিরদ্দী এক সঙ্গে খেলা করিত, এক সঙ্গে একমাঠে গরু চরাইত, দুইজনে গোপনে পরামর্শ করিয়া প্রতিবেশীর বাগান হইতে ফল চুরি করিত; দুই প্রহরের সময় মাঠের মধ্যে গরু ছাড়িয়া দিয়া দুইজনে বটগাছের ছায়ায় গামছা পাতিয়া শয়ন করিত এবং মধ্যে মধ্যে দুইজনে গলা মিলাইয়া রৌদ্রময় প্রান্তর প্রতিধ্বনিত করিয়া মেঠো সুরে গান ধরিত—

"আমার পরাণ কাঁদে বাড়ী যাই যাই কৈর‍্যারে—"

সেই বৈশাখের দ্বিপ্রহরে বটবৃক্ষ তলে শয়ান রাখাল বালকদ্বয়ের গৃহ গমনের জন্য সত্য সত্যই পরাণ কাঁদিত কি না বলিতে পরি না; কিন্তু সেই সময়ে কোন দূর-দেশগামী পথিক যদি প্রান্তরের পথে যাইত তাহা হইলে ঐ গান শুনিয়া তাহার হৃদয়ে বাড়ীর কথা জাগিয়া উঠিত এবং নিশ্চয়ই বাড়ী যাইবার জন্য তাহার পরাণ কাঁদিয়া উঠিত।

করিম ও বসিরদ্দীকেযে কোন দিন পাঠশালায় যাইতে হয় নাই, একথা না বলিলেও চলে। মা সরস্বতীর সহিত তাহাদের পূর্ব্বপুরুষের যখন কোন সম্বন্ধ ছিল না, তাহাদের বাপদাদারা যখন ঐ দেবীর সহিত কোন প্রকার সম্বন্ধ না পাতাইয়া এতকাল ঘরগৃহস্থালী করিয়াছেন এবং এখনও করিতেছেন, তখন তাহারা যে এই সনাতন প্রথার অন্যথা করিবে, ইহা কদাচ কর্ত্তব্য নহে, একথা তাহারা বেশ বুঝিত। তাহাদের বাপদাদারা যাহা করিয়াছে এবং এখনও করিতেছে, সেই গোরক্ষণ, চাষের কাজ প্রভৃতিই তাহাদের একমাত্র কর্ত্তব্যকর্ম্ম। করিম ও বসির এই শিক্ষাই লাভ করিয়াছিল।

যখন তাহারা ছোট ছিল তখন প্রাতঃকালে উঠিয়া বিশেষ কোন কাজ করিত না। একটু বেলা হইলে 'পান্ত' ভাত ও যাহা কিছু তরকারী থাকিত তাহাই আহার করিয়া গরুর পাল লইয়া মাঠ যাইত। তাহার পর

আড়াই প্রহর বেলার সময় বাড়ীতে আসিয়া তাড়াতাড়ি ভাত খাইয়া আবার মাঠে যাইত, অপরাহ্নকালে গরুর পাল লইয়া বাড়ী আসিত। তাহার পর তাহাদের ছুটি। তখন কোন দিন বা করিম বসিরদ্দীদের বাড়ী আসিত, কোন দিন বা বসিরদ্দী করিমদিগের বাড়ী যাইত এবং সন্ধ্যা পর্য্যন্ত খেলা করিত; কোন দিন বা পাড়ায় বেড়াইতে যাইত।

তাহার পর যখন তাহারা বড় হইল তখন বাপ খুড়ার সঙ্গে তাহাদিগকেও চাষের কাজ করিতে হইত। সে সময় দিনমানে অনেক সময় করিমের সহিত বসিরদ্দীর সাক্ষাৎ হইবার সুযোগ হইত না, তাহাদের জমি ভিন্ন ভিন্ন মাঠে ছিল, সারাদিন সেখানেই কাজকর্ম্ম করিতে হইত; অনেকদিন মাঠে বসিয়াই মধ্যাহ্নের আহার শেষ করিতে হইত। তাহার পর সন্ধ্যার পূর্ব্বে বাড়ীতে আসিয়া দুই বন্ধুতে মিলিত হইত এবং অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত খেলা গল্প প্রভৃতিতে সময় অতিবাহিত করিত। এমনও অনেক দিন হইত যে, একজন আর একজনের বাড়ীতেই রাত্রি অতিবাহিত করিত। তাহাদের পিতা মাতার ইহাতে কোন আপত্তি ছিল না। এই দুইটী যুবকের এই প্রকার মিত্রতা দেখিয়া তাহারা আনন্দিত হইত।

বসিরদ্দী পিতার একমাত্র সন্তান, সুতরাং এনাতুল্লা ও তাহার পত্নী ছেলেকে বড়ই ভালবাসিত, ছেলের জন্য কতকিছু আনিয়া দিত। বসিরদ্দীও পিতা মাতার আজ্ঞাবহ ছিল। করিমের আরও তিনটী ছোট ভাই এবং দুইটী ভগিনী ছিল। তাহাদের সংসারও বৃহৎ। জমির যাহা আয় হইত তাহা দ্বারা তাহাদের সংসার এক রকমে চলিয়া যাইত।

এক বৎসর খুব সুজন্মা হইল। কৃষকেরা বলিল, গত পনর বৎসরের মধ্যে এমন শস্য জন্মে নাই। সে বৎসর ধান বিক্রয় করিয়া এনাতুল্লা দুই পয়সা ঘরে আনিল! তখন তাহার স্ত্রী ধরিয়া বসিল যে, এইবার ছেলের বিবাহ দিতে হইবে। ছেলে ত আর এখন নাবালক নহে, তাহার বয়স সতর বৎসর হইয়াছে। শরীরের কথা বলা যায় না, কখন কি হয়। একমাত্র পুত্রের বিবাহ দিয়া আমোদ আনন্দ করিবার জন্য এনাতুল্লার পত্নী স্বামীকে বড়ই চাপিয়া ধরিল। এনাতুল্লা পত্নীর এই সঙ্গত প্রস্তাব উপেক্ষা করিতে পারিল না। অনেক অনুসন্ধানের পর প্রায় বার ক্রোশ দূরবর্ত্তী এক গৃহস্থের বয়স্থা সুন্দরী কন্যার সহিত এনাতুল্লা পুত্রের বিবাহ দিল।

একমাত্র পুত্র বলিয়া এনাতুল্লা এই বিবাহে অবস্থার অতিরিক্ত ব্যয় করিল। ধান বিক্রয় করিয়া সে যে দেড়শত টাকা পাইয়াছিল তাহাতে ব্যয় কুলাইল না, গ্রামের মহাজন রামমোহন পোদ্দারের নিকট হইতে মাসিক শতকরা দেড় টাকা সুদে সে আরও আড়াইশত টাকা ধার করিল। এনাতুল্লা মনে করিল এবার যেমন ধান পাইয়াছে আর দুই বৎসর এমন ধান পাইলে সে মহাজনের ধার ত শোধ করিবেই, অধিকন্তু বাড়ীর পশ্চিমের ভিটায় একখানি বড় ঘর তুলিবে।

বন্ধু বসিরদ্দীর বিবাহে করিমের আনন্দ দেখে কে? সে বাড়ীর কাজকর্ম্ম ফেলিয়া দিনরাত বসিরদ্দীদিগের বাড়ীতেই থাকে; বিবাহের যাহা কিছু আয়োজন করিমই তাহার ভার গ্রহণ করিল। এনাতুল্লা যে দিন বিবাহের সম্বন্ধ পাকা করিবার জন্য গেল সে দিন করিমই তাহার সঙ্গে গেল। মেয়ে দেখিয়া তাহার খুব পসন্দ হইল—যেমন সুন্দরী তেমনি বয়স্থা, চাষার ঘরে এমন সুন্দরী মেয়ে সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না, করিম মনেমনে তার মিতের নসিবের যথেষ্ট প্রশংসা করিল। হাঁ, বউ যদি চাই ত এমন বউই চাই!

করিম বাড়ী আসিয়া বউয়ের রূপের কথা মিতেকে বলিল। এ তল্লাটের মধ্যে যে এমন পরী, চাষা মুসলমান দূরে থাকুক বড় বড় হিন্দুর ঘরেও নাই, একথা করিম বসিরদ্দীকে এবং পাড়ার আর দশজনকে বলিল। সকলেই এনাতুল্লার পসন্দের তারিফ করিল।

যথা সময়ে বিবাহ হইয়া গেল। গ্রামের অনেক আত্মীয় কুটুম্ব বিবাহে গেল। এনাতুল্লা মুক্তহস্তে অর্থ ব্যয় করিল; সকলেই জানিল, হাঁ বিবাহে বেশ ঘটা হইয়াছে। এনাতুল্লার সাতটা পাঁচটা নাই, একই ছেলে; তাহার বিবাহে এই রকম দু পয়সা ব্যয় না করিলে কি ভাল দেখায়। এনাতুল্লা এত অর্থব্যয় সার্থক মনে করিল।

মানুষ ভাবে এক, বিধাতা করেন আর এক। এনাতুল্লা মনে করিয়াছিল আগামী দুই বৎসরও খুব শস্য হইবে, তাহার ধার শোধ হইবে, তাহার পশ্চিমের ভিটায় বড় ঘর উঠিবে। কিন্তু তাহা আর হইল না। পর বৎসর বড়ই অজন্মা গেল; ক্ষেতে যে কিছু শস্য জন্মিল তাহাতে সম্বৎসরের খোরাকী চলাই ভার হইল। শুধু এনাতুল্লার বলিয়া নহে, করিমের পিতারও ক্ষেত্রে তেমন শস্য জন্মিল না; সকলের মুখেই এক কথা, এবার কি উপায় হইবে।

বিপদের উপর বিপদ। এই সময়ে একদিন এনাতুল্লার জ্বর হইল। জ্বর হইয়াছে তার আর কি, দুইদিন উপবাস করিলেই জ্বর সারিয়া যাইবে। গরীব মুসলমানেরা কথায় কথায় ডাক্তার কবিরাজ ডাকেও না, ডাকিবার সামর্থ্যও তাহাদের নাই; তাহারা জ্বরে ভোগে, উপবাস করে, পাড়ার লোকে যে যাহা বলে সেই সকল টোট্‌কা ব্যবহার করে, বড় বেশী হইলে দুই পয়সার কুইনাইন খায়; শেষে পরমায়ু থাকে তবে বাঁচিয়া উঠে, নতুবা জীবলীলা শেষ করে। এনাতুল্লার জ্বরেও সেই ব্যবস্থাই হইল। দিন দুই উপবাসের পরও যখন জ্বর গেল না, তখন প্রতিবেশী বৃদ্ধ জলিম মণ্ডল কি একটা টোট্‌কা ঔষধ দিল; তাহাতেও জ্বর গেল না, আরও বাড়িয়া উঠিল। তাহার পর একদিন রাত্রিশেষে এনাতুল্লা সকলকে ফাঁকি দিয়া চলিয়া গেল।

বসিরদ্দী বড়ই বিপদে পড়িল। সংসারে মাতা ও যুবতী পত্নী, ঘরে অন্নাভাব; তাহার উপর মহাজনের ঋণ। সে কি করিবে ভাবিয়া পাইল না। এই দুঃখ ও বিপদের সময় প্রতিবেশীরা সকলেই মুখে সহানুভূতি দেখাইল; কিন্তু তাহার আবাল্য মিত্র করিম এই বিপদের সময় একবারে বুক দিয়া পড়িল। তাহাদেরও অবস্থা ভাল ছিল না। তবুও এখনও তাহার পিতা বর্ত্তমান, এখনও তাহার ছোট তিনটী ভাই আছে। সে যথাসাধ্য বসিরদ্দীর সাহায্য করিতে কৃতসঙ্কল্প হইল, তাহাকে নানাপ্রকার সাহস দিতে লাগিল। মাথার উপর আল্লা আছেন, তিনি তিনটী প্রাণীকে ভাতের অভাবে মারিবেন না। বন্ধুর আশ্বাসবাক্যে বসিরদ্দী মনে বল পাইল।

যথা সময়ে দুইটা ভাল গরু বিক্রয় করিয়া বসিরদ্দী পিতৃকার্য্য শেষ করিল। মহাজন পোদ্দার মহাশয় ইহারই মধ্যে দুইদিন টাকার তাগাদা করিয়া গিয়াছেন। বসিরদ্দী তাহাকে বলিয়াছে, “পোদ্দার মহাশয়, টাকা মারা যাবে না; তবে একটু দেরী হইবে। আমি বাপের ধার রাখিব না, যেমন করিয়া হউক শোধ করিব।” কিন্তু কেমন করিয়া যে সে সংসার প্রতিপালন করিয়া ধার শোধ দিবে তাহা সে ভাবিয়া পাইল না।

কৃষকপল্লীতে অনেকেরই সে বৎসর অতি কষ্টে চলিল। যাহাদের কিছু ধান সঞ্চিত ছিল তাহারা এক রকমে বৎসর কাটাইল; যাহাদের সঞ্চিত কিছুই ছিল না, তাহারা দুই চারিটী গরু বেচিল, কেহবা ঘটি, বাটী বন্ধক দিয়া কোন প্রকারে দিন চালাইল। বসিরদ্দীর পাঁচটী গরু সেই বৎসরই ক্রেতার হস্তগত হইল। উপায় নাই, সপরিবারে ত আর না খাইয়া মরিতে পারে না। সকলেই ভাবিল আগামী বৎসরে অবশ্যই কিছু জন্মিবে। কিন্তু পরের বৎসরেও অজন্মা হইল, মাঠের ধানগাছ মাঠেই শুকাইয়া গেল। একবিন্দু বৃষ্টিপাত হইল না। তখন চারিদিকে হাহাকার উঠিল; কেমন করিয়া দিনপাত হইবে ভাবিয়া কৃষকেরা মাথায় হাত দিয়া বসিল। ফতেপুরের অধিকাংশ কৃষকেই মহা বিপদ গণিল। করিম ও তাহার পিতা দিনমজুরী আরম্ভ করিল। করিমের ছোট দুইটী ভাই পরের বাড়ী রাখালী করিতে গেল। বসিরদ্দী কি করিবে ভাবিয়া পাইল না। করিমের দেখাদেখি সেও দিন মজুরী আরম্ভ করিল।

করিম কিন্তু এই সময়ে বসিরদ্দীকে বড়ই সাহায্য করিতে লাগিল। নিজে যাহা উপার্জ্জন করিত তাহার কিছু সে প্রতিদিন বসিরদ্দীকে দিত। বসিরদ্দী প্রথম প্রথম লইতে অস্বীকার করিত; কিন্তু তাহার উপার্জ্জনে যখন দিন চলে না তখন বন্ধুর দান সে প্রত্যাখ্যান করিত পারিল না। করিম প্রতিদিনই বসিরদ্দীর বাড়ীতে কিছু না কিছু পাঠাইয়া দিত; কোন দিন বা আধ সের লবণ, কোন দিন বা এক সের মটর, কোন দিন বা এক পোয়া তৈল সে বসিরদ্দীর বাড়ীতে দিয়া যাইত। ইহার অধিক দেওয়া তাহার শক্তিতে কুলাইত না।

করিম শুধু যে এই সকল আবশ্যক দ্রব্য দিয়াই ক্ষান্ত থাকিত তাহা নহে, মধ্যে মধ্যে সে দুই পয়সার বাতাসা, কি দুই পয়সার খাজা, কোন দিন বা দুই পয়সার গুড় কিনিয়া বসিরদ্দীর স্ত্রীকে দিয়া যাইত। বসিরদ্দী নিষেধ করিলেও সে শুনিত না; বলিত "বসির ভাই, বৌয়ের যাতে কোন কষ্ট না হয় তা দেখা তোমার আমার উচিত।" বসির বলিত "ভাই, এখন কি পয়সা নষ্ট করিবার সময়। আর তোমাদেরও ত অবস্থা ভাল নয়। ও দুই পয়সার জিনিস তোমার বাড়ীতে দিও। আমার যে উপকার তুমি করিতেছ তার কথা আমি চিরদিন মনে রাখিব।"

করিম যেন ক্রমেই বাড়াবাড়ি আরম্ভ করিল। এক দিন সে একগাছি লাল ঘুন্‌সী ও একখানি ছোট চিরুণী কিনিয়া আনিল এবং বসিরের অসাক্ষাতে তাহার স্ত্রীকে দিল। বসিরের স্ত্রী প্রথমে তাহা লইতে অস্বীকার করিল, কিন্তু করিম যখন কিছুতেই ছাড়িল না তখন সে ঐ দুই দ্রব্য তুলিয়া রাখিল। তাহার পর যখন বসির বাড়ীতে আসিল তখন ঐ দুই দ্রব্য বাহির করিয়া দিল।

বসিরের সহিত যখন করিমের সাক্ষাৎ হইল তখন বসির বলিল, "করিম ভাই, তুমি এ সকল কি করিতেছ, তুমি যাহা রোজগার কর তাহা ত আমি জানি; তবে তুমি এ সকল জিনিস কেন কিনিয়া আন? এ সকল কি ভাল? আর কখনও এমন করিয়া পয়সা নষ্ট করিও না।"

করিম এ কথার কোন উত্তর করিল না, শুধু একটু হাস্য করিয়া চুপ করিয়া থাকিল; কিন্তু যতই দিনের পর দিন যাইতে লাগিল ততই করিমের ব্যবহার বসিরের নিকট ভাল বোধ হইল না। করিম এখন সন্ধ্যার সময় বসিরের বাড়ীতে আসে এবং রাত্রি ১১ টা ১২ টা পর্য্যন্ত বসিয়া নানাপ্রকার গল্প করে, হাসি তামাসা করে। এ সকল বসিরের চক্ষে ভাল বোধ হয় না। কিন্তু করিম তাহার আবাল্য বন্ধু, করিম তাহার পরম উপকারী, করিম তাহার জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিতে পারে, এই সকল কথা যখনই তাহার মনে হইত, তখন সে আর কথা বলিতে পারিত না। এদিকে তাহার প্রিয়তমা পত্নীর উপরও তাহার অগাধ বিশ্বাস ছিল; করিমকে যে তাহার স্ত্রী ভাই ভিন্ন অন্য চক্ষে দেখিতে পারে একথা তাহার মনেই আসিত না। তবুও কি জানি কেন সময়ে সময়ে সে যেন কেমন একটা অশান্তি বোধ করিত এবং করিমের এত ঘনিষ্ঠতা যে ভাল নহে তাহা তাহার মনে হইত, কিন্তু সে মুখ ফুটিয়া একটী কথাও বলিতে পারিত না। সে সর্ব্বদাই সতর্ক থাকিত।

এই সময়ে তাহারা শুনিল যে, এবার তাহাদের দেশে যদিও ধান জন্মে নাই, কিন্তু সুন্দরবন অঞ্চলে যথেষ্ট ধান জন্মিয়াছে এবং তাহাদের দেশের অনেকে ধান কাটিতে যাইতেছে। বাদা অঞ্চলের কৃষকেরা নিজেরা সমস্ত ধান্য কাটিয়া উঠিতে পারে না। সেই জন্য ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে অনেক মজুর নৌকা করিয়া ঐ অঞ্চলে ধান কাটিতে যায়। তাহারা ধান কাটিয়া মজুরী স্বরূপ পয়সা পায় না, ধান পায়। করিম ও বসির পরামর্শ করিল যে, তাহারা দুইজনে ধান কাটিতে যাইবে। মাস খানেকের জন্য বাড়ীর ব্যবস্থা করিয়া সুন্দরবনে গেলে তাহারা যে ধান পাইবে তাহাতে অবশিষ্ট কয়মাস অনায়াসে চলিবে।

এদিকে বসিরদ্দীর অবস্থা দেখিয়া মহাজন রামমোহন পোদ্দার গ্রামে টাকার জন্য তাগাদা করিল; কিন্তু বসির কোথায় টাকা পাইবে, তাহার দিনঅন্ন চলে না। তখন পোদ্দার মহাশয় নালিস করিয়া ডিক্রী করিল এবং বসিরদ্দী যখন সুন্দরবনে যাইবার পরামর্শ করিতেছিল তখন তাহার জমি নীলাম হইয়া গেল। তাহাতেও মহাজনের ঋণ শোধ হইল না। বসিরদ্দী বুঝিল, বুড়া মা ও স্ত্রীর ভরণপোষণের জন্য তাহাকে অতঃপর ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিতে হইবে।

সুন্দরবনে যাওয়াই স্থির হইল। করিমের বাপ তাহাতে সম্মতি প্রদান করিল। করিমদিগের একখানি ছোট নৌকা ছিল, সেই নৌকায় যাওয়াই স্থির হইল। গ্রামের আরও দুই একটী যুবক করিম ও বসিরের সহিত যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিল, কিন্তু নৌকা ছোট বলিয়া করিম তাহাদের প্রস্তাবে অসম্মতি প্রকাশ করিল। তাহারা দুই বন্ধুতেই ধান কাটিতে যাইবে, আর কাহাকেও সঙ্গে লইবে না।

বসির করিমকে বলিল, "করিম ভাই, যেমন করিয়া হউক প্রায় একমাস বাড়ী ছাড়া থাকিতে হইবে। এই একমাস আমার মা ও স্ত্রী কি খাইয়া বাঁচিবে তাহার ত কিছুই ব্যবস্থা করিতে পারিতেছি না। কেহ যে দু দশ টাকা ধার দিবে তাহা ত বোধ হয় না। এক উপায় আছে, আমার স্ত্রীর গায়ে যে দুই তিনখানি রূপার গহনা আছে তাহাই আনিয়া তোমাকে দিতেছি, তুমি কোন খানে বন্ধক রাখিয়া কয়েকটা টাকা আনিয়া দাও। তাহারই কিছু আমরা সঙ্গে লইয়া যাই, আর অবশিষ্ট টাকা মায়ের হাতে দিয়া যাই; তাহাদ্বারা কোন রকমে এই একমাস সংসার চলুক।"

করিম বলিল, "সে কি কথা, বৌয়ের গায়ের গহনা বন্ধক দিতে হইবে কেন? সে কিছুতেই হইবে না। তুমি ভাবিও না, সে ব্যবস্থা আমি করিব। তোমার কোন চিন্তা করিতে হইবে না; তুমি যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হও।"

বসির বলিল "তোমার অবস্থা ত সকলই জানি। তুমি এত টাকা কোথায় পাইবে?"

করিম বলিল "তুমি সে ভাবনা ছাড়িয়া দাও না; কাল তোমার টাকা পাইলেই ত হইবে। তাহার পর তুমি যখন পারিবে তখন টাকা শোধ দিও।"

বসির আর কোন কথা বলিল না। করিম পরদিন কোথা হইতে কে জানে, দশটী টাকা আনিয়া বসিরের হাতে দিল এবং বলিল, "আর দেরী করিলে চলিবে না; আর আর গাঁয়ের লোকেরা চলিয়া গিয়াছে; দেরী হইলে হয় ত আমরা কাজ পাইব না।"

পর দিন আহারান্তে নৌকা ছাড়িয়া দেওয়াই স্থির হইল। করিম এদিকে গোপনে আরও পাঁচটী টাকা বসিরের স্ত্রীর হাতে দিয়া বলিল "দেখ, এ টাকার কথা কাহাকেও বলিও না। যদি খরচের টাকা কম পড়ে তবে এই টাকা হইতে খরচ করিও। আমি আছি, তোমাদের কোন কষ্ট হইবে না।"

বসিরের স্ত্রী এমন ভাবে টাকা লওয়া কর্ত্তব্য মনে করিল না। সে করিমের সহিত কথা বলিত; সে বলিল "আমার টাকার দরকার কি; মায়ের হাতে এ টাকাও দিয়া যাও, তিনিই খরচ করিবেন।"

করিম বলিল "তাঁকে দশ টাকা দিয়াছি; এ টাকা আমি তোমাকে দিলাম। তোমার যখন যা দরকার হইবে এই টাকা দিয়া কিনিও। এ টাকা তুমি না নিলে আমি বড়ই রাগ করিব। আর এ টাকার কথা কাহাকেও বলিও না।"

বসিরের স্ত্রী কি করিবে অগত্যা টাকা পাঁচটী লইল; কিন্তু একথা সে তাহার স্বামীর নিকট গোপন করিতে পারিল না, সেত কখন তাহার স্বামীর নিকট কিছু গোপন করিতে জানে না। সামান্য কৃষকের মেয়ে বটে, কিন্তু সে জানিত স্বামীর মত বন্ধু আর নাই; তাহার কাছে কোন কথা গোপন করিতে নাই, স্বামীর অগোচরে কোন কাজ করিলে পাপ হয়।

রাত্রিতে সে বসিরকে এ পাঁচ টাকার কথা বলিল। বসির শুনিয়া মনে বড়ই অশান্তি অনুভব করিল। অবশেষে সে তাহার স্ত্রীকে বলিল "টাকা পাঁচটী তোমার কাছেই থাকুক। আমি বাদা হইতে ফিরিয়া আসিয়া যাহা হয় করিব।'

তাহার পর স্বামী স্ত্রীতে অনেক কথা হইল। পরদিন প্রাতঃকালে আহারাদি করিয়া মায়ের চরণে প্রণাম করিয়া বসির ও করিম সুন্দরবনে ধান কাটিতে যাইবার জন্য নৌকা ছাড়িয়া দিল। সামান্য আবশ্যক দ্রব্য পূর্ব্বেই তাহারা নৌকায় তুলিয়াছিল।

তিন দিন নৌকা চালনের পর তাহারা কাউখালীর নিকটে পৌঁছিল। করিম নৌকা বাঁধিবার উদ্যোগ করিতেছে দেখিয়া বসির বলিল করিম ভাই, এখনও বেলা আছে, আর একটু গেলেই সম্মুখের ঐ বন্দরের মত কি দেখা যাইতেছে ঐ খানে যাওয়া যায়। ওখানে অনেক গুলো নৌকাও দেখা যাইতেছে। রাত্রি কালে এই জঙ্গলের পাশে না থাকিয়া আর একটু যাওয়াই ভাল।"

করিম বলিল "বসির ভাই, দেখছো না, কেমন জোয়ারের টান। এ ঠেলে যাওয়া বড়ই কষ্ট হবে। এ স্থানটা মন্দ কি এখানেই থাকি, শেষ রাত্রের ভাটায় নৌকা ছেড়ে দেব। এই ভাটাতেই আমরা তিন নম্বর ঘাটে পৌঁছিতে পারবো।"

করিমের কথায় বসির আর আপত্তি করিল না। দুই জনে খালের মাঝখানে নৌকা আট্‌কাইল। সুন্দরবন অঞ্চলে রাত্রি কালে তীরে নৌকা বাঁধিতে নাই, বড় বাঘের ভয়। এমনও শুনিতে পাওয়া যায় যে, বাঘেরা সাঁতরাইয়া নদীর মধ্যস্থিত নৌকা হইতেও মানুষ লইয়া যায়।

নৌকা বাঁধা হইলে বসির বলিল, "করিম ভাই, এ রাত্রিতে আর ভাত রেঁধে কাজ নেই; নৌকার উপর আগুন জাল্‌লেই বাঘই হোক, আর মানুষেই হোক, জান্‌তে পারবে যে এখানে একখানি নৌকা আছে। তাতে বিপদ হোতে পারে। ও বেলার যে ভাত আছে তাই কোন রকমে দুজনে খাই; আর কাল যে চিড়ে কিনেছিলাম তারও কিছু আছে, তাতেই আজ রাত কাটানো যাক্।"

করিম তাহাতেই সম্মত হইল। হাত মুখ ধুইতেই সন্ধ্যার আঁধার ঘনাইয়া আসিল। তখন দুই বন্ধুতে তামাক খাইতে খাইতে গল্প আরম্ভ করিল। বসির বলিল "করিম ভাই, আজ আমার প্রাণটা যেন কেমন কর্‌ছে, এ কয়দিনত বাড়ীর কথা মোটেই মনে হয় নাই। আজ সারাদিন থেকে থেকে বাড়ীর কথা মনে হচ্চে, আর বুঝি বাড়ী যেতে পারবো না, আর হয়ত মাকে দেখ্‌তে পাবো না।"

বসিরের কথা শুনিয়া সেই অন্ধকারের মধ্যে করিমের শরীর শিহরিয়া উঠিল। সে কি ভাবিল বলিতে পারি না। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া সে বলিল "বসির ভাই, বাড়ী ছেড়ে আস্‌লে সকলেরই অমন হয়; তুমি কোন দিন বাড়ী ছাড়া হওনাই, বাড়ীতে যাওয়ার জন্য মন অমন কোর্‌তেই পারে। তা কি কোরব ভাই; যদি বাড়ীতে থাক্‌লে দিনপাত হোতো তা হোলে কি আর এই বিদেশে জঙ্গলের মধ্যে আসি। কিছু ভেবোনা, দেখ্‌তে দেখ্‌তে মাস কেটে যাবে; তার পরই বাড়ী যাবো।"

বসির কোন কথা বলিল না, কিন্তু কি জানি কেন, থাকিয়া থাকিয়া তাহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিতে লাগিল; তাহার মনে হইতে লাগিল, আর সে বাড়ী যাইতে পাইবে না, আজই তার জীবনের শেষ দিন। তাহার বুকের মধ্যে কেমন করিতে লাগিল।

বসিরকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া করিম বলিল "বসির ভাই, চুপ কোরে রইলে যে। রাত হোলো আমিই ভাত বাড়িয়া দিই। এস আজ সকালে সকালেই দুইজনে ঘুমাই আবার শেষ রাত্রিতেই উঠ্‌তে হবে।"

এই বলিয়া করিম ভাত বাড়িতে লাগিল। দুই প্রহরের ভাত ও কুমড়ার তরকারী ছিল। করিম তাহাই দুইটা মাটীর পাত্রে বিভক্ত করিল। তাহার পর সে একবার বসিরের দিকে চাহিল। বসির তখন অন্ধকার নদীর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া একমনে বাড়ীর কথাই ভাবিতেছিল। করিম তখন অতি সতর্কভাবে নৌকার পার্শ্বে একটা স্থানে হাত দিল, অতি সাবধানে ছোট একটা কাগজের মোড়ক বাহির করিল। সেই মোড়কের মধ্যে গুঁড়ার মত কি একটু ছিল, তাহা একভাগ তরকারীর সহিত মিশাইয়া দিল এবং সেই ভাগটা বসিরের ভাতের উপর দিয়া বলিল "বসির ভাই, ভাত খাও। তুমি আজ অমন হোলে কেন?"

বসির সে কথার কোন উত্তর না দিয়া তাহার মৃৎপাত্রখানি কোলের কাছে টানিয়া লইল। দুই তিন গ্রাস ভাত খাইয়াই বসির বলিল "করিম ভাই, তরকারীটা এমন কেন? আমার যে গলার মধ্যে জ্বলিয়া উঠিল; আমার যে—" আর তাহার কথা সরিল না, সে নৌকার উপর শুইয়া পড়িল।

করিম বলিল "বসির ভাই, ওকি? তুমি শুয়ে পড়িলে কেন?" বসির আর কথা বলিতে পারিল না; গলার মধ্য হইতে গোঁ গোঁ শব্দ হইতে লাগিল এবং সে হাত পা ছুড়িতে লাগিল। করিম নির্ব্বাক হইয়া তাহার আবাল্য বন্ধুর মৃত্যু যন্ত্রণা দেখিতে লাগিল; সে একবার বসিরের হাতখানিও ধরিল না, একটা সান্ত্বনার কথাও বলিল না; মূর্ত্তিমান সয়তান তখন তাহার স্কন্ধে ভর করিয়াছিল।

বসির আর অধিকক্ষণ হাত পা নাড়িতে পারিল না, পাপিষ্ঠ করিম তরকারীর সহিত যে বিষ প্রয়োগ করিয়াছিল তাহার কার্য্য হইতে বিলম্ব হইল না,

বসির অসাড় হইয়া পড়িল। করিম সেই ভাবেই বসিয়া আছে, তাহারও সাড়াশব্দ নাই।

একটু পরেই তাহারও বোধ হয় জ্ঞান সঞ্চার হইল। তখন সে বসিরের দেহ একবার নাড়িয়া দেখিল, জীবনের কোন লক্ষণ দেখা গেল না। তখন সে ধীরে ধীরে বসিরের দেহ তুলিয়া ধরিল এবং সজোরে সেই দেহ নদীর মধ্যে নিক্ষেপ করিল। ঝুপ করিয়া একটা শব্দ হইল, তাহার পর সমস্ত নীরব।

করিম তখন জোয়ারের মুখে নৌকা ছাড়িয়া দিল, তাহার আর ধান কাটিতে যাওয়া হইল না।

(আগামীবারে সমাপ্য)

শ্রীজলধর সেন।

সম্মিলন।

যুগে যুগে আসে আর যায়
মিলন, মিলন সে যে চায়
আসে যায় আলোকে আঁধারে
মোর সুখে দুখে বেদনায়।

এসেছে সে মধু ঋতু সাথে
স্মিত হাসি ল'য়ে আঁখি পাতে,
নিখিল চিত্ত ঘেরি তাই
উতলা পবন আজি মাতে!

এসেছে হিয়ার কিনারায়
নূপুর বেজেছে পায় পায়
বসন্ত-বাহার রাগিণীর
মূরতি চিত্ত মাঝে ভায়।

এমনি সে নামে কত সাজে
ভূলোকে দ্যুলোকে হিয়া মাঝে,
কত ছন্দে কত নব রাগে
বাজে সুমধুর বীণা বাজে।

সে যে আসে মোর কাছে ধেয়ে;
শুধু মোর মুখ পানে চেয়ে
শূন্যে কোথা সুদূর কে জানে
যায় মিলনের গীত গেয়ে।

পবনে সৌরভ টুকু তার
খুঁজে ফিরে অঙ্গ আমার
তাহার বীণার তারে তারে
বাজিছে আমার ঝঙ্কার!

ঝরে পাতা ফোটে কিশলয়
ফুটে আর টুটে কুবলয়
এরি মাঝে তারি আসা যাওয়া
নিত্য জাগরণ আর লয়।

আসে সে যে যায় আর আসে
চিরদিন মোরে ভালবাসে,
সবে বাঁধি মহাসম্মিলনে
আসে মোর মিলনের আশে!

শ্রীদিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

কবি রজনীকান্ত
ও
তাঁহার একটী বাল্য কবিতা।

কবি রজনীকান্ত আর ইহলোকে নাই। তাঁহার বীণার ঝঙ্কার চিরকালের জন্য নীরব হইয়াছে। কিন্তু সে ঝঙ্কারে বঙ্গ-সাহিত্য-কুঞ্জ চিরকাল আনন্দ উপভোগ করিবে ইহা নিঃসন্দেহ বলা যাইতে পারে। তাঁহার অপরিম্লান কবিতা-কুসুম, তাঁহার মনোহর যশঃসৌরভ বহুদিন ধরিয়া মৃগনাভির মত সমুদয় বঙ্গে আদৃত হইবে। মায়ের অকপট সাধক, প্রতিভার অবতার রজনীকান্তের অকাল মৃত্যু বঙ্গ সাহিত্যের প্রভূত ক্ষতি করিল, ইহা বলাই বাহুল্য।

কলিকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রুগ্নাবস্থায় কবি রজনীকান্ত

শৈশবাবধিই তিনি অতি কোমলপ্রাণ এবং সঙ্গীত-প্রিয় ছিলেন। কাহারও সুমধুর সঙ্গীত শ্রবণ করিলে রজনীকান্ত আত্মহারা হইয়া তাহাতে যোগদান করিতেন এবং গৃহে প্রত্যাগত হইয়া আমাদিগকে তাহা গাহিয়া শুনাইতেন। গানের যে অংশ তাঁহার স্মরণ না হইত তাহা স্বয়ং পূরণ করিয়া লইতেন; আমরা তাহা ধরিতেই পারিতাম না। তাঁহার সেই বালকণ্ঠ-জাত সুমধুর গীতধ্বনি আজিও যেন আমার কাণে বাজিতেছে।

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সঙ্গীতে পারদর্শিতা প্রকাশিত হইতে লাগিল। ছোট খাট কথাগুলি অনেক সময় তিনি 'মিল' দিয়া বলিয়া যাইতেন। তাঁহার পঞ্চদশ বৎসর বয়সের রচিত একটী সঙ্গীতের কিয়দংশ এখনও আমার মনে পড়িতেছে! পাঠক এই কবিতায়—

"তব চরণ নিম্নে উৎসবময়ী
শ্যাম ধরণী সরস"
"সেথা আমি কি গাহিব গান"

প্রভৃতি রচয়িতার প্রাথমিক কবিত্বের পরিচয় প্রাপ্ত হইবেন। অকিঞ্চিৎকর হইলেও তাঁহার এই কবিতাংশটী আমার নিকট চির মধুর!

* * * * *

নবমী দুঃখের নিশি দুঃখ দিতে আইল।
হায়! রাণী কাঙ্গালিনী পাগলিনী হইল!
উমার ধরিয়া কর, কহে, উমা আয়রে!
এমন করিয়া দুঃখ দিয়া গেলি মায় রে!
সারাটী বরষ তোর মুখ পানে চাহিয়ে—
আসিবি রে আশা করি থাকি প্রাণ ধরিয়ে॥
কত আশা করে থাকি পারি না তা বলিতে
তিন দিনে চলে যাস পারি না তা পুরাতে।

তোর মত দয়াহীনা মেয়ে আমি দেখিনি
ওমা উমা, ছেড়ে যাস্ দেখে দীন দুখিনী ॥

*　*　*　*　*

*　*　*　*　*

এরূপ সরল কবিতা আজ কাল বঙ্গ সাহিত্যে বিরল!

আমি একদিন বলিয়াছিলাম, "দাদা! আমায় একটী গানের সুর বাঁধিয়া দিতে হইবে।"

তিনি হাসিয়া বলিলেন "দাদা কি সুর শিখ্‌তে কারো দুয়ারে যায়? তুই যাস কেন।"

দাদার দেখাদেখি আমিও নিজে সুর বাঁধিতে চেষ্টা করিতাম।

রজনীকান্ত একান্ত মাতৃভক্ত ছিলেন। মায়ের সেবা তাঁহার জীবনের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য ছিল।

সর্ব্বদা মুক্তকণ্ঠ স্বাধীন বন-বিহঙ্গের ন্যায় গান করিতে করিতে অবশেষে নিদারুণ কণ্ঠ-ক্ষত (ক্যান্‌সার) রোগে আক্রান্ত হইলেন! যাঁহার গান শুনিলে পথের লোক হাঁ করিয়া দাঁড়াইত, তিনি বাক্‌শক্তিহীন হইয়া পড়িলেন। তাই মৃত্যুশয্যায় বড় দুঃখে তিনি লিখিলেন,—

"দয়াল!
আমায় সকল রকমে কাঙ্গাল করিয়া
গর্ব্ব করেছ চুর।"

"সকল রকমের" মধ্যে সঙ্গীতই তাঁহার সর্ব্বপ্রধান ধন ছিল।

মৃত্যুশয্যায় তিন বৎসর কাল বাক্‌শক্তিহীন থাকিলেও তাঁহার হৃদয়ের শক্তির হ্রাস হয় নাই। দারুণ যন্ত্রণার মধ্যেও তিনি বাণীর সাধনা করিতে বিরত ছিলেন না। রোগশয্যায় শুইয়া তিনি বহু কবিতা লিখিয়া রাখিয়াছেন! ইহাতেই তাঁহার হৃদয়ের বল। সাহিত্যচর্চ্চায় তাঁহার আনন্দ,—এমন আনন্দ যাহাতে ভীষণ কণ্ঠক্ষত রোগের যন্ত্রণাও পরাভূত হয়। এই সকল কবিতা মনে মনে আবৃত্তি করিয়া তিনি পুলকিত হইতেন।

মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহার কনিষ্ঠা ভগিনী তাঁহাকে দেখিতে স্বামীসহ কলিকাতায় গিয়াছিলেন, সেখানেই ভগিনীর বৈধব্য ঘটে! রজনীকান্ত দারুণ কষ্টের উপর এই শোকে মুহ্যমান হইয়াছিলেন।

মৃত্যুর পূর্ব্বে যখন তিনি মেডিকেল কলেজ হাঁসপাতালে ছিলেন তখন বঙ্গের সাহিত্যিকগণ রজনীকান্তের রোগশয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হইয়া তাঁহার প্রতি গভীর সহানুভূতি ও সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন। সাহিত্যের প্রতি দেশের এই অনুরাগ, সাহিত্যিকের প্রতি সাহিত্যিকের সমবেদনা-ভাব মাতৃভাষার ভবিষ্যতের পক্ষে আশাপ্রদ।

এমন একজন সরল সুজনের এই শোচনীয় মৃত্যুতে, বোধ হয় ভগবান কষ্টের ভিতর দিয়া তাঁহাদের পৃথিবীবাস জনিত পাপের ক্ষয় সাধন করতঃ পরলোকে অক্ষয় স্বর্গের ব্যবস্থা করেন।

শ্রীঅম্বুজাসুন্দরী দাশগুপ্তা।

সন্ধ্যা।

সন্ধ্যায় উদার মুক্ত মহা ব্যোম তলে
সুগম্ভীর নীরবতা মাঝে,
ফুল্ল শশি কোটী কোটী দীপ্ত গ্রহ দলে
আলোকের অর্ঘ্য লয়ে সাজে।
তোমারি কৃপায় দান দিবে তব পদে,
চন্দ্র তারা সবারই বাসনা;
কিন্তু সে চরণ কোথা? গেলে কোন পথে,
স্নিগ্ধ হবে দীন উপাসনা?
কোটী কোটী গ্রহলোকে পায় কি খুঁজিয়া
আরাধনা হয়েছে বিফল,
বিক্ষিপ্ত হৃদয় লয়ে নয়ন বুজিয়া
বসে থাকা, মনরে, কি ফল?

নিশীথে

নিশীথে গগন স্তব্ধ, ধরা সুপ্তিকোলে,
গম্ভীর, সুধীর সমীরণ,
জলে স্থলে মধুগন্ধী কত ফুল দোলে,
ভুলে যায় চাঁদের কিরণ।

আমি মুক্ত করে "এস পূজা লও প্রভু!"
বলে কত ডাকিনু কাতরে,
মায়াময় লুকাইয়া রহিলে যে তবু?
খুঁজে কি পাবনা চরাচরে?
দুর্ব্বল এক্ষীণ দেহ ব্যাধির কবলে,
কাঁদে নাথ! এ বেদনাতুর;
দেখা দিয়ে. পূজা নিয়ে রাখ পদতলে.
চাও নাথ, বিরহ-বিধুর।

প্রভাত।

প্রভাতে যখন পাখী গাহিল প্রভাতী
আলোকে বসুধা ভরপূর;
পূর্ব্বাকাশে পরকাশে তপনের ভাতি
স্নিগ্ধ ধীর, সমীর মধুর;
মঙ্গল আরতি শঙ্খ বাজে ঘরে ঘরে,
অবিরত তব স্তুতি গান।
কোথায় লুকালে প্রভু! মুক্ত চরাচরে;
বলে দাও তোমার সন্ধান!
অকস্মাৎ খুলে গেল মরমের দ্বার;
মুদিয়া আসিল দু নয়ন;
দেবতা কহিল ডাকি "মানসে তোমার,
আন পূজা, করিব গ্রহণ।"

২৮শে আষাঢ় ১৩১৭ সন।
রাত্রি—
মেডিক্যাল কলেজ হস্পিটাল। } রজনীকান্ত সেন

গত বৎসরের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার।

ইংরাজি বৎসর শেষ হইয়া গিয়াছে এবং বাংলা বৎসরও শেষ হইল। এই এক বৎসরের জড়বিজ্ঞান কতদূর অগ্রসর হইয়াছে তাহার একটা খতিয়ান খাড়া করিবার সময় উপস্থিত। জমা খরচের হিসাবে অবশ্যই বাঙ্গালী বা কোন ভারতবাসীরই নাম থাকিবে না। যে যাত্রিদল প্রকৃতির মন্দিরে এক বৎসর কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন, কোনও ভারতবাসী তাহাতে যোগ দেন নাই! তথাপি ইঁহারা মন্দির দ্বার হইতে যে সকল মহা সত্য সংগ্রহ করিয়া আসিয়াছেন তাহা বিশ্ব মানবেরই সম্পত্তি। কাজেই সে গুলি আলোচনার অধিকার আমাদের পূর্ণ মাত্রায় বর্ত্তমান।

১। জ্যোতিঃ শাস্ত্র।

১৯১০ সালের জানুয়ারী মাসের মাঝামাঝি সময়ে, একটি বৃহৎ ধূমকেতুর আবিষ্কার হইয়াছিল। এই সময়ে সকলেই প্রসিদ্ধ হেলির ধূমকেতুর আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। হঠাৎ এই নূতন ধূমকেতুর উদয় দেখিয়া অনেকে ইহাকেই হেলির ধূমকেতু ভাবিয়াছিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকার জনৈক জ্যোতিষী ইহার আবিষ্কারক। এটি শেষে এত উজ্জ্বল হইয়া দাঁড়াইয়াছিল যে, দিবসেও ইহাকে অনেকে দেখিতে পাইয়াছিলেন।

গত আগষ্ট ও নভেম্বর মাসে আরো দুইটি ধূমকেতুর সাক্ষাৎ পাওয়া গিয়াছিল। যে সকল ধূমকেতু গ্রহের ন্যায় সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া বেড়ায়, তাহাদের সকলেরি সহিত জ্যোতিষীদিগের পরিচয় আছে। আগষ্টের ধূমকেতুটিতে পরিজ্ঞাত সাময়িক ধূমকেতুর লক্ষণ দেখা যায় নাই। দ্বিতীয় ধূমকেতুটিকে "ফেয়ির ধূমকেতু" (Faye's comet) বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হইয়াছিল। অধ্যাপক Faye গত ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে ইহার আবিষ্কার করেন। পৃথিবী যেমন একবৎসরে সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিয়া আসে, এটি সেই প্রকার সাড়েসাত বৎসরে সূর্য্য প্রদক্ষিণ করে। গত ১৯০৩ সালে ইহার উদয়ের সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু সেই সময়ে ইহা পৃথিবী হইতে অত্যন্ত অধিক দূরে ছিল বলিয়া দেখা যায় নাই।

গত বৎসরে ব্রুক্ সাহেব—(Brooke's Comet) আবিষ্কৃত প্রসিদ্ধ ধূমকেতুর আগমন সম্ভাবনা ছিল। পৃথিবীর নানা স্থান হইতে জ্যোতিষিগণ ইহার অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। অবশেষে অক্টোবর মাসে আমেরিকার

'লিক্' মান মন্দির হইতে অধ্যাপক উইলসন্ ইহার সন্ধান পাইয়া ছিলেন। আকারে হেলির ধূমকেতুর ন্যায় বৃহৎ না হইলেও ইহার বিচিত্র গতিবিধি জ্যোতিষিগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। আবিষ্কার কাল হইতে এপর্য্যন্ত এটি চারিবার সূর্য্য প্রদক্ষিণ করিয়াছে, এবং প্রত্যেক বারেই ইহার প্রদক্ষিণ কাল যেন এক একটু কমিয়া আসিতেছে। প্রদক্ষিণ কালে এই প্রকার ক্রমিক হ্রাস প্রসিদ্ধ এঁকির ধূমকেতুতেও (Enke's comet) লক্ষ্য করা হইয়াছে। জ্যোতিষিগণ অনুমান করিতেছেন, মহাকাশে পরিভ্রমণ করিবার সময় পথিমধ্যে এগুলি কোনো প্রকার বাধা পাইয়া থাকে। পথে বাধা পাইলে গাড়ীর বেগ যেরূপ কমিয়া আসে, এই ধূমকেতু গুলির বেগও পথিমধ্যস্থ কোনও বাধায় সে প্রকার কমিয়া আসিতেছে।

গত বৎসর হেলির ধূমকেতু দেখা দিয়া সমগ্র বৈজ্ঞানিক জগতে যে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিল তাহার বিশেষ বিবরণ প্রদান নিষ্প্রয়োজন। অবৈজ্ঞানিক জনসাধারণ বৃহৎ পুচ্ছবিশিষ্ট জ্যোতিষ্কটিকে কেবল দেখিবার জন্যই লালায়িত ছিলেন। বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায় ইহার গতিবিধি পরীক্ষা করিয়া ধূমকেতু সম্বন্ধে নূতন তথ্য সংগ্রহ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। নানা দেশের প্রসিদ্ধ জ্যোতিষিগণ তাঁহাদের পর্য্যবেক্ষণের যে বিবরণী প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা হইতে দেখা যায় গত ১৯শে মে তারিখে আমাদের পৃথিবীর অন্ততঃ কিয়দংশ ধূমকেতুর পুচ্ছে আচ্ছন্ন হইয়াছিল।

চন্দ্র যখন পৃথিবী ও সূর্য্যের মধ্যে আসিয়া ঠিক সমসূত্রে দাঁড়ায়, চন্দ্রের দেহে সূর্য্য ঢাকিয়া যায়। ইহাই সূর্য্য-গ্রহণ। ধূমকেতু বা অপর কোন জ্যোতিষ্ক এই প্রকারে মাঝে আসিয়া দাঁড়াইলে ছোটোখাটো সূর্য্য গ্রহণ হইবার সম্ভাবনা থাকে। গত ১৯শে মে তারিখে হেলীর ধূমকেতুর দ্বারা সূর্য্য মণ্ডল আচ্ছন্ন হইয়া পড়িবে স্থির ছিল। সেদিন পৃথিবীর প্রধান মানমন্দির হইতে সূর্য্যের সহস্র সহস্র ফটোগ্রাফ উঠান হইয়াছিল, কিন্তু কোনও ছবিতেই উপগ্রহণের পরিচয় পাওয়া যায় নাই। কাজেই বলিতে হইতেছে ধূমকেতুর দেহস্থ পিণ্ড গুলি এত ক্ষুদ্র এবং দূরবিচ্ছিন্ন যে সূর্য্যালোক সে গুলিকে ভেদ করিয়া অনায়াসেই পৃথিবীতে আসিয়া পড়িয়াছিল। দূর হইতে ধূমকেতুর পুরোভাগটাকে কঠিন পদার্থময় বলিয়া বোধ হইলেও, তাহা সত্যই কঠিন এবং অস্বচ্ছ নয়। ১৮৮২ সালে যখন আর একটি বৃহৎ ধূমকেতু পৃথিবী ও সূর্য্যের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল তখনও উহা সূর্য্যালোক রোধ করিতে পারে নাই।

সূর্য্য হইতে যখন দূরে অবস্থান করে তখন ধূমকেতুর পুচ্ছ থাকে না। সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী হইতে থাকিলেই ইহাদের পুচ্ছোদ্গম হয়। তারপর সূর্য্য হইতে দূরে চলিয়া গেলেই ইহাদের পুচ্ছ ছোট হইয়া পড়ে। গত ১৯০৮ সালের অতি প্রত্যুষে পূর্ব্বদিকে যে একটি ধূমকেতু (Moreshouse comet) কয়েক দিন দেখা গিয়াছিল, জ্যোতিষিগণ তাহার পুচ্ছের আকার পরিবর্ত্তন বিশেষ ভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন। ইহাতে সিদ্ধান্ত হইয়াছিল যে ধূমকেতু সূর্য্যের নিকটে আসিয়া যতটা পুচ্ছ নির্গত করে, দূরে চলিয়া যাইবার সময় সমস্ত পুচ্ছটাকে গুটাইয়া লইয়া যাইতে পারে না; পুচ্ছের কতক অংশ মহাকাশে বিক্ষিপ্ত হইয়া থাকিয়া যায়! ধূমকেতুর দেহের এই প্রকার ক্ষয় হেলির ধূমকেতুতেও গত বৎসর দেখা গিয়াছিল।

নাক্ষত্রিক জ্যোতিষও গত বৎসর নানা আবিষ্কারে সম্পদ্‌শালী হইয়াছে। পাঠক অবশ্যই জানেন, আমরা আকাশে যে সকল নক্ষত্র দেখিতে পাই তাহাদের মধ্যে কেবল কয়েকটির দূরত্ব আমাদের জানা আছে। নিকটবর্ত্তী বস্তুর দূরত্ব নির্ণয় করা অতি সহজ। ত্রিভুজের ভূমি সংলগ্ন দুই কোণের পরিমাণ ও ভূমির দৈর্ঘ্য জানিতে পারিলে যেমন উহার উন্নতি (altitude) নির্ণয় করা সহজ হয় সেই প্রকার দূরবর্ত্তী দুই স্থানের দর্শকের চক্ষুর সহিত যে কোণ উৎপন্ন করিতেছে তাহা নির্ণয় করিতে পারিলেই উহার দূরত্ব নির্ণয় করা যায়। নিকটবর্ত্তী জ্যোতিষ্কের দূরত্ব এই পদ্ধতিতে অতি সহজেই নির্ণয় করা চলে, কিন্তু ইহাদের মধ্যে যে গুলি অতি দূরে অবস্থিত,

তাহাদের দূরত্ব নির্দ্ধারণে এই নিয়ম খাটেনা। এস্থলে দর্শকদ্বয় যত দূরেই থাকুন না কেন, জ্যোতিষ্কটি চক্ষুর সহিত যে কোণ উৎপন্ন করে তার পরিমাণ অতি সূক্ষ্ম যন্ত্রেও ঠিক একই হইতে দেখা যায়। যাহা হউক আকাশের সহস্র সহস্র নক্ষত্রগুলির মধ্যে কোন্ গুলির বিচলন লক্ষ্য করিয়া দূরত্ব নির্ণয় সুসাধ্য, তাহা স্থির করা বড়ই কঠিন। গত বৎসর ইয়েল (Yale) মান মন্দিরের জ্যোতির্ব্বিদগণ পঁয়ত্রিশটি নূতন নক্ষত্রের দুরত্ব নির্ণয় করিয়াছেন। এই মান মন্দিরের তিনজন জ্যোতিষী বহু বৎসর ধরিয়া কেবল এই কার্য্যেই নিযুক্ত আছেন; এপর্য্যন্ত ইহারা প্রায় দুইশত নক্ষত্রের দূরত্ব নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

মাঝে মাঝে আকাশে যেমন হঠাৎ ধূমকেতু দেখা দেয় সেই প্রকার কখন কখন নূতন নক্ষত্রও অতর্কিত ভাবে আকাশে উদিত হইয়া পড়ে। গত বৎসর এই প্রকার তিনটি নূতন নক্ষত্রের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। ইহাদের মধ্যে দুইটি মিসেস্ ফ্লেমিং (Mrs Flemming) নামক জনৈক মার্কিন মহিলা আবিষ্কার করিয়াছেন। রশ্মি-নির্ব্বাচন যন্ত্র (Spectroscope) সাহায্যে আলোক পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে ইহারা এখনও উজ্জ্বল বাষ্পাকারে আছে। এই জাতীয় নক্ষত্রের উৎপত্তির কারণ জিজ্ঞাসা করিলে জ্যোতির্ব্বিদগণ বলেন, ক্ষুদ্র নক্ষত্রগুলি পরিভ্রমণ করিতে করিতে যখন পথিমধ্যে কোন অনুজ্জ্বল উল্কাপুঞ্জের সংঘর্ষণ প্রাপ্ত হয় তখন সেই প্রচণ্ড ধাক্কায় তাহারা উভয়েই উত্তপ্ত হইয়া জ্বলিয়া উঠে। কাজেই নূতন নক্ষত্রগুলিতে প্রথমতঃ বাষ্পময় অবস্থা দেখারই কথা।

গত বৎসরে পৃথিবীর নানা অংশে দুইটি চন্দ্রগ্রহণ এবং দুইটি সূর্য্যগ্রহণ দেখা গিয়াছিল। ৮ই মে তারিখের সূর্য্যগ্রহণটি পৃথিবীর কোন কোন অংশ হইতে পূর্ণগ্রাস দেখাইয়াছিল। ২০শে মে এবং ১৬ই নবেম্বরে যে দুই চন্দ্রগ্রহণ হইয়াছিল, তাহাও পূর্ণগ্রাস অবস্থাতে দেখা গিয়াছে। ভারতবর্ষ হইতে আমরা কেবল নবেম্বরের পূর্ণগ্রাস গ্রহণটিই দেখিতে পাইয়াছিলাম। সকল মান-মন্দিরেই গ্রহণের পর্য্যবেক্ষণ চলিয়াছিল, কিন্তু তাহা হইতে কোনও উল্লেখযোগ্য নূতন তথ্য সংগ্রহ করা যায় নাই।

২। পদার্থ বিজ্ঞান।

নবাবিষ্কৃত অদ্ভুত ধাতু রেডিয়মের পরিচয় পাঠক অবশ্যই অবগত আছেন। ইহা হইতে সর্ব্বদাই কয়েক প্রকার তেজ নির্গত হইতে দেখা যায়। এ পর্য্যন্ত কেহই বিশুদ্ধ রেডিয়ম প্রস্তুত করিতে পারে নাই। এ সম্বন্ধে সকল পরীক্ষা রেডিয়ম ঘটিত যৌগিক পদার্থ লইয়াই চলিতেছিল। সম্প্রতি ফরাসী বিদুষী মাডম্ ক্যুরি বিশুদ্ধ রেডিয়ম প্রস্তুত করিবার এক অভিনব উপায় আবিষ্কার করিয়াছেন। বিশুদ্ধ রেডিয়মকে অবিকৃতাবস্থায় দীর্ঘ-কাল বায়ুতে উন্মুক্ত রাখা যায় না। বায়ুর নাইট্রো-জেনের সংস্পর্শে অতি অল্পকাল মধ্যে রেডিয়ম যৌগিক পদার্থে পরিণত হইয়া পড়ে।

আজ তিন বৎসর হইল, সুবিখ্যাত ইংরাজ রসায়নবিদ্ সার উইলিয়ম র‍্যাম্‌জে (Ramsay) একখণ্ড তাম্রের উপর রেডিয়মের তেজ পাতিত করিয়া, ইহার এক অত্যাশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়াছিলেন। রেডিয়মের তেজের সংযোগে তাম্রের পরমাণুগুলি বিযুক্ত হইয়া এক নূতন লঘুতর পদার্থ উৎপন্ন করিয়াছিল। মেডাম্ ক্যুরি এই অবিষ্কারের সমাচার শ্রবণ করিয়া গত বৎসর ইহা লইয়া গবেষণা আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু রেম্‌জে যে ফল লাভ করিয়াছিলেন উনি পরীক্ষায় সে প্রকার ফল পান নাই। কাজেই র‍্যাম্‌জের আবিষ্কারে সাধারণের সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছিল। গত বৎসরে র‍্যাম্‌জে স্বয়ং আবার সেই পরীক্ষায় নিযুক্ত হইয়া পূর্ব্বদৃষ্ট সকল ব্যাপারই একে একে পুনরায় দেখিতেছিলেন। পরমাণু অবিনাশী এখন আর এ কথা বলা যাইতেছে না। তাম্র জিনিসটা এ পর্য্যন্ত মূল জড়পদার্থ বলিয়াই স্বীকৃত হইয়া আসি-তেছিল। যখন তাহারই পরমাণুর বিয়োগে অপর নূতন লঘুতর ধাতুর উৎপত্তি হইল তখন পরমাণুকে বিয়োগ-ধর্ম্মী বলিয়া স্বীকার করা ব্যতীত আর অন্য উপায় দেখা যায় না। রেডিয়মের তেজ হইতে পটাশিয়াম্, সোডি-য়াম্, এবং লিথিয়াম্ প্রভৃতি আরো কয়েকটি লঘুতর

ধাতুর উৎপত্তি গত বৎসরে ধরা পড়িয়াছে। মূল পদার্থের পরমাণুর এই প্রকার ভাঙাগড়ায় বৈজ্ঞানিক মহলে এক তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। ইহা কোথায় গিয়া শেষ হইবে এখন কোনো ক্রমেই বলা যাইতেছে না।

৩। ব্যোম-বিহার।

আজ কয়েক বৎসর ধরিয়া সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর ব্যোমযান নির্ম্মাণের জন্য ইংলণ্ড, আমেরিকা, ফ্রান্স ও জর্ম্মাণির বৈজ্ঞানিকগণ যে বিপুল অর্থব্যয় ও অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া আসিতেছেন, গত বৎসরে পৃথিবীর নানা অংশে তাহার সার্থকতার চিহ্ন দেখা গিয়াছে। সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর ব্যোমযান বোধ হয় শীঘ্রই মোটর গাড়ীর ন্যায় সুলভ হইয়া দাঁড়াইবে। বৎসরের প্রারম্ভে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব্যোমযান ৩০০০ ফিটের উর্দ্ধে উঠিতে পারিত না। রাইটের দ্বিপক্ষ ব্যোমযান (Wright's biplains) সেদিন প্রায় সাড়ে এগারো হাজার ফিট উপরে উঠিয়াছিল এবং ঘণ্টায় একাত্তর মাইল বেগে চলিয়াছিল। সমগ্র সভ্যজগতের যন্ত্র-শিল্পিগণের সমবেত চেষ্টা এখন ব্যোমযানের উন্নতির জন্যই নিযুক্ত রহিয়াছে। দেশের ধনিগণ এই উদ্দেশ্যে লক্ষ লক্ষ টাকা অকাতরে দান করিতেছেন। সহস্র সহস্র অকৃতকার্য্যতা ও বিঘ্ন এই উৎসাহকে খর্ব্ব করিতে পারিতেছে না।

রেলগাড়ী ও ষ্টীমার যেমন এখন অতি অল্পসময়ের মধ্যে যাত্রীদিগকে দেশদেশান্তরে লইয়া যাইতেছে, ব্যোমযান কেবল সখের জিনিস না হইয়া যে ঐ প্রকারেই সভ্যতার একটা প্রধান অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইবে, গত বৎসরে তাহার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। আরোহী বোঝাই করিয়া জনৈক ব্যোমবিহারী সেদিন দুই ঘণ্টায় প্যারিস হইতে আমিন সহরে উপনীত হইয়াছিলেন। সাধারণ যাত্রীসহ আর একটি ব্যোমযান ক্যালে হইতে ডোভারে উপস্থিত হইতে এখন সাঁইত্রিশ মিনিটের বেশি সময় লয় নাই। সামান্য বৃষ্টি বাত্যায় পূর্ব্বে ব্যোমযানগুলি পথভ্রান্ত ও বিপন্ন হইয়া পড়িত। পক্ষী সকল যে প্রকারে ঝড় বৃষ্টির আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিয়া উড়িতে থাকে বৈজ্ঞানিকগণের চেষ্টায় সেই সকল তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়া পড়ায় এখন প্রবল ঝড়েও উন্নত ব্যোমযানগুলি প্রায় নিরাপদ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

শ্রীজগদানন্দ রায়

অযোধ্যার রাজগণ কি সূর্য্যবংশীয়?

অযোধ্যার রাজগণ সূর্য্যবংশীয়, ইহা একটী স্বতঃসিদ্ধ স্বীকৃত সত্য ও পরিজ্ঞাত তথ্য। বালক, বৃদ্ধ, বনিতা, পণ্ডিত, মূর্খ, বিদ্বান্, গৃহী, সন্ন্যাসী ও শ্মশানগোচর, প্রত্যেক ব্যক্তিই জানেন যে অযোধ্যার রাজগণ সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয়। তবে আবার এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা ও সংশয় কেন? রামায়ণে বাল্মীকি, মহাভারতে মহর্ষি দ্বৈপায়ন এবং পুরাণ নিবহে ব্যাসশিষ্যগণ প্রত্যেকেই যখন উঁহাদিগকে সূর্য্যবংশীয় বলিয়া সূচিত করিয়া গিয়াছেন তখন আবার এ বিষয়ে নূতন প্রশ্নের অবতারণা কেন?

হাঁ আমরাও এই পরিজ্ঞাত সত্যের অপলাপ করিতে প্রস্তুত নহি, কিন্তু বর্ত্তমান রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণ নিবহ, বিশেষতঃ শ্রীমদ্‌ভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থ কাহার লেখনী বিনিঃসৃত তাহা কি কেহ কখন নিজে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন? ইহার প্রত্যেক গ্রন্থই কি প্রক্ষিপ্তবহুল নহে? বাল্মীকির সেই আদি ও অকৃত্রিম রামায়ণ কি ইহজগতে সশরীরে বিদ্যমান আছে? তাহা হইলে প্রচলিত রামায়ণের যুদ্ধ বা লঙ্কাকাণ্ডে কেন এই কথাগুলি স্থান পাইবে?

আদিকাব্যমিদং চার্ষং পুরা বাল্মীকিনা কৃতং। ১০৫
শৃণোতি য ইদং কাব্যং পুরা বাল্মীকিনা কৃতম্। ১১০
শৃণ্বন্তি য ইদং কাব্যং পুরা বাল্মীকিনা কৃতম্। ১১১—১২৮॥

বাল্মীকি কি নিজেই বলিতে পারেন যে, আমি "পুরা" অর্থাৎ পূর্ব্বে এই রামায়ণ নামক আদিকাব্য রচনা করিয়াছি? পাঠমাত্রই মনে হয় ইহা অন্য ব্যক্তি, অর্থাৎ কোন নূতন রিপুকারের উক্তিপরম্পরা

মাত্র। তিনিই বাল্মীকির হনুমানের ল্যাজ দিয়াছেন, তাঁহাকে দিয়া এক লাফে সমুদ্র ডিঙ্গাইয়াছেন ও সীতা-হরণের একটা মিথ্যা পালা বাল্মীকির পবিত্র রামায়ণে প্রবেশিত করিয়া দিয়াছেন। ঐরূপ মহাভারতাদি অন্যান্য গ্রন্থ সমূহও যুগে যুগে বিকৃত হইয়া অবকরভূয়িষ্ঠ ধাপার আকার ধারণ করিয়াছে। শ্রীমদ্‌ভাগবত অবরজ যুগের বোপদেবপ্রণীত সুতরাং সে সম্বন্ধে কোনও কথাই নাই *। যাহা হউক যখন সকল শাস্ত্রের সামঞ্জস্য করিতে গেলে অযোধ্যার রাজবংশকে সূর্য্যবংশ বলিয়া জানা যায় না, তখন আমরা ঋষি বাক্যকে অবহেলা করিয়া দুষ্ট প্রচলিত মতের অনুবর্ত্তনে সমর্থ নহি। তবে মহাকবি কালিদাস কেন বলিলেন যে—

ক সূর্য্যপ্রভবো বংশঃ ক চাল্পবিষয়া মতিঃ? ২—১মস

তত্র মল্লিনাথঃ প্রভবতি অস্মাৎ ইতি প্রভবঃ কারণং (উৎপত্তি স্থানং) সূর্য্যঃ প্রভবো যস্য স সূর্য্যপ্রভবো বংশঃ ক? অল্পঃ বিষয়ঃ জ্ঞেয়ঃ অর্থো যস্যাঃ সা যে মতিঃ প্রজ্ঞা চ ক? দ্বৌ কশব্দৌ মহদন্তরং সূচয়তঃ। সূর্য্য বংশম আকলয়িতুং ন শক্নোমি ইত্যর্থঃ।

সুতরাং বেশ জানা গেল যে স্বয়ং কালিদাস ও মহামতি মল্লিনাথ উভয়েই প্রসন্নহৃদয়ে অযোধ্যার রাজবংশকে সূর্য্যবংশ বলিয়াই অবগত ছিলেন? হাঁ অবশ্যই তাঁহাদিগের অবগতি ঐরূপই ছিল? কিন্তু পক্ষান্তরে স্বয়ং কালিদাস পরক্ষণেই বলিতেছেন যে—

বৈবস্বতো মনুর্নাম মাননীয়ো মনীষিণাম্।
আসীন্ মহীক্ষিতামাদ্যঃ প্রণব শ্ছন্দসামিব॥ ১১
তদন্বয়ে শুদ্ধিমতি প্রসূতঃ শুদ্ধিমত্তরঃ।
দিলীপ ইতি রাজেন্দুরিন্দুঃ ক্ষীর নিধাবিব॥ ১২ ১ম সর্গ।

মহাত্মা বৈবস্বত মনু, মনীষিগণের মাননীয় এবং যে প্রকার ওঙ্কার বেদমন্ত্রসমূহের আদ্য ও পূজার্হ তদ্রূপ উক্ত বৈবস্বত মনুও সমগ্র রাজগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন। তাঁহার বংশে দিলীপনামে এক পবিত্রচেতা রাজা জন্ম গ্রহণ করেন।

সুতরাং কালিদাস যে রাজবংশকে একবার সূর্য্য-প্রভব বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন সেই রাজবংশই আবার তৎকর্ত্তৃক বৈবস্বত মনুর অনন্তরবংশ বলিয়া সংসূচিত হইল ইহা বিরোধ হইতেছে। অবশ্য তোমরা বলিবে যে এখানে বিরোধ কোথায়? কেননা যিনি বিস্বান্ তিনিই সূর্য্য বটেন। উক্তঞ্চ—

সূরঃ সূর্য্যোর্য্যমাদিত্যদ্বাদশাত্মদিবাকরাঃ।
ভাস্করাহস্করব্রধ্নপ্রভাকরবিভাকরাঃ॥
ভাস্বদ্‌বিবস্বৎসপ্তাশ্বহরিদশ্বোষ্ণরশ্ময়ঃ।
বিকর্ত্তনার্কমার্ত্তণ্ডমিহিরারুণপূষণঃ॥
দ্যুমণিস্তরণির্মিত্রশ্চিত্রভানু র্বিরোচনঃ।
বিভাবসু র্গ্রহপতি স্ত্বিষাম্পতিরহঃপতিঃ।
ভানুর্হংসঃ সহস্রাংশু স্তপনঃ সবিতা রবিঃ॥ ইত্যমরঃ।

অর্থাৎ সূর, সূর্য্য, অর্য্যমা, আদিত্য দ্বাদশাত্মা, দিবাকর, ভাস্কর, অহস্কর, ব্রধ্ন, প্রভাকর, বিভাকর ভাস্বান্, বিবস্বান্, সপ্তাশ্ব, হরিদশ্ব, উষ্ণরশ্মি, বিকর্ত্তন, অর্ক, মার্ত্তণ্ড, মিহির, অরুণ, পূষা, দ্যুমণি, তরণি, মিত্র, চিত্রভানু, বিরোচন, বিভাবসু গ্রহপতি, ত্বিষাম্পতি, অহঃপতি, ভানু, হংস, সহস্রাংশু, তপন, সবিতা ও রবি, এই শব্দগুলি এক পর্য্যায়ক ও একার্থবাচী।

হাঁ অমরাদি পুরাণপ্রণেতৃগণের ভ্রান্তির অনুসরণ পূর্ব্বক এইরূপ অর্থেরই বিশ্লেষণ ঘটাইয়াছেন বটে, কিন্তু ইহা অদোষসন্দুষ্ট নহে। জড়সূর্য্যের নাম কোন কারণে অর্য্যমা, আদিত্য, দ্বাদশাত্মা বিবস্বান্, মার্ত্তণ্ড ও পূষা হইতে পারে না। ঐরূপ—

জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিং।
ধ্বান্তারিং সর্ব্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম॥

সকলে যে জড় সূর্য্যকে "কাশ্যপেয়" বলিয়া বিশেষিত করিয়া থাকেন উহাও সর্ব্বথা দোষসমাক্রান্ত পদবী। কেন?

অর্য্যমা, বিবস্বান্, হংস মার্ত্তণ্ড, পূষা, মিত্র, আদিত্য ও কাশ্যপেয় শব্দ কখনই শূন্যবিহারী জড়সূর্য্যের পর্য্যায়ে গৃহীত হইতে পারে না। যিনি দক্ষকন্যা অদিতির অপত্য, তাঁহারই নাম আদিত্য। কিন্তু জড় সূর্য্য যাহা পৃথিবী অপেক্ষাও আকারে চৌদ্দ লক্ষ গুণ বড়, তাহা

* প্রবন্ধ লেখকের এই উক্তি নির্ব্বিবাদে গৃহীত হইবার পক্ষে সংশয় আছে। লেখক এ বিষয়ে যুক্তি ও প্রমাণ দিলে পাঠকবর্গের কৌতূহল পরিতৃপ্ত হইতে পারিত। সঃ সঃ।

দেবমাতা অদিতির গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিতে পারে না। তবে সায়ণ কেমন করিয়া জড় সূর্য্যকে অদিতির অপত্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন?

উদগাৎ অয়মাদিত্যো
বিশ্বেন সহসা সহ। ১৩—৫১ সূ—১ম

তত্র সায়ণভাষ্যম্—অয়ং পুরোবর্ত্তী আদিত্যঃ অদিতেঃ পুত্রঃ সূর্য্যঃ বিশ্বেন সহসা সর্ব্বেণ বলেন সহ উদগাৎ উদয়ং প্রাপ্তবান্। হাঁ সায়ণ ঋগ্‌বেদের এই মন্ত্রের এইরূপ অর্থই করিয়াছেন, কিন্তু আমরা সায়ণের এই ব্যাখ্যা সাধীয়সী বলিয়া মনে করিতে পারি না। আমাদিগের বিশ্বাস এই বৈদিক মন্ত্র স্বতই প্রমাদ-সঙ্কুল। এই সূক্তটী "সৌর্য্য" অর্থাৎ সূর্য্যদেবতাক বলিয়া বিবৃত। সে সূর্য্যও জড় সূর্য্যই বটে। সুতরাং তাহার বিশেষণ "আদিত্য" ও সেই আদিত্যের ব্যুৎপত্তি বা ব্যাখ্যা "অদিতে রপত্যং পুমান্ আদিত্যঃ" হইতে পারে না। তাই মহামতি যাস্ক বৈদিক আদিত্য শব্দের (যাহার অর্থ জড় সূর্য্য) এইরূপ ব্যাখ্যা করিতে বাধ্য হইয়াছেন—

আদিত্যঃ কস্মাৎ? আদত্তে রসান্;
ভানাং জ্যোতিষাং আদীপ্তো ভাসা;
অদিতেঃ পুত্র ইতি বা অল্প প্রয়োগঃ,
দেবতানাম্ আদিত্য প্রবাদাঃ স্তুতয়োভবন্তি।
নৈঘণ্টুকং কাণ্ডম্—৫৮৭ ছ।

জড় সূর্য্যকে আদিত্য বলা যায় কেন? কেননা জড় সূর্য্য পৃথিবীর রস গ্রহণ করে। অথবা যে দীপ্তি দ্বারা সম্যক্ দীপ্ত হয়; অদিতির পুত্র আদিত্য, ইহা অল্প লোকের মত। কেননা দেবতা বলিয়া কোন মূর্ত্ত পদার্থ নাই * দেবগণের আদিত্য প্রবাদ স্তুতিবাক্য মাত্র।

যে রস আকর্ষণ করে, সে আদিত্য, যদি এইরূপ ব্যাখ্যা সঙ্গত হয়, তাহা হইলে জড় সূর্য্যের নামান্তর আদিত্য হউক তাহাতে আমাদিগের আপত্তি নাই। কিন্তু জড়সূর্য্য অদিতির পুত্র বা কশ্যপ নন্দন হইতে পারে না, সুতরাং আদিত্য বা কাশ্যপেয় বিশেষণ যে প্রমাদ ভূয়িষ্ঠ, তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

* এই অংশটুকু উদ্ধৃত যাস্কের বাক্যে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। সঃ, সঃ

ফলতঃ ভারতে এমন একটী যুগ আসিয়াছিল, যখন সকলে তাঁহাদিগের আদিবাসস্থান আদিস্বর্গ বা মঙ্গলিয়ার কথা ভুলিয়া গিয়াছিলেন। তজ্জন্য ভৌমস্বর্গটা পার-লৌকিক হইয়া যায়, ভৌম নরকও প্রোমোশন পাইয়া পারলৌকিকত্ব ধারণ করে। ঐরূপ লোক সকল যখন বেদ বেদান্তের অধ্যয়ন অধ্যাপনা পরিত্যাগ করিলেন, তখন তাঁহারা বেদশাস্ত্রের মর্ম্ম ভুলিয়া যাওয়াতে বেদের দেবতাখ্য, নর সূর্য্য, নর বিবস্বান্, নর মিত্র, নর পূষা ও নর অর্য্যমা প্রভৃতিকে ভুলিয়া যাইয়া ঐসকল নাম নিরপরাধ জড়সূর্য্যে আরোপিত করিয়া বসিলেন। কিন্তু তাঁহারা সকলেই অদিতিনন্দন বা আদিত্য? তজ্জন্য জড়সূর্য্য ও আদিত্য বিশেষণের বিষয়ীভূত হইয়া পড়িলেন, ঋগ্বেদের উক্ত মন্ত্রও সেই ভ্রান্তির যুগে বিরচিত।

অবশ্য তোমরা বলিবে, সেকি কথা মহাপ্রলয় কালে যে দ্বাদশ আদিত্য (সূর্য্য) উদিত হইয়া পৃথিবী ধ্বংস করিবে? সুতরাং আদিত্য অর্থ জড়সূর্য্য হইবে না কেন?

হাঁ পুরাণে ঐরূপ ভাবের কথাই আছে, কিন্তু পৃথিবীর সৃষ্টির পর যে যুগে যুগে মহাপ্রলয়ে উহার ধ্বংশ হইয়া আবার নূতন চন্দ্র সূর্য্যাদির সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা কি কেহ স্বচক্ষে দেখিয়াছেন? তবে কেন ঋগ্‌বেদই বলি-লেন যে—

সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথা পূর্ব্বম্ অকল্পয়ৎ।
দিবং চ পৃথিবীং চান্তরিক্ষ মথো স্বঃ॥
৩—১৯১ সূ—১০।

অর্থাৎ ধাতা পরমেশ্বর পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগের ন্যায় নূতন সূর্য্য নূতন চন্দ্রমাঃ, নূতন দ্যুলোক, নূতন পৃথিবী, নূতন অন্তরিক্ষ ও নূতন স্বর্গের সৃষ্টি করিয়াছেন।

হাঁ ঋগ্‌বেদে ইহা আছে, কিন্তু ইহা পৌরাণিক যুগের (দ্বাপর যুগের) পৌরাণিক ভ্রান্তির সাহায্যে বিরচিত। বস্তুতঃ সৃষ্টির পর মহাপ্রলয় হইয়া নূতন সৃষ্টি হয় নাই। তাহা হইলে ত্রেতা যুগের বিভীষণ কেমন করিয়া রাজসূয়যজ্ঞে উপস্থিত হইলেন? ত্রেতা যুগের বিশ্বামিত্র ও পরশুরামই বা দ্বাপরে। আর দ্বাপরযুগের

যুধিষ্ঠির ও ব্যাসাদিই বা কলিতে বর্ত্তমান থাকিলেন কি প্রকারে ? পরন্তু বৈদিকযুগের মন্ত্রই বলিতেছেন যে—

সকৃৎহদ্যৌ রজায়ত,
সকৃৎ ভূমি রজায়ত।
পৃশ্ন্যাদুগ্ধং সকৃৎ পয়ঃ,
তদন্যো নানুজায়ত ॥
২২—৪৮ সূ—৬ম।

তন্ত্র সায়ণভাষ্যং সকৃৎহ সকৃদেব দ্যৌঃ অজায়ত উদপদ্যত সকৃত্ উৎপন্না এব স্থিতা ভবতি ন পুনস্তস্যাং বিনষ্টায়াং অন্যা তৎসদৃশী দ্যৌর্জায়তে। ভূমিশ্চ সকৃদেব অজায়ত ইত্যাদি।

অর্থাৎ একবার মাত্র স্বর্গ ও ভূমির সৃষ্টি হইয়াছে, একবার মাত্র পৃশ্নীর দুগ্ধ দোহিত হইয়াছিল (অর্থাৎ অন্তরিক্ষের সৃষ্টিও একবার মাত্র হইয়াছিল। তৎপর অন্য কোন স্বর্গাদির সৃষ্টি হয় নাই। অতএব মহাপ্রলয়ও মহাপ্রলয়দ্বারা জগতের বিধ্বংস কাহিনী সম্পূর্ণ ই বেদ-বিরুদ্ধ হইতেছে। তবে দ্বাদশ আদিত্য কথাটীর সৃষ্টি হইল কেন ? দ্বাদশ আদিত্য কথাটা অলীক নহে সে দ্বাদশ আদিত্য দক্ষ কন্যা অদিতির গর্ভে মহাত্মা কশ্যপ ঋষির ঔরসে জাত দ্বাদশ জন সুর বা দেবতা বটেন। উক্তঞ্চ—

ধাতা মিত্রোঽর্য্যমা চেন্দ্রো বরুণঃ সূর্য্য এব চ।
ভগো বিবস্বান্ পূষা চ সবিতা দশমঃ স্মৃতঃ।
একাদশ স্তথা ত্বষ্টা বিষ্ণু র্দ্বাদশ উচ্যতে॥

অর্থাৎ ধাতা (পরমেষ্ঠী ব্রহ্মা), মিত্র, অর্য্যমা, ইন্দ্র, বরুণ, সূর্য্য, ভগ, বিবস্বান্, পূষা, সবিতা, ত্বষ্টা ও বিষ্ণু, অদিতিগর্ভ প্রভব এই দ্বাদশ জন দেবতা দ্বাদশ আদিত্য নামের বিষয়ীভূত।

আচ্ছা এবচনে ত এমন কোন কথা নাই যে আদিত্যেরা অদিতিগর্ভ প্রভব ? তাহা নাই বটে, কিন্তু ধাতা, ইন্দ্র, ত্বষ্টা ও বরুণ এই চারিটী শব্দ কি কোন স্থানে সূর্য্যার্থের অববোধ ঘটাইয়াছে ? তবে দ্বাদশ আদিত্য বলিতে যে মহাপ্রলয় কালীন বারটা জলন্ত সূর্য্য বুঝিতে হইবে তাহার হেতু কি আছে ? অপিচ উঁহারা যে অদিতি সন্তান তাহা মহাভারত ও বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতি প্রত্যেক প্রামাণ্য শাস্ত্রেই বিদ্যমান। বিষ্ণুপুরাণ বলিতেছেন যে—

মারীচাৎ কশ্যপাৎ জাতা স্তেঽদিত্যা দক্ষকন্যয়া।
তত্র বিষ্ণুশ্চ শক্রশ্চ জজ্ঞাতে পুনরেবহি ॥ ১৩০
অর্য্যমা চৈব ধাতাচ ত্বষ্টা পুষা তথৈবচ।
বিবস্বান্ সবিতা চৈব মিত্রো বরুণ এবচ।
অংশো ভগ শ্চাদিতিজা আদিত্যা দ্বাদশস্মৃতাঃ ॥ ১৩১

মরীচিতনয় কশ্যপের ঔরসে দক্ষকন্যা অদিতির গর্ভে প্রথমে অর্য্যমা, ধাতা, ত্বষ্টা, পূষা, বিবস্বান্, সবিতা, মিত্র, বরুণ, অংশ, ভগ, পরে ইন্দ্র ও বিষ্ণু জন্ম গ্রহণ করেন। ইঁহারা অদিতি সন্তান বলিয়াই দ্বাদশ আদিত্য নামের বিষয়ীভূত।

এই বচনে সূর্য্যের নাম নাই তৎপরিবর্ত্তে অংশের নাম রহিয়াছে, কোন কোন গ্রন্থে অংশ আবার অংশু বলিয়া বিকৃত। ইহাতে মনে হয় যে অংশ বা অংশু, পূর্ব্বের নামান্তর মাত্র। মহাভারতাদিতেও এইরূপ বিকৃতি রহিয়াছে। সুতরাং এই বারজন দেবতা যে জড়সূর্য্য নহে এবং ইহার বিবস্বান্ প্রভৃতিও যে জড়সূর্য্যের সহিত সম্পৃক্ত হইতে পারে না তাহা যে কোনও চেতস্বান্ ব্যক্তিই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। আর অমর যে জড়সূর্য্যের নামান্তর "হংস" বলিয়াছেন, উহাও প্রমাদ-গর্ভ। ফলতঃ মানুষ সূর্য্য সামবেদের মন্ত্র সমাহর্ত্তা ও একজন প্রধান দেবতাছিলেন, তজ্জন্য তাঁহার উপাধি "হংস" ছিল মাত্র, উহা জড় সূর্য্যের সহিত সংসৃষ্ট হইতে পারে না। আচ্ছা এই দ্বাদশ অদিতি নন্দনের মধ্যে ত মার্ত্তণ্ডের নাম দেখা গেল না, তবে উক্ত মার্ত্তণ্ড নাম জড়সূর্য্যেরই হউকনা ? না তাহা নহে বেদে মার্ত্তণ্ডের নাম বিবৃত হইয়াছে তাঁহারই নামান্তর বিবস্বান্, পুরাণাদিতে বিবস্বান্ নাম গৃহীত হইয়াছে। উক্তঞ্চ—

দেবানাং নু বয়ং জানা প্রবোচাম বিষাম্যয়া।
উক্থেষু শস্যমানেষু যঃ পশ্যাৎ উত্তরে যুগে ॥ ১

তত্র সায়ণভাষ্যং স ঋষিঃ (বৃহস্পতিঃ) অদিতেঃ সকাশাৎ আদিত্যোৎপত্তি প্রকারমাহ। —বয়ং দেবানাং আদিত্যানাং জানা জন্মানি প্রবোচাম কথয়াম বিষানম্যয়া বিস্পষ্টয়া বাচা ইত্যাদি।

মহর্ষি বৃহস্পতি বলিতেছেন—আমরা এই সূক্তে অদিতনন্দন দেবতাগণের জন্মের কথা বলিব। কেননা বেদমন্ত্রে ইহা বিবৃত থাকিলে পরবর্ত্তী যুগের লোকেরা উহা দেখিয়া জানিতে পারিবেন।

অদিতের্দক্ষো অজায়ত দক্ষাৎ অদিতিঃ পরি। ৪

অদিতি অর্থাৎ পৃথিবী হইতে প্রজাপতি দক্ষ উৎপন্ন হইলেন আবার তাঁহা হইতে দেবমাতা অদিতি জন্ম গ্রহণ করিলেন।

যখন বংশাবলী বা ইতিহাস লিখিত হয় তখন দক্ষ ধর্ম্ম ও স্বায়ম্ভুব মনুর কে কে পিতা—তাহা জানা যায় না বলিয়া দক্ষকে পৃথিবী হইতে উৎপন্ন বলা হইয়াছে।

অদিতির্হি অজনিষ্ট দক্ষা যা দুহিতা তব।

তাং দেবা অন্বজায়ন্ত ভদ্রা অমৃতবন্ধবঃ ॥ ৫

হে দক্ষ!—তোমার যে কন্যা অদিতি তিনি দেবগণকে প্রসব করিয়াছেন। উক্ত দেবগণ ভদ্র ও অমৃত লোকবাসী।

অষ্টৌ পুত্রাসো অদিতের্য জতাস্তম্বঃ পরি।

দেবান্ উপপ্রৈৎ সপ্তভিঃ পরা মার্ত্তণ্ডং আস্যৎ ॥ ৮

অদিতি হইতে আট পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন। অদিতি তন্মধ্যে মার্ত্তণ্ডকে পিত্রালয়ে পরিত্যাগ করিয়া আর সাত পুত্র লইয়া দেবলোকে স্বামিগৃহে গমন করেন।

সপ্তভিঃ পুত্রৈরদিতি রুপপ্রৈৎ পূর্ব্যং যুগং।

প্রজায়ৈ মৃত্যবে ত্বৎ পুন মার্ত্তণ্ড মাভরৎ ॥

৯—৭২ সূ—১০ম

প্রথমে অদিতি সাত পুত্র লইয়া দেবলোকে গমন করেন। কিন্তু মার্ত্তণ্ড ও তাঁহার পুত্র (প্রজা) সে পিত্রালয়ে মারা যাইতে পারে—এইজন্য তাহাকে পুনরায় লইয়া যান।

ঋগ্‌বেদের অন্য বহুমন্ত্রে আছে যে—অদিতি দেবমাতা এবং ধাতা অর্য্যমা, ত্বষ্টা ও মিত্র প্রভৃতি আদিত্যপদভাক্। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে তথাপি যাস্ক ও ভট্ট মোক্ষমূলর প্রভৃতি দেবগণের অস্তিত্বে অনাস্থা প্রদর্শন করিয়াছেন। এখন ভারতসন্তান দত্ত সাহেবও সেই বৈলাতিক মতে সায় দিয়া গিয়াছেন! যাহা হউক আমরা বেদমন্ত্র দ্বারাই জানিলাম অদিতির গর্ভে আটজন দেবতা জন্ম গ্রহণ করেন। সুতরাং তাঁহারা নিশ্চয়ই নর পরন্তু জড় সূর্য্য নহেন; বেদই বলিতেছেন যে মার্ত্তণ্ড নর পরন্তু জড় সূর্য্য নহেন। বাকী সাতজন কে? বেদ তাঁহাদিগের নাম করিলেন না? কেনই বা আর চারিজনের জন্মের কথা বলিতে বেদ বিরত থাকিলেন?

অদিতির বারটী পুত্র একবারে হয় নাই অন্ততঃ বার বারে বহু বৎসরে হইয়াছে।—যেমন হইয়াছে—তেমনই বেদ মন্ত্রে তাহা বিবৃত হইয়াছিল কিন্তু সেই সকল মন্ত্র মহর্ষি অগ্নিদেব বা মহর্ষি অথর্ব্বা সংগ্রহ করিতে না পারায় তৎসমুদয় বিলুপ্ত হইয়াছে। তবে সায়ণ বলিতেছেন যে—অদিতে রষ্টৌ পুত্রাঅধ্বর্য্যু ব্রাহ্মণে পরিগণিতাঃ—তান্ অনুক্রমিষ্যামঃ—

মিত্রশ্চ, বরুণশ্চ, ধাতাচ, অর্য্যমা চ

অংশশ্চ ভগশ্চ বিবস্বান্ আদিত্যশ্চ

অর্থাৎ অদিতি হইতে মিত্র, বরুণ, ধাতা, অর্য্যমা, অংশ, ভগ বিবস্বান্, আদিত্য সবিতা, এই আট পুত্র হয়।

তথাহি তত্রৈব প্রদেশান্তরে অদিতিং

প্রস্তুত্য আম্নাতং তস্যা উচ্ছেষণং অদদুঃ

তৎ প্রাশ্নাৎ সা রেতোঽধত্ত তস্যৈ চত্বার

আদিত্যা অজায়ন্ত। সা দ্বিতীয় মপচৎ

ইত্যাদিনা অষ্টানামাদিত্যানাং উৎপত্তি

বর্ণিতা। তৈত্তিরীয় সংহিতা—৬—৫—৬

তাহা হইলেই দেখা গেল অদিতির প্রথমে চারিটীও পরে আর আটটী মোট বারটী পুত্র হয়। তাঁহারাই দ্বাদশ আদিত্য। বিষ্ণু পুরাণও ঐকারণে বিষ্ণু ও ইন্দ্রের স্বতন্ত্র উৎপত্তি বলিয়াছেন। সুতরাং কশ্যপনন্দন ঐ আদিত্যগণ নরদেবতা এবং ইঁহাদিগের একজনও জড়সূর্য্য হইতে পারেন না। তৎপর বিবস্বান্ ও সূর্য্য যখন দুই সহোদর ভ্রাতা, তখন বৈবস্বত মনুর বংশকে তোমরা কিছুতেই সূর্য্য বংশ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পার না—উক্তঞ্চ দেবীমাহাত্ম্যে—

সাবর্ণিঃ সূর্য্যতনয়ো যো মনুঃ কথ্যতেঽষ্টমঃ।

সূর্য্যের পুত্রের নাম সাবর্ণি, যিনি অষ্টম মনু বলিয়া কথিত। কিন্তু অযোধ্যার রাজবংশ সাবর্ণি মনুর বংশ-

ধর নহেন, পরন্তু বৈবস্বত মনুর অনন্তর বংশ্য। এই বৈবস্বত মনু বিবস্বানের পুত্র এবং তিনি মনুদিগের মধ্যে সপ্তম।

বলিবে তবে পণ্ডিতাগ্রণী লালমোহন বিদ্যানিধি মহাশয় কেন তাঁহার তৃতীয় সংস্করণ সম্বন্ধনির্ণয়ের ৯৬ পৃষ্ঠাতে বলিলেন যে—

"সপ্তম মনু—বৈবস্বত। ইনি বিবস্বৎ—নামক সূর্য্যের ঔরসে তৎপত্নী ছায়ার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন।"

হাঁ তিনি এইরূপ বলিয়াছেন বটে—কিন্তু ইহা অনার্ষ গ্রন্থ ভাগবতের ভ্রান্তির উদ্বমন মাত্র। বিবস্বান্ যে একটা সূর্য্য, এমন কথা বেদ বা অন্য কোন প্রামাণ্য শাস্ত্রে নাই। কৃষ্ণ যজুঃ বলিতেছেন যে—

অদিতিঃ পুত্রকামা সাধ্যোভ্যোদেবেভ্যো
ব্রহ্মৌদনং অপচৎ অস্মৈ উচ্ছেষণং
অদদুঃ তৎ প্রাশ্নাৎ সা রেতঃ অধত্ত
তস্যৈ চত্বার আদিত্যা অজায়ন্ত। সা দ্বিতীয়ম্
অপচৎ সা অমন্যত উচ্ছেষণাৎ মে ইমে
অজ্ঞত যদগ্রে প্রাশিষ্যামি। ইতো মে
বলীয়াংসো জনিষ্যন্ত ইতি সা অগ্রে প্রাশ্নাৎ
সা রেতঃ অধত্ত তস্যৈ ব্যৃদ্ধ মাণ্ড মজায়ত
সা আদিত্যেভ্য এব। তৃতীয় মপচৎ ভোগায়
মে ইদং শ্রান্ত মস্ত ইতি তে অব্রুবন্ বয়ং
বৃণামহৈ যঃ অতো জায়তে অস্মাকং স
একঃ অসৎ যঃ অস্য প্রজায়াং ঋধ্যাতা
অস্মাকং ভোগায় ভবাদিতি। ততো বিবস্বান্
আদিত্যঃ অজায়ত। তস্য বৈ ইয়ং প্রজা
যৎ মনুষ্যাঃ। ৬—৫—৬।

মহীশূর সংস্করণ—১১শ খণ্ড—২৮—৩০ পৃ।

ইহাদ্বারা জানা গেল অদিতি বহুবার গর্ভ ধারণ করিয়া আদিত্যগণকে প্রসব করেন। সাধ্য দেবগণ তাঁহাকে যে যজ্ঞীয় চরুপাক করিয়া দেন, তাহা ভক্ষণ করাতেই তাঁহার গর্ভ হইয়াছিল। এই আদিত্যগণের মধ্যে বিবস্বান্ নামে যে আদিত্য জন্ম গ্রহণ করেন, মনুষ্যগণ, তাঁহারই সন্তান সন্ততি।

এই মনুষ্যগণই বৈবস্বত মনু ও তদ্বংশীয়গণ। সুতরাং বৈবস্বত মনুর বংশপ্রভব রঘুবংশকে কোন কারণে সূর্য্যবংশীয় বলা যাইতে পারে না কেননা তাঁহারা বিবস্বানের পুত্র বৈবস্বত মনুর বংশধর। পক্ষান্তরে বিবস্বানের ভ্রাতা সূর্য্যের পুত্রের নাম সাবর্ণি মনু। অযোধ্যার রাজবংশ তাঁহার অনন্তর বংশ্য নহেন। তবে এভুল হইল কেন? এক সময়ের লোকসকল ভৌম স্বর্গ পিতৃলোক বা পিতৃভূমিও নর বিবস্বান্ ভগ, মিত্র, অর্য্যমা, মার্ত্তণ্ড ও নর সূর্য্যের অস্তিত্ব ভুলিয়া যাইয়া জড় সূর্য্যে তাঁহাদিগের আরোপ করাতে এই প্রমাদ ঘটিয়াছে।

শ্রীউমেশচন্দ্র গুপ্ত বিদ্যারত্ন।

অভিভাষণ। *

"নানা বেদ পুরাণ দর্শনকথা বিজ্ঞান কাব্যস্মৃতি
ছন্দো ব্যাকরণাভিধানগণিতালঙ্কারপারংগতাঃ।
যস্যাস্তে তনয়া গুনৈকনিলয়া বাণীপ্রিয়া সন্ততং
শ্রীমদ্ভারত মাতরং ভগবতীং তাং রত্নগর্ভাম্ভজে॥"

যাঁহার কৃপাবিন্দুঃ—

"বাচালং বিকলং খলং শ্রিতমলং কামাকুলং ব্যাকুলং
চণ্ডালং তরলং নিপীতগরলং দোষাবিলঞ্চাখিলম্॥"

করে, তাঁহারই মঙ্গলময় ইচ্ছায় বঙ্গের বীণাপুত্রগণ বঙ্গ-সাহিত্যের চরণে ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ মানসে, বঙ্গের সুদূর প্রান্তস্থিত মানস-সরোবরোত্থিত পবিত্র ব্রহ্মপুত্র নদের তীরবর্ত্তী, এই ক্ষুদ্র ময়মনসিংহ নগরীতে আগ্রহান্বিত ও ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে সমবেত হইয়াছেন; ইঁহাদের সমাগমে এই নগরী অদ্য পবিত্র তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। অদ্যকার এই মিলন মনমনসিংহের ভবিষ্য ইতিহাসের পৃষ্ঠে একটী চিরস্মরণীয় দিবস বলিয়া প্রকীর্ত্তিত হইবে। ইতিপূর্ব্বে ময়মনসিংহের পক্ষে এই প্রকার ভাগ্যোদয় আর কখনও হয় নাই। মিলন ক্ষেত্র মাত্রই চিরকাল ভারতে তীর্থক্ষেত্ররূপে ঘোষিত হইয়াছে। নৈমিষারণ্য প্রভৃতি ঋষিদিগের মিলনস্থান ভারতের

* ময়মনসিংহে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনীর চতুর্থ বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি সুসঙ্গাধিপতি শ্রীযুক্ত মহারাজ কুমুদচন্দ্র সিংহ শর্ম্মা বি, এ, কর্ত্তৃক পঠিত বক্তৃতা।

পবিত্র তীর্থ। সমাগত ভদ্রমহোদয়গণের অনেকেই বহু ক্লেশ ও অসুবিধা ভোগ করিয়াও, এক মহান উদ্দেশ্যে এখানে উপস্থিত হইয়াছেন, কিন্তু আমরা কি দিয়া আজ তাঁহাদের সমুচিত আদর অভ্যর্থনা করিব, কি উপকরণে অতিথি সৎকার করিব, তাহা উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না; তবে এইমাত্র জানি যে, "গঙ্গা-জলেই গঙ্গা পূজা হয়" সেই ভরসাতে হীনসম্বল হইয়াও, হৃদয়ের অকৃত্রিম ভক্তি উপহার সহ ভক্তবৃন্দের অভ্যর্থনা করিতে সাহসী হইয়াছি; ভরসা করি আমাদের এই উপহার উপেক্ষিত হইবে না। বহুতর যোগ্য ব্যক্তি থাকা সত্ত্বেও আমার উপর অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতির পদ অর্পিত হওয়ায় আমি নিজকে গৌরবান্বিত মনে করিয়াছি; কিন্তু আমি এই বরণীয় পদোচিত কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে পারিব কি না, তাহা বলিতে পারি না। সমগ্র ময়মনসিংহবাসীর পক্ষ হইতে এবং ব্যক্তিগত ভাবে হৃদয়ের কবাট উন্মুক্ত করিয়া মহোদয়গণকে সাদরে অভ্যর্থনা করিতেছি, আপনারা অনুগ্রহপূর্ব্বক সম্মিলনীর শুভ উদ্দেশ্য মনে রাখিয়া আমাদের সর্ব্বপ্রকার ত্রুটি মার্জ্জনা করুন, ইহাই একান্ত প্রার্থনীয়।

বঙ্গসাহিত্য সম্মিলনী আজ চতুর্থ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে, অতএব ইহার এখনও শৈশবাবস্থা। যাঁহার মঙ্গলময় ইচ্ছায় বিগত তিন বৎসর ক্রমান্বয়ে বহরমপুরে, ভাগলপুরে ও রাজসাহীতে ইহার বাৎসরিক অধিবেশন কার্য্য নিরাপদে সম্পন্ন হইয়াছে, তাঁহারই অপার করুণাবলে বর্ত্তমান অধিবেশনের কার্য্যও সুসম্পন্ন হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই এবং সম্মিলন' ক্রমে যৌবন ও প্রৌঢ়াবস্থা অতিক্রম করতঃ পরিণত অবস্থায় উপনীত হইবেন। বাণীবিদ্যাবিধায়িনী, শ্বেতপদ্মাসনা, বীণাপুস্তক-রঞ্জিতহস্তা সর্ব্বশুক্লা বাগ্‌দেবী আমাদের কার্য্যের সহায় হউন।

যে বঙ্গভাষা বহুকাল উপেক্ষিতা হইয়া দীনহীন বেশে বঙ্গগৃহে বিরাজমানা ছিলেন, তিনি সম্প্রতি কোন্ অদৃশ্য মন্ত্রশক্তিবলে উদ্বোধিতা হইয়াছেন; চারিদিক হইতে কি যেন একটা উৎসাহের প্রবল-উদ্দীপনা আসিয়া নিদ্রিতা ভাষাকে জাগ্রত করিয়া তুলিয়াছে। এখন আর তিনি দীনা, কৃশা ও উপেক্ষিতা নহেন, তিনি ক্রমে হৃষ্টা-পুষ্টা লাবণ্যময়ী ও সর্ব্বাভরণভূষিতা হইয়া আমাদের সমক্ষে বরাভয় হস্ত লইয়া তাঁহার লাবণ্যছটায় দিগ্‌দিগন্ত উদ্‌ভাসিত করতঃ কল্যাণময়ী মূর্ত্তিতে দাঁড়াইয়াছেন। আসুন আমরা সকলে তাঁহার শ্রীচরণে ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করি এবং সাষ্টাঙ্গে প্রণত হই, তিনি আমাদের প্রতি কৃপানেত্রে চাহিবেন এবং আমাদের কল্যাণবিধান করিবেন। ভাই বঙ্গবাসিগণ, তোমরা সকলে তাঁহার গলদেশে নানারত্নবিভূষিত কণ্ঠহার পরাইয়া দাও, তিনি জগতের সমক্ষে সাহিত্য-সম্রাজ্ঞীরূপে দণ্ডায়মানা হউন এবং আমরাও তাঁহাকে দেখিয়া দুর্ল‌ভ মানব জন্ম সফল করি!

বঙ্গভাষার ক্ষুদ্র ও বৃহৎ স্রোতঃস্বতী সমূহ, কোনটী বা নির্ম্মল বারিরাশি বহনকরতঃ, কোনটী বা নানাবিধ আবর্জ্জণাপূর্ণ পঙ্কিল জলরাশি ধারণ করিয়া মৃদুমন্দ গতিতে অথবা প্রবল তরঙ্গভঙ্গ বিস্তার করতঃ বঙ্গ-সাহিত্যরূপ বিশাল সাগরাভিমুখে প্রধাবিত হইতেছে; এইগুলির সমস্ত সুস্বাদুতোয়া নহে, তথাপি সকলেরই গতি সাগরাভিমুখী। সাহিত্যসাগরেও নানাবিধ রত্ন ও নক্র কুম্ভীরাদি বর্ত্তমান, কিন্তু সাহিত্যের অতলস্পর্শ জলধিগর্ভ হইতে নিপুণ-রত্নগ্রাহীর ন্যায় বহুমূল্য রত্নরাজি আহরণ করতঃ সুশোভন মাল্য গ্রথিত করিয়া বঙ্গভাষার গলদেশে অর্পণপূর্ব্বক তাঁহাকে অপূর্ব্ব শ্রীসম্পন্ন ও মহিয়সী করিয়া তুলাই আমাদের কর্ত্তব্য, ইহা করিতে পারিলেই আমাদের জাতীয় গৌরব রক্ষিত হইবে এবং সম্মিলনীর জন্মগ্রহণেরও সার্থকতা হইবে।

বঙ্গসাহিত্য ও ভাষা কতকালের এবং তাহার মূল প্রস্রবণ কোথায়, এ সমস্ত তত্ত্বের অনুসন্ধান-প্রয়াস আমার অধিকার বহির্ভূত, অতএব অদ্য এ বিষয়ে কোনও আলোচনা সমীচীন নহে। মহাকবি জয়দেবের মধুর কোমলকান্ত পদাবলী হইতেই যে চিরকোমলতাময়ী সুললিত ভাষা ক্রমে উন্মেষিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে এবং বিদ্যাপতি, চণ্ডিদাস, জ্ঞানদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিগণের অপরিসীম প্রতিভাদ্বারা যে তাহা ক্রমে পুষ্টিলাভ করিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইতঃপর

কৃত্তিবাস, কাশীরাম দাস, ভারতচন্দ্র, দাশরথী রায়, নিধুবাবু প্রভৃতি কবিগণ এবং রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, রাজেন্দ্রলাল মি৷, কালীপ্রসন্ন সিংহ, প্যারিচাঁদ সরকার, অক্ষয়কুমার দত্ত, রঙ্গলাল, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র দত্ত, কালীপ্রসন্ন ঘোষ, হেমচন্দ্র, রজনীকান্ত গুপ্ত, নবীনচন্দ্র, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, রবীন্দ্রনাথ, চন্দ্রনাথ বসু, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, দীনেশ চন্দ্র সেন, অক্ষয়কুমার সরকার প্রভৃতি মহামনস্বী বঙ্গসন্তানগণের অক্লান্ত পরিশ্রমে এবং প্রতিভাবলে বঙ্গভাষা আজ মোহনমূর্ত্তিতে আমাদের নয়ন-পথবর্ত্তিনী হইয়াছেন এবং তাঁহার এই মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিয়া জগৎবাসী বিমুগ্ধ হইয়াছে এবং আমাদের আশা হইতেছে তিনি অচিরাৎ ভাষা জগতে অতি বরণীয় স্থান অধিকার করিবেন।

ভাষার শ্রীবৃদ্ধিসাধন স্বদেশপ্রেমিক ব্যক্তিমাত্রেরই কর্ত্তব্য, বাঙ্গালী হইয়া যিনি বঙ্গভাষার আলোচনায় হতশ্রদ্ধ, তিনি নিতান্ত হতভাগ্য। এতাদৃশ ব্যক্তি অন্য বহু গুণান্বিত হইলেও তিনি প্রশংসার্হ নহেন। বর্ত্তমানকালে আমরা যে প্রবল পরাক্রান্ত, পরমবিদ্যোৎসাহী ও অশেষ জ্ঞানসম্পন্ন জাতির শাসনাধীনে বাস করিতেছি, তাহাদের কৃপায় পৃথিবীর নানাভাষার জ্ঞানভাণ্ডারের দ্বার আমাদের সম্মুখে উন্মুক্ত হইয়াছে, ইচ্ছা করিলেই আমরা ঐ সমস্ত ভাষার রত্নরাজি আহরণ করতঃ বঙ্গভাষার রত্নভাণ্ডার পূর্ণ করিতে পারিব, এই সুযোগ অবহেলায় হারাণ আমাদের দূরদর্শিতা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক হইবে না। পক্ষান্তরে অমৃতনিস্যন্দিনি অনন্ত জ্ঞানের ভাণ্ডার, জগন্মোহিনী সংস্কৃত ভাষার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিলে আমাদিগকে পরিণামে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে। উক্ত ভাষার রত্নসমূহ সংগ্রহ করতঃ পৃথিবীর কত জাতি ধনী হইতেছেন, পক্ষান্তরে সে সমস্ত আমাদের গৃহকোণে ধূলিধূসরিত অবস্থায় হতাদরে ক্রমে বিলয়দশা প্রাপ্ত হইতেছে, ইহা অপেক্ষা পরিতাপের বিষয় আর কি হইতে পারে? সময় থাকিতে সতর্কতাবলম্বন সর্ব্বথা বিধেয়। পৈতৃক সম্পত্তি রক্ষা করিয়া তাহার বৃদ্ধিসাধনচেষ্টাই সুধীজনসম্মত। পরধনে সমৃদ্ধ হওয়া তত সহজসাধ্য নহে।

বঙ্গভাষায় বহু কাব্য, নাটক, উপন্যাস, প্রহসন প্রভৃতি রচিত হইয়াছে এবং হইতেছে, কিন্তু নিতান্ত লজ্জা ও দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, তন্মধ্যে কতক গুলি গ্রন্থের রুচি এতই বিকৃত যে তদ্দ্বারা ভাষার অঙ্গ পুষ্ট না হইয়া পক্ষান্তরে তাহার স্বাস্থ্যহানি হইতেছে এবং দেশেরও মহা অনিষ্ট হইতেছে। সময়োচিত ভেষজ প্রয়োগ দ্বারা স্বাস্থ্যোন্নতি সাধন করিতে না পারিলে ক্রমে ভাষার দুর্ব্বলতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে এবং তাহার দুরবস্থারও একশেষ হইবে। ভরসা করি, সম্মিলনী উপযুক্ত ভেষজ প্রয়োগের চেষ্টা করিবেন। দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, ভৈষজ্যতত্ত্ব-বিষয়ক ও গণিতাদি শাস্ত্রবিষয়ক গ্রন্থ বঙ্গভাষায় বিরলপ্রচার। সুখের বিষয় অধুনা এবম্বিধ গ্রন্থাদি প্রচারের সময়োচিত প্রয়াস দেখা যাইতেছে, ইহা শুভ লক্ষণ বটে। ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, ভূতত্ত্ব, উদ্ভিদতত্ত্ব, রত্নতত্ত্বাদি বিষয়ে কোনও গ্রন্থ অদ্যাপি বঙ্গভাষায় প্রচারিত হয় নাই, কিন্তু বঙ্গের কোনও কোনও সুসন্তান এসকল বিষয় গ্রন্থ প্রকাশেও মনোনিবেশ করিয়াছেন, ভরসা হয় অচিরে বঙ্গভাষার এ সমস্ত অভাব পূর্ণ হইবে। বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক গ্রন্থাদি প্রণয়ন করিতে হইলেই কতকগুলি পারিভাষিক শব্দ সঙ্কলন অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। "বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ও সাহিত্য সভা" প্রভৃতি বোধ হয় এবিষয় সমুচিত চেষ্টা করিবেন এবং করিতেছেন।

প্রাচ্য জ্ঞান (পারমার্থিক জ্ঞান) ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের (জড়বিজ্ঞান, গণিত ও শিল্প শাস্ত্রাদির) সমন্বয় সাধন দ্বারাই সভ্যতার চরমোৎকর্ষ সাধিত হইবে এবং সভ্যতার বোধ হয় ইহাই প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত। ভারতবাসীর পক্ষে এই প্রকার চেষ্টা যত সত্বর ফলবতী হওয়া সম্ভবপর পৃথিবীর অপর কোন জাতির পক্ষে তাহা তত অনায়াসসাধ্য নহে। আমার মনে হয়, বাঙ্গালীই এই সমন্বয়ের প্রথম পথপ্রদর্শক হইবেন এবং ভারতবর্ষে বঙ্গভাষাই এসম্বন্ধে অগ্রগণ্য হইবে। অদ্য যে মহাত্মাকে আমরা সভাপতির পদে বরণ করিতে আহ্বান করিয়াছি এবং যাঁহার ছাত্রগণ মধ্যে আমি

অন্যতম বলিয়া একটু গর্ব্ব করিতেও সাহসী হইতেছি, সেই স্বনামধন্য, বিশ্ববিশ্রুতকীর্ত্তি অধ্যাপিক ডাক্তার শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় তাঁহার অভিনব আবিষ্ক্রিয়া দ্বারা, স্বোদ্ভাবিত অপূর্ব্ব যন্ত্র সাহায্যে ইহাই প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে ভারতের সনাতন বেদবাক্য "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" অকাট্য বৈজ্ঞানিক যুক্তি ও সত্যের দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহাতে তিনি জগতের সমক্ষে ইহাও দেখাইয়াছেন যে হিন্দুর প্রতিভা নির্ব্বাণোন্মুখ হইলেও অদ্যাপি তাহা একেবারে ভস্মীভূত হয় নাই, তাহাতে জ্ঞানের ঘৃতাহুতি প্রদান করিলে তাহা পূর্ব্ববৎ পুনঃ সমুজ্জ্বল হইবে এবং তাহার পবিত্র ও স্নিগ্ধ রশ্মিজালে দিগ্‌দিগন্ত আলোকিত করিতে পারে। "একং সৎ-বিপ্রাবহুধা বদন্তি" এই বৈদিক বাক্যের সত্যতা ক্রমেই পাশ্চাত্য জগতের বৈজ্ঞানিকগণ সপ্রমাণ করিতেছেন। শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের আবিষ্ক্রিয়া তাঁহা-দিগকেও বিস্মিত করিয়াছে। বঙ্গের সুসন্তানের এই কীর্ত্তি তাঁহাকে অমর করিবে।

এইজন্যই বলিতে সাহসী হইয়াছি যে বঙ্গবাসীই সর্ব্বদা জ্ঞানবিজ্ঞানের সমন্বয় প্রদর্শনের পন্থা দেখাইবেন। সেদিন বোধ হয় বহুদূরবর্ত্তী নয়, যেদিন পৃথিবীর একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" এই গভীর বেদবাক্য মেঘমন্দ্র স্বরে প্রতিধ্বনিত হইবে এবং ভারতবর্ষীয় আর্য্য ঋষিগণ যে এক সময়ে জ্ঞানের উচ্চ সীমায় উপনীত হইয়াছিলেন তাহাও সর্ব্ববাদী-সম্মতরূপে স্বীকৃত হইবে এবং সমগ্র জগৎ বিস্ময়ে তাহা-দের চরণে ভক্তিভাবে প্রণত হইবে।

আজিকার আনন্দের দিনে পূর্ব্ববঙ্গের সাহিত্য-সম্রাট্ ৺রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর যদিও নশ্বর দেহে আমাদের মধ্যে বর্ত্তমান নাই, তথাপি তাঁহার অমর আত্মা মানব চক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া যে আমাদের এই সম্মিলনীর উপর কৃপাদৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন না এবং আমাদের উপর অমোঘ আশীর্ব্বাদরাশি বর্ষণ করিতেছেন না তাহা কে বলিতে পারে? চন্দ্রকান্তের প্রতিভার স্নিগ্ধোজ্জ্বল রশ্মিজাল চিরতরে তিরোহিত হইলেও, তাহার কিরণচ্ছটায় যে বঙ্গের প্রতিগৃহ আলোকিত হইয়াছে তাহা নিভিয়া যাইবে না। রজনীকান্তের বীণা নীরব হইলেও তাঁহার বাণী আজও আমাদের "কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়া" প্রাণ মন আকুল করিতেছে। চন্দ্রনাথের গভীর গবেষণার গম্ভীর ধ্বনি অদ্যাপি আমাদের কর্ণকুহরে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। ইঁহারা সকলেই শান্তিধামে চলিয়া গিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের যশোরাশি চিরকাল তাঁহাদিগকে অমর করিয়া রাখিবে। অতএব এই আনন্দের দিনে তাঁহাদের জন্য আর অশ্রুপাত করিয়া তাঁহাদের আত্মার অকল্যাণ সাধন করিতে ইচ্ছা করি না। "জাতস্য হি ধ্রুবং মৃত্যু ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য হি" এই ভগবদ্‌বাক্য মনে রাখিয়া শোক সম্বরণ করতঃ ভগবানের নিকট করযোড়ে প্রার্থনা করিতেছি যে অচিরে ইঁহাদের স্থান ও অভাব পূর্ণ হউক, ভগবান আমাদের কাতর প্রার্থনা অবশ্য শুনিবেন।

আমি অনেক অপ্রাসঙ্গিক কথার অবতারণা করতঃ আপনাদের অমূল্য সময় নষ্ট করিয়াছি, এইজন্য সমবেত ভদ্রমহোদয়গণের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

বঙ্গসাহিত্যের তরুমূলে সুশীতল বারি সেচন মানসে যে সমস্ত মহাজন সমবেত হইয়াছেন, তাঁহাদের ঐকান্তিক আগ্রহে এবং প্রযত্নে এই তরু শাখাপ্রশাখা বিস্তার করতঃ অচিরে মুকুলিত হউক এবং তাহা কালে সুদৃশ্য পুষ্পে বিশোভিত এবং সুমধুর ফলভরে অবনত হইয়া তাহার স্নিগ্ধছায়া দানে বঙ্গসন্তানগণকে অপার শান্তি প্রদান করুক, ইহাই ভগবানের নিকট প্রার্থনা। বাণীচরণাশ্রিত বাণীপুত্রগণের মনোবাঞ্ছা অবশ্যই পূর্ণ হইবে। কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদনেই আমাদের অধিকার-মাত্র, ফলাফল তাঁহারই হাতে। আসন গ্রহণ করার পূর্ব্বে "অয়মারম্ভঃ শুভায় ভবতু" বলিয়া পুনরপি সমাগত ভদ্রমণ্ডলীকে সাদর-অভ্যর্থনা জানাইতেছি, এবং উপ-সংহারে নিবেদন করিতেছি যে—

"যং শৈবাঃ সমুপাসতে শিব ইতি ব্রহ্মেতি বেদান্তিনো,
বৌদ্ধা বুদ্ধ ইতি প্রমাণ পটবঃ কর্ত্তেতি নৈয়ায়িকাঃ।
অর্হন্নিত্যথ জৈনশাসনরতাঃ কর্ম্মেতি মীমাংসকাঃ,
সোঽয়ং বো বিদধাতু বাঞ্ছিত ফলং ত্রৈলোক্যনাথো হরিঃ॥"

বিস্তারেনালমিতি—

শ্রীকুমুদচন্দ্র সিংহ শর্ম্মণঃ।

সাহিত্য-সম্মিলনের প্রতিষ্ঠাতা—

মহারাজা শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
(প্রথম সভাপতি)

শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায়।
(দ্বিতীয় সভাপতি)

মহারাজা কুমুদচন্দ্র সিংহ বাহাদুর।

শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র।
(তৃতীয় সভাপতি)

শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু
(চতুর্থ সভাপতি)

SREENATH PRESS, DACCA.

১ম খণ্ড। ঢাকা, জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৮ সাল ২য় সংখ্যা

গীত-গৌরাঙ্গ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

তৃতীয় স্তবক।

"যে মাধুরী ধরণীর নয়ন জুড়ায়,
কেহ আহা দেখিল না তারে ;"—

যে আপনি ভাল, তাহার সকলই ভাল হয়। ভাল যেন সকল দিকের ভাল ভাব, ভালবাসা, ভাল কথা, আপনাতে আপনি, কেমন এক আকর্ষণী দ্বারা, টানিয়া আনে। ইহার দৃষ্টান্ত স্থল,—নবদ্বীপ-নগরের লোক-সমুদ্রের মধ্যে—শচীর ক্ষুদ্র সংসার। সমুদ্রে যেমন মকর, কুম্ভীর, হাঙ্গর ও তিমি-প্রভৃতি ভয়ঙ্কর জীবসকল, এ দিকে, ও দিকে, ঘুরিয়া বেড়ায়, এবং মানুষ পাইলে একই গ্রাসে তাহার সর্ব্বনাশ করে ; গৌরাঙ্গের সময়ে, নবদ্বীপেও ঐরূপ নানা শ্রেণীর ভয়ঙ্কর লোকের বসতি ছিল। যেখানে অসংখ্য লোক বসতি করে, সেখানে সকল সময়েই ঠিক এইরূপ ঘটিয়া থাকে। বঙ্গের পুরাতন রাজধানী, বহুলোকপূর্ণ নবদ্বীপ যে, সে সময়ে, নানা প্রকার ভয়াবহ ও নিন্দিত ব্যক্তির অবিচার ও অত্যাচারের বোঝায় নিপীড়িত থাকিত, ইহা কোন অংশেও একটা বিচিত্র কথা নহে।

ফলতঃ, তখনকার নবদ্বীপ, সত্য সত্যই, সমস্ত বঙ্গে, 'কুতর্কের কেল্লা' বলিয়া পরিচিত ছিল। নবদ্বীপের শত শত লোক ঘোরতর নাস্তিক। যাহারা আস্তিক, তাহাদিগের মধ্যেও শত শত লোক, অনাচার ও জীবনের অপব্যবহারে, নাস্তিকেরও আচার্য্যগুরু। বহু লোকেরই ললাটে সুদৃশ্য দীর্ঘ-ফোঁটা শোভা পাইত ; অথচ তাহাদিগের লোক-পীড়নী ক্রূরমতি প্রতিবেশীদিগকে সকল সময়েই প্রাণের ভয়ে শঙ্কিত রাখিত।

এহেন নবদ্বীপের মধ্যে শচীর সেই ক্ষুদ্র সংসার, কেমন করিয়া, ক্ষুদ্র একটি শান্তি-নিকেতন, অথবা ভক্তি ও প্রীতির আনন্দকাননের ন্যায়, ধীরে ধীরে সুপ্রতিষ্ঠিত হইল, তাহা চিন্তা করিলে চিত্ত বিস্ময়ে অভিভূত হয়। তাই বলিয়াছি, যে আপনি ভাল, তাহার সকলই ভাল হয়। শচী আপনি যেমন তুলসী-চন্দনের মত পবিত্র-স্বভাবা এবং পর-দুঃখ-কাতরা দেবতা ছিলেন, গৃহস্বামী জগন্নাথ মিশ্রও সেইরূপ শুদ্ধ, শান্ত, শিষ্টমতি ও সরল চরিত্র ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বলিয়া সকলেরই প্রীতি লাভ

করিয়াছিলেন। বাড়ীর তৃতীয় ব্যক্তি ঈশান, সাধারণ সেবক হইয়াও, শুধু চরিত্রের গুণেই সকলের কাছে ব্রাহ্মণের মত আদর পাইতেন।

শচীর গৃহে সতত যাঁহাদের যাতায়াত হইত, তাঁহারাও সকলেই সুখ-প্রফুল্ল, সর্ব্ব-জন-প্রিয়, ভালমানুষ গোছের লোক ছিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে, শ্রীবাস পণ্ডিতের স্ত্রী মালিনী দেবীর নাম বিশেষরূপে স্মরণীয়। মালিনী দেবী শচীর সখী বলিয়া পরিচিত ছিলেন। এ দেশে এখনও মেয়েদিগের মধ্যে এইরূপ সখীত্ব সর্ব্বদা দৃষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু শচী আর মালিনী শুধু কথার কথায় সখী ছিলেন না। তাঁহারা পরস্পরের সখী ছিলেন প্রাণে প্রাণে, এবং দুইটি প্রাণের গভীর ভালবাসার টানে। মালিনী দিনের মধ্যে দশবার আসিয়া শচী এবং তাঁহার সাধের ধন বিশ্বরূপ ও গৌরাঙ্গের সংবাদ লইতেন; এবং শচীও সুযোগ পাইলেই মালিনীকে যাইয়া দেখিয়া আসিতেন

মালিনীর আকর্ষণে, শ্রীবাস পণ্ডিত, এবং তদীয় অনুজ শ্রীনিধি, শ্রীরাম, এবং শ্রীকান্ত পণ্ডিতও সর্ব্বদাই শচীর গৃহে যাতায়াত করিতেন। শচীর এক সহোদর ছিলেন তাঁহার নাম বিষ্ণুদাস পণ্ডিত। শচীর এক ভগিনীপতি ছিলেন, তাঁহার নাম নন্দন আচার্য্য। বিষ্ণুদাস আর নন্দন, বুদ্ধির প্রখরতার জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধ না হইলেও, শচী ও জগন্নাথের অকৃত্রিম ভালবাসার জন ছিলেন। শচী ও জগন্নাথের আর এক সুহৃৎ ছিলেন মুরারি গুপ্ত নামক চিকিৎসক। মুরারি গুপ্ত চট্টগ্রাম নিবাসী বৈদ্য সন্তান; সম্প্রতি জগন্নাথ মিশ্রের ন্যায় নবদ্বীপে উপনিবিষ্ট। মুরারিও, প্রয়োজন ঘটিলেই, শচী ও তাঁহার সুকুমার বালক দুইটিকে দেখিয়া যাইতেন।

এই বালক দুইটির মধ্যে ইদানীং সকলেরই বিশেষ দৃষ্টি বিশ্বরূপের উপর। বিশ্বরূপের বয়স এক্ষণ ষোল বৎসরের বেশী না হইলেও, তিনি রূপে, প্রস্ফুট ও পূর্ণ-বিকশিত যুবার ন্যায়, সকলের দর্শনীয় হইয়াছিলেন; এবং ঐ বয়সেই, নবদ্বীপের পণ্ডিত-সমাজে, সুপণ্ডিত বলিয়া প্রশংসা লাভ করিয়াছিলেন। সুতরাং, কিবা বেশিগণ, সকলেই সর্ব্বদা বিশ্বরূপের বিবিধ কথা লইয়া আলোচনা করেন।

জগন্নাথ মিশ্র এখন এক প্রকার বৃদ্ধ হইয়াছেন। তাঁহাকে তাঁহার বৃদ্ধকালে প্রতিপালন করিবে কে? আর, তাঁহার অভাব হইলেই বা সংসার রক্ষা করিবে কে? সকলই করিবে বিশ্বরূপ। বিশ্বম্ভর গৌরাঙ্গ, রূপের উজ্জ্বলতায়, নবদ্বীপবাসী শত শত নর-নারীর নয়ন ও মন আকর্ষণ করিয়া থাকিলেও, সকলের কাছেই যার-পর-নাই অশান্ত, উচ্ছৃঙ্খল ও চঞ্চল বালক বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। তিনি মুহূর্ত্তের তরেও কোথাও স্থির হইয়া থাকিতে পারেন না। শচীর সে বড় আদরের অবোধ নিমাইকে, সুমতি ও সুশিক্ষার পথ লওয়াইয়া, মানুষ বানাইবে কে? তাহাও করিবে বিশ্বরূপ। কেন না, সকলেই দেখিতে পান, বিশ্বরূপ কাছে আসিলেই, গৌরাঙ্গ তাঁহার সমস্ত চঞ্চলতা বিস্মৃত হন, এবং নিতান্ত শিষ্ট শান্ত বালকটির মত, পাছে পাছে চলিয়া, দাদার আজ্ঞা পালন করেন। শচী যখন গৌরাঙ্গের এই বিচিত্র ব্যবহার চক্ষে দেখিতেন, তখন তাঁহার চিত্তে আনন্দ আর ঠাঁই পাইত না। তিনি তখন তাঁহার মায়ের প্রাণে মুচ্‌কি হাসি হাসিতেন, এবং বিশ্বরূপই গৌরাঙ্গের উপযুক্ত ঔষধ, ইহা মনে করিয়া আনন্দে উচ্ছ্বসিত রহিতেন।

বিশ্বরূপকে কত দিনে বিবাহ করাইবেন, আর কত দিনে ঘরে পুত্রবধূ আনিয়া, এবং পুত্রবধূর প্রফুল্ল মুখ দেখিয়া, প্রাণ জুড়াইবেন, ইহাই এক্ষণ দিবা নিশি শচীর জল্পনা ও কল্পনা। জগন্নাথ মিশ্র শচীর মনোগত ভাব বুঝিতে পারিলেন, এবং বুঝিতে পারিয়া, নবদ্বীপে কার ঘরে, বিশ্বরূপের অনুরূপা সুন্দরী বালিকা আছে, গোপনে তাহার অনুসন্ধানে রহিলেন।

এদিকে, বিশ্বম্ভর-গৌরাঙ্গের বয়স পাঁচ বৎসর পার হইয়া যাইতেছিল বলিয়া, তাঁহার হাতে খড়ি অথবা বিদ্যা-রম্ভের অনুষ্ঠান হইল; এবং সেই উপলক্ষে, শচীর পিতা বৃদ্ধ নীলাম্বর, শচীর ভ্রাতা বিষ্ণুদাস, শচীর ভগিনীপতি চন্দ্রশেখর আচার্য্যরত্ন ও সখীপতি শ্রীবাস পণ্ডিত প্রভৃতি

তাঁহাদিগের মধ্যে, বিশ্বরূপের বিবাহ প্রসঙ্গেও, নানারূপ আলোচনা হইতে লাগিল। বিদ্যারম্ভের দিবস শ্রীগৌরাঙ্গের আনন্দ ও উৎসাহের আর সীমা রহিল না। তাঁহার ইচ্ছা যে, তিনি একই দিনে, সমস্ত বিদ্যা উপার্জ্জন করিয়া, পিতা মাতার চিত্তরঞ্জন করেন। তাঁহার এ ভাব দেখিয়া, শচী ও জগন্নাথ যার-পর-নাই সুখী হইলেন; এবং জ্ঞান-গম্ভীর বিশ্বরূপও বিশেষ প্রীতি লাভ করিলেন।

ইহার কিছুদিন পরে, একদিন জগন্নাথ মিশ্র বেলা দ্বিপ্রহরের সময়, নিতান্ত ক্ষুধার্ত্ত হইয়া বাড়ী আসিয়াছেন। ইচ্ছা করিয়াছেন, স্নানাহার করিয়া, একটুকু বিশ্রাম করিবেন। কিন্তু শচীর মলিন মুখ দেখিয়া, তিনি মনে একটুকু বিষণ্ণ হইলেন। শচী বলিলেন, বিশ্বরূপকে ডাকিয়া আনিবার জন্য, নিমাই তাহার অধ্যাপকের টোলে গিয়াছিল, সেখানে তাহাকে পায় নাই। বাছা আমার এই দুই প্রহর বেলার সময় স্নানাহার না করিয়া, কোথায় গেল? শচীর কথা শুনিয়া জগন্নাথও চিত্তে বড় বেশী চিন্তিত হইলেন। চিন্তিত হওয়ার বিশেষ কারণ ছিল। জগনাথ মিশ্র জানিতেন বিশ্বরূপ প্রস্তর-মূর্ত্তির মত স্থির ও ধীর। তিনি অধ্যাপকের টোল ও আপনার বাড়ী ছাড়িয়া, এমন সময়ে, উত্তরে কিংবা দক্ষিণে, এক পাও কখনও যান না। তবে তিনি কোথায় গেলেন! বাড়ীতে বিগ্রহ রহিয়াছে। বিশ্বরূপই প্রতিদিন গঙ্গাস্নান করিয়া বিগ্রহের পূজা করেন। জগন্নাথ শুনিয়া বিস্মিত হইলেন যে, আজি এখন পর্য্যন্তও বিগ্রহের পূজা হয় নাই। ইহারই বা কারণ কি?

> "দ্বিতীয় প্রহর বেলা, কেনে পুত্র না আইলা,
> পিতা মাতা চিন্তিত হৃদয়।
> জগন্নাথ খোঁজ করে, চাহে প্রতি ঘরে ঘরে,
> না পাইল আপন তনয়।" (লো)

হায় কি হইল? বিশ্বরূপ কোথায় গেল? বিশ্বরূপের অন্বেষণে একদিকে ছুটিয়াছেন, জগন্নাথ, আর একদিকে ছুটিয়াছেন ঈশান। আর, বাড়ীর আশে পাশে, দাদা বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতেছেন গৌরাঙ্গ। কেহ স্নাত, কেহ অস্নাত—সকলেই অভুক্ত। কেহই বিশ্বরূপের কোন অনুসন্ধান পাইতেছেন না। শচী পূর্ব্বেই অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া রাখিয়া ছিলেন। তিনি এক্ষণ সে কথা বিস্মৃত হইয়া, বাড়ীর বহিরঙ্গনে, বিগ্রহ-মন্দিরের দুয়ারে, একাকিনী একটা উন্মত্তার ন্যায় বসিয়া আছেন। মুখে কথা নাই। চক্ষেও জল নাই। মনে নানা প্রকার মন্দ কল্পনা উপস্থিত হইতেছে। তিনি সে সকল কথা মনের মধ্যে চাপিয়া রাখিয়া, অস্ফুট-স্বরে 'মধুসূদন মধুসূন' বলিয়া ডাকিতেছেন, আর মাঝে মাঝে এদিক্ ওদিক্ তাকাইতেছেন।

এইরূপ অকথ্য যম-যন্ত্রণায়, প্রহরেক কি ছয় দণ্ড, মুহূর্ত্তের মত, চলিয়া গেল। প্রায় এক প্রহর পরে মিশ্র ঠাকুর, ধীরে ধীরে—অতি-ধীর-পদ-ক্ষেপে, বাড়ী ফিরিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া সকলেরই বোধ হইল, তিনি আর সে জগন্নাথ মিশ্র নহেন। যেন এই অল্প সময়ে, তাঁহার অর্দ্ধেক পরমায়ু ফুরাইয়াছে। তাঁহার বুদ্ধি ও স্মৃতি উড়িয়া গিয়াছে। তিনি শচীর কাছে যাইয়া কি কহিবেন? কোথাও ত বিশ্বরূপের কোন সংবাদ পাইলেন না। তাঁহার বিশ্বরূপ কি গঙ্গায় ডুবিল? বিশ্বরূপের সে সোনার তনু কি মকর-কুম্ভীরের উদরস্থ হইল? মিশ্র-ঠাকুর বাড়ীর নিকটে যাইয়া স্তব্ধের মত বসিয়া রহিলেন। শচী যেখানে উন্মাদিনীর মত ঊর্দ্ধনেত্রে বসিয়া আছেন, সেখানে যাইতে সাহস পাইলেন না।

কিছু ক্ষণ পরে, বেচারা ঈশান, অশ্রু-পূর্ণ-নয়নে, বাড়ীতে ফিরিল। ঈশানের সঙ্গে, প্রতিবেশীরাও অনেকে, ক্রমে আসিয়া যুটিল। সকলেরই মুখ বিষণ্ণ, চক্ষু ছল-ছল। মিশ্র ঠাকুরকে সকলে ধরাধরি করিয়া, যেখানে শচী, সেখানে লইয়া গেল। কিছু ক্ষণ কানাকানির পর, প্রকৃত কথাটা প্রকাশ হইয়া পড়িল। বিশ্বরূপ বিবাহে বিমুখ, বৈরাগ্যে কৃতসংকল্প;—অথচ বাড়ীতে থাকিয়া বিবাহ না করিলে, পাছে মা হৃদয়ে ব্যথিত হন, ইহা মনে করিয়াও চিন্তান্বিত। তিনি, এই হেতু, প্রভাত-সময়ে, পিতা মাতার নিকট জন্মের মত বিদায় লইয়া, গঙ্গা পার হইয়াছেন, এবং গঙ্গার পর পারে যাইয়াই, এক সন্ন্যাসী গুরুর নিকট, সন্ন্যাস-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া, আপনার পথে চলিয়া গিয়াছেন।

"বিবাহ করিব আমি নহে ত উচিত,
নহে বা জননী দুঃখ পান বিপরীত।
এই মনে, অনুমানে, রাত্রি সুপ্রভাতে,
বাহির হইয়া গেলা পুথি বাম হাতে।
গঙ্গাজল সন্তরণ করি পার হৈল।
গত মাত্র মহাশয় সন্ন্যাস করিল।
জনে জনে কানাকানি, কার্য্য হইল জানাজানি,
বিশ্বরূপ সন্ন্যাস ধারণ;
তোকানি মোকানি কথা, শুনে জগন্নাথ পিতা,
আচম্বিতে হরিল চেতন।" (লো)

তখনকার দিনে, সন্ন্যাস-গ্রহণ, সংসারীর পক্ষে, এক প্রকার মৃত্যু-স্বরূপ ছিল। কারণ, যিনি সন্ন্যাসী হইতেন, তাঁহার আর, পিতা মাতা অথবা সমাজ ও সংসারের সহিত, কোন প্রকার সংস্রব থাকিত না। তাঁহার পুরাতন নামটি পর্য্যন্ত লোপ পাইত, এবং নূতন আর একটি নাম হইত। বিশ্বরূপের নাম হইয়াছিল শঙ্করারণ্য। যখন শচী ও জগন্নাথ দুইয়েই সেই সন্ন্যাসের বিবরণ শুনিলেন, তখন দুই জনেই হা! হা! বিশ্বরূপ বলিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া মাটীতে পড়িয়া গেলেন। জগন্নাথের ক্ষণ কাল পরে চৈতন্য হইল; কিন্তু অভাগিনী শচী, কএকটি বৎসরের সামান্য একটুকু সুখ-শান্তির পরে, এই অকস্মাৎ বজ্রাঘাতে, একবারে অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। তিনি, চৈতন্যলাভের পর, "আমার বাবারে, আমার বিশ্বরূপ ধনরে" এইরূপ বলিয়া বলিয়া, বিনাইয়া বিনাইয়া, যে ভাবে কাঁদিতে লাগিলেন, তাহা শুনিয়া প্রতিবেশীরাও কাঁদিয়া আকুল হইল।

"তবে শচী ইহা শুনি, মূর্চ্ছিত পড়িলা ভূমি,
অন্ধকার হৈল ত্রিজগৎ।
বিশ্বরূপ বলি ডাকে, আইস পুত্র দেখি তোকে,
কি লাগিয়া হৈলা বিরকত॥
সে হেন সুন্দর গা, সে হেন সুন্দর পা,
কেমনে হাঁটিয়া যাবে পথে।
প্রহরের ভোগ তুমি তিলেক সহিতে নার,
আখুটি করিবে আর কাথে।" (লো)

জগন্নাথ মিশ্র, অন্তরে হাঁড়ে পাঁজরে দগ্ধ হইলেও, বাহিরে কিছুক্ষণ একটুকু সুস্থিরের ভাব ধারণ করিলেন, এবং শচীকে নানা প্রকার সান্ত্বনা দান করিতে লাগিলেন। বলিলেন,—ধন্য সেই পিতা মাতা, যাহাদিগের পুত্র, পৃথিবীর মায়া মোহ ছিঁড়িয়া ফেলিয়া, সন্ন্যাস গ্রহণ করে। তাহাদিগের ত্রিকোটি কুল পর্য্যন্ত নিস্তার পাইয়া যায়। আকুল ও আত্মহারা জগন্নাথ, এইরূপ বহু কথা কহিয়া শচীকে বুঝ দিতে চেষ্টা করিলেন বটে; কিন্তু মায়ের অবোধ প্রাণ কি এ সকল কথায় প্রবোধ পাইল? না জগন্নাথ নিজেই চিত্তে সুস্থির হইলেন? বালক বিশ্বম্ভরও, ভ্রাতৃহারা হইয়া, কাঁদিয়া অধীর। তিনি একবার ভাইয়ের জন্য আকুলপ্রাণে ও উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতেছেন;—আবার মায়ের কোলে বসিয়া, পিতা মাতা উভয়কেই সান্ত্বনা ও সাহস দিতে যত্ন করিতেছেন। তাঁহার তখনকার সেই ভাবটি বড়ই হৃদয়হারী ও মধুর।

"বিশ্বম্ভর হেন কালে, বসিয়া মায়ের কোলে,
নেহারয়ে বাপের বদন।
কতি গেলা মোর ভ্রাতা, শুন শুন পিতা মাতা,
আমি তব করিব পালন॥" (লো)

প্রতিবেশীরা বিশ্বম্ভরকে নিকটস্থ কোন বাড়ীতে নিয়া এক মুষ্টি খাওয়াইলেন। কিন্তু শচী ও জগন্নাথ তেমনই পড়িয়া রহিলেন। কখনও উঠিতেছেন, কখনও বসিতেছেন, কখনও কখনও উন্মত্তের মত 'ইতি উতি' চাহিতেছেন;—কখনও আবার নয়ন জলে ভাসিয়া, শোকের আবেগে রুদ্ধ-কণ্ঠ হইয়া, শয্যায় ঢলিয়া পড়িতেছেন। শচীর গৃহে, সে দিন কেহই কাহাকেও, অন্ন-জল-গ্রহণের জন্য, অনুরোধ করিতে সাহস পাইলেন না। নিদ্রাও কাহারও প্রাণে, ক্ষণকালের তরে, শান্তিদানে সমর্থ হইল না। দিবসের অবশিষ্ট সময়, কেমন যেন একটা স্বপ্নের মত, আপনা হইতে চলিয়া গেল। শচী, চির-শোকাতুরা কুররীর ন্যায়, সমস্তটা রাত্রি 'অহ হ' ধ্বনিতে বিলাপ ও পরিতাপ করিয়া অতিবাহিত করিলেন।

(ক্রমশঃ)

জাতীয় উৎকর্ষ।

আবশ্যকতা।

কাজ মানুষেই করে, তা' নিজের কাজই হউক বা সমাজের কাজই হউক। বিধি নিষেধ যত প্রকার প্রস্তুত করা যাউক, নিয়ম যত রকম রচনা করা হউক, কাজ ও-সকলে করিবে না। কাজ করিবে মানুষে। মানুষ বা মনুষ্য সমাজ ভাল মন্দ হয় কাজে; ভাল কাজ করিলে ভাল, মন্দ কাজ করিলে মন্দ বলা হইয়া থাকে। সব বিষয়ের ন্যায়, জাতীয় বিষয়েও উৎকর্ষ বা অপকর্ষ কর্ম্মসাপেক্ষ; আর কর্ম্ম যখন মানুষ ভিন্ন ভূতে করিয়া দিবে না, তখন কর্ম্মী মানুষ গড়িতে জানিলেই কর্ম্ম নিষ্পন্ন হইবে, নচেৎ হইবে না। সৎকর্ম্মী গড়িতে জানিলে মনুষ্য সমাজের উৎকর্ষ হইবে, আর অসৎ-কর্ম্মী গড়িলে অপকর্ষ হইবে। মানুষই সমাজকে বড় করে, মানুষই ছোট করে। এ নিমিত্ত সমাজের উন্নতিকামী ব্যক্তি এই বিষয় সর্ব্বাগ্রে আলোচনা করিবেন।

কর্ম্ম।

কোন জাতি উন্নত হইতেছে, কেহ পতিত হইতেছে; কেহ বা এক সময় যেমন উন্নত হইতেছে, অপর সময় তেমন হইতেছে না। ইহার কারণ অনুসন্ধান করা কঠিন। মহাত্মা ডারুইন্ এক স্থলে বলিতেছেন যে, উন্নতি জনসংখ্যা বৃদ্ধির উপর, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন ও সুনীতি পরায়ণ ব্যক্তিগণের সংখ্যার উপর এবং তাহাদিগের উচ্চ আদর্শের উপর নির্ভর করে *। প্রকৃত পক্ষেও ইহার অধিক বেশী কিছু বলা যায় না। বুদ্ধিমান, নীতিমান, ও উচ্চ আদর্শ সম্পন্ন সুস্থকায় ব্যক্তি সমাজের উৎকর্ষ বিধান পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক। কিন্তু কোন সমাজেই তাঁহাদের সংখ্যা অধিক নহে। ইঁহারা শ্রেষ্ঠ; অপরের ইঁহাদিগের অনুসরণ করিবার যোগ্য হওয়া চাই। ইঁহারা অনুষ্ঠান করিবেন, অপরে তাহা গ্রহণ করিবে; এইরূপ হইলেই সমাজ উৎকর্ষ লাভ করিতে সক্ষম হয়। ইহা সমবেদনার ফল। সমবেদনার পরিণামে প্রেম ও ভক্তি। শ্রেষ্ঠের এবং অপরের মধ্যে সমবেদনা থাকা চাই; এক পক্ষে প্রেম, অপর পক্ষে ভক্তিও থাকা চাই; নচেৎ অনুষ্ঠানও হয় না, যদি হয় অপরে তাহা গ্রহণও করে না। প্রেম ও ভক্তি না থাকিলে স্বার্থ ও কলহ আসিয়া উপস্থিত হয়। তখন সে সমাজ প্রকৃতির তাড়নায় পরাস্ত হইয়া যায়। স্বার্থ ত্যাগ ব্যতীত, সহিষ্ণুতা ব্যতীত, শ্রেষ্ঠের আজ্ঞানুসরণ ব্যতীত, নৈতিক একাগ্রতা ও দৃঢ়তা ব্যতীত, আর সর্ব্বাপেক্ষা সার কথা—বিশ্বাস ব্যতীত কোন সমাজই উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে না। এ সকল কথা মহাত্মা ডারুইন্ পুনঃ পুনঃ বুঝাইয়াছেন। উন্নতি অবনতি কর্ম্ম সাপেক্ষ, আর কর্ম্ম দেহ ও মনের উপর নির্ভর করে। দেহ ও মন বংশ পরম্পরাগত। সুতরাং যাঁহারা বংশ গুণে দেহ ও মনে যোগ্য তাঁহারা ভিন্ন অন্য কর্ত্তৃক উন্নতি বিধান হইতে পারে না। তাঁহাদিগের সংখ্যা কমিয়া গেলে সমাজ সঙ্কটাপন্ন হয়। * দেহের ন্যায় মনোবৃত্তি সকলও বংশানুগত। সুস্থ শরীর ও রুগ্ন শরীর, মানসিক উন্নতি এবং অবনতি, সচ্চরিত্র এবং অসচ্চরিত্র, এ সকলই বংশানুগত। অধ্যাপক পিয়ার্সন্ দৃঢ়তার সহিত বলিতেছেন,—"There is no doubt that good and bad physique, the liability to and the immunity from disease, the moral characters and mental temperament are **inherited** in man and with much the same intensity" অর্থাৎ সুস্থ ও রুগ্ন শরীর, রোগ প্রবণতা

* It is very difficult to say why one civilised nation rises, becomes more powerful and spreads more widely than another; or why the same nation progresses more quickly at one time than at another. We can only say that it depends on the increase in the actual number of the population, on the number of men endowed with high intellectual and moral faculties as well as on their standard of excellence. Corporeal nature appears to have little influence, except so far as vigour of body leads to vigour of mind.—

Descent of Man 1906 P. 216.

* But if we once realise that ability, that mental and moral character are inherited, and that the fertility of the better and abler * * is certainly diminishing * * then I think we must see approaching, a crisis * *

Pearsons' National Life P. 78

এবং অপ্রবণতা, আর চরিত্র এবং মনোবৃত্তি, এ সকল তুল্যরূপেই বংশানুগত হয়। জাতীয় উন্নতি অবনতি দেহ ও মনের উপর নির্ভর করিল; দেহ ও মন বংশানুক্রমের উপর নির্ভর করিল; সুতরাং জাতীয় উন্নতি অবনতিও বংশানুক্রমের উপর নির্ভর করে।

শিক্ষা।

মানব একটা বংশানুক্রমিক ব্যক্তিত্ব লইয়া জন্মগ্রহণ করে। ইহাই তাহার স্ব-ভাব। পুত্র পিতার স্বভাব অর্দ্ধেক, পৌত্র পিতামহের স্বভাব এক-তৃতীয়াংশ, প্রপৌত্র প্রপিতামহের স্বভাব এক পঞ্চমাংশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এইরূপ মাতৃ কুলেও। ইহাই মানবের মূলধন; ইহাই তাহার অন্তর্নিহিত গূঢ় সম্বল। অনুরূপ শিক্ষা ইহাকে বিকাশ করিতে পারে; কিন্তু যাহা নাই, তাহা প্রকাশ করিতে পারে না। মানবের জন্মগত উপাদানের সহিত শিক্ষা সামঞ্জস্য রক্ষা করিলে, সে উপাদানের বিকাশ হয়, নচেৎ হয় না। মানবশিশু চারা গাছের ন্যায়; সকল জমিতে সকল সময়ে এবং সকল অবস্থায় বাড়ে না; মানব শিশুও সকলের সংস্রবে, সকল সময়ে, সকল অবস্থায় বাড়ে না। পারিপার্শ্বিক অবস্থা অনুরূপ না হইয়া প্রতিকূল হইলে কোন জীবেরই উন্নতি হয় না, মানবেরও হয় না। এ নিমিত্ত উন্নতি ইচ্ছা করিলে যোগ্য বংশ এবং অনুরূপ শিক্ষা, উভয়ই আবশ্যক।

লক্ষ্য।

যিনি সমাজের উৎকর্ষ ইচ্ছা করেন তাঁহাকে বুঝিতে হইবে, লক্ষ্য কি? গন্তব্য পথ কোন দিকে? ইহা বুঝিলে কীদৃশ কর্ম্মী আবশ্যক তাহাও বুঝিতে পারিবেন। তদ্রূপ কর্ম্মী সমাজে থাকেন ভালই। তাঁহাকে উপযুক্ত পারিপার্শ্বিক উত্তেজনার মধ্যে আনিতে হইবে। আর যদি না থাকেন তবে উপযুক্ত গুণ সম্পন্ন নরনারীগণকে যৌন সম্বন্ধে মিলিত করা ব্যতীত উপযুক্ত কর্ম্মী পাইবার আশা নাই। উপযুক্ত কর্ম্মত গাছে ফলিবে না; তিনিও পিতৃমাতৃজ। তাই তাঁহার পিতৃমাতৃ-নির্ব্বাচনে সাবধানতা স্বীকার না করিলে তাঁহাকে কোনরূপেই পাওয়া যাইবে না। এদেশে যোগ্য অযোগ্য বিচার না করিয়া কোন মতে কন্যা দায় হইতে নিষ্কৃতি পাওয়ার যে একটা সাংঘাতিক হুড়া হুড়ি উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে সমাজ অধঃপাতিত হইবেই। যেখানে যোগ্য অযোগ্যের বিচার নাই সেখানে যোগ্যতা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না। যে ফল লক্ষ্য করিতেছ তদুপযুক্ত নরনারীকে মিলিত না করিলে ঐ ফল সুসম্পন্ন করিবার কর্ত্তা মিলিবে না। কিন্তু উপযুক্ত নরনারী কোথায় পাওয়া যাইবে? পাওয়া যাইবে কিনা তাহারই বা স্থিরতা কি? এ নিমিত্ত দৈহিক ও মানসিক উন্নতির উপকরণ সকল সমাজ মধ্যে ছিটাইতে হয়, ভাগ্য ক্রমে কোথাও তাহা হইতে অঙ্কুর উৎপন্ন হইতে পারে। মানব জমিতেও আবাদ না করিলে সোণা ফলে না। যদি ফলাইতে পার, সমাজ কৃতার্থ হইবে, না পার সমাজকে রক্ষা করা যাইবে না। যাহা লক্ষ্যের অনুকূল, যোগ্য বলিতে তাহাই বুঝিতে হইবে, যাহা প্রতিকূল তাহাকেই অযোগ্য বলি।

দেহ ও মন।

সমাজের সম্বল দেহ ও মন। রুগ্ন দেহ এবং অযোগ্য মন দ্বারা কোনই উল্লেখ যোগ্য কর্ম্ম সিদ্ধ হয় না। দেহ অসুস্থ হইলে মনও অসুস্থ হয়, মন অসুস্থ হইলে দেহও অসুস্থ হয়। সুতরাং দেহ ও মন উভয়কেই সুস্থ রাখা আবশ্যক। সমাজের ইহাই একমাত্র কর্ম্ম। জাতি গঠনের ইহাই একমাত্র উপায়।* দেহ ও মন জাতীয় কর্ম্মের উপযোগী হওয়া চাই, নচেৎ কর্ম্ম সুসম্পন্ন হইবে না। একটা কথা আছে, "যার কর্ম্ম তারে সাজে অন্য লোকে লাঠি বাজে।" কথাটা সত্য। এই কথা হইতেই অধিকারী ভেদের কথা আসিয়া উপস্থিত হয়। সকলে সকল কর্ম্ম করিবার অধিকারী নহে, ইহা নিশ্চিত। যিনি বংশ গুণে শিক্ষা গুণে যে কর্ম্মের অধিকারী তিনি

* Taking the word sanity in its broadest sense of health and soundness, the primary purpose of statecraft is to insure that the nation as a whole shall possess sanity. It must be sound in body and sound in mind. This is the bed-rock on which alone a great nation can be built up; by aid of this sanity alone an empire once founded can be preserved. The scope and importance to the state of the science of National Engenies. P. 9.

ভিন্ন অপরে ঐ কর্ম্ম কিছুতেই করিতে পারিবে না। যাঁহারা অধিকারী তাঁহাদিগকে বংশানুক্রমে পৃথক করিয়া রাখিতে হয়। তাঁহারা যৌনসংস্রবে সাধারণের মধ্যে মিশিয়া গেলে কালে তাঁহাদিগের দৈহিক সুতরাং মানসিক যোগ্যতা ক্রমেই হ্রাস হইয়া যাইবে। তাঁহারা সাধারণ জন-সংঘের মধ্যে ডুবিয়া যাইবেন। এ নিমিত্ত তাঁহাদিগকে পৃথক রাখা আবশ্যক। * এ পার্থক্য যোগ্য হইতে অযোগ্যের। ইহা ঠিক বর্ণভেদ নহে; কারণ যোগ্য এবং অযোগ্য অল্লাধিক সকল বর্ণেই জন্মিতে পারে। যোগ্যগণের অপত্যোৎপাদনের, আহার সংগ্রহের এবং জীবন-সংগ্রামে জয়ী হইবার সুবিধা ও সুযোগ যে সমাজে যত কম সে সমাজ ততই অধঃপতিত হইবে, সন্দেহ নাই। অযোগ্যগণ সমাজ ছাইয়া ফেলিলে সমাজ টিকিতেই পারেনা। †

বলিয়াছি উদ্দেশ্যের অনুকূল হইলেই যোগ্য হইল, প্রতিকূল হইলেই অযোগ্য হইল।

যোগ্য অযোগ্য।

উদ্দেশ্য, বংশ পরম্পরায় সমাজের স্থায়ী উৎকর্ষ সাধন। উৎকর্ষ বুদ্ধিমান, নীতিমান, উচ্চ আদর্শ সম্পন্ন সুস্থকায় ব্যক্তিগণের উপর নির্ভর করে। সুতরাং ইহারাই যোগ্য, অন্যে অযোগ্য। প্রকৃত পক্ষে যোগ্য অযোগ্য স্থির করা বড়ই কঠিন; এ সম্বন্ধে মতভেদও অনেক হইতে পারে। কিন্তু এ কথা নিশ্চিত যে রুগ্ন অপেক্ষা সুস্থ, অবোধ অপেক্ষা সুবোধ অস্থির ও চঞ্চল অপেক্ষা ধীর ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, চরিত্রহীন অপেক্ষা চরিত্রবান যোগ্যতর। সুতরাং ইহাদিগের আহার সংস্থান, উপযুক্ত স্বামী অথবা পত্নী সংগ্রহ, ইঁহাদিগের বংশ বৃদ্ধি ও স্বাস্থ্য রক্ষা সমাজ—হিত-কর কর্ম্ম। এ সকলকে কেবল ব্যক্তিগত কর্ম্ম বিবেচনা করা সঙ্গত নহে; সমাজের বিশেষ দৃষ্টি এদিকে থাকা চাই। ইঁহারা সমাজের সম্পত্তি! চিন্তাশীল রাস্কিন বলেন "There is no wealth but life" মানব সমাজের পক্ষে মানবই প্রধান সম্পত্তি। এই সম্পত্তি হারাইলে সমাজ কোথায় থাকিবে? যে সমাজে যোগ্যের সংখ্যা কমিয়া যায়, যোগ্যগণের অন্নসংস্থানের ও বংশ বৃদ্ধির অসুবিধা হয়, পক্ষান্তরে অযোগ্যের ঐ সমস্ত বিষয়ে সুবিধা থাকে, সে সমাজ মরণোন্মুখ। আর মরণোন্মুখ সমাজকে উন্নত করিতে গেলে শুক্র-শোণিত-গত উন্নতি বিধান ব্যতীত উপায়ান্তর নাই *। মহাত্মা গ্যাল্টন পুনঃ পুনঃ বুঝাইয়াছেন যে "জাতীয় উন্নতির মূল যোগ্যের বংশ বৃদ্ধি।"† যোগ্যের বংশ বৃদ্ধি অর্থই অযোগ্যের ক্ষয়। উন্নত জাতি গঠন কেবল মাত্র সুস্থ দেহ ও সুস্থ মনের উপর নির্ভর করে। উপরে যাঁহাদিগকে যোগ্য বলিলাম জাতি গঠন তাঁহাদিগের কর্ম্ম, অন্যের নহে। কিন্তু যোগ্য গঠিত হইলেই প্রচুর হয় না, তাহাকে যোগ্যাবস্থায় বংশপরম্পরায় রক্ষা করা সমাজের গুরুতর দায়িত্ব। ইহার একমাত্র উপায়ই, যোগ্যের বৃদ্ধি, অযোগ্যের ক্ষয়। কিন্তু ক্ষয় বোধ হয় অসম্ভব; কারণ বিবাহিত নরনারীর চতুর্থাংশ পরবর্ত্তী বংশের সমস্ত জন সংখ্যার অর্দ্ধভাগ গঠিত করে; সুতরাং জনন শক্তি হ্রাস না হইলে বর্ত্তমান সমাজের অযোগ্যগণ সুদূর ভবিষ্যতেও সম্পূর্ণ ক্ষয় হইবে না। আলোর সহিত অন্ধকারের ন্যায় যোগ্যের পার্শ্বে অযোগ্য থাকিবেই। ভাল মন্দ মিশিয়াই সংসার। তবে অযোগ্যের সংখ্যা প্রবল না হয়, বরং উত্তরোত্তর হ্রাস হইতে পারে সমাজের তৎপক্ষে বিশেষ যত্নবান থাকা আবশ্যক। যেরূপ আচার ব্যবহার, আহার পরিচ্ছদ, ব্যবসায় বাণিজ্য যোগ্যের সংখ্যা হ্রাস করে এবং অযো-গ্যের সংখ্যা বৃদ্ধি করে, তাহা সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়। আর যাহাতে যোগ্যের সংখ্যা বৃদ্ধি করে, অযোগ্যের সংখ্যা হ্রাস করে তাহাই একান্ত কর্ত্তব্য। অযোগ্যের অন্ন-

* Romanes' Darwin and after Darwin vol. III Isolation.

† The dearth of brains and the dearth of physique are the worst misfortunes that can befall a nation — Pearson's National Life P. 56.

* No nation can preserve its efficiency unless dominant fertility be associated with the mentally and physically fitter stock * * * There is no hope of purification in any environment which does not mean selection of the germ — The scope and importance to the state of the science of National Engenics pp 37,38,39

† Essays in Engenics.

সংস্থান ও বিবাহ দুরূহ হওয়া আবশ্যক। মনু বলিয়াছেন, যোগ্য পাত্র না পাইলে বরং কন্যা চিরজীবন অবিবাহিতা থাকুক, তথাপি অযোগ্য পাত্রে কন্যা সম্প্রদান করিওনা। স্ত্রী রক্ষা করিবার প্রধান উদ্দেশ্যই "প্রজা বিশুদ্ধি"।* প্রজা অর্থ অপত্য; সুতরাং বংশানুক্রমে যোগ্যপুত্র লাভ করাই বিবাহ কার্য্যের প্রধান উদ্দেশ্য। বিবাহ বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করাই সমাজ হিতৈষীর প্রকৃষ্ট পন্থা। আচার ব্যবহার সহজে পরিবর্ত্তন করা যায়ও না, করা উচিতও নহে। লোক-ক্ষয়কারী আচার বর্জ্জন করিলেই প্রথমে যথেষ্ট হয়। সকলেই স্বীকার করিবেন, কতিপয় আচার ও ব্যবসায়, কতিপয় পীড়া ও মাদক দ্রব্য বংশানুক্রমে লোকক্ষয়কর। সে সকলের বর্জ্জন অবশ্য কর্ত্তব্য। সৎ কি? অসৎ কি? সামাজিক হিসাবে ইহার একমাত্র উত্তরই এই—যাহা বংশানুক্রমে লোক-ক্ষয়কর তাহা অসৎ, যাহা তদ্বিপরীত তাহা সৎ। জাতীয় উন্নতিকামী এ কথা কখনই বিস্মৃত হইবেন না।

বিবাহ।

ব্যভিচার কেবল যে দেহ ও মনকে অধঃপাতে লইয়া যায় তাহা নহে, উহা গুরুতররূপে বংশহানি করে, একথা পণ্ডিতগণ অঙ্গীকার করেন। পবিত্রভাবে বংশের বৃদ্ধি সাধন করিবার একমাত্র প্রশস্ত পন্থা বিবাহ; প্রজা-বিশুদ্ধির ইহাই একমাত্র উপায়। বলিয়াছি, দেহ ও মন বংশানুক্রম অনুসরণ করে। সজ্জন এবং অসজ্জন প্রধানতঃ বংশানুক্রমের ফল, সুতরাং যিনি সমাজের উন্নতি ইচ্ছা করেন তিনি বংশানুক্রমের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিবেন। একটী অসৎ ব্যক্তি হইতে সমাজ কতদূর পতিত হইতে পারে তাহা বিবেচনা করিলে সমাজ-হিতৈষী অসতের সংখ্যা বৃদ্ধি দেখিয়া মর্ম্মাহত হইবেন। এক জারম্যান রমণীর কথা বৈজ্ঞানিক সমাজে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। সে চোর, মদ্যপায়ী এবং অতীব দুশ্চরিত্রা ছিল। তাহার বংশে ৭০৯ জন ব্যক্তি জন্মিয়াছিল। তন্মধ্যে ১০৬ জন জারজ, ১৪২ জন বদমাইস ও ভিখারী ছিল, ১৮১ জন বেশ্যাবৃত্তি করিত, ৭ জন নরহত্যা এবং ৭৬ জন রাজ দ্বারে দণ্ডিত হইয়াছিল। ঐ নারীর ও তাহার বংশধরগণের নিমিত্ত ৭৫ বৎসরে রাজকোষ হইতে ৩৭,৫০,০০০৲ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। এ শ্রেণীর সমাজ-দ্রোহী ব্যক্তিগণকে সংশোধন করা যায় না। অধ্যাপক পিয়ার্সন বলেন "We cannot reform the criminal * * * the taint varies not with their moral or mental conduct" চোরা ধর্ম্মের কাহিনী শুনিবে না। এ শ্রেণী শিক্ষায় উন্নত হইবার নহে। ধর্ম্মযাজক, নীতি শিক্ষক বহু সহস্র বৎসর চেষ্টা করিতেছেন; মানবের জন্মগত দুরাচার সমাজে এখনও প্রবল বেগে প্রবাহিত। শিক্ষা নিষ্ফল হইয়া যায়; বরং শিক্ষিত বদমাইস উৎপন্ন হইয়া আরও সর্ব্বনাশ উপস্থিত করে। সুতরাং বংশ সংশোধন ভিন্ন অন্য পন্থা দেখি না। পতিতকে উন্নত করিতে, উন্নতকে উন্নত অবস্থায় রক্ষা করিতে, বংশ সংশোধন অত্যাবশ্যক। যাহারা সংশোধনের বাহিরে তাহাদিগের ক্ষয়ই পন্থা। বিবাহ সম্বন্ধে আর একটী কথা বলা আবশ্যক; অপ্রিয় হইলেও না বলিয়া নীরব থাকিতে পারি না। এক বর্ণ মধ্যে যে বিবাহ হয় তাহাকে সবর্ণ বিবাহ, ভিন্ন বর্ণ মধ্যে যে বিবাহ হয় তাহাকে অসবর্ণ বিবাহ বলি; বাঙ্গালী, মহারাষ্ট্রী, চীনা, ইংরাজ প্রভৃতি এক একটী জাতি মধ্যে যে বিবাহ সীমাবদ্ধ থাকে তাহাকে সজাতীয় এবং এক জাতির সীমা অতিক্রম করিয়া অন্য জাতির সহিত যে বিবাহ হয় তাহাকে বিজাতীয় বলিব। সমাজে সবর্ণ অসবর্ণ, এমন কি সজাতীয় বিজাতীয় বিবাহও প্রচলনের ব্যবস্থা থাকা উচিত। সজাতীয় বিবাহে লোক-চরিত্রে স্থায়িত্ব বিধান করে, বিজাতীয় বিবাহে সমাজ মধ্যে নুতন রক্তের সহিত নবশক্তি সঞ্চারিত করে। দীর্ঘকাল কেবল মাত্র সজাতীয় বিবাহ প্রচলিত থাকিলে এক রক্তই পুনঃ পুনঃ মিশ্রিত হইতে হইতে সমাজে দুর্ব্বলতা আসিয়া উপস্থিত হয়। তন্নিমিত্ত সময় সময় বিজাতীয় বিবাহ আবশ্যক হইয়া থাকে * কিন্তু সে

* যাদৃশং ভজতে হি স্ত্রী সুতং সূতে তথাবিধং।
তস্মাৎ প্রজাবিশুদ্ধ্যর্থং স্ত্রিয়ং রক্ষেৎ প্রযত্নতঃ
মনু ৯।৯

* The establishment of a successful race or stock requires the alternation of periods of inbreeding

স্থলে স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে অতীব বিষম প্রকৃতির নর নারীকে সম্বন্ধ করা না হয়। কারণ তাহা হইলে সমাজ অধঃপতিত হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ইউরেশীয়ান, মুলেটো প্রভৃতির উল্লেখ করা যাইতে পারে। অসবর্ণ বিবাহ এতদ্দেশে পূর্ব্বেও প্রচলিত ছিল। যদিও ঐরূপ বিবাহ সজাতীয় মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিত, সুতরাং এক রক্ত পুনঃ পুনঃ সংমিশ্রণের দোষ সম্পূর্ণ নিবৃত্ত হইত না, তথাপি কেবল মাত্র সবর্ণ বিবাহ প্রচলিত থাকিলে সমাজ যে পরিমাণে দুর্ব্বল হইত, সময় সময় অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত থাকায় দুর্ব্বলতা সে পরিমাণে বৃদ্ধি হইতে পারে নাই। যোগ্যকে যোগ্যের সহিত যোজন করিতে হইলে সময় সময় সবর্ণের এবং সজাতিরও বাহিরে যাওয়া আবশ্যক হইতে পারে। বিবাহ সবর্ণেই সীমাবদ্ধ রাখা হউক অথবা সময় সময় অসবর্ণ বিবাহের ব্যবস্থা দেওয়া হউক, উভয় ক্ষেত্রেই প্রত্যেক বর্ণ মধ্যে সুস্থ-কায়, উন্নতমনা যোগ্য ব্যক্তিগণের তালিকা রক্ষিত হওয়া উচিত। যাঁহাদিগের অপত্য সংখ্যা অত্যল্প নহে, বরং বহু বলা যাইতে পারে; যাঁহাদিগের অপত্যগণ দীর্ঘায়ু এবং সাংঘাতিক বংশানুগত পীড়ায় জীর্ণ নহে, যাঁহা-দিগের অপত্য সংসার ক্ষেত্রে জ্ঞানে কর্ম্মে অথবা চরিত্রে উন্নতি লাভ করিয়াছে; জীবন সংগ্রামে পূর্ব্বপুরুষগণ অপেক্ষা অধিকতর জয়ী হইয়াছে; তাঁহাদিগের সকলেরই নাম এই তালিকায় বর্ণানুক্রমে লিপিবদ্ধ হইবে। ঘটকদিগের পুঁথির ন্যায় এই সকল তালিকা পুস্তকাকারে সুরক্ষিত হওয়া আবশ্যক। বিবাহ ক্ষেত্রে এই সকল তালিকায় লিখিত ব্যক্তিগণেরই প্রাধান্য থাকা উচিত। ইহা নবপ্রতিষ্ঠিত কৌলিন্যবৎ সমাজে আদর প্রাপ্ত হইবে। দেহ ও মনের বংশানুক্রমিক পরিবর্ত্তন অর্থাৎ উন্নতি অবনতি এই সকল পুস্তকে লিপিবদ্ধ হইবে। পূর্ব্বের ন্যায় বিবাহ সভায় ইহা পঠিত হইবে। এত-দ্দেশীয় প্রাচীন সমাজে কৌলিন্য রক্ষার্থ সর্ব্বদাই ঐরূপ করা হইত; তবে জাতীয় উৎকর্ষ সাধনার্থ ঐরূপ করা কঠিন হইবে কেন? অন্যত্র এরূপ চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে; কিন্তু জাতীয় উন্নতি কল্পে এতদ্দেশে ঈদৃশ চেষ্টার নাম মাত্রও শুনা যাইতেছে না। বর্ত্তমান অবস্থায় এত-দ্দেশীয়গণের বংশানুক্রম-শাস্ত্র প্রধান অলোচ্য সাহিত্য বলিয়া বিবেচনা করি। সম্প্রতি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্যাল্টন্ লেবরেটরীর প্রধান জীবতত্ত্ববিৎ অধ্যাপক কার্ল পিয়ার্সন এফ, আর, এস, আমার প্রার্থনা মত এই উদ্দেশ্যে আমার নিকট কয়েক খণ্ড তালিকা পাঠাই-য়াছেন, আমাকে উহা পূরণ করিয়া দিতে হইবে। অন্যে আমাদিগের বিষয় চিন্তা করে, কিন্তু আমরা কিছুই করি না, এতদপেক্ষা পরিতাপের বিষয় আর কি আছে? আমি আপনাদিগকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি, আপনারা বংশানুক্রম শাস্ত্রের আলোচনা আরম্ভ করুন। যদি প্রকৃত প্রস্তাবে মানুষকে সমাজের একমাত্র সম্পত্তি বলিয়া স্বীকার করেন, তবে এ আলো-চনা হইতে আর বিরত থাকিবেন না। যাহাতে আপনাদিগের পরবংশীয়গণ সংখ্যায় ও যোগ্যতায় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় তদপেক্ষা মহদুদ্দেশ্য আর কিছুই হইতে পারে না। এ শাস্ত্র অবহেলা করিলে ধরাতলে আপনাদিগের চিহ্ন মাত্রও থাকিবে না? জীব সমাজে কৃমিকীটের যে স্থান আছে তাহাও আপ-নাদিগের থাকিবে না। অধঃপতনের চিহ্ন চারিদিকে বিদ্যমান। আপনাদিগের কি আতঙ্ক উপস্থিত হয় না। যাঁহাদিগের হয়, এ অনুষ্ঠানের অধিকারী তাঁহারাই। ভাব জাগ্রত না হইলে কর্ম্ম হয় না; কেবল মাত্র জ্ঞানে কর্ম্ম হয় না। জানি অনেক, কিন্তু করিতে পারি না কিছুই। ভাবের অভাবে আজি আমরা নিরুদ্যম। জ্ঞান আবশ্যক, সন্দেহ নাই; কিন্তু ভাবের সহিত যোগ না হইলে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইবে না, ইহাই নিশ্চিত।

জাতীয় উন্নতির প্রধান কথা বংশ সংশোধন, দ্বিতীয় কথা স্ব-ভাবের অনুরূপ শিক্ষা বিস্তার।

আয়োজন। যদিচ শিক্ষাও বংশানুক্রমের উপরই বিশেষ ভাবে নির্ভর করে সত্য, তথাপি অধিকাংশ ব্যক্তিকে কোন না কোনরূপ শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। সে শিক্ষা ধর্ম্ম প্রধান; উহা জনসাধা-

(endogamy) in which characters are fixed, and periods of outbreeding (exogamy) in which by the introduction of fresh blood, new variations are produced-Thomson's Heredity P 537

রণের প্রয়োজন অনুসারে নিয়মিত হওয়া উচিত। কিন্তু উচ্চশিক্ষা, যাহা জাতীয় উৎকর্ষ সাধনের উপযোগী, তাহা বহুবিস্তৃত এবং গভীর হওয়া আবশ্যক; কারণ মানব বহুশক্তির কেন্দ্র স্থল, তাই মানবকে পরিচালিত করিতে হইলে বহুবিষয়ে অভিজ্ঞতা থাকা চাই। নিম্নতম জীব হইতে বিবর্ত্তিত হইয়া মানবের জন্ম হইয়াছে। নিম্নতম জীবের অন্তর্নিহিত শক্তি পারিপার্শ্বিক নানাবিধ অবস্থাধীনে বিবর্ত্তিত হইতে হইতে অবশেষে মানবের উৎপত্তি। তাই মানব সমস্ত প্রকৃতির উত্তরাধিকারী। তাহার যে দেশে বাস, যে উদ্ভিদ ও জন্তুগণের সংস্রবে তাহার ও তাহার পূর্ব্ববর্ত্তিগণের জীবন সংগ্রাম অতিবাহিত হইয়াছে ও হইতেছে, যে পথে তাহার ভাবরাশির উন্মেষ হইয়াছে ও হইতেছে, সে সকলই তাহার স্বভাব গঠিত করে। লোকতত্ত্ববিদ্‌গণ দেখাইয়াছেন "দেশের প্রাকৃতিক অবস্থা, জল, বায়ু, উদ্ভিদ ও জন্তু সকল, মানবের জীবন ব্যাপার নিয়মিত করে। * তাই ভুগোল খগোল, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, গণিত, রসায়ন, জীবতত্ত্ব, ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব ও দর্শন শাস্ত্র, এককথায় বস্তুতত্ত্ব ও শক্তিতত্ত্ব, সকলই মানবের অলোচ্য; কিন্তু মানবতত্ত্বের অংশ স্বরূপে, অন্য প্রকারে নহে। এই ভাবে এ সকল শাস্ত্রের আলোচনা এতদ্দেশে এখনও আরম্ভ হয় নাই, বলিলেই হয়। আহ্লাদের বিষয়, বন্ধুবর রমাপ্রসাদ চন্দ এবং অধ্যাপক শশিভূষণ বসু এরূপ আলোচনার ভিত্তি স্থাপন করিতেছেন। ইহাঁদিগের প্রদর্শিত পথে অনেকে যত্নবান না হইলে দুই এক জনের সাধ্য নাই যে মানবতত্ত্ব অথবা সমাজতত্ত্ব সম্যক্ অনুশীল করিতে সক্ষম হন। ইঁহারা ধন্যবাদার্হ কিন্তু আরও কর্ম্মী চাই। এ সকল শাস্ত্রের আলোচনা কঠিন, কিন্তু জাতীয় উন্নতিকামীর অপরিহার্য্য। মিষ্টার এন, সি, মাক্‌নামরা এফ, আর, সি, এস, তাঁহার নব প্রকাশিত গ্রন্থের † ১৯১ ষ্ঠা হইতে ২৮৮ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত আয়র্লণ্ডের সেলট জাতির উন্নতিকল্পে এই সকল শাস্ত্র যেরূপে আলোচনা করিতে হয় তাহা দেখাইয়াছেন। ঐরূপ আদর্শ লইয়াই প্রথমে অগ্রসর হওয়া সঙ্গত বোধ করি। কোন নির্দ্দিষ্ট জাতিকে না বুঝিলে তাহাকে পরিচালিত করা যায় না। তাহার জন্মগত স্ব-ভাব না বুঝিলে তাহাকে শিক্ষা দেওয়া যায় না। তাই, তাহার কোন্ দেশে উৎপত্তি, সে দেশ কেমন, কোন কোন্ জাতির সংমিশ্রণে তাহার জন্ম, কিরূপ ভাব সম্পদের মধ্য দিয়া কিরূপ জীবন সংগ্রাম অতিবাহিত করিয়া ঐ জাতি চিরাতীত কাল হইতে প্রতিপালিত হইয়াছে, তাহার দৈহিক ও মানসিক অবস্থা কি ভাবে বিকশিত হইয়াছে, এসকলই জানা আবশ্যক, নচেৎ তাহাকে চেনা যাইবে না। তাহাদিগের বংশবৃদ্ধির গতি, তাহাদিগের আহার সংস্থানের সুযোগ, তাহাদিগের দৈহিক ও মানসিক পরিবর্ত্তন—এ সকলই বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করা আবশ্যক; এবং সর্ব্বোপরি --তাহাদিগের বংশানুক্রমিক পরিবর্ত্তন, প্রজনন শক্তির তারতম্য, বিশেষ ভাবে আলোচ্য। এ আলোচনা আরম্ভ করিতে আর বিলম্ব করা যায় না। সকল আলোচনার মূলই জ্ঞানতৃষ্ণা। আমরা সাহিত্য আলোচনা করি কেন? অধ্যাপক পুলটন্ অতি সুন্দর ভাষায় এই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন "I do it because it interests me: I want to find out." ‡ জানিতে চাই, বুঝিতে চাই, তাই আলোচনা করি। আপনাদিগের মধ্যে যাঁহারা এই সকল বিষয় জানিতে চান, জাতীয় উন্নতি অবনতির বিধি নিয়ম প্রকৃত পক্ষে বুঝিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা মানবতত্ত্ব শাস্ত্র, বিশেষতঃ উহার যে অংশকে Eugenics নাম দেওয়া হইয়াছে, তাহার অলোচনায় প্রবৃত্ত হউন। এ শাস্ত্রানুশীলন সকলেরই শক্ত্যায়ত্ত। ইহা যেরূপ গবেষণার উপর নির্ভর করে তাহার সহায়তা করিতে সকলেই সক্ষম। এ কথার সত্যতা পিয়ার্সন্ প্রেরিত এই তালিকা হইতেই বুঝিতে পারিবেন। বর্ত্তমানঅবস্থায় এই শাস্ত্রের আলোচনা অত্যাবশ্যক হইয়াছে। নতুবা ভারতবর্ষের জাতি সকলের পরিণাম কি হইবে তাহা ভাবিতেও শরীর অবসন্ন হয়।

---

* Haddon's study of man. Introduction pp XVII-XVIII

† The Evolution and Function of Living purposive matter.

উপসংহারে, আপনারা আমাকে যে এতক্ষণ ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক শ্রবণ করিয়াছেন, এ নিমিত্ত আপনাদিগকে সহস্র সাধুবাদ দিতেছি। আর বিশ্ব বিধাতার চরণোপান্তে একান্ত হৃদয়ে প্রার্থনা করিতেছি, সেই দীনের সহায়, দয়ার সাগর, আপনাদিগের হৃদয়ে এই বিষয়ের অনুসন্ধিৎসা জাগ্রত করিয়া দেন। অলমতি বিস্তরেণ।

শ্রীশশধর রায়।

"ভ্রম।"

"মুক্ত প্রাণের দৃপ্ত বাসনা
তৃপ্ত করিবে কে?
বদ্ধ বিহগে মুক্ত করিয়া
ঊর্দ্ধে ধরিবে কে?
রক্ত বহিবে মর্ম্ম ফাটিয়া;
তীক্ষ্ণ অসিতে বিঘ্ন কাটিয়া
ধর্ম্ম পক্ষে শর্ম্ম লক্ষ্যে
মৃত্যু বরিবে কে?
অক্ষয় নব-কীর্ত্তি-কিরীট
মাথায় পরিবে কে?"
বলিয়া, সে দিন হুঙ্কার ছাড়ি
ছিন্ন করিনু পাশ;
(হায়) ধর্ম্মের শিরে নিজেরে বসায়ে
করিনু সর্ব্বনাশ!
চেয়ে দেখি কেহ নাহি অনুচর,
মোর ডাকে কেহ ছাড়িবে না ঘর,
আমার ধ্বনির উত্তর, শুধু
মানবের পরিহাস;
আমি ধর্ম্মের শিরে নিজেরে বসায়ে
করেছি সর্ব্বনাশ!
এই অন্ধ, মত্ত উদ্যমে আমি
বাড়াতে আপন মান,
সিদ্ধি দাতারে গণ্ডীবাহিরে
করিনু আসন দান;
তাই বিধাতার হইল বিরাগ,
ভেঙ্গে দিল মোর শিবহীন যাগ,
সকল দণ্ড ধূলায় ফেলিয়া,
আজ ডাকি "ভগবান"।
হে দয়াল, মোর ক্ষমি অপরাধ,
কর তোমাগত প্রাণ।

৺ রজনীকান্ত সেন।

অন্ন-সংস্থান। *

আমাদের দেশের শিল্প ও ব্যবসায়ের উন্নতি বিধান করিয়া স্বাধীনভাবে জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় উদ্ভাবনের জন্য যাঁহারা চেষ্টা করিতেছেন তাঁহারা স্পষ্টই বুঝিতে পারিতেছেন যে, আমাদের বৈষয়িক জীবনধারা ক্রমশঃ ক্ষীণ, মন্দগতি ও অবরুদ্ধ হইয়া আসিতেছে। আমরা যে জীবনসংগ্রামের আবর্ত্তের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়াছি তাহাতে জয়লাভ করিবার উপযোগী সামর্থ্য আমাদের একবারেই নাই; এবং পাশ্চাত্য জগতের সহিত শিল্প ও বাণিজ্য-প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ দুরাকাঙ্ক্ষা মাত্র। প্রথমতঃ, আমাদের সমাজের যে শ্রেণীর লোক প্রধানতঃ কায়িক পরিশ্রমের দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করে তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই অশিক্ষিত। আর যাহাদেরই বা কিঞ্চিৎ বুদ্ধিশক্তি ও শিল্পনৈপুণ্য আছে তাহারাও সাধারণতঃ নূতন অবস্থার উপযোগী নূতন উপায় উদ্ভাবন অথবা নবাবিষ্কৃত উন্নত যন্ত্রাদির সাহায্য গ্রহণ করিয়া কার্য্য করিতে অসমর্থ। দ্বিতীয়তঃ, আমাদের ধনিসম্প্রদায় এবং মহাজনগণ অতিশয় স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়, তাঁহারা শিল্প ও ব্যবসায় সম্বন্ধে একবারেই অনুৎসাহী এবং এক প্রকার উদাসীন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না

* ময়মনসিংহ সাহিত্যসম্মিলনে পঠিত।

আবার, যে পরিমাণ মূলধনের সাহায্যে আমাদের শিল্প, ব্যবসায় ও বাণিজ্য চলিতেছে তাহাও ব্যক্তিগত এবং পরস্পরবিচ্ছিন্ন হইয়া রহিয়াছে। ফলতঃ, সমবেত-ব্যবসায়, যৌথকারবার, মহাজনসঙ্ঘ প্রভৃতির অভাবে আমাদের জাতীয় ধনভাণ্ডার নিজের শক্তি প্রকাশ করিতে পারিতেছে না। তৃতীয়তঃ, যে উৎসাহ, পরিচালনাশক্তি ও নায়কোচিত দায়িত্ববোধের ফলে জগতে অসম্ভবও সম্ভব হয়, ভিন্ন ভিন্ন স্থানের বিচিত্র শক্তি একস্থানে এবং এক উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীভূত হইয়া বিরাট শক্তিসমুচ্চয়ের সংঘটন করে সেই কর্ম্মকৌশল, ব্যবসায়-বুদ্ধি, চিন্তাশক্তি ও ঐক্যবিধায়িনী ক্ষমতা আমাদের শিক্ষার ব্যবস্থায় বিকশিত হইতে পায় না। আমাদের শিক্ষাপদ্ধতিতে বিজ্ঞান, শিল্প ও ব্যবসায়কে অপসারিত করিয়া সাহিত্যশিক্ষাই একচ্ছত্র অধিকার বিস্তার করিয়াছে। কাজেই আমাদের শিক্ষিত সমাজ প্রাকৃতিক ও বৈষয়িক জগতের তথ্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। এরূপ অবস্থায় আমাদের বৈষয়িক উন্নতি সম্বন্ধে আমরা যে সন্দিহান হইব, এবং শিল্প-সংগ্রামে জয়ী হইবার আশা দুরাশা থাকিবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

কিন্তু রণে ভঙ্গ দিলে চলিবে না; উপায় উদ্ভাবন করিতেই হইবে। এই জীবনসংগ্রামে সফলতা লাভ করিতে হইলে আমাদিগকে যে প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে এই প্রবন্ধে তাহার আলোচনা করা যাইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সম্মুখে যে কয়টী পথ উন্মুক্ত রহিয়াছে তাহাও নির্দ্দিষ্ট করা হইবে।

ভরতবর্ষে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসায়, এবং গ্রামগত ও পরিবার-বদ্ধ শিল্প পদ্ধতিই প্রচলিত; এখানে পাশ্চাত্য জগতের বিপুল আয়োজন, বিরাট কারখানা-সংঘটন ও বিশাল ব্যবসায়-কলেবরের সৃষ্টি হয় নাই। বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদির প্রয়োগ, মূলধনের সমবায়সাধন, বিচিত্র বিজ্ঞাপনপ্রণালী, পণ্যসরবরাহের শৃঙ্খলা এবং শ্রমবিভাগ-নীতির প্রবর্ত্তন প্রভৃতির ফলে ইউরোপীয়েরা সমগ্র পৃথিবীর দেশ প্রদেশগুলিকে যে ভাবে করতলগত করিয়া বিশাল বিশ্ববাজারের সৃষ্টি করিয়াছে তাহার ফলে তাহদের শিল্প, ব্যবসায় ও বাণিজ্যের প্রতাপে অন্যান্য জাতির বৈষয়িক সাধনা যে ফলবতী হইতে পারিবে তাহার আশা করা সুকঠিন। এই শক্তির বিরুদ্ধে ভারতবর্ষের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লীগত বৈষয়িক জীবন অস্তিত্ব রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে কি না তাহাই ভাবিবার প্রধান বিষয়। আমাদের যে সামান্য ধনশক্তি, ব্যবসায়বুদ্ধি ও কার্য্যদক্ষতা আছে তাহারই সদ্ব্যবহার করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারিব কি না—ইহাই আমাদের প্রথম সমস্যা।

শিল্পের ক্রমবিকাশের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে সকল দেশেই বৃহৎ আয়োজনের সঙ্গে সঙ্গেই কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্প-প্রতিষ্ঠান এবং ব্যবসায়-পদ্ধতি ও আনুষঙ্গিকভাবে অথবা স্বাধীনরূপে প্রতিষ্ঠালাভ করে। এই জন্য আধুনিক পাশ্চাত্যজগতে কলকারখানাগুলি, গৃহশিল্প, গ্রাম্যব্যবসায় ও হস্তনির্ম্মিত কাজের উচ্ছেদ সাধন করিতে পারে নাই। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কারবার এইরূপে নিজের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়া বহুলোকের স্বাধীন অন্নের সংস্থান করিয়াছে। প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের প্রভাবে শিল্প ও ব্যবসায়ের বৃহৎ অনুষ্ঠানগুলিই শিল্পজগতে সম্পূর্ণ স্থান অধিকার করে নাই।

জীবজগতের সর্ব্বত্রই এই প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের কার্য্য চলিতেছে; এবং প্রকৃতিদেবী অসমর্থ ও অনুপযুক্ত ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ও সমাজকে অপসারিত করিয়া উপযুক্ত ও সামর্থ্যবান ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ও সমাজকেই অঙ্কে স্থান দিয়াছেন। যে ব্যক্তি, সমাজ বা প্রতিষ্ঠান নিজের প্রয়োজন মত পারিপার্শ্বিক শক্তিপুঞ্জ ব্যবহার করিয়া নিজের অঙ্গ পুষ্ট করিতে পারে সেই ব্যক্তি, সমাজ ও প্রতিষ্ঠানই প্রকৃতির নিয়মে জীবনসংগ্রামে পুষ্টি ও বিকাশলাভের অধিকারী। কলেবরের আয়তন, আকার ও বিস্তৃতিই এই উপযোগিতালাভের একমাত্র অঙ্গ নহে। প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হইয়া স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে হইলে পারিপার্শ্বিকের অনুবর্ত্তন এবং জগতের বিবিধ ভাব ও শক্তিসমুচ্চয়ের ব্যবহার করিতে হইবে।

জীবনবিকাশের এই নিয়ম শিল্পজগতেও আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে। ইহার ফলে আমরা দেখিতে পাই, অনেক সময়ে ক্ষুদ্র কারবারই বৃহৎ অনুষ্ঠান অপেক্ষা

প্রতিষ্ঠালাভ করিবার পক্ষে অধিকতর উপযোগী। এমন অনেক অবস্থা আছে, যেস্থলে বিরাট আয়োজন করিলে লাভবান্ হইবার আশা অপেক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত হইবার আশঙ্কাই বেশী। সেই অবস্থায় ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের স্থান কোনরূপেই বিনষ্ট হইতে পারে না। মানবের অভাব বৈচিত্র্য এবং অভাব পূরণ করিবার ক্ষমতা, শ্রমবিভাগ-নীতির প্রবর্ত্তন, ভাবের আদানপ্রদানের সুবিধা, রাষ্ট্রীয় সুব্যবস্থা প্রভৃতির উপরেই বৃহৎ অনুষ্ঠানের অস্তিত্ব নির্ভর করে। কিন্তু এই সমুদয় সকল সমাজে সকল সময়ে থাকে না; সুতরাং বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদির প্রয়োগ করিয়া বৃহৎ অনুষ্ঠানের প্রয়োজন সকল সময়েই উপস্থিত হয় না।

এতদ্ব্যতীত সুকুমার শিল্প, চিত্রকলা, রঞ্জনশিল্প প্রভৃতি এমন কতকগুলি বিষয় আছে, যে সমুদয় যন্ত্রাদিপ্রয়োগে সুসম্পন্ন হইতে পারে না। তাহাদের উৎকর্ষ প্রত্যেক ব্যক্তির স্বতন্ত্র শিল্পনৈপুণ্যের উপর নির্ভর করে। সুতরাং এসকল স্থলেও ক্ষুদ্র ব্যবসায়-পদ্ধতিই বৃহত্তর অনুষ্ঠান গুলিকে পরাজিত করিয়া শিল্প-জগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে।

আবার, বৃহৎ অনুষ্ঠানগুলির অনেক বিষয়ে অসম্পূর্ণতা রহিয়াছে: ইহাদের সাহায্যে অল্প সময়ে বহুদ্রব্য উৎপন্ন হইতে পারে বটে; কিন্তু এই সমুদয় দ্রব্য যথাস্থানে বিতরণ করিতে বহুকালব্যাপী বহুলোকের সমবেত চেষ্টার প্রয়োজন। অধিকন্তু, কেবলমাত্র বৃহৎ কারবারের দ্বারাই মানবের সর্ব্ববিধ অভাব পূরণ হইতে পারে না। প্রত্যেক জনপদের মধ্যে সামাজিক ও প্রাকৃতিক শক্তি ও সুযোগসমূহ এমন বিচিত্রভাবে পড়িয়া থাকে, যে সেইগুলিকে মানবের অভাবমোচনের জন্য প্রয়োগ করিতে হইলে বিবিধ পরস্পরসম্বদ্ধ, আনুষঙ্গিক অথবা সম্পূর্ণ স্বাধীন শিল্প ও ব্যবসায়ের আয়োজন করা অবশ্য কর্ত্তব্যের মধ্যে পরিগণিত হয়। সুতরাং বৈজ্ঞানিক কলকারখানার প্রসার যতই বৃদ্ধি পাউক না কেন, এবং শ্রম-বিভাগনীতি প্রয়োগ করিয়া বিরাট ব্যবসায়-পদ্ধতি যতই প্রতিষ্ঠিত হইতে থাকুক না কেন, মানবের বিচিত্র অভাবমোচনের জন্য বিচিত্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্প ও ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন কোন দিনই সম্পূর্ণরূপে অপসৃত হইবে না।

আমাদিগকে শিল্প-জগতের এই নিয়মানুসারেই কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে হইবে। আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় দেশের মধ্যে যে অসংখ্য সুযোগ রহিয়াছে তাহারই যথাসম্ভব সদ্ব্যবহার করিয়া বিচিত্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসায়-ও-শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে হইবে। এইজন্য আমাদের শ্রমজীবিগণের কায়িক পরিশ্রম, ব্যবসায়িগণের উৎসাহ ও কর্ম্মশক্তি এবং মহাজনগণের ব্যবসায়-প্রযুক্ত মূলধন যে ভাবে পরিচালিত করিলে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ফললাভ হইতে পারে আমাদিগকে সেইরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে।

প্রথমতঃ, দেখা যাউক আমরা কি উপায়ে আমাদের শ্রম-জীবিগণের পরিশ্রম সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রণালীতে পরিচালিত করিতে পারি। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, শিল্প ও ব্যবসায় শিক্ষার অভাবে আমাদের সমাজে, বিশেষতঃ শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে শিল্পনৈপুণ্য, উদ্ভাবনী শক্তি, কলা-চাতুর্য্য, এবং হস্ত বা চক্ষুরিন্দ্রিয়গত কৌশল একবারেই জন্মিতে পায় না। এ অবস্থায় জাতিভেদের ফলে যাহারা পুরুষানুক্রমে কোন শিল্প বা ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া বংশগত নৈপুণ্যের অধিকারী হইয়া রহিয়াছে, আমাদের প্রাচীন সামাজিক ও বৈষয়িক সভ্যতার নিদর্শন সেই শিল্পী ও ব্যবসায়ী জাতির বিদ্যা, বুদ্ধি, স্বভাব ও অভ্যাসের সাহায্য গ্রহণ না করিলে আমাদের আর সম্বল কোথায়? এই সুযোগগুলি ব্যবহার করিবার সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে আমাদের শিল্পী ও ব্যবসায়ী জাতি নূতন বৈজ্ঞানিক যন্ত্র, এবং উন্নত প্রক্রিয়া ও প্রণালীগুলি ক্রমশঃ আয়ত্ত করিয়া জাতিগত বিদ্যার পরিপুষ্টি ও উন্নতি সাধন করিতে পারে তাহার প্রতি আমাদের দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

বাস্তবিকই কি আমাদের শিল্পিকুল এবং ব্যবসায়ী জাতির শিল্প ও ব্যবসায়-পদ্ধতি বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে পরিচালিত নহে? যাঁহারা আলোচনা করিয়া দেখিয়াছেন তাঁহারা নিশ্চয়ই স্বীকার করিবেন যে আমাদের শিল্পী ও ব্যবসায়ীরা উচ্চ অঙ্গের বুদ্ধি এবং বিবেচনা-

শক্তিরই পরিচয় প্রদান করিয়াছে ; এবং এখনও বর্ত্তমান যুগের সর্ব্ববিধ বৈষয়িক অবস্থার উপযোগী ব্যবস্থা করিয়া স্বকীয় কার্য্যদক্ষতা ও শিল্পপটুত্বের পরিচয় প্রদান করিতেছে। আমাদের শিক্ষার যতই অভাব থাকুক না কেন, আমাদের এখনও ভাবিবার প্রয়োজন নাই, যে আমাদের শিল্প ও ব্যবসায়িগণের উন্নতি একেবারে অসম্ভব। বাস্তবিক পক্ষে, যাঁহারা প্রচার করিতে চেষ্টা করেন, যে ভারতবর্ষের শ্রমজীবিগণ যুগে যুগে একই অবস্থার থাকিয়া একই জাতিগত নৈপুণ্যের অধিকারী হইয়া রহিয়াছে, এবং কখনও কোন বিষয়ে অবস্থোচিত নূতন ব্যবস্থা করিয়া উদ্ভাবনী শক্তি এবং পরিবর্ত্তন-শীলতার পরিচয় প্রদান করে নাই তাঁহারা বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। যদি আমাদের শিল্পী ও ব্যবসায়ী জাতি একই অবস্থার নিগড়ে আবদ্ধ থাকিয়া জগতের নিত্যনব ভাব ও শক্তিপুঞ্জ সম্বন্ধে একেবারে নিস্পন্দ ও উদাসীন হইয়া থাকিত, তাহা হইলে কি ভারতীয় চিত্র-কলা, রঞ্জনশিল্প, হস্তনির্ম্মিত কারুকার্য্য এবং বিবিধ পরিবারবদ্ধ ব্যবসায়-প্রসূত বিলাসদ্রব্য বহুকাল ধরিয়া প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জগতে একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করিতে সমর্থ হইত? কৃষিক্ষেত্রেও ভারতীয় কৃষক-সম্প্রদায় আমেরিকাখণ্ডের আবিষ্কারকাল হইতে যে সকল নূতন নূতন উদ্ভিজ্জ পদার্থ এদেশের জল-বায়ু ও ভূমির উপযোগী করিয়া চাষ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছে, তাহারই ফলে আমাদের আধুনিক কৃষিজাত-দ্রব্যের অর্দ্ধভাগের ও অধিক পাইয়া থাকি।

অবশ্য একথা স্বীকার্য্য যে, আমাদের শিল্পিকুল স্বকীয় শিল্প ও ব্যবসায়েই নবাবিষ্কৃত যন্ত্র এবং বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়াদি অবলম্বন করিয়া উন্নতি লাভ করিতে পারে। স্বকীয় জাতিগত ব্যবসায় ত্যাগ করিয়া অন্য কোন ব্যবসায় অবলম্বন করিতে হইলে যেরূপ পরিবর্ত্তনসাধন ও নূতন পারিপার্শ্বিকের অনুবর্ত্তন করিতে হয় সেরূপ ক্ষমতা তাহাদের নাই।

যাহা হউক, এই জাতিগত শিল্প-ব্যবসায়ী ব্যতিরেকে বর্ত্তমান অবস্থায় আমাদের অন্য কোন গতি নাই। যাঁহারা আমাদের শিল্প ও বাণিজ্য পরিচালনা করিবার ভার গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাদিগকে একথা সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে। আমাদের শিল্পের অধ্যক্ষগণ এবং ব্যবসায়ের ধুরন্ধরেরা যেন একথা ভুলিয়া গিয়া কারখানা-সমূহে সমাজস্থ যে কোন শ্রেণীর লোক নিযুক্ত না করেন। স্বদেশী আন্দোলনের সময় হইতে মসীজীবী বাঙ্গালী সন্তানকে হঠাৎ বিচিত্র শিল্পী জাতিতে পরিণত করিবার চেষ্টায় বৈষয়িক জগতের এই সাধারণ নিয়ম ভঙ্গ করা হইয়াছে, ইহার ফলে বয়ন এবং কৃষিকার্য্যের উন্নতির জন্য যে কয়েকটী প্রয়াস হইয়াছে সমস্তগুলিই পণ্ডশ্রমে পরিণত হইয়া সমাজে ঘোরতর নৈরাশ্য ও অবসাদের সৃষ্টি করিয়াছে।

শিল্পিগণের বিদ্যা, বুদ্ধি ও নৈপুণ্যের উন্নতি বিধান করিবার প্রয়াসের সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগকে ভাবিতে হইবে, কি উপায়ে আমাদের সমাজে শিল্পপ্রতিষ্ঠানের উপযুক্ত পরিচালক এবং ব্যবসায়ের অধ্যক্ষ ও ধুরন্ধরের সৃষ্টি হইতে পারে। আধুনিক কালে পাশ্চাত্য জগতের ব্যবসায়ক্ষেত্রে ধুরন্ধর এবং অধ্যক্ষেরাই সমাজের বৈষয়িক জীবনের প্রকৃত নিয়ন্তা; মহাজনগণ এবং ধনিসম্প্রদায় নহে! ইহাঁরাই সমাজের প্রয়োজন ও অভাবানুসারে উপযুক্ত আয়োজন করিয়া বৈষয়িক সুখ স্বচ্ছন্দতা বিধান করেন। ইহাঁদেরই ব্যবসায়বুদ্ধি, ধন-বিজ্ঞানে ব্যুৎপত্তি, সর্ব্ববিধ অবস্থা পর্য্যালোচনা করিবার শক্তি এবং কর্ম্মতৎপরতার প্রভাবে বিভিন্ন স্থান হইতে মহাজনগণ এবং বিভিন্ন শ্রেণীর শ্রমজীবীরা আকৃষ্ট হইয়া স্বকীয় শক্তিপ্রয়োগের ক্ষেত্র প্রাপ্ত হয়েন। ইহাঁরাই সকল দিক দেখিয়া শুনিয়া অন্নসংস্থানের নূতন নূতন পন্থা উদ্ভাবন এবং মূলধনপ্রয়োগের অভিনব কারবার আবিষ্কার করেন। ইহাঁদেরই চিন্তা ও কার্য্যপ্রণালী এবং ব্যবসায়-পাণ্ডিত্য ধনী মহাজনদিগের গন্তব্যপথ এবং কর্ম্মক্ষেত্র স্থির করিয়া দিয়া তাঁহাদের ভাগ্যগঠন করিয়া দেয়। ইহারই ফলে ধনী সম্প্রদায়ের মূলধন সর্ব্বত্র ধুরন্ধরের পরিচালনা-শক্তি এবং ব্যবসায়বুদ্ধি অনুসরণ করিয়া পরাধীনভাবে কার্য্য করে! বাস্তবিক পক্ষে কেবলমাত্র মূলধনের সাহায্যে মহাজনগণ কখনও নূতন শিল্প ও ব্যবসায়ের প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি অথবা নূতন

কারবার আবিষ্কার করিতে সমর্থ হয়েন না। ধনী সম্প্রদায় সাধারণতঃ গতানুগতিকভাবে কার্য্য করিয়া অভ্যস্ত কারবার এবং পুরাতন ব্যবসায়েই সমগ্র শক্তি প্রয়োগ করেন। লাভবান হইবার নূতন নূতন সুযোগ আবিষ্কার দ্বারা ধুরন্ধরেরা নূতন নূতন ব্যবসায়ক্ষেত্র সৃষ্টি করিয়া দিলে এই লাভজনক কারবারের প্রতি ধনবান্ মহাজনগণ আকৃষ্ট হইয়া থাকেন।

এইরূপ ধুরন্ধর আমাদের দেশে এখনও আবির্ভূত হয়েন নাই। কিন্তু যতদিন পর্য্যন্ত আমরা এরূপ ব্যবসায়বুদ্ধিবিশিষ্ট কর্ম্মবীরের সাক্ষাৎ না পাই, ততদিন আমাদের শিল্প ও ব্যবসায়ের উন্নতির পথ রুদ্ধ থাকিবে। সুতরাং সর্ব্বপ্রথমে আমাদিগকে এরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে, যাহাতে অন্নসংস্থানের নূতন নূতন পন্থা আবিষ্কার এবং অভিনব শিল্প ও ব্যবসায়ের উদ্ভাবন দ্বারা ধনী মহাজনগণের মূলধন আকৃষ্ট করিতে সমর্থ, উপযুক্ত ধুরন্ধর ও পরিচালকের সৃষ্টি হয়।

আমাদের সমাজে এরূপ কর্ম্মবীর এবং ব্যবসায়ের ধুরন্ধর নাই কেন? ব্যবসায় এবং শিল্পশিক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থার অভাবই ইহার একমাত্র কারণ। আমাদের দেশে যে শিক্ষাপদ্ধতি প্রচলিত আছে তাহার ফলে শাসনকার্য্যনির্ব্বাহোপযোগী কেরাণী, হাকিম ও উকিলের সৃষ্টি হইতে পারে মাত্র। শিল্প ও ব্যবসায় ক্ষেত্রের ভার বহন করিবার সামর্থ্য, এবং নানা উপায়ে সমাজের বৈষয়িক উন্নতি বিধান করিবার ক্ষমতা বিকাশ করিতে হইলে আমাদের এমন শিক্ষাপদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে, যাহাতে শিক্ষার্থিগণ প্রথমাবস্থায় সাধারণ সাহিত্যশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই উপযুক্ত বিজ্ঞান ও ব্যবহারিক শিল্প শিক্ষা করিতে পারে; এবং ক্রমশঃ কেবলমাত্র ব্যবসায়, বাণিজ্য, শিল্প প্রভৃতি ধনাগম সম্পর্কীয় বিদ্যা সমূহেই সমগ্র শক্তি ও সময় প্রয়োগ করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হয়। যতদিন পর্য্যন্ত শিক্ষাপদ্ধতির নিয়মে বৈজ্ঞানিক কলকারখানা, ভারতীয় কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের অবস্থা, এবং আমাদের সমাজের বিচিত্র অভাব পূরণ করিবার প্রথা প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞানলাভের সুবিধা সহজেই উপস্থিত না হয়; এবং বিভিন্ন কারখানা পরিদর্শন, বিবিধ যন্ত্র ব্যবহার, বিচিত্র স্থানে পরিভ্রমণ ও প্রদর্শনী পর্য্যবেক্ষণ প্রভৃতির সাহায্যে আমাদের কার্য্যকারিণী বৃত্তিসমূহের উন্মেষ, হস্ত চক্ষুরিন্দ্রিয়াদির পরিচালন এবং বৈষয়িক জগতের বিবিধ ঘটনা পর্য্যালোচনার সুযোগ সৃষ্টি না হয়, তত দিন পর্য্যন্ত আমাদের সমাজে আবিষ্ক্রিয়াশক্তিসম্পন্ন, উদ্ভাবনীক্ষমতাবান্ ধুরন্ধর ও কর্ম্মবীরের আবির্ভাব হইবে না।

এইরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা করিবার সঙ্গে সঙ্গে, যাহাতে আমাদের উচ্চশিক্ষিত যুবকগণ দেশের বিবিধ কৃষিজাত দ্রব্যের এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক পদার্থের বৈজ্ঞানিক ও ও রাসায়নিক পরীক্ষা দ্বারা নূতন শিল্প ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সমবেত হইয়া উপযুক্ত অধ্যাপক ও বিশেষজ্ঞদিগের তত্ত্বাবধানে আলোচনা, অনুসন্ধান এবং গবেষণা করিবার সুযোগপ্রাপ্ত হয়েন তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এতদ্ব্যতীত যাহাতে কেবলমাত্র আদান প্রদান, বিতরণ সরবরাহ, বাজার পরীক্ষা, অভাব ও প্রয়োজন অনুসন্ধান, এবং আমদানি রপ্তানি প্রভৃতি প্রকৃত ব্যবসায় ও বাণিজ্য বিষয়ে শিক্ষালাভ হইতে পারে সেইরূপ উচ্চ অঙ্গের ব্যবসায় শিক্ষারও আয়োজন করিতে হইবে।

এক্ষণে দেখা যাউক, বর্ত্তমান অবস্থায় আমাদের মূলধন কোন্ প্রণালীতে প্রয়োগ করিলে আমরা সর্ব্বোৎকৃষ্ট ফললাভ করিতে পারি! পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, আমাদের ধনিসম্প্রদায় মূলধনের সমবায়সাধন করিয়া যৌথকারবার, সমবেত-ব্যবসায় প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করিতে অপারগ। ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির স্বকীয় ব্যবসায়-প্রযুক্ত ধন যে একীকৃত হইয়া জাতীয় মূলধন-ভাণ্ডারের আয়তন ও প্রভাব বৃদ্ধি করিতে পারিবে তাহার আশা অতি অল্প। বর্ত্তমান অবস্থায় আমরা ইহার উপর নির্ভর করিতে পারি না; প্রত্যেক মহাজন ও ব্যবসায়ী ব্যক্তিগত স্বার্থান্বেষণের চেষ্টায় এবং লাভবান্ হইবার আশায় নিজ নিজ মূলধন প্রয়োগ করিতে উৎসাহী হইবেন, আমাদিগকে এইরূপ ভাবিয়াই কার্য্য করিতে হইবে।

যদি অল্প মূলধন লইয়াই শিল্প ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠা করিতে হয় তাহা হইলে যে সকল কারবারে শীঘ্র শীঘ্র ফলপ্রাপ্ত হওয়া যায় সেই সকল কারবারই অবলম্বন

করিতে হইবে। এই মূলধন যাহাতে ব্যবসায়ে অনেক কাল আবদ্ধ না থাকে এবং যাহাতে ইহা বৎসরে বহুবার কার্য্য করিতে পারে তাহার প্রতি দৃষ্টি না রাখিলে অল্পধন বিশিষ্ট মহাজনেরা কখনও লাভবান্ হইতে পারেন না। একই মূলধনের পুনঃ পুনঃ ব্যবহার করিলে যে ফললাভ হয় প্রচুর মূলধনের এককালীন ব্যবহারেও সেইরূপ ফললাভ হয়; কারণ ইহার ফলে মূলধন প্রকৃত প্রস্তাবে বহুগুণিত হইয়া যায়, সুতরাং প্রতিবারে অতি সামান্য রাখিলেও মোটের উপর বৎসরান্তে লাভের পরিমাণ অতি সন্তোষজনক হয়। অনুসন্ধানের ফলে জানা গিয়াছে, যে সকল ব্যবসায়ী এককালে প্রচুর পরিমাণ দ্রব্য ক্রয় করিয়া বিক্রয় করেন, অথবা যাঁহারা তাঁহাদের কার্য্য শীঘ্র শীঘ্র সম্পন্ন করিয়া একই মূলধন বহুবার প্রয়োগ করিতে পারেন তাঁহারা প্রতি কারবারে শতকরা এক-টাকা হিসাবেও লাভ রাখিয়া প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

কিন্তু অল্প মূলধন লইয়া কার্য্য করিতে হইলে ব্যবসায়ীকে অতি বিচক্ষণতার সহিত অগ্রসর হইতে হয়। যে সমুদয় জিনিষের কাট্তি খুব বেশী এবং যাহার অভাব হইলে সমাজের বাস্তবিক কষ্ট হইবে, সুতরাং সামান্য কারণে যে সমুদয় প্রয়োজনের হ্রাসবৃদ্ধি হয় না, গভীর ভাবে অনুসন্ধান করিয়া কেবলমাত্র সেই সমস্ত জিনিষই প্রস্তুত ও সরবরাহ করিবার আয়োজন করিতে হইবে। দ্রব্য সমূহের বিশিষ্ট উৎকর্ষ বিধানের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া তাহাদের অভাব মোচনোপযোগিতা এবং মূল্যের অল্পতার প্রতি মনোযোগী হইতে হইবে। যাহাতে ব্যবসায়ী অল্প মূল্যে বহু জিনিষ বিক্রয় এবং সমাজের প্রধানতম ও সার্ব্বজনীন অভাবগুলি পূরণ করিতে পারেন কেবলমাত্র তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিলে তাঁহার মূলধন ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে থাকিবে।

আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মূলধনগুলি বর্দ্ধিত করিবার আর একটী উপায় আছে। বাণিজ্য ও ব্যবসায়ের দ্বারা এই কার্য্য সুসাধিত হইয়া থাকে; কোনও দ্রব্য প্রস্তুত করিবার ভার গ্রহণ না করিয়াও কেবলমাত্র বিবিধ উৎপন্ন দ্রব্যের আমদানী রপ্তানি, এবং বিবিধ সমাজের প্রয়োজনানুসারে স্থান হইতে স্থানান্তরে তাহা প্রেরণের ব্যবস্থা করিয়াই যথেষ্ট ধনাগম হইতে পারে। আর বাস্তবিক, এইরূপ ব্যবসায়প্রথা অবলম্বন না করিলে ধনভাণ্ডার কখনও পুষ্ট ও বর্দ্ধিত হইতে পারে না। শিল্পপ্রতিষ্ঠার দ্বারা প্রয়োজনোপযোগী দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া যে পরিমাণ লাভের আশা থাকে, কেবলমাত্র সরবরাহ ও কাট্তির অনুরূপ জোগানের আয়োজন করিয়াই তদপেক্ষা অধিক লাভ হইয়া থাকে। ইহার ফলে দ্রব্য উৎপাদনকারী শিল্পিগণের লভ্যাংশ হইতে নিজ পারিশ্রমিক গ্রহণ করিয়া এইরূপ ব্যবসায়ী এবং জোগানদারেরা প্রচুর ধনলাভ করিতে সক্ষম হয়েন। ব্যবসায়ের ফলে মূলধন এইরূপে সংগৃহীত হইলে পর, বৃহৎ বৈষয়িক অনুষ্ঠানের সূত্রপাত হইতে পারে।

আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা আলোচনা করিয়া বৈষয়িক উন্নতি বিধানের যে কয়টি নিয়ম ও প্রণালী নির্দ্দিষ্ট হইল, তাহা কার্য্যে প্রয়োগ করিতে হইলে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসায় প্রতিষ্ঠার আয়োজন করিতে হইবে। এই জন্য দুই প্রকারের বৈষয়িক প্রতিষ্ঠান গঠন করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ, অল্পায়তন কারখানার ব্যবস্থা; দ্বিতীয়তঃ কোনরূপ কারখানা প্রতিষ্ঠা না করিয়া গৃহে গৃহে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্য্যের দায়িত্ব প্রদান করিয়া পরিবার-বদ্ধ ব্যবসায়ের ব্যবস্থা।

এই দুই শ্রেণীর অন্তর্গত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসায়গুলিতে ত্রিবিধ কার্য্য সম্পন্ন করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ, হস্ত নির্ম্মিত কার্য্য; দ্বিতীয়তঃ, যন্ত্রাদি ব্যবহৃত দ্রব্য; তৃতীয়তঃ, রাসায়নিক প্রণালী অবলম্বিত শিল্প।

এই সমুদয় কার্য্যের জন্য নিম্নলিখিত নিয়মগুলি মানিয়া চলিতে হইবে। প্রথমতঃ, জাতিগত নৈপুণ্য-বিশিষ্ট কারিগরদিগকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কারখানার ভিতর সমবেত করিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ মানবচালিত কল অথবা বাষ্প-নিয়ন্ত্রিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এন্‌জিনের সাহায্যে উন্নত যন্ত্রাদি প্রয়োজনমত ব্যবহার করিতে হইবে; তৃতীয়তঃ, উদ্ভিজ্জ, ও খনিজ উপকরণ গুলির রাসায়নিক পরীক্ষা করিয়া উন্নত শিল্পের আয়োজন করিতে হইবে। চতুর্থতঃ, উৎকৃষ্ট কৃষিজাত দ্রব্যের ও অন্যান্য প্রাকৃতিক

পদার্থের ব্যবহার করিতে হইবে। এই জন্য বিজ্ঞান-সিদ্ধ কৃষিবিদ্যাবিশিষ্ট তত্ত্বাবধায়কগণের অধীনে কৃষক-দিগকে কার্য্য করাইয়া ভূমির উৎকর্ষ সাধন করিতে হইবে।

নিম্নে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের নাম উল্লেখ করা যাইতেছে, বর্ত্তমান অবস্থায় এই গুলি অবলম্বন করা যাইতে পারে।

১—বিভিন্ন ধাতুর মিশ্রণ—তৈজস পত্র নির্ম্মাণ, তার প্রস্তুতকরণ, বোতাম, ঘণ্টা ও অলঙ্কার গঠন, সোণা বা রূপার ছাঁচ প্রস্তুতকরণ ইত্যাদি।

২—বিভিন্ন রকমের কালি প্রস্তুত করণ, জুতার কালি, ঘোড়ার সাজের কালি, ধাতু নির্ম্মিত দ্রব্যের উপর কালি, নিয়ুবিয়ন কালি, ছাতার কালি, ইত্যাদি।

৩—বিভিন্ন বারনীস ও মসৃণ করিবার দ্রব্য—ঘোড়ার সাজ, কাঁসা, পিতল, কাঁচের জিনিষ, দস্তার কাজ, ছুরি, কাঁচি, পাথর পালীশ, হাড় ও শিংএর কাজ, কাঠের কাজ।

৪—জল হইতে রক্ষা করিবার পদার্থ—চামড়ার কাজ রক্ষা, কাপড়ের জিনিষ, কাগজ রক্ষা করিবার উপায়, অয়েলক্লথ, ছাতার কাপড় ইত্যাদি।

৫—পরিষ্কার করিবার জিনিষ—তেল ও চর্ব্বী, তুলা ও রেশমের কাপড় ধোয়া, রং পরিষ্কার করা।

৬—পিতল—রং করণ, পালীশ করণ, জল ও বায়ু হইতে রক্ষা করণ।

৭—সংযুক্ত করিবার বিভিন্ন দ্রব্য—কাঠের কার্য্যে যোড়া লাগাইবার আঠা, স্বর্ণকার ও কর্ম্মকারের কার্য্য-উপযোগি সংযোজনদ্রব্য, সিমেণ্ট।

৮—বিভিন্ন দ্রব্য পরিষ্কার ও রক্ষা করিবার উপায় —অয়েলক্লথ পরিষ্কার করণ, দড়ি রক্ষা করণ, ছবি বাঁধাইবার কাঠ রক্ষা করণ, চিত্র পরিষ্কার করণ, দাগ নিবারণ, জুতা, কাঁচ, রেশমের জিনিষ, সোণা, রূপা ও কাঠের কাজ প্রভৃতি পরিষ্কার করণ।

৯—বিভিন্ন সুগন্ধি দ্রব্য প্রস্তুত করণ, দুর্গন্ধ নিবারণ।

১০—এনামেলের কাজ, গিল্টি করণ, তড়িৎ শক্তি ব্যবহার করিয়া অন্যান্য ধাতু লাগান।

১১—ফল ও ফুল প্রভৃতি হইতে নির্য্যাস প্রস্তুত করণ, সুগন্ধি, খাদ্য, সরবৎ, প্রভৃতি প্রস্তুত করণ।

১২—ফল, ফুল, দুগ্ধ, মাছ, মাংস চামড়া, পালখ, লোম প্রভৃতির রক্ষা করণ।

১৩—উদ্ভিজ্জ পদার্থ হইতে—দড়ি প্রস্তুত করণ।

১৪—বাঁশের কাজ, বেতের কাজ, মাদুর, আসবাব, প্রভৃতি প্রস্তুত করণ।

১৫—মোজা, গেঞ্জী, টুপী, প্রভৃতি।

১৬—পুস্তক শেলাই, বাঁধাই।

নিম্নে কতকগুলি শস্তা যন্ত্রের নাম করা যাইতেছে—এইগুলি হাতে চালান যাইতে পারে, অথবা ছোট ছোট এঞ্জীনের সাহায্যে চলিতে পারে।

১—মোমবাতীর পলিতা প্রস্তুত করিবার যন্ত্র

২—বিভিন্ন রকমের ফিতা প্রস্তুত করিবার যন্ত্র।

৩—মোম বাতী প্রস্তুত করিবার ছাঁচ।

৪—বিভিন্ন আকারের খাম বা এন্‌ভেলাপ প্রস্তুত করিবার যন্ত্র।

৫—মোটা কাগজের বাক্স প্রস্তুত করিবার যন্ত্র।

৬—জুতার ফিতা প্রস্তুত করিবার যন্ত্র।

৭—ঝিনুকের বোতাম করিবার যন্ত্র।

৮—ছোট ছোট টিনের কৌটা তৈয়ারী করিবার ছাঁচ ও যন্ত্র।

পূর্ব্বে পরিবারবদ্ধ গৃহগত শিল্পের কথা বলা হইয়াছে। এই জন্য উপযুক্ত স্থান বাছিয়া লইতে হইবে। আমাদের দেশের কৃষিজীবীরা কার্য্যাভাবে অনেক সময় বসিয়া থাকিতে বাধ্য হয়। সেই সময় তাহাদিগের দ্বারা অল্পশ্রম এবং অল্পকালসাধ্য অনেক কাজ করাইয়া লওয়া যাইতে পারে। কাদা মাটীর কাজ, খেলনা তৈয়ারী, বেত ও বাঁশের কাজ, মাদুর, দড়ি, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যন্ত্র ব্যবহৃত শিল্প প্রভৃতি বিচিত্র কার্য্য এই সুযোগে তাহারা অনায়াসে সম্পন্ন করিতে পারে। মহাজন এবং ধুরন্ধরেরা একবার এদিকে দৃষ্টিপাত করিলে, আমাদের শ্রমজীবি-গণের উদ্বৃত্ত সময় প্রয়োজনীয় কার্য্যে প্রযুক্ত হইয়া, সমাজের বৈষয়িক উন্নতি বিধানের বিশেষ সহায়তা করিতে পারে।

এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিবারবদ্ধ ব্যবসায় ব্যতিরেকে বর্ত্তমান অবস্থায়ই কতকগুলি বৃহৎ কারবারের প্রতিও আমাদের মনোযোগী হওয়া কর্ত্তব্য। অবশ্য এ সকল কাজের কএকটি অংশ মাত্রই আমরা অবলম্বন করিতে সমর্থ। লোহার কাজের মধ্যে বিশেষ উৎকর্ষবিশিষ্ট শিল্পের জন্য চেষ্টা না করিয়া যদি সাধারণ প্রয়োজনোপযোগি ছুরি, কাঁচি, পেরেক, কব্জা, বালৃতি, ছাঁচ প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হই; কাচের কার্য্যের মধ্যে সামান্য রকমের শিশি, বোতল অথবা মেরামতী কাজ প্রভৃতি গ্রহণ করি; বয়নকার্য্যের মধ্যে যদি উন্নত হাতের তাঁত, সূতা প্রস্তুত করণ প্রভৃতি বিষয়ে মনোযোগী হই; অথবা রঞ্জনকার্য্যের মধ্যে ছিট্ রংকরা, সাধারণ কাপড়ে রং লাগান, দেশীয় রং প্রস্তুত করণ, অথবা বিচিত্র মৃত্তিকা ব্যবহার করিয়া সোডা, ক্ষার প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে চেষ্টা করি, তাহা হইলেও আমাদের অনেক অভাবই স্বদেশীয় শিল্প এবং ব্যবসায়ের সাহায্যে পূরণ হইতে পারে; এবং বহু শিক্ষিত ও অশিক্ষিত লোকের স্বাধীন ভাবে জীবিকা অর্জ্জনের পন্থা উন্মুক্ত হয়।

যে কয়টি সুযোগ ও পন্থার কথা উল্লিখিত হইল, অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে তদ্ব্যতীত আরও অনেক অন্নসংস্থানের স্বাধীন উপায় আবিষ্কৃত হইতে পারে। এইরূপ কতকগুলি পন্থা অনুসন্ধান করিবার জন্য কতিপয় উপযুক্ত শিল্প-ও-বিজ্ঞানবিৎ কর্ম্মী নিযুক্ত করিবার প্রয়োজন হইয়াছে। তাঁহারা দেশের বিভিন্নস্থানে ভ্রমণ করিয়া বিচিত্র সুযোগগুলির সহিত পরিচিত হইবেন; এবং আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় সামান্য ধনশক্তি ও অশিক্ষিত পটুত্বের উপরেই নির্ভর করিয়া, অথবা সামান্য রকমের শিল্প ও ব্যবসায় শিক্ষার সাহায্যে এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদির প্রয়োগে কোন্ কোন্ উপায় অবলম্বন করা যাইতে পারে, তাহার আলোচনা করিবেন। এইরূপ অনুসন্ধান, আলোচনা ও পরীক্ষা কার্য্যে সহায়তা করিবার জন্য কোন্ মহাত্মা অগ্রসর হইবেন—তাহারই জন্য আমাদের সমাজ উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিয়াছে।

শ্রীরাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়।

সম্ভোগ।

আমি তোমারে পেয়েছি হৃদয়ে আমার
নিবিড় করে,
তুমি দিয়েছ যে ধরা আমার সকল
জনম ভরে!
বিশাল ভুবনে ঘেরেছে আঁধার
শূন্য চৌদিক—শুধু হাহাকার,
নাচিতেছে তবু হৃদি-পারাবার
পুলক ভরে,—
আমি তোমা যে পেয়েছি হৃদয়ে আমার
নিবিড় করে!

ওগো, জগতের যত শোভা-হাসি-গান
তোমার সনে,
মরি, না জানি কখন পশেছে আসিয়া
আমার মনে!
সকল হরষ ঘনায়ে সেথায়
তোমারি আসন রচিয়াছে হায়,
সফল সাধনা আজি কে ধরায়
পরম ক্ষণে,—
আমি তোমারে পেয়েছি হৃদয়ে আমার
সবার সনে!

ওগো, চির-পিপাসিত মরুভূ কঠিন
শীতল আজি,—
কিবা সুধার ধারায় মিলন-বাঁশরী
উঠেছে বাজি!
মরমে মরমে বাঁধিয়াছ মোরে
কুসুম-কোমল চারু ভুজ-ডোরে,
এ জীবন আর নাহি ঘুম-ঘোরে
অধম সাজি,—
এ যে সুধার ধারায় মিলন-বাঁশরী
উঠেছে বাজি!

তুমি আজি কে আমায় করিলে অমর
জগতে তব,—
ওগো সাধনার ধন! দিলে কি গৌরব
চেতনা নব!
তুমি বিনে আর কি আছে ভুবনে
ভুলেও যে কিছু পড়িছে না মনে,
নয়ন আমার তোমারি কিরণে
নেহারে ভব,—
মোরে নব-চেতনায় করিলে অমর
জগতে তব!

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত

পৌণ্ড্র বৰ্দ্ধন।*

বাঙ্গালা দেশের উত্তরাংশ প্রাচীনকালে পৌণ্ড্র বা পুণ্ড্র নামে পরিচিত ছিল। শ্রুতিতে ইহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। আধুনিক রঙ্গপুর, বগুড়া, পাবনা, দিনাজপুর জেলা সম্পূর্ণ এবং মালদহ ও ময়মনসিংহ জেলার কিয়দংশ পৌণ্ড্ররাজ্যের অন্তর্গত ছিল।

এই পৌণ্ড্র রাজ্যের রাজধানীর নাম পৌণ্ড্রবৰ্দ্ধন। বিবিধ প্রাচীন গ্রন্থে এবং পাল ও সেন গৌড়েশ্বরদিগের তাম্রশাসনে পৌণ্ড্র বৰ্দ্ধনের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। দীর্ঘকাল যাবৎ এই পৌণ্ড্র বৰ্দ্ধনের সংস্থান নির্ণয় করিবাব জন্য পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ বিশেষ চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ কেহ বা মহাস্থান কেহ বা বৰ্দ্ধন-কোটী লইয়া টানাটানি করিতেছেন। বঙ্গীয় লেখক-দিগের মধ্যে বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় হইতে আরম্ভ করিয়া বাবু অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় পর্য্যন্ত সকলে একতালে তাল বাজাইয়াছেন,সাহেবগণ এক একটা যুক্তি দিয়াছেন; কিন্তু বঙ্গীয় লেখকদিগের না আছে যুক্তি না আছে প্রমাণ, তাঁহারা পাঠান নরপতিদিগের স্থাপিত "হজরৎ পাণ্ডুয়া (ফিরোজাবাদ) কে পৌণ্ড্র বৰ্দ্ধন নির্ণয় করিয়া বসিয়া আছেন। কেহ বা সেই পাণ্ডুয়া বেড়াইয়া আসিয়া "পৌণ্ডবৰ্দ্ধন ভ্রমণ" শীর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশ করতঃ আনন্দ অনুভব করিয়া থাকেন এবং তাঁহারা বিবেচনা করেন যে, তাহাদের সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ অভ্রান্ত। কিরূপে যে তাহারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন তাহা আমি কিছুই বুঝিতে পারি না। প্রায় ৩০ বৎসর যাবৎ আমি পৌণ্ড্রবৰ্দ্ধনের স্থিতি স্থান নির্ণয়ের চেষ্টা করিয়া আসি-তেছি। ১২৮৯ বঙ্গাব্দে আমি বঙ্কিম বাবুকে তাঁহার ভ্রম দেখাইয়া দিয়াছিলাম। *

কিছুকাল গত হইল আমার চেষ্টা ও যত্ন সফল হইয়াছে। অদ্য আমার সেই আনন্দের সংবাদ বঙ্গীয় পাঠকদিগকে প্রদান করিবার অভিলাষে বিশেষ আহ্লা-দের সহিত এ স্থানে উপস্থিত হইয়াছি। আমি কিরূপে পৌণ্ড্রবৰ্দ্ধনের সংস্থান নির্ণয়ে সক্ষম হইয়াছি তাহা এক্ষণ প্রকাশ করিব।—

বিখ্যাত চান পরিব্রাজক হিয়োন সাঙ (বা হিউয়েন-ছোয়াং) বলিয়াছেন যে, তিনি হিরণ্য পর্ব্বত (মুদ্গ-গিরি বা মুঙ্গের) হইতে ৩০০ লি অর্থাৎ ৫০—৬০ মাইল গঙ্গার ভাটীর দিকে গমন করিয়া চাম্পা নগরে উপনীত হইয়াছিলেন। এই চাম্পা অঙ্গদেশের রাজধানী। বলা বাহুল্য যে, চাম্পা নগরী অধুনা কর্ণগড় নামে পরিচিত। কর্ণগড় ভাগলপুরের নিটক অবস্থিত। তৎপর পরিব্রাজক চাম্পা হইতে ৪০০ লি (৬৭—৮০ মাইল) ভাটীতে আসিয়া গঙ্গাতীরস্থিত কই-চ্ছি-উ-কোল নগরী প্রাপ্ত হন। পাশ্চত্য পণ্ডিতগণ ইহা পাঠ করি-য়াছেন কুজ্‌গিরো। কিন্তু আমি ইহাকে পাঠ করি কচ্ছগৌড়। আমার বিবেচনায় ইহাই প্রাচীন গৌর-নগরী। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলেন যে, চীন পরিব্রাজক রাজমহল কিম্বা তাহার নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে গঙ্গা পার হইয়াছিলেন; এবং সেই স্থানেই কইচ্ছিউকোল নগরী অবস্থিত ছিল।] কিন্তু তৎকালে গঙ্গার প্রবল স্রোত কোন্ স্থান দিয়া প্রবাহিত হইতেছিল, তাহা নির্ণয় করা নিতান্ত সহজ নহে। পঞ্চ শতাব্দী পূর্ব্বে (অর্থাৎ কীর্ত্তিবাসের সময়ে) গঙ্গা গৌড়ের পদতল

বিগত ২রা বৈশাখ ময়মনসিংহ সাহিত্য সম্মিলনিতে পঠিত।

* বান্ধব। সপ্তম খণ্ড। ২৩৯ পৃষ্ঠা।

প্রক্ষালিত করিয়া প্রবাহিত হইতেছিল। কীর্ত্তিবাস লিখিয়াছেন ঃ—

"কাণ্ডারের প্রতি গঙ্গা মুক্তিপদ দিয়া।
গৌড়ের নিকটে গঙ্গা মিলিলা আসিয়া॥"

কীর্ত্তিবাসের তিন শতাব্দী পূর্ব্ববর্ত্তী অর্থাৎ মহম্মদ বখ্‌তিয়ার খিলজির গৌড় বিজয়ের ৪০ বৎসর পর বিখ্যাত ইতিহাস লেখক মিনহাজ সিরাজ বাঙ্গালায় আগমন করেন। তিনি দেখিয়াছিলেন যে, গৌড়ের মধ্য দিয়া গঙ্গা প্রবাহিত হইতেছে; গঙ্গার দুই তীরেই সহর। একদিকের সহরের নাম গৌড় এবং অন্যদিকের সহরের নাম লক্ষ্মণাবতী। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রত্যক্ষ সাক্ষী মিনহাজের ৬০০ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ হিয়োন-সাঙের সময়ে গঙ্গা গৌড়ের কোন পার্শ্ব দিয়া প্রবাহিত হইতেছিল, এক্ষণ তাহা নির্ণয় করা নিতান্ত সুকঠিন। যাহা হউক গৌড় এবং রাজমহলের মধ্যবর্ত্তী কোন স্থান দিয়া যে গঙ্গা প্রবাহিত হইতেছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু আমার বিবেচনায় তৎকালে গৌড়ের প্রান্ত দিয়া গঙ্গা প্রবাহিত হইতেছিল। কারণ গৌড় নগরীকেই হিয়োনসাঙ কইচ্ছিউকোল লিখিয়াছেন। "কোল" শব্দ যে গৌড়ের প্রতিশব্দ তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। হিয়োনসাঙের সময়ে, গৌড়ের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয় নাই, অথচ এই কইচ্ছিউকোল ব্যতীত পরিব্রাজক অন্য কোন গৌড়ের উল্লেখ করেন নাই।

কচ্ছ গৌড়ের নিকট গঙ্গা উত্তীর্ণ হইয়া হিয়োনসাঙ পূর্ব্বদিকে ৬০০ লি (১০০—১২০ মাইল) গমন করত তিনি পুন্ ন ফতন্‌ন (পৌণ্ড্রবর্দ্ধন) নগরী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পক্ষান্তরে এই পৌণ্ড্রবর্দ্ধন হইতে ৯০০ লি (১৫০—১৮০) গমন করিয়া হিয়োনসাঙ কামরূপ নগরী প্রাপ্ত হন। যে স্থান গঙ্গা তীর হইতে ৬০০ লি এবং কামরূপ হইতে ৯০০ লি দূরে অবস্থিত, সেই স্থান কখনই পাণ্ডুয়া হইতে পারে না। * হিয়োনসাঙের বর্ণনা অনুসারে বাঙ্গালার মানচিত্রোপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে প্রতীয়মান হইবে যে, দিনাজপুর ও রঙ্গপুর জেলার মধ্যবর্ত্তী কোন স্থানে কিম্বা বগুড়া জেলার অন্তর্গত কোন স্থানে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নগরী অবস্থিত ছিল। আমার দীর্ঘকালব্যাপি গবেষণার ফল তাহাই হইয়াছে। বগুড়া জেলার মধ্যবর্ত্তী স্থানে আমি পৌণ্ড্রবর্দ্ধন প্রাপ্ত হইয়াছি।

বগুড়া জেলার অন্তর্গত আদেমদীঘি পুলিশ ষ্টেশনের অধীন এবং উত্তরবঙ্গ রেলপথের—শান্তাহার ও আক্কেলপুর ষ্টেশনের মধ্যবর্ত্তী তিলকপুর ষ্টেশনের পূর্ব্বদিকে—৪ মাইল দূরে বাঙ্গালার সর্ব্বপ্রাচীন রাজধানী পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। ইহার বর্ত্তমান নাম পুণ্ডরীয়া, এই ক্ষুদ্র পুণ্ডরীয়া ও তাহার পার্শ্ববর্ত্তী কএকখানি গ্রাম জমিদারি সেরেস্তায় "ডিহি পুণ্ডরীয়া" বলিয়া লিখিত হইয়া থাকে। পুণ্ডরীয়ার চতুর্দ্দিকে প্রাচীন হিন্দুরাজন্যবর্গের কীর্ত্তিকলাপের ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি ভূগর্ভে সমাহিত দেখিতে পাওয়া যায়। পুণ্ডরীয়ার পার্শ্বস্থিত "দেওরা" নামক পল্লিতে মহারাজাধিরাজ দেও (দেব) পালদেবের বাসভবনের ভগ্নাবশেষ অদ্যাপ প্রদর্শিত হইয়া থাকে। এই রাজনিকেতনের মধ্যে ও পার্শ্বে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ ৭৪টি পুষ্করিণী অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে। পুণ্ডরীয়ার অপর পার্শ্বে প্রায় এক মাইল দূরে—রামশালা নামে আর একটি গ্রাম আছে। সেই স্থানে রাশি রাশি ইটের স্তূপ ও প্রাচীন অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হইয়া থাকে। বহু সংখ্যক দীর্ঘিকা ও পুষ্করিণী এস্থানেও দেখিতে পাওয়া যায়। বোধ হয়, এস্থানে "দ্বিতীয় রামচন্দ্রের ন্যায় পরাক্রমশালী" মহারাজ রামপাল দেব বাসভবন নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এই রামপাল দেবের জীবন বৃত্তান্ত "রামচরিত" নামক গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে। পুণ্ডরীয়া অধুনা একখানি নগণ্য ও হীন অবস্থাপন্ন ক্ষুদ্রগ্রাম হইলেও খাটা পরগণার অন্তর্গত একটি মহাল ইহার নামানুসারে "ডিহিপুণ্ডরীয়া" আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। সুতরাং ইহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে যে, পুণ্ডরীয়া, দেওরা, রামশালা প্রভৃতি পল্লিগুলি প্রাচীন পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নগরের অংশ মাত্র। প্রাচীনকালে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন

* কোন কোন পণ্ডিত ৫ লিতে এক মাইল আবার কেহ কেহ ৬ লিতে ১ মাইল লিখিয়াছেন।

নগর ৬ মাইল দীর্ঘ ছিল।* উল্লেখিত গ্রাম সমূহের ভূগর্ভ অনুসন্ধান করিলে বাঙ্গালার ইতিহাসের রাশি রাশি উপকরণ প্রাপ্ত হওয়ার আশা করা যাইতে পারে। ডিহিপুণ্ডরিয়া ষ্টেটের কর্ত্তৃপক্ষগণ এবিষয়ে মনযোগী হইলে, বঙ্গবাসী তাঁহাদের নিকট ঋণী থাকিবেন।

সার আলেকজেণ্ডার কনিংহাম তাঁহার প্রাচীন ভূগোল গ্রন্থে প্রথমতঃ পাবনাকে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন লিখিয়াছিলেন। কিন্তু পশ্চাৎ তিনি তাঁহার ভ্রম বুঝিতে পারিয়া বগুড়া জেলার অন্তর্গত "মহাস্থান" কে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন অবধারণ করিয়াছেন। † দিনাজপুরের ভূতপূর্ব্ব মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত ওয়েষ্টমেকট সাহেব মহাস্থানের ১২ মাইল দূরস্থিত বর্দ্ধনকোটীকে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন অবধারণ করিয়াছেন। ‡ পুণ্ডরীয়ার অস্তিত্ব অবগত হওয়ার পূর্ব্বে আমরা এই বর্দ্ধনকোটীকে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন বিবেচনা করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। হিয়োনসাঙের বর্ণনা পাঠ করিলে, পৌণ্ড্রবর্দ্ধনকে অবশ্যই বগুড়া জেলার অন্তর্গত কিম্বা তাহার নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে অবস্থিত বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। তাহা না করিয়া কোন দূরবর্ত্তী স্থানে অনুসন্ধান করা নিতান্তই ভ্রমের কার্য্য। নিতান্ত ভ্রমান্ধ ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কেহই "হজরত পাণ্ডুয়া" (ফিরোজাবাদ) কে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন অবধারণ করিতে পারেন না। অধুনা যে সকল বঙ্গীয় যুবক পুরাতত্ত্বালোচনায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, তাঁহারা আমার বিশেষ স্নেহের পাত্র। কিন্তু তন্মধ্যে কোন কোন লেখকের লেখনীতে কৃতজ্ঞতার অভাব এবং দাম্ভিকতার প্রকাশ দর্শনে নিতান্ত ক্ষুব্ধ হইয়াছি

শ্রীকৈলাসচন্দ্র সিংহ।

* মতান্তরে পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের পরিধি ৬ মাইল।

† Arch. S. Report. Vol. voi xv. pp. V. 104, 110 f.

‡ Note on Torpandeghi copper Plate. (J. A. S. B. XLIV. 1. 7.-8.)

আলোক ও অন্ধকার।

আলো কহে,—"অন্ধকার তুই বড় কালো,
দেখিতে কুরূপ তোর নাহি লাগে ভালো।"
অন্ধকার কহে,—"তোরে বড় ভালবাসি
আমি কি আমাতে থাকি দেখে তোর হাসি।"

শ্রীঅবনীকান্ত সেন

ময়মনসিংহের "সাহিত্য সম্মিলন।"

নববর্ষের প্রথম তিন দিন ময়মনসিংহ সহরে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন হইয়া গিয়াছে। ইহাতে কলিকাতা, ঢাকা, রংপুর, বগুড়া, মুরশিদাবাদ প্রভৃতি স্থান হইতে সাহিত্য সভার প্রতিনিধিগণ উপস্থিত হইয়াছিলেন। এইরূপ বিদেশী প্রতিনিধিদিগের সংখ্যা ১৬০ জন হইবে।

৩০শে চৈত্র হইতেই নানাস্থানের প্রতিনিধিগণ আসিতে লাগিলেন। মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত ব্লাকউড্ সাহেবের অক্ষয়কীর্ত্তি ও তাঁহার লোকপ্রীতির দেহবদ্ধ নিদর্শন,—ময়মনসিংহের নূতন আনন্দমোহন কলেজে, ও কলেজ বোর্ডিংএ ভিন্ন জেলাবাসী প্রতিনিধিগণের আবাস নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। কলেজের বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণে কএকটি পটমণ্ডপ সংস্থাপিত হইয়াছিল। বাগ্দেবতার অর্চ্চনার নিমিত্ত ইহা হইতে অধিকতর মনোরম স্থান বুঝি হইতে পারে না।

২৭ বিঘা জমির কেন্দ্রস্থলে কলেজ নির্ম্মিত। দক্ষিণ প্রান্তে বিশাল দীঘি, চারিপার্শ্বে ঘনসন্নিবিষ্ট বেণুকুঞ্জ। দূরে পল্লীর ক্ষীণ কোলাহল বিদ্যামন্দিরে সমাধিমগ্ন বাণীভক্তের চিত্ত বিক্ষুভিত করিতে পারে না।

সাহিত্য সম্মিলনের তিন রাত্রিই জ্যোৎস্নাময়ী ছিল। যখন বালুকা-ধবল কলেজ প্রাঙ্গণ কৌমুদী জোয়ারে

ভাসিয়া, যাইত আর অতীতের সুখস্মৃতির মত পাপিয়ার ঝঙ্কার কিংবা 'বউ কথা কও' পাখীর মধুর সঙ্গীত রজনীর নীরবতা মুখরিত করিয়া তুলিত, তখনই মনে হইত যেন বৎসলা বাণী জননী স্বর্গ হইতে একখানি নন্দন দৃশ্য পৃথিবীতে প্রেরণ করিয়া স্বীয় পূজার উপযুক্ত স্থানই নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন।

১লা বৈশাখ অপরাহ্ণ তিনটার সময় সম্মিলনের প্রথম অধিবেশন হয়। কলেজের দুই বারেন্দার অন্তঃস্থলে সভামণ্ডপ নির্ম্মিত হইয়াছিল। মণ্ডপের প্রবেশদ্বার দেবদারু পত্রে সুসজ্জিত। স্তম্ভগুলি নানা রঙ্গের কাপড় দিয়া জড়ান। উপরে শ্বেত লোহিত বস্ত্রাতপ। তাহার নীচে অনেকগুলি সুরঞ্জিত টানা পাখা। মণ্ডপের দক্ষিণ পার্শ্বে ইষ্টক গ্রথিত উচ্চ বেদি। তাহার উপর সভাপতি ও বিদেশী প্রতিনিধি বর্গের বসিবার জন্য বহু বেত্রাসন। এই বেদির পশ্চাদ্ভাগে কলেজের বারিন্দার উপর মহিলাদিগের বসিবার স্থান হইয়াছিল।

প্রথম দিন সভাপতি শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় মণ্ডপে উপস্থিত হইবার বহু পূর্ব্বেই এই বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানাচার্য্যকে দেখিবার নিমিত্ত, উদগ্রীব দর্শক মণ্ডলীতে সভাস্থল পরিপূর্ণ হইয়াছিল। বিপুল উৎসাহে ও আগ্রহাতিশয্যে যে জনস্রোত সভামণ্ডপ পূর্ণ করিতেছিল, তাহার গতিরোধ করা যুবা স্বেচ্ছাসেবকগণের অসাধ্য হইয়াছিল। তাই প্রথম অধিবেশনেয় সময় একটু গোলযোগ হয়।

ময়মনসিংহের ও বিভিন্ন জেলার প্রতিনিধি ও দর্শক বৃন্দে সভায়, অন্যূন ছয় সহস্র লোকের সমাগম হইয়াছিল। সকলেরই মুখে অপূর্ব্ব উৎসাহ। সকলেই সাহিত্যানুরাগে উৎফুল্ল।

বেলা দুইটা হইতেই কলিকাতা প্রভৃতি স্থানের প্রতিনিধিগণ সভামণ্ডপে উপস্থিত হইয়া আসন গ্রহণ করিতে লাগিলেন। কাশীমবাজারের মহারাজ মণীন্দ্র চন্দ্র নন্দী বাহাদুর, অধ্যাপক রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, সুলেখক জলধর সেন, নাট্যাচার্য্য ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, মনস্বী দার্শনিক হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, অধ্যাপক ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রধান ঐতিহাসিক আনন্দ নাথ রায় প্রভৃতি কলিকাতা হইতে প্রতিনিধি স্বরূপে শুভাগমন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রবেশমাত্র সভামণ্ডপে আনন্দের কোলাহল উত্থিত হইয়াছিল।

অতঃপর তিনটার কিছু পূর্ব্বে সভাপতি ডাঃ জগদীশ চন্দ্র বসু সভাস্থলে উপনীত হন। সেই বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানাচার্য্যকে সম্মান করিবার নিমিত্ত বিপুল জনতা সসম্ভ্রমে দণ্ডায়মান হইল এবং ঘন ঘন করতালিতে সভাস্থল প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

রাজা জগৎকিশোর আচার্য্য চৌধুরীর প্রস্তাবানুসারে ডাঃ বসু সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে, সর্ব্বাগ্রে ভূতপূর্ব্ব "জাহ্নবী" সম্পাদক শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় ভাগলপুর সম্মিলনের সভাপতি জষ্টিস্ সারদাচরণ মিত্র মহোদয়ের লিখিত গত বর্ষের বাঙ্গালা সাহিত্যের বিবরণ পাঠ করেন। মিত্র মহাশয় তাঁহার প্রবন্ধে বঙ্গীয় সাহিত্য গগন হইতে, শিশিরকুমার, ইন্দ্রনাথ, চন্দ্রনাথ, কালীপ্রসন্ন প্রভৃতি উজ্জ্বল নক্ষত্রনিচয়ের তিরোধানে গভীর বেদনা প্রকাশ করিয়াছেন। তৎপর ময়মনসিংহের কবি, "দশানন বধ" মহাকাব্যরচয়িতা শ্রীযুক্ত হরগোবিন্দ লস্কর মহাশয় অভিনব ছন্দে একটি নাতিদীর্ঘ সুললিত কবিতা পাঠ করেন।

অতঃপর অভ্যার্থনা সমিতির সভাপতি সুসঙ্গের মহারাজ কুমুদচন্দ্র সিংহ বাহাদুর বি. এ. তাঁহার অভ্যর্থনাসূচক অভিভাষণ পাঠ করিয়া সরস ললিত ভাষায় শ্রোতৃ মণ্ডলীকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। সুসঙ্গ অধিপতির অভিভাষণ শেষ হইলে ময়মনসিংহের লোকপ্রিয় ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ব্লাকউড্ একটি ক্ষুদ্র বক্তৃতা করেন। তাঁহার বক্তৃতার প্রতি অক্ষরে মধুরতার ন্যায় উদারতা বিরাজ করিতেছিল। তৎপর সভাপতি মহাশয় যে সকল ব্যক্তি সভায় কোনও কারণ বশতঃ উপস্থিত হইতে না পারিয়া, সহানুভূতি জ্ঞাপন করিয়া চিঠি অথবা টেলিগ্রাম পাঠাইয়াছিলেন, তাহাদের নাম উল্লেখ করেন। তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী, ঢাকার উকিল শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র রায়, কুমার শ্রীযুক্ত শরদিন্দু নারায়ণ রায় মহাশয়দিগের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

চট্টগ্রামের উদীয়মান কবি জীবেন্দ্রকুমার তাঁহার সুললিত 'অর্ঘ্য' গীতি গাইয়া,— সেই বিরাট্ সাহিত্য যজ্ঞে, লোক-বিশ্রুত বিজ্ঞানাচার্য্যকে ঋত্বিক্ বরণ করিলে, সভাপতি মহোদয় তাঁহার সারাজীবনের গবেষণার ফল, জগতের অত্যাশ্চর্য্য আবিষ্কার, সজীব ও নির্জ্জীব স্পন্দনের গভীর তত্ব অতি সহজ বঙ্গভাষায় বিবৃত করেন। তিনি জগদ্ বিখ্যাত পণ্ডিত হইলেও উচ্চকণ্ঠের জন্য প্রসিদ্ধ নহেন। তাই, সেই বিশাল মণ্ডপে যখন তাঁহার কণ্ঠস্বর অস্ফুট জন কোলাহলে ডুবিয়া গেল, তখন তিনি স্বয়ং প্রবন্ধ পাঠ না করিয়া সাহিত্য পরিষদের সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় ও তৎপর ঢাকার ব্যারিষ্টার. মিঃ, আর, কে দাস সাহেবের প্রতি স্বীয় প্রবন্ধ পাঠের অনুমতি প্রদান করেন। উক্ত পাঠ সমাপ্ত হইলে, ভাগলপুরের ও রাজসাহীর সাহিত্য সম্মিলনের রিপোর্ট পঠিত হয়। তৎপর মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের প্রস্তাবে ও বরিশাল নিবাসী সুলেখক শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায় চৌধুরী মহাশয়ের সমর্থনে সম্মিলনের কতগুলি নিয়মাবলী গৃহীত হইল। এইরূপে সম্মিলনের প্রথমদিনের অধিবেশন শেষ হয়।

২রা বৈশাখ প্রাতঃকাল দেবকন্যা উষা আসিয়া তখনও আকাশের আঙ্গিনায় সোণার ছড়া দেয় নাই। পল্লীর অশ্বথ গাছে দুটি একটি কোকিল জাগিয়া ডাকিতেছে মাত্র। কোয়াসায় মুখ ঢাকা দিয়া তখনও প্রকৃতি নীরবে ঘুমাইতেছিল। দীঘির শাদা জলে পা ফেলিয়া বাতাস এখনও নাচিতে আরম্ভ করে নাই। কিন্তু স্বেচ্ছাসেবক দল সেই ভোরে উঠিয়া ঘরে ঘরে গরম চা ও মিঠাই মোহনভোগ বিলাইতেছিল। আজ সকাল ৭ টায় অধিবেশন। নির্দ্দিষ্ট সময়ের বহু পূর্ব্বে সভাপ্রাঙ্গণ পূর্ণ হইয়া গেল। নির্দ্দিষ্ট সময়ে সভাপতিসহ প্রতিনিধিগণ বেদিতে উপবিষ্ট হইলেন। সুকণ্ঠ, উমেশ, গিরীশ, কামিনী মধুর তান লয় সংযোগে বাণী-বন্দনা গাইয়া উঠিলেন। সর্ব্বপ্রথম সাহিত্যিক সমাজে সুপরিচিত শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ, মহাশয় তাঁহার স্বরচিত একটি সংস্কৃত উদ্বোধন কবিতা পাঠ করেন। তাহার ভাষা ও ভাব দুইই চমৎকার।

সাহিত্যসম্মিলন যে বচন রচনা করিয়াই ক্ষান্ত নহেন, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবেই কার্য্যকুশল, তাহার পরিচয় দিবার নিমিত্ত কবি হরগোবিন্দ লস্কর মহাশয় এক উপাদেয় প্রস্তাব উপস্থিত করেন, তাহা এই।—

"দরিদ্র সাহিত্যসেবিগণের সাহায্য ও তাঁহাদের পুস্তকাদি প্রকাশ করিবার জন্য ধনভাণ্ডার সংস্থাপিত হউক।" এই ভাণ্ডারে হরগোবিন্দ বাবু স্বয়ং ১০০০৲ হাজার টাকা দান করিতে অঙ্গীকার করিলেন এবং ইহাও বলেন যে, তাঁহার অবস্থার অবনতি না হইলে, তিনি আরও ৪০০০৲ হাজার টাকা এবং তাঁহার স্বরচিত "দশানন বধ" কাব্যের স্বত্বের বিক্রয়লব্ধ টাকা ও তালুকদারির অন্তর্গত একখানি গ্রাম এই ভাণ্ডারের পুষ্টিসাধন কল্পে প্রদান করিবেন। 'সাধু যাহার ইচ্ছা ঈশ্বর তাহার সহায়' এই মহাবাক্য হরগোবিন্দ বাবুতে সার্থক হউক। বলা বাহুল্য, সেই বিরাট্ সভা এই অকৃত্রিম সাহিত্য সৌহার্দ্দে কেবলই বিস্মিত হইয়াছিল। "Journeyman work" ভিন্ন কোনও দেশের সাহিত্যের ভূয়সী উন্নতি হইতে পারে না ইহা Mathew Arnold বলিয়াছেন। সেইরূপ কার্য্যের জন্য যিনি দানে মুক্তহস্ত, কেবল সাহিত্যিক কেন সমগ্র দেশ তাঁহার নিকট ঋণী। আমরা কবিসমাজে সমৃদ্ধ এবং সমৃদ্ধ সমাজে কবি হরগোবিন্দের দীর্ঘজীবন কামনা করি। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত মহাশয় কথিত দরিদ্র ভাণ্ডারে নগদ ২৫৲ এবং স্বরচিত "রজনীকান্ত সেনের জীবনার" খণ্ড দিতে প্রতিশ্রুত হন। তারপর নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি পাঠ করেন।—ইঁহাদের বিস্তৃত বিবরণ দিবার স্থান এখানে না হইলেও আমরা যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করিব।

ময়মনসিংহের ও ঢাকার "বিবরণ" প্রণেতা শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মজুমদার M. R. A. S. মহাশয় "ময়মনসিংহের সাহিত্যচর্চ্চা" নামক প্রবন্ধ পাঠ করেন। ইহাতে প্রাচীনকাল হইতে আধুনিক সময় পর্য্যন্ত স্থানীয় কবি ও গদ্য লেখকগণের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, পুস্তক, সংবাদপত্র, বক্তৃতা, সাহিত্যসমিতির বিবরণ সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল। লেখার বাবুর ভাষার বৈচিত্র্য ও বিষয় সমাবেশের যথেষ্ট কুশলতা আছে।

ভূতপূর্ব্ব "জাহ্নবী" পত্রের সম্পাদক শ্রীযুক্ত নলিনী-রঞ্জন পণ্ডিত কর্ত্তৃক "আধুনিক নাট্য সাহিত্য" পঠিত হয়। ইহাতে বাঙ্গালা নাটকের একটা মোটামুটি ইতিহাস পাওয়া যায় বটে। কিন্তু নাটককারদিগের বিভিন্ন রচনা প্রণালী বা তৎসময়ের চিত্র, অথবা বাঙ্গালী সমাজের প্রতিকৃতি অঙ্কনে কাহার কিরূপ কুশলতা ইত্যাদি বাঞ্ছনীয় ও প্রয়োজনীয় বিষয়গুলির অভাব বড়ই অনুভূত হইয়াছিল। প্রবন্ধে বর্ত্তমান নাট্য গুরু দ্বিজেন্দ্রলালের নামই ছিল না—পরে সেই ভ্রম-সংশোধন করা হয়।

ময়মনসিংহের কবিরাজ শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র সেন "আয়ুর্ব্বেদের ক্রম বিকাশ" শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করেন। ইহা তাঁহার গভীর বিদ্যাবত্তা ও গবেষণার সাক্ষী। স্বয়ং সভাপতি এই প্রবন্ধের বিশেষ প্রশংসা করিয়াছিলেন।

"পূর্ব্ববঙ্গের নদী পরিবর্ত্তন"—ফরিদপুরের ইতিহাস লেখক শ্রীযুক্ত আনন্দনাথ রায় কর্ত্তৃক পঠিত। ইহাতে মেঘনার গতি ও ব্রহ্মপুত্রের ক্ষীণ পরিণতির বিষয় উল্লিখিত হইয়াছিল। তৎপর সৈয়দ সহিদুল্লা বি, এ, "পারসী ও আরবী ভাষার গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ" নামক একটি রচনা পাঠ করেন। একজন মুসলমান বাঙ্গালা ভাষাকে মাতৃ সম্বোধন করিতেছেন, ইহা সমগ্র বাঙ্গালী জাতির আনন্দের বিষয় সন্দেহ নাই। স্বয়ং সহিদুল্লা সাহেব প্রবন্ধের একস্থানে বলিয়াছেন (প্রবন্ধ আমাদের নিকট নাই আমরা শুধু স্মৃতির উপর নির্ভর করিতেছি) যেমন শিশু মাতৃ স্তন্য ভিন্ন কেবল গো-দুগ্ধে যথেষ্ট পুষ্টি লাভ করিতে পারে না, সেইরূপ বাঙ্গালী মুসলমান উর্দ্দু আরবী পারসী দিয়া সাহিত্য জগতে উন্নতি লাভ করিতে সমর্থ হইবে না। অপিচ, হিন্দু ও মুসলমান পরস্পর জাতি বিদ্বেষ ভুলিয়া একত্র সম্মিলিত হইবার একটি মাত্র উপায় আছে, তাহা একই মাতৃভাষা। পরস্পরকে ঘৃণা না করিয়া, পরস্পর একে অন্যের সাহিত্য, ধর্ম্মশাস্ত্র অকপটচিত্তে আলোচনা করিলেই একীভাবের বিলক্ষণ সম্ভাবনা। সংস্কৃত বহু গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ আছে, কিন্তু আরবী পারশী গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ নাই বলিলেই চলে। এই অভাব দূর করিয়া ভাষাজননীর অভাব মোচন ও পুষ্টিসাধন আবশ্যক। বিশেষ, অনেক আরবী পারশী গ্রন্থ হইতে বঙ্গদেশের ঐতিহাসিক তত্ত্বও সংগৃহীত হইতে পারে। কিন্তু অনুবাদ করিলেই যথেষ্ট হইবে না অক্ষরান্তরিত (translitration) করিবার প্রণালীও উদ্ভাবিত হওয়া আবশ্যক। যেমন ভাবের গম্ভীর্য্যে তেমনই রচনার মাধুর্য্যে ও প্রসাদগুণে এই প্রবন্ধখানি উৎকৃষ্ট হইয়াছিল।

ময়মনসিংহের ভূতপূর্ব্ব স্কুল পণ্ডিত শ্রীযুক্ত চন্দ্রকিশোর তরফদার মহাশয় "মহাভারতের কাল ও জ্যোতিষিক প্রমাণ" সম্বন্ধে একটি গভীর জ্ঞানপূর্ণ প্রবন্ধ পাঠ করেন। বস্তুতঃ ঐ প্রবন্ধে এত তথ্য নিহিত রহিয়াছে যে তাহা একবার মাত্র শুনিয়া কিছুই হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। অনেকবার নিবিষ্টচিত্তে পড়া উচিত।

"ব্যাকরণের বিভীষিকা" প্রবন্ধ "বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় পাঠ করেন।

ললিত বাবু বাঙ্গালার রসিক লেখক বলিয়া পরিচিত। তিনি প্রবন্ধ পাঠ করিতে দণ্ডায়মান হইলেই, সভাতে ঘন ঘন করতালি পড়িতে লাগিল। তিনি পড়িতে লাগিলেন যে আজ তিনি হাসির ফোরায়া লইয়া আসেন নাই। আজ ব্যাকরণের সাহারা তাঁহার আলোচ্য বিষয়। এই ভূমিকা করিয়া, বাঙ্গালা লেখকদিগের দুই শ্রেণী বিভাগের কথা বলেন। এক শ্রেণীর লেখক আছেন, তাঁহারা বলেন যে বাঙ্গালা সংস্কৃতের কন্যা সুতরাং যতই সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম মানিয়া চলা যাইবে, ততই বাঙ্গালা ভাষার বিশুদ্ধি রক্ষিত ও উন্নতি সাধিত হইবে। আর এক দল বলেন, যে বাঙ্গালা সংস্কৃতের কন্যা নহে কনিষ্ঠ সহোদরা। বাঙ্গালা ভাষায় যে সকল শব্দ প্রচলিত হইয়াছে, তাহা হয়ত সংস্কৃত ব্যাকরণের কৈফিয়তে টিকিবে না—কিন্তু তাহারা তো খাঁটি বাঙ্গালা শব্দ। এখন কঃ পন্থাঃ? ললিত বাবু কোনও মীমাংসায় উপনীত হন নাই। তাঁহার প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়টি দশভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন—সংস্কৃত-গন্ধি শব্দ, বিকৃত সংস্কৃত শব্দ, শব্দের লিঙ্গবিচার ইত্যাদি।

ললিত বাবু সম্পূর্ণ প্রবন্ধ পাঠ না করিলেও তাহা হইতে বাছিয়া বাছিয়া যে সকল স্থান পড়িয়াছিলেন, তাহাতে নীরস ব্যাকরণের সাহারায় হাসির বিপুল ফোয়ারা ছুটিয়াছিল। সেই সংক্রামক হাস্যে স্বয়ং সভাপতিও বাদ যান নাই। নীরসকে সরস করিতে ললিত বাবুর মত সিদ্ধহস্ত অল্প লেখকই আছেন। Amusement and true knowledge hand in hand ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ আমরা এমনটি বড় প্রত্যক্ষ করি নাই। এই পর্য্যন্ত দ্বিতীয় দিবসের সকাল বেলার অধিবেশন শেষ হইল।

আবার, অপরাহ্ণ ৪ টার সময়, দ্বিতীয় অধিবেশন আরম্ভ হয়। পূর্ব্ববঙ্গের স্বভাব কবি শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র দাস 'সম্মিলন' বিষয়ে একটি কবিতা লিখিয়াছিলেন। পুণ্যতীর্থ ব্রহ্মপুত্র নদের তীরদেশে সাহিত্য তীর্থের সম্মিলনে পুণ্য মধুরের এক অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ হইয়াছে বলিয়া কবি বর্ণনা করেন।

তৎপর ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রভৃতির কএকখানি টেলিগ্রাম পঠিত হইলে, সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধে ঢাকার সুবিখ্যাত পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রসন্নচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় তাঁহার স্বভাব মধুর অথচ উন্মাদিনী ভাষায় "বঙ্গভাষার ক্রম বিকাশ" সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা করেন। তাহাতে তিনি বঙ্গভাষা কি ছিল ও কিরূপ হওয়া উচিত এবং প্রাদেশিক অপশব্দ বর্জ্জন করিয়া, ভাষার একটা উচ্চ আদর্শ নিরূপিত হওয়া কর্ত্তব্য ইহা স্বল্প কথায় বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। সেই সপ্ততিপর পূজ্যপাদ বৃদ্ধ পণ্ডিত ও বাঙ্গালার প্রবীণ সাহিত্যিকের মুখের প্রত্যেকটি উচ্চারিত বাণীই সমবেত জনমণ্ডলী শ্রদ্ধার সহিত উৎকর্ণ হইয়া শুনিতেছিল।

তারপর ময়মনসিংহ কলেজের তর্কশাস্ত্রের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শশিমোহন বসাক, এম্, এ, "অদ্বৈতবাদ ও স্পিনোজা"-শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করেন। জন-সাধারণের নিকট ইহার বিষয় ও ভাষা উভয়ই দুর্ব্বোধ হইয়াছিল।

ঢাকার "ভারত মহিলা" পত্র সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা সরযূবালা দত্ত "সাহিত্য সেবা ও বঙ্গনারী" প্রবন্ধে বঙ্গমহিলা সমাজকে সাহিত্য ক্ষেত্রে যোগদান করিতে আহ্বান করেন এবং স্বয়ং তাহার পথ প্রদর্শন করেন। তিনি যেরূপ দক্ষতা ও কৃতিত্বের সহিত তাঁহার "ভারত মহিলা" সম্পাদিত করিয়া আসিতেছেন তাহাতে তিনি পূর্ব্ববঙ্গ মহিলাকুলের গৌরবের বিষয় সন্দেহ নাই। সভাপতির আদেশ অনুসারে সেই বিরাট সভা এক ব্যক্তির ন্যায় দণ্ডায়মান হইয়া, এই বিদুষী মহিলার প্রতি বিপুল সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিল।

তারপর ঢাকা "পূর্ব্ববঙ্গ সাহিত্য সমাজের" সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত অবনীকান্ত সেন সাহিত্য-বিশারদ "সাহিত্য ও সমাজ" সম্বন্ধে একটি সারগর্ভ প্রবন্ধ পড়েন। ইহাতে সাহিত্য কিরূপে জাতীয় চরিত্রের সাক্ষ্যদান করে এবং পক্ষান্তরে জাতীয়চরিত্রসংগঠনে সহায় হয়, তাহাই অতি সুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছিল। ভাব উন্নত, ভাষা কোমলকান্ত। লেখক বয়সে নবীন হইলেও লিপিচাতুর্য্যে কুশলতার পরিচয় দিয়াছেন।

"জাতীয় উৎকর্ষ" রাজসাহীর উকিল শ্রীযুক্ত শশধর রায় এম্, এ, বি, এল্, কর্ত্তৃক পঠিত। ইহা জীব-তত্ত্ব (Biology) বিষয়ক একটি প্রবন্ধ। উপযুক্ত পাত্র পাত্রী নির্ব্বাচন করিয়া বিবাহ দেওয়া কর্ত্তব্য, তাহা হইলেই জাতির দেহ-মনের উন্নতি সাধন হইবে ইহাই এই প্রবন্ধের মুখ্য আলোচ্য বিষয়। ইহার পর সভাপতি শ্রীযুক্ত বসু মহাশয় কোনও কার্য্যানুরোধে সেদিনকার মত সভা ত্যাগ করিলে মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। তখন দিন প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। দিনান্তের গরমে অনেকে সভা হইতে বাহিরে আসিলেও সভামণ্ডপ পূর্ণ বলিয়াই বোধ হইতেছিল। অনেকদিন জন সাধারণের এমন উৎসাহ দেখা যায় নাই।

তৎপর যথাক্রমে নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি পঠিত হইতে লাগিল :—

"পৌণ্ড্রবর্দ্ধন" শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র সিংহ পাঠ করেন। সিংহ মহাশয় প্রাচীন ইতিহাস বেত্তাদিগের মধ্যে লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক, প্রবন্ধ তাঁহার লেখনীর অনুরূপই হইয়াছিল। "কালিদাসের কাব্যে বঙ্গভাষা ও বাঙ্গালী"

শীর্ষক প্রবন্ধ শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কর্তৃক পঠিত হয়। ইহার অধিকাংশ মতের সহিত আমার বিবাদ থাকিলেও, ভাষাগত সৌন্দর্য্যের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না।

অধ্যাপক সুরেন্দ্রনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় এম, এ, "মাইকেল ফ্যারাডে" নামক এক প্রবন্ধ পাঠ করেন। ইহাতে সেই বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকের জীবনী ও কার্য্যের আলোচনা করা হইয়াছিল।

অতঃপর ময়মনসিংহ সেরপুরের জমিদার শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় "ময়মনসিংহের মুদ্রাযন্ত্র ও সংবাদ পত্র" সম্বন্ধে একটি চমৎকার রচনা পাঠ করেন। তাঁহার পিতা স্বর্গীয় হরচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় স্বয়ং যেমন বিদ্বান, তেমনই বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। ময়মনসিংহে তিনিই প্রথম ছাপাখানা স্থাপিত করেন। প্রবন্ধ পাঠক চারু বাবুর নামে তাহার নাম "চারু-প্রেস" করা হইয়াছিল। আজিও ময়মনসিংহের "চারুমিহির" চারু বাবুর নামের সহিত জড়িত থাকিয়া তাঁহার যশস্বী পিতার অক্ষয়কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে।

"সূতিকা গৃহ" যশোহর কালিয়া নিবাসী ও বগুরার ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্যারীশঙ্কর দাস গুপ্ত কর্তৃক পঠিত হইয়াছিল। আমাদের সূতিকা গৃহে ভবিষ্যৎ বংশধর শিশুগণ কিরূপ অযত্নে রক্ষিত হইয়া, সময় সময় প্রসূতি সহ অকালে কাল কবলে পতিত হয় এবং কি প্রণালীতে তাহার উন্নতি বিধান হইতে পারে, ডাক্তার বাবু তাহা বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছিলেন।

তৎপর প্রসিদ্ধ বাঙ্গালী বৈদিকপণ্ডিত শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র গুপ্ত বিদ্যারত্ন মহাশয় "বেদের উৎপত্তি" বিষয়ে একটি সারগর্ভ প্রবন্ধ কাঠ করেন। পলিতকেশ শুভ্রশ্মশ্রু গৈরিক বসনধারী পণ্ডিত মহাশয়কে দেখিয়া সকলেরই শ্রদ্ধার উদ্রেক হইয়াছিল। বৈদিক ঋষি কেমন ছিলেন জানি না; সম্ভবতঃ তেজঃ সম্পন্ন ওজস্বীই হইবেন। বিদ্যারত্ন মহাশয়কে অনেকে কল্পনার চক্ষে সেই ঋষির সহিত তুলনা করিতেছিলেন। পণ্ডিত মহাশয়ের দুর-প্রসারী কণ্ঠস্বর উদাত্ত উচ্চারণের উপ- । তিনি আজীবন যে বেদাদি শাস্ত্র চর্চ্চা করিয়াছেন, তাহার একটি ফলস্বরূপ ঐ প্রবন্ধ শ্রোতৃমণ্ডলীকে উপহার দিয়াছিলেন। সভাস্থল তাঁহার বাক্যের ওজস্বিতায় বিক্ষুভিত হইয়া উঠিয়াছিল!

দ্বিতীয় দিবসের দ্বিতীয় অধিবেশন এখানে শেষ হয়।

তৃতীয়দিনের অধিবেশন।

৩রা বৈশাখ। আজ অধিবেশনের তৃতীয় দিন। প্রাতে ৭টার সময় সভাপতি ও সভ্যগণ সমাসীন হইলে, শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ রচিত "সম্মিলন" নামক কবিতাটি পঠিত হয়। তাড়াতাড়ি বলিয়াই বোধ হয় এই কবিতায় ক্ষীরোদ বাবুর স্বভাবসিদ্ধ কৃতিত্ব লক্ষিত হইল না। শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চৌধুরী মহাশয়, ময়মনসিংহের গৌরব স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কারের উপযুক্ত স্মৃতিচিহ্ন রক্ষার এক প্রস্তাব উপস্থিত করেন। উক্ত প্রস্তাব সুষঙ্গের মহারাজ ও "চারুমিহিরের" ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক, "অরূপা", "লহরী" প্রভৃতি উপন্যাস প্রণেতা শ্রীযুক্ত অমরচন্দ্র দত্ত এবং কলিকাতার প্রত্নতত্ত্ববিৎ শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও অন্যান্য ব্যক্তিগণ কর্তৃক সমর্থিত হইলে সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। এই স্মৃতিচিহ্ন কেবল ময়মনসিংহবাসীর অর্থ দ্বারাই ময়মনসিংহে রক্ষিত হইবে, সভাতে এরূপ কথাও হইয়াছিল।

তৎপর কলিকাতা ন্যাশনাল কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার ইতিহাস, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ক বিদেশী ভাষায় লিখিত গ্রন্থ সমূহের বঙ্গানুবাদ দ্বারা ভাষার পুষ্টি ও শিক্ষার প্রসর-বৃদ্ধি হওয়া আবশ্যক ইহা প্রস্তাব করেন। মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর ও শ্রীযুক্ত জলধর সেন ও বরিশালের বাগ্মিপ্রবর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন সমর্থন এবং শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায় চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ উহার অনুমোদন করিলে, উক্ত প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

তারপর প্রবন্ধ পঠিত হইতে থাকে। বিষয় নির্ব্বাচন-সমিতির অধিকার-প্রমত্ততা বশঃতই হউক, কিম্বা অনব-

ধানতা দোষেই হউক, অধিবেশনের তিন দিবসই প্রবন্ধ নির্ব্বাচনে কুশলতা পরিদৃষ্ট হয় নাই। কতকগুলি প্রবন্ধ যাহা পড়িতেই ভাল, শুনিলে সহজে অনুসরণ করা যায় না, তাহা পাঠ করিতে দীর্ঘ সময় দেওয়া হইয়াছিল। আর কতকগুলি, যাহা পাঠ করিলে, শ্রোতৃবর্গ আনন্দ ও জ্ঞানলাভ করিতে পারিতেন, তাহাদের জন্য অত্যল্প সময় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। এ কোন্ চিত্রগুপ্তের অয়োমুখী লেখনীর বাহাদুরী আমরা জানি না! যাহাহউক, শেষ অধিবেশনে নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি পঠিত হইয়াছিল;— "অন্ন সংস্থান" শ্রীযুক্ত রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক পঠিত। এ প্রবন্ধটি মুদ্রিত হইয়া পুস্তিকাকারেও বিতরিত হইয়াছিল। নিত্য প্রয়োজনীয় কি কি জিনিষের ব্যবসায় করিয়া সহজে, অল্প মূলধনে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা যাইতে পারে, তাহার আলোচনাই এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। তৎপর অধ্যাপক পঞ্চানন নিয়োগী মহাশয় "আয়ুর্ব্বেদ ও আধুনিক রসায়ন" সম্বন্ধে একটি গভীর গবেষণা পূর্ণ প্রবন্ধ পাঠ করেন। পঞ্চানন বাবু এ ক্ষেত্রে অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেছেন; এবং নূতন বিজ্ঞানের আলোকে যে ভারতের প্রাচীন চিকিৎসা শাস্ত্রের বহুল উন্নতি সাধন ও অপব্যয় না করিয়া স্বল্প মূল্যে উৎকৃষ্ট ঔষধ প্রস্তুত করা যাইতে পারে, অন্যান্য অনেক জ্ঞাতব্য বিষয়ের সহিত, স্থূলতঃ তাহাই এই প্রবন্ধে আলোচনা করিয়াছেন।

তৎপর যে সকল প্রবন্ধ পঠিত হয় (সত্য কথা বলিতে গেলে, পঠিত বলিয়া গৃহীত হয়) তাহাদের ও তত্তৎ রচয়িতার নামের লিষ্ট প্রদত্ত হইল। একেতো মধ্যাহ্ন কালে শ্রোতৃবর্গের অধৈর্য্য বশতঃ গোলমাল, তাহাতে প্রবন্ধের স্বল্প পরমায়ু, এই উভয়ে মিলিয়া প্রবন্ধগুলির যে দুর্দ্দশা ঘটাইয়াছিল তাহা আহা আর কি বলিব?

"বৃক্ষের সহিত ভূমির উর্ব্বরতার সম্বন্ধ"—শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য। "বাংলা ও দ্রাবিড় ভাষা"— শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়।

"ভাষা শিক্ষা কৌশল"—শ্রীযুক্ত বিভুচরণ বটব্যাল। এই প্রবন্ধ সম্বন্ধে একটি কথা বলা আবশ্যক মনে করি। বিভু বাবু এক্ষণে ময়মনসিংহের উকিল। ইনি পূর্ব্বে শিক্ষক ছিলেন। সেই অভিজ্ঞতায় এবং বহুবৎসরের গবেষণা ও পাঠের ফলে ইনি ভাষা শিক্ষার যে অভিনব অথচ সরল প্রণালী উদ্ভাবিত করিয়াছেন, তাহা বস্তুতঃ আশ্চর্য্যজনক। ইনি কেবল কল্পনার রথারূঢ় নহেন, কিন্তু নিজের চিন্তার ফল কার্য্যে পরিণত করিয়া সফল-কাম হইয়াছেন। অত্যল্প কালের মধ্যে ইঁহার পুত্র দিগকে নিজের উদ্ভাবিত প্রণালীতে ইংরাজী ও সংস্কৃত ভাষায় এমন সুন্দর শিক্ষা দিয়াছেন যে, দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। ইঁহার প্রবন্ধ মুদ্রিত হইলে, সকলেরই মনোনিবেশ পূর্ব্বক তাহা পাঠ করা কর্ত্তব্য।

"ময়মনসিংহে মুসলমান প্রবেশ"—শ্রীযুক্ত কৈলাস চন্দ্র বিশ্বাস। অতি সংক্ষেপ পঠিত হয়। আমরা ভাল করিয়া শুনিতে পারি নাই। পরিশেষে শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়—"বাংলা অক্ষরের উৎপত্তি" সম্বন্ধে প্রবন্ধ পড়েন। ইহা বড়ই কুতুহলোদ্দীপক হইয়াছিল। রাখাল বাবু ২২০০ বৎসর পূর্ব্বের বাংলা অক্ষরের নমুনা দেখাইয়া ছিলেন। অতঃপর ৬০ জনের নাম পড়া হয় যাঁহারা "সাধারণ সম্মিলন সমিতির" সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। প্রস্তাব করিয়াছিলেন শ্রীযুক্ত শশধর রায়, রাজসাহীর উকিল।

ইহার পর ধন্যবাদের পালা! বৃদ্ধ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্রীনাথচন্দ মহাশয় ময়মনসিংহের পক্ষ হইতে বিদেশী প্রতিনিধিদিগকে; এবং বিদেশী প্রতিনিধিগণের মধ্য হইতে শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ, এম্, এ, শ্রীহট্টের প্রতিনিধি স্বরূপ, মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর ও শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী কলিকাতার পক্ষে, বারিষ্টার শ্রীযুক্ত আর, কে, দাস ঢাকার পক্ষে,—ময়মনসিংহকে ধন্যবাদ প্রদান করেন। মনস্বী হীরেন্দ্রনাথ সাহিত্য সেবকদিগকে সাহিত্য সেবায় আহ্বান করিয়া সম্মিলনের মহান্ আদর্শের দিকে লক্ষ্য রাখিতে বলেন। তারপর সভা ভঙ্গ হইল। সাহিত্য সম্মিলনের চতুর্থ অধিবেশনের যবনিকা আর এক বৎসরের জন্য পতিত হইল।

ময়মনসিংহ এবার যেরূপ উৎসাহে ও নবোদ্যমে সাহিত্য-যজ্ঞ উদ্‌যাপন করিয়াছে, তাহা—মুক্তকণ্ঠে

প্রশংসনীয়। কেহ অর্থ দিয়া, কেহ উৎসাহ দিয়া কেহ বা অক্লান্ত পরিশ্রমে এবং সকলেই গভীর শ্রদ্ধার সহিত বাণী-জননীর যে বিপুল সেবার আয়োজন করিয়া, সাহিত্যিক ভ্রাতৃবৃন্দকে সমবেত করিয়াছিলেন, তজ্জন্ত বঙ্গভাষা তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ।

সাহিত্য সম্মিলনের সঙ্গেই সিটিকলেজিয়েট স্কুল গৃহে এক সাহিত্য প্রদর্শনীও খোলা হয়। তাহাতে ময়মনসিংহ জিলার অনেক প্রাচীন কীর্ত্তির আলোকচিত্র, অনেক গদ্য পদ্য গ্রন্থকারের পুঁথি, কতিপয় প্রস্তর-মূর্ত্তি প্রভৃতি জিনিষের সুষ্ঠু সমাবেশ হইয়াছিল। এইরূপ প্রদর্শনী এই নূতন। উত্তরোত্তর ইহাতে আরো শ্রীবৃদ্ধি হইবে আশা করা যায়।

ময়মনসিংহের সাহিত্য সম্মিলনে যে বিপুল অর্থ ব্যয় হইয়াছে এবং গত তিন অধিবেশনেই হইয়াছে, তাহাতে দেশের দারিদ্র্য উহা কতদিন সমভাবে চালাইতে সমর্থ হইবে জানি না। একদিকে সাহিত্যিকগণ সম্মিলিত হইয়া ভাব আদান প্রদান না করিলে, যেমন সাহিত্যের কল্যাণ হয় না, তেমনই পক্ষান্তরে কেবল প্রস্তাব উত্থাপন, সমর্থন, অনুমোদন ও গ্রহণ করিলেই যথেষ্ট হইবে না। অগ্নিহোত্রী যেমন দিবারাত্র অগ্নিপোষণ ও তাহাতে হোম করেন, সেইরূপ সাহিত্যিকগণের প্রতিনিয়ত মননশীল ও কর্ম্মপরায়ণ হইতে হইবে। বার্ষিক সম্মিলনে কার্য্যপ্রণালী নির্দ্দিষ্ট হইলে, তদনুসারে একবৎসর যথা-নির্দ্দিষ্ট কার্য্যে তৎপর হইতে হইবে। উন্নতির একটি একটি করিয়া সোপান শনৈঃ শনৈঃ বাহিয়া উঠিতে হইবে। নচেৎ বৃথাই সব আড়ম্বর। Goldsmith এর ভাষায় "অধ্যবসায়বিহীন উৎসাহ নিতান্তই অকিঞ্চিৎ-কর।"

আমার শেষ বক্তব্য স্বেচ্ছা সেবকগণের সরলমধুর ব্যবহার, অক্লান্ত প্রফুল্ল পরিশ্রম ও নীরবগভীর দেশভক্তি। স্নান নাই, আহার নাই, নিদ্রা নাই, সেই এক লক্ষ্য—প্রতিনিধিগণের তুষ্টি বিধান!

আমরা ময়মনসিংহের শস্পশ্যামল পল্লীনিবাসে পূর্ব্ব-বঙ্গজননীর নিভৃত-নিকেতনে মাছের মুড়া, দুধের সর আহার করিয়া যেমন পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছি, কর্ত্তব্য-পরায়ণতার জীবন্তমূর্ত্তি স্বেচ্ছাসেবকদিগকে দেখিয়া তেমনই চক্ষু জুড়াইয়া আসিয়াছি।

শ্রীকামিনীকুমার সেন।

বঙ্গভাষার ক্রমোন্নতি।

বঙ্গভাষা আমাদের মাতৃভাষা। আমরা যখন এই বাঙ্গালা ভাষার ইতিহাস প্রগাঢ় মনোযোগের সহিত চিন্তা করি, তখন মন বিস্ময়ে অভিভূত হয়,—আমরা চিত্তে নিরতিশয় আনন্দ অনুভব করি। এদেশে যখন ইংরেজী শিক্ষার প্রথম প্রচার হয়,—যখন বাঙ্গালি প্রথম ইংরেজী শিক্ষা লাভ করিতে আরম্ভ করেন, সেই সময়ের শিক্ষিত যুবকগণ অনেকেই বাঙ্গালা ভাষার অনাদর করিতেন,—বাঙ্গালায় একখানা চিঠি লিখিতে ঘৃণাবোধ করিতেন; এবং যখন বন্ধুগণের সহিত সম্মিলিত হইতেন, তখন বাঙ্গালায় কথা বলিতেও যেন সংকোচ জ্ঞান করি-তেন। ক্রমশঃ সে ভাব দূর হইতে লাগিল।

অতীত অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যে বঙ্গভাষা এক বিরাট্ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। যাহা প্রথমে একটি ক্ষীণকায়া স্রোতস্বিনীর মত ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করিয়াছিল, তাহা এইক্ষণে বিশাল সাগরে পরিণত হইয়াছে। কিবা সাহিত্য, কিবা ইতিহাস, কিবা বিজ্ঞান, সকল বিষয়েই বঙ্গভাষা এইক্ষণ একটি প্রধান ভাষার স্থান অধিকার করিয়াছে। যে ভাষায় প্রতাপের দেব-দুর্ল্লভ পবিত্র চরিত্র অঙ্কিত হইতে পারে,—যে ভাষায় 'বৃত্রসংহারের' মত কাব্য রচিত হয়—যে ভাষায় ভাষার প্রাণ-রূপিণী উদ্দীপনা অবলীলা-ক্রমে ক্রীড়া করিতে পারে,—যে ভাষা সময়ে অগ্নিস্রোত-তুল্য জ্বালাময়ী, সময়ে মেঘ-গর্জ্জনের মত গম্ভীর, এবং কোন সময়ে ইটালিদেশীয় সঙ্গীতের মত প্রাণ-স্পর্শিনী, সে ভাষা কখনও সামান্যা নহে।

বাঙ্গালা ভাষার জননী সংস্কৃত ভাষা। সংস্কৃত হইতে এই ভারতবর্ষে আরও কতকগুলি ভাষার উৎপত্তি হই-য়াছে। যথা,—পালি, হিন্দী প্রভৃতি। কিন্তু বাঙ্গালা ভাষা অল্প সময়ের মধ্যে যেরূপ উন্নতি লাভ করিয়াছে,

সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন অন্য কোন ভাষাই তাহার শতাংশের একাংশও পারে নাই। প্রাতঃস্মরণীয়া ভিক্টোরিয়ার রাজত্বকালে যে সকল মনীষিগণ এদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের অক্লান্ত পরিশ্রম এবং দৃঢ় অধ্যবসায় ইহার প্রধান কারণ। এক দিকে সংস্কৃত, অপর দিকে ইংরেজী, এই দুই বৃহৎ ভাষাই বঙ্গভাষার পুষ্টি সাধনে যার-পর-নাই সাহায্য করিয়াছে।

অতি প্রত্যুষে সূর্য্য যখন সোনার থালের মত, ধীরে ধীরে, আকাশে ফুটিতে থাকে, তখন মানুষ, সময়ে সময়ে, ইহা কল্পনা করিয়া বিস্ময়াপন্ন হয় যে, এই সূর্য্যের কিরণছটায়ই, ক্ষণকাল পরে, সমস্ত দিক্ উদ্ভাসিত ও আলোকিত হইবে। সেইরূপ আমরা যখন বঙ্গভাষার পূর্ব্ব ইতিহাস আলোচনা করি, তখন আমরা চিত্তে অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হই যে, এই ভাষা, অল্প কালের মধ্যে, কিরূপ উন্নতি লাভ করিয়াছে!

বঙ্গভাষার ইতিহাস মোটামুটি আলোচনা করিলে, ইহাকে প্রধানতঃ দুইটি ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। এক ভাগ ইংরেজের ভারতবর্ষে রাজ্য স্থাপনের পূর্ব্ব সময়, এবং অপর ভাগ ইহার পরবর্ত্তী সময়।

বঙ্গভাষার উৎপত্তি কোন্ সময় হইয়াছে, তাহা প্রকৃতরূপে স্থির করা কঠিন। এতৎসম্পর্কে বহু মতভেদ আছে। সেই সকল পরস্পর বিরুদ্ধ মতের সামঞ্জস্য বিধান সহজ কথা নহে। তবে সহস্র বৎসর পূর্ব্বেও যে বঙ্গভাষা বর্ত্তমান ছিল, এ সম্বন্ধে অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। গোপীচাঁদের গান, রাজা লক্ষ্মণসেনের পদাবলী বহুশত বৎসরের কথা। বঙ্গসাহিত্যের তরুণ সময়ে এ দেশে বৌদ্ধধর্ম্মের অদ্বিতীয় প্রভাব। তখন বৌদ্ধধর্ম্মের বিজয়-কাহিনী দেশে দেশে ঘোষিত হইতেছিল,—বৌদ্ধধর্ম্মের জয়-পতাকা নগর হইতে নগরে,—গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে, উড্ডীন হইতেছিল। সেই সময়ের প্রধান লেখক মাণিকচাঁদ। আমরা মাণিকচাঁদের গানে হিন্দু দেবদেবীর দুর্গতি দেখিয়া শিহরিয়া উঠি। এই সকল গানের প্রতি লক্ষ্য করিলে স্পষ্টই অনুভূত হয় যে, এ দেশ তখন বৌদ্ধধর্ম্মের কল-কল স্রোতে তরঙ্গায়িত, তখন হিন্দুধর্ম্মের প্রভাব যেন অস্তমিত, যেন ক্ষণকালের জন্য হিন্দুধর্ম্মের প্রতি লোকের বিশ্বাসে ভাঁটা লাগিয়াছে। অবশেষে, কালের স্রোতে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব এদেশ হইতে চলিয়া গেল। হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থানের সহিত বাঙ্গালা ভাষারও নূতন বিকাশ দেখিয়া আমরা আনন্দিত হই। এই সময়ে কএকটি বিখ্যাত লেখক জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহাদিগের নাম কৃত্তিবাস, কাশীরাম দাস, সঞ্জয়, কবীন্দ্র পরমেশ্বর। কৃত্তিবাস ও কাশীরাম দাসের নাম বঙ্গ সাহিত্যে অবিনশ্বর। তাঁহাদের নাম চিরদিনই বঙ্গ সাহিত্যের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রহিবে। বাঙ্গালি কখনও তাঁহাদিগকে ভুলিতে পারিবে না। শিক্ষিত লোক ব্যতীত কয় জনে বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র কি মধুসূদনের গ্রন্থাবলীর আদর করিতে পারে? কিন্তু কৃত্তিবাস ও কাশীরাম দাসের আদর ঘরে ঘরে। তাঁহাদের সরল অথচ মধুর ছন্দ যে পড়ে, সে-ই মুগ্ধ হয়। দুপ্রহর রাত্রিতে পল্লীগ্রাম যখন নীরব হয়, যখন কদাচিৎ শৃগালের চীৎকার কিংবা কুকুরের বিকট রব ভিন্ন আর কিছুই শ্রুতিগোচর হয় না, তখন দেখিবে পরিশ্রান্ত মুদী, দিবসের খাটুনীর পর, দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করিয়া, সুর তুলিয়া কৃত্তিবাসের রামায়ণ কি কাশীরাম দাসের মহাভারত পড়িতেছে এবং নয়ন জলে ভাসিতেছে।

সাহিত্যের সহিত জাতীয় প্রকৃতির অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। সাহিত্যে জাতীয় প্রকৃতি দর্পণের মত প্রতিফলিত হয়। এই সময়ে এ দেশে অসংখ্য দেবদেবীর পূজার প্রচলন হইতে লাগিল। কেহ মনসার উপাসক, কেহ মঙ্গলচণ্ডীর উপাসক, কেহ বা সত্যনারায়ণের উপাসক। এই সময়েই বিজয় গুপ্ত, নারায়ণ দেব প্রভৃতি তাঁহাদের গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

ইহার পরবর্ত্তী সময় বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসে বিশেষ প্রসিদ্ধ ও অতি মূল্যবান্। এই সময়ে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস তাঁহাদের কান্ত-মধুর পদাবলী রচনা করিয়া দেশে একটা প্রেমের তরঙ্গ প্রবাহিত করেন, এবং কাব্যপ্রিয় বাঙ্গালির প্রাণ পদাবলীর মধুর উচ্ছ্বাসে উদ্বেল ও উন্মাদিত হইয়া উঠে। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস এ জগতে নাই। কিন্তু তাঁহাদিগের প্রাণ-স্পর্শিনী কবিতাবলী আমরা যখন পাঠ করি, তখনই মনে হয় যেন

আমরা কি এক অপূর্ব্ব ভাবের রাজ্যে যাইয়া উপস্থিত হইয়াছি। সে ভাবের রাজ্যে শোক নাই—বিদ্বেষ নাই; আছে কেবল স্বর্গীয় প্রেম। যখন বঙ্গসাহিত্য পদাবলীর সাহায্যে পরিপুষ্ট হইয়া, ধীরে ধীরে, আপনার ক্ষেত্র প্রসার করিয়া লইতেছিল,তখন নবদ্বীপে মহাপ্রভু চৈতন্যদেব জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার অলৌকিক জীবন এ দেশে এক ঘোর পরিবর্ত্তন উপস্থিত করিল। দেশ ভক্তির স্রোতে ভাসিয়া গেল,—কীর্ত্তনের রবে দেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত মুখরিত হইয়া উঠিল। চৈতন্যদেবের প্রেম-ভক্তির উচ্ছ্বাসে এ দেশে এক অপূর্ব্ব গীতি-সাহিত্যের সৃষ্টি হইল।

বস্তুতঃ, শ্রীগৌরাঙ্গের সময়ে, এদেশে গীতিকাব্যের এক প্রবল স্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল। তখন যেমন ভক্তির বন্যায় দেশ কল-কলায়মান, তেমনই সহস্র ভক্তের কণ্ঠ মধুর গীত-লহরীতে বাজিয়া উঠিয়াছিল। সে সময়ের ভাব সম্বন্ধে একজন অতিপ্রসিদ্ধ লেখক যাহা লিখিয়াছেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল।—

"যখন ভাগীরথীর তটে ভক্তির অবতার শ্রীগৌরাঙ্গের ভাবের উচ্ছ্বাসে, কীর্ত্তনের নূতন উৎসবে, নব-জলধর-গম্ভীর মধুর মৃদঙ্গ মন্দিরা যোগে বাজিয়া উঠিল, তখন বঙ্গদেশে একসঙ্গে সহস্রকণ্ঠে সংগীতময়ী বাঙ্গালা ধ্বনিত হইল। যেমন নব বসন্তসমাগমে, নিকুঞ্জে কিংবা বনে ও উপবনে, একসঙ্গে অসংখ্য কোকিলকণ্ঠ কুহরিত হয়, গৌরচন্দ্রের প্রেম-বসন্ত-সমাগমেও সেইরূপ সহস্র ভক্ত কবির কোমল কণ্ঠ অতি বড় ললিত, অতি বড় মধুর, অতিমাত্র ভাব-রস-পীযুষ-সিক্ত গীত-পদাবলীতে মুখরিত হইতে আরম্ভ করিল। তখন যাহার গায়ে গৌরাঙ্গের বাতাস লাগিল, সে-ই আনন্দে মাতিয়া, ভাবে উথলিয়া নাচিয়া নাচিয়া গীত গাইল। যে আর কিছু না পারিল, সেও অন্ততঃ দুই চারিটি নূতন গীতে আপনার প্রাণের কথা গাঁথিয়া প্রাণ জুড়াইল, এবং তৃষিত প্রাণে অন্যদীয় গীতিসুধা পান করিয়া ভাবের সেই এক অনির্ব্বচনীয় আবেশে নয়নজলে ভাসিল। এই যে বাঙ্গালায় গীতের স্রোত ঢেউ খেলাইয়া প্রবাহিত হইল, আর উহা থামিল না।"

এই সময়ের প্রধান গ্রন্থ কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্য-চরিতামৃত, লোচন দাসের চৈতন্যমঙ্গল, নরহরি চক্রবর্ত্তীর ভক্তিরত্নাকর, গোবিন্দ দাসের করচা প্রভৃতি। ইহার পর, ক্রমশঃ বঙ্গসাহিত্যের আলোচনা বাড়িতে লাগিল। নিত্য নূতন কবিতার সৃষ্টি হইতে লাগিল। তখন মাধবাচার্য্য, ক্ষেমানন্দ, মুকুন্দরাম প্রভৃতি লেখক জন্ম গ্রহণ করিয়া বঙ্গকাব্যসাহিত্যের পুষ্টি সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন।

ইহার কিছুকাল পরে, ভারতচন্দ্রের অভ্যুদয়। ভারতচন্দ্রের হাতে বাঙ্গালা কবিতা এক নূতন মূর্ত্তি ধারণ করিল। ভারতচন্দ্র অপূর্ব্ব শব্দশিল্পী। পদের লালিত্যে ও শব্দের বিন্যাসে তিনি অতি বড় ক্ষমতাশালী ছিলেন। দুঃখের বিষয়, তাঁহার রচনা অনেক স্থলে অশ্লীলতা দোষে দুষ্ট। জয়দেবের গীত-গোবিন্দের অনেক স্থান যেমন পদ-লালিত্যে সঙ্গীতের মত সুধা ক্ষরণ করে, ভারতচন্দ্রের রচনাও বহুস্থানে তদ্রূপ।

তখনও এদেশে গদ্য সাহিত্যের সৃষ্টি হয় নাই। এই সময়ে এদেশ হইতে মোগল-সূর্য্য অস্তমিত এবং ইংরেজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন রামমোহন রায় জন্ম গ্রহণ করেন। একদিকে প্রাচ্য সভ্যতা, অপর দিকে পাশ্চাত্য সভ্যতা। দুইদিক্ হইতে দুই স্রোত আসিয়া, গঙ্গাযমুনার সঙ্গমের মত, সম্মিলিত হইল। মধ্যস্থলে রাজা রামমোহন। তিনি পর্ব্বত-পুরুষের ন্যায় দণ্ডায়মান হইলেন। "স্থিতঃ পৃথিব্যা ইব মানদণ্ডঃ"। রামমোহন রায় বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যের একরূপ সৃষ্টিকর্ত্তা। যে অপ্রতিহত প্রতিভা লইয়া তিনি সতীদাহ এবং অন্যান্য গুরুতর সমাজ-সংস্কারে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, সেই প্রতিভা লইয়াই তিনি মাতৃভাষার সেবায়ও অগ্রসর হইলেন। তিনি বাঙ্গালা গদ্য লিখিতে লাগিলেন। তাঁহার গদ্যে আমরা তাঁহার প্রতিভার পরিচয় পাই বটে, কিন্তু বুঝিতে পারি যে, গদ্য সাহিত্য যেন তখন সূতিকা-গৃহে,—যেন তাহার কথা ভাল করিয়া ফুটিতেছে না। তখনকার গদ্য সরল, সতেজ সুমধুর গদ্য নহে। তখনকার গদ্য অলঙ্কার-বহুল। একদিকে রামমোহন রায়, অপরদিকে, তাঁহারই প্রায় সঙ্গে সঙ্গে, তারাশঙ্কর,

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার প্রভৃতি বাঙ্গালা গদ্য লিখিতে আরম্ভ করিলেন। আমরা সেই কালের গদ্য পাঠ করিয়া সুখ অনুভব করি না। মনে লয় এ যেন প্রাণের ভাষা নহে,—যে প্রাণের কথাগুলি পরিস্ফুট হইতেছে না। মিল্টনের অ্যারিওপ্যাজিটিকা প্রভৃতি গদ্য গ্রন্থ যেরূপ মেকলে প্রভৃতির গদ্য হইতে অনেকাংশে দুরূহ ও দুর্ব্বোধ, সেই সময়ের বাঙ্গালা গদ্য এবং বর্ত্তমান গদ্যেও সেইরূপ অনেক প্রভেদ। আমরা সেই কালের গদ্য সাহিত্যের কিছু উদাহরণ নিম্নে দিতেছি।—

রামমোহন রায়ের গদ্য রচনার দৃষ্টান্ত,—

"আমরা এখন দুই তিন প্রশ্ন করিয়া এ প্রত্যুত্তরের পরিসমাপ্তি করিতেছি। প্রথম কোন ব্যক্তি আচারের দ্বারা ঋষির ন্যায় আপনাকে দেখান, এবং ঋষিদিগের ন্যায় বেশ ধারণ করেন, আপনি সর্ব্বদা অনাচারীর নিন্দা করেন, অথচ যাহাকে স্নেহ করেন, তাহার গুরু এবং নিরত সহবাসী হয়েন, আর গোপনে নানাবিধ আচরণ করেন। আর অন্য একব্যক্তি অধম বর্ণের ন্যায় বেশ রাখে, আমিষাদি স্পষ্টরূপে ভোজন করে, আপনাকে কোন মতে সদাচারী দেখায় না, যে দোষ তাহার আছে, তাহা অস্বীকার করে। দুই প্রকার মনুষ্যের মধ্যে বকধূর্ত্ত আখ্যান কাহাকে শোভা পায়।"

গদ্য সাহিত্য যখন, এইরূপে, ধীরে ধীরে ফুটিতেছে,—ধীরে ধীরে বিকসিত হইয়া আপনার কার্য্যক্ষেত্র প্রসার করিয়া লইতেছে, এমন সময় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন। ক্রমে আরও কএকটি প্রতিভাশালী পুরুষ, তাঁহারই অনুসরণে, সাহিত্যব্রতে ব্রতী হইলেন, এবং তাঁহারা এক এক জনে, দিক্‌পালের মত, সাহিত্যের এক এক দিক্‌ আশ্রয় করিয়া, তাঁহাদের প্রতিভা মাতৃভাষার সেবায় নিয়োজিত করিলেন। অক্ষয়কুমার দত্ত ইংরেজী গ্রন্থ বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ করিতে লাগিলেন। যে সকল গ্রন্থ ইংরেজী ভাষার অলঙ্কার-স্বরূপ, তিনি তাহার কএকটি পুস্তকের অনুবাদ করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের পুষ্টি সাধন করিলেন, এবং যাঁহারা ঘৃণা করিয়া বাঙ্গালা গ্রন্থ স্পর্শ করিতেন না, তাঁহারাও ক্রমে উহাতে সার-বস্তু দেখিতে পাইলেন। প্যারীচাঁদ মিত্র তাঁহার বিখ্যাত "আলালের ঘরের দুলাল" রচনা করিলেন, এবং কালীপ্রসন্ন সিংহ "হুতুম পেঁচার নক্সা" লিখিয়া তদানীন্তন সাহিত্যক্ষেত্রে যশস্বী হইলেন। "আলালের ঘরের দুলাল" ও "হুতুম পেঁচার নক্সার" ভাষা অনেক স্থলে গ্রাম্যতা দোষে দুষ্ট। কিন্তু এই সকল রচনায় আমরা প্রথম সরল ও সহজ বাঙ্গালা গদ্য দেখিতে পাই। "আলালের ঘরের দুলালের" ভাষা সম্বন্ধে বঙ্কিম বাবু লিখিয়াছেন,—

"যে ভাষা সকল বাঙ্গালির বোধগম্য, এবং সকল বাঙ্গালি কর্ত্তৃক ব্যবহৃত, প্রথম তিনিই তাহা গ্রন্থ প্রণয়নে ব্যবহার করিলেন; এবং তিনিই প্রথম ইংরেজী ও সংস্কৃতের ভাণ্ডার পূর্ব্বগামী লেখকদিগের উচ্ছিষ্ট বিশেষে অনুসন্ধান না করিয়া স্বভাবের অনন্ত ভাণ্ডার হইতে আপনার রচনার উপাদান সংগ্রহ করিলেন। এক "আলালের ঘরের দুলাল" নামক গ্রন্থে এই উভয় উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। "আলালের ঘরের দুলাল" বঙ্গভাষায় চিরস্থায়ী ও চিরস্মরণীয় হইবে। ইহার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট গ্রন্থ তৎপরে কেহ প্রণীত করিয়া থাকিতে পারেন, অথবা ভবিষ্যতে কেহ করিতে পারেন। কিন্তু "আলালের ঘরের দুলালের" দ্বারা বাঙ্গালা সাহিত্যের যে উপকার হইয়াছে, অন্য কোন বাঙ্গালা গ্রন্থের দ্বারা সেরূপ হয় নাই, এবং ভবিষ্যতে হইবে কি না, সন্দেহ।"

এইরূপে বাঙ্গালা গদ্য ক্রমশঃ উৎকর্ষ লাভ করিতে লাগিল। আমরা বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্তের সময় পর্য্যন্ত দেখিতে পাই যে, বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যে অনুবাদের যুগ চলিতেছে। বিদ্যাসাগর সংস্কৃতের অক্ষয় ভাণ্ডার হইতে বহুরত্ন চয়ন করিয়া বাঙ্গালা ভাষার কণ্ঠে তাহা পরাইলেন,—ভাষার কণ্ঠে তাহা মালার ন্যায় শোভা পাইল। অক্ষয়কুমারও ইংরেজী সাহিত্যকুঞ্জ হইতে বহু সুগন্ধি কুসুম আহরণ করিয়া মাতৃভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিলেন। গদ্য সাহিত্য উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে লাগিল। আমরা এই স্থলে ঈশ্বরচন্দ্র ও অক্ষয়কুমারের গদ্য হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি।—

"লক্ষ্মণ তীরে উত্তীর্ণ হইলেন, এবং কিয়ৎক্ষণ নিস্পন্দ-নয়নে জানকীরে নিরীক্ষণ করিয়া অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে করিতে রথে আরোহণ করিলেন। রথ চলিতে আরম্ভ করিল। যতক্ষণ সীতাকে দেখিতে পাওয়া গেল, লক্ষ্মণ অনিমিষ নয়নে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। সীতাও চিত্রার্পিত প্রায় রথে দৃষ্টিযোজনা করিয়া রহিলেন। রথ ক্রমে ক্রমে দূরবর্ত্তী হইল, তখন লক্ষ্মণ আর সীতাকে লক্ষিত করিতে না পারিয়া হাহাকার ও শিরে করাঘাত করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। সীতাও রথ নয়ন-পথ-বহির্ভূত হইবা মাত্র যূথ-বিরহিত কুররীর ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিলেন।"

(ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর)।

"কোথায় বা প্রকৃত প্রস্তাবে বিজ্ঞান-বিশেষের বিশেষরূপে অনুশীলন পূর্ব্বক তদ্বিষয়ক অভিনব তত্ত্বানু-সন্ধান-চেষ্টা, কোথায় বা ভূমণ্ডল অথবা তদীয় ভূরি ভাগ সন্দর্শন বাসনায় এক এক বারে বহুবিধ বর্ব্বর-নিবাস, সুপ্রাচীন যাদব-কীর্ত্তি এবং অপূর্ব্ব নৈসর্গিক সামগ্রী ও অদ্ভুত নৈসর্গিক ব্যাপারাদিবিশিষ্ট বিস্তৃত ভূখণ্ড পরিভ্রমণ, কোথায় বা আপনাদের শারীরিক ও মানসিক উভয় প্রকৃতির যুগপৎ সমুন্নতি সাধন ব্রতে ব্রতী স্বদেশীয় সম্প্রদায় বিশেষ প্রবর্ত্তনের অভিলাষ, এবং কোথায় বা বিজ্ঞান, দর্শন ও ভারতবর্ষীয় পুরাবৃত্ত বিষয়ক বিবিধ গ্রন্থ প্রণয়ন ও স্বদেশ সম্বন্ধীয় নানাপ্রকার হিতানুষ্ঠান কামনা রহিল। সকলই বাষ্পীভূত হইয়া গেল। সকল বাসনাই নির্ম্মূল হইল। অচিরেই আঘাত ঘটিল।"

(অক্ষয়কুমার)

এই সময়ে ইংরেজী শিক্ষার তর-তর স্রোত এ দেশে প্রবলবেগে বহিতে লাগিল। এ দেশ পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা করিবার জন্য উন্মত্ত হইয়া উঠিল। ক্রমে ইংরেজী সাহিত্য এ দেশে বহুল পরিমাণে প্রচলিত হইয়া পড়িল। দেশে এক সঙ্গে যেন বহু সূর্য্য ফুটিয়া উঠিল। যেমন রাজ্ঞী এলিজাবেথের সময়ে ইংলণ্ডে, এক সঙ্গে, বহু সাহিত্যিক ফুটিয়া উঠিয়াছিলেন, এবং তাঁহাদিগের প্রতিভায় দিগন্ত উদ্ভাসিত হইয়াছিল, একই সময়ে, সেক্‌স্‌পিয়র, বেকন, বেন্‌জন্‌সন্ প্রভৃতি অলৌকিক প্রতিভাশালী পুরুষেরা সাহিত্যের সম্পদ্ বাড়াইয়াছিলেন, তেমনই ইংরেজী শিক্ষার প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে, ভিক্টোরিয়ার রাজত্বকালে বাঙ্গালা সাহিত্যেও এক নূতন যুগ প্রবর্ত্তিত হইল। তখন রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র, তাঁহার জ্ঞানের অগাধ ভাণ্ডার লইয়া "বিবিধার্থ সংগ্রহ" প্রণয়নে প্রবৃত্ত হইলেন। দীনবন্ধু নাটকে আপনার হৃদয়নিহিত রসের প্রস্রবণ উৎসারিত করিয়া দিলেন। মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাকবি মিল্টনের অনুকরণে, অমিত্রাক্ষর ছন্দে তাঁহার অতুলনীয় কাব্য 'মেঘনাদবধ' প্রকাশ করিলেন। বাঙ্গালি দেখিয়া বিস্মিত হইল যে, বাঙ্গালা কবিতা কেবলই প্রেম ও বিরহের কথায় স্ফুর্ত্তি লাভ করে না। ইহাতে গাম্ভীর্য্যপূর্ণ মহা-কাব্যও রচিত হইতে পারে।

পণ্ডিত-শ্রেষ্ঠ দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ তাঁহার সোম প্রকাশ লইয়া সাহিত্য-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। সোম প্রকাশ দেশে দেশে প্রচারিত হইতে লাগিল। সোম প্রকাশে অনেকে লিখিতে আরম্ভ করিলেন। ভূদেব-চন্দ্রও এডুকেশন গেজেট প্রকাশিত করিলেন, এবং সমাজ সম্বন্ধে তাঁহার বহুকালব্যাপি চিন্তার ফল গ্রন্থা-কারে লিপিবদ্ধ করিলেন। বঙ্কিমের দুর্গেশনন্দিনী ও কপালকুণ্ডলা বাহির হইল। যে পড়িল, সেই চমৎকৃত হইল। এমন মধুর ও সরল রচনা ইহার পূর্ব্বে আর কেহ পড়ে নাই। সাহিত্য-ক্ষেত্রে আনন্দ-কোলাহল উপস্থিত হইল, একটা জয়-জয়-কার পড়িয়া গেল। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার প্রতিভাশালী সুহৃৎ হেমচন্দ্র ও অক্ষয়চন্দ্র প্রভৃতিকে লইয়া "বঙ্গদর্শন" প্রকাশ করিলেন,—সাহি-ত্যের নদীতে যেন বন্যা উপস্থিত হইল,—তরঙ্গের পর তরঙ্গ উঠিতে লাগিল,—দেশে এক অপূর্ব্ব ভাবের উৎস ছুটিল। বঙ্গভাষা আর অনাদরের বস্তু রহিল না। সেই সময়ে পূর্ব্ববঙ্গে "বান্ধব" বাহির হইল; এবং পরমারাধ্য স্বর্গীয় পিতৃদেব "নারীজাতি বিষয়ক প্রস্তাব" লিখিয়া অতুল যশ উপার্জ্জন করিয়া শেষে "বান্ধবে" তাঁহার অসামান্য চিন্তাশীলতা দেখাইতে আরম্ভ করিলেন। আমার পিতৃদেব সম্বন্ধে আমি বেশী কিছু বলিব না। পিতার প্রশংসা পুত্রের মুখে ভাল শুনাইবে না। তবে

এই মাত্র বলিতে পারি, আমরা তাঁহার অকৃতী, অধম—অযোগ্য পুত্র, আর তিনি বঙ্গ-সাহিত্যের অন্যতর যুগ-প্রবর্ত্তক কৃতী-পুরুষ।

বঙ্গদর্শন, বান্ধব, আর্য্যদর্শন প্রভৃতির প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালা গদ্য এক নূতন মূর্ত্তি ধারণ করিল। বর্ষাকালে নদী যেমন কূলে কূলে পরিপূর্ণা হয়, বাঙ্গালা ভাষাও তেমনই উছলিয়া উঠিল। সাহিত্য-ক্ষেত্রে এক সঙ্গে বহুবীণা বাজিয়া উঠিল;—বীণায় বহু রাগিণী বাজিল,—সাহিত্যকুঞ্জ কোকিলের কল-কণ্ঠে মুখরিত হইতে লাগিল। আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা হইতে দুইটি স্থান উদ্ধৃত করিব। দুইটিই অতি মনোহর। কিন্তু, আমরা প্রথমটিতে দেখিতে পাই, ভাষা একটু জটিল,—ভাষা সমাস-বাহুল্যে, শৃঙ্খলাবদ্ধ বন্দীর ন্যায়, যেন ভাল করিয়া চলিতে পারিতেছে না। কিন্তু পরবর্ত্তি রচনার ভাষা প্রশান্ত, গম্ভীর অথচ সরল ও মধুর।

(১) গম্ভীর জল-কল্লোল নবকুমারের কর্ণপথে প্রবেশ করিল। তিনি বুঝিলেন যে, এ সাগর-গর্জ্জন। ক্ষণকাল পরে অকস্মাৎ বনমধ্য হইতে বহির্গত হইয়া দেখিলেন যে, সম্মুখেই সমুদ্র। অনন্ত বিস্তার-নীলাম্বুমণ্ডল সম্মুখে দেখিয়া উৎকট আনন্দে হৃদয় পরিপ্লুত হইল। সিকতাময় তটে গিয়া উপবেশন করিলেন। ফেণিল নীল অনন্ত সমুদ্র। উভয় পার্শ্বে যতদূর চক্ষু যায়, ততদূর পর্য্যন্ত তরঙ্গ-ভঙ্গ প্রক্ষিপ্ত ফেণার রেখা। স্তূপীকৃত বিমল-কুসুম-দাম-গ্রথিত মালার ন্যায় সেই ধবল-ফেণ-রেখা হেমকান্ত সৈকতে ন্যস্ত হইয়াছে। কানন-কুণ্ডলা ধরণীর উপযুক্ত অলকাভরণ। নীল-জল-মণ্ডল-মধ্যে সহস্র স্থানে সফেণ তরঙ্গভঙ্গ হইতেছে। * * *

(২) বর্ষাকাল। রাত্রি জ্যোৎস্না। জ্যোৎস্না এমন বড় উজ্জ্বল নয়, বড় মধুর। একটু অন্ধকার মাখা,—পৃথিবীর স্বপ্নময় আবরণের মত। ত্রিস্রোতা নদী বর্ষাকালের জল-প্লাবনে কূলে কূলে পরিপূর্ণ। চন্দ্রের কিরণ সেই তীব্রগতি নদীজলের স্রোতের উপর—স্রোতে—আবর্ত্তে কদাচিৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গে জ্বলিতেছে। কোথাও জল একটু ফুটিয়া উঠিতেছে সেখানে একটু চিকিমিকি; কোথাও চরে ঠেকিয়া ক্ষুদ্র বীচিভঙ্গ হইতেছে। সেখানে একটুকু ঝিকিমিকি। তীরে, গাছের গোড়ায় জল আসিয়া লাগিয়াছে গাছের ছায়া পড়িয়া সেখানে জল বড় অন্ধকার; অন্ধকারে গাছের ফল, ফুল পাতা বাহিয়া তীব্র স্রোত চলিতেছে; তীরে ঠেকিয়া জল একটু তর-তর, কল-কল, পত-পত শব্দ করিতেছে। কিন্তু সে আঁধারে আঁধারে। আঁধারে আঁধারে সেই বিশাল জলধারা সমুদ্রানুসন্ধানে পক্ষিণীর বেগে ছুটিয়াছে। কূলে কূলে অসংখ্য কল-কল শব্দ, আবর্ত্তের ঘোর গর্জ্জন; প্রতিহত স্রোতের তেমনি গর্জ্জন; সর্ব্বশুদ্ধ একটা গম্ভীর গগন-ব্যাপী শব্দ উঠিতেছে।"

এইরূপে বাঙ্গালা গদ্য ক্রমশঃ উন্নতির সোপানে অগ্রসর হইতে লাগিল। নাটকের ক্ষেত্রে দীনবন্ধুর অনুসরণ করিয়া গিরীশচন্দ্র ও অমৃতলাল নিত্য নূতন নাটক প্রণয়ন পূর্ব্বক রস-গ্রাহী পাঠকবৃন্দকে ভোজ্য যোগাইতে লাগিলেন। ঐ সকল নাটক রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইতে লাগিল, এবং সহস্র সহস্র শ্রোতা অভিনয়ে আকৃষ্ট হইয়া, সাহিত্যের অনুশীলনে অধিকতর আগ্রহের সহিত ব্যাপৃত হইলেন। মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দ অনুকরণ করিয়া হেমচন্দ্র তাঁহার অতুলনীয় বৃত্রসংহার কাব্য রচনা করিলেন। নবীনচন্দ্রও সাহিত্য-ক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন, এবং স্বর্ণকুমারী ও গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী প্রভৃতি সুশিক্ষিতা বঙ্গমহিলাগণ বাঙ্গালা গদ্যে ও গীতিলহরীতে তাঁহাদের প্রাণ-নিহিত উচ্চভাবের আদর্শ বিকশিত করিতে লাগিলেন। ইন্দ্রনাথ, যোগেন্দ্রচন্দ্র প্রভৃতি বিদ্রূপাত্মক গ্রন্থ লিখিয়া সমাজের আবর্জ্জনাগুলির উপর তীব্র কশাঘাত করিতে লাগিলেন। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ, পণ্ডিতপ্রবর চন্দ্রনাথ, জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ রাজনারায়ণ, দার্শনিক দ্বিজেন্দ্রনাথ, ধীমান্ রজনীকান্ত প্রভৃতি আপনাদিগের প্রতিভা লইয়া বঙ্গ-সাহিত্যের সেবায় ব্রতী হইলেন। রবীন্দ্রনাথ বঙ্গের কাব্য-জগতে একযুগ-প্রবর্ত্তন করিলেন। তাঁহারই অনুকরণে ও তাঁহারই অনুসরণে, অধুনা বহুসংখ্য যুবক ললিত-মধুর কবিতা লিখিতে আরম্ভ করিয়াছে।

এইরূপে সাহিত্যক্ষেত্র ক্রমশঃ প্রসারিত হইয়া পড়িল। বর্ত্তমান সময়ে বাঙ্গালা ভাষা এক অপূর্ব্ব মূর্ত্তি ধারণ

করিয়াছে। ইহা সময়ে সময়ে অনন্ত-বিস্তারিত নীলিমাময় সাগরের তুলনাস্থল;—সময়ে সময়ে শত পারিজাত-শোভিত নন্দনকাননের সহিত উপমেয়। ভাবের গাম্ভীর্য্যে, ভাষার তরঙ্গে ইহা সাগরের সঙ্গে তুলনীয়, এবং রচনার শ্রুতি-মধুরতায় ইহা নন্দন-কাননের মত সুন্দর সুদৃশ্য এবং শান্তিপ্রদ। ভাষা কোথাও সাগর-গর্জ্জনের মত গম্ভীর;—কোথাও কল্পনার উচ্চতায় অভ্রভেদী পর্ব্বতের মত উন্নত;—কোথাও মধুরতায় নিশীথে বংশীধ্বনির মত প্রাণ-শীতল। যে সকল প্রাতঃ-স্মরণীয় মহাপুরুষ তাঁহাদের জীবনের সমুদায় শক্তি ব্যয় করিয়া আমাদের মাতৃভাষার সেবা করিয়াছেন,—তাঁহাদের অলৌকিক প্রতিভা ভাষার উন্নতিকল্পে নিয়োজিত করিয়াছেন, এবং যেথানে যেটুকু সুন্দর দেখিতে পাইয়াছেন, তাহাই, পক্ষিণী যেমন শাবকের জন্য দূর হইতে খাদ্য আহরণ করিয়া আনে, সেই পক্ষিণীর প্রাণে লইয়া আসিয়া মাতৃভাষাকে অলঙ্কৃত করিয়াছেন, আজি আমি তাঁহাদের উদ্দেশে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি। আমরা চক্ষের জলে তাঁহাদের স্মৃতির তর্পণ মাত্র করিতে পারি। বাঙ্গালা ভাষার ইতিহাসে তাঁহাদের নাম স্বর্ণাক্ষরে গ্রথিত রহিবে। আর, আমাদের প্রধান কৃতজ্ঞতাভাজন ইংরেজ জাতি। আজি এই বাঙ্গালা ভাষা অতীত অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যে এরূপ উৎকর্ষ লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে, তাহার প্রধান কারণ এদেশে ইংরেজ-রাজত্ব। ইংরেজের রাজত্ব যেমন এদেশে বহু বিষয়ে শান্তি সংস্থাপন করিয়াছে,—বহু বিষয়ে উন্নতি বিধান করিয়াছে, তেমনই উহার সাহায্যে বঙ্গভাষার সম্পদ্ অসামান্যরূপে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। *

শ্রীসারদাপ্রসন্ন ঘোষ

* এই প্রবন্ধ পূর্ব্ববঙ্গ সাহিত্য-সমাজে পঠিত হইয়াছিল।

পাপের ফল।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

(২)

করিমের আর ধান কাটিতে যাওয়া হইল না। যে জন্য ধান কাটিতে যাওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছিল, বসিরদ্দি যদি তাহা ঘুণাক্ষরেও বুঝিতে পারিত, তাহা হইলে সে সাবধান হইত। তাহার মনে এমন ভয়ানক ব্যাপারের সামান্য সন্দেহও উপস্থিত হয় নাই। বাড়ীতে থাকিবার সময়, করিম তাঁহার স্ত্রীর সহিত যে প্রকার ব্যবহার করিত তাহাতে বসির অন্য কথা ভাবিত; কিন্তু করিম যে এতদুর অগ্রসর হইবে, সে কথা তাহার মনে উদিত হয় নাই,—সে স্বপ্নেও এমন কথা ভাবিতে পারে নাই। করিম তাহার আবাল্য বন্ধু, করিম তাহার কত উপকার করিয়াছে!

প্রাণের বন্ধু বসিরকে জলে ভাসাইয়া দিয়া করিমের মনে কি ভাবের উদয় হইয়াছিল, তাহা আমরা বলিতে পারি না। করিম সেই যে নৌকা ছাড়িয়াছে, পথে আর সে নৌকা বাঁধে নাই। নৌকায় যে সামান্য চিড়া গুড় ছিল দুই দিন তাহাই সে খাইল। এ দুই দিন সে স্নান পর্য্যন্তও করিল না। তৃতীয় দিনে যখন সে বাড়ীর ঘাটে পৌঁছিল তখন তাঁহাকে দেখিয়া মনে হইল বন্ধুর মৃত্যুশোকে সেও যেন মৃতপ্রায় হইয়াছে। তাহার মলিন মুখ, তাহার রুক্ষকেশ, তাহার অনাহারে দুর্ব্বল শরীর, তাহার গভীর শোকের সাক্ষ্য দিতে লাগিল

করিম বাড়ীর ঘাটে নৌকা বাঁধিয়া ধীরে ধীরে তীরে উঠিল; নৌকায় যে সামান্য জিনিসপত্র ছিল তাহা তীরে নামাইবার কোন চেষ্টাই সে করিল না, জিনিসগুলি নৌকার মধ্যেই পড়িয়া রহিল। সে তীরে উঠিয়া প্রথমেই বসিরের বাড়ীর দিকে চলিল। পথে যে দুই চারি জন পরিচিত লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইল, তাহারা করিমের অকস্মাৎ প্রত্যাবর্ত্তনের কারণ জিজ্ঞাসা করিল; করিম তাহাদের প্রশ্নের কোন উত্তরই দিল না; সে এমন ভাব দেখাইল যেন তাহাদের প্রশ্ন তাহার কর্ণে প্রবিষ্ট হয়

নাই। তাহারাও করিমের ভাব দেখিয়া দ্বিতীয় প্রশ্ন করিল না।

বেলা তখন নয়টা। বসিরের স্ত্রী গৃহকার্য্য শেষ করিয়া স্নানে যাইবার আয়োজন করিতেছে। সেই সময় করিম বসিরের বাড়ীতে প্রবেশ করিল এবং "হা আল্লা, কি করিলে" বলিয়া, উঠানের উপর পড়িয়া গেল। বসিরের স্ত্রী দাবায় বসিয়া তৈল মাখিতে ছিল; সে সহসা করিমকে এই অবস্থায় দেখিয়া এবং তাহার কথা শুনিয়া ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিল। বসিরের বৃদ্ধা মাতা ঘরের মধ্যে ছিল। সে বৌএর এই চীৎকার শুনিয়া "কি হলো কি হলো" বলিয়া তাড়াতাড়ি, বাহির হইয়া দেখে, বসিরের স্ত্রী ভয়ে বিহ্বল হইয়া বসিয়া আছে; উঠানে চাহিয়া দেখে, করিম মূর্চ্ছিত অবস্থায় পড়িয়া আছে।

বৃদ্ধা তখন বারান্দা হইতে নামিয়া তাড়াতাড়ি করিমের নিকট গেল, দেখিল করিমের সংজ্ঞা নাই। "বৌ, শীগ্‌গির জল আন" বলিয়া বৃদ্ধা, করিমের মস্তক কোলে তুলিয়া বসিল এবং নিজের অঞ্চল দ্বারা তাহাকে ব্যজন করিতে লাগিল। বসিরের স্ত্রী জল আনিয়া করিমের মুখে মাথায় দিতে লাগিল।

একটু পরেই করিমের কৃত্রিম অজ্ঞানতা দুর হইল; সে চাহিয়া দেখে বসিরের মাতা ক্রোড়ে লইয়া বসিয়া আছে, এবং বসিরের স্ত্রী নিকটেই দাঁড়াইয়া আছে। করিমের জ্ঞান সঞ্চার হইয়াছে দেখিয়া বসিরের মাতা বলিল "করিম, কি হইয়াছে? আমার বসির কৈ? সে ত ভাল আছে?"

করিম সে কথার কোন উত্তর না দিয়া, "হা আল্লা, কি করিলে" বলিয়া পুনরায় চক্ষু মুদ্রিত করিল। তখন বসিরের নিশ্চয়ই কোন ভয়ানক বিপদ হইয়াছে মনে করিয়া তাহার মাতা চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, বসিরের স্ত্রীও কাঁদিতে লাগিল। তাঁহাদের কান্নার শব্দ শুনিয়া প্রতিবেশী পুরুষ স্ত্রী বালক বালিকা সকলেই দৌড়াইয়া আসিল। উঠান লোকে পূর্ণ হইয়া গেল। সকলেরই মুখে এক কথা "কি হইয়াছে? ব্যাপার কি?" কিন্তু কে উত্তর দিবে? করিম তখনও চক্ষু মুদ্রিত করিয়া পড়িয়া আছে।

তিন চারি জন পুরুষ তখন ধরাধরি করিয়া করিমকে বারান্দায় তুলিল এবং তাহার জ্ঞান-সঞ্চারের জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল। করিমের মাতা, ভগিনী ও ভাইয়েরাও উপস্থিত হইল, করিমের পিতা মাঠে গিয়াছিল, সে এ সংবাদ জানিতে পারিল না। করিমের মূর্চ্ছা আর ভাঙ্গে না। যে ইচ্ছা করিয়া অজ্ঞানের ভাণ করিতেছে, তাহাকে জাগাইয়া তোলা বড় সহজ ব্যাপার নহে। অনেক জল ঢালিয়া অনেকক্ষণ বাতাস করিয়া সকলে করিমকে প্রকৃতিস্থ করিল। তখন সে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল "সর্ব্বনাশ হইয়াছে। বসির ভাই আজ তিন দিন হইল ওলাউঠায় মারা গিয়াছে। আমি কত চেষ্টা করিলাম, কত যত্ন করিলাম, কিছুতেই, কিছু হইল না। আর সেখানে সেই জঙ্গলের মধ্যে "দাওয়াই" কোথায় পাইব। বসির ভাইকে কোলে করিয়া কেবল আল্লাকে ডাকিতে লাগিলাম। সন্ধ্যার পরই বসির ভাই মারা গেল। হায় হায়, আমি তার কিছুই করিতে পারিলাম না, করিম আর কথা বলিতে পারিল না, সে কাঁদিয়া ফেলিল, তাঁহার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া গেল। ধন্য চতুরতা!

তখন চারিদিকে ক্রন্দনের রোল উঠিল। বসিরের মাতার করুণ ক্রন্দনে কেহই অশ্রুজল সংবরণ করিতে পারিল না। করিম মাথায় হাত দিয়া অধোমুখে ক্রন্দন করিতে লাগিল। প্রতিবেশিনীরা বসিরের মাতাকে সান্ত্বনা প্রদান করিবার জন্য বৃথা চেষ্টা করিতে লাগিল। বসিরই পরিবারের একমাত্র অবলম্বন; সেই অবলম্বন-শূন্য হইয়া বসিরের মাতা চারিদিক অন্ধকার দেখিতে লাগিল।

বসিরের স্ত্রী এতক্ষণ নীরবে ক্রন্দন করিতে ছিল। ক্রমে তাহার ক্রন্দনের বেগ কমিয়া গেল। সে এক দৃষ্টিতে করিমের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার মনে কি ভাবের উদয় হইয়াছিল, তাহা আমরা কেমন করিয়া বলিব। একটু পরেই দেখা গেল বসিরের স্ত্রী উঠান হইতে উঠিয়া ঘরের বারান্দায় যাইয়া বসিল; তাহার বদনমণ্ডলে কেমন একটা দৃঢ়তা ফুটিয়া উঠিল। সে অনেকক্ষণ গালে হাত দিয়া বসিয়া রহিল; তাহার

পর ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিরের মায়ের নিকট গেল। বসিরের মা তখন বৌকে বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিয়া আরও কাঁদিতে লাগিল। কিন্তু বসিরের স্ত্রীর চক্ষুতে তখন আর জলবিন্দুও নাই, সে চুপ করিয়া রহিল; একটি কথাও তাহার মুখ হইতে বাহির হইল না।

প্রতিবেশী পুরুষেরা করিমকে তাহার বাড়ীতে লইয়া গেল; রমণীদিগের মধ্যে দুই চারি জন ব্যতীত আর সকলেই নিজ নিজ গৃহে চলিয়া গেল। সেদিন আর রান্না হইল না; প্রতিবেশিনী একটি স্ত্রীলোক অনেক বুঝাইয়া বসিরের মাতাকে স্নান করাইল, বসিরের স্ত্রী স্নান পর্য্যন্তও করিল না। দুইটি স্ত্রীলোক সারাদিন উপবাসেই কাটাইল।

সন্ধ্যার সময় করিম বসিরদিগের বাড়ীতে আসিল এবং বসিরের মায়ের নিকট বসিয়া তাহাকে নানা প্রকার সান্ত্বনা দিতে আরম্ভ করিল। বসিরের মাতা করিমকে বসিরের রোগের বিবরণ জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল,, "দুই প্রহরে বসির ভাই ভাত ও কুমড়ার তরকারী নিজেই রাঁধিয়াছিল। আমরা দুইজনেই ভাত খাইলাম। খাওয়ার পরেই বসিরের একবার দাস্ত হইল। আমি মনে করিলাম ও কিছুই নহে। তখন নৌকা ছাড়িয়া দিলাম। একটু পরেই আবার নৌকা লাগাইতে হইল; বসিরের আবার দাস্ত হইল। এবার সে কাতর হইয়া পড়িল, আমারও মনে ভয় হইল। নৌকা লাগাইয়াই থাকিলাম। তাহার পর দুই তিনবার দাস্ত হইলে, সে অজ্ঞান হইয়া পড়িল। আমি আর কি করিব। চারিদিকে জঙ্গল, নদীর মধ্যেও কোন নৌকা দেখিতে পাইলাম না। বসিয়া বসিয়া আল্লাকে ডাকিতে লাগিলাম। সন্ধ্যাকাল বসির ভাই মারা গেল। তখন আর কি করি, সমস্ত রাত্রি তাহাকে লইয়া নৌকাতেই রহিলাম; রাত্রিতে বাঘের ভয়ে উপরে উঠিতে পারিলাম না। প্রাতঃকালে ডাঙ্গায় উঠিয়া একটা ছোট কবর কাটিলাম এবং অতি কষ্টে বসির ভাইকে মাটী দিলাম। তাহাতে আর ধান কাটিতে যাইতে ইচ্ছা হইল না। বাড়ী আসিবার জন্য নৌকা ছাড়িলাম। এ তিন দিন আমি কিছু খাই নাই; দিন রাত নৌকা চালাইয়া বাড়ী আসিয়াছি। আগে যদি জানিতাম যে, এমন হইবে তাহা হইলে কি ধান কাটিতে যাই। হা আল্লা কি করিলে।" করিম আবার কাঁদিতে আরম্ভ করিল। তখন বসিরের মা বলিল "করিম, এখন আমাদের উপায়।" করিম বলিল "সে জন্য ভাবিও না আমি যতদিন বাঁচিয়া আছি, ততদিন তোমাদের কোন কষ্ট হইবে না। আমিও ত তোমারই ছেলে। বসির গিয়াছে, আমি আছি। তোমাদের কোন ভয় নাই। আমি যেমন করিয়া হোক তোমাদের সংসার চালাইব। তাহার জন্য ভাবিও না।"

করিমের কথা শুনিয়া বৃদ্ধা যেন অকুল সাগরে কুল পাইল। সে করিমকে প্রাণ খুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিল।

তাহার পর করিম বসিরের স্ত্রীর সমীপবর্ত্তী হইয়া বলিল "বৌ, তোমার কোন চিন্তা নাই। আল্লা তোমাদিগকে কষ্ট দিবেন না। আমি যে কয়দিন আছি, তোমাদের সে কয়দিন কোন ভাবনা করিতে হইবে না। আমি যেমন করিয়া হউক, তোমাদের চালাইব। বসির ভাই চলিয়া গেল, এখন আমাকেই তোমাদের সব করিতে হইবে।

বসিরের স্ত্রী এ কথার কোন উত্তর দিল না, উত্তর দেওয়ার প্রয়োজনও বোধ করিল না। করিম ইহাতে মনে যেন একটু অসন্তুষ্ট হইল। সে মনে করিয়াছিল, বসিরের স্ত্রী তাহাকে বলিবে "ভাই এখন তুমিই আমার একমাত্র আশ্রয়, তুমিই আমার একমাত্র গতি।" তাহার পর সে করিমকে কত প্রকারে তুষ্ট করিবার চেষ্টা করিবে। কিন্তু বসিরের স্ত্রী সে রকম কোন ভাবই প্রকাশ করিল না; তাহার এই অযাচিত অনুগ্রহ ও সাহায্য প্রদানের কথা শুনিয়া, এই পতিহীনা, আশ্রয়হীনা যুবতী তাহাকে সামান্য একটা ধন্যবাদও করিল না, একটু কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ করিল না, ইহাতে করিমের হৃদয় একটু দমিয়া গেল; তাহার উদ্দেশ্য যে সহজে সিদ্ধ হইবে না, তাহা সে আজই বুঝিতে পারিল। সে তখন বিষণ্ণ হৃদয়ে উঠিল এবং পরদিন প্রাতঃকালে আসিয়া ঘর গৃহস্থালীর ব্যবস্থা করিয়া দিয়া যাইবে, এই কথা বলিয়া বাড়ীতে চলিয়া গেল।

বসিরের স্ত্রী তখন শাশুড়ীর নিকট আসিয়া বসিল এবং চুপে চুপে বলিল "মা, আমার মনে হইতেছে তোমার ছেলে মরে নাই। করিম ভাইয়ের কথা আমার মনে ধরিতেছে না, কে যেন আমাকে বলিতেছে করিমের সব কথা মিথ্যা; তোমার ছেলে বেঁচে আছে, আবার ফিরে আসবে। কেন এমন কথা আমার মনে হচ্চে, তা আমি বল্‌তে পারিনে, কিন্তু আমি করিমের কথাবার্ত্তা যত শুন্‌ছি ততই আবার মনে হ'চ্চে ও মিথ্যা কথা বোল্‌ছে।"

বৃদ্ধা পুত্রবধূকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া বলিল; "বৌ, তুমি কি পাগল হোলে। করিম কি মিথ্যা বল্‌বার ছেলে, ওর গুণের কি শেষ আছে। ও আমাদের জন্য প্রাণ দিতে পারে। বসিরকেও বড় ভাল বাসিত; ও মিথ্যা কথা বোল্‌বে কেন? আহা, বাছা আমার তিন দিন খায় নাই, নায় নাই, না না, বৌ! তুমি পাগলের মত কথা বোলো না। আমার বসির আর বেঁচে নেই, আর তার মুখ আমরা দেখ্‌তে পাবো না।"

বৌ বলিল "মা, তা তুমি যাই বল, আমার কিন্তু মনে বলিতেছে তোমার ছেলে মরে নাই, সে আবার আসবে।"

বৃদ্ধা বলিল "তাই হো'ক বাছা, তাই হো'ক। তা বোলে এমন কথাটা সকলের কাছে বোলো না, তারা মনে কোর্‌বে তোমার মাথা খারাপ হোয়ে গিয়েছে। আজ সারাদিন একটা দানাও পেটে দিলে না, চল এখন শুইগে।

এই বলিয়া বৌকে লইয়া বৃদ্ধা শয়ন করিতে গেল।

(৩)

দিনের পর দিন যাইতে লাগিল। বৃদ্ধার পুত্রশোকও ক্রমে কমিয়া আসিতে লাগিল; কিন্তু এতদিনের মধ্যে বসিরের স্ত্রীর চক্ষে কেহ জল দেখে নাই, এ কথা লইয়া প্রতিবেশিনী মণ্ডলীতে একটু আধটুকু আলোচনাও হইল।

করিম দিবারাত্র বসিরের মাতা ও স্ত্রীর সুখ স্বচ্ছন্দের জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল। নিজে মজুরী করিয়া যাহা পায়, তাহাই আনিয়া বসিরের মায়ের হাতে দেয়। পাড়ার লোকে কানা কানি করিতে লাগিল যে, করিমের মতলব ভাল নহে; কেহ কেহ বলিল যে, করিম হয়ত বসিরের বিধবা পত্নীকে নিকা করিবার চেষ্টা করিতেছে।

এদিকে করিম যে প্রকার ঘনিষ্ঠতা আরম্ভ করিয়াছে, তাহাতে বসিরের মাতা বড়ই আনন্দ বোধ করিতেছে; কিন্তু বসিরের স্ত্রীর নিকট করিমের ব্যবহার বড়ই অপ্রীতিকর বোধ হইতে লাগিল। তাহার মনে পূর্ব্বে যে সন্দেহ হইয়াছিল, তাহা ক্রমেই বদ্ধমূল হইতে লাগিল। সে যেন স্পষ্ট দেখিতে লাগিল যে, করিম নিজের অভিপ্রায় সাধনের জন্যই বসিরকে বাদায় ফেলিয়া আসিয়াছে, বাঘের মুখে দিয়া আসিয়াছে। বসিরের রোগের কথা, তাহার মৃত্যুর কথা সে বিশ্বাস করিতেই পারিতেছে না।

করিম খরচপত্রের সমস্ত ত দেয়ই, অধিকন্তু সে এক দিন বাজার হইতে ভাল একখানি সাড়ী কিনিয়া আনিয়া গোপনে বসিরের স্ত্রীর হাতে দিয়া বলিল "বৌ, তুমি এমন ভাবে থাক কেন? যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে। যে মরিয়াছে, সে কি আর ফিরিয়া আসিবে? তবে তুমি এমন ভাবে থাক কেন? এই কাপড়খানি পরিও, শরীরের উপর যত্ন করিও। ভাবিয়া কি করিবে, আল্লা নসিবে যাহা লিখিয়াছেন, তাহাই হইবে। তুমি এমন করিয়া থাকিও না; ওতে আমার মনে বড় কষ্ট হয়। আমাকে কি তুমি পর মনে কর? ছি! মুখ ভার করিয়া থাকিও না।"

করিম আরও যেন কি বলিতে যাইতে ছিল, তাহার কথায় বাধা দিয়া বসিরের স্ত্রী বলিল, "দেখ করিম ভাই, তোমাকে আমি আমার ভাইয়ের মতই ভাবিতাম, সেই ভাবেই তোমার সঙ্গে কথা বলিতাম। কিন্তু তোমার ভাব বড় ভাল নহে। তুমি আর আমার সঙ্গে কথা বলিও না। আমি আর তোমার সম্মুখে বাহির হইব না, তোমার সঙ্গে কথাও বলিব না। তোমার মতলব আমি বুঝিয়াছি। তুমি যদি এখনও সাবধান না হও, তাহা হইলে আমি মাকে লইয়া এ গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া যাইব। পথে পথে ভিক্ষা করিয়া খাইব, তবুও তোমার নিকট

হইতে কিছু লইব না। তোমার কাপড় লইয়া যাও। আর কখন আমার সহিত কথা বলিও না, তোমার ভাল হইবে না। এখনও সাবধান করিতেছি

বসিরের স্ত্রীর কথা শুনিয়া করিম যেন কেমন হইয়া গেল, তাহার মুখদিয়া কথা বাহির হইল না। করিম কোন কথা না বলিয়া সেদিনের মত চলিয়া গেল। সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল, যেমন করিয়া হউক এই কে হস্তগত করিতেই হইবে। যাহার জন্য সে নরহত্যা, বন্ধুহত্যা করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই, তাহাকে সে সহজে ছাড়িবে না,—জান কবুল!

বসিরের স্ত্রীও মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল, আর কোন দিন করিম যদি তাহাকে প্রলুব্ধ করিতে চেষ্টা করে, তাহা হইলে লাথি মারিয়া তাহাকে বাড়ীর বাহির করিয়া দিবে। তাহার পর যা থাকে অদৃষ্টে! পথে পথে ভিক্ষা করিয়া খাইবে, অনাহারে প্রাণত্যাগ করিবে তবুও সে করিমের প্রলোভনে ভুলিবে না। তাহার বিশ্বাস, তাহার স্বামী বাচিয়া আছে, সে আবার ফিরিয়া আসিবে, নিতান্তই যদি তাহার স্বামী ফিরিয়া না আসে, সে তাহারই কথা চিরদিন ভাবিবে, তাহারই নাম চিরদিন জপ করিবে। শাস্ত্রে থাকে থাকুক, সে এজীবনে আর কাহাকেও নিকা করিবে না—না খাইয়া মরিতে হয় তাহাও স্বীকার।

(ক্রমশঃ)

শ্রীজলধর সেন।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সমালোচনা

“সতীর আলেখ্য বা শৈব্যা-চরিত। শ্রীশরচ্চন্দ্র ধর প্রণীত। ঢাকা—কটন লাইব্রেরী হইতে শ্রীশরচ্চন্দ্র দত্ত কর্তৃক প্রকাশিত। ঢাকা—কাশী প্রিণ্টিং ওয়ার্কসে মুদ্রিত। মূল্য ॥৵০ দশ আনা।”

গ্রন্থখানি ক্রাউন ষোল পেজি আকারে ১১২ পৃষ্ঠায় পরিসমাপ্ত। ইহার মুদ্রণ-কার্য্য পাইকা অক্ষরে, যথাসম্ভব পারিপাট্য সহকারে সম্পন্ন হইয়াছে। গ্রন্থে দুইখানি ছবি আছে। এক খানিতে রাজ্য ও রাজপুরী পরিত্যাগ পূর্ব্বক, আত্মবিক্রয়ার্থ, রাজা হরিশ্চন্দ্র, রাণী শৈব্যা ও রাজকুমার রোহিতাশ্বের দীনবেশে কাশীযাত্রা, এবং অন্য খানিতে শ্মশান-দৃশ্য অঙ্কিত হইয়াছে। ছবি দুখানি সুদৃশ্য, সুন্দর ও ভাব-ব্যঞ্জক।

শৈব্যার উপাখ্যান-ভাগ পৌরাণিক। গ্রন্থকার মার্কণ্ডেয় পুরাণ অবলম্বনে ইহা লিখিয়াছেন কিন্তু ইহা উপন্যাস বা উপাখ্যানের রীতি অনুসারে রচিত নহে। উপন্যাস বা উপাখ্যানে ঘটনাবলী, ও নায়ক নায়িকার অনুষ্ঠিত তদানুষঙ্গিক কার্য্য-কলাপের বর্ণনা দ্বারা তাহাদিগের অপরিজ্ঞাত চরিত্র পরিস্ফুট করা হইয়া থাকে। এ গ্রন্থে তাহা করা হয় নাই। গ্রন্থকার, হরিশ্চন্দ্র ও শৈব্যার জীবন-পটের এক একটা দৃশ্য সম্মুখে ধরিয়াছেন, আর তাঁহাদিগের সর্ব্বত্রপরিচিত চরিত্রের সমালোচনা ও চরিত্রগত উচ্চ ভাবগুলির বিশদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই চরিত্র সমালোচন অতি সুন্দর এবং স্থানে স্থানে প্রকৃতই চিত্তহারী হইয়াছে। বর্ণনায় কোন কোন অংশে কবিত্ব ফলান হইয়াছে। কোন কোন স্থানে গ্রন্থকার, দার্শনিক ভাবের উচ্চতর গ্রামে আরোহণ করিয়া, আপন কৃতিত্ব-প্রদর্শনে প্রয়াস পাইয়াছেন। ভাষা গভীর ও মধুর; শব্দবিন্যাসে উহা কোন স্থানেই আড়ম্বরশূন্য বা দরিদ্র নহে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ নিম্নে একটি স্থান উদ্ধৃত হইল।—

“পতিভক্তির অর্থ পতির জন্য, পতির পুণ্য-প্রতিষ্ঠার জন্য আত্মত্যাগ। আত্মসুখের লালসায় আত্মত্যাগ নহে, —আত্মসুখশূন্য আত্মত্যাগ। যে স্ত্রী আত্মসুখের কামনায় স্বামিসেবা করেন, তাঁহারা প্রকৃতপক্ষে স্বামিসেবা করেন না,—আত্মসেবা করেন। যেখানে আত্মপূজা, আত্ম-উপাসনা, সেইখানেই কলঙ্ক, সেইখানেই নরক। * * * দেবী শৈব্যা আত্মবিসর্জ্জন করিলেন, সুখের কামনা তাঁহার নাই। তাঁহার সকল সুখ, সকল শান্তি, সকল আনন্দ স্বামী; সংসারের সকল এক দিকে, সকলের সার, জীবনের চরম লক্ষ্য স্বামী আর এক দিকে। তিনি স্বামীকে ঋণমুক্ত দেখিলেই সুখী হইবেন ও শান্তিলাভ করিবেন। তাই তাঁহার আত্ম-বিসর্জ্জন। তিনি আত্ম-

বিসর্জ্জন করিয়াই সুখী, পতি হইতে আর কোন সুখের প্রত্যাশা করেন না। ইহাই শৈব্যার পতিভক্তির অর্থ।"

মোটের উপর, এই গ্রন্থখানি, পুরমহিলাদিগের পক্ষে সর্ব্বতোভাবেই প্রীতিপ্রদ সুপাঠ্যরূপে পরিগণিত হইবার যোগ্য। গ্রন্থকার শরৎবাবু এই গ্রন্থপ্রণয়ন দ্বারা, সম্ভবতঃ, সুলেখক বলিয়া পরিচিত হইতে পারিবেন। কিন্তু ভাষার গাঁথনি ও শব্দবিন্যাসবিষয়ে যতদুর দৃষ্টি রাখিয়া চলা আবশ্যক, দুঃখের বিষয়, এই সংস্করণে তিনি তাহা করেন নাই। প্রুফসংশোধনও যেন একটু হেলায় তাচ্ছিল্যে সম্পন্ন হইয়াছে। তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য, নিম্নে কতিপয় আপত্তিজনক স্থানের উল্লেখ করা যাইতেছে।—

মহৎ উদ্দেশ্য, প্রায় সকল স্থানেই 'মহান্ উদ্দেশ্যে' পরিণত হইয়াছে। উৎসৃষ্ট ও উৎসর্গ স্থলে "উৎসর্গীকৃত" লেখা রহিয়াছে। রাশীকৃত, দৃঢ়ীকৃত ও বশীকৃত. ইত্যাদি পদ হয় বলিয়া, উৎসর্গীকৃতও লেখা যাইবে, এমন কোন কথা নাই। জাগ্রৎ ও জাগরিত হইতে পারে। 'জাগ্রত' হয় কি? স্নিগ্ধকর যদি হয়, তাহা হইলে মোহকর, স্বাস্থ্যকর, তৃপ্তিকর ও পুষ্টিকর না লিখিয়া মুগ্ধকর, সুস্থকর, তৃপ্তকর, পুষ্টকর ও প্রীতিকরের পরিবর্ত্তে প্রীতকর লিখেন না কেন? "গাহিতে লাগিল জয় সত্যের জয়।" গাহিতে না লিখিয়া, গাইতে লিখিলে দোষ কি? সিঞ্চনের পরিবর্ত্তে সেচন লেখাই সঙ্গত। পূর্ব্বে যে পেরাটি উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতেও 'যে স্ত্রী' ইহার সর্ব্বনামরূপে 'তাঁহারা' লেখা হইয়াছে। 'যে স্ত্রী' বলিলে, একটি স্ত্রী বুঝা যায়, উহার সর্ব্বনাম 'তিনি' হওয়া উচিত ছিল।

একস্থানে আছে, "ইহাতে অসীম, অম্লান সুখ ও আনন্দের কণা আছে।" যে সুখ ও আনন্দ অসীম, তাহার আবার কণা কি? অথবা যেখানে অসীম, অম্লান সুখ, সে খানে আবার আনন্দের কণা কেন;—সমুদ্রের বক্ষে কুশাগ্রে সলিল-প্রক্ষেপের কোন মাহাত্ম্য আছে কি?

আর একস্থানে আছে সে আনন্দেই আনন্দময় মানব-দম্পতির হৃদয়মন্দিরের প্রেম-বেদীর উপর প্রাণপূর্ণ শ্রদ্ধার সহিত প্রতিষ্ঠিত হন।" মানবদম্পতির হৃদয়মন্দিরের প্রেমবেদীর ইত্যাদি রূপ একই স্থানে কতকগুলি ষষ্ঠ্যন্ত পদের প্রয়োগ ভাল শুনায় না,—হৃদয়-মন্দিরের স্থানে, হৃদয়-মন্দিরস্থ বলিলেই ভাল হইত। আনন্দময় শব্দের পরে কমা না থাকাতে, অর্থে গোল ঘটিয়াছে। শ্রদ্ধার সহিত প্রতিষ্ঠিত হন। এই শ্রদ্ধা কাহার? আনন্দময়ের, না মানব-দম্পতির?

আমরা আশা করি, গ্রন্থকার, এই গ্রন্থের পুনর্মুদ্রণ-সময়ে, এই সকল দোষের অপহার দ্বারা, তাঁহার এই স্ত্রীপাঠ্য উপাদেয় গ্রন্থখানিকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিয়া লইতে বিশেষরূপ মনোযোগী ও যত্নবান্ হইবেন।

এই গ্রন্থ পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেই বুঝা যায় যে, গ্রন্থকার যাহা লিখিয়াছেন, মনের ভাবাবেগে লিখিয়াছেন, এবং লিখিতে লিখিতে, সময় সময়, আপনার ভাবে আপনি তন্ময় হইয়া, সাধারণ পাঠকের কথা ভুলিয়া গিয়াছেন। রচনাকার্য্যের পক্ষে, স্থান, বিশেষে, ইহা একটি বড় আদরণীয় গুণ, সন্দেহ নাই; কিন্তু অবস্থা বিপাকে তাঁহার এই গুণ দোষে পরিণত হইয়াছে।

শৈব্যা চরিত পড়িতে পড়িতে, আমাদিগের পরিচিত স্বর্গগত একটি ভদ্রলোকের কথা মনে পড়িয়াছিল। এই ভদ্রলোকের ক্রোধ বড় প্রবল ছিল। তিনি ভৃত্যের সামান্য ত্রুটিতেই ক্রোধে অধীর হইয়া, তাহাকে তীব্র-ভাষায় গালি দিতে আরম্ভ করিতেন। কিন্তু এই গালি শীঘ্র থামিত না। এক একবার গালি দিতেন, আর বলিতেন, 'না কটু হ'ল না' এই বলিয়া গালিবাচক শব্দ-নির্ব্বাচনে আর এক গ্রাম উপরে উঠিতেন। এই রূপে গালির প্রবাহ অবিরামগতি চলিতে থাকিত, তথাপি উহা তাঁহার মনের মত 'কটু' হইত না।

শরৎ বাবুও প্রেম.পতিব্রতা-ধর্ম্ম 'ভক্তি' ও দয়া প্রভৃতি মানব-হৃদয়ের উচ্চভাব-নিচয়ের স্মরণ-মননে, সময় সময়, এতদূর আবেগবিহ্বল ও আত্ম-হারা হইয়া পড়িয়াছেন যে, উক্ত ভদ্রলোকের মত, 'হ'ল না, মনোভাব বুঝি কথায় ফুট্‌ল না' এইরূপ চিন্তা করিয়া, একই ভাবের অভিব্যক্তি মানসে উপর্য্যুপরি বর্ণনার পর বর্ণনার ভিন্ন ভিন্ন প্রণালী অবলম্বন করিয়াও যেন মনের সাধ মিটাইতে পারেন নাই।

কখন কখন বা সুকণ্ঠ গায়িকা যেমন আপন কণ্ঠের ভিন্ন ভিন্ন তান ও মূর্চ্ছনার প্রকারপ্রদর্শনার্থ একই পদের পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করে, তিনিও তেমন স্থানে স্থানে আপনার বর্ণন-কৌশলের পরিচয় প্রদানার্থ, একই কথার ভিন্ন ভিন্ন ভাবে পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করিয়াছেন। এই কারণে, শৈব্যা চরিতের কোন কোন অংশের পাঠ-সময়ে পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে ও ঈষৎ একটু বিরক্তির উদ্রেক হইয়া থাকে। 'সংক্ষিপ্ততাই রস-সৃষ্টির মূলমন্ত্র', গ্রন্থ রচনায় এই সূত্রের যথাসম্ভব অনুসরণ করা কর্ত্তব্য।

শরৎ বাবু ইহার পরবর্ত্তী সংস্করণে যদি এ অংশেও একটু সতর্ক হইয়া চলেন, তাহা হইলে তাঁহার শৈব্যাচরিত যে অধিকতর উপাদেয় ও সুখপাঠ্যরূপে আদৃত হইবে, তাহাতে আর কিছু মাত্র সন্দেহ নাই।

"প্রভাত-প্রসূন। শ্রীঅবনীকান্ত সেন প্রণীত। শ্রীললিতমোহন বসাক কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ঢাকা আশুতোষ প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য ছয় আনা।" গ্রন্থখানি ১২৮ পৃষ্ঠায় অর্থাৎ ষোল পেজি আকারের ৮ ফর্ম্মায় পরিসমাপ্ত। গদ্য প্রবন্ধে প্রথম ২০৭ পৃষ্ঠা ও পদ্যে অবশিষ্ট ১১ পৃষ্ঠা পূর্ণ হইয়াছে। গদ্য অংশে 'ছাত্র জীবনে ধর্ম্ম জীবনের আবশ্যতা', 'রাজা রামমোহন রায়', 'গুরুভক্তি', 'ধর্ম্মাত্মা হজরত মোহাম্মদ', 'আত্মোন্নতি ও তৎসাধনের উপায়', 'দাতা মহম্মদ মহসীন', 'প্রাচীন ভারতের গৌরব', এবং 'রায় বাহাদুর কালীপ্রসন্ন' এই আটটি প্রবন্ধ এবং পদ্যাংশে 'কে তুমি?', 'দুঃখীর সান্ত্বনা' ও 'জন্মভূমি' প্রভৃতি বারটি কবিতা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। গ্রন্থকার ইহাকে বিদ্যালয়ের পাঠোপযোগী করিয়া লিখিবার নিমিত্ত যথাশক্তি যত্ন করিয়াছেন। প্রবন্ধগুলি সমস্তই উপদেশাত্মক ও শিক্ষাপ্রদ, সুতরাং বিদ্যালয়ের পাঠোপযোগী; এ অংশে তাঁহার যত্ন সফল হইয়াছে।

'প্রভাত-প্রসূনের' ভাষা স্থানে স্থানে গভীর, শব্দ সম্পদে সমৃদ্ধ এবং স্থানে স্থানে মধুর। দুঃখের বিষয়, ভাষাটি আশানুরূপ প্রাঞ্জল হয় নাই। কিন্তু বিশেষ প্রশংসার কথা এই যে, ভাষাগত ভুলভ্রান্তি প্রায় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। সুগন্ধি স্থলে 'সুগন্ধ', মহতী নীরবতা স্থলে 'মহান্ নীরবতা' ইত্যাদিরূপ গুটি কএক ভুল মাত্র চক্ষে পড়িয়াছে। আশা করি, গ্রন্থকার পরবর্ত্তী সংস্করণে গ্রন্থখানিকে সম্পূর্ণরূপে নির্ভুল করিতে পারিবেন।

অবনী বাবুর গদ্য পাঠ করিবার সময়, স্বর্গগত রায় বাহাদুর কালীপ্রসন্ন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের লেখা পাঠ করিতেছি বলিয়া ভ্রম হয়। অবনী বাবু স্থানে স্থানে আত্ম মতের সমর্থনার্থ রায় বাহাদুরের লেখা উদ্ধৃত করিয়াছেন। কোটেশন চিহ্নদ্বারা উদ্ধৃত অংশ চিহ্নিত না থাকিলে, স্থূল দৃষ্টিতে, অবনী বাবুর লেখা হইতে উহা পৃথক্ করিয়া লওয়া কঠিন হইত। অবনী বাবু রায় বাহাদুরের ভাষা এতদূর অভ্যাস করিয়াছেন এবং রায় বাহাদুরের ভাব-লহরীতে এতদূর অনুপ্রাণিত ও তন্ময় হইয়া পড়িয়াছেন যে, তিনি অনেক স্থলে, অজ্ঞাতসারে, তাঁহারই ভাব ও ভাষা অবিকল প্রতিফলিত করিয়াও কোটেশন চিহ্ন দেওয়া আবশ্যক মনে করেন নাই। তাঁহার এই অনুকরণ আমরা যতদূর বুঝিতে পারিলাম, ইচ্ছাকৃত নহে,—স্বাভাবিক। গ্রন্থ-রচনায় অবনী বাবুর এই প্রথম উদ্যম। যত্ন করিলে তিনি সুলেখক হইতে পারিবেন। তাঁহার লেখায় রায় বাহাদুরের ভাষার সেই সজীব ওজস্বিতা, সেই গাম্ভীর্য্য ও সেই জীবন্ত মাধুরী না ফুটিলেও, উহার একটা নির্জীব ফটো বা প্রতিবিম্ব যে প্রতিফলিত হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

পদ্য কয়টির মধ্যে গুটি দুই ইংরেজী কবিতার প্রায় আক্ষরিক অনুবাদ। অনুবাদ সুন্দর হইয়াছে। কবিতা-গুলি সমস্তই প্রাঞ্জল ও মধুর। 'জন্ম ভূমি' নামক কবিতা হইতে একটি শ্লোক দৃষ্টান্তস্বরূপ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।—

"জন্মভূমি, তব পদে করি নিবেদন,
দিক্ নিরূপণ যন্ত্রে চুম্বক যেমন,
যে দিকে চালাও তায়,
উত্তরে ঘুরিয়া যায়,
তেমন যেখানে কেন করি না গমন,
তব পানে হিয়া যেন রহে অনুক্ষণ।"

গ্রন্থকার নব্য যুবা। ইহাই তাঁহার প্রথম চেষ্টা। উপদেশচ্ছলে, দুটি কথা বলিলে বোধ হয়, তত দোষের হইবে না। বিদ্যালয়ের পাঠ্য গ্রন্থ লিখিতে হইলে, এই কএকটি বিষয়ে দৃষ্টি রাখিয়া চলিলে ভাল হয়। ভাবাত্মক বিষয় ছাড়িয়া দিয়া, কথাত্মক বিষয় নির্ব্বাচন পূর্ব্বক সরল ও মধুর শব্দদ্বারা ছোট ছোট বাক্য রচনা করা কর্ত্তব্য। বাক্য যাহাতে জটিল ও দীর্ঘ না হয়, তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া চলিতে হইবে। অনর্থক শব্দাড়ম্বর ও বিনা প্রয়োজনে বিশেষণ শব্দের বাহুল্য ভাল নহে। সংজ্ঞা নির্দ্দেশ বড় কঠিন কর্ম্ম। কোন বিষয় সংজ্ঞা রচনা দ্বারা বুঝাইতে চেষ্টা না করিয়া, সরল ব্যাখ্যা দ্বারা বুঝান কর্ত্তব্য। পাঠ্য গ্রন্থ রচনা কালে, এই কএকটি কথার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া চলিলে, আমাদিগের স্থির বিশ্বাস, অবনী বাবু এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ সফলমনোরথ ও কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন।

"**রচনা-পুস্তক**। শ্রীহরনাথ ঘোষ প্রণীত। ঢাকা, ভিক্টোরিয়া লাইব্রেরী হইতে শ্রীজিতেন্দ্রনাথ ঘোষ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ৷৶০ আনা।" অধুনা শিক্ষা বিভাগের বিধান অনুসারে, বাঙ্গালা রচনা, এদেশের প্রায় সমস্ত পরীক্ষারই বিষয়ীভূত হইয়াছে। সুতরাং বিদ্যালয় মাত্রেই, অল্লাধিক পরিমাণে, বাঙ্গালা রচনা-শিক্ষাদেওয়া হইতেছে। লোকে যাহা চায়, বাজারে সেই মালেরই আমদানী হয়। ইহারই মধ্যে বাঙ্গালা-রচনা-শিক্ষা-কল্পে কএক খানি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। হরনাথ বাবুর 'রচনা-পুস্তক' ও এই সকলেরই অন্যতম। ইহাতে কতিপয় বাঙ্গালা শব্দের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, ব্যাকরণ, বাক্য রচনা, শব্দবিন্যাস-প্রণালী, প্রবন্ধ লেখার সঙ্কেত এবং শুদ্ধাশুদ্ধির বিচার ইত্যাদি, বহু প্রয়োজনীয় বিষয়ের সন্নিবেশ করা হইয়াছে। এ অংশে এই শ্রেণীর যে কএক খানি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে, তন্মধ্যে হরনাথ বাবুর 'রচনা পুস্তক' সর্ব্ব শ্রেষ্ঠরূপে গণ্য হইবার যোগ্য।

কিন্তু এই সকল গ্রন্থদ্বারা বালকদিগের রচনা-শিক্ষার পক্ষে কিরূপ সাহায্য হইতেছে, তাহা আমরা জানি না। আমরা ইহাই জানি যে, যাঁহারা লেখকরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের কেহই, ঈদৃশ সীমাবদ্ধ বিধি-ব্যবস্থা বা রচনা বিষয়ক আইন কানন মুখস্থ করিয়া, লেখক বা গ্রন্থকার হন নাই। যেমন নিদান পাঠ করিলেই চিকিৎসক, তালের মাত্রা বুঝিলেই নর্ত্তক, যোগের সূত্র মুখস্থ থাকিলেই যোগী, অথবা রণ-নীতির গ্রন্থ কণ্ঠস্থ হইলেই বীর হওয়া যায় না, তেমন কেবল রচনা বিষয়ক সূত্র শিক্ষা দ্বারাই কেহ রচক বা লেখক হইতে পারে না।

অগ্রে মনোযোগ সহকারে ভাল ভাল গ্রন্থ অধ্যয়ন দ্বারা ভাব-সঞ্চয়, ও ভাব-ব্যক্তির উপায়,—ভাষাটিকে আয়ত্ত করিয়া লওয়া আবশ্যক। এতদ্ব্যতীত রচনা বিষয়ে কৃতকার্য্য হওয়া কখনও সম্ভবপর নহে! মালা গাঁথিবার প্রণালী শিক্ষা করা হইল, কিন্তু বাগানে ফুল না ফুটিলে এবং মালা গাঁথিবার উপযোগি সূত্রটি আপনার করায়ত্ত না থাকিলে, মালাগাঁথা হইবে কেন? রচনার প্রধান উপাদান ভাব, ভাবের পর ভাষা। এই দুইএর জন্যই গ্রন্থ পাঠের প্রয়োজন। রচনা বিষয়ক সূত্র পাঠে এ অভাব পূর্ণ হইতে পারে কি? কিবা হরনাথ বাবুর রচনা পুস্তক, কিবা অন্য কাহারও রচনা-শিক্ষাবিষয়ক গ্রন্থ, কোন গ্রন্থেরই রচনা সম্পর্কে, রাজপথ দেখাইয়া দিবার সাধ্য নাই। বিনা আয়াসে, বিনা সাধনায় সে পথ পাওয়া অসম্ভব। তবে ভাবের তহবিল যদি পুষ্ট হয়,—বাগানে যদি ফুল ফোটে, আর ভাষায় যদি প্রবেশাধিকার জন্মিয়া থাকে, তাহা হইলে, কোন্ ফুল কোথায় রাখিয়া, কি ভাবে সূত্র চালাইলে, কোন্ ফুলের পরে, কি ভাবে কোন্ ফুল গাঁথিলে, মালাটি যথারীতি গ্রথিত ও সুন্দর হয়, তাহার উপায় প্রদর্শনে এই সকল গ্রন্থ অনেকাংশে কার্য্যকর হইতে পারে।

হরনাথ বাবু ব্যাকরণের খুটি নাটি লইয়া, এই গ্রন্থে অকারণ অতিরিক্ত শ্রম করিয়াছেন। মহামহোপাধ্যায় পাণ্ডত শ্রীযুক্ত প্রসন্নচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়ের সাহিত্য-প্রবেশ ব্যাকরণে বর্ত্তমান বাঙ্গালা ভাষার বিস্তৃত ইতিহাস, ব্যাকরণ ও বাঙ্গালার নাড়ী নক্ষত্রের বিশদ পরিচয় আছে। সুতরাং রচনাপুস্তকে রচনাকার্য্যের জন্য অপরিহার্য্যরূপে প্রয়োজনীয় ব্যাকরণ বিষয়ে সংক্ষেপে দিঙ্মাত্র প্রদর্শন করিলেই যথেষ্ট হইত। যাহা হউক, হরনাথ

বাবু পরিশ্রমে ক্রটি করেন নাই। তাঁহার যত্ন ও শ্রম সার্থক হইলেই আমরা সুখী হইব।

ময়মনসিংহ ঐতিহাসিক প্রদর্শনী।

পূত-সলিল ব্রহ্মপুত্র-তটে নববর্ষের প্রথম দিন হইতে আরম্ভ করিয়া তিনদিনব্যাপী বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের চতুর্থ অধিবেশন সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এই সম্মিলনের সঙ্গে একটী ঐতিহাসিক প্রদর্শনীরও ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

এইরূপ ঐতিহাসিক প্রদর্শনীর ব্যবস্থা একদিন ময়মনসিংহ হইতেই প্রথম সূচিত হইয়াছিল। বিগত ১৩১২ সনে এই নগরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশন হয়। তখন ময়মনসিংহ-সারস্বত-সমিতির কর্ত্তৃপক্ষ এই নগরে "কৃষিশিল্প ও সাহিত্য প্রদর্শনীর" ব্যবস্থা করেন। কবিবর রবীন্দ্রনাথকে আমন্ত্রণ করিয়া সাহিত্যিক মিলনের উদ্যোগ করা হয়; রবীন্দ্রনাথ "স্বদেশী সমবায়" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিবেন বলিয়া স্বীকৃত হন। পরিশেষে রবীন্দ্রনাথ পীড়িত হইলে, সম্মিলন স্থগিত থাকে; কেবল সাহিত্য প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয়। তারপর ১৯০৬ সনে কলিকাতা কংগ্রেসের সময় সাহিত্য পরিষৎ একটী ঐতিহাসিক প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন। বিগত বৎসর ভাগলপুরেও প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হইয়াছিল।

১৩১২ সনে ময়মনসিংহে যে প্রথম সাহিত্য-প্রদর্শনী হইয়াছিল, তাহাতে সংগৃহীত সাহিত্যিক দ্রব্য সম্ভার ৪ ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছিল। (১) এজেলার প্রাচীন হস্ত-লিখিত গ্রন্থ ও দলিলাদি (২) আধুনিক হস্ত লিখিত গ্রন্থ (৩) আধুনিক মুদ্রিত গ্রন্থ (৪) বঙ্গদেশের মহিলা গ্রন্থকর্ত্রীদিগের গ্রন্থ। এবারকার ঐতিহাসিক সংগ্রহ গুলিকে নিম্নলিখিত চারিভাগে স্থান প্রদান করা হইয়াছে।

১। প্রাচীন হস্ত লিখিত গ্রন্থ বিভাগ।
২। ঐতিহাসিক চিত্র-বিভাগ।
৩। প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ।
৪। পল্লি-বিবরণ সংগ্রহ-বিভাগ।

প্রদর্শনী প্রাঙ্গনের সম্মুখেই ঐতিহাসিক বিভাগ। সেই প্রকাণ্ড গৃহের চারি প্রকোষ্ঠে এই সকল প্রদর্শনী দ্রব্য সজ্জিত করা হইয়াছিল। পশ্চিমের প্রকোষ্ঠে এজেলার প্রাচীন হস্ত-লিখিত গ্রন্থ ও দালল পত্র প্রদর্শিত হইয়াছে। তৎপর চিত্রশালা, পল্লি বিবরণ সংগ্রহ ও প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগ।

ময়মনসিংহ সাহিত্য সম্পদে চিরসম্পদশালী। বাঙ্গালী আদি কবিদিগের মধ্যে কৃত্তিবাস ও কাশীরাম দাসই সর্ব্বাপেক্ষা বরণীয়। পশ্চিম বঙ্গ যে সময়ে কৃত্তিবাসের কলকণ্ঠে মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার বহুপূর্ব্ব হইতে ময়মনসিংহ নারায়ণ দেবের পদ্মাপুরাণের অমৃত রস আস্বাদন করিতেছিল। পূর্ব্ববঙ্গবাসীর জড়তা ও আত্ম-সম্মান বোধের অভাবে নারায়ণ দেব প্রাচীনতম হইয়াও অপরিচিত অবস্থায় লুপ্ত হইতে চলিয়াছেন। এই বিভাগে সেই প্রাচীনতম কবি নারায়ণ দেবের পদ্মাপুরাণ, মাধবাচার্য্যের শ্রীকৃষ্ণবিজয়, রূপনারায়ণ ঘোষের চণ্ডী, অন্ধ কবি ভবানীদাসের চণ্ডী, রামেশ্বর নন্দীর মহাভারত, অনন্ত দত্তের ক্রিয়াযোগসার, কৃষ্ণদাসের বিষ্ণুভক্তি রত্নাবলী, বংশীদাসের পদ্মাপুরাণ, বৈদ্য রঘুদাসের স্বরূপ চরিত, গঙ্গানারায়ণ দেবের ভাস্কর পরাভব, জগন্নাথের হাড়মালা, মুক্তারাম নাগের কালীপুরাণ, বিষ্ণুরাম নন্দীর উদ্ধবগীতা, রাজা জগন্নাথের জগদ্ধাত্রী গীতাবলি, রাজা রাজকৃষ্ণ সিংহের পদ্মাপুরাণ ইত্যাদি সংগৃহীত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য বহু প্রাচীন দলিল ও গ্রন্থ প্রদর্শিত হইয়াছিল। মাঘানের কালী বিদ্যালঙ্কার স্মার্ত্ত রঘু নন্দনের মত খণ্ডন করিয়া "অষ্টাবিংশতত্ত্বাবশিষ্টম্" প্রণয়ন করেন। তাঁহার সেই জগদ্বিখ্যাত গ্রন্থ এবং মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্তের গ্রন্থ রাশি সযত্নে সংগৃহীত হইয়াছিল। এই বিভাগে রাজাবলি নামক একখানা হস্তলিখিত সংস্কৃত ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস সংগৃহীত হইয়াছিল। মহারাজ কাশিমবাজার, তাহা মুদ্রণ জন্য লইয়া গিয়াছেন। এই বিভাগে সর্ব্বপেক্ষা আশ্চর্য্য একখানা গ্রন্থ আসিয়াছিল, তাহার ফটো প্রদর্শিত হইল। এই গ্রন্থ

সুসঙ্গ রাজধানী হইতে সংগৃহীত হয়। গ্রন্থের ভাষা প্রাচীন পালি বলিয়া ভাষাতত্ত্ববিদেরা বলিয়া গিয়াছেন। এই গ্রন্থ কি পদার্থের উপর লিখিত তাহা এ পর্য্যন্ত নির্ণীত হয় নাই। বোধ হয় গালার পাতে লিখিত হইয়াছে। গ্রন্থাবরণীর বিচিত্র দৃশ্য ও অক্ষরাবলীর নমুনা পাঠকের নয়ন সমক্ষে উপস্থিত করা গেল।*

এই বিভাগে ময়মনসিংহের সর্ব্বপ্রথম মাসিক পত্র ও মুদ্রিত পুস্তক প্রদর্শিত হইয়াছিল।

২য় ঐতিহাসিক চিত্র বিভাগ—ময়মনসিংহের স্থানে স্থানে নিবিড় অরণ্যের অন্তরালে বহু প্রাচীন কীর্ত্তির ধ্বংসোন্মুখ স্মৃতি বিরাজ করিতেছে। হিন্দু শাসন কালের বহু স্মৃতি আটীয়ার নিবিড় অরণ্যে লোক-লোচনের অগোচরে থাকিয়া দিন দিন বিলীন হইয়া গিয়াছে। সুসঙ্গ রাজ-পরিবার প্রাচীনতার হিসাবে সমগ্র বঙ্গের শীর্ষস্থানীয়—কালের অমোঘ পরিবর্ত্তনে সেই প্রাচীন গৃহের কান্তি-সম্পদ এখন একেবারে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। বাঙ্গালার ভৌমিক শ্রেষ্ঠ ইশাখাঁর প্রাচীন রাজধানী জঙ্গল বাড়ীর প্রাচীন কাহিনী এখন স্বপ্নের অগোচর। রোয়াইল বাড়ীর স্ফটিকস্তম্ভ এখন ভূগর্ভে প্রোথিত। ঐতিহাসিক চিত্র বিভাগে সেই সকল বিলয়প্রাপ্ত কীর্ত্তি সমূহের আলোক চিত্র প্রদর্শন করা হইয়াছে।

বাঙ্গালার দ্বাদশ ভৌমিকের অন্যতম ভৌমিক বিক্রমপুরাধিপতি চাঁদরায় যে দশভুজা মূর্ত্তি পূজা করিতেন, শ্রীপুর বিজয় কালে রাজা রঘুনাথ সিংহ তাহা সুসঙ্গ রাজধানীতে আনয়ন করেন। সেই দশভুজার চিত্র, ঈশাখাঁর গুপ্ত গৃহ, জঙ্গলবাড়ীর চতুর্দ্দিক বেষ্টিত বিস্তৃত পরিখা ও এগারসিন্দুর দুর্গের ভগ্নাবশেষ, ঈশাখাঁ যে সকল কামান সাহায্যে মোগলের বিপুল শক্তি বিধ্বস্ত করিতেন, ঈশাখাঁর নামাঙ্কিত সেই সকল কামানের চিত্র, মসজিদজালালের প্রাচীন গৃহ ও সুরম্য পুরীর নক্সা, তাজপুরের কেল্লা, বোকাই নগরের দুর্গ, আটীয়ার সাহেনসাহের মসজিদ, করটীয়ার মসজিদ,

* চট্টগ্রাম কলেজের পালি ভাষার অধ্যাপক বৌদ্ধভিক্ষু শ্রীযুক্ত ধর্ম্মবংশ এই গ্রন্থের ইংরেজী ও বাঙ্গালা অনুবাদ প্রকাশ করিবার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। গ্রন্থের আকার বৃহৎ নহে। আমরা এই গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ "সম্মিলনে" প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব।

ইতনার মসজিদ, এগারসিন্ধুর মসজিদ, ভগদত্ত প্রতিষ্ঠিত মধুপুরের বারতার্থের নক্সা, এগারসিন্ধুর দুর্গের নক্সা, যশোধর নৃপতির প্রতিষ্ঠিত মদন গোপালের চিত্র, রাজা যশোধরের প্রাচীন রাজধানী ফলধার রাজভবনের ভগ্নাবশেষ, রাজগোলাবাড়ীর রাজা বসন্ত রায়ের বিস্তৃত রাজভবন প্রভৃতির চিত্র এই বিভাগে রক্ষিত হইয়াছিল। মধুপুরের নিবিড় অরণ্যে অষ্টাদশ শতাব্দীতে যে সন্ন্যাসী বিপ্লবের বহ্নি প্রজ্জলিত হইয়া উঠিয়াছিল, সেই বিপ্লবকারী পীর সন্ন্যাসীদিগের বিরাট দুর্গের ভগ্নাবশেষ ও তাহাদের প্রতিষ্ঠিত নবরত্নের আলোকচিত্র প্রদর্শিত হইয়াছিল।

কিশোর গঞ্জের প্রামাণিক দিগের একুশ রত্ন পূর্ব্ববঙ্গের স্থাপত্য শিল্পের একটী প্রকৃষ্ট নিদর্শন স্বরূপ এত দিন বিদ্যমান ছিল; বিগত ১৩০৪ সনের প্রবল ভূকম্পনে সেই গৌরব-স্তম্ভ ধরা বক্ষ হইতে একেবারে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। সেই অমূল্য লুপ্ত কীর্ত্তির মহামূল্য আদর্শ ও ফটো চিত্র, প্রামাণিকদিগের বিশাল গৃহের নকসা, জলটঙ্গী, অতিথিশালা, প্রাচীন গৃহ প্রভৃতির চিত্র, রাজা নবরঙ্গ রায়ের বিশাল দীর্ঘিকা, পুদ্মাপুরাণপ্রণেতা নারায়ণ দেবের বর্ত্তমান গৃহ ও রামেশ্বর নন্দীর ভিটা প্রভৃতির চিত্র সংগৃহীত হইয়াছিল। এই জেলায় বহু পার্ব্বত্য জাতির বাস। তাহাদের সভ্যতা ও সাজসজ্জার নিদর্শন স্বরূপ বহু আলোক চিত্র সংগৃহীত ও প্রদর্শিত হইয়াছিল।

৩য় প্রত্নতত্ব বিভাগ—এই বিভাগে প্রাচীন মুদ্রা ও মূল্যবৎ ঐতিহাসিক দ্রব্য রক্ষিত হইয়াছিল। পরগণে নসিরুজিয়ালের অন্তর্গত মোয়াজ্জমাবাদ নামক স্থানে এক সময় টাঁকশাল ছিল। ঐ টাঁকশালের মুদ্রা, জাহাঙ্গীর নগরের মুদ্রা, বঙ্গাক্ষরে খোদিত রাজা গৌরনাথ সিংহ ও ব্রজনাথ সিংহের নামাঙ্কিত মুদ্রা, ভগদত্ত বংশোদ্ভব ভরত সিংহের নামাঙ্কিত মুদ্রা, সুসঙ্গ রাজাদিগের ব্যবহৃত কামানের গোলা, সুসঙ্গ রাজধানীর প্রাচীন কারুকার্য্যখচিত ইষ্টকাবলী ও অন্যান্য বহু প্রাচীন দ্রব্য সংগৃহীত হইয়াছিল। সুসঙ্গের রাজা জানকীনাথকে যে ছুরিকাঘাতে ইশাখাঁর নিয়োজিত লোক নিহত করে, সেই প্রাচীন ছুরিকা প্রদর্শিত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত বহু ঐতিহাসিক কীর্ত্তি-স্তম্ভের কারুকার্য্যখচিত ইষ্টকাবলি প্রদর্শিত হইয়াছিল। এই বিভাগে বহু প্রস্তরমূর্ত্তি প্রদর্শিত হইয়াছিল। ইহার মধ্যে একখানি মূর্ত্তি অতি প্রাচীন। কলিকাতা মিউজিয়মের শ্রীযুক্ত রাখাল দাস বন্দোপাধ্যায় মহাশয় এই মূর্ত্তিটী গুপ্ত রাজগণের সমসাময়িক বলিয়া অনুমান করেন। প্রাচীন সময়ের এনামেল করা বহু ইষ্টক সংগৃহীত ও প্রদর্শিত হইয়াছিল। এই প্রদর্শনীতে অতি প্রাচীন কালের ৫ ইঞ্চি ব্যাসবিশিষ্ট দুই যোড়া শাঁখা প্রদর্শিত হইয়াছিল। এই শাঁখা সে কালের প্রাচীনা স্ত্রীলোকেরা ব্যবহার করিতেন।

পল্লি বিবরণ সংগ্রহ—এই বিভাগে এই জেলার বহু ক্ষুদ্র ও বৃহৎ গ্রামের ও শ্রেষ্ঠ পরিবার সমূহের বিবরণ সংগৃহীত হইয়াছে। বিগত ১৩১২ সনের কৃষিশিল্প-সাহিত্য প্রদর্শনীর সম্বয় সমিতির অন্যতম উদ্যোক্তা, 'ময়মনসিংহের ইতিহাস' প্রণেতা শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মজুমদার মহাশয় নিম্নলিখিত মর্ম্মে এক খানা বিজ্ঞাপন প্রচার করেন।

জেলবাসী প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ গ্রাম সম্বন্ধীয় বিবরণগুলি অনুসন্ধান করিয়া দিলে ময়মনসিংহের পল্লীগ্রামগুলিরও বিস্তৃত ইতিহাস সঙ্কলনের চেষ্টাকরা যাইতে পারে। নিম্নলিখিত বিষয়গুলি লইয়া অনুসন্ধান করিতে হইবে।

১। গ্রামের নাম ও নামের উৎপত্তিগত অর্থ।

২। কত কালের প্রাচীন ও প্রাচীনতার যে প্রমাণ আছে।

৩। গ্রামের আদিম নিবাসীদিগের বিবরণ ও কোন চিহ্ন থাকিলে তাহা।

৪। গ্রামে বর্ত্তমান সময়ে কোন্ কোন্ জাতীয় কত ঘর লোক আছে।

৫। তাহাদিগের গাঁই গোত্রাদির বিবরণ সহ এক একখানা বংশাবলী।

৬। গ্রামস্থিত প্রাচীন পুকুর, মন্দির, ইষ্টকালয়, ইষ্টকস্তূপ প্রভৃতির বিবরণ।

(ক) পুকুরের বর্ত্তমান অবস্থা, নাম, দীর্ঘ প্রস্থের পরিমাণ, ও বিবরণ।

(খ) ইষ্টকালয় বা স্তূপ কত দিনের প্রাচীন, ইটের আকার কিরূপ ইত্যাদি।

৭। মাটীর অবস্থা ও শস্যের অবস্থা।

৮। প্রাচীন ও আধুনিক উৎপন্ন দ্রব্যজাতের বিবরণ।

৯। গ্রামের প্রাচীন ও আধুনিক শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণের সংক্ষিপ্ত জীবনী।

১০। সামাজিক রীতি নীতি ও সমাজের প্রাচীন ও বর্ত্তমান অবস্থা।

১১। মাসিক মেয়েলী ব্রত ও পূজাদির নাম ও অনুষ্ঠান প্রক্রিয়া।

১২। কোন প্রবাদ, মেয়েলী ছড়া, গান বা কবিতা প্রচলিত থাকিলে তাহা।

১৩। ব্যবহারিক শব্দ সমূহ এবং উচ্চারণের বিশেষত্ব।

১৪। বাজারের ওজন ও পরিমাণ এবং ভূমির মাপ।

১৫। বিবাহ প্রভৃতি ক্রিয়া-কলাপের রীতি পদ্ধতি।

১৬। গ্রামের বর্ত্তমান সম্পদ্।

১৭। গ্রাম কোন্ পরগণা, চৌকী, সবরেজেষ্টরী, পোষ্টাফিস ও মহকুমার অধীন; মহকুমা হইতে কোন্-দিকে কত দূর।

১৮। আমোদ প্রমোদ—কিরূপ গান, বাজনা, খেলা প্রভৃতি প্রচলন ছিল ও আছে।

১৯। প্রাচীন ও আধুনিক বিশেষ বিশেষ ঘটনা।

২০। জন সংখ্যা—স্ত্রী, পুরুষ, হিন্দু, মুসলমান, প্রজা ভূম্যধিকারী প্রভৃতির সংখ্যা।

২১। সে কালের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা।

তাহার ফলে এই সকল বিবরণ সংগৃহীত হইয়াছে। এইরূপ ভাবে প্রতি গ্রামের ও প্রতি জিলার বিবরণ সংগৃহীত হইলে, সমগ্রদেশের একখানা মূল্যবান্ ইতিহাস অচিরেই লিখিত হইতে পারে, এরূপ আশা করা যায়। যদি প্রতি জিলায় এইরূপ পল্লিবিবরণ সংগ্রহের চেষ্টা হয়, তবে সাহিত্য প্রদর্শনী দেশের ও দশের ভিতর একটী নবভাব প্রবেশ করাইয়া দিতে সমর্থ হইয়াছে, ইহা নিঃসন্দেহ বলা যাইতে পারে।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ মজুমদার।

প্রকাশ।

১

আমি ত বুঝি নি কবে তুমি প্রিয়!
এসেছ হৃদয় মাঝে,
আমি শুধু দূরে মরিয়াছি খুঁজি
প্রভাতে, দুপুরে, সাঁঝে।
শরত প্রভাতে শেফালির বাসে,
চাঁদের জোছনা ধারে;—
আগমনী গানে, সাহানার তানে,
পূজার অরঘ ভারে!

২

আমি ত জানি না কবে মধুমাসে
সুখের স্বপন সম,
হৃদয় ভরিয়া উঠেছ ফুটিয়া
নিরমল নিরূপম!
মধু কোকিলের কাকলি লহরে
পাপিয়ার সুধা-গানে
জানি না কখন স্বরগ বারতা
বহিয়া এনেছ প্রাণে!

৩

আমি দেখি নাই কবে তুমি প্রিয়!
নিভৃতে বসি একেলা
ভাঙ্গা প্রাণ টুকু কুড়াইয়ে নিয়ে
খেলিছ মোহন খেলা!
শুনি নাই কবে তোমার বীণায়
গাহিতেছ বসি গান,—
মধুর ঝঙ্কারে অমিয় ধারায়
সরস করিয়া প্রাণ!

এ যে মরুভূমি কঠিন নীরস
ফুটিতে চাহে না কলি ;
ফোটে যদি কভু ঝ'রে প'ড়ে যায়,
হাসি টুকু যায় দলি।
আমি ত দেখিনি কখন্ সেথায়
ঢালিলে অমিয় ধার,
রাশি রাশি ফুল ফুটায়ে তুলিলে
স্নিগ্ধ-সুরভিসার !

স্বপনের পারে ঘুমের আড়ালে,
বিজন পুরীর মাঝে
এতদিন তুমি আছিলে লুকায়ে
খুঁজেছি প্রভাতে, সাঁঝে !
দেখিনি ত আমি জানি নাই প্রিয়,
চিনিনি তোমারে আগে,
যদিও ঢেলেছি শত অর্ঘ্যভার,
চাহিয়াছি অনুরাগে !

স্বপনেও আমি ভাবিনি কখন
আমারে দিবে যে ধরা,
নিয়ম-বিহীন পূজায় আমার
শূন্য কথায় ভরা !
আজ মোহ গেছে, চেয়ে দেখি একি
তোমার বিজলী হাস ;
প্রাণ টুকু মোর ছাইয়া ফেলেছে,
হে প্রিয় ! তব প্রকাশ !

না বুঝিতে আমি আসিয়াছ যদি,
ফিরিয়া যেও না কভু ;
ছোট এ হৃদয়ে পাতিয়া আসন
মুঞ্জুরিবে কলি ফুটিবে কুসুম
তোমারি চরণ চুমি,
এস হে আমার চির জনমের
সাধনার ধন তুমি !

শ্রীশৈলজা গুপ্তা।

তুমি ও আমি।

তুমি আলো হ'য়ে যদি, কর নিরবধি,
উজল ধরার কায়া।
আমি রহিব জড়িয়ে, অঙ্গ ধরিয়ে,
হইয়া তোমারি ছায়া।
তুমি রবি শশী সাজি, নানারঙ্গে রাজি,
শোভ যদি নভোতল।
আমি তব ছায়া নিয়া, খেলিব হইয়া,
স্বচ্ছ সরসী জল।
তুমি গহনে ভবনে, যেখানে সেখানে,
দেবরূপে রাজ আসি।
আমি সেবিতে তোমায়, অর্ঘ্য ডালায়,
হব গো কুসুম রাশি।
তুমি ঊর্ম্মি মুখর, অকূল সাগর,
কর গো শয্যা যদি।
আমি অকূলে মিশিতে, কুল কুল গীতে,
ধাইব হইয়া নদী।
তুমি ছিন্ন করি হৃদি, মিশে যাও যদি,
শূন্য গগন গায়।
আমি মলয়ার সনে, মিশিয়া গোপনে,
করিব গো হায় হায়।
তুমি যাদেছ আমায়, যদি পুনরায়,
নিয়ে যেতে চাও কাড়ি।
আমি সবটুকু দেব, স্মৃতিটী রাখিব,
হবে নাকো ছাড়া ছাড়ি।

শ্রীবিজয়াকান্ত লাহিড়ী চৌধুরী।
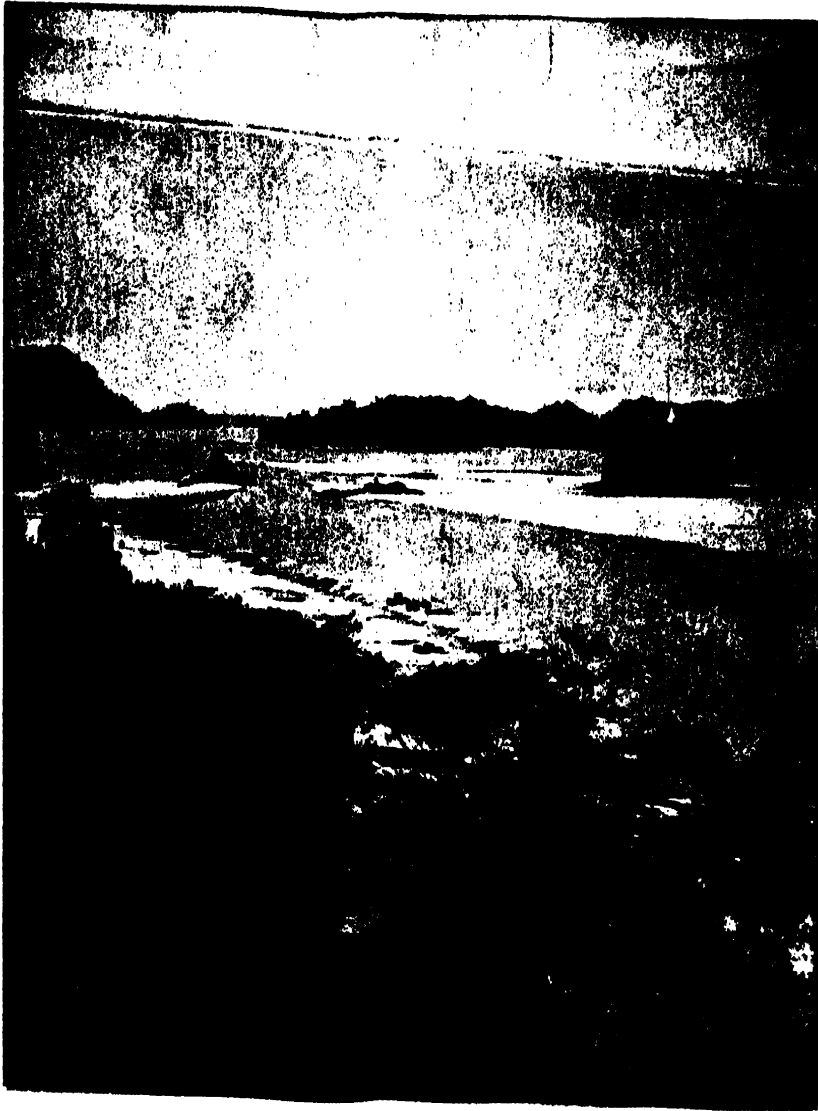
কামাখ্যা মন্দির ও উমানন্দাধ্যুষিত গৌহাটির সম্মুখস্থ দ্বীপখণ্ড।

Temple of Oomananda.

১ম খণ্ড ঢাকা, আষাঢ়, ১৩১৮ সাল ৩য় সংখ্যা।

আয়ুর্ব্বেদের ক্রম-বিকাশ। *

অতি প্রাচীনকালে অন্যান্য দেশে মানবীয় সত্ত্বা বিকাশের পূর্ব্বে ভারতে মহর্ষিদিগের মস্তিষ্ক মণ্ডলে প্রথমতঃ চিকিৎসার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইয়াছিল।

চরক সংহিতায় উক্ত হইয়াছে,—প্রজাপতি ব্রহ্মা হইতে দক্ষ প্রজাপতি, দক্ষ হইতে অশ্বিনীকুমার, অশ্বিনীকুমার হইতে ইন্দ্র আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা করিয়াছিলেন। ভরদ্বাজ মুনি ইন্দ্র হইতে আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা করিয়া প্রথমতঃ মর্ত্ত্যলোকে প্রচার করিলেন। ইহাই আয়ুর্ব্বেদ প্রচারের প্রথম যুগ বলিয়া পরিগণিত।

কালে উহা বিলুপ্ত হইলে, অত্রিপুত্র পুনর্ব্বসু মুনি অগ্নিবেশ, ভেল, জতুকর্ণ, পরাশর, হারীত ও ক্ষারপাণি এই ছয় জন শিষ্যকে আয়ুর্ব্বেদের শিক্ষা দান করিয়াছিলেন। উক্ত ষট্‌শিষ্য পৃথক্ পৃথক্ ছয় খানি সংহিতা প্রণয়ন করিয়াছিলেন। সংহিতাগুলি গ্রন্থকারদিগের নামেই অভিহিত। যথা—অগ্নিবেশ সংহিতা, ভেলসংহিতা হারীতসংহিতা ইত্যাদি। এই সময়কে আমরা আয়ুর্ব্বেদ প্রচারের দ্বিতীয় যুগ মনে করিতে পারি।

বহুদিন পরে, উক্ত সংহিতাগুলিও কালসাগরের অগাধ জলে নিমগ্ন হইয়া যায়; কেবল অগ্নিবেশ সংহিতার স্থূল স্থূল বিষয়গুলি প্রতিভাশালী মহর্ষিদিগের হৃদয়ে জাগরূক থাকে।

তৎকালে চরক মুনি এই অগ্নিবেশ সংহিতার প্রতিসংস্কার করেন। মহর্ষি চরক অগ্নিবেশ সংহিতার প্রতিসংস্কর্ত্তা,—প্রণেতা নহেন। প্রতিসংস্কর্ত্তার নামেই গ্রন্থের নাম প্রচলিত হইয়াছে। এই সময়কে আমরা আয়ুর্ব্বেদ প্রচারের তৃতীয় যুগ মনে করিতে পারি। যিনি অতি বিস্তীর্ণ বর্ণনাকে প্রয়োজন অনুসারে সংক্ষেপে, এবং সংক্ষিপ্তকে বিস্তারিতরূপে বর্ণনা করিয়া, প্রাচীন গ্রন্থকে অভিনবরূপে প্রচারিত করেন, তাঁহার নাম প্রতিসংস্কর্ত্তা।

এই চরকমুনি কতকালের এবং এই প্রতিসংস্কারই বা কোন্ সময় হইয়াছিল, তাহা নিশ্চয় বলা যায় না; তবে এইমাত্র বলিতে পারা যায় যে, এই প্রতিসংস্কারও অল্পদিনের নহে। 'কঠচরকাল্লুক্' পাণিনির এই সূত্রের বৃত্তিতে 'চরকেণ প্রোক্তং' এইরূপ বাক্য দৃষ্ট হয়। ইহাতে

* সাহিত্য সম্মিলনের ৪র্থ অধিবেশনে পঠিত।

স্পষ্টই প্রতীতি হয় যে, মহর্ষি চরকের অস্তিত্ব ও তদীয় সংস্কার মহর্ষি পাণিনির বহু পূর্ব্ববর্ত্তী।

চরকমুনি সমস্ত গ্রন্থের প্রতিসংস্কার করিতে পারেন নাই, সূত্রস্থান হইতেই চিকিৎসিত স্থানের ত্রয়োদশ অধ্যায় পর্য্যন্ত চরক কর্ত্তৃক প্রতিসংস্কৃত। কপিল বলির পুত্র দৃঢ়বল চিকিৎসিত স্থানের অবশিষ্টাংশ,—কল্পস্থান ও সিদ্ধিস্থানের প্রতিসংস্কার করিয়াছেন।

দৃঢ়বল সিদ্ধি স্থানে নিজের পরিচয় দিয়াছেন। যথা— জাতঃ পঞ্চনদেপুরে, সপ্তদশৌষধাধ্যায়ং সিদ্ধিকল্পৈরপূরয়ৎ। দৃঢ়বল পঞ্চনদে জাত। এই পঞ্চনদ অধুনা পঞ্জাব নামে খ্যাত। দৃঢ়বল গ্রন্থ শেষে আরও বলিয়াছেন।

যদিহাস্তিতদন্যত্র যন্নেহাস্তিনতৎকচিৎ।

এই চরকে যাহা আছে, অন্যান্য গ্রন্থে তাহারই অনুকরণমাত্র ; এই গ্রন্থে যাহা নাই, তাহা আর কোথাও দেখিতে পাইবে না।

দৃঢ়বলের এই কথা বর্ণে বর্ণে সত্য। বাস্তবিক চরকে না আছে, এমন বিষয়ই নাই। উহাতে আত্মা, জন্মান্তর, মায়াবাদ, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ, যুক্তি ও বিচার-প্রণালী প্রভৃতি দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব নানা কৌশলে প্রদর্শিত হইয়াছে। সুতরাং চরক সংহিতা আয়ুর্ব্বেদ-খনির সর্ব্বোৎকৃষ্ট রত্ন, বিজ্ঞানের প্রসূতি, নীতির আশ্রয় ও সমস্ত জগতের মঙ্গলসিন্ধু।

একমাত্র চরকে যে জ্ঞান লাভ করিতে পারে, সে সমস্ত বিষয়ের যুক্তি জ্ঞানে বলিয়া, অন্যান্য শাস্ত্র ও দর্শন মাত্রই উপলব্ধি করিতে পারে *।

এই চরকের বহুদিন পরে সুশ্রুত প্রচারিত হইয়াছিল। সুশ্রুত ধন্বন্তরির শিষ্য সুশ্রুত ঋষি কর্ত্তৃক প্রণীত। ধন্বন্তরি নাম নহে,—উপাধি। ধন্ব শব্দের অর্থ শল্য-চিকিৎসা, যিনি তাহার শেষ সীমায় উপস্থিত হইয়াছেন, তাঁহারই উপাধি ধন্বন্তরি †। ইনি ক্ষত্রিয় বংশাবতংস, কাশীর রাজা ছিলেন, এজন্য ইঁহাকে কাশীরাজ বলে, ইহার প্রকৃত নাম দিবোদাস।

মহামতি চক্রপাণি দত্ত সুশ্রুতের টীকায় সুশ্রুতকে বিশ্বামিত্র পুত্র বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

মহাভারতে বিশ্বামিত্রের কথা আছে। মহাভারত যে চারি সহস্র বৎসরের পুরাতন, তাহা ইয়ুরোপীয় ও দেশীয় বিভিন্ন পণ্ডিত দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে। সুতরাং, আদিম সুশ্রুত মহাভারতের পূর্ব্ববর্ত্তী। বৃহৎ কথা সাগরে লিখিত আছে, মহর্ষি পাণিনি ও কাত্যায়ন এক সময় উপবর্ষ পণ্ডিতের শিষ্য ছিলেন। পাণিনি, পাণিনি নামক ব্যাকরণ ও কাত্যায়ন,বার্ত্তিক নামে তাহার পরিশিষ্ট প্রণয়ন করিয়াছেন। সেই বার্ত্তিকে "সুশ্রুতেন প্রোক্তং সৌশ্রুতং" এরূপ প্রয়োগ আছে। ইহাতে স্পষ্ট উপলব্ধি হয় যে, সুশ্রুত পাণিনিরও পূর্ব্ববর্ত্তী। ইয়ুরোপীয় পণ্ডিত গোল্ডষ্টুকর অনুমান করেন,—পাণিনি খৃষ্টাব্দের ছয় শতবর্ষ পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন। মহাত্মা সুশ্রুত ইহারও পূর্ব্ববর্ত্তী, সুতরাং গোল্ডষ্টুকরের মতে সুশ্রুত ২৪ শত বৎসরের অধিক পুরাতন, দেশীয় প্রমাণে ইহা হইতেও অধিক পুরাতন বটে।

কিন্তু উক্ত প্রমাণ প্রয়োগ সত্ত্বেও আমরা বর্ত্তমান সুশ্রুতকে তত প্রাচীন বলিতে পারি না। কারণ, আদিম সুশ্রুত কালে বিলুপ্ত হওয়ায় নাগার্জ্জুন মুনি তাহার প্রতিসংস্কার করেন, সেই প্রতিসংস্কৃত সুশ্রুতই আমরা সমাজে প্রচলিত দেখিতেছি।

বর্ত্তমান সুশ্রুতে ব্যাস প্রশিষ্য শৌনকের ও শাক্যসিংহ সুভূতির মত গৃহীত হইয়াছে। যথা—গর্ভস্থ শিশুর মস্তক পূর্ব্বে জন্মে, ইহা শৌনকের মত।

ব্যাসের শিষ্যানুশিষ্য সুমন্ত, সুমন্তের শিষ্য শৌনক। এই শৌনকই অথর্ব্ব বেদের শৌনকী সংহিতার প্রণেতা ; শৌনকী সংহিতা হইতেই সুশ্রুতে শৌনকের মত গৃহীত হইয়াছে। শৌনক ব্যাসের বহু পরবর্ত্তী, তাঁহার মত সুশ্রুতে থাকায় বর্ত্তমান সুশ্রুত তত প্রাচীন হইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ গর্ভস্থ শিশুর নাভি মূল পূর্ব্বে জন্মে, ইহা সুভূতি গৌতমের মত। সুভূতি গৌতম শাক্যসিংহের শিষ্য, তাঁহার মত সুশ্রুতে গৃহীত হওয়াতে বর্ত্তমান

---

* একস্মিন্নপি যস্যেহ শাস্ত্রে লব্ধাস্পদা মতিঃ।
স শাস্ত্র মন্যদপ্যাশু যুক্তিজ্ঞত্বাৎ প্রবুধ্যতে॥

† ধন্বঃ শল্যবিদ্যা তস্যাঃ অন্তং পারং এতি গচ্ছতীতি ধন্বন্তরিঃ— ইতি ডল্বনাচার্য্যঃ।

সুশ্রুতকে মহাভারত এবং পাণিনি অপেক্ষা অভিনব ভিন্ন প্রাচীন বলিতে পারি না।

সুশ্রুতের প্রতিসংস্কর্ত্তা যে নাগার্জ্জুন, টীকাকার ডল্বনাচার্য্য তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। নাগার্জ্জুন একজন অসাধারণ লোক ছিলেন, সর্ব্বদর্শন সংগ্রহে নাগার্জ্জুনের ভূরি ভূরি প্রশংসা দৃষ্ট হয়। রাজতরঙ্গিনীর লেখক কহ্লন পণ্ডিত বলেন, নাগার্জ্জুন একজন কাশ্মীর দেশীয় মণ্ডলের রাজা। তিনি বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া বনাশ্রমী হইয়া ছিলেন। শাক্যসিংহের মৃত্যুর বহুদিন পরে মগধরাজ চন্দ্রগুপ্তের পূর্ব্বে তিনি জীবিত ছিলেন। রাজতরঙ্গিনীর নাগার্জ্জুন ও সুশ্রুতের নাগার্জ্জুন এক হইলে বর্ত্তমান সুশ্রুত ২৪ শত বৎসরের পুরাতন। বর্ত্তমান সময়ে, এই সুশ্রুতের ২ খানি মাত্র টীকা পাওয়া যায়,এক খানি ডল্বনাচার্য্যকৃত "নিবন্ধ সংগ্রহ",অপর খানি বৈদ্যকুলসম্ভূত মহামহোপাধ্যায় চক্রপাণি দত্তের লিখিত। ডল্বনের পিতার নাম ভরত। ইনি মথুরা সমীপে আঙ্কোল নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং সহন পাল দেবের অমাত্য ও পারিবারিক চিকিৎসক ছিলেন। চক্রপাণিও পাল বংশীয় রাজাদিগের সময় আবির্ভূত হন। পাল বংশীয় রাজাদিগের রাজত্ব সহস্র বৎসরের পূর্ব্বে ছিল, সুতরাং ডল্বন ও চক্রপাণি অন্যূন সহস্র বৎসরের পূর্ব্বের লোক হইবেন।

বর্ত্তমান সুশ্রুত অমূল্য রত্নস্বরূপ, ইহাতে অস্ত্র চিকিৎসার যেরূপ পারিপাট্য ও বিবিধ অস্ত্রশস্ত্রাদির যেরূপ ঔৎকর্ষ্য বর্ণিত হইয়াছে, তাহা শ্রবণ করিলে আশ্চর্য্য বোধ হয়। এমন কি নিত্য উন্নতিশীল পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণও আজ পর্য্যন্ত ইহার কোন কোন বিষয়ের সমকক্ষতা লাভ করিতে পারেন নাই।

গর্ভের সন্তান কিরূপে পরীক্ষা করিতে হয়, কিরূপে গর্ভস্থ মৃতসন্তান খণ্ড খণ্ড করিয়া বাহির করিতে হয়, নাড়ীভূড়ী মৎস্য কণ্টকাদি দ্বারা বিদ্ধ হইলে, উদর ফাড়িয়া কিরূপে তাহা বাহির করিতে হয়, এক স্থানের চর্ম্ম অন্য স্থানে কিরূপে যোড়া লাগাইতে হয়, কিরূপে এক জনের রক্তে অপরের জীবনরক্ষা করিতে হয়, সুশ্রুতে তাহার ভূরি ভূরি উপায় প্রদর্শিত হইয়াছে।

সুশ্রুত একস্থানে বলিয়াছেন,—যিনি শবচ্ছেদ দ্বারা শারীরিক তত্ত্ব জানেন,—ব্রণের পকতা বুঝিলেই বুঝিতে পারেন, তিনিই বাস্তবিক চিকিৎসক, আর যে তাহা পারে না, সে চিকিৎসক নহে। আজকাল সুদক্ষ পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণও অভ্যন্তর-ব্রণের পক্কাপক্কতা টেপ না করিয়া, নিশ্চয় রূপে বুঝিতে পারেন না; সুশ্রুতের সময় দর্শন স্পর্শন মাত্রেই আর্য্য চিকিৎসকগণ ব্রণের পক্কাপক্কতা নির্দ্দেশ করিতে পারিতেন।

ভাব মিশ্রকৃত ভাব প্রকাশে লিখিত আছে—

মৃতেতু গর্ভে গর্ভিন্যা যোনৌশস্ত্রং প্রবেশয়েৎ।
শস্ত্র শাস্ত্রার্থ বিদুষী লঘুহস্তা ভয়োজ্ঝিতা॥
নাপেক্ষেত মৃতং গর্ভং মুহূর্ত্ত মপি পণ্ডিতঃ।

যে স্ত্রী শস্ত্র কার্য্যে বিদুষী, লঘুহস্তা অর্থাৎ শীঘ্র শীঘ্র শস্ত্রকার্য্য সম্পাদন করিতে পারে, ও ভীতিশূন্যা, গর্ভস্থ সন্তান মৃত হইলে ঐরূপ শিক্ষিতা স্ত্রী তৎক্ষণাৎ প্রসবদ্বারে শস্ত্র প্রবেশ করাইয়া মৃত সন্তান খণ্ড খণ্ড করিয়া বাহির করিবে।

সুশ্রুতের সময় ভারতে এমন একদিন ছিল, যখন গর্ভস্থ মৃত সন্তান কাটিয়া বাহির করিতে হইলেও মহিলাদিগের লজ্জাশীলতায় জলাঞ্জলি দিতে হইত না; তখন সুশিক্ষিতা রমণীগণই ঐরূপ কার্য্য সম্পাদন করিতেন। এখন পুরুষগণেরও ঐরূপ কার্য্যে কত বিভ্রাট ঘটিয়া থাকে

চরক সুশ্রুতের প্রতিসংস্কারের পর ভারতে বাগ্‌ভট প্রচারিত হইয়াছিল। বাগ্‌ভট অতি প্রাচীন সার-সংগ্রহ। উহা সংগ্রহ পুস্তক হইলেও সুশ্রুতাদি প্রাচীন-সংহিতার ন্যায় সমাদৃত। এইগ্রন্থ বৈদ্যকুল-তিলক মহামতি বাগ্‌ভট গুপ্ত কর্ত্তৃক প্রণীত। বাগ্‌ভটের পিতার নাম সিংহ গুপ্ত, পুত্রের নাম দেবেশ্বর গুপ্ত। দেবেশ্বর মালব রাজসভাতে অমাত্যের কার্য্য করিতেন। কাব্য শাস্ত্রেও তাঁহার অসাধারণ অধিকার ছিল। তাঁহার রচিত কবিকল্পলতা নামক অলঙ্কার গ্রন্থ অতি প্রসিদ্ধ। সেই গ্রন্থে তিনি নিজের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।*

* মালবেন্দ্র মহামাত্য শ্রীমদ্‌বাগ্‌ভট নন্দনঃ।
দেবেশ্বরঃ প্রতনুতে কবিকল্পলতা মিমাং॥

বাগ্‌ভট গ্রন্থকারের নামেই পরিচিত। ইহার প্রকৃত নাম 'অষ্টাঙ্গ হৃদয়'। কায়-চিকিৎসা প্রভৃতি আটটী অঙ্গ ইহার হৃদয় স্বরূপ, এজন্য এই গ্রন্থের নাম অষ্টাঙ্গ হৃদয়। এই গ্রন্থ পাঠে গ্রন্থকারের পাণ্ডিত্য, রচনাকৌশল, সারগ্রাহিতাদি দর্শনে আশ্চর্য্য বোধ হয়। গ্রন্থকার এক পংক্তিতে যত কথার সার সঙ্কলন করিয়াছেন, অন্য কেহ ১০ পৃষ্ঠাতেও তাহা পারেন কিনা সন্দেহ; বাগ্‌ভটের অনেক স্থলেই এরূপ রচনাকৌশল দৃষ্ট হয়। বাগ্‌ভটের নামের যোগার্থ দ্বারাও তাঁহার বাক্যবিন্যাসের দক্ষতা প্রমাণিত হইয়াছে। বাক্ষুভটঃ বাগ্‌ভটঃ অর্থাৎ বাক্য বিন্যাসে যিনি পটু, তাঁহারই নাম বাগ্‌ভট। বাগ্‌ভট বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা গ্রন্থে যেরূপ কবিত্বের পরিচয় দিয়াছেন, অন্যান্য কর্ত্তৃক প্রণীত চিকিৎসাগ্রন্থে সেরূপ কবিত্বের পরিচয় পাওয়া যায় না। অনেকে অনুমান করেন, মহামতি বাগ্‌ভটের এবং তৎপুত্র মহাকবি দেবেশ্বরের কবিত্ব প্রভাবেই সেই সময় হইতে আর্য্য চিকিৎসকগণ কবিরাজ উপাধিতে অলঙ্কৃত হইয়া আসিতেছেন। বাগ্‌ভটের পর মাধবকরনিদান। চক্রপাণি দত্ত চক্রদত্ত নামক সংগ্রহ পুস্তক প্রণয়ন করেন। সংগ্রহ পুস্তক প্রণেতৃগণ প্রায় সকলেই বৈদ্যকুলসম্ভূত। মাধবের বিশেষ কিছু পরিচয় পাওয়া যায় না, চক্রপাণির নিবাস রাঢ়ের অন্তর্গত ময়ূরেশ্বর গ্রামে। ইঁহার পিতার নাম নারায়ণ দত্ত, জ্যেষ্ঠের নাম ভানু দত্ত, জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম পণ্ডিত ক্রমদীশ্বর। গ্রন্থের নাম চক্রদত্ত।

চক্রপাণির পিতা নারায়ণ পাল-বংশীয় রাজা নয়পাল দেবের খাদ্য বস্তুর পরীক্ষক ছিলেন। শত্রুগণ খাদ্য মধ্যে বিষ মিশ্রিত করিয়া রাজা মহারাজদিগের প্রাণ নাশ করিতে পারে, এজন্য পূর্ব্বকালে তাঁহাদের খাদ্য পরীক্ষক থাকিত। রসায়ন শাস্ত্রের আলোচনা না থাকিলে, খাদ্য বস্তুর পরীক্ষাদি হয় না; সুতরাং পালবংশীয় রাজগণের সময়ও আমাদের দেশে রসায়ন বিদ্যায় পারদর্শী লোক ছিলেন। চক্রপাণি চরক সুশ্রুতের টীকা, দ্রব্যগুণও প্রণয়ন করিয়াছেন।

তৎপর শিবদাস সেন চরক, চক্রদত্ত ও দ্রব্যগুণের টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন। শিবদাসও পালবংশীয় রাজগণের সময়ে আবির্ভূত, ইনি বংশপরম্পরায় সুপণ্ডিত। ইহার টীকা সরল ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ। ভাবমিশ্র ভাবপ্রকাশ প্রণয়ন করিয়াছেন।

রাজবল্লভ, নাড়ীমালা, রসেন্দ্র চন্দ্রিকা, স্নেহমালা, সংক্ষিপ্ত সার, প্রয়োগ-চিন্তামণি, প্রভৃতি আরও বহু গ্রন্থ বহু পণ্ডিত কর্ত্তৃক প্রণীত হইয়াছে। গোপাল কবিভূষণ রসেন্দ্রসার সংগ্রহে তান্ত্রিক ঔষধ ও স্বর্ণাদির জারণ মারণাদি প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

এইরূপে আয়ুর্ব্বেদ কল্পতরু পত্র-পুষ্প-ফল-পল্লবে বিভূষিত হইয়া ভারতের অশেষ হিত সাধন করিতেছে। বর্ত্তমান সময়ে এই বৃদ্ধায়ুর্ব্বেদ তরুর জীবন রক্ষা, দেশীয় রাজামহারাজ প্রভৃতি ধনিগণের করায়ত্ত। তাঁহারা কৃপাবারি সেচন না করিলে, এই জীর্ণতরু কিছুতেই সজীব ও সবল থাকিতে পারিবে না।

শ্রীগিরিশচন্দ্র সেন কবিরত্ন।

শিল্প। *

ভ্রাতৃগণ!

জগতে আমরা নাকি অভিশপ্ত খালি?
চারি দিকে দেখ চাহি, এ দশা কাহারো নাহি,-
অলসেরি ভাগ্যে ঘটে শাকভাতে বালি।
দিনান্তে তোমরা কি হে ভাব কদাচন,
কেন দেশে দুঃখ দৈন্য অকাল মরণ?

২

এই দুঃখ হাহাকার এই অশ্রুজল,
শিল্প অনাদরে এই দারিদ্র্য কেবল!
শিল্পই রত্নের খনি, শত ধনে বারে ধনী
কুটীরে সাজায় মণি হীরা মুক্তাফল,
শিল্প বীর ধনঞ্জয়, কুবের করিয়ে জয়,
কনক চম্পক দাম বর্ষে অবিরল!
শিল্পের হেলায় এই দারিদ্র্য কেবল!

* ময়মনসিংহ সাহিত্য সম্মিলন উপলক্ষে যে শিল্প প্রদর্শনী হইয়াছিল, তাহাতে পঠিত।

শিল্পই সকল দেশে সকলের বল,
শিল্পেই দুর্ভাগ্য নাশে, বাণিজ্য-তরণী ভাসে,
উড়ে নব ব্যোমযানে পতাকা চঞ্চল!
শিল্প নব রাজ্য গড়ে, একেরে সহস্র করে,
রচে শত সিংহাসনে রাজ সভাতল,
শিল্পেই সম্পদ রাগে, আত্ম অভিমান জাগে,
জাগে সে অতুল দম্ভে হৃদয় দুর্ব্বল!
শিল্পে গড়ে অট্টহাসা, রত্নবতী রাজভাষা
উজলি সাগর সপ্ত সারা ভূমণ্ডল,
কীর্ত্তি-সুধা কুম্ভ ভরি, লক্ষ্মী ফিরে কক্ষে করি,
শিল্পের পশ্চাতে মরি উরায়ে অঞ্চল!
শিল্পেই দুর্ভাগ্য নাশে, স্বর্গ হতে মুক্তি আসে,
উঠে নব ইতিহাসে জয় কোলাহল!
শিল্পই সকল দেশে সকলের বল!

শিল্পেই সে সুখশান্তি দেশের মঙ্গল,
শিল্পের হেলায় দেশ যায় রসাতল!
কার না দেশের তরে, পরাণ আকুল করে,
নয়নে নাহিক ঝরে করুণা তরল?
প্রতিবেশী গৃহপাশে, হাহা করে উপবাসে,
কেমনে তোমার ভাই রুচে অন্নজল?
ফিরে কত হতভাগা, উলঙ্গ সন্ন্যাসী নাগা
মেখে যে তোমার মুখে কলঙ্ক কজ্জল!
হায় হায় নাহি লজ্জা, তোমার বিলাস সজ্জা
তোমার উচিত পরা কৌপীন কম্বল!
তুমি আর আমি ভাই, এক ঘাটে জল খাই,
দু'জনেরি এক লিপি এক কর্ম্মফল,
আমার শকতি বিনা, তুমি ভাই কিছুই না,
বাতাসে ভাঙ্গিয়া পড় বালুর অচল!
ঘুচাতে মায়ের দুখ, মুছাতে ভাইয়ের মুখ,
দাও অর্থ অকাতরে যার যত বল,
স্থাপিয়া মঙ্গল ঘট, স্থাপিয়া মন্দির-মঠ,
শিল্পের প্রতিষ্ঠা কর লভিবে মঙ্গল!
আজি বসন্তের প্রাতে, মধুর মলয় বাতে,
কর হে শিল্পের নামে মুক্ত করতল,
জগতে উঠিবে তব জয় কোলাহল!

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস।

মহাভারতের জ্যোতিষ।*

মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন মহাভারত প্রণয়ন করেন, এবং বৈশম্পায়ন ও সৌতি ক্রমে ইহার কথকতা করেন। মূল গ্রন্থের উপর তাঁহারা কি পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করিয়াছেন, বলা যায় না। যাহা হউক, তাঁহারা উক্ত মহর্ষির সম-সাময়িক, এবং তাঁহার সহিত তাঁহাদিগের মতদ্বৈধ থাকার সম্ভাবনা অল্প।

মহাভারতের অনুক্রমণিকায় লিখিত আছে, ভারত-সংহিতা প্রথমতঃ চতুর্ব্বিংশতি সহস্র শ্লোকে বিরচিত হয়। তাহাতে উপাখ্যান ভাগ ছিল না। মহাভারতের উপাখ্যানের সংখ্যা সামান্য নহে এবং এক একটী উপাখ্যান অতি বৃহৎ। এই সকল উপাখ্যান কবে কে মহাভারতভুক্ত করিয়াছেন, তাহার নিশ্চয় করা কঠিন। উপাখ্যান সকল ভুক্ত হওয়ার পরেও অনেকে মহাভারতে স্থানে স্থানে কলম ধরিয়া তাহা আপনাদের সময়ের মতোপযোগী করিয়া লইতে প্রয়াস পাইয়াছেন, দেখা যায়।

উপরোক্ত কারণ বশতঃ মহাভারতের উক্তি সকলে পরস্পর অনেক অনৈক্য ও অসংলগ্নতা আছে। যে সকল উক্তি সরল ও স্বাভাবিক, এবং মূলের সহিত মিশিয়া আছে, সেগুলিকে মৌলিক গণ্য করা, আর যে গুলি বিশেষ বিবেচনা করিয়া বাধাবাঁধি রূপে লিখিত কিংবা যেগুলি মূলের সহিত মিশে না, সেগুলির মৌলিকতায় সন্দেহ করা, অন্যায় নহে। যে উক্তিটি সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীনতম মতানুযায়ী, তাহাই মূলগ্রন্থের সমকালীয় কিংবা তৎকালানুমোদিত হওয়ার অধিকতর সম্ভাবনা। তদপেক্ষা প্রাচীন কালীয় অথচ তৎকালের মতবিরুদ্ধ কোন উক্তি

* সাহিত্য সম্মিলনের ৪র্থ অধিবেশনে পঠিত।

মূলগ্রন্থে সন্নিবেশিত হওয়া সম্ভবপর নহে। নিম্নে বিভাগক্রমে মূলমহাভারতের সমকালীয় জ্যোতিষের আলোচনা করিতেছি।

১। **কালচক্র**।— আদিপর্ব্ব তৃতীয় অধ্যায়ে উপমন্যুকৃতস্তবে কালচক্র এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে—

"একাংনাভিং সপ্তশতা অরাঃ শ্রিতা প্রতিষঙ্গা বিংশতিচার্পিতা অরাঃ অনেমিচক্র পরিবর্ত্ততে'। পুনশ্চ "একং চক্রং বর্ত্ততে দ্বাদশারং ষণ্নাভি মেকাক্ষং"। পুনশ্চ

"ত্রীণ্যর্পিতান্যত্র শতানি মধ্যে, ষষ্টিশ্চ নিত্যং।
চরতি ধ্রুবেঽস্মিন্।
যুক্তে চতুর্ব্বিংশতি পর্ব্বযোগে, ষড়বৈ
কুমারাঃ পরিবর্ত্তয়ন্তি॥"

কালচক্রের সংবৎসর রূপ নাভিতে দিবারাত্রিস্বরূপ ৭২০টি অর। অথবা, ছয় ঋতু স্বরূপ নাভিতে দ্বাদশমাস স্বরূপ অর অর্পিত আছে। অথবা, চতুর্ব্বিংশতি পর্ব্বযুক্ত সেই চক্রে অহোরাত্রস্বরূপ ৩৬০ তন্ত সমর্পিত আছে, এবং ঋতুস্বরূপ ছয় কুমার তাহাকে পরিবর্ত্তন করিতেছে। এখানে সংবৎসরে ছয় ঋতু, দ্বাদশমাস, চতুর্ব্বিংশতি পর্ব্ব (অমাবস্যা পূর্ণিমা) এবং ৩৬০ অহোরাত্র স্বীকৃত হইয়াছে। এই সংবৎসর সাবন উদ্ধৃত বাক্যগুলিতে বৈদিক ছায়া আছে।

বিরাট পর্ব্ব ৫২ম অধ্যায়ে ভীষ্মদেবে কালচক্র সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

"কলাকাষ্ঠাশ্চ যুজ্যন্তে মুহূর্ত্তানি দিনানিচ।
অর্দ্ধমাসাশ্চ মাসাশ্চনক্ষত্রাণি গ্রহাস্তথা॥
ঋতবশ্চাপিযুজ্যন্তে তথাসংবৎসরা অপি।
এবং কালবিভাগেন কালচক্রং প্রবর্ত্ততে॥
তেষাং কালাতিরেকেণ জ্যোতিষাঞ্চ ব্যতিক্রমাৎ।
পঞ্চমে পঞ্চমে বর্ষে দ্বৌমাসাবুপজায়তঃ॥

এই ভীষ্মবাক্য উপমন্যুস্তবাপেক্ষা অগ্রসর দেখা যায়। ইহাতে দিবসকে কলা, কাষ্ঠা, এবং মুহূর্ত্তে বিভক্ত করা হইয়াছে, এবং গ্রহনক্ষত্রের উল্লেখ আছে। উপমন্যুস্তবে সাবন বৎসর লক্ষ্য। ভীষ্মবাক্যের লক্ষ্য চান্দ্র ও সৌর-বৎসর। তিনি ৫সৌরবৎসরে ২ মাস বা প্রতি সৌরবৎসরে ১২দিন অধিমাসাধিক্য ধরিয়াছেন। অর্থাৎ তাঁহার মতে চান্দ্রবর্ষের পরিমাণ ৩৫৪ দিবস এবং সৌরবর্ষের পরিমাণ ৩৬৬ দিবস। দেখা যাইতেছে যে, বর্ত্তমান সময়ের ন্যায়, মহাভারতীয় কালেও সাবন, সৌর এবং চান্দ্র এই ত্রিবিধ বৎসরই প্রচলিত ছিল।

ভীষ্মদেব উপরোক্ত চান্দ্রবর্ষ হিসাবে পাণ্ডবদিগের নির্ব্বাসন কাল গণনা করিয়া বলিয়াছিলেন যে, তাঁহাদিগের ত্রয়োদশবর্ষ গত হইয়া আরও "মাসাঃপঞ্চ চ দ্বাদশাক্ষপাঃ" অধিক গত হইয়াছে। নির্ব্বাসন-কাল গত হওয়া সম্বন্ধে কোনরূপ সন্দেহ না থাকে, এই জন্য, পাণ্ডবদিগের প্রতি বিশেষ অনুরাগ বশতঃ ভীষ্মদেব চান্দ্রবর্ষ হিসাবে তাহা গণনা করিয়া থাকা অসম্ভব নহে। বর্ষ গণনা বোধ হয় তৎকালে সাধারণতঃ সৌর হিসাবেই হইত। কারণ,ভীমের এই গণনার কয়েকদিবস পূর্ব্বে ভীম কীচক-লাঞ্ছিতা দ্রৌপদীকে আর অর্দ্ধমাস মাত্র সহ্য করিতে বলিয়াছিলেন, এবং কীচকবধের পর দ্রৌপদী বিরাট রাজমহিষীকে আর তের দিন মাত্র ক্ষমা করিতে প্রার্থনা করিয়াছিলেন। উদ্দেশ্য এই ছিল যে, ইহার পরেই অজ্ঞাত বাস শেষ হইবে। ভীম ও দ্রৌপদী সৌরবর্ষের হিসাব করিয়াছিলেন।

২। **চন্দ্র সূর্য্যের গতি**—বনপর্ব্ব ১৬২ ম অধ্যায়ে যুধিষ্ঠির প্রতি ধৌম্য বাক্যে চন্দ্র সূর্য্যের গতি বর্ণিত হইয়াছে।—

"এনং ত্বহরহর্মেরুং সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধ্রুবম্।
প্রদক্ষিণমুপাবৃত্য কুরুতঃ কুরুনন্দন॥
জ্যোতীংষি চাপ্যশেষেণ সর্ব্বাণ্যনঘ সর্ব্বতঃ।
পরিযান্তি মহারাজ গিরিরাজং প্রদক্ষিণম্॥
এবং জ্যোতীংষি সর্ব্বাণি প্রকর্ষন্ ভগবানপি।
অস্তং প্রাপ্যততঃ সন্ধ্যামতিক্রম্য দিবাকরঃ॥
উদীচীং ভজতে কাষ্ঠাং দিশমেষঃ বিভাবসুঃ।
সমেরুমনুবৃত্তঃ সন্ পুনর্গচ্ছতি পাণ্ডব॥
প্রাঙ্ মুখঃ সবিতাদেবঃ সর্ব্বভূতহিতে রতঃ।
সমাসং বিভজন্ কালে বহুধা পর্ব্বসন্ধিষু॥
তত্রৈবভগবান্ সোমোনক্ষত্রৈঃ সহগচ্ছতি॥
* * * * * * *
এবমেষহ্যতিক্রম্য মহামেরু মতন্দ্রিতঃ।
ভাসয়ন্ সর্ব্বভূতানি পুনর্গচ্ছতিমন্দরম্॥

তথা তমিস্রহা দেবো ময়ূখৈর্ভাসয়ন্ জগৎ।
মার্গমেতমসম্বাধ মাদিত্যঃ পরিবর্ত্ততে ॥
সিসৃক্ষুঃ শিশিরাণ্যেষ দক্ষিণাং ভজতে দিশম্।
ততঃ সর্ব্বাণি ভূতানি কালোঽভ্যর্জ্জতি শিশিরঃ
স্থাবরাণাঞ্চ ভূতানাং জঙ্গমানাঞ্চ তেজসা।
তেজাংসি সমুপাদত্তে নিবৃত্তঃ স বিভাবসুঃ ॥"

এস্থলে বলা হইয়াছে যে, চন্দ্র সূর্য্য এবং নক্ষত্রগণ প্রত্যহ তির্য্যগ্‌বৃত্ত পথে সুমেরুপর্ব্বত বা পৃথিবীর মেরু-দণ্ড পরিভ্রমণ করে। তাহাদিগের দৈনিক ভ্রমণ-পথের অন্তর্গতাংশ উত্তর দিকে হেলিয়া থাকে। সূর্য্য এইরূপ দৈনিক গতিতে ঘুরিতে ঘুরিতে বিষুবাদি পর্ব্বসন্ধি সকল অতিক্রম করিয়া উত্তরায়ণান্ত ও দক্ষিণা-য়নান্ত বিন্দুদ্বয় মধ্যে উত্তর দক্ষিণ মুখে যাতায়াত করে। তাহার দক্ষিণায়নান্তে অবস্থানকালে শীত ঋতুর আরম্ভ এবং উত্তর গমন হইলে, গ্রীষ্মবর্ষাদির প্রবর্ত্তন হয়। সূর্য্যের পর্ব্বসন্ধি অতিক্রম দ্বারা সম্বৎসর মাসে বিভক্ত হইয়া থাকে। এই বর্ণনায় জ্যোতিষ্কগণের দৈনিকগতি এবং সূর্য্যের উত্তর দক্ষিণমুখে বার্ষিক অয়নগতি স্পষ্টরূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। কিন্তু বার্ষিক পূর্ব্বমুখী গতির উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। "মার্গমেতমসম্বাধম্" বাক্যদ্বারা অপমণ্ডলকে না বুঝাইয়া দৈনিক পথকেই বুঝাইতেছে, বোধ হয়। তবে কি মহাভারতীয় কালে পূর্ব্ব কিংবা পশ্চিম ক্ষিতিজে সূর্য্যের উত্তর দক্ষিণ অপসরণ ও ভিন্ন ভিন্ন নক্ষত্রে অবস্থান দৃষ্টে বিষুবাদি ক্রান্তি চিহ্নিত ও চান্দ্র-মাসানুসরণে সৌরমাস বিভাগ করা হইত? বাস্তবিক, সূর্য্যগতি পর্য্যবেক্ষণ করিবার ইহাই মৌলিক প্রণালী, বোধ হয়।

৩। **নক্ষত্র**।—মহাভারতের বহু পূর্ব্ব হইতে রাশিচক্রস্থ নক্ষত্রসকল আর্য্যঋষিগণের সুপরিচিত ছিল। সুতরাং মহাভারতে তাহাদের যে ভূরি উল্লেখ আছে, ইহা বলা বাহুল্য। ইহাতে দিবস, পক্ষ, মাস এবং অয়ন বা বর্ষ প্রবৃত্তিকাল নক্ষত্রদ্বারা পরিচিত করা হইয়াছে। রব্যাদিবারের নাম মহাভারতের কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। তৎকালে নক্ষত্র সকলই বারের কার্য্য করিত এবং দিবস গণনার সহায়তা করিত। তাহারা দিঙ্-নির্ণয়েরও সহায় ছিল—"নক্ষত্রৈর্বিন্দতেদিনঃ"। যাত্রা, জন্ম বিবাহাদি কার্য্যে একমাত্র নক্ষত্রই অধিকাংশ স্থলে কাল নির্দ্দেশ বা শুভাশুভ নির্ণয় করিত। পুষ্যা নক্ষত্রই বিশেষ প্রশস্ত ছিল বোধ হয়। অতঃপর ক্রমে উদ্ধৃতবাক্যে আমাদের এই সকল কথার প্রমাণ পাওয়া যাইবে।

মহাভারতে রাশিচক্রের নক্ষত্র সকল তারকাবাচক (বা নির্দ্দিষ্ট বিন্দুবাচক) নহে। চিত্রা এবং স্বাতী নক্ষত্র প্রত্যেকে একটি মাত্র তারকা, প্রত্যেককে অতিক্রম করিতে চন্দ্রের এক ঘণ্টার অধিক কাল আবশ্যক করে না। অথচ "অদ্য চিত্রা বা স্বাতী নক্ষত্র" বলিলে, মহাভারতীয় কালে কেহ বুঝিত না যে "চন্দ্র অদ্য একঘণ্টাকাল মাত্র চিত্রা বা স্বাতীতে অবস্থান করিবে।" বাস্তবিক, রাশিচক্রের ২৭টি নক্ষত্র কালপরিমাপকরূপেই প্রথম চিহ্নিত হই-য়াছিল,—বিন্দুনির্দ্দেশকরূপে নহে। "কালস্যনয়নেযুক্তা সপ্তবিংশতিমিন্দবে" (আদিপ ৭৫ ম অধ্যায়।) কাল-পরিমাণে নিযুক্ত করিয়া ২৭টি ভগিনীকে ইন্দুকরে সমর্পণ করা হইয়াছিল। ২৭ ভগিনী ২৭ দিবসরূপ গৃহের গৃহিণী ছিল, চন্দ্র ২৭ দিন সেই ২৭ গৃহে বাস করিত। চন্দ্রের নক্ষত্রচক্র অতিক্রম করিতে যদি ২৭ দিনের অধিক আবশ্যক হইত, তবে নক্ষত্র সংখ্যাও সাতাইশের অধিক হইত। সুতরাং, দেখা যাইতেছে নক্ষত্র সকল প্রথমতঃ এক একটি দিনের পরিমাপক ছিল, এবং কালে তৎপরিমিত স্থানের পরিমাপক হইয়াছে। অর্থাৎ নক্ষত্রচক্রকে স্থূলভাবে ২৭ সমভাগে বিভক্ত করিয়া সেই প্রত্যেক ভাগে যে তারকা বা তারকাপুঞ্জ প্রধানতঃ লক্ষ্য হইয়াছিল,তদ্দ্বারাই ঐ ভাগের নামকরণ হইয়াছিল। আমরা ২৭ নক্ষত্রের সর্ব্বত্রই ব্যাপক অর্থ করিব। যথা, 'মাঘী-পূর্ণিমা' বলিলে বুঝিব 'মঘা নক্ষত্রের গৃহে যে পূর্ণিমা ঘটি-য়াছে। 'রোহিণ্যাদিকাল' বলিলে বুঝিব 'রোহিণী নক্ষত্রের গৃহের যে কোন স্থান হইতে যে কাল আরম্ভ হয়'। এ স্থলে 'রোহিণী' দ্বারা যদি একটি তারকামাত্র বুঝায়, তবে ঐ তারকার অব্যবহিত পূর্ব্বে বা পরে সূর্য্যের অবস্থান-কালে যে কাল হয়, তাহাকে কোন্ কাল বলিব?

৪। **নবগ্রহ**।—মহাভারতে হিন্দুশাস্ত্রোক্ত নব-গ্রহেরই নামোল্লেখ আছে। কিন্তু চন্দ্র সূর্য্য ভিন্ন অন্য

কাহারও ভগণ বা পরিভ্রমণকালের পরিমাণ লিখিত নাই ও তাহা তখন জ্ঞাত থাকা সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় না। সুতরাং তদনুপাতে তাহাদের আপেক্ষিক দূরত্ব কল্পিত হয় নাই ও সেই দূরত্বের সহিত কাল্পনিক সম্বন্ধবিশিষ্ট রব্যাদি সাত বারের নামকরণও হয় নাই। গ্রহের চক্রগতি জানা ছিল।

৫। তিথি ও পক্ষ।—মহাভারতীয় কালে তিথি সকল সুপরিচিত, কিন্তু তন্মধ্যে পূর্ণিমা তিথিরই প্রাধান্য ছিল। প্রায় স্থলেই পূর্ণিমাকে নক্ষত্র দ্বারা পরিচিত করা হইয়াছে। যথা, "চৈত্র্যাং হি পৌর্ণমাস্যান্ত" (আশ্বমেধিক প। ৫২ম অ) "মাঘীচ পৌর্ণমাসীয়ং" (ঐ। ৮৫ ম অধ্যায়)। পৌর্ণমাসীর নক্ষত্রজ বিশেষণ "মাঘী" "চৈত্রী" ইত্যাদি শব্দ কালক্রমে 'মাঘ' 'চৈত্র' ইত্যাদি বিশেষ্যে পরিণত হইয়া প্রথমতঃ চান্দ্রমাসের পরে সৌরমাসের নাম হইয়াছে। কিন্তু মহাভারতীয় কালে মাসের নক্ষত্রজ নাম পরিস্ফুট হইয়াছিল বলিয়া আমাদের বিশ্বাস হয় না। তাহা হইলে পৌর্ণমাসী ভিন্ন অন্যান্য তিথিও মাসের নক্ষত্রজ নাম কিংবা তদুৎপন্ন বিশেষণ দ্বারা পরিচিত হইত। তাহা হয় নাই। যথা, "কৃষ্ণপক্ষস্যসপ্তমীং" (বিরাট প। ৩০ম অ), "দ্বাদশীং মাঘ পাক্ষিকীং" (আশ্বমেধিক। ৮৫ম অ)। নিম্নোদ্ধৃত শ্লোক-দ্বয়ে মাসের নক্ষত্রজ নাম দৃষ্ট হয় বলা যাইতে পারে।—

১। "অলক্ষ্যপ্রভয়াহীনঃ পৌর্ণমাস্যান্ত কার্ত্তিকে।
চন্দ্রোঽভূদগ্নিবর্ণশ্চ পদ্মবর্ণে নভস্তলে॥"
(ভীষ্মপ। ২য় অধ্যায়)

২। "মাঘোঽয়ং সমনুপ্রাপ্তো মাসঃ সৌম্য যুধিষ্ঠির।
(অনুশাসন। ১৬৭ম অধ্যায়)।

কিন্তু প্রথমোদ্ধৃত শ্লোকে 'কার্ত্তিকে' শব্দ 'নভস্তলে' শব্দের বিশেষণ হইয়া উভয়ের সমবেত অর্থ 'কৃত্তিকা-ধিষ্ঠিত নভস্তলে' (অর্থাৎ আকাশের যে ভাগে কৃত্তিকা অবস্থিত তথায়) হইতে পারে। পরোদ্ধৃত শ্লোকে 'মাঘ' শব্দ মাসের নাম বটে, কিন্তু ঐ শ্লোক প্রক্ষিপ্ত, ইহা পরে দেখাইব। পূর্ণিমেতর তিথি সকল মাস বা নক্ষত্র দ্বারা পরিচিত না হওয়াতে বোধ হয় যে, পৌর্ণমাসীর ন্যায় ঐ সকল তিথি জানিবার নিশ্চিত উপায় ছিল না, এবং পূর্ণিমার পরদিন হইতে সাবন দিন-সংখ্যা গণনা করিয়া সেই সংখ্যাদ্বারা তিথির সংখ্যা নির্দ্দেশ করা হইত। এ জন্যই তিথি ও দিন শব্দ একার্থবোধক। মৌষল পর্ব্ব দ্বিতীয় অধ্যায়ে আছে।

এবং পশ্যন্ হৃষিকেশো লোকানাং কালপর্য্যয়ম্।
ত্রয়োদশ্যামমাবস্যাং দৃষ্ট্বা তান্ প্রব্রবীদিদম্॥
চতুর্দ্দশী পঞ্চদশী কৃতেয়ং রাহুণাপুনঃ।
যথা বৈ ভারতযুদ্ধে প্রাপ্তো চাদ্য ক্ষয়ায় নঃ॥

শ্লোক দুইটীর অন্বয় সহজ হইলেও তাৎপর্য্য গ্রহণ কঠিন। আমাদের এই অর্থ বোধ হয় যে, সাবন-দিন-গণনায় যে দিবস ত্রয়োদশী হয়, তাহার শেষ হইতেই চন্দ্রকলা লোপ পাইয়াছিল এবং পরদিবস শেষে সূর্য্যগ্রহণ হইয়াছিল। তদ্দৃষ্টে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন "ভারতযুদ্ধ কালের ন্যায় আমাদের ক্ষয়ের জন্য গণিত ত্রয়োদশীর দিন শেষেই আমাবস্যা আরম্ভ হইয়াছে, এবং অদ্যগণিত চতুর্দ্দশীর দিবস অমাবস্যা বর্ত্তমান থাকিয়া শেষভাগে সূর্য্যগ্রহণ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে"। ইহাতে দেখা যায় যে, তৎকালে সাবনদিন সংখ্যা দ্বারা তিথির সংখ্যা স্থির হইত এবং আমাবস্যাশেষে সূর্য্যগ্রহণ হওয়া পরিজ্ঞাত ছিল।

মহাভারতীয় কালে পৌর্ণ মাসীর পর হইতে মাস আরম্ভ হইত। যথা, আশ্বমেধিক পর্ব্ব ৮৫ম অধ্যায়ে আছে "মাঘীচ পৌর্ণমাসীয়ং মাসঃ শেষোবৃকোদর" হে বৃকোদর, ইহা মাঘী পূর্ণিমা এবং মাসশেষ হইয়া আসিল। বাস্তবিক, পূর্ণিমায় সূর্য্যাস্তকালে পূর্ব্বক্ষিতিজে পূর্ণচন্দ্র উদিত হইয়া মানবের বিশেষ লক্ষ্য হইয়া থাকে। সুতরাং প্রাচীনকালে ঐ তিথিকে মাসের সীমান্তস্তরূপে স্থাপিত করা স্বাভাবিক। অমাবস্যা ও তাহার পূর্ব্বাপর তিথিতে চন্দ্র দৃষ্ট হয় না, অতএব অমাবস্যা দ্বারা মাসের সীমা নির্দ্দেশ করা সহজ ছিল না। কিন্তু আশ্বমেধিক পর্ব্বের ৪৭ ম অধ্যায়ে আছে "মাসাঃ শুক্লাদয়ঃ স্মৃতাঃ" শুক্লপক্ষে মাস আরম্ভ হয়। একই পর্ব্বের দুইটি উক্তি পরস্পর বিপরীত। বর্ত্তমান সময়ে 'গৌণ' 'মুখ্য' ভেদে উভয় পক্ষেই মাসারম্ভ হইয়া থাকে। কিন্তু দৈব ও পৈত্রিক কার্য্যে ভিন্ন বঙ্গদেশে চান্দ্র মাস প্রচলিত নাই। উত্তর

পশ্চিম প্রদেশে চান্দ্রমাস প্রচলিত আছে ও কৃষ্ণপক্ষে উহার আরম্ভ হইয়া থাকে। আশ্বমেধিকের বিপরীত উক্তিদ্বয় একই সময় একই গ্রন্থকারের দ্বারা লিখা হইয়াছে বলিয়া বিশ্বাস করা কঠিন। বাস্তবিক, 'মাসাঃ শুক্লাদয়ঃ' বাক্যযুক্ত শ্লোকটি প্রক্ষিপ্ত। ইহা লিখিত হইবার সময়, হিন্দুগণ জ্যোতিষশাস্ত্রে অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছিল। তখন চন্দ্র সূর্য্যের স্ফুট-গতি গণিত হইত এবং সেই স্ফুটদ্বয়ের অন্তর বাহির করিয়া অমাবস্যার শেষ নির্ণয় পূর্ব্বক শুক্লপক্ষারম্ভ হইতে মাস গণনা হইতে পারিত। পৌর্ণমাস্যন্ত মাস স্বাভাবিক, অমান্ত মাস জ্যোতিষিক, এবং তাহার কার্য্যতঃ প্রচলন, বোধ হয়, মূলে যাবনিক।

'পৌর্ণমাসী' শব্দের অর্থ, যে তিথিতে মাস পূর্ণ হয়। সুতরাং ঐ নামটিই মাসের অন্ত নির্দ্দেশক। সৌর-মাস হইতেও পূর্ণিমান্ত মাসের পরিচয় পাওয়া যায়। চান্দ্র চৈত্র, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ প্রভৃতি মাসের পূর্ণিমায় চন্দ্র যথাক্রমে চিত্রা, বিশাখা, জ্যেষ্ঠা প্রভৃতি নক্ষত্রে অবস্থান করে। সুতরাং সূর্য্য তখন যথাক্রমে তাহাদিগের বিপরীত অশ্বিনী, কৃত্তিকা, মৃগশিরা প্রভৃতি নক্ষত্রে অবস্থিত থাকে। শেষোক্ত নক্ষত্র সকলে সূর্য্যের অবস্থান কালেই, বর্ত্তমান সময়ে, সৌর বৈশাখাদি মাস প্রবর্ত্ত হয়। অতএব, সৌর বৈশাখাদি মাস প্রথমতঃ চান্দ্রমাসের অনুসরণে নির্দ্ধারিত হওয়া কালে যথাক্রমে চৈত্রাদির পূর্ণিমান্তে আরম্ভ হইয়াছিল। আজিও তাহারা আদি পূর্ণিমানুগামী নক্ষত্রে আরম্ভ হইতেছে। কিন্তু অধিমাসাধিক্য বশতঃ পূর্ণচন্দ্র আর সর্ব্বদা তাহাদিগের আদিতে থাকিতে পারে না।

৬। **ঋতু**।—আদি পর্ব্ব হইতে কালচক্র বিষয়ক উদ্ধৃতাংশে ষড় ঋতুর উল্লেখ পাওয়া গিয়াছে। আর বনপর্ব্ব ১৬২ ম অধ্যায়ের উদ্ধৃতাংশে সূর্য্যের অয়ন-গতি ও তাহার দক্ষিণায়নান্তে অবস্থান কালে শীত ঋতু আরম্ভ হওয়া বর্ণিত আছে। আশ্বমেধিকের ৪৪ ম অধ্যায়ে আছে "ঋতবঃ শিশিরাদয়ঃ"। সুতরাং মহাভারতীয় কালে ও তৎপরে উত্তরায়ণ-প্রবর্ত্তে শীত ঋতু ও বর্ষ-প্রবর্ত্ত হইত। বর্ত্তমান সময়েও উত্তরায়ণারম্ভের নিকটবর্ত্তী সময়ে ১লা পৌষ হইতে শীত ঋতুর আরম্ভ গণিত হইয়া থাকে। কিন্তু অয়ন ও ঋতুর আরম্ভ অধিকাংশ সময়েই এক হইতে পারে না। কারণ, অয়নান্ত বিন্দু সর্ব্বদাই পশ্চাৎ সরিতেছে, কিন্তু ঋতু মাসের সহিত একত্র আরম্ভ হওয়ার ব্যবস্থা থাকায়, মাসের ভগ্নাংশ পরিমাণ সরিতে পারে না। মহাভারতের সময় চান্দ্রমাস প্রচলিত ছিল, অধিমাসাধিক্য বশতঃ কোন চান্দ্রমাস ও ঋতুর আরম্ভ প্রতিবৎসর এক হওয়া অসম্ভব।

দুই মাসে এক ঋতু। কিন্তু কোন্ দুই মাসে কোন্ ঋতু মহাভারতে তাহার স্পষ্ট উল্লেখ আমাদের দৃষ্টিতে পড়ে নাই। এ বিষয়ে পরস্পরবিরোধী দুইটি উক্তি আমরা উদ্ধৃত করিতেছি। পাণ্ডবদিগের নারায়ণাশ্রমে বাস কালে

"তেষাং পুণ্যতমা রাত্রিঃ পর্ব্বসন্ধৌ স্ম শারদী।
তত্রৈব বসতা মাসীৎ কার্ত্তিকী জনমেজয়॥"

বনপর্ব্ব। ১৮২ ম অধ্যায়। ১৬।

এখানে দেখা যায়, কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় শরৎকাল ছিল। কিন্তু উদ্যোগ পর্ব্ব ৮২ ম অধ্যায়ে আছে—"কৌমুদে মাসি রেবত্যাং শরদন্তে হিমাগমে," অর্থাৎ কার্ত্তিক মাসের রেবতী নক্ষত্রে শরৎকাল অন্ত ও হেমন্তকাল উপস্থিত হইলে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দৌত্য কার্য্যে হস্তিনা যাত্রা করিয়াছিলেন। কার্ত্তিক মাসের রেবতীনক্ষত্র ঐ মাসের পূর্ণিমার ৩ নক্ষত্র পরিমিত অগ্রগামী। সুতরাং এই শ্লোকানুসারে কার্ত্তিকী পূর্ণিমার পূর্ব্বে হেমন্ত ঋতু ও তদ্ধেতু পৌষ পূর্ণিমার পূর্ব্বে শীত ঋতু এবং তৎসঙ্গে উত্তরায়ণ আরম্ভ হইত। মহাভারতের অন্য কোন উক্তি দ্বারা ইহা সমর্থিত হয় না। অতএব শরদন্তে হিমাগমে শব্দ দুইটিকে আমরা সর্ব্বথা প্রক্ষিপ্ত মনে করি। আমাদিগের মতে আশ্বিনের শুক্লান্ত হইতে অগ্রহায়ণের শুক্লান্ত পর্য্যন্ত শরৎ, তৎপর মাঘ শুক্লান্ত পর্য্যন্ত হেমন্ত থাকিয়া, মাঘী পূর্ণিমার পর হইতে শীত ঋতু গণিত হইত।

৭। **কাল ও বর্ষ-প্রবৃত্তি**।—সূর্য্য যে নক্ষত্রে বিষুবাদি পর্ব্বসন্ধিতে অবস্থান করিত, তাহা হইতে কাল বা বর্ষগণনা আরম্ভ হইত। মহাভারতে তিনটি কালের উল্লেখ আছে—রোহিণ্যাদি, ধনিষ্ঠাদি ও শ্রবণাদি। রোহিণ্যাদিকালে সূর্য্য বাসন্ত বিষুবপদে, এবং ধনিষ্ঠাদি

ও শ্রবণাদিকালে উত্তরায়ণারম্ভ বিন্দুতে অবস্থিত থাকিত।

রোহিণ্যাদি ও ধনিষ্ঠাদি কাল সম্বন্ধে বনপর্ব্ব ২২৮ ম, অধ্যায়ে একটি আখ্যান আছে, তাহা এই—রোহিণীর কনিষ্ঠা ভগিনী অভিজিৎ জ্যেষ্ঠার পদ প্রাপ্তির বাসনায় তপস্যার্থ বনে গমন করিলে, ইন্দ্র আসিয়া স্কন্দকে জানাইলেন যে, পূর্ব্বে রোহিণীর যে কাল ছিল, তাহাই ব্রহ্মা কর্ত্তৃক ধনিষ্ঠাদি কালরূপে নির্দ্ধারিত হইয়াছে, সুতরাং নক্ষত্র সংখ্যা সমান ছিল ("ধনিষ্ঠাদিস্তথা কালোব্রহ্মণা পরিকল্পিতঃ। রোহিণীহ্যভবৎ পূর্ব্বমেবং সংখ্যা সমাভবৎ"॥) এখন অভিজিৎ চলিয়া যাওয়াতে একটি নক্ষত্র কম পড়িয়াছে, তাহার স্থান পূরণ আবশ্যক। তখন কৃত্তিকাগণ আকাশে নক্ষত্ররূপে অধিষ্ঠিতা হইয়া অভিজিতের স্থান পূরণ করিল।

আখ্যানের মর্ম্ম এই বোধ হয় যে, পূর্ব্বকালে অভিজিৎ ২৭ নক্ষত্রের অন্তর্গতা, এবং কৃত্তিকা তাহাদিগহইতে বর্জ্জিতা ছিল। আর রোহিণীতে মহাবিষুবপদের ও ধনিষ্ঠাতে উত্তরায়ণারম্ভ বিন্দুর অবস্থান গণ্য করা হইত। তখন রোহিণী হইতে ধনিষ্ঠা একবিংশ ও ধনিষ্ঠা হইতে রোহিণী অষ্টম থাকায় মহাবিষুব ও অয়নারম্ভ-বিন্দুর অবস্থানের সহিত নক্ষত্রসংখ্যার সমতা বা তুল্যানুপাত ছিল। কিন্তু চাক্ষুষ পর্য্যবেক্ষণে মহাবিষুবপদ রোহিণী হইতে সরিয়া আসিয়াছে দৃষ্টে, এবং অয়নান্তবিন্দু অভিজিতে সরিয়া আসিয়াছে মনে করিয়া, রোহিণী ও মহাবিষুবপদ হইতে কাল গণনারম্ভের পরিবর্ত্তে অয়নারম্ভে অধিষ্ঠিত সমুজ্জ্বল অভিজিত হইতে কালগণনার প্রস্তাব হইল। পরে, উত্তরায়ণারম্ভের পর্য্যবেক্ষণে দেখা গেল যে, তাহা অভিজিতে সরিয়া যায় নাই, ধনিষ্ঠাতেই আছে। তখন অভিজিৎকে রোহিণীর পরিবর্ত্তে নক্ষত্র মণ্ডলীর শীর্ষস্থানে স্থাপন না করিয়া, ধনিষ্ঠাকেই স্থাপন করা হইল। কেবল তাহাই নহে। অভিজিতের অধিকৃত স্থান সম্ভবতঃ সঙ্কীর্ণ দৃষ্টে, এবং ভরণী ও রোহিণীর মধ্যভাগে একটি অতিরিক্ত নক্ষত্রের পরিমিত স্থান আছে দৃষ্টে, অভিজিৎকে নক্ষত্র চক্র হইতে একদা নির্ব্বাসিতা করা হইল, এবং উক্ত অতিরিক্তস্থানীয়া কৃত্তিকাকে ঐ চক্রভুক্তা করিয়া অভিজিতের অভাব পূরণ পূর্ব্বক রোহিণীর মহাবিষুব-সিংহাসনে কৃত্তিকাকে স্থাপন করা হইল। মহাভারতের স্থানে স্থানে কৃত্তিকা নক্ষত্রের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। অতএব, উক্ত গ্রন্থ প্রণয়নের পূর্ব্বেই কৃত্তিকার প্রতিষ্ঠা ও ধনিষ্ঠাদি কাল আরম্ভ হইয়াছিল, বোধ হয়। ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি মাঘীপূর্ণিমান্তে শীত ঋতু আরম্ভ হইত, উহাই অয়নারম্ভেরও সময়। মাঘী পূর্ণিমায় চন্দ্র অশ্লেষায় কিংবা মঘায় থাকে, এবং সূর্য্য তদ্‌বিপরীত ধনিষ্ঠা বা শতভিষায় থাকে। সুতরাং আমাদিগের অনুমানসহ ধনিষ্ঠাদি কালের ঐক্য হইতেছে। কিন্তু সেই প্রাচীন কালে সূক্ষ্মপর্য্যবেক্ষণের উপায়াভাবে নক্ষত্র চক্রের বিভাগ সূর্য্যের ভোগ্য নক্ষত্র, এবং আয়নারম্ভ ও বিষুবপদে সূর্য্যের প্রবেশকাল সূক্ষ্মরূপে পরিজ্ঞাত ছিল না। বোধ হয়, সূর্য্যের উদয়াস্তের পূর্ব্বাপর নক্ষত্র দৃষ্টে তাহার ভোগ্য নক্ষত্র স্থিরীকৃত হইত। যুধিষ্ঠির এবং শরশয্যাগত ভীষ্মদেব চাক্ষুষ পর্য্যবেক্ষণেই সূর্য্যের দক্ষিণায়ন-নিবৃত্তি ও উত্তরায়ণ-প্রবৃত্তি ঠিক করিয়াছিলেন। ভীষ্মদেবের স্বর্গারোহণ-কাল-আলোচনা উপলক্ষে উত্তরায়ণ প্রবৃত্তিকাল আরও সূক্ষ্মরূপে দেখা যাইবে এবং শ্রবণাদি কাল পরবর্ত্তী বলিয়া প্রমাণিত হইবে।

শ্রীচন্দ্রকিশোর তরফদার।

অন্তিম সঙ্গীত।

"জ্ঞান মুকুট পরি" সুর।

(মিশ্র ভৈরবী—কাওয়ালী)

(মোরে) এ উৎকট ব্যাধি দিয়ে,
কি সঙ্কটে ফেলে নিয়ে,
বুঝাইয়া দিলে যবে
সকল চিকিৎসাতীত,
না হইলে নিরুপায়
নিলাজ ফেরে না হায়;
তাই, শরণ লইতে হল
তোমারি চরণে পিতঃ।

যার যেটা এ সংসারে
তীব্রতম আকর্ষণ,
তাই আগে ছিন্ন করি,
ফিরাইয়া লহ মন;
নতুবা সংসারে মজি—
তোমারে ভুলিয়া থাকি,
ধূলো নিয়ে খেলা করি
তোমারে ত নাহি ডাকি
মধুরে ডেকেছ তবু—
চেতনা হয়নি প্রভু!
অবিশ্রান্ত কষাঘাত,
না হ'লে কি জাগে চিত?
দীর্ঘ দিবারাত্রি, পেয়ে
বেত্রাঘাত অনিবার,
বুঝিলাম যবে পিতঃ
এ সুধু স্নেহের মার;
এটুকু সহিতে হবে
নতুবা কি হতে পারি,
অনশ্বর সে অনন্ত
আনন্দের অধিকারী?
তিক্ত ভেষজের মত
রোগের যন্ত্রণা যত;
ব্যাধি মুক্ত করে সখা
খেতে দিবে প্রেমামৃত।

৩১ শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৭।
মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল

রজনীকান্ত সেন

পাপের ফল।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

(৩)

দিন সকলেরই যায়। কাহারও বা সুখে যায়, কাহারও বা দুঃখে যায়। কেহ বা দুগ্ধ ফেণনিভ শয্যায় শয়ন করিয়া নিশা যাপন করে, কেহ বা অনাবৃত আকশতলে অথবা বৃক্ষতলে ভূমিশয্যায় রাত্রি কাটায়। দিন সকলেরই যায়।

বছিরের বিধবা পত্নী ও পতি-পুত্রহীনা জননীর দিনও কাটিতেছে :—কিন্তু বড় দুঃখে দিন যাইতেছে। বছিরের বৃদ্ধা মাতা ভাবিতেছে, এমন করিয়া করিমের অনুগ্রহে কতদিন কাটিবে; করিম কতদিন তাহাদের ভরণ পোষণ করিবে। তাহারও ত ঘর সংসার আছে, তাহারও ত পিতা মাতা ভ্রাতা ভগিনী আছে; দুদিন পরে সে ত বিবাহ করিবে। তখন সে যদি তাহাদের মুখের দিকে না চায়। হাজারও হউক করিম পরের ছেলে। এখনও না হয় সে বছিরের বন্ধুত্ব স্মরণ করিয়া তাহাদের ব্যয়ভার বহন করিতেছে। দুদিন পরে সে যদি আর সাহায্য না করে: তখন কি উপায় হইবে? বউকে তাহার বাপের বাড়ী পাঠাইয়া দেওয়া যায়। সেখানে হয়ত সে আবার কাহাকেও নিকা করিয়া নূতন ঘর সংসার পাতিতে পারে। কিন্তু তাহার গতি কি হইবে? এ সংসারে তাহার যে কেহই নাই। এই বুড়া বয়সে সে কি না খাইয়া ঘরে পড়িয়া মরিবে? হায় আল্লা, এ কি করিলে! বৃদ্ধা এই সকল কথা ভাবিয়া আকুল হয়।

এদিকে বছিরের স্ত্রী, কেন বলিতে পারি না, আশায় বুক বাঁধিয়া বসিয়া আছে, তাহার স্বামী মরে নাই; সে আবার ফিরিয়া আসিবে, আবার তাহাকে দেখিতে পাইবে। কথাটা কিন্তু সে মুখ ফুটিয়া বলিতে পারে না; একদিন মাত্র সে তাহার শাশুড়ীকে কথাটা বলিয়াছিল; বৃদ্ধা তাহাকে ওকথা কাহারও নিকট বলিতে নিষেধ করিয়া দিয়াছে; লোকে মনে করিবে বউটা পাগল হইয়াছে। বছিরের স্ত্রী তাহার মনের কথা আর কাহাকে বলিবে, সে দিবানিশি শুধু আল্লাকে ডাকে, আর প্রার্থনা করে, তাহার আশা যেন পূর্ণ হয়,— তাহার স্বামী যেন ফিরিয়া আসে।

বছিরের স্ত্রীর আর এক কষ্ট, সে করিমকে দুই চক্ষে দেখিতে পারে না; করিমকে দেখিলেই তাহার হৃদয়ে কেমন একটা ভাবের সঞ্চার হয়। তাহার মনে হয়, যেন সয়তান তাহাকে প্রলুব্ধ করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে। যে করিমকে সে অন্তরের সহিত

ঘৃণা করে, যাহাকে দেখিলেই তাহার সয়তানের কথা মনে হয়, সেই করিমের অনুগ্রহের উপর তাহাদের নির্ভর করিতে হইতেছে,—সেই করিমের উপার্জ্জনে তাহাদের জীবিকা নির্ব্বাহ হইতেছে। এ চিন্তাও তাহার নিকট অসহ্য বোধ হইত। এক এক সময় সে মনে করিত করিমের প্রদত্ত চা'ল দা'ল সে গ্রহণ করিবে না, উপবাস করিয়া মরিবে, তবুও তাহার প্রদত্ত দ্রব্যে ক্ষুধা নিবারণ করিবে না। পৃথিবীতে কত দীন দুঃখিনীর অন্ন যুটিতেছে, তাহার কি আর যুটিবে না? সে ভিক্ষা করিয়া খাইবে, তবুও করিমের দান গ্রহণ করিবে না। কিন্তু পরক্ষণেই বৃদ্ধা শাশুড়ীর কথা মনে হয়, বুড়ীর যে এ সংসারে আর কেহ নাই; করিমের সাহায্য গ্রহণ না করিলে বুড়ীর দশা কি হইবে? এই ভাবিয়া সে কাতর হইয়া পড়ে, তাহার সঙ্কল্প সে কার্য্যে পরিণত করিতে পারে না।

দেখিতে দেখিতে কুড়ি দিন চলিয়া গেল। করিম প্রতিদিনই দুইবার তিনবার বছিরের বাড়ীতে আসে; আবশ্যক দ্রব্যাদি দিয়া যায়; অকারণে বিলম্ব করে; বছিরের মাতার সহিত বৃথা কথাবার্ত্তায় সময় কাটায়; কিন্তু সাহস করিয়া বছিরের স্ত্রীকে কোন কথা বলিতে পারে না। কিন্তু এমন ভাবেই বা কতদিন চলে। যে রমণীকে লাভ করিবার জন্য সে এতবড় একটা দুষ্কর্ম্ম করিয়াছে—নরহত্যা, বন্ধুহত্যার পাপে লিপ্ত হইতেও দ্বিধা বোধ করে নাই, সেই রমণী, সেই সুন্দরী যুবতী তাহার সম্মুখেই ঘুরিয়া বেড়ায়, অথচ তাহার সহিত কথাটী পর্য্যন্ত বলে না, তাহার দিকে ফিরিয়াও চাহে না। ইহা অসহ্য—সম্পূর্ণ অসহ্য। এমন করিয়া সে আর কষ্ট পাইতে পারে না—তাহার সহিষ্ণুতা, তাহার আত্মসংযম সীমা অতিক্রম করিতেছে। সে আর তাহার মনোভাব গোপন করিয়া রাখিতে পারিতেছে না। বছিরের বিধবা পত্নীকে লাভ করিতেই হইবে—সহজে যদি সে তাহাকে নিকা করিতে না চায়, তাহা হইলে তাহার প্রতি বলপ্রয়োগ করিতেও সে কুণ্ঠিত হইবে না। তাহার প্রতিজ্ঞা, এই সুন্দরী যুবতীকে লাভ করিতেই হইবে—জান কবুল!

করিম মনে করিয়াছিল এই পাড়াগাঁয়ের মেয়ে তাহার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিতে পারিবে না। কেন সে করিমকে বিবাহ করিতে অস্বীকার করিবে? বছির অপেক্ষা সে সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ; তাহার রূপ আছে, তাহার গুণ আছে, সে একেবারে পথের ভিখারী নহে; এখনও তাহার বাড়ীতে তিন খানি লাঙ্গল আছে, এখনও তাহার গোশালায় গাই বলদে দশ বারটা আছে। কিসে সে এই সুন্দরীর অযোগ্য। সে নবীন যুবক, সে যে কালে অর্থ উপার্জ্জন করিয়া গ্রামের মণ্ডল হইবে না, এ কথাই বা অসম্ভব কেন? সে মনে করিয়াছিল, তাহার প্রতি কৃতজ্ঞতার খাতিরেও বছিরের স্ত্রী তাহাকে নিকা করিতে সম্মত হইবে। সেই জন্যই সে তাহাদের ভরণ পোষণের ভার গ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু এখন সে দেখিতে পাইল যে, বছিরের স্ত্রীর রকম ভাল নহে, সে করিমকে ঘৃণা করে, তাহার প্রতি অনুরক্ত হওয়া দূরে থাকুক, সে বড়ই বিরক্ত। কাজেই করিম এই যুবতীর অকৃতজ্ঞতায় ফল দিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইল। সে অবশেষে স্থির করিল যে, বছিরের বৃদ্ধা মাতার নিকট সে প্রথমে নিকার প্রস্তাব উপস্থিত করিবে; তাঁহার সম্মতি গ্রহণ করিয়া সে স্পষ্ট বাক্যে বছিরের স্ত্রীকে তাহার অভিপ্রায় জানাইবে। বছিরের স্ত্রী যদি তাহাতে সম্মত হয়, ভাল কথা; আর যদি এই বোকা স্ত্রীলোকটা নিজের মঙ্গল না বুঝিয়া তাহার প্রস্তাবে অসম্মতি প্রকাশ করে, তাহা হইলে বল প্রকাশ ভিন্ন উপায়ান্তর নাই।

এই স্থির করিয়া একদিন সন্ধ্যার পর সে বছিরের মাতার নিকট বসিয়া প্রথমে নানাগল্প করিতে লাগিল। দেশের অবস্থা, ধান চা'লের দুর্ম্মূল্যতার কথা, খাদ্য দ্রব্যের মহার্ঘতার কথা প্রভৃতি বলিতে লাগিল। তাহার পর সে ধীরে ধীরে অতি বিনীতভাবে বলিল "আজ কয়েক দিন হইতেই একটা কথা বলিব বলিয়া মনে করিতেছি। এ কয়দিন আর বলা হয় নাই।" এই বলিয়াই করিম চুপ করিল; কেমন করিয়া প্রস্তাবটা উপস্থিত করিবে তাহা সে ভাবিয়া স্থির করিতে পারিল না। তাহাকে নীরব দেখিয়া বছিরের মাতা বলিল "কি কথা বাবা

করিম! কথা* বলিতে বলিতে চুপ কোরে গেলে কেন?"

করিম বলিল "তা, তা এমন কিছু নয়। বল্‌ছিলাম কি,—আমি বল্‌ছিলাম যে বছির ভাই-ত চ'লে গেল। আমি তা—আমি আর কতদিন এমন কোরে এ সংসার চালাই। তারপর আবার নানা জনে নানা কথা বলে। সে ত আর ভাল নয়। তাই আমি বল্‌ছিলাম কি—তাই কথাটা এই কি না——" মধ্যপথেই করিম আবার চুপ করিল

বছিরের মা সেকালে মানুষ, সে করিমের কথাটা বুঝিতেই পারিল না। সে বলিল তা বাবা! তুমি কি মনে করেছ, তা আমি ত বুঝ্‌তে পারলাম না।

করিম তখন বলিল, "আমি বল্‌ছিলাম কি, এই যে নানা জনে নানা কথা বলে, সেটাত আর ভাল নয়; তাই আমি বল্‌ছিলাম কি, আমি বউকে নিকা করি না কেন। তা হোলে আর কোন কথা থাক্‌বে না।'

বছিরের মা অকূলের কূল পাইল; সে মনে করিল ইহার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট প্রস্তাব আর হইতে পারে না। করিম যদি বছিরের স্ত্রীকে নিকা করে তাহা হইলে করিম কি আর বুড়ীকে ফেলিয়া দিতে পারিবে; কিন্তু বউ যদি বাপের বাড়ী চলিয়া যায় এবং সেখানে আর কাহাকেও নিকা করে, তাহা হইলে তাহার দশা কি হইবে। সুতরাং বছিরের মা করিমের এই প্রস্তাব শুনিয়া আনন্দিত হইল। সে বলিল "বাবা করিম, তুমি বেশ কথা বলেছ। তোমার মতই কথা বটে। তা আমি বউকে আজই এ কথা বোলে রাজি কোরবো। এত খুব ভাল কথা—খুব ভাল কথা।

বৃদ্ধার সহিত করিমের যে কথা হইতেছিল, বছিরের স্ত্রী দ্বারের আড়াল হইতে তাহা শুনিতেছিল। এতক্ষণ সে সাড়াশব্দ করে নাই। বছিরের মা যখন বলিল এ ত খুব ভাল কথা—খুব ভাল কথা, তখন আর তাহার সহ্য হইল না। সে দ্বারের বাহিরে আসিয়া ক্রোধভরে বলিল " কি ভাল কথা, মা? আমি তোমাদের সব কথা শুনেছি। আমি অনেকদিন থেকেই কথাটা বুঝেছিলাম। তোমরা আমাকে কি মনে করিয়াছ? একদানা ভাতের জন্য কি আমি ঐ কুকুরটারে নিকা কোর্‌বো? তা কখনই হবে না। আমি তোমাদের বোল্‌ছি, আমাকে সে মেয়ে মনে কোরো না আমি এ জন্মে আর কাউকে স্বামী বোল্‌বো না! দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষা কোরে খেতে হয়—না খেয়ে মরে যেতে হয় তাও স্বীকার, তবুও আমি আর নিকা 'পুষবো' না—কিছুতেই না। আমার স্বামী বেঁচে থাকুক আর নাই থাকুক, আমি তারই স্ত্রী, মরণের দিন পর্য্যন্ত তারই স্ত্রী থাক্‌বো। কাল থেকে আমি এবাড়ীর—ঐ কুকুরের দেওয়া দানাপানি পেটে দেবো না। আমি ভিক্ষা কোরে খাবো"। যুবতীর মুখ দিয়া আর কথা বাহির হইল না, রাগে তাহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল।

বুড়ী ত এতটুকু হইয়া গেল, সে যে কি বলিবে তাহা ভাবিয়া উঠিতে পারিল না। করিম রাগে ফুলিতেছিল, তাহার নিশ্বাস বন্ধ হইয়া আসিতেছিল। অনেক চেষ্টায় রাগ কিঞ্চিৎ দমন করিয়া সে বলিল "বেশ কথা, তাই হোক্। কালথেকে আর তোমাদের জন্য আমি কিছু কোরবো না। কি, ছোট মুখে বড় কথা। এত বড় সাহস তোমার; আমার খেয়ে আমাকেই অপমান করা। দেখ্‌বো তুমি কেমন মেয়ে। তোমার সর্ব্বনাশ যদি কর্‌তে না পারি, তবে আমি পুরুষ বাচ্চাই নই—তবে আমি মুসলমান নই। এই বলিয়া ক্রোধভরে করিম বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেল; সেই সময়ে ছায়ার মত কি যেন একটা ঘরের পশ্চাৎদিকে সরিয়া গেল। কেহ তাহা দেখিতে পাইল না।

বুড়ীরও বউয়ের উপর ভারি রাগ হইয়াছিল। বুড়ী একটী কথাও না বলিয়া ঘরের মধ্যে চলিয়া গেল এবং আপনার বিছানায় শয়ন করিল। বউ দেখিল শাশুড়ী তাহার উপর রাগ করিয়াছেন। এখন আর তাঁহার রাগ ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিয়া কাজ নাই। আজ থাকুক, কা'ল বুড়ীর রাগ পড়িবে। করিম যে তাহাকে ভয় দেখাইয়া গেল, তাহা সে কাণেও তুলিল না। সে জানিত উপরে একজন আছেন, তিনি দিনদুনিয়ার মালিক; তিনি তাহাকে রক্ষা করিবেন। একটা কেন, দশটা করিমও তাহার কেশাগ্রও স্পর্শ করিতে পারিবে

না, বছিরের স্ত্রী সেই অখিল নির্ভরের উপর নির্ভর করিয়া হৃদয়ে শান্তিলাভ করিল। সে ধীরে ধীরে ঘরের দ্বার বন্ধ করিল, তাহার পর প্রদীপ নিবাইয়া দিয়া ভূমি-শয্যায় শয়ন করিল এবং স্বামীর মুখ খানি ভাবিতে ভাবিতে ঘুমাইয়া পড়িল।

(৪)

করিম বছিরের বাড়ী হইতে রাগ করিয়া বাহির হইয়া গেল। অনতিদূরেই একটী বটগাছ ছিল। করিম সেই বটগাছের তলায় যাইয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া কি ভাবিল; তাহার পর সেই বটগাছের তলায় ভূমিশয্যায় শয়ন করিয়া ভাবিতে লাগিল। রাত্রি তখন ৯টা বাজিয়া গিয়াছে। এত রাত্রিতে গ্রামের লোকজন কেহই জাগিয়া নাই, গ্রামের পথে একটি লোকও চলিতেছে না। করিম সেই অন্ধকার রাত্রিতে সেই নির্জ্জন গাছতলায় শয়ন করিয়া কত কি ভাবিতে লাগিল। তাহার ভাবনার যেন অন্ত নাই।

অনেকক্ষণ এই ভাবে থাকিয়া করিম উঠিয়া বসিল। বসিয়া বসিয়াই কি ভাবিতে লাগিল। তাহার পর উঠিয়া সে বাড়ীর দিকে চলিয়া গেল।

এতক্ষণ একটা লোক বৃক্ষের আড়ালে দাঁড়াইয়াছিল। করিমকে বাড়ীর দিকে যাইতে দেখিয়া লোকটা করিম যেখানে বসিয়াছিল সেই স্থানে আসিয়া বসিল; এবং কি চিন্তা করিতে লাগিল। লোকটা এক একবার করিমের বাড়ীর দিকে চাহিতে লাগিল। তাহার ভাব দেখিয়া বোধ হইল সে যেন কাহার প্রতীক্ষা করিতেছে।

করিম এদিকে চোরের মত পা টিপিয়া বাড়ীতে গেল। বাহিরের উঠানের পার্শ্বেই তাহাদের গোশালা। করিম বাড়ীর মধ্যে গেল না, সেই গোশালার দিকে গেল। অতি সন্তর্পণে গোশালার চালে কি খুঁজিতে লাগিল। অন্ধকারে হাতড়াইয়া সে একখানি দা পাইল, অপরাহ্ন কালে সে ঐ দাখানি গোশালার চালে রাখিয়া গিয়াছিল। করিম দাখানি লইয়া আবার রাস্তায় আসিল এবং বছিরের বাড়ীর দিকে যাইতে লাগিল। তাহাকে আসিতে দেখিয়া বৃক্ষতলের লোকটী বৃক্ষের অন্তরালে লুকাইল; অন্ধকারে করিম তাহাকে দেখিতে পাইল না, কিন্তু লোকটী করিমকে দেখিল। করিমের হাতের দাখানি লোকটী দেখিতে পাইল না। করিম বছিরের বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল। লোকটীও তখন বছিরের বাড়ীর দিকে গেল।

করিম বছিরের ঘরের বারান্দায় উঠিয়া দ্বারে আঘাত করিল। বছিরের স্ত্রী ঘোর নিদ্রায় মগ্ন, দ্বারে আঘাতের শব্দ তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল না। বুড়ী কিন্তু এতক্ষণও জাগিয়া ছিল। কিছুক্ষণ পূর্ব্বে করিমের সহিত তাহাদের যে সমস্ত কথা হইয়াছিল, বুড়ী তাহাই ভাবিতেছিল; ভবিষ্যতে কি উপায় হইবে, এই ভাবনায় বুড়ীর নিদ্রা আসে নাই।

দ্বারে আঘাতের শব্দ শুনিয়াই বুড়ী বলিল কে গো? এত রাত্রিতে দুয়ার ঠেলে কে? করিম উত্তর করিল "আমি করিম। প্রদীপ জ্বালিয়া দুয়ার খোল, দরকার আছে।" করিমের স্বর গম্ভীর, দৃঢ়তাব্যঞ্জক।

বুড়ী তখন তাড়াতাড়ি উঠিয়া প্রদীপ জ্বালিল, তাহার পর দুয়ার খুলিয়া দিল। বছিরের স্ত্রী তখনও ঘুমাইতেছে। বুড়ী বৌকে ডাকার প্রয়োজন বোধ করিল না।

করিম ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াই উন্মত্তের ন্যায় চীৎকার করিয়া বুড়ীকে বলিল,—"খবরদার, ঐখানে বোসো; ওখান থেকে এক পা যদি নড়িবে বা চেঁচাইবে, তাহা হইলে এই দায়ে তোমার মাথা নেবো। এই বলিয়া করিম দা খানি তুলিয়া ধরিল।

করিমের চীৎকারশব্দে বছিরের স্ত্রীর ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। সে তারাতাড়ি উঠিয়া দেখে সম্মুখে দা হস্তে করিম। বছিরের স্ত্রীর আর কোন কথা বুঝিতে বাকী রহিল না। সে চাহিয়া দেখিল ক্রুদ্ধ ব্যাঘ্রের মত করিম তাহার দিকে একদৃষ্টিতে চাহিয়া আছে। বিপদ আসন্ন দেখিয়া বছিরের স্ত্রী দৌড়াইয়া বাহিরে যাইবার চেষ্টা করিল। কিন্তু তাহার চেষ্টা সফল হইল না,—ব্যাঘ্রের মত লম্ফদিয়া বামহস্তে করিম তাহার চুল চাপিয়া ধরিল। তাহার পর দা খানি দক্ষিণ হস্তে তুলিয়া বলিল "সয়তানি! এখন তোকে তোর কোন্ বাবায় রক্ষা করে। আজ তোরই একদিন কি আমারই একদিন। বল আমাকে নিকা করবি কি না? আজ তোর সর্ব্বনাশ না ক'রে আমি

যাচ্ছিনে”। এই বলিয়া সেই পাষণ্ড অসহায়া রমণীর চুল ধরিয়া টান দিল, রমণী মাটীতে পড়িয়াগেল। সে শুধু একবার বলিল “আল্লা, তুমি কোথায় ?”

সেই মুহূর্ত্তেই দ্বারের সম্মুখে একটা ছায়া দেখা গেল। তাহার পরই একটী পুরুষ সবেগে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিল “করিম।”

সেই দণ্ডে ঘরের মধ্যে যদি বজ্রপাত হইত, তাহা হইলেও করিম এত ভয় পাইত না। সে দেখে তাহার সম্মুখে তাহার আবাল্য বন্ধু বছির দাঁড়াইয়া আছে। করিমের শরীর শিহরিয়া উঠিল, তাহার মুষ্টি শিথিল হইল, তাহার দক্ষিণ হস্ত হইতে দা খানি পড়িয়া গেল। সে একবার বছিরের সেই স্থির, গম্ভীর, অচঞ্চল মূর্ত্তির দিকে চহিয়া দেখিল। তাহার পরই “ওরে বাবারে, ভূত এই বলিয়া সবেগে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। বছির তাহার গতিরোধ করিবার চেষ্টা করিল না, একবার শুধু পলায়মান বন্ধুর দিকে কাতর নয়নে চাহিয়া দেখিল।

বছির তখন ধীরে ধীরে বলিল “বৌ, ওঠ; মা, ওঠ। আর এ দেশে থাকা নয়। আর এখানে না। এখনই আমার সঙ্গে এস—দেরী কোরো না। সব জিনিস যেমন আছে তেমনই থাক। দেরী কোরো না; ওঠ।” বছিরের কথা অতি ধীর, তাহার মূর্ত্তি প্রশান্ত ও গম্ভীর, কিন্তু তাহার মুখখানি বিষাদ মাখা।

বছিরের মাতা ও স্ত্রী কথা বলিতে পারিল না; মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় উঠিয়া দাঁড়াইল। বছির ঘরের বাহির হইল, তাহার পশ্চাতে বছিরের মা, তাহার পশ্চাতে বছিরের স্ত্রী। কাহারও মুখে কথা নাই; কে যেন তাহাদিগকে চালাইতে লাগিল। বাড়ীর বাহির হইয়া বছির একবার তাহার সেই বাপ ঠাকুরদাদাব ভিটার দিকে চাহিল, তাহার পর দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কেবল বলিল “করিম”!

বছির মাতা ও স্ত্রীকে লইয়া নদীর পথে গেল। নদীতীরে উপস্থিত হইয়া বছিরের স্ত্রী দেখিল ঘাটে একখানি নৌকা বাঁধা আছে। নৌকাখানি ছোট, তাহাতে দাঁড়ী মাঝী বা আরোহী কেহ নাই। বছির তাহার মাতা ও স্ত্রীকে বলিল “দেরী করিও না, নৌকায় ওঠ।” তাহারা মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় নৌকায় উঠিল; একটী কথা বলিবারও সাহস দুইজনের একজনেরও হইল না। কি যে হইল, কি যে হইতেছে, তাহা তাহারা বুঝিতে পারিল না।

বছির সকলের শেষে নৌকায় উঠিল এবং নৌকা ছাড়িয়া দিল। নৌকা যখন স্রোতের বেগে দক্ষিণ দিকে ছুটিয়া চলিল, তখন বছির একবার তাহার গ্রামের দিকে চাহিল। তাহার পর একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল “করিম!”

(৫)

এই স্থানে আমরা বছিরের কথা বলিব। করিম বছিরকে মৃত মনে করিয়া জলে ভাসাইয়া দিয়াছিল; কিন্তু বছির মরে নাই। তীব্রবিষের জ্বালায় তাহাকে অজ্ঞান করিয়া ফেলিয়াছিল; করিম তাহা বুঝিতে পারে নাই; তাই সে বছিরের দেহ জলে ফেলিয়া দিয়াছিল!

ভগবান্ যাহাকে রক্ষা করিবেন, কেহ তাহাকে মারিতে পারে না। বাদার যে নদীতে করিম বছিরকে ফেলিয়া দিয়াছিল, সে নদীতে অসংখ্য কুম্ভীর। কুম্ভীরের ভয়ে কেহ জলে নামিয়া স্নান করিতে সাহস করে না। কিন্তু এই নদীর মধ্যে বছিরের দেহ কেহ স্পর্শ করিল না। বছিরের দেহ ভাসিতে ভাসিতে কিছু দূর যাইয়া একটা জঙ্গলে আট্‌কাইয়া গেল; একটা গাছের ডাল জলের মধ্যে নত হইয়াছিল, তাহাতেই বছিরের দেহ আট্‌কাইয়াছিল। ক্রমাগত জলের মধ্যে থাকিতে থাকিতে বছিরের শরীর শীতল হইতে লাগিল। তাহার প্রাণের বন্ধু করিম তাহাকে মারিয়া ফেলিবার জন্য যে বিষ-প্রদান করিয়াছিল, ক্রমাগত অনেকক্ষণ জলে থাকায় সে বিষের ক্রিয়া হইতে পারিল না। শীতল জল তাহার সর্ব্বাঙ্গে লাগাতে ক্রমে ক্রমে তাহার চৈতন্য সঞ্চার হইল। তখন সে চাহিয়া দেখে নদীতে ভাটা পড়িয়াছে। সে একটা গাছের ডালে বাঁধিয়া নদীতীরে কর্দ্দমের মধ্যে অর্দ্ধনিমগ্ন অবস্থায় পড়িয়া আছে। তৎক্ষণাৎ তাহার সকল কথা মনে পড়িল। আকাশে তখন চাঁদ

উঠিয়াছে; শুভ্রজ্যোৎস্না নদীর বক্ষে খেলা করিতেছে, নীল আকাশে চাঁদ হাসিতেছে।

বছির একবার উঠিবার চেষ্টা করিল; কিন্তু তাহার শরীর এমন অবশ হইয়াছিল যে, তাহার সে চেষ্টা ব্যর্থ হইল। সে তখন চুপ করিয়া পড়িয়া রহিল। একটু পরে আবার উঠিবার চেষ্টা করিল। এবার সে অতি কষ্টে বসিতে পারিল। কিন্তু তখনও তাহার মাথা ঘুরিতেছে, বিষ তাহাকে তখনও ছাড়ে নাই। সে তখন মাথায় হাত দিয়া বসিয়া রহিল। তাহার মনে তখন কি ভাবের উদয় হইয়াছিল, তাহা আর বলিতে হইবে না। একটু পরে সে দাঁড়াইবার চেষ্টা করিল; এবার তাহার চেষ্টা সফল হইল। গাছের ডালের উপর ভর দিয়া সে দাঁড়াইল। চারিদিকে চাহিয়া দেখিল; নদীর মধ্যে একখানি নৌকাও নাই, তীরে একখানি গ্রামও নাই। একদিকে নদী আর একদিকে জঙ্গল। তখন তাহার মনে হইল, যে এই সকল জঙ্গলে বড় বাঘের ভয়। উপরে উঠিলেই তাহাকে বাঘে লইয়া যাইবে। এই ভাবিয়া সে অতি কষ্টে নিকটবর্ত্তী একটা গাছে উঠিল। সে ইতঃপূর্ব্বে কত বড় বড় গাছে অনায়াসে উঠিয়াছে। কিন্তু আজ এই ছোট গাছে উঠিতেই তাহার কষ্ট হইতে লাগিল। অনেক কষ্টে সে গাছের উপর উঠিল। সেই কাদামাখা ভিজা কাপড়ই তাহার পরিধানে রহিল—তাহার সর্ব্বাঙ্গে কাদামাখাই রহিল। করিম যে তাহাকে একেবারে উলঙ্গ করিয়া ফেলিয়া দেয় নাই, ইহাই ভাল। সে তখন কোঁচার কাপড় খুলিয়া দেখিল কাপড়ের খুঁটে যে তিনটী টাকা বাঁধা ছিল তাহা তেমনই আছে। বাড়ী হইতে আসিবার সময় তাহার স্ত্রী তাহাকে এই তিনটী টাকা দিয়াছিল।

এই ভাবে রাত্রি কাটিয়া গেল। প্রাতঃকালে সে গাছ হইতে নামিয়া শরীরের কাদা ধুইয়া ফেলিল, কাপড়খানিও ধুইয়া লইল। তাহার পর তীরে উঠিয়া জঙ্গলের ভিতর দিয়া চলিতে লাগিল; সে কিন্তু নদীর তীর ছাড়িল না। এই ভাবে কিছু দূর যাইয়া সে একখানি গ্রামে উপস্থিত হইল। গ্রামের নাম রামচন্দ্রপুর, এখানে জমিদারের একটা কাছারী আছে এবং তাহারই নিকটে কয়েক ঘর প্রজার বাড়ী আছে। বছির ধীরে ধীরে সেই কাছারীতে উপস্থিত হইল। কাছারীর নায়েব মহাশয় বড় ভদ্রলোক, বড় দয়ালু। বছির তাহার সমস্ত কথা নায়েব মহাশয়কে বলিল। বছিরকে দেখিয়াই নায়েব মহাশয়ের মনে দয়ার সঞ্চার হইয়াছিল; এখন তাহার দুর্দ্দশার কথা শুনিয়া তিনি বড়ই কাতর হইলেন। বছিরের আহারাদির ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। বছির সেদিন সেই কাছারিতেই থাকিল।

পরদিন প্রাতঃকালে নায়েব মহাশয় বছিরকে বলিলেন "বছির, তোমার আর দেশে যাওয়া উচিত নহে। কাহার জন্য দেশে যাইবে? আমার মনে হয়, তোমার স্ত্রীও এই ষড়যন্ত্রের মধ্যে আছে; নতুবা করিম কি এমন কাজ করিতে পারে? এক ভাবনা তোমার মা। তা আমি লোক পাঠাইয়া তোমার মাকে এখানে আনাই। তারপর তোমাকে এখানে বাড়ী করিয়া দিব, লাঙ্গল, গরু, কিনিয়া দিব, ভাল দেখিয়া জমি দিব; তুমি চাষ আবাদ করিও। আবার ঘর সংসার করিও।"

বছির বলিল "বাবুজি, আপনি আমার বাপ। কিন্তু আমার মনে হয়, আমার পরিবার ইহার মধ্যে নাই; আমি বেশ বলিতে পারি. সে এ কাজের মধ্যে নেই। সে করিমের উপর ভারি চটা।"

নায়েব মহাশয় বলিলেন "তবে এক কাজ কর। আমি তোমার পথ খরচ দিচ্ছি। তুমি বাড়ী যাও; তারপর সব দেখে বুঝে যা ভাল হয় কোরো। এখানে আসা যদি মত হয়, তা হোলে এসো, আমি যা বোলেছি তা কোরে দেবো। তোমার শরীর ভাল নয়; দুচার দিন এখানে থাক; তারপর বাড়ী গেলেই হবে।"

বছির তাহাতেই সম্মত হইল। তাহার বাড়ী যাইবার ইচ্ছা প্রবল হইয়াছিল, কিন্তু রামচন্দ্রপুর হইতে আট ক্রোশ পথ গেলে তবে হরিণঘাটার বন্দরে গয়নার নৌকা পাওয়া যাইবে। আট ক্রোশ পথ চলিবার শক্তি এখনও তাহার হয় নাই। বছির অগত্যা আট দশ দিন রামচন্দ্রপুরেই থাকিল।

সারাদিন কি বসিয়া থাকা যায়। বছির একটু একটু এদিক ওদিক বেড়াইতে লাগিল। একদিন

অপরাহ্ন কালে সে একটা ছোট খালের পাশ দিয়া আসিতেছে, এমন সময় দেখিল একটা স্থানে কি একটা জিনিস মাটীর মধ্য হইতে একটু বাহির হইয়া রহিয়াছে। সে সেই জিনিষটার নিকট যাইয়া দেখে একটা পিতলের ঘটির মুখটা বাহির হইয়া রহিয়াছে; ঘটির মুখে একখানি পাথর চাপা রহিয়াছে। ঘটির পার্শ্বটা সুধু দেখা যাইতেছে। বছির তাড়াতাড়ি পাথরখানি সরাইয়া ফেলিল; এবং চারি পাশের মাটীও তুলিয়া ফেলিল। তাহার পর ঘটিটা তুলিয়া দেখে তাহার মধ্যে কতকগুলি টাকা রহিয়াছে।

বছির চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, কোথাও কেহ নাই। সে তখন ঐ ঘটিটা লইয়া কিছু দূরে একটা গাছের তলায় গেল এবং সেখানে একটা গর্ত্ত করিয়া ঘটিটা লুকাইয়া রাখিল; তাহার খরচের জন্য ত্রিশটা টাকা বাহির করিয়া লইল।

কাছারীতে আসিয়া সে ঐ টাকার কথা কাহাকেও বলিল না। কিন্তু সেই রাত্রিতেই নায়েব মহাশয়ের নিকট বাড়ী যাওয়ার প্রস্তাব করিল। নায়েব মহাশয় সম্মত হইলেন এবং তাহাকে দশটী টাকা দিলেন। বছির সে টাকা দশটী গ্রহণ করিল। মনে মনে স্থির করিল, ফিরিয়া আসিয়া নায়েব মহাশয়ের ধার শোধ করিবে।

পরদিন সে হরিণঘাটায় পৌছিল। ঘাটে অনুসন্ধান করিয়া জানিল যে, একজন কৃষক তাহার ডিঙ্গী নৌকা বিক্রয় করিবে। বছির সেই কৃষকের বাড়ীতে যাইয়া নৌকাখানি বাইশ টাকায় ক্রয় করিল। নৌকা ছোট বটে, কিন্তু প্রায় নূতন এবং যে যে দ্রব্যের দরকার নৌকায় সে সমস্তই আছে। সে একদিন হরিণঘাটাতেই থাকিল; সেখানে হাট বাজার করিল; যে যে দ্রব্যের আবশ্যক, সমস্ত নৌকায় তুলিয়া সে বাড়ী যাইবার জন্য যাত্রা করিল। ছোট নৌকা,—সে নিজেই চালাইয়া লইয়া যাইতে লাগিল, অন্য কাহাকেও সঙ্গে লইল না।

যে দিন বছিরের বাড়ীতে পূর্ব্বোক্ত ঘটনা হয়, সেই দিন সন্ধ্যার পর সে গ্রামের ঘাটে নৌকা বাঁধিল। ঘাটে অন্য কোন নৌকা ছিল না এবং নদীতীরে কাহারও বাড়ী ছিল না, রাত্রিকালে কেহ জল লইবার জন্যও নদীতে আসিল না; সুতরাং বছিরকে কেহই দেখিতে পাইল না।

বছির তখন ধীরে ধীরে বাড়ীর দিকে গেল; সহসা দেখা না দিয়া, কে কি করিতেছে, তাহা জানিবার জন্য তাহার ইচ্ছা হইল। তাহার স্ত্রীর প্রতি যে তাহার কোন সন্দেহ জন্মিয়াছিল তাহা নহে, কিন্তু একটু জানিয়া শুনিয়া আত্মপ্রকাশ করিবার ইচ্ছা তাহার মনে হইল।

সে যখন বাড়ীতে উপস্থিত হইল, তখন করিম তাহার মাতার সহিত কথা বলিতেছিল। বছির ঘরের পার্শ্বে থাকিয়া সমস্ত কথা শুনিল। তাহার স্ত্রীর কথা শুনিয়া তাহার মনে যে কি আনন্দ হইল, তাহা বর্ণনীয় নহে, কিন্তু করিমের আচরণে সে বড়ই ব্যথিত হইল। তাহার পর করিম যখন রাগ করিয়া বাহির হইয়া গেল, বছির তখন তাহার অনুসরণ করিল। তাহার পর যাহা যাহা হইয়াছিল, পাঠক তাহা পূর্ব্বেই অবগত হইয়াছেন। এই স্থানেই বছিরের কথা শেষ করিলাম।

(৬)

করিম সেই যে বছিরের বাড়ীতে বছিরের প্রেতাত্মা দেখিয়া দৌড়াইল, তাহার পর ১৫ দিন আর সে বিছানা হইতে উঠিল না। সেই রাত্রিতে বাড়ীতে গিয়াই তাহার ভয়ানক জ্বর হইল—একবারে অজ্ঞান। অজ্ঞান অবস্থায় সে বিড় বিড় করিয়া কি বলিত, কেহই তাহা বুঝিতে পারিত না। জ্বর ক্রমেই বাড়িতে লাগিল দেখিয়া, পাড়ার ছমির মণ্ডলকে ডাকিয়া আনা হইল; মণ্ডলের পো টোট্‌কা ব্যবস্থা করিল। জ্বর কখনও বাড়ে, কখনও কমে।

এদিকে উপরি উক্ত ব্যাপারের পরদিন বছিরের প্রতিবেশীরা সকলে দেখিল বছিরের বাড়ীতে কেহই নাই। ঘর খোলা পড়িয়া আছে, জিনিসপত্র যেখানে যেমন ছিল, তেমনই রহিয়াছে। গ্রামের মধ্যে ভারি আন্দোলন উপস্থিত হইল। কেহ বলিল "বউটা বুড়ীকে লইয়া তাহার বাপের বাড়ী চলিয়া গিয়াছে।" একজন তাহার প্রতিবাদ করিয়া বলিল "তা হোলে চোরের মত কাউকে কিছু না বোলে যাবে কেন? সব জিনিষপত্র

ফেলে যাবে কেন?" আর একজন বলিল "আরে আমি জানি ও বউটার স্বভাব ভাল নহে। বুড়ীকে নানাকথা বোলে বউটা কোথায় নিয়ে গেছে।" আর একজন বলিল "আমি ত ভেবেছিলাম করিম ঐ বউটাকে নিকা করিবে। তা কি না বউটা বেড়িয়ে গেল অদেষ্টে অনেক দুঃখ আছে।"

দুই দুইটা মানুষ কোথায় গেল, কোন সংবাদ নাই। গ্রামের পঞ্চায়েত কি স্থির থাকিতে পারে? সে থানায় খবর দিল। থানাওয়ালারা চৌকীদারকে জিনিযপত্র পাহাড়া দিতে হুকুম দিল। সপ্তাহ পরে বছিরের লোটা, থালা, ছেঁড়া কাঁথা ইত্যাদি থানায় যাইয়া জমা হইল।

এদিকে করিমের জ্বর ক্রমে কম হইতে লাগিল বটে, কিন্তু তাহার আর একটা উপসর্গ দেখা দিল। করিম কাহার সহিত কথা বলে না—তাহার মুখ দিয়া কেহ একটী কথাও বাহির করিতে পারে না। সে চুপ করিয়া পড়িয়া থাকে, আর মধ্যে মধ্যে চম্‌কিয়া উঠে; এদিক ওদিক চায়। আবার চুপ করিয়া পড়িয়া থাকে।

জ্বর সারিয়া গেল, শরীরেও বল হইল, কিন্তু করিম কথা বলে না। তখন গ্রামের দশ জন বিজ্ঞলোক বলিলেন, করিমের উপর পরীর দৃষ্টি হইয়াছে। তিন চারি জন ওঝা আসিল, অনেক জলপড়া দিল, অনেক ঝাড়া হইল; কিন্তু পরীটা করিমের স্কন্ধ হইতে নামিল না। ওঝারা জবাব দিয়া গেল "এ ভারি শক্ত পরী; শীঘ্র যাইতেছে না।"

কয়েকদিন এই ভাবেই গেল। করিম এখন পাগলের মত পথে পথে বেড়ায়। স্নান করে না, কেহ ধরিয়া লইয়া দুইটা খাইতে না দিলে, অনাহারে থাকে। সারাদিন কোন গাছতলায় পড়িয়া থাকে, সারারাত্রি মাঠে মাঠে পথে পথে নদার তীরে দৌড়াদৌড়ি করিয়া বেড়ায়। সকলেই তাহার আশা ত্যাগ করিয়াছে। সকলেই বলিয়াছে করিমের এ পাগলামির ঔষধ নাই।

এখন এক একদিন রাত্রিতে দূর মাঠের মধ্যে ভূমিশয্যায় পড়িয়া করিম এক একবার চীৎকার করিয়া বলে "করিম!"

অনেকদিন রাত্রিতে নদীর মধ্য হইতে মাঝিরা শুনিতে পায় কে যেন তীরে দাঁড়াইয়া ডাকিতেছে "করিম!"

করিম ঐ কথাটী ছাড়া আর কথা বলে না। দিনের বেলায় মোটেই কিছু বলে না। অন্ধকার রাত্রিতে এক এক সময় গ্রামের লোকে শুনিতে পায় পথের ধারে, মাঠের দিকে, নদীর তীরে শব্দ হইতেছে "করিম!"

(সমাপ্ত।)

শ্রীজলধর সেন।

আসামের মহাপুরুষীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়।

বঙ্গের জন সাধারণ আসাম প্রদেশের প্রকৃত তথ্য এখনও অতি অল্পই অবগত আছেন। আসামের মহাপুরুষীয় সম্প্রদায় বিষয়ে 'ধর্ম্মতত্ত্ব' নামক পত্রে কতিপয় প্রবন্ধ আজ ৩০।৩৫ বৎসর হইল প্রকাশিত হইয়াছিল—পরে উহা ৺ অক্ষয়কুমার দত্ত প্রণীত ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় প্রথমভাগে * চৈতন্য সম্প্রদায়ের শাখারূপে অন্তর্নিবিষ্ট হইয়াছে। মহাপুরুষীয় ধর্ম্মের এই বিবরণী এতাদৃশ ভ্রমপরিপূর্ণ যে ইহার সমালোচনা করিতে গেলে প্রত্যেক পংক্তিরই ভ্রম প্রদর্শন করিতে হয়। তাহার পরও দুই একখানি পত্রিকায় এতৎসম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছে কিন্তু সেগুলিও অসম্পূর্ণ।

মহাপুরুষীয় ধর্ম্ম সম্বন্ধে কিছু বলিবার পূর্ব্বে অতি প্রাচীনকাল হইতে আসামের প্রচলিত ধর্ম্ম সম্বন্ধে ধারাবাহিক বিবরণী প্রদান করিতে প্রয়াস করা যাইতেছে।

রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণাদিতে ভারতের এই পূর্ব্বোত্তরপ্রান্তস্থিত প্রদেশকে "প্রাগ্‌জ্যোতিষ" আখ্যায় সংজ্ঞিত হইতে দেখি। এবং বরাহরূপী ভগবানের

* ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় ১ম ভাগ, ২য় সংখ্যায় ২০৬ পৃঃ।

ঔরসে, পৃথিবীর গর্ভে সমুদ্ভূত নরকই এতৎপ্রদেশের পুরাণাদি সমুল্লেখিত প্রথম আর্য্য নরপতি।

দক্ষযজ্ঞে সতী প্রাণ ত্যাগ করিলে তদীয় দেহ বিষ্ণুচক্রে ছিন্ন হইয়া নানাস্থানে পতিত হয় এবং ঐ সমস্ত স্থানই মহাপীঠ রূপে পরিগণিত হইয়াছে। এই প্রদেশে সতীর যোনিমণ্ডল পতিত হওয়াতে কামাখ্যা মহাপীঠের উদ্ভব হইয়াছে। যেখানে শক্তি সেইখানেই শিব, তাই কামাখ্যার সঙ্গে সঙ্গে ভৈরব উমানন্দও এস্থানে বিরাজমান। *

ভগবান্ তাঁহার সন্তান নরককে কামাখ্যার প্রতি ভক্তিপরায়ণ হইতে উপদেশ দিয়াছিলেন। অতএব নারায়ণের পুত্র প্রাগ্‌জ্যোতিষের পুরাণোক্ত প্রথম নৃপতি শিব-শক্তিতে আস্থাবান্ ছিলেন, একথা অনুমান করা যায়।

প্রাগ্‌জ্যোতিষ রাজ্যের সমীপেই শোণিতপুর রাজ্য ছিল। আসামীয়া ভাষায় শোণিত অর্থাৎ রক্তকে 'তেজ' বলে, তাই বর্ত্তমানে শোণিতপুর "তেজপুর" আখ্যায় বিখ্যাত হইয়াছে। শোণিতপুরের পুরাণাদিপ্রসিদ্ধ রাজা 'বাণ' শিবভক্ত ছিলেন। আজিও বাণের স্থাপিত বলিয়া প্রসিদ্ধ মহাভৈরব তেজপুরে বর্ত্তমান। (তদীয় মন্দিরের চিত্র প্রদত্ত হইল)। "নন্দি সংহিতা" নামক একখানি প্রাচীন হস্তলিখিত সংস্কৃত গ্রন্থে আছে যে লৌহিত্যতীরে দ্বিতীয় বারাণসী স্থাপনার্থ বাণ বহু তপস্যা করিয়া প্রায় কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন; আজিও "বিশ্বনাথ" নামক স্থানে এই প্রাচ্য বারাণসীর স্মৃতিচিহ্ন বর্ত্তমান আছে। † যাহাহউক বাণের তপস্যা বৃথা হয় নাই; ভক্তাধীন ভোলানাথ "বাণেশ্বর" এই উপাধি গ্রহণ করিয়া ভক্তের নাম চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছেন। কিন্তু বাণ পরিশেষে হরি-হর যে একই আত্মা ইহা ভুলিয়া বিষ্ণুদ্বেষী হইয়া অসুর আখ্যা লাভ করেন; এবং কালিকাপুরাণে আছে যে এই বাণের সংসর্গে পড়িয়া নরকও অসুর হইয়া উঠেন। কিংবদন্তী আছে যে নরক কামাখ্যাকে বিবাহ করিবার জন্য ব্যাকুল হইলে দেবী তাঁহার সঙ্গে চুক্তি করিলেন, রাত্রির মধ্যে নীলাচল শিখরে তদীয় মন্দির নির্ম্মাণ পূর্ব্বক পর্ব্বতের পাদদেশ হইতে মন্দির পর্য্যন্ত উত্তম রাস্তা প্রস্তুত করাইয়া দিলে তিনি নরকের বাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন। নরক বিশ্বকর্ম্মার সাহায্যে রাত্রির মধ্যেই মন্দির ও পথ নির্ম্মাণ করাইয়া দিলেন কিন্তু দেবীর ইচ্ছায় ইতিমধ্যেই কুক্কুট-ধ্বনি শ্রুত হইল। রাত্রি প্রভাত হইয়াছে ভাবিয়া নরক কামাখ্যার পাণি-পীড়ন করিতে পারিলেন না। সে যাহা হউক রামায়ণ মহাভারতাদিতে নরকের উল্লেখ আছে কিন্তু কামাখ্যার উল্লেখ দেখা যায় না। ইহার কারণ এই যে, কালিকাপুরাণে উক্ত আছে বশিষ্ঠের অভিশাপে দেবী নরককে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন।

নরকের পর ভগদত্ত প্রাগ্‌জ্যোতিষাধিপত্য লাভ করেন। মহাভারতে রাজা ভগদত্ত এক বিশিষ্ট অধ্যায় অধিকার করিয়া রহিয়াছেন কিন্তু তাঁহার উপাস্য কি তাহা জানা যায় না। তৎপুত্র বজ্রদত্ত সম্বন্ধে বলবর্ম্মার তাম্র শাসনে আছে যে তিনি ঈশে অর্থাৎ মহাদেবে অমল-ভক্তি ছিলেন। *

শিব ও শক্তি বাগর্থের ন্যায় নিত্য-সম্পৃক্ত; যেখানে শৈব সেখানে শাক্তও থাকিবার কথা। তাই বাণ-রাজার কন্যা ঊষা চণ্ডিকার আরাধনা করিতেন—তেজপুরে আজিও তাঁহার মন্দির বিদ্যমান। কালিকা-পুরাণে আছে, নরক বিদর্ভরাজ-পুত্রীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। আসামের উত্তর-পূর্ব্ব প্রান্তে সদীয়ার নিকটে কুণ্ডিল নামক একটি নদী আসিয়া ব্রহ্মপুত্রে মিলিত হইয়াছে। ঐ কুণ্ডিলের তীরে আজিও একটি নগরীর ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়—কিংবদন্তী ইহারই নাম অনুসারে নদীর নাম কুণ্ডিন বা কুণ্ডিল হইয়াছে; এই কুণ্ডিল সেই বিদর্ভের রাজধানী। আজিও সেই অঞ্চলে চণ্ডিকার এক মন্দির বর্ত্তমান—ইহার অধুনাতন নাম তাম্রেশ্বরীর

* এতৎসহ কামাখ্যা মন্দিরের এবং উমানন্দাধ্যুষিত গৌহাটির সম্মুখস্থ দ্বীপখণ্ডের চিত্র প্রদত্ত হইল।

† সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা ১৭শ বর্ষ ১ম সংখ্যায় মল্লিখিত আসাম ভ্রমণ ১ম প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

* "...অভবদ্ভুবেঃ।
পতিরমলভক্তিরীশে যং প্রাহু র্বজ্রদত্ত ইতি কবয়ঃ॥"
বলবর্ম্মার তাম্রশাসন সাহিত্যপরিষদ পত্রিকা ১৩১৭—২য় সংখ্যা।

মন্দির। কিংবদন্তী এইরূপ যে এই মন্দিরে পূজা দিতে আসিয়া রুক্মিণী শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক অপহৃতা হইয়াছিলেন। এই কুণ্ডিল-বিদর্ভ যথার্থ কি না সেই আলোচনা এস্থলে নিষ্প্রয়োজন; কিন্তু এতদ্দ্বারা সূচিত হইতেছে যে স্মরণাতীত কাল হইতেই ভারতবর্ষের এই ভূখণ্ডে শিব ও শক্তির উপাসনা চলিয়া আসিতেছিল।

অতীতের সেই ঘনান্ধকারের মধ্যে হঠাৎ কিয়ৎক্ষণের জন্য একটি আলোক বর্ত্তিকা জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। চীন পরিব্রাজক য়ুয়ান চুয়াং খৃঃ সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভে ভারতবর্ষ পর্য্যটনে আসিয়া তাহার ভ্রমণ কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি "কামলুপে"ও আগমন করিয়াছিলেন; তাঁহার বর্ণনায় দেখা যায় যে "কামরূপ প্রদেশের লোকেরা দেবতার উপাসক ছিল; বৌদ্ধধর্ম্মে আস্থাবান্ ছিল না। এই প্রদেশে কোনও বৌদ্ধ মঠ ছিল না; যাহারা বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিল তাহারা গোপনে সাধন ভজন করিত। এই স্থানে শত শত দেবমন্দির ছিল। এবং নানা মতাবলম্বী সহস্র সহস্র লোক বাস করিত। নৃপতি বিদ্যোৎসাহী ছিলেন—দেশ বিদেশ হইতে সুযোগ্য ব্যক্তিগণ আসিয়া এখানে অধ্যয়ন করিতেন। রাজা বৌদ্ধ না হইলেও সুশিক্ষিত শ্রমণদিগের প্রতি সম্মাননা প্রদর্শন করিতেন।" এই বিবরণ হইতে দেখা যাইবে যে এ স্থানে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রসার লাভ করিতে পারে নাই। এবং নানা মতাবলম্বী লোক (এমন কি বৌদ্ধেরাও) একত্র নির্বিরোধে কালযাপন করিত।

কিন্তু রাজা কোন্ দেবতার আরাধনা করিতেন তাহা এই কাহিনী হইতে জানা যায় না। তদানীন্তন আর্য্যাবর্ত্তের সম্রাট হর্ষবর্দ্ধনের জীবনী অবলম্বনে বাণভট্ট "হর্ষচরিত" প্রণয়ন করিয়াছেন। তাহার সপ্তম উচ্ছ্বাসে কামরূপাধিপতি কুমার ভাস্করবর্ম্মার দূতমুখে হর্ষবর্দ্ধনের সম্ভাষণে স্পষ্ট আছে যে, ভাস্করবর্ম্মা স্থাণু অর্থাৎ মহাদেব ভিন্ন আর কাহারও নিকট মাথা নোয়াইতেন না। *

ইহার প্রায় দুই শতাব্দী পরে ভগবান শঙ্করাচার্য্য কামরূপে পদার্পণ করিয়াছিলেন। এখানে তিনি শাক্ত অভিনবগুপ্তকে বিচারে পরাভূত করিলে, ঐ ব্যক্তি তান্ত্রিক অভিচার ক্রিয়াদ্বারা তাহার দারুণ ভগন্দর রোগ জন্মাইয়াছিলেন। বহুদিন ক্লেশ ভোগ করিয়া আচার্য্য রোগের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন।

গৌহাটীতে দশভুজ (দিক্‌কর) মহাদেবের প্রস্তর খোদিত একটি বিশাল মূর্ত্তি ও একটি ক্ষুদ্রতর মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে; ঐ গুলি যে কোন্ সময়ের তাহা নির্ণয় করা কঠিন। আসামে অনেকগুলি তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে কিন্তু দুঃখের বিষয় কোনও শাসনেই সময় নির্দ্দেশক কিছু পাওয়া যায় না। বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতেরা অক্ষরাদি দর্শনে ঐ গুলিকে খ্রীষ্টীয় দশম হইতে দ্বাদশ শতাব্দীর বলিয়া অনুমান করেন। শাসন প্রদাতা নৃপতিগণ সকলেই নরক-ভগদত্তের বংশধর বলিয়া আপনাদিগকে খ্যাপিত করিয়াছেন। শাসনগুলির প্রারম্ভক শ্লোকে প্রায়শঃ মহাদেবেরই স্তোত্র আছে এবং সবটিতেই নরক-জনক নারায়ণের বরাহাবতারের বর্ণনা আছে। অতএব দেখা যায় শিব উপাস্য হইলেও বিষ্ণু উপেক্ষ্য ছিলেন না। আসাম-প্রত্নতত্ত্ব বিশারদ শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র গোস্বামী মহাশয় কর্ত্তৃক সম্প্রতি আবিষ্কৃত ধর্ম্মপালের একখানি তাম্রশাসনে দেখা যায় যে যাহাকে শাসন প্রদান করা হইয়াছে সেই মধুসূদন নামা ব্রাহ্মণ আশৈশব নারায়ণ-পূজন-পরায়ণ ছিলেন। *

এই শাসনটিতে ব্রাহ্মণাধ্যুষিত কামরূপের গ্রাম বিশেষের কি একটি সুন্দর চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে! যজ্ঞধূমে গগনমণ্ডল সমাচ্ছন্ন হইলে শিখিকুল মেঘভ্রমে বিভ্রান্ত হইয়া নৃত্য করিত—গঙ্গাযমুনা সঙ্গমোথ জল কল্লোলের ন্যায় ব্রাহ্মণগণের বেদধ্বনিতে সমগ্র স্থান

* অয়মত্র শৈশবাদারভ্য সংকল্পঃ স্থেয়ান্ স্থাণুপদারবিন্দদ্বয়াদৃতে নাহমন্যং নমস্কুর্য্যামিতি। হর্ষচরিতম্ সপ্তম উচ্ছ্বাসঃ।

* তাভ্যাং সুতঃ সকলবিপ্রকুলপ্রদীপঃ
শ্রীমান্ বভূব মধুসূদননামধেয়ঃ।
যো বাল্যতঃ প্রভৃতি মাধবপাদপদ্ম-
পূজাপ্রপঞ্চরচনাং রুচিরং চকার॥

মুখরিত হইয়া উঠিত। * কামরূপে যখন এই অবস্থা, তখন সন্নিকৃষ্ট গৌড় প্রদেশের অধিপতিগণ আপন রাজ্যে যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ না পাইয়া প্রদেশান্তর হইতে ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়াছিলেন!

কিন্তু হায় হঠাৎ কামরূপের এই মনোহারী সুস্নিগ্ধ সভ্যতালোক নির্ব্বাপিত হইল। এক ভীষণ বিপ্লবে দেশ এক প্রকার উলট পালট হইয়া গেল। কাছাড়ী, চুটিয়া, আহোম প্রভৃতি জাতিদের আক্রমণ উপদ্রবে আসাম প্রদেশ বিপর্য্যস্ত হইল। সুসভ্য জনপদবাসিগণ এই উপদ্রবে উৎসন্ন প্রায় হইয়া পড়িল। তিন শতাব্দীর হুলস্থূলের পর ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে ব্রহ্মপুত্রোপত্যকার পূর্ব্বাংশে আহোমগণের এবং পশ্চিমাংশে কোচরাজগণের অধিকার স্থাপিত হইল, ক্রমশঃ দেশে শান্তিসুশৃঙ্খলা ফিরিয়া আসিতে লাগিল। কোচ-রাজ্য-প্রতিষ্ঠাতা যোগিনীতন্ত্রমতে মহাদেবের ঔরসজাত বিশ্বসিংহ কর্ত্তৃক ৺ কামাখ্যা মহাপীঠের আবিষ্কার হইল ও কামাখ্যা মন্দির পুনর্নির্ম্মিত হইল; এবং দেবীর সেবা পূজার জন্য বঙ্গদেশ হইতে ব্রাহ্মণ আনীত হইয়া পুনশ্চ এতদ্দেশে শাক্ত ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা হইল। কিন্তু অচিরে কালাপাহাড় আসিয়া মন্দির ধ্বংশ করিবার পর বিশ্বসিংহের পুত্র রাজা নরনারায়ণ কামাখ্যার বর্ত্তমান মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দেন।

আহোমরাজগণ বৌদ্ধধর্ম্মাক্রান্ত ব্রহ্মদেশ হইতে আগমন করিলেও একপ্রকার জড়োপাসক ছিলেন; কিন্তু এখানে আসিয়া ক্রমশঃ এতদ্দেশের ধর্ম্মই গ্রহণ করিতে লাগিলেন। চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষভাগে আহোমরাজ সুদাংশ লক্ষ্মীনারায়ণ শালগ্রাম পূজন পূর্ব্বক সিংহাসনাধিষ্ঠিত হইলেন—তদবধি তাঁহারা পুরুষানুক্রমিক আচারের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু উচিত আচার ব্যবহার পালন করিতে আরম্ভ করিলেন। কোচরাজগণ যেমন শিব বংশীয় বলিয়া গৌরবান্বিত হইলেন—আহোমরাজগণও ইন্দ্রবংশীয় বলিয়া আপনাদিগকে খ্যাপন করিলেন।

এতক্ষণে আমরা মহাপুরুষীয় ধর্ম্মের বীজিপুরুষ মহাত্মা শঙ্করদেবের সময়ে আসিয়া পৌঁছিলাম। পূর্ব্বে যাহা উল্লেখিত হইল তাহা হইতে দেখা যাইবে যে শিব শক্তি ও বিষ্ণুর উপাসনা আবহমান কাল হইতে প্রচলিত হইয়া আসিতেছিল—সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য দেবতারও উপাসনা চলিত—তাই গণেশ * প্রভৃতির মূর্ত্তি নানাস্থানে পর্ব্বতগাত্রে খোদিত দেখা যায়। অতঃপর অসভ্য বা অর্দ্ধ সভ্য জাতিদের উপদ্রবে ধর্ম্মের অবস্থা শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল—বেদাধ্যায়ী যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ লুপ্তপ্রায় হইয়াছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে আহোম ও কোচরাজগণ হিন্দুধর্ম্মের পৃষ্ঠপোষক হইলেন বটে—কিন্তু পুনরভ্যুত্থিত ধর্ম্মের ক্ষীণ আলোক রশ্মি উচ্চস্তরের কিয়দংশ উদ্ভাসিত করিয়াই পর্য্যবসিত ছিল। মহাত্মা শঙ্করদেব যে ধর্ম্মান্দোলনের সূত্রপাত করিলেন তাহাই দেশের উচ্চ, মধ্য ও নিম্ন যাবতীয় স্তরে অনুস্যূত হইয়া সমগ্র আসাম ভূমি ধর্ম্মালোকে উজ্জ্বলীভূত করিয়াছে।

শঙ্করদেব ১৪৪৯ খৃষ্টাব্দে নৌগাঁ জেলার অন্তঃপাতী বড়দোয়া নামক স্থানে জন্ম পরিগ্রহ করেন। ইনি জাতিতে কায়স্থ ছিলেন; ইঁহার পূর্ব্বপুরুষীয়েরা কনৈজপুর নামক স্থান হইতে আসামে আসিয়া "ভুইয়াঁ" রূপে পরিচিত হন এবং সেই মহাবিপ্লবের যুগেও শৌর্য্যবীর্য্যে এবং পাণ্ডিত্যে এতদঞ্চলে বরেণ্য হইয়া অবস্থিতি করিতেছিলেন। শঙ্করদেব বাল্যে সংস্কৃত সাহিত্য ও পুরাণাদিতে শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। জীবনের প্রথমভাগেই তাঁহার ধর্ম্ম-প্রবণতা পরিলক্ষিত হইয়াছিল এবং তিনি তীর্থযাত্রোপলক্ষে সমগ্র ভারতবর্ষ পর্য্যটন

হোমধূমবলয়ে বিয়দ্গতে
যজ্বনাং ক্রতুষু কালিকাভ্রমাৎ।
যত্র ডম্বরসকাণ্ডতাণ্ডবে
তেনু রুগ্মুখশিখাঃ শিখণ্ডিনঃ॥

দ্বিজানাং সদ্ধর্ম্মপ্রণয়পথিকানামনুদিনং
ত্রিসন্ধ্যং স্নানার্থং প্রশমজপপাপক্ষয়কৃতাম্।
চতুর্ব্বেদী পাঠধ্বনি রভসু বাচালয়তি যদ্
যমী গঙ্গাসঙ্গোচ্ছলিতজলকল্লোলবহলঃ॥

* নীলাচলের পূর্ব্বদিকে নরকাসুরের পথ দিয়া উঠিবার সময় গণেশের একটি বিশাল মূর্ত্তি পাওয়া যায়—ইহার চিত্র প্রদত্ত হইল।

করিয়াছিলেন। সেই সময়ে ভারতবর্ষের প্রাচ্য, প্রতীচ্য ও দাক্ষিণাত্য প্রদেশে বৈষ্ণব ধর্ম্মের নবপ্ররোহ উদ্গত হইয়াছে, বঙ্গে মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য কমলাক্ষ ওরফে অদ্বৈতাচার্য্য ভাগবতের ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। সর্ব্বত্র বৈষ্ণব ধর্ম্মের এই নবজাগরণের ভাব প্রত্যক্ষ করিয়া শঙ্করদেব স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক ভাগবতের ধর্ম্ম প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন। জন সাধারণের মধ্যে প্রচার নিমিত্ত শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থ ভাষায় অনুবাদ করিলেন এবং নাম সংকীর্ত্তন প্রবর্ত্তন করিলেন। কায়স্থ শঙ্করদেব অভিনব উপায়ে ধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন, ইহাতে সমাজের ব্রাহ্মণ কেহ কেহ আপত্তি উঠাইলেন; কিন্তু শঙ্করদেব সর্ব্বদাই ব্রাহ্মণের প্রতি যথোচিত মর্য্যাদা প্রদর্শন করিতেন এবং তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্ম সম্বন্ধে শাস্ত্রীয়যুক্তি প্রয়োগ করিয়া প্রতিপক্ষকে নিরস্ত করিতেন। তখন ব্রাহ্মণের অবস্থা ঈদৃশ শোচনীয় ছিল যে কামাখ্যার তত্ত্বাবধানের নিমিত্ত ভিন্ন দেশ হইতে ব্রাহ্মণ আনাইতে হইয়াছিল। যাহাহউক শঙ্করদেবের দলে কয়েকজন ব্রাহ্মণও আসিয়া যোগ দিলেন; তন্মধ্যে দেব-দামোদরের নাম উল্লেখযোগ্য। কিন্তু যাঁহার নামে মহাপুরুষীয় ধর্ম্মের নামকরণ হইয়াছে, শঙ্করের সেই প্রিয় শিষ্য মহাপুরুষ মাধবদেবও কায়স্থ ছিলেন। মাধবদেবের পিতা বান্দুকা নামক স্থান হইতে আসামে আসেন। মাধব ১৪৮৯ খৃষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। শঙ্করের ন্যায় তিনিও বাল্যাবধি ধর্ম্মগতপ্রাণ ছিলেন এবং শাস্ত্রচর্চ্চাপরায়ণ ছিলেন। শাক্তধর্ম্ম তাঁহার কুলক্রমাগত ধর্ম্ম ছিল। কথিত আছে, একদা তিনি দেবতার নিকট ঘোড়া পাঠা মানস করিয়া বলি প্রদানে উদ্যত হইলে শঙ্করদেবের সঙ্গে তাঁহার বলিদান বিষয় নিয়া ঘোরতর তর্কবিতর্ক হয়; এবং অবশেষে বর্ষীয়ান্ শঙ্করদেবের নিকট তাঁহাকে পরাজয় স্বীকার করিয়া বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করিতে হইয়াছিল।

শঙ্কর ও মাধব প্রবল উৎসাহে ধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিলেন কিন্তু মাধবের শাক্তধর্ম্ম পরিত্যাগে অনেকে বিরক্ত হইয়া আহোমরাজের নিকট অভিযোগ উপস্থিত করিল। ধর্ম্ম বিষয়ে যদিও আহোমরাজ উদাসীন ছিলেন তথাপি অন্য এক কারণে শঙ্কর ও মাধবের প্রতি রাজা এতাদৃশ কুপিত হইয়া উঠিলেন যে তাঁহারা প্রাণ লইয়া কোনরূপে কোচরাজের অধিকার বড়পেটা নামক স্থানে আসিয়া উপনিবিষ্ট হইলেন। কালে দেব-দামোদরও সেই স্থানেই আসিয়া মিলিত হইলেন। তখন সকলে মিলিয়া পুনর্ব্বার তীর্থ ভ্রমণে বহির্গত হন। অতঃপর নিরাপদে ধর্ম্ম প্রচার চলিতে লাগিল। তিন শতাব্দী ব্যাপক উপদ্রবের পর লোকসাধারণ প্রবল পরাক্রান্ত রাজগণের অধীনে শান্তিতে বাস করিতেছিল, সুতরাং ধর্ম্মালোচনায় মনোনিবেশ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। দলে দলে লোক নাম-সংকীর্ত্তনের মাহাত্ম্যে আকৃষ্ট হইয়া বৈষ্ণব হইতে লাগিল। তখন রাজা নরনারায়ণ কোচ রাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন; তাঁহার দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ অনুজ ভ্রাতা শিলারায় সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন—তাঁহার সঙ্গে শঙ্করদেব আপন ভ্রাতুষ্পুত্রীর বিবাহ দিলেন। কিন্তু এখানেও শঙ্করদেবের প্রতিপক্ষ যুটিল। তাঁহারা নরনারায়ণের নিকট অভিযোগ উপস্থাপিত করিয়া বলিলেন যে শঙ্কর দেবের প্ররোচনায় লোকে কামাখ্যার প্রতি বিরাগ-ভাব প্রদর্শন করিতেছে। কামাখ্যা-ভক্ত কোচরাজ ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া শঙ্করদেবকে কোচবিহারে আহ্বান করিলেন। কিন্তু শঙ্কর দেবের অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও ধর্ম্মভাব দেখিয়া তিনি বিমুগ্ধ হইলেন। কথিত আছে যে রাজা নরনারায়ণ শঙ্করের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন; কিন্তু শঙ্কর ব্রাহ্মণ, রাজা ও স্ত্রীলোক এই তিনকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করিতে পরাঙ্মুখ ছিলেন; তাই রাজার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। যাহা হউক ইহাতে কোচবিহার পর্য্যন্ত শঙ্করের ধর্ম্ম প্রচারিত হইল; অপিচ, ইহার পর আর কেহ কোনও দিন তাঁহার ধর্ম্ম প্রচার কার্য্যে বাধা প্রদান করিতে সাহসী হয় নাই। এইরূপে নববৈষ্ণব ধর্ম্মের বীজ বপন ও প্রচার সাধন করিয়া মহাত্মা শঙ্করদেব পূর্ণ পুরুষায়ু উপভোগ করিয়া ১৫৬৮ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন।

শঙ্করদেবের ধর্ম্মমত সম্বন্ধে এস্থলে কিঞ্চিৎ সমালোচনা আবশ্যক। পূর্ব্বে যাহা আলোচিত হইয়াছে তদ্দ্বারা

এবং গৌহাটি সহরস্থিত পর্ব্বত-গাত্রে খোদিত অতি প্রাচীন বিশাল জনার্দ্দন মূর্ত্তির দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে পূর্ব্বেও ভগবান বিষ্ণুর পূজাদি হইত। তবে শঙ্কর দেবের নূতনত্ব এই যে তিনি ভাগবতোক্ত প্রেমভক্তি সহকারে একমাত্র নারায়ণকে উপাসনা করিতে উপদেশ দিতেন। তাঁহার গ্রন্থাদিতে নারায়ণের রাম, কৃষ্ণ প্রভৃতি নানা অবতারের স্তবস্তুতি দেখা যায় কিন্তু অন্য দেবদেবীও যে একমাত্র পরব্রহ্মেরই বিভিন্ন প্রকটন, আর্য্য ধর্ম্মের এই বিরাট ভাব তাঁহার প্রচারের বিষয়ীভূত ছিল না। অতি অল্পশিক্ষিত লোকদিগকে একনিষ্ঠ করিবার নিমিত্তই বোধ হয় তাঁহার যত্ন ছিল। ব্রাহ্মণেরা যে এই নিমিত্তই তাঁহার প্রতি বিদ্বেষের ভাব পোষণ করিতেন তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। যাহা হউক শঙ্করদেব ধর্ম্ম সাধনের পথ সুগম করিয়া দিয়াছিলেন। "হরের্ণাম হরের্ণাম হরের্ণামৈব কেবলম্। কলৌনাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥" শঙ্কর দেবের ইহাই মত ছিল। আসামে তখন উচ্চশ্রেণীর লোকসংখ্যা অতি কমই ছিল—সমাজের নিম্নতর স্তরে ধর্ম্ম সাধনের জটিলতর বিধান গুলি প্রায় পৌঁছিত না। মহাত্মা শঙ্করদেবের এই সরল বিধান ঐ সকল শ্রেণীর লোকেরা সুতরাং সাদরে গ্রহণ করিতে লাগিল। কেবল তাহাই নহে; আসামের মানচিত্র দেখিলে বুঝা যাইবে ইহার এক পশ্চিমদিক ব্যতীত সমস্ত দিকে কি বিশাল পর্ব্বত শ্রেণী রহিয়াছে; ঐ সকলে অসংখ্য পার্ব্বত্য জাতির বাস—এমন কি পৃথিবীর কুত্রাপি এইরূপ অল্পপরিসর স্থানে এত বিভিন্ন জাতির বসতি আছে কি না সন্দেহ। শঙ্করদেবের বৈষ্ণব ধর্ম্ম সহজ সাধ্য অথচ কীর্ত্তনাদি সঙ্গীতের মধুর রসে অভিষিক্ত। তাই পার্ব্বত্য জাতীয়েরাও আসিয়া এই নব প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের "শরণ" লইতে লাগিল। ইহাতে তাহাদের বিলক্ষণ লাভ হইয়া থাকে। প্রথমতঃ 'শরণ' লইবামাত্রই ইহাদের কাছাড়ী, মিকির প্রভৃতি অসভ্য পার্ব্বত্য জাতিসূচক নাম ঘুচিয়া, "শরণীয়া" নাম হয়। তৎপরে দুই এক পুরুষ গেলে কোচ সংজ্ঞা হয়। তখন ইহাদের জল উচ্চবর্ণের ব্যবহার্য্য হইয়া থাকে। ঈদৃশ প্রথা প্রবর্ত্তিত হওয়াতে লাভ এই হইয়াছে যে আসামে মুসলমান বা খৃষ্টানের সংখ্যা অনেকটা কম। শঙ্করদেব এইরূপে ভাগবতের ধর্ম্ম আসামে প্রচার করিলেন। বঙ্গদেশে সপার্ষদ মহাপ্রভু চৈতন্য ঠিক্ সেই সময়েই নামকীর্ত্তন প্রচার করিতেছিলেন। তাই অনেকে মনে করেন যে শঙ্করদেবের ধর্ম্ম চৈতন্যদেবেরই ধর্ম্মের ছায়ামাত্র। উভয়েরই ভাগবতাদি বৈষ্ণব শাস্ত্র অবলম্বন হওয়াতে এই সাদৃশ্য ঘটিয়াছে এবং সারগ্রাহী শঙ্কর তীর্থ পর্য্যটনোপলক্ষে বঙ্গ প্রদেশে গিয়া তদানীন্তন বৈষ্ণবাচর্য্যাদির ধর্ম্ম ব্যাখ্যায় যে উপকৃত হন নাই, একথাও বলা যায় না; কিন্তু একটিমাত্র বিষয়ই শঙ্কর ও চৈতন্যের ধর্ম্মের সমূহ পার্থক্য প্রদর্শন করিতেছে—সেইটি শ্রীমতী রাধার মাধুর্য্য ভাব; ইহা শঙ্করদেবের ধর্ম্মে স্থান লাভ করে নাই। ইহাতে আসাম প্রদেশের জন সাধারণ অপূর্ব্ব এক রসাস্বাদ হইতে বঞ্চিত হইয়াছে সন্দেহ নাই; কিন্তু বঙ্গদেশের "নেড়ানেড়ির" কথা মনে করিলে বোধ হয় যে আসামের মঙ্গলার্থেই শঙ্করদেব শ্রীরাধাকে এখানে আনয়ন করেন নাই; একেই আসামের নিম্ন জাতীয়দের মধ্যে বিবাহ-বন্ধন অনেকটা শিথিল, ইহাতে আবার পরকীয়া-রসের আমদানী হইলে মহাবিভ্রাট ঘটিত। শঙ্করদেব স্ত্রীলোকদের গৃহস্থাশ্রম ত্যাগের ব্যবস্থাও দেন নাই।

মহাত্মাদের পরস্পর তুলনা করা—কে ছোট কে বড় বলা সঙ্গত নহে; তবে ততদূর না গিয়া শঙ্কর ও চৈতন্য দেবের জীবনীর সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা বোধ হয় মার্জ্জনীয় হইবে। শঙ্করদেব বিবাহিত গৃহস্থ ছিলেন, দার-বিয়োগেও সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করেন নাই। চৈতন্যদেব দার সত্তেও সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়াছিলেন। শঙ্করদেব কেবল ধর্ম্ম মতের প্রবর্ত্তক নহেন, অপিচ স্বয়ং ধর্ম্মগ্রন্থানুবাদ দ্বারা অভিনয়ার্থে পৌরাণিক উপাখ্যান অবলম্বনে ভাওনা অর্থাৎ নাটক রচনা দ্বারা, কীর্ত্তনার্থে ঘোষা (ধূঁয়া) সমন্বিত পদাবলী প্রস্তুত করিয়া এবং (বঙ্গের আখড়ার ন্যায়) সত্রাদি প্রতিষ্ঠা করিয়া যাহাতে তৎ প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম সমাজে বদ্ধমূল হইয়া প্রচারিত হয় তাহার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। চৈতন্যদেব "হরি হরয়ে নমঃ, কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ" বলিয়া নাম

সংকীর্ত্তনের বীজ বপন করিয়াছেন বটে, কিন্তু স্বয়ং তৎ প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের প্রচার ও প্রসারের ব্যবস্থার জন্য তাদৃশ যত্ন করেন নাই—অবসরও পান নাই; সর্ব্বদাই নামরস পানে মত্ত থাকিতেন। শঙ্কর গৃহস্থ এবং কায়স্থ ছিলেন; অতিশয় দীর্ঘজীবন লাভ করিয়াছিলেন এবং তীর্থ-ভ্রমণাদি দ্বারা বিশেষ অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়া একরূপ প্রৌঢ় বয়সে স্বীয় ধর্ম্মমত প্রচার করিয়াছিলেন। তাই তৎপ্রচারিত মত সমাজের সাধারণ লোকের দ্বারা যতটুকু গ্রহণীয় হইতে পারে তাহাই ছিল। তাঁহার প্রিয় শিষ্য মাধবদেব বিবাহ করিবেন না এই পণ করাতে শঙ্কর তাঁহার প্রতি বিরক্ত হইয়াছিলেন। এদিকে মহাপ্রভু চৈতন্যদেব সন্ন্যাসী এবং ব্রাহ্মণ, স্বভাবতঃই বিষয়ানভিজ্ঞ; অতি অল্প বয়সে ধর্ম্মপ্রচার করেন। রায় রামানন্দসংবাদে তিনি তাঁহার ধর্ম্মমত রামানন্দের মুখে খ্যাপিত করিয়াছেন—তাহা এত উচ্চ যে আমরা ক্ষুদ্র সাংসারিক জীব তাহা অনুসরণ করিতে গিয়া স্খলিতপাদ হইয়া পড়ি। মহাপ্রভু তাহা বুঝিয়াই নিত্যানন্দপ্রভুর দণ্ড ভাঙ্গিয়া তাঁহাকে গৃহী করিয়া তন্মুখে "মৎস্যের ঝোল, যুবতীর কোল, মনের আনন্দে হরি হরি বোল" প্রচার করাইয়া ধর্ম্মটিকে গৃহস্থ-সাধারণ সুলভ করিয়া ছিলেন।

অপিচ শঙ্কর-জীবনীতে এরূপ কুত্রাপি দেখা যায় না যে শঙ্কর কীর্ত্তনোপলক্ষে বাহ্যজ্ঞান রহিত হইয়া ভূম্যবলুণ্ঠিত হইয়াছিলেন—কিন্তু মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের এই "দশার" কথা বলাই বাহুল্য। ফল হইয়াছে "যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ"—বঙ্গীয় বৈষ্ণবের যেরূপ "দশা" লাগে আসামীয় ভকতের তাহা হয় না। ফলকথা মহাপ্রভু ভক্তিরস আস্বাদনের জন্য—শ্রীরাধার ঋণ পরিশোধের জন্য আসিয়াছিলেন; ধর্ম্ম প্রচারের জন্য নয়; তাঁহার মহৎ জীবন অনুকরণের জিনিস নহে—তবে "হনুকরণ" (aping) স্বতন্ত্র কথা। শঙ্করদেব আদর্শ ধর্ম্ম প্রচারক; স্বয়ং যে আচারানুষ্ঠান দেখাইয়া গিয়াছেন তাহা আজিও সম্যক্ অনুকরণযোগ্য আদর্শ হইয়া রহিয়াছে।

বঙ্গের বৈষ্ণবেরা সাধারণতঃ মাছ খায় কিন্তু মাংস খায় না৻ আসামে মাছ মাংস উভয়ই চলে, তবে গৃহপালিত পশুর মাংস সচরাচর ভক্ষ্য নহে এবং রক্তপাত করিয়া প্রাণি বধ করিবার বিধি নাই—লগুড়াঘাতে বা ঘাড় মচকাইয়া মারা হয়।

চিরাবিবাহিত মাধবদেবের অনুকরণে একরূপ অবিবাহিত বৈষ্ণব আছে ইহাদিগকে "কেবলীয়া ভকত" বলে। ইহারা বঙ্গীয় বৈরাগীর ন্যায়; কিন্তু বৈরাগীরা মরিলে গোর দেওয়া হয় এবং বৈদিক শ্রাদ্ধ হয় না। কিন্তু কেবলীয়া ভকতদের শব দাহ করা হয় এবং যথাবিধি শ্রাদ্ধ হইয়া থাকে।

চৈতন্যদেবের মতানুবর্ত্তিরা তাঁহাকে যে চক্ষে দেখিয়া থাকেন, শঙ্করদেবের ধর্ম্মাবলম্বিরা তাঁহাকে তেমন দেখেন বলিয়া বোধ হয় না। যদিও শঙ্করদেব তাহাদের নিকট ঈশ্বরাবতার, তথাপি ইষ্টমন্ত্রদাতা গুরুকে আমরা যেরূপ ঈশ্বর মনে করি শঙ্করদেবও যেন তাদৃশ সম্মানই লাভ করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ কি শ্রীরামের জন্ম তিথিতে যেমন উপাসনাদি হয়, বঙ্গীয় বৈষ্ণবগণ শ্রীচৈতন্যের জন্মতিথিতেও সেইরূপ করিয়া থাকেন। কিন্তু শঙ্করদেবের মৃত্যুতিথি কীর্ত্তনাদি অনুষ্ঠান দ্বারা প্রতিপালিত হয়, যেমন আমরা পিতৃপুরুষের "তিথি" মানি। শ্রীচৈতন্যের মন্ত্র আছে—"গৌর" নাম জপিত হইয়া থাকে—শঙ্করের তাদৃশ মাহাত্ম্য স্বীকৃত হয় নাই।

শঙ্করের মৃত্যুর পর তাঁহার ধর্ম্ম দুইটি প্রধান সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া পড়ে। কথিত আছে ব্রাহ্মণ দেবদামোদর শঙ্করের অন্ত্যেষ্টি সময়ে স্বয়ং উপস্থিত না হওয়ায় মাধবদেব তাঁহাকে কিঞ্চিৎ তিরস্কার করেন, ইহাতে দামোদরের সম্প্রদায় পৃথক হইয়া দামোদরীয় (বা বামুণীয়া) নামে অভিহিত হইয়াছে। এবং মাধবদেব মহাপুরুষ নামে পরিচিত হওয়ায় তাঁহার অনুবর্ত্তিরা মহাপুরুষীয় এই নামে আখ্যাত হইয়াছে। এই দুই দলে প্রতিযোগিতা থাকিলেও পরস্পরের মধ্যে বিবাহাদি দ্বারা সামাজিক সম্পর্ক থাকায় ইহাদের পার্থক্য খুব কম। তবে মহাপুরুষীয়েরা একটু গোঁড়া বৈষ্ণব—বিষ্ণু এবং তাহার অবতার ভিন্ন অন্য দেবতার প্রতি তাকানও অন্যায় মনে করে, এমন কি বসন্ত রোগাধিষ্ঠাত্রী দেবতা শীতলাকে

ডাকিয়া আনিতে হয় বলিয়া মহাপুরুষীয়েরা "টিকা" দেয় না। ব্রাহ্মণ দামোদরের সম্প্রদায়ের লোকেরা প্রায়শঃ একটু উচ্চতর শ্রেণীর হওয়াতে উহাদের উদারতা অধিক, শক্তির নিকট বলি দিতে পর্য্যন্ত উহাদের আপত্তি দেখা যায় না। দামোদরীয়গণ ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য কোনও জাতীয় লোক হইতে মন্ত্র গ্রহণ করে না, কিন্তু মহাপুরুষীয়দের মধ্যে কোনও কোনও স্থানে শূদ্রেরাও নিম্ন জাতীয় দিগকে মন্ত্র দিয়া থাকে।*

মহাপুরুষীয় ধর্ম্মের সঙ্গে বঙ্গের বৈষ্ণব ধর্ম্মের যে যে বিষয়ে পার্থক্য তাহা প্রদর্শিত হইল। অন্যান্য বিষয়ে উভয়েরই খুব সৌসাদৃশ্য রহিয়াছে। বঙ্গে যেমন আখড়া, মোহান্ত, বৈষ্ণব, বৈরাগী প্রভৃতি আছে এখানেও "সত্র," "অধিকার," "ভকত," "কেওলীয়া-ভকত" প্রভৃতি আছে। তবে এখানে প্রত্যেক সত্রেই কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তির উপর নির্দ্দিষ্ট কাজ আছে। সত্রের অবস্থানুসারে ঐরূপ কর্ম্মচারীর পদের ও সংখ্যার তারতম্য পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। নিম্নে প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীর নাম ও কর্ত্তব্য নির্দ্দেশিত হইল।

অধিকার—সত্রের ইনি সর্ব্বময় প্রভু। সত্রের যত গ্রামাদি আছে ঐসকলের অধিবাসিদিগকে অধিকার মন্ত্রদিয়া থাকেন। এই কার্য্যের সহায়তার জন্য তাঁহার নীচে একজন ডেকা (যুব) অধিকার থাকেন। অধিকারকে সত্রীয়াও বলে। "সমূহভকত" অর্থাৎ সত্রস্থিত বৈষ্ণব সাধারণের সভা হইতেও অধিকার কার্য্য পরিচালনে সহায়তা পাইয়া থাকেন।

বুড়া ভকত—সত্রে যে সকল "ভকত" বাস করিয়া থাকে তাহাদিগের ইহারা শিক্ষাগুরু।

ভাগতী ও পাঠক—ভাগতী বা ভাগবতী শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থ পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন এবং পাঠক ভাষায় ধর্ম্মোপদেশক গ্রন্থ পাঠ করিয়া থাকেন।

পূজারি—প্রায় প্রতি সত্রেই শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ স্থাপিত আছে ইহার পূজা করা পূজারির কাজ।

ভড়ালী—ইহা ভাণ্ডারী শব্দের অপভ্রংশ; ভাণ্ডার রক্ষণই ইহার কাজ। নানা প্রকারের ভড়ালী আছে, যথা ধন ভড়ালী, ধান ভড়ালী ইত্যাদি।

মেধি—প্রধান প্রধান সত্রের শাখাগুলিতে মেধিরাই অধিকারের স্থলবর্ত্তী। কিন্তু মেধিরা সত্রের শিষ্যদের কাছ হইতে কর গ্রহণের কার্য্য করিয়া থাকেন।

কীর্ত্তন ব্যাপারে গায়ন (গীত কর্ত্তা) বায়ন (বাদক) নামলওয়া (যাহারা ধূঁয়া ধরাইয়া দেয়) ইত্যাদি নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তি আছে। এইরূপ ভাওনা অর্থাৎ নাটক ব্যাপারেও নির্দ্দিষ্ট সূত্রধারী (সূত্রধার) নিযুক্ত থাকে।

এই সত্রগুলির ব্যয় নির্ব্বাহার্থ স্থাবর জমি জমা আছে; আবার শিষ্যগণ হইতে বার্ষিক অর্থও আদায় হইয়া থাকে। সামাজিক অপরাধের বিচারও সত্রেই হইয়া থাকে—তদ্ব্যবস্থার জন্য বাগীশ (পণ্ডিত) নিযুক্ত থাকেন। অপরাধানুসারে অর্থদণ্ড হইয়া থাকে; উহাও সত্রের একটা আয়ের পথ। এতদ্ব্যতীত "সেবা জানানী," "বিয়া দনীয়া" প্রভৃতি বাবদও অনেক আয় হয়; কেহ মরিলে শ্রাদ্ধের সময় যে উপঢৌকন সত্রে যায় ইহার নাম "সেবা জানানী," অর্থাৎ মৃতের তরফে সত্রের নিকট ভক্তি বিজ্ঞাপন; বিবাহ কালে প্রেরিত উপঢৌকনের নাম "বিয়া দনীয়া"।

* মহাপুরুষীয় ও দামোদরীয় ব্যতীতও আসামে অন্য বৈষ্ণব সম্প্রদায় আছে; গোপালদেব ও হরিদেব নামক শঙ্কর মতানুবর্ত্তী অপর দুই ব্যক্তি নূতন সম্প্রদায় প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন—তবে বর্ত্তমানে গোপালদেবের সম্প্রদায় মহাপুরুষীয়গণের এবং হরিদেব পন্থিরা দামোদরীয়গণের সঙ্গে প্রায় অভিন্ন হইয়া পড়িতেছে। এখানে চৈতন্য পন্থী বৈষ্ণবও আছে—এইটা দ্বারাও মহাপুরুষীয়-গণ চৈতন্য সম্প্রদায়ের শাখা নহে তাহাই প্রমাণিত হয়। "রাতিখোয়া ভকত' নামে একদল আছে ইহারা অনেকটা বঙ্গের সহজীয়াদের ন্যায়। এতদ্ব্যতীত—"মোয়ামরীয়া" নামক এক সম্প্রদায় আছে; ইহাদের বিবরণীও উল্লেখযোগ্য। কথিত আছে যে অনিরুদ্ধ নামে শঙ্করদেবের একজন শিষ্য এই সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। মহাপুরুষীয়গণ ইহাদিগকে আপন সম্প্রদায়ভুক্ত মনে করে না। কেননা ইহাদের আচার বিচার বড় কম। মোয়ামারা নামক সরের নাম হইতে এই সম্প্রদায়ের নামকরণ হইয়াছে। খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইহারা আহোমরাজ কর্ত্তৃক উপদ্রুত হইয়া বিদ্রোহী হইয়া উঠে—তাহার ফলে আহোম রাজ-শক্তির অধঃপতন ঘটে। মহাপুরুষীয়াদের ন্যায় ইহাদেরও ন (অর্থাৎ নব) ঘোষাদি গ্রন্থ আছে—ঐ গুলি শঙ্করদেবের অনুকরণে প্রাগুক্ত অনিরুদ্ধের প্রণীত বলিয়া কথিত হয়।

মহাপুরুষীয় সত্রের মধ্যে বড়পেটাস্থ মাধবদেবের সত্রই সর্ব্ব প্রধান। শঙ্করদেবের জন্মভূমি নৌগাঁ, বড়-দোয়া (বটদ্রবা), কামরূপের সুন্দরদীয়া, শিবসাগরের কমলা বাড়ীতে এই সম্প্রদায়ের প্রসিদ্ধ সত্র আছে। কিন্তু আসামের সর্ব্বাপেক্ষা প্রভাবশীল সত্র দামোদরীয় সম্প্রদায়ের আউনি আটি, দক্ষিণপাট, গড়মুর ও কুরুয়াবাহী; শিবসাগরের অন্তর্গত ব্রহ্মপুত্রের একটি চরে এই চারিটি সত্রই অবস্থিত। মহাপুরুষীয় (এবং দামোদরীয়) সম্প্রদায় আসামোপত্যকার সর্ব্বত্রই আছে; আসামের বহির্ভাগে কেবল কোচবিহারই দেখিতে পাওয়া যায়। বিগত ১৯০১ সনের লোক সংখ্যায় আসাম উপত্যকায় ২৬ লক্ষ লোক মধ্যে ১৯ লক্ষ হিন্দু; তন্মধ্যে ১৩ লক্ষ বৈষ্ণবেয়, ৪ লক্ষ মহাপুরুষীয়—বাকী প্রায় সমস্তই দামোদরীয়। *

সাহেবেরা মহাপুরুষীয়দের কথা লিখিতে গিয়া প্রায়শঃ বলেন যে, ইহাদের মধ্যে মূর্ত্তি পূজা নাই এবং জাতি ভেদের বন্ধন অতি শিথিল। এতদ্বিষয়ে দুই চারিটি প্রয়োজনীয় কথা বলিয়াই এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

ইতি পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে প্রায় প্রত্যেক সত্রেই শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ স্থাপিত আছে এবং সেবা পূজার্থ পূজারি ব্রাহ্মণ নিযুক্ত রহিয়াছে। মহাপুরুষীয় সত্রগুলিতে প্রায়শঃ শঙ্করদেবের পদচিহ্নও আছে—উহাও পূজিত হইয়া থাকে।

কেহ মনে করিতে পারেন যে বর্ত্তমান মহাপুরুষীয়গণ যাহাই করুক না কেন শঙ্করদেব ও মাধবদেব মূর্ত্তি পূজার ব্যবস্থা করেন নাই। তাই শঙ্করদেব ও মাধবদেব লিখিত গ্রন্থ হইতে তাঁহাদের স্বীয় মত উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

রামায়ণের আদিকাণ্ডের প্রারম্ভে মাধবদেব লিখিয়াছেন :—

"একে ব্রহ্ম আসি চারিমূর্ত্তি অবতরি।
হরিলা ভূমির ভার রাক্ষস সংহারি॥
ব্রহ্মা আদি দেবর সাধিলা প্রয়োজন।
প্রণামো সাদরে হেন রামর চরণ॥"

ইহা হইতে দেখা যাইবে যে, যাহা মূর্ত্তিপূজার বীজ অর্থাৎ অবতার-বাদ, তাহা স্বীকৃত হইয়াছে।

তৎপর শঙ্করদেব কীর্ত্তনঘোষায় তাঁহার শিষ্য সম্প্রদায়কে উদ্দেশ্য করিয়া নারায়ণের ধ্যান কিরূপে করিতে হইবে, বলিতেছেন।

"স্থির বুদ্ধি করি ভকত জনে।"
প্রত্যেক অঙ্গক চিন্তিব মনে॥
চরণপদ্ম দেখি সুখী হুই।
অরুণ অতি পদতল দুই॥ ১৫।
অঙ্কুশ পদ্ম ধ্বজ বজ্র যব।
দেখি চিহ্ন তাতে মিলে উৎসব॥
চরণ পঙ্কজ আছে প্রকাশি।
অঙ্গুলী পান্তি (ক) তার তৈল পাখি (খ)॥

* * * * *

নাভি সরোরুহ রুচির কান্তি।
হৃদয়ে প্রকাশে শ্রীবৎস পান্তি॥
উরঃস্থলে লক্ষ্মী দিনন্ত দেখা।
কষ্টিত যেন সোণার রেখা॥ ১৬১
চারু চতুর্ভুজ শোভে সুঠাম।
ললিত বলিত নীল যোলাম॥
কেয়ুর কঙ্কণ বলয়া তাত।
প্রকাশ নব কিশলয় হাত॥ ১৬৪।

* * * * *

হেন মনোহর রূপ নিরীক্ষি।
থাকিব সমস্ত অঙ্গক দেখি॥ ১৭১।"

তর্ক হইতে পারে যে ইহাতে 'মানস' ধ্যান আছে বটে, কিন্তু বাহ্যমূর্ত্তি পূজার কোন কথা নাই। তদুত্তরে

* এই কামাখ্যাধ্যুষিত প্রদেশে শাক্তের সংখ্যা মাত্র ৩ লক্ষ; কিন্তু ধনে মানে পদপদার্থে শাক্তেরাই শ্রেষ্ঠ। আহোমরাজগণ শাক্ত ছিলেন—তাঁহাদের প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীরাও শাক্তই ছিলেন। আহোম-আকবর রাজা রুদ্রসিংহ নদীয়া শান্তিপুর হইতে কৃষ্ণরাম ভট্টাচার্য্য নামক একজন শাক্ত সাধককে আসামে আনেন; রাজপরিবারের গুরু হইয়া তিনি নীলাচলে অবস্থান করেন। তাঁহারই বংশধরগণ আজিও 'পর্ব্বতীয়া গোসাই' নামে আসাম-প্রদেশে সম্মানিত।

(ক) পান্তি—পংক্তি।

(খ) পাখি—দল, পাপড়ি

বক্তব্য এই যে শঙ্করদেবের জীবনীতে আছে যে তিনি শ্রীজগন্নাথদেবের বিগ্রহ আপন জন্মভূমিতে মহাসমারোহে ব্রাহ্মণদ্বারা সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। তাঁহার লিখিত "উরেষা" (উড়িষ্যা) বর্ণনে আছে :—

"উত্তরার্ক দক্ষিণার্ক দিনা চিত্তো নরে।
রাম কৃষ্ণ সুভদ্রাক দেখন্ত সাদরে॥
প্রণাম করন্ত পড়ি হুয়া শুদ্ধমতি।
সিয়ো বিষ্ণু লোকক আনন্দে করে গতি॥ ২৩০:
ফাল্গুনীত গোবিন্দক তুলিয়া দোলত।
দোলযাত্রা করে মহোৎসব শিবেলাত॥
তাক গোবিন্দক যত্নে দেখে যিতো জনে।
গোবিন্দর পুরে শিবয়া বঞ্চে রঙ্গমনে॥ ২৩০২
* * * * *
জগন্নাথ নামর মহিমা কৈবো কত।
মহা প্রসাদর আবে (ক) শুনিয়া মহত্ত্ব॥
যতফল পাবে যজ্ঞ হোম তপদানে।
যেন ফল পাবে তুলা পুরুষ প্রদানে॥ ২৩১৪
যেন ফল লভে ভুঞ্জাই ব্রাহ্মণ কোটিক।
পাবে মহা প্রসাদ ভক্ষণে ততোধিক॥
পিতৃ শ্রাদ্ধ দিলা আনি বিষ্ণুর অন্নক।
ভক্তি ভাবে দেয় তাক পিতৃক দেবক॥ ২৩১৫
* * * * *
নাহি কাল নিয়ম ব্রতত দোষ নাই।
পাইলে মাত্রে খাবে অন্ন তেবে মোক্ষ পাই॥
হৃদয়ত রূপ হরিনাম যার মুখে
বিষ্ণুর নৈবেদ্য উদরত ভরে সুখে॥ ২৩১৯
পাদোদক নির্ম্মাল্য সমস্তো থাকে যার।
বোলা হরি হরি সেই বিষ্ণু অবতার॥
ভণিল শঙ্করে কৃষ্ণে চরণত ধরি।
পাতক ছাড়োক ডাকি বোলা হরি হরি॥ ২৩২০"

মূর্ত্তিপূজাদির ইহা অপেক্ষা স্পষ্ট প্রমাণ আর কিছু আছে কি? তার পর জাতি বিচারের কথা। এতদ্বিষয়ে বঙ্গীয় বৈষ্ণব অপেক্ষাও মহাপুরুষীয়গণ (দামোদরীয় গণেরও কথাই নাই) সমধিক শাস্ত্রানুগত। শঙ্কর দেব মহাত্মা হইয়াও ব্রাহ্মণকে মন্ত্র দেন নাই। অপিচ ব্রাহ্মণ দেবদামোদর কর্ত্তৃক তাঁহার পরিবারস্থ সকলকে মন্ত্র দীক্ষা দেওয়াইয়া ছিলেন। গৃহস্থ শঙ্করদেব অপেক্ষা অবিবাহিত মাধবদেব এতদ্বিষয়ে একটু শিথিল ছিলেন বোধ হয়; * তিনি মহাপুরুষীয়গণের কেন্দ্রস্থান বড়পেটা সত্রের কর্ত্তৃত্ব কায়স্থ জাতীয় অবিবাহিত "আতা" গণের হস্তে সমর্পণ করিয়া যান। কিন্তু যখন তাঁহার নিযুক্ত শেষ "আতার" মৃত্যু হইল তখন সমস্ত মহাপুরুষীয় সমাজ কর্ত্তৃক এক বাক্যে স্থিরীকৃত হইল যে শঙ্করদেবের পুরোহিত রাম রাম গুরুর বংশধর বড়পেটার সত্রাধিকার হইবেন, তদবধি সেই বংশের ব্রাহ্মণেরা পুরুষানুক্রমে অধিকার হইয়া আসিতেছেন। এমন সত্র কমই আছে যাহাতে ব্রাহ্মণেতর অধিকার আছে এবং শুনা যায় যে তৎস্থলেও বিগ্রহ পূজা এবং ব্রাহ্মণকে মন্ত্রদান ব্রাহ্মণের দ্বারাই হইয়া থাকে। এতদপেক্ষা জাতি বিচারের প্রমাণ আর কি হইতে পারে?

ইতিপূর্ব্বে কেবলীয়া ভকতগণের প্রসঙ্গতঃ দেখান হইয়াছে যে যেখানে বঙ্গীয় বৈষ্ণবগণ মহোৎসব মাত্র করিয়া ক্ষান্ত হয়, সেইরূপ স্থলে মহাপুরুষীয়গণ কীর্ত্তনাদি ব্যতীত সনাতন পদ্ধতিতে শ্রাদ্ধ শান্তির অনুষ্ঠানও করিয়া থাকে।

ফলতঃ শঙ্করদেব ও মাধবদেব উভয়েই শাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন, শাস্ত্র গ্রন্থাদির অনুবাদ করিয়া সাধারণ্যে বিষ্ণু ভক্তির প্রচার করিয়া ছিলেন। কোনও রূপ শাস্ত্র বিগর্হিত কার্য্যের প্রশ্রয় তাঁহারা দেন নাই। বরং অনেক অনেক বিষয়ে তাঁহাদের সমকালে প্রবর্ত্তিত চৈতন্য সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব অপেক্ষাও যে তাঁহাদের মতানুবর্ত্তিগণ সুষ্ঠুতর শাস্ত্রাচারের অনুষ্ঠান করিতেছে ইহাই প্রতীত হয়।

শ্রীপদ্মনাথ দেবশর্ম্মা।

(ক) আবে—এবে, এখন।

* এতদ্বিষয়ে মাধবদেবও বেশ সাবধান ছিলেন। কেননা তদীয় নাম ঘোষায় আছেঃ—

"অবিরক্ত ভকতর বেদ লঙ্ঘিবাক দোষ
জানিবাহা ইহাক নিশ্চয়।
পরম বিরক্ত যিতো কৃষ্ণর ভকত হৈল
তার একো নাহিকে নির্ণয়॥ ৫৯৬"

বাস্তবিক সংসার ত্যাগী বৈরাগী বা সন্ন্যাসী সর্ব্বত্রই বেদ-বিধির অতীত।

খনা। *

পিতার আদেশ পুণ্য অশেষ
পালনে,
ভাবিল মিহির, পুত্র সুধীর,
পরাণে;
জাগিল প্রিয়ার প্রিয়মুখ-ছবি,
সে যে গো তাহার স্বর্গ শশী রবি,
সাধনা সিদ্ধি যাহা কিছু স'বি
জীবনে,—
অর্থ, কর্ম্ম, মোক্ষ, ধর্ম্ম
মরণে!
সে যে বীণাপাণি বিদ্যা-রূপিণী
শ্রেয়সী,
গৃহেতে কমলা শুচি-নির্ম্মলা
মানসী,
উজ্জয়িনীর সে যে রত্ন খনি,—
নব রত্নের সে যে শিরোমণি
জ্ঞানে বিজ্ঞানে ভুবনেরে জিনি
ধন্যা,—
সে যে সিংহল মুখ উজ্জ্বল
কন্যা!
"ডাকিনী সে বধূ নহে ওরে শুধু,
পুত্র
পলকে যেজন ছেড়েছে স্বজন
মিত্র,
বিশ্বাস তারে কোরো না কখন"
কহেন বরাহ "সে পারে হনন
করিতে যে প্রিয় তাহারো জীবন—
জান কি?
এ লোক-শাস্ত্র জ্ঞানের অস্ত্র
মান কি?"
মুদি দুই আঁখি দেবতারে ডাকি
কাতরে
কহিল মিহির "দাও মোরে তীর
পাথারে!
পিতৃ-আজ্ঞা করিতে হনন
অর্দ্ধাঙ্গিনী, কণ্ঠ-ভূষণ!
কাটিতে জিহ্বা—বাণীর আসন—
বসুধা—
আমার এ পাপে হবে না কি তাপে
শতধা!"
হেরিয়া মৌন সহে না গৌণ
মিহিরে
কহেন বরাহ "কহ পুত্র কহ,
তিমিরে
ডুবাবে কি তব বংশ-গরিমা
ডুবাবে কি তব পিতৃ-মহিমা
ক্ষুদ্র এক নারী সে কি তোর ভূমা-
নন্দ?
পিতা আমি তোর লাগালি যে মোর

* খনার কাহিনী এদেশে সুপরিচিত। তত্রাচ সাধারণের বোধসৌকর্য্যার্থে সামান্য একটু পরিচয় দেওয়া গেল খনা সিংহল রাজার কন্যা ছিলেন। উজ্জয়িনী তখন বিক্রমাদিত্যের রাজসভাস্থিত নবরত্নের আলোকে সমুজ্জ্বল। বরাহ এই নবরত্নের এক রত্ন; কিন্তু নিজের বেলায় তাঁহার সে পাণ্ডিত্য কোন ফল প্রসব করিল না; শত বর্ষজীবী পুত্রের দশ দিবস কাল পরমায়ু স্থির করিয়া তিনি তাহাকে নদীতরঙ্গে ভাসাইয়া দেন। সিংহল রাজ সেই ভাসমান শিশুকে পালন করেন ও কন্যা খনার সহিত বিবাহ দেন। বিবাহের পর খনা মিহিরকে শ্বশুরের ভুল গণনা বুঝাইয়া দিয়া তাঁহার সহিত উজ্জয়িনীতে গমন করেন। বরাহের অক্ষুণ্ণ যশোভাতি খনার অতুলনীয় প্রতিভার কাছে ম্লান হইয়া যাইতে লাগিল, অবশেষে একদিন খনা যখন বরাহকে তাহার একটি ভুল গণনা দেখাইয়া দিয়া রাজ সভায় যশস্বিনী হইয়া উঠিলেন; তখন বরাহ তাহা অসহ্য বোধে পুত্রকে বধূর জিহ্বা কর্ত্তন করিতে আদেশ দিলেন। মিহির পিতার আজ্ঞা পালন করিলেন, এবং খনার তাহাতেই মৃত্যু হইল।

সাধারণতঃ এই কাহিনীই প্রচলিত, ইহার মধ্যে ঐতিহাসিক সত্য কতটা আছে তাহা ঠিক্ বলা যায় না।

অদ্রি-সমান কত না প্রমাণ
আনিয়া
বরাহ তনয়ে দিলেন বুঝায়ে
কহিয়া—
"গৃহের মাঝারে নারীর কর্ম্ম,
জ্যোতিঃশাস্ত্রে কি তার ধর্ম্ম
সভার মাঝারে বিচারি মর্ম্ম
কবে সে ?
একি আতঙ্ক কুলে কলঙ্ক
হবে সে !"
বিদ্বেষ অনলে হৃদয়েতে জ্বলে
বরাহ,
অখণ্ডিত যশ হবে নারীবশ —
অসহ !
দুর্বোধ দুর্গম খগোল-গণনা,
ভুবন মাঝারে কেহ যা জানে না,
কেমনে এমনে করে সে খ্যাপনা
পলকে,
ডাকিনী সে বধূ জানে ইহা শুধু
কুহকে !
"তুমি গুরু-পিতা, নহে ত বনিতা
উচ্চ
তোমা হতে ভবে হোক্ তাই তবে
তুচ্ছ—"
কহিল মিহির "মানিনু যা আর"
ঘুচিল পিতার হৃদয়ের ভার
কহেন "যোগ্য পুত্র আমার—
তুষ্টা
সর্ব্বনাশিনী সে বধূ ডাকিনী
নষ্টা !"
স্মরি হৃষীকেশ স্নান করি শেষ
প্রভাতে,
করিছেন খনা দেব অর্চ্চনা,
ভূমিতে
লুটায়ে পড়েছে কালো কুন্তল
নিশির তিমির বীচি-চঞ্চল
শ্যাম শৈবালে রক্তোৎপল
মরি কি !
মুদিত অক্ষি রয়েছে লক্ষি
পিনাকী !
চমকিল ধীর- চিত্ত মিহির
হেরি সে
অচপল জ্যোতি দেবীর মুরতি,
আবেশে
উঠিল তাহার হৃদয় ভরিয়া,
নয়নে অশ্রু আসিল ছাইয়া
শাণিত ছুরিকা ধিক্কার দিয়া,
ধূলাতে
দিল দূরে ফেলি, দাব দাহে গলি
প্রাণেতে ;
শ্বশুরের বাণী গণনায় জানি
আপনি
খনা কন হাসি "স্বামী তব দাসী
অধিনী
সময় আমার হইয়াছে শেষ
করিবার কিছু নাহি অবশেষ
রাখ প্রিয়তম পিতার আদেশ—
মিথ্যা——?
নারিবে স্বকরে করিতে আমারে
হত্যা ?
জানিনি জীবনে তোমা ছাড়া মনে
ধর্ম্ম
যাহা কিছু মোর তুমি তার ডোর
মর্ম্ম ;
পিতা তিনি গুরু দেবতা তোমার,
কণ্টক সম রব আমি তাঁর ?
খ্যাতি মম তাঁরে করিবে আঁধার-
গ্রস্ত ?
হবে কি মিহির উজ্জয়িনীর
অস্ত ?

ওঠ, বাঁধ বুক এই মম সুখ,
জীবনে
দিয়াছিনু প্রাণ, দিনু দেহ দান
মরণে ;
ইহ পরকাল দিছি পায় যাঁর
সিদ্ধি আমার সাধনা আমার
লহ এ জিহ্বা—এই শেষ-সার
আহুতি
দিনু প্রিয়তম আজি শেষ মম
আরতি !

শ্রীআমোদিনী ঘোষ।

মধুর পবন

কোথা হতে এস তুমি মধুর পবন ?
কার আজ্ঞামত আসি, পরশ কেশের রাশি,
অশরীরী দেহে দেহ কর পরশন।
পলকে আবার কোথা কর পলায়ন ?

২

যে স্থানে যে গীত তুমি করহ শ্রবণ,
তাহাই বহিয়া আনি, মুগ্ধ কর যত প্রাণী,
কোথায় নিঃশেষ তব, কোথায় জনম ?

৩

উচ্চপাহাড়ের শির হিমানী প্রধান,
শ্বেত প্রস্তরের স্তূপ, দুগ্ধফেণ-নিভ রূপ,
প্রবেশি তাহার মাঝে ঠাণ্ডা কর প্রাণ,

৪

বজ্রের পতন তুমি কর অনুভব,
ভূমিকম্পে ধরা যবে, সঘনে কম্পিত হবে,
সে কম্পনো অনুভব কর তুমি সব।

হে সমীর !
সিন্ধু পার হয়ে যবে যাও,
খুলিয়া তরল প্রাণ, তালমান-হীন গান,
প্রতিলম্ফে প্রতিঝম্পে অবিরত গাও।

৬

বসন্তের সদ্য ফোটা পুষ্পের কেয়ারী,
যখন পরশ কর, তখনও মনোহর,
সুরে ও বেসুরে গান গাও প্রাণ ভরি।

৭

অল্প অন্ধকারাবৃত বন-ভূমি দিয়া
যখন বহিয়া যাও তখনও গান গাও,
সে গীতে নিস্তব্ধ ছায়া উঠে শিহরিয়া।

৮

রসাল তরুর শিরে পাখীর বাসায়
অথবা শ্মশানে যথা, ছাইমাখা তৃণলতা,
যাও যথা চিতা-ধৌত মরানদী ধায়।

৯

তোমার পরশে বায়ু! কাননে প্রান্তরে,
চমকে জন্তুর দল, জল করে কোলাহল,
তোমারি পরশে বারি বাষ্পরূপে উড়ে।

অম্বুজাসুন্দরী দাস গুপ্তা

শুভ দিবা।

যে দিন তোমার মোহন মূরতি
নয়ন সমুখে হাসে,
সে দিন আমার সুন্দর ধরণী
কত মধুময় পুলক বরণী
কত সুধাময় এত জ্যোতিঃ ঢালি
আঁধার তিমির নাশে।

তীব্র-রবির দীপ্ত-কিরণ
আলোক ছটায় নীলিম গগন
উজ্জ্বল করে ফুটায় প্রভাতে
হাসায় আমার প্রাণ।
সন্ধ্যাকাশে জাগে শুভ্র-শশধর
স্ফুটতর ওই নক্ষত্র অম্বর
মধুর পঞ্চমে কুঞ্জে কুঞ্জে ধরে
বিহগ বিহগী তান।
হৃদয়ের যত যাতনা লুকায়;
নব বলে আশা সমুখে দাঁড়ায়,
প্রেম সরলতা বিশ্বে শোভা পায়
ছলা মলা সব নাশে।
তোমার পবিত্র পুণ্য-পরশ,
জাগায় চিত্তের বাসনা হরষ,
আকুল হৃদয় বিভল হইয়া
মুখ পানে চেয়ে হাসে।

বিভাবতী সেন

সরস্বতী।

(১)
ভারত গৌরব কথা গাহি কলতানে,
বহিত প্রাচীন কালে নদী সরস্বতী,
উভতীরে দাঁড়াইয়া যবে আর্য্যগণে
সামগানে দেবতার করিতেন স্তুতি।

(২)
সময়ে, সলিল রাশি নিরমল অতি—
জননীর শুন্য গেল শুকাইয়া;
আর্য্যগণ মিলি এক গড়িলা মূরতি,
পূজিবারে ভকতির পুষ্পাঞ্জলি দিয়া।

(৩)
শুভ্রবর্ণ ছিল জল ব'লে আর্য্যগণ,
শুভ্রমূর্ত্তি রূপে দেবী করিয়া কল্পনা,
তটিনীর রাজহংস করিলা বাহন,
বেদগান ঝঙ্কারিতে হাতে দিলা বীণা॥

শ্রীহেমন্তচন্দ্র চৌধুরী।
শেরপুর, ময়মনসিংহ।

আদালতীয় বাংলার নালিশ।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ বরাবরেষু।

দরখাস্ত কারিণী ফিদবী শ্রীবঙ্গভাষিণী * দেব্যা জওজে নাস্তি, পিতা অজ্ঞাত, মাতা ৺ সমাস্কৃত ওরফে স্যাংস্কৃট্

............বাদিণী।

বনাম

উকীলের মুহুরী, মোক্তারের মুন্সী, দলিল দস্তাবেজ মুসাবিদা লেখক বর্গ, যাহাদের কলম বঙ্গসংসারে পনের আনা রাজত্ব করিতেছে

.........মূল বিবাদীগণ।

আদালতে অর্থী প্রত্যর্থীদের সহচর, অনুচর ও পার্শ্বচর তাবেদার উমেদার কারপরদাজ গয়রহ

.........মোকাবিলা বিবাদীগণ।

বাদিণী সবিনয় পূর্ব্বক দস্তবস্তা আরজী করিতেছেনঃ—

১। বাদিণী ফিলহাল যে রকম দুরাবস্থায় উকীল মোক্তারের সেরেস্তায় ও আদালত প্রাঙ্গণের বট বৃক্ষ তলায় গরীবিনী বেশে পতিতা আছেন, নিতান্ত দুরাদৃষ্ট ক্রমে তাহা সাহিত্যিকগণের এতক নজর, মন যোগ বা আদৌ গ্রাহ্য যোগ্য হইল না! গরীব-পরওার মহারাজা ও মহিমাবর সদস্যগণ বাদিণীর দুরাবস্থা ও দুরাদৃষ্ট আকার দৃষ্টেই বিলকুল মালুম করিতে পারিবেন। তত্রাচ নিম্নদফায় বাদিণীর বদ-নসীব, আহওয়াল ও আফ্‌সোসের নমুনা হুজুর আদালতে বিদিত হইবেক।

২। বাদিণী ও তাঁহার প্রীতিনিধি (প্রতিনিধি) ভগিনী শ্রী ত্রৈলক্য তারিণী দেব্যা জওজে মৃত কালী-চৈতন্য ভটচাজ মহামহোমূর্খোপাধ্যায় সাকিন নবদ্বীপ হাং সাং হুতোমি নয়াচর ষ্টেশন রাজাগঞ্জ জিলে খোলা নিবেদন এই, পরগণে বঙ্গসাহী মোতালক ইং ১১৫০ নং বঙ্গ-

* বঙ্গভাষা শব্দের স্ত্রীত্ব নিশ্চিত্ত বোধার্থে "বঙ্গভাষিণী"। cf শ্যামরস "রসিকিনী," চাণ্ডকিনী, রজকিনী &c.

ওয়ালা * তাম্বক (তালুক) গীতাগবিন্দ নামাকরণে পত্তন হইয়া যাহা অত্র কালেক্টরী সেরেস্তায় ১০১৲ সদর জমায় নিয়ত আছে তন্মধ্যে চর ফুলিয়া ও সিঙ্গি বনামে বিদ্যাপতি ঠাদর (ঠাকুর) ও রামী রজকিনী দাস্যা + কিসমত নাম্নুর মধ্যে কাশীরাম দাস ঘটারাম (মুচীরাম) দাস প্রভৃতি অন্য জমি সামিল ষোল আনা রকমে ।/৬॥/ ক্রান্তি হিস্যা দেহায় ॥/ দুই কড়া দুই ক্রান্তি অংশে বিন্দাবন দাস, ছিদাম দাস, দীগাম্বর বৈষ্ণব, বীশাম্বর ঠাকুর ও তাহাদের আলাহিদা থাকা পিসার দূর সম্পর্কীয় ভ্রাতা ভারতচন্দ্র রায় তুল্যাংশে মালিক দখিলকার থাকিয়া উক্ত ভারতচন্দ্র অভাব হইলে তৎস্থলে তাহার কন্যা বিদ্যাসুন্দরা দেব্যা হইতে এজমালি অংশে উক্ত তালুকের সওয়ায় থানাবাড়ী ।২॥ কড়া হিস্যা খরিদ হইয়া খারিজ থাকা ।১॥ কড়া অংশে বাদিনী ডিক্রিজারী মূলে নীলাম সূত্রে এক কড়া আড়াই তিল মোয়াজি ২৫ বিঘা জমি আদালত হইতে লম্বরী পদাতিক যোগে ঢোল সহরতে ঝাণ্ডাগাড়ি করিয়া দখল লইলে তৎবাদে ও তৎপূর্ব্বে পৃতিনিধি ভগ্নির পিতা জীবমানে অত্র সহরা ঞ্চলের এলাকাধীন উর্দ্দু বাজার নিবাসী ৺মৌলবী হোসেন শা মিঞার নিকাহিতা স্ত্রী রূপজান বিবি ও তস্য ভাই বিরাদর মারফৎ বহুতর সরিকানগণ বরাবর আপোষ নিষ্পত্য ক্রমে তাহাদের পৈত্রিক ও মাতামৈহিক সত্ব দখলীয় অংশ খোস-কবালা, কট-কবালা ও হেবা সূত্রে যথা সময়ে নামজারী করনান্তর ভোগদখীলকার থাকিয়া পিতা মজকুর মৃত্যু হন গতিকে তদাভাবে দরখাস্ত কারিণী তাঁহার ও অন্যান্যের স্থাবরা স্থাবর মুসল্লম ত্যজ্য সম্পত্তি বিল ঝিল পাহাড় গোরাট বৃক্ষ ময় পুষ্করিনি বীরসিং, সাগর দাঁড়ি, কাটাস পাড়া, চুপী চৌবেরায়া, পানিসেহালা, ঠাকুর বাড়ী, গুজরা, ভরাকর প্রভৃতি যাবতীয় তামাম তালুক মুলুকে পৌত্র পুত্রাদিক্রমে পরম সুখে ভোগ তদ্রূপের নির্ভুর হক মূলে একমাত্রা সাবালিকা ওয়ারিশী কন্যা বর্ত্তমানা থাকিয়া কথঞ্চিৎ কাল পরে স্বজ্ঞানে সুস্থ-শরীরে খোস মেজাজে আমি দাতা উপরুক্ত রূপজানবিবি গৃহীত বরাবর ফাজিল অকেজো দেড় ক্রান্তি * অংশের ওয়াপশ ও হেবা পত্র সম্পাদন কালীন মুগ্ধ প্রতিপক্ষের বোধার্থে এক জিল্দ ব্যাকরণ সরিফ তাহাদের হাতে দিতে গেলে বিবাদীগণ অন্যায় ও দুর্ল্লোভের বশবর্ত্তী হইয়া শত্রু পক্ষের কুমন্ত্রণায় ষড়যন্ত্রে ও যোগাযোগে বাদিনীর বহুকালীয় সত্বদখলীয় খামার-জমিতে অনধিকার প্রবেশের বিষম দুরাশায় ও কুমতলবে শঠতা ও তঞ্চকতা ক্রমে বহুতর মিথ্যা ও যোগসাজসী বদনামী দলিলাৎ সৃজন করিয়া ও করাইয়া কল্পিত বায়ার সাহার্য্যে নানা অজুহাতে বেসুমারী মামলা মোকদ্দমা দায়ের করিয়া খরচান্ত ও জেরবার কন্নায় দরখাস্তকারিনী অসহনীয় অবস্থায় আর কোন মতেই খাতিরজমা থাকিতে না পারিয়া গত ১৩০১ সনের ১৭ই বৈশাখে একখণ্ড নারাজী আর্জ্জি দ্বারায় মোজাহেম হইলে এ পক্ষের সঙ্গত আপত্য স্বপক্ষে নিষ্পত্য হইয়া প্রতিপক্ষের অলীক ও না-হক দাবী দাওয়া একদম গ্রাহ্য যোগ্য নহে কিম্বা তাহাদের কালে কস্মিনেও হরগেঞ্জ আমল দখল ছিল না, হইতে পারে না ও নাই ইত্যাদি সুবিবেচনা ও তজবিজ মূলে খয়েরখাহ্ জজ ও জুরি বাহাদুরগণ যুক্তি ও মৌলক চিন্তা পূর্ন রায় প্রকাশ করিলে এবং ঐ ফয়সালা প্রচলিত ন্যায়বিধি আইন কানুন শাস্ত্র ও সরা এবং ইকুইটি অনুসারে মায় খর্চ্চাসহ ষোলআনা বহাল বজায় থাকা স্বত্তেও বাদিনী নেহাৎ গরীব পিতৃ মাতৃহীন অভিভাবক শূন্য বেওয়া স্ত্রীয়ালোক এবং প্রতিপক্ষীয় বিবাদ-পরায়ণ বিবাদীগণ অনেকেই অল্পবিদ্যাশীল ভয়ঙ্করী অতি দুর্দ্দান্ত ও জবরদস্ত প্রকৃতির মামলাবাজ বিধায় উহাদের অষ্টক্ষণ কাইজ্যা কচায়ণ ও নানা জুলুমে সর্ব্বদা সশঙ্কিত ও দারুণ মনোকষ্টে মৃত্যুবৎ

* এই "বঙ্গ-ওয়ালা" শব্দ হইতেই বাঙ্গালা, বাঙ্গলা, বাংলা, বাঙ্‌লা (যাহার যেরূপ খুসি) শব্দের উৎপত্তি।

+ কর্ত্তৃকারকে দেব্যা স্থলে দেবী লিখিতে বোধ হয় „দেব-" দের আপত্তি হইবে না। দাসেরা অনুমেয় কারণে "দাশ" বানান সৃষ্টি করিয়াছেন; সুতরাং দাস্যা স্থলে দাশী লিখিলেই গোল চুকিয়া যাইতে পারে। যথা হরিদাশী, কালিদাশী ইত্যাদি দাশগুপ্তেরা কি বলেন ?

* কেবল দেড়ক্রান্তি কেন, বর্ত্তমান বঙ্গভাষা হইতে উর্দ্দু শব্দের ২০গণ্ডা অংশই বাদ দেওয়া চলিতে পারে।

ম্রিয়মান ও কম্পমান হয়রাণ-পেরেসান-লবেজান অবস্থায় কোন মতে সতে কালাতিপাত হইতেছে।

৩। অত্র মোকদ্দমার আসল অবস্থা এহি যে বাদিনী প্রতিপক্ষের বে-আইনি বেদাড়া ও নৈতান্তিক খাম-খেয়ালী কার্য্যতায় ও অসহনীয় জুলুমে হরেক রকম মাজরায় জড়িত হইয়া হামেশা আদালতে নাস্তানাবুদ কাবু শরীরে যাতায়াত প্রযুক্ত সহরে অনাশ্রয়ে আসিয়া প্রতি রোজ দুইসন্ধ্যা বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণের খিচুড়ি ভক্ষণ করিতে করিতে জাতীচ্যুত অবস্থায় যাওয়া-দশাপন্ন বীমার হইয়া শয্যাগত কাতর আছেন, কখন কি হয় বলা যায় না।

৪। অতএব প্রার্থীৎ যে হুজুর আদালত আর কাল-বিলম্ব না করিয়া ত্বরাত্বরি * উচিৎ ও নেহ্য প্রেমাণাদি গৃহণে এবং বিবাদী সেরেস্তার সমস্ত কাগজাত ও নথি তলবান্তে দৃষ্টে প্রতিপক্ষের অনেহ্য আমলদখল রদ ও নামঞ্জুর করতঃ তর্কিত জমিতে অস্নাত অবস্থায় উহাদের প্রবেশে স্থায়ী নিষেধাজ্ঞা প্রচার পূর্ব্বক জামীন মুচ-লিকাবদ্ধ ও গুরুতর দণ্ডের আদেশ প্রদান করিয়া সুবিচার করিতে আজ্ঞা হয়। † সে মতে প্রার্থনা, আদেশ হউক যেঃ—

(ক) প্রতিপক্ষের যদি কেহ কর্ত্তার ক্রিয়াকর্ম্ম অবহেলা করিয়া অসমাপিকা ক্রিয়ার শ্রাদ্ধোৎসবে মত্ত থাকে; এবং ঐরূপ মত্ত অবস্থায় থাকিয়া, যদি কেহ যথেচ্ছভাবে বহুরূপী ভেজাল ও বিকৃত শব্দের অনর্গল সাহায্যে, হনূমান-পুচ্ছের লজ্জা ও অনুবাদকের মূর্চ্ছা উৎপাদন পূর্ব্বক দাঁড়ি-কমা-বিবর্জ্জিত সুদীর্ঘ দুর্ব্বোধ্য জটিল বাক্য স্তূপীকৃত করিতে রহে; তবে মাতৃ-ভাষার হত্যা জন্য "জ্ঞানকৃত বধ" অপরাধে তৎক্ষণাৎ সেই উচ্ছৃঙ্খল হ্রস্বদীর্ঘ বোধশূন্য শৌচাসৌচ-জ্ঞান-বিহীন দুরাচারকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া নিকটতম বৃক্ষের উচ্চতম শাখায় গলবন্ধন পূর্ব্বক দোদুল্যমান রাখিতে হইবেক, যাবৎ তাহার দেহ-পিঞ্জর হইতে প্রাণ-পাখী আকাশে উড্ডীয়মান না হয়।

(খ) বেদখলের মোদ্দতের ওয়াশীলাৎ ময়সুদ ও বাদিনীর যাবতীয় আদালত ব্যয় দিতে প্রতিপক্ষ বাধ্য হইবে।

(গ) ন্যায় ও ইকুইটীমতে আদালত অন্য যে প্রতীকার সঙ্গত বোধ করেন, প্রতিবাদীগণ তাহাতে দায়ী থাকিবে।

(সত্যতা আছে)।

শ্রীমতী বঙ্গভাষিনী দেব্যা।

বকলম প, প্র, রা।

* ত্বরা-ত্বরি=অতিশীঘ্র। পশ্চিমবঙ্গের "তাড়াতাড়ি" প্রভৃতি বহুশব্দ পৈতৃক কুল ছাড়িয়া আত্মবিস্মৃত হইতেছেন।

† "আদালতী বাংলার" এই অভিযোগ ভিত্তিশূন্য অযথা প্রলাপ নহে। ইহার উপযুক্ত প্রতিকার একান্ত আবশ্যক। কিন্তু এই অভিযোগ বা নালিশ একমাত্র সাহিত্যিক জজ বা একমাত্র সাহিত্যিক মাজিষ্ট্রেটের বিচার্য্য কিনা সন্দেহ। কারণ, হত্যার সহিত, ইহার সম্পর্ক। সুতরাং এই মামলা সর্ব্বথা সেশনে সোপর্দ্দ হইবার যোগ্য। বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধিপ্রাপ্ত শামলাধারী, জমিদারের উচ্চশীর্ষ কর্ম্মকর্ত্তা বা ম্যানেজার, মহাজনের সুশিক্ষিত "বড়বাবু", কৃতবিদ্য মোক্তার এবং মামলাবাজ গ্রাম্যদেবতা, এই পঞ্চজুরি যদি সাহিত্যিক জজের সহিত একমত হইয়া কঠোর দণ্ডের ব্যবস্থা করেন, তাহা হইলেই প্রকৃত সুবিচার ও বটতলাবাসিনী 'শ্রীমতী বঙ্গভাষিনীর' দুরবস্থা দূর হইতে পারে; অন্যথা ইহার উদ্ধার প্রয়াস সুদূরপরাহত। শুধু সাহিত্যিকের যত্নে এ ক্ষেত্রে সুফলের প্রত্যাশা বস্তুতই বড় কম।

সঃ সঃ

উপহারের অভিশাপ।

(ইংরেজী একটী গল্পের অনুকরণে)

সিভিল সার্ব্বিস্ পরীক্ষা দিতে বিলাত গিয়া, অবশেষে লিনকল্‌ন্ ইনে খানা খাইয়া, ব্যারিষ্টার-রূপী বিহঙ্গের গাউন পরিয়া, যখন কর্ম্মক্ষেত্রের উদ্দেশে বাহির হইয়া পড়িলাম, তখন আমাদের রক্ষণশীল ভারতবর্ষটাকে আমার আইন-মার্জ্জিত প্রতিভার নিকট একটা মূর্ত্তিমান বিঘ্নের মত বোধ হইতে লাগিল। তাই গ্রামে আসিয়া বসিয়াছি। বাড়ী পূর্ব্ববঙ্গে, তাই গ্রাম, সিভিলিয়ানদের মত; আমার নিকটেও বিদেশ, এই মনে করিয়া ব্রহ্মদেশ-

বাসীদিগের নিকটে একটা স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া চলিতাম। যাহা হউক, মক্কেলের নগদ ফিসের উপর দিয়া কষ্টে সাহিবী আনা বাঁচাইয়া রাখিয়া জীবনের দুই তৃতীয়াংশ কোনও রকমে হেভানা চুরুটের ধোঁয়ার মত উড়াইয়া দেওয়া গিয়াছে, এমন সময় হঠাৎ একদিন মনে হইল, একবার একটু দেশ ভ্রমণ করিয়া আসিলে মন্দ হয় না! নিজেই "প্রপোজ" করিয়া নিজেই 'সেকেণ্ড' করিলাম। "রিজলিউসন" পাশ হইয়া গেল। কোনও বিশেষ অসুবিধাও ছিল না, মিসেস্ ক-কে স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য ইতিপূর্ব্বেই ভারতের একটা হিল-ষ্টেশনে পাঠান গিয়াছে। যেই আপন মনে রিজলিউশন পাশ হইয়া গেল, অমনি গ্লাডষ্টোন ব্যাগ্ হোল্ডল, প্রভৃতির লগেজ বাঁধিয়া বেহারা সহ ষ্টেশনে বাহির হইয়া পড়িলাম। এক্সপ্রেশ্ ট্রেণে যথাসময়ে রেঙ্গুণ এবং তথা হইতে জাপান মেইল ষ্টীমারে যথা সময়ে সিঙ্গাপুর আসিয়া পঁহুছিলাম। এখানে ভ্রমণকারীদের উপযোগী কয়েকটী ভাল ভাল হোটেল আছে। সিঙ্গাপুরকেই কেন্দ্র করিয়া মালয়দ্বীপপুঞ্জ এবং হংকং পর্য্যন্ত আমার ভ্রমণের পরিধি বিস্তার করিব এই মতলব—নচেৎ ব্যাঙ্কের চেকদ্বারা আর কুলায় না।

বোর্ণিও দ্বীপের উপকূল হইতে আন্দাজ ২॥ মাইল দূরে নীলসাগরের মাঝে ছোট একখানি দ্বীপ প্রভাতের ও সন্ধ্যার সূর্য্যকিরণে উজ্জ্বল নীলকান্ত মণিটীর মত দেখায়! এই দ্বীপটীর রূপে মুগ্ধ হইয়া সেখানে একটু বেড়াইয়া আসিবার ইচ্ছা হইল। দ্বীপটীর নাম টটেন্হাম আইল—শ্যামদেশীয় বেতের বাঁধ দেওয়া নৌকায় কোনও মতে প্রাণে প্রাণে টটেনহামে আসিয়া পঁহুছান গেল। টটেনহামে আদিমবাসিগণ বাস করে। মাঝে মাঝে ২।৪ খানি ঔপনিবেশিক ফরাসীকুটীর, তাহারা লেভেণ্ডার, ভায়লেট, ডেইজি প্রভৃতির কুঞ্জের মাঝে মূর্ত্তিমান ছবির মত দেখিতে;—যেন এসিয়ার মধ্যে ছোট ছোট ইউরোপের টুকরা বসানো!

সঙ্গে টিফিনবাক্সের মধ্যে যে সামান্য খাবার ছিল, তাহাদ্বারা সমুদ্রেই নিতান্ত সংক্ষিপ্তভাবে প্রাতরাশ সমাপন করা গিয়াছে। যখন টটেনহামের কূলে আসিয়া দাঁড়াইলাম, তখন মাথাটা কেমন ঝিম্ ঝিম্ করিতেছিল—মনে হইল যেন মাথার ভিতরে সাগর দুলিতেছে! স্থির করিলাম সাগরের কূল দিয়া খানিকটা হাঁটিয়া আসি—সামুদ্রিক বাতাসে, সব ঠিক হইয়া যাইবে। নৌকায় বেহারাটীকে রাখিয়া আসিয়া সাগরের পাড় ধরিয়া আমি চলিতে লাগিলাম—আকাশে একটা মেঘের মলিনতা; খুব বাতাস বহিতেছে। শুভ্র ফেণমাল্য-শোভিত নীলসাগরের তরঙ্গগুলি তালে তালে তাণ্ডব নৃত্যে দুলিতেছিল। কখন কখন দুই একবিন্দু বৃষ্টিও আমার কপালে পড়িতেছিল। পথের পাশে গাছপালার মধ্যে বৃষ্টির জলের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানাগুলি ভিজা সবুজ রঙের উপর জ্বলিতেছিল। অন্যমনস্কভাবে অনেক দূর চলিয়া আসিয়াছি—তবু চলিতেছি—যেন অনন্ত পথের যাত্রী—কালের মহাসমুদ্রে কোথায় ভাসিয়া চলিয়াছি। এমন সময় অন্নবহা নালীতে ক্ষুধার ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। পকেটের ঘড়ির সঙ্গে মিলাইয়া দেখি দুইটা বাজিয়াছে। কিন্তু এখন উপায়?—একাকী হাঁটিতে হাঁটিতে কোথায় চলিয়া আসিয়াছি। বেহারাটা ত টিফিন বাক্স লইয়া নৌকায় বসিয়া আছে। একি গ্রহ!

উপরের দিকে চাহিয়া দেখি, আমার পথের সম্মুখে একটী কালো প্রস্তরময় সামুদ্রিক পাহাড়! যেন সে সাগর হইতে উঠিয়া আসিয়া আমার পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহার চূড়ায় একটী ছোট বাঙ্গালো—গড়নটা কতকটা গথিক স্থাপত্য আদর্শের অনুযায়ী! আগাগোড়া পাথরের বলিয়া পাহারটীর উপর গাছ-পালা, পুষ্পলতার তেমন ঘটা নাই। কোথাও ক্বচিৎ এক আধটুকু সেঁওলার রেখা কোনও মতে শ্যামলতার আভাসটী বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। যখন প্রভাতের সূর্য্য পৃথিবীর পানে তরুণ নয়নে হাসিয়া দেখা দেয়, তখন সে কজ্জল নীল গ্রেনাইট পাহাড়টীর উপর এক অপরূপ স্বর্গাবরণ উজ্জ্বল হইয়া উঠে। সাগরের তরঙ্গ বাহুর মধ্যে বিরুদ্ধ প্রেমের স্তব্ধ মূর্ত্তির ন্যায় পাহাড়টী; নীল জলরাশি তাহার নিষ্ফল উচ্ছ্বাস লইয়া পাহাড়ের পদমূলে যেন যুগযুগান্তর ধরিয়া কাঁদিয়া মরিতেছে। এমন অসহায় স্থানে ঐ কুটীরখানি, একটী প্রফুল্ল ছবির

মত যেন আমাকে অভিনন্দন করিল—আমি একেবারে দ্বারে আসিয়া আঘাত করিলাম।

দ্বারমুক্ত করিয়া যিনি বাহির হইয়া আসিলেন, তিনি একটী ফরাসী মহিলা। দেহখানি বেশ লম্বা, একটু বাঁকাছন্দের। চাঁপাফুল হইতে রঙটী পৃথক করিয়া আনিয়া যেন তাঁহার মুখের উপর বিশ্বকর্ম্মা লাগাইয়া দিয়াছেন। বয়স বেশী হওয়াতে কপোল হইতে গোলাপের রক্তিমা অনেকদিন বিদায় লইয়াছে। মাথায় একটী শাদা টুপী—চিবুকের সঙ্গে সবুজ রেশমের ফিতা দিয়া বাঁধা। পাকাচুলের কবরীটী টুপীর নীচে কোনও মতে আত্ম-গোপন করিবার চেষ্টা করিতেছে। পরিধানে মোটা নীল কাপড়ের কুঞ্চিত ঘাগরী; গায়ে অনাবশ্যক ফ্রিল ও লেস দেওয়া একটী পাতলা জ্যাকেট। ফরাসী বিলাসের একটু অস্ফুট আভাস প্রৌঢ়ার বেশ বিন্যাস ও মুখশ্রীর উপর এখনও বিদ্যমান। আমাকে দেখিয়া তিনি কোনও প্রকার দ্বিধা না করিয়া হাস্য মুখে বলিলেন।

"আসুন ঘরে এসে বসুন।"

ততক্ষণে উদরের ক্ষুধা একেবারে লাল লইয়া আমার মুখের উপর উঠিয়াছে। আমি প্রাণহীন ভদ্রতার স্বরে তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া কহিলাম, "তাতে শুধু আপনাকে বিরক্ত করা হবে।"

মহিলা উত্তর করিলেন "আমাদের সংসারে স্বামী স্ত্রী ছাড়া ত্যক্ত বিরক্ত করিবার আর কেউ নেই। ভদ্র লোক ছোট লোক এ দিকে এলে, সকলেই দয়া করে এ কুটীরে এসে থাকেন। আমার স্বামী খুব বুড়ো তাতে আবার কাণে শুনেন না। তাঁর সঙ্গে আপনার কোনও শিষ্টাচারও করতে হবে না—কিছু মনে করবেন না, আপনি ঘরে এসে বসুন।" আমারও শিষ্টাচারের সময় অনেকক্ষণ অতীত হইয়াগিয়াছিল! সেই জন্য পুনঃ বিনা বাক্যব্যয়ে মহিলার পিছু পিছু ঘরে প্রবেশ করিলাম। ঘরে প্রবেশ করিয়াই দেখি, এক কোণে একটা ইজি চেয়ারে এক অশীতিপর বৃদ্ধ একটি মাংস পিণ্ডের ন্যায় বসিয়া আছেন। মহিলা বলিলেন "উনিই আমার স্বামী"। আমার আকস্মিক আগমনে পুরুষটী আমার পানে একবার কৌতুহল পূর্ণ নয়নে চাহিয়া আবার তন্দ্রার ঘোরে ঢুলিতে লাগিলেন। জরার পরবর্ত্তী শৈশবে পদার্পণ করিয়া তিনি যেন জ্ঞান অজ্ঞানের পারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন; এখন শুধু জগতের নিকট হইতে বিদায় লইবার দিনটার প্রতীক্ষায় বসিয়া আছেন।

একখানি চেয়ারের ধূলা ঝাড়িয়া অতি সমাদরে মহিলাটী আমাকে বসাইলেন,—যেন কোনও রাজ অতিথি তাঁহার দ্বারে উপস্থিত। তারপর তিনি ষ্টোভের উপর জল গরম করিবার জন্য কেতলী চড়াইয়া দিয়া ঘরের তাক হইতে একটি সবুজ রঙ্গের টীনের ডিবা পাড়িলেন। সেই ডিবার চা গরমজল স্পর্শ করিবা মাত্র ঘরখানি একটা অপূর্ব্ব সৌরভে পূরিয়া গেল; দেখিলাম ইজি চেয়ারের বৃদ্ধও বিস্ফারিত নাসিকা দ্বারা সে সুঘ্রাণ 'অর্দ্ধ-ভোজন', করিতেছেন। পেয়ালা হইতে একটু চা খাইয়াই মনে মনে বলিয়া উঠিলাম "Smuggled,—অথবা নিশ্চয় চোরাইমাল—আমি ব্রহ্মদেশের লাট বাড়ীতেও কোন পার্টীতে এমন উৎকৃষ্ট চা খাই নাই"।

মহিলাটী আমাকে বলিলেন

"চা কেমন হয়েছে?"

কথাটার একটা কৃতজ্ঞতা পূর্ণ জবাব দিবার পূর্ব্বেই দেখি, আমার পাশে ছোট একখানা টেবিল আনীত হইয়াছে; তার উপরে নানা উপাদেয় খাদ্য সম্ভার—আঙ্গুর, পনীর, বেদনা, বিস্কুট ইত্যাদি।

"ফিয়োডোর এই সমুদয় খাবার আমাদিগকে রীতিমত পাঠিয়ে দেন" এই বলিয়া মহিলাটী আমার টেবিলে মাখন ও অন্যান্য সুস্বাদু খাদ্য দ্রব্য পূর্ণ রেকাবগুলি সাজাইয়া রাখিতে লাগিলেন।

আমি কহিলাম 'ফিয়োডোর আপনাদের কে হন?' তিনি বলিলেন "ফিয়োডোর হিমকক্ শ্যাম রাজের কোষাধ্যক্ষ।"

আমি পুনরায় কহিলাম "আপনাদের তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক আছে, বোধ করি?"

কথাটা যেন শুনিতে না পাইয়া, তিনি বলিলেনঃ—"এসব খাবার আপনার তত পসন্দসই নয় বুঝি? এদেশে কিন্তু এরি চল বেশী!"

আমি তাড়া তাড়ি ব্যস্ত হইয়া বলিলাম "বলেন কি! অতি উত্তম জিনিষ সব—আপনি কি এ সব জিনিষ তত পসন্দ করেন না?" এই বলিয়া আমি তাঁহার মুখের দিকে তাকাইলাম।

তিনি বলিলেন "তা'ত' জানিনে, আমরা ত এসব কখনো খাই নি, যাঁরা দয়া করে আমাদের এখানে আসেন, এসব তাঁদের জন্য।"

আমি বলিলাম "এ সব যে বড় মানুষের খাবার জিনিষ!" তিনি উত্তর করিলেন "তা হ'তে পারে, আমাদের জিব দিয়ে এ সব কখনো তলায় নাই।"

কথাটার রহস্য ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলাম না। কিন্তু ইচ্ছা হইল, মহিলাটীকে 'জেরা' করিয়া বিষয়টা বাহির করিয়া লইব। কিন্তু সব সময়ে এ বেহায়াপানাটা ভদ্রতা সঙ্গত নয়, এই মনে করিয়া নীরবে ভদ্র মহিলার আতিথ্যের সময়োচিত সৎকারে অনেকটা সান্ত্বনা লাভ করিলাম। কিন্তু বলিতে কি আমি ক্রস-একজামিনকে ছাড়িলাম বটে কিন্তু ক্রস-একজামিন আমাকে ছাড়িল না। কিছু কাল পরে আমি মহিলাটীকে বলিলাম,

"আমায় মাফ্ করুন,—না জিজ্ঞেস করে থাকতে পাচ্ছিনা—ঐ ফিয়োডোর হিমককৃটী কে জানিতে বড় সাধ হচ্ছিল!"

মহিলাটী অতি আস্তে আস্তে বলিলেন,—"সে এক অতি গোপনীয় কথা ফিয়োডোর হিমকক্!—ভগবান্ আমাদের অপরাধ ক্ষমা করেছেন কি ভবিষ্যতে আরো অসীম কষ্ট লিখেছেন, তা কে জানে! কিন্তু আমার স্বামীর অনুতাপে দুঃখে যা হবার, তা হয়েছে।"

রহস্যটা বেশ ঘনিয়া উঠিয়াছে।

এর পরে মহিলাটী আবার কি ভাবিয়া ক্ষণকাল চুপ করিয়া রহিলেন তার পর বলিতে লাগিলেন,—

"আমাদের একটী উপযুক্ত ছেলে ছিল! আঃ, সে কি মানুষ না দেব-শিশু! যেমন তার কান্তি, তেম্নি বলিষ্ঠ তার গঠন। সে সিঙ্গাপুরের এক সওদাগরী আফিসের এজেন্ট ছিল—ব্যবসার খাতিরে তাকে নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াতে হ'তো। এক দিন রাস্তায় একদল শ্যামদেশীয় দস্যু তার যথাসর্ব্বস্ব লুট করে নিয়ে শেষে তার বুকে ছোরা বসিয়ে দেয়! সেত মরেছে কিন্তু দেখুন, মায়ের বুক চিরে দেখুন, সেখানে আজও সেই ডাকাতের ছুরী বিঁধে রয়েছে! ওঃ কি জ্বালা তার!

"এখন একবার আমার স্বামীর পানে আপনি তাকিয়ে দেখুন দেখি—মনে হ'বে একটা মাংসের পিণ্ড বইত নয়! কিন্তু চিরদিন এমনটী ছিল না। যখন আমার স্বামী শুনিলেন "আমাদের ছেলে নাই—শ্যাম দেশের ডাকাতের হাতে আমাদের বংশের একমাত্র বাতি নিবে গেছে—তখন আমার স্বামী, কোয়াসা আচ্ছন্ন জোছনার মাঝে দাঁড়াইয়া নিজের বাহু নিজে কামড়াইয়া রক্তাক্ত করিয়া দিয়া রুদ্ধকণ্ঠে ব'লে উঠলেন "যদি কোন দিন একটীও শ্যামামী আমার হাতে পড়ে, তা হলে,—" দিন যেতো তিনি কাঁদতেন আর বলতেন "হায় ভগবান্ আজো একজন শ্যামামীর সঙ্গে দেখা হ'লো না!"

একটী শ্যামবাসীর প্রতীক্ষায় স্বামী যোলটী দীর্ঘ বৎসর নীরবে কাটাইয়া দিলেন; কিন্তু কাহারও দেখা পাওয়া গেল না। তাঁর মনে কি হয়েছিল, কে জানে! একদিন জুন মাসের রাতে আমরা ঘরের সাসি দরজা বন্ধ করে দিয়ে, স্বামী স্ত্রীতে এই ঘরে বসে ছিলাম। সম্মুখে, সাগরের উপর দিয়ে তুমুল ঝড় বইতেছিল—ঢেউ গুলো সব আকাশ পানে ঠেলে মাথা তুল্‌ছিলো। রাত্ অন্ধকার, ঘরের মাঝে আলো জ্বলছিলো! রাত বেশী হয়েছে তবু আমরা শুতে যাই নাই—এমন সময়ে কে যেন দরজায় ঘা দিলে। স্বামী "কে—ও" বলে উঠে এসে দোর খুলে দিলেন—তখন কাঁপ্‌তে কাঁপিতে একটী যুবক ভিজে কাপড়ে ঘরে এসে ঢুকলো! মাথার চুল থেকে বুট পর্য্যন্ত জল ঝরছিল, যেন সে এই মাত্র সমুদ্রের মাঝ থেকে উঠে এলো! মুখের উপরে ও শরীরের জায়গায় জায়গায় রক্ত, সুন্দর মুক্তার পাঁতির মত দাঁতগুলি দিয়ে, ওঃ কি রক্তই না তার পড়ছিলো! বিপদে পড়ে এ অসময়ে আশ্রয়ের একটা সম্ভাবনা দেখে, তার মন নিশ্চয়ই খুব উৎফুল্ল হয়েছিলো—তা তার মুখ দেখেই মনে হয়েছিলো! হায় ভগবান্!

সে আমার স্বামীকে বল্লে,—

"মহাশয় আমরা বণিক্, ঝড়ে আমাদের জাহাজ ডুবে গিয়েছে। আমরা সাত জন কোনও মতে কূল পেয়েছি—আর সবাই ভেসে গিয়েছে—আধ মড়া ভাবে আমরা সাগরের কূলে বসে জলে ভিজছিলাম—আপনি যদি দয়া করে একটু আশ্রয় দিতেন"—

স্বামী একটু খানি স্তম্ভিতভাবে থেকে জিজ্ঞেস কল্লেন "তোমরা কোন দেশের?" ঘরের এক কোণে আগুন করা হয়েছিলো—সে আলোকে যুবকের মুখ খানা ভয়ানক রক্ত শূন্য দেখাচ্ছিল!

"যুবকটী উত্তর করলে "আমরা শ্যামদেশীয় বণিক্"।

এই কথা শুনেই স্বামী যেন কেমন হয়ে গেলেন! যেন একটা বিদ্যুৎ শক্তি তাঁর শরীরের ভিতর দিয়ে বয়ে গেল! দেখলাম স্বামী হাঁটতে হাঁটতে আগুনের কাছে গেলেন। যুবকটী তখন ডান হাত দিয়ে মাথার জল কেঁচে ফেলছিল তখন দেখলাম তার তর্জ্জনীটী কাটা! স্বামীর মুখে কোনও কথা না শুনে যুবকটী একটু থতমত খেয়ে বল্লে,—"আমরা সাত জন—সকলের ঘরে স্ত্রীপুত্র নিরুপায় অবস্থায় পড়ে আছে—ফিরে আসবো ভেবে কোন মতে বেঁচে আছে। আমাদিগকে জলে ভাসিয়ে দিবেন না, দয়া করে আমাদিগকে রক্ষা করুন—ভগবান্ আপনার মঙ্গল করবেন!"

সহসা, স্বামী চীৎকার করে পাগলের মত বলে উঠলেন "ভগবান্, তোমার জয় হোক—এতদিনে মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করলে!" এই বলিয়া একখণ্ড জ্বলন্ত কাঠ অগ্নিকুণ্ড হইতে তুলে, সেই যুবকের মাথায় সজোরে আঘাত করে—তারে ঘরের বাহির করে দিয়ে—শেষে দরজা বন্ধ করলেন!

দরজা বন্ধ করে স্বামী আর আমি দু'জন মাটীর পুতুলের মতো সারারাত বসে কাটিয়ে দিলাম—কারো মুখে কথাটী নাই, চোখের একটুও ঘুমের জড়তা নেই! রাত পোহালে দিন পরিষ্কার হলো—স্বামী ঘরের বাহিরে চলে গেলেন। সাগরের কূলে দু'টী মৃত দেহ পাওয়া গেল—স্বামী আমাদের গমের ক্ষেতের এক কোণে তাদের কবর দিয়ে রাখলেন। এ ঘটনার চা'র দিন পরে, সেই আঙুল কাটা যুবকটীর মৃত দেহ পাওয়া গেল! স্বামীর হাতে দুর্য্যোগের রাতে যে জ্বলন্ত আতিথ্য পেয়েছিল—এই সে! নীরবে তা'র মৃত দেহের উপর স্বামী স্ত্রীতে দু'জনে মিলে কত চোকের জল ফেল্‌লাম—হায়, জীবনে আর মরণে তার প্রতি আমাদের ব্যবহার কত পৃথক! কেন এমন হলো কে জানে! যাহা হউক, স্বামী তারেও গম খেতের কোণায় কবর দিয়ে, কবর খানার চারদিকে বেড়া দিয়ে রেখেছেন—ঐ যে ক'টী চেরী গাছ দেখছেন্ তারই লাগ সে কবরখানা—বেড়াখানি আজও চেরী গাছ ক'টী ধরে দাঁড়িয়ে আছে!

"তার পর পাঁচটী বছর চলে গেল—এ বিষয়ে আমরা কাউকে কিছু বলিনি—স্বামী স্ত্রীতেও এ বিষয়ে আমরা কখনো কথাবার্ত্তা বলি নাই। সেই সময় একদিন দু'পুর বেলা—একজন অচেনা শ্যামদেশীয় বড়লোক অতিথির বেশে অমাদের বাড়ীতে এসে উপস্থিত! তিনি আমায় বল্লেন,—"আমি শ্যামরাজের কোষাধ্যক্ষ—আইজাক—নেনাইলের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি!" একথা শুনে আমার বুকের রক্ত জমা হয়ে গেল! তবে কি সব ঘটনা প্রকাশ হয়ে পড়েছে? এখন তবে উপায় কি! এমন সময় স্বামী নিজেই সেখানে এসে উপস্থিত! আমার মুখ একেবারেই শাদা হ'য়ে গিয়েছে—মনে হচ্ছিলো "নিশ্চয় ফরাশী গবর্ণমেণ্টের অনুমতিক্রমে শ্যামরাজ্য হ'তে এরা স্বামীর নামে ওয়ারেণ্ট নিয়ে গ্রেপ্তার কত্তে এসেছে! স্বামীকে দেখে সে ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা কল্লেন ঃ—

"মহাশয়ের নাম আইজাক নেনাইল?"

স্বামী মাথা নাড়িয়া তাঁর স্বীকারোক্তি জানালেন। তখন সে ভদ্রলোক আমার স্বামীকে নমস্কার কত্তে গিয়ে একেবারে কেঁদে ফেল্লেন। একটু সুস্থির হ'য়ে পরে বল্লেন,—"মহাশয় আপনি আমাদের ধর্ম্মপিতা—আপনি তার অন্তিমের কাজ করেছেন।"

আমরা নত মুখে চুপ করে বসে ছিলাম। তার পর তিনি বলতে লাগলেন,—"এই দ্বীপের নিকটে 'ভিয়াটকা' জাহাজ ঝড়ে মারা গিয়াছে, আমার ভাই এই জাহাজে চড়ে দেশে আসছিলো—তার ডান হাতের তর্জ্জনীটী ছিল না। ছেলে বেলা—কুড়াল নিয়ে খেলা

করতে করতে আমিই ভাইয়ের আঙ্গুলটী কেটে ফেলেছিলাম! আমি খবর পেয়েছি আপনি নাকি, সে জাহাজের অনেকগুলি মৃতদেহ পেয়ে যত্ন করে তাদের আপনার ক্ষেতে কবর দিয়েছেন—যদি আমার ভাইকেও পেয়ে কবর দিয়ে থাকেন, তবে সে জন্য আপনাকে কৃতজ্ঞতা অর্পণ করবো আর তার সমাধির উপর একটী ক্রুশ ও স্তম্ভ গড়িয়া দিব—এই জন্য এসেছি।”

ততক্ষণ, আমরা স্বামী স্ত্রীতে ঘামিয়া ঘামিয়া একবারে কাদা হ'য়ে গেছি!

যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার জন্য ভদ্রলোক আমাদিগের নিকট এত বিনয় কচ্ছিলেন সে কৃতজ্ঞতায় আমাদের কোনও অধিকার নাই—এ কথা জেনে স্বামী স্ত্রীর আর চোকের জল বাধা মানিতে চাচ্ছিল না! কিন্তু আমাদের কাহিনী যে প্রকাশ করবার নয়—“সে কথা কি ক'রে বুঝাই বলুন!”

আমি নিঃশব্দে ঘাড় নাড়িলাম!

“স্বামী তাঁ'কে কবর খানায় নিয়ে গেলেন—ঐ দেখুন সে মার্ব্বেল পাথরের সমাধি স্তম্ভটী—ক্রুশ হাতে মেরি স্তম্ভটীর উপর দাঁড়িয়ে আছেন! ঐ দেখুন আমাদেরি ক্ষেতের একপাশে বেড়া দিয়া ঘেরা স্থানটীতে জলমগ্ন জাহাজের হতভাগ্য বণিকগণ চিরকালের জন্য আমাদের অতিথি হয়ে রয়েছে! আমার স্বামীর অদৃষ্ট এই কবরের ইতিহাসের সঙ্গে কি ভয়ানক ভাবে জড়িত হয়ে গেছে! শ্যামরাজের কোষাধ্যক্ষ্য আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ ক'রে চলে গেলেন।

সেই হ'তে তিনি বেঙ্কক থেকে অনবরত খালি এই সব খাবার জিনিষ আসবাব পত্র উপহার দিচ্ছেন! কিন্তু তাঁর এ কৃতজ্ঞতার উপহারে আমাদের কোনও অধিকারই নাই! আমার স্বামী বলেন—“ফিয়োডোরের কৃতজ্ঞতা কেবল নিজের পশুত্বে আরো কালি মাখিয়া দেয়।”

সে যা হোক, এ সমুদায় ভাল ভাল জিনিষপত্র আমরা কেউ স্পর্শ করি না—স্পর্শ করিবার আমাদের কোন অধিকার নাই—কেবল যখন কোনও অতিথি এসে আমাদের ঘরে উপস্থিত হন, তিনি বড় লোকই হউন্ আর গরীবই হউন,—আমরা তাঁ'দেরপরিচর্য্যা করে এই সমুদায় খাবার তাঁদের দিয়ে কোনমতে এই উপহারের অভিশাপ হ'তে নিজদের প্রাণ বাঁচিয়ে থাকি!—ভাবি এই সেবা দ্বারা স্বামীর অমঙ্গলের কতকটাও যদি শান্তি ক'রে দেওয়া যায়।”

শ্রীসুরেশচন্দ্র সিংহ

সৈকতে

তোমায় আমায় দেখা সাগর-কূলে,
জানি নে কেমনে পথ এসেছি ভুলে!
বিধির লিখন নারি! সব অপরাধ তাঁরি,
পৃথিবী যে গোল, তাই পড়েছি গোলে।
হায়লো অপরিচিতে, আমিত বুঝি নি চিতে,
বিঁধিবে কমল-তনু এ আঁখি-হুলে।
শীতল মলয় বায় আমারে জুড়ায়ে যায়,
বুঝি নি লাগিলে গায়, মরিবে জ্বলে।
আমার এ কালো দেহ কালোজল ক'রে স্নেহ
যতনে ধুইয়ে দেয়—মলিন ধূলে।
কি সাহসে এলে নামি, বুঝিতে পারি নে আমি
অপরূপ রূপ ল'য়ে এলানোচুলে!
আমার গায়ের ঢেউ লাগিলে বাঁচে না কেউ,
জাগিবে বাড়বানল হৃদয়-তলে!
জ্বলিবে জুড়াতে এসে, কাঁদিবে চাহিতে হেসে,
পশিলে আমার হাসি শ্রবণ-মূলে।
আমার এ ক্ষীণ হাসি লহরী লয়েছে গ্রাসি
আকুল ধাইছে বুঝি ছুঁইবে ব'লে!
ধরলো মিনতি ধর উঠে পড় উঠে পড়,
লাগিবে কলঙ্ক-কালি অমল কুলে।
অতিক্ষুদ্র জলাশয়! দু'য়ের কি ঠাঁই হয়?
আছি দূরে তবু কাছে পয়োধি-কোলে!
কবে সে জগৎবন্ধু রচিবে রমণী-সিন্ধু,
গাহন করিবে সুখে হৃদয় খুলে।
রাগে কিংবা অনুরাগে এমনে সন্দেহ লাগে
রঞ্জিত অধর তব বাঁধুলী ফুলে!

একটু দাঁড়াও দেবি !　　হৃদয়ে অঁকিব ছবি
সমুখে দাঁড়াও এসে মু'খানি তুলে।
আমার যা কিছু আছে,　　নিবেদন করি কাছে,
প্রেমের অঞ্জলি দিই চরণ-মূলে
শুভদিনে দেখা হ'স সাগর-কূলে।

শ্রীমনোমোহন সেন।

কবিসম্বর্দ্ধনা

বিগত ২৫ শে বৈশাখ কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় পঞ্চাশ বৎসর সম্পূর্ণ করিয়া ৫১ বৎসরে পদার্পণ করিয়াছেন। রবীন্দ্রবাবু আমাদের দেশের একজন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যসেবী ; তিনি বহুবর্ষ ধরিয়া নানা-ভাবে বঙ্গভাষা ও বঙ্গদেশের কল্যাণসাধন করিয়া আসিতেছেন। তাঁহার একপঞ্চাশৎতম জন্মতিথি উপ-লক্ষ্যে তাঁহাকে যথোচিত অভিনন্দন দেওয়া ও সম্বর্দ্ধনা করা দেশবাসীর কর্ত্তব্য বলিয়া মনে হওয়াতে আপাততঃ নিম্নলিখিত মহোদয়গণকে লইয়া একটি সমিতি সংগঠিত হইয়াছে।

যাহাতে কবিবরের প্রতি দেশের সকল লোকের আন্তরিক শ্রদ্ধা ও সম্মান যথাযোগ্যভাবে প্রদর্শন করা সম্ভবপর ও সুবিধাজনক হয়, তজ্জন্য সমিতি দেশের প্রতিভূস্বরূপ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্‌কে এই কার্য্যের ভার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। সাহিত্য পরিষদ্ এই ভার গ্রহণ করিয়াছেন। পরে সমিতির সহিত পরামর্শ করিয়া পরিষদ্ উৎসবের দিন ও প্রণালী ধার্য্য করিবেন এবং তাহা যথাসময়ে বিজ্ঞাপিত হইবে।

সমিতি স্থির করিয়াছেন যে, উৎসব দিবসে কবি-বরকে অভিনন্দনের সহিত শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ সময়োচিত উপহার দেওয়া হইবে এবং কবিবরের নাম সংযুক্ত করিয়া বঙ্গসাহিত্যের স্থায়ী উন্নতি কল্পে "রবীন্দ্র বৃত্তি" নামে একটি বৃত্তিকোষ প্রতিষ্ঠা করা হইবে : সেই বৃত্তিকোষ হইতে অর্থ সাহায্য দ্বারা বিভিন্ন ভাষার শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতগণের গবেষণার ফলস্বরূপ সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ক উচ্চ শ্রেণীর পুস্তক সকলের ধারাবাহিক বঙ্গানুবাদ এবং তত্তৎবিষয়ক মৌলিক গবেষণামূলক উচ্চাঙ্গের পুস্তক প্রণয়ন করাইয়া পরিষদ্ প্রকাশ করিবেন। পরিষদ্ উপযুক্ত লোক ও পুস্তক নির্ব্বাচন করিয়া দিবেন এবং রচনা কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়াছে কি না তাহাও পরিষদ্ দেখিয়া লইবেন।

ইহাতে যে শুধু রবীন্দ্র বাবুর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হইবে তাহা নহে, ইহার দ্বারা বঙ্গীয় সাহিত্যের সৌষ্ঠব ও সম্পদ বৃদ্ধি হইবে। বিগত ময়মনসিংহ সাহিত্য সম্মিলনে মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র এই প্রস্তাব উপস্থাপিত করিয়াছিলেন এবং উহা সমর্থিত হইয়া সমগ্র সাহিত্যিক-মণ্ডলী কর্ত্তৃক পরিগৃহীত হইয়াছিল।

এই মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অনেক অর্থের প্রয়োজন। আপাতত অন্তত দশ হাজার টাকা লইয়া কার্য্য আরম্ভ করা যাইতে পারে। বঙ্গদেশ ও বঙ্গ-সাহিত্যের হিতৈষীমাত্রেই এই সঙ্কল্পকে যে কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য যথাসাধ্য সাহায্য করিবেন তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

এই উদ্দেশ্যে সমিতি, সাধারণের নিকট সহানুভূতি ও অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করিতেছেন। এই ব্যাপারে সাধারণের যোগদান প্রার্থনীয়। যিনি যাহা দিবেন সাদরে তাহা গৃহীত হইবে এবং সংবাদপত্রে স্বীকৃত হইবে। সমিতির ধনরক্ষক শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী মহাশয়ের নামে ৫৩ নম্বর সু:কিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ঠিকানায় চাঁদা পাঠাইতে হইবে। ইতি

সমিতির সভ্যগণ

মহারাজা শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী।
শিবনাথ শাস্ত্রী।
জগদীশচন্দ্র বসু।
প্রফুল্লচন্দ্র রায়।
ব্রজেন্দ্রনাথ শীল।
সারদাচরণ মিত্র।

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।
রায় ,, যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী।
,, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়।
,, আশুতোষ চৌধুরী।
মহামহোপাধ্যায় ,, সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ।
,, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।
,, বিনয়কুমার সরকার।
,, রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়।
,, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।
,, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

শ্রীযুক্ত শৈলেশচন্দ্র মজুমদার।
,, ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী (ধনরক্ষক)
,, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত (সম্পাদক)।
,, খগেন্দ্রনাথ মিত্র।
,, যতীন্দ্রমোহন বাগচী।
,, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়। } সহকারী
,, দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী। } সম্পাদক।
,, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।
,, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
ইত্যাদি ইত্যাদি।

শিবমন্দির ও অতিথিশালা

The Pramaniks' Temple of Siva
and
Guest-house, Kishoreganj, Mymensingh.

১ম খণ্ড | ঢাকা, শ্রাবণ, ১৩১৮ সাল। | ৪র্থ সংখ্যা।

গীত-গৌরাঙ্গ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

চতুর্থ স্তবক।

"আজি হেতে শূন্য ঘর হইল আমার।
আর না দেখিব দুই চরণ তোমার॥"

শচীর পিতা নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী, বিশ্বরূপ-সন্ন্যাসের কিছু পূর্ব্বেই, গৌরাঙ্গের উপনয়ন-ক্রিয়া সমাপন করিয়া, স্বর্গগত হইয়াছিলেন। জগন্নাথ মিশ্রও আর বেশী দিন বাঁচিলেন না। বিশ্বরূপ-হেন পুত্রের শোক, তাঁহার বুকের মধ্যে, দিবারাত্র, তুষের আগুনের মত, ধিকি ধিকি জ্বলিতেছিল। তিনি, তাঁহার মনের সেই মর্ম্ম-নিহিত আগুনে, দুই তিন বৎসর ভাজা ভাজা হইয়া, এক দিন অকস্মাৎ উৎকট জ্বরে আক্রান্ত হইলেন এবং, গঙ্গার তটে, পতিপরায়ণা শচী ও পিতৃবৎসল গৌরাঙ্গের সন্নিকটে, সদ্‌জ্ঞানে ও সদানন্দ ধ্যানে, ভগবানের নাম লইতে লইতে, পুণ্যধামে চলিয়া গেলেন।

তনুত্যাগের সেই মহামুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত জগন্নাথ মিশ্রের বাক্য-স্ফূর্ত্তি ছিল। গৌরাঙ্গ তখন, তাঁহার পা দুখানি বুকে তুলিয়া লইয়া, কাঁদিয়া আকুল। গৌরাঙ্গ কহিতেছেন,—'বাবা তুমি আমায় ছাড়িয়া কোথায় চলিলে? আমি আর ত তোমায় বাবা বলিয়া ডাকিতে পাইব না। আজ হইতে আমার ঘর ও সংসার সকলই ত শূন্য হইল। আর ত আমি তোমার ঐ চরণ দুখানি চক্ষে দেখিতে পাইব না। আজি হইতে আমার দশ দিক্ অন্ধকারে ডুবিল। আর কে আমাকে, হাতে ধরিয়া, যত্ন করিয়া, লিখা পড়া করাইবে?

"বাপের চরণ ধরি কান্দে বিশ্বম্ভর।
সম্বরিতে নারে অশ্রু, গদ-গদ স্বর॥
আমারে ছাড়িয়া বাপু কোথা যাহ তুমি।
বাপ বলি আর ডাক নাহি দিব আমি॥
আজ দশ দিক্ শূন্য আঁধিয়ার ঘোরে।
কে পড়াবে যত্ন করি ধরি নিজ করে॥" (চৈঃ মঃ)

গৌরাঙ্গের প্রাণটা বয়সের প্রথম বিকাশ-সময়েও কিরূপ স্নেহ ও ভালবাসার সমুদ্র-সদৃশ ছিল, তাহা ইহা হইতেই অনুমান করা যাইতে পারে। তাঁহার এই

অমৃত-মাখা কথাগুলি জগন্নাথ মিশ্রের প্রাণে যাইয়া পশিল। তিনি, গৌরাঙ্গের অশ্রুসিক্ত চক্ষু দুটির দিকে, আপনার দুইটি চক্ষু স্থির রাখিয়া, অতি করুণকণ্ঠে, ধীরে ধীরে, কাতর স্বরে, কহিতে লাগিলেন,—

'বাছা! তোমার কাছে আমার অনেক কথা বলিবার ছিল। আমার অন্তরের সে সমস্ত কথাই অন্তরে রহিল। এখন আর কি কহিব? আমি আমার আরাধ্য দেবতা শ্রীরঘুনাথের চরণে তোমায় সঁপিয়া যাইতেছি। তুমি আমায় কোন দিনও পাসরিও না।

"গদ-গদ স্বরে বলে শুন বিশ্বম্ভর।
কহিতে নারিনু মোর যে ছিল অন্তর॥
রঘুনাথ-চরণে সঁপিনু আমি তোমা।
তুমি যেন কোন কালে না পাসর আমা॥" (চৈঃ মঃ)

শচী এতক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহার প্রাণের প্রবল শোক ও শঙ্কা, ঠিক যেন প্রাণের মধ্যেই, পাথরের তলে চাপিয়া রাখিয়াছিলেন। যখন দেখিলেন—তাঁহার আশার শেষ সূতাগাছিও ছিঁড়িয়া গিয়াছে, তখন শচী, তাঁহার স্বর্গ-গত পতির পদ-তলে পড়িয়া, পা দুখানি বুকে ধরিয়া, অতি-করুণ-কণ্ঠে কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন; এবং কাঁদিয়া কাঁদিয়া কহিতে লাগিলেন,—'তুমি আমায় ছাড়িয়া যাইও না হে,—আমায় ছাড়িয়া যাইও না। তুমি আমায় সঙ্গে লইয়া যাও। আমি এত কাল কায়-মনঃপ্রাণে—শয়নে জাগরণে, তোমার সেবা করিয়াছি। তুমি কি এখন আমায় অন্ধকারে ফেলাইয়া একা যাইবে? আমি আজি দশ দিক্ শূন্য,—দশ দিক্ অন্ধকার দেখিতেছি। আমি অনাথা, কিরূপে তোমার এই অনাথ শিশুকে আবরিয়া রাখিব? তোমার সোনার পুতুল নিমাই সংসারে কোন দিনও কষ্ট পায় নাই। আমি এখন আমার এ অসহায় অবস্থায় কিরূপে উহাকে সুখে পালন করিব? হা নাথ! তুমি কি এখন সময় পাইয়া সকল কথাই পাসরিয়া গেলে?'

"বৈকুণ্ঠে চলিলা দ্বিজ রথ আরোহণে।
ধরণী বিদরে সেই শচীর ক্রন্দনে॥"

শচীর সে হৃদয়স্পর্শী বিলাপ ও পরিতাপে সেখানে সকলেরই চক্ষে দর দর ধারা বহিল; এবং বালক গৌরাঙ্গও অঝর নয়নে কাঁদিতে লাগিলেন।

"মায়ের কান্দনা দেখি বাপের মরণ,
কান্দয়ে শচীর সুত অঝর নয়ন।
গজ-মতি-হার যেন গাঁথিল সূতায়,
নয়নে বহয়ে জল বিশাল হিয়ায়।"

লোকে গঙ্গাজলে পিতৃ-তর্পণ করে। অশ্রুজলের তর্পণ তাহা অপেক্ষাও অধিকতর পবিত্র। জগন্নাথ মিশ্রের স্বর্গোন্মুখ প্রাণ, গৌরাঙ্গের ঐ অমৃতময় অশ্রু-জলে, যেরূপ সন্তর্পণ লাভ করিয়াছিল, জীবের ভাগ্যে এ জগতে, সকল সময়েই তাহা ঘটে কি?

পঞ্চম স্তবক।

"স্থিরোপদেশামুপদেশকালে।
প্রপেদিরে প্রাক্তনজন্মবিদ্যাঃ॥"

পিতৃবিয়োগের সময়ে, গৌরাঙ্গের বয়স, সম্ভবতঃ, এগার কিংবা বার বৎসর। গৌরাঙ্গ, তাঁহার বাল্যকাল হইতেই, হৃদয়-শক্তির কেমন এক বিচিত্র প্রভাবে, বহু-হৃদয়ের পরিচালক—প্রকৃত বীর। এক দিকে যেমন চঞ্চল, আর এক দিকে তেমনই পর্ব্বতের মত অটল। যখন যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া বুঝিতেন, তখনই তাহা নির্ভয়ে ও নিশ্চল চিত্তে সম্পাদন করিতেন। তিনি, পিতৃ-বিয়োগের পর, মাতাকে প্রবোধ-বাক্যে সুস্থির করিয়া, যথারীতি পিতৃশ্রাদ্ধ করিলেন; এবং তাঁহার প্রাণের প্রবল তৃষ্ণায়, পণ্ডিতের টোলে পুস্তক পাঠে নিবিষ্ট হইলেন। তিনি শৈশবে ছিলেন খেলা লইয়া পাগল, এখন হইলেন পুথি লইয়া পাগল। অন্যে যাহা দশ দিনে পাঠ করে, তিনি এক দিনেই তাহা পরিসমাপ্ত করিবার জন্য প্রমত্ত। তিনি প্রাতে, অপরাহ্নে, এবং রাত্রিরও প্রায় দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত, টোলে থাকিয়া অধ্যয়ন করেন; এবং দুপুর বেলায় যখন গঙ্গায় স্নান করিতে যান, তখন নগর-পথে ও গঙ্গার ঘাটে, টোলের ছাত্রদিগকে লইয়া, শুধুই শাস্ত্রকথার আলাপে উন্মত্ত রহেন।

এখানে, প্রসঙ্গতঃ, নবদ্বীপের কএকটি পুরাতন টোলের কথা কহিব। নবদ্বীপে এখনও অনেক টোল আছে। শ্রীগৌরাঙ্গের সময়ে, প্রায় ঘরে ঘরেই টোল ছিল; এবং প্রত্যেক টোলেই স্বদেশী ও বিদেশী বহু-

সংখ্য ছাত্র বিদ্যাশিক্ষা করিত। ছাত্রেরা যখন, প্রাতর্ব্বেলার পাঠ-সমাপন করিয়া, দুই প্রহরের সময়, গঙ্গাস্নানে যাইত, তখন পথে, ঘাটে, ও গঙ্গার তটে, হাটের মত কল-কল ধ্বনি উঠিত; এবং গায়ে তৈল, কাঁধে গামছা, হাতে একটি গাড়ু কিংবা ঘটী, এই অবস্থায়ই, এক টোলের ছাত্রেরা, আর এক টোলের ছাত্রের সঙ্গে, শাস্ত্র-কথার বিচার-যুদ্ধে মত্ত রহিত।

এইরূপ বিচার-যুদ্ধে কেহই গৌরাঙ্গের সম্মুখীন হইতে সাহস পাইত না। ছাত্রদিগের মধ্যে যাহারা তাঁহার অপেক্ষা বয়সে অনেক বড়, তিনি তাহাদিগকেও, নানা-প্রকার কূট-প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া, ফাঁপড়ে ফেলাইতেন; এবং যাহারা, তাঁহাকে এড়াইয়া আর এক পথে যাইতে চেষ্টা করিত, তিনি দৌড়িয়া যাইয়া তাহাদিগকেও বিচারে আমন্ত্রণ করিতেন। নবদ্বীপের সেই এক দিন ছিল!

সে সময়ের নবদ্বীপে এক পণ্ডিত ছিলেন—গঙ্গাদাস শর্ম্মা; আর এক পণ্ডিত ছিলেন—বিষ্ণু মিশ্র। গঙ্গাদাসের টোল তখন সমস্ত বঙ্গে ব্যাকরণ, বাদার্থ ও সাহিত্য-অলঙ্কারের টোল বলিয়া বিখ্যাত। বিষ্ণু মিশ্রের টোলে স্মৃতি শাস্ত্রের অধ্যাপনা হইত। তৃতীয় এক পণ্ডিত ছিলেন,—সুদর্শন শর্ম্মা। 'সুদর্শন' তাঁহার নাম, না উপাধি, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি না; কারণ, ছাত্রেরা তাঁহার টোলে দর্শন শাস্ত্র পাঠ করিত।

ঐ সময়ের পণ্ডিতদিগের মধ্যে, বাসুদেব সার্ব্বভৌমের নামও এ স্থলে উল্লেখ করিব। যেমন বকুল, তমাল ও কদম্ব প্রভৃতি বৃক্ষরাজির মধ্যস্থলে, অতিবড় উচ্চ ও অসংখ্য-শাখায় প্রসারিত ও পরিশোভিত বৃহৎ একটা বটবৃক্ষ, সেই রূপ, তখনকার নবদ্বীপে, পণ্ডিত সমাজের মধ্যস্থলে, পণ্ডিতপ্রবর বাসুদেব সার্ব্বভৌম। নবদ্বীপের যে স্থানে বাসুদেবের টোল ছিল, সেই স্থান অদ্যাপি ইতিহাসে বিদ্যানগর বলিয়া বর্ণিত হয়।

নবদ্বীপে তখন আর একটি নির্ম্মলচরিত্র, নয়নানন্দ-মূর্ত্তি ও নিতান্ত-পরিচিত পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার নাম অদ্বৈত আচার্য্য। পাঠকের এ নামটি বিশেষ রূপে মনে রাখিতে হইবে। কারণ, গৌরাঙ্গের ইতিহাসের সহিত অদ্বৈতেরই বিশেষ সম্পর্ক।

অদ্বৈতের এক টোল ছিল শান্তিপুরে, আর এক টোল ছিল নবদ্বীপে। গৌরাঙ্গের পিতা জগন্নাথ মিশ্রের ন্যায় অদ্বৈতেরও আদি-নিবাস পূর্ব্ববঙ্গ। পূর্ব্ববঙ্গের অন্তর্গত শ্রীহট্টের জিলায়, লাউর নামে একটি ক্ষুদ্র রাজ্য অথবা ক্ষুদ্র জন-পদ ছিল; এবং রাজা দিব্যসিংহ উহার অধিপতি ছিলেন। উল্লিখিত লাউর রাজ্যের রাজধানীর নাম ছিল নবগ্রাম, এবং সেই নবগ্রামই অদ্বৈতের জন্মধাম।

অদ্বৈত বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। তাঁহার পিতার নাম কুবের পণ্ডিত, মাতার নাম লাভা দেবী। তিনি, তাঁহার পিতা মাতার সহিত, প্রথম-বয়সেই শান্তিপুর আসিয়া-ছিলেন, এবং সেখানে নানা শাস্ত্রে সুশিক্ষিত হইয়া, যৌবনের প্রথম-স্ফূর্ত্তি সময়েই, প্রধান-শ্রেণীর পণ্ডিত রূপে, প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। শান্তিপুরের অদূরে, নারায়ণপুর নামে, একটি গ্রাম ছিল। অদ্বৈত তাঁহার পিতৃ-বিয়োগের পর, একটি বৎসর ভারতের তীর্থে তীর্থে পরিভ্রমণ করিয়া, পরিশেষে শান্তিপুরে ফিরিয়া আইসেন, এবং সেখানে, নারায়ণপুর-নিবাসী বারেন্দ্র-কুলীন নৃসিংহ ভাদুড়ীর সীতা ও শ্রীনাম্নী দুইটি কন্যাকে এক সঙ্গে বিবাহ করিয়া, শান্তিপুরেই চিরজীবনের তরে অব-স্থিত হন।

এই সময়ে, ভারতবর্ষে, মাধবেন্দ্রপুরী নামে, এক মহাযোগী অথবা বিখ্যাত ও বয়োবৃদ্ধ বৈষ্ণব-গুরু ছিলেন। লোকে তাঁহাকে সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ও ভক্তি-তত্ত্বের কল্পতরু বলিয়া পূজা করিত; এবং যে তাঁহার প্রেমের আকর্ষণে পড়িত, সে-ই প্রাণের কেমন এক টানে, তাঁহার পায়ে গড়াইয়া পড়িয়া, তাঁহার কাছে প্রেম-ভক্তির মহা-মন্ত্রে দীক্ষিত হইত। ফলতঃ, মাধবেন্দ্র সর্ব্বাংশেই একটি সমুচ্চ-শক্তিশালী, পূজাস্পদ ও প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষ ছিলেন। তাঁহার নাম লইলেও শরীর ও মন পবিত্র হয়। তিনি, সাধারণতঃ মথুরা কিংবা বৃন্দাবনে বাস করিতেন, এবং মাঝে মাঝে, শ্রীশ্রীজগন্নাথ-বিগ্রহ দর্শনের উদ্দেশ্যে, বঙ্গদেশ হইয়া উৎকল যাইতেন। মাধবেন্দ্র, একবার ঐরূপ পরিভ্রমণের পথে, শান্তিপুরে আসিয়াছিলেন। শান্তিপুরে অদ্বৈতের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল, এবং তত্ত্বজ্ঞ অদ্বৈত, দর্শন মাত্রই, মাধবেন্দ্রের প্রকৃত মহত্ত্ব

হৃদয়ে অনুভব করিয়া, তাঁহার কাছে কৃষ্ণনামে ও ভক্তির ধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন।

দীক্ষার পূর্ব্বে অদ্বৈতের নাম ছিল কমলাক্ষ পণ্ডিত, দীক্ষার পর হইতে নাম হইল অদ্বৈত আচার্য্য। এক্ষণে তিনি অদ্বৈত গোস্বামী অথবা 'শান্তিপুরের বুড়ো গোঁসাই' বলিয়াই অধিকতর পরিচিত। তাঁহার সন্তান সন্ততিরা এখনও শান্তিপুরে বাস করিতেছেন। বৈষ্ণবেরা তাঁহাদিগকে শান্তিপুরের গোঁসাই বলিয়া সম্মান করিয়া থাকেন।

শান্তিপুরের সেই আদি গোস্বামী অদ্বৈত যখন, মাধবেন্দ্রের নিকট, ক্রমে কএকটি দিবস, প্রেম-ভক্তির নিগূঢ় তত্ত্বে শিক্ষিত হইলেন, তখন মাধবেন্দ্র, তাঁহার হস্তেই বঙ্গদেশে ভক্তি-ধর্ম্মের প্রচার-ভার অর্পণ করিয়া, আপনি আপনার পথে, কৃষ্ণনাম গাইতে গাইতে, চলিয়া গেলেন। অদ্বৈত গোস্বামীও সেই হইতে, গুরুর আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া, বঙ্গের শীর্ষস্থান নবদ্বীপেই ভক্তিশাস্ত্রের টোল করিয়া বসিলেন। অদ্বৈতের এই ভক্তিশাস্ত্রীয় টোলই নবদ্বীপের সুবিখ্যাত ভক্তিসভা;—এবং এই টোলেরই অতুল মহিমায়, আজি বঙ্গের গৃহে গৃহে, শ্রীগৌরাঙ্গের স্নিগ্ধ-শীতল প্রেম-প্রভা।

শচী ও জগন্নাথের প্রাণ-প্রিয় বিশ্বরূপ, আর আর পণ্ডিতের টোলে ব্যাকরণ-প্রভৃতি বিবিধ শাস্ত্র শিক্ষা করিয়া, অবশেষে অদ্বৈতের টোলে ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন; এবং শ্রীবাস পণ্ডিত প্রভৃতি নবদ্বীপ-নিবাসী ভক্ত বৈষ্ণবেরা, সকলেই প্রাতে কিংবা অপরাহ্নে, অদ্বৈতের টোলে মিলিত হইয়া, গীতা ও ভাগবত-প্রভৃতি গ্রন্থের আলোচনা ও নাম-কীর্ত্তন করিতেন। গৌরাঙ্গও, তাঁহার চারি পাঁচ বৎসর বয়সের সময় হইতেই, অদ্বৈতের প্রাণ-প্রিয়। তিনি তাঁহার দাদা বিশ্বরূপকে বাড়ীতে লইয়া যাইবার জন্য, প্রায়ই দুপুর বেলায়, অদ্বৈতের টোলে যাইতেন, এবং তখন অদ্বৈত তাঁহাকে তৃষিত-নয়নে তাকাইয়া দেখিতেন। অদ্বৈত তাঁহার টোলের সকলকে বলিতেন,—'তোমরা এই শিশুটিকে দেখিয়া রাখ। এ শিশুকে আমার সামান্য মনুষ্য-শিশু বলিয়া বোধ হয় না। ইহার এই দেহে অবশ্যই কোন বস্তু আছে'। ভক্তেরাও তখন শিশু গৌরাঙ্গের সে অপূর্ব্ব রূপ-লাবণ্য দেখিয়া মোহিত হইতেন, এবং মুক্তকণ্ঠে তাঁহার প্রশংসা করিতেন।

"মনে মনে চিন্তয়ে অদ্বৈত মহাশয়।
প্রকৃত মানুষ কভু এ বালক নয়॥" (চৈ, ভা)

সেই শিশু-গৌরাঙ্গ এইরূপ সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর, সুচারু-বিকসিত ও সুতীক্ষ্ণ-বুদ্ধিশালী বলিষ্ঠ বালক, এবং অদ্বৈত গোস্বামী পলিত-কেশ বৃদ্ধ পণ্ডিত। শ্রীগৌরাঙ্গের জন্ম সময়ে অদ্বৈতের বয়স বায়ান্ন বৎসর। যথা,—

"ওহে প্রভু আজি দ্বিপঞ্চাশ বর্ষ হৈল,
তুয়া লাগি ধন্নাধামে এ দাস আইল।" (অ)

এক দিকে এই বালক, আর এক দিকে ঐ বৃদ্ধ। এই দুইয়ের জীবন-স্রোত, কেমন করিয়া দুই দিক হইতে প্রবাহিত হইয়া, গঙ্গা ও যমুনার স্রোতের মত, আগে পৃথক্ থাকিয়াও, শেষে এক হইয়া গেল, এবং একই টানে—একই প্রাণে,—একই দিকে প্রবাহিত হইয়া, বঙ্গে প্রেম-ভক্তির একটা বিচিত্র-ভাবময় বিপ্লব ঘটাইল, ইহা বিশেষ একটা আলোচনার কথা।

বালক গৌরাঙ্গ, বৃদ্ধ অদ্বৈতের নিকট, বিশ্বরূপের ন্যায়, বিদ্যাশিক্ষাও করিয়াছিলেন কি? বৈষ্ণব ইতিহাসের বহু-প্রচলিত গ্রন্থপত্রে এ কথার উল্লেখ নাই। অনুসন্ধানে যাহা পাওয়া যায়, তাহাতে বোধ হয় যে, গৌরাঙ্গ তাঁহার বাল্যকালেই, পণ্ডিত গঙ্গাদাসের টোলে প্রবিষ্ট হইয়া, ব্যাকরণ পড়িতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, এবং জগন্নাথ মিশ্র যখন স্বর্গগত হন, সেই সময়ে তিনি ব্যাকরণ-শাস্ত্রে রীতিমত ব্যুৎপন্ন ছিলেন। পিতৃবিয়োগের পর, ছয় সাত বৎসর যাইতে না যাইতে, তাঁহার জীবনের অবস্থা একবারে পরিবর্ত্তিত হইল। তিনি, এই অল্প সময়ের মধ্যেই, বিষ্ণুমিশ্র ও সুদর্শনপণ্ডিত প্রভৃতি বড় বড় পণ্ডিতের টোলে, ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্র শিক্ষা করিয়া, সাহিত্য, অলঙ্কার, স্মৃতি ও ষড়্দর্শনে অতিপ্রগাঢ় ব্যুৎপন্ন বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হইলেন; এবং সতর কি আঠার বৎসর বয়সের সময়েই, বিদ্যাসাগর উপাধিতে অলঙ্কৃত ও বল্লভাচার্য্যের রূপসী কন্যা লক্ষ্মীদেবীর সহিত পরিণয় সূত্রে গ্রথিত হইয়া, সমস্ত নবদ্বীপের নয়ন আকর্ষণ করিলেন।

সতর কিংবা আঠার বৎসরের পুত্র যদি বিদ্যাসাগর উপাধি * লাভ করিয়া দেশ বিদেশে বিখ্যাত হয়, এবং লক্ষ্মী-হেন পুত্রবধূ সর্ব্বদা কাছে কাছে থাকিয়া প্রফুল্ল-বদনে ও প্রফুল্ল-মনে পরিচর্য্যা করে, তাহা হইলে, মায়ের প্রাণ অবশ্যই সর্ব্বদা আনন্দে উৎফুল্ল রহে। কিন্তু অভাগিনী শচীর এখন আর সে প্রাণ নাই। তাঁহার পিতা, মাতা ও ভ্রাতা প্রভৃতি ভালবাসার জনেরা এবং প্রাণারাধ্য পতি স্বর্গে চলিয়া গিয়াছেন। জীবনের আশ্রয়স্বরূপ জ্যেষ্ঠ পুত্র—শচীর সে বড় আদরের ধন বিশ্বরূপ, স্বর্গগত না হইয়াও, শচীর পক্ষে জীবন্মৃত। কেন না, শচী এ জীবনে আর তাঁহার মুখশ্রী দেখিতে পাইবেন না; এবং তিনি কোথায় আছেন, অথবা আছেন কি নাই, তাহাও আর কানে শুনিয়া শীতল হইবেন না। এখন শচীর প্রাণ ও মন এবং আশা ও আকাঙ্ক্ষার এক মাত্র অবলম্বন তাঁহার ঐ নয়নের পুতুল "নিমাই ধন।" কিন্তু নিমাই কি প্রাণে বাঁচিবে? নিমাই ত শিশুকাল হইতেই পাগল। নিমাই বিবাহ করিয়াছে সত্য। কিন্তু তাঁহার সে চিরচঞ্চল ও পাগল নিমাই কি সংসারী হইয়া মায়ের আশা পূর্ণ করিবে?

ঘরের সর্ব্বকনিষ্ঠ শিশু প্রায় সকল স্থলেই মায়ের আঁচলের ধন। কিন্তু এ অংশে নিমাই গৌরাঙ্গ, যে ভাবে ও যে অর্থে, মাতা শচীর আঁচলের ধন হইয়া ছিলেন, বোধ হয়, এ জগতে আর কেহই তেমন হয় নাই। শচী যদি মুহূর্ত্তকাল তাঁহার নিমাইকে চক্ষে না দেখিতেন, তাহা হইলেই নয়ন-জলে আপ্লুত হইয়া, আত্মহারা পাগলিনীর মত বাড়ী হইতে এক দিকে ছুটিয়া বাহির হইতেন, অথবা চক্ষে অন্ধকার দেখিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেন। তিনি, কি দিয়া কি করিয়া, তাঁহার নিমাইকে একটুকু ভাল খাওয়াইবেন, ভাল পরাইবেন, ইহাই ইদানীং দিবারাত্র তাঁহার জপ তপ, এবং নিমাই, দীর্ঘজীবী হইয়া সংসারের সুখে সুখী হউক, এই এক প্রার্থনাই, শয়নে, জাগরণে, সর্ব্বদা তাঁহার অন্তরের প্রার্থনা।

"পিতৃহীন বালক দেখিয়া শচী আই,
সেই পুত্র সেবা বহি আর কার্য্য নাই।
দণ্ডেক না দেখে যদি আই গৌরচন্দ্র,
মূর্চ্ছা হয় আই দুই চক্ষু হয় অন্ধ।"

গৌরাঙ্গও তাঁহার চিরজীবনই মাতৃভক্ত বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন, যথা চৈতন্যভাগবতে—

"প্রভুও মায়েরে প্রীতি করে নিরন্তর,
প্রবোধেন তানে বলি আশ্বাস উত্তর।
শুন মাতা মনে কিছু না করিহ তুমি,
সকল তোমার আছে যদি আছি আমি।"

গৌরাঙ্গ শচীকে শুধুই যে প্রগাঢ় ভক্তির সহিত পূজা করিতেন, তাহা নহে; দুধের শিশু যেমন আকুল প্রাণে মায়ের কোলে যাইয়া আশ্রয় লয়, তিনিও তাঁহার শাস্ত্র-চিন্তা ও শাস্ত্রযুদ্ধের মধ্যে মুহূর্ত্তের অবকাশ পাইলেই, সেইরূপ আকুলপ্রাণে, তাঁহার মায়ের কাছে দৌড়িয়া যাইতেন। তাঁহার এই মানব-দুর্ল্লভ মাতৃভক্তি এবং মায়ের প্রতি ভালবাসা জীবনের সকল সময়েই সমান ছিল। মা তাঁহার মাথায় তৈলটুকু না দিলে, তাঁহার শরীর স্নানে শীতল হইত না। মা তাঁহার স্বহস্তে দুখানি ব্যঞ্জন পাক করিয়া না দিলে, আহারে তাঁহার ক্ষুধা মিটিত না; এবং মা, মাঝে মাঝে, কাছে বসিয়া, গায়ে হাত না বুলাইলে, সে দিনটা ভাল যাইত না,—সে দিন তাঁহার প্রাণটা শান্তি লাভ করিত না। হা মা শচী!

(ক্রমশঃ)

* অল্প দিন হয়, সুকীর্ত্তিত গৌর-ভক্ত শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরি-তত্ত্বনিধি মহাশয়ের যত্নে, অদ্বৈতপ্রকাশ নামক এক খানি বৈষ্ণবগ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের রচয়িতার নাম ঈশান নাগর। এ ঈশান শচীর সেবক সুপরিচিত ঈশান নহে। ইঁহার নিবাস শ্রীহট্ট। কথিত আছে, এই ঈশান দীর্ঘকাল অদ্বৈত-আচার্য্যের সেবকতা করিয়াছেন, এবং সেই সূত্রে, গৌর-চরিত্রের অনেক কথা অবগত হইয়াছেন। ঈশান তদীয় অদ্বৈতপ্রকাশ পুস্তকে লিখিয়াছেন যে, শ্রীগৌরাঙ্গ নবদ্বীপে পাঠ সমাপন করিয়া, দুই বৎসর কাল শান্তিপুর নগরে, বেদাচার্য্য অদ্বৈত-আচার্য্যের ঘরে, বেদশাস্ত্র শিক্ষা করেন; এবং সেখানে বিদ্যাসাগর উপাধি লাভ করিয়া যশস্বী হন যদিও এ কথা অন্য কোন গ্রন্থে উল্লিখিত নাই, কিন্তু কথাটি কোন অংশে অসম্ভব নয় বলিয়া, আমরা ইহা গ্রন্থ-বদ্ধ করিলাম। যথা অদ্বৈতপ্রকাশে,—

"এই নিমাঞি সর্ব্ব শাস্ত্রে অতি বিচক্ষণ।
বিদ্যাসাগর উপাধি মুঞি করিনু স্থাপন॥
তাহা শুনি সভে কৈল জয় জয় ধ্বনি।
ছাত্র কহে বিদ্যাসাগর দেহ পাদ চিনি॥"

আয়ুর্ব্বেদ ও আধুনিক রসায়ন। *

শিলাজতু।

আয়ুর্ব্বেদে শিলাজতুর ব্যবহার প্রাচীনকাল হইতে আরব্ধ হইয়াছে। চরকের শিলাজতু প্রয়োগ সর্ব্বজন প্রসিদ্ধ। সুশ্রুত, বাগ্‌ভট, ভাবমিশ্র প্রভৃতি সকলেই উহা ব্যবহার করিয়াছেন। এই পদার্থ পর্ব্বত সকল উত্তপ্ত হইলে তাহাদের মল হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়া বর্ণিত হয়। রসেন্দ্রচিন্তামনিকার বলিয়াছেন "সুবর্ণাদি গিরিজ ধাতু সকল প্রচণ্ড সূর্য্যতাপে পরিতপ্ত হইলে, তাহা হইতে জতু সদৃশ কোমল কর্দ্দমবৎ যে মলভাগ গলিত হয় তাহাকে শিলাজতু কহে।" † কিরূপ পর্ব্বত হইতে কি প্রকারে এইরূপ পদার্থ নির্গত হয় তাহার প্রকৃত বিবরণ সংগৃহীত হয় নাই। ভাবপ্রকাশ বলিয়াছেন বিন্ধ্য পর্ব্বতে বহুল পরিমাণে উহা পাওয়া যায়। ‡ অধুনা হিমালয় প্রদেশ হইতে শিলাজতু বেশী পরিমাণে আমদানী হয়। শিমলা, মশৌরী, হরিদ্বার, দেরাদুন, কাট্‌মণ্ডু প্রভৃতি স্থানে উহা পাওয়া যায়। সেথান হইতে ভুটিয়ারা তাহা বিক্রয় করিতে আনে। যাহারা শিলাজতু সংগ্রহ করিয়া থাকে তাহাদের অধিকাংশই নিরক্ষর পার্ব্বত্যজাতীয়, তাহাদের নিকট শিলাজতুর উৎপত্তি সম্বন্ধে যথার্থ সংবাদ অবগত হওয়া যায় না।

রাসায়নিক বিশ্লেষণ—কলিকাতার মিউজিয়মের হুপার সাহেব শিলাজতুর রাসায়নিক বিশ্লেষণ করিয়া এসিয়াটিক সোসাইটিতে একটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। ¶ তাহাতে তিনি উহার স্বরূপ ঠিক নির্ণয় করিতে পারিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না তিনি আমাকে সম্প্রতি পত্রের দ্বারা জানাইয়াছেন যে তিনি শিলাজতু সম্বন্ধে আরও পরীক্ষা করিতেছেন। আশা করা যায় ঐ সকল পরীক্ষা দ্বারা শিলাজতুর স্বরূপ নির্ণীত হইবে।

শিলাজতু দেখিতে কালবর্ণের ছোট ছোট খণ্ডাকৃতি। গোমূত্রের মত দুর্গন্ধ বিশিষ্ট। শিলাজতু বায়ু হইতে জল আকর্ষণ করে (hygroscopic) এবং কাল আঠার মত চট্‌চটে হইয়া যায়। উহা জলে বিশেষতঃ উষ্ণজলে গলিয়া যায়। ডাক্তার উদয়চাঁদ দত্ত উহাকে bitumen বা কয়লাজাতীয় পদার্থ বলিয়াছেন। কিন্তু যখন উহা জলে দ্রবনীয় তখন bitumen হইতে পারে না। হুপার সাহেব বলিয়াছেন যে শিলাজতুর জৈব অংশ (Organic) হিউমিক এসিড (humic acid) এর মত কোন জৈব অম্ল এবং অজৈব (inorganic) অংশ প্রধানতঃ চুণ, মেগনেসিয়া, পটাশ ও সোডা নামক ক্ষার। দুইটি নমুনার জৈব ও অজৈব অংশের ভাগ নিম্নে প্রদত্ত হইল। *

	প্রথম নমুনা।	দ্বিতীয় নমুনা।
জল	৭.৯৫	৯.৩৪
জৈব অংশ ...	৩৫.০৫	৫৫.৩৬
অজৈব	৫৭.০০	৩৫.৩০
	১০০.০০	১০০.০০

সম্প্রতি হুপার সাহেব "materia medica animalium Indica" † নামক প্রবন্ধে বলিয়াছেন যে শিলাজতু প্রাণি জাতীয় ঔষধ, ধাতু ঘটিত বা উদ্ভিদ জাতীয় নহে। মিশরদেশে বহু প্রাচীনকাল হইতে সঞ্চিত মৃতদেহ (mummey) হইতে এক প্রকার ঔষধ বাহির করা হইত, সেই ঔষধ এবং হিমালয় অঞ্চলে প্রাপ্ত শিলাজতু সদৃশ পদার্থ বলিয়া হুপার সাহেব মনে করেন। আমি

* মৈমনসিংহ সাহিত্য-সম্মিলনে পঠিত।

† হেমাদ্যাঃ সূর্য্যসন্তপ্তাঃ স্রবন্তি গিরিধাতবঃ।

‡ "জত্বাভং মৃদু মৃৎস্নাভং যন্মলং তচ্ছিলাজতু" রসেন্দ্রচিন্তামনি। বিন্ধ্যাদৌ বহুলং তত্তু তত্র লোহং যতোঽধিকম্। ভাবপ্রকাশ।

¶ Silajit: an ancient Eastern medicine—Hooper; Journ. Asiatic. Soc. Bengal Vol, LXXII Part II, 1903.

* Ibid.

† Materia medica animalium Indica—David Hooper; Journ Asiatic Soc. Beng. Vol. VI, No.-10, 1910.

তাঁহাকে লিখি যে পর্ব্বতে সঞ্চিত মৃতদেহ কিরূপে আসিবে? তিনি উত্তরে লিখিয়াছেন যে পারস্যদেশে ঐরূপ পর্ব্বতের কথা প্রাচীন পর্য্যটকগণ (Chardin, Le Brun প্রভৃতি) লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ঐ সম্বন্ধে সকল কথা তিনি একটি প্রবন্ধে ব্যক্ত করিবেন বলিয়া জানাইয়াছেন।

শিলাজতুর শোধন—আয়ুর্ব্বেদে শিলাজতুকে শোধিত করিয়া ব্যবহার করিবার ব্যবস্থা আছে। এখানে শোধন অর্থে বিশুদ্ধকরণই বুঝিতে হইবে। "শিলাজতুকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড করিয়া উষ্ণজলে নিক্ষেপ করতঃ এক প্রহরকাল রাখিবে, পরে উহা মর্দ্দন করতঃ ঐ জল বস্ত্রদ্বারা ছাঁকিয়া একটী মৃৎপাত্রে স্থাপন করতঃ রৌদ্রে রাখিবে, তদনন্তর সেই পাত্রের উপরিস্থ ঘনভাগ অন্য পাত্রে রাখিবে, এইরূপ পুনঃ পুনঃ ঘনাংশ গ্রহণ করিলে দুই মাসের মধ্যেই শিলাজতু কার্য্যক্ষম হইবে।" * এইরূপ শোধন প্রক্রিয়ায় শিলাজতুর মধ্যে মৃত্তিকা,, বালুকা, লৌহ, ক্ষার প্রভৃতি ধাতুঘটিত পদার্থ পড়িয়া থাকিবে এবং উহার মধ্যে জৈব (Organic) অংশই গৃহীত হইবে। ইহাদ্বারা বেশ বুঝা যাইতেছে যে শিলাজতুর জৈব অংশ গ্রহণ করাই এই শোধন প্রক্রিয়ার উদ্দেশ্য।

শ্বেত শিলাজতু।

কৃষ্ণবর্ণ শিলাজতু ভিন্ন শ্বেত বর্ণের এক প্রকার শিলাজতু পাওয়া যায়। সচরাচর তাহাকে শিলাজিত বলে এবং ইউনানি হাকিমেরা তাহা ব্যবহার করিয়া থাকেন। এই শিলাজিত নেপাল, আসাম প্রভৃতি অঞ্চলে পাওয়া যায়। উহা কৃষ্ণ শিলাজতু হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন; দেখিতে ময়লাযুক্ত কিন্তু শ্বেতবর্ণের। উহার শতকরা ৯৫ ভাগ এলুমিনিয়াম সাল্‌ফেট্ (Aluminium Sulphate) ও ৩ ভাগ লৌহ। †

কৃষ্ণ ও লোহিত কজ্জলী (black and red modifications of Mercuric Sulphide).

মকরধ্বজ প্রস্তুতকালে গন্ধক ও পারদ একত্রে খলে মর্দ্দন করিতে করিতে যে কৃষ্ণ বর্ণের পদার্থ পাওয়া যায় তাহাকে কজ্জলী বলে। পরে ঐ কজ্জলীকে বালুকাযন্ত্রে ঊর্দ্ধপাতিত করিলে লোহিত বর্ণের মকরধ্বজ স্বর্ণসিন্দুর বা রসসিন্দুর প্রস্তুত হয়। এই কৃষ্ণ ও লোহিত বর্ণ দুইটি পদার্থ মার্কিউরিক সল্‌ফাইডের দুই রূপান্তরিত অবস্থা—কৃষ্ণ কজ্জলী দানাবিহীন (amorphous) এবং মকরধ্বজ দানাদার (crystalline), **উত্তাপ** সংযোগে কৃষ্ণকে লোহিতে এবং লোহিতকে কৃষ্ণ কজ্জলীতে পরিণত করা যায়। আমি মকরধ্বজ প্রস্তুত কালে এমন একটি অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছি, যাহাতে কৃষ্ণ কজ্জলী বিনা উত্তাপে সামান্য আঘাতে (mechanical means) লাল কজ্জলীতে পরিণত হয়। এইরূপ পরিবর্ত্তন অন্য কোথাও পড়ি নাই বলিয়া এখানে লিপিবদ্ধ করিলাম। খুব সম্ভবতঃ—উহা নূতন না হইতে পারে।

প্রথমে কৃষ্ণ কজ্জলী প্রস্তুত করা হয়। পারদ ও গন্ধক খলে না মাড়িয়া প্রথমে গন্ধককে অল্প উত্তাপে গলাইয়া পরে পারদ মিশাইয়া গুঁড়া করিয়া লইলে খুব শীঘ্র কজ্জলী প্রস্তুত হইয়া থাকে। সেই কজ্জলী একটি কাঁচপাত্রে (Erlenmeyer flask) বালুকাযন্ত্রে ২০০ ডিগ্রি উত্তাপের কম উত্তাপে পাঁচ ছয় ঘণ্টা কাল উত্তপ্ত করা হয়। প্রথমতঃ অসংযুক্ত গন্ধক **ঊর্দ্ধপাতিত** হইতে থাকে এবং পরে অধঃস্থিত কৃষ্ণকজ্জলী সময়ে সময়ে বাহির করিয়া পরীক্ষা করা হয়। এইরূপ পরীক্ষা করিতে করিতে দেখা গেল যে কাল কজ্জলী এমনি একটা অবস্থায় আসিয়া দাঁড়ায় যখন উহাকে একটা কাঁচের শলাকা (Glass rod) বা হামাণদিস্তার ডাঁট দিয়া অল্প পেষণ করিলে লাল কজ্জলীতে পরিণত হয়। ক্রমে বেশী সময় উত্তপ্ত করিতে করিতে কাল কজ্জলী উত্তাপ সহকারে লালে পরিণত হয়। কিন্তু সেইরূপ পরিবর্ত্তনের পূর্ব্বে এমন একটা অবস্থা আইসে—যখন

---

* ভাবপ্রকাশ—পূর্ব্বখণ্ড, ৬৩১ পৃঃ।

† Silajit: an ancient Eastern medicine·

কাল কজ্জলীর অনুগুলি (molecules) স্বল্প আঘাতে লালের অনুতে পরিণত হয় বলিয়া মনে হয়।

রাসায়নিকগণ অবগত আছেন এইরূপ পরিবর্ত্তনের একটি প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত মার্কিউরিক আইওডাইড (Mercuric iodide)। এই পদার্থটির দুইটি রূপান্তর অবস্থা আছে একটি লোহিত, অপরটি হরিদ্রাবর্ণ। উত্তাপ সহকারে লোহিত বর্ণ পদার্থকে হরিদ্রাবর্ণে পরিণত করা যায়, এবং অতি সামান্য আঘাতে (যথা কাঁচের শলাকা দিয়া নাড়িয়া দিলে) ঐ হরিদ্রাবর্ণ পদার্থ পুনরায় লোহিতে পরিণত হয়। কজ্জলীর বেলায় এত সহজে পরিবর্ত্তন হয় না, আঘাত শেষোক্ত উদাহরণ অপেক্ষা বেশী লাগে এবং উহার কৃষ্ণবর্ণ অবস্থা উদাহরণের হরিদ্রাবর্ণের অবস্থার মত এত অস্থায়ী (unstable) নহে। এ সম্বন্ধে আরও পরীক্ষা চলিতেছে। ফল পরে প্রকাশ্য।

ধাতু বর্গ।

বৈদিক যুগ।

ঋগ্বেদে স্বর্ণের ভূরি ভূরি উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। দুই একটি উদাহরণ এখানে প্রদত্ত হইল—যথা, "হিরন্ময়ান অৎকান" (৫।১৫।৬), "শিপ্রাঃ শীর্ষসু বিততা হিরণ্ময়ী" (৫।৫৪।১১) ইত্যাদি দ্বারা বেশ বুঝা যায় যে ঋগ্বেদ রচনা কালে যোদ্ধৃবর্গ সুবর্ণের বর্ম্ম শিরস্ত্রাণ প্রভৃতি ব্যবহার করিতেন। ঋগ্বেদে স্বর্ণকারেরও উল্লেখ দৃষ্ট হয়, যথা, "দ্রবিঃ ন দ্রাবয়তি" (৬।৩।৪), "নিষ্কং··· কৃণবতে স্রজং বা" (৮।৪৭।১৫)। পঞ্চম মণ্ডলের নবম সূক্তের পঞ্চম ঋকে কর্ম্মকারের ভস্ত্রা যন্ত্রের অস্তিত্ব সূচিত হইয়াছে। ঋগ্বেদে লৌহের উল্লেখ সম্বন্ধে মতভেদ দৃষ্ট হয়। ঐ গ্রন্থে "অয়স্" শব্দের বহুস্থানে প্রয়োগ আছে—যথা, "অয়সঃ ন ধারাং" (৬।৪৭।১০), "আয়সীভিঃ" (৭।৩।৭; ৭।১৫।১৪; ৭।৯৫।১) ইত্যাদি। অয়স্ শব্দ সাধারণতঃ লৌহ অর্থেই ব্যবহৃত হয় কিন্তু সায়ন ঐ সকল স্থলে অয়স্ শব্দের অর্থ সুবর্ণ করিয়াছেন। বাচস্পত্যাভিধানে "তেজোঽয়সো ন ধারাং" প্রভৃতি স্থানে অয়স্‌শব্দের লৌহ অর্থই করিয়াছেন। রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় ও উইল্‌সন সাহেব অয়স্ শব্দের লৌহ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন।

শুক্ল যযুর্ব্বেদে ছয়টি ধাতুর উল্লেখ দেখিতে পাই—"হিরণ্যং চ মে, অয়শ্চ মে, শ্যামং চ মে, লোহং চ মে, সীসং চ মে, ত্রপু চ মে যজ্ঞেন কল্পন্তাম্" (১৮।১৩)। *

অথর্ব্ববেদে স্বর্ণের ভূরি ভূরি উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। সেই সকল স্থল উদ্ধৃত করিতে হইলে প্রবন্ধের আকার বৃহৎ হইয়া যাইবে। স্বর্ণ সচরাচর ধাতু অবস্থায় পাওয়া যায় বলিয়া উহা সর্ব্বপ্রথমে মানবের ব্যবহারে আইসে। রৌপ্যের উল্লেখ বৈদিক গ্রন্থে তত বেশী স্থলে দৃষ্ট হয় না। † অথর্ব্ববেদে আট দশ স্থানে লৌহের উল্লেখ দেখিতে পাইয়াছি।

"অয়স্" "অয়স্ময়" প্রভৃতির উল্লেখ নানা স্থানে আছে। ‡ তাম্রের উল্লেখ দুই এক স্থানে দেখিলাম—"লোহিতময়" (২।৩।৭); ৮।৬।১৭। অথর্ব্ববেদে নানা ব্যাধি নিবারণের জন্য সীসের মাদুলি ধারণের ব্যবস্থা অনেক স্থলে দৃষ্ট হয়, যথা; ১, ১৬, ২; ১, ১৬, ৪; ২, ১, ১৯; ২, ১, ২০; ২, ১, ৫৩। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে পঠিত "আয়ুর্ব্বেদের উৎপত্তি" নামক প্রবন্ধে আমি অথর্ব্ববেদকে আয়ুর্ব্বেদের উৎপত্তিস্থল বলিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছি। ঐ বেদে স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ, (৫।২৮।৯), এবং সীস (১।১৬।২) ধাতুর মাদুলি বা বলয় ধারণ দ্বারা বিবিধ ব্যাধি নিবারণের ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়। ঐ গ্রন্থে আমরা সর্ব্বপ্রথমে ঔষধরূপে ধাতুর বাহ্যিক ধারণের (external application) আভাসপাইয়া থাকি। পরবর্ত্তী তান্ত্রিকযুগে ঐ সকল ধাতুর ভস্ম সূক্ষ্ম মাত্রায় ঔষধরূপে সেবিত (internally) হইয়াছে। ঔষধ সেবনের ক্রম বিকাশ এইরূপেই সংঘটিত হইয়া থাকে—প্রথমে বাহ্যিক ধারণ বা

---

* Ray's History of Hindu Chemistry Vol. 1., P. 83.

† "রজস্"—অথর্ব্ববেদ (৫।২৮।২; ৫।২৮।৯)।

‡ অথর্ব্ববেদে লৌহের উল্লেখ:— ২।৩।৭।৫।২৮।৯; ৫।২৮।২; ৬।৬৩।২; ৬।৬৩।৩; ৬।৮৪।৩; ৬।১৪১।২; ৭।১১৫।১; ৮।৩।২; ১১।৩৮।৪; ১১, ৬৬, ১; ২০, ৩০, ৩।

প্রলেপরূপে ব্যবহার এবং পরে অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির সহিত ঔষধরূপে সূক্ষ্ম মাত্রায় সেবন। অথর্ব্ববেদ হইতে তান্ত্রিক যুগ পর্য্যন্ত আমরা ভারতে ধাতুঘটিত ঔষধ ব্যবহার ও সেবনের ক্রমবিকাশের একটা ধারাবাহিক ইতিহাসের আভাস বেশ স্পষ্ট দেখিতে পাই।

মনু তাম্র, লৌহ, কাংস্য, ত্রপু, সীসক প্রভৃতি ধাতু-নির্ম্মিত ("তাম্রায়ঃ কাংস্যরেত্যানাং ত্রপুণঃ সীসকস্য চ") ভোজন ও রন্ধন পাত্রের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

সুবিখ্যাত ঐতিহাসিক প্লিনি (Pliny) খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার সর্ব্বজনপ্রসিদ্ধ Natural History নামক গ্রন্থে সিন্ধুদেশ বর্ণনা করিতে গিয়া তথাকার স্বর্ণ ও রৌপ্যের খনির উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার প্রায় সমসাময়িক গ্রীক পর্য্যটক ষ্ট্রাবো (Strabo) তাঁহার বিখ্যাত ভ্রমণ বৃত্তান্তে গুজরাট অঞ্চলের বর্ণনায় লিখিয়াছেন যে, "রৌপ্য অন্যদেশ হইতে ঐ স্থানে আমদানি হইত।"

(ক্রমশঃ)

শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী।

বিদ্যাপতির লিখনাবলী।

কবিবর বিদ্যাপতির নাম বঙ্গ সাহিত্যে সুপরিচিত। বাঙ্গালী সাহিত্যসেবী মাত্রেই বিদ্যাপতির অমৃতময়ী পদাবলীর রসাস্বাদন করিয়াছেন কিন্তু কবিবরের জীবনী বা তাঁহার বিরচিত অন্যান্য গ্রন্থ বঙ্গীয় পাঠক বর্গের নিকট একপ্রকার অজ্ঞাত। অবশ্য অনেকেই কবির জীবনকথার আলোচনা করিয়াছেন কিন্তু ঐ আলোচনা কতদূর বাস্তবঘটনামূলক তদ্বিষয়ে সংশয়ের যথেষ্ট অবকাশ আছে। ঐ সংশয়ের অপনোদনে দ্বারবঙ্গের পণ্ডিতমণ্ডলী আমাদিগের যথেষ্ট সাহায্য করিতে পারেন। অদ্য আমি এই প্রসঙ্গে দ্বারবঙ্গ হইতে প্রকাশিত কবিবরের বিরচিত—"লিখনাবলী" নামক একখণ্ড পুস্তকের সংক্ষিপ্ত বিবরণ বঙ্গীয় পাঠকের নিকট উপস্থিত করিব। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গদেশীয় রাজকীয় পুস্তকাগারের (Bengal Library র) অধ্যক্ষতা কার্য্যে নিযুক্ত থাকিবার সময় ঐ পুস্তকখানি আমার হস্তগত হয় এবং ঐ পুস্তক অবলম্বন করিয়া কলিকাতা সাহিত্য সভার কোন এক অধিবেশনে একটী প্রবন্ধ পঠিত হয়। শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ, মহাশয় ঐ প্রবন্ধ পাঠ করেন। প্রবন্ধ পাঠান্তে অনেকেই উল্লিখিত গ্রন্থের প্রতি আকৃষ্ট হন ও কেহ কেহ উহা ক্রয় করেন। কিন্তু সময়াভাব বশতঃ ঐ প্রবন্ধে অনেক আবশ্যক কথাই অনালোচিত থাকে, তজ্জন্য অদ্যকার এই আরম্ভ। গ্রন্থের বিজ্ঞাপনী হইতে অবগত হওয়া যায় যে কবিবর পদাবলী ব্যতীত অনেকগুলি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকখানির এস্থলে উল্লেখ একবারে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না ; যথা—

বিদ্যাপতি প্রণীত গ্রন্থাবলী।

(১) পুরুষ পরীক্ষা গ্রন্থের প্রতিপাদ্য দণ্ডনীতি (Politics), উহা রাজা শিবসিংহের আজ্ঞায় বিরচিত (২) শৈবসর্ব্বস্বসার—ইহা শিবপূজা পদ্ধতি বিষয়ক গ্রন্থ। রাজা শিবসিংহের ভ্রাতা পদ্মসিংহের পত্নী বিশ্বাস দেবীর আজ্ঞানুসারে বিরচিত। অদ্যাপি ত্রিহুত্ জেলার নানাস্থানে শুভকর্ম্মোপলক্ষে কবিবরের বিরচিত শিব-ভজনাবলী আনন্দসহকারে গীত হইয়া থাকে। ইহাতে বোধ হয় বিদ্যাপতি এককালে শৈব ছিলেন অথবা তাঁহার বৈষ্ণবধর্ম্মে সাম্প্রদায়িকতা ছিলনা। (৩) দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী (৪) কীর্ত্তিলতা কীর্ত্তিপতাকা—ইহা রাজা কীর্ত্তিসিংহের ইতিহাস বিষয়ক, (৫) দানবাক্যাবলী। ইহা ব্যতীত কবিবরের অন্যান্য গ্রন্থও ছিল। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় তাঁহার সুবিখ্যাত ও সুলিখিত বিশ্বকোষে ঐরূপ কয়েকখানি গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার পর কবিবরের বংশাবলীর কথা আলোচিত হইল না। অনুসন্ধিৎসু পাঠক উহা বিশ্বকোষে পাঠ করিতে পারেন।

কবির আবির্ভাব কাল সম্বন্ধে কয়েকটী কথা :—

কবির আবির্ভাব কাল সম্বন্ধে কয়েকটী কথা।

কবিবরের লিখিত ভজনসমূহ হইতে বুঝাযায় যে তিনি রাজা দেবসিংহের সময় হইতে রাজা ভৈরবসিংহের রাজ্যকাল পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন—লিখনাবলীর প্রকাশকার প্রমাণ স্বরূপ নিম্নলিখিত ভজনটী উদ্ধার করিয়াছেন যথা :

"বিদ্যাপতি কবি গাওল রে রস বুঝ রসবন্ত।
দেবসিংহ নৃপ নাগর রে হাসি নিবেদি কন্ত। ইত্যাদি"

দেবসিংহের পুত্র রাজা শিবসিংহ ৫৩ বর্ষ জীবিত ছিলেন। ২৯২ লক্ষণাব্দ অর্থাৎ ১৩২৪ (?) শকাব্দে দেব সিংহের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র শিব সিংহের নিকট হইতে বিদ্যাপতি বিসপী গ্রাম ব্রহ্মোত্তররূপে * লাভ করেন। শিবসিংহ তিন বৎসর রাজ্য করেন পরে তিনি রাজ্যচ্যুত হন ও বাদসাহের সহিত মনোমালিন্য বশতঃ উত্তর পর্ব্বতে (হিমালয়ে ?) আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। রাণী লখিমা যবন ভয়ে কিছুকাল নেপাল তরাইয়ে জনকপুরের সন্নিহিত বনৌলী রাজ্যে বাস করেন। ঐ স্থানে বড়ই জলকষ্ট দেখিয়া বিদ্যাপতি তথায় এক বৃহৎ সরোবর খনন করাইয়া দেন। ঐ সরোবরের উৎসর্গ উপলক্ষে বহুসংখ্যক পণ্ডিত নিমন্ত্রিত হন। নিমন্ত্রিত পণ্ডিতদিগের সহিত স্থানীয় বৌদ্ধদিগের বিবাদ উপস্থিত হয় ও পণ্ডিতদিগের উপর ঘোরতর অত্যাচার আরম্ভ হয়। "সপ্তরী" নামক স্থানের অধিপতি বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী অর্জ্জুন বৌদ্ধদিগের দলপতি ছিলেন। রামনবমীর মেলা উপলক্ষে জনকপুরে হিন্দু ও বৌদ্ধদিগের সমাগম হয় ও উভয় পক্ষের ঘোর যুদ্ধ হয়। ঐ যুদ্ধে দ্রোণবার-পুরাধিপতি গিরিণারায়ণ সদলবলে উপস্থিত ছিলেন ও তাঁহারই সাহায্যে অর্জ্জুন পরাজিত ও তাঁহার রাজধানী লুণ্ঠিত হয়। গিরিনারায়ণ জয়লব্ধ গোমহিষাদি পশু বৈষ্ণব ও অন্যান্য সাধুদিগের মধ্যে বিতরণ করেন ও সপ্তরী পরগণায় স্বীয় রাজধানী স্থাপন করেন। কবিবর বিদ্যাপতি দ্রোণবারপতিকে সনাতন ধর্ম্মরক্ষক বিবেচনা করিয়া তাঁহারই আজ্ঞানুসারে আলোচ্য লিখনাবলী গ্রন্থখানি প্রণয়ন করেন।

সর্ব্বাদিত্যতনুজস্য দ্রোণবারমহীপতেঃ।
গিরিনারায়ণস্যাজ্ঞাং পুরাদিত্যস্যপালয়ন্ ॥১।
অল্পশ্রুতোপদেশায় কৌতুকায় বহুশ্রুতাম্।
বিদ্যাপতিঃ সতাং প্রীত্যৈ করোতি লিখনাবলীম্ ॥২।
উচ্চৈঃকক্ষ মধঃকক্ষং সমকক্ষং নরং প্রতি।
নিয়মে ব্যবহারেচ লিখ্যতে লিখনক্রমঃ ॥৩॥

গ্রন্থের প্রথমেই মঙ্গলাচরণের পর উপরি উক্ত তিনটী শ্লোক দৃষ্ট হয়। উহা হইতে বুঝা যায় যে কবিবর অল্পজ্ঞ ব্যক্তিসমূহের উপদেশার্থ ও বহুশ্রুত ব্যক্তিগণের কৌতুক বর্দ্ধনের নিমিত্ত লিখনাবলী প্রণয়ন করিয়াছেন। উহাতে উচ্চৈঃকক্ষ, সমকক্ষ ও অধঃকক্ষ ব্যক্তিদিগের সহিত পত্র ব্যবহারের রীতি প্রদর্শিত হইয়াছে ও নিয়ম ও ব্যবহার এই উভয় শ্রেণীর পত্রেরই আদর্শ প্রদত্ত হইয়াছে। অর্থাৎ উচ্চপদবী সমপদবী ও নিম্নপদবীর ব্যক্তিকে কিরূপে পত্র লিখিতে হয় ও কিরূপে সাধারণ পত্র ও ব্যবহার পত্র (Court documents, business letters &.) লিখিতে হয় তাহার রীতি প্রদর্শিত হইয়াছে। উচ্চৈঃকক্ষ ও অধঃকক্ষ এই দুইটী শব্দের ব্যবহার বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যে প্রচলিত নাই, কেবল "সমকক্ষ" এই শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। বোধ হয় প্রথমোক্ত শব্দ দুইটীর পুনর্ব্যবহারে আমাদের সাহিত্যের পুষ্টি হইতে পারে। গ্রন্থোক্ত পত্রের আদর্শগুলি পাঠ করিলে কবিবরের সমকালীন সামাজিক আচার ব্যবহারের অনেক আভাস পাওয়া যায়। নিম্নে কয়েকখানি পত্র উদ্ধৃত হইল।

উচ্চৈঃকক্ষ ব্যক্তির উদ্দেশে লিখিত পত্র :—

"স্বস্তি। গুরুষু পরমদৈবতাধিদৈবতেষু পরমারাধ্যতমেষু আচারচারুত্বচমৎকারিত্বচতুর্মুখমানসেষু বিদ্যানির্জ্জিতবসিষ্ঠাদিনিবহেষু মহামহোপাধ্যায়শ্রীদেবদত্তমহাশয়েষু অমুক গ্রামাৎ অন্তেবাসিনঃ শ্রীঅমুকস্য মেদিনীমিলিতাষ্টাঙ্গস্য প্রণামপত্রীয়ম্। শ্রীমচ্চরণানা মনুকম্পয়া

* এই শব্দের ব্যুৎপত্তিরদিকে দৃষ্টিরাখিলে ইহার বর্ণবিন্যাস হওয়া উচিত "ব্রহ্মত্রা"। সং সং

কুশলমত্র গোচরশ্চ শ্রীমচ্চরণসকাশাদধীতব্যাকরণোঽ-হমনধ্যায়মধিগত্য দিনকতিপয়ং গৃহ মাগতোঽস্মি। সম্প্রতি প্রত্যাসন্নে স্বাধ্যায়ে তত্রাগত্য শাস্ত্র মধ্যেতু মিচ্ছামি। তেন দ্রব্যগুণলীলাবতী কুসুমাঞ্জলিপুস্তকান্যা-দর্শত্বেন ময়ি সন্দেষ্টু মাদেষ্টব্যানি। কিং বহুনা পত্রাচিহ্নার্থং নারিকেলফলচতুষ্টয়ং প্রহিতমস্তীতি। তত্র-প্রহিত ফলঃ।"

উপরি লিখিত পত্রখানি গ্রন্থের প্রথম পত্র। পত্রখানি শিষ্যকর্ত্তৃক গুরুর উদ্দেশে লিখিত। শিষ্য অনধ্যায় উপলক্ষে স্বীয় গ্রামে গমন করিয়াছিলেন। সেই গ্রাম হইতে গুরুকে লিখিতেছেন "আমি আপনার অনুকম্পায় ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিয়াছি, এক্ষণে আপনার নিকট শাস্ত্রাধ্যয়ন করিতে ইচ্ছা করি। অতএব অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমার নিকট দ্রব্যলীলাবতী, গুণলীলাবতী ও কুসুমাঞ্জলি এই তিনখানি পুস্তক আদর্শরূপে পাঠাইবার আদেশ হউক। পত্রচিহ্নার্থ চারিটী নারিকেল ফল পাঠাইতেছি" পাঠক লক্ষ্য করিবেন যে শিষ্য লিখিতেছেন যে তিনি ব্যাকরণ সমাপ্ত করিয়া এক্ষণে শাস্ত্র (শাস্ত্রান্তর নহে) অধ্যয়ন করিবেন যেন ব্যাকরণ শাস্ত্র মধ্যে পরিগণিত নহে। ফলকথা আলোচ্যকালে এমন কি বর্ত্তমান সময়ের কিছু পূর্ব্বেও কোন পণ্ডিতই কেবল ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিতেন না। মহা-মহোপাধ্যায় কামাখ্যা তর্কবাগীশ মহাশয় বলেন যে তাঁহাদের সময়ে নবদ্বীপে ব্যাকরণের টোলকে সাধারণতঃ "আখড়া" বলিত। ইহা অবান্তর কথা।—উপরিউক্ত পত্র পাঠে অবগত হওয়া যায় যে বিদ্যাপতির সময়ে আচার্য্যের গ্রন্থ সমূহ আদরের সহিত পঠিত ও পাঠিত হইত।

২য় পত্র। পাঠক এক্ষণে অনুজকর্ত্তৃক অগ্রজের নিকট লিখিত নিম্নলিখিত পত্রখানি পাঠ করুন :—

"স্বস্তি। পরমারাধ্যেষু জ্যেষ্ঠভ্রাতৃষু স্নেহমাস্তোভয়—ব্যতিকর বিশ্রাম মহীরুহেষু পিতৃকল্পেষু ঠকুর শ্রীঅমুক মহাশয়েষু অমুকগ্রামাৎ শ্রীঅমুকস্য প্রণামশতপত্রীয়ম্। শ্রীমদ্ ভ্রাতৃচরণানাং স্নেহাতিশয়াৎ কুশলমত্র। তত্রত্যঞ্চ তদীহে। কার্য্যঞ্চ নিগলবদ্ধশূদ্রস্য অমুকস্য বিয়োক্ষণায় যদাদিষ্টং, তদয়ং যদ্যপি মমাপথ্যকারী তথাপি শ্রীমচ্চ-রণানাং লিখনমতিক্রান্তুন্ন শক্নোমীতি লিখনদর্শনাদেব ময়া বন্ধনাদ্বিমোচিতঃ। তদিত্থং সর্ব্বদাপি মৎ্যাজ্ঞা-কারিণি স্নেহসন্ততি র্নপরিত্যক্তব্যেতি॥"

পত্রে লৌকিক ব্যবহারে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রতি কনিষ্ঠের কিরূপ ভক্তি শ্রদ্ধা ছিল তাহার বিলক্ষণ প্রমাণ পাওয়া যায়। এখনও অনেক স্থলেই অন্ততঃ যাঁহারা প্রাচীন হিন্দুরীতি একবারেই পরিত্যাগ করেন নাই, তাঁহারা পত্রাদিতে জ্যেষ্ঠভ্রাতার সম্বন্ধে এইরূপ পাঠ লিখিয়া থাকেন। পত্রার্থ সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে বোধ হয় তৎকালে উচ্চবর্ণেরা ইচ্ছা করিলেই শূদ্রকে নিগড়বদ্ধ করিয়া রাখিতে পারিতেন ও অন্যান্য দণ্ডে দণ্ডিত করিতে পারিতেন। এখানে বোধ হয় সাধারণ শূদ্রের কথা আলোচিত হইয়াছে। শূদ্র দাসের কথা স্বতন্ত্র, কারণ অন্যান্য অনেক পত্রে শূদ্র দাসের প্রতি তৎকালে কিরূপ ব্যবহার ছিল তাহা বুঝিতে পারা যায়। সে জন্য পত্র পরে উল্লিখিত হইবে। পত্রার্থ সংক্ষেপতঃ এই :—কোন ব্রাহ্মণ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অনুরোধে নিগড়বদ্ধ কোন শূদ্রকে নিগড়মুক্ত করিয়া লিখিতেছেন যে ঐ শূদ্র তাঁহার অনিষ্টকারী হইলেও তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অনুরোধে তাঁহাকে মুক্তি দিলেন। পাঠক এই পত্রের "কার্য্যঞ্চ" এই কথাটী লক্ষ্য করিবেন। বোধ হয় এখনও যে ইংরাজি অনভিজ্ঞ পল্লীবাসীর পত্রে "কার্য্যানঞ্চাগে" দেখা যায়—তাহার মূল এই কার্য্যঞ্চ হইতে আসিয়া থাকিবে। পাঠক নিম্নলিখিত পত্রে রাজস্ব সংগ্রহ ভূমি-মাপন পঞ্জীপ্রণয়ন (a preparation of settlement records and rights) ইত্যাদি বিষয়ের আভাস পাইবেন।

৩য় পত্র।

স্বস্তি। শ্রীকরণে পরমাবেক্ষকেষু দণ্ডনীতি-পাণ্ডিত্যমণ্ডিতেষু ধর্ম্মরক্ষাপূর্ব্বকরাজকার্য্যচাতুর্য্যচাণক্যেষু সমস্তপ্রক্রিয়াবিরাজমানমহাসামন্তাধিপতিমহামহত্তকঠকুর-শ্রীঅমুকমহাশয়ানাং চরণকমলেষু অমুকবিষয়াৎ ওবাথ-শ্রীঅমুকস্যাষ্টাঙ্গপ্রণতিপত্রীয়ম্ শ্রীমৎপ্রতাপোদয়াৎ কুশল-মত্র। বিশেষস্ত—অত্র কর্ষিণঃ পূর্ব্ববর্ষপঞ্জীপ্রামাণ্যেন

প্রজাভ্যঃ কপর্দ্দকং প্রার্থয়ন্তি। অত্র চ কস্মিন্নপি গ্রামে সংস্থানমস্তি কোঽপিগ্রামো নিঃসংস্থানএব। ততো যদ্যস্মিন্বর্ষে দেশেঽস্মিন্, ভূমিমাপনং কৃত্বা রাজকরো গৃহ্যতে তদা করকপর্দ্দকঃ সম্পূর্ণ এব প্রাপ্যতে। ক্ষীণানাং পীড়া ন ভবতি ইতি তু রাজাজ্ঞাং বিনা অধিকারীকর্ত্তুং নশক্কোতি (?) ইতি সুরূপং গোচরিতং ততো যথা করিষ্যামি তথাদেষ্টব্যং কিমহুনেতি"।

পত্রখানিতে এরূপ কতকগুলি শব্দের প্রয়োগ দেখা যায় যাহার অর্থ এক্ষণে সুপরিজ্ঞাত নহে পত্রখানি শ্রীকরণে মহাসামন্তাধিপতি ঠাকুর শ্রী অমুক মহাশয়ের নিকট অমুক স্থান হইতে অমুক ওযথি কর্ত্তৃক লিখিত। এক্ষণে প্রশ্ন এই যে "শ্রীকরণ" শব্দের অর্থ কি? লিখনাবলীতে দেখাযায় যে রাজা বা রাজপুরুষদিগের সহিত পত্রাদিতে পত্রলিখনের ও যাঁহার উদ্দেশে পত্র লিখিত হইত তাঁহার স্থানের উল্লেখ আছে যথা:—অমুক নগরাৎ, অমুক গ্রামাৎ, অমুক পত্তনাৎ, রাজধানীতঃ, অমুকনদীতটাবস্থিতকটকাৎ ইত্যাদি। সুতরাং 'করণ'ও লিখনস্থানের নাম হইবে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। করণ শব্দের অর্থ কার্য্যস্থলে করা যাইতে পারে, এখনকার কথায় Department বা সেরেস্তা বলা যাইতে পারে। ইহা যে রাজকীয় কার্য্যবিভাগ তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই; কারণ পত্রান্তরে (৩২নং পত্রে পৃষ্ঠা ২১) পাঠ করা যায়। বলকরণ হইতে বলকরণিক ঠাকুর শ্রী অমুক মহাশয়. স্থানাধ্যক্ষেশ্বর শ্রী অমুককে আদেশ করিতেছেন ইত্যাদি।

এক্ষণে "শ্রীকরণ" শব্দের অর্থ কি? ঐস্থলে 'শ্রী' শব্দ কি কেবল মান্যার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে যেমন—"শ্রীপাট" অথবা উহার কোন বিশেষ অর্থ আছে? কতকগুলি পত্র পর্য্যালোচনা করিলে বোধ হয় 'শ্রী' সম্পত্তি, এই অর্থে প্রযুক্ত, তাহার করণ অর্থাৎ কার্য্যবিভাগ—অর্থাৎ যে বিভাগে রাজ্যের আয়ব্যয় সম্বন্ধীয় ব্যাপার আলোচিত হয়, তাহাই "শ্রীকরণ"। অর্থাৎ শ্রীকরণ শব্দে এক্ষণে Revenue Department বলিলে যাহা বুঝায় তাহাই বুঝাইত। পত্রার্থ নিম্নে বিবৃত হইল:—ঔর্ষথি [Settlement offices (?)] মহাসামন্তাধিপতি মহামহত্তক ঠাকুর (রাজস্ব বিভাগের মন্ত্রী) শ্রীঅমুক মহাশয়ের নিকট নিবেদন করিতেছেন যে এখানকার কর্ষকগণ (চাষীরা) পূর্ব্ববর্ষের পঞ্জীর (Settlement Record) প্রামাণ্যে প্রজাদিগের নিকট কপর্দ্দক (কড়ি, অর্থাৎ তাহাদের প্রাপ্য অংশ) প্রার্থনা করিতেছে [প্রার্থয়ন্তি পাণিনি অনুসারে দুষ্ট হইলেও ব্যাকরণান্তরসাধ্য] আর এখানে কোন কোন গ্রামে সংস্থান আছে, কোন কোন গ্রাম একবারে নিঃসংস্থান (অর্থাৎ সে সকল গ্রামে রাজস্ব আদায়ের কোন উপায় নাই)। অতএব যদি এ বৎসর এদেশে ভূমি মাপ করিয়া রাজস্ব গ্রহণ করা হয় তাহা হইলে সমস্ত রাজস্ব আদায় হইতে পারে। দরিদ্র ব্যক্তির পীড়া হইতে পারে এই আশঙ্কায় রাজা—দেশ ব্যতীত আধকারী করিতে পারিতেছি না [কোন্ জমির অধিকারী কে তদ্বিষয়ে নিষ্পত্তি করিতে পারিতেছি না (?)]। এক্ষণে কি কর্ত্তব্য তদ্বিষয়ে আদেশ দিবেন ইতি.

গত পত্রে আমরা—"মহাসামন্তাধিপতি মহামহত্তক" নামক রাজপুরুষবিশেষের উল্লেখ প্রাপ্ত হইয়াছি ও তিনি রাজস্ববিভাগের প্রধানমন্ত্রী হইবেন এইরূপ অনুমান করা হইয়াছে। ঐ বাক্যের প্রমাণস্বরূপ নিম্নলিখিত পত্রখানি উপন্যস্ত করা যাইতে পারে।

"স্বস্তি। অমুকনদীতটাবস্থিতকটকে প্রভুষু········ ······রাজধানীতঃ সমস্তপ্রক্রিয়াবিরাজমানমহাসামন্তাধিপতিমহামহত্তকঠক্কুর শ্রীঅমুকশর্ম্মণাং শুভাশীঃপূর্ব্বকবিনয়বিজ্ঞাপনপত্রায়ম্। শ্রীমৎপ্রতাপোদয়াৎ কুশলমত্র তত্রত্যং শ্রীমদ্দেবপাদানাং গজতুরগপদাতিচতুরঙ্গবলসহিতানাং কুশলমাশাস্মহে। কার্য্যঞ্চ যদা শ্রীমদ্দেবপাদৈরিতঃ প্রয়াণং কৃতং তদারভ্য সমস্তরাজকার্য্যং শ্রীমদ্দেবপাদানাং পুণ্যোপচয়াৎ ভদ্রক্রমেণ চলদস্তি। যে চাধিকারিণঃ সাধ্যশেষনিমিত্তং যে চ সাপরাধা দণ্ডশেষনিমিত্তং কারাগারে বদ্ধাঃ সন্তি যাবচ্ছক্তি তৈর্দত্তমেবাতঃ পরং তে পরমদুর্গতাঃ প্রাপ্তযাতনাক্লেশা অপি কিমপি দাতুং ন শক্লুবন্তি ম্রিয়ন্তে। পরং ততো যদি করুণয়া দেবপ্রসাদো বা তদামীষাং দেয়বস্তুনিপরিচ্ছেদঃ ক্রিয়তে, পরিচ্ছিন্নে প্রতিভুবো গৃহ্যতে (?) শৃঙ্খলবন্ধনাদেতে

বিমোচ্যন্তে তদা কিঞ্চিদ্ধনপ্রাপ্তিরপি ভবতি প্রাণিবধবারণঞ্চ সম্ভবতীত্যস্মাভিঃ গোচরিতং। রাজধর্ম্মেণ যদর্হতি তল্লিখিতুমাদেষ্টব্যং। সম্বাদবস্তূনি পত্তাপ্রামাণ্যেন (Hindi for পত্র letter.) প্রহিতপুরুষদ্বারা গোচরী-ভবিষ্যন্তোবেতি। (১৮নং পত্র)।

পত্রখানি রাজধানী হইতে মহাসামন্তাধিপতি মহামহত্তক কর্ত্তৃক কোন নদীতীরাবস্থিত রাজশিবিরে রাজার উদ্দেশে লিখিত। মহাসামন্তাধিপতি মহাশয় একজন ব্রাহ্মণ কর্ম্মচারী। তিনি রাজাকে আশীর্ব্বচনপুরঃসর বিজ্ঞাপন করিতেছেন যে কতকগুলি ব্যক্তি বাকী রাজকর দানে অসমর্থ হওয়ায় ও অপর কতকগুলি ব্যক্তি অপরাধের নিমিত্ত দণ্ডিত হইয়া কারাগারে শৃঙ্খলবদ্ধ হইয়া বাস করিতেছে। তাহারা যথাশক্তি অর্থ দান করিয়াছে। ও নানাবিধ যাতনা (torture) দান সত্ত্বেও আর অধিক অর্থ প্রদানে অসমর্থ হইয়াছে। আর অধিক দিন এ ভাবে বদ্ধ থাকিলে তাহাদের প্রাণ বিনাশ হইতে পারে। এক্ষেত্রে যদি তাহাদিগকে আর কত দিতে হইবে তাহার একটা পরিচ্ছেদ (সীমানির্দ্দেশ) করিয়া ঐ টাকার জন্য প্রতিভূ (জামিন) লইয়া তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে অনর্থক অনেকগুলিপ্রাণিবধ নিবারিত হইতে পারে। অতঃপর আপনার রাজধর্ম্মে যাহা বিহিত বোধ হয় তাহার আদেশ দান করিবেন। প্রেরিত পুরুষের সহিত প্রদত্ত পত্র হইতে বিশেষ বিবরণ পরিজ্ঞাত হইবেন ইতি।"

এইরূপ অপরাপর পত্রেও যেস্থলে রাজস্বঘটিত কথা আছে সেই স্থলেই মহাসামন্তাধিপতি মহামহত্তক মহাশয় হয় পত্রের লেখক নয় গ্রাহক। মহাসামন্তাধিপতি বোধ হয় কোনরূপ উপাধি হইবে; অন্বর্থসংজ্ঞা না হইলেও হইতে পারে। উপরিউক্ত পত্রখানি পর্য্যালোচনা করিলে বোধ হয় বিদ্যাপতির সময়ে রাজস্ব-সংগ্রহার্থ অনেক অত্যাচার ও উৎপীড়ন অনুষ্ঠিত হইত ও বোধ হয় কারাগারে অনাহার, যাতনা প্রভৃতি নিবন্ধন অনেক অকালমৃত্যু সজ্ঘটিত হইত। পত্রে দণ্ডিত ব্যক্তির দণ্ডশেষের নিমিত্ত কারাবাসের কথা আছে। বোধ হয় অর্থদণ্ডদানে অসমর্থ ব্যক্তিগণকে তৎকালে দণ্ডশেষের নিমিত্ত কারারুদ্ধ করিয়া অনেক যাতনা দেওয়া হইত। অবশ্য বিদ্যাপতি কাল্পনিক পত্র সংগ্রহ করিয়াছেন, তথাপি তাঁহার কল্পনা হইতে অনেক বাস্তবতত্ত্বের আভাস পাওয়া যায়। গ্রন্থে সর্ব্বসমেত পত্র ও আগমাদি (দলিল প্রভৃতি) র ৮৮ খানি আদর্শ প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে প্রায় প্রত্যেক লিপিতেই বিশেষতঃ ব্যবহার পত্রগুলিতে তৎকালীন সমাজস্থিতির বিশিষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা আর কয়েকখানি লিপির উদ্ধার করিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব ঃ—

রাজপানীয়শালা হইতে পানীয়শালাধ্যক্ষ কুম্ভকারদিগকে (?) পত্র লিখিতেছেন ঃ—

"স্বস্তি" পানীয়শালাতঃ সপ্রক্রিয়পানীয়াগারিকঠক্কুর শ্রীঅমুকমহাশয়াঃ কুম্ভকার শ্রীঅমুকান্ সম্বাদয়ন্তি ঃ কার্য্যঞ্চ —অত্র পানীয়শালা বহ্বঃ সমীচীনা ন বিদ্যন্তে। তেন দিবা আতপং ভোজয়িত্বা রাত্রৌ শিশিরে ধৃত্বা জলার্দ্রবাসসা প্রচ্ছাদ্য তালব্যজনেন পানীয়ং শীতলং কর্ত্তুং ন পার্য্যতে। বহুতরকলশসাধ্যমেতদিতি বিজ্ঞায় মহতো মহতো কলশান্নির্মায় নীত্বা সত্বরং তত্রাগমিষ্যসি (?)। শ্রূয়তে বাণিজ্যব্যবসায়িনঃ সমাগতাঃ সন্তি। ততোঽগুরুগুগ্গুলুসিহ্লক প্রভৃতি ধূপদ্রব্যাণি প্রহিত টংকৈরেকৈকং ক্রীত্বা সত্বরমাগমিষ্যসি। পাটলাবাসিত মুশীরবারি ঘটে ঘটে কৃত্বা ধারয়িষ্যসি কিংবহুনা।"

পত্রার্থ এই যে—এখানে বহুসংখ্যক ভাল পানীয়শালা নাই। তজ্জন্য দিবাভাগে আতপ ভোজন করাইয়া রাত্রিতে শিশিরে রাখিয়া জলসিক্তবস্ত্রাচ্ছাদন করিয়া ও তালব্যজন (পাখার বাতাস) করিয়া পানীয় শীতল করিতে পারা যাইতেছে না। ইহাতে অনেক কলশের আবশ্যক ইহা বুঝিয়া বৃহৎ বৃহৎ কলশ সমূহ নির্ম্মাণ করিয়া সত্বর আসিবে। শুনিতেছি—বাণিজ্যব্যবসায়ীরা সমাগত হইয়াছে। তাহাদের নিকট হইতে প্রেরিত টাকার এক একটী করিয়া অগুরু, গুগ্গুলু, সিহ্লক (গন্ধদ্রব্য বিশেষ) প্রভৃতি ধূপদ্রব্য ক্রয় করিয়া সত্বর আসিবে। আর উশীরবারি (বেণার মূলদ্বারা সুগন্ধ জল) পাটলা (পুষ্প বিশেষ) বাসিত করিয়া ঘটে ঘটে স্থাপন করিবে। অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই।

পাঠক নিম্নলিখিত পত্রখানি পাঠ করিলে বুঝিতে পারিবেন যে বিদ্যাপতির সময়ে ভারতে প্রকাশ্যভাবে দাস ক্রয় বিক্রয় চলিত। সংক্ষেপতঃ পত্রখানি এই :—

৫৫ নং পত্র।

·············মহারাজাধিরাজ শ্রীঅমুকদেবপাদানাম্ সংভুজ্যমানরাজ্যে তীরভুক্তৌ রত্নপুরদেশপ্রতিবদ্ধ সীগোতপ্যাসংলগ্নমিশ্বরাগ্রামে শ্রীঅমুকদত্তাঃ শূদ্রশূদ্রী ক্রয়ণার্থং স্বধনম্ প্রযুঙ্‌ক্তে (?)। ধনগ্রাহকশ্চৈতৎসকাশাৎ নামতো রাউৎ শ্রীঅমুকদত্তঃ কেনাপি চাঢ্যেন স্বদাসং কৈবর্ত্তম্ বর্ষচতুশ্চত্বারিংশৎসমুদ্দেশিতবয়স্কং শ্যামবর্ণং অমুকনামানং রূপ্যটঙ্কষট্‌ট্যেন, তথৈব তস্য বধূম্ সমুদ্দেশিতবর্ষাত্রিংশৎবয়স্কাম্ গৌরবর্ণাং অমুকনাম্নীং রূপ্যটঙ্কচতুষ্টয়েন, তথৈব তয়োঃ পুত্রং বর্ষষোড়শতয়োদ্দেশিতবয়স্কং গৌরবর্ণং অমুকনামানং রূপ্যটঙ্কত্রয়েণ ·············অমীষু ধানষু চন্দ্রার্কাবধিনা বিক্রীতবস্তঃ ·············তদমী শূদ্রাঃ ধনিকাবাসে হলবাহনোচ্ছিষ্টক্ষেটনপানীয়ানয়ন দোলোদ্‌বাহনাদি সকলকর্ম্ম করিষ্যন্তি। যদি কদাচিৎ প্রপলায্য গচ্ছন্তি তদানেন পত্রপাত্রপ্রামাণ্যেন রাজসিংহাসনতলগতা অপি সমুদ্ধৃত্যানীয় তদেতে পুনর্দাসকর্ম্মণি যুজ্যন্তে। অত্রার্থে সাক্ষিণঃ দেবস্বত্তযজ্ঞদত্তবিষুমিত্রাদয়ঃ কৃতা ভূতাশ্চেতি। লিখিতমিদং উভয়ানুমত্যা কায়স্থ শ্রীঅমুকেন। লিখাপন দেয় সমুভয় রূ ১৷২ ইতি ধনং পরীক্ষ্য গৃহীতম্ পত্রস্থা এব সাক্ষিণঃ।”

সরলভাষায় পত্রের অর্থ এই যে, কোন ব্যক্তি স্বীয় দাস, দাসের স্ত্রী ও তাহাদের এক পুত্র এক কথায় এক দাস পরিবার কয়েকটী রৌপ্য মুদ্রার বিনিময়ে চিরকালের জন্য (চন্দ্রার্কাবধি) বিক্রয় করিতেছেন। দাসদিগকে ধনিকের বাটীতে হলবাহন, উচ্ছিষ্টক্ষেটন, জলানয়ন দোলাসঞ্চালন (উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে এখনও বর্ষাকালে লোকে দোলায় আরোহণ করিয়া দুলিয়া থাকে বোধ হয় এই কারণে দোলা সঞ্চালনের জন্য দাসের আবশ্যক হইয়া থাকিবে) প্রভৃতি কার্য্য করিতে হইবে। পত্রে ইহাও লেখা আছে যে যদি দাসেরা পলাইয়া রাজসিংহাসনের নিম্নেও আশ্রয় গ্রহণ করে তথাপি তাহাদিগকে পুনর্ব্বার আনিয়া দাস্য কার্য্যে নিয়োগ করিতে হইবে। ইহা একখানি ব্যবহার লিপি। ইহাতে কায়স্থলেখকের নাম, তাঁহার প্রাপ্য লিখন পারিশ্রমিক, সাক্ষীর নাম, বিক্রেতা যে টাকা বুঝিয়া পাইয়াছেন (ধনং পরীক্ষ্য গৃহীতং) ইত্যাদি সকল কথারই উল্লেখ আছে। আর পত্রোদ্ধার অনাবশ্যক বিবেচনায় ক্ষান্ত হইলাম। অনেক পত্রে কৈবর্ত্তেরা শূদ্র বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে (কৈবর্ত্ত শূদ্র শ্রী অমুকস্য সুতং শ্রী অমুকেষু বিবাহ বিধিনা বিক্রীতবান্), আবার পত্রান্তরে কোন ব্রাহ্মণ সেবায় পরিতৃপ্ত হইয়া শূদ্র দাসকে দাসত্বমুক্তিসূচক “নিস্তার পত্রী” (Deed of release) দিতেছেন ইহাও পাঠ করা যায়; যথা (৬৭ নং পত্র) অস্মাকং ন্যায্যধনক্রীতেন দাসেন ত্বয়া মহতীসেবা কৃতা ত্বৎসেবাপরিতুষ্টৈরস্মাভি শ্চন্দ্রার্কাবধিনা দাসো নিস্তারিতোহসি। সুখেন যত্র তিষ্ঠসি, যত্র বা গচ্ছসি, তত্র কাপ্যস্মাকং ত্বয়ি ধনে চ স্বত্বং নাস্তীতি অত্র ধর্ম্মএব সাক্ষীতি”। অনুবাদ অনাবশ্যক।

এতদ্ব্যতীত অনেক পত্রে বৈশ্যবণিক্ অমুক গুপ্ত, বণিক্ সাহু (সাধু সাহা (?)) শ্রীঅমুক প্রভৃতির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা হইতে তৎকালে যে ‘সাহু’ উপাধিধারী বাণিজ্যজীবী এক শ্রেণীর লোক ছিল তাহাও প্রতিপন্ন হয়। বোধ হয় বর্ত্তমান “সাহা” শব্দ এই “সাহু” শব্দেরই বিকৃতি মাত্র। পত্রান্তরে ইহাও প্রতিপন্ন হয় যে কায়স্থেরা এখনকার ন্যায় রাজকার্য্য, লেখকতা প্রভৃতি ব্যাপারে লিপ্ত থাকিতেন। উঁহারা শূদ্র হইতে পৃথক্ জাতিরূপে উল্লিখিত হইয়াছেন—যেমন কোন কোন পত্রে পাঠ করা যায় যে অমুক কায়স্থ শূদ্রদাসক্রয়ার্থ অর্থপ্রয়োগ করিতেছেন ইত্যাদি। সমগ্রগ্রন্থখানির অনুবাদ আবশ্যক। সময়াভাববশতঃ আপাততঃ সেই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারিতেছি না। গ্রন্থের শেষ শ্লোক এইঃ—

জিত্বা শক্রকুলং তদীয়বসুভির্যেনার্থিন্ তর্পিতাঃ
দোর্দর্পার্জিতসপ্তরীজনপদে রাজ্যস্থিতিঃ কারিতা

সংগ্রামেহর্জ্জনভূপতি র্বিনিহতো বৌদ্ধো নৃশংসায়িত
স্তেনেয়ং লিখনাবলী নৃপপুরাদিত্যেন নির্মাপিতাঃ॥
ইহার অর্থ পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে।

শ্রীরাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী।

বিধবা।

কুন্দকলি সম শুভ্র পবিত্র সরল,
প্রাণভরা প্রীতি প্রেম স্বর্গ পরিমল!
বসন্তের শুষ্কমালা,
ধরণীর দেব বালা,
মুক্ত প্রাণে কি মাধুর্য্য বিলাও ভুবনে,
মানব অরঘ ঢালে ওপূত চরণে!

সহিষ্ণু ধরিত্রী সম অবিকার প্রাণ,
শোকাগ্নি দহনে হৃদি বিশুদ্ধ মহান্‌,
সংসারের শোক দুখ
সহিতেছ পাতি বুক,
কিন্তু হাসিমুখে স্নেহ বিলাও ধরায়,
মুছাও নয়ন তার যে কাঁদে ব্যথায়!

ভূষণ বিহীন শান্ত দেহখানি তব,
কূলে কূলে পরিপূর্ণ স্বর্গীয় বিভব!
ও-তুচ্ছ খেলনা গুলি,
ফেলিয়াছ দূরে খুলি;
অমলিন ভূষা সত্য করেছ ধারণ,
কি মহা সাধনে মগ্ন উদার জীবন!

ধৌত করি বাসনার চিতা আঁখিজলে,
লভেছ নির্ম্মল শান্তি হৃদয়ের বলে;
আত্মসুখ বলি দিয়া,
ত্যাগী মুক্ত শুদ্ধ হিয়া,
পরের কারণে সদা খুঁজিছ কল্যাণ;
দেবি, তুমি ধরণীতে দেবতার দান।

শ্রীশৈলজা গুপ্তা

ময়মনসিংহ জিলার অন্তর্গত শেরপুর পরগণার ইতিহাস।

অবতরণিকা।

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।"

সর্ব্ব প্রথমে মানব, জনক জননী প্রভৃতি পরমাত্মীয়গণ, এবং জন্মভূমির সহিত পরিচিত হন। জন্মভূমি মানবগণের প্রথম বিচরণ স্থান। শেরপুর আমার জন্মভূমি ও বাসস্থল; আবার ইহার সহিত বিষয় সংশ্রবেও আমি সংসৃষ্ট। এই শেরপুরের ও তৎসঙ্গে ময়মনসিংহ জিলার পুরাবৃত্ত জানিতে স্বতঃই কৌতূহল জন্মে। পরম সৌভাগ্যের বিষয়, মদীয় পিতৃদেব স্বর্গগত পণ্ডিত হরচন্দ্র চৌধুরী বিদ্যাবিনোদ মহাশয় এসম্বন্ধে অনেক তত্ত্ব সংগ্রহ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। শেরপুরের পুরাতন ইতিবৃত্ত, অধিকাংশ তদবলম্বনে লিখিত হইল।

প্রায় কোন স্থানেরই প্রাচীন ইতিহাস পূর্ণাঙ্গ, কাঙ্খিতানুরূপ ও সর্ব্বসমঞ্জস প্রাপ্ত হওয়া যায়না; পুরাবৃত্ত যাহা কিছু পাওয়া যায়, তাহাও নিরতিশয় জটিল ও একান্ত দুরবগাহ। বস্তুতঃ পৃথিবীর অনেক পুরাতন ইতিহাস এরূপ কুজ্ঝটিকাচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে যে, মানুষের মনশ্চক্ষু তাহা উদ্ভেদ করিয়া প্রায় কিছুই সুস্পষ্ট দেখিতে পায়না।

তাই, কোন কোন স্থলে ভ্রম প্রমাদ অসম্ভব নহে, সুধীগণ ত্রুটী মার্জ্জনা করতঃ অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাহা আমাকে জানাইলে অত্যন্ত উপকৃত হইব।

প্রথম অধ্যায়।

পূর্ব্বতন অবস্থা।

ময়মনসিংহ জিলার উত্তর ভাগে শেরপুর ও সুসঙ্গ নামে দুইটী পরগণা পরস্পর বামে ও দক্ষিণে অবস্থিত। তন্মধ্যে শেরপুর পরগণাই বর্ত্তমান গ্রন্থের আলোচ্য। এই পরগণার আকৃতি অনিয়মিত ত্রিভুজ, পূর্ব্বাপ্রশস্ত

পশ্চিম দিক সমধিক প্রশস্ত। শেরপুর উঃ নিঃ ৪২° ৫২′ হইতে ২৫° ৪১′ এবং পূঃ দ্রাঃ ৯০° ১′ হইতে ৯০° ৩১′ কলা পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ইহার উত্তরে কড়ৈবাড়া পরগণা ও গারো পর্ব্বত প্রদেশ (১), পূর্ব্বে প্রাগুক্ত সুসঙ্গ পরগণা, দক্ষিণে সুসঙ্গ এবং আলাপসিংহ ও পুখরিয়া পরগণা, পশ্চিমে পুখরিয়া ও পাতিলাদহ পরগণা।

এই পরগণার শীর্ষ দেশে সমুচ্চ প্রাকার পঙক্তির ন্যায় উপপর্ব্বতপুঞ্জ বিদ্যমান রহিয়াছে। সুসঙ্গের "উব্দা খালি" এবং ময়মনসিংহের "মগরার" ন্যায়, দুরগামী "মালিঝী" ও "কংশ" অধিকাংশ পরগণা, ভাগদ্বয়ে বিভক্ত করিয়া তির্য্যগ্‌ভাবে উপবীত সদৃশ বিস্তৃত হইয়া আছে। পশ্চিম ও দক্ষিণভাগ যথাক্রমে "মৃগী" ও ব্রহ্মপুত্র সলিলে অভিষিক্ত, এবং "নেত্রবতী" পূর্ব্বদিকের প্রায় পরিখা স্বরূপ হইয়া রহিয়াছে। নতোন্নত পাদশৈল, উত্তুঙ্গসানু, গভীর উপত্যকা, নিবিড় কানন, বিস্তৃত বালুকাভুমি, শস্য শ্যামলক্ষেত্র, প্রশস্ত প্রান্তর, সুদৃশ্য পল্লী, শব্দায়মান নির্ঝর, বেগবতী পয়স্বিনী, অসংখ্য জলাশয়, এবং নানাবিধ বৃক্ষ, লতা, ফল, পুষ্প ও পশু পক্ষী ইহার ভূপৃষ্ঠকে অতি বিচিত্র ও মনোহর করিয়া রাখিয়াছে। প্রখর রৌদ্রে, অবিরলধারাবর্ষিজলদাবলী, শীতাংশু-সমুজ্জ্বল-নির্ম্মল রজনী, এবং দৃষ্টি নিরোধি বিষম কুজ্ঝটিকা, এ সমুদয়ই যথা সময়ে এখানে প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। স্বর্গগত মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার শেরপুরের স্বভাব শোভা যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

" প্রদেশমেতং খলুদক্ষিণেন,
স তীর্থরাজোস্তি বিধেস্তনুজঃ।
সম্পর্কত স্তস্য, স, তীর্থভাবং
পাপাত্মনাং পাবনমাপ নূনম্॥
যস্যোত্তরস্যাং দিশি শৈলমালা,
গারাভিধানা সুতরাং চকাস্তি।
স্বভাবশোভৈব হরত্যুদারা,
সচেতসাং নেত্রমনাংসি যত্র॥
মৃগীচ খৈড়াচ সমুদ্রগে দ্বে
ভুজোপমে দীর্ঘতমে প্রসার্য্য।
যোয়ং সমালিঙ্গতি তীর্থরাজং
সদা সদাচারপরঃ প্রদেশঃ॥
বিশেষতঃ সা নগরোপকণ্ঠে
স্রোতস্বতী সুপ্রতরাবতারা।
শরীতিনাম্না সুতরাং প্রসিদ্ধা
বিরাজমানা পরিখেব ভাতি।
সোমেশ্বরী ভোগবতী চ তীব্রা
মহাখ্যির্নাম নদী পরাপি।
সুমন্দগা মালিঝিনামিকান্যা
যস্যাঙ্কশয্যামভিতঃ শ্রয়ন্তে॥
রক্তোদকাঃ কাপি সুধাবদাত—
তোয়াঃ ক্বচিচ্চিত্ররুচঃ ক্বচিচ্চ
বিশ্বম্ভরায়া ইব ভক্তিশোভাং
বিতেনুরেতাঃ সরিতঃ সমেত্য॥
(১২৭৮ সন।)

ব্রহ্মপুত্র নদ ময়মনসিংহ জিলাকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছে। একভাগ পশ্চিম ও দক্ষিণে, অন্যভাগ পূর্ব্ব ও উত্তরে; শেষোক্ত অংশেই শেরপুরাদি পরগণা সকল সন্নিবিষ্ট।

এইক্ষণে শেরপুর পরগণার যেরূপ বৃহদায়তন লক্ষিত হয়, পূর্ব্বে তদ্রূপ ছিল না। সে সময় কুত্রাপি হ্রদতড়াগ-সঙ্কুল, কুত্রাপি নদীকূলসুলভ ঘন নিবিড় তৃণরাশি, এবং কুত্রাপি বা হিংস্রজন্তুসমাকীর্ণ ঘোর অরণ্যানী মাত্র ছিল। উত্তর দিকস্থিত উত্তুঙ্গ শৈলমালা ও মালভূমি ব্যতীত পশ্চিমদক্ষিণাঞ্চলের অধিকাংশ স্থান ব্রহ্মপুত্র নদের কুক্ষিগত ছিল (১)। তখন জনমানবের সম্পর্ক মাত্র ছিল না, সুতরাং যে কারণে দেশের প্রসিদ্ধি লাভ হয়, তাহার সম্যক্ অভাব হেতু, বোধ হয় মহাভারতের সভাপর্ব্বে ভীমসেনের দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে লোহিত্যদেশ (ব্রহ্মপুত্রের তীরবর্ত্তী প্রদেশ (২)) অতিক্রম

(১) এই পর্ব্বতপুঞ্জের প্রাচীন নাম " গারাশৈল "। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১৭৮৯ শক ২৩৬ পৃঃ।

(১) ১৭৭৮ খৃঃ রেণালস্ এট্‌লাস্ ৬ষ্ঠ ও ৯ম মানচিত্রেও এ বিষয়ের অনেকটা উপলব্ধি হইতে পারে।

(২) তীরবর্ত্তী শব্দে উভয় তীরই বুঝাইতেছে।
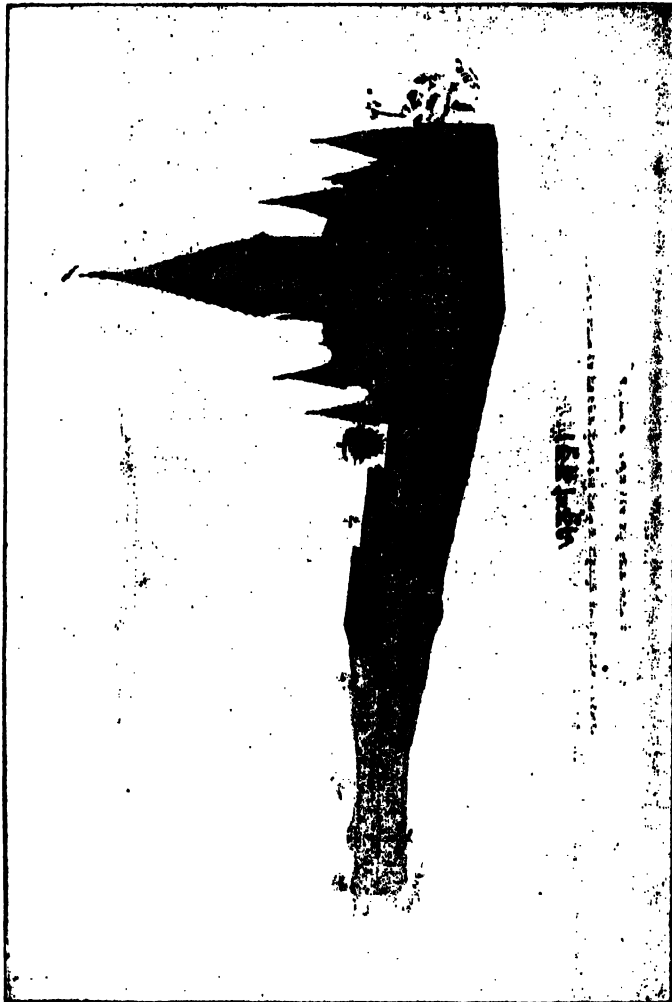
পূর্ব্বক সমুদ্র তীরস্থ ম্লেচ্ছাধিপগণকে বশীভূত করার উল্লেখ দেখা যায় (১)। লোহিত্য প্রদেশে সে সময় লোক-বসতি থাকিলে, অবশ্যই ঐ দেশ অধিকার বা তচ্চেষ্টার বিষয় উল্লেখ থাকিত। আর দেখা যাইতেছে যে, লোহিত্য প্রদেশ ভিন্ন এই ভূভাগের অন্য কোন বিশেষ নাম স্পষ্ট পাওয়া যায় না।

বৌদ্ধযুগে প্রসিদ্ধ গ্রীকদূত মেগাস্থিনীসের প্রকাশিত ভ্রমণ-বৃত্তান্তে সমস্ত ময়মনসিংহ জিলা কামরূপ রাজ্যভুক্ত ছিল বলিয়া বর্ণিত আছে (২)। আবার খৃঃ ৪র্থ শতাব্দীতে ইহা মগধ রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল (৩)। পুনরায় দেখা যায়, চীনদেশীয় পরিব্রাজক বিখ্যাত হিউএন্থসান্ খৃঃ ৭ম শতাব্দীতে ময়মনসিংহস্থ ব্রহ্মপুত্রের পূর্ব্বভাগ কামরূপ রাজ্য ও পশ্চিম তটস্থিত ভূখণ্ড পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের অন্তর্গত ছিল বলিয়া স্বীয় ভ্রমণ-বৃত্তান্তে প্রকাশ করিয়াছেন (৪)।

পরন্তু কালক্রমে পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের অন্তর্গত পশ্চিম ময়মনসিংহ পুনরায় কামরূপ রাজ্যাধীন (৫) হইয়া, পরিশেষে বঙ্গদেশভুক্ত হয় (৬)। লোকবিশ্রুত রাজা বল্লাল সেনের সময়ে যদিও বঙ্গদেশ রাঢ়, বরেন্দ্র, মিথিলা, বাগড়ী ও বঙ্গ, এই পাঁচ প্রদেশে বিভক্ত ছিল, কিন্তু ইহার একটীরও সীমা ব্রহ্মপুত্র নদের পূর্ব্বে বিস্তারিত হয় নাই (৭)। কাল সহকারে এইরূপ সীমার সঙ্কোচন ও প্রসারণ, ময়মনসিংহের ভাগ্যে অনেকবার ঘটিয়াছিল। পশ্চিম ময়মনসিংহ বঙ্গদেশভুক্ত হইলেও দেখা যায় পূর্ব্বভাগ কামরূপ রাজ্যাধীন রহিয়া গেল। পূর্ব্ববর্ণিত বিবরণাদি পর্য্যালোচনা করিলে বুঝা যায়, একরাজ্য হইতে অপর রাজ্যভুক্ত হওয়া ব্যতীত এই ভূভাগ কামরূপ রাজ্যাধীন হওয়ার পূর্ব্বে কি নামে অভিহিত ছিল তাহা জানা যায় না।

শক্তিসঙ্গমতন্ত্রে এই ভূভাগের বিশেষ বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। কামরূপের পূর্ব্বতন নাম প্রাগ্‌জ্যোতিষ (১)। কথিত আছে পুরাকালে ব্রহ্মা এখানে থাকিয়া নক্ষত্র সৃষ্টি করিয়াছিলেন, সে জন্য ইহার নাম প্রাগ্‌জ্যোতিষ (২)। এই প্রাগ্‌জ্যোতিষ বা কামরূপের সীমা চিরকাল যে একভাবে স্থায়ী ছিল না, তাহা ময়মনসিংহের পূর্ব্ববর্ণিত অবস্থা দৃষ্টেই বিশেষ উপলব্ধি করা যায়। জর্ম্মণ দেশীয় সুবিজ্ঞ প্রত্নতত্ত্ববিদ্ লামন সাহেব বহু গবেষণার পর প্রাগ্‌জ্যোতিষের প্রাচীন স্থিতি বিষয়ে এইমাত্র নিরূপণ করিতে পারিয়াছেন যে, কোন কালে এদেশ হিমালয়ের উত্তরাংশে, কোন কোন প্রমাণানুসারে ভোটদেশসন্নিহিত ছিল (৩)।

যাহাই হউক না কেন, কামরূপ রাজ্য চতুর্দ্দিকে বিস্তারিত হইবার পূর্ব্বে, ব্রহ্মপুত্রের পূর্ব্বকূল হইতে কামরূপের তদানীন্তন সীমা পর্য্যন্ত ভূভাগের অবশ্যই কোন না কোন নাম ছিল। শক্তিসঙ্গম তন্ত্রের ৭ম পটলে "ব্রহ্মপুত্রাৎ কামরূপাৎ মধ্যদেশস্তু কৈকয়ঃ।" প্রমাণে এই ভূখণ্ড কৈকয় দেশ বলিয়া জানা যাইতেছে। শক্তিসঙ্গম তন্ত্রেই যে কেবল এই প্রদেশকে কৈকয় দেশ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তাহা নহে; গর্গসংহিতাও কৈকয় দেশের অবস্থান এই প্রদেশেই নির্দ্দেশ করিতেছেন (৪)। কেহ আশঙ্কা করিতে পারেন, গর্গসংহিতার উদ্ধৃতবচনে কামরূপ বিজয়ের পর (ধনুর্দ্ধারী যদুনন্দন প্রদ্যুম্ন সেই সময় সৈন্য সহকারে বিপাশা নদী ও শোণনদ

(১) মহাভারত সভাপর্ব্ব ২৯ অধ্যায় শেষভাগ।

(২) শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মজুমদার এম. আর, এ, এস্, কৃত ময়মনসিংহের ইতিহাস ১১ পৃঃ।

(৩) রমেশচন্দ্র দত্ত কৃত History of Civilization in Ancient India ৫০১ পৃঃ।

(৪) Indo Aryan ২য় ভাগ ২৩৫ পৃঃ।

(৫) করতোয়াং সমাশ্রিত্য যাবদ্দিকর বাসিনী। উত্তরস্যাং কঞ্জগিরি করতোয়ান্তু পশ্চিমে॥ তীর্থশ্রেষ্ঠাদীক্ষুনদী পূর্ব্বস্যাং গিরিকন্যকে। দক্ষিণে ব্রহ্মপুত্রস্য লাক্ষায়াং সঙ্গমাবধি (যোগিনী তন্ত্র)।

এল্‌ফিন্‌ষ্টোন কৃত ভারতবর্ষের ইতিহাস ২৩০ পৃঃ। রত্নাকরং সমারভ্য ব্রহ্মপুত্রাগং শিবে। বঙ্গদেশোময়া প্রোক্ত সর্ব্বসিদ্ধি প্রদর্শকং॥ (শক্তিসঙ্গম তন্ত্র ৭ম পটল)।

(৭) মার্শম্যান্ সাহেব কৃত বাঙ্গালার ইতিহাস ৫ পৃঃ।

(১) প্রাগ্‌জ্যোতিষ পুরং খ্যাতং কামাখ্যাযোনিমণ্ডলম্। (যোগিনীতন্ত্র)।

(২) অত্রৈব হি স্থিতোব্রহ্মা প্রাঙ্‌নক্ষত্রং সসর্জ্জচ। ততঃ প্রাগ্‌জ্যোতিষাখ্যেয়ং পুরী শক্রপুরীসমা॥ (কালিকাপুরাণ ৩৭ অঃ)

(৩) তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ১৭৭০ শক ১১১ পৃঃ।

(৪) ব্রহ্মপুত্রং সমুত্তীর্য্য প্রদ্যুম্নোঽমিতবিক্রমঃ। আসীমাধিপতিং ডিম্বং গৃহীত্বা যাদবেশ্বরঃ॥ বলি মাদায়যদুভিঃ কামরূপং সমাযযৌ। বিপাশাং তু সমুত্তীর্য্য শনৈঃ শোণনদং নৃপ। কৈকয়ানাং যযৌধন্বী প্রদ্যুম্নো যদুনন্দনঃ॥ (গর্গসংহিতা)

পার হইয়া কৈকয়দেশে গিয়াছিলেন।) বিপাশা নদীর উল্লেখ থাকা হেতু ইহা রামায়ণোক্ত কৈকয় দেশকে নির্দ্দেশ করিতেছে। কিন্তু সংহিতার উক্ত বচনটী একটুকু প্রণিধান করিয়া দেখিলেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, কামরূপ হইতে পশ্চিমাভিমুখে গমন করিলে কখনই পাঞ্জাবের বিপাশানদী অতিক্রম করিয়া দানাপুরের শোণ-নদ পার হইতে হয় না। ইহাতেই এই কৈকয় প্রদেশ, পশ্চিম কৈকয় প্রদেশকে বুঝাইতেছে না, উপলব্ধি হয়। বিশেষতঃ বঙ্গ, আসাম ও কামরূপ প্রদেশ পরস্পর সন্নিহিত; কৈকয় প্রদেশও ইহাদিগের নিকটবর্ত্তী না হইলে, রাজ্য-বিজয়প্রসঙ্গে গর্গসংহিতায় ইহার কথা ঐ সকল প্রদেশের সহিত একত্র কথিত হইত না। আরও জানিতে পারা যায়, কামরূপের মধ্যবর্ত্তী শৈলমালা দক্ষিণে রাখিয়া পূর্ব্বদিকে গমন করিলে, পুরাকালীয় বিপাশানদী এবং শোণনদ পাওয়া যায় (১)। অতএব, ব্রহ্মপুত্রের পূর্ব্বতটস্থিত শের-পুরাদি পরগণা পুরাকালে কৈকয়দেশান্তর্গত ছিল, ইহাই সমীচীন বলিয়া বোধ হইতেছে। প্রাগুক্ত গর্গসংহিতাতে ইহাও পাওয়া যায় যে, বসুদেবের ভগিনী শ্রুতকীর্ত্তির পতি ধৃষ্টকেতু এই কৈকয় দেশের রাজা ছিলেন (২)।

কেহ কেহ প্রশ্ন করিতে পারেন যে, ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিমস্থিত রামায়ণোক্ত কৈকয় দেশের সহিত, পূর্ব্ব প্রান্তস্থিত বঙ্গদেশের ও পূর্ব্বে এই কৈকয় দেশের কোন সম্বন্ধ ছিল কি? এই প্রশ্নের মীমাংসা সম্বন্ধে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। কিন্তু দেখা যায়, এক-কালে ভোটাঙ্গ প্রদেশ কামরূপ হইতে কাশ্মীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল (৩)। এবং এককালে কাশ্মীর-রাজ মেঘ-বাহন, প্রাগ্‌জ্যোতিষের রাজকন্যা লাভহেতু স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন (১)। এই অবস্থায় কাশ্মীরের সন্নিকটবর্ত্তী কৈকয় প্রদেশের কোন রাজবংশধরের এ প্রদেশে আগমন ও তৎকর্ত্তৃক নামাবধারণ আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। পরন্তু, যেরূপ উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্ব্ব কোশল নামে (২) একই কোশল নামীয় ভিন্ন ভিন্ন স্থানে তিনটী দেশ দেখা যায়, সেইরূপ কৈকয় নামধেয় প্রদেশ দুইটী স্বতন্ত্র স্থানে থাকা কি অসম্ভব?

কাল সহকারে যখন কামরূপরাজ প্রবল-পরাক্রান্ত হইয়া নানা দেশে অধিকার স্থাপন করিতে আরম্ভ করি-লেন, ব্রহ্মপুত্রের পূর্ব্বতটস্থ কৈকয় দেশও সেই সঙ্গে কাম-রূপ রাজ্যভুক্ত হইল। এ বিষয় পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু আবার কামরূপরাজ ধর্ম্মপালের বংশ উচ্ছেদের পর, যখন কামরূপে অরাজকতা আরম্ভ হইল (৩), যখন কামরূপের চতুর্দ্দিকস্থিত কোচ, মেছ, গারো, লেপ্‌চা, ভোট প্রভৃতি পার্ব্বত্য জাতিগণ স্বীয় স্বীয় প্রাধান্য স্থাপনে উদ্যোগী হইল, যখন তাহাদের প্রভুত্ব লালসা অত্যন্ত বলবতী হইয়া উঠিল, সেই গোলযোগের সময়, কামরূপ রাজ্যও বহু অংশে বিভক্ত হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে পরিণত হইল। এই সুযোগে শেরপুর, সুসঙ্গ ও জঙ্গলবাড়ী প্রভৃতি স্থানের আদিম অধিবাসী কোচ ও হাজঙ্গ প্রভৃতি অর্দ্ধসভ্য লোকদিগের জাতীয় গৌরব-প্রভাব সমধিক পরিবর্দ্ধিত হয়। তখন কোচ ও হাজঙ্গ জাতীয় কতিপয় সামন্ত এ অঞ্চলের অনেক স্থানে আধিপত্য বিস্তার করতঃ (৪) এ পরগণার অনেক ভাগ শাসন করিতে

(১) কালসহকারে বিপাশা—বিপাশ—বিঃপাশ—বিরপাশ—বির-পাক—বিরাক—বেরাখ এই ক্রমে অপভ্রংশ হইয়া "বরাক" নাম ধারণ করিয়াছে এবং শোণনদ "শোনাই" নামে অভিহিত হইয়াছে। (রঘুনাথ সার্ব্বভৌম কৃত বিশ্ববিজ্ঞান ১০৯ পৃঃ)

(২) কৈকয়ান্তাধিপোরাজা ধৃষ্টকেতুর্ম্মহাবলঃ। বসুদেব স্বসুরাসীৎ শ্রুতকীর্ত্তেঃ পতির্ম্মহান্॥ (গর্গসংহিতা) বসুদেব পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের রাজা ছিলেন। (বিশ্বকোষ বঙ্গদেশ ৪০৪ পৃঃ)

(৩) কাশ্মীরান্তু সমারভ্য কামরূপাত্তু পশ্চিমে। ভোটাঙ্গোদেশো দেবশি মানসেশাচ্চ দক্ষিণে॥ (শক্তিসঙ্গম তন্ত্র)

(১) বিশ্বকোষ, কাশ্মীর। (১০৪ পৃঃ)

(২) বিশ্বকোষ ৪র্থ ভাগ (ক) ৬০৭ পৃঃ।

(৩) গ্লেজিয়ার সাহেব কৃত রঙ্গপুরের ইতিহাস ১১ পৃঃ।

(৪) পূর্ব্বকালে ময়মনসিংহ জিলার অনেক স্থান কোচদিগের অধিকার ছিল। যৎকালে সুসঙ্গের বর্ত্তমান মহারাজাদিগের পূর্ব্বপুরুষ সোমেশ্বর ঠাকুর ঐ পরগণায় আগমন করেন, তৎকালে তাহা এক কোচ রাজার শাসনাধীন ছিল। মোগল সম্রাট হুমায়ুনের সময়ে ঈশাখাঁ এ জিলার দক্ষিণ-পূর্ব্ব ভাগস্থ স্থান বিশেষে আসিয়া দীর্ঘিকাযুক্ত এক কোচ রাজার ভবন দেখিয়াছিলেন। ঈশাখাঁ সেই কোচ রাজাকে বধ করিয়া তাহার বাটীই স্বকীয় বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিলেন, এবং লোকাভাব প্রযুক্ত গ্রামের নাম "জঙ্গল-বাড়ী" রাখিলেন। ঈশাখাঁ হইতেই জঙ্গলবাড়ীর দেওয়ান সাহেব দের উৎপত্তি হইয়াছে। ১২৭৪ সন ১৬ই আষাঢ়ের বিজ্ঞাপনী পত্রিকা।

লাগিলেন (১)। আজিও এ পরগণার ভিন্ন ভিন্ন ভাগে ইঁহাদের কীর্ত্তি কলাপ নয়নগোচর হইয়া থাকে। ইঁহাদের মধ্যে কাছার রায়, সোণারায়, বিরৈরাণী, এবং দরিপা (২) সমধিক প্রসিদ্ধ। রাণীশিমুল, রাণীগাঁও, কোচনীপাড়া, সিন্দুরকোচা, মালকোচা, টাওকোচা, ডুফরিয়া, কাংশা, গড়দরিপা (গড় জরিপা) প্রভৃতি গ্রাম এই সময়ে প্রতিষ্ঠিত হয়। যে সকল স্থান, কাছাররায়ের অধিকৃত ছিল, তাহা "কাছার চাকলা" বলিয়া খ্যাত। নৈয়ারীকুড়ায়, কাছার ও সোণারায়ের ও গড় জরিপায় দরিপার ভগ্নাবশেষ বাটী ও পুষ্করিণ্যাদি, এবং কাকরকান্দী গ্রামে বিরৈরাণীর একটী দীর্ঘিকা দেখিতে পাওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন ডুফরিয়া, চান্দগাঁও, কাংশা, হাতিবান্দা, নাকগাঁও প্রভৃতি গ্রামে ইহাদের কীর্ত্তিচিহ্নের ভগ্নাবশেষ রহিয়াছে।

খৃঃ ষোড়শ শতাব্দীতে স্মার্ত্ত রঘুনন্দন সঙ্কলিত জ্যোতিস্তত্ত্বে "অঙ্গ বঙ্গোপবঙ্গ ত্রৈপুর কোশলাঃ" এই কয়েকটী দেশের একত্র উল্লেখ আছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিম পাড় পর্য্যন্ত প্রকৃত বঙ্গদেশ, সুতরাং ব্রহ্মপুত্রের পূর্ব্বকূলস্থিত এ অঞ্চল বঙ্গের সন্নিহিত এবং বঙ্গ ও ত্রিপুরার মধ্যস্থিত বলিয়া ঐ গ্রন্থানুসারে ইহা তৎসময় উপবঙ্গ নাম ধারণ করিয়াছিল বলা যাইতে পারে।

উত্তর ও দক্ষিণ কোশল ভিন্ন, ভারতবর্ষের পূর্ব্বভাগেও এক কোশল দেশ ছিল (৩)। কামরূপরাজ হর্ষদেব—"গৌড়োড্রাদি কলিঙ্গ কোশলাধিপ" উপাধি ধারণ করিয়া ছিলেন (৪)।

শেরপুর মুসলমান রাজত্বকালে প্রথম বাঙ্গালা দেশের অধীন হয় (৫)। ঐ সময় ঢাকা, রাজমহল, মুরশিদাবাদ, ইহার যে স্থানে যখন রাজধানী থাকিত, সেখানেই এই পরগণা সম্বন্ধীয় যাবতীয় কার্য্যকর্ম্ম নিষ্পন্ন হইত। এইরূপ জনশ্রুতি, বর্ত্তমান জিলা সংস্থাপিত হওয়ার বহু পূর্ব্বে ইহা রঙ্গপুর জিলার অধীন ছিল। ১৬০৩ খৃঃ রাঙ্গামাটীয়ার মোগল ফৌজদার কোচবিহারের অধিকাংশ আক্রমণ এবং তাহার কিঞ্চিৎপরে রঙ্গপুরের অন্তঃপাতি বোদাচাকলা, পাটগাঁও, ও পূর্ব্বভাগ সামান্য জমিদারি বলিয়া বাঙ্গালার অন্তর্ভুক্ত করেন (১)। সেই সময় শেরপুর, রঙ্গপুর জিলার অধীন হওয়া অসম্ভব নহে।

মোগল সম্রাট আকবর শাহের সময়ে রাজস্বসচিব রাজা তোড়রমলের রাজস্বসংক্রান্ত বন্দোবস্তী ডৌলে এ পরগণা "দশকাহনীয়াবাজু" নামে অভিহিত আছে। প্রফেসার ব্লকম্যান সাহেব ইহার রাজস্ব ১৬৪৫৬০০ দাম অর্থাৎ আকবরসাহী মুদ্রার ৪১১৪০।০ আনা অত্যধিক বিবেচনা করিয়া অনুমান করেন, তোড়রমলের সময়ে দশকাহনীয়া আরও অনেক ভূভাগ লইয়া বিস্তৃত ছিল। (২) এইরূপ কিম্বদন্তী—পুণ্যতোয় ব্রহ্মপুত্র নদ তৎকালে এত বিস্তৃত ছিল যে, বিশাল জলরাশি অতিক্রম করিতে এক প্রহরকাল অতিবাহিত হইত এবং তন্নিমিত্ত পারাপার জন্য "দশকাহন" তরপণ্য নির্দ্দিষ্ট ছিল বলিয়া এ পরগণা "দশকাহনীয়া" বলিয়া প্রথিত ছিল। প্রফেসর ব্লকম্যান সাহেব এই সংখ্যাও অত্যধিক বিবেচনা করিয়া ইহা "খালসা" মহালের জমা বলিয়া অনুমান করেন (৩)।

---

(১) গ্লেজিয়ার সাহেব কৃত রঙ্গপুরের ইতিহাস

(২) দরিপা—দিলীপ শব্দের অপভ্রংশ, কালে ইহা জরিপা শব্দে অভিহিত হইয়াছে। পরন্তু প্রাচীন কাগজ পত্রে দরিপা শব্দই দৃষ্ট হয়। (১২১৬ সন রাজচন্দ্র চৌধুরীর দাখিলী ইসিমনবিসী।

(৩) বিশ্বকোষ ৪র্থ ভাগ (ক) ৬০৭ পৃঃ।

(৪) বিশ্বকোষ—প্রাগ্‌জ্যোতিষ ৪৪৯ পৃঃ।

(৫) ৭৯১ বঙ্গাব্দে (১৩৮৪ খৃঃ) মুসলমানেরা শ্রীহট্ট অধিকার করেন, তৎসঙ্গে শেরপুরও বঙ্গরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। স্বর্গীয় হরচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় নামীয় প্রফেসর ব্লকম্যান্ সাহেবের ১৮৭৪ সন ১১ই অক্টোবরের পত্র।

*　*　*　*　*

I am convinced that your Sherpur became annexed to Bengal with Silhet.

*　*　*　*　*

(১) রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের বিবিধার্থ সংগ্রহ ৫ম পর্ব্ব ৮ পৃঃ।

(২) ১৮৭৪ সালের এসিয়াটিক সোসাইটীর জার্ণেল ১ম ভাগ ১০৬ পৃঃ।

*　*　*　*

(৩) ১৮৭৪ সালের ১১ই অক্টোবরের লিখিত মদীয় পরমারাধ্য পিতৃদেবের নামীয় প্রফেসর ব্লকম্যান সাহেবের পত্র।

If the faremoney over the Brahmaputra was 10 Kahans i.e. 12800 Cowries, the sum was exorbitant. I should not be astonished, if the 10 Kahans expressed the Khalsa revenue of the Mahall under the old Bengal Kings.

১০ কাহন=১২৮০০ কড়ি—শিকা ১০ টাকা।

তৎকালীন ভূস্বামী শের আলিগাজী নিজ নামানুসারে এ পরগণার "শেরপুর" নামকরণ করিয়াছিলেন। ১১২৯ বঙ্গাব্দে (১৭২২ খৃঃ) নবাব জাফর খাঁর (ইনি পরে মুরশিদ কুলী খাঁ নাম ধারণ করেন।) তক্‌সিম্ বা রাজস্ব সংক্রান্ত ডৌলে, এই পরগণা "শেরপুর দশকাহনীয়া" নামে অভিহিত দেখা যায়, এবং ইহা পরগণে "কড়ই-বাড়ী" চাকলার অধীন হয়; কিন্তু অল্পকাল পরেই ইহার অধিকাংশ ঢাকার অন্তর্ভুক্ত হয়।

ইংরেজ রাজত্বেও কিছুকাল এ পরগণা "শেরপুর দশকাহনীয়া" বলিয়া ব্যবহৃত হইয়াছিল; পরে ইহা শুধু "শেরপুর পরগণা" নামে অভিহিত হইতেছে।

দিল্লীশ্বর শাহ আলম ১৭৬৫ খৃঃ যে সনন্দদ্বারা বাঙ্গালা বিহার, উড়িষ্যার দেওয়ানী ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীকে সমর্পণ করেন, তদনুসারে লেপ্টেনেণ্ট সুইন্‌টন্ (লোকে ইহাঁকে সুলতান সাহেব বলিত) ঢাকাতে আগমন পূর্ব্বক এতদ্দেশের শাসনভার গ্রহণ করিলেন (১)। তদবধি অন্যান্য স্থানের সহিত এ পরগণাতেও ইংরেজাধিকার প্রতিষ্ঠিত হইল। সূর্য্যনারায়ণ চৌধুরী এ পরগণার তদানীন্তন ভূস্বামী ছিলেন।

বৃটিশাধিকারে প্রথমতঃ ঢাকানগরে এপরগণার যাবতীয় রাজকার্য্য সংসাধিত হইত। ১১৯৪ বঙ্গাব্দে (১৭৮৭ খৃঃ) ময়মনসিংহ জিলা স্থাপিত হওয়ায়, তদবধি শেরপুর উক্ত জিলার শাসনাধীন হইয়াছে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীচারুচন্দ্র চৌধুরী।

বিক্রমপুরে বৌদ্ধ প্রভাব।

বিক্রমপুরে বৌদ্ধ প্রভাব কোন্ সময়ে কিরূপভাবে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল, সে সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইলে, সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধযুগের প্রাচীন ইতিহাসও আলোচনা করা কর্ত্তব্য। ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, গৌতম বুদ্ধের মৃত্যুর প্রায় দেড়শত বৎসর পর তদীয় ধর্ম্মনীতি জন-সাধারণের মধ্যে প্রচারিত হয়। সম্রাট্ অশোকের (প্রিয়দর্শী খ্রীঃ পূঃ ২৬৪-২২২) রাজত্বের পূর্ব্বে কি চন্দ্রগুপ্ত (১ম), কি বিন্দুসার কেহই বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ কিংবা উক্তধর্ম্ম প্রচারের কোনও রূপ সহায়তা করেন নাই। মহাত্মা অশোকই সর্ব্ব প্রথমে উহা রাজধর্ম্মরূপে গ্রহণ করিয়া প্রচারের নিমিত্ত চারিদিকে ধর্ম্ম প্রচারক প্রেরণ করেন। তাঁহারই সময়ে চীন, জাপান, সিংহল, তিব্বত প্রভৃতি নানা দূরদেশে সাম্যবাদী গৌতমবুদ্ধের প্রেমের ধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছিল। অশোকের ধর্ম্ম বিস্তারের সময় বঙ্গদেশের অবস্থা তাদৃশ সন্তোষজনক ছিল না। তৎকালে বঙ্গদেশের অধিবাসিবর্গ কোন্ ধর্ম্মাবলম্বী ছিল, তাহা জানিতে পারা যায় না। মোটের উপর অশোকের রাজত্বকালীন বিবরণ হইতে আমরা তৎকালীন বঙ্গরাজ্যের অবস্থা জ্ঞাত হইতে পারি নাই। এইমাত্র জানিতে পারা যায় যে, তৎকালে বঙ্গদেশ ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে বিভক্ত হইয়া এক এক জন সামন্ত রাজার অধীন ছিল। তাঁহার রাজত্বকালে বঙ্গদেশে বৌদ্ধধর্ম্মের বিশেষরূপে প্রচার হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। বঙ্গদেশে বৌদ্ধধর্ম্মের বিস্তৃতি তাঁহার মৃত্যুর অনেক পরে হইয়াছিল বলিয়াই ঐতিহাসিক প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়;—কারণ বঙ্গের কোন অংশেই অশোক নির্ম্মিত স্তূপ, বিহার বা চৈত্যের চিহ্ন বিদ্যমান নাই—কিংবা এ পর্য্যন্ত বাঙ্গলার কোন অংশ হইতে তৎপ্রদত্ত কোনও খোদিত লিপি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে বলিয়াও জানা যাইতেছে না। কাজেই তাঁহার রাজত্বকালে ভারতের অন্যান্য প্রদেশে বৌদ্ধধর্ম্ম যেরূপ প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল, বাঙ্গলাদেশে তদ্রূপ কিছুই হয় নাই;—বোধ হয় সামান্য একটু আভাস মাত্র জাগিয়াছিল।

সম্রাট্ অশোক ও বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার।

সম্রাট অশোক ও বঙ্গদেশ।

প্রিয়দর্শীর মৃত্যুর পর হইতে গুপ্ত সম্রাট্‌গণের রাজত্বের পূর্ব্ব সময় পর্য্যন্ত, বৌদ্ধ ভারতের প্রাচীন

(১) "Romance of an Eastern Capital" by Bradley Birt.—২২০ পৃষ্ঠা।

ইতিহাস তমসাবৃত। ঐ সময়কার জৈন ও বৌদ্ধ সাহিত্যের অধিকাংশ পুস্তকাবলী পাণ্ডুলিপির অপঠিত অংশসমূহের মধ্যে নিবদ্ধ কিংবা কোন কোন অংশে চিরবিলুপ্ত হওয়ায় সে সময়কার তেমন প্রমাণোপযোগী কোন বিবরণই আমাদের হস্তগত হইতেছে না। মুদ্রালিপি ও শিলালিপির সাহায্যে সে সময়কার যে সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত জানা গিয়াছে, তাহাও অতি সামান্য। অশোকের পরবর্ত্তী দুইশত বৎসর পর্য্যন্ত, অর্থাৎ মহারাজ কনিষ্কের আবির্ভাবের পূর্ব্ব সময় পর্য্যন্ত, ভারতবর্ষের ইতিহাসের পৃষ্ঠাগুলি যে সমুদয় রাজবংশের আবির্ভাবে ক্ষণিক আলোকিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে মৌর্য্য, শাকদ্বীপী, কাণ্ব বা কাণ্বায়ণ নামক ব্রাহ্মণ বংশ, অন্ধ্র রাজগণ তৎপরে শকাধিপ কনিষ্ক ভারত সম্রাট্ হইলেন। খ্রীষ্টিয় প্রথম শতাব্দী হইতেই মহারাজ কনিষ্কের প্রাধান্য বিস্তৃতি লাভ করে।

কনিষ্ক।

মহারাজ কনিষ্কের রাজধানী প্রাচীন পুরুষপুর বা বর্ত্তমান পেশোয়ারে অবস্থিত ছিল। কনিষ্কও বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন এবং ইঁহার নেতৃত্বেই বৌদ্ধদিগের চতুর্থ সভার অধিবেশন হয়। দেবপ্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া পূজার প্রচলন সম্রাট্ অশোকের মৃত্যুর পর শাকদ্বীপীর ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃকই সর্ব্বাগ্রে প্রচলিত হয়। মহারাজ কনিষ্কও ইহাদের অনুকরণে ক্রিয়াকাণ্ডবহুল দেবদেবী পূজামূলক "মহাযান" মত প্রচার করেন। কথিত আছে 'বুদ্ধ চরিত' প্রণেতা অশ্বঘোষ বৌদ্ধধর্ম্মোক্ত মহাযান সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। এতদিন পর্য্যন্ত সর্ব্বসাধারণের নিকট অশ্বঘোষ প্রণীত "বুদ্ধচরিত" ব্যতীত অপর কোনও গ্রন্থের নাম পরিজ্ঞাত ছিল না; কিন্তু সম্প্রতি চীনভাষায় একখানি প্রাচীন গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে, অশ্বঘোষ প্রণীত "মহাযান শ্রদ্ধোৎপাদসূত্র" নামে একখানি সংস্কৃত গ্রন্থের ইহা অনুবাদ। জাপানের সুপ্রসিদ্ধ বৌদ্ধভিক্ষু সুপণ্ডিত টিটারোসুযুকী কিছুকাল পূর্ব্বে এই শ্রদ্ধোৎপাদসূত্রের চৈনিক অনুবাদের ইংরেজী ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন এবং "Awakening of faith in the Mahajana" এই নাম দিয়া ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে ঐ গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। *

সারনাথে মৃত্তিকা খনন দ্বারা প্রায় দশ হস্ত মৃত্তিকার নিম্নে সম্রাট্ কনিষ্কের যে শিলালিপি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে জানিতে পারা যায় যে, পূর্ব্ব-ভারতেও তাঁহার অধিকার বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। মহারাজ কনিষ্ক ব্রাহ্মণ বিদ্বেষী না হইলেও তাঁহার ধর্ম্মানুরাগ যে বৌদ্ধ ধর্ম্মের দিকেই অধিকতর প্রবল ছিল, তাহা তাঁহার যত্নে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ প্রভৃতি দেশে মহাযান বৌদ্ধমতের প্রচার হইতেই বুঝিতে পারা যায়। তবে ক্রিয়াকাণ্ড-বহুল মহাযান মতোক্ত বৌদ্ধদেব প্রতিমার পূজা কোন্ সময়ে পূর্ব্ববঙ্গে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল, তাহার কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না; কারণ কনিষ্কের সাম্রাজ্য উত্তরে কাশ্মীর, পূর্ব্বে মথুরা, দক্ষিণে সিন্ধু ও পশ্চিমে গান্ধার পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল,—বঙ্গের কোনও উল্লেখ নাই। বৌদ্ধ-গ্রন্থ মতে কনিষ্ক সমগ্র ভারতেই মহাযান মত প্রচার করিয়াছিলেন, কোন মত প্রচারিত হইলেই যে তাহা নির্ব্বিবাদে গৃহীত হইবে, তাহার কি কোন অকাট্য প্রমাণ আছে?

কনিষ্কের মৃত্যুর পর হবিষ্ক সিংহাসনারোহণ করেন। হবিষ্ক অত্যন্ত পরাক্রমশালী নরপতি ছিলেন—পেশোয়ার হইতে পূর্ব্ববঙ্গ পর্য্যন্ত তাঁহার অধিকার বিস্তৃত হইয়াছিল—অতএব তাঁহার রাজত্ব সময়েই পূর্ব্ববঙ্গে বা বিক্রমপুরে বৌদ্ধ মহাযান মতাবলম্বী দেবদেবীমূর্ত্তি পূজার প্রচলন হইয়াছিল, ইহাই যথার্থ বলিয়া মনে হয়। শকাধিপতি কনিষ্কের সময় হইতেই শকাব্দা প্রচলিত হইতে থাকে। হবিষ্ক ৭৪ শকাব্দ হইতে ৯৮ শকাব্দ পর্য্যন্ত রাজদণ্ড পরিচালনা করিয়াছিলেন। পূর্ব্ব ভারত শাসন করিবার নিমিত্ত তাঁহার অধীন পাটলীপুত্র নগরে একজন ক্ষত্রপ (Satrap) অধিষ্ঠিত ছিলেন—অতএব আমাদের এ অনুমান অসঙ্গত নহে যে, ৭৪ হইতে ৯৮ শকাব্দার মধ্যে পূর্ব্ববঙ্গে হিন্দু ও বৌদ্ধ দেবদেবী মূর্ত্তির পূজা প্রচলিত হইতে থাকে। বর্ত্তমান সময়ে ১৮৩৩ শকাব্দা চলিতেছে—ইহা হইতে ৭৪ শকাব্দা পরিত্যাগ করিলেও ১০৫৮ বৎসর

* 'বাণী' তৃতীয় বর্ষ ৬ষ্ঠ ও সপ্তম সংখ্যা শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ লিখিত 'অশ্বঘোষ' শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

প্রায় দ্বিসহস্র বৎসর পূর্ব্ব হইতেই যে বিক্রমপুরে দেবমূর্ত্তি-পূজার পদ্ধতি প্রচলিত হয়, তাহা বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ-বলে গ্রহণ করা যাইতে পারে।

বহু প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে ইতিহাস রচিত হয় নাই; পুরাণ সংহিতা, এমন কি অনেক সময়ে, কাব্য নাটক পর্য্যন্তও ইতিহাসের কার্য্য করিত। বৌদ্ধ যুগ হইতেই ইতিহাস রচনার প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়, কিন্তু তখনও কোন ঐতিহাসিক গ্রন্থ বিরচিত হয় নাই; কাজেই সে যুগের যে ইতিহাস আমরা আলোচনা করিতে যাইতেছি, তাহার মূলে খুব দৃঢ় সত্য নিহিত আছে কিনা, বলা অসম্ভব।

হুবিষ্কের পুত্র বাসুদেবের সময়েই কনিষ্ক প্রতিষ্ঠাপিত বিশাল সাম্রাজ্যের ধ্বংস হইতে থাকে, এমন কি তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই সুবিশাল উত্তর ভারতীয় শাক সাম্রাজ্য ধ্বংস হইয়া যায়। তৎপর খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে লিচ্ছবিগণ পাটলী পুত্র অধিকার করেন। তাঁহাদের পরে খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে মধ্য ভারতে ত্রৈকুটক বা হৈহয় বংশ প্রবল হইয়া উঠে, ইঁহারা অঙ্গ-বঙ্গ অধিকারের চেষ্টা করিয়া বিফলমনোরথ হন। এই বংশের অধঃপতনের পরে গুপ্ত বংশের অভ্যুদয় হয়—ইঁহাদের প্রাধান্য বহুদিন পর্য্যন্ত অব্যাহত ছিল। তৃতীয় খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে গুপ্ত ও তৎপুত্র ঘটোৎকচ হইতে আরম্ভ করিয়া অষ্টম শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্য্যন্ত গুপ্তরাজগণের প্রাধান্য বঙ্গের বিভিন্ন স্থানে সঞ্জীবিত ছিল। কর্ণ সুবর্ণে তাঁহাদের রাজধানী সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। গুপ্তরাজগণ ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মানুরক্ত ছিলেন; কিন্তু তাহা হইলে কি হইবে? পূর্ব্বপ্রতিষ্ঠিত জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রতি সাধারণের অনুরাগ এতদূর বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে, তাঁহারা মধ্যবর্ত্তী যুগে শুঙ্গ ও কাণ্ববংশের প্রচলিত ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের প্রতি বিন্দুমাত্রও অনুরাগ প্রদর্শন করিতে পারেন নাই; কাজেই গুপ্তরাজগণের ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মানুরাগ থাকা সত্ত্বেও জনসাধারণ পূর্ব্বগৃহীত ধর্ম্মমত পরিত্যাগ করে নাই। গুপ্ত সম্রাটগণের রাজত্ব সময়ে অর্থাৎ চতুর্থ খ্রীঃ অঃ হইতে অষ্টম খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত গৌড় ও বঙ্গদেশে বৌদ্ধ ধর্ম্ম ও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম সমভাবেই প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল। গুপ্তরাজগণ নিজেরা শৈব অথবা বৈষ্ণব হইলেও সাধারণ-গৃহীত বৌদ্ধধর্ম্মের অবমাননা করেন নাই, বরং প্রকৃতি পুঞ্জের মনোরঞ্জনের নিমিত্ত তাহারা বৌদ্ধ দেবদেবীর পূজায় যথেষ্ট উৎসাহ প্রদান করিতেন। *

গুপ্তরাজগণের পরবর্ত্তী সময়ে অর্থাৎ দশম শতাব্দীর মধ্যবর্ত্তী সময়ে পালরাজগণ বঙ্গদেশে বিশেষ ক্ষমতাশালী হইয়া উঠেন, ইঁহারা "গৌড়েশ্বর" উপাধি ভূষণে ভূষিত ছিলেন, পালবংশীয় নৃপতিগণের এক শাখা পূর্ব্ববঙ্গের অন্তর্গত বিক্রমপুরে, তালিপাবাদ পরগণার মাধপপুরে, ভাওয়ালের অন্তর্গত কাপাসিয়ায় এবং সাভারের নিকটস্থ কাঠাবাড়ীতে রাজত্ব করেন। পালবংশীয় নৃপতিগণ বৌদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। ইঁহাদের রাজত্ব সময়ে পূর্ব্ববঙ্গে বৌদ্ধ-ধর্ম্ম বিশেষরূপে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল,—ইহা সর্ব্ববাদি-সম্মত ঐতিহাসিক তথ্য। ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যবর্ত্তী সময়ে, সেনবংশীয় নৃপতিবর্গ কর্ত্তৃক বঙ্গরাজ্যের প্রভুত্ব গ্রহণের পূর্ব্বপর্য্যন্ত, বৌদ্ধধর্ম্ম বিক্রমপুরে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। তৎপরে হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী সেনরাজগণের সঙ্গে সঙ্গে উহা পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইয়া যায়। আমরা বৌদ্ধ-ধর্ম্মের বিস্তৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করিতে যাইয়া, পূর্ব্ববঙ্গে কোন্ সময়ে ইহার প্রচার হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে নিম্ন-লিখিত রূপ সিদ্ধান্ত কয়টিতে উপনীত হই।—

১। গৌতম বুদ্ধের মৃত্যুর প্রায় দেড়শত বৎসর পরে মহারাজা অশোক কর্ত্তৃক সর্ব্বাগ্রে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারিত হয়; কিন্তু সে সময়ে উহা বঙ্গরাজ্যে গৃহীত হয় নাই।

* গুপ্তরাজগণের মধ্যে কেহ কেহ যে শৈব ছিলেন, তাহা ফৈজাবাদ জিলার অন্তর্গত ভারদি ডিহ (Bharadi Dih) নামক গ্রামে প্রাপ্ত শিবলিঙ্গের গাত্রে খোদিত প্রমথকুমার গুপ্তের লিপি হইতেই প্রমাণ করা যাইতে পারে। শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ লিখিত Two Inscriptions of Kumara Gupta নামক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। J. R. A. S. B. December, 1909. P. 457.

বিক্রমপুরস্থিত দ্বিপাড়া নামক গ্রামের একটী প্রাচীন পুষ্করিণী খননেও একটী পঞ্চমুখবিশিষ্ট শিবলিঙ্গ পাওয়া গিয়াছে—সেও প্রায় দুইশত বৎসরের কথা—ঐরূপ শিবলিঙ্গ পূজা কোন্ সময়ে প্রচলিত হয়, তাহাও আলোচনার যোগ্য।

২। মহারাজা কনিষ্ক "মহায়ান" মত প্রচার করেন। এক সময়ে এই ক্রিয়াকাণ্ডবহুল দেবদেবী পূজার মত ভারতের প্রায় সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়াছিল। কিন্তু কনিষ্কের সময়ের কোনও বৌদ্ধ মূর্ত্তি এপর্য্যন্ত বঙ্গদেশের কোন স্থানে পাওয়া গিয়াছে বলিয়া জানা যায় নাই। অতএব তাঁহার সময়েও বঙ্গদেশে বৌদ্ধ প্রাধান্য বিশেষ রূপে বিস্তৃত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না।

৩। কনিষ্কের পুত্র হুবিষ্কও মহায়ান-মতাবলম্বী ছিলেন এবং তাঁহার রাজত্বও সুদূর পূর্ব্ববঙ্গ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। অতএব তাঁহার সময়েই সর্ব্বপ্রথমে বৌদ্ধ মহায়ান মত পূর্ব্ববঙ্গে বা বঙ্গরাজ্যে ধীরে ধীরে মূল প্রতিষ্ঠা করিয়া লইয়াছিল, বলিয়াই বিবেচনা করি। ইহার অধিক এসম্বন্ধে কোন কথা বলা যায় না; কারণ, এসময়কার প্রাচীন ইতিহাস এখনও বহুল অংশে মৃত্তিকা গর্ভে নিহিত।

৪। প্রকৃতপক্ষে বলিতে গেলে, গুপ্তরাজগণের পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ে বাঙ্গালা দেশের প্রকৃত অবস্থা কি ছিল, তাহা বিশদরূপে জানিবার কোন উপায়ই নাই। গুপ্ত-রাজগণের সময়েই বিক্রমপুরে বা পূর্ব্ববঙ্গে যে বৌদ্ধধর্ম্ম-মত বিশেষরূপে প্রচারিত হইয়াছিল এবং অধিবাসি-গণের অধিকাংশই যে বৌদ্ধ ছিল, তাহা সে যুগের প্রাপ্ত বৌদ্ধ মূর্ত্তি সমূহ হইতেই বিশেষ রূপে প্রমাণিত হয়। চৈনিক পরিব্রাজক য়ুয়ন্ চয়ঙের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত হইতেও তাহা সুস্পষ্ট রূপে প্রমাণ করা যাইতে পারে এই গুপ্ত-রাজগণের সময়েই তদানীন্তন নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাতনামা পণ্ডিত শীলভদ্র বিক্রমপুরে জন্মগ্রহণ করিয়া-ছিলেন। য়ুয়ন চয়ঙ স্বয়ং ঐ মহাপুরুষের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন। য়ুয়ন্ চয়ঙের সমতটের বর্ণনা হইতে জানিতে পারি যে, সপ্তম শতাব্দীতে যখন তিনি সমতট দর্শন করেন, সে সময়ে তথায় ত্রিশটী বৌদ্ধ মঠ এবং একশত দেব মন্দির দেখিয়াছিলেন। * তাঁহার এ উক্তির অকাট্য প্রমাণ বিক্রমপুরস্থিত বিভিন্ন গ্রামের দেউলবাড়ী গুলি। অধিকাংশ দেউলবাড়ীই অতি প্রাচীন। এখনও দিন দিন মৃত্তিকা খননের সঙ্গে সঙ্গে এ সকল দেউলবাড়ী হইতে হিন্দু ও বৌদ্ধ দেবদেবীমূর্ত্তি ভগ্ন প্রস্তরস্তম্ভের ধ্বংসাবশেষ, প্রস্তর-সোপানাবশিষ্ট ইত্যাদি বহু পুরাতত্ত্বের মীমাংসক দ্রব্যাদি আবিষ্কৃত হইতেছে। বিক্রমপুরের যে সকল দেবমূর্ত্তি স্থানান্তরিত হইয়াছে, তাহার সংখ্যাই বা কে করে? কালের সুদীর্ঘ তরঙ্গ প্রহার এসকল দেউল বাড়ীর উপর দিয়া না গেলে, কখনই ইহাদের এরূপ শোচনায় অবস্থা হইত না। দেউলবাড়ীর সংগৃহীত ইষ্টকাদিও অন্যতম প্রমাণ।

এই সকল ইষ্টকের আকার ৮×৬ ইঞ্চি। আমি যে যে দেউল বাড়ী হইতে দু একখানি অভগ্ন ইষ্টক সংগ্রহ করিয়াছি, তাহার অধিকাংশের আকারই পূর্ব্বোক্তরূপ। ক্ষুদ্রাকৃতি পাত্‌লা গৌড়ীয় ইষ্টকের নমুনার ইষ্টক কোন দেউল বাড়ীতেই দেখিতে পাইলাম না। অধিকাংশ দেউল বাড়ীতেই ধ্যানীবুদ্ধ, লোকেশ্বর, মারাচী ইত্যাদি বৌদ্ধ দেবমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে;—আর এ সকল মূর্ত্তির অধিকাংশই চতুর্থ খ্রীষ্টাব্দের বিশেষ শিল্প চিহ্ন "কীর্ত্তিমুখ" চিহ্নিত। কোন একটী বৌদ্ধ মূর্ত্তির পাদপীঠে গুপ্তদের রাজত্ব কালীন প্রচলিত বঙ্গাক্ষরে খোদিত "যে ধর্ম্ম হেতু প্রভবঃ" এই মন্ত্রটী দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। ইহাও কি অন্যতম প্রমাণ নহে যে, গুপ্তদের রাজত্ব সময়েই বিক্রমপুরে বৌদ্ধধর্ম্ম বিশেষরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল?

মূর্ত্তি-তত্ত্বালোচনা দ্বারাও আমরা ইহা বিশেষরূপে প্রমাণ করিতে পারি যে, গুপ্ত রাজগণের পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ে বৌদ্ধ ধর্ম্ম বিক্রমপুরে তেমন প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে নাই। তাহার কারণ (ক) অধিকাংশ দেবমূর্ত্তিই চতুর্থ খ্রীষ্টাব্দের 'কীর্ত্তিমুখ' চিহ্নিত, কাজেই ইহা নিশ্চিতরূপে দৃঢ়তার সহিত বলা যায় যে, চতুর্থ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে কোন দেব-মূর্ত্তি-পূজার প্রচলন বিক্রমপুরে হয় নাই, (খ) 'কীর্ত্তিমুখ-চিহ্ন' বিরহিত কোন কোন স্থলে 'ছত্র-চিহ্নিত' বা ঐ রূপ কোন প্রকারের শিল্পনিদর্শনবিহীন যে সকল বহুবাহু-বিশিষ্ট বা অন্য কোন প্রকারের দেবমূর্ত্তি দেখিতে পাই, তাহার অধিকাংশ দেবমূর্ত্তিই যে নবম শতাব্দীর পরবর্ত্তী

* It had more than 30 Buddhist Monasteries and above 2000 Brethren all adherents of the sthavira school * * there were 100 Deva temples. Watter's Yuanchuwang Vol II.

যুগে গঠিত হইয়াছিল, বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতগণ প্রায় সকলেই তাহা স্বীকার করেন। শিল্পকলাভিজ্ঞ পণ্ডিত কুমার-স্বামী বলেন যে, ভারতবর্ষীয় তক্ষণ শিল্প খ্রীষ্টিয় তৃতীয় শতাব্দীর পরবর্ত্তী যুগ হইতেই উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করিতে থাকে এবং নবম শতাব্দীতে উহা পূর্ণ-রূপে উন্নতি লাভ করে,—ইহাও আমাদের উক্তির অন্যতম প্রমাণ। অতএব গুপ্তরাজগণের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া সেন রাজগণের রাজত্বের পূর্ব্ব সময় পর্য্যন্ত অর্থাৎ তৃতীয় খ্রীষ্টাব্দ হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বাদশ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বিক্রমপুরে বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। বৌদ্ধ-ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা লাভ করিলেও হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বী লোকের সংখ্যাও ন্যূন ছিল না; কারণ তৎকালে একই পরিবারের বিভিন্ন ব্যক্তি কেহ হিন্দু, কেহ বৈষ্ণব, কেহ বৌদ্ধ এরূপ ছিলেন। সে ইতিহাস আলোচনার স্থল ইহা নহে বলিয়া এস্থানে তাহা পরিত্যাগ করিলাম।

অদ্য আমরা যে ধ্যানী বুদ্ধ মূর্ত্তিটির চিত্র প্রকাশ করিলাম, উহা প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে বিক্রমপুরস্থ বজ্র-যোগিনী গ্রামের কোনও প্রাচীন পুষ্করিণী খননে পাওয়া গিয়াছিল। অধুনা ইহা স্বর্গীয় দীননাথ সেন মহাশয়ের গেণ্ডারিয়াস্থ বাস-ভবনে অযত্নে রক্ষিত আছে। বিক্রমপুর সোনারঙ্গ নিবাসী ডেপুটি স্কুল ইন্‌স্পেক্টার ৺ বৈকুণ্ঠ নাথ রায় মহাশয় এই এই মূর্ত্তিটি বজ্রযোগিনী গ্রাম হইতে সংগ্রহ করিয়া উক্ত সেন মহাশয়কে উপহার প্রদান করিয়াছিলেন। বৈকুণ্ঠ বাবু এইরূপ ভাবে আরও সুন্দর সুন্দর প্রাচীন বৌদ্ধ ও হিন্দু দেব দেবামূর্ত্তি বিক্রমপুর হইতে স্থানান্তরিত করিয়া নানা জনকে উপহার প্রদান করিয়া দেশের প্রাচীন ইতিহাস সংকলনের পক্ষে সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া গিয়াছেন। এ সকল মূর্ত্তি কাহারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি হওয়া কোন রূপেই উচিত নহে—ইহা সর্ব্বসাধারণের দেখিবার যোগ্য স্থানেই রক্ষা করা উচিত। সময়াভাবে মূর্ত্তিটীর প্রকৃত মাপ লইবার অবসর আমার হয় নাই; অনুমানিক ৩×২ ফুট। ইহা কৃষ্ণ-প্রস্তর-নির্ম্মিত, দেখিলে মনে হয়,—এই বুঝি শিল্পী সেদিন ইহাকে তক্ষণ করিয়া গিয়াছে। ধ্যানীবুদ্ধের প্রশান্ত, নির্ব্বিকার ও হাসিমাখা বদন কমলের মধ্যে ধর্ম্মের পবিত্র জ্যোতিঃ বিভাসিত। বুদ্ধদেব ধ্যান-নিরত। হস্তের নিম্নভাগ ভগ্ন, কিন্তু তাহা হইলেও বুঝিতে পারা যায় যে, ঐ ভগ্ন হস্তেরও তলদেশে অন্য করতলের উপর ধ্যানী মুদ্রাকারে ন্যস্ত ছিল। বুদ্ধদেব পদ্মাসনোপবিষ্ট। পাদপীঠের উভয় পার্শ্বে ও নিম্নে কোন মূর্ত্তি নাই। এই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর

'র বদন কমলের কিয়দংশ, হস্তের নিম্নাংশ ও চালীর উর্দ্ধাংশ কতক পরিমাণে ভগ্ন বলিয়া মূল মূর্ত্তিটির পূর্ণ সৌন্দর্য্যের আংশিক পরিমাণে ক্ষতির কারণ হইলেও ইহা যে প্রাচীন তক্ষণশিল্পের অত্যুৎকৃষ্ট নিদর্শন, তাহা

নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। ক্ষুদ্র কুঞ্চিত কেশকলাপ বিস্তৃত, দীর্ঘ লাবণ্যমণ্ডিত সুন্দর বাহুযুগল, উন্নত স্কন্ধ, বক্ষ, ক্ষীণ কটি, সুগভীর নাভি সকলই উচ্চতর আদর্শে গঠিত। মূর্ত্তিটির আর একটি বিশেষত্ব এই যে অন্যান্য ধ্যানী বুদ্ধ মূর্ত্তির কণ্ঠে যেরূপ উপবীত বিলম্বিত দেখিতে পাওয়া যায়, এই মূর্ত্তির কণ্ঠদেশে তাহা নাই। "Buddhist Art in India" নামক গ্রন্থের ১৮০ পৃষ্ঠার ১২৮ নং মূর্ত্তির সহিত এই মূর্ত্তির বহুল সৌসাদৃশ্য অনুভূত হয়। সে মূর্ত্তির ন্যায় এ মূর্ত্তির শীর্ষদেশেও বুদ্ধ গয়ার মন্দির-চূড়া দেখা যাইতেছে, আর পার্শ্বে দুইদিকে দু'টি দু'টি করিয়া চারিটি পুরুষ ও স্ত্রী পবিত্র বোধিবৃক্ষের পত্র শোভিত পল্লব ধারণ করিয়া আছে। বুদ্ধ গয়ায় মন্দিরালাখ্যের নিম্নে চতুর্থ খ্রীষ্টাব্দে বিশেষ শিল্পচিহ্ন কীর্ত্তিমুখ অঙ্কিত থাকায়, এই ধ্যানী বুদ্ধ মূর্ত্তিটির সময় নিরূপণ লইয়া তর্ক বিতর্কের আর কোন প্রয়োজনই নাই।

তৃতীয় ও চতুর্থ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ধীরে ধীরে বৌদ্ধ প্রভাব বিক্রমপুরে বিস্তৃতি লাভ করিতে আরম্ভ করিয়া, পাল রাজগণের রাজত্বের শেষ সময় পর্য্যন্ত, যে উহা বিক্রমপুরে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল, এ সকল মূর্ত্তিই তাহার জীবন্ত সাক্ষী।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

জমিদার।

আমরা, ভূম্যধিকারী বঙ্গে,
সদা, এসব বন্ধু সঙ্গে,
কত ফূর্ত্তিতে করি সময় হত্যা,
তাস, পাশা, চতুরঙ্গে;

মোদের, Highly furnished room,
তাতে দিন রাত "দেরে তুম্"
ঐ, তবলার চাঁটি, বাহবা'র চোটে,
নাই পরশীর ঘুম।

চল্‌ছে, সুন্দর টানা পাখা,
তার, ঝালরে আতর মাখা,
আর, হরদম পান তামাক চল্‌ছে,
গল্প চল্‌ছে ফাঁকা।

আছে, ডজন চারেক চাকর,
বসে, মাচ্ছে মাছী ও মাকর,
দেখ, তাদেরো মাথায় আলবার্ট টেরী
(ভুঁড়িটিও বেশ ডাঁগর);
তারাও রসিক নাগর।

মোদের, আছে পেয়ারের ভৃত্য,
তারা, যোগায় মেজাজ নিত্য;
আর, উদর পূরিয়া প্রসাদ পাইয়া,
বা-খুসি তাদের চিত্ত।

বাইরে, সমাজের ধারো ধারি,
বাড়ীতে, পূজোর জমক ভারি,
আবার, Half a score বাবুর্চ্চি আছে
রেঁধে দেয় চপ্, কারি;

রোজ ছানা ও মাখন চলে,
আমরা, রোদে গেলে যাই গ'লে,
ঐ কস্তুরী দিয়ে দাঁত মাজি, আর
আঁচাই গোলাপ জলে।

দেশে কত দুখী ভাতে মরে,
দেই নে, পয়সাটি হাতে ক'রে,
তারা, গেট থেকে পেয়ে অর্দ্ধ চন্দ্র,
রাস্তায় প'ড়ে মরে;

কিন্তু D. M., D. S., D. J.,
এলে, ভয়ে ঘেমে উঠি ভিজে,
তাদের, খানা দেই আর বুট চাটি
(আহা) নতুবা জনম মিছে

খেয়ে, School এ Severe beating,
ঐ, First Book of Reading,
হাঁ, পড়েছিনু বটে, এখনো ভুলিনি
"Blind man is bleating" ;

যত, সাহেব সুবোর সনে,
বলি, ইংরেজী প্রাণ পণে,
ঐ First Book এর বিদ্যের চোটে,
তারাও প্রমাদ গণে।

Brain এ, সয়নাক গুরু চাপটা,
আর, পড়েই বা কোন্ লাভটা ?
"Yes" 'no' আর "Very good" দিয়ে
বুঝাইলেই হ'ল ভাবটা !

আমরা, এত যে আরামে থাকি,
তবু, কোন রোগ নাই বাকী,
Dyspepsia, Debility, আর
কিছু কিছু ঢেকে রাখি।

ক'রে, প্রজার রক্ত শোষণ
করি, মোসাহেব-দল-পোষণ,
আর, প্রজার বিচার আমলারা করে,
কোথায় আপীল সেশন ?

করি, হাতীতে চড়িয়া ভিক্ষে
কেহ, না দিলে পায় সে শিক্ষে,
তারা, ভিক্ষে খরচা দিতে, জমি ছেড়ে
উঠেছে অন্তরীক্ষে ;

তবু, ঘোচে না ঋণের দায় ;
ঐ খেয়ালে (ই) তো মাথা খায়,
দেখ, সুবিধা ঘটিলে, দু চার হাজার,
এক রেতে উড়ে যায়।

ঋণ শোধের উপায় কুত্র ?
শুধু অধঃপাতের সূত্র।
ঐ বাবা করেছিল, আমি উড়ালাম,
বাবার যোগ্য পুত্র ;

ঠিক বলেছিল Darwin,
We are very Sanguine ;
মোদের জীবনটা এক চির-বাঁদরামি,
সম্মুখে শুধু ruin ;

এই ছোট অটো বাই-ও-গ্রাফি,
পড়ে, কে কি ভাবে, তাই ভাবি ;
কমলাগো! তুমি কার হাতে দিলে,
তোমার ঝাঁপির চাবি ?

রজনী কান্ত সেন।

সাময়িকপ্রসঙ্গ

শিক্ষা-বিস্তার।

(মাননীয় গোখ্‌লে মহোদয়ের শিক্ষা-প্রসার সম্পর্কীয় আইনের আলোচনা।)

আমাদের দেশে শিক্ষার অভাবই সর্ব্বপ্রধান। পারমার্থিক, নৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রভৃতি যাবতীয় বিষয়ের উন্নতি লাভ করা একমাত্র শিক্ষার দ্বারাই সম্ভবপর। ভারতবর্ষের এই সুবিশাল অনুর্ব্বর ভূমি শিক্ষাসহায়ে কর্ষিত না হইলে, আমরা কোনকালেও কোনরূপ উন্নতি লাভের আশা করিতে পারি না।

সম্প্রতি বাধ্যকর শিক্ষা-প্রসার সম্পর্কে ভারত-গৌরব মাননীয় শ্রীযুক্ত গোপাল কৃষ্ণ গোখ্‌লে মহাশয় ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় যে আইনের পাণ্ডুলিপিটি উপস্থাপিত করিয়াছিলেন, তদুপলক্ষে ভারতের মুষ্টিমেয় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের এক তুমুল আন্দোলন জাগিয়া উঠিয়াছে। অনেকের মতে—এজন্য যদি নূতন কর-ভারও বহন

করিতে হয়; তথাপি ইহা পরম শুভকর ও সম্পূর্ণ সমর্থন-যোগ্য; আবার কাহার কাহার মতে—আমাদের এই কর-ভার-প্রপীড়িত ভারতে নূতন কর নির্দ্ধারিত না হইয়া যদি এই অরণ্যপ্রদেয় শিক্ষা প্রচলিত হয়, তবেই উহা বাঞ্ছনীয়,—অন্যথা নহে। তাহা হইলেই এখন দেখা যাইতেছে, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সকলেই মূলে এই আইনের আবশ্যকতাই অকপটে স্বীকার করিতেছেন; তবে, কেহ এজন্য কর দিতেও প্রস্তুত, কেহ কর দিতে হইলে এমন আইন চাহেন না।

এক্ষণে দেখিতে হইবে এ অবস্থায় কি কর্ত্তব্য। অবশ্য আমরা বিশ্বাস করি, গবর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিলে, অনায়াসেই এই ব্যয়ভার বহন করিতে পারেন; এবং আমাদের প্রতি এই অনুগ্রহটুকু প্রদর্শন করুন, ইহাও আমাদের ঐকান্তিক প্রার্থনা সত্য; কিন্তু গবর্ণমেণ্ট যদি আমাদের এই 'আব্দার' বা দাবী গ্রাহ্য না ই করেন, তাহাহইলে আমরা নিজেরা কি করিব, তাহাই এক্ষেত্রে বিবেচ্য। ইচ্ছা করিলে, দেশের এই পরম কল্যাণ গবর্ণমেণ্ট যে সাধন করিতে অক্ষম, কোন ক্রমেই আমরা ইহা মানিয়া লইতে প্রস্তুত নহি। গবর্ণমেণ্ট অকাতরে যে অজস্র অর্থরাশি ব্যয় করিতেছেন, তাহাহইতে কিঞ্চিৎ অর্থ দেশের এই নিদারুণ দৈন্য-বিমোচনে ব্যয়িত হইলে, গবর্ণমেণ্টের পক্ষেও অমিশ্র কল্যাণ ব্যতীত কোনরূপ অলাভের কোন সুদূর সম্ভাবনাও আছে, এমন তো মনে হয় না। কিন্তু, যদি আমাদের এই আশা দুরাশাই হয়,—অর্থাৎ গবর্ণমেণ্ট যদি এ বিষয়ে, আমাদিগকে অর্থ-সাহায্য করিতে সম্মত বা পারগ না-ই হন, তবে আমরা নিজেরা ইহার জন্য কিছু করিব কি না, এক্ষেত্রে তাহাই এখন সমূহ সমস্যা।

কৌতূহলপরবশ হইয়া, আমরা বরিশাল জেলায় কতকগুলি অশিক্ষিত প্রজাকে এসম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়াছিলাম। কথাটা তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিলে, তাহারা বলিল-"হেয়া ওইলে তো মোরা বাচ্য়্যা যাই!" তাহাদের অশিক্ষিত মন এমনি সহজে এই জটিল সমস্যার মীমাংসা করিয়া ফেলিল যে, আমরা তাহাদের কথা শুনিয়া বস্তুতঃই বিস্মিত হইলাম। ব্যয়-বিহীন এই বাধ্যতামূলক শিক্ষা-ব্যবস্থার জন্য তাহাদের দেয় নির্দ্ধারিত পথ-করের অর্দ্ধাংশ পরিমাণ কর তাহারা অনায়াসেই দিতে নির্ব্বিবাদে সম্মত আছে। কারণ, ইহাতে তাহাদেরই প্রচুর লাভ। গড়ে প্রতি গ্রামবাসীর যদি দুইটী করিয়া সন্তান থাকে, আর গড়ে (দশ টাকা খাজানা হিসাবে) তাহাকে যদি কুড়ি পয়সা শিক্ষা-কর দিতে হয়, তবে বার্ষিক মাত্র পাঁচ আনা দিয়া দুইটি সন্তানের শিক্ষা-দানের ব্যবস্থা করিতে যাওয়া, সেই দরিদ্রের পক্ষে পরম সৌভাগ্যের বিষয় সন্দেহ নাই।

কিন্তু গোখলে মহোদয় যাহাই কেন বলুন না, কার্য্যতঃ এই দীন প্রজাবর্গের নিকট হইতে শিক্ষা-প্রসার সম্বন্ধে সমুদয় ব্যয়ই আদায় করিতে চেষ্টা করা, একান্তই গর্হিত ও অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। দরিদ্র কৃষক কুলি বা কর্ম্মজীবির নিকটে এতঅধিক কর-সংগ্রহের ব্যবস্থা হইলে, তাহারা অচিরেই অনাহারে প্রাণত্যাগ করিবে, ইহা নিশ্চয়। অতএব, আমাদের মতে—দেশের মধ্যে যাহারা সম্পন্ন,—অবস্থাপন্ন, এই মহামঙ্গলকর কার্য্যে তাঁহাদিগকেও সাহায্য দান করিতে হইবে। আমাদের প্রস্তাব এই যে, মাসিক অন্যূন ষাট ৬০৲ টাকা যাঁহার আয় তিনি যদি এপক্ষে ৷৷০ আট আনা হিসাবে বার্ষিক ছয় টাকা দেন, তালুকদার ও জমিদারগণ (যাঁহারা আয়ের উপরে প্রতি টাকায় এখনি দশ পয়সা করিয়া পথ-কর দিতেছেন তাঁহারা) যদি বর্ত্তমান তাঁহাদের দেয় পথ-করের চতুর্থ বা পঞ্চমাংশ পরিমাণ এবং ব্যবসাদার বা মহাজনগণ তাঁহাদের আয়-করের দশমাংশ অর্থও এতদুপলক্ষে দান করেন, তবে আর আমাদের অর্থের জন্য কোনরূপ চিন্তা করার আবশ্যক হয় না। একটুও ত্যাগ স্বীকার না করিয়া, শুদ্ধ বক্তৃতা দ্বারা দেশোদ্ধারের আশা, বাতুলতা মাত্র। দেশের দুর্দ্দশা মোচন করিবার জন্য এই কর-ভার আমাদের সকলকেই বহন করিতে হইবে, এবং তাহাই সর্ব্বথা বাঞ্ছনীয়।

গবর্ণমেণ্ট সরকারী তহবিল হইতে এই সৎকার্য্যের সাহায্য না করিলেও আমাদের পক্ষে ঔদাসীন্য অবলম্বন করা নিতান্তই গর্হিত হইবে। মাননীয় গোখলের এই 'বিলটি' যে পরম হিতকর তদ্বিষয়ে যখন কাহারও

কোন সন্দেহ নাই, তখন গবর্ণমেন্টের সাহায্য না পাইলেও আমরা নিজেরাই এই কর্ত্তব্য পালনের জন্য অগ্রসর হইব। গবর্ণমেন্ট না করিলেই যদি দেশের সকল কাজ অসম্পূর্ণ রহিয়া যায় এবং যদি তাহা হইলেই আমাদের সকল দায়িত্ব বিলুপ্ত হয়, তবে অগোণেই আমাদের রজ্জু ও কুম্ভের সন্ধান করা সঙ্গত। গবর্ণমেন্টকে তো আমরা নিতান্তই আবেদন ও প্রার্থনা দ্বারা আবৃত করিয়া রাখিয়াছি; চাহিয়া না পাইলেই তো আমরা বিরক্তি ও ক্ষোভবশে নানাকথা বলিতেও ছাড়ি না, কিন্তু নিজেদের কাজ নিজেরা কিছুই করিব না, শুদ্ধ গবর্ণমেন্টকে সমালোচনার সুতীক্ষ্ণ শরজালে সমাচ্ছন্ন করিয়া রাখিব, ইহা বড়ই লজ্জাকর। গবর্ণমেন্ট সবই করিবেন, আমরা শুধু ফলভোগ করিয়া ইংরেজ কুলকে ধন্য করিবার জন্য জীবিত রহিব,—ইহাই যদি আমাদের ধারণা হয়, তবে সে ভ্রমাত্মক সংস্কারের জন্য আমাদিগকে পদে পদেই অনুতাপ করিতে হইবে। আর, গবর্ণমেন্ট না ই বা করিতেছেন কি? দেশের আজ যাহা কিছু হইয়াছে বা হইতেছে—সবই যে প্রধানতঃ রাজারই অনুগ্রহে, একথা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। এখন যদি (ধরুন এই আমাদের দুরদৃষ্টবশতঃই) ইংরেজ রাজ আমাদের এই শিক্ষাবিস্তারের অভাব (অর্থানুকূল্য করিয়া) বিদূরিত করিতে 'নারাজ' হ'ন, তবে আমাদের পক্ষে আমাদেরই জাতীয় হিতকর এরূপ একটি মহতী প্রচেষ্টা সফল করিবার জন্য বাস্তবিকই সাধ্যতঃ স্বার্থত্যাগ করা, সুপরামর্শ ও ধর্ম্মানুমোদিত নহে কি?

সেদিন কেহ কেহ আমাকে বলিতে ছিলেন--"ট্যেক্স্ ধার্য্য করিয়া, এই দারিদ্র্য-নিষ্পীড়িত ভারতে আর শিক্ষাপ্রসারের কোনই প্রয়োজনীয়তা নাই। বিধাতা যদি 'দিন' দেন, তবে তাঁহারই ইচ্ছায় আবার এই পতিত ভারত জাগিয়া উঠিবে। আবার সেই বিধাতা—সেই অদৃষ্টের দোহাই! নিজেরা কেবল আলস্য ঔদাস্য ও জঘন্য তামসিকতায় জীবন যাপন করিব; আর, বিধাতা আসিয়া হাতে ধরিয়া আমাদিগকে মুক্তি দান করিবেন,—না? Shakespear's এর একটি বাক্য মনে পড়িল—

"Our remedies oft in ourselves lie
Which we ascribe to Heaven!"

কোন কোন শিক্ষিত ব্যক্তির মতে—"যদি অর্থ-ব্যয়ই করিতে হয়, তবে স্বাধীনভাবে আমরা জাতীয় শিক্ষা পরিষদের দ্বারা এই হিতকর্ম্ম সম্পন্ন না করিয়া, গবর্ণমেন্টর পৃষ্ঠপোষকতা প্রার্থনা করিতেছি কেন? যেকার্য্য আমাদেরই ব্যয় ও শ্রম সাধ্য তজ্জন্য গবর্ণমেন্টর দ্বারস্থ হইয়া জাতীয় শিক্ষার জন্য আবার সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের কুক্ষিগত হইতে যাওয়ার কি হেতু আছে?" স্বীকার করি—জাতীয় শিক্ষা-পরিষৎ (শুদ্ধ এই পূর্ব্ব ও পশ্চিম বঙ্গে) যদি এই দায়িত্বের ভার গ্রহণ করিয়া সাফল্য লাভ করিতে পারেন, তবে তাহাতে কাহারও অণুমাত্র আপত্তি থাকিতে পারে না। কিন্তু, তৎপক্ষেও কথা এই যে, মুসলমান-প্রধান পূর্ব্ববঙ্গে শিক্ষা-পরিষদের পক্ষে যথোপযুক্ত শিক্ষা-বিস্তার করা কতদূর সম্ভপর, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিলে, সমগ্র ভারতবর্ষের এই গুরু-তর কার্য্যটি গবর্ণমেন্টের তত্ত্বাবধানে ও বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দ্দেশানুসারে জিলা-বোর্ডের দ্বারাই পরিচালিত হওয়া,—সুপরামর্শসঙ্গত ও সুবিধাজনক বলিয়া মনে হয়।

যে ভাবেই হউক্ বাধ্যকর শিক্ষা-বিস্তার যে একান্তই আবশ্যক ও অবশ্যকর্ত্তব্য তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। এশিক্ষা 'প্রাথমিক' অর্থাৎ যৎসামান্য হইলেও, জ্ঞানের এমনই একটি মোহিনী স্পৃহা আছে যে, পরে, ধীরে ধীরে এই স্বল্প-শিক্ষিত সম্প্রদায়ই উচ্চশিক্ষার জন্য দুর্ব্বাররূপে উন্মুখ হইয়া উঠিবে, এবং তখনি এদেশের যথার্থ কল্যাণ সংসাধিত হইবে।

হজরৎ মাহম্মদ বলিয়াছেন—জ্ঞানার্জ্জন কর! ইহা আপন অধিকারীকে সদসৎ? বিচারে সমর্থ করে, ইহা স্বর্গের পন্থা আলোকিত করিয়া দেয়; ইহা মরুভূমিতে সখা, বিজনের সঙ্গী, সুহৃৎহীনের সহবাসী; ইহা আমাদিগকে আনন্দের অভিমুখে পরিচালিত করে, ইহা আমাদিগকে দুঃসহ বিপদে বল দান করে; ইহা বন্ধু মধ্যে অলঙ্কার, এবং শত্রুর বিরুদ্ধে বর্ম্মবিশেষ?" এই আজন্ম অশিক্ষিত, দিব্যজ্ঞানী মহাত্মা এ কি মহাবাণী

উচ্চারণ করিয়া আমাদিগকে উদ্বুদ্ধ করিতেছেন? ইহা স্বেচ্ছাপালনীয় পরামর্শ বাক্য মাত্র নহে, ইহা শুদ্ধ কর্ত্তব্য-নির্দ্দেশ নহে, ইহা সবিনয় অনুনয়ও নহে;—ইহা যেন বিশ্বমানবের প্রতি মহেশ্বরের মহান্ মঙ্গলপ্রদ পরম আদেশ!—'জ্ঞানার্জ্জন কর'!

জ্ঞানই স্বর্গের পথে, সত্য লোকে লইয়া গিয়া, আমাদিগকে সেই চিরন্তন সত্যের সহিত সম্পূর্ণরূপে সম্মিলিত করাইয়া দেয়। কারণ, জ্ঞানের দ্বারাই আমাদের অন্তর্নিহিত বিবেক-বুদ্ধি, বিচার-শক্তি সম্মার্জ্জিত ও সমুজ্জ্বল হইয়া উঠে, এবং বিবেকবিহনে—জ্ঞানহীনতায় মানুষ সত্য সন্দর্শনে সমর্থ তো হয়ই না,—মন্দের মোহকেও বিমর্দ্দিত করিয়া আত্ম-বিকাশের যোগ্যতা লাভ করিতে পারে না। তজ্জন্যই মহামনস্বী মাহম্মদ আরও বলিয়াছেন—"বিধাতা বিবেকের ন্যায়, বিচার-বুদ্ধির ন্যায়, এমন পরিপূর্ণ, এমন সুন্দর ও এমন উৎকৃষ্ট আর কিছুরই সৃষ্টি করেন নাই।" ইহারই পরিমাণানুরূপে বা হিসাব অনুসারে দয়াময় আমাদিগকে উপকৃত করিয়া থাকেন, এবং ইহারই সাহায্যে আমাদের সকল বোধগম্য হয়। মানুষের সত্যপথ অর্থাৎ ধর্ম্মপথ চিনিয়া চলিতে হইবে। তাহা হইলেই ঈশ্বরকে আমরা একান্তই আপনার ভাবে অধিগত করিবার উপযুক্ত হইব। এখন জিজ্ঞাস্য এই,—ধর্ম্ম কাহাকে বলে ও কি উপায়ে ধর্ম্মকে জ্ঞাত হওয়া সম্ভবপর। আমাদের শাস্ত্র বলেন ধর্ম্মের মূলে প্রথমেই 'নেতি' বিচার। 'ইহা নহে'—এইযে বিচার,ভাবিয়া দেখিলে তাহারই অভ্যন্তরে আমাদের মন একটি বিরাট্ সত্যের অস্তিত্বকে স্বীকার করিয়া সার্থক হইতেছে। এখন এইযে 'নেতি'-মূলক ধর্ম্ম, এই সদসৎ বিচার ইহা কি উপায়ে সম্ভবপর হইবে? উপায় জ্ঞানার্জ্জন বা শিক্ষা-সঞ্চয়। জ্ঞানী Emerson ও ঠিক এই কথাই বলিয়াছেন—"Our religion assumes the negative form of rejection; out of love of the true we repudiate the false and religion is an abolishing criticism!"—"আমাদের ধর্ম্ম একটা ত্যাগের বা পরিবর্জ্জনের স্বরূপ বিশেষ; সত্যের প্রতি অনুরাগ বশতঃই আমরা অঞ্ৰব, অমঙ্গল বা মন্দকে পরিত্যাগ করিয়া থাকি; সুতরাং ধর্ম্ম অর্থবর্জ্জনমূলক বিচার বা সমালোচনা!" ইহা সৎ ও ইহা অসৎ, এই যে চেতনা, এ বিচার বোধ কি করিয়া স্ফুরিত হয়,—জ্ঞানার্জ্জনই বিচার-বুদ্ধির জনক ও চিরসহচর। অতএব, একমাত্র জ্ঞানার্জ্জনেই আমরা এই পরম মঙ্গল, সার সত্য বা যথার্থ ধর্ম্মের সন্ধান লাভ করিয়া ধন্য হইতে পারিব।

মানুষের জীবনে জ্ঞানের একটা প্রবল ও অদম্য পিপাসা সততই সজীব হইয়া রহিয়াছে। শিশু যখন সাগ্রহ-কৌতুহলে সংসারের সর্ব্ববিধ অনুষ্ঠানের কারণ সন্ধান করিতে থাকে, তখন তাহার সেই 'কেনর' উত্তর দিতে গিয়া বিস্ময়ে অবাক্ হইতে হয়। সে 'কেনর' যেন শেষ নাই, সে কৌতুহলের যেন অন্ত নাই, সে অসীম জ্ঞান-তৃষ্ণার যেন নিবৃত্তিই নাই। এই পিপাসা, দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা পার্থিব সুখ-সম্পদে কোনদিনই পরিতৃপ্ত হইবার নহে। তাহা এই চরাচরে একমাত্র মানবেরই প্রধান বিশেষত্ব, এইটুকু আছে বলিয়াই মানুষ মনুষ্যনামের যোগ্য; ইহাই তাহার গৌরব, এবং এই দিব্য অভাববোধ করে বলিয়াই মানুষ চিরকাল অমৃতের অধিকারী।

মানুষকে আমরা যতটা দেখি, তাহা শুধুই সেই মানুষের বহির্ব্বাস বা বিভূষণ। আসল মানুষকে আমরা দেখিতে পাই না। তাহাকে দেখিতে পারাই মুখ্য লক্ষ্য। আমি আমাকে দেখিতে পাই না, তুমি তোমাকে দেখিতে পাও না। আমরা সকলেই বাহিরের একটা পারস্পরিক বহির্ব্বাস দেখিয়া, আমাদের প্রত্যেকের অস্তিত্ব সম্পর্কে বিশ্বাস রাখিয়া চলিয়াছি। তুমি যেহেতু বলিতেছ—আমি আছি, বাহিরের আরও দশ জনে যখন বলিতেছেন যে, আমি আছি, তখন আমি আছিই বটে। ইহাকে বলে পরোক্ষ বিশ্বাস। আর, প্রত্যক্ষ বিশ্বাস হয় তখন যখন মানুষ নিজের অস্তিত্বকে নিজেই অনুভূতি বা উপলব্ধির দ্বারা বুঝিতে ও জানিতে সমর্থ হয়। এই উপলব্ধি হওয়া, এই আত্ম-জ্ঞান লাভ করা মানুষের পক্ষে পরম আবশ্যক। এই উপলব্ধি হইলেই মানুষ মানুষ হয়। শাস্ত্রে আছে—"আত্মানং বিদ্ধি!" এই আত্মজ্ঞানই আমাদের লভ্য; কারণ, আত্ম-জ্ঞান লাভ না হইলে আমরা মহাজ্ঞান, সেই চরম জ্ঞান অর্জ্জন করিতে

পারিব না; এবং সে জ্ঞানে জ্ঞানী হইতে না পারিলে, মানবের গত্যন্তর নাই! এই মহালক্ষ্যে আমাদিগকে পহুঁচিতে হইবে। তাহাই যদি না হইল, তবে বৃথাই এ জীবন, বৃথাই এই অন্তর্নিহিত, অমূল্য শক্তির অনর্থ বিক্ষেপ! Ruskin কহিয়াছেন—Know thyself and through you alone thou canst know God"—"আপনাকে চিনিতে শিখ; কারণ, আপনার ভিতর দিয়াই সেই অন্তরতমকে জানিতে পারিবে।" সুতরাং, দেখা গেল আমাদের প্রত্যক্ষ বিশ্বাস ও সেই সঙ্গে সেই মহাজ্ঞান অর্জ্জন করিতে হইলে, প্রথমতঃ আত্ম-জ্ঞানেরই প্রধান প্রয়োজন।

দর্পণে না দেখিলে নিজের মুখ দেখা যায় না। দর্পণে অজ্ঞানতার দাগ লাগিয়াছে; সে কলঙ্ক পরিষ্কৃত করিয়া আপনাকে চিনিব। মনোদর্পণের সংস্কার করিতেই হইবে। তাহার একমাত্র উপায়—জ্ঞান-সঞ্চয়। আত্ম-জ্ঞান লাভ করিতে হইলে সুশিক্ষাই যথার্থ সহায়।

ব্যক্তির সমষ্টিই জাতি। অতএব এই জাতীয় জীবনের প্রকৃত শুভও এই সুশিক্ষা-প্রসারেই সম্ভবপর। বিশাল ভারতের এই অগণ্য জন-সংঘকে সমর্থ ও সজীব করিয়া প্রকৃত মনুষ্যত্বের পদবীতে প্রতিষ্ঠিত করিবার পক্ষে শিক্ষা ভিন্ন অন্য পন্থাই নাই।

আহারের দ্বারা যেমন আমাদের এই দেহ পরিপুষ্ট হয়, শিক্ষার দ্বারাও আমাদের মন সুস্থ, সুন্দর ও উন্মেষিত হইয়া উঠে। শিক্ষা—মানসিক আহার। খাদ্য ভিন্ন দেহ ধারণ যেরূপ অসম্ভব শিক্ষা ব্যতিরেকে মানসিক স্বাস্থ্য লাভও তদ্রূপ অসম্ভব। অতএব বাঁচিতে হইলে, সুখাদ্য ও সুশিক্ষা উভয়েরই প্রয়োজন। এই দুই'এর একটিকেও পরিহার বা উপেক্ষা করিলে কোনক্রমেই চলিতে পারে না।

ভারতবর্ষে বিবিধ কারণে দুর্ভিক্ষ একরূপ লাগিয়াই আছে বলিতে হইবে। এই দুর্ভিক্ষে কত শত অনাথ অসময়ে অজ্ঞাত কাল-গর্ভে বিলীন হইয়া যাইতেছে, কে তাহার ইয়ত্তা করে! কিন্তু, এ দুর্ভিক্ষ স্থায়ী ও ক্রমাগত নহে। যে দুর্ভিক্ষ আমাদিগকে যুগ-যুগান্ত হইতে কবলিত করিয়া বসিয়া আছে—সেই জ্ঞান-দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাস হইতে পরিত্রাণ লাভের জন্য অদ্যাপি আমরা সম্যক্ আগ্রহ প্রকাশ করি নাই। পশুর মত আহারের সংস্থানটুকু করিয়াই যদি নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইতে চাহি, তবে আমরা একান্তই হীনবৃত্ত। আত্মাকে ধারণ করে বলিয়াই আমাদের এই দেহের এত গৌরব। সুতরাং, এই দেহকে জীবিত রাখার জন্য আমাদের যেমন যত্নশীল হইতে হইবে; আমাদিগকে আধ্যাত্মিক বা মানসিক উন্নতির প্রতি তদপেক্ষাও অধিকতর মনঃসংযোগ করিতে হইবে। আসল যে মানুষটা আমার এই দেহাবরণের অন্তরালে লুক্কায়িত হইয়া রহিয়াছে, তাহাকে সজীব ও বিশুদ্ধ করিয়া তুলিতে না পারিলে, আমার এ জীবন-ধারণ বাস্তবিকই বিড়ম্বনা। বিখ্যাত লেখক Rousseau লিখিয়াছেন—"Life is burdensome tons Chiefly from the abuse of it." "শক্তির অপচয়ের দরুণই জীবন দুর্ব্বহ হইয়া উঠে।"

সুশিক্ষাই এই জীবনের শক্তি-সম্বর্দ্ধনের ও সুপরিচালনের প্রধান উপায়। ইহাই জ্ঞানের সোপান, এবং জ্ঞান-সঞ্চয়ের দ্বারাই মানবের ন্যায়ান্যায়-বোধ-শক্তি স্ফুরিত হয় ও বিবেক-বুদ্ধি বিকশিত হইতে থাকে। বিবেক-বিহীন মানব পশু অপেক্ষাও অধম ও ভয়ঙ্কর। কারণ, পশু অপেক্ষা তাহার দ্বারা অনিবার্য্যরূপেই এই জগতের অশুভ সাধিত হইয়া থাকে। Bible'এ আছে —A man Shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth from the mouth of God!" কিন্তু এই যে Voice of God, বিধাতার নির্দ্দেশ—তাঁহার বাণী আমরা কেমন করিয়া, কি উপায়ে শুনিতে পাইব? বিবেকই এই বাণীর অপূর্ব্ব ঝঙ্কারে আমাদের মানব-জীবনকে নিরন্তর পরিপূর্ণ করিয়া তুলিয়া থাকে, এবং সেই বিবেক-বুদ্ধিকে একমাত্র শিক্ষা বা অনুশীলনের দ্বারাই পরিমার্জ্জিত ও প্রোজ্জ্বল করিয়া তুলিতে পারা যায়। "Education is the apprenticeship of life"—একমাত্র এই শিক্ষা-নবিশির দ্বারাই ক্রমে মানবের মনোবৃত্তিনিচয়ের উৎকর্ষ সাধন সম্ভবপর।'

অনুশীলনের দ্বারা বৃত্তি-নিচয়ের উৎকর্ষ সাধিত হইলেই মানুষ প্রকৃতপক্ষে সেই ভূমাকে ধ্যানায়ত্ত করিতে সমর্থ হয়। সুতরাং শিক্ষাই আত্মোন্নতি-লাভের, আত্ম-বিকাশের ও আত্মোৎকর্ষের সহায়-স্বরূপ; এবং এই আত্মোৎকর্ষই ভূমাকে অধিগত করিবার প্রকৃষ্ট পন্থা। Matthew Arnold একস্থানে সত্যই কহিয়াছেন—"Culture is a study of perfection."

ভগবান্ করুন — এইরূপে আমরাও যেন সেই অসীমের, ভূমার অনুধ্যান করিয়া, আবার এই অধঃপতিত ভারতে অতীতের সেই আদর্শ পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিয়া বিশ্বের বিস্ময়-কেন্দ্ররূপে পরিগণিত হইতে পারি।

শ্রীদেবকুমার রায় চৌধুরী।

জাতীয় শিক্ষা কাহাকে বলে ?

কয়েক বৎসর হইতে বাঙ্গালা দেশের স্থানে স্থানে "বঙ্গদেশস্থ জাতীয় শিক্ষা পরিষদের" প্রবর্ত্তিত নূতন শিক্ষা-পদ্ধতি অনুসারে শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা হইয়াছে। কিন্তু জাতীয় শিক্ষার প্রকৃতি ও বিশেষত্ব সম্বন্ধে দেশের মধ্যে বিশেষ কোন আলোচনা হয় নাই। এজন্য এতৎ সম্বন্ধে যাঁহার যেরূপ অভিরুচি, তিনি সেইরূপ ধারণাই পোষণ করিয়া আসিতেছেন। যাঁহারা কেবল মাত্র দুএকটী ছাত্র অথবা শিক্ষক অথবা দুই একটা জাতীয় শিক্ষালয়ের পরিচয় পাইবার সুযোগ পাইয়াছেন, এবং কোন ব্যক্তি বিশেষের মতের অথবা কার্য্যের উপর নির্ভর করিয়াই জাতীয় শিক্ষার লক্ষণ নির্ণয় করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে অনেক ভ্রমে পতিত হইতে হইয়াছে।

অনেকে জাতীয়-শিক্ষার নাম মাত্র শুনিয়া ভাবিয়া রাখিয়াছেন—হিন্দুধর্ম্ম-শিক্ষা এবং সংস্কৃত-চর্চ্চার জন্যই জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এখানে ইংরেজী শিক্ষার কোন বন্দোবস্ত নাই এবং অন্য ধর্ম্মাবলম্বী ছাত্রের কোন স্থান নাই। ইহা এক প্রকারের টোল বিশেষ।

অনেকে মনে করেন, কেবলমাত্র কারখানার কার্য্য শিক্ষা দেওয়াই জাতীয় শিক্ষার উদ্দেশ্য। ইহাতে সাহিত্য, ইতিহাস প্রভৃতি সাধারণ উচ্চ শিক্ষার কোন ব্যবস্থা নাই। সূত্রধর ও কর্ম্মকারের কর্ম্ম এবং বয়ন কার্য্য প্রভৃতি বিবিধ শিল্প শিক্ষার দ্বারা অন্ন সংস্থানের সুবিধার জন্যই জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সুতরাং যে সকল ছাত্র মেধাবী এবং যাহারা উন্নত উপায়ে জীবিকা অর্জ্জন করিতে সমর্থ, তাহারা এই বিদ্যালয়ে প্রবেশ করে না। যাহাদের সাধারণ শিক্ষা দ্বারা উপকার লাভের আশা অতি অল্প এবং যাহাদিগকে অতি বল্যকালেই কোন একটী জীবিকার্জ্জনের পন্থা অবলম্বন করিতে হইবে, তাহাদের জন্যই জাতীয় শিক্ষার আয়োজন হইয়াছে।

আবার অনেকে ঠিক বিপরীত ধারণা পোষণ করিয়া থাকেন। তাঁহারা মনে করেন—কেবলমাত্র ধনবান্ ও অভাবহীন ব্যক্তিদিগের সন্তানেরাই জাতীয় বিদ্যালয়ে প্রবেশ করে। জাতীয় বিদ্যালয়ে যে শিক্ষা প্রদান করা হয়, তাহাতে আর্থিক লাভের তেমন কোন প্রত্যাশা নাই। যাহারা কেবলমাত্র বিদ্যাচর্চ্চার জন্যই বিদ্যালাভ করিতে চাহে, তাহারা যে বিদ্যা অর্থকরী নহে, সেই বিদ্যা গ্রহণেও ঔৎসুক্য প্রকাশ করিতে পারে। কিন্তু সাধারণ লোক অন্ন-চিন্তায় জর্জ্জরিত। তাহারা ভবিষ্যৎ জীবনের প্রতি নিরপেক্ষ হইয়া সন্তানদিগকে কেবলমাত্র জ্ঞান-লাভের জন্য এরূপ নিঃস্বার্থভাবে জাতীয় বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিতে পারে না।

কেহ কেহ মনে করেন, জাতীয় বিদ্যালয় সমূহে কতকগুলি অকর্ম্মণ্য বিদ্যাভ্যাসের জন্য অমনোযোগী ছাত্র প্রবেশ করিয়াছে। যাহারা দেশের মধ্যে প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতির নিয়মানুসারে শিক্ষালাভে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতে পারে নাই, অথবা যাহারা সাধারণ-বিদ্যালয় সমূহ হইতে, কোন না কোন কারণে, বহিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাদিগকে স্থান দেওয়াই জাতীয় বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য। এখানে সচ্চরিত্র, বিদ্যানুরাগী ছাত্র প্রবেশ করে না।

আর যাঁহারা স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে জাতীয় শিক্ষাপরিষদের জন্ম হইয়াছে ভাবিয়া ইহার প্রবর্ত্তিত শিক্ষাপদ্ধতিকে কেবলমাত্র হুজুগ মনে করেন, তাঁহারা

ভাবেন, কতিপয় হুজুগপ্রিয় ব্যক্তির সাময়িক চেষ্টা ও উত্তেজনার ফলে কতকগুলি অপরিণতবয়স্ক যুবক ও বালকদিগের পরকাল নষ্ট করিবার জন্য, দেশের স্থানে স্থানে, কতকগুলি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য বিদ্যাদান বা শিক্ষাবিস্তার নহে—দেশের মধ্যে বিবিধ হুজুগে যোগদান করাই ইহাদিগের বিশেষ লক্ষ্য। ছাত্রেরা কেবলমাত্র বিদ্যালয়ে যাওয়া আসা করে। এগুলিকে বিদ্যালয় বলা যায় না,—শিক্ষকদিগের স্থিরতা নাই,—ছাত্রদিগের প্রতি কোনরূপ শাসনের ব্যবস্থা নাই—প্রকৃত সুদৃঢ় নিয়ম শৃঙ্খলাদ্বারা ছাত্রদিগকে সংযত ও সুচালিত করিবার কোন বন্দোবস্ত নাই।

এতদ্ব্যতীত এই বিদ্যালয়গুলির স্থায়িত্ব সম্বন্ধে সকলেরই সন্দেহ। অনেকের ধারণা,—জাতীয়-শিক্ষা গবর্ণমেণ্টের পরিচলিত শিক্ষার বিরোধী হইয়া দেশের উপর কর্ত্তৃপক্ষের কোপ ও বিরাগের বর্দ্ধন করিতেছে। বিশেষতঃ, বোধ হয়, জাতীয় বিদ্যালয়ের পাঠ্যনির্ব্বাচন ও কার্য্যনির্ব্বাহ প্রণালী প্রভৃতি বিষয়ের সহিত দেশের মধ্যে প্রচলিত বিবিধ রাজনৈতিক অন্দোলনের সংস্রব আছে। হয়ত, রাজদ্রোহ-প্রচারক পুস্তকাদি জাতীয় বিদ্যালয়ে ব্যবহৃত এবং কোমলমতি শিশুদিগের হৃদয়ে অল্প বয়সেই রাজ-বিদ্বেষের বীজ বপন করিয়া দেওয়া হয়; সুতরাং ইহা দ্বারা বালকদিগের ভাবী সর্ব্বনাশের সূচনা এবং সঙ্গে সঙ্গে দেশের মধ্যে অনর্থক বিবিধ অমঙ্গল সৃষ্টির পথ করা হইতেছে।

বাস্তবিক পক্ষে, কোন দেশের জাতীয় শিক্ষা কোন ব্যক্তি বা সম্প্রদায় বিশেষের কোন এক লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয় না। কোন কালে কোন সমাজেই প্রকৃত জাতীয় শিক্ষা ধর্ম্মশিক্ষায় পর্য্যবসিত হইতে পারে না। যেখানে দেখা যাইবে যে, দেশের সন্তান সন্ততিদিগের শিক্ষা একমাত্র ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠে পরিণত হইয়াছে, সেই খানে বুঝিতে হইবে, শিক্ষায় বিকৃতি ঘটিয়াছে,—জাতীয় শিক্ষায় আবর্জ্জনা পড়িয়াছে। জাতীয় শিক্ষায় শিল্পশিক্ষা বা প্রকৃত জীবিকা অর্জ্জন উপযোগী শিক্ষা বুঝায় না। জাতীয় শিক্ষা রাজনৈতিক শিক্ষা নহে; জাতীয় শিক্ষার অর্থ সমরশিক্ষা বা শারীরিক শিক্ষা নহে; স্ত্রীশিক্ষা বা লোকশিক্ষা নহে; জাতীয় শিক্ষার অর্থ স্বদেশহিতৈষণা শিক্ষাও নহে।

সমগ্র সমাজের সর্ব্ববিধ উৎকর্ষের বিকাশ সাধন করিয়া যে শিক্ষাপদ্ধতি জাতীয় প্রকৃতি ও বিশেষত্বের পরিণতি ও পূর্ণতা বিধানের সহায় হয়, সেই জাতীয় চরিত্রের সর্ব্বাঙ্গীণ বিকাশ-সাধনোপযোগি শিক্ষাই প্রকৃত পক্ষে জাতীয় শিক্ষা। ইহা যে নামেই অভিহিত হউক, আর যাহার কর্ত্তৃত্ব ও নায়কতায়ই পরিচালিত হউক না কেন, এই শিক্ষাই জাতীয় শিক্ষা নামে পূজা পাইবার যোগ্য।

মানুষ কতকগুলি বৃত্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করে। প্রকৃতির সাহায্যে ও পারিপার্শ্বিক ভাব ও শক্তি সমূহের প্রভাবে সেই সকলের বিকাশ ও বৃদ্ধি হয়। পারিবারিক, সামাজিক ও দেশের অন্যান্য শক্তির সংঘর্ষে তাহার কৈশোর-যৌবনাদি অবস্থা স্বাভাবিক নিয়মে গঠিত হয়। সমাজের বিশেষ কোন সাহায্য না থাকিলেও, মানুষের মন ও শরীর আপনা আপনিই বহির্জ্জগৎ হইতে নিজের উপযোগী উপকরণ সংগ্রহ করিয়া লইয়া পুষ্টিলাভ করিতে থাকে। এইরূপে ব্যক্তিত্ব-বিকাশই জীবিত অবস্থার লক্ষণ এবং জীবনী-শক্তির কার্য। এই জীবনী-শক্তির পুষ্টিসাধন করিয়া মানুষের ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য বিকাশের সহায়তা করা, যথার্থ শিক্ষার উদ্দেশ্য।

অতএব যদি আমাদের শারীরিক ও মানসিক বৃত্তি নিচয়ের সম্যক্ স্ফূর্ত্তি সাধনের জন্য কোন ব্যবস্থা করিতে হয়, তাহা হইলে সেই ব্যবস্থাকে এই স্বাভাবিক জীবন-গঠন প্রণালীরই সহায় হইতে হইবে। মানুষকে যদি শিক্ষাগার প্রস্তুত করিতেই হয়, তবে তাহাকে তাহার সমাজের, ধর্ম্মের ও দেশের পূর্ব্বাপর সকল অবস্থা ভাবিয়া, তদনুকূল অতি সুসাধ্য ও সহজ ব্যবস্থা করিতে হইবে। তাহা না করিলে, নৈসর্গিক মনুষ্যত্ব বিকাশের বিঘ্ন উৎপন্ন হইবে, এবং তাহার ফলে বিকৃত স্বভাব, অপ্রকৃতিস্থ লোক-সমাজের সৃষ্টি হইবে।

এই জন্যই দেশভেদে ও কালভেদে শিক্ষার স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে। এক সমাজে এক সময়ে যাহা স্বাভাবিক ও সহজ, সেই সমাজেরই অবস্থান্তরে

তাহা অস্বাভাবিক এবং ক্ষতিকর হইতে পারে। এক অবস্থার প্রতিকার, অন্য অবস্থায় ব্যাধির কারণ হওয়া অসম্ভব নহে। সময়ের পরিবর্ত্তনে সমাজের সকল বিষয়েরই পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে; এই পরিবর্ত্তন অবস্থার উপযোগি না হইলে শিক্ষাপদ্ধতি "সেকেলে" থাকিয়া যায়। এইরূপ শিক্ষাপ্রণালী বেশ সহজ উপায়ে পারিপার্শ্বিক, নৈতিক ও প্রাকৃতিক শক্তি সমূহ হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিতে পারে না; এবং এই জন্য ইহা খর্ব্বতা ও পঙ্গুত্ব প্রাপ্ত হইয়া অর্দ্ধবিকশিত বা কৃত্রিম উপায়ে প্রস্ফুটিত পুষ্পের ন্যায় অস্বাভাবিক রূপ ধারণ করে।

চতুষ্পার্শ্বস্থ বিষয় হইতে প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ দ্বারা বিকাশ ও পুষ্টি লাভ করিতে হইলে, স্বাধীন ভাবে ইহাকে ব্যবহার করিবার বন্দোবস্ত থাকা আবশ্যক। আপনার ক্ষেত্রের অবস্থা ও শক্তি বুঝিয়া স্বাধীনভাবে কর্ষণ করিবার সুযোগ প্রাপ্ত না হইলে, নিজের উপযোগী কৃষি উৎপাদন অসবম্ভব হইয়া পড়ে। স্বীয় বিকাশ স্বকীয় চেষ্টা ও দায়িত্বের উপর নির্ভর করে। এমন কি, অপর কোন ব্যক্তি যদি কোন ব্যবস্থা করিবার উপযুক্ত অথবা অধিকার প্রাপ্ত হয়, তাহাকে এই স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এবং উহার সাহায্য গ্রহণ করিয়াই কার্য্য করিতে হইবে। সুতরাং যে কোন দেশে এবং যে কোন যুগে শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে, সেই দেশ ও সেই যুগের শিক্ষাগুরুদিগকে তদ্দেশোপযোগী স্বাভাবিক এবং তৎকালোচিত "আধুনিক" শিক্ষাপদ্ধতি প্রবর্ত্তন করিতে হইবে। সমাজের প্রকৃতি কি, কোথায় ইহার বিশেষত্ব, কোন কোন্ বিষয়ে ইহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ও শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়, এবং তৎকালের যুগ ধর্ম্ম কি, অর্থাৎ সেই যুগে পৃথিবীতে কোন্ কোন্ ভাব ও কর্ম্ম সমূহ প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, এবং তাহার দ্বারা কিরূপ নূতন অবস্থা সংঘটন হইয়াছে, বা হইবার সম্ভাবনা আছে, এই সকল বিষয় আলোচনা না করিলে সকল শ্রমই পণ্ড হইয়া যায়। এইরূপ সমাজোপযোগী এবং তৎকালে প্রচলিত "আধুনিক" শিক্ষা পদ্ধতি স্বাভাবিক এবং উহাকে জাতীয় শিক্ষা বলা হয়। ইহার দ্বারাই সেই জাতির তৎকালপযোগী জীবন বিকাশের সুবিধা ঘটে; এবং ইহাতে সমাজ স্বীয় কর্ত্তব্য সাধন করিতে সমর্থ হইয়া ভবিষ্যৎ জীবনের উন্নতির সহায়তা করে, এবং মানব সভ্যতার বিস্তৃতি ও বিকাশের পথ পরিষ্কৃত হইয়া উঠে।

সেই সময়ে যেমন পুরাতন প্রথার প্রচলন অথবা উহা স্থায়ী করিতে গেলে, জোর করিয়া এক অনৈসর্গিক ক্রিয়ার অভিনয় করা হয়; তেমন আবার পুরাতন ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান না হইলে, বালুকার উপর অট্টালিকা নির্ম্মাণের ন্যায়, প্রয়াস বিফল হইয়া যায়। এজন্য সম্প্রদায়-প্রবাহ, ধর্ম্মপ্রবাহ, কুলপ্রবাহ ও জ্ঞানপ্রবাহ প্রত্যেকেই তদন্তর্গত প্রত্যেক ব্যক্তিনিষ্ঠ প্রতিদিনকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবনপ্রবাহের সহিত মিলিত হইয়া, যাহাতে জাতি-প্রবাহের অঙ্গীভূত হইতে পারে, শাস্ত্রকারদিগকে প্রথমতঃ এরূপ ব্যবস্থা করিয়া, পরে অন্যান্য দেশের মনুষ্যসমাজ এতদিনের কর্ম্ম ও চিন্তাধারা যে ফল প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার সহিত উহার সংযোগ স্থাপন করিতে হইবে।

কোন দেশের শিক্ষাপদ্ধতিই জাতীয় চরিত্রের অনুরূপ ও উপযোগী না হইলে, জাতীয় চরিত্রের পরিপূর্ণতা বিধানে সহায় হইতে পারে না। এজন্য জাতীয় প্রকৃতি ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশের অভ্যন্তরে নিজের পারম্পর্য্য ও স্বাতন্ত্র্যরক্ষা করিয়া যুগে যুগে যে বিশেষত্বের অভিব্যক্তি করিয়াছে, সেই ইতিহাসগত বিশেষত্ব ও চরিত্রগত স্বাতন্ত্র্যের অনুসন্ধান ও সম্যক্ অবধারণ করিয়াই, সমাজের শিক্ষাতত্ত্ববিৎ ব্যক্তিগণকে, অথবা যাঁহাদের হস্তে সমাজের শিক্ষার ভার আসিয়া পড়িয়াছে, তাঁহাদিগকে শিক্ষাক্ষেত্রে চালকরূপে অবতীর্ণ হইতে হইবে। সুতরাং জাতীয় শিক্ষার অর্থ জাতীয় চরিত্রের অনুবর্ত্তনকারী অর্থাৎ স্বাভাবিক শিক্ষা। এ জন্যই জাতীয় সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান ও ইতিহাস প্রভৃতির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া চলা জাতীয় শিক্ষার প্রধান অঙ্গ হইয়া পড়ে; এবং জাতীয় ভাষা এই সমুদয়ের প্রবেশদ্বার বলিয়া, জাতীয় ভাষাই সকল দেশে শিক্ষার পদ্ধতিতে সকল বিষয়ে মুখ্য স্থান অধিকার করে।

মধ্যযুগে ইউরোপের সকল দেশে বিদেশীয় সাহিত্য, বিদেশীয় দর্শন প্রভৃতি শিক্ষালাভ করিবার জন্য ছাত্রেরা বিদেশীয় ভাষা ব্যবহার করিত। সকলেই আজকাল স্বীকার করেন যে, সেই কারণে সেই সময়ে, কোন দেশেই, কি সামাজিক, কি রাষ্ট্রীয়, কি শিক্ষা-সম্বন্ধীয়, কি বৈষয়িক, কি ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় কোন বিষয়েই জাতীয় চরিত্র-স্বাতন্ত্র্য ও প্রকৃতি-পার্থক্য জন্মে নাই।

জাতীয় সভ্যতা এবং জাতীয় ভাষা ও সাহিত্যেরই প্রকৃত জাতীয় শিক্ষার মূল উপাদান হইবার প্রধান কারণ এই যে,—মানবের জ্ঞান, মানবের ধারণা, সকলই আত্মোপলব্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত। নিজের সহিত তুলনা সাধন ও পার্থক্য অনুভব করিয়াই মানব বিশ্বের উপলব্ধি করিতে পারে; মনোবিজ্ঞানের এই সত্যটীর উপর শিক্ষাবিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত। এই কারণে স্বাভাবিক জাতীয় শিক্ষাকে প্রকৃত শিক্ষা বা বিজ্ঞানানুমোদিত শিক্ষা বলা যায়।

জাতীয় চরিত্রের বিকাশ-সাধনোপযোগি শিক্ষা এক দিকে সমাজানুরূপ, অপর দিকে কালোপযোগী। পারিপার্শ্বিক ভাব ও শক্তিপুঞ্জের সহিত মানবের সম্বন্ধ, এবং ইহাদের পরস্পর আদানপ্রদানেই মানবের স্বভাব বিকাশ প্রাপ্ত হয়; এজন্য প্রত্যেক জাতি স্বকীয় শিক্ষা-পদ্ধতিতে পারিপার্শ্বিক ভাব সমূহকে নিজের স্বতন্ত্র পুষ্টিসাধনোপযোগিরূপে ব্যবহার করিতে চেষ্টা করে। এই কারণে, জাতীয় শিক্ষাকে পারিপার্শ্বিকের অনুরূপ শিক্ষা বলা যাইতে পারে।

এই পারিপার্শ্বিক বিষয় সমূহের কালে কালে পরিবর্ত্তন হয়। এজন্য শিক্ষা-পদ্ধতি পরিবর্ত্তিত না হইয়া চিরকাল একরূপই থাকিলে, পরিবর্ত্তিত পারিপার্শ্বিকের ব্যবহার করিতে অনুপযুক্ত হইয়া অস্বাভাবিক হইয়া পড়ে; এজন্য জাতীয় শিক্ষা পরিবর্ত্তনশীল অর্থাৎ কালানুসারিণী। বিশ্বের সভ্যতাশক্তির নূতন নূতন সমাবেশের ফলে যে দেশে বা যে সমাজে সামাজিক, আর্থিক ও রাষ্ট্রীয়, সকল বিষয়েরই পরিবর্ত্তন হইয়াছে, অথচ শিক্ষা-পদ্ধতি পুরাতন প্রথায়ই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, সেই দেশে ও সেই সমাজে জাতীয় চরিত্রের বিকাশ সাধনে বিঘ্ন উপস্থিত হইয়াছে, সেই সমাজ পারিপার্শ্বিক ভাব ও পদার্থ সমূহকে নিজের উপযোগী করিয়া ব্যবহার করিতে অসমর্থ হইয়াছে, সুতরাং জীবনী শক্তি হারাইয়া বিশ্ব-সভ্যতার এক অতি নিম্নস্তর-প্রোথিত অস্থিকঙ্কালের ন্যায় নিস্পন্দ ও অসাড় হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। ঈদৃশ শিক্ষা-পদ্ধতিকে আর জাতীয় শিক্ষা বলা যায় না।

পারিপার্শ্বিকের অনুবর্ত্তিতা, কালোপযোগিতা ও পরিবর্ত্তনশীলতা জাতীয় শিক্ষার লক্ষণ হইবার কারণ এই যে,—শিক্ষার উদ্দেশ্য মানবের জন্য উপযুক্ত সুযোগ সৃষ্টি করিয়া, তাহার ভিতরকার শক্তিগুলি প্রকটিত করিয়া দেওয়া। সেই সুযোগগুলি প্রাপ্ত হইলে মানবের বৃত্তি সমূহ স্বতঃই বিকশিত হইয়া পূর্ণতা লাভ করে। কিন্তু সুযোগ সমূহের সহিত মানবের কোনরূপ বিরোধ বা বৈষম্য ঘটিলে, এই বিকাশের বিঘ্ন উপস্থিত হয়। যেখানে বিশ্বে বিবিধ সুযোগের সৃষ্টি হইয়াছে, অথচ কোন কোন সমাজে শিক্ষাতত্ত্ববিদেরা অথবা শিক্ষা-প্রতিষ্ঠাতারা এত উদাসীন যে, সেই সকল সুযোগের উপযুক্ত ব্যবহার করিয়া শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিতে উদ্যোগী হইলেন না, সেই সমাজে শিক্ষা-পদ্ধতি অতি পশ্চাতে পড়িয়া রহিবে—নূতন যুগের নূতন সভ্যতার মধ্যে পথভ্রান্ত নির্জ্জীব পুরাতন প্রথার ন্যায় কাহারও অবজ্ঞা, কাহারও দয়ার পাত্র; অথবা বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক সমালোচনার উপযুক্ত পদার্থ মাত্র হইয়া থাকিবে। প্রাণবিজ্ঞানেরই এই সাধারণ তত্ত্বের উপর জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠিত।

কোন সমাজে জাতীয় শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে কিনা, নির্ণয় করিতে হইলে, প্রধানতঃ এই দুইটী প্রশ্ন করিতে হইবে।

[১] মনোবিজ্ঞানের প্রশ্ন—শিক্ষা-পদ্ধতি জাতীয় স্বভাবের উপযোগী কিনা—এজন্য (ক) জাতীয় সভ্যতার বিবিধ অঙ্গের সহিত পরিচিত হইবার সুব্যবস্থা আছে কিনা, এবং (খ) উচ্চতম শিক্ষার আয়োজনে জাতীয় ভাষা ব্যবহারের বিধান আছে কিনা?

[২] প্রাণ-বিজ্ঞানের প্রশ্ন—শিক্ষা-পদ্ধতি জাতীয় অভাব মোচনের উপযোগী কিনা, তৎকালীন বিশ্বের মধ্যে

জাতিকে সচেতনভাবে পরিপুষ্ট করিবার ব্যবস্থা আছে কিনা—অর্থাৎ শিক্ষা যুগ-ধর্ম্মের অনুরূপ কিনা ?

লোক-শিক্ষা, স্ত্রী-শিক্ষা, ধর্ম্ম-শিক্ষা, শিল্প-শিক্ষা, দেশ-হিতৈষণা শিক্ষা প্রভৃতি সকল বিষয়ই জাতীয় শিক্ষার গৌণ লক্ষণ। এই সমুদয় প্রধান লক্ষ্য হইতে পারে না, ইহারা উপরি উক্ত মুখ্য উদ্দেশ্য সমূহের অন্তর্গত। শিল্প, ধর্ম্ম বা রষ্ট্রনীতির প্রভাবে শিক্ষা-পদ্ধতি, নিয়ন্ত্রিত না হইয়া মানব-বিজ্ঞান, সমাজ-বিজ্ঞান এবং শিক্ষা-বিজ্ঞানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইলেই জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। এইরূপ শিক্ষাদানের জন্য শিক্ষানুরাগী অধ্যাপক সংবাদ পত্রের বিজ্ঞাপনে প্রাপ্ত হওয়া যাইবে না। অভাবোপযোগী শিক্ষক তৈয়ারী করিয়া লইবার যথা-সাধ্য চেষ্টা করিতে হইবে। সে চেষ্টা না করিয়া কেবল গৃহপ্রতিষ্ঠা, ভূমিক্রয়ে অর্থব্যয় করিলে, বিদ্যালয়ের ভিত্তি স্থাপিত হইবে না। এতদ্ব্যতীত কেবল মাত্র বেঞ্চ টুলের স্বাতন্ত্র্যে, বিদ্যালয় গৃহের স্বাতন্ত্র্যে, বিদ্যালয়ের পরিচালনা-সমিতির স্বাতন্ত্র্যে শিক্ষা-পদ্ধতির স্বাতন্ত্র্য স্পষ্টীকৃত হয় না। প্রথম হইতেই ছাত্র ও শিক্ষকদিগের চিত্তে শিক্ষাক্ষেত্রের বিস্তীর্ণ গম্ভীর ধারণা বদ্ধমূল করিয়া দিয়া জ্ঞানানুশীলন, বিদ্যাদান, শিক্ষা বিস্তার, বিজ্ঞান-প্রচার, সাহিত্য-সেবা, পরোপকার প্রভৃতির প্রতি হৃদয়ের আসক্তি জন্মাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিয়া দিতে হইবে। তাহা হইলে প্রকৃত শিক্ষা-সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়া দেশের চিন্তা ও কর্ম্মরাশি স্থির ভাবে নিয়ন্ত্রিত করিতে সমর্থ হইবে।

শ্রীবিনয়কুমার সরকার।

লক্ষ্মীনারায়ণের কৃপা।

(ঐতিহাসিক চিত্র)।

অতিপরুষপবনবিলুলিতদীপশিখেব চঞ্চলা লক্ষ্মীঃ।

কমলা বেগবান্ পবন পীড়িত দীপশিখার ন্যায় চঞ্চলা। সৌভাগ্য লক্ষ্মী কোন্ সময়ে কি প্রকারে আসিয়া কৃপা কটাক্ষপাত করেন, তাহা কেহই বলিতে পারে না; তিনি কোন্ মুহূর্ত্তে আবার তাঁহার শুভদৃষ্টি ফিরাইয়া নেন, তাহাও কেহ বলিতে পারে না। মনস্বিগণ তাই কমলার এই অজানিত দৃষ্টিটাকে 'অদৃষ্ট' নামে অভিহিত করিয়াছেন।

কৃষ্ণদাস সেই অজানিত অদৃষ্টের তাড়নায় যখন স্ত্রী পুত্র লইয়া পৈত্রিক বাসস্থান বারপাড়া ত্যাগ করিয়া কাটাখালীতে মাথা রাখিবার একটু স্থান অন্বেষণ করিতে-ছিলেন, তখন তিনি তাঁহার ভবিষ্যৎ অদৃষ্টের ভাবনা ভা'বিবেন কি? বর্ত্তমানে উদরের ভাবনা ভাবিবারই অবসর ছিল না। তিনি দারিদ্র্যের সমস্যা লইয়া একবারে বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

বারপাড়া ময়মনসিংহ জিলার একটী গণ্ড গ্রাম। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বারপাড়ার এক দরিদ্র তাঁতী পরিবারে কৃষ্ণদাস জন্ম গ্রহণ করেন। কৃষ্ণদাস প্রথম জীবনে পৈত্রিক ব্যবসার দ্বারাই জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। ক্রমে তাঁহার পরিবার বৃদ্ধি হইয়া যাওয়ায় জীবিকা নির্ব্বাহের পথ সংকীর্ণ হইয়া পড়ে—তিনি দারিদ্র্যের করাল নিষ্পেষণে নিষ্পেষিত হইতে থাকেন।

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সেই সময়ে ভূমির সহিত প্রজার বা জমিদারের কোন সম্বন্ধ ছিল না; প্রজা শস্য উৎপাদন করিয়া অংশ গ্রহণ করিত মাত্র। অপেক্ষাকৃত নিম্নশ্রেণীর লোক যাহারা নিজে কৃষিকার্য্য করিতে সক্ষম হইত না, তাহাদের পক্ষে ভূমির উপস্বত্ব ভোগ করা কঠিন ছিল। এইরূপ নিয়মে দুর্ব্বল ও দরিদ্রের যাহা হয়, কৃষ্ণদাসের তাহাই হইল। শেষ "কণ্ডর গোণাগারির" * নিষ্পেষণে পড়িয়া কৃষ্ণদাস পৈত্রিক বাসস্থান পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। কৃষ্ণদাস ৭টী সন্তান ও স্ত্রীকে লইয়া একটীমাত্র ঘটী সম্বল করিয়া বারপাড়ার পৈত্রিক বাসস্থান পরিত্যাগ করিলেন। জমিদারের পাইক প্যাদা দরিদ্রের যথাসর্ব্বস্ব "কণ্ডর-গোণাগারির" জন্য লুঠিয়া লইয়া গেল।

---

* কণ্ডর-গোণাগারি—কোন প্রজা রাজস্ব বাকী রাখিয়া পলায়ন করিলে প্রতিবেশী প্রজাকে পলায়িত প্রজার বাকী রাজস্ব প্রদান করিতে হইত। এই অতিরিক্ত রাজস্বের নাম "কণ্ডর-গোণাগারি।"

কথিত আছে, কৃষ্ণদাস তাঁহার এই পিতৃ-পরিত্যক্ত জলপাত্র ঘটিটীকে বড়ই আদর করিতেন। সুখে দুঃখে এই ঘটী তাঁহার নিত্য সহায় ছিল।

নিঃস্বহায় কৃষ্ণদাস স্ত্রী পুত্র লইয়া কাটাখালী আসিয়া আরও অধিকতর দারিদ্র্যের ও দুরদৃষ্টের নিপীড়ন লাভ করিলেন। নূতন অপরিচিত স্থানে আসিয়া তাঁহার দিন চালান কঠিন হইয়া উঠিল। নিরুপায় হইয়া কৃষ্ণদাস ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিতে বাধ্য হইলেন।

২।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে কাটাখালী একটী বৃহৎ কারবারের স্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। ঢাকাই 'মস্‌লিন্‌' নামে যে মস্‌লিন্‌ তখন ঢাকা হইতে আরব, পারস্য, চীন প্রভৃতি দেশে রপ্তানী হইত, এবং দিল্লীর বাদসাহগণ ও আমির ওমরাহগণ সাদরে গ্রহণ করিতেন, তাহার অর্দ্ধাংশ এই কাটাখালী হইতে উৎপন্ন হইয়া ঢাকায় যাইত এবং তথায় যাইয়া এই কাটাখালীর মস্‌লিনই "ঢাকাই মস্‌লিন" নামে পরিচিত হইত।

কাটাখালিতে তখন ইংরেজ, ফরাসি ও পর্তুগীজদিগের বাণিজ্য কুঠি ছিল। তাঁহারা এই অঞ্চল হইতে মস্‌লিন্‌ ও 'শুক্‌না মাছ' ঢাকায় রপ্তানী করিতেন এবং লবণ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য আমদানী করিয়া বিক্রয় করিতেন।

মানুষের সুখ দুঃখের ন্যায় কৃষ্ণদাসের চক্ষের সম্মুখে এই বিশাল বাণিজ্যের আমদানী রপ্তানী চলিত। কৃষ্ণদাস "আদার বেপারীও" নহেন, সুতরাং তাঁহার "জাহাজের খবরের প্রয়োজন কি? এ তাঁহার ক্ষুদ্র দৃষ্টি, সে বিশাল ব্যবসায়ের পানে ফিরিয়াও তাকাইত না।

* * * * *

একদিন কৃষ্ণদাস ভিক্ষায় বাহির হইয়াছেন। উপবাসকাতর শিশুগুলিকে লইয়া কৃষ্ণদাসের স্ত্রী আকুল মনে চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়, এক সন্ন্যাসী আসিয়া সেই দরিদ্র কুটীরে উপস্থিত হইলেন। কৃষ্ণদাসের স্ত্রী গৃহে অতিথি দেখিয়া একেবারে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। গৃহে সেদিন এমন কিছুই ছিল না, যে বস্তুর সহযোগে অতিথিকে তৃষ্ণানিবারণ জন্য একপাত্র জলও দেওয়া যাইতে পারে।

সন্ন্যাসী সমস্তই বুঝিতে পারিলেন। তিনি বলিলেন, "মা, আমার আহারের জন্য তোমার কোন চিন্তা করিতে হইবে না।—আমাকে অনতিবিলম্বে স্থানান্তরে যাইতে হইবে। আমার সঙ্গে বিগ্রহ আছে, ইঁহাকে তোমাদের হস্তে রাখিয়া যাই, ইহাই আমার একমাত্র ইচ্ছা। মা, তোমার শুভ হইবে, তুমি কয়েক দিনের জন্য আমার এই লক্ষ্মীনারায়ণের স্থান দান কর। কয়েক দিন পরে পুনরায় আসিয়া আমার লক্ষ্মীনারায়ণ আমি লইয়া যাইব।"

সন্ন্যাসী কোন প্রত্যুত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়া কৃষ্ণদাসের গৃহে বিগ্রহ রাখিয়া চলিয়া গেলেন। হিন্দু রমণী লক্ষ্মীনারায়ণের নামে মুখ ফুটিয়া কোন কথা বলিতে পারিলেন না। নিজের অবস্থা ভাবিয়া কেবল অশ্রু পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন।

যথা সময়ে কৃষ্ণদাস গৃহে আসিয়া সকল কথা শুনিলেন। শুনিয়া স্ত্রীকে ভৎর্সনা করিতে লাগিলেন।

স্ত্রী বলিলেন—"সন্ন্যাসী বলিয়াছেন শুভ হইবে।"

কৃষ্ণদাস বলিলেন—"লক্ষ্মীনারায়ণের সেবার ত্রুটি হইলে ইহকাল পরকাল উভয়ই নষ্ট হইবে।"

স্ত্রী বলিলেন—"আমাদের যাহা যোটে, তাহাই দেবতার নিকট নিবেদন করিব — তারপর আমরা প্রসাদ লইব।"

কৃষ্ণদাস অশ্রুসিক্তনয়নে লক্ষ্মীনারায়ণকে প্রণাম করিয়া বলিলেন "তাহাই হউক।"

কৃষ্ণদাসের ভিক্ষালব্ধ তণ্ডুল সেদিন লক্ষ্মীনারায়ণের সম্মুখে নিবেদিত হইল। রামশঙ্কর, রামগঙ্গা, নন্দকিশোর, ব্রজকিশোর প্রভৃতি ভ্রাতৃগণ হরিসংকীর্ত্তন করিয়া তাহাদের ক্ষুদ্র গৃহে নূতন অতিথির শুভাগমন ঘোষণা করিল।

৩।

১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই মার্চ্চ ইংরেজ ফরাসি যুদ্ধে ফরাসির পরাভব সংবাদ কলিকাতা পঁহুছে। ২৩শে মার্চ্চ ইংরেজ ফরাসিদিগের হস্ত হইতে চন্দন নগর কাড়িয়া লন। ইহার পর লর্ড ক্লাইভ ঢাকার ইংরেজ

রেসিডেণ্টকে ফরাসিদিগের কুঠি অধিকার করিয়া লইতে আদেশ প্রদান করেন। আদেশ অনুসারে ইংরেজ ঢাকার ফরাসি কুঠি অধিকার করেন। ফরাসিরা প্রাণ লইয়া পলায়ন করেন।

এইরূপ উত্থান পতন জগতের ধর্ম্ম, ইহাও অদৃষ্টেরই নামান্তর। এই উত্থান পতনও কাহার জন্য কোন্ মুহূর্ত্তে অপেক্ষা করিতেছে কে বলিতে পারে?

* * * * *

কৃষ্ণদাস দুই দণ্ড রাত থাকিতে উঠিয়া নরশুন্দার (নদী) ঘাটে প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিতে যাইতে ছিলেন। পথে গড্‌লি সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ হইল। গড্‌লি কাটাখালিস্থ ফরাসি কুঠির এজেণ্ট। তিনি কৃষ্ণদাসকে অতিশয় ধার্ম্মিক বলিয়া জানিতেন এবং মাঝে মাঝে সাহায্য করিতেন।

গড্‌লি কৃষ্ণদাসকে বলিলেন—"কৃষ্ণদাস এই মুহূর্ত্তে আমি দেশে যাইতেছি। তুমি সৎলোক—কাল রাত্রিতে এই ৮ শ্লুপে ১৬ হাজার মন লবণ আমদানী হইয়াছে। আমি তোমার জিম্মায় এই ১৬ হাজার মন লবণ রাখিয়া গেলাম। যাহা করিতে হয়, তুমি করিও। আমাদের বড় বিপদ। এই মাত্র ঢাকা হইতে বিপদের সংবাদ পঁহুছিয়াছে।" এই বলিয়া গড্‌লি একখানা কাগজ কৃষ্ণদাসের হস্তে প্রদান করিয়া, শেষ বিদায় গ্রহণ করিলেন।

অদৃষ্ট এমনই অজানিত ভাবে আইসে। কমলার কৃপা এইরূপ অযাচিত ভাবে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

৪।

লক্ষ্মীনারায়ণের শুভ আগমনে কৃষ্ণদাসের শুভদিন দেখা দিয়াছে—কৃষ্ণদাসের ইহাই বিশ্বাস। কৃষ্ণদাস লবণ বিক্রয় করিয়া অর্দ্ধাংশ গড্‌লি সাহেবের জন্য রাখিয়া দিলেন, বাকী অর্দ্ধাংশ হইতে লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দির প্রতিষ্ঠা করিলেন এবং নিজে ইংরেজ কুঠির দালালি আরম্ভ করিলেন।

কৃষ্ণদাস তাঁহার সাধুতা ও বিশ্বস্ততা দ্বারা ইংরেজ কুঠির এজেণ্টকে এতদূর সন্তুষ্ট করিলেন যে, অবশেষ ঢাকার ইংরেজ কুঠির এজেণ্ট কৃষ্ণদাসকেই কাটাখালীর একমাত্র এজেণ্ট নিযুক্ত করিয়া বিশ্বস্ততার চিহ্ন স্বরূপ "প্রামাণিক" উপাধি প্রদান করিলেন।

কৃষ্ণদাস নাটোর রাজত্বে বাস করিতেছিলেন। এইবার রাজধানী নাটোর যাইয়া আপন সম্মান প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করিলেন।

কৃষ্ণদাস বিপুল উপঢৌকন দ্বারা নাটোর রাজকে প্রীত করিলেন। রাজা রামকৃষ্ণ দুইটী সুবৃহৎ তালুক লাখিরাজ দান করিয়া কৃষ্ণদাস প্রামাণিকের সংবর্দ্ধনা করিলেন।

নাটোরের বিপুল বিভব দেখিয়া পুত্র নন্দকিশোরের ভোগলিপ্সা প্রবল হইয়া উঠিল। গৃহে আসিয়া নন্দকিশোর পিতার অনুমতি লইয়া নাটোরের অনুকরণে নিজ গৃহ নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিলেন।

৫।

ছিয়াত্তরের মন্বন্তর শস্য শ্যামলা বঙ্গভূমিকে শ্মশানে পরিণত করিয়াছিল। দেশের সেই ভীষণ দুর্দ্দিনে নন্দকিশোর লক্ষ্মীনারায়ণের নূতন গৃহ প্রস্তুতের আয়োজন করিয়া দরিদ্র প্রতিপালনের ব্যবস্থা করিলেন। নন্দকিশোর নাটোরের যে বিভব প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন তাহা ভুলিয়া যান নাই। তিনি নাটোরের আদর্শ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট আদর্শে নূতন গৃহ প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিলেন।

সেই সময়, বঙ্গদেশে নাটোরের পঞ্চরত্ন ও রাজনগরের একুশ রত্ন স্থপতি-শিল্পের প্রকৃষ্ট নিদর্শন বলিয়া গণ্য ছিল। নন্দকিশোর রাজনগরের একুশ রত্ন অপেক্ষা অধিকতর সুদৃশ্য একুশ রত্ন নির্ম্মাণের চেষ্টায় যত্নবান্ হইলেন।

নন্দকিশোর মন্বন্তরের সম্পূর্ণ বৎসর দুর্ভিক্ষপ্রপীড়িত সহস্র সহস্র শ্রমজীবীর অন্ন সংস্থান করিলেন এবং তৎপরিবর্ত্তে তাহাদিগের দ্বারা বৃহৎ বৃহৎ দীর্ঘিকা খনন করাইলেন, দোলমঞ্চ, জলটঙ্গী, রাসবাড়ী, দুর্গা মন্দির, গোলদালান, শিবমন্দির, একুশ রত্ন প্রভৃতি প্রস্তুত করাইলেন, এবং তাহা ইষ্টদেবতা লক্ষ্মীনারায়ণের নামে উৎসর্গ করিয়া দিলেন।

কৃষ্ণদাসের দরিদ্র পরিবার লক্ষ্মীর কৃপায় শ্রীসম্পন্ন হইয়া উঠিল।

৬।

সৌভাগ্য লক্ষ্মী আসিবার কালে কাহাকে জানাইয়া আইসেন নাই। তাঁহার অন্তর্দ্ধানের সময়ও কেহ জানিতে পারিল না।

নন্দকিশোরের ভ্রাতুষ্পুত্র নবকিশোর একদিন স্বপ্ন দেখিলেন-গৃহদেবতা লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দিরের পশ্চাৎ দরজায় বাহির হইয়া চলিয়া গেলেন। স্বপ্ন দেখিয়া নবকিশোরের নিদ্রাভঙ্গ হইল, তিনি আর নিদ্রা যাইতে পারিলেন না। 'লক্ষ্মীনারায়ণ' 'লক্ষ্মীনারায়ণ' বলিয়া শয্যা ত্যাগ করিলেন। দ্বার খুলিয়া নবকিশোর দেখিলেন সম্মুখে বিশাল শ্মশ্রু দীর্ঘ জটা সমন্বিত বৃদ্ধ সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসী বলিল—"নবকিশোর আমার লক্ষ্মীনারায়ণ আমাকে দাও।"

নবকিশোর পিতা পিতামহের নিকট লক্ষ্মীনারায়ণের আকস্মিক আগমনের কথা শুনিয়াছিলেন। সুতরাং সন্ন্যাসীর কথায় কোন প্রতিবাদ করিতে পারিলেন না। সন্ন্যাসী স্বপ্নের ন্যায় আসিয়াছিলেন, স্বপ্নের ন্যায় চলিয়া গেলেন। নবকিশোরের চক্ষের সম্মুখ দিয়া যেন বিপ্লব চলিয়া গেল।

দেখিতে দেখিতে কালের কঠোর তাড়নে প্রামাণিকের বিপুল বিভব মঠমন্দির ধূলিকণাতে পরিণত হইতে লাগিল।

শ্রীকেদারনাথ মজুমদার।

প্রামাণিকের কীর্ত্তি।

ময়মনসিংহ জিলার অন্তর্গত কিশোরগঞ্জের প্রামাণিকদিগের সুবিশাল হর্ম্ম্যরাজি এক সময় পূর্ব্ববঙ্গের স্থাপত্যশিল্পের প্রকৃষ্ট নিদর্শন বলিয়া পরিগণিত ছিল। কালের কঠোর নিষ্পেষণে সেই দেশবিশ্রুত কীর্ত্তিস্তম্ভগুলি এখন ধরা বক্ষ হইতে একে একে বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে। উপর্য্যুক্ত "লক্ষ্মীনরায়ণের কৃপা" গল্পটীতে সংক্ষেপে প্রামাণিকদিগের প্রাচীন কাহিনী বিবৃত হইয়াছে।

কৃষ্ণদাস পৈত্রিক বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া আসিয়া নরশুন্দা নদীর পশ্চিম তীরে স্বীয় বাসস্থান নির্দ্দেশ করেন। তাঁহার প্রাচীন বাসগৃহ এখন বৃহৎ পাদপ-শিকড়ে নিষ্পেষিত হইয়া অন্তিম মুহূর্ত্তের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছে।

কৃষ্ণদাস স্বীয় জীবনে তাঁহার আকাঙ্ক্ষা পূরণ করিয়া যাইতে পারেন নাই। নাটোর ও রাজনগরের বাড়ীর অনুরূপ সৌধমালায় ভূষিত করিয়া স্বীয় বাসস্থানকে লক্ষ্মীনারায়ণের পদে উৎসর্গ করিয়া দেওয়াই তাঁহার শেষ আকাঙ্ক্ষা ছিল। পাছে আকস্মিক মৃত্যু তাঁহার এই প্রবল বাসনা পূরণে বিঘ্ন উৎপাদন করে, সেই জন্য ১১৬৫ বঙ্গাব্দে (১৭৫৯ খ্রীঃ) তিনি পুত্র নন্দকিশোরকে এক দলিল সম্পাদন করিয়া দিয়া তাঁহার ইচ্ছানুরূপ গৃহ প্রস্তুতের উপদেশ প্রদান করেন। কৃষ্ণদাসের কল্পনা তাঁহার দলিলে প্রতিফলিত হইয়াছে। সেই প্রাচীন দলিলের আলোক চিত্র প্রদত্ত হইল। পাঠকের বোধ-সৌকর্য্যার্থে দলিলের সঙ্গে একখানা বিশুদ্ধ পাঠও নিম্নে প্রদত্ত হইল।

৭শ্রীহরি—

শ্রীকৃষ্ণদাস

ইআদি কির্দ্দ সকল মঙ্গলালয়--

শ্রীনন্দকিশোর দাস সুচরিতেষু—লিখনং কার্য্যঞ্চাগে তুমি মদ ? ৺ লক্ষ্মীনারায়ণের সেবার কার্য্যেতে বৃত আছ অতএব এক দেবালয় নির্ম্মাণ করার কারণ আমার তালুক গলগলীয়া কাটাখালী দেবোত্তর করিয়া দেওা গেল গ্রাম মজকুরের মধ্যস্থলে এমত পুরী করিবে যাহাতে ৺ সর্ব্বদা বাসস্থান ও গ্রীষ্মকালে জলটঙ্গী বসন্তকালের পুষ্পাবাস ও বাগুলী ও দুলমঞ্চ আদি ও ৺ দুর্গাপুজার স্থান ও ৺ চতুর্দ্দশ কালীপুজার স্থান ও ৺ মঙ্গলচণ্ডী পুজার স্থান ও ৺ কার্ত্তিক ও ৺ বিষহরি প্রভৃতি কৌলিক

পুরীনির্ম্মাণের আদেশপত্র।

নানা দেবতার স্থান ও ৺ শিবালয় করিয়া তাহাতে শিব স্থাপন করিয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সতর রত্নে ৺ স্থাপিত করিয়া তুমি ও তোমার পুত্র পৌত্রাদী পুরুষানুক্রমে ৺ সেবা করিতে রহ তালুক মজকুরের রাজস্ব সিমলিয়া নথ আটী সামিল আমি আদায় করিব তোমার স্থানে কখন তলপ হইবে না। ৺ পুরী যে পর্য্যান্ত প্রস্তুত না হয়; ততদিন পর্য্যন্ত দরমা খরচ ৭৫০ সাড়ে সাত শত টাকা আমার সরকারে পাইবা। ইতি সন ১১৬৫ বাঙ্গালা তারিখ ১১ ফাল্গুণ"

যথা সময়ে নন্দকিশোর পিতার উপদেশ অনুসারে পুরী নির্ম্মাণ করিয়া তাহা লক্ষ্মীনারায়ণের নামে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। পিতৃসন্নিধানে আসিয়া নন্দকিশোর নাটোর ও রাজনগরের যে বিপুল ঐশ্বর্য্যের চিত্র প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার মানসনেত্রে অবিরাম ক্রীড়া করিতেছিল। তিনি তাহা অপেক্ষা মনোজ্ঞ পুরী নির্ম্মাণ করিয়া পিতার শেষ আদেশ প্রতিপালন করিতে যত্ন করিলেন।

বাঙ্গালায় যখন "ছিয়াত্তরের মন্বন্তর" তখন সেই ভীষণ দুর্দ্দিনে নন্দকিশোর পুরী নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিলেন। মন্বন্তরের সমস্ত বৎসর ব্যাপী তিনি দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত সহস্র সহস্র শ্রমজীবীকে অন্ন বস্ত্র প্রদান করিয়া প্রতিপালন করিলেন এবং তাহাদিগের দ্বারা পুরীর চতুর্দ্দিকে বৃহৎ বৃহৎ দীর্ঘিকা দোলমঞ্চ, জল-বাস (জল-টঙ্গী), গোল দালান, শিব মন্দির, রাস মণ্ডপ, একুশরত্ন প্রভৃতি নির্ম্মাণ করাইলেন। কৃষ্ণদাসের দলিলে সতর রত্নের উল্লেখ থাকিলেও নন্দকিশোর একুশরত্ন নির্ম্মাণ করাইলেন।

১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে লক্ষ্মীনারায়ণের পুরীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মন্দির একুশরত্ন প্রস্তুত হয়। ইহার দেওয়ালের কারুকার্য্য এরূপ মসৃণ ছিল যে, তাহার ভিতর দিয়া দর্পণের ন্যায় দর্শকের চিত্র প্রতিফলিত হইত। এরূপ কীর্ত্তি বাঙ্গালায় দুইটী নাই। যে বিস্তৃত ভূমি খণ্ডে এই একুশরত্ন অবস্থিত, ছিল তাহার পরিমাণ ফল ৯২১৬ বর্গ ফুট। নিদারুণ কালের হস্তে এই একুশরত্ন তুচ্ছ ধূলিকণা হইয়া ধূলিতে মিশিয়া গিয়াছে। প্রথমে ১৯২ সনের ভূমিকম্পে একুশ রত্নের আকাশস্পর্শি চূড়ার কতকাংশ স্খলিত হয়, ইহার পর ১৩০৪ সনের ভীষণ ভূকম্পে তাহা একবারে ধূলিসাৎ হইয়া ধরাপৃষ্ঠ হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিয়াছে।

চিত্রকর শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত চৌধুরী মহাশয় ১২৯০ সনে একুশরত্নের যে চিত্র তুলিয়াছিলেন, লুপ্ত কীর্ত্তির সেই অমূল্য চিত্র লেখা আজ "সম্মিলনের" পাঠকগণের সম্মুখে উপস্থিত করা গেল।

জলটঙ্গী বা গ্রীষ্মাবাস সমন্বিত যে বিশাল পুষ্করিণী বাড়ীর পূর্ব্বদিকে এখনও দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার দৈর্ঘ্য ৫২৮ হাত, প্রস্থ ২৮২ হাত। তাহা এক দ্রোণ জমি অধিকার করিয়া আছে। জলটঙ্গী ত্রিতল ছিল। ইহা পুষ্করিণীর তলদেশ হইতে উত্থিত হইয়াছে। ১৮৯৭ সনের ভূমিকম্পে সে জলটঙ্গী জলমগ্ন হইয়া গিয়াছে। এখন সম্মুখের সেই বিশাল দীর্ঘিকার গর্ভ আগাছায় পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। সেই দীর্ঘিকাবাস জলটঙ্গীর ভগ্নাবশেষ চিত্র এখনও বহু প্রাচীন কাহিনী স্মরণ করিয়া দেয়।

বাড়ীর পশ্চিমে শিবালয়। সেই শিবালয়ের পশ্চিমেও দীর্ঘিকা। শিবালয়গুলি দোচালা ইষ্টক-নির্ম্মিত গৃহ। পুকুর ঘাটের দুইদিকে তিনটী করিয়া ঘর। ঠিক মধ্যস্থলে বাড়ীর সিংহদ্বার হইতে সোজা ঘাটে আসিবার পথ। এই শিবালয় এক সময়ে অতিথিশালার জন্যও ব্যবহৃত হইত।

১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে নাটোরের রাজা রামকৃষ্ণের জমিদারী নীলাম হইয়া গেলে, আর্ম্মানী খাজে আরাতুন তাহা ক্রয় করেন। খাজে আরাতুনের সহিত লাখিরাজ লইয়া প্রামাণিকদিগের বহুদিন পর্য্যন্ত মোকদ্দমা হয়। প্রামাণিকেরা মহারাজ রামকৃষ্ণের দস্তখতি দানপত্র দেখাইয়া মোকদ্দমা জয় লাভ করিলেন বটে, কিন্তু এই মোকদ্দমায় তাঁহারা বহু পরিমাণ ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িলেন। ইহার পর ঋণ লইয়া পরিবার মধ্যে আত্মকলহ উপস্থিত হইল। আত্মকলহের পরিণাম যাহা হয়, এ পরিবারেও তাহাই হইল। ঋণের জন্য শেষে সম্পত্তি নীলাম হইতে আরম্ভ হইল।

প্রামাণিকদিগের সৌভাগ্য লক্ষ্মী তিন পুরুষ মাত্র ছিল। তিন পুরুষের সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য এতদঞ্চলের

লোককে একটী প্রত্যক্ষ সত্য শিক্ষা প্রদান করিয়া গিয়াছে। আজ সেই সৌভাগ্যের কঙ্কাল চিত্র পাঠকের মনেও সেই সত্যকে জাগরিত করিতেছে সন্দেহ নাই। সেই একুশরত্নসমন্বিত অগণিত সৌধশ্রেণীর স্থানে আজ অযত্নবর্দ্ধিত কণ্টকবন। সেই কণ্টকবনে সমাচ্ছন্ন ভগ্ন জীর্ণগৃহে আজও কৃষ্ণদাসের দুর্ভাগ্য বংশধর দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া ফেলিয়া সেই চির সত্য প্রচার করিতেছে।

প্রামাণিকের বিস্তৃত প্রাসাদ-পুরী পরিত্যক্ত শ্মশান পুরীতে, ঝুলনের সময়, ঝুলন মেলা হইয়া থাকে। এই ঝুলন মেলা পূর্ব্ববঙ্গে একটী প্রসিদ্ধ মেলা। ইহাতে বহুলক্ষ টাকার জিনিসপত্র বিক্রয় হইয়া থাকে।

আমরা নিম্নে কৃষ্ণদাসের বংশাবলী প্রদান করিয়া এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উপসংহার করিলাম।

কৃষ্ণদাস প্রামাণিক ১
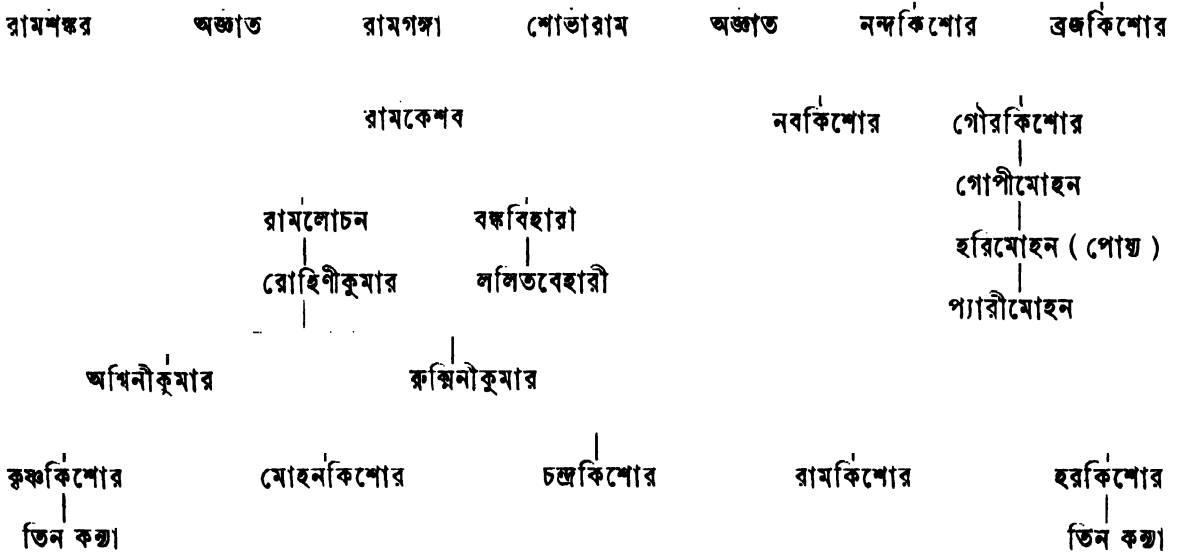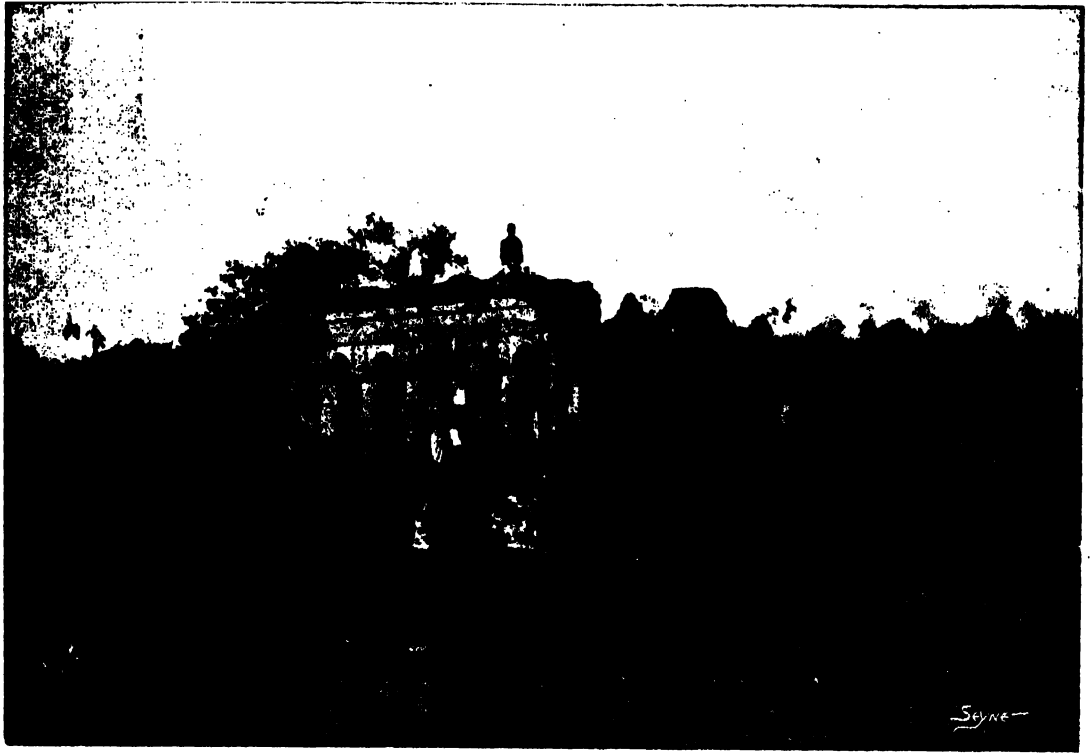
গ্রীষ্মাবাস বা জলটঙ্গী (ভগ্নাবশেষ)।
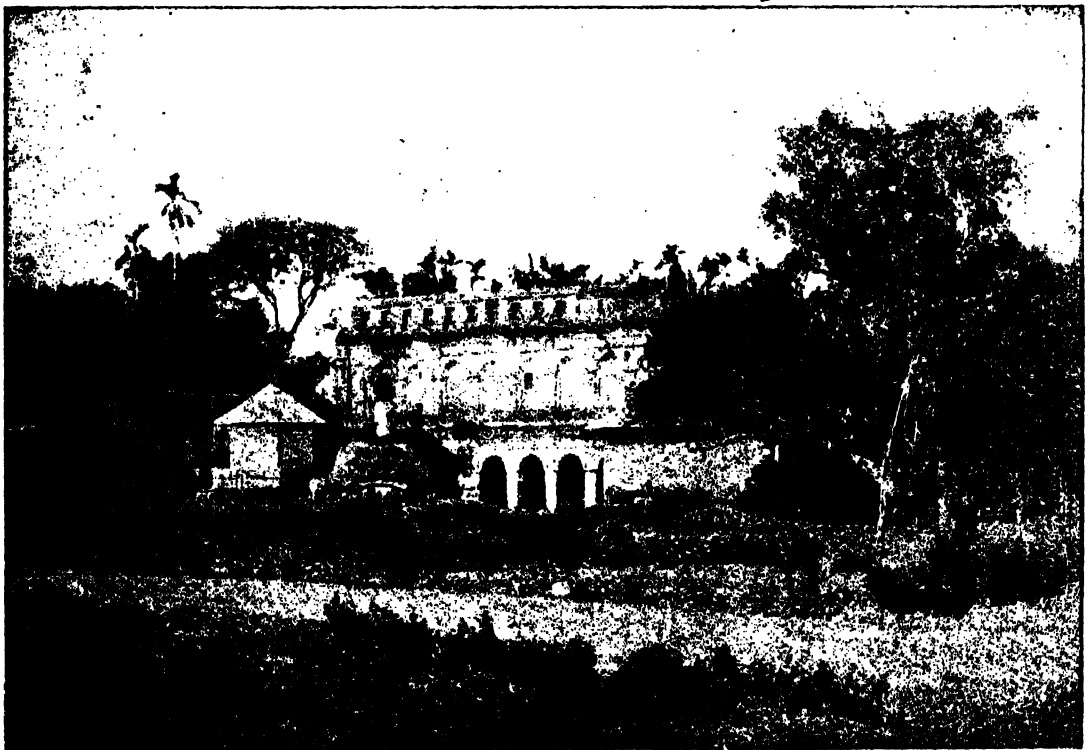
উত্তরচরিত

'উত্তরচরিত' ভাবের অমৃত উৎস,—কবিত্বের পূর্ণ প্রস্রবণ—পবিত্রতার মানস মোহিনী লীলালহরী। 'উত্তরচরিত' কবির প্রতিষ্ঠাক্ষেত্র,—সিদ্ধিভূমি,—কীর্ত্তিতীর্থ। 'উত্তরচরিত' সংস্কৃত সাহিত্য মন্দিরের চিরোজ্জ্বল পবিত্র রত্নপ্রদীপ। উত্তরচরিত নাটক, কালপ্রিয়নাথের উৎসবে অভিনীত হয়। রঘুকুলমণি রামচন্দ্রের উত্তরচরিত বা শেষ জীবন বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া ইহা উত্তরচরিত নামে পরিচিত। সতী-ধর্ম্মের পূততম আদর্শ, নারী জাতির শিরোভূষণ, চরিত্র মাহাত্ম্যের পুণ্যময়ী মূর্ত্তি, লক্ষ্মীরূপিণী সীতাদেবীর নির্ব্বাসনই রামজীবনের উল্লেখযোগ্য শেষ ঘটনা। এই ঘটনা-অবলম্বনে উত্তরচরিত বিরচিত। অনন্ত রত্নভাণ্ডার রামায়ণ হইতে উত্তরচরিত্রের উপাদান বা আখ্যানভাগ গৃহীত হইয়াছে, কিন্তু ভবভূতির অলোকসামান্য প্রতিভা পরকীয় উপাদানের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া কাব্যসৌধ নির্ম্মাণে সম্ভবতঃ লজ্জাবোধ করিল; তাই অনেক অতুলনায় নূতন বস্তু সৃষ্টিদ্বারা সেই উপাদান ভিত্তির উপরে উত্তরচরিতরূপ অনুপম কাব্য-প্রাসাদ গঠিত হইয়াছে। উত্তরচরিতে রামায়ণীয় আখ্যান-উপাদানের পুরাতন ভিত্তি স্থানে স্থানে পরিবর্ত্তিত ও সংস্কৃত হইয়াছে; তাহা প্রসঙ্গ ক্রমে উল্লেখ করিব।

মহাবীর চরিত, মালতী মাধব ও উত্তরচরিত নামক নাট্য সাহিত্যত্রয় ছাড়া ভবভূতি কাব্যান্তর প্রণয়ন করিয়াছেন কি না জানি না। এই মহাকবি-রচিত অন্য কোন গ্রন্থের সংবাদ আমরা অবগত নহি। নাটকত্রয়ের কোন্ খানি কোন্ সময়ে রচিত ও অভিনীত হইয়াছে, তাহা আজিও গ্রহণযোগ্য প্রমাণাদিদ্বারা সুমীমাংসিত হয় নাই, কাজেই পুস্তক তিন খানার পৌর্ব্বাপর্য্য নির্দ্দেশ করিতে আমরাও অসমর্থ। তবে গ্রন্থত্রয়ের ভাব ভাষাদির উৎকর্ষাবকর্ষদর্শনে অনুমান করি, উত্তরচরিত ভবভূতির পক্ক লেখনী প্রসূত পরবর্ত্তি কাব্য। মালতী মাধব সম্ভবতঃ কবির আদি রচনা, মহাবীর চরিত মধ্য-সৃষ্টি এবং উত্তরচরিত শেষ কীর্ত্তি। যমজ ভ্রাতার ন্যায় মহাবীর চরিত ও উত্তরচরিতে আকৃতি-সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। একই শ্লোক বহুস্থানে উভয়ত্র সন্নিবেশিত। মালতী মাধবের প্রস্তাবনায় কবি যে অশোভন দাম্ভিকতা প্রকাশ করিয়াছেন তাহা প্রথম জীবনেই শোভা পায়। মালতী মাধব রচনা করিয়া ভবভূতি আত্মশক্তির উপরে অনুচিত আস্থা স্থাপন করিয়াছিলেন; ভাবিয়াছিলেন, বিপুলবিশ্বে তিনি একমাত্র কবি, তাঁহার ন্যায় কবি 'ন ভূতো ন ভবিষ্যতি।' প্রথম কার্য্যে সিদ্ধিলাভ ঘটিলে সাধারণতঃ একটা গর্ব্বভাব উপস্থিত হয়, ভবভূতির পক্ষেও বোধ হয় তাহাই হইয়াছিল। মালতী মাধব তদানীন্তন রসজ্ঞ-সুধীসমাজে সাদরে গৃহীত হইয়াছিল—মনে করি, এবং পণ্ডিত সমাজের প্রশংসাবাণীই যে, প্রথমপ্রবিষ্ট ভবভূতিকে অহঙ্কারে অন্ধ করে নাই, কে বলিতে পারে? সুখে—দুঃখে, মানে—অপমানে, মিলনে—বিচ্ছেদে সর্ব্বত্রই দিনের পর দিন নূতনত্ব ঘুচিয়া যায়, সময়ে সকল বিষয়েরই উত্তাল মাদকতা-তরঙ্গ প্রশমন সীমায় আসিয়া দাঁড়ায়।

কালে ভবভূতির কবিত্ব-গর্ব্বোন্মাদ অপনীত হইল, ক্রমে তাঁহার দিগন্ত বিশ্রান্ত যশঃ পুঞ্জের নূতনত্ব তিরোহিত হইল। সেই কারণেই অনুমিত হয়, মহাবীর চরিত ও উত্তরচরিতের প্রস্তাবনায় কবির আত্মস্তুতি অনেকটা শান্তভাব ধারণ করিয়াছে। বয়সের প্রভাব না থাকিলে নিশ্চয়ই কাব্য কোহিনূর উত্তরচরিতের ললাট-দেশে পূর্ব্বোক্ত গর্ব্বপতাকা উচ্ছ্রিত হইত। যাক, সে কথা। কাব্যত্রয়ের পৌর্ব্বাপর্য্য নিরূপণ বর্ত্তমান প্রবন্ধের লক্ষীভূত বিষয় নহে। উত্তরচরিতের গল্পভাগ রামায়ণ হইতে গৃহীত হইয়াছে বটে, কিন্তু ভবভূতির প্রতিভা সর্ব্বত্রই অপরূপ নূতনত্ব সৃষ্টি করিয়াছে। "ছায়া" ভবভূতির নিজস্ব, "বাসন্তী" কবির অপূর্ব্ব রচনা, গ্রন্থের শেষভাগ আমূল পরিবর্ত্তিত। "চিত্র দর্শনে" কবির অলোকসামান্য কৃতিত্ব চিত্রিত হইয়াছে। পুস্তকের আদ্যোপান্তে পবিত্র দাম্পত্য প্রেমের গভীর উচ্ছ্বাস লক্ষিত হয়। ভবভূতি ব্যতীত অন্য কোন সংস্কৃত কবি এইরূপ মার্জ্জিত রুচির পরিচয় দিতে

পারেন নাই। এই নাটকের কুত্রাপি কুরুচির পূতিগন্ধ নাই, অশ্লীলতার আবর্জ্জনা নাই, সর্ব্বত্র কেবল সংযম, পবিত্র প্রেমের তরঙ্গ, শুধু উন্নত রুচির অমৃত ধারা।

উত্তর চরিতের প্রস্তাবনায় ভবভূতির অসামান্য রচনা-নৈপুণ্য প্রদর্শিত হইয়াছে। প্রস্তাবনা সংস্কৃত নাট্য সাহিত্যের অবশ্য করণীয় উল্লেখ যোগ্য মুখবন্ধ। যে প্রারম্ভক দৃশ্যে অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ রঙ্গ মঞ্চে প্রবিষ্ট হইয়া সংলাপচ্ছলে চতুরতার সহিত অভিনেতব্য বিষয়ের অবতারণা করে, তাহারই নাম প্রস্তাবনা। প্রস্তাবনা প্রসঙ্গে আর একটি সুধীজনজ্ঞাতব্য প্রয়োজনীয় কথা সমাজ সমক্ষে উপস্থাপিত হয়। সূত্রধার প্রধান অভিনেতা, তিনি সমাগত সম্ভ্রান্ত দর্শকমণ্ডলীর নিকটে সবিনয় সম্ভাষণে নাট্যকারের যে সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করেন তাহা উত্তরকালে প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধিৎসুগণকর্ত্তৃক বিশ্বাসযোগ্য ঐতিহাসিক উপাদেয় উপাদান সামগ্রীরূপে সাদরে পরিগৃহীত হইয়া থাকে। সূত্রধারের অনুগ্রহেই যে, আমরা উত্তরচরিত রচয়িতা কবি ভবভূতির সুদূর-অতীতের কুক্ষিগত জাতি গোত্রাদির সংবাদ অবগত হইতে সমর্থ হইয়াছি। প্রস্তাবনার প্রারম্ভে সূত্রধারের উক্তি, যথা;—

—"অদ্য খলু ভগবতঃ কালপ্রিয়নাথস্য যাত্রায়াং আর্য্যমিশ্রান বিজ্ঞাপয়ামি, এবমত্রভবন্তো বিদাংকুর্ব্বন্তু, অস্তি তত্রভবান্ কাশ্যপঃ শ্রীকণ্ঠপদলাঞ্ছনঃ পদ-বাক্য-প্রমাণ জ্ঞো ভবভূতির্নাম জাতুকর্ণীপুত্রঃ। যং ব্রহ্মান মিয়ং দেবী বাগ্ বীশ্যেনুবর্ত্ততে" ইত্যাদি উক্তিতেই আমরা সম্যক্ পরিজ্ঞাত হইতে পারিয়াছি যে, কবি ভবভূতি ব্যাকরণ সাহিত্যে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য লাভ করিয়া "শ্রীকণ্ঠ" উপাধিভূষণে অলঙ্কৃত হইয়াছিলেন। ইনি কাশ্যপ গোত্রীয় ব্রাহ্মণবংশ সম্ভূত; ইঁহার জননীর নাম জাতুকর্ণী। জনকের নাম গোপন করিয়া ভবভূতি জনসমাজে মাতৃনামে আত্ম-পরিচয় প্রদান করিতে প্রয়াস পাইলেন কেন বলিতে পারি না। সে সময়ের সমাজে মাতৃনামে পরিচিত হওয়ার রীতিই প্রবর্ত্তিত ছিল কি না, পুরাতত্ত্ববিদ্গণ অনুসন্ধান করিয়া দেখিবেন। নব্যযুগের কবিকুলবরেণ্য মাইকেল মধুসূদন দত্তও আত্মপরিচয় প্রদান কালে সগৌরবে পবিত্র মাতৃনাম উচ্চারণ করিয়া গিয়াছেন যথা:—

"যশোরে সাগর দাঁড়ি, কবতক্ষ তীরে
জন্মভূমি, জন্মদাতা দত্ত মহামতি
রাজনারায়ণ নামে, জননী জাহ্নবী।"

তারপর উত্তরচরিতের প্রস্তাবনারূপ প্রস্তরফলকে আরও ঐতিহাসিক তত্ত্ব খোদিত রহিয়াছে। এই নাটকখানি কালপ্রিয়নাথের উৎসব-সভায় প্রথম অভিনীত হয়। কালপ্রিয়নাথ স্থান-বিশেষে প্রতিষ্ঠিত নিশ্চয় প্রসিদ্ধি-প্রাপ্ত কোনও শিবমূর্ত্তির নাম। যদি কোনও প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধিৎসু পর্য্যাটক সশ্রম-অনুসন্ধানে কালপ্রিয়নাথকে অতীতের তিমিরাবৃত গহ্বর হইতে উদ্ধার করিয়া জিজ্ঞাসু জনসমাজের জ্ঞানগোচরে আনয়ন করিতে পারেন, তবে আশা করা যায়, কবি ভবভূতির জন্মভূমি ও আবির্ভাব কাল নিরূপণ-সিদ্ধান্তের বাহিরে পড়িয়া থাকিবে না। বাঙ্গালা নাট্যসাহিত্য হইতে এই মঙ্গল্য প্রস্তাবনা-অনুষ্ঠান একরূপ নির্ব্বাসিত হইয়াছে। বাঙ্গালায় এই প্রস্তাবনা-নির্ব্বাসন সাহিত্য-সংসারের কল্যাণ উৎপাদন করিবে কি অগৌরব ঘোষণার বীজ বপন করিবে, তাহা অদ্য আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি না।

বর্ত্তমান যুগে বঙ্গ-রঙ্গপ্রকোষ্ঠে বিনা সংবাদে যেমন অভিনেতব্য বিষয় দর্শকগণের নয়ন সম্মুখে সহসা উপস্থিত হয়, প্রাচীনকালে অভিনয়ক্ষেত্রে নাট্যোল্লিখিত নরনারীর আকস্মিক উপস্থিতির তেমন কোনও রীতি প্রচলিত ছিল না। সমালোচ্য গ্রন্থের আখ্যানাংশ প্রস্তাবনাতেই প্রকাশ-পথে পদার্পণ করিয়াছে। প্রস্তুত বিষয়ের অবতারণায় কবি প্রকৃত পক্ষেই কৃতিত্ব প্রদর্শনে সমর্থ হইয়াছেন। পাঠকবর্গের অবগতির নিমিত্ত প্রস্তাবনা হইতে কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল। নট ও সূত্রধারের কথোপকথনে প্রকাশ পাইয়াছে যে, অযোধ্যার বালক বৃদ্ধ নর নারী জামাতা ঋষ্যশৃঙ্গের যজ্ঞে গমন করিয়াছেন। অরুন্ধতী, বশিষ্ঠ ও কৌশল্যা প্রভৃতি দূরদর্শী গুরুজনবর্গ বধূ জানকীকে "কঠোরগর্ভা" বলিয়া স্থানান্তরিত করিতে সাহস পান নাই; সুতরাং তাঁহারা অন্তর্বত্নী সীতাকে অযোধ্যায় রাখিয়া জামাতৃ-যজ্ঞে গমন করিয়াছেন। কিন্তু বধূর ভাবনা তাঁহাদিগকে আকুল করিয়া তুলিয়াছিল;

তাই তাঁহারা জানকীর চিত্তবিনোদনের জন্য রাম-লক্ষ্মণকেও অযোধ্যার রাজভবনে রাখিয়া যান। এই সকল কথা বিনা প্রয়োজনে বর্ণিত হয় নাই; যথাস্থানে ইহার উদ্দেশ্য-গুরুত্ব প্রদর্শিত হইবে। সূত্রধার ও নটের যে কথা-বার্ত্তায় বহু জ্ঞাতব্য-তত্ত্ব প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে, তাহার কিয়দংশ এইরূপ—

সূত্রধার। থাক্ রাজারাজরার কথায় আমাদের প্রয়োজন নাই। চল এখন, আমাদের কুলপ্রথা অনুসারে রাজাকে স্তুতি করিবার জন্য রাজদ্বারে যাই।

নট। মহাশয়, তাহা হইলে রাজার নিকটে উপস্থিতি মাত্রেই পাঠযোগ্য সর্ব্বাংশে অনিন্দ্য একটা স্তোত্র ঠিক করুন।

সূত্রধার। ওহে,—

চলিবে যথেচ্ছ কোথা নাহি নিন্দাভার?
যেমন রমণীগণে
তেমনি ত সুবচনে
সাধুতায় দুর্জ্জন সকল সংসার।

নট। "অতি দুর্জ্জন" ইহাই বলা উচিৎ। কারণ,—

সতী সীতা দেবীতেও নিন্দারত জন!
রাক্ষস ভবনে বাস
তাই রটে নিন্দা রাশ,
করেনা বিশ্বাস কেহ বহ্নি-বিশোধন।

সূত্রধার। যদি এই কিম্বদন্তী মহারাজকে স্পর্শ করে, তবে বড়ই কষ্টকর ঘটনা উপস্থিত হইবে।

নট। দেবতা ও ঋষিগণ সর্ব্বপ্রকারে কল্যাণ করিবেন।

ইহার পরে নট পুরবাসী-জন-সজ্বকে তারস্বরে জিজ্ঞাসা করিল ও প্রত্যুত্তরে অবগত হইল;—"মহারাজ রামচন্দ্র মানসিক সুখশূন্যা সীতা দেবীর চিত্ত-তৃপ্তিসাধন মানসে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াছেন"। এই পর্য্যন্ত প্রকাশ করিয়াই সূত্রধার ও নট নিষ্ক্রান্ত হইল। নট ও সূত্রধারের উল্লিখিত উক্তি—বৈচিত্র্যে সীতাদেবীর ভবিষ্যৎ জীবনের উজ্জ্বল চিত্র প্রতিফলিত হইয়াছে। "যদি পুনরীয়ং কিম্বদন্তী মহারাজং স্পৃশেৎ, ততঃ কষ্টং স্যাৎ।" সূত্রধারের এই মন্তব্যে রঘুকুলপতি রামচন্দ্রের সর্ব্বজন-স্বীকৃত লোকরঞ্জনকথা ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এই উক্তিই সীতা-নির্ব্বাসনের পূর্ব্বাভাষ। তারপর—মহাতপাঃ বাল্মীকির অনুকম্পায় গৌরব-দীপ্ত সূর্য্যবংশের কুল-প্রদীপ যে রক্ষিত হইবে, তাহাও "সর্ব্বথা দেবাঃ ঋষয়শ্চ স্বস্তি করিষ্যন্তি" এই বচন-ভঙ্গিতে সূচিত হইয়াছে। বস্তুতঃ প্রস্তাবনা বা মুখবন্ধে নট ও সূত্রধারের কথাবার্ত্তার অন্তরালে রাম ও সীতার উত্তরচরিত বা জীবনবৃত্তের শেষাংশ লুক্কায়িত রহিয়াছে। প্রস্তাবনার পরেই অভিনয়ারম্ভ।

সাতটি অঙ্কে উত্তরচরিত সমাপ্তি লাভ করিয়াছে। প্রথম অঙ্কের প্রারম্ভেই নট বর্ণিত অবস্থায় রাম ও সীতার প্রবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। শ্বশ্রূগণ ঋষ্যশৃঙ্গের আশ্রমে গমন করাতে সীতাদেবীর প্রীতিস্নিগ্ধ অন্তরে একটা মহান্ অভাব অনুভব করিলেন। রমণীরত্ন জানকী শ্বশুরগৃহের সকলকেই অনাবিল শ্রদ্ধা-স্নেহের পবিত্র আসনে সাদরে বসাইয়াছিলেন। তিনি প্রিয়তম স্বামীর উপদেশ বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন,—"জানামি আর্য্যপুত্র, কিন্তু সন্তাপকারিণো বন্ধুজন বিয়োগাঃ ভবন্তি" অর্থাৎ আর্য্যপুত্র আমি সবই জানি, কিন্তু বন্ধু বান্ধবের বিয়োগ-বিচ্ছেদ বড়ই সন্তাপকারী হয়। সীতাদেবী শ্বশুর ভবনকে কেমন নিজস্ব করিয়া লইয়াছিলেন। শ্বশ্রূগণের সাময়িক বিচ্ছেদ তাঁহার পক্ষে অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। যে নারী এই আদর্শ-রমণী সীতার ন্যায় সহজ-স্নেহ-নিগড়-বদ্ধ পিতৃ-গৃহ চিন্তাকে হৃদয়ের এক কোণে স্থাপিত করিয়া শ্বশুরালয়ের ধূলি-কণিকার মধ্যেও আন্তরিক স্নেহ ভালবাসা ষোল আনা ছড়াইতে পারেন, যে নারী মাতাপিতার ন্যায় শ্বশ্রূ শ্বশুরকে ভক্তি-শ্রদ্ধাপূত সরল অন্তরে সমান ভাবে গ্রহণ করিতে পারেন, যে নারী শ্বশুর গৃহের সুখে দুঃখে সংসারকে মধুময় ও তিমিরাবৃত বিবেচনা করেন, তিনিই নারী সমাজে মূর্ত্তিমতী কর্ত্তব্য নিষ্ঠা। সীতাদেবী এই অংশেও প্রাতঃস্মরণীয়া ও সকলের নমস্যা।

উত্তরচরিতের প্রথম অঙ্কে আমরা আর একটি মনোহর ঐতিহাসিক চিত্র দেখিতে পাই,—যে অবরোধ প্রথার প্রবল প্রভাবে বঙ্গের অঙ্গনাদল আজিও "অসূর্য্যম্পশ্যা", যে অবগুণ্ঠন—রাহুগ্রাসে বঙ্গীয় নারীগণের

মুখশশী চির-কবলিত ; স্ত্রী সমাজের এই স্বাতন্ত্র্যনাশিনী কুরীতি সম্ভবতঃ ভবভূতির মাতৃ-ভূমিতে প্রবেশ পথ খুঁজিয়া পায় নাই, অথবা কবির আবির্ভাব সময়ে জন্ম-গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করে নাই। অন্তঃপুরের বিলাস কক্ষে রাম ও সীতা উপবিষ্ট, বৃদ্ধ কঞ্চুকী আসিয়া নিবেদন করিলেন,—"ঋষ্যশৃঙ্গের আশ্রম হইতে ঋষি অষ্টাবক্র আসিয়াছেন।" এই সংবাদে অন্তঃপুরের নিভৃত-নিবাসে পবিত্র দাম্পত্য-প্রেমের পীযুষ-প্রবাহে কোনরূপ বিঘ্ন বিক্ষোভ উপস্থিত হইল না। অনুচিত ব্রীড়ার তাড়নায় জানকী তখনই সেই স্থান পরিত্যাগ করিলেন না কিংবা অবগুণ্ঠনে বদনমণ্ডল আবৃত করিয়া গৃহকোণে দণ্ডায়মান থাকিয়া লজ্জাবতী লতিকাকে লজ্জা দিতে অগ্রসর হইলেন না। তিনি সসম্ভ্রমে বৃদ্ধ কঞ্চুকীকে বলিলেন, "আর্য্য কিং ততঃ বিলম্ব্যতে" আর্য্য তাহা হইলে আর বিলম্ব করিতেছেন কেন? রামচন্দ্রের বাক্য প্রয়োগের পূর্ব্বেই সীতা ইহা বলিয়া প্রাচীন ভারতের স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যের সাক্ষ্য প্রদান করিলেন।

অষ্টাবক্র প্রকোষ্ঠে প্রবিষ্ট হইলে রামচন্দ্র "প্রণাম করিতেছি এই স্থানে উপবেশন করুন" বলিয়া যেমন সমাগত ঋষিকে সংবর্দ্ধনা করিয়াছিলেন, সীতাদেবীও তেমনই ভাবে সরল সুন্দর ভাষায় ঋষির গৌরব রক্ষা করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠা প্রকাশ করিলেন না। তিনি সবিনয়ে বলিলেন ;—"নমস্তে অপি কুশলংমে সকল গুরুজনস্য আর্য্যায়াশ্চ শান্তায়াঃ?" আপনাকে প্রণাম করিতেছি, আমার সকল গুরুজনের বিশেষতঃ আর্য্যা শান্তার কুশল ত? স্বামি-সমীপবর্ত্তিনী মনস্বিনী সীতার এই নির্ব্বাধ প্রশ্নে যেমন দাম্পত্য-প্রেমের পতিব্রতা ও প্রাচীন নারী সমাজের শালীনতা প্রদর্শিত হইয়াছে, তেমনই করুণাময়ী বৈদেহীর স্ত্রী-জাতি সুলভ মমতা এবং শান্তার কুশল স্বতন্ত্র ভাবে জিজ্ঞাসা করাতে সাংসারিক অভিজ্ঞতাও প্রকাশ পাইয়াছে। ঋষি অষ্টা-বক্রের আগমনও কবি নিষ্প্রয়োজনে অঙ্কিত করেন নাই। অষ্টাবক্রই রাম-জীবনের শেষ অশুভ দুঃখসূত্র রচনা করিয়া যান। রাম কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া ঋষি বলিলেন,—(বশিষ্ঠ বলিয়াছেন) "জামাতৃ-যজ্ঞে আমরা আসিয়াছি, তুমি বালক, রাজ্যও নূতন, প্রজামণ্ডলীর মনোরঞ্জন সর্ব্বথা করণীয়। তোমাদের পরমধন যশ ইহাতে অর্জ্জিত হইবে।" ইহার উত্তরে সূর্য্যবংশের মুকুটমণি রামচন্দ্র দৃঢ়তার সহিত বলিলেন ;—

"স্নেহ, দয়া, সুখি-ভাব কি বলিব আর,
প্রাণের অধিক প্রিয়া জানকী আমার,
প্রজার রঞ্জন তরে হ'লে প্রয়োজন
ত্যজি তারে, নাহি হ'ব ব্যথিত কখন।"

প্রিয়তমা মহিষীর সম্মুখে এইরূপ অপ্রিয় মন্তব্য প্রকাশ করিতে সত্যপ্রিয় প্রজারঞ্জনকামী রামচন্দ্র কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করিলেন না। রাজনন্দিনী, রাজমহিষী জানকীও রাজধর্ম্ম ভালরূপেই অবগত ছিলেন, তাই তিনি ইহাতে অসন্তুষ্ট হইলেন না, বরং হৃদয়ে অপার তৃপ্তি অনুভব করিলেন। পতি-ধর্ম্মানুবর্ত্তিনী সীতা প্রীতি-প্রফুল্ল-চিত্তে ভাবিলেন ;—

"অতএব রাজ-ধুরন্ধর আর্য্যপুত্রঃ" অর্থাৎ প্রজাগণের মনোরঞ্জনের নিমিত্ত এতটা ত্যাগ স্বীকার করিতে স্বীকৃত আছেন বলিয়াই ত আমার পতি রাজেন্দ্রবর্গের শিরোভূষণ।

রামচন্দ্রের উপরি লিখিত উক্তি নিয়তিকে যেন সাদরে আহ্বান করিল। পরমুহূর্ত্তে রামচন্দ্র সত্য সত্যই লোকরঞ্জনের জন্য প্রিয়তমা সাধ্বী-পত্নীকে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন।

কঞ্চুকী ও রামচন্দ্রের কথোপকথনের মধ্যে আমরা আর-একটি গ্রহণযোগ্য সুন্দর ভাব দেখিতে পাই। সূর্য্যবংশের বৃদ্ধ সম্ভ্রান্ত কর্ম্মচারী কঞ্চুকী শৈশবে রামচন্দ্রকে হাতে ধরিয়া মানুষ করিয়াছিলেন। তিনি বালক রামকে, রামভদ্র বলিয়া ডাকিতেন। রাম এখন বালক নহেন, রাজপুত্র ও নহেন। তিনি এখন যৌবন পদবীতে রাজপদে অধিষ্ঠিত। এই কারণেই সেই দিন কঞ্চুকী কক্ষে প্রবেশ করিয়া অভ্যাস বশতঃ "রামভদ্র" বলিয়া ফেলিতেছিলেন, শেষে রাজার নাম গ্রহণে সঙ্কুচিত হইয়া, মুখের বাক্য মুখে রাখিয়া বৃদ্ধ কঞ্চুকী মহারাজ সম্বোধনে ভ্রম সংশোধন করিতে প্রয়াস পাইলেন। বুদ্ধিমান্ সহৃদয় রামচন্দ্র কঞ্চুকীর অবস্থা বেশ বুঝিতে

পারিলেন, শেষে একটু হাসিয়া বলিলেন, "আর্য্য আমার প্রতি রামভদ্র এই সম্বোধন ব্যবহারই পিতৃ পরিজনের পক্ষে শোভা পায়; সুতরাং চির অভ্যস্থ বাক্য প্রয়োগ করিতে কখনও সঙ্কুচিত হইবেন না" বৃদ্ধ কর্ম্মচারীর প্রতি কেমন সসম্ভ্রম ব্যবহার, কি সুন্দর সম্মান প্রদর্শন! বাল্যে প্রতিপালিত প্রভু পুত্র, যৌবনে প্রতিপালক রূপে প্রতিষ্ঠিত হইলে বহু পুরাতন ভৃত্য বস্তুতঃই অনেক সময়ে মহাবিপদে পতিত হইয়া থাকে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, কয়জন প্রতিপালিত প্রভু রামচন্দ্রের মত বৃদ্ধ কর্ম্মচারীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকেন?

অষ্টাবক্র চলিয়া গেলে লক্ষ্মণ আলেখ্য-হস্তে সেই প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন। এই আলেখ্যে রাম সীতা প্রভৃতির অবস্থা-পরম্পরা অঙ্কিত হইয়াছিল। রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কতদূর পর্য্যন্ত চিত্রিত হইয়াছে?" লক্ষ্মণ উত্তর করিলেন, "আর্য্যাজানকীর অগ্নি বিশুদ্ধি পর্য্যন্ত।" ইহা শুনিয়া রাম বলিলেন,—ছিঃ, একি বলিতেছ! "জন্ম পরিপূতা সীতার আবার পাবনান্তরের প্রয়োজন কি? তীর্থজল ও অগ্নির অন্য স্থান হইতে শুদ্ধিপ্রাপ্তি আবশ্যক হয় না।" নিপুণ চিত্রকর ভবভূতি বিনা প্রয়োজনে এই কথার অঙ্কণে তুলিকা গ্রহণ করেন নাই। সীতা নির্ব্বাসনের মূলে লোকরঞ্জনই একমাত্র কারণ, রামচন্দ্রের নিজের অবিশ্বাসাদি হেতুরূপে তথায় উপস্থিত হয় নাই। ইহা জ্ঞাপন করিবার উদ্দেশ্যেই উল্লিখিত উক্তি সম্ভবতঃ লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীঅনুকূলচন্দ্র গুপ্ত শাস্ত্রী

অভিষেক সঙ্গীত।

মিশ্র পূরবী—তাল একতালা।

রাজ-রাজ অধিরাজ, গাহে কবি আজি জয় তোমার।
বিকসিত সদ্য কোটী হৃদিপদ্ম, আনে অভিষেক-অর্ঘ্য-ভার।
তোমার মহিমা-কিরণ মন্ত্রে, ভানু নাহি যায় রাজ্যে অস্তে,
ততোধিক তব কুল-বৈভব, চির অম্লান চির উদার।
সাগর-চুম্বিত অপূর্ব্ব ভূমি, তাহার বুকের রতন তুমি,
যশ ধেয়ে আসে জলধি পার—
জেনো আজও এই ভারতবর্ষ
ভোলেনি আপন সোণার আদর্শ,
দীর্ঘ জীবন, তোমার রাজন্, কামনা করিছে চরণে তাঁর।

শ্রীপ্রমথনাথ রায় চৌধুরী।

মাইবংএর বুদ্ধ মূর্ত্তি।

শরৎ।

শেফালীকুসুমাকুলৈরলিকুলৈর্লোলা বনালির্ভৃশং
শ্বেতাভঃ শরদভ্রশুভ্রনভসি প্রোদ্ভাসতে চন্দ্রমাঃ।
কহ্লারৈঃ কুমুদৈঃ প্রিয়ৈঃ কুবলয়ৈঃ পদ্মৈশ্চ কীর্ণং সরো
হৃদ্যাদ্য প্রকৃতিঃ প্রসন্নসলিলা সর্ব্বত্র লীলাময়ী ॥

অথবা—

প্রফুল্লকাশৈঃ স্থলপদ্মহাসৈঃ
শেফালিকাশৈর্ভ্রমরৈঃ সুভাষৈঃ।
আকাশদেশৈঃ শরদভ্রশেষৈ
র্বেশৈঃ প্রিয়াদ্য প্রকৃতির্বিশেষৈঃ ॥

শ্রীপ্রসন্নচন্দ্র বিদ্যারত্ন

১ম খণ্ড | ঢাকা, ভাদ্র, ১৩১৮ সাল | ৫ম সংখ্যা।

গীতগৌরাঙ্গ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ষষ্ঠ স্তবক।

নবদ্বীপে শ্রীগৌরাঙ্গের সমসাময়িক দুই তিনটি সমৃদ্ধ ও সৌভাগ্যশালী কায়স্থ ছিলেন। তাঁহাদিগের এক জনের নাম মুকুন্দ সঞ্জয়; আর এক জনের নাম বুদ্ধিমন্ত খাঁন। মুকুন্দ সঞ্জয়ের বাহির্ব্বাটীতে বড় একটা চণ্ডীদালান ছিল। গৌরাঙ্গ যখন নিমাই বিদ্যাসাগর নামে বিখ্যাত পণ্ডিত হইলেন, তখন মুকুন্দ সঞ্জয়ের বিশেষ আগ্রহে, তাঁহার চণ্ডীমণ্ডপেই গৌরাঙ্গের টোল প্রতিষ্ঠিত হইল; গৌরাঙ্গের পিতৃতুল্য-পূজাস্পদ গঙ্গাদাস পণ্ডিতের অসংখ্য ছাত্র, হৃদয়ের আনন্দে, গৌরাঙ্গের টোলে আসিয়া ঠাঁই লইল।

এই টোল সংস্থাপনে মুকুন্দ সঞ্জয়ের একটুকু সুখ-স্বার্থ ছিল; মুকুন্দ সঞ্জয়ের একটি পুত্র ছিল; তাহার নাম পুরুষোত্তম সঞ্জয়। মুকুন্দ তাঁহার সেই প্রাণ-প্রিয় পুরুষোত্তমকে গৌরাঙ্গের হাতে তুলিয়া দিলেন, এবং তাঁহারই শিক্ষার অনুরোধে এই বিখ্যাত টোলের ব্যয়-বহনে অগ্রসর হইলেন। গৌরাঙ্গের এই টোল অতি শীঘ্রই বড় জাঁকিয়া উঠিল; এবং নবদ্বীপ-নিবাসী বড় আর ছোট সকলেই টোলের সৌষ্ঠব, সম্পত্-সামগ্রী ও শিক্ষা-পদ্ধতি দেখিয়া বিস্মিত হইল।

অষ্টাদশ বৎসরের এক অপরূপ-সুন্দর বালক, অথবা অর্দ্ধস্ফুট-যুবা, অধ্যাপক শিরোমণিরূপে, মধ্যস্থলে আসীন; তাঁহার চারি দিকে দেশ-দেশান্তরের অসংখ্য ছাত্র। কেহ পাঠ লইতেছে,—কেহ পঠিত পাঠের অর্থ লইয়া কূট-প্রশ্ন করিতেছে,—কেহ নূতন পাঠের সহিত পুরাতন পাঠের সামঞ্জস্য করিতে না পারিয়া বিরক্তি দেখাইতেছে। আর, মধ্যস্থ বালক-অধ্যাপক প্রীতি ও স্নেহের সহিত সকলেরই মন যোগাইতেছেন, এবং অণুমাত্রও বিরক্ত কিংবা বিচলিত না হইয়া, সকলকেই প্রফুল্ল-বদনে, প্রীত-প্রফুল্ল-নয়নে, সকল প্রকার প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন। এই দৃশ্য যার-পর-নাই সুখ-প্রীতিকর ও বিস্ময়াবহ নয় কি?

"মুকুন্দ সঞ্জয় বড় মহাভাগ্যবান্‌।
যাহার আলয় বিদ্যা বিলাসের স্থান ॥
তাহার পুত্রেরে প্রভু আপনে পড়ায়।
তাহারাও তাঁর প্রতি ভক্ত সর্ব্বথায় ॥
বড় চণ্ডীমণ্ডপ আছয়ে তার ঘরে।
চতুর্দ্দিকে বিস্তর পড়ুয়া তার ধরে ॥
গোষ্ঠী করি তাঁহাই পড়ান দ্বিজরাজ।
সেই স্থানে শ্রীগৌরাঙ্গের বিদ্যার সমাজ॥" (চৈ,ভা,)

এইরূপ অধ্যাপনার ও প্রশ্নোত্তরের কলকলির মধ্যেও প্রমোদ-বিহ্বল গৌরাঙ্গ তাঁহার পরিহাস-রসিকতাটুকু একবারে পাসরিয়া যাইতেন না। নবদ্বীপের অনেক অধ্যাপককেই তিনি অন্তঃসারশূন্য বলিয়া জানিতেন। যখন শাস্ত্রকথার প্রসঙ্গক্রমে সুযোগ ঘটিত, তখন তাহাদিগের প্রতি একটুকু অনুযোগের প্রক্ষেপ দিতেও তিনি চিত্তে কৃপণ কিংবা কুণ্ঠিত হইতেন না। যথা চৈতন্য-ভাগবতে—

"কতরূপে ব্যাখ্যা করে কত বা খণ্ডন।
অধ্যাপক প্রতি সে আক্ষেপ সর্ব্বক্ষণ॥
প্রভু কহে সন্ধিজ্ঞান নাহিক যাহার।
কলিযুগে ভট্টাচার্য্য পদবী তাহার॥"

পাঠকের যদি এইরূপ মনে হইয়া থাকে যে, গৌরাঙ্গ এক্ষণ বড় পণ্ডিত হইয়া বড় বেশী ধীর, স্থির, শান্ত, শিষ্ট, গম্ভীর পুরুষ হইয়াছেন, তাহা ভুল। বড় নদীর স্রোত, বর্ষার পরিপূর্ণতার সময়ে, বিনা বাতাসেও যেমন টলমল ঢল ঢল অবস্থায় রহে, গৌরাঙ্গের প্রাণটাও চিরকালই সেইরূপ রহিত। তাঁহার প্রাণের মধ্যে বিনা বাতাসেও তুফান বহিত, এবং সমানবয়স্ক ছাত্র ও সমহৃদয় সুহৃদ্‌বর্গ, সকলেই সে তুফানে সময়ে সময়ে হাবুডুবু খাইত।

পুরুষোত্তমের বাড়ীতে গৌরাঙ্গের একটা টোল হইয়াছিল বটে; কিন্তু তাঁহার প্রকৃত টোল ছিল নবদ্বীপের নগরপথে ও নয়ন-হারিণী ভাগীরথীর নির্ম্মলতটে। তিনি যখন মধ্যাহ্নে স্নানের জন্য বাহির হইতেন, তখন তাঁহার ছাত্রবৃন্দকে সঙ্গে লইয়া একবার সমস্ত নবদ্বীপ পরিভ্রমণ করিতেন। এইরূপ আবার, অপরাহ্নেও, নবদ্বীপের পথে পথে—উদ্যানে—উপবনে—বহুছাত্রবেষ্টিত বিচিত্র বিগ্রহের ন্যায়, সমস্ত নবদ্বীপে বেড়াইয়া আসিতেন, এবং পথে ঘাটে,—গাছের তলায়, যেখানে যখন থাকিতেন, সেখানেই শাস্ত্রকথার আমোদে ও আনন্দে ডগ-মগ রহিতেন।

কিন্তু, তাঁহার এই অসহ্য চঞ্চলতার মধ্যেও এক এক বিষয়ে এমন একটা ভয়ঙ্কর গাম্ভীর্য্য পরিদর্শিত হইত যে, সকলেরই তাহাতে বিস্ময় জন্মিত। নবদ্বীপের বালিকা ও যুবতী, প্রৌঢ়া ও প্রাচীনা সকল শ্রেণীর পুরমহিলারাই গঙ্গাস্নান অথবা দেবালয় দর্শন ইত্যাদি বিবিধ প্রয়োজনে নগর-পথে যাতায়াত করিত। তাঁহারা কেহ কখনও সম্মুখে পড়িলে, চঞ্চল গৌরাঙ্গ অমনিই অচঞ্চল ঋষি তাপসের ন্যায় আর এক ভাব ধারণ করিতেন; এবং যার-পর-নাই নম্রস্বভাব সাধুসজ্জনের মত এক পাশে সরিয়া যাইতেন। ভক্তকবি বৃন্দাবন এ কথাটি বড় সুন্দর করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন;—

"এই মত চাপল্য করেন সবা সনে।
সবে স্ত্রী মাত্র না দেখেন দৃষ্টিকোণে॥
স্ত্রী হেন নাম প্রভু এই অবতারে।
শ্রবণেও না করিলা বিদিত সংসারে॥" (চৈ, ভা)

বৃন্দাবন দাসের এই কথা কয়টি, বঙ্গের ঘরে ঘরে বিশেষ রূপে আলোচিত ও প্রগাঢ় ভক্তির সহিত সকলেরই প্রাণে গ্রথিত হইলে, দেশের উপকার হইবে; এবং লোকে প্রকৃত গৌরচরিত্রের চিত্তহারি পবিত্র মাধুর্য্য একটুকু বেশী অনুভব করিতে পাইয়া ভক্তিতে মাথা নোয়াইবে।

গৌরাঙ্গ যখন নবীন বয়সের নূতন-স্ফুরণে, শাস্ত্র-রসের নিত্য-নূতন-সুধাস্বাদনে এইরূপ উন্মত্ত, তখন এক দিন তাঁহার সহিত নবদ্বীপের নগর-পথে এক জন অপরিচিত উদারপুরুষের অকস্মাৎ সাক্ষাৎ হইল। সাক্ষাৎ মাত্রই দুইয়েরই প্রাণে কেমন একটা টানের মত লাগিল। দুইয়েরই প্রাণ যেন কেমন একপ্রকার অপূর্ব্ব সুখে, অপূর্ব্ব আনন্দে উছলিয়া উঠিল। আগন্তুকের নাম ঈশ্বরপুরী। যাঁহারা ভগবান্ করুণাসিন্ধুর দিকে চাহিয়া কাতরমূর্ত্তি ভক্তের পূজা করিতে শিখিয়াছেন, তাঁহারা পুণ্যপুঞ্জময় ঈশ্বরপুরীর পবিত্র নাম উচ্চারণে আপনাকে আপনি কৃতার্থ মনে করিবেন।

মহাত্মা ঈশ্বরপুরী মাধবেন্দ্রের মুখ্য শিষ্য,—মধ্বাচারী সম্প্রদায়ের শেষ গুরু। সেই ভারত-বিখ্যাত মাধবেন্দ্রের কথা অবশ্যই পাঠকের মনে আছে। মাধবেন্দ্র স্বর্গে চলিয়া গিয়াছেন, এবং প্রয়াণের পূর্ব্বে তাঁহার প্রাণের সমস্ত শক্তি ও সম্পদ ঈশ্বরপুরীকে দান করিয়া, তাঁহারই হস্তে, ভারতের ভক্তি-ধর্ম্মের প্রচার-ভার অর্পণ করিয়াছেন। মাধবেন্দ্র যেমন তাঁহার প্রাণারাধ্য পরম পুরুষের প্রেম-ভক্তি প্রচারের উদ্দেশে, দেশে দেশে, দীন-হীনের বেশে পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন; তাঁহার প্রধান শিষ্য পণ্ডিত-পূজ্য ঈশ্বরপুরীও সেইরূপ ইদানীং দেশে দেশে পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছেন, এবং ঐ প্রকার পরিভ্রমণ উপলক্ষে সম্প্রতি নবদ্বীপে আসিয়া, গোপীনাথ আচার্য্যের ঘরে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিত রহিয়াছেন। নবদ্বীপে বড় বড় পণ্ডিত। কিন্তু সেই পণ্ডিতবর্গের মধ্যে কেহই ঈশ্বরপুরীকে চিনিতে পারেন নাই।

"এই মত ঈশ্বরপুরী নবদ্বীপ পুরে।
অলক্ষিতে বুলেন চিনিতে কেহ নারে॥"

বড় পণ্ডিতেরা চিনিবেন কি প্রকারে? যাঁহার পরিধান ছিন্ন ও মলিন বস্ত্র, গায়ে ছেঁড়া কাঁথা, কক্ষে ছেঁড়া ঝুলী, তাঁহার হৃদয়ের মধ্যে দেব-দুর্ল্লভ ধন-বৈভব থাকিলেও কয় জনে তাঁহাকে চিনিতে পারে? কিন্তু মাধবেন্দ্রের বঙ্গীয় শিষ্য ভক্ত-গুরু অদ্বৈত আচার্য্য, এবং তাঁহার ভক্তিসভার সঙ্গী সাথীরা ঈশ্বরপুরীকে চিনিতে পারিয়াছিলেন। আর, আজি চিনিলেন তাঁহাকে (ভক্তি-সম্পর্ক-শূন্য!!) গৌরাঙ্গ। যাঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গের প্রথম বয়সের ক্রীড়াকৌতুক ও প্রমোদ-মত্ততা দেখিয়া তাঁহাকে ভক্তি-শূন্য মনে করিতেন, তাঁহারা কি অবোধ!

বেলা দুই প্রহর। গৌরাঙ্গ সঞ্জয়দিগের বাড়ীর টোলে দুইপ্রহর পর্য্যন্ত অধ্যাপনার কার্য্য করিয়া দ্রুতপদে বাড়ী যাইতেছেন। ঈশ্বরপুরীও সেই পথে আসিতেছেন। দৈবাৎ দুইজনে দেখা হইল। দৃষ্টিমাত্রেই দুইয়ের প্রাণ—দুইয়ের হৃদয় ও মন—দুইয়ের কাছে গড়াইয়া পড়িল। গৌরাঙ্গ আর কখনও ঈশ্বরপুরীকে দেখিয়াছেন, এমন বোধ হয় না। কিন্তু তিনি যেই পুরী ঠাকুরকে দেখিতে পাইলেন, অমনি আপনা হইতে অগ্রসর হইয়া, সেই অপরিচিত জনের পায়ে পড়িয়া, প্রণাম করিলেন। সিদ্ধপুরুষের ন্যায় গভীরস্বভাব ঈশ্বরপুরীও তখন এক দৃষ্টে গৌরাঙ্গকে তাকাইয়া দেখিতে লাগিলেন।

"চাহেন ঈশ্বরপুরী প্রভুর শরীর।
সিদ্ধ পুরুষের প্রায় পরম গম্ভীর॥"

মানুষ মুখের কথা শোনে কানে, কিন্তু চোখের কথা শোনে প্রাণের অন্তর-নিহিত পিপাসু প্রাণে। মনুষ্যের সহিত যখন মনুষ্যের চোখে চোখে প্রাণের পরিচয় ও প্রেমের আলাপ হয়, তখন চারি দিকে সকলেই চিত্তে কি যেন ভাবিয়া ক্ষণকালের তরে চিত্রার্পিতের ন্যায় অবস্থিত রহে। গৌরাঙ্গ কি এত দিন তাঁহার গুরু খুঁজিতে ছিলেন? তাঁহার প্রশান্ত দৃষ্টিতে তখন ইহাই প্রতীতি হইল যে, তিনি এত দিন যেরূপ প্রেম-বিহ্বল ও জ্ঞানোজ্জ্বল পথ-প্রদর্শকের অনুসন্ধান করিতেছিলেন, সেই জন ঐ ঈশ্বরপুরী। আর ঈশ্বরপুরীও বোধ হয়, গৌরাঙ্গের অপরূপ মূর্ত্তি দেখিয়া, মনে মনে ইহাই অবধারণ করিতেছিলেন যে, যাঁহার প্রভাবে বঙ্গদেশ, এবং সঙ্গে সঙ্গে ভারতের অন্যান্য প্রদেশ, প্রেম-ভক্তির পবিত্রস্রোতে প্লাবিত হইতে পারে, তাঁহার সেই প্রার্থিত-দুর্ল্লভ প্রীতির ধন ঐ নয়ন-মনোহারী নবীন যুবা। পুরী ও গৌরাঙ্গ উভয়েই প্রাণে শীতল হইলেন।

পুরী ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন, বাছা তুমি কি পুঁথি পড়াও? এই নবদ্বীপে তোমার কোথায় ঘর? কিন্তু গৌরাঙ্গকে কোন উত্তর করিতে হইল না। যাঁহারা আশে পাশে উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারাই বলিয়া উঠিলেন, ইনি নবদ্বীপের নিমাই পণ্ডিত। নিমাই নাম শুনিয়াই ঈশ্বরপুরী বড় হর্ষগদ্গদ ভাবে বলিয়া উঠিলেন, "তুমিই সেই।" পুরী ঠাকুরের মুখ-নিঃসৃত এই মধুর প্রশ্নের অর্থ কি? পুরী কি তবে সত্য সত্য শচীর আঁচলের ধন, সরল-সুন্দর নিমাই-রতনকে খুঁজিবার জন্য নবদ্বীপে আসিয়াছিলেন?

"জিজ্ঞাসেন তোমার কি নাম বিপ্রবর।
কি পুথি পড়াও—পড়, কোন স্থানে ঘর॥"

> শেষে যবে বলিলেন নিমাঞি পণ্ডিত।
> তুমি সে বলিয়া বড় হৈলা হরষিত॥" (চৈ, ভা)

বৈষ্ণব সন্ন্যাসীদিগের মধ্যে ভোজনের আমন্ত্রণকেই ভিক্ষার নিমন্ত্রণ বলিয়া থাকে। গৌরাঙ্গ ঈশ্বরপুরীকে ভিক্ষার্থ নিমন্ত্রণ করিয়া বাড়ী লইয়া গেলেন; এবং সেখানে আহারের পর বিষ্ণুমণ্ডপে বসিয়া, দুই জনে বহুক্ষণ আলাপ করিলেন। এই আলাপ ক্রমেই অধিকতর আনন্দজনক, এবং উভয়ের প্রাণভরা ভালবাসাও ক্রমেই অধিকতর প্রগাঢ় হইতে লাগিল। গৌরাঙ্গ কিছু দিনের মধ্যেই ঈশ্বরপুরীর জন্য এক প্রকার পাগলের মত হইলেন। তিনি প্রাতে ও অপরাহ্নে টোলের কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতেন, এবং সন্ধ্যা হইতে না হইতেই ঈশ্বরপুরীর কাছে চলিয়া যাইতেন।

> "পড়াইয়া পড়িয়া ঠাকুর সন্ধ্যা কালে।
> ঈশ্বর পুরীকে নমস্করিবারে চলে॥"

ঈশ্বরপুরীর প্রতি প্রণাম অথবা নমস্কার সূচিত ভক্তি-প্রসঙ্গে এখানে একটি কথা বলা আবশ্যক। ঈশ্বরপুরী জীবনের উৎকর্ষে যোগি-জন-পূজ্য হইলেও, বোধ হয়, জাতিতে উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন না। গৌরাঙ্গ উচ্চশ্রেণীর বৈদিক ব্রাহ্মণ। যখন ঈশ্বরপুরীর সহিত অদ্বৈত আচার্য্যের প্রথম পরিচয় হয়, তখন পুরী মহাশয় বলিয়াছিলেন, আমি অতি ক্ষুদ্র, অতি অধম; তোমার চরণ দর্শনের জন্য আসিয়াছি। যথা চৈতন্য ভাগবতে,—

> "বলেন ঈশ্বরপুরী আমি ক্ষুদ্রাধম।
> দেখিবারে আইলাম তোমার চরণ॥"

এইরূপ ক্ষুদ্রকে শ্রীগৌরাঙ্গ তদ্গত ভক্তির সহিত নমস্কার করিতেন. ইহার অর্থ কি? অর্থ—যোগ-ভক্তির জগজ্জয়িমাহাত্ম্যপ্রদর্শন। গৌরাঙ্গের প্রাণ চিরদিনই ভক্তির অপার সমুদ্র। তিনি যাঁহাকে প্রকৃত ভক্ত বলিয়া জানিতেন, তাঁহাকেই আপনার প্রাণটা অনায়াসে বিলাইয়া দিতে ভাল বাসিতেন।

গৌরাঙ্গ যখন সন্ধ্যাকালে ঈশ্বরপুরীর নিকট যাইয়া উপবিষ্ট হইতেন, তখন সেখানে তাঁহার আর একটি সাথী যুটিত। সে সাথী তাঁহার সুখ-শৈশবের সাধের সাথী;—তাঁহার প্রাণের সাথী.—প্রেমের সাথী.—প্রাণনিহিত পরমার্থ-রসের সাথী। সে সরল, সুরূপ, সহৃদয় সাথীর নাম গদাধর পণ্ডিত। নবদ্বীপে মাধব মিশ্র নামে একটি বিশুদ্ধস্বভাব বৈদিক ব্রাহ্মণ ছিলেন। গদাধর পণ্ডিত তাঁহারই পুত্র। গদাধর গৌরাঙ্গের সমানবয়স্ক এবং গৌরাঙ্গেরই মত সুন্দর ও সর্ব্ব-জন-মনোহর যুবা। তবে এই প্রভেদ, গদাধর শিশুকাল হইতেই সংসারে বিরক্ত ও চির-কুমার-ব্রত। গদাধরের চরিত্রে, প্রেম-ঢল ঢল গৌর-চরিত্র অপেক্ষা, প্রশান্তস্বভাব বিশ্বরূপ-চরিত্রের ছায়া একটু বেশী ছিল। গদাধর জীবনের শেষ কাল পর্য্যন্তও বিবাহে বিমুখ রহিয়া ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করিয়াছিলেন।

গদাধরের সহিত শিশুকাল হইতেই গৌরাঙ্গের গাঢ় প্রণয় ছিল। সে প্রণয় এক্ষণ প্রেমে পরিণত হইল। দুইয়ের মধ্যে বড় বেসী মিশামিশি হইল। দুইয়ের প্রাণে বড় বেশী বাধ পড়িল। ঈশ্বরপুরী গদাধরকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন, এবং তাঁহাকে স্বরচিত কৃষ্ণ-লীলামৃত নামক-গ্রন্থ হইতে প্রতিদিন কিছু কিছু পড়াইতেন। এক দিন ঈশ্বরপুরী, গৌরাঙ্গকে সেই গ্রন্থের দোষ-গুণ-সমালোচনার জন্য অনুরোধ করিলেন। গৌরাঙ্গ প্রথমে কিছুতেই সমালোচনায় সম্মত হইলেন না। কেন না, ঈশ্বরপুরী তখন তাঁহার হৃদয়ে গুরুর আসনে আসীন। কিন্তু চিত্ত-চোর চতুরপুরীঠাকুর, ভক্তিরসে বিভোর হইলেও, সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ও শাস্ত্রীয় বিচারে রসিক।

> "ঈশ্বরপুরীও সর্ব্ব শাস্ত্রেতে পণ্ডিত।
> বিদ্যা-রস-বিচারেও বড় হরষিত॥"

পুরীঠাকুর বিদ্যা-রসের আকর্ষণী দ্বারাই গৌরাঙ্গকে টানিয়া লইতেছেন। সুতরাং বিচারে বিমুখ হইবেন কেন? দুইয়ের মধ্যে পদ-প্রত্যয় লইয়া বিচার হইল। কিন্তু বিচারে গৌরাঙ্গই,—যেন ইচ্ছা করিয়া,—পরাজয় স্বীকার করিলেন। যেখানে প্রাণের মধ্যে ভালবাসা, সেখানে বিচারে আর জয়ের আশা থাকে কোথায়?

> "ব্যাখ্যান শুনিয়া প্রভু পরম সন্তোষ।
> ভৃত্য-জয় নিমিত্ত না দেন আর দোষ॥"

মহাত্মা ঈশ্বরপুরী, গৌরাঙ্গকে লইয়া, নবদ্বীপে গোপীনাথ আচার্য্যের ঘরে কএকটি মাস এইভাবে প্রেম-

ভক্তির নিগূঢ় রহস্যবিচারে অতিবাহিত করিলেন ; তার পর, একদিন, কাহাকেও কিছু না বলিয়া, ভগবানের নাম লইতে লইতে, আপনার ভাবে আপনি কোন এক দিকে চলিয়া গেলেন। তিনি কি জন্য নবদ্বীপ আসিয়াছিলেন, তাহা কেহ বুঝিল না,—কি জন্য কোথায় আবার চলিয়া গেলেন, তাহাও কেহ জানিল না।

"এই মত কত দিন বিদ্যা-রস-রঙ্গে
আছিলা ঈশ্বরপুরী গৌরচন্দ্র সঙ্গে॥
ভক্তি-রসে চঞ্চল একত্র নহে স্থিতি
পর্য্যটনে চলিলা পবিত্র করি ক্ষিতি॥"

ঈশ্বরপুরীর সহিত গৌরসুন্দরের আবার কখনও সাক্ষাৎকার হইবে কি ?

ক্রমশঃ।

ভারতযুদ্ধকাল

পাণ্ডবগণের নির্ব্বাসনের ১৩ বৎসর পর কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমীতে উত্তরগোগৃহযুদ্ধে অর্জ্জুন কৌরবগণের নিকট পুনঃ প্রকাশিত হইয়াছিলেন—

"আদাতুং গাঃ সুশর্ম্মাথ কৃষ্ণপক্ষস্য সপ্তমীম্। অপরে দিবসে সর্ব্বে রাজন্ সম্ভূয় কৌরবাঃ॥ অষ্টম্যামাভ্যগৃহ্নন্ত গোকুলানি সহস্রশঃ॥" (বিরাট প ৩০অ। ২৮-২৯)।

তৎপর বাসুদেব ও দ্রুপদরাজ প্রভৃতি বিরাটরাজধানীতে উপস্থিত হইয়া বিরাটতনয়াসহ অভিমন্যুর উদ্বাহ সম্পন্ন করাইলেন ও পাণ্ডবদিগের রাজ্যপুনঃপ্রাপ্তির মন্ত্রণায় প্রবৃত্ত হইলেন। ইহাই ভারতযুদ্ধের সূচনা। আমরা এই হইতে ভীষ্মদেবের স্বর্গারোহণ পর্য্যন্ত প্রধান প্রধান ঘটনার কাল সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়া দেখাইতেছি।

বিবাহের পর শ্রীকৃষ্ণাদি স্ব স্ব আলয়ে প্রস্থান করিলে জামাতৃগণের রাজ্যপ্রত্যর্পণ জন্য দ্রুপদরাজ স্বীয় পুরোহিতকে পুষ্যানক্ষত্রে ধৃতরাষ্ট্রসমীপে দূতস্বরূপ পাঠাইলেন

"স ভবান্ পুষ্যাযোগেন মুহূর্ত্তেন জয়েন চ।
কৌরবেয়ান্ প্রয়াত্বাশু কৌন্তেয়স্বার্থসিদ্ধয়ে॥"

উদ্যোগ প। ৫ম। ১৭।

ইহার ৯ দিবস পর অনুরাধানক্ষত্রে ভোজরাজ কৃতবর্ম্মা সসৈন্যে দুর্য্যোধনের সহায়তায় গমন করিলেন এবং সাত্যকি সহ শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবশিবিরে উপস্থিত হইলেন—"মৈত্রনক্ষত্রযোগেন সহিতঃ সর্ব্বযাদবৈঃ। আশ্রয়ামাস ভোজস্তু দুর্য্যোধনমরিন্দমম্। যুযুধানেন সহিতো বাসুদেবস্তু পাণ্ডবান্॥" শল্য প। ৩৫অ। ৪০।

ইতিমধ্যে রাজা ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে পাণ্ডব সমীপে প্রেরণ করিলেন। সঞ্জয়ের দৌত্যের পর ভগবান্ বাসুদেব ১০ দিবস পাণ্ডবশিবিরে অবস্থান করিয়া স্বয়ং "কৌমুদে মাসি রেবত্যাং" (উদ্যোগ। ৮অ। ৭) কার্ত্তিক মাসের রেবতী নক্ষত্রে সন্ধিস্থাপনোদ্দেশ্যে কুরু সভায় গমন করিলেন।

শ্রীকৃষ্ণের হস্তিনা যাত্রা কার্ত্তিকের রেবতী নক্ষত্রে — সম্ভবতঃ শুক্লা দ্বাদশীতে। দ্রুপদপুরোহিতের দৌত্য তাহার অব্যবহিত পূর্ব্বে পুষ্যায় গণ্য করিলে, ১৯ দিবস পূর্ব্বে উক্ত গৌণ কার্ত্তিকের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমীতে হইয়াছিল। তাহার অব্যবহিত পূর্ব্বে কৃষ্ণাষ্টমীতে গোগৃহ যুদ্ধ হইয়া থাকিলে, প্রথমোক্ত কৃষ্ণাষ্টমীর একমাস পূর্ব্বে গৌণ আশ্বিনে কৃষ্ণপক্ষে হইয়া থাকিবে। অর্থাৎ পাণ্ডবগণের অজ্ঞাতবাস শেষ হওয়ার আনুমানিক ৪৯ দিবস পর শ্রীকৃষ্ণ সন্ধিসংস্থাপন জন্য হস্তিনায় গমন করিয়াছিলেন।

বাসুদেব সন্ধিসংস্থাপনে অকৃতকার্য্য হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলে, তাঁহার হস্তিনাগমনের ৮ দিবস পরবর্ত্তী পুষ্যা নক্ষত্রে বলদেব পাণ্ডব শিবিরে উপনীত হইয়া বাসুদেবকে যুদ্ধে নিরপেক্ষ থাকিতে অনুরোধ করিলেন। তিনি অনুরোধ রক্ষা না করায় বলদেব সরস্বতী তীর্থে প্রস্থান করিলেন ; বাসুদেব পাণ্ডবসহ কুরুযুদ্ধে যাত্রা করিলেন।

"ন কুর্ব্বন্তি বচোমহ্যং কুরবঃ কালচোদিতাঃ।
নির্গচ্ছধ্বং পাণ্ডবেয়াঃ পুষ্যেণ সহিতাময়া॥"

(ইতি শ্রীকৃষ্ণবাক্য। শল্য। ৩৫। ১০)।

"রৌহিণেয়েগতেশূরে পুষ্যেণ মধুসূদনঃ।
পাণ্ডবেয়ান্ পুরস্কৃত্য যযাবভিমুখং কুরূন্॥"
(শল্য প। ৩৫। ১৫)।

দুর্য্যোধনও ঐ পুষ্যানক্ষত্রে স্বপক্ষীয় রাজগণকে কুরুক্ষেত্রে গমনের আদেশ করিয়াছিলেন ইহা শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের নিকট বলিয়াছেন দেখা যায়—

"আজ্ঞাপয়চ্চ রাজ্ঞস্তান্ পার্থিবান্ নষ্টচেতসঃ।
প্রয়াধ্বং বৈ কুরুক্ষেত্রং পুষ্যোঽদ্যেতি পুনঃ পুনঃ॥"
(উদ্যোগ। ১৪৯অ। ৩)।

আমরা শেষ উক্তির সংলগ্নতা ভালরূপ বুঝিতে পারি নাই। ভারতযুদ্ধের শেষ দিন ভীম ও দুর্য্যোধন গদাযুদ্ধে পরস্পরের সম্মুখীন হইয়াছেন এমন সময় উক্ত শিষ্যদ্বয়ের যুদ্ধদর্শনে অভিলাষী হইয়া বলদেব যুদ্ধক্ষেত্রে উপনীত হইলেন। তিনি বলিলেন—

"চত্বারিংশদহান্যদ্য দ্বেচমে নিঃসৃতস্যবৈ।
পুষ্যেণ সংপ্রয়াতোঽস্মি শ্রবণে পুনরাগতঃ॥"
(শল্য প। ৩৪অ। ৬)।

সেই ভীষণ ক্ষত্রিয়কুলান্তক ভারতযুদ্ধ অষ্টাদশ দিবস ব্যাপী ছিল। দেখা যায় যে, তাহা শেষ হইবার ৪২ দিবস পূর্ব্বে বলদেব পুষ্যানক্ষত্রে তীর্থ যাত্রায় বহির্গত হইয়াছিলেন, এবং তাঁহার তীর্থযাত্রার ২৪ দিবস পর মৃগশিরা নক্ষত্রে ঐ যুদ্ধ আরম্ভ হয়, ও ১৮ দিবসে শ্রবণা নক্ষত্রে শেষ হয়। উপরে, পাণ্ডবদিগের অজ্ঞাতবাস শেষ হওয়ার ৪৯ দিবস পর শ্রীকৃষ্ণের দৌত্য, ও তাহার ৮ দিবস পর বলদেবের তীর্থযাত্রা অনুমান করিয়াছি। তীর্থযাত্রার ২৪ দিবস পর ভারতযুদ্ধ আরম্ভ হইয়া থাকিলে, ৮১ দিবসে যুদ্ধের মন্ত্রণা, সৈন্যসংগ্রহ, ও শিবির সন্নিবেশাদি কার্য্যশেষ হইয়াছিল। ইহাতে প্রাচীন কালীন ক্ষত্রিয়জাতির যুদ্ধৈকাগ্রতা প্রকাশ পায়।

দ্রোণপর্ব্ব ১৮৫ম অধ্যায়ে বর্ণিত আছে, ভারতযুদ্ধের চতুর্দ্দশ দিবসে, দ্রোণবধের পূর্ব্বরাত্রিতে, ঘোরতর নৈশ-যুদ্ধে উভয় পক্ষীয় সৈন্য নিরতিশয় ক্লান্ত হইয়া সমর ভূমিতেই নিদ্রিত হইয়া পড়ে। অতঃপর, কামদেবের শরাসনপ্রভ, নব বধূর ঈষৎ হাস্যের ন্যায় চারু মনোহর চন্দ্রকলা উদিত হইয়া পূর্ব্বদিগলঙ্কৃত করিল—

"ততঃ কুমুদনাথেন কামিনীগণ্ডপাণ্ডুনা।
নেত্রানন্দেন চন্দ্রেণ মাহেন্দ্রীদিগলঙ্কৃতা॥" (৪৬ শ্লোক)
"হররৃষোদরগাত্র সমদ্যুতিঃ,
স্মরশরাসনপূর্ণ সমপ্রভঃ।
নববধূস্মিত চারু মনোহরঃ,
প্রবিকশৎ কুমুদাকর বান্ধবঃ॥" (৪৮ শ্লোক)

তখন চন্দ্রালোক দৃষ্টে উভয় পক্ষীয় সৈন্য জাগিয়া উঠিল, এবং রাত্রির প্রায় চতুর্থাংশ অবশিষ্ট থাকিতে পুনঃ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল—

ত্রিভাগমাত্রশেষায়াং রাত্র্যাং যুদ্ধমবর্ত্তত।
কুরূণাং পাণ্ডবানাঞ্চ প্রহৃষ্টানাং বিশাম্পতে॥"
(দ্রোণ। ১৮৭। ১।)

কাম দেবের শরাসন এবং নব বধূর ঈষৎ হাস্যের সহিত চন্দ্রকলার তুলনা হওয়ায়, ও তখন রাত্রি ত্রিভাগ মাত্র শেষ হওয়ায়, ঐ রাত্রি কৃষ্ণা দ্বাদশী ছিল অনুমিত হয়। বাস্তবিক, সৈন্যগণ পুনঃ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়ার পরেই—

"অথ চন্দ্রপ্রভাং মুষ্ণন্নাদিত্যস্য পুরঃসরঃ।
অরুণোভ্যুদয়ঞ্চক্রে তাম্রীকুর্ব্বন্নিবাম্বরম্॥"
(দ্রোণ প। ১৮৭। ২।)

যুদ্ধের চতুর্দ্দশ দিবস দ্বাদশী প্রবৃত্ত হইয়া থাকিলে যুদ্ধের দ্বিতীয় দিবস পূর্ণিমা ও অষ্টাদশ দিবস শুক্লপ্রতিপদ হওয়ার সম্ভাবনা. এবং শেষোক্ত দিবসের রজনী চন্দ্রিকা-শূন্য হইবে। আমরা তাহাই দেখিতে পাই। অষ্টাদশ দিবসের রাত্রি সমাগম বর্ণনায় তারকার উল্লেখ আছে, চন্দ্রিকার উল্লেখ নাই, শেষ রাত্রিতেও চন্দ্রিকার উল্লেখ দেখা যায় না। আর, সেই রাত্রিতে অশ্বত্থামা যখন পাণ্ডব শিবিরে প্রবেশ করিয়া নিদ্রিত পাণ্ডব ও পাঞ্চাল

বংশের উচ্ছেদসাধন করেন, তখন রজনীর তমিস্রাবরণে সেই পৈশাচিক দৃশ্য আচ্ছাদিত ছিল।

অতএব স্থূলতঃ দেখা যাইতেছে যে ভারতযুদ্ধের প্রথম দিবস মৃগশিরানক্ষত্র ও শুক্লচতুর্দ্দশী তিথি' দ্বিতীয় দিবস আর্দ্রা ও পূর্ণিমা। দশম দিবস কৃষ্ণাষ্টমী ও চিত্রায় ভীষ্মের শরশয্যা। পঞ্চদশ দিবস কৃষ্ণাত্রয়োদশী ও মূলায় দ্রোণবধ। সপ্তদশ দিবস অমাবস্যা ও উত্তরাষাঢ়ায় কর্ণবধ। এবং অষ্টাদশ দিবস শুক্ল প্রতিপদ ও শ্রবণায় শল্যবধ, ও গদাযুদ্ধে দুর্য্যোধনের পতন। এই গণনায় কিছু অগ্র পশ্চাৎ হইতে পারে। প্রথম ও দ্বিতীয় যুদ্ধদিবসে মৃগশিরা ও আর্দ্রা নক্ষত্রে চতুর্দ্দশী ও পূর্ণিমা হইয়া থাকিলে এই পূর্ণিমা অগ্রহায়ণ মাসের পরবর্ত্তী মাস গৌণ পৌষ। ইহার ৩২ দিবস পূর্ব্বে কার্ত্তিকের শুক্লা দ্বাদশীতে শ্রীকৃষ্ণ হস্তিনা যাত্রা করিয়াছিলেন বলিয়াছি। যুদ্ধারম্ভের প্রাক্কালে মহর্ষি ব্যাসদেব ভাবী অমঙ্গলসূচক যে সকল বিপর্য্যয় দর্শন করিয়া আসিতেছিলেন রাজা ধৃতরাষ্ট্রের নিকট তাহা বর্ণনোপলক্ষে বলিয়াছিলেন—

"অলক্ষ্যপ্রভয়াহীনঃ পৌর্ণমাস্যান্তু কার্ত্তিকে।
চন্দ্রোভূদগ্নিবর্ণশ্চ পদ্মবর্ণে নভস্তলে॥"

(ভীষ্মপ। ২য়। ২১)

এখানে যুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী পূর্ণিমাকে কার্ত্তিকী পূর্ণিমা বলা হইয়াছে, সুতরাং যুদ্ধারম্ভের পূর্ণিমা অগ্রহায়ণ মাসীয়া

ভীষ্মদেবের শরশয্যার ৮ দিবস পর ভারতযুদ্ধ শেষ। তৎপর ৫০ রাত্রি হস্তিনাপুরে বাস করিয়া, উত্তরায়ণপ্রবৃত্তি দৃষ্টে পাণ্ডবগণ ভীষ্মসমীপে গমন করেন—

"উষিত্বা শর্ব্বরীঃ শ্রীমান্ পঞ্চাশন্নগরোত্তমে;
সময়ং কৌরবাগ্র্যস্য সস্মার পুরুষর্ষভঃ॥
স নির্যযৌ রাজপুরাদ্ যাজকৈঃ পরিবারিতঃ।
দৃষ্ট্বা নিবৃত্তমাদিত্যং প্রবৃত্তঞ্চোত্তরায়ণম্॥"

(অনুশাসন। ১৬৭। ৫-৬।)

ভীষ্মদেব তাঁহাদিগকে দেখিয়া বলিলেন—

"দিষ্ট্যা প্রাপ্তোঽসি কৌন্তেয় সহামাত্যো যুধিষ্ঠিরঃ।
পরিবৃত্তোহি ভগবান্ সহস্রাংশুর্দিবাকরঃ॥
অষ্টপঞ্চাশতং রাত্র্যঃ শয়ানস্যাদ্য মে গতাঃ।
শরেষু নিশিতাগ্রেষু যথা বর্ষশতং তথা॥"

(অনুশাসন। ১৬৭। ২৬-২৭।)

মুখ্য অগ্রহায়ণ বা গৌণ পৌষের কৃষ্ণাষ্টমীতে ভীষ্ম শরশয্যাগত হন। অতএব, তিনি ৫৮ দিবস শরশয্যায় থাকিয়া দুই চান্দ্রমাস পূর্ণ হইবার দিবস মুখ্য মাঘ বা গৌণ ফাল্গুনের কৃষ্ণা সপ্তমী বা অষ্টমীতে উপরিউদ্ধৃত বাক্য বলিবার পর পরলোকে গমন করেন। আমরা অষ্টমীই অনুমান করিলাম।

যুদ্ধ শেষের পূর্ব্ব দিবস গৌণ পৌষের অমাবস্যায় ও উত্তরাষাঢ়ায় কর্ণবধ বলিয়াছি। সুতরাং সূর্য্যও তখন চন্দ্রের সহিত উত্তরাষাঢ়ায় ছিল। সৌর পৌষের ২৭শে সূর্য্য উত্তরাষাঢ়ায় প্রবেশ করে, এবং ৩০শের পর আর গৌণ পৌষের অমাবস্যা হইতে পারেনা। অতএব, ঐ অমাবস্যা ২৭শে হইতে ৩০শে পৌষ মধ্যে হইয়াছিল, এবং তখন সূর্য্য উত্তরাষাঢ়ার প্রথম পাদে অবস্থিত ছিল। তাহার পর ৫১ দিবসে সূর্য্য পাদোনচারি নক্ষত্র অতিক্রম করিয়া, ভীষ্মদেবের মৃত্যুদিবস ১৭ই হইতে ২১শে ফাল্গুন মধ্যে, শতভিষা নক্ষত্রের অন্তে অবস্থান করিতেছিল। আর, উক্ত অমাবস্যা উত্তরাষাঢ়ার প্রারম্ভে না হইয়া পূর্ব্বাষাঢ়ার শেষভাগে হইয়া থাকিলেও, ভীষ্মদেবের মৃত্যু দিবস সূর্য্য শতভিষারই কিছু পশ্চাদ্‌বর্ত্তী ছিল, কিন্তু সেই দিবস ১৭ই ফাল্গুনের পূর্ব্ববর্ত্তী ছিল। অধিক পূর্ব্ববর্ত্তী না হওয়াই সম্ভবপর। সেই দিবসের অল্প পূর্ব্বে ভীষ্মদেব স্বয়ং ও রাজা যুধিষ্ঠির উত্তরায়ণপ্রবৃত্তি দেখিয়াছিলেন। মহাভারতের সময়ে ধনিষ্ঠাদি কাল প্রচলিত থাকা, অর্থাৎ সূর্য্য ধনিষ্ঠায় অবস্থান করা কালে উত্তরায়ণ প্রবৃত্ত হওয়া, সম্ভবপর বলিয়া আমরা বলিয়াছিলাম। ৭ই ফাল্গুন সূর্য্য ধনিষ্ঠা পরিত্যাগ করে। ইহা ১৭ই ফাল্গুনের অনেক পূর্ব্ববর্ত্তী হয়। তৎকালে নক্ষত্র সকলের সীমা রেখা এবং সূর্য্যের অয়ন পরিবর্ত্তন কাল সূক্ষ্মরূপে নির্দ্দেশ করা যাইত না। অতএব আমরা অনুমান করিতে পারি যে তৎকালে ৭ই পৌষ কিম্বা তাহার অল্পপরবর্ত্তী কোন দিবস ধনিষ্ঠার অন্তে কিম্বা শতভিষার প্রারম্ভে সূর্য্যের অবস্থান সময়ে উত্তরায়ণ প্রবৃত্ত হইত, এবং ইহাকেই

ধনিষ্ঠাদি কাল বলিত। বর্ত্তমান সময়েই দেশীয় পঞ্জিকানুসারে পাশ্চাত্যগণিত দিবসের দুই দিবস পর উত্তরায়ণ প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। পাশ্চাত্যমতে এখন ২২শে ডিসেম্বর বা ৭ই পৌষ উত্তরায়ণ আরম্ভ হয়। ৭ই পৌষ হইতে ৭ই ফাল্গুন দুই মাস বা এক ঋতু অন্তর, অর্থাৎ আমাদের বসন্ত ঋতুর আরম্ভকালে মহাভারতীয় কালে শীত ঋতুর আরম্ভ হইত। অয়নান্ত বিন্দু সম্পূর্ণ রাশিচক্র পশ্চাদপসরণ করিতে ২৫৮০০ বৎসরের প্রয়োজন হয়, সুতরাং তাহার এক ঋতু পরিমিত স্থান পশ্চাদপসরণে ৪৩০০ বৎসর আবশ্যক হয়। অতএব বর্ত্তমান সময়ের ৪৩০০ বৎসর কিম্বা তাহার দুই তিন শত বৎসর অধিক পূর্ব্বে, অর্থাৎ খৃষ্ট জন্মের ২৪০০ বৎসরের অধিক পূর্ব্বে ভারতযুদ্ধ সংঘটিত বা মহাভারত রচিত হইয়াছিল অনুমান করা অসঙ্গত হইবে না। মহাভারতীয় কালে সৌরমাসের তারিখ দ্বারা সময় গণিত হইত না। আমরা বোধ সৌকর্য্যার্থে উপরে তাহা অবলম্বন করিয়াছি।

অনুশাসন পর্ব্ব হইতে আমরা উপরে যে ভীষ্মোক্তি উদ্ধৃত করিয়াছি তাহার অব্যবহিত পরেই ভীষ্মমুখে এই শ্লোকটি দেওয়া হইয়াছে

"মাঘোঽয়ং সমনুপ্রাপ্তো মাসঃ সৌম্যো যুধিষ্ঠির।
ত্রিভাগশেষপক্ষোঽয়ং শুক্লো ভবিতুমর্হতি॥"

(অনুশাসন। ১৬৭। ২৮।)

এখানে মাঘী শুক্লাষ্টমী ভীষ্মের মৃত্যুদিন বলা হইয়াছে। আমরা মুখ্য মাঘের বা গৌণ ফাল্গুনের কৃষ্ণাষ্টমী তাঁহার মৃত্যুদিন বলিয়াছি। আমাদিগের পূর্ব্ববর্ত্তী অনেকে এই শ্লোক অনুসরণ ও অবলম্বন করিয়াছেন, এবং ইহারই অনুসরণে স্মার্ত্তগণ মাঘী শুক্লাষ্টমীতে ভীষ্মাষ্টমীর ব্যবস্থা করিয়াছেন। কিন্তু ইহা ব্যাস লিখিত বলিয়া আমরা কিছুতেই স্বীকার করিতে পারি না। নিম্ন লিখিত কারণে আমরা ইহাকে প্রক্ষিপ্ত মনে করি—

(১) মহাভারতের সময়ে মাসের নক্ষত্রজ নাম প্রচলিত ছিল বলিয়া আমাদের বিশ্বাস নয়, সুতরাং শ্লোকোক্ত 'মাঘ' শব্দ সন্দেহজনক।

(২) 'মাঘ' শব্দ 'মঘাসম্বন্ধীয়' অর্থে মাস শব্দের বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে অগত্যা এরূপ স্বীকার করিলেও চন্দ্র অর্থে বিশেষণ 'সৌম্য' শব্দ প্রয়োগের উদ্দেশ্য দেখা যায় না। ইহার দ্বারা সৌরমাস প্রচলিত থাকার আভাস দেওয়া হইয়াছে। মহাভারতের কোন স্থলে সৌরমাস কিম্বা তাহার তারিখ দ্বারা কোন ঘটনার কাল নির্দ্দেশ করা হয় নাই, কারণ সৌরমাস তখন কার্য্যতঃ প্রচলিত ছিল না।

(৩) শুক্লপক্ষে মাস প্রবৃত্ত হইত না। কিন্তু এই শ্লোকে তাহা বলা হইয়াছে।

(৪) শ্লোকটি বড়ই জ্যোতিষী হিসাবে লিখা। তৎপূর্ব্বের ৫৮ দিবস শরশয্যার কথা ও দ্রোণপর্ব্বের শেষ রাত্রিতে চন্দ্রোদয়ের কথা অধিকতর স্বাভাবিক এবং বিশ্বাসযোগ্য।

(৫) পরস্পর বিরোধী দুইটি উক্তি একই স্থানে একই ব্যক্তি লিখিয়াছেন বোধ হয় না। সুতরাং পরবর্ত্তী উক্তি পরবর্ত্তী কালের প্রক্ষিপ্ত মনে করা অন্যায় নহে।

আমাদের বোধ হয় এই শ্লোকটি এবং 'মাসাঃ শুক্লাদয়ঃ' ও 'শ্রবণাদীনি ঋক্ষাণি' বাক্যদ্বয়যুক্ত শ্লোক মহাভারত প্রণয়নের বহু পরে, শ্রবণাদি কালে, একই হাতের লিখা। উদ্যোগ পর্ব্বে 'শরদন্তে হিমাগমে' শ্রীকৃষ্ণের হস্তিনাযাত্রার ব্যবস্থাও এই হাতের হওয়া অসম্ভব নহে। ধনিষ্ঠাদি কালের প্রায় সহস্রবৎসর পর শ্রবণাদি কাল প্রবৃত্ত হইয়াছিল। এই শ্রবণাদি কালের প্রক্ষেপ্তা কোন কোন শ্লোকের দুই একটি শব্দ তুলিয়া বোধ হয় তৎপরিবর্ত্তে অন্য শব্দ বসাইয়া দিয়াছেন। উপরিউদ্ধৃত শ্লোকে 'সমনুপ্রাপ্তো', 'সৌম্যো' এবং 'শুক্লো' স্থলে যথাক্রমে 'সমতিগতো', 'সৌম্য' এবং 'কৃষ্ণো' এইরূপ কিছু থাকা অসম্ভবপর কি?

প্রোক্ত প্রক্ষিপ্ত শ্লোকানুসরণে শ্রবণাদি কালারম্ভে ভারতযুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল মনে করিয়াই বোধ হয় বিষ্ণুপুরাণ প্রণেতা লিখিয়াছেন—

"যাবৎ পরীক্ষিতো জন্ম যাবন্নন্দাভিষেচনম্।
এতদ্বর্ষসহস্রন্তু জ্ঞেয়ং পঞ্চদশোত্তরম্॥"

তিনি বোধ হয় মহারাজনন্দ ও চন্দ্রগুপ্তের কাল নিশ্চিতরূপেই অবগত ছিলেন, কিন্তু নন্দ এবং পরীক্ষিতের মধ্যবর্ত্তী কাল অনুমানে পূরণ করিয়াছেন।

উপরের শ্লোকোক্ত ১০১৫ বর্ষসহ নন্দবংশের রাজত্বকাল ১০০ বর্ষ, চন্দ্রগুপ্ত বা সেলুকসের কাল খৃঃ পূঃ ন্যূনাধিক ৩২৫, এবং বর্ত্তমান খৃষ্টাব্দ ১৯১১ একত্র যোগ করিলে মোট ৩৩৫০ বৎসর হয়। ইহাই শ্রবণাদি প্রবর্ত্তনের কাল। উক্ত ১০১৫ বর্ষ যে বিষ্ণুপুরাণ কর্ত্তা নিজেই বিশ্বাস করেন নাই এবং কেবল শ্রবণাদি কালের সহিত ঐক্য জন্য লিখিয়াছিলেন তাহা তাঁহার নিজের লেখা দ্বারাই প্রমাণিত হয়, কারণ তিনি ভবিষ্যদ্‌ রাজবংশের যে তালিকা দিয়াছেন তাহাতে ভারত যুদ্ধকালে বর্ত্তমান জরাসন্ধ পুত্র সহদেব হইতে নন্দবংশের আরম্ভ পর্য্যন্ত ভূপতিগণের রাজত্বকালের সমষ্টি ১৫০০ বৎসর হয়। ইহা প্রোক্ত ১০১৫ হইতে ৪৮৫ অধিক। এই ৪৮৫ উপরের সমষ্টি ফল ৩৩৫০ সহ যোগ করিলে ৩৮৩৫ হয়। সুতরাং ৩৮৩৫ বর্ষ পূর্ব্বে সহদেব বর্ত্তমান ছিলেন। পরীক্ষিত তাঁহার ২৪ বৎসর বয়ঃকনিষ্ঠ মনে করিলে পরীক্ষিতের কাল বর্ত্তমানের ৩৮১১ বর্ষ পূর্ব্বে হয়। ইহা বর্ত্তমান কল্যব্দ ৫০১১ হইতে ১২০০ বৎসর কম। তাই বিষ্ণুপুরাণ কর্ত্তা উপরিউদ্ধৃত শ্লোকের কিছুপরে আবার বলিয়াছেন—

"তেতু পারীক্ষিতে কালে মঘাস্বাসন্‌ দ্বিজোত্তম।
তদা প্রবৃত্তশ্চ কলির্দ্বাদশাব্দশতাত্মকঃ॥"

অর্থাৎ পরীক্ষিতের কালে সপ্তর্ষিমণ্ডল মঘায় ছিল, এবং তখন দ্বাদশশত বৎসর গত হইয়াছিল। এই শ্লোকে "দ্বাদশাব্দশতাত্মকের" দিব্যকাল বলিয়া যে ব্যাখ্যা আছে আমরা তাহা বিদ্যার পরিচায়ক ভিন্ন সঙ্গত মনে করি না। কারণ, কিছু পরেই কলির যে পরিমাণ লেখা আছে তাহা লৌকিক, দিব্য নহে। বিষ্ণুপুরাণ কর্ত্তার এই দ্বিতীয় গণনার মূল কি? বোধ হয় তাঁহার কালে গণনাদ্বারা স্থির হইয়াছিল যে কলির দ্বাদশশতবর্ষ গতে সপ্তর্ষিমণ্ডল মঘায় ছিল, এবং সপ্তর্ষি মঘায় থাকা কালে পরীক্ষিতের জন্ম হইয়াছিল।

রাজতরঙ্গিণীগ্রন্থকর্ত্তা বলিয়াছেন কলির ৬৫৩ বর্ষ অন্তে (অর্থাৎ বর্ত্তমানের ৪৩৫৮ বর্ষ পূর্ব্বে) কুরু পাণ্ডব প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহার এই উক্তির মূল সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে সপ্তর্ষিমণ্ডলের শত বার্ষিকী গতি অনুসরণে ঐতিহাসিকগণ যাহা নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন তদনুসারে জানা যায় যে যুধিষ্ঠিরের কালে সপ্তর্ষি মঘায় ছিল এবং রাজতরঙ্গিণী প্রণয়নের সময়ে (১০৭০ শকে) যুধিষ্ঠিরের কালে সপ্তর্ষির মঘায় স্থিতি আনুমানিকগণনাফল মাত্র, চাক্ষুষসিদ্ধ নহে। বোধ হয় রাজতরঙ্গিণী কর্ত্তা যে সব ঐতিহাসিককে মূল ধরিয়াছিলেন, মহাভারতোক্ত ধনিষ্ঠাদি কালই তাঁহাদের মূল ভিত্তি। মহাভারত ভিন্ন অন্য ভিত্তি ছিল কিনা সন্দেহ। অতএব মহাভারতের কাল নির্ণয়ে মহাভারত ছাড়িয়া অন্যত্র উপকরণ সংগ্রহের চেষ্টা বিড়ম্বনা মাত্র।

রাজতরঙ্গিণী মতে প্রথম গোনর্দ্দ হইতে তৃতীয় গোনর্দ্দ পর্য্যন্ত ৫২জন রাজা কাশ্মীরে ১২৬৬ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে ভারতযুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী ৪জনের নাম দিয়া গ্রন্থকর্ত্তা তৎপরবর্ত্তী ৩৫ জনেরই নাম দিতে পারেন নাই, এবং তাহাদের রাজত্বকাল দেন নাই। ইহাতে বোধ হয় যে মহাভারতানুযায়ী ভারতযুদ্ধের কাল অবগত হইয়া, সেই কাল মূল ধরিয়া তাঁহার ইতিহাস আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু উপকরণাভাবে আঁধারে পড়িয়া ৩৫ জন অজ্ঞাতনামা রাজার সংখ্যা মাত্র দ্বারা বিষ্ণুপুরাণ কর্ত্তার ন্যায় কালসংখ্যা পূরণ করিয়াছেন। বাস্তবিক তিনি বিষ্ণুপুরাণ কর্ত্তার অনেক পরকালবর্ত্তী হইয়া যে তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর ঐতিহাসিক উপকরণ সংগ্রহে সমর্থ হইয়াছিলেন তাহার সম্ভাবনা কি?

শ্রীচন্দ্রকিশোর তরফদার।

রাজর্ষি বিশ্বামিত্র।

অতি প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে যে সকল ঋষিগণ প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন, তন্মধ্যে বিশ্বামিত্র সুপ্রসিদ্ধ। বিশ্বামিত্রের নাম ভারতের আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই অবগত আছেন। পুরাণে তাঁহাকে চন্দ্রবংশীয় নরপতি বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। বিশ্বামিত্র এবং তদীয় বংশধরগণ ঋগ্বেদের তৃতীয় মণ্ডলের ঋষি।

ঋষির্দর্শনাৎ। নিরুক্ত।

যাঁহারা বেদমন্ত্র দৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহারাই বেদের ঋষি। প্রকৃত পক্ষে বেদরচয়িতৃগণ বৈদিক ঋষি।

বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের ঘোরতর প্রতিদ্বন্দ্বী; পিযবন পুত্র সুদাস্‌নরপতির পুরোহিত; ইক্ষ্বাকুবংশীয় বেধসতনয় হরিশ্চন্দ্রের যজ্ঞের হোতা; রঘুবংশীয় অযোধ্যাধিপতি রামের অস্ত্র শিক্ষক; এবং শুনঃশেফের জীবনদাতা।

রাজর্ষি বিশ্বামিত্র কোন্ সময়ে প্রাদুর্ভূত হন? এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সুকঠিন। ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন যে ঋগ্বেদ সম্ভবতঃ খৃষ্টাব্দের দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে রচিত হইয়াছে। এই মীমাংসা প্রকৃত হইলে বিশ্বামিত্র খৃষ্টাব্দের দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন। কিন্তু আমরা এই মীমাংসার প্রতি নির্ভর করিতে পারি না।

ইয়ুরোপীয় জাতিগণের মধ্যে য়ুনানীগণ প্রাচীনকালে সভ্যতা লাভ করেন, কিন্তু আর্য্যজাতির সভ্যতার এবং চীনদেশীয় লোকের সভ্যতার প্রাচীনত্বের সহিত য়ুনানীদিগের সভ্যতার প্রাচীনত্বের তুলনা হয় না। য়ুনানীগণ আর্য্যজাতির বহুকাল পরে সভ্য হইয়াছেন। এজন্য প্রাচীনসাময়িককালনিরূপণ করিতে পাশ্চাত্য প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের অনেক সময়ে ভ্রম হইয়া থাকে।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ প্রাচীন সময়ের ঘটনার কাল নিরূপণ করিতে আমাদিগকে পন্থা প্রদর্শন করিয়াছেন ইহা সত্য। এজন্য ভারতবাসীমাত্রই কৃতজ্ঞ। তাঁহারা অশোকের উৎকীর্ণ লিপির পাঠ উদ্ধার করিয়াছেন; চন্দ্রগুপ্তের কাল নির্ণয় করিয়াছেন; চীন পরিব্রাজকগণের গ্রন্থ অনুবাদ করিয়াছেন। ইহা দ্বারা ভারতের প্রাচীন তত্ত্ব নির্ণয়ের সুবিধা হইয়াছে। কিন্তু তথাপি আমরা অনেক বিষয়ে তাঁহাদের মতানুসরণ করিতে অক্ষম।

পাশ্চাত্যপণ্ডিতগণমধ্যে কেহ কেহ আর্য্যজাতির বহু মৌলিক তত্ত্বাবিষ্কার অস্বীকার করিয়াছেন এবং তাহা য়ুনানীগণ হইতে গৃহীত বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আর্য্যগণ পক্ষান্তরে বলিয়াছেন:—

ম্লেচ্ছা হি যবনাস্তেষু সম্যক স্থিতমিদং শাস্ত্রম্।
ঋষিবৎ তেঽপি পূজ্যন্তে কিং পুনর্বেদবিদ দ্বিজাঃ॥

বাস্তবিক ঋগ্বেদ এক সময়ে রচিত হয় নাই। বৈদিক নিবিদগুলি অতি প্রাচীন সাময়িক এবং তদনন্তর ও বহুকালে ক্রমে ক্রমে ঋগ্বেদ রচিত হইয়াছে। অতএব দ্বিসহস্র সার্দ্ধদ্বিসহস্র বা সার্দ্ধসহস্র বৎসর ইত্যাদি খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ব সময় নির্ণয় করার চেষ্টা বৃথা। আমরা এ সম্বন্ধে এই মাত্র বলিতেছি যে যাহারা বেদের কাল নির্ণয়ের চেষ্টা করিবেন তাঁহারা ভ্রমে পতিত হইবেন। আমাদের দুঃখের বিষয় এই যে কোন কোন ভারতীয় কৃতবিদ্যব্যক্তি ইয়ুরোপীয়দিগের মত গ্রহণ করিয়াছেন।

প্রাচীনসাময়িক ঋষিগণ মধ্যে কেহ কেহ গোত্রকারক ঋষি বলিয়া কথিত। বিশ্বামিত্র একজন গোত্রকারক ঋষি।

বিশ্বামিত্রো জমদগ্নি র্ভরদ্বাজোগোতমঃঅত্রির্বশিষ্ঠঃ
কাশ্যপ ইত্যেতে সপ্তর্ষয়ঃ সপ্তর্ষীণামগস্ত্যাষ্টমানাং
যদপত্যং তদ্‌গোত্রমিত্যাচক্ষতে।

বিশ্বামিত্র, জমদগ্নি, ভরদ্বাজ, গোতম, অত্রি, বশিষ্ঠ, কাশ্যপ এবং অগস্ত্য এই আট ঋষির যে সন্তান পরম্পরা, তাহাকে গোত্র বলে। (বিদ্যাসাগর)

জমদগ্নিভরদ্বাজৌ বিশ্বামিত্রাত্রিগোতমাঃ।
বশিষ্ঠকাশ্যপাগস্ত্যামুনয়ো গোত্রকারিণঃ॥
এতেষাং যান্যপত্যানি তানি গোত্রাণি মন্বতে॥

জমদগ্নি, ভরদ্বাজ, বিশ্বামিত্র, অত্রি, গোতম, বশিষ্ঠ, কাশ্যপ, অগস্ত্য এই কয়মুনি গোত্রকারক। ইহাদের সন্তানপরম্পরাকে গোত্র বলে। (বিদ্যাসাগর)

বিদ্যাসাগর মহাশয় বলেন:—

"গোত্র শব্দের অর্থ বংশ"

উপরি উদ্ধৃত দুইটি বচনের প্রথমটি মহর্ষি বৌধায়নের বচন। বৌধায়ন দক্ষিণাপথনিবাসী ঋষি। দ্বিতীয় বচনটি কাহার তাহা জানা যায় না। স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য তাঁহার উদ্বাহতত্ত্বে এই বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার বিধবাবিবাহ নামক গ্রন্থেও এই বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন।

যদিও এই বচনে এই আটজন ঋষি গোত্রকারক ঋষি বলিয়া কথিত কিন্তু ইহা পরিসংখ্যা বলিয়া বোধ হয়। বঙ্গদেশীয় রাঢী এবং বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণ ভরদ্বাজ

শাণ্ডিল্য সাবর্ণি বাৎস্য এবং কাশ্যপ গোত্র। অতএব এই আটজন ঋষি ব্যতীত আরও গোত্রকারক ঋষি ছিলেন।

গোত্র শব্দের কি অর্থ তাহা নির্ণয় করিতে হইলে বহু বৃত্তান্তের উল্লেখ করা প্রয়োজন হয়। আমরা তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিয়া প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করিতে ইচ্ছুক নহি।

বর্ত্তমান সময়ে মনুসংহিতা নামে যে গ্রন্থ প্রচলিত আছে, তাহাতে লিখিত আছে ঃ—

বেণো বিনষ্টোঽবিনয়ান্নহুষশ্চৈব পার্থিবঃ।
সুদাঃ পৈযবনশ্চৈব সুমুখো নিমিরেবচ॥
পৃথুস্তু বিনয়াদ্রাজ্যং প্রাপ্তবান্ মনুরেবচ।
কুবেরশ্চ ধনৈশ্বর্য্যং ব্রাহ্মণ্যঞ্চৈব গাধিজঃ॥

৭—৪১।৪২

'সুদাঃ পৈযবনশ্চৈব' এস্থলে কুল্লুকভট্ট "সুদাসো যাবনিশ্চৈব" পাঠ ধরিয়াছেন কিন্তু আমরা মুর সাহেবের ধৃত পাঠ লিখিয়াছি। তাহাই আমরা সমীচীন বোধ করি। (Muir's Sanskrit texts)

অতএব মনুসংহিতা দৃষ্টে অবগত হওয়া যায় যে রাজর্ষি বিশ্বামিত্র বিনয়ে ব্রাহ্মণ হইয়াছেন।

রাজর্ষি বিশ্বামিত্র বিনয়ে ব্রাহ্মণ হইয়াছেন, এ সম্বন্ধে আমাদের গভীর সন্দেহ আছে। আমরা ক্রমে আমাদের সন্দেহের হেতু প্রদর্শন করিতেছি, যথা ঃ—

১ম। বিশ্বামিত্র এবং তদীয় বশংধর কতিপয় ব্যক্তি ঋগ্বেদের তৃতীয় মণ্ডলের ঋষি। বিশ্বামিত্র যে সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন, তৎকালে আর্য্যদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই জাতি চতুষ্টয়ের বিভাগ হয় নাই। তৎকালে আর্য্য এবং অনার্য্য এই দুইজাতি ছিল। আর্য্যগণ অনার্য্যদিগকে নানাপ্রকার কুৎসিত বাক্যে অলঙ্কৃত করিয়াছেন। যাতুধান, রাক্ষস, দস্যু অসুর ইত্যাদি সংজ্ঞা অনার্য্যদিগের প্রতি প্রযুক্ত হইত।

মহানৃষির্দেবজা দেবজূতো,
অস্তভ্নাৎ সিন্ধুং অর্ণবং নৃচক্ষাঃ।
বিশ্বামিত্রো যদবহৎ সুদাসং,
অপ্রিয়ায়ত কুশিকেভির্ইন্দ্রঃ॥

ঋগ্বেদ ৩।৫৩।৯ ঋক

বিশ্বামিত্রঃ ঋষিঃ সুদাসঃ পৈযবনস্য পুরোহিতো বভূব।
স বিত্তং গৃহীত্বা বিপাট্‌ছুতুদ্রয়োঃ সম্ভেদং আযযৌ।

যাস্ক ২। ২৪

বিশ্বামিত্র মহাঋষি। তিনি দেবের জনয়িতা (?) তিনি পঞ্চনদ প্রদেশে সুদাস রাজার যজ্ঞ সম্পাদন করেন এবং তথা হইতে প্রচুর অর্থ গ্রহণ করিয়া শতদ্রু এবং বিপাশা নদীদ্বয়ের সঙ্গমস্থলে উপনীত হন।

২য়। ব্রাহ্মণ কাহাকে বলে? কি গুণে ব্রাহ্মণ হওয়া যায়?

জন্মনাজায়তে শূদ্রঃ সংস্কারাৎ দ্বিজ উচ্যতে।
বেদাভ্যাসাদ্‌ভবেৎ বিপ্রঃ ব্রহ্মজানাতি ব্রাহ্মণঃ॥

ইহাদ্বারা দেখা যায় ব্রহ্ম জানিতে পারিলে ব্রাহ্মণ হওয়া যায়। বিনয়দ্বারা ব্রাহ্মণ হওয়া যায় এরূপ অনুমান করা যায় না। "ব্রহ্মজানাতি ব্রাহ্মণঃ" এতাদৃশ ব্রাহ্মণের দৃষ্টান্ত বিরল, এজন্য অনেকে এই বচনের প্রথম চরণে 'জন্মনা ব্রাহ্মণঃ জ্ঞেয়ঃ" এই পাঠ ধরিয়াছেন। শেষোক্ত পাঠ প্রকৃত নহে। বিশেষতঃ শেষোক্ত পাঠ প্রকৃত হইলে বিশ্বমিত্রের বিনয় গুণে ব্রাহ্মণত্বের কথা প্রকৃত হইতে পারে না।

৩য়। বিশ্বামিত্র বিনয়ী ছিলেন না। তিনি বশিষ্ঠের প্রতিদ্বন্দ্বী। বিশ্বামিত্র ও তদীয় বংশধরগণসহ বশিষ্ঠ ও তাঁহার বংশধরগণের শত্রুতা ছিল। ঋগ্বেদের তৃতীয় মণ্ডলের কতকগুলি ঋক্‌দ্বারা তাহা প্রমাণিত হয়। বশিষ্ঠগোত্রজ ব্রাহ্মণগণ এই সকল ঋক্ পাঠ বা শ্রবণ করেন না। এই ঋষিদ্বয়ের কলহ পরে মহাভারত ও রামায়ণে বর্ণিত হইয়াছে। এই সময়ে পিযবনপুত্র সুদাস আর্য্যদিগের মধ্যে একজন পরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন। বশিষ্ঠ তাঁহার পুরোহিত ছিলেন কিন্তু পরে বিশ্বামিত্র সুদাস নরপতির যজ্ঞ সম্পাদন করেন এবং প্রচুর অর্থ লাভ করেন।

৪র্থ। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের শুনঃশেফের উপাখ্যানে দৃষ্ট হয় রাজা হরিশ্চন্দ্রের যজ্ঞে বিশ্বামিত্র হোতা এবং বশিষ্ঠ ব্রহ্মা ছিলেন।

বাস্তবিক বিনয়গুণে ব্রাহ্মণ হওয়ার কথা কোন ক্রমেই বিশ্বাস করা যায় না।

বিষ্ণুপুরাণে বিশ্বামিত্রের ব্রাহ্মণত্বের অপর এক কারণ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। চন্দ্রবংশে গাধি নামক এক নরপতি জন্ম গ্রহণ করেন। গাধির সত্যবতী নাম্নী দুহিতা ছিল। ভৃগুবংশীয় ঋচীক সত্যবতীর পাণি গ্রহণ করেন। ঋচীক তাঁহার পত্নীর পুত্রোৎপাদনের জন্য চরু প্রস্তুত করেন। সত্যবতীর জননীর তৎকালে কোন পুত্র হয় নাই। এ জন্য সত্যবতীর অনুরোধে ঋচীক শ্বশ্রূর জন্যও চরু প্রস্তুত করেন। তদনন্তর ঋচীক প্রয়োজন বশতঃ বনে গমন করেন।

ঋচীকের অনুপস্থিতি সময়ে মাতা এবং দুহিতা উভয়ে চরু ভক্ষণ করেন। কিন্তু মাতার জন্য যে চরু প্রস্তুত হইয়াছিল তাহা দুহিতা ভক্ষণ করেন এবং দুহিতার জন্য যে চরু প্রস্তুত হইয়াছিল তাহা মাতা ভক্ষণ করেন। মাতার জন্য যে চরু প্রস্তুত হইয়াছিল তাহা 'অতি রৌদ্রাস্ত্রধারণ মারণনিষ্ঠ ক্ষত্রিয়াচার' পুত্রোৎপাদক গুণ-বিশিষ্ট ছিল এবং সত্যবতীর জন্য যে চরু প্রস্তুত হইয়াছিল তাহা 'উপশমরুচি ব্রাহ্মণাচার' পুত্রোৎপাদক গুণবিশিষ্ট ছিল। সত্যবতীর মাতার গর্ভে বিশ্বামিত্র জন্ম গ্রহণ করেন, এজন্য তিনি ব্রাহ্মণাচার হন। সত্য-বতীর গর্ভে ক্ষত্রিয়াচার পুত্র জন্ম গ্রহণ করিত কিন্তু সত্যবতী পতির পাদ গ্রহণ করিয়া অনুগ্রহ প্রার্থনা করেন, ঋচীক অদেশ করেন যে সত্যবতীর পৌত্র ক্ষত্রিয়াচার হইবেন। সত্যবতীর গর্ভে জমদগ্নি জন্ম গ্রহণ করেন। জমদগ্নি ইক্ষ্বাকুবংশোদ্ভবরেণুর তনয়া রেণুকার পাণি গ্রহণ করেন। রেণুকার গর্ভে পরশুরাম জন্ম গ্রহণ করেন। (বিষ্ণুপুরাণ ৪। ৭)

মহাভারত অনুশাসন পর্ব্বে বিশ্বামিত্রের ব্রাহ্মণত্বের বিবরণ লিখিত আছে। যথা ঃ—

শ্রূয়তাং পার্থ তত্বেন বিশ্বামিত্রোযথাপুরা।
ব্রাহ্মণত্বং গতস্তাত ব্রহ্মর্ষিত্বং তথৈবচ॥

ভরতবংশে গাধি নামক এক নরপতি জন্ম গ্রহণ করেন! তাঁহার সত্যবতী নাম্নী এক তনয়া ছিল কিন্তু কোন পুত্র না থাকাতে নরপতি বনবাসী হইয়াছিলেন। সত্যবতী অতিশয় সুন্দরী ছিলেন। ঋচীক নামক এক ঋষি সত্যবতীর সৌন্দর্য্যে বিমোহিত হইয়া তাঁহার পাণি প্রার্থনা করেন। পরিশেষে রাজা এককর্ণ শ্যামবর্ণ ও চন্দ্রতুল্য কীর্ত্তিসম্পন্ন বাতবেগশালী সহস্র অশ্ব শুল্ক গ্রহণ করিয়া সত্যবতীকে ঋচীকের করে সম্প্রদান করেন।

অথ তামব্রবীন্মাতা সুতাং কিঞ্চিদবাঙ্‌মুখীম্।
মমাপি পুত্রি ভর্ত্তাতে প্রসাদং কর্ত্তুমর্হতি।
অপত্যস্যপ্রদানেন সমর্থঃ স মহাতপাঃ॥
ততঃ সা ত্বরিতং গত্বা তৎসর্ব্বং প্রত্যবেদয়ৎ।
মাতুশ্চিকীর্ষিতং রাজন্ ঋচীকস্তামথাব্রবীৎ॥
গুণবন্তমপত্যংসা অচিরাজ্জনয়িষ্যতি।
মমপ্রসাদাৎ কল্যাণি মাভূত্তে প্রণয়োঽন্যথা॥
* * * * *
ঋতুস্নাতা চ সাশ্বত্থং ত্বঞ্চবৃক্ষমুড়ুম্বরম্।
পরিষ্বজেথাঃ কল্যাণি তত এবমবাপ্স্যথঃ॥
চরুদ্বয় মিদঞ্চৈব মন্ত্রপূতং শুচিস্মিতে।
ত্বঞ্চ সাচোপভুঞ্জীতং ততঃ পুত্রাববাপ্স্যথঃ॥

হে কল্যাণি! তুমি এবং তিনি ঋতুস্নান করিয়া উড়ম্বর এবং অশ্বত্থ বৃক্ষ আলিঙ্গন করিবে, তাহা হইলে এরূপ পুত্র পাইবে। হে শুচিস্মিতে! তুমি এবং তিনি মন্ত্র-পূত চরুদ্বয় ভক্ষণ করিবে, তাহা হইলে এরূপ পুত্র পাইবে।

তদনন্তর সত্যবতী তাঁহার মাতাকে এ বিষয় জ্ঞাপন করেন। মাতা বলিলেন ঃ—

ভর্ত্রা য এষ দত্তস্তে চরুর্মন্ত্রপুরস্কৃতঃ।
এতং প্রযচ্ছমহ্যং ত্বংমদীয়ং ত্বং গৃহাণ চ॥
ব্যত্যাসং বৃক্ষয়োশ্চাপি করবাব শুচিস্মিতে।

তোমার পতি তোমাকে যে মন্ত্রপূত চরু প্রদান করিয়াছেন তাহা আমাকে দেও এবং আমাকে যে চরু দিয়াছেন তাহা তুমি গ্রহণ কর। এবং হে শুচিস্মিতে! আমরা বৃক্ষদ্বয়ের ব্যত্যাস করি।

সত্যবতী মাতার অনুরোধে তাহাতে সম্মত হইলেন। কালক্রমে সত্যবতীর মাতার গর্ভে বিশ্বামিত্র জন্ম গ্রহণ করেন।

বিশ্বামিত্রঞ্চাজনয়ৎ গাধিভার্য্যা যশস্বিনী।
ঋষেঃ প্রসাদাদ্রাজেন্দ্র ব্রহ্মর্ষিং ব্রহ্মবাদিনম্॥
ততো ব্রাহ্মণতাং যাতো বিশ্বামিত্রো মহাতপাঃ।
ক্ষত্রিয়ঃ সোঽপ্যথ তথা ব্রহ্মবংশস্যকারকঃ॥

হে রাজেন্দ্র! যশস্বিনী গাধিভার্য্যা ঋষির প্রসাদে ব্রহ্মর্ষি ব্রহ্মবাদী বিশ্বামিত্রের জননী হইলেন। মহাতপাঃ বিশ্বামিত্র এজন্য ব্রাহ্মণ হইয়াছেন, ক্ষত্রিয় হইলেও তিনি ব্রহ্মবংশকারক। (অনুশাসনপর্ব্ব ৪ অধ্যায়)।

এই বৃত্তান্ত বিষ্ণুপুরাণের বৃত্তান্তের অনুরূপ।

তেনহ্যমিতবীর্য্যেণ বশিষ্ঠস্য মহাত্মনঃ।
হৃতং পুত্রশতং সদ্যস্তপসাপি পিতামহ॥
যাতুধানাশ্চ বহবো রাক্ষসাস্তিগ্মতেজসঃ।
মন্যুনাবিষ্টদেহেন সৃষ্টাঃ কালান্তকোপমাঃ॥

অনুশাসনপর্ব্ব ৩ অধ্যায়।

পিতামহ! অমিতবীর্য্য তিনি (বিশ্বামিত্র) তপস্যা-দ্বারা মহাত্মা বশিষ্ঠের শতপুত্র বিনাশ করিয়াছেন। তিনি ক্রোধবিশিষ্ট হইয়া অনেকানেক কালান্তকোপম তিগ্মতেজা যাতুধান রাক্ষসগণকে সৃজন করেন।

ইহা বিশ্বামিত্রের অবিনয়ের উৎকৃষ্ট প্রমাণ।

শল্যপর্ব্বের ৪২ অধ্যায়ে বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রের সংবাদ লিখিত আছে।

বিশ্বামিত্রস্য চৈবর্ষের্বশিষ্ঠস্য চ ভারত।
ভৃশং বৈরমভূদ্রাজংস্তপঃস্পর্দ্ধাকৃতং মহৎ॥

সরস্বতী বিশ্বামিত্রকে অতি কোপনস্বভাব বলিয়া অবগত ছিলেন।

জজ্ঞে চৈনং মহাবীর্য্যং মহাকোপঞ্চ ভাবিনী।

আদিপর্ব্বের ১৭৬ অধ্যায়ে বশিষ্ঠবিশ্বামিত্রের বৃত্তান্ত লিখিত আছে, যথা :—

অর্জ্জুন উবাচ।

কিং নিমিত্তমভূদ্বৈরং বিশ্বামিত্রবশিষ্ঠয়োঃ।
বসতোরাশ্রমে দিব্যে শংস নঃ সর্ব্বমেবতৎ॥

গন্ধর্ব্ব উবাচ।

কন্যাকুব্জে মহানাসীৎ পার্থিবো ভরতর্ষভ।
গাধীতি বিশ্রুতো লোকে কুশিকস্যাত্মসম্ভবঃ॥

* * * * *

তস্যধর্ম্মাত্মনঃ পুত্রঃ সমৃদ্ধবলবাহনঃ।
বিশ্বামিত্র ইতি খ্যাতো বভূব রিপুমর্দ্দনঃ॥
সচচার সহামাত্যো মৃগয়াং গহনে বনে।
মৃগান্বিধ্যন্ বরাহাংশ্চরম্যেষু মরুধন্বসু॥
ব্যায়ামকর্ষিতঃ সোপমৃগলিপ্সুঃ পিপাসিতঃ।
আজগাম নরশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠস্যাশ্রমংপ্রতি॥

একদা বিশ্বামিত্র মৃগয়া উপলক্ষে পিপাসিত হইয়া বশিষ্ঠাশ্রমে উপনীত হন। বশিষ্ঠ তাঁহার উপযুক্ত অতিথিসৎকার করেন। পরিশেষে বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের নন্দিনীনামা কামধেনু পাইতে প্রার্থনা করেন। বশিষ্ঠ তাহা দিতে অস্বীকার করেন। তাহাতে বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রে মধ্যে ঘোর যুদ্ধ হইয়াছিল। তন্মধ্যে বিশেষ উল্লেখ যোগ্য এই যে বশিষ্ঠের নন্দিনী নানাপ্রকার সৈন্য সৃজন করেন।

অসৃজৎ পহ্লবান্ পুচ্ছাৎ প্রস্রবাদ্দ্রাবিড়াঞ্ছকান্।
যোনিদেশাচ্চ যবনান্ শকৃতঃ শবরান্ বহূন্॥
মূত্রতশ্চাসৃজৎ কাঞ্চীঞ্ছরভাংশ্চৈব পার্শ্বতঃ।
পৌণ্ড্রান্ কিরাতান যবনান্ সিংহলান্ বর্ব্বরান্ খশান্॥
চিবুকাচ্চ পুলিন্দাংশ্চীনান্ হূনাংশ্চকেরলান্।
সসর্জ্জ ফেনতঃ সা গৌর্ম্লেচ্ছান্ বহুবিধানপি॥

নন্দিনী তাহার পুচ্ছদেশ হইতে পহ্লবগণ, পয়োধর হইতে দ্রাবিড় ও শকগণ, যোনিদেশ হইতে বহু যবন শকৃত হইতে শবর মূত্র হইতে কাঞ্চী পার্শ্বদেশ হইতে শরভ, পৌণ্ড্র কিরাত যবন সিংহল বর্ব্বর খশ, চিবুক হইতে পুলিন্দ চীন হূন কেরল এবং ফেন হইতে নানাবিধ ম্লেচ্ছ-গণের সৃজন করেন।

তদনন্তর বিশ্বামিত্র তপস্যাদ্বারা ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন।

এই বৃত্তান্ত মনুবচনের বিরোধী। কিন্তু ইহাতে কোন ঐতিহাসিক সত্য নাই। বিশ্বামিত্রের সময়ে উপরি-উক্ত জাতিগণের সহিত আর্য্যগণের পরিচয় হয় নাই। তৎকালে তাঁহারা অনার্য্যদিগ হইতে আর্য্যাবর্ত্ত অধিকার করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন।

অনেকে বলিবেন মনু বেদের অর্থ সংগ্রহ করিয়া-ছেন, অতএব মনুসংহিতাতে যাহা লিখিত আছে তাহা অবিশ্বাস করা যায় না। বৃহস্পতি বলিয়াছেন :—

"মন্বর্থবিপরীতা যা সা স্মৃতির্ন প্রশস্যতে।"

আমরা এসম্বন্ধে নির্দ্দেশ করিতেছি, এক্ষণ সমাজে যে মনুসংহিতা প্রচলিত আছে, তাহা মনুস্মৃতি নহে। ইহা ভৃগুপ্রোক্ত মনুসংহিতা বলিয়া প্রচলিত। বৃহস্পতির

নানা বচন মনুসংহিতার বচনের বিরোধী, অতএব বৃহস্পতি যে মনুস্মৃতির কথা বলিয়াছেন তাহা বর্ত্তমান মনুসংহিতা নহে। প্রকৃত পক্ষে এক্ষণ ভারতবর্ষে মনুসংহিতা প্রচলিত নাই। আমরা নির্দ্দেশ করিতেছি যে এই মনুসংহিতা কখন ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিলনা। দায় সম্বন্ধে অদ্যাপি হিন্দুগণ হিন্দুশাস্ত্র দ্বারা শাসিত হন্ কিন্তু দায়সম্বন্ধেও মনুসংহিতা প্রচলিত নহে। বঙ্গদেশ ব্যতীত ভারতবর্ষের অন্যান্য সমুদায় প্রদেশে যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি এবং তাহার টীকা মিতাক্ষরা প্রচলিত। মনুসংহিতার প্রাধান্য কেবল নামে, কার্য্যে নহে। অতএব মনুসংহিতার বচন অগ্রাহ্য করা যাইতে পারে। (?)

রামায়ণ আদিকাণ্ডে বিশ্বামিত্রের উপাখ্যান আছে।

যস্মাদ্বিপ্রেন্দ্র মদ্রাক্ষং সুপ্রভাতা নিশা মম।
পূর্ব্বং রাজর্ষিশব্দেন তপসা দ্যোতিতপ্রভঃ॥
ব্রহ্মর্ষিত্বমনুপ্রাপ্তঃ পূজ্যোসি বহুধা ময়া।

আদিকাণ্ড ১৮। ৫৪-৫৫

আমার রাত্রি সুপ্রভাত হইয়াছে এজন্য বিপ্রেন্দ্রকে দর্শন করিলাম। আপনি তপস্যা দ্বারা অতিশয়িত কান্তিমান, পূর্ব্বে রাজর্ষি ছিলেন পরে ব্রহ্মর্ষি হইয়াছেন এবং আমার পরম পূজনীয়।

একদা রাজর্ষি বিশ্বামিত্র তাঁহার আশ্রমে যজ্ঞের আয়োজন করেন। রাক্ষসগণ কর্ত্তৃক তাঁহার যজ্ঞে নানা প্রকার বিঘ্ন উৎপাদনের ভয়ে রাক্ষসবিনাশ করার জন্য বিশ্বামিত্র দশরথপুত্র রামকে আনয়ন করিতে অযোধ্যা গমন করেন। কথিত আছে বর্ত্তমান বক্শার ষ্টেশনের নিকট বিশ্বামিত্রের আশ্রম ছিল। রামায়ণের বর্ণনা মতে তাহা প্রকৃত বলিয়া বোধ হয়। এই সময়ে এই স্থান কীকট প্রদেশ বলিয়া কথিত হইত। যাস্ক বলেন :-

"কীকটা নাম দেশো হ নার্য্য নিবাসঃ"

ত্রিকাণ্ড শেষে কীকটা মগধ দেশ বলিয়া কথিত। বর্ত্তমান বেহার প্রদেশের প্রাচীন নাম কীকট; তদনন্তর এই প্রদেশ মগধ নামে পরিচিত। দেবগণের প্রিয়দর্শী অশোকের পরে বেহার বলিয়া কথিত হইতেছে। বিশ্বামিত্রের সময়ে এই প্রদেশ অনার্য্যগণের আবাস স্থান ছিল।

বিশ্বামিত্র রাম এবং লক্ষ্মণকে নানাপ্রকার অস্ত্র-পরিচালন শিক্ষা দেন। পরে রাম রাক্ষসদিগকে বধ করেন।

রাজর্ষি বিশ্বামিত্র একদা বশিষ্ঠাশ্রমে উপনীত হন। বশিষ্ঠের আদেশে কামধেনু শবলা অতিথি সৎকারের জন্য ইক্ষু, মধু, লাজ নানাপ্রকার ভক্ষ্য এবং মৈরেয় প্রভৃতি নানাপ্রকার পানীয় উৎপন্ন করিয়াছিল। পরিশেষে বিশ্বামিত্র শবলাকে পাইবার জন্য বশিষ্ঠের নিকট প্রার্থনা করেন, বশিষ্ঠ তাহা দিতে অস্বীকার করেন। শবলা বশিষ্ঠের আদেশে শকসৈন্য সৃজন করিয়াছিল। উভয়ের মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ হইয়াছিল।

(বালকাণ্ড ৫৪। ৫৫ অধ্যায়)

কথিত আছে অনন্তর বিশ্বামিত্র তপস্যা প্রভাবে ব্রহ্মর্ষি হন।

রামায়ণের এই বর্ণনা মনুসংহিতার বৃত্তান্তের অনুরূপ নহে। রামায়ণে লিখিত আছে—

"অয়ং সুরপতে ঘোরো বিশ্বামিত্রমহামুনিঃ।
ক্রোধমুৎস্রক্ষ্যতে ঘোরং ত্বয়িদেব ন সংশয়ঃ॥"

বালকাণ্ড ৬৪। ৩

এই বৃত্তান্ত মহাভারতের আদিপর্ব্বের বৃত্তান্তের অনুরূপ।

এই উপাখ্যানে লিখিত আছে যে বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রকে ব্রাহ্মণ স্বীকার করাতে বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণ হইলেন এবং ইহা দেবগণ স্বীকার করিলেন।

(বালকাণ্ড ৬৫ অধ্যায়)

বাস্তবিক তপস্যা প্রভাবে ব্রাহ্মণ হইলে বশিষ্ঠের স্বীকার অস্বীকারের কি প্রয়োজন।

মহাকবি কালিদাস অভিজ্ঞান শকুন্তল নামক নাটকে লিখিয়াছেন যে রাজা দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে বিশ্বামিত্রের কন্যা অবগত হইয়া তাহাকে বিবাহ্যা স্থির করিলেন। ইহাদ্বারা বুঝা যায় কালিদাস বিশ্বামিত্রকে ক্ষত্রিয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

বাস্তবিক বিশ্বামিত্র যে বংশে জন্মগ্রহণ করেন সেই বংশ পশ্চাদ্‌বর্ত্তী সময়ে ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত হইয়াছে তবে বিশ্বামিত্র পূর্ব্বে ক্ষত্রিয় ছিলেন পরে ব্রাহ্মণ হইয়া-

ছেন এরূপ উপাখ্যান রচিত হওয়ার কি প্রয়োজন। আমরা এরূপ উপাখ্যানের প্রয়োজন প্রদর্শন করিতেছি।

বিশ্বামিত্র তৃতীয় মণ্ডলের ঋষি। ব্রাহ্মণগণ প্রতিদিন যে গায়ত্রী উচ্চারণ করিয়া থাকেন তাহা তৃতীয় মণ্ডলের মন্ত্র। ক্ষত্রিয়ঋষির প্রণীত মন্ত্র প্রতিদিন ব্রাহ্মণগণের উচ্চারণ করিয়া উপাসনা করিতে হইবে একথা স্বীকার করিলে ক্ষত্রিয় হইতে ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্বের হানি হইতে পারে ইহা বিশ্বামিত্রের ব্রাহ্মণত্বপ্রাপ্তিপ্রবাদের এক কারণ।

বিশ্বামিত্রের বংশধর যোগীশ্বর যাজ্ঞবল্ক্য। যাজ্ঞবল্ক্য কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক নূতন শুক্ল যজুর্ব্বেদ রচনা করেন। যাজ্ঞবল্ক্য মিথিলাধিপতির নিকট বহু সম্মান লাভ করেন। ঋষিগণ মধ্যে তৎকালে তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন।

যাজ্ঞবল্ক্যের পুত্র মহর্ষি কাত্যায়ন প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ।

আমার অনুমান হয় এই সমস্ত কারণে বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন এরূপ প্রবাদের সৃষ্টি হইয়াছে।

বেণ প্রাচীনকালে একজন প্রসিদ্ধ নরপতি ছিলেন। বেণ অবিনয়ে বিনষ্ট হইয়াছেন ইহা এইরূপ কল্পিত। বেণ অতি উন্নত আদর্শ নরপতি ছিলেন। কথিত আছে যে বেণের সময়ে সঙ্কর জাতির উৎপত্তি হইয়াছে। বেণ বোধ হয় জাতিভেদের বিরোধী ছিলেন। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ৯৩ সূক্তের ১৪ ঋকে বেণের প্রশংসা দৃষ্ট হয়। সায়ন বেণ পুত্র পৃথিবীর সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—

"এতৎসংজ্ঞকং বৈণং রাজর্ষিং"

বেণের সম্বন্ধে আমরা সময়ান্তরে আলোচনা করিব।

অতি বিস্তরেণালম্

শ্রীরেবতী মোহন গুহ।

আয়ুর্ব্বেদ ও আধুনিক রসায়ন

(২)

আয়ুর্ব্বেদীয় যুগ।

অ যুগ কোন সময় হইতে আরব্ধ হইয়াছে তাহা ঠিক নির্ণয় করা যায় না। হারীত, ভেল, জাতুকর্ণ, অগ্নিবেশ প্রভৃতি আয়ুর্ব্বেদীয় সংহিতাকার ও চরক ও সুশ্রুতের সময় হইতে আয়ুর্ব্বেদীয় যুগ আরব্ধ হইয়াছে বলিয়া সর্ব্বসাধারণে গৃহীত হইয়া থাকে। চরক, সুশ্রুতে ধাতুঘটিত ঔষধের বড় প্রচলন দেখা যায় না। সুশ্রুতে ধাতু সকলকে ব্যবহারোপযোগী করিবার জন্য যে অয়স্কৃতির ব্যবস্থা করিয়াছেন পরবর্ত্তীকালের তাহা জারণ মারণের পূর্ব্বাবস্থা বলিয়া গৃহীত হইতে পারে।

অনেকের মতে নাগার্জ্জুনই ধাতুর জারণ মারণ প্রণালীর প্রবর্ত্তক বলিয়া কথিত হন। এ বিষয়ে রসেন্দ্র-চিন্তামণিতে ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। যথা, নাগার্জ্জুন মতে লৌহ মারণ ইত্যাদি। এই রাসায়নিক নাগার্জ্জুন ও মাধ্যমিক বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রবর্ত্তয়িতা নাগার্জ্জুন এক বলিয়া অনেকেই স্বীকার করেন। তাঁহার আবির্ভাব কাল লইয়া বিলক্ষণ মত ভেদ আছে। মামুদ গজনবির সমসাময়িক প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক আলবেরুনি (Alburini) লিখিয়াছেন যে, খ্রীঃ পরে নবম বা দশম শতাব্দীতে একজন প্রসিদ্ধ রাসয়নিক সোমনাথের নিকট একস্থানে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার নাম নাগার্জ্জুন; তিনি রসায়ন শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন এবং ঐ সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। * আলবেরুনি নিজেই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন যে, তিনি রসায়ন শাস্ত্রের উপর কখনই বড় একটা শ্রদ্ধাবান ছিলেন না এবং ঐ শাস্ত্র তিনি বড় একটা অনুশীলন করেন নাই। তিনি মনে করিতেন যে, স্বর্ণ রৌপ্য প্রস্তুত করিবার ও ভেল্কি দেখাইবার জন্য রসায়ন শাস্ত্রের আলোচনা হইয়া থাকে: অতএব উহার আলোচনা পরিহর্ত্তব্য। তিনি "রসায়ন" এর অর্থ করিতে গিয়া "রস"কে স্বর্ণ করিয়া ফেলিয়াছেন সুতরাং তাঁহার শোনা কথায় নাগার্জ্জুনের আবির্ভাব কাল ঠিক হইতে পারে না। প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ লামা তারানাথ নাগার্জ্জুনকে রাজা নেমিচন্দ্রের সমসাময়িক করিয়াছেন। ইনি খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। নাগার্জ্জুনের শেষ আবির্ভাব কাল ৪০১ খ্রীঃ অব্দের পর হইতে পারে না, কারণ ঐ সময়ে তাঁহার জীবনচরিত চীনভাষায় কুমার

* Sanchu's "Alburini's India" Vol. D. P. 189.

জীবের দ্বারা অনুবাদিত হয়। * তাঁহার আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ সকল Dr. Palemer cordier's Introduction A L' Etrude destraits medicaus Sanscritas নামক পুস্তকে সংগৃহীত হইয়াছে বলিয়া পড়িয়াছি। উহার সবিশেষ আলোচনা আমাদের দেশে হওয়া উচিত।

অধ্যাপক রায় মহাশয় নাগার্জ্জুন কর্ত্তৃক লিখিত বলিয়া রসরত্নাকর নামক একখানি বৌদ্ধতন্ত্রের অংশ সংগ্রহ করিয়াছেন। তিনি উহাকে সপ্তম বা অষ্টম শতাব্দীর লিখিত তন্ত্র বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। † নাগার্জ্জুন ধাতুর জারণ মারণ প্রভৃতি প্রক্রিয়ার প্রবর্ত্তক বলিয়া যে প্রসিদ্ধি আছে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ এই গ্রন্থে পাওয়া যায়। এই গ্রন্থে মাক্ষিক হইতে তাম্র, রসক (calamine) হইতে রসকস্বত্ব (zinc), দরদ (ciemabor) পাতিত করিয়া পারদ, কৃত্রিম স্বর্ণ কজ্জলী প্রভৃতি প্রস্তুত করিবার প্রণালী ও পাতনযন্ত্র প্রভৃতি ২৫ প্রকার যন্ত্রের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

সুশ্রুতের সময় হইতে আয়ুর্ব্বেদে ছয়টি ধাতুর অস্তিত্ব স্বীকৃত হইয়াছে—স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, বঙ্গ, সীসক ও লৌহ। সার্ঙ্গধর এবং বিশেষতঃ তাহার টীকাকার নয়টি ধাতুর উল্লেখ করিয়াছেন, তাম্র, রৌপ্য, পিত্তল, সীসক স্বর্ণ, বঙ্গ, লৌহ, কাংস্য ও বৃত্তলৌহ। তাঁহারা সূর্য্য প্রভৃতি নবগ্রহ হইতে ইহাদের নামকরণ হইয়াছে এরূপও নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ‡ এই নবগ্রহমূলক নয় ধাতু বাদ দৃষ্টে অনেকে অনুমান করেন যে আয়ুর্ব্বেদের ধাতুবাদ গ্রীকদিগের নিকট হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে। কিন্তু এই নয় ধাতুবাদ আয়ুর্ব্বেদে স্থায়িত্ব লাভ করে নাই, কারণ শার্ঙ্গধরের পরে রচিত ভাবপ্রকাশে নয়টি ধাতুর উল্লেখ নাই, সাতটি ধাতুর উল্লেখ আছে যথা, স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, বঙ্গ, যশদ, সীসক ও লৌহ। *

ধাতু প্রস্তুত প্রক্রিয়া (Metallurgy).

প্রত্যেক ধাতুর নিয়ে উহার প্রস্তুত প্রক্রিয়া আলোচিত হইবে।

ধাতুর আপেক্ষিক গুরুত্ব। (Specific gravity).

আয়ুর্ব্বেদে ধাতুর আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্দ্ধারণের চেষ্টা কোথাও দেখিতে পাই নাই। ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত বিখ্যাত আইন আকবরী নামক গ্রন্থে ধাতু ও অন্যান্য দ্রব্যের আপেক্ষিক গুরুত্বের তিনটী তালিকা দেওয়া হইয়াছে। ঐ তালিকা আলবেরুনির দ্বারা প্রস্তুত বলিয়া আইন আকবরীতে লিখিত আছে। † সুতরাং উহার আবিষ্কার ভারতবর্ষে হয় নাই। একথা সুনিশ্চিত। ঐ তালিকা আইন আকবরীতে স্থান পাওয়াতে উহার উল্লেখ এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। ধাতুর আপেক্ষিক গুরুত্ব দুই উপায়ে নির্ণীত হইয়াছে।

প্রথম—সমপরিমিত স্থানাধিকৃত (equal volumes) ভিন্ন ভিন্ন ধাতুর ভিন্ন ভিন্ন ওজন হইবে। যে সকল দ্রব্য বেশী গুরু তাহাদের ওজন সেই পরিমাণে বেশী হইবে এবং যে সকল দ্রব্য বেশী লঘু তাদের ওজন সেই পরিমাণে কম হইবে। এই ভিত্তির উপর নির্ভর করিয়া নিম্নলিখিত আপেক্ষিক গুরুত্বের তালিকা প্রস্তুত করা হইয়াছে।

ধাতু	ওজন
স্বর্ণ	১০০
পারদ	৭১
রৌপ্য	৫৪
সীসক	৫৯
বঙ্গ	৩৮
লৌহ	৪০
তাম্র	৪৫
পিত্তল	৪৫

* Satish Ch. Vidyabhushan: "Indian Logic, medieval Period" P. 68 & 69.

† Roy: History of Hindu Chemistry, Vol. II, P. XLI.

‡ তাম্রতারারনাগাশ্চ হেমবঙ্গৌ চ তীক্ষ্ণকম্।
কাংস্যকং বৃত্তলোহং চ ধাতবো নব সংস্মৃতাঃ।
সূর্য্যাদীনাং গ্রহাণাং তে কথিতানামভিঃ ক্রমাৎ ॥ শার্ঙ্গধর।

* স্বর্ণং রূপ্যঞ্চ তাম্রঞ্চ বঙ্গং যশদমেব চ।
† সীসং লৌহঞ্চ সপ্তৈতে ধাতবো গিরিসম্ভবাঃ ॥ ভাবপ্রকাশ।

Gladwnis Ayeen Akbry. Vol. I. P. 43.

দ্বিতীয়—সুপ্রসিদ্ধ গ্রীক বৈজ্ঞানিক আর্কিমিডিসের (Archimedes, 287 B.C.) আবিষ্কৃত তথ্যঅনুযায়ী আপেক্ষিক গুরুত্বনির্দ্ধারণ। একটি জলপূর্ণ পাত্রে ১০০ ভাগ ওজনের ভিন্ন ভিন্ন ধাতু নিক্ষেপ করিলে ভিন্ন ভিন্ন ওজনের জল উপচাইয়া পড়িয়া যাইবে। যে দ্রব্য যত গুরু সেই দ্রব্য তত কম জল ফেলিয়া দিবে এবং যে দ্রব্য যত লঘু সেই দ্রব্য তত বেশী জল ফেলিয়া দিবে।

ধাতু	১০০ ভাগ ওজনের ভিন্ন ভিন্ন ধাতু জলে নিক্ষেপ করিলে যতটুকু জল পড়িয়া যাইবে তাহার ওজন।
স্বর্ণ	... ... ৫
পারদ	
সীসক	
রৌপ্য	
তাম্র	১১
পিত্তল	১১
লৌহ	১২
বঙ্গ	১৩

বৈজ্ঞানিক ইহা হইতে সহজেই আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্দ্ধারণ করিতে পারিবেন।

ধাতুর আকর।

এই প্রসঙ্গে প্রাচীন ভারতে কোথায় কোথায় ধাতুর খনি ছিল তাহার একটা তালিকা প্রস্তুত করিবার চেষ্টা করা যাইতে পারে। প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে সেরূপ খনির উল্লেখ দেখিতে পাই নাই। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে প্লিনী (প্রথম শতাব্দী) সিন্ধুদেশে স্বর্ণ ও রৌপ্যের আকরের উল্লেখ করিয়াছেন। আইন আকবরীতে ভিন্ন ভিন্ন স্থানের বর্ণনাকালে কোন কোন স্থানে বিভিন্ন ধাতুর খনির অস্তিত্ব সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে। এখানে সেই সকল খনির একটা তালিকা সংকলন করিয়া দেওয়া হইল।

সুবা।	সরকার বা সহর	কি ধাতুর খনি।
(১) বাঙ্গলা।	বাজুহা।	লৌহ।
(২) ঐ	মান্দুরন।	হীরক।
(৩) আলাহাবাদ	কালিঞ্জর	হীরক।
(৪) অযোধ্যা।	অযোধ্যা	মাটী খুঁড়িলে স্বর্ণের কণা পাওয়া যায়।
(৫) আগ্রা।	বায়না।	তাম্র।
(৬) ঐ	বিরাট।	কয়েকটি তাম্রের খনি একটি রূপার খনি।
(৭) ঐ	সিঙ্গনে দাদীতুর ও কোট পোটনী।	কয়েকটী তাম্রের খনি।
(৮) গুজরাট।		এখানে রোম ও ইরাক প্রদেশ হইতে রৌপ্য আমদানি হয়।
(৯) দিল্লী।	কুমায়ুন।	স্বর্ণ, সীসক, রৌপ্য, লৌহ, তাম্র, হরিতাল ও সোহাগা।
(১০) লাহোর।		পঞ্জাবের নদী সকলের বালি হইতে স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, দস্তা, বঙ্গ, সীসক পাওয়া যায়।
(১১) কাশ্মীর।	কেরো।	লৌহ।
(১২) কাশ্মীর।	পক্লী।	নদীর জলে ও বালুকাতে স্বর্ণ কণা।
(১৩) ঐ	কান্দাহার	পুরাতন লৌহ কারখানা।

ক্রমশঃ।

শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী

সঙ্গীত।

বাউলের সুর।

(৬)

ওরে মন তোর জ্যোতিষে হারায় দিশে
অলক্ চেয়ে আকাশ পানে,
ওরে ঐ কোটী বছর, রবির ভিতর—
পুড়্ছে কি তা মালিক জানে?
এত কাঠ কোথায় থাকে, কে দেয় তাকে
কোথা থেকে যুগিয়ে আনে?
চিরদিন সমান জ্বলে বিনা তেলে
যায়না নিভে কোন্ বিধানে?
আলাময় কিরণ রেখা (এমনি চোখা)
যায়না দেখা স্থির নয়নে।
সেই আলো চাঁদে প'ড়ে, বল্ কি করে
ঠাণ্ডা হয়ে ধরায় নামে।
ঢেলে দেয় সুধার ধারা এমনি ধারা
কোটী তারা রয় বিমানে।
এমনি ঠাণ্ডা গরম, শক্ত নরম
কত রকম কত স্থানে।
ভেবে দেখ সত্যাসত্য এদের তত্ত্ব
নাই বিজ্ঞানে, বেদ-কোরাণে।
মাথা তো একটু খানি কতই জানি
বলে মরি অভিমানে।
কান্ত কয় জ্ঞানের মালিক জ্ঞান না দিলে
জ্ঞান আসে কি ভেসে বানে?

রজনীকান্ত সেন।

ইয়ুরোপীয় পর্য্যটকগণের মক্কা দর্শন।

মুসলমানদিগের মহাতীর্থ মক্কা নগরীতে এবং বিশেষতঃ কাবার পবিত্র মন্দিরে মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী ব্যতীত জন সাধারণের প্রবেশ নিষিদ্ধ, অনেকেই এই বিষয় অবগত আছেন। তথাপি এই বিধানটি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

মুসলমান ধর্ম্মের অভ্যুদয়ের বহু শতাব্দী পূর্ব্ব হইতেই মক্কা মহাতীর্থরূপে সম্মানিত হইত। তথায় পবিত্র কাবা * এবং জম্ জম্ কূপ † অবস্থিত ছিল বলিয়া মক্কার এই

* কাবার মন্দির সম্বন্ধে জনশ্রুতি আছে যে ইসমাইল ঈশ্বরের আদেশানুসারে ইহা নির্ম্মাণ করেন। এই ধর্ম্ম কার্য্যে তাঁহার পিতা এব্রাহাম তাঁহাকে সাহায্য করেন। মন্দির নির্ম্মাণ সময়ে দৈবশক্তি সম্পন্ন এক খণ্ড প্রস্তর মঞ্চরূপে এব্রাহামের সহিত উপরে উঠিত ও নীচে নামিত। আজিও ঐ প্রস্তর খণ্ড প্রদর্শিত হয় এবং প্রকৃত ধার্ম্মিকগণ ইহাতে এব্রাহামের পদচিহ্ন দেখিতে পান। যখন এব্রাহাম ও ইস্মাইল নির্ম্মাণ কর্ম্মে ব্যাপৃত ছিলেন তখন ঈশ্বরদূত গেব্রিয়েল তাহাদিগের নিকট এক খণ্ড প্রস্তর আনয়ন করে। এই প্রস্তর খণ্ড সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রবাদ প্রচলিত আছে। কোন কোন প্রবাদ অনুসারে ইহা স্বর্গ হইতে আদমের সহিত মর্ত্তলোকে পতিত হয় এবং প্রলয় পয়োধিজলে হারাইয়া যায়। তৎপর গেব্রিয়েল ইহার পুনরুদ্ধার করেন। কিন্তু যে প্রবাদটি অত্যন্ত প্রচলিত তাহা এই—এই প্রস্তর খণ্ড পূর্ব্বে স্বর্গবাসী আদমের রক্ষাকারী দূত ছিল। অসতর্কতার শাস্তিস্বরূপ ইহা প্রস্তরত্ব প্রাপ্তহয় এবং স্বর্গ-হইতে আদমের সহিত বিতাড়িত হয়। ভক্তিভরে এব্রাহাম ও ইস্মাইল ইহাকে গ্রহণ করেন এবং কাবার বহির্ভাগে প্রাচীরের এক কোণে স্থাপন করেন। আজিও ইহা তথায় অবস্থান করিতেছে এবং প্রত্যেক যাত্রী এক একবার মন্দির প্রদক্ষিণ করিয়া ইহা চুম্বন করে। কথিত আছে যখন ইহা প্রথম স্থাপিত হয় তখন অতি শুভ্র ছিল কিন্তু পাপী মানবের ওষ্ঠস্পর্শে ক্রমে কৃষ্ণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। মহাজাগরণের দিনে ইহা পুনঃ দূত-শরীর পরিগ্রহ করিবে এবং ঈশ্বরের সমীপে প্রকৃত বিশ্বাসীর সপক্ষে দণ্ডায়মান হইবে। (*See* Irving's 'Life of Mahomet, Chapter III).

† এই কূপ সম্বন্ধে প্রবাদ আছে যে যখন হেগার (Hagar) এবং তত্পুত্র ইসমাইল মরুভূমিতে তৃষ্ণায় মৃতপ্রায় হইয়াছিলেন

প্রসিদ্ধি। বিরোধী যুদ্ধপ্রিয় জাতি সকল তাহাদিগের বৈরিতা ভুলিয়া যাত্রীর বেশে মক্কার দ্বারে সমবেত হইত, কাবার ধর্ম্মমন্দির সাতবার ¶ প্রদক্ষিণ করিত, তত্রস্থিত পবিত্র কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরখণ্ড স্পর্শ ও চুম্বন করিত, জম্ জম্ কূপের জলে স্নান করিত, ঐ জল পান করিত, তৎপর অন্যান্য বহুবিধ ক্রিয়াদি সমাপন করিয়া নিজ নিজ গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিত এবং পুনঃ যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হইত। মহম্মদের আবির্ভাবের পূর্ব্বে আরববাসিগণ বহুদেবে বিশ্বাস করিত। খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দীতেও তাহারা সূর্য্য, চন্দ্র নক্ষত্রাদির পূজা করিত। আরবে প্রচলিত জড়পূজার একটী বিশেষত্ব প্রস্তর পূজা; কোন দেবতা বা বস্তু বিশেষের প্রতিমূর্ত্তি নয়, সামান্য একখণ্ড প্রস্তর মাত্র। সম্ভবতঃ এই পদ্ধতি কাবাস্থিত প্রস্তর খণ্ডের পূজা হইতে উদ্ভূত এবং এই প্রস্তর পূজা হইতেই পৌত্তলিকতার আবির্ভাব হয়। § একেশ্বরবাদী মহম্মদ এই পৌত্তলিকতার বিরোধী ছিলেন বলিয়া অনেক লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছিলেন; এমন কি তিনি মদিনায় পলায়ন করিয়া প্রাণ রক্ষা করেন। ক্রমে তথায় তাঁহার অনুচরের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। তিনি তাঁহার জীবিতাবস্থায় আর মক্কায় পদার্পণ করেন নাই, মদিনায়ই তাঁহার মৃত্যু হয়। তিনি মৃত্যুর পূর্ব্বে স্থির প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন যে অতি শীঘ্রই বহুকালাবধি প্রচলিত হজের পৌত্তলিকতা-দুষ্ট আচার পদ্ধতি শোধিত এবং তাঁহার জন্ম স্থান মহাতীর্থ মক্কা পৌত্তলিক বর্জ্জিত করিবেন।

হিজিরার নবম বর্ষে (৬৩১ খৃঃ) তিনি স্বীয় শ্বশুর ও উত্তরাধিকারী আবুবাকরকে ৩০০ যাত্রীর অধিনায়ক করিয়া উৎসর্গের নিমিত্ত ২০টী উষ্ট্রসহ মক্কায় প্রেরণ করেন। আবুবাকর চলিয়াগেলে পর কোরাণের ৯ম অধ্যায়ের আদেশগুলি প্রত্যাদিষ্ট হয়। মহম্মদ অতঃপর তাঁহার জামাতা ও প্রিয় অনুগত শিষ্য আলিকে আহ্বান করিলেন এবং তাঁহাকে সর্ব্বাপেক্ষা দ্রুতগামী উটে আরোহণ করাইয়া ত্বরিত গতিতে মক্কায় যাইয়া তথায় সমবেত যাত্রিমণ্ডলীর সমক্ষে ঐ প্রত্যাদেশ প্রচার করিতে অনুরোধ করিলেন। পথিমধ্যে আবুবাকর প্রভৃতির সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয় এবং আবুবাকরকে তিনি তাঁহার যাত্রার উদ্দেশ্য বলেন। আলি যেদিন মক্কায় পৌছেন, সেদিন উৎসব সপ্তমে চড়িয়াছিল, বলির নির্দ্দিষ্ট দিনে মিনা উপত্যকায় বলি প্রভৃতি ক্রিয়া কলাপ অনুষ্ঠিত হইলে পর আলি অল্ অকবা শৈলে সম্মিলিত এক মহতী জনতার সমক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া কোরাণের নবম অধ্যায় প্রচার করিলেন। তিনি প্রচার করিলেন যে "চারি মাস কাল আরববাসিগণ যদৃচ্ছা ক্রিয়া অনুষ্ঠানাদি করিতে পারিবে কিন্তু তৎপর যদি কেহ

তখন ঈশ্বরের এক দূত তাঁহাদিগকে ইহা দেখাইয়া দেয়। বার্কহার্ডট (Burkhardt) তাঁহার ভ্রমণ কাহিনীতে বলেন যে যদ্যপি ইহার জল কেবল যাত্রিবর্গ কেন মক্কার প্রত্যেক পরিবার প্রত্যহ পান ও স্নানের নিমিত্ত প্রভূত পরিমাণে ব্যবহার করে তথাপি কূপ মধ্যে জলের উচ্চতা সমস্ত দিন সমভাবেই থাকে। ইহা তিনি প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যার সময় জল উঠাইবার রজ্জুর দৈর্ঘ্য তুলনা করিয়া নিরূপিত করিয়াছিলেন। তিনি আরও বলেন—"The water is supplied by a subterraneous rivulet. The water is heavy in its taste, and sometimes in its colour resembles milk; but it is perfectly sweet and differs very much from that of the brackish wells dispersed over the town. When first drawn up, it is slightly tepid, resembling in this respect many other fountains in the Hejaz (Burkhardt's Travels in Arabia." p. 144).

¶ এই প্রথা সম্ভবতঃ গ্রহাদির আবর্ত্তনের অনুকরণে অবলম্বিত হয়। আরববাসিগণ সূর্য্য, চন্দ্র প্রভৃতি গ্রহাদির উপাসক ছিল। "Shahrastany informs us that there was an opinion among the Arabs that the walking round the Kaaba and other Ceremonies, were symbolical of the motion of the planets and other astronomical facts." Sprenger's 'Mohammed.' p. 6.

§ "The adoration of stones among the Ishmaelites originated in the practice of carrying a stone from the sacred enclosure of Mecca, when they went a journey out of reverence to the Kaaba; and whithersoever they went, they set it up and made circuits round about it as was done to the Kaaba; till at the last, they worshiped every goodly stone they saw, and forgot their religion and changed the faith of Abraham and Ishmael and worshipped images." Hishami. P. 27.

নব প্রচারিত ধর্ম্মের বিরুদ্ধাচরণ করে অথবা তাহা গ্রহণ করিতে স্বীকৃত না হয় তাহা হইলে যে প্রকারেই হউক তাহাকে নবধর্ম্মের বশীভূত করিতে হইবে।" "পৌত্তলিকের সাক্ষাৎ পাওয়া মাত্র তাহাকে হত্যা করিবে অথবা বন্দী করিবে।" "এই বৎসরের পর পৌত্তলিকদিগকে পবিত্র মন্দিরের নিকট আসিতে দিবে না, যেহেতু তাহারা অশুচি" (কোরাণ ৯ম অধ্যায় ২৮ শ্লোক)। নব প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মের একাধিপত্য স্থাপনের ইহাই মূলমন্ত্র।

মহম্মদ "পৌত্তলিক" শব্দে শুধু আরবদেশের পৌত্তলিক দিগকেই বুঝিতেন। তাঁহার মুখ হইতে যখন বাহির হইল "নাস্তিকেরা ঈশ্বরের মন্দির দর্শন করিতে পাইবে না" তখন তিনি তাহার স্বদেশের মূর্ত্তিপূজকদিগের কথাই ভাবিতেছিলেন; ইহারাই তাঁহার পরম শত্রু ছিল—ইহারাই তাঁহার প্রাণনাশের ষড়যন্ত্র করে এবং ইহারাই স্মরণাতীত কাল হইতে—আরবের সেই সমৃদ্ধির সময়ে—রাজনীতি ও ধর্ম্ম বিষয়ে আধিপত্য সুখ উপভোগ করিতেছিল। সুতরাং মহম্মদ তাহাদিগকে সকল প্রকার অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন।

কিন্তু মহম্মদের শিষ্যবর্গ ঐ বিধানের অতি বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিয়া, উহা কেবল আরবে মূর্ত্তিপূজকগণের সম্পর্কে প্রয়োগ করিয়াই ক্ষান্ত না থাকিয়া, মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী ব্যতীত অন্য জন সাধারণের প্রতি প্রয়োগ করিলেন। এমন কি সিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত মুসলমানেরাও এই বিধান অনুসারে 'তখইয়া' (অর্থাৎ নিজের ধর্ম্ম বিশ্বাস আচার পদ্ধতি সেই সময়ের জন্য ত্যাগ করিয়া) না করিয়া কাবার মন্দিরে প্রবেশ করিতে পারিবে না বলিয়া আদিষ্ট হইল। মক্কায় সুন্নি সম্প্রদায়ের আধিপত্য; সুতরাং মন্দিরে প্রবেশ লাভ করিতে হইলে সুন্নিদিগের ধর্ম্মমত অবলম্বন করিতে হয়। এই বিধানের ফলে মুসলমানের মস্‌জিদে মুসলমান ব্যতীত অন্য লোকের প্রবেশ নিষেধ। এই বিধান মহম্মদের জীবনের শেষ দশায় "প্রত্যাদিষ্ট" বলিয়া ইহার প্রভাব অত্যন্ত অধিক। বিধানের এইরূপে ব্যাখ্যা হইতে সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে যে মক্কা প্রবেশের রাস্তাগুলি কিরূপ সতর্কতার সহিত পরিরক্ষিত হইত। এই নিয়ম ভঙ্গ করিলে কিম্বা নিয়ম ভঙ্গ করিবার চেষ্টা করিলে শাস্তি অতি কঠোর ছিল—অধিকাংশ স্থলেই প্রাণদণ্ড। বার্টন, পিট্‌স প্রভৃতি পর্য্যটকেরা এই বিষয় বিশেষরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। গীবন (Gibbon) তাঁহার মহাগ্রন্থে (Decline and fall of the Roman Empire) দেখাইয়াছেন যে সমগ্র আরবদেশ সম্পর্কে ঐ নিয়ম বলবত্ ছিল না। সমুদ্রতীরস্থ বন্দরাদিতে খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বিগণের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল না। মুসলমানদিগের প্রধান আপত্তি ছিল—বিধর্ম্মী যেন কাবার পবিত্র মন্দির দেখিতে না পারে। সেই হেতু যখন বার্কহার্ডট (Burkhardt) মক্কা গমন করেন, তখন তাঁহাকে নগরীর উত্তর প্রান্তবাহী 'উপরের রাস্তা' (the 'upper road') নামক পথে লইয়া যাওয়া হয়; এই পথে মন্দির দৃষ্ট হয় না।

বিকনেল (Bicknell)—১৮৬২ খৃঃ মক্কা দর্শন করেন। তিনি বলেন যে মক্কা দর্শন করিতে হইলে সম্পূর্ণভাবে—অন্ততঃ বাহ্যতঃ—মুসলমান হইতে হয় এবং একটী আরবী নাম গ্রহণ করিতে হয়। বিকনেল আরও বলেন যে তাহার মক্কা দর্শনের দুই বৎসর পূর্ব্বে জনৈক ইহুদীকে 'কলমা' অথবা ইসলামধর্ম্মের বীজমন্ত্র ("লা ইলাহা ইল্লা' ল্লা ওয়া মহম্মদ রসুলু 'ল্লা"—আল্লা ভিন্ন ঈশ্বর নাই এবং মহম্মদ আল্লার দুত বা বার্ত্তাবহ) উচ্চারণ করিতে আদেশ করা হইয়াছিল। সে তাহাতে অসম্মতি প্রকাশ করিলে মক্কাবাসিগণ তাহাকে ক্রুশে বধ করিয়াছিল।

পলগ্রেভ (Palgrave) বলেন যে, যদি একজন ইংরাজ মুসলমানধর্ম্মের রীতি, নীতি, প্রার্থনা প্রভৃতি সম্যক অবগত থাকে ও ইসলামধর্ম্মপরায়ণতার উপযুক্ত নিদর্শন দেখাইতে পারে এবং কাইরোস্থিত (Cairo) ইংরাজ শাসনকর্ত্তা (Consul) হইতে 'আমিরুল হাজের' নিকট পরিচয়পত্র লইয়া যায়, তবে তাহার কোন বিপদের আশঙ্কা নাই। তাহা হইলেও তাহাকে মুসলমান সাজিতে হয়।

বার্টন (Burton) তাঁহার ভ্রমণ কাহিনীতে বলেন দরবেশ সাজা সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ; কারণ দরবেশ-

দিগের নানা বিষয়েই বিশেষ স্বাধীনতা আছে। তাঁহারা ব্যক্তি বিশেষের প্রতি সম্মান প্রদর্শন না করিলে, এমন কি ঈশ্বরের উপাসনা না করিলেও কেহ তাঁহাদিগকে কিছু বলিতে পারে না। §

এইরূপ বাধা বিঘ্ন সত্বেও মক্কার কর্ত্তৃপক্ষগণকে প্রতারিত করিয়া অনেক ইয়ুরোপীয় পর্য্যটক মক্কা দর্শন করিতে সক্ষম হইয়াছেন। তাঁহাদিগের ভ্রমণ কাহিনী পাঠে আমরা কাবার ইতিহাস ও কাবামন্দিরের অনুষ্ঠিত ক্রিয়াদির বিবরণ সবিশেষ অবগত হইতে পারি। নিম্নে কয়েকজন ইয়ুরোপীয় পর্য্যটকের মক্কা দর্শন কাহিনী সংক্ষেপে বর্ণিত হইল।

ইয়ুরোপীয় পর্য্যটকগণের মধ্যে রোমনিবাসী লুইস্ বার্টেমা (Lewis Bartema) সর্ব্বপ্রথম মক্কা ও মদিনা দর্শন করেন। ১৫০৩ খৃঃ তিনি ভেনিস্ (Venice) হইতে জাহাজে আরোহণ করিয়া আলেকজেন্দ্রিয়া (Alexandria) পৌহুছেন এবং তথা হইতে ট্রিপলি, (Tripoli), এণ্টিয়ক (Antioch) প্রভৃতি স্থানে গমন করেন। ঐ বৎসর ৮ই এপ্রিল তারিখে দামাস্কাস (Damascus) হইতে যাত্রীদলের সহিত তিনি ছদ্মবেশে মদিনা যাত্রা করেন। প্রথম মদিনা এবং তৎপর মক্কার ধর্ম্ম ক্রিয়াদি (বাহ্যতঃ) সম্পন্ন করিয়া তিনি জিড্ডাপথে (Jidda) লোহিত সাগরোপকূলে পলায়ন করেন এবং পারস্যদেশে যাইবার জন্য জাহাজে আরোহণ করেন। এডেন (Aden) বন্দরে আসিয়া তিনি ধৃত হইলেন এবং মুক্তি লাভের পূর্ব্বে আরও অনেক স্থান দর্শন করেন, তন্মধ্যে যমানের (Yaman) রাজধানী পুরাতন প্রসিদ্ধ সানা (Sanna) নগরী বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। অবশেষে তিনি বাতুলতার ভাণ করিয়া § মুক্তি লাভ করিয়াছিলেন এবং অনেক আপদ বিপদের মধ্যদিয়া পারস্য হইতে পূর্ব্বাভিমুখে যাইতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

১৫১১ খৃঃ অব্দে বারমেটার ভ্রমণ কাহিনী লাটিন ভাষায় মিলেন (Milan) হইতে প্রকাশিত হয় এবং ঐ গ্রন্থ ১৫৫৫ খৃঃ অব্দে ইংরাজি ভাষায় প্রথম অনূদিত হয়। পরবর্ত্তী পর্য্যটকেরা বার্টেমার কাহিনীতে অনেক ভুল ভ্রান্তি নির্দেশ করিয়াছেন কিন্তু তিনি ইয়ুরোপীয়গণের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম মক্কা দর্শন করিয়াছেন বলিয়া বিশেষ সম্মানার্হ।

বার্টেমার পর এক্সিটার বাসী (Exeter) যোসেফ পিট্‌স (Joseph Pitts) নামক জনৈক ইংরাজ ইসলামের ঐ পবিত্র নগর গুলি দর্শন করেন। ইংরাজ পর্য্যটক-দিগের মধ্যে তিনিই প্রথম মক্কাগমন করেন।

তাঁহার জীবনের ইতিহাস বিচিত্র ঘটনাবলীতে পরিপূর্ণ। ১৬৭৮ খৃঃ অব্দে পনর বৎসর বয়ঃক্রম কালে তিনি নাবিকরূপে বিদেশ ভ্রমণেচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া স্বদেশ ও পিতামাতা পরিত্যাগ করতঃ টপ্‌সাম (Topsham) নামক স্থানে জাহাজে আরোহণ করেন। এবং পথিমধ্যে আল্‌জিয়ার্স (Algiers) বাসী জনৈক জলদস্যুর হস্তে বন্দী হইয়া এল্‌জিয়ার্স নগরে নীত হন। ঐ জলদস্যু অতি কঠোর প্রকৃতির লোক ছিল। সে বালক পিট্‌সকে

---

§ "No character in the Moslem world is so proper for disguise as that of the Dervish. It is assumed by all ranks, ages and creeds ; by the nobleman who has been disgraced at court and by the peasant who is too idle to till the ground ; by Dives who is weary of life, and by Lazarus who begs bread from door to door. Further the Dervish [illegible] ignore ceremony and politeness, as one who ceases to appear upon the stage of life ; he may pray or may not, marry or remain single as he pleases, be respectable in cloth of frieze as in cloth of gold and no one asks him the chastered vagabond—Why he comes here? or—Wherefore he goes there? He may wend his way on foot alone, or ride his Arab steed followed by a dozen servants ; he is equally feared without weapons as swaggering through the streets armed to the teeth. The more haughty and offensive he is to the people, the more they respect him—a decided advantage to the traveller of choleric temperament." Burton Pilgrimage to El Medinah and Meccah. Vol. I, Chapter I.

§ এই বাতুলতার ভাণ সম্বন্ধে বার্টন তাঁহার ভ্রমণ কাহিনীতে বলেন—"In the hour of imminent danger, he (the tourist) is only to become a maniac and he is safe ; a madman in the East, like a notably eccentric charcter in the West, is allowed to say or do whatever the spirit directs." Burton. "Personal Narrative of a Pilgrimage to El Medinah and Meccah." Chapter I.

বল প্রয়োগ দ্বারা ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণে বাধ্য করে। পিট্‌স বলেন তিনি নিভৃতে বাইবেল পাঠ করিতেন এবং মুসলমানের অখাদ্য শূকরের মাংস ভক্ষণ করিতেন ; তবে প্রাণ ভয়ে তাঁহাকে অবশ্য মুসলমানের ন্যায় চলিতে হইত। তিনি তিনবার দাস রূপে বিক্রীত হইয়াছিলেন। এইরূপ অবস্থায় প্রায় পনর বৎসর কাটিয়া যায়। অবশেষে তাঁহার তৃতীয় প্রভু ওমর নামক জনৈক ব্যক্তি তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া মক্কা যাত্রা করেন। তাঁহারা এলেকজেন্দ্রিয়া (Alexandria), রোসেটা (Rosetta) কাইরো (Cairo) প্রভৃতি স্থান দর্শন করিয়া সমুদ্র পথে জিড্ডায় (Jidda) পৌছেন। এল্‌জিয়ার্সে অবস্থিতি সময়ে পিট্‌স আরবী ও তুর্কী ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। সেই হেতু তিনি সহজে মুসলমানদিগের আচার পদ্ধতি সকল সম্যকরূপে অবগত হইতে পারিয়াছিলেন। তিনি চারিমাস কাল মক্কায় অবস্থান করেন। রমজানের মাস তিনি তথায় অতিবাহিত করেন সুতরাং নিশ্চয়ই তিনি ঐ মহোৎসবের আড়ম্বর প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। ইসলাম ধর্ম্মাবলম্বীদিগের একটী নিয়ম আছে যে যদি কোন মুসলমানেতর ক্রীতদাস মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন করে, তাহা হইলে তাহাকে মুক্তি প্রদান করিতে হইবে। এই নিয়মানুসারে পিট্‌সের প্রভু পুণ্য অর্জ্জনেচ্ছায় তাহাকে এক মুক্তি পত্র লিখিয়া দেন। পিট্‌স তখন বিরহ সন্তপ্ত জনক জননীর নিকট প্রত্যাবর্ত্তন করিতে অতিশয় ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। ঘটনাচক্রে তিনি এল্‌জিয়ার্সে পৌছিলে তত্রস্থ ইংরাজ শাসনকর্ত্তা (Consul) মিঃ বেকার (Mr Baker) তাঁহার প্রতি দয়া প্রকাশ পূর্ব্বক স্মার্নার (Smyrna) ইংরাজ কনসাল (Consul) মিঃ রের (Mr. Raye) নিকট এক পরিচয় পত্রসহ তাঁহাকে প্রেরণ করেন এবং যাহাতে তিনি স্বদেশে পৌছিতে পারেন তদ্বিষয়ে সাহায্য করিবার জন্য মিঃ রেকে বিশেষ অনুরোধ করেন। অশেষবিধ বাধা বিপত্তি অতিক্রম করিয়া পিট্‌স স্মার্ণা পৌছিলেন এবং কর্ণওয়াল (Cornwall) বাসী মিঃ ইলিয়ট (Mr Eliot) নামক জনৈক ইংরাজ বণিকের শরণাগত হইলেন। মিঃ ইলিয়ট কৃপা পূর্ব্বক নিজে ভাড়ার অর্থ প্রদান করিয়া পিটসকে এক ফরাসী জাহাজে লেগ্‌হরণে (Leghorn) পাঠাইয়া দিলেন। তথা হইতে তিনি ইতালী, জার্ম্মানী, এবং হল্যাণ্ড পরিভ্রমণ করিয়া দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। কিন্তু যে রাত্রিতে তিনি ইংলণ্ডে পৌছেন সেই রাত্রিতেই তিনি রাজ কার্য্যের নিমিত্ত ধৃত হইলেন এবং অনেক অনুনয় ও অশ্রুমোচন সত্ত্বেও তাঁহাকে কয়েকদিন কল্‌চেষ্টার (Colchestor) কারাগারে যাপন করিতে হইল। শেষে তাহাকে ড্রেডনট (Dreadnought) নামক রণপোতে প্রেরণ করা হয়। সৌভাগ্যবশতঃ সার উইলিয়াম ফকনার (Sr. William Faulkner) নামক জনৈক বিশিষ্ট ভদ্র লোকের কৃপায় অবশেষে তিনি মুক্তি লাভ করেন। তিনি স্বগৃহে ফিরিয়া পিতার সাক্ষাৎ পাইলেন বটে কিন্তু তাঁহার জননী এক বৎসর পূর্ব্বেই ইহলোক হইতে চলিয়া গিয়াছিলেন।

পিটস তাঁহার ভ্রমণ কাহিনীতে মক্কা দর্শনের তারিখ সম্বন্ধে কিছুই লিখেন নাই। কিন্তু তিনি বলেন যে ইংলণ্ড পরিত্যাগের পর প্রায় পনর বৎসর ক্রীতদাসের জীবন অতিবাহিত করেন এবং তৎপর তাহার প্রভুর সহিত মক্কা দর্শন করেন। ইহা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে যে তিনি সম্ভবতঃ ১৬৯৩ খৃঃ অব্দে মক্কা দর্শন করেন।

তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্ত ১৭০৯ খৃঃ ক্ষুদ্র গ্রন্থাকারে § প্রকাশিত হয়। তিনি এই ভ্রমণ কাহিনী স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনের বহুকাল পরে লিখেন। এ বিষয়ে স্মৃতিই তাঁহার প্রধান সহায় ছিল। ক্ষুদ্র হইলেও তাঁহার গ্রন্থ বিশেষ চিত্তাকর্ষক।

পিটসের পর বদিয়াইলেব্‌লিচ (Badi'a-y-leblich) নামক জনৈক কেটেলোনিয়াবাসী মক্কা দর্শন করেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে মুসলমান ব্যতীত অন্য কোন

§ এই গ্রন্থের নাম—"A faithful Account of the Religion and Manners of the Mahometans, in which is a Particular Relation of their Pilgrimage to Mecca, the place of Mahomet's birth and Description of Medinah and of his tomb there." নামটি অতি বড়—তৎকালে গ্রন্থাদির নাম প্রায় এই প্রকার বড়ই থাকিত।

ব্যক্তি অজ্ঞাত ভাবে ইসলামের পবিত্র নগরগুলি দর্শন করিতে ইচ্ছুক হইলে তাহাকে একটী আরবী নাম গ্রহণ করিতে হইত। ইহা শুদ্ধ মুসলমান সাজিবার জন্য। এই পর্য্যটক আলি বে (Ali Bay) নামে সুপ্রসিদ্ধ। তাহার জন্মস্থান সম্বন্ধে মতভেদ আছে—কেহ বলেন তিনি ১৭৬৬ খৃঃ এপ্রিল মাসে বিস্কে (Biscay) নগরে জন্মগ্রহণ করেন, কেহ বলেন তিনি ১৭৬৭খৃঃ বারসিলোনা (Barcelona) নগরে জন্মগ্রহণ করেন।

ভেলেনসিয়াতে (Valencia) তিনি সামান্যভাবে বিদ্যালাভ করেন। মাতৃভাষা (স্পেনদেশীয় ভাষা) ব্যতীত তিনি কিঞ্চিৎ ফরাসী ও ইতালীয় ভাষা এবং অত্যল্প পরিমাণে আরবী ভাষা জানিতেন। বিদ্যা সমাপন করিয়া তিনি তাহার দেশীয় সরকারের অধীনে কর্ম্ম গ্রহণ করেন। ইতিমধ্যে তাহার ভ্রমণেচ্ছা অত্যন্ত বলবতী হইয়া উঠে এবং অবশেষে তিনি এসিয়া, এফ্রিকা এবং বিশেষতঃ ভূমধ্যসাগরোপকূলবর্ত্তী মুসলমানাধিকৃত দেশ সমূহ দর্শন করিতে সংকল্প করেন। তদনুসারে ১৭৯৭ খৃঃ সরকারী চাকুরী পরিত্যাগ করিয়া ভ্রমণ বিষয়ক আয়োজন করিবার নিমিত্ত তিনি রাজধানী মেড্রিড (Madrid) যাত্রা করেন। তথায় রাজা তাহাকে সাহায্য দানে স্বীকৃত হইলে তিনি ১৮০২ খৃঃ অব্দে লণ্ডনে পৌছেন। রাজনীতি ও বাণিজ্য বিষয়ে কিছু জ্ঞানার্জ্জন তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। ইংলণ্ডে অবস্থিতি সময়ে তিনি মুসলমানাধিকৃত দেশ সমূহের আচার ব্যবহার রীতি নীতি সম্যক অবগত হইতে বিশেষ চেষ্টা করেন। বর্ত্তমান সময়ে অনেকেই মনে করেন তিনি স্পেনরাজের প্রতিনিধি স্বরূপ নানা দেশ ভ্রমণ করিয়াছিলেন কারণ তিনি অত্যন্ত আড়ম্বরের সহিত এবং সরকার হইতে বিশেষ পরিচয়পত্র সহ ভ্রমণে বহির্গত হইয়াছিলেন। খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী বিদেশীর পক্ষে মুসলমান রাজ্যে বিচরণ করা কোনমতেই নিরাপদ নহে বিধায় তিনি নিজের নামকরণ করিলেন "আলি বে-অল-আব্বাসি" (Ali Bey-al Abbasi)। কলমাও আবৃত্তি করিলেন। তাহার আকৃতিও ছদ্মবেশের অনুকূল ছিল, তাহাকে ঠিক মুসলমানের ন্যায় দেখাইত। সুতরাং তাহার আর কোনও ভয়ের কারণ ছিল না।

১৮০০ খৃঃ অব্দে তিনি স্পেন হইতে মরক্কো (Morocco) যাত্রা করিলেন এবং প্রকাশ করিলেন যে তাঁহার পিতা মাতা টুনিস (Tunis) নিবাসী, তাঁহারা সম্প্রতি স্পেন (Spain) এ অবস্থান করিতেছেন। তথায় তিনি বেশ আড়ম্বরের সহিত বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার আড়ম্বর দেখিয়া মরক্কোর সম্রাট্ তাঁহাকে নিজ দরবারে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। মরক্কোতে দুই বৎসর অবস্থান করিয়া তিনি ১৮০৫ খৃঃ মক্কা যাত্রা করেন। পথিমধ্যে ট্রিপলি (Tripoli), সাইপ্রাস (Cyprus) প্রভৃতি স্থান দর্শন করিয়া অবশেষে এলেকজেন্দ্রিয়া (Alexandria) হইতে কাইরো, (Cairo) কাইরো হইতে সুয়েজ (Suez) এবং তথা হইতে জিড্ডা (Jidda) গমন করিয়া ১৮০৭ খৃঃ অব্দে জানুয়ারী মাসে তিনি মক্কা পৌছেন।

তিনি কিছুকাল মক্কায় অবস্থান করিয়া অন্যান্য যাত্রীদিগের ন্যায় বিবিধ ক্রিয়াদি সমাপন করিলেন, তৎপর জুন মাসে কাইরো প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। অতঃপর পেলেসটাইন (Palestine) সিরিয়া (Syria) দমাশকাস্ (Damascus) ও অন্যান্য নগর দর্শন করিয়া শেষে আলেপ্পোতে (Aleppo) কিছুকাল বিশ্রাম জন্য বাস করিতে থাকেন। এই স্থানে কোন কোন ব্যক্তি তাঁহাকে খ্রীষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া সন্দেহ করিয়াছিল বটে। কিন্তু তিনি নানা কৌশলে সেই সন্দেহ দূরীভূত করেন। বার্কহার্ডট (Burk-hardt) বলেন সাত বৎসর পর যখন তিনি আলেপ্পোতে গমন করেন তখনও লোকে আলিবের কথা লইয়া আলোচনা করিত।

স্বদেশে ফিরিয়া তিনি নেপোলিয়নের (Napoleon) পক্ষ অবলম্বন করেন এবং ১৮০৯ খৃঃ সেগোভিয়ার (Sagovia) অধ্যক্ষ এবং কারডোভার (Cardova) শাসনকর্ত্তার পদে নিযুক্ত হন। ১৮১৩ খৃঃ অব্দে যখন ফরাসীরা স্পেন হইতে বিতাড়িত হইল, তখন তাঁহাকেও স্পেন পরিত্যাগ করিতে হয় এবং তদবধি তিনি পারিতে

§ এই স্থলে "Life of Finati" প্রণেতা Bankes এর মত গৃহীত হইল।

(Paris) বাস করিতে থাকেন। তথায় তাঁহার ভ্রমণ কাহিনী § ১৮১৪ খৃঃ ফরাসী ভাষায় প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৮১৪ খৃঃ তিনি ইংলণ্ড গমন করেন এবং সেই বৎসরই তাহার গ্রন্থের ইংরাজি অনুবাদ প্রকাশিত হয়। ক্রমে তাহা প্রায় সমুদায় ইয়ুরোপীয় ভাষাতেই অনুবাদিত হয়।

চারি বৎসর পর তিনি পুনর্ব্বার সিরিয়া যাত্রা করেন। কিন্তু এইবার তিনি অন্যনাম গ্রহণ করিলেন। তিনি 'আলি উথমান' (Ali Uthman) নাম রাখিয়া নিজকে ফরাসী গভর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি (Political agent) বলিয়া প্রকাশ করিলেন। কিন্তু এলেপ্পো পৌঁছিবার অল্প কিছুকাল পরেই ১৮১৮ খৃঃ ৩০ আগষ্ট হঠাৎ তাঁহার মৃত্যু হয়। বিষ প্রয়োগে তাঁহার মৃত্যু ঘটিয়াছিল বলিয়াই অনেকে সন্দেহ করেন।

তাহার ভ্রমণবৃত্তান্ত পাঠে আমরা কাবার অনুষ্ঠিত ক্রিয়াদির বিষয় বিশেষরূপে অবগত হইতে পারি। যদিও কোন কোন অংশে তাঁহার বর্ণনা ভ্রমাত্মক, তথাপি স্থূলতঃ তাহার গ্রন্থে তিনি ইসলামের পবিত্র স্থান সকলের এক একটি সুস্পষ্ট ও চিত্তাকর্ষক চিত্র অঙ্কিত করিতে সক্ষম হইয়াছেন।

আলির পর বার্কহার্ডট (Burkhardt) ওরফে সেখ ইব্রাহিম, ইতালী বাসী ফিনেটী (১) (Finati) ওরফে হাজি মহম্মদ, বার্টন (Burton) ওরফে সেখ আবদুল্লা, বিক্নেল (২) (Bicknell) ওরফে আবুল ওয়াহিদ, কিন (৩) (Keane) ওরফে মহম্মদ আমিন প্রভৃতি পর্য্যটকগণ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে মক্কা দর্শন করেন। তন্মধ্যে বার্কহার্ডট এবং বার্টনের কাহিনী বিশেষ উল্লেখ যোগ্য ; তাঁহাদের ভ্রমণ বৃত্তান্ত সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

সুইজারল্যাণ্ডের (Switzerland) অন্তঃপাতী লউসান (Lausanne) নামক স্থানে ১৭৮৪ খৃঃ ২৪শে নভেম্বর তারিখে বার্কহার্ডট জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা সেনা বিভাগে চাকরী করিতেন। নিউফসেটেল (Neufchatel) নামক স্থানে প্রাথমিক গ্রীক ও লাটিন শিক্ষা সমাপন করিয়া ১৮০০ খৃঃ অব্দে তিনি লিপ্‌জিগ্ (Leipzig) বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন এবং তথায় দুই বৎসর অবস্থান করেন। তৎপর গটিন্‌জেনে (Gottingen) তাহার বিদ্যাশিক্ষা সমাপ্ত করেন। তথায় তিনি প্রসিদ্ধ অধ্যাপক ব্লুমেনাবকের (Blumenbach) প্রিয় ছাত্র ছিলেন। সেস্থান হইতে যখন ১৮০৬ খৃঃ অব্দে তিনি অধিকতর বিদ্যালাভ জন্য ইংলণ্ডে যাত্রা করেন, তখন তাঁহার অধ্যাপক তাহাকে 'আফ্রিকা আবিষ্কার সমিতি'র (African Exploration Society) জনৈক বিশিষ্ট সভ্য সার জোসেফ্ ব্যাঙ্কস্ (Sir Joseph Banks) মহোদয়ের নিকট এক পরিচয় পত্র প্রদান করেন। বার্কহার্ডট স্বভাবতঃই ভ্রমণপ্রিয় ছিলেন। ১৮০৮ খৃঃ তিনি পূর্ব্বোক্ত সমিতির কার্য্য গ্রহণ করিলেন। ইতি মধ্যে তিনি লণ্ডন ও কেম্‌ব্রিজে রসায়ন, ধাতুবিদ্যা, চিকিৎসা, জ্যোতিষ প্রভৃতি বিষয়ে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। কেম্‌ব্রিজে তিনি আরবী ভাষা লিখিতে, পড়িতে ও বলিতে শিখেন এবং প্রাচ্য আচার ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে অনুকরণ করিলেন। ভ্রমণের সুবিধার জন্য তিনি সকল প্রকার আয়োজন করিলেন।

১৮০৯ খৃঃ অব্দের জানুয়ারী মাসে তিনি সমিতি কর্তৃক সিরিয়া যাইয়া আরবী এবং অন্যান্য প্রাচ্য ভাষায় বিশেষ বুৎপত্তি লাভ করিতে আদিষ্ট হইলেন। ইহার পর তাঁহাদিগকে কাইরো (Cairo), মুন জুক্ (Mun Zuk), সাহারা সুদন (Sudan) প্রভৃতি হইয়া নাইগার (Nigar) নদের উৎপত্তিস্থান আবিষ্কার করিতে হইবে, এইরূপ আদিষ্ট হইয়া তিনি ১৮০৯ খৃঃ

---

§ এই গ্রন্থের নাম—"Voyages d Ali Bei en Afrique et en Asie pendent les Annees 1803 a 1807."

(১) তাঁহার ভ্রমণ কাহিনী প্রথম ইতালীয় ভাষায় লিখিত হয়। ১৮২৮ খৃঃ মিঃ উইলিয়াম জন ব্যাঙ্কস্ (Mr. William John Bankes) দ্বারা ইংরাজি ভাষায় অনুবাদিত হয় এবং ১৮২০ খৃঃ প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থের নাম—"Narrative of the Life and Adventures of Giovanni Finati."

(২) বিকনেল ১৮৬২ খৃঃ মক্কা দর্শন করেন।

(৩) মিঃ এফ্, জে, কিন (Mr. F. J. Keane) তাহার ভ্রমণ বৃত্তান্ত ১৮৮১ খৃঃ প্রকাশিত করেন। গ্রন্থের নাম—("Six Months in Meccah"

অব্দে ইংলণ্ড পরিত্যাগ করেন এবং ঐ বৎসর এপ্রিল মাসে মল্টা (Malta) পৌঁছিয়া অক্টোবর মাসে এলেপ্পো (Aleppo) গমন করেন। বলা বাহুল্য যে তিনি তাঁহার উদ্দেশ্য সাধনসৌকর্য্যার্থে এই সময় আত্মগোপন করিয়া নিজকে সেখ ইব্রাহিম নামে পরিচয় প্রদান করিতেন।

সিরিয়ায় তিনি দীর্ঘকাল অবস্থান করেন এবং সেই সময়ে দামাসকাস (Damascus) লেবানন (Lebanon) প্রভৃতি দর্শনযোগ্য অনেক স্থানে ভ্রমণ করেন। ইহার ফলে তিনি আরবী ভাষায় এরূপ ব্যুৎপত্তি লাভ করিলেন এবং তদ্দেশবাসী লোকদিগের আচার ব্যবহার এরূপ ভাবে অবগত হইলেন যে তাঁহাকে খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া সন্দেহ করা অসম্ভব হইল। কথিত আছে কোন এক সময়ে তিনি প্রকৃত মুসলমান কি না এই সম্বন্ধে কাহারও কাহারও সন্দেহ উপস্থিত হয় এবং তাহা নিরাকরণার্থে তাঁহাকে ইসলাম ধর্ম্ম সম্বন্ধে বিবিধ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়। তাহার প্রদত্ত উত্তরগুলি মুসলমানধর্ম্মের গূঢ়-তত্ত্বাবগতির এতদূর পরিচায়ক হইয়াছিল যে প্রশ্ন কর্ত্তারা একবাক্যে তাঁহাকে একজন খাঁটি মুসলমান এবং আইন কানুনে একজন বিশেষজ্ঞ বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়া ছিলেন।

কোন যাত্রিদলের সহিত ফেজান (Fezzan) যাইবার উদ্দেশ্যে তিনি অল্পদিনের মধ্যেই কাইরো যাত্রা করেন এবং ১৮১২ খৃঃ সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম ভাগে কাইরো পৌঁছেন। শীঘ্র কোন যাত্রাদলের আগমনের সম্ভাবনা না দেখিয়া তিনি মাহাস (Mahass) যাত্রা করেন। তথায় তাহার মনে হইল, যদি তিনি মক্কা যাইয়া "হাজি" উপাধি লইয়া ফিরিতে পারেন, তাহা হইলে যে কার্য্যে তিনি তাঁহার সমিতি কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াছেন, তাহার বিশেষ সুবিধা হইবে। তদনুসারে তিনি এক দরিদ্র সিরিয়াবাসী বণিকের বেশে মাহাস হইতে যাত্রা করেন এবং নিউবিয়ার মরুভূমি অতিক্রম করিয়া বারবার (Berber) এবং সেণ্ডি (Shendy) হইয়া লোহিত সাগরের পশ্চিমোপকূলবর্ত্তী সুয়াকিন (Suakin) পৌঁছেন। তথা হইতে জাহাজে আরোহণ করিয়া ১৮১৪ খৃঃ অব্দে ১৮ই জুলাই তারিখে জিড্ডায় উপনীত হন।

তিনি একবারে মক্কা না যাইয়া টইফ্ (Taif) অভিমুখে যাত্রা করিলেন। টইফ্ স্থলপথে জিড্ডা হইতে প্রায় পাঁচ দিনের পথ। তথায় মহম্মদ আলির সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। মহম্মদ আলি হিজাডা (মক্কা মদিনা প্রভৃতি স্থান ইহার অন্তর্গত) অধিকার করিয়া তখন ওহাবিদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আয়োজন করিতে ছিলেন। কিছুকাল টইফে অবস্থান করিয়া তিনি মুসলমান যাত্রীর বেশে ১৮১৪ খৃঃ ২৫শে নভেম্বর মক্কা যাত্রা করেন। প্রায় চারি মাস তিনি মক্কা, টইফ্ প্রভৃতি স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইয়া এবং ১৮১৫ খৃঃ অব্দে জানুয়ারী মাসে মদিনা দর্শন করেন। সেই সময়ে মদিনা সম্বন্ধে ইয়ুরোপীয়দিগের জ্ঞান অতি অল্পই ছিল। মক্কা সম্বন্ধে তাহারা যৎকিঞ্চিৎ জানিতেন কিন্তু মদিনা সম্বন্ধে একপ্রকার সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মদিনায় অবস্থিতি কালে তিনি অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়েন। শেষে আরোগ্য লাভ করিয়া ১৮১৫ খৃঃ অব্দ জুন মাসে সুয়েজ পথে কাইরো প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ১৮১৬ খৃঃ অব্দে বসন্তকালে তিনি সিনাই পর্ব্বত (Mt. Sinai) ও অন্যান্য স্থান দর্শন করেন এবং তাঁহার পূর্ব্বসঙ্কল্পিত ভ্রমণের সুযোগ অন্বেষণ করিতে থাকেন। এই স্থানে অক্টোবর মাসের প্রথম ভাগে তিনি আমাশয় রোগে আক্রান্ত হইয়া ঐ মাসের ১৫ই কি ১৭ই তারিখ রাত্রিতে দেহত্যাগ করেন। মুসলমান রীত্যনুসারে তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

তাঁহার মৃত্যুর পর ১৮২৯ খৃঃ অব্দে তাঁহার ভ্রমণ-কাহিনী "আরবে ভ্রমণ" (Travels in Arabia) নামে ইংরাজি ভাষায় প্রকাশিত হয়। তৎপর এই গ্রন্থ ফরাসী ভাষায়ও অনূদিত হইয়াছে।

শৈশবাবধি তিনি অত্যন্ত ভ্রমণপ্রিয় ছিলেন। সকল বিষয়েই তাঁহার দৃষ্টি ছিল। তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্তে তাঁহার সত্যপ্রিয়তা ও সূক্ষ্মদৃষ্টি বিশেষরূপে পরিস্ফুট হইয়াছে। তিনি বহুদেশ পর্য্যটন করিয়াছিলেন এবং সেই সকল দেশের আচারপদ্ধতি রীতি নীতি, ধর্ম্ম বাণিজ্য, ভাষা,

ইতিহাস—সকল বিষয় সুচারুরূপে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মক্কা ও তথায় অনুষ্ঠিত ক্রিয়াদির বর্ণনা বিশেষ উল্লেখ যোগ্য।

বার্টন (Burton) গলওয়েতে (Galway) ১৮২১ খৃঃ জন্মগ্রহণ করেন। ধর্ম্মযাজকের ব্যবসায় অবলম্বন করা তাঁহার আত্মীয়গণের অভিপ্রেত ছিল এবং তদনুসারে তাঁহাকে অক্সফোর্ড (Oxford) প্রেরণ করা হয়। কিন্তু তাহার সৈনিক বিভাগে প্রবেশ করিতে অত্যন্ত ইচ্ছা থাকায় সেই ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া তিনি ১৮৪২ খৃঃ অব্দে সৈনিক বিভাগে কর্ম্মগ্রহণ করিয়া ভারতে আগমন করেন। এখানে অবস্থান কালে তাহার মক্কা ও মদিনা দর্শনের ইচ্ছা অত্যধিক বলবতী হইয়া উঠে। ১৮৫৩ খৃঃ অব্দে তিনি কিছু দিনের জন্য অবকাশ গ্রহণ করেন।

দেশে প্রত্যাগমন করিয়া তিনি লণ্ডনের Royal Geographical Society'র ব্যয়ে মুসলমান রাজপুত্রের বেশে মিসরে আগমন করেন এবং 'মিরজা' উপাধি গ্রহণ করিয়া নিজকে "সেখ আবদুল্লা" নামে পরিচিত করিতে থাকেন। তিনি কেবল নাম পরিবর্ত্তন করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন না। পাঠান বংশীয় ভারতবাসী বলিয়াও তিনি নিজকে পরিচিত করিলেন। পারস্য, হিন্দুস্থানী এবং আরবী ভাষা তিনি বিশেষরূপে আয়ত্ত করিয়াছিলেন। মক্কা পৌছিয়া তিনি সুন্নিসম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলেন। কাইরো হইতে মক্কা যাত্রা কালে কিছু চিকিৎসা বিদ্যা জানেন ইহাও প্রকাশ করেন এবং "হাকিম আবদুল" (Dr. Abdul) নাম গ্রহণ করেন।

বার্টনের ভ্রমণ বৃত্তান্ত ১৮৫৫ খৃঃ প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থের নাম—"Personal Narrative of a Pilgrimage to EL Medinah and Meccah." ইহাতে মানচিত্র ও অন্যান্য চিত্রাদি সন্নিবিষ্ট থাকায়—বিশেষ চিত্তাকর্ষক হইয়াছে।

আরও অনেকে ইসলামের পবিত্র স্থান সমূহ দর্শন করিয়াছেন ও করিবেন .কিন্তু আলিবে, বার্কহার্ডট ও বার্টন ঐ সম্বন্ধে যাহা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া-গিয়াছেন, তদপেক্ষা অধিক বলিবার বিষয় অতি অল্পই আছে।

শ্রীপদ্মিনীভূষণ রুদ্র।

হৃদয়-নদী

হৃদয় আমার নদীর প্রায়
নাচিয়া গাইয়া সাগরে ধায়।
তপন শশীর তারার করে
মেদুর মেদুর বায়ুর ভরে
আকুল আবেগে পুলকে হায়,
হৃদয় আমার সাগরে ধায়!
সরস শ্যামল করিয়ে ভবে
তুষিয়ে সাদরে তৃষিত সবে
সকল বিঘ্ন দলিয়ে পায়,
হৃদয় আমার সাগরে ধায়!
কখন মোহন উদার স্বরে
বাজিল বাঁশরী মরম-পুরে
আপনা হারায়ে মিশিতে তায়,
হৃদয় আমার সাগরে ধায়!

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

বৈজ্ঞানিক কথা।

১। মনোরোগের নূতন চিকিৎসা।

Psych-analysis নামে একটি নূতন ব্যাপার আধুনিক চিকিৎসা-বিজ্ঞান ও মনস্তত্ত্বে স্থান পাইয়াছে। মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তির নিকট হইতে কৌশলে মনের কথা জানিয়া ব্যাধির প্রতিকার করা এই শাখা-বিজ্ঞানের লক্ষ্য। এমন অনেক মানসিক রোগ আছে, যাহার লক্ষণ রোগী চিকিৎসকের নিকটেও প্রকাশ করিতে কুণ্ঠা বোধ করে, কখন কখন হয় ত নানা

পারিবারিক গোপনীয় ব্যাপার পীড়ার মূলে বর্ত্তমান থাকে। সাধারণ রোগী এই সকল কথা চিকিৎসকের নিকট বলিতে চায় না, এবং রোগের মূল কোথায় তাহাও বুঝিতে পারে না, কাজেই রোগের প্রতিকার হয় না। এই সঙ্কটে নূতন চিকিৎসা-পদ্ধতির সাহায্যে নানা সুফল পাওয়া যাইতেছে।

অষ্ট্রিয়াবাসী ডাক্তার ফ্রয়েড্ (Freud) এই নূতন চিকিৎসা-পদ্ধতির প্রতিষ্ঠাপয়িতা। কিন্তু ইনি এটিকে ব্যবহারোপযোগী করিয়া গড়িতে পারেন নাই। ডাক্তার জঙ্ (Jung) নামক জনৈক জর্ম্মান্ চিকিৎসক কয়েক বৎসর পরিশ্রম করিয়া নূতন শাস্ত্রটিকে মূর্ত্তিমান করিয়া তুলিয়াছেন। আজকাল জর্ম্মানিতে এই প্রথায় চিকিৎসা করিয়া নানা সুফল পাওয়া যাইতেছে।

মনে করা যাউক যেন কোন রোগী ডাক্তারের নিকট আসিয়া বলিল, তাহার ঘাম হইতেছে না। ঘাম না হইলে মানুষ মারা যায়, মৃত্যুভয়ে তার কাজ কর্ম্ম বন্ধ। ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া তাহার দেহের কোন যন্ত্রকেই বিকল দেখিলেন না। রোগীকে বুঝাইলেন রোগটা কাল্পনিক, কিন্তু সে বুঝিয়াও অলীক ভয় ত্যাগ করিতে পারিল না। আর একটি শুচিবায়ুগ্রস্ত রোগী আসিয়া বলিল, মনে হইতেছে তাহার দেহটা যেন সর্ব্বদাই কলুষপূর্ণ। ডাক্তার তাহাকে খুবই বুঝাইলেন, এবং অশুচিতার আশঙ্কা যে সম্পূর্ণ কাল্পনিক তাহাও সে বুঝিল, কিন্তু তাহার সেই কলুষ-বিভীষিকা গেল না। মনে এক কোণে রোগীর অলক্ষ্যে যে একটা মিথ্যা ভাব বা সংস্কার চাপা পড়িয়া আছে তাহা আবিষ্কার করিয়া দূর করিতে না পারিলে, এই শ্রেণীর রোগীকে নীরোগ করিতে পারা যায় না।

সাধারণ চিকিৎসক দীর্ঘকাল রোগীকে নিকটে রাখিয়া পরীক্ষা করেন এবং তারপর যে ভাব বা চিন্তা বিভীষিকা উৎপন্ন করে তাহার অমূলকতা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু এই পরীক্ষায় ব্যাধির মূল খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, রোগীর বাহ্য অনুষ্ঠান ও চলা ফেরা কথাবার্ত্তায় মূল ব্যাপারটা এমন ঢাকা থাকে যে, রোগী বা চিকিৎসক কেহই তাহার সন্ধান পান না। মানসিক ব্যাধির নূতন চিকিৎসকগণ এই প্রকার অবস্থায় রোগীর নিকটে যে কোন একটি কথা উচ্চারণ করেন, এবং তাহা রোগীর মনে পর পর কোন্ কোন্ ভাবের উদয় করে, তাহা জিজ্ঞাসা করেন। প্রত্যেক কথার সহিত কতকগুলি ভাব জড়িত থাকা খুবই স্বাভাবিক। "জল" এই কথাটা উচ্চারণ করিলেই চাষীর মনে হয়ত ধানের ক্ষেতের কথা উদয় হয়। যাঁহারা নদী তীরে বাস করেন, তাঁহার হয়ত শ্যামল-তটশালিনী স্বচ্ছ-তোয়া নদীর মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া ফেলেন। আবার যাঁহারা স্বভাবতঃ দুর্ব্বল প্রকৃতির লোক তাঁহারা হয়ত জলের উল্লেখমাত্র জলমগ্ন ব্যক্তির মৃত্যুর কথা মনে করিয়া আতঙ্কিত হইয়া পড়েন। যাহা হউক চিকিৎসকগণ এই প্রকার একটা কথা উচ্চারণ করিয়া তাহা রোগীর মনে পর পর যে সকল ভাবের উদয় করে, তাহা ধারাবাহিক ভাবে লিপিবদ্ধ করিতে থাকেন। বলা বাহুল্য যাহারা প্রকৃতই মানসিক রোগগ্রস্ত তাহাদের মনোভাবের মধ্যে শৃঙ্খলা থাকে না। সেই নানা বিশৃঙ্খল ভাবের মধ্যে শৃঙ্খলা আবিষ্কার করিয়া চিকিৎসককেই রোগীর মানসিক ব্যাধির কারণ স্থির করিতে হয়। প্রত্যেক কথার সঙ্গে সঙ্গে মনে কোন্ ভাব বা কোন্ কথার উদয় হইল, তাহা যদি রোগী অকপটচিত্তে প্রকাশ না করে, তবে এই চিকিৎসা ব্যর্থ হয়। কোন প্রকারে গোপন না করিয়া ভাবগুলিকে প্রকাশ করিতে থাকিলে যে ব্যাপারে মানসিক উচ্ছৃঙ্খলতা উপস্থিত হইয়াছে, সুচিকিৎসকের হাতে তাহা সহজেই ধরা দেয়। চিন্তাকে বন্ধনমুক্ত করিলে যে ব্যাপার মানসিক ব্যাধির কারণ চিন্তা যেন তাহারি চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়।

মনে করা যাউক যেন "প্রদীপ কথাটা" চিকিৎসক উচ্চারণ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে হয়ত রোগীর মনে মৃৎ-প্রদীপ, গ্যাস্ শিখা, এবং বৈদ্যুতিক দীপের কথা জাগিয়া উঠিল। কিন্তু কোন মানুষ একাধিক ভাব অবলম্বন করিয়া চিন্তাকে চালনা করিতে পারেনা। যুগপৎ যে সকল ভাবের উদয় হয়, তাহাদেরি একটিকে লইয়া চিন্তাস্রোত চালাইতে হয়। রোগী যদি বৈদ্যুতিক দীপের কথাটাকে অবলম্বন করে, তবে সঙ্গে সঙ্গে কোন

বিশেষ গৃহের কথা এবং তার পর সেই গৃহেরই পরিবার বর্গের কথা মনে করিয়া চিন্তাস্রোতকে চালাইতে চায়। যদি ব্যক্তি বিশেষের উপকার অনুরাগ বা বিরাগ ব্যাধির কারণ হয় তবে চিন্তাটা সেই দিকেই ধাবিত হয়।

পূর্ব্বোক্ত পদ্ধতিটিই জর্ম্মানির ডাক্তারেরা চিকিৎসায় ব্যবহার করিতেছেন। কেহ কেহ আবার ইহারই একটু আধটু পরিবর্ত্তন করিয়া ব্যবহারে লাগাইতেছেন। এক শ্রেণীর চিকিৎসক কাগজ পেন্‌সিল হাতে করিয়া, তাঁর নিজের আকৃতি প্রকৃতি সম্বন্ধে কোন্ কোন্ ভাব মনে উদিত হইতেছে, তাহা রোগীকে জিজ্ঞাসা করেন। তার পর রোগীর মনের অসম্বদ্ধ ভাব লিপিবদ্ধ করিয়া ডাক্তার তাহারি সাহায্যে রোগের মূল আবিষ্কার করিয়া ফেলেন।

এই প্রকার চিকিৎসায় কোন একটি রোগী ডাক্তারকে দেখিয়াই বলিয়াছিল, ডাক্তারের চেহারাটা যেন একটা-প্রকাণ্ড টাক-যুক্ত মাথা স্মরণ করাইয়া দিতেছে। ইহার পরই সে বলিয়াছিল, যেন কোন বৃদ্ধের মূর্ত্তি তাহার চক্ষুর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। এই প্রকার শতাধিক অদ্ভুত ভাব জোড়া দিয়া দেখা গিয়াছিল, নিজে বৃদ্ধ ও অক্ষম হইয়া পড়িতেছে বলিয়া একটা অলীক কল্পনা কোন গতিকে লোকটার মাথায় প্রবেশ করিয়াছিল। এই সূত্রই তাহার মানসিক ব্যাধির কারণ।

ডাক্তার জঙ্‌ জনৈক অর্দ্ধ-ক্ষিপ্ত ধর্ম্মযাজকের চিকিৎসা করিতে গিয়া আশ্চর্য্য ফল লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার আকৃতি দেখিয়া মনে কোন্ কোন্ ভাবের উদয় হয় রোগীকে জিজ্ঞাসা করিবা মাত্র সে বলিয়াছিল, "ডাক্তার মহাশয়! আপনি কখনই সত্যবাদী নহেন। "তা ছাড়া রোগীদিগকে প্রতারিত করার অভ্যাসটাও আপনার যথেষ্ট আছে। আপনার নৈতিক বলও একটু নাই।"

বলা বাহুল্য ডাক্তার স্পষ্টই বুঝিয়াছিলেন, ধর্ম্ম যাজক মহাশয় নিজেই চরিত্র হীন ও দুর্ব্বলচেতা, এবং লোকের সহিত প্রতারণা করার অভ্যাসে তিনিই দক্ষ। অনুসন্ধানে এই সকল অনুমানের সত্যতা ধরা পড়িয়াছিল এবং শেষে দেখা গিয়াছিল, লোকটা প্রথমজীবনের অন্যায় আচরণে অনুতপ্ত হইয়াই ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে।

২। উদ্ভিদের আত্মত্রাণ।

প্রাণী ও উদ্ভিদের জীবনের কার্য্যে অনেক একতা দেখা যায়। আমাদেরি দেশের মহাপণ্ডিত বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় জীবমাত্রেরই জীবনের কার্য্যে যে ঐক্য দেখাইয়াছেন তাহা বড়ই অদ্ভুত। জন্মমৃত্যু শ্রম-অবসাদ, প্রভৃতি মূলগত ব্যাপারে প্রাণী ও উদ্ভিদে কোন ভেদ দেখা যায় না। কোন প্রকার আঘাত দিলে প্রাণী যেমন হাত পা নাড়িয়া বেদনা প্রকাশ করে, উদ্ভিদও সেইরূপ ডাল বাঁকাইয়া পাতা গুটাইয়া নানা-প্রকারে আঘাতে সাড়া দেয়। প্রাণী ও উদ্ভিদের জীবনের কার্য্যে এই প্রকার স্থূল একতা থাকিলেও পার্থক্য যথেষ্ট আছে। আহার না পাইলে প্রাণী বা উদ্ভিদ্ কেহই বাঁচে না সত্য, কিন্তু প্রাণীর খাদ্য কখনই উদ্ভিদের আহার্য্য নয়। যে রোগে প্রাণীর মৃত্যু হয়, উদ্ভিদকে তাহা স্পর্শও করিতে পারে না।

যাঁহারা শরীরতত্ত্বের একটুও সন্ধান রাখেন তাঁহাদের নিকট রক্তের শ্বেত-কণিকার (White corpuscles) পরিচয় প্রদান নিষ্প্রয়োজন। প্রতি মুহূর্ত্তে আমরা শ্বাসপ্রশ্বাসের সহিত যে অসংখ্য ব্যাধির জীবাণুকে দেহের মধ্যে আশ্রয় দিতেছি, তাহারা শরীরে প্রবেশ করিয়া রক্তের সহিত মিশিয়া আশ্রয়দাতা প্রাণীর সর্ব্বনাশের চেষ্টা করে। রক্তের শ্বেতকণিকাগুলিই এইসকল জীবাণুর সহিত সংগ্রাম করিয়া প্রাণীকে ব্যাধিনির্ম্মুক্ত রাখে। জীবতত্ত্ববিদ্‌গণের মুখে ব্যাধি জীবাণুর এই সংগ্রামের বিবরণ শুনিলে সত্যই বিস্মিত হইতে হয়। যাহাহউক রক্তে শ্বেতকণিকার সৃষ্টি করিয়া বিধাতা যেমন দেহ-শত্রুগণকে দমন করিয়া থাকেন, উদ্ভিদ্ শরীরে শত্রুনাশের সেই প্রকার কোন স্বাভাবিক ব্যবস্থা আছে কিনা জানিবার জন্য সম্প্রতি কয়েকজন ফরাসী উদ্ভিদ্‌বিদ্ পরীক্ষা আরম্ভ করিয়াছিলেন। নানা পরীক্ষায় দেখা গিয়াছিল, জীবাণু কেবল প্রাণীরই শত্রু। জীবাণু আশ্রয় গ্রহণ করিলে উদ্ভিদ্-দেহের কোন অনিষ্ট হয় না। বরং বিশেষ বিশেষ অবস্থায় উপকারই হইয়া থাকে। পণ্ডিতদিগের মতে

ব্যাঙের ছাতাজাতীয় অণুবীক্ষণিক উদ্ভিদ্‌গুলিও বড় বড় বৃক্ষের একমাত্র মহাশত্রু। পরীক্ষা করিলে উদ্ভিদের শিকড় বা ভূ-প্রোথিত অংশে এই জাতীয় ছাতার বহু উপনিবেশ দেখা যায়। প্রাচীন পণ্ডিতগণ ও ইহাদের অস্থিত্বের কথা জানিতেন। কিন্তু ইহারা যে উদ্ভিদ্-শত্রু, তাহা ইঁহারা বুঝিতেন না। এখন দেখা যাইতেছে, ইহারই উদ্ভিদ্ দেহের কোষে প্রবেশ করিয়া আশ্রয় দাতাকে রুগ্ন করিয়া ফেলে। প্রকৃতি কেবল শত্রু সৃষ্টি করিয়া জীবের ধ্বংস সাধন করেন না শত্রু সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে শত্রুনাশের ও উপায় সৃষ্ট হয়। ঘরে বাহিরে জড়ে ও জীবে এই দুই প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীর দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ অবিরাম চলিতেছে, ইহাতে শত্রুর নাশ হইলেই মঙ্গল নচেৎ জীব বা জড় কেহই নিজের অস্তিত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারে না। উদ্ভিদ্ নাশের জন্য ছাতাজাতীয় ক্ষুদ্র উদ্ভিদ সৃষ্টি করিয়া, স্বয়ং প্রকৃতিই তাহাদের ধ্বংসের জন্য উদ্ভিদ্ কোষে এক অদ্ভুত শক্তি যোজনা করিয়া দিয়াছেন। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে ছাতাগুলি কোষের মধ্যে প্রবেশ করিলে কোষস্থ সামগ্রী তাহাদিগকে হজম করিয়া ফেলে। স্থূল কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, প্রাণী-শরীরে রক্তের শ্বেত-কণিকাগুলি যে কার্য্য করে উদ্ভিদ্‌দেহের কোষগুলিই অতি নিপুণ ভাবে তাহা করিয়া উদ্ভিদ্‌কে জীবিত রাখে। সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী বিজ্ঞানবিদ্ মেস্‌নিকফ্ (Metchnikoff) জীবাণুর গ্রাস হইতে উদ্ধার সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্ত প্রচার করিয়াছেন তাহার সহিত, উদ্ভিদের এই আত্মত্রাণ ব্যাপারের একতা দেখিলে অবাক্ হইতে হয়।

৩ জল

পৃথিবীতে জল ও বায়ুর ন্যায় সুলভ জিনিস আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। যেদিন প্রকৃতির রহস্য সর্ব্ব-প্রথমে মানবের দৃষ্টিআকর্ষণ করিয়া ছিল, বোধ হয় সেইদিন হইতেই এই দুইটি জিনিস লইয়া আলোচনা চলিতেছে। প্রাচীনেরা উভয়কেই মূলপদার্থ বলিয়া স্বীকার করিতেন। আমাদের শাস্ত্রেও পঞ্চভূতের মধ্যে উভয়ই স্থান পাইয়াছিল। ইহার পর জলে যুক্ত হাইড্রোজেন্ ও অক্সিজেন্ এবং বায়ুতে মুক্ত অক্সিজেন্ ও নাইট্রোজেনের অস্তিত্ব ধরা পড়িলে, ইহাদের রাসায়নিক সংগঠন যে কিপ্রকারে জানা গিয়াছিল, তাহার বিশেষ বিবরণ প্রদান নিষ্প্রয়োজন। যাহাহউক অতি প্রাচীন কাল হইতে এই দুইটি জিনিসকে নানা প্রকারে নাড়াচাড়া করিয়াও বৈজ্ঞানিকগণ ইহাদের সকল রহস্য আজও সম্পূর্ণ জানিতে পারেন নাই। জল জিনিসটাকে বিজ্ঞানের একটা অতুলনীয় জিনিস বলিলেও অত্যুক্তি হয় না উষ্ণতা-মান (Thermometer) যন্ত্রে পারদ বা এল্‌কোহলের পরিবর্ত্তে জল ব্যবহার করিলে দেখা যায়, মাঝামাঝি উষ্ণতা জলের উষ্ণতা-মান যন্ত্রে মাপাযায়, কিন্তু উষ্ণতা কমিতে কমিতে চারি ডিগ্রি হইয়া দাঁড়াইলে যন্ত্রের নলের ভিতরকার জল হঠাৎ ফাঁপিয়া উঠে। সাধারণতঃ দেখা যায় শীতল করিলে জিনিস সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে, কিন্তু জল এ নিয়ম মানিয়া চলে না। উষ্ণতার পরিমাণ চারি ডিগ্রির নীচে নামাইয়া আরো শীতল করিতে থাকিলে জল জমিতে আরম্ভ করে, জমিবার সময়ও ইহার আয়তন আর একবার বাড়িয়া উঠে। তরল হইতে কঠিন হইবার সময় আমরা সাধারণতঃ জিনিসকে সঙ্কুচিত হইতেই দেখি। এই নিয়মটিকেও জল মানিতে চায় না। সমআয়তন জল অপেক্ষা সেই আয়তনের কঠিন জল অর্থাৎ বরফ এই কারণেই লঘু এবং এই লঘুতার জন্যই উহা জলে ভাসে।

তারপর জলের আপেক্ষিক তাপটাও একটা অসাধারণ ব্যাপার। জলে যে পরিমাণ তাপ দিলে তাহার উষ্ণতাকে এক ডিগ্রি অধিক করা যায়, ঠিক সেই তাপই লোহ, তাম্র প্রভৃতি ধাতুতে লাগাইলে, সে গুলির উষ্ণতা অনেক বাড়িয়া যায়। প্রযুক্ত তাপের একটা জমা খরচ দাঁড় করাইতে গেলে, জমার ঘরে অনেক তাপ থাকে কিন্তু অনুসন্ধানে জলে তাপের সন্ধান পাওয়া যায় না। এই ব্যাপারের ব্যাখ্যান দিতে গিয়া সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক Roentgen বলিতেছেন, চিনির রসে যেমন চিনি আমাদের অলক্ষ্যে অবস্থান করে, সেইরূপ সাধারণ জলে বরফের অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানা মিশানো থাকে। আমরা জলে উত্তাপ দিলে সেই দানা গুলিকে ভাঙিতে অনেকটা

তাপের ব্যয় হয়, কাজেই উষ্ণতা-মান যন্ত্রে প্রযুক্ত তাপ ধরা দেয় না।

জলের আপেক্ষিক তাপের আধিক্য সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত ব্যাখানটি মানিতে গেলে, উহার অণুগুলিকে এখন আর পরস্পর বিচ্ছিন্ন বলিয়া স্বীকার করা যায় না। তরল অবস্থাতেও তাহার অন্ততঃ কতকগুলি অণু পরস্পর জোট্ বাঁধিয়া অবস্থান করে স্বীকার করিতে হয়। শুনা যাইতেছে র‍্যাম্‌জে প্রমুখ রসায়নবিদ্‌গণ এই সিদ্ধান্তটির আলোচনা করিয়া ইহার সত্যতা বুঝিতে পারিয়াছেন। সম্প্রতি একখানি বিখ্যাত ফরাসী বৈজ্ঞানিক পত্রে (Cosmos) অধ্যাপক ডুক্লো (Duclause) বিষয়টির আলোচনা করিয়া বলিতেছেন সাধারণ উষ্ণজলে আমাদের অলক্ষ্যে যে সকল বরফের কণা থাকে, তাহার প্রত্যেকটি তিন অণু (Molecules) প্রমাণ জলের সমষ্টি। সুতরাং ইহাতে বিশ্বাস করিলে বলিতে হয় বরফের প্রত্যেক অণুর গুরুত্ব হাইড্রোজেনের পরমাণুর গুরুত্বের তুলনায় ৫৪ গুণ অধিক, ইহার রাসায়নিক সংগঠন H_2O নয় $(H_2O)_3$.

শ্রীজগদানন্দ রায়।

অবোধ।

সংসারের প্রলোভনে শ্রবণে ত প্রভো!
পশেনা তোমার শত স্নেহের আহ্বান,
ছাড়িয়া চরণ প্রান্ত চলে যাই দূরে,
প্রতি কার্য্যে হেরি তব উদ্দেশ্য মহান্।
সম্মুখে বিপুল বিশ্ব হাস্য-মুখরিত—
আশার আলোক চিত্র অনিন্দ্য সুন্দর,
পশ্চাতে গরজে সিন্ধু গভীর উচ্ছ্বাসে—
অশ্রুবিন্দু রচিয়াছে অনন্ত-লহর।
আবেগে তৃষিত-কণ্ঠে চলেছি ছুটিয়া
না মানি তোমার প্রভো! মঙ্গল-শাসন,
তোমারে রাখিয়া দূরে স্বাধীন প্রতাপে—
ভেবেছিনু করিবগো সার্থক জীবন!
ব্যর্থ হয়ে ফিরিয়াছি—বুঝিয়াছি সার
শাসনে রেখেছ প্রেম গোপনে তোমার।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মহিন্তা।

প্রবাসের কথা।

যাহার জীবনের অধিকাংশ প্রবাসে অতিবাহিত হইয়াছে, তাহাকে অনেক সময় অনেক কষ্ট, অনেক বিপদ, অনেক অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছে। আমি ত চিরপ্রবাসী, কখন বিষয়কর্ম্মোপলক্ষে, কখন শুধু ভ্রমণের জন্য, আবার কখনও বা কোন প্রকারে মানুষের পক্ষে যে সময় অমূল্য তাহা নষ্ট করিবার জন্য নানাস্থানে বেড়াইয়াছি। এই শেষোক্ত অবস্থায় অনেকদিন পূর্ব্বে একবার আমি হিমালয়-ক্রোড়স্থিত দেরাদুনে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলাম। সে সময়ে আমার মাথায় অনেক খেয়াল চাপিয়াছিল; সে সকল কথা আর এখন বলিব না। একদিনের একটি ঘটনা নিয়ে লিপিবদ্ধ করিলাম।

আমি দেরাদুনে থাকি। সামান্য একটু কাজ কর্ম্মও করি, আর অবশিষ্ট সময় পাহাড়ে পর্ব্বতে ঘুরিয়া বেড়াই। এই সময়ে একদিন বিনা সংবাদে আমার দেশের একটি যুবক আমার নিকট উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া ত আমি অবাক্। তাহার পর শুনিলাম যুবকটি বাড়ীতে ঝগড়া করিয়া সন্ন্যাসী হইবার শুভ অভিপ্রায়ে আমার নিকট উপস্থিত হইয়াছেন।

তাহাকে দশ পনরদিন আমার নিকট রাখিলাম; ক্রমে তাহার রাগ কমিয়া গেল, সন্ন্যাসী হইবার অভিপ্রায়ও সে ত্যাগ করিল। তখন বাড়ী যাইবার জন্য তাহার আগ্রহ প্রবল হইল। আমার নিকট আসিবার সময় সে একাকীই আসিয়াছিল. কিন্তু যাইবার সময় তাহাকে একাকী পাঠাইতে আমার ইচ্ছা হইল না। তখন দেরাদুনে রেল হয় নাই; দেরাদুন হইতে ৪২ মাইল দূরে সাহারণপুরে গেলে তবে রেল পাওয়া যায়। এই ৪২ মাইল পথ অপরিচিত একাওয়ালার সঙ্গে তাহাকে যাইতে দিতে আমার সাহস হইল না, কি জানি পথের

মধ্যে যদি তাহার সন্ন্যাসী হইবার বাসনা আবার জাগিয়া উঠে। সেই জন্য সাহারণপুর পর্য্যন্ত তাহাকে রাখিয়া আসিবার ব্যবস্থা করিলাম; এবং একদিন প্রাতঃকালে অনিন্দ্যসুন্দর একায় আরোহণ করিয়া আমরা সাহারণপুর যাত্রা করিলাম।

যথাসময়ে সাহারণপুরে পৌঁছিয়া মনে করিলাম এতটা পথই যখন আসিয়াছি তখন যুবকটির সঙ্গে গাজিয়াবাদ পর্য্যন্ত যাইয়া তাহাকে একেবারে ঈষ্টইণ্ডিয়া রেলের গাড়ীতেই তুলিয়া দিয়া আসি। যুবকটির জন্য একখানি মধ্যম শ্রেণীর হাবড়া পর্য্যন্ত চড়িবার টিকিট এবং আমার জন্য একখানি গাজিয়াবাদের রিটার্ণ টিকিট কিনিলাম।

আমাদের গাড়ী যখন গাজিয়াবাদ ষ্টেসনে পৌঁছিল তখন হাবড়ার গাড়ী ছাড়ে ছাড়ে হইয়াছে। আমি তাড়াতাড়ি আমার সঙ্গীটিকে সেই গাড়ীতে তুলিয়া দিতে গেলাম। প্রবেশদ্বারের নিকট একজন টিকিট সংগ্রাহক ছিল, সে 'জল্‌দি যাও' বলিয়া আমার টিকিটের অর্দ্ধেক ছিড়িয়া লইল; আমার আর তখন টিকিটখানি দেখিয়া লইবার অবকাশ ছিল না, টিকিট সংগ্রাহক মহাশয়ও টিকিট-খানির দিকে চাহিয়া দেখিলেন না। সঙ্গীটিকে গাড়ীতে তুলিয়া দিলাম। গাড়ী আমার দেশের দিকে ছুটিয়া চলিল! আমি একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া গাড়ীর দিকে চাহিয়া রহিলাম। কতকথা তখন মনে হইল: মনে হইল এই গাড়ী আমার সুজলা সুফলা সস্যশ্যামলা জন্মভূমির দিকে যাইতেছে। একদিন পরেই এই গাড়ী আমার দেশে উপস্থিত হইবে। তখন মনে পড়িল আমার সেই ছায়া শীতল ক্ষুদ্র গ্রামের কথা—মনে পড়িল আমার আত্মীয়স্বজন, বন্ধু বান্ধবের কথা,—মনে পড়িল আমার বাল্য খেলার কুটীর,—মনে পড়িল আমার ছেলেবেলার কথা। আরও কতকথা মনে পড়িল। একবার মনে হইল, কি জন্য এমন করিয়া পথে পথে বেড়াইতেছি; যাই—দেশে ফিরিয়া যাই; আমার সেই পল্লীভবনে ফিরিয়া যাই। এত দেশে ঘুরিলাম, এত পাহাড় পর্ব্বত দেখিলাম, শান্তির অন্বেষণে দেশ দেশান্তরে বেড়াইলাম। কোথাও শান্তির সন্ধান পাইলাম না। আর না, দেশে চলিয়া যাই। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হইল, কোথায় যাইব, কাহার কাছে যাইব! একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া প্ল্যাটফরমের একপার্শ্বে একখানি বেঞ্চে বসিয়া পড়িলাম।

রাত্রি তখন এগারটা; শেষ রাত্রিতে তিনটার পর এলাহাবাদ হইতে যে গাড়ী আসিবে, সেই গাড়ীর যাত্রী লইয়া তবে আমাদের সাহারণপুরের গাড়ী ছাড়িবে। ততক্ষণ ষ্টেশনেই থাকিতে হইবে।

গ্রীষ্মকাল জ্যোৎস্নারাত্রি। আমি সেই বেঞ্চে বসিয়াই রাত্রি কাটাইবার অভিপ্রায় করিলাম। দেখিলাম আরও দুই চারিজন যাত্রী আর কয়েকখানি বেঞ্চে বসিয়া আছে। কতক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকা যায়! ধীরে ধীরে আমার চক্ষু বুজিয়া আসিল, আমি নিদ্রিত হইলাম।

কতক্ষণ ঘুমাইয়া ছিলাম বলিতে পারিনা; হঠাৎ একটা শব্দে আমার ঘুমভাঙ্গিয়া গেল। আমি চাহিয়া দেখি আমার পার্শ্বেই একটি লোক বসিয়া আছে। আমি জাগিয়াছি দেখিয়া লোকটি উঠিয়া দাঁড়াইল এবং ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। আমি তাহার দিকে চাহিলাম না, তখনও নিদ্রার অলসভাব আমাকে পরিত্যাগ করে নাই।

একটু পরেই একজন পুলিসম্যান আসিয়া আমাকে আমার গন্তব্য স্থানের কথা জিজ্ঞাসা করিল। আমি বলিলাম, আমি সাহারণপুর যাইব। তখন সে বলিল, সাহারণপুরের গাড়ী ওদিকের প্লাটফরমে গিয়াছে। আমি তখন যাইয়া সেই গাড়ীতে আরোহণ করিয়া পুনরায় নিদ্রার আয়োজন করিলাম।

গাড়ী কখন ছাড়িয়াছিল তাহা জানিতে পারি নাই। একটু বেলা হইলে আমার নিদ্রাভঙ্গ হইল। তখন দেখিলাম গাড়ী চলিতেছে। অল্প একটু পরেই গাড়ী মিরাট ষ্টেসনে উপস্থিত হইল। মনে করিলাম এই স্থানে একটু বেশী সময় গাড়ী দাঁড়ায়: এইখানে প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া লই। এই মনে করিয়া প্রথমেই পকেটে হাত দিলাম; দেখি আমার রুমালখানি অন্তর্হিত হইয়াছে। আমার সঙ্গে দশটী টাকার একখানি নোট ও নগদ দুইটী টাকাছিল। তাহা

ঐ রুমালেই বাঁধা ছিল। কখন কেমন করিয়া রুমালখানি কে হস্তগত করিয়াছিল, তাহা স্থির করিতে পারিলাম না। বিষম বিপদ; পকেট অনুসন্ধান করিয়া দেখিলাম ছয়টী পয়সা মাত্র সম্বল রহিয়াছে, বুকের পকেটে হাত দিয়া দেখিলাম রিটার্ণ টিকিট খানা রহিয়াছে। তবুও রক্ষা! টিকিট খানি অপহৃত হইলে আরও মঙ্গল হইত!

কি করি, ষ্টেসনে হাত মুখ ধুইয়া গাড়ীতে আসিয়া বসিলাম। ছয়টি পয়সা সম্বল; যাইতে হইবে দেরাদুন পর্য্যন্ত। মনে করিলাম পয়সা ছয়টী আর এখন খরচ করিব না—একবারে নিঃসম্বল হওয়া কিছু নয়। ভগবান্ আজ অনাহারই ব্যবস্থা করিয়াছেন; কিন্তু অদৃষ্টে যে ইহা অপেক্ষাও অধিকতর লাঞ্ছনা ভোগ লিখিত ছিল তাহা তখনও বুঝিতে পারি নাই। মনকে প্রবোধ দিলাম যে, সাহারণপুর নামিয়া একা ভাড়া করিব, বাসায় যাইয়া তাহাকে টাকা দিব; আর সঙ্গে যে ছয়টী পয়সা আছে তাহারই দ্বারা সাবারণপুরে জলযোগ করিব। এক দিনের অনাহারে মারা যাইব না; জীবনে অনেক দিন অনাহারে কাটিয়াছে।

মধ্যাহ্ন কালে সাহারণপুর ষ্টেসনে গাড়ী থামিল। আমি গাড়ী হইতে নামিয়া গেটের নিকট টিকিট দিতে গেলাম। টিকিটখানি বাহির করিয়া টিকিট সংগ্রাহক মহাশয়ের হস্তে দিলে তিনি টিকিটখানি দেখিয়াই আমার গতিরোধ করিলেন। ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করায় তিনি টিকিটখানি আমাকে দেখিতে দিলেন। ও হরি! গাজিয়াবাদের টিকিট সংগ্রাহক শেষার্দ্ধখানি লইয়াছেন, আমাকে প্রথমার্দ্ধ ফিরাইয়া দিয়াছেন। তখন যে তাড়াতাড়ি তাহাতে আমিও টিকিটখানি দেখিয়া লই নাই, সে বেচারীও পরীক্ষা করিয়া দেখে নাই।

এখন উপায়—সম্বলত সেই ছয়টী পয়সা। টিকিট সংগ্রাহক মহাশয় মেজাজ গরম করিয়া জানাইলেন যে, আমাকে গাজিয়াবাদ হইতে সাহারণপুর পর্য্যন্ত মধ্যম শ্রেণীর ভাড়া দিতে হইবে। তাহার পর ট্রাফিক সুপারিণটেনডেণ্ট মহাশয়ের নিকট আবেদন করিলে আমি এই ভাড়া পরে ফেরত পাইব। পরে ফেরত পাইব, তাহাত বুঝিলাম, কিন্তু এখন টাকা কোথায় পাই। টিকিট সংগ্রাহক হিন্দুস্থানী মহাশয় বলিলেন যে, আমাকে একটু অপেক্ষা করিতে হইবে, তাঁহার উপস্থিত কার্য্য শেষ হইলে তিনি আফিসে যাইয়া আমার টাকা লইবেন এবং তাহার রসিদ দিবেন। আমি তাঁহাকে বলিলাম যে, আমার নিকট মোট ছয়টী পয়সা আছে বারটী টাকা রুমালে বাঁধা ছিল, তাহা পথে অপহৃত হইয়াছে। ষ্টেসনের হাকিম মহাশয় বোধ হয় আমার এ এজাহার বিশ্বাস করিলেন না, তিনি অধিকতর উদ্ধত ভাবে বলিলেন "অভি গোল মৎ করো।" বুঝিলাম অদৃষ্টে আজ বিশেষ লাঞ্ছনা ভোগ আছে। আমি চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম।

যাত্রীদিগের টিকিট সংগ্রহ শেষ হইলে তিনি বাদসাহী রকমে পদক্ষেপ করিয়া অগ্রসর হইলেন এবং আমাকে তাঁহার অনুসরণ করিতে বলিলেন। কি করি, —বিদেশ, পরিচিত কেহই সেখানে নাই—চারিদিকে চাহিয়া একটী বাঙ্গালীর মুখও দেখিতে পাইলাম না।

টিকিটঘরে প্রবেশ করিয়া সেই টিকিট সংগ্রাহক আমাকে বলিলেন, যে ভাড়ার টাকা আমাকে দিতেই হইবে, নতুবা তিনি আমাকে পুলিশের হস্তে সমর্পণ করিবেন। আমি বলিলাম, আমার কোন অপরাধই নাই, গাজিয়াবাদের টিকিট সংগ্রাহক মহাশয়ই এজন্য অপরাধী। কিন্তু আমার কথায় কর্ম্মচারিপ্রবর কর্ণপাত করিলেন না; সেখানে আরও যে দুই চারিজন কর্ম্মচারী ছিলেন, তাঁহারাও ঐ কথারই সমর্থন করিলেন। আমি বলিলাম, আমার নিকট ছয়টীর অধিক পয়সা নাই, আমি ভাড়া দিতে পারিব না। তবে তাঁহারা যদি বিশ্বাস করেন, তাহা হইলে আমি দেরাদুন পৌছিয়া টাকা পাঠাইয়া দিতে পারি। আমার এই প্রস্তাব শুনিয়া আমার বিচারক মহাশয় আমাকে যে "কমপ্লিমেণ্ট" দিলেন, তাহা আর লিপিবদ্ধ করিতে পারিলাম না। আমার তখন বড়ই রাগ হইল, আমি বলিলাম, এত কথার প্রয়োজন নাই; আপনাদের আইনে যাহা বলে আপনারা তাহাই করুন। আমি আর আপনাদের সহিত কোন কথাই বলিতে চাহি না। আমি এ কথা-

গুলি হিন্দীতে বলি নাই, ইংরাজীতে বলিয়াছিলাম। তাঁহারা কিন্তু আমার কথায় নরম হইল না।

আমরা যখন কথাবার্ত্তা বলিতেছিলাম, তখন দ্বারের সম্মুখে একটী ইংরেজ দাঁড়াইয়া আমাদের কথা শুনিতে ছিলেন। আমার শেষ কথা শুনিয়া ইংরেজটী আফিস ঘরের মধ্যে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্যাপার কি ?" আমি উত্তর দিবার পূর্ব্বেই টিকিট সংগ্রাহক মহাশয় তাঁহাকে সমস্ত কথা বলিলেন। সাহেব তখন আমার দিকে চাহিয়া ইংরাজীতে বলিলেন "আপনাকে ত ভদ্রলোক বলিয়া মনে হইতেছে।"

আমি বলিলাম "ধন্যবাদ মহাশয়! আপনি সাহেব হইয়াও আমাকে চিনিয়াছেন, কিন্তু আমার স্বদেশবাসী এই মহাত্মারা বোধ হয় তাহা স্বীকার করিবেন না।" এই বলিয়া আমার টাকা চুরীর কথা বলিলাম; টিকিটের গোলের কথা ত অভিযোগকারীই বলিয়াছিলেন।

সাহেব তখন আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কোথায় যাইবেন ?"

আমি বলিলাম "যাইবারত ইচ্ছা ছিল দেরাদুন, কিন্তু এই ভদ্রলোকদিগের যে প্রকার আগ্রহ দেখিতেছি তাহাতে আপাততঃ আমাকে পুলিশ হাজতেই আতিথ্য গ্রহণ করিতে হইতেছে।"

আমার এই কথা শুনিয়া সাহেব "হো, হো করিয়া হাসিয়া ফেলিলেন। তাহার পর টিকিট সংগ্রাহক মহাশয়ের দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই ভদ্রলোককে কত টাকা ভাড়া দিতে হইবে ?" টিকিট সংগ্রাহক মহাশয় যেন কত বলিলেন। সাাহবটী তখন তাঁহার পকেট হইতে টাকা বাহির করিয়া দিলেন এবং আমাকে যথারীতি রসিদ দিতে বলিলেন।

আমিত আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম। আমার স্বদেশবাসী কয়েকজন কর্ম্মচারী আমাকে এই প্রকার বিপন্ন দেখিয়া সহানুভূতি প্রকাশ বা সাহায্য করা দূরে থাকুক, আমাকে পুলিশের হস্তে সমর্পণ করিতে প্রস্তুত হইয়া ছিলেন; আর এই অপরিচিত সাহেবটী আমাকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইলেন। যাহাদিগকে আমি ভাই বলিয়া সম্বোধন করিতে পারি, তাহারা আমার সহিত কি ব্যবহার করিল, আর এই সদাশয় সাহেবটী উপযাচক হইয়া আমার সাহায্য করিতে অগ্রসর হইলেন। আমি তখন সাহেবকে কি বলিব ভাবিয়া পাইলাম না, আমি তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। তাহার পর আমি যখন কথা বলিতে উদ্যত হইলাম, তখন আমার মুখের ভাব দেখিয়াই সাহেবটী আমার মনের কথা বুঝিয়া ফেলিলেন; তিনি তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন "No thanks Babu" (বাবু, ধন্যবাদের প্রয়োজন নাই) সাহেবের এই ব্যবহারে আমি সত্য সত্যই আশ্চর্য্য বোধ করিলাম, আমি আর কথা বলিলাম না।

সাহেব তখন আমাকে বলিলেন "আমিও দেরাদুন হইয়া মসূরী যাইব। আমার গাড়ী প্রস্তুত; জিনিষপত্র গাড়ীতে উঠিয়াছে। আপনি আমার সঙ্গে দেরাদুন পর্য্যন্ত যাইতে পারেন; আপনার কোন কষ্ট হইবে না

আমি তখন বলিলাম "আপনাকে ধন্যবাদ না করিয়া আমি থাকিতে পারিতেছি না। আপনি আমার উপর যথেষ্ট অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। আমি একখানি একা ভাড়া করিয়া দেরাদুনে যাইতে পারিব। আপনাকে আমার জন্য অসুবিধা ভোগ করিতে দিতে পারি না। যদি ক্ষমা করেন তাহা হইলে আপনার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিবার অধিকার পাইতে পারি কি ?"

সাহেব বলিলেন "আমার পরিচয়ের জন্য ব্যস্ত হইবার প্রয়োজন নাই। আমরাত এক সঙ্গেই যাইতেছি পথে পরিচয় করিব।" এই বলিয়া তিনি আমার হাত ধরিয়া বাহিরে লইয়া গেলেন।

বাহিরে যাইয়া দেখি দুইখানি ডাকগাড়ী দাঁড়াইয়া আছে। গাড়ীর মাথার উপর একরাশি বাক্স বিছানা প্রভৃতি রহিয়াছে এবং গাড়ীর পার্শ্বে খানসামা, বেহারা প্রভৃতি চারি পাঁচ জন রহিয়াছে। তখন বুঝিলাম সাহেব বিশেষ পদস্থ ব্যক্তি।

সাহেব তখন বেহারাকে ডাকিয়া কি বলিলেন, আমি একটু দূরে দাঁড়াইয়া ছিলাম, তাহা শুনিতে পাইলাম না। বেহারা সাহেবের কথা শুনিয়া একখানি গাড়ীর মধ্য হইতে বিছানা বাহির করিয়া ফেলি

এবং গাড়ীর উপর হইতে আর একটী বিছানা লইয়া সেই গাড়ীর মধ্যে পাতিল। আমি তখন বুঝিতে পারিলাম আমার জন্যই শয্যা প্রস্তুত হইতেছে। ভাবিলাম, কোথায় আজ আমার স্বদেশীয় ভ্রাতৃবৃন্দের অনুগ্রহে হাজত গৃহে ভূমিশয্যায় রাত্রি কাটাইবার কথা, আর কোথায় এই ডাক গাড়ীতে দুগ্ধফেননিভশয্যা! ইহারই নাম অদৃষ্ট!

আমি তখন সাহেবের নিকটে গিয়া বলিলাম "মহাশয়, আপনার চাকরদিগের কষ্ট হইবে; তাহারা ঐ গাড়ীর মধ্যে যাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিল। তাহাদের কোথায় স্থান হইবে? আমার জন্য তাহারা বিশেষ কষ্ট ভোগ করিবে, ইহা বাঞ্ছনীয় নহে।"

সাহেব আমার কথায় বাধাদিয়া বলিলেন "নেভার মাইণ্ড! তাহারা এই গাড়ীর মাথায় বসিয়া যাইবে। ভাল কথা, আপনার বোধ হয় আহার হয় নাই।"

আমি বলিলাম "সে জন্য আপনাকে ভাবিতে হইবে না। আমার এখন কিছুই আহার করিবার ইচ্ছা নাই।"

সাহেব বলিলেন "তবে গাড়ীতে উঠিয়া বসুন। আর বিলম্ব করিয়া কাজ নাই। রাত্রি নটার মধ্যে দেরাদুনে পৌঁছিতে হইবে।"

তখন আর কি করি; গাড়ীতে উঠিয়া বসিলাম। সাহেবের গাড়ী আগে ছাড়িয়া দিল, তাহার পরই আমার গাড়ী ছড়িল।

অর্দ্ধেক পথ গেলে একটা ডাক বাঙ্গালা পাওয়া যায়। সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বেই আমার গাড়ী সেই ডাক বাঙ্গালার নিকট পৌঁছিল। এই বাঙ্গালার নিকট গাড়ী আসিবামাত্র দেখি সাহেব বাঙ্গালার বারান্দায় দাঁড়াইয়া আছেন। আমাকে দেখিয়াই তিনি বলিলেন "ওয়েল, আপনার জন্য আমি এখানে অপেক্ষা করিতেছি। একটু চায়ের আয়োজন করা গিয়াছে; আপনার অপেক্ষায় তাহার সদ্ব্যবহার করিতে পারিতেছি না।"

সহেবের এই উদারতা ও সহৃদয়তায় আমি একবারে মোহিত হইয়া গেলাম। ইংরাজ যে আমার মত কৃষ্ণকায় বাঙ্গালীর সহিত এমন ব্যবহার করিতে পারেন, ইহা আমি জানিতাম না—ইহা আমি কখনও দেখি নাই—কখনও শুনি নাই।

আমি তখন সাহেবকে ধন্যবাদ করিয়া বারান্দায় যাইয়া বসিলাম। চা আসিল, রুটী আসিল, নানা প্রকার ফল আসিল। বলা বাহুল্য আমার সারাদিন অনাহার, আমি সে গুলির যথেষ্ট সদ্ব্যবহার করিলাম।

সেই সময় আমি পুনরায় সাহেবের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনিত কিছুতেই পরিচয় দিতে চাহিলেন না; অবশেষে অনেক অনুরোধ করার পর আমাকে তাঁহার পরিচয় দিলেন; কিন্তু আমাকে বলিয়া দিলেন যে, সেদিনের ঘটনা সম্বন্ধে আমি অন্যের নিকট গল্প করিতে পারি কিন্তু তাঁহার নাম যেন কাহাকেও না বলি। তিনি বলিলেন যে, তিনি আত্ম প্রকাশ করিতে ভাল বাসেন না। এতদিন পরে তাঁহার নাম প্রকাশ করিলেও কোন ক্ষতি ছিল না, কিন্তু তাঁহার নামটী আর বলিবনা; এই মাত্র বলিতে পারি তিনি একজন সিবিলিয়ান; সে সময় তিনি উত্তর পশ্চিম প্রদেশের ছোটলাটের সহকারী সেক্রেটারীর কাজ করিতেন।

সাহেবের পরিচয় পাইয়া আমার বিস্ময়ের সীমা রহিলনা। কোথায় আমি পথের ভিকারী, আর কোথায় উত্তর পশ্চিম প্রদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী। তখন বুঝিলাম, এই প্রকার মহানুভব ইংরাজ আছেন বলিয়া ইংরাজ আজ সসাগরা পৃথিবীর অধিপতি।

রাত্রি প্রায় নয়টার সময় আমাদের গাড়ী দেরাদুনে পৌঁছিল। সাহেব ঐ গাড়ীতেই রাজপুর যাইয়া হোটেলে অবস্থান করিলেন, তিনি দেরাদুনে অপেক্ষা করিবেন না।

আমি গাড়ী হইতে নামিয়া সাহেবের গাড়ীর নিকটে গেলাম। তিনি তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া আমার করমর্দ্দন করিলেন এবং বলিলেন, তিনি একমাস মসুরীতে হিমালয়ান হোটেলে থাকিবেন। আমি যদি এই সময়ের মধ্যে কোন দিন মসুরী যাই, তাহা হইলে যেন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বিস্মৃত না হই। আমি তাঁহাকে অভিবাদন করিলাম। তাঁহার গাড়ী চলিয়া গেল।

সেই সপ্তাহের শনিবারেই আমি মসুরীতে যাইয়া সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করি। তিনি আমাকে দেখিয়া

যে কত আনন্দ প্রকাশ করিলেন তাহা বলিতে পারি না। আমাকে সেদিন মস্থরীতেই থাকিবার জন্য অনুরোধ করিলেন; কিন্তু আমি আর সেখানে থাকিলাম না। সেই দিন অপরাহ্ণকালেই দেরাদুনে ফিরিয়া আসিলাম। সাহেব আমার দেরাদুনের ঠিকানা লিখিয়া লইলেন।

পর দিন বেলা একটার সময় একজন কুলী আমার বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইল। সে আমাকে সাহেবের লিখিত এক খানি পত্র দিল, এবং তাহার পৃষ্ঠের বোঝা নামাইয়া বসিল। তাহার পর সেই বোঝা খুলিয়া আমার সম্মুখে সাজাইতে লাগিল।

সাহেবের পত্রে অবগত হইলাম যে, আমি পূর্ব্বদিন তাঁহার আতিথ্য স্বীকার না করায় তিনি আমার জন্য কিছু জিনিস পাঠাইলেন, আমি যেন দয়া করিয়া তাহা গ্রহণ করি। চাহিয়া দেখি, সাহেব নানা প্রকার ফল, বিস্কুট' চাট্নী প্রভৃতি পাঠাইয়াছেন.

সাহেব যে দিন এলাহাবাদ ফিরিয়া যান' সে দিন দেরাদুনে আমিও তাঁহাকে ফলমূলাদি দিয়াছিলাম। তাহার পরও দুই তিনমাস তিনিও আমাকে পত্র লিখিতেন, আমিও তাঁহাকে পত্র লিখিতাম। তাহার পরই আমি হিমালয়ের জঙ্গলে ডুবিয়া যাই। আজ অনেক দিন পরে সেই কথা বলিলাম।

শ্রীজলধর সেন।

একটি সঙ্গীত

সিন্ধু উথলে অই,　　আয়লো পরাণ সই
　বিজন বেলায় বসি' যাপি নিশি দুজনায়।
আঁখি আঁখি পানে রাখি,　　মদির স্বপন মাখি,
　অনিমিখে চেয়ে থাকি, তব প্রেম সাধনায়।
আজিলো মাধবী নিশি,　　পুলক-মগন দিশি,
　আকাশেতে রাকা শশী হেসে হেসে ভেসে যায়।
হেরলো তরঙ্গ সঙ্গে,　　জ্যোছনা খেলিছে রঙ্গে,
　দিগন্তে সলিল নীল চুমে নভোনীলিমায়।
কত নদী মহানদী,　　ঢালে প্রেম নিরবধি,
　আকুল অকূল হৃদি, প্রেমে নাচে প্রেমে গায়।
উদ্বেলিত হৃদিমম,　　প্রমত্ত সাগর সম,
　চাহেলো তোমারে শুধু আর কিছু নাহি চায়।
এ মহামিলন তীরে,　　সাধ মিটিবে না কি রে,
　উদ্‌ভ্রান্ত চকোর সখি মরিবে কি পিপাসায়?

পুরী।　　শ্রীমনোমোহন সেন

সারনাথ।

(১)

শাক্যসিংহ বুদ্ধত্ব লাভ করিয়া, বারাণসী-ধামের দুই ক্রোশ উত্তরে [মৃগদাবের অন্তর্গত] ঋষিপত্তন নামক তপোবনে "ধর্ম্মচক্র-প্রবর্ত্তনের" সূত্রপাত করিয়াছিলেন। তজ্জন্য তাহা একটি প্রধান বৌদ্ধ তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হইয়া, সা র না থ নামে জগদ্বিখ্যাত হইয়া রহিয়াছে। তথাকার অসংখ্য অট্টালিকা অক্ষুণ্ণ অবস্থায় বর্ত্তমান থাকিতে পারিলে, বহু যুগের ধর্ম্মানুরাগের পরিচয় প্রদান করিতে পারিত। কিন্তু যাহা কিছু কাল পরাজয় করিয়া বর্ত্তমান থাকিতে পারিত, তাহাও কালক্রমে নিতান্ত নির্দ্দয় পীড়নে বিধ্বস্ত ও ভূগর্ভ-নিহিত হইয়া পড়িয়াছিল;—কেবল ধা মে ক নামক একটি ধ্বংসাবশিষ্ট উচ্চ স্তূপের কিয়দংশই সারনাথের স্থান নির্দ্দেশ করিত।

শাক্য-বুদ্ধের প্রচার-কার্য্য "ধর্ম্মচক্র-প্রবর্ত্তন" নামে পরিচিত হইবার পর, তাহার একটি যন্ত্র-মূর্ত্তি কল্পিত হইয়াছিল। মৃগদাবের সহিত "ধর্ম্মচক্র-প্রবর্ত্তনের" প্রথম সম্পর্ক বর্ত্তমান থাকায়, যন্ত্র-মূর্ত্তি-নিহিত মূলচক্রের উভয় পার্শ্বে দুইটি মৃগ-মূর্ত্তিও স্থান প্রাপ্ত হইয়াছিল। বৌদ্ধমত-বিজ্ঞাপক ধর্ম্মচক্র-যন্ত্রমূর্ত্তি সর্ব্বত্র সমাদর লাভ করিয়াছিল। তাহা পাল-নরপালগণের শাসন-লিপিতে রাজ-মুদ্রারূপে ব্যবহৃত হইত; দেবমন্দিরে এবং শ্রীমূর্ত্তির পাদপীঠে অঙ্কিত হইত; কখন বা স্বতন্ত্র যন্ত্র-মূর্ত্তিরূপেও যথোপচারে অর্চ্চিত হইত। লাসা নগরীর দলই লামার প্রাসাদ ভিত্তিতে এই যন্ত্র-মূর্ত্তি অদ্যাপি সগৌরবে অঙ্কিত হইয়া আসিতেছে * ইহার সহিত সারনাথের পুণ্য-স্মৃতি চিরবিজড়িত হইয়া রহিয়াছে।

* Waddell's *Lhasa and its Mysteries*, p. 397.

বৌদ্ধস্তূপ—সারনাথ।

শাক্যসিংহের মহানির্ব্বাণ লাভের পূর্ব্বেই সারনাথ তীর্থ-মহিমা লাভ করিয়াছিল। উত্তরকালে এইস্থান ক্রমে ক্রমে জনাকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল। সুবিখ্যাত বৌদ্ধ সম্রাট অশোক এখানে স্তূপ এবং স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তাহা বহুকাল সারনাথের প্রধান উল্লেখযোগ্য দৃশ্য বলিয়া সুপরিচিত ছিল। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর প্রারম্ভে ফাহিয়ান সারনাথে চারিটি বৃহৎ স্তূপ, এবং দুইটি বিহার দর্শন করিয়াছিলেন †। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে ইয়ন্ চুয়ঙ্গ তথায় শত শত ক্ষুদ্র স্তূপ এবং প্রায় দুইশত ফুট উচ্চ বৃহৎ বিহারে একটি শাক্য-মূর্ত্তি দর্শন করিয়াছিলেন §। তাহার অল্পকাল পরে আইসিঙ্গ সারনাথে আসিয়া দেখিয়াছিলেন,—শাক্যসিংহ যেখানে পাদচারণ করিতেন, তাহার উপরও অট্টালিকা নির্ম্মিত হইয়াছে। ‡ এইরূপে খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত সারনাথে নূতন নূতন অট্টালিকা নির্ম্মিত হইবার নানা পরিচয় প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। সেই শেষ। তাহার পর একদিন এই পুরাতন তীর্থক্ষেত্র সহসা বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছিল!

অসংখ্য অনায়াসলভ্য ইষ্টক-প্রস্তর সারনাথের ধ্বংসাবশেষকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল। চীন, জাপান, তিব্বত, ব্রহ্ম, সিংহল প্রভৃতি দূরদেশের বৌদ্ধ তীর্থ-যাত্রিগণ কখন কখন সেই ধ্বংসাবশিষ্ট ইষ্টক-প্রস্তরময় পবিত্র তীর্থ ক্ষেত্র দর্শন করিতে আসিত। একবার বাদশাহ হুমায়ুঁ এখানে আসিয়া, নিকটবর্ত্তী প্রান্তর মধ্যস্থ এক ভগ্নাবশিষ্ট উচ্চ স্তূপের উপর কিয়ৎকাল বিশ্রাম লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার সুযোগ্য পুত্র আকবর বাদশাহ সেই ঘটনা চিরস্মরণীয় করিবার জন্য স্তূপের উপর একটি স্মৃতিমন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। তাহা এখনও "চৌখণ্ডি" নামে সুপরিচিত হইয়া রহিয়াছে। *

† Legge's *Travels of Fa-Hien*. p. 95.

§ Fergusson's *Indian Architecture*. p. 222.

‡ I-Tsing, *Buddhist Religion*, translated by Taka Kusu.

* As Humayun, king of the Seven Climes, now residing in paradise, deigned to come and sit here one day, thereby increasing the splendour of the sun, so Akbar, his son and humble servant, resolved to build on this spot a lofty tower reaching to the blue sky. It was in the year 996 A. H [1588 A. D.] that this beautiful building was erected.—Translatiorn of the stone-inscription.

অট্টালিকা নির্ম্মাণের প্রচুর উপাদান পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া, লোকে সারনাথ হইতে ইচ্ছামত ইষ্টক-প্রস্তর আহরণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। অন্যের কথা দূরে থাকুক, কোম্পানী বাহাদুরের কর্ম্মচারিবর্গও তাহাতে সঙ্কুচিত হইতেন বলিয়া বোধ হয় না। বরণা-নদীর উপর ডন্‌কান্-সেতু নামক প্রস্তর-সেতু নির্ম্মিত হইবার সময়ে, তাহাকে নদীস্রোত হইতে রক্ষা করিবার জন্য, সারনাথ হইতে আহৃত বহু প্রস্তর-মূর্ত্তি নদীগর্ভে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল।† কত কাল এরূপ অব্যাহত আহরণ-প্রথা প্রচলিত ছিল, তাহার সন্ধান লাভের উপায় নাই। একটি আকস্মিক ঘটনায় ইহার প্রতি পণ্ডিত-সমাজের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল।

রাজা চেৎ সিংহের দেওয়ান জগৎ সিংহ জগৎগঞ্জে অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিবার সময়ে, সারনাথ হইতে প্রস্তর আহরণ করাইতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার অনুচরগণ এই কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিবার সময়ে, [১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে] ভূগর্ভ খনন করিতে করিতে, একটি হরিৎ-প্রস্তরনির্ম্মিত কৌটার মধ্যে দগ্ধাবশিষ্ট অস্থিখণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছিল। অস্থিখণ্ড ভাগীরথীগর্ভে নিক্ষিপ্ত হইবার পর, কৌটাটি বারাণসীর রেসিডেণ্ট জোনাথন্ ডন্‌কানের হস্তগত হয়। তিনি সোসাইটির পত্রিকায় তাহার আবিষ্কার-কাহিনী প্রকাশিত করিয়া গিয়াছেন।§ কৌটাটি কোথায় গেল, তাহার আর সন্ধান প্রাপ্ত হওয়া যায় না। জগৎ সিংহের অনুচরগণ আরও একটি কৌতূহলোদ্দীপক পদার্থ প্রাপ্ত হইয়াছিল। তাহা একটি ভগ্নাবশিষ্ট প্রস্তর-মূর্ত্তির পদ্মপীঠ; তাহাতে ১০৮৩ সংবতে [১০২৬ খৃষ্টাব্দে] মহীপাল কর্ত্তৃক নানাকীর্ত্তি প্রতিষ্ঠাপিত হইবার বিবরণযুক্ত শিলালিপি বর্ত্তমান ছিল।‡ কিন্তু সে শিলালিপি কোথায় গেল, অনেকদিন পর্য্যন্ত তাহার সন্ধান চেষ্টা সফল হইতে পারে নাই।

সারনাথের ধ্বংসাবশিষ্ট ইষ্টক প্রস্তরের মধ্যে ভারতবর্ষের নানা বিলুপ্ত কাহিনীর সন্ধান লাভের সম্ভাবনা এইরূপে অনুভূত হইবার পর, সারনাথের ধ্বংসাবশেষ পরীক্ষা করিবার প্রয়োজন অনুভূত হইয়াছিল। কর্ণেল ম্যাকেঞ্জী তাহার পথপ্রদর্শক বলিয়া উল্লিখিত হইবার যোগ্য। তিনি [১৮৫ খৃষ্টাব্দে] যে অনুসন্ধান-কার্য্যের সূত্রপাত করিয়াছিলেন, তাহাকে যথারীতি পরিচালিত করিবার আশায়, [১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে] জেনারেল কনিংহাম সারনাথে উপনীত হইয়াছিলেন। তিনি জগৎসিংহের অনুচরগণের পদাঙ্কানুসরণ করিয়া, প্রস্তর-কৌটার প্রাপ্তিস্থানে ভূগর্ভ খনন করাইতে গিয়া তথায় একটি প্রস্তর-পেটিকা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।* তাহা কলিকাতার যাদুঘরে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। যে স্তূপের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে এইরূপে ভস্মাধার আবিষ্কৃত হইয়াছিল, তাহা যে একটি সমাধি-স্তূপ, তাহাতে সকল সংশয় নিরস্ত হইবার পর, জেনারেল কনিংহাম, আরও সমাধি-স্তূপ আবিষ্কৃত করিবার আশায়, যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু সারনাথের অসংখ্য স্তূপের মধ্যে আর কোনও স্তূপ হইতে অদ্যাপি ভস্মাধার বা চিতাভস্ম আবিষ্কৃত হয় নাই। কনিংহামের অনুসন্ধান-চেষ্টা, সর্ব্বাংশে সফল না হইলেও, অনুসন্ধানের আকাঙ্ক্ষা উত্তরোত্তর প্রবল করিয়া তুলিয়াছিল।

১৮৪৮ হইতে ১৮৫২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মেজর কিট্টো অসীম অধ্যবসায়ের সহিত অনুসন্ধান-কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া, অকালে দেহ বিসর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার চেষ্টায় জগৎগঞ্জ হইতে মহীপালের প্রস্তর-লিপিটি পুনরাবিষ্কৃত হইয়া, লক্ষ্ণৌ-নগরের যাদুঘরে প্রেরিত হইয়াছিল।† এই প্রস্তর-লিপির সহিত বাঙ্গালার ইতিহাসের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বর্ত্তমান থাকিলেও ইহার প্রকৃত মর্ম্ম এতকালেও সম্পূর্ণরূপে উদ্ঘাটিত হইতে পারে নাই। তজ্জন্য [১৯১০ খৃষ্টাব্দে] "বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির" সদস্যগণ কাশীধামে ও সারনাথে তথ্যানুসন্ধানে ব্যাপৃত হইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তাহার বিবরণ

† Sherring's *Sacred City*, P. 25.

§ Asiatic Researches, Vol V. P. 131.

‡ Archeological Survey Annual Report 1903-4.

* Archeological Survey of India, Annual Report, 1204-5.

† ডাক্তার হল্‌জ্ এই প্রস্তর-লিপির যেরূপ পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাই মূলানুগত পাঠ বলিয়া পরিচিত হইয়াছে।

যথাকালে প্রকাশিত হইবে;—তাহা এখন যন্ত্রস্থ। পুরাতত্ত্বানুরাগী বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট সারনাথের ধ্বংসাবশেষ খনন করাইয়া, এ পর্য্যন্ত যে সকল কীর্ত্তিচিহ্ন আবিষ্কৃত করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাহাতে ভারতবর্ষের ইতিহাস উদ্‌ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। না দেখিলে কিম্বা দেখিতে গিয়াও বুঝিবার জন্য, যথাযোগ্য চেষ্টা না করিলে, সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধে তাহার সম্পূর্ণ পরিচয় প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা নাই। তাহার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্যই এই প্রবন্ধ সংকলিত হইল।

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

আত্মগ্লানি।

(১)

দ্বাত্রিংশৎ বর্ষে, জীবনের মধ্যাহ্নে, পত্নীবিয়োগ জীবনে এক ঘোর উদাস ভাব আনয়ন করিয়া, আমাকে বিশ্বসংসারের সমস্ত বন্ধন হইতে ভাটার জলের ন্যায় দূরে সরাইয়া ফেলিল। হেভানা চুরটের বাক্সটী অগ্নি-মুখে প্রদান করিলাম, ব্রেজিল প্রস্তরটী টুকরা টুকরা করিয়া অণুপরমাণুতে পরিণত করিলাম। পুত্র, কন্যা কেহই আমার প্রাণে শান্তি প্রদান করিতে সমর্থ হইল না। আমি ভগ্ন কাঁচখণ্ডের ন্যায়—এতদিনের মায়াময় সংসারটাকে—দূরে ফেলিয়া, নব জীবন লাভের চেষ্টায় চলিলাম।

প্রথম বৎসর ৺ কাশীধামে, সুখ ও শান্তির নিকেতন, বিশ্বেশ্বরের পাদমূলে গড়াগড়ি দিয়া কর্ত্তন করিলাম। ভগবৎ প্রেম আমাকে বিভোর করিয়া বাস্তবিক আমার প্রাণে এক নূতন ভাব জাগাইয়া দিল। আমি বিশ্বেশ্বর চরণে আত্মসমর্পণ করিলাম।

এই সময় দাদা মহাশয় 'ঘরের ধন ঘরে' রাখিবার আয়োজন করিয়া, আমাকে চিঠি লিখিলেন। আমি 'কবুল জবাব' দিয়া, বন্ধন বিহীন মুক্ত বিহঙ্গের ন্যায় উদ্দেশ্য হীন গতিতে ছুটিয়া চলিলাম। কাশীধাম হইতে ৺ জগন্নাথ ক্ষেত্রে আসিলাম।

অনন্ত সৌন্দর্য্যের নিকেতন অসীম বারিধিতটে দাঁড়াইয়া বিশ্বরাজকে অনুভব করিতে প্রাণে যে আনন্দ হয়, যে উচ্ছ্বাস হয়, তাহা যিনি সেরূপ সৌন্দর্য্য উপভোগ করেন নাই, দৃশ্যজগতের অসীমতা লক্ষ্য করেন নাই, তিনি বুঝিবেন না!

পুরীতে আসিয়া বিশ্বগ্রাসী অনন্তের কূলে দাঁড়াইয়া, আমি সে বিরাট ভাব, মহান্ ভাব, বিশ্বের প্রতি অণুতে পরমাণুতে উপলব্ধি করিতে পারিলাম।

উষায় সমুদ্র স্নাত বাল সূর্য্য, দিবসে উত্তাল সমুদ্র তরঙ্গ, সন্ধ্যায় জগন্নাথদেবের সন্ধ্যারতি, রজনীতে সুখ-স্পর্শ সমুদ্রানিল—আমার মনে অনন্ত ভাব জাগাইতে লাগিল। এ মূক সৌন্দর্য্য, বধির ভাবের নিকট সংসারের স্বার্থ পূর্ণ কোলাহলের স্থান কোথায়?

প্রতিদিন প্রত্যূষে সমুদ্রে স্নান করিতাম। বিক্ষুব্ধ-তরঙ্গরাজির ভিতর আত্মসমর্পণ করিয়া আত্মাকে চরিতার্থ বোধ করিতাম।

সহায় হীন, সম্বল হীন, সংসারজীব কিরূপে সংসার-সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গে হাবুডুবু খায়, সমুদ্র তাহা শিক্ষা দেন—প্রত্যক্ষ দেখাইয়া দেন। অগণিত নর নারী তাহা শিক্ষা করিবার জন্য তাহা প্রত্যক্ষ করিবার জন্য, সমুদ্র স্নানে আইসে, আপন আপন বুক পাতিয়া, মাথা পাতিয়া সেই শিক্ষা গ্রহণ করে। ইহারই নাম "সমুদ্রে ঢেউ লওয়া।"

(২)

উপযুক্ত বস্ত্র পরিধান করিয়া অকূল বারিধি বক্ষে আত্মসমর্পণ করিলাম। প্রবল তরঙ্গ বিশ্বগ্রাসী আহবে ছুটিয়া আসিয়া আমাকে শুষ্ক পত্রের ন্যায় ভাসাইয়া লইয়া গেল। অভীপ্সিত ফল লাভের প্রত্যাশায় অগণিত নর নারী সে জল-স্রোতে আপন আপন গা ভাসাইয়া দিল।

আমি সৈকতাশ্রয় করিয়া বসিতে চেষ্টা করিতেছিলাম, এমন সময় একটী বালিকা জলস্রোতে ভাসিয়া আসিয়া আমাকে আকুলভাবে চাপিয়া ধরিল।

বালিকা অর্দ্ধনগ্ন, উন্মুক্তকবরী। আমি আশ্রয় দিয়া বলিলাম—"ভয় নাই, লজ্জা নাই, কাপড় পর।"

আমি তাহাকে দুই হস্তে স্রোতের মুখে টানিয়া রাখিলাম। বালিকা আকুলভাবে, সরমে মরিয়া তাহার শিথিল বসন সংযত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। পুনরায় ভৈরব গর্জ্জনে আর এক তরঙ্গ আসিতেছে দেখিয়া, আমি তাহাকে টানিয়া তীরে লইয়া গেলাম। ষোড়শী বালিকা বসন সংযত করিয়া অবনত মস্তকে কাঁদিতে লাগিল।

আমি বালিকার মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"তোমার সঙ্গে আর কে এসেছে।" বালিকা কাঁদিতে লাগিল, কোন উত্তর করিল না।

আমাকে বালিকার উত্তরের জন্য প্রতীক্ষা করিতে হইল না। বালিকার পিতা উন্মত্তের ন্যায় ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন, এবং আমার নিকট পুনঃ পুনঃ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতে লাগিলেন। বৃদ্ধের বিনীত ও কৃতজ্ঞতা পূর্ণ ভাবে আমি বড়ই লজ্জিত হইলাম।

আমি বালিকার পিতাকে বিনামূল্যে একটী উপদেশ প্রদান করিবার প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারিলাম না। আমি বলিলাম "স্ত্রীলোকদিগকে এবং বালক বালিকাদিগকে একটু সাবধানে ঢেউ লওয়াইতে হয়।" প্রত্যুত্তরে ভদ্রলোকটী তাঁহাদের সাবধানতা অবলম্বন সত্ত্বেও যে এই ঘটনা ঘটিয়াছে এবং এই ঘটনাটীও যে সেই পরম কারুণিক মঙ্গলময়েরই কোন মঙ্গল ইচ্ছায় সংঘটিত হইয়াছে তাহা আমাকে বুঝাইয়া বলিলেন এবং পুনঃ পুনঃ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

দেখিলাম ভদ্রলোকটী অতিরিক্ত মাত্রায় ঈশ্বর বিশ্বাসী। তিনি জগতের প্রতি কার্য্যকেই মঙ্গলময়ের শুভ ব্যবস্থা বলিয়া মনে করেন। এইরূপ লোকই জগতে সুখী।

(৩)

পুরী হইতে ভুবনেশ্বর যাইতেছি। সন্ধ্যার প্রাক্কালে গাড়ীতে উঠিয়া একাগ্র মনে "গীতগোবিন্দ" খানা পড়িতে ছিলাম। গাড়ী ছাড়িয়া দিল। আমি পুস্তক বন্ধ করিয়া পাশ ফিরিলাম। আমার পার্শ্বে অবস্থিত ভদ্রলোকটী আমাকে অভিবাদন করিলেন। আমি সসঙ্কোচে প্রতিঅভিবাদন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম।—'আপনারা অদ্যই চলিয়া যাইতেছেন?'

ভদ্রলোকটী বলিলেন—"ভগবানের ইচ্ছায়, আজই যাচ্ছি।"

আমি বলিলাম—"বেশ্।"

ভদ্রলোকটী বিনীতভাব দেখাইয়া বলিলেন—"আপনি যে উপকার করেছেন তা ভুল্‌বার নয়! চিরদিন মনে থাক্‌বে।"

আমি লজ্জিত হইলাম।

বৃদ্ধের বাক্য বন্ধ হইল না। তিনি আমার নিবাস, জাতি, নাড়ী-নক্ষত্র—ক্রমে সকল বিষয়ের অনুসন্ধান লইয়া আমাকে ক্লান্ত করিয়া ফেলিলেন। তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দিয়া অবসন্ন হইয়া, শেষে আমি উচ্চৈঃস্বরে গীতগোবিন্দের শ্লোক গাইতে লাগিলাম। তিনিও ক্রমে চুপ করিতে বাধ্য হইলেন।

সাক্ষীগোপাল আসিয়া গাড়ীখানা ভরিয়া গেল। আরামের জন্য যে স্থানটুকু আয়ত্ত রাখিয়াছিলাম, সাক্ষীগোপাল-যাত্রিকের প্রবল বন্যায় তাহা হস্তচ্যুত হইতে চলিল দেখিয়া, পূর্ব্বদিনের বালিকার কথাটী আমার মনে উদয় হইল।

এই যে সেই বালিকা।

দাঁতে জিভ কাটিয়া গীতগোবিন্দ খুলিলাম। মনোরাজ্যে মহাপ্রলয় বহিয়া যাইতে লাগিল

গীত-গোবিন্দের প্রতি শ্লোক, আজ আমাকে নূতন ভাবে প্রমত্ত করিতে লাগিল। আমি নিরাশ হইলাম। গীত-গোবিন্দের শ্লোকের ভিতর আমি সেই বালিকার জীবন্ত মূর্ত্তি অনুভব করিতে লাগিলাম। সেই ফোটা ফোটা চোক্ দুটী—সুন্দর মুখ খানি—উন্মুক্ত কবরী—শিথিল বসন—আমি চক্ষু ঘুরাইয়া বালিকার মুখের দিকে চাহিলাম। কি সুন্দর মুখ!

বালিকা বসিয়া বসিয়া ঘুমাইতেছে। চন্দ্রালোকে তাহার উজ্জ্বল মুখ খানা—আরও উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। কপোলের চূর্ণ কুন্তল রাশি—প্রবল বায়ুতে আন্দোলিত হইতেছে। কি সুন্দর! কি সুন্দর!

যৌবনের প্রবল আকাঙ্ক্ষা যেন সহসা আমার সমস্ত সাধনা ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া ফেলিল। হস্তস্থিত 'গীত-

গোবিন্দ' খানা হস্ত হইতে স্খলিত হইয়া পড়িয়া গেল।

বুকের ভিতর প্রবল স্পন্দন অনুভব করিতে লাগিলাম। চক্ষু ফিরাইয়া, মুখ বাহির করিয়া, অভ্রভেদী পাহাড়ের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে মনকে ডুবাইতে চেষ্টা করিলাম, কিছুতেই মন প্রবোধ পাইল না। চক্ষু ঘুরিয়া ফিরিয়া সেই চন্দ্র কিরণ-স্নাত সুন্দর মুখ খানার উপরই পতিত হইতে লাগিল। আমি আমার এই অনিচ্ছা কৃত কর্ম্মের জন্য বিব্রত হইয়া পড়িলাম। বিবেক সহস্র চেষ্টা করিয়া চক্ষুকে প্রবোধ দিতে পারিল না। আমার চক্ষু যেন বহু যুগ পরে তৃপ্তির অমৃত সাগরে অবগাহন করিয়া নিজকে চরিতার্থ জ্ঞান করিতে লাগিল।

তন্দ্রা প্রতি চক্ষে আপন প্রভাব বিস্তার করিয়া বিরাজ করিতে ছিল। এই স্বর্ণ-সুযোগে আমার বহু যুগের বুভুক্ষু ও অতৃপ্ত চক্ষু যেন অনন্ত তৃপ্তি লাভ করিতে লাগিল। আর আমি? আমি যেন উপাস্য দেবতার সম্মুখে বসিয়া সিদ্ধির জন্য সাধনায় ব্রতী হইলাম।

উৎকলের উন্মত্ত পার্ব্বত্য অনিল আমার অকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধির সহায়তা করিতে লাগিল। নির্লজ্জ পবন বালিকার বসন অঞ্চল অপসারিত করিয়া ক্রমে আমার চক্ষের সম্মুখে এক মোহের রাজ্য উন্মুক্ত করিয়া দিল। আমি তদ্গত চিত্তে সেদৃশ্য উপভোগ করিতে লাগিলাম।

বালিকার তন্দ্রালসদেহ ঢলিয়া পড়িল। আমার সুখের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। চারি চক্ষের সম্মিলনে বড়ই অপ্রস্তুত হইলাম। বালিকা বসনাঞ্চল টানিয়া একটু সঙ্কুচিত ভাবে বসিল। আমার বুকের ভিতর হইতে যেন একটা পাষাণ নামিয়া গেল।

আমি আমার কম্বল খানা গাড়ীর মেঝেয় ফেলিয়া একটু শয়নের স্থান করিয়া ভদ্রলোকটীকে বলিলাম 'মেয়েটীর ঘুম পেয়েছে, তাহাকে এখানেই শুইতে বলুন।' তিনি আমার এই অপ্রত্যাশিত আদর উপেক্ষা করিলেন না। তাহার বালিকাও করিল না। আমি মনে পরমানন্দ উপভোগ করিলাম। অবশিষ্ট রজনী বালিকার পিতার সঙ্গে নানা সুখকর প্রসঙ্গে কাটিয়া গেল। ভুবনেশ্বর আমার মোহের ঘোরে কোথায় পড়িয়া রহিল, আমি তাহা চিন্তা করিতেও অবসর পাইলাম না।

(৪)

বাড়ীর অনেক 'বাধা-নিষেধ' সত্বেও আমি কলিকাতায় বিবাহ করিবার ইচ্ছা ত্যাগ করিতে পারিলাম না। পুরীর সমুদ্রসৈকতে বিনোদিনীকে যে ভাবে দেখিয়াছিলাম, ভুবনেশ্বরের পথে,—গাড়ীতে বসিয়া তাহাকে ঠিক সেই ভাবে দেখিতে পারি নাই।

গুরুদেব বলিয়াছিলেন

"কিমত্র হেয়ং?—কনকঞ্চ কান্তা।"

"কনক ও কান্তার সংসর্গে মুহূর্ত্তে জীবনের বহু পরিবর্ত্তন হয়। মহাযোগীর মহাসাধনা ব্যর্থ হইয়া যায়। অতএব বৎস, কনক ও কান্তাকে সর্ব্বদা দূরে রাখিবে।"

গুরুদেবের মহামূল্য উপদেশগুলি বিনোদিনীর সৌন্দর্য্য চিন্তার অন্তরালে পড়িয়া, আমার মন হইতে একেবারে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছিল। তার পর, তাহার পিতার অযাচিত নির্ব্বন্ধাতিশয্যে আমার সাধন মার্গের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিতেই বাধ্য হইলাম, এবং বিপত্নীকেরা পুনর্ব্বিবাহের সপক্ষে যে সকল নজির উত্থাপন করিয়া থাকেন, আমিও মনে মনে সেই সকল উত্থাপন করিয়া এক শুভ দিনে বিনোদিনীকে বিবাহ করিলাম।

ফুল শয্যায় শয়ন করিয়া বিনোদিনীকে বহু প্রশ্ন করিলাম। সাক্ষাতের পর, কি সমুদ্রসৈকতে, কি রেল গাড়ীতে, এ পর্য্যন্ত একদিনও তাহার মুখের কথা শুনিতে পাই নাই। তাই আবেগভরে একবারে বহুপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া ফেলিলাম। বিনোদিনী একই ভাবে, নীরবে থাকিয়া, আমার সকল প্রশ্ন ব্যর্থ করিয়াদিল। আমি দুঃখিত হইলাম, কিন্তু নিরাশ হইলাম না। বিনোদিনীর সৌন্দর্য্যমণ্ডিত নীরব চিত্রই এতদিন আমার হৃদয়রাজ্য অধিকার করিয়া রহিয়াছিল।

সে আমাকে তাহার কোমল বাহু বেষ্টনে বক্ষে টানিয়া লইয়া সকরুণ দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিয়া ইঙ্গিতে, মূকের স্বাভাবিক ভাষায়, তাহার মূকত্ব ও বধিরতার পরিচয় প্রদান করিল। সৌন্দর্য্য-মোহের পরিণাম—অনন্ত আত্মগ্লানিতে আমার বক্ষ-পঞ্জর বিদীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল।

শ্রীকেদারনাথ মজুমদার।

রণচণ্ডীর মন্দির।

জন্মাষ্টমী।

গরজে জলদ আজি গম্ভীরে গগনে,
সূচীভেদ্য অন্ধকারে আবৃত ভুবন!
যমুনা চলিছে গর্ব্বে মন্থর গমনে
প্লাবিয়া উভয় কূল সাগর সদন!
শৃঙ্খলিত কারাগারে, প্রহরী বেষ্টিত,
দেবকী নাথের সহ! সতী-অপমান
নির্দ্দোষের নিপীড়ন—হেরি আবির্ভূত,—
অধর্ম্ম নাশিতে হরি—পূর্ণ ভগবান্।
হাসিল দামিনী নভে, গর্জ্জিল অশনি,
শিহরি উঠিল কংস শয়ন মন্দিরে।
শান্তিসুধা বক্ষে আজি লভিল ধরণী,—
মকরন্দ গুপ্ত যথা কোরক মাঝারে!
তমঃ পলাইবে দূরে—উদিবে তপন!—
ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার পুণ্য আয়োজন।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

মাইবংএর ধ্বংশাবশেষ।

স্বাধীন কাছাড়ের পুরাতন রাজধানী মাইবং পূর্ব্বে দুরধিগম্য ছিল; কিন্তু আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ের কৃপায় এখন আর সেরূপ নহে। আসাম যাত্রীগণ রেলগাড়ী হইতেই এখন মাইবংএর প্রধান দ্রষ্টব্য "রণচণ্ডীর বাড়ী" দেখিতে পারেন।

মাইবং ষ্টেশন হইতে রণচণ্ডীর বাড়ী ২০ মিনিটের পথ। পথে ক্ষুদ্র একটী পার্ব্বত্য নদী। নদী পার হইলেই রণচণ্ডীর বাড়ী। রণচণ্ডীর মন্দিরটী দেখিলেই বোধ হয় নিকটবর্ত্তী পর্ব্বত হইতে স্খলিত বৃহৎ একখণ্ড প্রস্তর খুদিয়া যেন তাহা প্রস্তুত করা হইয়াছে। প্রায় ৮ হাত উচ্চ ভিত্তির উপর উহা অবস্থিত; মন্দিরে উঠিবার কোন সিঁড়ি নাই, কেবল ভিত্তি-গাত্রে ক্ষুদ্র বংশদণ্ড সাহায্যে কোন ক্রমে উপরে উঠিতে হয়। ভিত্তির উপরি ভাগের পরিসর সামান্য হইলেও মন্দিরের চতুর্দ্দিকে বারান্দার ন্যায় যথেষ্ট স্থান আছে। মন্দিরটী প্রায় ১০ ফুট লম্বা, ৭ ফুট প্রস্থ এবং ৫ ফুট উচ্চ। মন্দিরের ছাদ ও দেয়ালগুলি বেশ মসৃণ কিন্তু উহাতে কোনও প্রকার কারুকর্ম্মের নিদর্শন দেখা যায় না। পশ্চিমদিকের দেয়ালগাত্রে ঈষৎ উন্নতভাবে একটী মূর্ত্তির অস্পষ্ট রেখা ফুটিয়া উঠিয়াছে। উহাই "রণচণ্ডীর" মূর্ত্তি। পশ্চিমের দেয়ালের দক্ষিণ প্রান্তে এই মন্দিরের বৃত্তান্ত সম্বলিত একখণ্ড প্রস্তর লিপি সংলগ্ন আছে; উহা সংস্কৃত গদ্যে কিন্তু বঙ্গাক্ষরে লিখিত। ইহাতে কেবল যে বর্ণাশুদ্ধি আছে এমন নহে ভাষারও ভুল আছে।

শ্রীশ্রীরণচণ্ডি পদারবিন্দে মধুকরস্য
বগা গোহাই শ্রীশ্রীরায় * * * *
হিড়ম্বেশ্বর শ্রীশ্রী যুত হরি ই চন্দ্র নারায়ণ
নৃপস্য সক সুভমস্ত সকাব্দা ১৬৮৩
মাগসীর্ষস্য দ্বা * দিবস গতে ভুমি পু
ত্র বাসরে পাষা * নিম্মিতং প্রাসাদ
স * র্ণ মিতি।

এই লিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, রণচণ্ডী দেবীর চরণপদ্মে ভৃঙ্গস্বরূপ হিড়ম্বাধিপতি রাজা হরিশ্চন্দ্র নারায়ণ কর্ত্তৃক ১৬৮৩ শকের ১২ই অগ্রহায়ণ এই মন্দির নির্ম্মিত হয়।

প্রাচীনকালে কাছাড় হিড়ম্বরাজ্যে বলিয়া পরিচিত ছিল। এই শিলা লিপিতেও কাছাড়-রাজ নিজকে হিড়ম্বরাজ্যের অধিপতি বলিয়া পরিচয় দিতেছেন। বস্তুতঃ বৃটিশাধিকারের পরও কিছুকাল পর্য্যন্ত কাছাড়কে "হিড়ম্ব" বলা হইত। কাছাড়ের রাজাগণ আপনাদিগকে ভীম এবং হিড়িম্বার পুত্র মহাভারতোক্ত ঘটোৎকচের বংশীয় বলিয়া পরিচয় প্রদান করিতেন। এবং এই সূত্রেই বর্ত্তমান কাছাড়ীগণও ক্ষত্রিয় "বর্ম্মণ" বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করিয়া থাকেন।

কাছাড়ী ভাষায় "মাইবং" অর্থ ধান্য ক্ষেত্র। প্রকৃত প্রস্তাবে এই পার্ব্বত্য প্রদেশের মধ্যে এই স্থানেই ধান্য

১৫৩৬ খৃঃ অব্দে আহোমগণ কর্ত্তৃক ডিমাপুর হইতে বিতাড়িত হইয়া আসিয়া কাছাড়রাজগণ এই পর্ব্বতান্তর্ব্বর্ত্তী স্থানে রাজধানী সংস্থাপন করেন। এই স্থানে তাঁহারা বোধ হয় প্রায় ১৭০৭ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত নিরুপদ্রবে ছিলেন। ১৭০৭ খৃঃ অব্দে আহোমরাজ রুদ্রসিংহ তাঁহাদের বিরুদ্ধে এক অভিযান প্রেরণ করেন। তখন তাঁহারা এই স্থান হইতে পলায়ন করিয়া কাছাড়ের বর্ত্তমান প্রধান নগর শিলচরের ১২ মাইল উত্তরে খাসপুর চলিয়া যান। কিন্তু রণচণ্ডী মন্দিরের এই শিলালিপির—তারিখ১৬৮৩ শক বা ১৭৬১ খৃষ্টাব্দ হইতে প্রতীতি হয় যে, তাঁহারা তখনও মাইবং একবারে পরিত্যাগ করেন নাই।

খাসপুরের রাজপ্রাসাদ সমূহের ভগ্নাবশেষ মধ্যে প্রাপ্ত একখণ্ড প্রস্তরলিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে রাজা হরিশ্চন্দ্র নারায়ণ ১৬৯৩শকে (১৭৭১খৃঃ অব্দে) তথায় এক প্রাসাদ নির্ম্মাণ করেন। কাছাড়ের শেষ স্বাধীন রাজগণের মধ্যে খাসপুরে যাঁহাদের বাসস্থানের চিহ্ন দেখা যায় তন্মধ্যে ইনিই সকলের অগ্রবর্ত্তী; সুতরাং নিঃসন্দহে বলা যায় যে ১৭৭১ খৃঃ অব্দ হইতেই কাছাড়রাজগণ মাইবং সম্পূর্ণ রূপে পরিত্যাগ করেন।

মাইবং এ দর্শনযোগ্য আর বিশেষ কিছু নাই। ষ্টেশন হইতে প্রায় ১ মাইল দক্ষিণে এক বৃক্ষতলে তিনটী, প্রস্তর মূর্ত্তি দেখা যায়। ইহা কোন দেবতার কি মানুষের প্রতিমূর্ত্তি কিছুই বুঝাযায় না। যদি মানুষের প্রতিমূর্ত্তি হয় তবে সন্ন্যাসীর প্রতিমূর্ত্তি হওয়াই সম্ভব। মূর্ত্তিগুলি দেখিতে নেহাৎ নিন্দনীয় নয়। তবে অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির গঠনে সামঞ্জস্য রক্ষার ভাব একেবারেই নাই। সর্ব্বাপেক্ষা বড় মূর্ত্তিটীর চিত্র দেওয়া গেল। তথায় ইহা বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি বলিয়া পরিচিত। এই মূর্ত্তির মস্তক হইতে নাভিদেশ পর্য্যন্ত ২৯ ইঞ্চি কিন্তু নাভি হইতে পদদ্বয় মাত্র ২৫ ইঞ্চি লম্বা। তক্ষণরাজ্যে এই প্রকার খামখেয়ালি অনেক সভ্যতর দেশের শিল্প-সামগ্রীতেও বিদ্যমান দেখিতে পাওয়াযায়; সুতরং এখানে ইহা ক্ষমার যোগ্য।

এই স্থানে আরও দুইখান প্রস্তর লিপি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। উভয় লিপিতেই এক পাঠ দৃষ্ট হয়। লিপিব পাঠ এবং চিত্র উভয়ই প্রদত্ত হইল।

"শুভমস্তু শ্রীশ্রীযুত মেঘনারায়ণ দেব হাচেঙ্গসা
বংশত জাত রাজাহৈ মাইবাঙ্গ রাজত পাথরে
সিংহদ্বার বান্ধাইলেন শকাব্দা ১৪৯৮ বিতেরীখ আষাঢ় ২৬

লিপিদ্বয়ের অক্ষর একরূপ নহে।

এই লিপি পাঠ করিলে স্পষ্টই অবগত হওয়া যায় যে মেঘনারায়ণ দেব নামক হাচেঙ্গসা বংশজ কোন মাইবঙ্গ রাজ কর্ত্তৃক ১৪৯৮ শকের ২৬ আষাঢ় তাঁহার রাজধানীর সিংহদরজায় এই প্রস্তর দ্বয় সংলগ্ন করা হইয়াছিল।

এই লিপির উল্লেখিত রাজা মেঘনারায়ণের নাম কাছাড় ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায় না। সুতরাং এই প্রস্তর লিপি হইতে কাছাড় ইতিহাসের একটী অভিনব অধ্যায় আবিষ্কৃত হইবে সন্দেহ নাই।

রেলওয়ে লাইনের পার্শ্বেই এক স্থানে একটী ভগ্ন-মন্দিরের ভিত্তি আছে। শুনা যায় এই স্থানে পূর্ব্বে নরবলি হইত।*

শ্রীগিরিজাশঙ্কর ভট্টাচার্য্য

* অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ এম, এ মহাশয়ের প্রদত্ত উপাদান অবলম্বনে লিখিত এবং চিত্রগুলিও তাঁহারই অনুগ্রহে প্রাপ্ত।

ইব প্রাপ্ত প্রস্তর লিপি

নাথ প্রেস

১ম খণ্ড। | ঢাকা, আশ্বিন, ১৩১৮ সাল। | ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

সাধুভাষা বনাম চলিত ভাষা।

ইংরাজী শিক্ষার প্রথম হিড়িকে বাঙ্গালীর মুখে ইংরাজী বুলি ফুটিত, কলমের আগায় ইংরাজী বয়েদ ছুটিত, এমন কি তখনকার দিনে নাকি বাঙ্গালী ইংরাজীতে স্বপ্ন পর্য্যন্ত দেখিত। রাজা রামমোহন রায়, রাজনারায়ণ বসু, মাইকেল মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, সঞ্জীবচন্দ্র, রমেশচন্দ্র, কালীপ্রসন্ন, চন্দ্রনাথ, ইঁহারা সকলেই ইংরাজী রচনা লইয়া সাহিত্যের আসরে নামিয়াছিলেন। য়ুরোপেও যেমন এক সময় দেশভাষায় গ্রন্থ লিখিত না হইয়া সমগ্র য়ুরোপীয় বিদ্বৎসমাজে পঠিত হইবে বলিয়া ল্যাটিনে লিখিত হইত, আমাদের দেশেও সেই একই কারণে অনুরূপ ব্যাপার ঘটিয়াছিল; প্রাচীনতন্ত্রের লেখকগণ সংস্কৃতে ও নব্যতন্ত্রের লেখকগণ ইংরাজীতে লিখিতেন। যাহা হউক, কিছুদিন পরেই ইংরাজী সুরার সে তীব্র নেশা ছুটিয়া গিয়া বাঙ্গালীর সুমতি হইয়াছিল। একদিকে সংস্কৃতবিদ্যাবিশারদেরা দীনা বঙ্গভাষার প্রতি কৃপাদৃষ্টি করিলেন। অন্যদিকে ইংরাজীনবীশেরাও রাজার ঝিউরীর পায়ে তেল দেওয়া ছাড়িয়া দীনদুঃখিনী মায়ের ঘরে ফিরিয়া আসিলেন। ফল কথা, ইংরাজী-শিক্ষিত-সম্প্রদায় সত্বর ইংরাজী-লীলা-সংবরণ করিয়া মাতৃভাষায় সদগ্রন্থপ্রচারে প্রবৃত্ত হইলেন। স্মরণ রাখিতে হইবে, ইঁহারা কেহই অক্ষমতাবশতঃ ইংরাজী রচনা ছাড়েন নাই। সব্যসাচী অর্জ্জুন যেমন উভয় হস্তেই সমান দক্ষতার সহিত অস্ত্রচালনা করিতে পারিতেন, ইঁহারাও তেমনি উভয় ভাষায়ই সমান লিপিকুশল ছিলেন। জননী বঙ্গভাষার প্রতি স্নেহবশতঃই ইঁহারা দেশীয় ভাষায় গ্রন্থাদি-রচনা আরম্ভ করিলেন। কবি যথার্থই বলিয়াছেন—

> 'নানান্ দেশে নানান্ ভাষা।
> বিনা স্বদেশীয় ভাষা পূরে কি আশা॥'

প্রথম প্রথম ফ্যাশানটা চলিয়াছিল ভাল। ভক্তি-শ্রদ্ধা করিয়া যে যাহা মায়ের পায়ে আনিয়া দিত, ভক্তের পুষ্পাঞ্জলি বলিয়া তাহাই গৃহীত হইত। যে যাহা লিখিত তাহাই বাঙ্গালা হইত। ছাপান বই হইলেই সাহিত্য হইত। তা' সে পুরুষ পরীক্ষা বা প্রবোধচন্দ্রিকার শব্দাড়ম্বরময় জড়িমজড়িত ভাষায়ই হউক আর বিটকেল আলালী বা হুতোমী ভাষায়ই হউক। কিন্তু আজ কাল

আর তেমন সুবিধা নাই। এখন বাঙ্গালী পাঠকের বিচারশক্তি হইয়াছে, রুচি ও কাব্যবোধশক্তি জন্মিয়াছে। তাহার ফলে বাঙ্গালা লেখকদিগের উভয়-সঙ্কট উপস্থিত। বাঙ্গালা সাহিত্যের শুভানুধ্যায়ী সুহৃদ্‌গণ মুরুব্বী সাজিয়া নানারূপ সৎপরামর্শ দিতে আরম্ভ করিয়াছেন, সাহিত্যের আসরে রচনা-রীতি সম্বন্ধে নানান্তর ফরমাএশ চালাইতেছেন; বৈদ্যসঙ্কটে রোগী মারা যাইবার লক্ষণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সাধুভাষা বনাম চলিত ভাষা, ইহাই এখনকার সমস্যা। এসম্বন্ধে কয়েকটী কথা গুছাইয়া বলিব মনে করিয়াছি। নিরপেক্ষভাবে কথাগুলি বলিব ইচ্ছা করিয়াছি; তবে সর্ব্বত্র ঝোঁক সামলাইতে পারিব কিনা জানিনা। (Personal equation) ব্যক্তিগত বিশেষত্ব একবারেই বাদ দেওয়া কঠিন। জগতের শ্রেষ্ঠ কবি শেক্ষপীয়র কাল্পনিক চরিত্র অঙ্কিত করিতে গিয়াও নিজের মনের কথা নাকি মুখ ফসকাইয়া বলিয়া ফেলিয়াছেন, আমরা ত কোন্ ছার। বর্ত্তমান লেখক বিচারকের আসন অলঙ্কৃত করিতেছেন না, উকীলের সামলাও আঁটিয়া আসেন নাই। বরং তাঁহাকে আপনারা আসামী-শ্রেণীভুক্ত করিতে পারেন, কেননা তিনি সম্প্রতি দুই দুইখানা বই লিখিয়া চোরদায়ে ধরা পড়িয়াছেন।

কোন পক্ষ সাধুভাষার পক্ষপাতী, কোন পক্ষ চলিত ভাষার পক্ষপাতী। অনেকে দুই কুল রাখিতে চাহেন। আবার একদল 'চন্দ্রাহত' 'সাহিত্যিক' দেখা দিয়াছেন তাঁহারা 'তপ্তযৌবনে' 'অভ্যাসের দাস' হইয়া 'লেখনীর লাগাম খুলিয়া দিয়া' 'সাধারণ আত্মা (public spirit)' দেখাইয়া ফিরিঙ্গি বাঙ্গালার সাধনা করিতেছেন এবং 'সুবর্ণময় সুযোগে' 'চা বাটীতে তুফান তুলিয়া' 'অনুকূল বিলাতী হাওয়ায় পাল খাটাইয়া' মা বাপকে 'প্রিয় পিতা প্রিয় মাতা' সম্বোধনে 'উত্তম রাত্রি' দিয়া ভাষাটাকে জাহান্নমে পাঠাইবার জন্য মহাযাত্রা করিয়াছেন। দেখিয়া শুনিয়া আমরা দিশাহারা।

ভাষার দুইটা দিক্ আছে, সুবিধার দিক্ ও আর্ট বা কলাকৌশলের দিক্। দুইদিক্ হইতেই প্রশ্নটা বিচার করিয়া দেখি।

সাধুভাষার সপক্ষে যুক্তি।

(১) যাঁহারা সাধুভাষার প্রচলন চাহেন, সাহিত্য-কলার দিক্ হইতে তাঁহাদের এই যুক্তি যে, ভাষায় গ্রাম্যতাদোষবর্জ্জন ভদ্রসাহিত্যের উপযোগী। চলিত শব্দগুলি কথাবার্ত্তায় ও মহাজনের বা আদালতের কাগজপত্রে চলিতে পারে, কিন্তু সাহিত্যের ভাষায় সেগুলি অশোভন। আটপৌরে ও পোষাকী কাপড় একরূপ নহে। ঘরে যে কাপড়ে থাকা যায়, সে কাপড়ে সভায় যাওয়া, পাঁচজন ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করা চলে না। কোরা কাপড়, কোরা চাদর, কোরা জামা পরিয়া বাহিরে গেলে, লোকে পাড়াগেঁয়ে বলিয়া উপহাস করে। পরিচ্ছদের এ প্রভেদটুকু সকল সভ্য সমাজেই আছে। ভাষাও ত ভাবের পরিচ্ছদ। অতএব এক্ষেত্রেও ঐরূপ প্রভেদ থাকা সঙ্গত নহে কি?

(সাহিত্যকলার) আর্টের দিক্ হইতে সাধুভাষার সপক্ষে পূর্ব্বোক্ত কথাগুলি বলা যায়। আবার সুবিধার দিক্ হইতে সাধুভাষার সপক্ষে নিম্নলিখিত যুক্তি দেওয়া হয়। বাঙ্গালা ভাষা যতই সংস্কৃতানুগ ও প্রাদেশিকতা-বর্জ্জিত হইবে, ততই বাঙ্গালাদেশের সকল প্রদেশে বুঝিবার সুবিধা হইবে। শুধু তাহাই কেন, মারাঠী, হিন্দী, গুজরাটী, প্রভৃতি ভারতবর্ষের বিভিন্ন ভাষাভাষী দিগের পক্ষেও বুঝিবার সুবিধা হইবে; ফলে এ উপায়ে, রাষ্ট্রীয় একতা সংস্থাপিত হইবার পথ প্রশস্ত হইবে, কালে ভারতের সর্ব্বত্র এক ভাষা হইবে। ইহা কি বাঞ্ছনীয় নহে? হইতে পারে, এরূপ ভাষা অল্পশিক্ষিত লোকে বুঝিবে না। কিন্তু সাহিত্যক্ষেত্রে একটা অধিকারিভেদ চিরকালই আছে ও থাকিবে।

একটি রাজনৈতিক ব্যাপারের দরুণ প্রাদেশিকতা-বর্জ্জনের ধুয়াটা আজকাল আবার নূতন করিয়া জোর ধরিয়া উঠিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ এই দুইজন প্রতিভাশালী লেখক দক্ষিণবঙ্গের প্রাদেশিক শব্দ তাঁহাদিগের পুস্তকপ্রবন্ধাদিতে অল্পবিস্তর চালাইয়াছেন। তাঁহাদের দেখাদেখি দক্ষিণবঙ্গের আরও অনেক লেখক এই দিকে ঝুঁকিয়াছেন। কিন্তু আজকাল রাজনৈতিক

শিক্ষার প্রসারহেতু, রাষ্ট্রীয় অভিব্যক্তির সূচনাসূত্রে, 'সবাই স্বাধীন, সবাই প্রধান;' কোন প্রদেশই অন্য প্রদেশের কাছে খাটো হইতে চাহে না। কলিকাতার বা দক্ষিণবঙ্গের ভাষার সর্ব্বতোমুখী প্রভুতা সকলে মানিতে রাজী নহে। বাঙ্গালীর জাতিতত্ত্বে যে কলহ উঠিয়াছে, ভাষাতত্ত্বেও তাহার পুনরভিনয় চলিতেছে। পূর্ব্ববঙ্গ, উত্তরবঙ্গ, বলিতেছেন, "যদি প্রাদেশিকতা চলিবে, তবে আমাদের অঞ্চলের প্রাদেশিকতাই বা কি অপরাধ করিয়াছে? সকলেই কলিকাতার মুখ চাহিয়া থাকিব কেন? লর্ড কর্জ্জন ত তাহা নিষেধ করিয়া গিয়াছেন।" তাঁহারা আরও অনুযোগ করেন, "যখন 'ভাই ভাই এক ঠাঁই, ভেদ নাই ভেদ নাই,' এই মন্ত্র মুখে উচ্চারণ করিয়াছ তখন আবার একটা ভাষার ব্যবধান সৃষ্টি কর কেন? এরূপ প্রাদেশিকতা দ্বারা ভাষা দুর্ব্বোধ করিয়া তুলিলেই ত বঙ্গভঙ্গ প্রকৃত হইয়া দাঁড়াইবে। বঙ্গভাষারূপ

'মায়ের দুয়ারে দাঁড়াইয়া সবে ভুলে যাও অভিমান
এস ভাই এস প্রাণে প্রাণে আজি রেখোনারে ব্যবধান'।

এটা স্নেহের আবদার, ইহার উপর আর যুক্তিতর্ক চলে না।

প্রাদেশিক-শব্দ-ব্যবহারে সময়ে সময়ে যে বিড়ম্বনা ঘটে তাহার একটি বড় কৌতুকপ্রদ দৃষ্টান্ত মনে পড়িতেছে। ভাগলপুর-সাহিত্য-সম্মিলনে একটি পূর্ব্ববঙ্গীয় সুরসিক সুবিদ্বান্ সমব্যবসায়ী সাহিত্যিকের সহিত আলাপ-পরিচয় হইয়াছিল এবং সম্মিলনের পরে কিছুদিন তাঁহার সঙ্গে পত্রব্যবহার চলিয়াছিল। একখানি পত্রে একটু রসিকতা করিয়াছিলাম এবং ভাবিয়াছিলাম বন্ধুবর না জানি আমার নিপুণ রসিকতায় কতই পুলকিত হইয়াছেন। পত্রপ্রেরণের তিন মাস পরে একজন দক্ষিণবঙ্গীয় উৎকীর্ণলিপিশাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ সাহিত্যিকের মুখে প্রসঙ্গক্রমে শুনিলাম যে, ভাগ্যে তিনি ঘটনাচক্রে পূর্ব্ববর্ণিত বন্ধুটির নিকট গিয়াছিলেন তাই আমার পত্রের পাঠোদ্ধার করিয়া তিনি উক্ত বন্ধু ও তাঁহার কয়েকজন সহচরের হাস্যোদ্রেক করিতে পারিয়াছিলেন। একটি রসের কথার তিন মাস পরে সদ্গতি হইল, ইহা কি কম বিড়ম্বনা!

প্রাদেশিক-শব্দ-ব্যবহারের অসুবিধা।

চলিত-শব্দমাত্রই যে প্রাদেশিকতাদোষদুষ্ট ইহা জোর করিয়া বলা চলে না। কিন্তু চলিত শব্দ ব্যবহার করিতে গেলেই আশঙ্কা হয় যে হয়ত শব্দটি সকল প্রদেশে বুঝিবে না। অল্পদিন হইল দৈবাৎ একখানি শিশুপাঠ্য পুস্তক আমার হস্তগত হইয়াছে, তাহার ভূমিকায় পূর্ব্ববঙ্গের সাহিত্যভাস্কর ৺ কালীপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাসাগর মহাশয় বেশ একটু বড় গলা করিয়া ঘোষণা করিয়াছেন যে সেই পুস্তকে সর্ব্বত্র গৃহীত সর্ব্বত্র ব্যবহৃত সর্ব্বত্র সুপ্রচলিত সরল সহজবোধ্য খাঁটি বাঙ্গালা শব্দ আছে। কিন্তু পুস্তক খুলিয়া দেখিলাম, এই পুস্তকে ব্যবহৃত কতকগুলি শব্দ আমাদের অঞ্চলে অজ্ঞাত। অতএব চলিতশব্দ ব্যবহার করিতে গেলেই সেটা প্রাদেশিক কি না মনে এই বিতর্কের উদয় হওয়া অন্যায় নহে। বাঙ্গালা ভাষায় আজও এমন কোন অভিধান সঙ্কলিত হয় নাই, যাহা দেখিয়া কোন্ চলিত শব্দটা সকল অঞ্চলের লোকেরই বোধগম্য, ইহা জানিতে পারা যায়। পক্ষান্তরে সংস্কৃত শব্দ হাজারও বিকট হউক, অভিধানের সাহায্যে অন্ততঃ তাহার অর্থগ্রহ করা যাইতে পারিবে।

এক্ষণে, প্রাদেশিক-শব্দ-ব্যবহারে অর্থগ্রহের কিরূপ ব্যাঘাত ঘটিতে পারে, তাহা একটু সবিস্তরে দেখাইব।

এক অঞ্চলে যাহা উনুন অন্য অঞ্চলে তাহা আখা, এক অঞ্চলে যাহা হাঁড়ি অন্য অঞ্চলে তাহা পাতিল, এক অঞ্চলে যাহা সিদ্ধ চাউল অন্য অঞ্চলে তাহা উষ্ণা (উষ্ণ?) চাউল, এক অঞ্চলে যাহা আমন অন্য অঞ্চলে তাহা হৈঁউতি (উভয়ই হৈমন্তিকের অপভ্রংশ), এক অঞ্চলে যাহা মরাই অন্য অঞ্চলে তাহা গোলা, এক অঞ্চলে যাহা বিলাতী বা সূর্য্যিকুমড়া অন্য অঞ্চলে তাহা মিঠাকুমার আবার আর এক অঞ্চলে তাহাই ডিংলি, এক অঞ্চলে যাহা পল্‌তা অন্য অঞ্চলে তাহা নতি বা লতি (লতার অপভ্রংশ), এক অঞ্চলে যাহা ছোলা অন্য অঞ্চলে তাহা বুট, এক অঞ্চলে যাহা সুপারি অন্য অঞ্চলে

তাহা গুয়া, এক অঞ্চলে যাহা কুল অন্য অঞ্চলে তাহা বড়ুই (বদরী), এক অঞ্চলে যাহা পেয়ারা অন্য অঞ্চলে তাহা সপ্‌রি, এক অঞ্চলে যাহা ফুটি অন্য অঞ্চলে তাহা বাঙ্গি, এক অঞ্চলে যাহা শশা অন্য অঞ্চলে তাহা ক্ষীরাই, এক অঞ্চলে যাহা লাউ অন্য অঞ্চলে তাহা কদু। আবার দেখুন, এক অঞ্চলে যাহা আরশুলা অন্য অঞ্চলে তাহা তেলাপোকা আবার আর এক অঞ্চলে তাহাই তেলাচোরা, এক অঞ্চলে যাহা জোনাকী অন্য অঞ্চলে তাহা জোনী-পোকা আবার অন্য এক অঞ্চলে তাহাই জ্যোচ্ছনা পোকা, এক অঞ্চলে যাহা খ্যাংরা অন্য অঞ্চলে তাহা ঝাঁটা, এক অঞ্চলে যাহা মাড়ান (মর্দ্দ্) অন্য অঞ্চলে তাহা দলান (দল্), এক অঞ্চলের পৈতা অন্য অঞ্চলে নগুন, এক অঞ্চলের উলু অন্য অঞ্চলে জোকার, এক অঞ্চলের আড়িপাতা অন্য অঞ্চলে গাঁটা দেওয়া, এক অঞ্চলে ছ্যাঁদা (ছিদ্র) অন্য অঞ্চলে ফুটো (স্ফুট), এক অঞ্চলের বেস্পতি অন্য অঞ্চলে বিষ্যুৎ (উভয়ই বৃহস্পতির অপভ্রংশ), এক অঞ্চলের সেক্‌রা অন্য অঞ্চলে সোণার (উভয়ই স্বর্ণকারের অপভ্রংশ), এক অঞ্চলের ফর্সা অন্য অঞ্চলে ধলা, এক অঞ্চলের ঢেঙ্গা অন্য অঞ্চলে লম্বা।

আবার আর এক বিভ্রাট্ আছে। 'কোঠা' বলিলে এক অঞ্চলে ইটে প্রস্তুত ইমারত বুঝিবে অন্য অঞ্চলে প্রকোষ্ঠ (কুঠারি) বুঝিবে, 'দালান' বলিলে এক অঞ্চলে ইমারতের প্রশস্ত অংশবিশেষ বুঝিবে. অন্য অঞ্চলে ইষ্টকনির্ম্মিত গোটা গৃহটা বুঝিবে, 'পাটী' বলিলে এক অঞ্চলে শীতল-পাটী (!) বুঝিবে অন্য অঞ্চলে মাদুর বুঝিবে, 'ভুঁই' বলিলে এক অঞ্চলে মাটি (ground) বুঝিবে অন্য অঞ্চলে জমি (land for cultivation) বুঝিবে, 'সকাল' বলিলে এক অঞ্চলে প্রাতঃকাল বুঝিবে অন্য অঞ্চলে শীঘ্র বুঝিবে, 'বান' বলিলে এক অঞ্চলে জোয়ারের বান (bore) বুঝিবে অন্য অঞ্চলে বন্যা (flood) বুঝিবে, 'মরিচ' বলিলে এক অঞ্চলে গোল-মরিচ বুঝিবে অন্য অঞ্চলে লঙ্কা বুঝিবে, 'খড়ি' বলিলে এক অঞ্চলে চা খড়ি (chalk) বুঝিবে অন্য অঞ্চলে জ্বালানী কাষ্ঠ বুঝিবে, 'খড়' বলিলে এক অঞ্চলে গরুর খাদ্য বুঝিবে অন্য অঞ্চলে গরুর অখাদ্য বুঝিবে।

প্রাদেশিক উচ্চারণের ব্যতিক্রমেও জানা শব্দ অজানার মত হইয়া পড়ে (নিজ নিজ অঞ্চলের উচ্চারণানুযায়ী বাণান করিলে)। যথা উই, রুই ; ওঝা, রোজা ; ইকুন, উকুন ; কাৎলা, কাতল ; পোঁটলা, টোপলা ; কাবারি, ব্যাকারি ; বাকস ফুল, বাসক ফুল ; বেগুন, বাইগুন, বাগুন, বায়গোন ; কড়াই, কলাই, কলুই ; তেল, তোল, ত্যাল। 'ন' ও 'ল' লইয়া নদীয়া ও বর্দ্ধমানে বেশ একটু বৈপরীত্য আছে। নদীয়ার নৌকা, নাল, নাউ, নেবু, নেপ, নোয়া, নুচি, নক্ষ্মী, নতি, ন্যাখাপড়া ; বর্দ্ধমানের লৌকা, লদে (নদীয়া), লদী, লতুন, লিতাই, লারাণ, লেওয়া। আশ্চর্য্যের বিষয়, পূর্ব্ববঙ্গের লক্ষ্মীন্দ্র রাড়বাগ্‌ড়ী উভয়ত্রই নখিন্দর নামক হিংস্রজীবে পরিণত। এইরূপ 'র' ও 'অ' লইয়া, 'স' ও 'হ' লইয়া, র ও ড় লইয়া, চন্দ্রবিন্দুর উদয়াস্ত লইয়া এক অঞ্চলের সঙ্গে অন্য অঞ্চলের উচ্চারণের পার্থক্য আছে। নিজের অঞ্চলের উচ্চারণের মত বাণান চালাইলে বিভ্রাট্ ঘটিবে।

সাধুভাষার বিরুদ্ধে ও চলিত ভাষার সপক্ষে যুক্তি।

বিরুদ্ধবাদীরা পূর্ব্বোল্লিখিত যুক্তিগুলির নিম্ননির্দ্দিষ্ট প্রণালীতে খণ্ডন করেন।

(১) ভারতের সর্ব্বত্র বা বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র সহজ বোধ্য হইবে বলিয়া সংস্কৃতানুরূপ রচনার প্রচলন করিলে বাস্তবিকই সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে কি? সাধুভাষায় যদি এতই সুবিধা, তবে দেবভাষা সংস্কৃতভাষা থাকিতে এক সময় পালিভাষা ও প্রাকৃতভাষায় বিরাট্-সাহিত্যসৃষ্টি হইয়াছিল কেন? এ প্রশ্নের উত্তরে ইহাই কি মনে হয়না যে, ভাষাকে অতিমাত্র সাধু করিয়া তুলিলে, স্বাভাবিক নিয়মে প্রতিক্রিয়া (reaction) ঘটিয়া (protest) বিদ্রোহস্বরূপ, সাধারণ লেখক ও পাঠকবর্গের সুবিধার জন্য, একটা অপেক্ষাকৃত সরল ভাষার সৃষ্টি হইবেই হইবে? বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 'বেতাল পঞ্চ-বিংশতি'র ভাষার পাল্টা গাহিবার মতলবেই কি আলালী ভাষার সৃষ্টি হয় নাই? বেতালের ভাষা বিক্রমাদিত্য

ও তাঁহার নবরত্ন বুঝিতে পারেন, কিন্তু আপামরসাধারণ সে ভাষা বুঝিবে কি? সে ভাষা বুঝিতে যতটা বোধশক্তি আবশ্যক ততটা বোধশক্তি সকলের আছে কি? সে ভাষা বুঝিতে যতটা প্রয়াস আবশ্যক, ততটা প্রয়াস তাহারা করিবে কি? না, তাহারা প্রকৃত অধিকারী নহে বলিয়া তাহাদিগকে সাহিত্যরসাস্বাদনে বঞ্চিত থাকিতে হইবে? বিংশ শতাব্দীতে সাহিত্যসমাজে এরূপ জাতিভেদ সঙ্কীর্ণতাদোষদুষ্ট নহে কি? ইহাতে শিক্ষিতসম্প্রদায় ও অশিক্ষিত সাধারণ লোকের মধ্যে ব্যবধান আরও বাড়ান হইবে না কি?

(২) রাজনৈতিক যুক্তি দিয়া যাঁহারা প্রাদেশিকতা-বর্জ্জিত সংস্কৃতানুগ রচনার প্রচলন করিতে চাহেন, তাঁহাদিগকে বিরুদ্ধবাদীরা একটি পাল্টা রাজনৈতিক যুক্তি দেখান। যথা, ভাষা অতিরিক্ত সংস্কৃতানুগ করিলে আমাদের মুসলমান ভ্রাতৃগণের আপত্তি হইবে। তাঁহাদিগকে বাঙ্গালাভাষাকে মাতৃভাষা বলিয়া স্বীকার করিতে উপদেশ দিয়া, পরক্ষণেই 'যাবনিক' শব্দ পরিহার করিয়া নিরবচ্ছিন্ন সংস্কৃত শব্দ প্রচলন করিয়া ভাষাকে অনুস্বার-বিসর্গহীন সংস্কৃত করিয়া তুলিলে কি তাঁহাদের প্রতি সুবিচার ও প্রীতিপ্রদর্শন করা হইবে? ভারতবর্ষের অথবা বাঙ্গালাদেশের সব প্রদেশ এক করিতে গিয়া হিন্দুমুসলমানসমস্যা আরও জটিল করিয়া তুলিলে কি দেশের প্রকৃত কল্যাণসাধন করা হইবে? ইহা একটা বিষম সমস্যা।

ফলতঃ ভাষা অত্যন্ত সংস্কৃতানুগ করিতে গেলে কোন কোন শ্রেণীর পাঠককে (ও লেখককে) হারাইতে হইবে। আবার নিছক চলিত (Colloquial) ভাষা গ্রন্থাদিতে বেজায় রকম চালাইতে গেলে অপর কয়েক শ্রেণীর পাঠককে (ও লেখককে) হারাইতে হইবে। লাভলোকসান উভয় দিকেই আছে। কথাবার্ত্তার ভাষা ও সাহিত্যের ভাষা উভয়ের মধ্যে প্রভেদ যত কম থাকে ততই সুবিধা এ কথাও যেমন সত্য, আজকাল রেলওয়ে ডাকঘরের যুগে দেশের সকল প্রদেশে পরিগৃহীত হইতে পারে এরূপ কেতাবী ভাষার চল হওয়া উচিত, একথাও তেমন সত্য।

(৩) সাহিত্য শব্দটি বাঙ্গালায় ব্যাপক অর্থে প্রচলিত। লোকশিক্ষার (Mass education) জন্য যে সকল পুস্তক ও প্রবন্ধ লিখিত হয় তাহাও সাহিত্য (অর্থাৎ literature) বলিয়া পরিগণিত। এই শ্রেণীর সাহিত্যে চলিত ভাষা না চালাইলে কার্য্য উদ্ধার হইবে কি? মুদ্রাযন্ত্রের কল্যাণে, সংবাদপত্রাদির প্রচলনে, লোকশিক্ষার ক্রমশঃই প্রসার হইতেছে, পাঠক ও পাঠার্থীর সংখ্যা ক্রমশঃই বাড়িতেছে। এই নিত্যবর্দ্ধমান পাঠকসাধারণের নিকট কৃষি, বিজ্ঞান, ব্যবহারিক-বিজ্ঞান, স্বাস্থ্যরক্ষা, বাণিজ্য প্রভৃতির নূতন তত্ত্বগুলি, এমন কি কাব্য ও দর্শনের ধর্ম্ম ও নীতির স্থূলতত্ত্বগুলি, পৌঁছাইয়া দিতে গেলে সংস্কৃতানুগ রচনার আশ্রয় লইলে চলিবে কি? আখমাড়া ও চিনি তৈয়ারীর বৈজ্ঞানিক প্রণালী, পাট বা নালিতার চাষ, ভারতের খটখটি তাঁত, চামড়ার কারখানা, যৌথ কারবার, যৌথঋণদান-সমিতি প্রভৃতি সম্বন্ধে অল্পশিক্ষিত লোকদিগকে নূতন নূতন কথা শুনাইতে হইলে চলিত ভাষার ব্যবহার অনিবার্য্য নহে কি?

(৪) ইঁহারা আরও বলেন, শিশুদিগকে নিরবচ্ছিন্ন আমোদ বা আমোদব্যপদেশে শিক্ষা দিবার জন্য গত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে বিলাতে একটা শিশুসাহিত্য (Juvenile Literature) উদ্ভাবিত হইয়াছে ও সেই প্রণালীর অনুসরণে বঙ্গীয় লেখকগণ বাঙ্গালা সাহিত্যেও ঐরূপ একটা সাহিত্যের সৃষ্টি ও পুষ্টি করিতেছেন। সে সাহিত্যে সরল সরস ভাষা প্রয়োগের দরকার। ছোট ছেলেমেয়েরা দিদিমা, ঠাকুরমা, মাসিমা, পিসিমার মুখ হইতে যে মেয়েলি ভাষায় রূপকথা শুনে তাহাই এপ্রকার শিশুসাহিত্যের প্রকৃত উপযোগী। দংষ্ট্রাবিদারী শব্দ ব্যবহার করিলে তাহাদের আমোদ বোধ হইবে কি?

তবে এই উভয়শ্রেণীর সাহিত্যের বেলায় একথাও ভাবিবার বিষয় যে চলিত শব্দ ব্যবহার করিলে সকল অঞ্চলের অল্পশিক্ষিত সাধারণ লোকও শিশুগণ বুঝিবে কিনা? না, স্থানে স্থানে অস্যার্থঃ করিয়া অন্যান্য প্রদেশে প্রচলিত চলিত শব্দ প্রতিশব্দ দিয়া পাদটীকার ব্যবস্থা করিতে হইবে? এখানেও উভয়সঙ্কট। কলিকাতায় চলিত ভাষায় এ সকল পুস্তক লিখিত হইবে এবং রাজধানীর ভাষা বাঙ্গালীমাত্রেই জানা উচিত এ হুকুম জারি করিলে সেটা নিতান্ত জুলুম হইবে না কি?

এ পর্য্যন্ত সুবিধার তরফ হইতে প্রশ্নটির বিচার করা গেল। এক্ষণে আর্ট বা সাহিত্যকলার দিক্ হইতে চলিত ভাষার সপক্ষে কি কি বলিবার আছে আলোচনা করা যাউক। গার্হস্থ্যজীবনের চিত্র, পল্লীচিত্র, নাটক নভেলের কথোপকথন, রসরঙ্গময় রচনা, সাহিত্যের এ সকল ক্ষেত্রে নিরবচ্ছিন্ন সাধুভাষা-প্রয়োগ অস্বাভাবিক ও অশোভন নহে কি? এ সকল স্থলে চলিত শব্দগুলি বাদ দিলে জাতীয় জীবনের সঙ্গে সাহিত্যের সংযোগসূত্র ছিন্ন হইয়া যায় এবং একটা কৃত্রিম আড়ষ্ট ভাষার সৃষ্টি করা হয়। শেক্ষপীয়রের Comedy of Errorsএর ন্যায় হাস্যরসোদ্দীপক নাটক 'গোড়ায় গলদে'র ভাষায় অনুবাদ না করিয়া 'সীতার বনবাস' বা 'কাদম্বরী'র ভাষায় অনুবাদ করাতে 'ভ্রান্তিবিলাসে রসভঙ্গ হয় নাই কি? ঠিক ছবিখানি ফুটাইয়া তুলিতে হইলে, কৌতুকহাস্য যাহাতে স্বতঃ উৎসারিত হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইলে, চলিত ভাষা ছাড়া গত্যন্তর নাই। এক্ষেত্রে নিরবচ্ছিন্ন সাধুভাষা ব্যবহার করিলে যে তাল ঠিক রাখা যায়না তাহার প্রমাণ "ভ্রান্তিবিলাসেই" রহিয়াছে। এই পুস্তকের একস্থলে দেখিতেছি—"আমি দিদিকে ডাকিয়া দিতেছি; অতঃপর তিনি আপনার মামলা আপনি করুন।" এখানে এক "অতঃপর" ই সাধুভাষার মান রাখিয়াছে, অবশিষ্ট চলিত শব্দ, তাহার ভিতর আবার একটা "যাবনিক" শব্দ। কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্।

বাস্তবিক, চলিত শব্দ ব্যবহার না করিলে যে অনেক স্থলে ছবিখানি ভাল ফুটিয়া উঠেনা (Picturesqueness is sacrificed) এ যুক্তির সারবত্তা আছে। 'দিশাহারা না বলিয়া 'দিগ্‌ভ্রান্ত' বলিলে, 'হতভম্ব' না বলিয়া 'কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়' বলিলে, 'মনগড়া' না বলিয়া 'মনঃকল্পিত' বা 'স্বকপোলকল্পিত' বলিলে তাদৃশ আপত্তিকর হয় না বটে; কিন্তু 'তেলগোল' বা 'তেলচুকচুকে' বা 'তেলা' বলিলে যে ছবিখানি মানসচক্ষুঃর সম্মুখে ফুটিয়া উঠিবে, 'মসৃণ' বলিলে তাহা উঠিবে না। 'হৃষ্টপুষ্ট' মন্দনহে কিন্তু 'গোলগাল' 'নাদুসনুদুস' 'গ্যামাগোমা' আরও পরিষ্কার করিয়া ছবিখানি তুলিয়া দেয় না কি? আবার স্থূলকলেবরের সঙ্গে কদর্য্যগঠনের সংমিশ্রণ বুঝাইতে 'গ্যাপসাগোপসা' যে ভাবটি আদায় করে, তাহা বুঝাইতে সংস্কৃত শব্দ হারি মানে না কি? 'গজেন্দ্রগামিনী' কামিনী মনোহারিণী বটে, কিন্তু 'গদাইলস্করী চা'লে, যে গরজের একান্ত অভাবের সঙ্গে অতিধীরমন্থর গমন বুঝায়, তাহা প্রকাশের কি উপায়? 'দুষ্মন্ চেহারা' বলিলে প্রাণটা যেরূপ আঁতকাইয়া উঠে, 'আততায়ীর আকৃতি' বলিলে সেরূপ হয় কি? ফল কথা, হিমসিম খাইয়া যাওয়া, আদাজল খাইয়া লাগা, উপরপড়া হইয়া কথা বলা, ভ্যব্যাচ্যাকা লাগিয়া যাওয়া, আড়ে হাতে লাগা, গচ্ছা দেওয়া, আমড়াগেছে, মিঠেকড়া বুলি, আক্কেলসেলামী, গোবরগণেশ, ম্যাড়াকান্ত, বিষপুঁটুলি, ন্যাকামি, ঠিকে ভুল, প্রভৃতি চলিত শব্দ এবং চলিত প্রবাদবাক্যগুলি এমন সুন্দর ভাবদ্যোতক (expressive) যে এগুলিকে 'কোণঠেসা' বা নির্ব্বাসিত করিলে ভাষা সত্যসত্যই দরিদ্র হইয়া পড়িবে। *

অবশ্য দেশকালপাত্র বুঝিয়া সাধুভাষা ও চলিত ভাষার প্রয়োগের উপযোগিতা স্থির করিতে হইবে। 'স্বস্তিবাচনে প্রমাদ' লিখিবারও স্থান আছে, 'বিসমোল্লায় গলদ' বা 'গোড়ায় গলদ' লিখিবারও স্থান আছে। সকল জায়গায়ই গাইগরু ধেনুতে, ষাঁড় বৃষে, ভেড়া বা মেড়া মেষে, টিক্‌টিকি জ্যেষ্ঠীতে, ঢোঁড়া ডুণ্ডুভে, আস্তাবল মন্দুরায়, রান্নাঘর পাকশালায়, পাগড়ী উষ্ণীষে, বেড়া বৃতিতে, হাড়চামড়া অস্থিত্বকে, কাপড়চোপড় বসনভূষণে, ঘটীবাটী তৈজসপত্রে, পলতা পটোলপত্রে, সুপারি গুবাকে, পরিণত হইলে, হাঁই না তুলিয়া অনবরত জৃম্ভণ করিতে থাকিলে, ঢেকুর না তুলিয়া উদ্গার তুলিলে, মুচকি হাসি না হাসিয়া মধ্যম হাস্য করিলে, সাড়া না দিয়া সংজ্ঞাদান করিলে, ছাইচাপা আগুনমাত্রেই ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নিরূপ ধারণ করিলে, জোয়ারভাটা 'ভাগীরথীজলস্যাপি স্ফীততান্যূনতাদিকং' হইয়া উঠিলে, রামাশ্যামা পর্য্যন্ত যজ্ঞদত্ত দেবদত্ত হইয়া দাঁড়াইলে, কিঞ্চিৎ বেতালা হইয়া পড়িবে না কি?

* এই শব্দগুলি কখনই নির্ব্বাসিত হইবে না। কথোপকথনের ভাষায় এগুলি চিরদিন রহিবে। কিন্তু নাটক নভেল ভিন্ন অন্য শ্রেণীর পুস্তকে ইহাদের প্রচলন বাঞ্ছনীয় নহে। সং সং।

মীমাংসার চেষ্টা।

সব দিক্ দেখিয়া, সাধুভাষা বনাম চলিত ভাষা এই মামলার মীমাংসা করিতে হইলে, আধা ডিক্রী আধা ডিস্‌মিস্ ছাড়া উপায় নাই। বাস্তবিক, হাকিম বঙ্কিমচন্দ্র যে কাজীর বিচার করিয়া দিয়াছেন, যিনি যাহাই মুখে বলুন, সকলেই তাহা মাথা পাতিয়া লইয়াছেন। রোখের মাথায় টেকচাঁদঠাকুর যে আলালী ভাষা চালাইয়াছিলেন, তাহার পুনঃপ্রচলন বোধ হয় এখনকার দিনে কেহই চাহেন না। নিরবচ্ছিন্ন সাধু-ভাষায় রচনারীতির প্রাণবস্ত বিদ্যাসাগর তারাশঙ্কর অক্ষয়কুমার দত্তের সঙ্গে সঙ্গেই উড়িয়া গিয়াছে, এখন তাহার কঠোর অস্থিপঞ্জর পাঠ্য-পুস্তক-নির্ব্বাচন-সমিতির বায়ুশূন্য টীনের কৌটায় রক্ষিত। মুষ্টিমেয় লেখক প্রাচীন রীতি আঁকড়াইয়া আছেন, ফলে তাঁহাদের পাঠক যুটিতেছে না। তাই বলিতেছিলাম, বঙ্কিমচন্দ্র সাধুভাষা ও চলিত ভাষার সংমিশ্রণে যে অপূর্ব্ব রচনারীতির প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন, তাহাই প্রকৃষ্ট প্রণালী; সকল সুলেখকই সেই মহাজনের পথ ধরিয়াছেন।

ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, বঙ্কিমচন্দ্রের রচনারীতির অনুসরণ করিলেও তাঁহার ভাষার অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্য ও সৌন্দর্য্যটুকু সকল লেখক আয়ত্ত করিতে পারেন না। যেমন স্নিগ্ধকর অনিল ও সলিল যৌগিক পদার্থ হইলেও রাসায়নিক প্রণালীতে উদ্ভূত, Mechanical Compound নহে, বঙ্কিমচন্দ্রের রচনারীতিও সেইরূপ সিদ্ধহস্ত প্রতিভাশালী লেখক ভিন্ন অন্য কেহ এই রচনারীতিতে কৃতকার্য্য হইবে না। আধাছানার সন্দেশ সকলেই প্রস্তুত করিয়া থাকে কিন্তু ভীমনাগের মত সু-তার সকলের পাকে হয় না। রাং তামা সকল কাঁসারিই মিশায়, কিন্তু সকলে খাগড়াই নমুনার বাসন গড়িতে পারে না। ঠিক মিশাল না হইলেই ভরুণে হইয়া যায় ম্যাড় ম্যাড় করে। ভাষায়ও ঠিক মিশাল না দিতে পারিলে (bathos) হাস্যকর ভাব আসিয়া পড়ে। প্রকৃত পক্ষে সাহিত্যকলা, অন্যান্য সুকুমার কলার ন্যায়, কতকটা শিক্ষাসাপেক্ষ ও কতকটা প্রতিভাপ্রসূত।

বোধহয় ভীমনাগের সন্দেশের ভিয়ানে চিনির চেয়ে ছানার পরিমাণই একটু বেশী থাকে। নামটা অথচ আধাছানা। আদর্শ বাঙ্গালা রচনায়ও বোধ হয় সংস্কৃত চিনির চেয়ে চলিত শব্দের ছানা একটু বেশী থাকিবে। ছানা দুধের বিকার, অথচ মুখরোচক। অনেক চলিত শব্দও সংস্কৃত শব্দের বিকার, অথচ মুখরোচক। বঙ্কিমচন্দ্র ও কালীপ্রসন্ন ঘোষ দুই জন সুলেখকই এতৎসম্বন্ধে এক রকম রায় দিয়াছেন। রায়ের নকল নিম্নে দিতেছি।

"রচনার প্রধান গুণ এবং প্রথম প্রয়োজন, সরলতা এবং স্পষ্টতা। যে রচনা সকলেই বুঝিতে পারে, এবং পড়িবামাত্র যাহার অর্থ বুঝা যায়, অর্থগৌরব থাকিলে তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট রচনা। তাহার পর ভাষার সৌন্দর্য্য: সরলতা এবং স্পষ্টতার সহিত সৌন্দর্য্য মিশাইতে হইবে। প্রথমে দেখিবে তুমি যাহা বলিতে চাও কোন্ ভাষায় তাহা সর্ব্বাপেক্ষা পরিষ্কাররূপে ব্যক্ত হয়। যদি সরল প্রচলিত কথাবার্ত্তার ভাষায় তাহা সর্ব্বাপেক্ষা সুস্পষ্ট ও সুন্দর হয়, তবে কেন উচ্চ ভাষার আশ্রয় লইবে? যদি সংস্কৃতবহুল ভাষায় ভাবের অধিক স্পষ্টতা এবং সৌন্দর্য্য হয়, তবে সামান্য ভাষা ছাড়িয়া সেই ভাষার আশ্রয় লইবে। যদি তাহাতেও কার্য্যসিদ্ধি না হয়, আরও উপরে উঠিবে; প্রয়োজন হইলে, তাহাতেও আপত্তি নাই। নিষ্প্রয়োজনতাই আপত্তি।" **বঙ্কিমচন্দ্র**। "পুরাতন সংস্কৃত ও নূতন বাঙ্গলা উভয়ই আদরের বস্তু, উভয়ই আমাদিগের প্রাণপ্রিয়। সংস্কৃতকে ছাড়িয়া দিলে বাঙ্গলার কিছুই থাকেনা; আর বাঙ্গলা রচনায় যদি সুরুচির পরিচায়ক সহজবোধ্য বাঙ্গলা শব্দ যথেষ্ট ঠাঁই না পায় তাহা হইলে সে বাঙ্গলা, বিদ্যাসাগর ও তারাশঙ্কর প্রভৃতির মত ব্যক্তিবিশেষের হাতে অর্থবোধক হইলেও প্রায়শঃ সুন্দর হয়না এবং কখনও স্বাদগ্রাহী বাঙ্গালীর হৃদয়হারিণী হইতে পারে না। কিন্তু এই দুইএর সুচারু মিশ্রণ অবশ্যই একটু বেশী যত্নসাপেক্ষ।"

গুরুচণ্ডালী দোষ।

এক সম্প্রদায় বলেন, সাধুভাষা ও চলিত ভাষার এরূপ সংমিশ্রণে গুরুচণ্ডালী দোষ হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের

প্রথম উদয়কালে দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ প্রমুখ পণ্ডিত সম্প্রদায় বিদ্রূপ করিয়া এই অভিনব রচনারীতিকে 'মরা-দাহ' বা 'শবপোড়া' নামে অভিহিত করেন। অবশ্য, ঠিক মিশাল দিতে না পারিলে এরূপ রচনা-রীতিতে (bathos) হাস্যকর ভাব আসিয়া পড়ে তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কিন্তু উভয়রীতির এরূপ সংমিশ্রণ বাঙ্গালাভাষার মজ্জাগত, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। প্রাচীন বাঙ্গালা কবিদিগের রচনায়, মাইকেলের ওজস্বিনী রচনায়, আলালী রচনায়, কালীপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাসাগরের রচনায়, পণ্ডিতসম্প্রদায়ের রচনায়. অন্যে পরে কা কথা স্বয়ং বিদ্যাসাগর মহাশয়ের রচনায়, এরূপ সংমিশ্রণ রহিয়াছে। • একা বঙ্কিমচন্দ্রকে দোষী করিলে চলিবে কেন? উদাহরণ দ্বারা কথাটা প্রমাণ করিব।

ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে,—

"অতি বড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ
কোন গুণ নাই তার কপালে আগুন।
গঙ্গা নামে সতা তার তরঙ্গ এমনি
জীবনস্বরূপা সে পতির শিরোমণি।"

ইত্যাদিস্থলে 'বৃদ্ধ' 'নিপুণ' 'তরঙ্গ' 'জীবনস্বরূপা' 'শিরোমণি'র ন্যায় সংস্কৃত শব্দও রহিয়াছে, আবার 'বড়' 'তা'র' 'এমনি' 'আগুন' 'সতার' মত চলিত শব্দও রহিয়াছে। মাইকেলের 'মহেষাস' 'ইরম্মদ' 'হর্য্যক্ষ' 'দম্ভোলি' সর্ব্বজনবিদিত; কিন্তু 'আঁধার' 'বাঘিনী' 'পাতা' (কুল), 'সাজ,' 'তবুও,' ইত্যাদি শব্দের অভাব নাই, চলিত বাঙ্গালা ক্রিয়াপদ ত যথেষ্ট। ['একাকিনী শোকাকুলা' হইতে 'ও অপূর্ব্বরূপে' পর্য্যন্ত অংশ চতুর্থ সর্গে দেখিলেই চলিবে।]

অনেকের ধারণা, 'আলালের ঘরের দুলাল' নির্ভেজাল চলিত ভাষায় রচিত। কিন্তু ইহা ভ্রান্ত ধারণা। এই পুস্তকে সংস্কৃত শব্দের অভাব নাই। তবে সেই সঙ্গে যে সকল চলিত শব্দ, এমন কি (slang) চাষাড়ে শব্দ, পার্শী আরবী লবজ পূর্ব্বে কখন কেতাবী ভাষায় কেহ ব্যবহার করিতে সাহসী হইত না, সেগুলিও ব্যবহৃত হইয়াছে। ফলে ভাষাটাও বিকট হইয়াছে, পদে পদে গুরুচণ্ডালী দোষও দাঁড়াইয়াছে। যথা, 'বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরা ভঙ্গিক্রমে তোষামোদ করিত আর এলোমেলো লোকেরা একবারেই জল উঁচুনীচু বলিত'। 'জামাতারা কুলীন, অনেকস্থানে দারপরিগ্রহ করিয়াছিল—বিশেষ পারিতোষিক না পাইলে বৈদ্যবাটীর শ্বশুরবাটীতে উকিও মারিত না'। 'বেণী বাবু অধ্যয়নানন্তর গামোছা দিয়া উঠিয়া তামাক খাইতেছেন, ইত্যবসরে একটা গোল উপস্থিত হইল'। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম রচনা 'দুর্গেশনন্দিনী'তেও ভাষা সর্ব্বত্র মিষ্ট হয় নাই। ব্রাহ্মণপণ্ডিতী ভাষা একবারে ছাড়িতে তখনও তাঁহার সাহস হয় নাই।

পক্ষান্তরে, ৺ কালীপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাসাগরের ভাষায় একটিও গ্রাম্য শব্দ নাই, তিনি নিরবচ্ছিন্ন সাধুভাষা প্রয়োগ করিয়াছেন, এরূপ ধারণাও অনেকের আছে। কিন্তু ইহাও ভ্রান্ত ধারণা। সম্প্রতি "ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলনে" তাঁহার যে 'গীতগৌরাঙ্গ' প্রকাশিত হইতেছে তাহাতে চলিত শব্দের ভূরি ভূরি উদাহরণ দেখিতে পাইবেন। তাঁহার পূর্ব্বপ্রকাশিত পুস্তকাদিতেও চলিত শব্দের অভাব নাই।

তাহার পর, পণ্ডিত-সম্প্রদায়ের ভাষা। পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের প্রথম ইতিহাসলেখক। তাঁহার 'রোমাবতী' নামক আখ্যায়িকায় একদিকে 'পিচুমর্দ্দাশ্লিষ্টা মাধবীলতা', 'জ্বলনবিশোধিত জাতরূপ ও শাণোল্লীঢ় হীরকমালা' 'রাকানিশানাথের করস্পর্শ', 'রথ্যাসম্বাধ', 'গগন-কমলিনী-প্রসূন-পূতিগন্ধ', ইত্যাদি শব্দসমাবেশ আছে, আবার অন্যদিকে 'অগ্রে তোমার ত সাপের মুখে বাঘের মুখে পতিত হইবার ফললাভ হউক, পরে আমার যাহা হয় হইবে', 'এই ব্যাপার শ্রবণমাত্র রঞ্জনের আত্মাপুরুষ একবারে শুষ্ক হইয়া গেল এবং হৃদয় ছিন্নকণ্ঠ কপোতের ন্যায় ধড়ফড় করিতে লাগিল' এরূপ বাক্যও আছে। শেষোক্ত বাক্যটিতে 'ধড়ফড়' শব্দের প্রয়োগে গুরুচণ্ডালী দোষ হয় নাই কি?

অনেকে উঠিতে বসিতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রণালীতে পুস্তক রচনা করিতে বলেন। তাঁহারা মনে করেন. বিদ্যাসাগর মহাশয় সর্ব্বত্র সাধুভাষা প্রয়োগ করিয়াছেন, চলিত শব্দ তাঁহার রচনায় কুত্রাপি নাই।

কিন্তু এটিও ভ্রমাত্মক সংস্কার। 'কথামালা'র কথা ছাড়িয়া দিলেও 'শকুন্তলা', 'সীতার বনবাস' প্রভৃতি উপাদেয় গ্রন্থেও খুঁজিয়া দেখিলে গুরুচণ্ডালী দোষের উদাহরণ না মিলে এমন নহে। স্ত্রীলোকের কথাবার্ত্তায় সংস্কৃত নাটকে যেরূপ প্রাকৃত ভাষা প্রযুক্ত হয়, বিদ্যাসাগর মহাশয়ও সেইরূপ করিয়াছেন বলিলেও নিষ্কৃতি নাই। 'সীতার বনবাসে' গ্রন্থকারের নিজের উক্তিতে রহিয়াছে 'সমুদায় শ্রবণ করিয়া সকলেরই চক্ষের জলে বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইতে লাগিল' এখানে 'ভাসিয়া যাওয়া' চলিত শব্দ; 'চক্ষ'ও সংস্কৃত ভাষার নিয়মে দ।

তবে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, বিদ্যাসাগর মহাশয়, পণ্ডিত সম্প্রদায় ও ৺ কালীপ্রসন্ন ঘোষ প্রভৃতি সুলেখকগণের রচনায় চলিত শব্দের অনুপাত অত্যন্ত অল্প। এবং তাঁহাদের ভাষার কাঠামো সংস্কৃত উপাদানে তৈয়ারী।

যাঁহারা সাধুভাষার অতিমাত্র পক্ষপাতী, তাঁহারা যদি কখন দায়ে ঠেকিয়া একটা চলিত শব্দ (বিশেষ্য বা বিশেষণ) ব্যবহার করিতে বাধ্য হয়েন, তবে সেটা (inverted commas) উদ্ধরণ-চিহ্নের মধ্যে লেখেন; যেন শব্দটা অপাঙ্‌ক্তেয়, সাধুভাষার শব্দগুলি সংস্পর্শ-জনিত পাপে লিপ্ত না হয় সেজন্য এই সাবধানতা। ইহা কি জাতিভেদের দেশে অনাচরণীয় জাতিদিগের প্রতি সামাজিক ব্যবহারের অনুবৃত্তি? বলা বাহুল্য, বিদ্যাসাগর মহাশয়, ৺ কালীপ্রসন্ন ঘোষ প্রভৃতি সুলেখক-গণ এরূপ বিকট গোঁড়ামি দেখান নাই।

প্রাদেশিকতা চালান সম্বন্ধে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট। সকলেই স্ব স্ব প্রদেশের ভাষা স্বচ্ছন্দে চালাইতে পারেন, কোন বাধা নাই। তবে একটা শব্দ ছাপার বহিতে চালাইলেই যে তাহার চল হইবে এমন কোন কথা নাই। যিনি প্রতিভাশালী লেখক হইবেন, তাঁহার চালান- প্রাদেশিকতা চলিয়া যাইবে, প্রতিভার নিকটে সকলেই ঘাড় হেঁট করিবে। অধম লেখকের গ্রন্থ প্রাদেশিকতার জ্বালায় কেহ পড়িবে না। এখানে যোগ্য-তমের উদ্বর্ত্তন (Survival of the fittest)।

শব্দাবলি (Vocabulary)।

রচনারীতির বিচার প্রসঙ্গে শব্দাবলি সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলিয়াছি এক্ষণে আরও গোটা কতক কথা বলিয়া বক্তব্য শেষ করিব।

আরবী ও পারসী শব্দ।

বিপক্ষে যুক্তি।

আমাদের ভাষায় অনেক চলিত শব্দ আরবী ও পারসী হইতে আসিয়াছে। যে শব্দগুলি মূলে সংস্কৃত শব্দের সহিত অভিন্ন, কেবলমাত্র বাঙ্গালায় অপভ্রষ্ট আকারে প্রচলিত, সেগুলিকে যাঁহারা গ্রাম্য শব্দ বলিয়া রচনার ভাষা হইতে বিতাড়িত করিতে চহেন, শেষোক্ত 'যাবনিক' শব্দগুলির বেলায় ত তাঁহারা আরও খড়্গ-হস্ত। তাঁহারা সেগুলিকে ভাষা হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া তৎপরিবর্ত্তে সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার করিতে (প্রয়োজন হইলে উদ্ভাবন করিতে) পরামর্শ দেন। সামাজিক ক্ষেত্রে বর্ণসঙ্কর উৎপাদনের ন্যায় ভাষার ক্ষেত্রেও এরূপ ভাষাসঙ্কর-প্রচলনে তাঁহারা একবারেই নারাজ। বোধ হয় ভারতে মুসলমানশাসনের সকল চিহ্ন তাঁহারা ভাষার অঙ্গ হইতে মুছিয়া ফেলিতে ব্যগ্র।

সপক্ষে যুক্তি।

অপর পক্ষে বিরুদ্ধবাদীরা বলেন, যে শব্দগুলি বহু শতাব্দী ধরিয়া ভাষায় প্রবেশলাভ করিয়া একবারে অঙ্গাঙ্গিভাবে মিশিয়া গিয়াছে, 'অশ্বত্থপাদপজাত উপ-বৃক্ষের মত' শিকড় গাড়িয়া বসিয়াছে, সেগুলিকে উঠাইয়া দেওয়ার প্রস্তাব নিতান্তই গোঁড়ামি। অনেক স্থলে সেগুলি এত প্রয়োজনীয় ও নিত্য ব্যবহৃত যে সেগুলি উঠাইয়া দেওয়াও তত সহজ নহে। সেগুলির অভাবে ভাষা দরিদ্র হইয়া পড়িবে। তবে এ সকল শব্দ বেজায় রকম প্রয়োগ করিলে অবশ্য ভাষার ধাত খারাপ হইয়া যায়।

ইহা ছাড়া, এরূপ গোঁড়ামির ফলে আরবী, পারসী শব্দের বহিষ্কার ঘটিলে হিন্দুমুসলমানসমস্যা জটিলতর হইয়া উঠিবে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মুসলমান ভ্রাতৃগণকে বাঙ্গালাভাষা মাতৃভাষাস্বরূপ গ্রহণ করিতে অনুরোধ

করিয়া সঙ্গে সঙ্গে আরবী পারসী শব্দের উপর এরূপ জাতক্রোধ হইলে সঙ্গতি-রক্ষা (Consistency) হয় কি? বাঙ্গালা সাহিত্যের এমন একদিন ছিল যখন হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লেখকগণ সমভাবে বঙ্গ সাহিত্যের সেবা করিয়াছেন, ভেদজ্ঞান ভুলিয়া গিয়া বঙ্গভাষার পুষ্টিসাধন করিয়াছেন, ইতিহাসের এ অংশ বিস্মৃত হইলে ঘোরতর কৃতঘ্নতা হয়।

যাঁহারা বর্ণসঙ্করের ন্যায় ভাষাসঙ্করও ঘৃণার চক্ষে দেখেন, তাঁহারা ধরিয়া লন যে বঙ্গভাষা একমাত্র হিন্দুর ভাষা। কিন্তু ইতিহাস একথায় সায় দেয় না।

ইংরাজী শব্দ।

ইংরাজী অনেক শব্দও দিন দিন আমাদের ভাষায় প্রবেশ করিতেছে। উচ্চারণের অল্পবিস্তর বিকৃতি ঘটাইয়া স্থলবিশেষে শব্দটিকে নূতন ছাঁচে ঢালিয়া, বাঙ্গালার ধাতের সঙ্গে ঠিক রাখিয়া, সেগুলিকে ভাষার অঙ্গীভূত করিয়া লওয়া হইতেছে। অশিক্ষিত সাধারণ লোকে পর্যন্ত সে শব্দগুলি অজস্র ব্যবহার করিতেছে; দৃষ্টান্ত-স্বরূপ—গেলাস, ডিস, ডবল, রেল, টিকিট, লগেজ, টেলিগেরাপ, মনিঅর্ডার, পোষ্টকার্ড, রেজিষ্টারি, রসীদ, বিল, ইষ্টিশান, হোটেল, পেন্‌খ্যান, বগ্‌লস, ইস্ক্রুপ, র‍্যাপার, ফ্ল্যানেল, ডাক্তার, ভিজিট, বিস্কুট, সাগু, বার্লি, কুনিয়ান, বাক্স, ডেস্ক, সেলেট, পেন্সিল, পাশ, ফেল, কেলাস, এগ্‌জামিন, থিয়েটার, কলেরা, ম্যালেরিয়া ইত্যাদির উল্লেখ করা যায়। অনেক ব্যবসায়ে অস্ত্রের নাম ও পারিভাষিক শব্দগুলি ভারতীয় ব্যবসায়িগণ গ্রহণ করিয়াছে।

বিপক্ষে যুক্তি।

এক্ষেত্রেও, বিশুদ্ধির পক্ষপাতীরা বলেন যে এরূপ ধারকরা শব্দ লইলে ভাষার দারিদ্র্যমোচন হয় না, দারিদ্র্য আরও পরিস্ফুট হইয়া উঠে। ভাষাসঙ্কর বর্ণসঙ্করের ন্যায় বর্জ্জনীয়, তাঁহারা এ কথাও বলিয়া থাকেন। তাঁহারা দেখান, য়ুরোপীয় জাতিরা ভাষার ক্ষেত্রে যেরূপ আদান প্রদান চালাইতেছেন, রক্তের সংস্রব সম্বন্ধেও সেই নিয়মের অনুবর্ত্তন করিতেছেন। ভাষার শ্রীবৃদ্ধি ও জাতির উৎকর্ষ, উভয়ই এক নিয়মে সংসাধিত হইতেছে। কিন্তু হিন্দু আমরা যেমন সামাজিক ক্ষেত্রে এরূপ রক্তের সংমিশ্রণ বাঞ্ছা করি না, সেইরূপ ভাষার ক্ষেত্রেও এরূপ সংমিশ্রণ শ্রেয়স্কর মনে করি না। বলা বাহুল্য, এরূপ সাদৃশ্যমূলক প্রমাণ (Proof by analogy) ঠিক তর্ক শাস্ত্রসঙ্গত নহে। কেননা বাঙ্গালা ভাষাটা কেবল হিন্দুর ভাষা নহে।

সপক্ষে যুক্তি।

(১) সুবিধার তরফ হইতে প্রশ্নটি বিচার করিতে হইলে এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, যখন যে জাতি দেশে রাজা থাকে, তখন সে জাতির ভাষা হইতে দেশীয় ভাষায় শব্দ প্রবেশ ঘটিবেই, ইহার রোধ করা অসম্ভব। মুসলমান শাসনকালে যাহা ঘটিয়াছিল, আবার ইংরাজশাসনকালে তাহাই ঘটিতেছে; ইতিহাস নিজেকে পুনরাবৃত্ত করিতেছে (History repeats itself)। বিজেতৃ জাতির ভাষায়ও ত বিজিত জাতির শব্দ (জঙ্গল, পণ্ডিত, বখ্‌শীশ, লুঠ) প্রভৃতি অল্প পরিবর্ত্তিত আকারে প্রবেশ করিতেছে, কৈ তাঁহারাত সেগুলিকে ঘৃণার চক্ষে দেখেন না ও ভাষা হইতে নিষ্কাসিত করিতে চাহেন না। ভাষার ক্ষেত্রে তাঁহারা বিজেতা হইয়াও যেটুকু পরাধীনতার পরিচয় দেন, আমরা বিজিত হইয়াও কি সেটুকু ন্যূনতা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি?

(২) আর এক কথা। ভাষার শ্রীবৃদ্ধিসাধন করিতে হইলে নূতন নূতন ভাবপ্রকাশের জন্য, নূতন নূতন বস্তু-নির্দ্দেশের জন্য, নূতন নূতন প্রয়োজনসিদ্ধির জন্য, সভ্যতার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, চারিদিক্ হইতে শব্দ গ্রহণ করা নিতান্ত আবশ্যক। সমৃদ্ধ ইংরাজীভাষা ইহার জলন্ত উদাহরণ। যাঁহারা সংস্কৃতভাষা গভীরভাবে আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা দেবভাষা সংস্কৃত ভাষায়ও বৈদেশিক শব্দের আমদানী ও দেশজ শব্দের বেমালুম প্রবেশ লক্ষ্য করিয়াছেন। বৈয়াকরণেরাও একথা স্বীকার করিতে ইতস্ততঃ করেন নাই। নানাজাতির সংসর্গে ও সংঘর্ষে

ভাষার এরূপ পরিপুষ্টি অপরিহার্য্য। এইরূপে এক সময় বাঙ্গালা ভাষায় আরবী পারসী শব্দের প্রবেশ ঘটিয়াছে এবং আজকাল ইংরাজী শব্দের প্রবেশ ঘটিতেছে। ইহা প্রাকৃতিক নিয়ম। সকল ভাষাতেই যাহা ঘটিয়াছে বাঙ্গালা ভাষায়ও তাহাই ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে।

তবে কেহ কেহ দুঃখ করেন, আমাদের ভাণ্ডারে শব্দ থাকিতে এরূপ ঋণগ্রহণ করা কেন? 'বিদ্যালয়' বলিলে যখন চলে, তখন স্কুল কলেজ বলি কেন, শিক্ষক বলিলে যখন চলে তখন মাষ্টার বা ম্যাষ্টার বলি কেন, পরীক্ষা বলিলে যখন চলে তখন এগজামিন বলিয়া ইংরাজী ব্যাকরণের মুণ্ডপাত করি কেন, চিকিৎসক বলিলে যখন চলে তখন ডাক্তার বলি কেন, দুণো বা দ্বিগুণ বলিলে যখন চলে তখন ডবল বলি কেন? আবার সামান্য প্রযত্নে যখন সংস্কৃত মূল হইতে নূতন শব্দ নির্ম্মাণ করা যায়, তখন বৈদেশিক ভাষার শরণাপন্ন হই কেন? স্যাক্সন ভাষার ভাণ্ডার সংস্কৃত ভাষার ভাণ্ডারের ন্যায় অফুরন্ত নহে, তাই ইংরাজকে ল্যাটিন গ্রীক ও অন্যান্য বিদেশী ভাষার দ্বারস্থ হইতে হইয়াছে। আমরা কেন সে পথ ধরিব? কথাটা যুক্তিসঙ্গত বটে, কিন্তু কালমাহাত্ম্যে বা যুগধর্ম্মে যাহা ঘটিতেছে, তাহা কি রোধ করা যাইবে? লোকে সুবিধা বুঝে, যুক্তি তর্ক বুঝে না। হাজারও চেষ্টা করা যাউক, কেহ বন্দুক বা রিভল্ভার না বলিয়া নালীকাস্ত্র বা অগ্নিবাণ বলিবে না ষ্টীমার রেলগাড়ী না বলিয়া বাষ্পীয় পোত বাষ্পীয় শকট বলিবে না, র‍্যাপার না বলিয়া শীতবস্ত্র বলিবে না, রসীদ না বলিয়া প্রাপ্তিস্বীকার-পত্র বলিবে না, ডাক্তার না বলিয়া ভিষক্ বলিবে না। লেখকগণকেও অগত্যা লোকে যাহা সহজে বুঝে সেই শ্রেণীর শব্দই ব্যবহার করিতে হইবে। সাহিত্য-পরিষদ্ কি আইন করিয়া এই প্রথা রদ করিতে পারিবেন? একই ভাবপ্রকাশ করিতে একাধিক শব্দ (কোনটি ইংরাজী, কোনটী আরবী বা পারসী, কোনটি সংস্কৃত) থাকিলে সুবিধাও আছে।

পুস্তকাদিতে ইংরাজী শব্দের ব্যবহার।

বিপক্ষে যুক্তি।

এ পর্য্যন্ত, যে সকল ইংরাজী শব্দ একপ্রকার অপরিহার্য্য, সেগুলির তরফে ওকালতী করিলাম। অনেকে কিন্তু কথাবার্ত্তায় ও রচনায় ইংরাজী শব্দের অযথা ব্যবহার করেন। ইহাতে পরাধীনতার ছাপটা আরও বেশী করিয়া পড়ে। অনেকে আলস্য ও জড়তাবশতঃ, ইংরাজী শব্দের বাঙ্গালা প্রতিরূপ ভাবিয়া আনিতে যেটুকু সময় ও প্রযত্ন লাগে, সেটুকু ব্যয় করিতে চাহেন না। অনেকে আবার এরূপ ইংরাজী শব্দ প্রয়োগ করা উচ্চশিক্ষা ও সভ্যতার নিদর্শন বলিয়া মনে করেন। যাহারা ইংরাজীতে অনভিজ্ঞ, তাঁহারাও লোকমুখে শুনিয়া যে দুই চারিটা ইংরাজী বুলি শিখিয়াছেন, বিদ্যা জাহির করিবার জন্য সেগুলি ব্যবহার করেন ও সময়ে সময়ে বিকৃত উচ্চারণ করিয়া হাস্যাস্পদ হয়েন। ফলতঃ, সকলেরই একটা বিশ্বাস জন্মিয়াছে, চন্দ্রপুলিতে মিছরির বুকনীর ন্যায় বাঙ্গালায় এরূপ ইংরাজীর বুকনী বড় মিষ্ট লাগে।

আমার কিন্তু মনে হয়, ভাততরকারীতে কাঁকরের ন্যায় ইহা সত্য সত্যই পীড়াদায়ক। গোরার হাতের সঙ্গীনের খোঁচার ন্যায় ইংরাজীওয়ালাদিগের এই ইংরাজীর বুকনি নিরীহ বাঙ্গালানবীশ পাঠককে সন্ত্রস্ত করিয়া তুলে। অনেক গৃহস্থ যেমন প্রাচীরে তীক্ষ্ণধার কাচখণ্ড বসাইয়া চোরের প্রবেশ বন্ধ করেন, ইঁহারাও সেইরূপ ভাষার প্রাচীর তুলিয়া তাহাতে খরধার ইংরাজী শব্দ বসাইয়া সাধারণ পাঠকের প্রবেশপথ রুদ্ধ করেন। দেবীর উদ্দেশে উৎসৃষ্ট ছাগমাংসে পিঁয়াজ রশুন দেওয়া আর বাঙ্গালার আনাজে ইংরাজীর ফোড়ং দেওয়া একই প্রকারের অপরাধ নহে কি? কথাবার্ত্তায় কতকটা অসংযত ভাব আসিয়া পড়িলেও, রচনার ভাষায় এসম্বন্ধে সতর্কতা আবশ্যক।

সপক্ষে যুক্তি।

আশ্চর্য্যের বিষয়, খাঁটি বাঙ্গালী কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তও হুইগ ও টোরীর উপর কবিতা লিখিয়াছেন, রেলগাড়ীর উপর কবিতা লিখিয়াছেন এবং অন্যান্য কবিতায় ইংরেজী শব্দ প্রবেশ করাইতে দ্বিধাবোধ করেন নাই। রামপ্রসাদের গানেও ইংরাজী শব্দ দু একটা আছে।

সাধারণের জন্য লিখিত ছড়া ও গানে 'বুঝি হুট ব'লে বুট পায়ে দিয়ে চুরুট ফুঁকে স্বর্গে যাবে', 'কি কল বানিয়েছে কোম্পানী', 'এবার ম'রে সাহেব হ'ব রাঙ্গা-চুলে হেট বসিয়ে পোড়া নেটিভ নাম ঘুচাব', ইত্যাদি ছত্রে ইংরাজী শব্দের সমাবেশ রহিয়াছে। বঙ্গের ঘরে ঘরে যে বঙ্কিমচন্দ্রের আদর, তাঁহার গ্রন্থেও ইংরাজী শব্দ কখন ইংরাজী হরপে কখন বাঙ্গালা অক্ষরে বিরাজ করিতেছে, Psychic force, Now or Never, জেণ্ট্, স্পার্ক্লিং শ্যামপেন, কমিসেরিয়েট, বোট, উইল, ডোম্, পেবিল, মিনিট, রিপোর্ট ইত্যাদি। কমলাকান্তের দপ্তর ও লোকরহস্য এই রঙ্গরসময় পুস্তকদ্বয় ত ইংরাজী শব্দে ও বাক্যে কণ্টকিত।

অবশ্য একথা স্বীকার করিতে হইবে যে, অনেক সময়ে ইংরাজী শব্দ বা শব্দসত্ত্ব বাঙ্গালায় ঠিক অনুবাদ করা যায় না, করিবার ব্যর্থ প্রয়াসে প্রসঙ্গের সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য নষ্ট হইয়া যায়, অনুবাদ অত্যন্ত পেঁচাও বা আড়ষ্টরকমের হইয়া পড়ে। যাঁহারা পরিভাষাসঙ্কলনে ব্যাপৃত আছেন, তাঁহারা একথা হাড়ে হাড়ে বুঝেন। আবার একথাও মানিতে হইবে যে, সকল বাঙ্গালা পুস্তকই দেশের সমগ্র পাঠকমণ্ডলীকে উদ্দেশ্য করিয়া লিখিতে হইবে এমন কোন কথা নাই। অনেক পুস্তক ইংরাজীশিক্ষিত সম্প্রদায়ের উপভোগের জন্য রচিত হয়, সাধারণের মধ্যে জ্ঞানবিস্তারের জন্য নহে। এ সকল পুস্তকে ইংরাজীর আমদানী তাদৃশ দোষাবহ নহে। ইংরাজী উচ্চদরের গ্রন্থে ল্যাটিন গ্রীক বা ফরাশী জার্ম্মান শব্দ বা শব্দসত্ত্ব, বাক্য বা বাক্যাংশ প্রয়োজনমত উদ্ধৃত থাকে, ইহা লক্ষ্য করা যায়। ফলকথা, সাহিত্যের ক্ষেত্রে কতকটা অধিকারিভেদ আছে, সুকুমার সাহিত্য সর্ব্বজনগ্রাহ্য হইতে পারে না, কলাবিদ্‌গণেরই উপভোগ্য হয়। *

শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

* কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউট হলে পঠিত।

শারদীয় সঙ্গীত।

ইমন কল্যাণ—একতালা।

আজি এ শারদ সাঁঝে,
ঐ শুন দূরে পল্লীমুখর কাঁসর ঘণ্টা বাজে!
দিনমণি যায়—"বিদায় বিদায়"
বিহগ কণ্ঠে দিশি দিশি ধায়
উদ্দাম বেগে মরম আবেগে
মত্ত তটিনী চলিছে;
ধীরে ধীরে তীরে তীরে শ্লথ মন্থর বীচিমালা ফিরে
গাহিয়া সবারি কাছে।
পবনে গগনে ধনে জনে বনে
ঐ কল্লোলময়ী গীতি
নিখিল বিশ্বে একই রাগিণী
ধ্বনিতেছে নিতি নিতি;
একই মন্ত্রে একই সাধনা একই আরতি রাজে
মনোমন্দির মাঝে।

রজনীকান্ত সেন।

আয়ুর্ব্বেদ ও আধুনিক রসায়ন।

(৩)

এক্ষণে আমরা প্রত্যেক ধাতুর শোধন ও মারণ প্রক্রিয়ার রাসায়নিক ক্রিয়া পরীক্ষা করিতে চেষ্টা করিব।

স্বর্ণ।

প্রাচীন ইতিহাস—পূর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছে। বৈদিক যুগ হইতে স্বর্ণ ভারতে ব্যবহৃত হইতেছে।

ধাতু প্রস্তুত প্রক্রিয়া (metallurgy)—ভারতে পতঞ্জলি ও নাগার্জ্জুন ধাতু প্রস্তুত প্রক্রিয়ার বিশেষ পারদর্শী ছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। কিন্তু তাঁহাদের প্রণীত গ্রন্থাদি এখন প্রায় বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, কেবল অন্যান্য গ্রন্থে তাঁহাদের উক্তি কতক কতক উদ্ধৃত হইয়াছে। স্বর্ণের উৎপত্তি সম্বন্ধে ভাবপ্রকাশ লিখিয়াছেন যে স্বর্ণ মরীচি, অঙ্গিরা, অত্রি, পুলস্ত্য, পুলহ,

ক্রতু ও বশিষ্ঠ এই সপ্ত মহর্ষির শুক্র হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। * এই পৌরাণিক আখ্যান ব্যতীত স্বর্ণ প্রস্তুত প্রণালীর বিবরণ আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থে দেখিতে পাই নাই। আইন আকবরী নামক গ্রন্থে আকবরের সময় ভিন্ন ভিন্ন সুবার বর্ণনাকালে কোথায় কোন দ্রব্য উৎপন্ন হইত তাহার বর্ণনা আছে। সেই সকল বর্ণনা হইতে বুঝা যায় যে স্বর্ণ নিম্নলিখিত চারি প্রকার স্থান হইতে আহৃত হইত।—(১) পার্ব্বত্য প্রদেশে স্বর্ণের খনি, (২) কোন কোন নদীর জল, (৩) নদীতীরস্থ বালুকা, ও (৪) মৃত্তিকা। দিল্লী সুবার উত্তরে কুমায়ুনে স্বর্ণের খনি ছিল। † কাশ্মর সুবার অন্তর্গত পকিলী (?) নামক স্থানে নদীর জল হইতে নিম্নলিখিত উপায়ে স্বর্ণ প্রাপ্ত হওয়া যাইত। নদীর স্রোতে প্রথমে লম্বা লম্বা লোম সমেত ছাগচর্ম্ম বিছান হইত এবং স্রোতে যাহাতে তাহাদিগকে ভাসাইয়া লইয়া না যায় সেই জন্য পাথরের দ্বারা চাপিয়া রাখা হইত। দুই তিন দিবস পরে চর্ম্মগুলি সযত্নে তুলিয়া লইয়া রৌদ্রে শুকান হইত। বেশ শুকাইয়া যাইলে ঝাড়িয়া স্বর্ণের কণা সংগ্রহ করা হইত। এই উপায়ে এক এক বারে তিন তোলা পর্য্যন্ত স্বর্ণ পাওয়া যাইত। * লাহোর সুবা বা পাঞ্জাবের নদী সমূহের তীরস্থ বালুকা ধুইয়া ও চালিয়া স্বর্ণ, রৌপ্য প্রভৃতি ধাতু পাওয়া যাইত। † অযোধ্যানগরীর চারিধারের মৃত্তিকায় স্বর্ণকণা পাওয়া যাইত এবং ঐ মৃত্তিকা ধৌত করিয়া স্বর্ণ সংগৃহীত হইত। ‡

কৃত্রিম স্বর্ণ। লৌহ তাম্র প্রভৃতি হীন ধাতুকে স্বর্ণে পরিণত করা প্রাচীন রাসায়নিকগণের একটি প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। ইউরোপে বহুদিন পর্য্যন্ত প্রাচীন রাসায়নিকগণ পরেশ পাথর (Philosopher's stone) এর অনুসন্ধানে ব্যাপৃত ছিলেন। ভারতেও পরেশ পাথরের অলৌকিক গুণের অনেক কাহিনী প্রচলিত আছে। আইন আকবরীতে পরেশ পাথর সম্বন্ধে নিম্নলিখিত গল্পটি বিবৃত হইয়াছে। বিক্রমাদিত্যের পূর্ব্বে মালব-প্রদেশে জয়সিংহ দেব নামক একজন পরম ধার্ম্মিক ও ন্যায়বান্ রাজা রাজত্ব করিতেন। তাঁহার রাজত্বকালে একজন কৃষক ধান কাটিতে কাটিতে দেখিতে পাইল যে তাহার কাস্তেখানি একখানি পাথরে লাগিয়া সোণা হইয়া গিয়াছে। মূর্খ কৃষক ভাবিল যে তাহার কাস্তেখানা নষ্ট হইয়া গিয়াছে, সেইজন্য সে, তাহার অস্ত্র ও পাথরখানা এক কামারের নিকট লইয়া যাইল। বুদ্ধিমান্ কামার ব্যাপার দেখিয়া বুঝিল যে এ পাথর সামান্য পাথর নহে, উহা পরেশ পাথর। কামার পাথরখানি রাখিয়া দিল এবং তাহার যাবতীয় লোহার জিনিসে পরেশ পাথর স্পর্শ করাইয়া সোণা করিয়া লইল। এইরূপে সে বিস্তর অর্থ উপার্জ্জন করিয়া ভাবিল যে এ পাথর রাজার নিকটেই থাকা উচিত। এই ভাবিয়া সে পাথরখানি রাজাকে উপহার প্রদান করিল। রাজা জয়সিংহ অনতি-বিলম্বে প্রভূত ধনের অধিকারী হইলেন এবং দ্বাদশ বর্ষ ধরিয়া এক প্রকাণ্ড দুর্গ নির্ম্মাণ করিলেন। দুর্গ নির্ম্মাণান্তে তিনি নর্ম্মদাতীরে প্রজাবর্গের সন্তোষের জন্য এক বিশাল ভোজের বন্দোবস্ত করিলেন। সেই ভোজে তিনি সন্তুষ্ট হইয়া রাজপুরোহিতকে পরেশ পাথর খানি দান করিলেন। পুরোহিত মহাশয় রাজানুগ্রহের নিদর্শন স্বরূপ সামান্য একখানি পাথর পাইয়া অত্যন্ত দুঃখিত ও ক্রুদ্ধ হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ পাথরখানি নর্ম্মদার জলে ফেলিয়া দিলেন। যখন তিনি শুনিলেন যে তিনি লক্ষ্মীকে হাতে পাইয়া হেলায় হারাইয়াছেন তখন দিগ্বিদিগ—জ্ঞান শূন্য হইয়া নদীতে ঝম্প প্রদান করিলেন কিন্তু সেখানে জল এত গভীর ছিল যে তিনি উহার তলদেশ খুঁজিয়া পাইলেন না। এইরূপে পরেশ পাথর অন্তর্হিত হইল এবং এখন পর্য্যন্ত সেখানে নদীর জল অতলস্পর্শ বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস। *

এখন পর্য্যন্ত অনেকে বিশ্বাস করিয়া থাকেন যে ভারতের সাধু সন্ন্যাসীরা কৃত্রিম স্বর্ণ প্রস্তুত করিতে পারেন। কয়েক দিবস পূর্ব্বে দুইজন ভদ্রমহোদয় দুই

* ভাবপ্রকাশ—পূর্ব্বখণ্ড, ৪১৬ পৃঃ।
† Gladwin's Ayeen Akbery Vol. II. p. 87.
* Ibid. Vol. II. p. 136.
† Ibid. Vol. II. p. 109.
‡ Ibid. Vol. II. p. 22.

* Ibid. Vol. II. p. 42.

বিভিন্ন স্থান হইতে আমাকে ঐ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিয়া পত্র লিখিয়াছেন। যদি কোন ভদ্র মহোদয় ঐরূপ সাধুসন্ন্যাসীর দর্শন পান, অনুগ্রহ করিয়া তাহার প্রস্তুত স্বর্ণের একটু নমুনা আমায় পাঠাইয়া দিলে অত্যন্ত উপকৃত হইব। রাসায়নিক পরীক্ষা দ্বারা উহা স্বর্ণ কি না নিশ্চয় ধরা পড়িবে। উহা স্বর্ণ হইতেই পারে না, রৌপ্য, তাম্র, সীস, পারদ প্রভৃতির মিশ্রধাতুকে (alloy) হরিতালের দ্বারা বা অন্যপ্রকারে স্বর্ণের ন্যায় রং করা কোন দ্রব্য হইতে পারে। নিম্নে অধ্যাপক রায় মহাশয়ের হিন্দু রসায়নের ইতিহাস হইতে রৌপ্য ও তাম্রকে স্বর্ণে পরিণত করিবার কয়েকটী প্রাচীন প্রক্রিয়া উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

(১) "রাজবর্ত্তকে শিরীষপুষ্পের রসের দ্বারা ভাবনা দিলে এক গুঞ্জা পরিমাণ রৌপ্য একশত গুঞ্জা পরিমাণ নবোদিতসূর্য্যসন্নিভ স্বর্ণে পরিণত হইবে ইহাতে বিচিত্র কি ?†

(২) "গন্ধককে পলাশের রসের দ্বারা শোধিত করিয়া রৌপ্যের সহিত তিনবার ঘুটের আগুনে পুটপাক করিলে রৌপ্য স্বর্ণে পরিণত হইবে ইহাতে বিচিত্র কি ?‡

(৩) "যদি রসককে (calamine)·········তিনবার তাম্রের সহিত পুটপাক করা যায় তাহা হইলে তাম্র কাঞ্চনে পরিণত হইবে তাহাতে বিচিত্র কি ?*

(৪) "মেষের দুগ্ধ ও বহু অম্লরসের দ্বারা দরদকে (cinnaba) অনেকবার ভাবনা দিলে রৌপ্য সাক্ষাৎ কুঙ্কুমসদৃশ স্বর্ণে পরিণত হইবে তাহাতে বিচিত্র কি ?" †

ভাব প্রকাশ পারদাদিসংযুক্ত স্বর্ণকে কৃত্রিম স্বর্ণ বলিয়াছেন।‡

স্বর্ণশোধন—"স্বর্ণকে অতি সূক্ষ্মপাত করতঃ অগ্নিতে পোড়াইয়া যথাক্রমে তিলতৈল, তক্র, কাঁজি, গোমূত্র ও কুলত্থকলায়ের কাথে তিন তিনবার নিমগ্ন করিবে অর্থাৎ একবার পোড়াইবে ও এক একবার উপরি উক্ত দ্রবদ্রব্যে ক্রমান্বয়ে নিঃক্ষেপ করিবে। ইহাদ্বারা স্বর্ণ শোধিত হইবে।" এই শোধন প্রক্রিয়ায় কি প্রয়োজন বুঝিতে পারিলাম না, কারণ এই সকল প্রক্রিয়ায় স্বর্ণের কোনও রাসায়নিক পরিবর্ত্তন আদৌ হইবে না। পরবর্ত্তী জারণ প্রক্রিয়ায় স্বর্ণকে সূক্ষ্ম গুঁড়ায় পরিণত করিতে সম্ভবতঃ এই শোধন ক্রিয়া সহায়তা করিতে পারে।

শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী

বাঙ্গালার ব্রতকথা।

গোমুখীর মুখ-গলিত পবিত্র গাঙ্গেয় বারিধারার ন্যায় একদিন শুভ মুহূর্ত্তে আমাদের মাতৃগণের বদন হইতে পবিত্র ব্রতকথা বঙ্গদেশে আবির্ভূত হইয়াছিল। সে কোন্ যুগ ইতিহাস তাহা বলিতে পারেনা; কিন্তু ব্রতকথার ছত্রে ছত্রে সেই অনৈতিহাসিক যুগের ইতিহাস উদ্ভাসিত হইয়া রহিয়াছে। ব্রতকথা, পুরাতন বঙ্গের অবিকৃত সামাজিক প্রতিকৃতি।

কবির নিকট ব্রতকথা বাঙ্গলার আদিম কাব্য, ঐতিহাসিকের নিকট ইহা বঙ্গের গৃহ ও সমাজের, ধর্ম্ম ও কর্ম্মের পুরাতন ইতিহাস, আর মাতৃভক্ত বাঙ্গালীর নিকট ব্রতকথা বঙ্গজননীর স্তন-নিঃসৃত প্রথম ক্ষীরধারা।

---

† (১) কিমত্র চিত্রং যদি রাজবর্ত্তকম্
শিরীষ পুষ্পাগ্ররসেন ভাবিতম্।
সিতং সুবর্ণং তরুণার্কসন্নিভম্
করোতি গুঞ্জাশতমেকগুঞ্জয়া॥

‡ (২) কিমত্র চিত্রং যদি পীতগন্ধকঃ—
পলাশ নির্য্যাসরসেন শোধিতঃ।
আরণ্যকৈরুৎপলকৈস্ত পাচিতঃ—
করোতি তারং ত্রিপুটেন কাঞ্চনম্॥

* (৩) কিমত্র চিত্রং রসকো রসেন।
ক্রমেণ কৃত্বাম্বুধরেণ রঞ্জিতঃ
করোতি শুল্বং ত্রিপুটেন কাঞ্চনম্॥

† (৪) কিমত্র চিত্রং দরদঃ সুভাবিতঃ
পয়েন মেষ্যা বহুশোঽম্লবর্গৈঃ।
সিতং সুবর্ণং বহুধর্ম্মভাবিতম্
করোতি সাক্ষাদ্বরকুঙ্কুমপ্রভম্॥
নাগার্জ্জুন বিরচিত রসরত্নাকর।

‡ কৃত্রিমঞ্চাপি ভবতি তদ্রসেন্দ্রস্য বেধতঃ। ভাবপ্রকাশ।
ভাবপ্রকাশ—পূর্ব্বখণ্ড, ৬১১ পৃঃ

আমাদের প্রাচীন বঙ্গলক্ষ্মীগণ এই ব্রতকথায় জননী, ভগিনী, কন্যা ও বধূরূপে, রাজরাণী, ভিখারিণী, ব্রাহ্মণী ও গোয়ালিনী বেশে, তাঁহাদের সমগ্র গৃহস্থালী, সমুদয় ঐশ্বর্য্য ও সৌন্দর্য্য, আশা ও তৃপ্তি, সুখ ও দুঃখ, চিত্ত ও চরিত্র লইয়া প্রতিষ্ঠিত আছেন। ষষ্ঠী ও মনসা, চণ্ডী ও সুবচনীর পূজা করিতে বসিয়া কথা ও কবিতার ভাব ও বর্ণনায় আপনারা আপনাদিগকে চিত্রিত করিয়াছেন। ব্রতকথা, আমাদের সে কালের মাতৃগণের পিতামহী ও মাতামহীর চিত্র। এ চিত্র বড়ই মধুর; উহাতে সংযম, সহিষ্ণুতা, স্নেহ ও করুণা শান্তরূপে উজ্জ্বলিয়া উঠিয়াছে। প্রাচীন মাতৃগণকে জানিতে হইলে, পিতামহী ও মাতামহীদিগকে বুঝিতে হইলে, ব্রতকথা বুঝিতে হয়, ব্রতকথা শুনিতে হয়। কিন্তু যে ব্রহ্মচারিণী পিসীমা ও মঙ্গল মূর্ত্তি শঙ্খসিন্দূর শোভিতা জেঠীমাগণ এই পবিত্র কাহিনী শুনাইতেন, তাঁহারাও একে একে বিদায় লইয়া যাইতেছেন। তাঁহাদের সেই নিয়মনিষ্ঠা, ব্রত-উপবাস নগর হইতে কেন পল্লী হইতেও বিলুপ্ত হইতেছে. এ সময়ে তাঁহাদের সেই সংযম নিষ্ঠার কাহিনীর আলোচনা করিলে পিতামহীগণের পুণ্য প্রভায়, তাঁহাদের শান্তি ও তৃপ্তিতে বাঙ্গালীর দীন গৃহস্থালী স্নিগ্ধ ও শান্ত হইতে পারে।

যে ভাষায় মাতৃগণ ব্রতকথা বলিয়া থাকেন, উহাই আমাদের প্রকৃত মাতৃভাষা। ব্যাকরণ উহাকে নিষেধ বিধির তীক্ষ্ণধারে কাটিয়া ছাটিয়া হ্রস্বদীর্ঘ করে নাই, পাণ্ডিত্যের অলঙ্কার বর্ণলেপন করিয়া উহাকে দুর্ব্বোধ করিয়া তুলে নাই। মাতৃস্তনের সুধা-ধারার ন্যায় উহা অনাবিল ও সুপেয়। বাঙ্গালা ভাষার ইতিহাসের মন্দিরে এই অকৃত্রিম অনাবিল মাতৃভাষার এক মহোচ্চবেদী প্রতিষ্ঠিত আছে। মা, স্বমূর্ত্তিতে স্নিগ্ধ শান্ত সৌন্দর্য্য ছড়াইয়া সেই বেদীতে বিরাজিত আছেন। এ মূর্ত্তি বাঙ্গালী মাত্রেরই স্মরণীয় ও বরণীয়। বাঙ্গালীর গার্হস্থ্য জীবনের সুখ ও শান্তি, আনন্দ ও বেদনা, ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য—এই মূর্ত্তিতেই চিরদিন বিকশিত। বাঙ্গালার বাণীমাতার এই স্বভাব-সুন্দর মনোহর-রূপ দেখিতে হইলে ব্রতকথা শুনিতে হয়।

যদিও বারমাস ব্যাপিয়াই জননীরা ব্রতাচরণ করিয়া থাকেন, তথাপি যখন হাট, মাট, গৃহ ও গোঠ ধান্য ধনে ভরিয়া যায়, লক্ষ্মীর রথের ন্যায় কৃষকের গৃহে ধান্যস্তূপ সজ্জিত হয়, নবপ্রসূতবৎস গাভীগুলির হাম্বারবে বাঙ্গালার মাঠ মুখর হইয়া উঠে, মূর্ত্তিমান আনন্দরূপে বাল-বৎসগণ কৃষকের প্রাঙ্গণে ও গ্রামের গোষ্ঠে নাচিতে থাকে, সেই ক্ষেতের ধান ও গাইয়ের দুধের দিনে—অগ্রহায়ণ ও পৌষ মাসেই নানাবিধ ব্রতের অনুষ্ঠান হয়। অনেক ব্রত, পাড়ার ব্রতিনীরা সকলে এক বাড়িতে মিলিয়া করেন, কোন কোন ব্রত আপন আপন গৃহেই সম্পন্ন হয়, কিন্তু ব্রতিনীরা কুলবধূ হইলেও সকল ব্রতই গৃহে সম্পন্ন হয় না। কোন কোন ব্রত 'তেমাথা'পথে, নদীর ঘাটে, মাঠের প্রান্তে, ও গ্রাম-চৈত্যের তলে করিতে হয়।

ব্রত সমূহের মধ্যে কতকগুলি পৌরাণিক; কোন পুরাণ বা উপপুরাণ উহার মূল। এ সকল ব্রত ইচ্ছা করিলেই করা যায় না; শুদ্ধকালে পুরোহিতের নিকট সঙ্কল্প করিয়া ইহা গ্রহণ করিতে হয় এবং যে ব্রতের যতদিন নিয়ম আছে ততদিন অবাধে অনুষ্ঠান করিয়া শেষে 'প্রতিষ্ঠা' করিতে হয়। এই পৌরাণিক ব্রত সমূহ ব্রতিনী নিজে নিজে করিতে পারেন না, তাঁহাকে ব্রতের পূর্ব্বদিবস 'সংযম' এবং ব্রতের দিন উপবাস করিয়া সমস্ত আয়োজন করিতে হয়, যথাসময়ে পুরোহিত আসিয়া পূজা করেন। পৌরাণিক সমস্ত ব্রতেরই এক একটি কথা বা উপাখ্যান আছে, উহা সংস্কৃত ভাষায় নিবদ্ধ; কাজেই পুরোহিতের সংস্কৃত জ্ঞান না থাকিলে তিনি উহা বলিতে পারেন না। এরূপ স্থলে পুরোহিতের মুখে কেবল 'ফলশ্রুতি' মাত্র শুনিয়াই ব্রতিনীকে সন্তুষ্ট চিত্তে দক্ষিণা দিতে হয়। হিন্দুর অন্য দশরকম পূজার ন্যায় এ সকল ব্রতের ও যজমান কেবল উপলক্ষ্য মাত্র; পুরোহিতই দেবতাকে আবাহন নিবেদন ও বিসর্জ্জন করেন। ব্রতিনীরা পূজার কিছুই জানেন না; কথাগুলি জানিতে পারিলেও তাঁহাদের একটা লাভ হইত, তাহাও হয় না। আর এক শ্রেণীর ব্রত আছে উহা আমন্ত্রণ করিতে হয়। উহার সঙ্কল্প নাই,

পুরোহিতের প্রায় আবশ্যক হয় না। কোন একটা নাম দিতে হইলে লৌকিক ব্রত বলিয়া উহাদের নাম দেওয়া যাইতে পারে। এই সকল ব্রতের ব্যবস্থা দিবার জন্য কোন ভবদেব বা হলায়ুধের প্রয়োজন হয় নাই। কুলবৃদ্ধা ও গ্রামবৃদ্ধাগণের উপদেশ ও আদেশই ইহার শাস্ত্র। মেয়ে, মায়ের নিকট; বধূ, শ্বশ্রূর নিকট; বালিকা বৃদ্ধার নিকট—এই ব্রত সমূহের বিধিব্যবস্থা ও নিয়ম পদ্ধতি শিক্ষা করিয়া থাকে। শ্বশ্রূগণ, নববধূদিগকে কৌলিক প্রথা বলিয়া দিয়া এই সকল ব্রতে দীক্ষিত করেন। এই কৌলিক প্রথার নাম "আর্ষ"। সকল বংশের 'আর্ষ' একরূপ নহে। যে বংশে যে ব্রত করিবার 'আর্ষ' নাই, সে বংশের বধূরা সে ব্রত করিতে পারেন না। কুলবৃদ্ধাগণের বচনই আর্ষের প্রমাণ। আর্ষ অনুসারে কোন কোন বংশে কোন কোন ব্রত বিভিন্ন পদ্ধতি অনুসারে হইয়া থাকে। নববধূ স্ত্রী-ধর্ম্মিণী হইবার পরেই কৌলিক ব্রতানুষ্ঠানের অধিকারিণী হন। কুমারীগণ ও কোন কোন ব্রত করিয়া থাকেন কিন্তু উহার বেশী গুরুত্ব নাই; উহা প্রায় ধূলা খেলার মত।

এই সকল লৌকিক ব্রতের মূল যে কোনও পুরাণ বা উপপুরাণ নহে, একথা ভয়ে ভয়েই বলিতে হয়। হিন্দুর অনন্ত শাস্ত্র; কবে কোন্ দুরধিগম্য গ্রন্থ হইতে কি বাহির হইবে তাহার নিশ্চয় নাই। বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে—"ত্বং কালকেতুচ্ছলনে স্বর্ণগোধিকাদি" বলিয়া চণ্ডীর স্তুতি করা হইয়াছে। আবার কবে নেপাল বা গান্ধার হইতে কোন্ গ্রন্থে সুবচনী বা 'মস্কিল আসানের' স্তুতি বাহির হইয়া পড়িবে তাহার নিশ্চয় কি? সত্যপীর ও স্কন্দপুরাণের রেবাখণ্ডে আবির্ভূত হইয়াই আছেন। তথাপি বলিতে হয়, কোন পুরাণ বা উপপুরাণ এই সকল লৌকিক ব্রতের মূল নহে। আমাদের প্রাচীন মাতৃগণ এই সকল ব্রত যজ্ঞের ঋষি, তাহাদের রচনা ভঙ্গীই ইহার ছন্দঃ, সুবচনী মস্কিল আসানগণ ইহার দেবতা, এবং স্বামী পুত্রের মঙ্গল কামনায় ইহার বিনিয়োগ।

লৌকিক ব্রত, সংস্কৃতের বঙ্গীয় সংস্কার নহে; বাঙ্গালার জল মাটিতে বাঙ্গালী মেয়ের প্রতিভা, চরিত্র ভক্তিও কল্পনাতে উৎপন্ন হইয়া ইহা বধূপরম্পরায় আবহমান কাল অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে। বৌদ্ধ ধর্ম্মের পতনের পরে বঙ্গে প্রথমে শৈব ধর্ম্ম এবং তৎপরে শক্তি উপাসনার প্রচার হয়। শৈব ধনপতি সওদাগর খুল্লনার 'মেয়েদেবতার' ঘট পদাঘাতে চূর্ণ করিলে ও বঙ্গে নানামূর্ত্তিতে ও নানা নামে পূজা পাইতে চণ্ডীর বাধা হয় নাই। চণ্ডীই অধিকাংশ লৌকিক ব্রতের আরাধ্য দেবতা। তিনি কখনও মঙ্গলরূপে খুল্লনার হারাণো ছাগল আনিয়া দিতেছেন, কখনও 'কমলে-কামিনী' সাজিয়া শ্রীমন্তকে ছলনা করিতেছেন, কখনও 'উদ্ধার' রূপে ব্রাহ্মণীকে সুখের উপর সুখ দিয়া দুঃখের জন্য ব্যাকুল করিয়া তুলিতেছেন। তাঁহার কৃপায় অপুত্রক রাজার পুত্র হইতেছে, বন্দী সওদাগর মুক্তি পাইতেছে, রাঘব বোয়ালের উদর হইতে নববধূর অলঙ্কারের 'বাটা' বাহির হইতেছে। গ্রাম্য পূজার বেদীতে চণ্ডীর নানা নাম, নানা মাহাত্ম্য। বঙ্গের বধূগণ নানা ভাবে তাঁহার পায়ে ফুল দিয়া আসিতেছেন।

চণ্ডীব্যতীত আরও একটি দেবী গ্রাম্যব্রত বেদীতে চণ্ডীর মতই পূজা পাইয়া আসিতেছেন। ইনি ষষ্ঠী; ইঁহার কৃপায় অপুত্রের পুত্র জন্মে, মরাছেলে জীবন পায়। কাজেই স্নেহবতী পুত্রপ্রাণা বঙ্গমাতাদিগের ইনি পরমারাধ্যা। ষষ্ঠী পৌরাণিক দেবতা; কিন্তু বঙ্গে ইনি পুরাণের আসন ছাড়িয়া মাতৃগণের কথার আসনে অবতীর্ণ হইয়া 'ঘাটের জল' বিকীর্ণ করিতেছেন। পুরাণে দ্বাদশমাসে ষষ্ঠীর দ্বাদশ নাম দৃষ্ট হয়, বঙ্গবধূরা এই দ্বাদশ নাম ছাড়া ষষ্ঠীর আরও দুই একটি নূতন নামকরণ করিয়াছেন।

চণ্ডী ও ষষ্ঠী ব্যতীত মনসা ও এ বেদীতে বৎসরে দুই-বার—আষাঢ় ও শ্রাবণের সংক্রান্তিতে—পূজা পাইয়া থাকেন। এই সর্প-ভীত বাঙ্গালায় একদিন মনসা জোর করিয়া চণ্ডীর সমকক্ষ হইয়াছিলেন, চণ্ডীর ঘট সরাইয়া গন্ধবণিকদিগের মণ্ডপে আপনার আসন ও ঘট পাতিয়াছিলেন। এখনও তাঁহার প্রতাপ একবারে অল্প নহে।

এই সকল 'মেয়ে দেবতা' ব্যতীত দুই একটি পুরুষ দেবতা ও এ বেদীতে পূজা পাইয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহাদের প্রভাব অধিক নহে। পুরুষ দেবতাদিগের মধ্যে 'মস্কিল আসান' একটি, নামেই বুঝা যায় ইনি হিন্দু ছিলেন না। মুসলমানের পীর স্বীয় মহিমায় হিন্দুর ঘরে—চণ্ডীমণ্ডপে—বসিয়াছেন। ইতিহাসে দেখা যায়, মুসলমান রাজত্বের মধ্যভাগে একবার হিন্দু মুসলমানের একীকরণের চেষ্টা হইয়াছিল। বাদশাহ 'আকবর জগদীশ্বর' হইয়া এক নূতন ধর্ম্ম প্রচার করিতেছিলেন, অনেকে তাহার নিকট মন্ত্রগ্রহণ করিয়াছিল। আকবরের সময়ে অনেক পীর ও দরবেশ, সন্ন্যাসী ও বৈরাগী, উদার ধর্ম্মমত প্রচার করিতেছিলেন। তুলসী মালা ও তছলী—উভয়ই ইহারা গলায় পরিতেন। "রাম রহিম এক বান্দা" মত প্রচার করিতেন। অনেক ফকীরের হিন্দু শিষ্য ছিল; অনেক বৈরাগী ও সন্ন্যাসীর মুসলমান সেবক থাকিত। এই উদার উদাসীনদিগের সাধনে, সত্যনারায়ণ, সত্যপীর হইয়া মুসলমানের দান 'সিন্নি' খাইতেছিলেন, এবং গাজী ও পীরগণ, হিন্দুর পূজা গ্রহণ করিতেছিলেন। বোধ হয় 'মস্কিল আসান' সেই যুগের পীর। অন্যান্য পীর আপন আপন 'আস্তানায়' পূজা পাইতেন; ইনি একবারে হিন্দুর ঘরে গ্রাম্যদেবতার বেদীতে আসিয়া উঠিয়াছেন। সুতরাং বুঝিতে হইবে অন্যান্য পীর অপেক্ষা ইহাঁর নাম ও প্রভাব হিন্দুর নিকট অধিক অনুভূত হইয়াছিল। এখনও একশ্রেণীর ফকীর দেখিতে পাওয়া যায়, ইহারা মস্কিল আসানের ফকীর বলিয়া পরিচয় দেয় এবং সন্ধ্যার পর বাতি জ্বালিয়া "যাঁহা মস্কিল তাঁহা আএসান্" বলিয়া বাড়ী বাড়ী ভিক্ষা করে।

গ্রাম্যব্রতের প্রত্যেকটিরই 'কথা' আছে। 'কথা' অর্থ ব্রতটি কিরূপে জগতে প্রচার হইল সেই ইতিহাস। এই ইতিহাসে, যে দেবতার পূজা করা হইল, তিনি কি শুভাশুভ করিতে পারেন, কাহার কি শুভাশুভ করিয়াছেন, কিরূপে পূজা করিতে হয়, কে এই পূজা প্রথমে করিয়াছিল—এই সকল দুর্জ্ঞেয় আদি বৃত্তান্ত—গ্রাম্য বৈদিক রহস্য—বর্ণিত হয়। ব্রতিনীগণ দূর্ব্বা ও অক্ষত হস্তে লইয়া 'কথা' শুনিতে বসেন। ব্রতচারিণীদিগের মধ্যে যিনি বয়োবৃদ্ধা বা কথানিপুণা তিনি ঘটের সম্মুখে 'ব্যাসাসনে'—কুশাসনে বসিয়া বিচিত্র বচনভঙ্গীর সহিত সেই বিচিত্র ইতিহাস—বঙ্গীয় শ্রুতিকথা বলিতে থাকেন। ব্রতিনীগণ এই বহুবার শ্রুত পুরাতন কথা যেরূপ মনোযোগ ও ভক্তির সহিত শ্রবণ করেন, উহা দেখিবার ও ভাবিবার বিষয় বটে। কথা শেষ হইলে ব্রতিনীরা হাতের দূর্ব্বা ও আতপ চাউল ঘটে নিক্ষেপ করিয়া মনে মনে নানা কামনার সহিত প্রণাম করেন।

ব্রতকথা গুলির মধ্যে উপাখ্যানের চমৎকারিত্ব বা বর্ণনার তাদৃশ মনোহারিত্ব কিছুই নাই। নিরাভরণা সরলা গ্রাম্যবধূর ন্যায় এই সকল কথা অলঙ্কারহীনা। ইহা যাঁহারা রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহারা কবি নহেন, কাব্য বা মনোহর উপাখ্যান রচনা, তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিলনা। আরাধ্য দেবতার শুভ বা অশুভ শক্তির পরিচয় দিয়া ব্রতিনীগণের মনে ভয় ও ভক্তির উদ্বোধনই ইহাঁদের অভিপ্রেত ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাহাদের বর্ণনায় ভক্তি অপেক্ষা ভয়ই অধিক জন্মিয়া থাকে। গ্রাম্যদেবতারা শুভ করিতে পারেন কি না পারেন অশুভ করিতে পারেন বলিয়াই ইতিহাসে বর্ণিত হইয়াছে। এবং সেই জন্যই ইহাঁদের পূজা মর্ত্ত্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। প্রকৃত পক্ষে ইহাঁরা ভক্তির দেবতা নহেন, ইহাঁরা ভয়ের ঠাকুর।

গ্রাম্যব্রতের দেবতাগণ কেবলই নৈবেদ্য-লোলুপ, ইহাঁদের দেবোচিত মহত্ব নাই। ইহাঁরা কিঞ্চিৎ আতপতণ্ডুল ও কয়েকটী ফুল বেলপাতা পাইবার জন্য গায়ে পড়িয়া কাহাকেও দুঃখে ফেলিয়াছেন, কাহাকেও পুত্র ও ঐশ্বর্য্য দিয়াছেন, কাহার ও জীবিত পুত্র মারিয়াছেন, কাহারও মরাছেলের প্রাণ দিয়াছেন। প্রভাব দেখাইবার জন্য ইহাঁদিগকে নানা ছল পাতিয়া নানারূপ ধরিতে হইয়াছে, নানাকাজ করিতে হইয়াছে। ইহাঁদের এই ছলচাতুরী মর্ত্ত্যমানব শ্রদ্ধার চক্ষে দেখে নাই। ভীরু বাঙ্গালীর জননীরা ভক্তিতে নহে, ভয়ে পতিপুত্রের মঙ্গল কামনায় উপবাস করিয়া

নানা নিয়ম পদ্ধতির কষ্ট সহিয়া ইহাঁদের অর্চ্চনা করিয়াছেন।

ব্রতের এই "দেবে মানবে খেলা", বাঙ্গালীর শিক্ষা, দীক্ষা, সাহস ও চরিত্রবলের অবনতির ইতিহাস। ব্রতপ্রতিষ্ঠার যুগে বাঙ্গালী বেদের যজ্ঞ, উপনিষদের জ্ঞান, বুদ্ধের শিক্ষা ও তন্ত্রের সাধন বিস্মৃত হইয়া আর্য্যোচিত সাহস ও উদারতা হারাইয়া বৌদ্ধতান্ত্রিকতার মোহে ভীরু ও অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিল, কাজেই তাহার মণ্ডপে—জ্ঞান ও কর্ম্মের বেদীতে—প্রকৃতি পুরুষের তত্ব-ক্ষেত্রে—নাটাই ও পাটাই, ক্ষেত্তর ও কুলাই প্রভৃতি দেব অদেবেরা আসন পাতিয়া, চক্ষু রাঙ্গাইয়া—শরীর সম্পত্তির উপর, পুত্র ও কন্যার উপর যথেচ্ছাচার করিয়া ভীরুবাঙ্গালীর নিকট 'অষ্টতণ্ডুল দূর্ব্বা' ও 'লুণে অলুণে চাপ্‌টী'র উপহার দাবী করিতেছিলেন। ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ, ভীত সওদাগর, শাশুরী লাঞ্ছিতা বধূ এবং পুত্র-বৎসলা জননী, ভয়ে ও প্রলোভনে তাহাদের সে দাবী যুগ যুগ ভরিয়া সম্যক্‌ই আদায় করিয়াছেন।

কিন্তু এই মানসিক অবনতির মধ্যেও একটি লাভের কথা আছে ; সেটি—বধূজনের সংযম, সহিষ্ণুতা ও ভক্তি। বলিতে গেলে ইহাই গ্রাম্যব্রতের পরমশিক্ষা ও চরম লাভ। তুমি ব্রতকে যাহাই মনে কর না কেন, বধূজন উহা ভক্তিপূতচিত্তেই উদ্‌যাপন করিয়া থাকেন। তাঁহাদের নিঠা ও সংযম, কৃচ্ছ্র ও সাধনা, স্বামী ও পুত্রের মঙ্গল কামনায় প্রযুক্ত হয়। ব্রতচারণায় তাঁহারা কষ্ট সহিতে শিখেন, ভক্তি করিতে শিখেন। স্বামী পুত্রের জন্য, শ্বশুর শাশুরীর জন্য প্রার্থনা করিতে ও সাধনা করিতে অভ্যস্ত হন। এই ব্রতের খেলায় দেবতা ও ধর্ম্মে তাঁহাদের বিশ্বাস জন্মে, পবিত্রতা ও পরার্থপরতার অনুশীলন হয়। পুষ্প ও দূর্ব্বা, তুলসী ও বিল্বপত্র, আতপ তণ্ডুল ও সিন্দুর—ব্রতের এই সকল পবিত্র উপকরণ, নিরর্থক ব্যয় হয় না। এই সকল নিবেদন করিতে বসিয়া ব্রতিনীগণের হৃদয়ে ভক্তি ও বিশ্বাস, নির্ভর ও দৈন্যের উদয় হয়। তাহার ফলে বাঙ্গালার অন্তঃপুর শান্তি ও স্বস্তির বাতাসে মধুময় হইয়া উঠে ; বঙ্গভূমি পুণ্যের হোমগন্ধে ভরিয়া যায়।

ব্রতকথায়ও একটি লাভ আছে। এই অনাদিকাল—প্রচলিত, শ্রুতির ন্যায় অপৌরুষেয়—উপাখ্যানে কবিত্ব না থাকিলেও করুণা আছে, রচনা কৌশল না থাকিলেও সংযম ও সহিষ্ণুতা আছে, চমৎকারিত্ব না থাকিলেও দৈন্য, বিনয়, ভক্তি ও বাৎসল্য আছে। এ সকল উপাখ্যানের নায়ক নায়িকা দরিদ্রা গোয়ালিনী, ভিখারিণী ব্রাহ্মণী, ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ, মাতৃহীনা কন্যা ও সোদরহীনা বধূ। সওদাগর ও রাজা দুই একটি আছেন বটে, কিন্তু সওদাগরী ও রাজগিরির কথা নাই। সকলগুলি উপা-খ্যানেই সহজ সরল পল্লীর গার্হস্থ্যজীবন, পল্লীর ক্ষুদ্র সুখ ও দুঃখ, আনন্দ ও বেদনার কথা। সহরের কোলা-হল, ঐশ্বর্য্য-বিলাসের আড়ম্বর, উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খল জীবনের উৎকট বাসনা, কাম ও কামনার কালুষ্য এই পূত ব্রত কথাগুলিকে তীব্র, দুঃসহ ও অপবিত্র করিয়া তুলে নাই। একটি স্নিগ্ধ-শান্ত শ্যামসৌন্দর্য্য এই সহজ গল্পগুলিকে পল্লীর পুরাতন গার্হস্থ্য জীবনের ন্যায় পবিত্র করিয়া রাখিয়াছে। পতি পুত্রের হিতকামনায়, গার্হস্থ্য জীবনের সংযম সাধনায়, এবং স্নেহকরুণাবাৎসল্যে এই আখ্যান-মালা, "পরিধানে লালপেড়ে সাড়ী, হাতে শাঁখা, গালে পান"—সধবার এই মঙ্গলমূর্ত্তির ন্যায় আমাদের সাহিত্য মন্দিরে শান্ত মঙ্গলশ্রীরূপে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। বাণীর এই শান্তরূপ, এই পুণ্যদীপ্ত স্নিগ্ধরূপ—বন্দিত ও অভি-নন্দিত হইয়া বঙ্গে কল্যাণপ্রদ হউক।

শ্রীরসিকচন্দ্র বসু।

আগমনী।

বর্ষার কুহেলিচ্ছন্ন আঁধার আকাশ,
মেঘের গর্জ্জন ঘন, প্রমত্ত বাতাস,
অবিশ্রান্ত বারিধারা ঝর ঝর ঝর,
উদ্দাম যৌবনমত্ত তটিনী নিকর।

শ্রান্ত দেহে শান্ত এবে ; মৃদু সমীরণে
বিশ্ব জননীর স্নেহ বহি আনে মনে !
মেঘ মুক্ত তপনের জগত-উদ্ভাসি-
কিরণে মণ্ডিতা ধরা ; মুখে চারু হাসি।

বর্ষা বারি-ধৌত স্নিগ্ধ শ্যাম তরু রাজি
পল্লব মুকুলে নব হাসিতেছে সাজি ;
সে হাসি ধরার বুকে ছড়ায় আহ্লাদ
স্বর্গ হতে ঝরে যেন মার আশীর্ব্বাদ।

প্রভাতে শিশির সিক্ত সুষমার রাশি
ফুলবালা শেফালিকা ধীরে পড়ে খসি।
যেন আজ মার পায়ে ভক্তি উপহার
শেফালি হৃদয় ঢালি দেয় অর্ঘ্যভার !

আনন্দে বনের পাখী আগমনী গায়
সারাটি বরষ পরে আয় মা গো আয় !
পাখীর সে কলস্বরে কি অমিয় ধারা
সমগ্র ধরণী তাহে মুগ্ধ আত্মহারা !

নিভৃত নির্জ্জন গ্রামে প্রতি ভক্ত গৃহে
ডাকিছে হৃদয় খুলি ভক্তি প্রীতি স্নেহে !
মধুর সানাই বাজে ; শুভ শঙ্খধ্বনি
সমগ্র জগত আজ গায় আগমনী !

শ্রীশৈলজা গুপ্তা

স্বার্থত্যাগ।

(ঐতিহাসিক চিত্র)

ইতিহাসের স্বর্ণাক্ষরে স্বার্থত্যাগের যে সকল উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত চিত্রিত হইয়াছে তন্মধ্যে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডাক্তার হ্যামিণ্টনের কীর্ত্তি যে অন্যতম তদ্বিষয়ে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। সাহানসা দিল্লীর বাদসাহ ফেরোকসায়ার সন্তুষ্ট-চিত্তে প্রত্যুপকারমানসে হ্যামিণ্টনের উপর যে অনুগ্রহ বারিবর্ষণের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিয়াছিলেন, যদি স্বকীয় স্বার্থপ্রণোদিত হইয়া হ্যামিণ্টন উহাতে সম্মত হইতেন, তাহা হইলে জানিনা আমরা এইক্ষণ ইংরাজের সুশাসন ভোগ করিতে পারিতাম কি না ! যদি নিজ ক্ষুদ্র স্বার্থ বিসর্জ্জন না করিয়া এবং ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর ভবিষ্যৎ না ভাবিয়া কোম্পানীর সামান্য বেতন ভোগী কর্ম্মচারী নিজ স্বার্থ সিদ্ধির উপায় দেখিতেন, কে বলিতে পারে তাহা হইলে কোম্পানীর ভাগ্যতারা সুপ্রসন্ন হইত কি না ? ক্লাইবের কূটনীতি, কার্ণাকের বীরত্ব, কুটের প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, ইহার হয়ত কোনটীরও আবশ্যক হইত না। বস্তুতঃ, এই স্বার্থত্যাগ কাহিনী ইতিহাসে অলন্তাক্ষরে লিখিত হওয়া আবশ্যক। তাই আজ আমরা এই দুইশত বৎসরের প্রাচীন কথার আলোচনায় প্রয়াস পাইব।

লর্ডক্লাইব, জবচার্ণক, মেজর রেনেলের ন্যায় যে সকল ক্ষণজন্মা ব্যক্তি—ইংরাজের ভারতাধিকারে সাহায্য করিয়াছেন তাঁহাদের যেরূপ বাল্যজীবনের বৃত্তান্ত অবগত হওয়া যায় না, উইলিয়াম হ্যামিণ্টনের ও বাল্য বৃত্তান্তের বিশেষ কিছু জানা যায় না। তবে হ্যামিণ্টন যে উচ্চবংশজাত ছিলেন ইহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ তিনি গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়াধীন কোন বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাধি পাওয়ার কোনই নিদর্শন বর্ত্তমানে পাওয়া যায় না। কিন্তু ক্লাইব বা চার্ণকের বাল্যকালের বৃত্তান্ত লোকচক্ষুর অগোচর হইলেও তাঁহাদের শেষ জীবনের ঘটনাবলী প্রথম জীবনের ঘটনার অভাবের যথেষ্ট প্রতিদান করে। দুঃখের বিষয় হ্যামিণ্টন শেষজীবনে কোম্পানীর প্রভূত উপকার করিলেও তাঁহার দৈনন্দিন জীবনের আমূল বৃত্তান্ত অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য।

১৭০৯ সনের ১২ই নবেম্বর তারিখে মাসিক মাত্র ৩। পৌণ্ড অর্থাৎ বর্ত্তমান ৫২। টাকা বেতনে হ্যামিণ্টন শুভক্ষণে কোম্পানীর অধীনে ডাক্তারের কার্য্য গ্রহণ করেন। হ্যামিণ্টন ফেরোকসায়ারের দুরারোগ্য ব্যাধি আরোগ্য করিয়া ইংরাজ কোম্পানীর প্রভূত উপকার করিয়াছিলেন। একথা আজ দুগ্ধপোষ্য বালকেও জানে

বলিলে বিশেষ অত্যুক্তি করা হয় না; কিন্তু ১৭১২ সনের জানুয়ারী মাসে পলাতক স্কটডাক্তার হ্যামিল্টন কলিকাতায় দ্বিতীয় ডাক্তার নিযুক্ত হইলেও কেহই তাঁহার খোঁজ লয় নাই। কালের বিচিত্রগতি।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ১৭০৯ সনের ১২ই নবেম্বর তারিখে মাসিক সার্দ্ধ তিন পৌণ্ড বেতন হিসাবে অগ্রিম ৭ পৌণ্ড বেতন হস্তগত করিয়া হ্যামিল্টন কোম্পানীর চাকুরী স্বীকার করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী বৎসরের ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি সেরবর্ণ জাহাজের ডক্তার হইয়া ভারতবর্ষাভিমুখে যাত্রা করেন। সেপ্টেম্বরে জাহাজ লঙ্কায় পৌঁছিল কিন্তু জাহাজ লঙ্কার উপকূলে চড়ায় লাগিয়া গেল। অতিকষ্টে জাহাজকে স্থানচ্যুত করিয়া জাহাজের কাপ্তেন কর্ণওয়াল কলিকাতায় পৌঁছিলেন এবং কলিকাতা হইতে মাদ্রাজ দিয়া কুদলোর পৌঁছিলেন।

জাহাজের কাপ্তেন কর্ণওয়াল কর্কশ প্রকৃতির লোক-ছিলেন। তাঁহার ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া জাহাজের গোরাসৈন্য বিদ্রোহী হইবার চেষ্টা করিয়াছিল। হ্যামিল্টন ও কর্ণওয়ালের প্রতি রুষ্ট হইয়া জাহাজ পরিত্যাগ করিয়া পলায়নে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। ৩রা মে তারিখে হ্যামিল্টন গোপনে সেরবর্ণ জাহাজ পরিত্যাগ করিয়া মাদ্রাজে পৌঁছিলেন। পলায়ন সংবাদ অবগত হইয়াই কর্ণওয়াল ফোর্টসেণ্ট জর্জ্জের কর্ত্তৃপক্ষকে সংবাদ প্রেরণ করিলেন; কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইলেও হ্যামিল্টন জাহাজে প্রত্যাগমন না করিয়া গোপনে মাদ্রাজ পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতায় পৌঁছিলেন।

ডিসেম্বর মাসে কলিকাতায় দ্বিতীয় আর একজন ডাক্তারের প্রয়োজন হইয়াছিল। তৎকালীন ডাক্তার উইলিয়াম জোন্স একাকী কোম্পানীর সকল কর্ম্মচারীর তত্বাবধান করিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না। (১) হ্যামিল্টন বেকার অবস্থায় ছিলেন; সেই জন্য ১৭১১ সনের ২৭শে ডিসেম্বর তারিখে কৌন্সিলের সদস্যগণ বাৎসরিক ৩৬ পৌণ্ড বেতনে তাঁহাকেই অন্যতম চিকিৎসক নিযুক্ত করিলেন। হ্যামিল্টন প্রায় দুই বৎসর কলিকাতায় অতিবাহিত করিলেন।

এই সময়ে বঙ্গদেশের তৎকালীন নবাব, মুর্শীদকুলি খাঁ ইংরাজ কোম্পানীর প্রতি সাতিশয় রুষ্ট হইয়াছিলেন। রুষ্ট হইবার কারণও ছিল। আমরা অন্যত্র এ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছি তাহাই উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"নবাব মুর্শীদকুলী খাঁ বাহাদুর যখন দেখিলেন যে উৎকোচ ও অন্যান্য অসদুপায়ে ইংরেজ কোম্পানী বাৎসরিক মাত্র তিন সহস্র মুদ্রার বিনিময়ে অগাধ বাণিজ্যের অধিকারী হইয়াছেন এবং ইচ্ছামত দুর্গাদি নির্ম্মাণ করিতেছেন, তখন হিন্দু ও অন্যান্য বণিকগণ যে হারে শুল্ক প্রদান করিয়া বাণিজ্য করিতেন, তদ্রূপ হারে শুল্ক ইংরাজদিগের নিকট দাবী করিলেন। অবশ্যই ইংরাজগণ এ প্রস্তাবে অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া বিলাতে তাঁহাদের ডিরেক্টরগণের নিকট মত চাহিয়া পাঠাইলেন। ডিরেক্টরগণ নবাবের এই আচরণের বিরুদ্ধে দিল্লীতে বাদশাহসকাশে দূত প্রেরণের ব্যবস্থা করিতে আজ্ঞা দিলেন এবং যাহাতে বোম্বাই ও মাদ্রাজের অধ্যক্ষগণ বাঙলার অধ্যক্ষের সহিত একমত হইয়া এই কার্য্য করেন তজ্জন্য আদেশ প্রেরণ করিলেন।"

সকলেই অবগত আছেন যে শারমান ও ষ্টিভেন্‌সন্ নামক দুইজন সুদক্ষ ইংরাজ এই কার্য্যের জন্য কলিকাতা হইতে প্রেরিত হইয়াছিলেন। খোজা সারহাদ নামক ইংরাজী ও পারস্যভাষাভিজ্ঞ একজন আর্ম্মানী এই কার্য্যের সহকারী নিযুক্ত হন। কলিকাতা কৌন্সিলের সদস্যগণ স্থির করেন যে দৌত্যবাহিনীর সহিত একজন চিকিৎসক থাকা উচিত। (২) সেই জন্য হ্যামিল্টনকে এই সঙ্গে প্রেরণের ব্যবস্থা হয় এবং দরবারোপযোগী উপযুক্ত বস্ত্রাদি খরিদের জন্য হ্যামিল্টনকে ৩০০ শত টাকা দেওয়া হয়। (৩)

১৭১৫ সনের ৮ই জুলাই দৌত্যবাহিনী সমারোহের সহিত দিল্লী প্রবেশ করেন। প্রায় সাড়ে চারিলক্ষ

(1) Diary and Consultations Book of the United Trade Council at Fort William in Bengol." December 27, 1711.

(2) Ditto, Ditto, January 5, 1713.

(3) Ditto, Ditto, February 26, 1713.

টাকা মূল্যের দ্রব্যাদি ফেরোকশায়ারকে উপহারস্বরূপ প্রদান করা হয়। ফেরোকশায়ারও, দূতগণের যাহাতে কোনরূপ কষ্ট না হয় তাহার ব্যবস্থা এবং দৌত্যবাহিনীর সকলকেই মূল্যবান খেলাৎ দেন। কিন্তু দৌত্যবাহিনীর কার্য্যের সফলতালাভের কোনই আশা ছিল না। মুষ্টিমেয় ভিক্ষার্থী ইংরাজবণিকের সুবিধা অসুবিধা দেখা অপেক্ষা ফেরোকশায়ার তখন অধিকতর গুরুকার্য্যে ব্যস্ত ছিলেন। ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রই অবগত আছেন যে ফেরোকশায়ার তখন সৈয়দ ভ্রাতাদের কবলচ্যুত হইবার চেষ্টা করিতেছিলেন। অধিকন্তু বঙ্গদেশের নবাব এই অভিযান আদৌ প্রীতিচক্ষে দেখিতেছিলেন না। উজীর ও অন্যান্য আমীর উল ওমরাহের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া এই দৌত্যকার্য্য পণ্ড করিবার যথেষ্ট চেষ্টাও করিতেছিলেন। কিন্তু ভগবান যাহার সহায় তাহার সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইলে সাফল্য লাভের আশা কিরূপে সম্ভব? এক অপ্রত্যাশিত দৈবঘটনায় ইংরাজের কার্য্য সাধিত হইল।

রাজা অজিৎ সিংহের কন্যার সহিত ফেরোকশায়ারের শুভ বিবাহ স্থির হইয়াছিল এবং রাজকুমারীও দিল্লী পৌঁছিয়াছিলেন। অকস্মাৎ সম্রাট্ দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া পড়েন এবং সহস্র চেষ্টায়ও তাঁহার নিজ হকীমগণ তাঁহাকে নিরাময় করিতে পারিলেন না। অবশেষে হ্যামিলটনের উপর এই কার্য্যের ভার পড়ে। উপযুক্ত অস্ত্র চিকিৎসায় ডাক্তার হ্যামিলটন অত্যল্পকাল মধ্যেই বাদশাহকে নিরাময় করিয়া তাঁহার প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন। সম্রাট্ হ্যামিলটনকে প্রকাশ্য দরবারে খেলাৎ, মূল্যবান প্রস্তরাদি সমন্বিত কল্‌গী, ২টী হীরকাঙ্গুরীয়, একটী হস্তী ও একটী অশ্ব ও নগদ পাঁচ সহস্র মুদ্রা উপহারস্বরূপ প্রদান করেন। সুবর্ণ নির্ম্মিত এক প্রস্ত ডাক্তারী অস্ত্র ও হ্যামিলটনকে প্রদান করা হয়। অধিকন্তু হ্যামিলটন যাহাই প্রার্থনা করুন না কেন তাহাই তাঁহাকে দেওয়া হইবে সম্রাট প্রকাশ্য দরবারে এইরূপ স্বীকৃত হয়েন। (৪)

ডাক্তার হ্যামিণ্টন এই সময় নিজ ক্ষুদ্র স্বার্থে সম্পূর্ণরূপে জলাঞ্জলি দিয়া ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর ভবিষ্যতের দিক চাহিয়া দূতের প্রার্থনা পূর্ণ করিবার প্রার্থনা জানাইলেন। এই প্রার্থনায় সম্রাট্ ও সভাসদ্‌বর্গ স্তম্ভিত হইলেন। দুরারোগ্য ব্যাধি হইতে মুক্ত কৃতজ্ঞ ফেরোকশায়র ডাক্তারের নিঃস্বার্থপরতায় মুগ্ধ হইয়া বিবাহান্তে ইংরাজের প্রার্থনা পূর্ণ করিবেন স্বীকৃত হইলেন। কিছুদিন পরে ইংরাজ প্রার্থিত ফার্ম্মান পাইলেন এবং দৈত্যবাহিনীর সকলেই পুরস্কৃত হইলেন।

১৭১৭ সনের ৩০ মে দৌত্যবাহিনীর সকলে বাদসাহের নিকট শেষ বিদায় গ্রহণার্থ দরবারে উপস্থিত হইলে হ্যামিণ্টন ব্যতীত সকলেই ছাড়পত্র পাইলেন। দৌত্যবাহিনীর সেক্রেটারী লিখিত নিম্নোদ্ধৃতপত্রে এই বিষয়ের বিস্তারিত বর্ণনা আছে। আমরা এই পত্র উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। পত্রের তারিখ ৭ই জুন ১৭১৭।

"গত ২৭ তারিখে জন সারমান বাদসাহের নিকট হইতে একটা অশ্ব ও খেলাৎ উপহার পাইয়াছেন। ৩০শে তারিখে আমরা ছাড়পত্র পাইয়াছি। জন সারমান, সারহাদ ও এডোয়ার্ডষ্টিফেনসন প্রভৃতি সকলেই সিরপা ও কল্‌গী উপহার পাইয়াছি। শেষ বিদায় কালীন আমরা প্রত্যেকে একে একে কুর্নীশ করিয়া দরবার পরিত্যাগ করিতে লাগিলাম; কিন্তু হ্যামিলটনের বেলায় তাঁহাকে বলা হইল যে সম্রাটের বিশেষ প্রীতিচিহ্ন স্বরূপ তাঁহাকে কোট উপহার দেওয়া হইয়াছে কিন্তু

(৪) "The King was pleased to reward Mr. Hamilton for his care and success in a public manner presenting him with a vest, a culgee set with precious stones, two Diamond Rings, An Elephant, Horse, Five-thousand Rupees and has ordered several additions to be got from him" (Ditto, January 10, 17-15-16) ঐতিহাসিক ষ্টুয়ার্ট লিখিয়াছেন" Among the presents given to Mr. Hamilton on this occasion were models of all his surgical instruments, made of pure gold. কিন্তু কলিকাতা কৌন্সিলের Reportএ এ বৃত্তান্ত পাওয়া যায় না। হ্যামিণ্টন ১৭১৭ সনের ৯ই ডিসেম্বর তারিখে যে উইল করেন তাহাতে বাদসাহদত্ত হীরকাঙ্গুরীয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। "Large Diamond King that had given me by King Futeeksecr and likewise my calgie. ফেরোকশায়রের নাম ফটীকশায়ার লিখিবার কারণ বুঝিতে পারি নাই।

তাঁহার ছাড়পত্র মঞ্জুর হয় নাই। আমরা এই সংবাদে অত্যন্ত চিন্তিত হইলাম। কেননা পূর্ব্বে কেহই আমাদিগকে এ সংবাদ জানান নাই। হ্যামিল্টন কিছুতেই বাদসাহের অধীনে কার্য্যগ্রহণ করিবেন না। সুতরাং বাদসাহ যদি জোরপূর্ব্বক তাঁহাকে আটক করেন, তবে বিশেষ বিপদ হইবার সম্ভাবনা। কেননা হ্যামিল্টন পলায়নের চেষ্টা করিলে তাঁহার ও কোম্পানীর উভয়েরই অমঙ্গল হইবে।

এই অসুবিধা দূরীকরণমানসে আমরা খান দৌরানকে ২।৩ বার জানাইলাম কিন্তু তিনি এ সম্বন্ধে কিছুই করিতে পারিবেন না জানাইলেন। অবশেষে আমাদের বন্ধু সৈয়দ সালাবৎখাঁ খান দৌরানকে অনুরোধ করিলে তিনি উজীরকে এই সম্বন্ধে প্রার্থনা জানাইতে উপদেশ দিলেন।

৬ই তারিখে আমরা উজীরের নিকট উপস্থিত হইয়া হ্যামিল্টন লিখিত এক দরখাস্ত পেশ করিলাম। উক্ত দরখাস্তে নিবেদন করিলাম যে ঔষধাদি না থাকিলে হ্যামিল্টনের দিল্লী থাকা বৃথা হইবে। বিশেষতঃ তিনি দরবারের ভাষা অবগত নহেন। সুতরাং তাঁহাকে আটক করিয়া রাখিলে সম্রাটের কোনই উপকার হইবে না। উজীর আমাদের কাতর প্রার্থনায় দয়া পরবশ হইয়া সম্রাটের নিকট এক আর্জী পেশ করিতে আদেশ দিলেন।

এই আর্জ্জীর উত্তরে বাদসাহ আদেশ দিলেন যে হ্যামিল্টন যখন কিছুতেই এ যাত্রায় দিল্লী থাকিতে প্রস্তুত নহেন এবং যখন তিনি ইউরোপে প্রত্যাগমন করিয়া স্ত্রী পুত্র দেখিবার জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়াছেন, তখন তাঁহাকে বিদায় দেওয়া হউক। কিন্তু এই সর্ত্ত থাকিল যে ইউরোপ হইতে প্রত্যাগমন করিয়া তিনি পুনরায় দরবারে উপস্থিত থাকিবেন। (৫)

দুঃখের বিষয় হ্যামিল্টন স্বদেশে প্রত্যাগমন করিতে পারেন নাই। বঙ্গদেশে পৌঁছিবার কিছুকাল পরেই তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার কবরের উপর ইংরাজী ও পার্শী লিপিতে যাহা লিখিত আছে উহা হইতে জানা যায় যে তিনি ১৭১৭ সনের ৪ঠা ডিসেম্বর ধরাধাম পরিত্যাগ করেন। "ফেরোকশায়ারকে আরোগ্য করিয়া তিনি পৃথিবীতে সুবিখ্যাত হইয়াছিলেন।" কবরের উপরিস্থ এ উক্তি যে বিন্দুমাত্রও অতিরঞ্জিত নহে, ইহা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন। (৬)

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার

লক্ষ্মণ।

ধন্য তুমি বীরবর সুভ্রাতা লক্ষ্মণ,
যে কীর্ত্তি রেখেছ দেব, তায় নর নারী
করিয়া আদর্শ যদি চলে ভবধামে,
না জানি এ ধরা হয় কি সুখ সদন,—
বহে প্রতি গৃহে কি যে প্রেম-মন্দাকিনী!

---

(5) "Since he is privy to my disease and perfectly understands his business, I would very fain have kept him and given him whatsoever he should have asked. But seeing he cannot be brought on any terms to be content, I agree to it; and on condition that after he has gone to Europe and procured such medicines as are not to be got here and seen his wife and children, he return to visit the court once more let him go." হ্যামিল্টনের মৃত্যুসংবাদ দিল্লীতে প্রেরিত হইলে বাদসাহ উহা প্রথমতঃ বিশ্বাস করেন নাই। পরে বিশ্বস্তলোক প্রেরণ করিলে সংবাদ সত্য বলিয়া বিশ্বাস করেন।

(6) William Hamilton, Physician in the service of the English Company, who had accompanied the English Ambassadors to the enlightened presence, and having made his own name famous in the four quarters of the earth by the cure of the Emperor, the asylum of the world, Mahammad Farruksiyar the Victorious; and with a thousand difficulties having obtained permission from the court which is the refusg of the universe, to return tohis country; by the Divine decree, on the fourth of December 1717, died in Calcutta and is buried here. (Inscription on the tomb).

তোমার জনম ভূমি অযোধ্যা নগরী
হইয়াছে মহাতীর্থ, কোটি নরনারী
দূরদেশ হ'তে আসি, তব পদরজ
ধরিয়া মাথায়, হইতেছে আজো ধন্য!
কি প্রাসাদে, কি অরণ্যে, কিবা রণস্থলে,
—সুখে দুঃখে বীরত্বের অগ্নি-পরীক্ষায়
তোমার যে দেব-চিত্র পেয়েছে বিকাশ,
দুর্ব্বার—সে সর্ব্বভুক্ কালের কবলে,
হবে না বিনাশ তার,—হবে না বিনাশ
সুভ্রাতৃবৎসল! তব ভ্রাতৃ স্নেহ গাথা,
বুকে শেল—আত্মত্যাগ, স্বার্থত্যাগ আর!

শ্রীভুবনমোহন দাস গুপ্ত

সারনাথ।

(২)

ধামেক-স্তূপ।

ভারতবর্ষে পুরাকীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষের অসদ্ভাব নাই। সকল প্রদেশেই,—এমন কি অনেক প্রদেশের সকল গ্রামেই,—তাহার কিছু না কিছু পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু সর্ব্বত্রই তাহার অবস্থা প্রায় এক রূপ। একদিন যাহা লৌকিক কীর্ত্তি-কলাপের পরিচয় প্রদান করিত, এখন তাহা অলৌকিক কিংবদন্তীর আধার। তাহাতে কোন কোন ধ্বংসাবশেষ বিভীষিকার আধার হইয়া উঠিয়াছে। কেহ সহসা তাহার সমীপবর্ত্তী হইতে সাহস করে না। যাহার মধ্যে আমাদের প্রকৃত পুরাতত্ত্ব নিহিত হইয়া রহিয়াছে, তাহা এইরূপে দেশের লোকের নিকট অপরিচিত হইয়া উঠিয়াছে। নচেৎ তাহার অনুসন্ধান-কার্য্য বহুপূর্ব্বেই,—এবং দেশের লোকের আগ্রহেই,—আরব্ধ হইতে পারিত।

সারনাথের অবস্থাও এইরূপ ছিল। তাহার নাম পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। কেবল ধ্বংসাবশিষ্ট ধামেক-স্তূপের নামানুসারে সমস্ত স্থান "ধামিক" নামেই কথিত হইত। যাহারা কখন কখন তাহার সমীপবর্ত্তী হইত, তাহারা তথায় "কি আছে" তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াই প্রত্যাবৃত্ত হইত; তথায় "কি ছিল," তাহার তথ্যানুসন্ধানের জন্য আয়োজন করিত না। বরং কেহ কেহ সাহস এবং সুযোগ প্রাপ্ত হইয়া, যথেচ্ছ-ভাবে ইষ্টক-প্রস্তর আহরণ করিয়া, কীর্ত্তি-লোপের সহায়তা-সাধন করিত!

বৃটীশ—গবর্ণমেণ্টের চেষ্টায় তথ্যানুসন্ধান আরব্ধ হইবার প্রথম উপক্রমেও, "যাহা আছে," তাহার উপরেই অনুসন্ধানকারিগণের প্রথম দৃষ্টি নিপতিত হইয়াছিল। তাঁহারাও "কি ছিল," তাহার অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হইবার পূর্ব্বে, "কি আছে," তাহারই খনন-কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া,—অসংযত পুরাতত্ত্বানুরাগের বশবর্ত্তী হইয়া,—অনেক পুরাকীর্ত্তি-চিহ্ন বিলুপ্ত করিয়া ফেলিয়াছিলেন! তৎকালে সারনাথে ধামেক-স্তূপই প্রধান দৃশ্যরূপে দেদীপ্যমান ছিল। সুতরাং তাহার কথাই প্রধান কথা হইয়া উঠিয়াছিল। এই স্তূপটির ইতিহাস কি, অন্যান্য প্রমাণে তাহার আবিষ্কার সাধনের চেষ্টা না করিয়া, ইহাকে খনন করিয়া ইহার ইতিহাস আবিষ্কৃত করিবার জন্য সকলেই লালায়িত হইয়া উঠিয়াছিলেন। কারণ ইহাকে সকলেই "অশোক-স্তূপ" বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া, সেই সিদ্ধান্তের অনুকূল প্রমাণের অনুসন্ধান-কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়াছিলেন। ইহা আদৌ "অশোক-স্তূপ" হইতে পারে কি না; সেরূপ পুরাতন হইলে, ইহা আদৌ ভূপৃষ্ঠে বর্ত্তমান থাকিতে পারিত কি না;—তৎকালে এসকল বিষয়ে কাহারও কোনরূপ সংশয় উপস্থিত হয় নাই।

কনিংহাম ইহাকে "অশোক-স্তূপ' মনে করিয়াই, ইহার অভ্যন্তরে শাক্যসিংহের চিতাভস্ম আবিষ্কৃত করিবার আশায়' [১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে]এক বৎসরের অক্লান্ত অধ্যবসায়ে, ইহার শীর্ষদেশ হইতে তলদেশ পর্য্যন্ত সুরঙ্গ-খননে ব্যাপৃত হইয়াছিলেন। স্তূপটি ক্ষত বিক্ষত হইয়া গেল, কিন্তু ইহার মধ্যে ভস্ম বা ভস্মাধার আবিষ্কৃত হইল না! তখনও কনিংহামের ভ্রান্ত ধারণা বিদূরিত হইল না বরং তাহার ধারণা হইল,—তাঁহার অনুপস্থিতির

সুযোগ প্রাপ্ত হইয়া, শ্রমজীবিগণ ভস্মাধারটি আত্মসাৎ করিয়া ফেলিয়াছে! * বলা বাহুল্য, এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার কারণ ছিল না। কারণ, সুড়ঙ্গ-খনন সমাপ্ত হইলে দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল,—এই স্তূপের অভ্যন্তরে কোন ও গর্ভকুটী বর্ত্তমান ছিল না। ইহার অভ্যন্তর একবারে নিরেট,—লৌহকীলকাবদ্ধ সুবৃহৎ প্রস্তরখণ্ডে সুসজ্জিত। শিখর দেশ ইষ্টকনির্ম্মিত ছিল; তজ্জন্য তাহাই কেবল ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল। জগৎ-সিংহের অনুচরবর্গ, যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও, প্রস্তর-নির্ম্মিত নিম্নাংশের কোনরূপ অনিষ্ট সাধন করিতে পারে নাই।

বর্ত্তমান অবস্থায় এই স্তূপটির উচ্চতা ১০৪ ফুট; এবং ভূগর্ভে ৩৯ ফুট প্রোথিত হইয়া রহিয়াছে। ইহার রচনা-রীতি অশোকের শাসন-সময়ের রচনা-রীতি হইতে পৃথক্। ইহাতে যে সকল কারুকার্য্যের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাও অশোকের শাসন-সময়ের কারুকার্য্য হইতে পৃথক্। ইহার চতুর্দ্দিকে যে সকল আবর্জ্জনা পুঞ্জীকৃত হইয়াছিল, তাহা স্থানান্তরিত হইবার পর দেখিতে পাওয়া গিয়াছে,—এই স্তূপের প্রস্তরখণ্ডে, স্থানে স্থানে, "গুপ্তাক্ষর" উৎকীর্ণ রহিয়াছে। স্থপতিগণ প্রস্তর-খণ্ডে ইচ্ছামত অক্ষর উৎকীর্ণ করাইয়া, রচনা-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইত। ইহা একটি চিরপরিচিত রচনা-রীতি। সুতরাং ধামেক-স্তূপ কোন্ সময়ে রচিত হইয়াছিল, ইহাতেই তাহার সন্ধান প্রাপ্ত হওয়া যায়। তথাপি ইহার নামের জন্যই ইহাকে "অশোক-স্তূপ" বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হইয়াছিল।

অশোক নির্ম্মিত স্তূপগুলি "ধর্ম্ম রাজিকা" নামে কথিত হইত। অশোকের এক নাম ধর্ম্মরাজ। তাহা হইতেই হয়ত তাঁহার স্তূপগুলির "ধর্ম্মরাজিকা" নামে কথিত হইবার সূত্রপাত হইয়া থাকিবে। "ধর্ম্মরাজিকা" এবং "ধামেক", এই দুইটি নামের ধ্বনিসাদৃশ্য ভিন্ন, ধামেককে ধর্ম্মরাজিকার অপভ্রংশ বলিয়া মনে করিবার অন্য কোনও প্রমাণ বর্ত্তমান ছিল না। কিন্তু তাহাই প্রচুর প্রমাণ বলিয়া পরিগৃহীত হইয়াছিল। যে যুগে এইরূপ সিদ্ধান্ত প্রশ্রয় লাভ করিত, সে যুগের পুরাতত্ত্বা-লোচনা বৈজ্ঞানিক বিচারপদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া, যে কোনও কষ্টকল্পনাকেই ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া প্রচারিত করিতে লালায়িত হইত। এখনও এরূপ বিচারপদ্ধতির প্রভাব সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। কেবল, এই পদ্ধতি এখন ইংরাজী-সাহিত্যে অনাদৃত হইয়া, বঙ্গ-সাহিত্যে আশ্রয় লাভ করিয়াছে। তাহাতে বৈজ্ঞানিক বিচারপদ্ধতি এখনও যথাযোগ্য সমাদর লাভ করিতে পারে নাই!

সারনাথের ধ্বংসাবশেষ জৈনদিগের পক্ষেও তীর্থ-ক্ষেত্র বলিয়া সুপরিচিত। করাণ, সারনাথের উত্তর পূর্ব্বে [সিংহপুরী নামক গ্রামে] একাদশ তীর্থঙ্কর অংশুনাথ সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে সারনাথের ধ্বশাংবশেষের উপর অংশুনাথের মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। গত সংখ্যায় প্রকাশিত চিত্রে যে নূতন মন্দিরটি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাই অংশুনাথের মন্দির। তাহার অনতিদূরবর্ত্তী ধ্বংসাবশিষ্ট উচ্চ স্তূপটি "ধামেক"-স্তূপ একখানি জৈন-গ্রন্থের সাহায্যে "ধামেক" নামের প্রকৃত ব্যুৎপত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

গ্রন্থখানি হস্তলিখিত। তাহার নাম—"তীর্থকল্প"। তাহা ১৬৬৯ সংবতে জিনপ্রভ নামক জনৈক জৈন যতি কর্ত্তৃক সঙ্কলিত হইয়াছিল। বারাণসী ধামের শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ের জৈন-পাঠশালার আচার্য্য ধর্ম্মবিজয়ী নামক যতি এই হস্তলিখিত গ্রন্থখানির অধিকারী। তিনি অধ্যাপক ভিনিস্‌কে এই গ্রন্থ হইতে দেখাইয়া দিয়াছেন,—

"অস্মাং ক্রোশত্রিতয়ে ধর্ম্মেক্ষা নাম সন্নিবেশো
যত্র বোধিসত্বস্যোচ্চৈ স্তরশিখরচুম্বিন গগন মায়তনম্।"

এই গ্রন্থের প্রমাণে, বারাণসী-ধামের ক্রোশত্রিতয় মধ্যে, "ধর্ম্মেক্ষা" নামে একটি "বোধিসত্বের আয়তন" বর্ত্তমান থাকিবার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। যাহা "ধর্ম্মেক্ষা" নামে কথিত হইত, তাহাই এখন "ধামেক" নামে কথিত হইতেছে। নিরক্ষর লোকে এখনও "ধামেক" না বলিয়া, "ধামেখ" বলিয়াই তাহার উচ্চারণ করিয়া থাকে।

---

* ভিল্‌সা-স্তূপের বিবরণ প্রকাশিত করিবার সময়ে কনিংহাম এই কথাই স্পষ্টাক্ষরে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

ধর্ম্মেক্ষা নামক আয়তন যে "বোধিসত্বের আয়তন," ধামেক-স্তূপে তাহারও পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহার আট দিকে আটটি "কুলুঙ্গি" বর্ত্তমান আছে। তাহাতে শ্রীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছিল, এখন কেবল তাহার শূন্য পাদপীঠের চিহ্ন মাত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল "কুলুঙ্গির" মধ্যে পশ্চিমদিকের "কুলুঙ্গির" কারুকার্য্যেই আড়ম্বরের আতিশয্য দেখিয়া বুঝিতে পারা যায়,—সেই "কুলুঙ্গিতেই' মূল মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছিল। তাহা শাক্য-মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠাস্থান বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারে না। মৈত্রেয় বোধিসত্বই পশ্চিমাস্যে প্রতিষ্ঠাপিত হইতে পারেন। মৈত্রেয় ভবিষ্যতে বুদ্ধত্ব লাভ করিবেন বলিয়া, শাক্যসিংহ যেখানে দাঁড়াইয়া বরদান করিয়াছিলেন, তথায় একটি স্তূপ নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইয়ন্ চুয়ঙ্গ তাহার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং সারনাথে মৈত্রেয় বোধিসত্বের যে স্তূপ বর্ত্তমান ছিল, তাহাই যে "ধর্ম্মেক্ষা" বা "ধামেক," তাহাতে সংশয় নাই। তাহাকে "অশোক-স্তূপ" বলিয়া বর্ণনা করা যায় না। তাঁহার শাসন সময়ে বোধিসত্ব-পূজার আড়ম্বর প্রচলিত ছিল না। উত্তর কালে শাক্যসিংহের পরিবর্ত্তে বোধিসত্বগণের অর্চ্চনাই সমধিক প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল; এবং ভবিষ্যতে বুদ্ধত্বলাভের অধিকারী মৈত্রেয় বোধিসত্ব নানা স্থানে প্রধান উপাস্য বলিয়া সমাদর লাভ করিয়াছিলেন।

ধামেক স্তূপটি সারনাথের অন্যান্য বৌদ্ধকীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ হইতে একটু দূরে,—একটু নিভৃতে,—একটু একপার্শ্বে অবস্থিত। ইহার অবস্থান, ইহার গঠন প্রণালী, এবং ইহার ধামেক আখ্যাই ইহাকে "ধর্ম্মেক্ষা" নামক "বোধিসত্ব-স্তূপ" বলিয়া পরিচিত করিতে সমর্থ। এই স্তূপ এখন ধ্বংসদশায় নিপতিত হইলেও, এখনও ইহার অর্চ্চনা তিরোহিত হয় নাই। তাহার নানা চিহ্ন এখনও প্রস্তর খণ্ডে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা যে কতকালে কত যত্নে, কত অর্থব্যয়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল, ইহার রচনারীতি অদ্যাপি তাহার সাক্ষ্যদান করিতেছে। এক্ষণে সারনাথে এরূপ সুদৃঢ় সুবৃহৎ আর কোনও স্তূপ দেখিতে পাওয়া যায় না। যখন সারনাথ বিবিধ সুদৃশ্য এবং সমুচ্চ স্তূপে সুশোভিত ছিল, তখনও ধামেক-স্তূপ উল্লেখযোগ্য ছিল বলিয়াই বোধ হয়। অনেক দূর হইতে ইহার শিখরদেশ তীর্থযাত্রিগণের দৃষ্টিপথে পতিত হইত, অনেক দূর হইতে হর্ষধ্বনি ইহার মাহাত্ম্য বিঘোষিত করিত।

এক সময়ে ভারতবর্ষে এবং ভারতবর্ষের বাহিরে,—সমগ্র বৌদ্ধপ্রভাব-ক্ষেত্রে,—স্তূপ নির্ম্মাণের আতিশয্য উপস্থিত হইয়াছিল। বৌদ্ধ-সাহিত্যে দেখিতে পাওয়া যায়,—এক অশোক ৮৪০০০স্তূপ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। তাঁহার সাধু দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া, উত্তর কালে অনেকেই স্তূপ নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এই প্রথা কালক্রমে এত প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল যে, নিতান্ত নিঃস্ব লোকেও অনুকল্পের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া, অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৃণ্ময় স্তূপ উৎসর্গ করিয়া পুণ্য উপার্জ্জন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। সারনাথের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে এই শ্রেণীর অসংখ্য স্তূপ দেখিতে পাওয়া গিয়াছে।

স্তূপগুলিকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। যথা,—(১) সমাধি-স্তূপ (২) স্মৃতি-স্তূপ, এবং (৩) মানসিক-স্তূপ। সমাধিস্তূপে শাক্যসিংহের এবং সাধুপুরুষগণের চিতাভস্ম; ভিক্ষাপাত্র প্রভৃতি সমাধি নিহিত হইত। তাহা "ধাতুগর্ভ" নামে কথিত হইত বলিয়া, "দাগোবা" (DAGOBA) নামে পরিচিত হইয়াছে। স্মৃতি-স্তূপ 'ধাতুগর্ভ' নামে কথিত হইত না। তাহা কেবল পুণ্যস্মৃতি চিরস্মরণীয় করিবার চেষ্টা করিত। মানসিক-স্তূপ সম্পূর্ণ ভিন্ন শ্রেণীর। কেহ কিছু "মানস" করিয়া, তাহার চরিতার্থতা লাভ করিলে, কোনও পুণ্যস্থানে গমন করিয়া, স্তূপ উৎসর্গ করিয়া আসিত। ধামেক-স্তূপ একটি স্মৃতি-স্তূপ বলিয়াই কথিত হইতে পারে, তাহাতে শাক্যসিংহের চিতাভস্ম সমাধি নিহিত থাকিবার সম্ভাবনা নাই। তাহা বোধিসত্ব-স্তূপ; সুতরাং মহাযান-সম্প্রদায়ের কীর্ত্তিস্তম্ভ। অশোকের শাসন-সময়ে এরূপ স্তূপ নির্ম্মিত হইবার সম্ভাবনা ছিল না; তৎকালে মহাযান-মত প্রচারিত হইবার সূত্রপাত হয় নাই।

অনেকবার ধামেক-স্তূপ পরিদর্শন করিয়াছি। তখন তাহা আবর্জ্জনা রাশিতে সমাচ্ছন্ন ছিল। এবার এক-

দিন,—প্রভাত হইতে সায়াহ্ন পর্য্যন্ত,—এই স্তূপের সম্মুখে, বৃক্ষ স্থায়ার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া, সারনাথ-কাহিনীর আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। সে দিন বড় বিমল আনন্দেই অতিবাহিত হইয়া গিয়াছিল।

পৃথিবীতে হিংসার বিজয়-স্তম্ভের অসম্ভব নাই। সকল দেশেই তাহার কিছু কিছু পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। পাশ্চাত্য সভ্যদেশেই (?) তাহার সংখ্যা কিছু অধিক! তাহার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া, লোকে কত না গর্ব্ব অনুভব করে;—তাহার কাহিনী কীর্ত্তন করিবার জন্য কবিকুল কত না রচনা-লালিত্যের অবতারণা করিয়া থাকে! তাহার তুলনায় এই অহিংসা-স্তূপ,—এই জীবহিতব্রতের অনির্ব্বচনীয় বিজয়-স্তম্ভ,—কিরূপ সমাদর লাভের যোগ্য, আমরা ভাল করিয়া তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার অবসর লাভ করি না। তজ্জন্য এই সকল পুরাকীর্ত্তির নিদর্শনের কথা বঙ্গ-সাহিত্যে ছোট কথা হইয়া রহিয়াছে। তাহার বক্তা শ্রোতা এখনও দুর্লভ বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

যাহারা ধামেক-স্তূপ রচনা করিয়াছিল, তাহারা ইহাকে চিরস্থায়ী করিবার জন্য যথাসাধ্য আয়াস স্বীকার করিতে ত্রুটি করে নাই। নিম্নস্তরে যে সকল সুবৃহৎ প্রস্তরখণ্ড স্তূপীকৃত হইয়াছিল, সেগুলির সহসা স্থানচ্যুত হইবার আশঙ্কা ছিল না। তাহা এরূপ দৃঢ়বদ্ধ ছিল যে, বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সুড়ঙ্গ খনন করিতেও, এক বৎসর অতিবাহিত হইয়া গিয়াছিল! তথাপি তাহা আর পূর্ব্বাবস্থায় বর্ত্তমান নাই। তাহা সারনাথের শ্মশান-ভূমির উপর অর্দ্ধদগ্ধ চিতাকাষ্ঠের ন্যায় দণ্ডায়মান থাকিয়া, লোকচিত্ত অবসাদ-গ্রস্ত করিতেছে।

তথাপি,—তাহা সুন্দর না হইলেও, শিক্ষাপ্রদ;—তাহাকে উপেক্ষা করিয়া ভারত-কাহিনী লিপিবদ্ধ করিবার উপায় নাই।

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়

আঁধারে

(১)

সারাদিন গৃহ-কোণে মগ্ন হ'য়ে স্বার্থ-চিন্তা মাঝে,
বিরত ছিলাম শুধু সংসারের শত মিথ্যাকাজে,
সন্ধ্যা যবে ঘনাইয়া এল ধীরে, চমকি' তখন
সর্ব্বচিন্তা পরিহরি'; কর্ম্ম-ক্লান্ত, অবসন্ন দেহে,
অন্ধকার গৃহ-ছাদে একা আসি' করিনু শয়ন।—
তিমিরে আচ্ছন্ন চারি ধার।
ঊর্দ্ধে দেখিলাম চে'য়ে—
অনন্ত অম্বর-পটে কি বিরাট্ প্রশান্ত মহিমা;
সংখ্যাহীন তারারাজি দীপ্যমান একি দিব্য তেজে!
কি মহান্ এই দৃশ্য;—বিস্ময়ের নাহি আর সীমা!
এহি দিন স্বার্থ-লিপ্সু, ক্ষুদ্র, তুচ্ছ, মূঢ় হৃদয়ে যে
এল আজি অসীমের অনুপম অমৃত সংবাদ!
শিহরিয়া উঠিলাম লভি' এহি শুভ আশীর্ব্বাদ!

(২)

এত লোক নিখিল-নিলয়ে? এত দীর্ঘ জীবের গতি!
একি তানে কা'র পানে ছুটাইছে অদৃষ্ট নিয়তি
এ অখিল ব্রহ্মাণ্ডেরে?
তবু, কেন বৃথা অবিরাম
তুচ্ছ সুখ-লোভে সদা কাঁদে অন্ধ মানবের হিয়া?
তবে কেন পরস্পরে করে সবে সতত সংগ্রাম
রুধির রঞ্জিত করি' ধরাতলে লক্ষ্য বিস্মরিয়া?
আছে যদি এ আশার—এ প্রেমের আরো পরিণতি,
কেন তবে এ জগতে এত দ্বন্দ্ব, এত হিংসা-দ্বেষ?
কেন মিথ্যা হাহাকার, কেন তবে হেন অধোগতি?
দেহ আজি জ্যোতির্ম্ময়, এ ভ্রান্তি-তিমির অপসারি';
পুণ্য-পূর্ণ হো'ক পৃথ্বী, নন্দিত হউক নর-নারী!

শ্রীদেবকুমার রায় চৌধুরী

হীরার মূল্য।

প্রায় আধ ঘণ্টা কাল ধরিয়া পাশের কাম্‌রাতে আলোচনা করিয়া 'জুরী মহোদয়'গণ শেসন 'জজ' সাহেবের আদালত গৃহে প্রবেশ করিলেন। সে দিনকার দৃশ্য ও ঘটনাগুলি আজও আমার চোখের উপর ভাসিতেছে;—কারণ আমি যে আসামী,—নরহত্যা ও দস্যুতার অপরাধে বিচারার্পিত—আসামী! বিচারকের চাকরী, উকীল ব্যারেষ্টারের ব্যবসা, বাদীর কতকটা ক্ষতি এবং কতকটা প্রতিহিংসা, কিন্তু আসামীর নিকট সে বিচার জীবন-মৃত্যুর সমস্যা। বিচারালয়ের অপ্রসন্ন অন্ধকার ভরিয়া পুঞ্জীকৃত নথিপত্র হইতে একটা ন্যক্কারজনক গন্ধ উঠিতেছিল। প্রশস্ত বিচার-গৃহের একধারে মঞ্চের উপর একখানি বড় টেবিল, তাহার সম্মুখে একখানি গদি আঁটা চেয়ারে কালো গাউনের উপর সাদা টাই বাঁধিয়া প্রবীণ জজ সাহেব বসিয়াছেন। নীচে মেঝেতে একখানি টেবিলের উপর কাগজ কলম, নথিপত্রের স্তূপ লইয়া পেস্কার বাবু নিতান্ত গো-বেচারির মত উৎকর্ণ হইয়া বসিয়া আছেন। হুজুরের হুকুম তামিল করাই তাঁর একমাত্র 'পেশা'—তবু কর্ম্মদোষে মাঝে মাঝে সাহেবের ধমক খাইতেছেন। এ কাম্‌রার একপার্শ্বে সাক্ষীর মঞ্চ, অপরপার্শ্বে আসামীর মঞ্চ। কিছু দূরে একখানি লম্বা টেবিল সম্মুখে লইয়া 'জুরীমহোদয়'গণ নিজ নিজ স্থানে বসিয়াছেন। পেস্কারের টেবিলের পর গ্যালারীর মত ক্রমশঃ উচ্চ হইয়া বেঞ্চের সারি চলিয়াছে—সে গুলিতে কৌন্সলী, উকীল, মোক্তার, টাউট ও পরিদর্শকগণ বসিয়াছেন। এককোণে সংবাদ পত্রের প্রতিনিধিদিগের জন্য নির্দ্দিষ্টস্থানে কয়েকটা 'বিশেষ সংবাদদাতা' সংবাদ আহরণের জন্য পক্ষীবিশেষের ন্যায় চঞ্চু উত্তোলন করিয়া বসিয়া আছেন। বিচারগৃহ লোকে লোকারণ্য!

যাহার উপরে আজ সকলের সোৎসুক দৃষ্টি ন্যস্ত—সে আমি! 'নরহত্যা' ও দস্যুতার জন্য অপরাধীর মঞ্চে, নিতান্ত নিরুপায়ভাবে দাঁড়াইয়া! সে ভয়ঙ্কর স্থানে দাঁড়াইয়া যে কৃতকর্ম্মের জন্য আমি বড় একটা লজ্জা অথবা অনুশোচনা বোধ করিতেছিলাম, তাহা নহে—কারণ সে মঞ্চের ভীতি এখন আমার অনেকটা অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এতগুলি লোক যে আমার পানে বাঘের মত চাহিয়া আছে, সেটা আমার নিকট বড়ই অসহ্য ঠেকিল! জুরীগণ যখন আলোচনা শেষ করিয়া বিচার গৃহে ফিরিলেন, তখন দিবাবসানের মুমূর্ষু আলোকরেখাটী অন্ধকারে বিলীন হইয়া গিয়াছে। কিছুক্ষণ পরে, হঠাৎ একসঙ্গে চতুর্দ্দিকে কয়েকটী বৈদ্যুতিক আলো দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল! আমার মনে হইল যেন সেগুলি বর্ণহীন তেজঃপুঞ্জ মাত্র—যেন ছবির ফানুস্—রূপ আছে কিন্তু ছটা নাই!

চারিধারে পুলিস, চাপরাশী জনতার মধ্যে অতিকষ্টে শান্তিরক্ষা করিতেছে। আইন শাস্ত্রের নূতন-রসজ্ঞ 'জুনিয়ার' উকীলমণ্ডলীর চসমা-মণ্ডিত নয়ন হইতে বৈদ্যুতিক আলো প্রতিফলিত হইয়া যেন গৃহময় কৌতুহল বিকীর্ণ করিতেছিল। সকলের মুখেই ভয়ানক একটা উত্তেজনার চিহ্ন—কি হইবে বলা যায় না! অদূর ভবিষ্যতে, অনিশ্চিত বিচারফল যেন একখানি অতি সূক্ষ্ম পরদার আড়ালে অতি সুনিশ্চিত ভাবে অবস্থিত! এই ক্ষণিকের বিলম্বটাও জনতার পক্ষে একান্ত অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল, মানুষ এমনি হৃদয় হীন! আর আমি? শুধু প্রাণপণ বলে আশা করিতেছিলাম, আরও কিছু বিলম্ব হোক! জুরী এত তাড়াতাড়ি ফিরিয়া আসিল কেন? তবে কি আর কোন সন্দেহ নাই? জজের গম্ভীর বদনমণ্ডলের মাঝে আমি তো একটিও আশার রেখা খুঁজিয়া পাইলাম না। আমার মাথার ভিতরে রক্ত ঝিম্ ঝিম্ করিতেছে। গৃহের প্রজ্জ্বলিত দীপগুলি যেন একত্র হইয়া বৃত্তাকারে আমার চারিদিকে ঘুরিতে লাগিল। দোষী হোক, নির্দ্দোষী হোক, বিচার গৃহের ভীষণতা আসামী ভিন্ন আর কে হৃদয়ঙ্গম করিবে? আমি 'দারুণ উৎকণ্ঠায় জুরিগণের চিন্তাক্লিষ্ট পাণ্ডুর মুখমণ্ডলের মাঝে আমার ভবিষ্যত বৃথা খুঁজিয়া মরিলাম জীবনের ক্ষীণসূত্র লইয়া আশা-নিরাশার একি প্রাণান্ত খেলা!

পরিণাম যতই নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, ততই যেন শৃঙ্খল, কারাগারের নির্জ্জন বন্দীশালা, প্রহরীর গুরু-

পদধ্বনি, সঙ্গীনের ধারাল চাকচিক্য, ফাঁসীরজ্জুর প্রাণ বিভীষিকা, এক অতি ভয়ঙ্কর দীর্ঘ রজনীর কথা আমার মনে ফুটাইয়া তুলিতে লাগিল, মৃত্যু অপেক্ষাও মৃত্যুর সে ভয়ঙ্কর প্রতীক্ষা বড় নিষ্ঠুর! জীবন-মরণের সন্ধি ফলকের উপর দাঁড়াইয়া আমি স্পষ্টই দেখিতেছিলাম, একদিকে অন্ধকার রজনীর তিমির তট আমার অদৃষ্টের পানে ঘনাইয়া আসিতেছে, অপর দিকে শ্যামল সংসার মরীচিকার মত হাসিতে হাসিতে আমার মুগ্ধ নয়নের সম্মুখ দিয়া সরিয়া যাইতেছে! এ সচেতন মৃত্যু কি ফাঁসীর অজ্ঞান-মৃত্যু অপেক্ষা অনেক বেশী ভয়ঙ্কর নহে?—শত্রুরও যেন এমন না হয়!

এ জীবনে ভগবানের উপর কোনকালেও আমার কোনও নির্ভর ছিল না তাই আমার ব্যারেষ্টারের উপর জগতের রক্ষাকর্ত্তার সর্ব্বশক্তি আরোপ করিয়া তাঁহার মুখের মাঝে আমি অভয় অন্বেষণ করিতে লাগিলাম, কিন্তু হায় সেখানে অভয়ের সান্ত্বনা কোথায়? প্রতিমুহূর্ত্তে যেন ঝলকে ঝলকে আমার রক্ত শুকাইয়া উঠিতেছিল, ওঃ কি শুষ্ক সে পিপাসা! মৃত্যু কি ইহা অপেক্ষাও ভয়ঙ্কর?

কিন্তু কি আশ্চর্য্য, আমার ব্যারেষ্টারের মুখে তো কোনও উদ্বেগের চিহ্ন দেখিতে পাইলাম না। বিচার ব্যাপারটা যেন একটা নিতান্ত সহজ উত্তেজনাহীন দৈনন্দিন ঘটনা মাত্র—ইহার ভিতরে যেন বিশেষ কোনও একটা গুরুত্ব নাই, তাঁহার মুখে চক্ষে এমনি একটা লঘুভাব! বিচার ফলের সহিত যেন তাঁহার কোনও সংস্রবই নাই—যেন ফলাকাঙ্ক্ষা বর্জ্জিত কর্ম্মের প্রতিমূর্ত্তি খানি—কলিতে নিষ্কাম ধর্ম্মের একমাত্র উপাসক! যখন জুরীগণ আসিয়া যথা স্থানে উপবেশন করিলেন তখন সমস্ত জনতা ব্যাকুল হইয়া সেই দিকে চাহিল। কিন্তু আমার ব্যারেষ্টার তখন একটা পেন্সিল কাটা ব্যাপারে এত ব্যাপৃত ছিলেন যে, জুরীদের আগমনটা তিনি লক্ষ্যই করেন নাই। কিন্তু আমি ঠিক লক্ষ্য করিতে পারিয়াছিলাম যে, তিনি সকলের অলক্ষিতে চুরি করিয়া একবার জুরিদের মুখপানে চাহিয়া লইয়া—আবার অতি নিপুণতার সহিত পেন্সিলাগ্র সরু করিতে লাগিলেন। বলা বাহুল্য আমার আর বুঝিতে বাকী রহিল না, যে এ নিষ্কাম ধর্ম্মের লক্ষণ নয়, ব্যারেষ্টারী কায়দা মাত্র। এমন সময়ে জজসাহেব গম্ভীর স্বরে বলিয়া উঠিলেন :—

জুরী মহাশয়গণ! আপনারা আসামীর দোষ বা নির্দ্দোষ সম্বন্ধে সকলে কি একমত হইতে পারিয়াছেন!

তখন কাছারীগৃহের গুণ গুণ ধ্বনি একেবারে থামিয়া গিয়াছে—বুঝিবা একটী আলপিন মেজেতে পড়িলেও তার শব্দ শোনা যায়! জুরিপতি স্কুলের শিক্ষক; মাথায় জর্ম্মান বাবু ক্যাপ্; মুখে অপরিপাটী শ্মশ্রু; চোখের উপর নিকেলের চশমা। কালো কোটের নীচে কামিজের ছিন্ন বোতাম হীন কফটী অতি কষ্টে আত্মগোপন করিতেছিল। তিনি সসম্ভ্রমে দাঁড়াইয়া বলিলেন "হাঁ, আমরা সকলেই একমত!"

আমি তখনো দণ্ডায়মান। কিন্তু সে যেমন বজ্রাহত পথিকের মত! সমস্ত জড় জগত তখন আমার চক্ষের উপর ভয়ঙ্কর অস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। জজসাহেব পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন :—

"আসামী দোষী কি নির্দ্দোষী?"

"সর্ব্ব সম্মতিক্রমে নির্দ্দোষী!"

জজ ও জুরিপতিতে এই সাংঘাতিক কথোপকথন সমাপ্ত হইতে পুরা দুই মিনিট কালও লাগে নাই। কিন্তু আমার মনে হইল আমি যেন এক যুগের নরক-যন্ত্রণা অতিক্রম করিয়া আসিয়াছি! কতক্ষণ পরে আমি প্রকৃতিস্থ হইলাম, তাহা সঠিক বলিতে পারিনা—কিন্তু যখন অসম্ভব সম্ভব হইল,—বিচার ফলের মর্ম্ম আমার সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম হইল, তখন দেখি আমার পা-দুখানি অসম্ভব কাঁপিতেছে। অবলম্বনের জন্য আমি 'টিক-টিকির রেলিং ধরিয়া কোনও মতে খাড়া থাকিলাম।

যখন উত্তেজনার প্রথম উচ্ছ্বাস থামিল তখন বুঝিলাম, স্বপ্ন নয়—সত্য সত্যই আমি খালাস পাইয়াছি। আমি কৃতজ্ঞতাপূর্ণ চক্ষে আমার রক্ষাকর্ত্তা ব্যারেষ্টারের মুখপানে চাহিলাম! কিন্তু কি আশ্চর্য্য! তখনও তিনি পূর্ব্ববৎ তদ্গতভাবে পেন্সিলই কাটিতেছিলেন। তিনি তাড়াতাড়ি আমার নিকটস্থ হইয়া দুইটা মিষ্ট বাক্যও বলিলেন না, অথবা খালাসের মূল্য স্বরূপ অতিরিক্ত

পারিতোষিকও চাহিলেন না! লোকটার রকম সকম, ভাবভঙ্গি দেখিয়া আমি একবারে অবাক্ হইয়া গিয়াছিলাম। আমাকে মোকদ্দমার দায় হইতে খালাস করিবার জন্য লোকটা কি অক্লান্ত পরিশ্রমই না করিয়াছে! অথচ যখন সেই পরিশ্রমের পুরস্কার তাঁহার হস্তগত হইল, তখন তাঁহার মুখে একটী আত্মপ্রসাদের রেখাও ফুটিল না! যেমন দিনের পর রাত্রি—রাত্রির পরে দিন হয়—আমার নিষ্কৃতিও যেন তেমনি একটা সুনিশ্চিত প্রাত্যহিক ঘটনা মাত্র! যেন প্রত্যাশার অধিক কিছুই ঘটে নাই, তাঁহার মুখে এমনি একটা ভাব! যখন হাকিম আমার খালাসের হুকুম প্রচার করিলেন, কেবল তখন একবার দেখিলাম তিনি তাঁহার সঙ্গীয় শিক্ষা নবীস জুনীয়ার উকীলের কাণের কাছে হাসিয়া হাসিয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া কি যেন কহিলেন, কিছু শুনিতে পাইলাম না—কিন্তু আমার মনে হইল, সে হাসির মধ্যে জজ ও জুরীর বিবেচনা শক্তির উপর এবং আমার অব্যাহতির উপর একটা তীব্র শ্লেষ ব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। আমার ব্যারেষ্টারের 'রায়ই' ঠিক 'রায়' কিন্তু তবু অপ্রিয় সত্যকে প্রাণ ভরিয়া গ্রহণ করিতে পারিলাম না। আমার মনে হইল, লোকটা আমার জন্য যথেষ্ট করিয়াছে বটে কিন্তু শেষকালে তার একি ব্যবহার! লোকটার উপর আমার তখন অশ্রদ্ধাই হইল! শ্রদ্ধার প্রয়োজনও নির্ভরের সঙ্গে সঙ্গে ততক্ষণ অন্তর্হিত হইয়াছে! সংসারে এই ত প্রথা— তাহাতে আমার এমনি কি বিশেষ দোষ

যথা সময়ে আমার সঙ্গীয় টাকা কড়ি কাপড় জামা প্রভৃতি সব ফিরিয়া পাইলাম। হত্যাপরাধে আমার যে পিস্তলটীও বাজেয়াপ্ত করা হইয়াছিল, তাহাও পুনরায় আমাকে প্রত্যর্পণ করা হইল। বিচারের দীর্ঘ কয়েক ঘণ্টার তীব্র উত্তেজনার পর জনতার ভিড় ঠেলিয়া তাড়াতাড়ি তাড়িতালোকে উদ্ভাসিত সুবিস্তৃত রাজপথে বাহির হইয়া পড়িলাম। অন্ধকার রাত্রির শীতলতা বহুকালের অপহৃত মাতৃবক্ষের ন্যায় মধুর! বহুদিনের অবরোধের পর জ্বর-তপ্ত শিশুর মত, সেই স্নিগ্ধ অন্ধকারের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িলাম। ধীরে ধীরে মুক্ত বায়ুর স্পর্শে আমার স্বেদ-সঞ্চিত উত্তপ্ত ললাট জুড়াইল!

সংসারের মাঝে নিজকে অনুভব করিয়া কতকটা বিস্মিত হইলাম! কিন্তু বারংবার ভিতর হইতে কে যেন বলিতেছিল, তুমি অপরাধী! তুমি অপরাধী,—মনে হইল বুঝিবা খালাস পাই নাই, শুধু রাজদ্বারে চলিয়াছি মাত্র! কিন্তু এ ভাবান্তর মনে বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় নাই; কারণ তাহা হইলে অপরাধীর আর সংসার করা চলে না! আমি যে দণ্ডবিধি আইনের একটী ছিদ্রপথে নিরঙ্কুশ বাহির হইয়া পড়িয়াছি, সেকথা বিচারালয়ে মানুষের ভ্রান্ত বিচারে ত আমি মুক্তিলাভ করিয়াছি, বুঝিতে আর বড় বিলম্ব হইল না। রাজপথে চলিতে চলিতে একটু শীত শীত করিতে লাগিল! এই মোকদ্দমার আসামী হইয়া প্রথম যখন হাজতে ঢুকিয়াছিলাম, তখন ভাদ্রমাস। আজ অগ্রহায়ণের শেষ ভাগে অব্যাহতি লাভ করিয়াছি। সাদা চাদর ও একটী ছিটের জামা গায়ে দিয়া হাজত বাসরে পদার্পণ করিয়াছিলাম। আজ অগ্রহায়ণের শীত তাহাদের দ্বারা বারণ হইবে কেন? কিন্তু আসল কথা বলিতে কি, বাহিরের শীতলতা অপেক্ষা বেশী হিম লাগিতেছিল আরেক জায়গায়! ব্যারেষ্টারের শেষ ব্যবহারটা যেন আমার অন্তরের মধ্যে স্পিরিট্ ইথার ঢালিয়া দিয়া হৃত্পিণ্ডটাকে একবারে বরফ করিয়া দিয়াছে! এতক্ষণে সে ব্যারেষ্টারের নিকট নিজের জীবন ঋণের শেষ কৃতজ্ঞতার রেখাটী বিলুপ্ত হইল—অনাবিল ঘৃণা ও বিরক্তি ভিন্ন তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করিবার আমার আর কিছু ছিল না!

খানিক দূরে আসিয়া বিদ্যুত্ বিকাশিত রাজপথের আলোক অসহ্য বোধ হইল। ল্যাম্প-পোষ্ট বামে রাখিয়া তাড়াতাড়ি সুড়ুং এর মত অন্ধকার একটা অপ্রশস্ত গলির মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলাল। কিছু দূরে অগ্রসর হইয়া "বিশুদ্ধ-ব্রাহ্মণের হোটেল" এই ধ্বজ-বজ্রাঙ্কিত একটী সাইন-বোর্ড দেখিতে পাইয়া সেই ঘরে প্রবেশ করিলাম, কারণ অনেকক্ষণ হইল উদরাভ্যন্তরে ভগবান্ বৈশ্বানর আসন পরিগ্রহ করিয়াছিলেন।

হোটেলখানায় উপস্থিত হইয়াই দেখি, সেখানে

সমাগত লোকেরা আমার মোকদ্দমাটীর পুনর্বিচার করিতেছে! এ হাইকোর্টে বহু বিচারক আমার দোষ নির্দ্দোষ সম্বন্ধে বহুপ্রকার 'রায়' প্রকাশ করিতেছেন!

কেহ বলিতেছিল "মানুষ বুদ্ধিমান হইলে জুরী লিষ্ট থাকিয়া তাহার নাম কাটীয়া দেওয়া হয়!" কেহ গম্ভীর-ভাবে বলিতেছিল, "এ বোকামি নয়—এর নাম অতি বুদ্ধি, কিসের লক্ষণ জান তো!" কেহ বলিল "জজ বুঝেছিল, কিন্তু এ জুরির বিচার, করে কি!" ইত্যাদি। এক কোণায় কুপির মধ্যে কেরাসিনের দীপখানি বহুকষ্টে ঝুলের মধ্যে জ্বলিতেছিল—তাহাতে আলো অপেক্ষা অন্ধকারই ভাল দেখা যাইতেছিল! যখন আমি হোটেলে প্রবেশ করি, তখন দেখিলাম একটী ঝি ঘরের বারান্দা ঝাঁট দিতেছে। আমাকে দেখিয়াই সে আর একটী লোককে ধাক্কা দিয়া কাণে কাণে কি যেন বলিল! তৎক্ষণাৎ সমস্ত ঘরময় একটা কাণাকাণি, অর্থপূর্ণ চোখো-চোখি, সংক্রামক ব্যাধির মত বিস্তৃত হইয়া পড়িল! ঘরের মেজেতে একটী সপের উপর গিয়া সবে বসিয়াছি, অমনি আমার পশ্চাদ্দিক্ হইতে আমার জামার উপর একটা অভদ্রোচিত স্পর্শ অনুভব করিয়া ফিরিয়া দেখি একটী মধ্য-বয়স্ক লোক—দাঁড়াইয়া। ইনি হোটেলের কর্ত্তা! তিনি হোটেলের কর্ত্তাই হউন, আর বিকানিরের মহারাজাই হউন, একজন আগন্তুকের সঙ্গে তাঁর এ প্রকার ব্যবহারটা আমি আদৌ পসন্দ করি নাই, সেই জন্য বিরক্তিকে চাপা না দিয়া একটু তিক্ত স্বরেই বলিলাম :—

"সে কি রকম, মশায়?"

সে লোকটী উদ্ধত স্বরে জিজ্ঞাসা করিল :—"পান্নালাল জহুরীর খুনের মামলার আসামী না তুমি?"

আমি উত্তর করিলাম :—"বেশতো, তাতে হয়েছে কি?"

এতক্ষণ আমার চারিদিকে মিশ্রির দানার মত জটলা বেশ বাঁধিয়া উঠিয়াছিল,—যেই আমার ঐ স্বীকারোক্তি অমনি লোকগুলি সব আমার নিকট হইতে একটু তফাৎ হইয়া দাঁড়াইল—যেন আমি কুষ্ঠরোগী, সংস্পর্শে আসিলে ব্যারাম হইবে।

তখন হোটেলের সুলতান রুক্ষকণ্ঠে আমায় বলিল :—"এমন লোকের খাবার আমার হোটেলে হবে না, তুমি তোমার পথ দেখ।" আমি জবাব দিলাম "মামলায় আমি বেকসুর খালাস পেয়েছি যে!"

বেয়াড়া হোটেল-ওয়ালা বলিল "তোমার আদালতের নথি তলব করে আমরা মামলা কত্তে বসিনি, বেরোও, বলূচি—নৈলে ভাল হবে না!"

উদরে ক্ষুধা বাহিরে অপমান; আমি অন্ধকারের জীব আবার অন্ধকারে বাহির হইয়া পড়িলাম। হোটেলের বাহিরে আসিয়া দেখি একদল ছেলের 'রেজিমেণ্ট' জড় হইয়াছে! আমি বাহির হইবামাত্র তাহারা আমার পিছু লাগিল! কেহ বলে চোর, কেহ বলে বদমায়েস্, কেহ বলে ডাকাত, কেহ বলিল মানুষ খেগো! কেহ কেহ বাক্যুদ্ধ অনাবশ্যক মনে করিয়া ইট পাটকেল ছুড়িতে লাগিল! আমি তাড়াতাড়ি বহুকষ্টে অনেক অলি-গলি ঘুরিয়া তাহাদের কবল হইতে এ যাত্রা রক্ষা পাইলাম।

চলিতে চলিতে সহরের এক প্রান্তদেশে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। তখন কুহেলীজড়িত নিশীথের উপর ক্ষীণ-চন্দ্র ক্ষয়রোগাক্রান্তা সুন্দরীর ন্যায় শীর্ণ সুন্দর মুখে দেখা দিয়াছেন। আমার যাইবার কোনও নির্দ্দিষ্ট স্থান ছিল না। যাহারা অন্ধকারের জীব—তাহাদের সংসারবন্ধন থাকে না। তাই অনির্দ্দিষ্ট পথে চলিতে ছিলাম, আর ভাবিতেছিলাম, কেবল আমার সেই ব্যারেষ্টারের কথা। এ সংসারে আমার লুণ্ঠনের সাম্রাজ্য যে পুনঃসংস্থাপিত হইয়াছে—অন্ধকার রজনীর ভিতরে আজ যে 'পুনরায় আমার স্বাধীনতা ফিরিয়া পাইয়াছি, তাহার মূলে ত ব্যারেষ্টারের কুশাগ্রীয় আইনবুদ্ধি এবং অক্লান্ত মানসিক পরিশ্রম। তাহারই চেষ্টায় আজ আমার ভবিষ্যৎ কণ্টক-মুক্ত। নচেৎ আজকার রাত্রিবাসের জন্য অন্ধকার কারাকক্ষে আমার স্থান হইয়াছিল—তার পরের রজনী কোন্ গাঢ়তর অন্ধকারের মধ্যে নিদ্রিত ছিল, তাহা কে বলিতে পারে! কিন্তু তবু কেন জানি না, তাহার প্রতি আমার একটা ঘৃণাই কৃতজ্ঞতাকে বে-দখল করিয়া অন্তরে বাহিরে জমিয়া উঠিল!

পথ চলিতে চলিতে রাস্তার ধারে একখানি হতশ্রী উদ্যানের মাঝে একখানি ছোট পাকাবাড়ী দেখিতে পাইলাম। গাছ পালার কোনও পারিপাট্য নাই। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত জঙ্গলের মধ্যে দুই একটা সুগন্ধি ফুলের গাছে—দুই একটা অস্ফুট কলি, পত্র বাহুল্যের মধ্যে যেন লজ্জিত হইয়া রহিয়াছে। ঘর খানির চারিদিক হইতে খোলা জানালা দিয়া আলো বাহিরের বনরাশিকে উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছিল। ঘরের ভিতর হইতে বাঁশীর সুর বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছিল।—"বাঁশরী বাজাতে চাহি, বাঁশরী বাজিল কই!"

উদরাভ্যন্তরে তখন ক্ষুধার আগ্নেয়গিরি জ্বলিতেছিল; সুতরাং তখন আমার বিবেচনা করিয়া কায করিবার বড় একটা অবসর ছিল না। উদ্যানস্থিত মেধি গাছের বেড়া একলম্ফে পার হইয়া একবারে বাগানের ভিতরে আসিয়া পৌঁছিলাম। বরাবর দালানটীর সদর দরজার কাছে আসিয়া দেখি দ্বার ভিতর হইতে বন্ধ। বাহির হইতে বারংবার কড়া নাড়িতে লাগিলাম এবং দরজায় আঘাত করিতে লাগিলাম কিন্তু ঘরে লোক জনের সাড়া পাইলাম না। কেবল কে একজন তাহার সমুদয় মন প্রাণ বাঁশীর সুরে ভাসাইয়া দিয়া একটা ব্যথিত আর্ত্তস্বরে যেন নির্জ্জনগৃহের চারিধার মুখরিত করিয়া তুলিয়াছে। সুরের মধ্যে বারংবার তালভঙ্গ হইতেছিল। বাজনা শুনিয়া বেশ বুঝা যায় যে বাঁশী বেচারা নূতন শিক্ষার্থীর দৌরাত্ম্যে এমন বেসুরা কাঁদিতেছে। শীতল দমকা হাওয়া মাঝে মাঝে হু হু করিয়া আসিতেছিল। কিন্তু ধন্য শিক্ষার্থীর সহিষ্ণুতা! তার বাদ্যের আর বিরতি ছিল না। আমি আরো দুই তিন বার দ্বারে আঘাত করিলাম, কিন্তু তবু কেহ আসিল না। তখন খুব জোরে ধাক্কাধাক্কি করিতে করিতে ভিতরের জীর্ণ অর্গল সহসা খুলিয়া গেল আমিও মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। যেখানে প্রবেশ করিলাম সেটা একটা বারান্দার মত। আমি বাঁশীর উন্মত্ত চীৎকার লক্ষ্য করিয়া বরাবর সেই কামরার দিকে অগ্রসর হইলাম। আমার পদশব্দে তখন বাঁশীর গান থামিয়াছে। যে ঘর হইতে বাঁশীর শব্দ আসিতেছিল সে ঘর হইতে কে একজন যেন চেনাস্বরে কহিল "কে ও?" তাহার প্রশ্নের প্রত্যুত্তর স্বরূপ তখন আমি সেই কামরার ভেজান দরজা ঠেলিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছি। ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখি, সে নটবর বংশীধারী অপর কেহ নহে আমারই ব্যারেষ্টার!

ইনি সেই ব্যারেষ্টার। যাহার কৃপায় এই অল্পক্ষণ হইল আমার গলা হইতে মৃত্যুর দড়ি খসিয়া গিয়াছে এবং এতক্ষণ রাস্তায় রাস্তায় যাহার মুণ্ডপাত করিয়া আসিয়াছি। টেবিলের উপর একটী উজ্জ্বল কেরাসিনের ল্যাম্প জ্বলিতেছে। ব্যারেষ্টার তার পার্শ্বে বাঁশী লইয়া বসিয়া। মুখে উদ্বেগের চিহ্ন—চক্ষের উপর একটা সন্নিহিত আশঙ্কার ছায়া। জানি না, কেন তাহার মুখ-চোখ দেখিয়া আমার মনে হইল যে, রহস্যের গূঢ় বৃত্তান্ত আমি তাহার নিকট গোপন করিয়াছি, সে যেন তার ঢের বেশী খবর রাখে। আমার শরীরটা কাঁটা দিয়া উঠিল। যদি তাহাই হয়, আমার গোপন কথা যদি ঘুণাক্ষরেও সে জানিয়া থাকে, তবে এই দণ্ডে পিস্তলের গুলিতে তাহার মাথা উড়াইয়া দিতে কুণ্ঠিত হইব না। এ চিন্তা করিয়া পকেটের পিস্তলটা স্পর্শ করিলাম। আমাকে দেখিয়াই তিনি বলিয়া উঠিলেন, "কেও তুমি? এসো, বসো এসে।" আমি কুণ্ঠিত ভাবে দরজার কাছে দাঁড়াইয়াছিলাম;—আমার মনের মধ্যে তখন একটা বিপ্লব চলিতেছিল। আমাকে নীরব দেখিয়া তিনি আবার বলিলেন "এসো না হে, দরজাটা দাও দেখি, ভারি ঠাণ্ডা আস্‌চে।"

এবার আমি নিঃশব্দে দরজাটা বন্ধ করিয়া দিয়া ব্যারেষ্টারের সামনে একটা বেঞ্চের উপর গিয়া বসিয়া পড়িলাম। বলা বাহুল্য ইচ্ছা করিয়াই আমি তাঁহাকে নমস্কার করিলাম না।

ব্যারেষ্টার আমার সঙ্গে আর কোনও কথা না বলিয়া পুনরায় বাঁশীতে তাঁহার কণ্ঠ মুখরিত করিয়া তুলিলেন:—

"তোমার গোপন কথাটী সখি, রেখো না মনে,
তোমার গোপন কথাটী শুধু, আমায় শুধু, আমায়
বোলো আমায় গোপনে!"

একি আমাকেই লক্ষ্য করিয়া তিনি গান ধরিলেন!

ব্যারেষ্টার খর্ব্বাকৃতি মনুষ্যটী; মুখখানি পাকা আমড়াটীর মত গোলগাল রসে পূর্ণ। হাল্ ফেসনে দাড়ি-গোঁপ কামান। চঞ্চল, তীব্রোজ্জ্বল চক্ষু দুটীর উপরে এক যোড়া যুক্ত ভুরু। কিন্তু সে একা। সে ঘরে আর কেহ নাই। আমার স্থির বিশ্বাস হইল সে আমার গুপ্ত রহস্যের সব সন্ধান পাইয়াছে। তবে তার মৃত্যু অনিবার্য্য। শীঘ্র হউক, বিলম্বে হউক, স্থির করিলাম, আমার সমুদয় রহস্য জানে, এমন লোক দুইটী এক সঙ্গে বাঁচিয়া থাকিতে পারিবে না।

কিছুকাল পরে বাঁশীটী টেবিলের উপর রাখিয়া দিয়া তিনি স্মিতমুখে আমাকে বলিলেন :—

"তাইতো,—এখন যে তুমি আসবে তা'ত আমি স্বপ্নেও জানতুম না।" তখন রাত্রি আন্দাজ সাড়ে দশটা।

টানেলের মধ্যে শব্দ করিলে যেমন কতকটা অস্পষ্ট আওয়াজ হয়, তেমনি আমি গুজ্ গুজ্ করিয়া কতকটা কি বকিলাম। তার অর্থ তিনি ত কিছু বুঝিলেনই না, আমিও বুঝি নাই। মনের অবস্থা তখন বড়ই বিশ্রী! তিনি তার পর বলিলেন :—

"দেখ, আজ বাঁশীর সঙ্গে আমার মনের সুর মিস্‌ল না। খালি বেসুরা বাজ্‌চে। যতটুকু রহস্য আজ এর ভিতরে পুরে দিচ্ছিলাম, ততদূর যেতে সে একেবারে নারাজ।"

আমি রুদ্ধকণ্ঠে বলিলাম :—আমারো মনে হচ্চে আজ অনেক অনুচিত রহস্য একে বলা হয়েছে।"

তখন ব্যারেষ্টারের মুখ একেবারে সাদা হইয়া গিয়াছে। আমিও সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ হইয়া আমার কর্ত্তব্য স্থির করিলাম।

কিন্তু চোখের নিমিষে নিজের মনোভাব গোপন করিয়া অতি উজ্জ্বল-তীব্র দৃষ্টিতে যেন আমার কালো অন্তঃকরণের সমস্তটা দেখিয়া লইলেন! ওঃ সে কি ভয়ানক বৈদ্যুতিক "ক্রশ একজামিনেসন্"! তারপর কি মনে করিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া শিশ্ দিতে দিতে নিকটস্থ আলমারী হইতে দুইটী চুরুট বাহির করিয়া একটী আমাকে দিয়া, অপরটী তিনি ধরাইয়া মুখে দিলেন। হাভানার সৌরভে ঘর আমোদিত হইল।

চেয়ারে বসিয়া অন্যমনস্কভাবে পূর্ব্বচিন্তার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিলেন, "ততদূর যেতে সে একেবারে নারাজ! তাইতো, তবে আর কেন!" তখন পুনরায় স্ফূর্ত্তির সহিত আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন :—

"একটা পয়েন্ট নিয়ে বাঁশীতে আমাতে তর্ক হচ্চিল—আজ বাঁশীর কাছে আমার যুক্তি তর্ক হার মেনেছে! তা যাক্, ভাল কথা, এখন কি করবে বলে ঠিক করে? জীবনে আবার একটা সুযোগ পেলে?"

আজ চারি পাঁচ মাস পরে তাম্রকূটসার মস্তিষ্কে প্রবেশ করিয়া আমার বুদ্ধি বেশ সতেজ ও খোলাসা করিয়া দিয়াছে। পাঠক, বোধ হয় জানেন, বিচারের অব্যবহিত পূর্ব্বে আমি যেখানে ছিলাম, সে রঙ্গালয়ে ধূমপান নিষেধ!

আমি স্থির হইয়া বলিলাম :—

"আপনি জানেন, সকলের আগে আমি কি কোর্‌ব, ঠাউরিছি?"

তিনি একটু গম্ভীর হইয়া বলিলেন :—

"না, তবে আগে যা কোর্‌বে, তাতেই তোমার ভবিষ্যতের গতি স্থির হবে।"

আমি খুব দৃঢ়তার সহিত তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলাম ;—

"আমার সকলের আগের কায—আপনাকে খুন করা!"

তিনি হাসিয়া উঠিলেন!

এমন সম্ভাষণেও যে মানুষ হাসিয়া উঠিতে পারে, তাহা আমার জানা ছিল না। তারপর হাসির সঙ্গে খানিকটা কটু বিদ্রূপ মিশ্রিত করিয়া তিনি আমাকে বলিলেন :—

"সে আমি অনেকক্ষণ বুঝ্‌তে পেরেছি। যখন তুমি ঘরে ঢুকেচো, তখন থেকেই। কিন্তু আমার কথাটা হচ্চে এই যে, কায যেন এই ভাবেই সুরু কর্‌লে,—তারপরে?" আমি মুখ হইতে একগাল চুরুটের ধোঁয়া বাহির করিয়া দিয়া, গাঢ়স্বরে বলিলাম,—

"ওঃ, তার পরের কথা ভাব্‌বার ঢের সময় পাওয়া যাবে।"

আবার হাত দিয়া পকেটের পিস্তল স্পর্শ করিলাম। সে যেন মৃত্যুবাণ হৃদয়ে লইয়া সর্পের মত ফোঁপাইতে ছিল।

কাযটা সারিবার জন্য মনে মনে একটা প্ল্যান আঁটিলাম। মনে হইল, আগে তাঁহাকে বেশ চটাইয়া লইলে কায করিবার জন্য যথেষ্ট উত্তেজনা ও অজুহাত পাওয়া যাইবে। নচেৎ যাহার বুদ্ধিতে আজ আমি বাঁচিয়া রহিয়াছি, তাহাকেই গুলি করা! সে বড় কঠিন!

কিন্তু এ ক্ষেত্রেও আমারই আগা গোড়া ভুল! এ পর্য্যন্ত অসদ্ব্যবহারেও যাহাকে আমি চটাইতে পারি নাই, তাহাকেও আবার চটাইবার চেষ্টা! এবারও আমার ব্যবহারে তাঁহার কোনওরূপ ভাবান্তর হইল না। তিনি বলিলেন "পরের কথা পরে ভেবে তোমার বেশী লাভ হবে না। এখন থেকে যদি জীবনটাকে তুমি এমনি করে গুরুভার করে তোল, তবে পরে আর অভ্যাস বদলাতে পারবে না। আমাকে খুন করা, তোমার পক্ষে খুব একটা বড় কথা নয়, তা জানি। আগ পাছ বিবেচনা না করে হঠাৎ কাজ কল্লে তোমার কোন লাভ হবে না—মনে তোমার একটা দাগও থেকে যেতে পারে।" কথাটার মধ্যে যেন একটা তীব্র ব্যঙ্গোক্তি নিহিত ছিল। তার পর দুজনেই খানিকক্ষণ চুপ্ চাপ্—কোনও কথাবার্ত্তা নাই। আমি পকেটের মধ্যস্থিত ছোট পিস্তলটার উপর অন্যমনস্কভাবে অঙ্গুলি চালনা করিতেছিলাম। পরে, তিনি হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন:—

"তুমি যা ভাব্‌চ্—সে বিষয়ে আমার কতটা জানা আছে, শুনবে?" আমি একটু কাষ্ঠহাসি হাসিয়া বলিলাম:—

"যদি খুব তাড়াতাড়ি বলে শেষ কত্তে পার, তবে—আমার বেশী ফরসুত নাই!"

তিনি বলিলেন:—"বেশ্ কথা!" দেখবে এখন, তুমি যতখানি মনে কচ্চ, তার চাইতেও কতখানি বেশী আমার জানা আছে! প্রথম বাদীর পক্ষে, কি নালিশ ছিল, তা একটু তলিয়ে দেখা যাক্।"

আমি বলিলাম, "বেশ"

তিনি বলিতে আরম্ভ করিলেন:—

ছেক্‌ড়া গাড়ীতে পান্নালাল জহুরী মাঠের ভিতরের রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল, রাত্রি অনেক। সঙ্গে শুধু চাকর গণেশরাম। স্বভাবটা তার খুব সুবিধাজনক ছিল না। জহুরীর সঙ্গে টাকা পয়সা ছিল ঢের। আর ছিল সেই হীরাটী, দাম পঁচিশ হাজার টাকার কম হবে না। কেমন?" আমি বলিলাম "হুঁ"

তিনি বলিতে লাগিলেন:—"বেটা নেহাৎ মূর্খ! সমান্য পয়সা বাঁচাতে গিয়ে, এত রাত্তিরে, এত টাকাকড়ি জহরৎ নিয়ে এমন ভাবে যাওয়া! ভোরবেলা দেখা গেল,—কোচোয়ান বেটা অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে,—তোমরা তাকে ক্লোরোফরম করে ছিলে।"

আমি একটু কাঁপিলাম।

"গাড়ীর ঘোড়া দুটোর সর্ব্বাঙ্গ ঘাম ও ফেণায় মাখা! তারা খালি মাঠের মাঝে ছুটাছুটী কচ্ছিলো। রাস্তার উপরে গাড়ীখানি উল্‌টে পড়ে আছে। আর দেখা গেল, গাড়ীর কাছেই পান্নালাল মৃত অবস্থায় পড়ে আছে। বুকে আর পাঁজ্‌রাতে দুটো পিস্তলের গুলি বিঁধেছে। বুকের গুলিটা তার হৃদ্‌পিণ্ড ভেদ্ করেছিল। হীরক টাকাকড়ি সব লুট্! গণেশরাম নিরুদ্দেশ! এই ত ঘটনা। তোমার স্বভাবটাও বড় সুবিধাজনক নয়! ঘটনার দিন দুই পরে একটা কাণাকাণি উঠ্‌লো তোমার নিকট নাকি হঠাৎ কতকগুলো টাকা পয়সা এসে পড়েছে। আবার তোমার সঙ্গে গণেশের এমন খাতির! পুলিশ খানাতালাসি করে তোমার বাড়ী থেকে তোমার জামা কাপড় বের কল্লে তাতে রক্তের দাগ। তোমার পিস্তলটীও খানাতালাসি করে পাওয়া গেল, তার মুখে পোড়া বারুদের গুঁড়া ছিল! এই ত আওয়াজের চিহ্ন! তদন্তে প্রকাশ সেদিন গভীর রাত্রে তোমাকে ঐ রাস্তায় আসা-যাওয়া কর্ত্তে দেখা গেছে। কেমন ঠিক বল্‌চি ত?" আমি মাথা নাড়িয়া স্বীকার করিলাম, যে ঠিক বলা হইতেছে। "তোমার সপক্ষে বল্‌বার এই ছিল যে, গণেশরাম নিরুদ্দেশ, খানাতালাসিতে তোমার ঘরে চোরাই হীরাটী পাওয়া যায় নি—হীরাটী যে কোথায় তার কোনই উদ্দেশ পাওয়া যায় নাই। টাকা কড়ি যা পাওয়া গেছে, তাত সেনাক্তের মালই

নয়—বিশেষ যখন সব তোমার নিজের বলে দাবী কচ্চ। বাদীর পক্ষে সব চেয়ে মারাত্মক কথা, যে গুলি পান্নালালের বুক ও পীঠ থেকে বের করা হয়েছে, সে দুটী গুলি তোমার পিস্তলেরই নয়! সে পিস্তলের নলের মুখ তোমার পিস্তলের চাইতে অনেক বড়।"

আমি বলিলাম, "বেশ্ তারপর?"

তিনি অঙ্গুলি দিয়া কি যেন দেখাইয়া বলিলেন ঃ—

"দেখ, দেখি, ঘরের কোণায় কি?"

আমি একটু পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বলিলাম "একটা সাবল আর একটা টুক্‌রি বৈ আর ত কিছু দেখ্‌চি না।"

ব্যারেষ্টার জোরে টেবিলের উপর একটা চাপড় দিয়া বলিলেন ঃ—"বেশ্ সাবল আর টুকরি বই আর কিছু নয়! আসল কথা, গণেশরাম পান্নালালকে খুন করে তার হীরেটী হস্তগত কর্‌ল—আর তুমি খুন করেছ গণেশরামকে। তারপর সাবল আর টুক্‌রীর ব্যাপার, —আর কিছু নয়—কেমন, ঠিক্ ত?"

আমি তখন ঘামিয়া একেবারে কাদা হইয়া উঠিয়াছি।

এই পর্য্যন্ত বলিয়াই ভারি ফূর্ত্তির সহিত তাড়াতাড়ি বাঁশীটা তুলিয়া লইয়া গান ধরিলেন ঃ—"এমন দিনে তারে বলা যায়!"

আমি তাড়াতাড়ি তাঁহার হাত চাপিয়া ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম ঃ—

"আপনি কি তবে তার লাস্ খুঁড়ে তুলেছেন?"

তিনি হাসিয়া বলিলেন ঃ—"বল কি হে বাপু! মোকদ্দমা আস্কারা না হতেই?

খুনখারাবতের কাজে তোমার বেশ হাত ছাপাই আছে জানি, কিন্তু আমাদের আইন ব্যবসায়ীদের বিবেক ও এটিকেটের কথা কিছুই জান না।"

আমি চুপ করিয়া রহিলাম।

তিনি আবার বলিতে লাগিলেন ঃ—

"এ ব্যাপারে আমার হয়ত, অনেক বেশী জানা আছে, অথবা যথেষ্ট জানা নাই। কিন্তু তাতে বড় একটা কিছু আসে যায় না। কিন্তু একথা ঠিক যে, যদি বিবেচকের মত কাজ কর, তবে আমাকে খুন করবার ইচ্ছাটা তোমার পক্ষে নিতান্ত অসঙ্গত হয় নি।" এ কথাটা তোমার মনে হয়েচে কি না জানি না, যে তোমার উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য আমাকে খুন কর্‌লেই বিশেষ লাভ, না বাঁচিয়ে রাখ্‌লেই বেশী লাভ! জানো তো, আমাদের উকীল ব্যারেষ্টারের মুখ রূপো দিয়ে বাঁধিয়ে রাখ্‌লে আর কোন গোল নাই!" এই বলিয়া তিনি আর এক পস্‌লা হাঁসিলেন—সে হাসির কি ঝঙ্কার!

"সে লাভালাভের বিচার তোমার কাছে। আচ্ছা এই ধর না—যদি এক ঘণ্টার মধ্যে সেই হীরেটী আমি তোমায় পাইয়ে দি তা হলে তুমি অবশ্য বুঝতে পারবে যে, বেশী তাড়াতাড়ি করে তুমি হিসাবে কতখানি ভুল কচ্ছিলে!"

আমি বলিয়া উঠিলাম—

"ও সব চালাকিতে বেশী এগুবে না। এত সহজে আমি ফাঁকিতে পড়্‌বার ছেলে নই।"

তিনি বলিলেন "উল্টো বুঝ্‌লে রাম!" আমি শপথ করে বল্‌চি আমি তোমার সঙ্গে চালাকী কচ্চি না—তোমায় আমি বিলক্ষণ চিনি; কখনো পালাবো না। যদি সে চেষ্টা করি, অমনি গুলি করো, সব চুকে যাবে। এখন আমি খালি তোমার সঙ্গে একটা সর্ত্ত ঠিক করে নিয়ে কাজে হাত দিতে যাচ্ছি। যা হবার তা হয়েছে, কিন্তু তোমায় যদি সে মাল পাইয়ে দি, তবে আমার খালাস?—কেমন?"

ক্ষণেক চিন্তা করিয়া পরে বলিলাম ঃ—

"আচ্ছা তাই হোক্, কিন্তু যদি না দিতে পার?"

তিনি বলিলেন "ব্যস্—গুলি!"

তিনি দুই খণ্ড করিয়া বাঁশীটী পকেটে পুরিলেন। আমিও পিস্তলটী সাবধানমত পকেটে রাখিলাম। দুই-টীই বাদ্য যন্ত্র, কিন্তু দুয়ে কত তফাৎ!

তিনি আমায় বলিলেন "তুমি ঐ সাবল ও টুকরীটা লও!" অমি নিঃশব্দে সাবল ও টুকরী ঘাড়ে তুলিয়া লইলাম। তার পর দুইজনে ঘরের বাহির হইয়া পড়িলাম।

বাহিরে অন্ধকার রাত্রিকে ম্লানজ্যোৎস্না একটু উজ্জল করিয়া তুলিয়াছে। সবুজ ঘাসের মধ্যে মেঠো রাস্তা-

খানি একখানি ফিতার মত পড়িয়া রহিয়াছে! আমরা নিঃশব্দে সেই পথে চলিয়াছি। আমার সঙ্গী মাঝে মাঝে শিশ্ দিয়া প্রকৃতির সঙ্গে তাঁহার অন্তরের সুর মিলাইতে ছিলেন,—আমি চুপ করিয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিতে ছিলাম,আমার হৃদয়ের সুর প্রকৃতির সঙ্গে কখনো মিলিবার নয়! হাটিতে হাটিতে আমরা পান্নালাল যে জায়গায় খুন হইয়াছিল সেই খানে আসিয়া পৌছিলাম। ঘটনার স্থানের নিকটবর্ত্তী হইলে মনের উপর দিয়া একটা শঙ্কা মিশ্রিত জড়তা বারে বারে আমার গতি-রোধ করিয়া দিতে লাগিল! আমি তাড়াতাড়ি হাটিয়া সে স্থানটা পার হইয়া যাইতেছিলাম। কিন্তু যে স্থানে গাড়ী উল্টিয়া গিয়াছিল, ঠিক সেই খানে হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইয়া ব্যারেষ্টার আমার পানে চাহিলেন। সে দৃষ্টিতে আমি একবারে হিম হইয়া গেলাম!

ক্ষণকাল পরে তিনি আমাকে বলিলেনঃ—

"এইখানে জহুরী পড়েছিল,—খানিকটা জায়গা জুড়ে রক্ত পড়েছিল! এই জায়গা থেকে আন্দাজ ৩০ হাত দূরে আর একটা জায়গায়ও খানিকটা রক্ত ছিল! জহুরী গুলি খেয়ে অমনি মাটিতে পড়েছিল, কারণ প্রথম গুলিটাই হৃৎপিণ্ড ভেদ করেছিল! তবু জজ, জুরীসকলেই বিশ্বাস কর্‌লে ত্রিশ হাত দূরে যে রক্ত পড়েছিল, সেও জহুরীর শরীর থেকে! সব মূর্খ!"

তার পর তিনি রাস্তা ছাড়িয়া দিয়া মাঠের মধ্যে নামিয়া কি খুঁজিতে লাগিলেন। আমি ছায়ার ন্যায় তাঁহার পিছু পিছু ঘুরিতেছি। মাঝে মাঝে ভাসমান মেঘের আড়ালে পড়িয়া চন্দ্রালোক নিস্তেজ হইতেছিল-আবার উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছিল। দুই একটী ইঁদুরপ্রত্যাশী বৃহৎপক্ষী মাটীতে বসিয়া তপস্যা করিতেছিল—আমাদের সাড়া পাইয়া তাহারা বাতাসে ভারি পাখা দুলাইয়া উড়িয়া গেল। ঘুরিতে ঘুরিতে আমরা একটী ছোট নদীর কূলে আসিয়া পৌছিলাম। গাঢ় কালো গাছ পালার মাঝে সোণার নদীটী যেন ছবির মত! কূলে একটা স্থানে একটা বড় গাছ পড়িয়াছিল। বন্যার জল পাহাড় হইতে গাছটী ভাসাইয়া আনিয়া এইখানে রাখিয়াগিয়াছে। সেই গাছের গোড়াটা একটুকু সরাইয়া দিয়া একটা স্থান নির্দ্দেশ করিয়া আমাকে বলিলেন,—"খোঁড়"।

"আমি বলিলামঃ—

নীচে কি আছে দুজনার যদি ঠিক জানা থাকে তবে আর খুঁড়িবার কি দরকার?"

তিনি বলিলেনঃ—"দেখই না একবার খুঁড়ে!"

খুঁড়িবার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু তখন আমি যেন তাঁহার ইচ্ছা পাশে বন্দী! তাই নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও আমাকে সেই স্থান খুদিতে হইল। আমার প্রাণের উপর দিয়া বরফের মত একটা শৈত্য মেরুদণ্ড পর্য্যন্ত হিম করিয়া দিয়াছে। খুঁড়িয়া কি পাওয়া যাইবে, তাহা ত অজ্ঞাত ছিল না—কিন্তু তাঁহার আদেশের বিরুদ্ধা-চরণ করিবার আমার কোনও শক্তি ছিল না। আমার নিকটেই বড় একখানি শৈবালাচ্ছন্ন পাথরের উপর বসিয়া কাবুলের বুল্‌বুল্‌টার মত অতি প্রফুল্লচিত্তে ব্যারেষ্টার শিশ্ দিয়া গান করিতেছিলেন!

চন্দ্রের ম্লানজ্যোৎস্না শ্যামল তৃণরাশির উপর মূর্চ্ছিত ভাবে পড়িয়াছিল। সে জ্যোৎস্নালোক—আমার সাবল ও তাহার গর্হিত কর্ম্মখানিকে—রজতময় করিয়া তুলিয়াছিল। পার্শ্বে স্বপ্নের নদী সোণার জল লইয়া কালো তট স্পর্শ করিয়া কোন্ দেশে ছুটিয়া চলিয়াছে! যখন সাবলের উপর দেহভার ন্যস্ত করিয়া দাঁড়াইলাম, তখন গণেশরামের কঙ্কাল, শ্যামল ঘাসের উপরে ম্লান জ্যোৎস্নালোকে কি বিদ্রূপের হাসিই হাসিতেছিল! এই সেই গণেশরাম! পাঁচমাস পূর্ব্বে হত্যা করিয়া যাহাকে আমিই এখানে প্রোথিত করিয়া রাখিয়াছিলাম! শেষ রাত্রে এই হত্যাকাণ্ড শেষ হইয়াছিল। তাড়াতাড়ি কোনও রকমে তাহাকে সমাহিত করিয়া হীরাটী না পাইয়া আপন অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়া রাত্রি প্রভাত হওয়ার পূর্ব্বেই পালাইয়াছিলাম। কঙ্কালটী উৎখাত গহ্বর হইতে তুলিলে পর, দেখিতে পাইলাম গহ্বরের মধ্যে একটী স্থানে চন্দ্রের সমুদয় রশ্মি কেন্দ্রীভূত করিয়া কি একটা পদার্থ জ্বলিতেছে! বক্ষের মধ্যে একটা আনন্দ উচ্ছ্বাস উথলিয়া উঠিল। নত হইয়া চাহিয়া দেখি গহ্বরের মধ্যে সেই হীরাটী কেন্দ্রীভূত চন্দ্রকিরণকে

নীল সবুজ হরিদ্রা লাল ভায়োলেট রঙ্গে বিভক্ত করিয়া জ্বলিতেছে। এমন সময় পেছন হইতে একটা দীর্ঘ ছায়া আসিয়া হীরার ফলিত জ্যোতি একবারে নিভাইয়া দিল; আমি চমকিত হইয়া পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখি,—সেই ব্যারেষ্টার দাঁড়াইয়া! তাঁহার বিস্ফারিত চক্ষু দুইটী নক্ষত্রের মত জ্বলিতেছে!

তিনি আমাকে বলিলেন :—

"তুমি একটা আস্ত গাধা; তোমার তখনি বুঝা উচিত ছিল যে সে হীরাটী গিলে ফেলেছিল!"

কিছুক্ষণ পরে বলিলেনঃ—

এখন আমার সর্ত্ত পূরণ হয়েছে? তবে এখন বিদায় হই। ভগবান্ করুন্ আর যেন এ জন্মে তোমার সঙ্গে আমার দেখা না হয়। কিন্তু সত্যের খাতিরে, যাবার আগে তোমার নিকট আজ আমার একটা কথা স্বীকার কর্ত্তে হবে। আজ রাত্রে তুমি আমাকে একটা মহাপাতক হতে রক্ষা করেছ সে জন্য আমি তোমার নিকট আজীবন ঋণী! এই সাবল টুকরি নিয়ে, আজ রাত্রে এ কাজে আমিই আসবো স্থির করেছিলাম।

বাদীর মোকদ্দমা শুনে এবং তোমার নিকট থেকে, এ ঘটনার যতটুকু বুঝতে পেরেছিলাম, তা থেকে, কার্য্য কারণ ও সম্ভব অসম্ভব বিবেচনা করে, অমি ঠিক ধরৃতে পেরেছিলাম, গণেশরাম কোথায় আর হীরাটী কোথায় আছে! তাই এত সহজে তোমার হাত থেকে আজ বাঁচলুম। এই পাপের হীরাই আমার লোভের উপর লাল-নীল-পীত-সবুজ রঙ্গের বিচিত্র রশ্মি বিকীর্ণ করেছিল। এই হীরার বিষয় নিয়েই যখন আমি আমার বাঁশীর সঙ্গে 'সোয়াল' কচ্ছিলাম, তখন তুমি এসে উপস্থিত"—

এমন সময় আমি তাঁহাকে বাধা দিয়া বলিলাম:—

"যদি আপনি এর লাভের অংশ চান্, তবে অবশ্য—

এবার ব্যারেষ্টার একটু বিরক্ত হইয়া আমাকে বলিলেন "এ সম্বন্ধে আর যদি তুমি আমাকে একটা কথাও বল, তবে আমি বলবো, তুমি আমাকে ইচ্ছে করে অপমান কচ্ছ। এ পর্য্যন্ত তুমি আমার জন্য যা করেছ, এ জীবনে সে ঋণ ভুল্ব না। আগা গোড়া তুমি আমার সঙ্গে যে ব্যবহার করেছ, তাতে তুমিও আমার বাঁশীর সোয়ালই সমর্থন করেছ। দুঘণ্টা আগে আমি লোভের স্রোতে ভেসে যাচ্ছিলাম,—তোমার আর আমার বাঁশীর অনুগ্রহে আমি এ যাত্রা রক্ষা পেয়েছি। এখন আমি মুক্তকণ্ঠে বলতে পারি যে, আমি ঘটনা ও অবস্থার পর্য্যালোচক আইনব্যবসায়ী মাত্র, অপরাধী নহি।" এই বলিয়াই আমার সঙ্গে আর একটি কথাও না বসিয়া বরাবর চলিলেন, আমি স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। মাঠ পার হইয়া তিনি সরকের উপর উঠিলেন—মৃদু চন্দ্রালোকে তাঁহার মূর্ত্তিটী কালো দিগন্ত-রেখার উপর একটী সাদা দাগের মত দেখা গেল, যতদূর দৃষ্টি চলিল আমি অবাক্ হইয়া সেই আশ্চর্য্য মনুষ্যটীকে দেখিতে লাগিলাম। তারপর অস্পষ্টতার মধ্যে তাঁহার ছবি কোথায় বিলীন হইয়া গেল। কিন্তু বহুদূর হইতেও তাঁহার বাঁশীর শব্দ করুণ ভাবে আসিয়া আমার মর্ম্মে আঘাত করিল। বাঁশী বলিতেছিল :—

"তুমি নির্ম্মল কর, মঙ্গল করে মলিন মর্ম্মমুছায়ে,
তব পুণ্য কিরণ দিয়ে যাক মোর মোহকালিমা ঘুচায়ে।

আমি নয়নে বসন বাঁধিয়া, বসে আঁধারে মরিগো কাঁদিয়া।
আমি দেখি নাই কিছু, বুঝি নাই কিছু, দাও হে
দেখায়ে বুঝায়ে!"

সে বাঁশীর সুরে এমন একটা আনন্দ ও প্রফুল্লতা ছিল, যাহা আমার পঁচিশ হাজার টাকা মূল্যের চোরাই হীরা প্রাপ্তির মধ্যে ছিল না। ম্লান চন্দ্রালোকে, আমার চক্ষু হইতে দুই বিন্দু অশ্রু গড়াইয়া পড়িল! হায়, ভগবান্, জীবনে তুমি সেই প্রথম, আর অশ্রু বিন্দুও সেই প্রথম! আমি গণেশরামের কঙ্কাল সমাধিগহ্বরে ধীরে ধীরে শায়িত করিয়া সেই পঁচিশ হাজার টাকা মূল্যের হীরা তৃণবৎ সে গহ্বরে নিক্ষেপ করিলাম। তার পর সমাধি গহ্বর মাটী দিয়া ঢাকিয়া প্রস্থান করিলাম।

কুমার সুরেশচন্দ্র সিংহ।

ময়মনসিংহ জিলার অন্তর্গত শেরপুর পরগণার ইতিহাস

দ্বিতীয় অধ্যায়।

মুসলমান—অধিকার।

৭৯১ বঙ্গাব্দে (১৩৮৪ খৃঃ) মুসলমানেরা শ্রীহট্ট অধিকার করেন। তৎসঙ্গে শেরপুরও বঙ্গরাজ্যভুক্ত হয় (১) কিন্তু সেই সময় পর্য্যন্তও কোচ ও হাজঙ্গ জাতীয় সামন্তগণ পরগণার কোন কোন স্থানে শাসন করিতেছিলেন। পূর্ব্বে বর্ণিত "দরিপা" (২) নামা সামন্ত স্বনামখ্যাত গ্রামে এক মৃন্ময় দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতেন। বাঙ্গালার দ্বিতীয় ফিরোজ শাহার সময়ে (৮৯৫-৮৯৭ বঙ্গাব্দে) পাঠান বংশীয় মজলিশ শা হুমায়ুন, দরিপাকে নিহত করিয়া ঐ দুর্গ অধিকার করেন। জনশ্রুতি মজলিস শা হুমায়ুন দিল্লীর তদানীন্তন বাদসাহের ভাগিনেয় ছিলেন। তিনি বিদ্রোহী হইয়া বাদসাহের ভয়ে প্রভূত সৈন্য ও শ্রমজীবি-সমভিব্যাহারে এস্থানে পলাইয়া আসিয়াছিলেন। আবার কেহ কেহ বলেন, ইনি বঙ্গেশ্বর ফিরোজ শাহের সেনাপতি ছিলেন এবং বঙ্গেশ্বর কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া এখানে আসিয়াছিলেন। অবস্থানুসারে শেষোক্ত প্রবাদ সমীচীন বলিয়া বোধ হয়।

সে যাহাহউক, মজলিস শা হুমায়ুন ঐ দুর্গ অধিকার করিয়া উহাকে আরও দুর্ভেদ্য করতঃ এখানেই বসতি করিতে লাগিলেন ও কালক্রমে এই দুর্গ মধ্যেই তাঁহার মৃত্যু হয়। এই দুর্গের ভিতরে তাঁহার সমাধিমন্দিরের গাত্রে তোগরা আরবি অক্ষরে প্রস্তর-ফলকে খোদিত এক লিপি পাওয়া যায়। ঐ প্রস্তর খানি দৈর্ঘ্যে ৪ ফিট ও প্রস্থে ২ ফিট। পরমারাধ্য পিতৃদেব স্বর্গীয় হরচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় ঐ প্রস্তরলিপি যথাসময়ে এসিয়াটিক সোসাইটীতে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। (১) প্রফেসর ব্লকম্যান সাহেব গবেষণা পূর্ব্বক ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের এসিয়াটিক সোসাইটীর জার্ণেলে (৩০০ পৃঃ) উহার ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করেন। তাহার বাঙ্গালা মর্ম্ম এই ঃ—

"দয়াময় ও ক্ষমাশীল ঈশ্বরের নামে। আল্লা ব্যতীত দ্বিতীয় ঈশ্বর নাই মহম্মদ আল্লার প্রেরিত......... আল্লা ব্যতীত দ্বিতীয় ঈশ্বর নাই .... মহম্মদ আল্লার প্রেরিত.........হে ঈশ্বর, তোমার নির্ব্বাচিত মহম্মদকে, তোমার মনোমত আলিকে এবং সাধ্বী ফতেমাকে এবং হাসন এবং হোসেনকে আশীর্ব্বাদ কর.........প্রস্তুত হইয়াছিল.......... সেই যুগের এবং তৎসময়ের সুলতান সৈফ্ উদ্দুন্যা ওয়াদ্দিন্ আবুল মজঃফর ফেরোজ-শা রাজা—ঈশ্বর তাঁহার রাজ্য এবং শাসন অবিনশ্বর করুন! ইহা সমাধা হইয়াছিল.........রমজান পবিত্র মাস ....৮।" (২)

গড় জরিপা

উত্তর কালে ঐ দুর্গ "গড় জরিপা" বলিয়া প্রসিদ্ধ হয়। ইহা সহর শেরপুরের উত্তরাংশে অনতিদূরে অবস্থিত। এই গড় কাল-সহকারে হীন ও মলিন অবস্থায় নিপতিত হইলেও ইহার রচনানৈপুণ্য দর্শনে প্রাচীন সময়ের সৌন্দর্য্যজ্ঞান ও সমৃদ্ধির বিষয় এখনও অনেক উপলব্ধি করা যায়।

---

(১) পূজ্যপাদ পিতৃদেব স্বর্গীয় হরচন্দ্র চৌধুরী নামীয় প্রফেসর ব্লকম্যান সাহেবের ১৮৭৪ সন ১১ই অক্টোবরের পত্র।

... ...

"I am convinced that your Sherpur became annexed to Bengal with Silhet"

(২) দরিপা—দিলীপ শব্দের অপভ্রংশ, পরে "জরিপা" নামে অভিহিত হইয়াছে।

(১) ইহা অদ্যাপিও কলিকাতা মিউজিয়মে রক্ষিত আছে।

(২) প্রকাশিত ইংরেজি অনুবাদ এই ঃ—

"In the name of God, the merciful the clement! There is no God but Allah. Mohomed is Allah's Prophet......................no God but Allah.................. Mohomed is Allah's Prophet.....................O God, Bless Mohomed, the elected, Ali the chosen and Fatima the pure and Hassan and Hosain.................. built..............the king of the age and the period Saifuddunya Waddin Abul Muzaffar Firaz Shah, the king. May God perpetuate his kingdom and his rule! This (vault?) was..................in the blessed Ramjan..............8."

রাজপ্রাসাদ এবং প্রকোষ্ঠ সকল, কোন স্থানে বা সৈনিকাবাস, কোথাও বা বিশ্রামাগার, কোথাও বা ভাণ্ডার গৃহ প্রভৃতির সুদৃশ্য দৃঢ় অট্টালিকা সকল ভগ্ন ও হতশ্রী হইয়া রহিয়াছে। দক্ষিণোপান্তবর্ত্তী উন্নত বিশাল ফটকের চিহ্ন অদ্যাপিও অন্তর্হিত হয় নাই। এতদ্ভিন্ন একটী দরগা ও মজলিস শা হুমায়ুনের সমাধি দৃষ্ট হয়। দরগাটী "কাদীর পীরের দরগা" বলিয়া খ্যাত। (১) উহাতে বিস্তর কারুকার্য্য ছিল, উহা ইষ্টক ও শিলা বন্ধনে সংযোজিত হইয়া নিরতিশয় সৌন্দর্য্য সম্পাদন করিত। দ্বারে দ্বারে লোহার্গল স্থলে শিলা কীলক ছিল। ইহা এখন জীর্ণ হইয়া লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। বৈশাখ মাসের শেষ পক্ষে এখানে এক মেলা হইয়া থাকে।

গড়ের চতুর্দ্দিক "জাঙ্গাল" নামক সমুচ্চ মৃন্ময় প্রাকার শ্রেণীতে পরিবেষ্টিত। ঐরূপ ক্রমান্বয়ে ৭টী প্রাকার মধ্যে প্রায় চারিটী প্রাচীর অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। উহা ৪৫´ ফিট উচ্চ ও ৭৫´ ফিট প্রশস্ত। প্রতি প্রাচীরের অন্তরেই এক একটী পরিখা দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে কোন কোনটী শুষ্ক ও মৃত্তিকায় পূর্ণ হইয়াছে। বর্ষাকালে প্রায় সকলগুলিই জলে পরিপূর্ণ হয়। চতুর্থ জাঙ্গালের বাহিরে যে পরিখা আছে, তাহার পশ্চিমাংশকে "কালীদহ," দক্ষিণাংশকে "ফুলবাড়ী,' পূর্ব্ব ভাগকে "খাস" এবং উত্তরাংশকে "দিগ্‌দাইর" কহে। কালীদহ ও ফুলবাড়ীর মধ্যস্থলে নৌকার আকারে একটী জঙ্গলাকীর্ণ স্থান নয়নগোচর হয়। ইহা "কোশা" বলিয়া কীর্ত্তিত আছে। প্রবাদ এই—এই স্থানে হুমায়ুনের একখানা তরণী জলমগ্ন হইয়াছিল। গড়ে প্রবেশ করিবার জন্য চারিদিকে চারিটী দ্বার আছে। পূর্ব্বদিকেরটীকে "কাম দোয়ারী (২)," পশ্চিমটীকে "পাণি দোয়ারী (৩)" দক্ষিণেরটীকে "সমসের দেউরী (৪)," এবং উত্তরেরটীকে "খিড়কী দোয়ারী (৫)" কহে পাণি দোয়ারী নামক দ্বারের সমীপে দুইটী প্রস্তর ফলক পড়িয়া আছে। উহা কপাটের অংশ বিশেষ বলিয়া অনুমিত হয়। "সমসের দেউরী" হইতে গড়ের মধ্য দিয়া আর একটী জাঙ্গাল উত্তর মুখে গমন করিয়াছে। ইহা কাচের জাঙ্গাল" বলিয়া খ্যাত। উহা ইট, কড়ি, কাচ ও প্রস্তর দ্বারা প্রস্তুত হইয়াছিল। উক্ত দেউরী ও জাঙ্গালের নিকট গোলা বারুদের স্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল। গড়ের অভ্যন্তরে উত্তর ভাগে "সরোবর" নামে এক জলাশয় আছে। উহার উত্তর পূর্ব্ব কোণে একটী মস্‌জিদের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু ১৩০৪ সনের প্রবল ভূকম্পনে উহার অধিকাংশ চিহ্নই বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছে। গড়ে বহুসংখ্যক পুষ্করিণী আছে, তন্মধ্যে পূর্ব্বোল্লিখিত "সরোবর' দীর্ঘিকা সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। "মতি মিঞার তালাব" নামক পুষ্করিণী ও সমধিক প্রসিদ্ধ। প্রথম জাঙ্গালের বাহিরে অন্য একটী জলাশয় আছে, তাহাকে "রাজার মার পুষ্করিণী" কহে। দরিপার (দিলীপের) সময়ের এই চিহ্ন মাত্রই বিদ্যমান আছে। ইহার জল অতি নির্ম্মল, অদ্যাপি তাহাতে শৈবাল তৃণাদি জলজ উদ্ভিদের উৎপত্তি লক্ষিত হয় না। এই পুষ্করিণীর উত্তর পারে বৃহৎ একখণ্ড প্রস্তর আছে। লোকে সময় সময় ভক্তির সহিত তদুপরি দুগ্ধ ও কদলী প্রদান করিয়া থাকে।

কোচ বেহারের রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ ও পাট কোঙরের পরস্পর কলহকালে বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা রাজা মানসিংহ এখানে কিছুকাল অবস্থিতি করেন (১)।

বঙ্গীয় দশম শতাব্দীতে বাঙ্গালার শাসন কর্ত্তা হুসেন শা কর্ত্তৃক এ অঞ্চলে মুসলমানাধিকার বিস্তৃত হয়। এ জেলার হুসেন সাহী পরগণা বিজয়ী হুসেন শাহের নাম

(১) কথিত আছে, ইহা পূর্ব্বে দরিপার সময়ের পূজার মন্দির ছিল, পরে ইহাকে হুমায়ুন শা মস্‌জিদে পরিণত করেন।

(২) কার্য্যোপলক্ষে গমনাগমনের রাস্তা। (৩, নৌকায় গমনাগমনের পথ। (৪) রাজন্যবর্গ এবং সচিবগণের গমনাগমনের রাস্তা। (৫) গুপ্তপথ।

(১) এসিয়াটিক সোসাইটির জার্ণেল ১৮৭২ সন ১ম ভাগ ১ম সংখ্যা ৫৩ পৃষ্ঠা।

কাল সহকারে সা চিন্‌কি মহম্মদ নামক একজন সম্ভ্রান্ত মুসলমান গড়জরিপা লাখেরাজ প্রাপ্ত হন। বাদী সরকার বাহাদুর বিবাদী মির আব্দুল বাকির বিরুদ্ধে ১৮১৯ খৃঃ ২ আইন মতে এক মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়া ১২৪২ সনে কেবল বাহির গড় খাস হইয়া যায়। পরে কালক্রমে মদীয় পূজ্যপাদ পিতৃদেব নিষ্কর গড় জরিপা ক্রয় করেন। মদীয় জ্যেষ্ঠ সহোদরার বিবাহ-কালে তাঁহাকে এই গড় জরিপা যৌতুক স্বরূপ প্রদান করা হয়।

কীর্ত্তন করিতেছে। পরাক্রান্ত মুসলমানগণ বাহুবল প্রভাবে আদিম পার্ব্বত্য সামন্তদিগকে পরাস্ত করিয়া শেরপুরে মুসলমান বসতি বিস্তার পূর্ব্বক প্রভুত্ব সংস্থাপন করেন। এবং ১৫৮৫ খৃঃ অব্দে দ্বাদশ ভৌমিকের অন্যতম ঈশা খাঁও স্বীয় আধিপত্য এবং মুসলমানরাজ্য বিস্তার জন্য তদধীন মাশুম আফগানকে এ অঞ্চলে প্রেরণ করিয়াছিলেন। (১)

১৫৯৫ খ্রীষ্টাব্দে রাজা মানসিংহের সহিত যুদ্ধান্তে ঈশা খাঁ (২) সম্রাট আকবর কর্ত্তৃক দিল্লীনগরীতে "দেওয়ান" ও "মস্‌নদালী" উপাধিতে ভূষিত হইয়া বাইশ পরগণার আধিপত্য লাভ করিয়া জঙ্গলবাড়ী গ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ঈশা খাঁ এই বাইশ পরগণা দ্বাদশ প্রদেশে বিভক্ত করিয়া দ্বাদশজন প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন (৩)। শেরপুর (তদানীন্তন দশ কাহণীয়া বাজু) ঐ বাইশ পরগণার অন্যতম একটী। ঈশা খাঁর অতি সুশাসন ছিল; ইঁহার সময়ে এই অঞ্চলে অনেক হিন্দু বসতির বিস্তার হইয়াছিল। ইঁহার সময়ে টাকায় ৪/০ মণ চাউল বিক্রয় হইত ও ব্যবসায় বাণিজ্যের বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল, মুসলমান অধিকারের পর শেরপুরের অবস্থার বহু পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। উত্তরোত্তর প্রজা বৃদ্ধি ও ভূমি সকল আবাদ হইতে লাগিল। কোচআদি অর্দ্ধসভ্য জাতীয়েরা প্রাচীন মহিমাপরিভ্রষ্ট ও অপরিজ্ঞাতপ্রায় হইয়া প্রজা সাধারণের সহিত মিশিয়া গেল। তৎকালে হিন্দু ও আদিম নিবাসীদিগের অনেকেই মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন করে। কেহ ধন, প্রাণ, ও মানের ভয়ে, কেহ রাজা বা রাজপ্রতিনিধি সমীপে প্রতিপত্তিলাভাশয়ে, কেহ বা তদানীন্তন মুসলনান ধর্ম্মের বিষম প্রভাবদর্শনে স্বীয় জাতীয় ধর্ম্ম, আচার ব্যবহার এমনকি নাম গোত্র পর্য্যন্তও পরিত্যাগ করিয়া মহম্মদের প্রতিষ্ঠিত মতের অনুসরণ করিতে লাগিল। এখানকার অধিকাংশ মুসলমানই উহাদের বংশোদ্ভব।

এতদ্দেশে মুসলমান জাতির বসতি বিস্তার ও অবস্থার উন্নতির কথা পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, কেহ নিয়মিত কর প্রদানে অসমর্থ হইয়া পলায়ন করিয়া কোন নিভৃত ও নিরাপদ প্রদেশে গিয়া বাস করিত। কেহ সম্রাট্ বা নবাবের অত্যাচার সহিতে না পারিয়া স্বীয় মান ও সম্ভ্রম রক্ষার্থ অন্যত্র গিয়া বসতি করিত। কেহ বা কার্য্য বিশেষের ভার প্রাপ্ত হইয়া রাজ প্রেরিত-রূপে নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপনীত হইত এবং তথাকার সৌন্দর্য্য ও ঐশ্বর্য্যে বিমোহিত হইয়া সেইখানেই থাকিয়া যাইত; কেহ তাহার তত্ত্বানুসন্ধান করিত না। কেহ বা স্থান বিশেষের শাসন ভার প্রাপ্ত হইয়া সময়ে স্বাধীন হইয়া দাঁড়াইত।

শ্রীচারুচন্দ্র রায় চৌধুরী।

(১) History of India by Sir H. Elliot. vol. VI, P. 77.

(২) পূর্ব্বকালে ময়মনসিংহ জিলার অনেক স্থান কোচদিগের অধিকার ছিল। যৎকালে সুসঙ্গের বর্ত্তমান মহারাজদিগের পূর্ব্ব পুরুষ সোমেশ্বর ঠাকুর ঐ পরগণায় আগমন করেন, তৎকালে তাহা এক কোচ রাজার শাসনাধীন ছিল। মোগল সম্রাট্ হুমায়ুনের সময়ে ঈশাখাঁ এ জিলার দক্ষিণ-পূর্ব্ব ভাগস্থ স্থানবিশেষে আসিয়া দীর্ঘিকাযুক্ত এক কোচ রাজার ভবন দেখিয়াছিলেন। ঈশা খাঁ সেই কোচ রাজাকে বধ করিয়া তাহার বাটীই স্বকীয় বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিলেন এবং লোকাভাব হেতু গ্রামের নাম "জঙ্গলবাড়ী" রাখিলেন। ঈশাখাঁ হইতেই জঙ্গলবাড়ীর দেওয়ান সাহেবদের উৎপত্তি হইয়াছে। (১২৭৪ সন ১৩ই আষাঢ়ের বিজ্ঞাপনী)

(৩) Romance of an Eastern Capital by Bradley Bart. P. 79.

গ্রন্থ-পরিচয় ও সমালোচনা।

প্রবন্ধাষ্টক—শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ এম্, এ কর্ত্তৃক প্রণীত—

"প্রবন্ধাষ্টকের" সমস্ত প্রবন্ধই পূর্ব্বে মাসিক বা সাপ্তাহিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। এক্ষণে সেই প্রবন্ধগুলি সংশোধনপূর্ব্বক পুনর্মুদ্রিত হইয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। প্রবন্ধগুলির ভাষা প্রাঞ্জল। প্রবন্ধগুলি পাঠ করিলে যুগপৎ আনন্দ ও জ্ঞান লাভ করিতে পারা যায়। অধিকাংশ প্রবন্ধে লেখকের গবেষণা, বিচারকুশলতা ও সহৃদয়তার পরিচয় প্রাপ্ত

হওয়া যায়। বঙ্গভাষার উন্নতিবিধানে ও পুষ্টিসাধনে ঐকান্তিক অনুরাগ লেখককে যে ব্রতগ্রহণে বহুপূর্ব্বে প্রণোদিত করিয়াছিল, তিনি অকুণ্ঠিতভাবে সেই ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া আসিতেছেন, এবং "শিক্ষিত সম্প্রদায়কে" সেই ব্রতগ্রহণের জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিয়াছেন।

"পূর্ণানন্দগিরি ও কামাখ্যাপীঠ" ও "ফকির শাহ জালাল" এই প্রবন্ধদ্বয় সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। হিন্দুদিগের পরমতীর্থ কামাখ্যাপীঠ সম্বন্ধে অনেক কথা তাঁহার প্রবন্ধপাঠে অবগত হইতে পারা যায়। পূর্ণানন্দগিরির কালনিরূপণে ও কামাখ্যাপীঠের প্রভাবপ্রখ্যাপনবিষয়ে উক্ত সিদ্ধপুরুষের কৃতিত্বের পরিচয়প্রদানে লেখকের ঐতিহাসিকতত্ত্বানুরাগ, বিচার ও বিশ্লেষণ শক্তির পটুতা ও মনস্বিতা সম্যক্ পরিস্ফুট হইয়াছে।

বিভিন্নধর্ম্মা, যোগশক্তিসম্পন্ন মুসলমান ফকিরের আখ্যান শ্রদ্ধা ও যত্নের সহিত বিবৃত করিয়া লেখক তাঁহার জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে গুণপক্ষপাতিতা, সমদর্শিতা ও হৃদয়বত্তার পরিচয় দিয়াছেন।

সকল প্রবন্ধের সমালোচনা করা আমাদের অভিপ্রেত নহে। কোনও প্রবন্ধে যদি কিছু দোষ পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে, উহা ইন্দুকিরণে নিমগ্ন কলঙ্কের ন্যায় উপেক্ষণীয়। উহার উল্লেখ করিয়া "যথা স্ত্রীণাং তথা বাচাং সাধুত্বে দুর্জ্জনো জনঃ" এই তিরস্কারবচনের পাত্র হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে।

মোহনভোগ। শ্রীমনমোহন সেন প্রণীত। ভট্টাচার্য্যএণ্ড সন্‌স এর পুস্তকালয় হইতে শ্রীদেবেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ছয় আনা।

মোহনভোগ সার্থক নাম মনোরম শিশুপাঠ্য পুস্তক। কি ছাপায়, কি কাগজে কি চিত্রে পুস্তক খানি চমৎকার হইয়াছে। বাজারে চিত্রের বই অনেক আছে কিন্তু এমন সুন্দর সুপাঠ্য কোমল কবিতা বিরল। 'তারা'র কবিতাগুলি কি সুন্দর; চিত্রগত বালিকাটীর চাহনির মত সরল অথচ স্নিগ্ধ।

"তোমরা কা'রা তারা?
নিত্যি এসে—সন্ধ্যাবেলা
হেসে হেসে সারা!
… … … …
তোমরা বুঝি দেবতাদের
ছোট্ট ছেলে মেয়ে,
রোদে থাক চোখ্‌টি বুঝে
রেতে থাক চেয়ে"।

"ছোট লোক ও বড় লোক" শীর্ষক কবিতা ইংরেজী "Clean and I"হইতে ও সরস ও সুমধুর হইয়াছে

জাপানী তিন মেয়ে'র কবিতার ঝঙ্কার অনেক দিন কাণে লাগিয়া রহিবে ঃ—

"আমরা তিনটী ছোট্টো মেয়ে
বাড়ী জাপান দেশে,
ঊষা যথা চক্ষু মেলে
নিত্যি নিশি শেষে।
সাগর জলে আল্‌তা গুলে
রোজ সকালে নায়,
লাল টুক্‌টুক্ গাল দুখানি
আল্‌তা হাতে পায়।
হলুদ রঙ্গের সাড়ী পড়া
সোণার আঁচল উড়ে,
ঢেউয়ের উপর তর্ তর্ তর্
কেমন নৃত্য করে!
… … … …
আয় কে যাবি, খেল্‌তে বনে
ফুলের সনে আড়ি;
আমরা যাচ্ছি তিনটি মেয়ে
ঊষার দেশে বাড়ী।'

"খুকুরাণী"র শব্দে ও অঙ্কিত চিত্রউ ভয়ই মনোহর। রবিবাবুর "নাম রেখেছি বাব্‌লা রাণী এক রত্তি মেয়ে"র মত "আমাদের খুকুরাণী বড়ই কোমল"। আমরা সুকবি গ্রন্থকারের দীর্ঘজীবন কামনা করি।

মাহিলাড়ার মঠ (বাখরগঞ্জ)

১ম খণ্ড। } ঢাকা, কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ, ১৩১৮ সাল। ৭ম,৮ম সংখ্যা।

ভুতত্ত্ব।

আমাদের দেশে অনেকেরই বিশ্বাস যে প্রাচীন আর্য্যগণ পৃথিবীর কোন তত্ত্বই অবগত ছিলেন না। পৃথিবীর গতি, গোলত্ব ও আকর্ষণ শক্তি প্রভৃতির বিষয় তাঁহারা কিছু মাত্রই জানিতেন না, পৃথিবী ত্রিকোণ-বিশিষ্টা অচলা এবং অনন্ত নাগের মস্তকে কূর্ম্ম পৃষ্ঠে অবস্থান করিতেছে ইত্যাদি অন্ধ বিশ্বাসের বশীভূত হইয়াই তাঁহারা জীবন যাপন করিতেন। প্রাচীন পূর্ব্ব-পুরুষদিগকে এইরূপ অন্ধ অজ্ঞান মনে করার মুলীভূত কারণ দুইটী। প্রথম পুরাণাদি শাস্ত্রের রূপক বর্ণনা, দ্বিতীয় পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবল স্রোতঃ। পাশ্চাত্য পণ্ডিত-দিগের মধ্যে কেহ কেহ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে প্রাচীন ভারতবাসিগণ কূপমণ্ডুকের ন্যায় ভারতবর্ষ অতিক্রম করিয়া অন্যত্র গমন করিতেন না, অন্যদেশ তাহাদের নেত্রপথের পথিক হইত না; ভারতবর্ষ ত্রিকোণ, তাই তাহারা ভারতবর্ষকেই সমগ্র পৃথিবী মনে করিয়া পৃথিবীকে ত্রিকোণবিশিষ্টা বলিতেন। ইত্যাদি ইত্যাদি-রূপে অনেকেই প্রাচীন আর্য্যদিগের মস্তকে কলঙ্ককালিমা লেপন করিয়া থাকেন। তাই আজ আমরা প্রাচীন আর্য্যদিগের ভূতত্ত্ব সম্বন্ধে কতদূর অভিজ্ঞতা ছিল, তাহা কিঞ্চিৎ দেখাইতে চেষ্টা করিব। মহামতি সূর্য্য-সিদ্ধান্তকার গোলাধ্যায়ে বলিয়াছেন,—

"ভূগোলো ব্যোম্নি তিষ্ঠতি"

গোলাকার ভূমি আকাশে অবস্থান করিতেছে। সিদ্ধান্ত শিরোমণিতে লিখিত আছে—

"নান্যাধারং স্বশক্ত্যা বিয়তি চ নিয়তং তিষ্ঠতীহাস্যপৃষ্ঠে"

ধরণীর অন্য কোন আধার নাই, পৃথিবী স্বীয় শক্তি-দ্বারা নিয়ত আকাশে অবস্থান করিতেছে। নক্ষত্রকল্পে লিখিত আছে—

"কপিত্থফলবৎ ক্ষৌণী দক্ষিণোত্তরয়োঃ সমা।"

পৃথিবী কয়েৎবেলের ন্যায় দক্ষিণ উত্তর দিকে একটু চাপা।

ইংরাজেরা বলেন, কমলালেবুর ন্যায় দক্ষিণোত্তর দিক্ চাপা, আর আর্য্যগণ বলেন, কয়েৎবেলের ন্যায় দক্ষি-ণোত্তর দিক্ চাপা, কথা প্রায় একই।

সূর্য্য সিদ্ধান্ত গোলাধ্যায়ে বলিয়াছেন,—পৃথিবী গোল না হইলে নানাদেশে, নানা সময়ে সূর্য্যের উদয়াস্ত হইত না, সকল দেশেই এক সময় হইত। *

ভারতে যখন প্রভাত, আমেরিকায় তখন সন্ধ্যা, আবার শ্রীহট্টে যখন প্রভাত, কাশীতে তখন সূর্য্যের উদয় হয় না, পৃথিবীর গোলত্বই ইহার মূল কারণ। পৃথিবীর বক্রতাবশতঃ শ্রীহট্ট ও কাশীর মধ্যস্থান যে উভয় কেন্দ্র হইতে উচ্চ, তাহাতেই শ্রীহট্টে সূর্য্য উদিত হইলে কাশীবাসীরা সে সময় সূর্য্যালোক দেখিতে পায় না।

যখন কোন জাহাজ দূরে থাকে, তখন প্রথমতঃ আমরা তাহার মাস্তুল দেখিতে পাই, জাহাজ ক্রমে যত নিকটে আসে ততই আমরা তাহার নিম্ন ভাগ অবলোকন করিতে পারি। পৃথিবীর গোলত্ব প্রতিপাদনে ইংরাজ-দিগের এই উদাহরণ অপেক্ষা আর্য্যদিগের উক্ত উদাহরণ শতগুণ সুন্দর ও সুস্পষ্ট।

সূর্য্য সিদ্ধান্ত বলেন,—

ছাদকো ভাস্কর স্যেন্দু রধঃস্থো ঘনবদ্ভবেৎ। ভূচ্ছায়া প্রবিশে চ্চন্দ্রং—

সূর্য্যগ্রহণে আমাবস্যার দিন সূর্য্য ও চন্দ্রের সমসূত্রপাত হইলে অধঃস্থ চন্দ্র মেঘের ন্যায় সূর্য্যকে আচ্ছাদন করে, তাহাতেই সূর্য্যগ্রহণ হয়। চন্দ্রগ্রহণে পৃথিবীর ছায়া চন্দ্রে প্রবেশ করে তাহাতে চন্দ্রগ্রহণ হয়। যে বস্তু যে প্রকার তাহার ছায়াও ঠিক সেইরূপ, পৃথিবী গোলাকার না হইলে তাহার ছায়া কখনও গোলাকার হইত না। পৃথিবীর গোলত্বে আর্য্যদিগের ইহাও একটী প্রত্যক্ষ প্রমাণ বটে।

পদার্থ দীপিকায় উক্ত হইয়াছে—দারুময় গোলাকার পৃথিবী নির্ম্মাণ করিয়া এবং খগোল নির্ম্মাণ করিয়া গুরু শিষ্যকে বুঝাইয়া দিবেন। †

* তত্রাখাপরিগঃ সূর্য্যো ভারতেহ হ্রোদয়োরবেঃ।
রাত্র্যর্দ্ধং কেতুমালাখ্যে কুরাবস্তমনং তদা॥

† অতীষ্টং পৃথিবীগোলং কারয়িত্বাতু দারবম্।
তদ্বৎ খ গোলকং কৃত্বা গুরুঃ শিষ্যং প্রবোধয়েৎ॥
পদার্থ দীপিকা।

পৃথিবী গোল না হইলে তাহার ম্যাপ্ গোলাকার করিবার কথা থাকিত না।

কবি জয়দেব বলিয়াছেন—

'ভূগোল মুদ্বিভ্রতে' সুতরাং পৃথিবী যে গোলাকার তাহা আমাদের কাব্য—উপন্যাসে পর্য্যন্ত বর্ণিত রহিয়াছে, তথাপি ভারতবাসীরা পৃথিবীকে ত্রিকোণ বলিত, এ দুর্নাম তাহাদের কোথা হইতে আসিল জানিনা।

পৃথিবীর গতি সম্বন্ধে আর্য্যভট্টই পৃথিবীতে জগদ্‌গুরু, ভূলোকে তিনিই সর্ব্ব প্রথমে পৃথিবীর গতি নিশ্চয় করিয়াছিলেন। তিনি বহু সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে বলিয়া ছিলেন।

"চলা পৃথ্বী স্থিরা ভাতি"

পৃথিবী চলিতেছে অথচ অচলার ন্যায় বোধ হইতেছে, তিনি আরও বলিয়াছেন, যথা—

"ভপঞ্জরঃ স্থিরো ভূরেবাবৃত্যাবৃত্য প্রতিদৈব-
সিকৌ উদয়াস্তময়ো সম্পাদয়তি গ্রহনক্ষত্রাণাং।"

নক্ষত্র মণ্ডল, অর্থাৎ রাশিচক্র স্থির, প্রতিদিন পৃথিবীই ঘুরিয়া ঘুরিয়া গ্রহনক্ষত্রগণের উদায়াস্ত সম্পাদন করিতেছে।

মহামহোপাধ্যায় আর্য্যভট্ট প্রাচীন পণ্ডিত; ভাস্করা-চার্য্য শ্রীপতি, লল্ল, বরাহ, মিহির, খনা প্রভৃতি আর্য্যভট্টের মত স্ব স্ব গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। বরাহ ও মিহির বিক্রমাদিত্যের সভা পণ্ডিত ছিলেন।

বিক্রমাদিত্যের জীবিতকাল ২০০০ দুই হাজার বৎসর অতীত হইয়াছে, সুতরাং আর্য্যভট্ট ইহারও পূর্ব্ববর্ত্তী ছিলেন।

গ্রীস্ দেশবাসী পিথাগোরস্ প্রভৃতি কতিপয় পণ্ডিত আর্য্যভট্টের মত, ভারত হইতে নিয়া স্বদেশে প্রচার করেন। তৎকালে পিথাগোরস্ সাহেবের মত গ্রীশ্ দেশবাসী অনেকের মতের সহিত সমঞ্জস না হওয়ায় তিনি তাহা লোকের হৃদয়ে বদ্ধমূল করিতে পারেন নাই, পরে ইটালি দেশবাসী কোপর্নিকস্ পণ্ডিত পিথাগোরসের মতের বিশেষ আলোচনা করিয়া বহুকষ্টে 'পৃথিবীর গতি আছে' এ কথা অনেকের মনে বদ্ধমূল করিয়া দেন।

আর্য্যভট্টের আবিষ্কৃত সেই পুরাতন মত তথা হইতে ইয়ুরোপে প্রকাশিত হইয়াছে।

আর্য্যভট্টের মৃত্যুর পর সূর্য্যসিদ্ধান্ত, লল্ল ও শ্রীপতি পৃথিবীর গতি স্বীকার করেন নাই, তাঁহারা কতকগুলি দৃষ্টান্ত দ্বারা, "পৃথিবীর গতি নাই, রাশিচক্রই ঘোরে," এ কথা সমাজকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। তাঁহারা যে সকল তর্কযুক্তি দৃষ্টান্তের তুমুলতরঙ্গ উত্থাপিত করিয়া পৃথিবীর নিশ্চলতা প্রতিপাদনের চেষ্টা করিয়াছিলেন নিম্নে তাহার একটু নমুনা প্রদর্শিত হইতেছে।

লল্ল বলিতেছেন—পৃথিবী ঘোরে এ কথা স্বীকার করিলে আকাশ মার্গে উড্ডীন বিহঙ্গগণ নিজের কুলায়ে ফিরিয়া আসিতে পারিত না। কারণ পক্ষিগণের ২।১ ঘণ্টা আকাশবিহারের মধ্যে পৃথিবী ঘুরিতে ঘুরিতে অনেক দিনের পথে সরিয়া পড়ে, সুতরাং তাহারা নিজের বাসস্থান লক্ষ্য করিয়া আসিবে কিরূপে।

দ্বিতীয়তঃ—শর ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইলে উহা যে স্থান হইতে উৎক্ষিপ্ত হইয়াছে সে স্থানে আসিয়া পড়িত না। কারণ শরের পতনকালমধ্যে পৃথিবী ঘুরিতে ঘুরিতে অনেকটা পূর্ব্বদিকে সরিয়া পড়ে, সুতরাং শর উৎক্ষেপ্তার অনেক পশ্চিমে যাইয়া পড়িত *।

তৃতীয়তঃ—আমরা মেঘকে কখন পূর্ব্বদিকে গমন করিতে দেখিতাম না, যেহেতু মেঘের গতি অপেক্ষা পৃথিবীর গতি অতি দ্রুত, দ্রুতগতি না হইলে পৃথিবী একদিনে একবার পরিভ্রমণ করিতে পারিত না, সুতরাং মেঘ পূর্ব্বদিকে গমন করিলেও পৃথিবীর পূর্ব্বাভিমুখে দ্রুতগতি বশতঃ মেঘকে আমরা পশ্চিম দিকেই যাইতে দেখিতাম। শ্রীপতি আর্য্যভট্টের মত উদ্ধৃত করিয়া দোষ দেখাইতেছেন। যথা—

নৌস্থো বিলোমগমনাদচলং যথান
চামস্যতে চলতি নৈব ধরা ভ্রমেণ।
তদ্বৎ সদৈব গগনে প্রচলদ্‌ভচক্রং
আভাতি সুস্থির মপীতি বদন্তি কেচিৎ॥

নৌকাস্থিত ব্যক্তি নৌকার দ্রুতগমনে তীরস্থ অচল বৃক্ষনগরাদিকে যেরূপ সচল অর্থাৎ নৌকার বিপরীত দিকে চলিতেছে এরূপ জ্ঞান করে, সেইরূপ পৃথিবীর পূর্ব্বাভিমুখে দ্রুতগমন হেতু সুস্থির রাশিচক্রও পশ্চিম দিকে চলিতেছে এরূপ জ্ঞান হইয়া থাকে। কেহ কেহ অর্থাৎ আর্য্যভট্ট ও তাঁহার শিষ্যগণ এই কথা বলেন।

যদি এরূপ হয়, তবে গগনচারী পক্ষিগণ নিজের কুলায়ে ফিরিয়া আসিতে পারিত না। এবং মেঘবৃন্দ একস্থানে বহুক্ষণ বারিবর্ষণ করিতে পারিত না। কারণ যে স্থানে থাকিয়া মেঘ বর্ষণ করিতেছে কিছুক্ষণ পরেই পৃথিবী তাহার সমসূত্র হইতে বহুদূর পূর্ব্বদিকে সরিয়া পড়িয়াছে। তৃতীয়তঃ ভূমির ঘূর্ণন বেগজনিত-বায়ুদ্বারা পর্ব্বত দালান বৃক্ষাদি পতিত হইয়া যাইত। অতএব রাশিচক্রই ঘোরে অচলা অচলাই থাকে *।

শিক্ষিত পাঠকগণ! বিরুদ্ধবাদিগণের যুক্তিতর্ক দৃষ্টান্তের নমুনা যাহা দেখিলেন তাহা মহামহোপাধ্যায় আর্য্যভট্ট জীবিত থাকিলে এক ফুৎকারেই উড়াইয়া দিতে পারিতেন। এ সকল তর্ক যে কিছুই নহে তাহা আমরাও একপ্রকার উপলব্ধি করিতে পারি।

আকাশে উড্ডীন পক্ষী পৃথিবীর দূরগমন বশতঃ নিজ কুলায়ে আসিতে পারিত না, ঊর্দ্ধে নিক্ষিপ্ত শর নিক্ষেপ্তার নিকটে না পড়িয়া পশ্চিমদিকে পড়িত, পৃথিবীর গতি থাকিলে এক স্থানে বহুক্ষণ বৃষ্টি হইতে পারিত না, এবং পৃথিবীর দ্রুতগতি বশতঃ মেঘ পূর্ব্বদিকে গমন করিলেও পশ্চিমদিকে গমন করে এরূপ দেখিতাম, এই চারিটী দৃষ্টান্ত কিছুই নহে।

* যদিচ ভ্রমতি ক্ষমা তদা স্বকুলায়ং কথমাপ্নুয়ুঃ খগাঃ। ইষবোঽপি নভঃ সমুজ্ঝিতা নিপতন্তঃ স্যুরপাংপতের্দ্দিশি। পূর্ব্বাভিভ্রমে ভুবো বরুণাশামুখো ব্রজেদ্ ঘনঃ। অথ মন্দগমাৎ তথা ভবেৎ কথ যেকেন দিবা পরিভ্রমঃ।

* যদ্যেব মম্বরচরা বিহগাঃ স্বনীড় মাসাদয়ন্তি ন খলু ভ্রমেণ ধরিত্র্যাঃ। কিঞ্চাম্বুদা অপি ন ভূরি পয়োমুচঃস্যু র্দৈশস্য পূর্ব্বাভি গমনেন। ভূগোলবেগজনিতবায়ুনা প্রাসাদভূধরশিরাংস্যপি সংপতন্তি। তস্মাৎ ভ্রমত্যুড়ুগণঃ অচলা চলৈব।

সকলেই জানেন যে কোনও বেগবান পদার্থ হইতে যাহা উত্থিত কি বিশ্লিষ্ট হয় তাহারও একটা বেগ উপস্থিত হইয়া থাকে। আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি কেহ কেহ আশ্চর্য্য দেখাইবার নিমিত্ত দ্রুতগামিনী নৌকার অগ্রভাগ হইতে ঊর্দ্ধে লম্ফপ্রদান করিয়া আবার সেই তরণীর অগ্রভাগেই পতিত হইয়া থাকেন। চলিত নৌকা হইতে যে ব্যক্তি ঊর্দ্ধে উত্থিত হইল, তাহার পতনকাল মধ্যে নৌকা অনেক দূর অগ্রসর হইয়া পড়িয়াছে, সুতরাং উত্থিত ব্যক্তির নৌকার পশ্চাৎদিকে পতনের সম্ভাবনা ছিল, তাহা না পড়ার কারণ কেবল আধারের বেগ-জনিত আধেয়ের বেগ। উত্থিত ব্যক্তি নৌকা হইতে সম্বন্ধচ্যুত হইয়াও নৌকার বেগের সঙ্গে সঙ্গে তুল্য পরিমাণে অগ্রসর হইয়া থাকে, তাহাতেই সে যেস্থান হইতে উঠিয়াছিল ঠিক সেই স্থানে পড়িতে পারে। সেইরূপ দ্রুতগামিনী ধরণী হইতে যাহারা উত্থিত হয় তাহাদেরও ধরণীর সঙ্গে সঙ্গে তুল্যবেগ উপস্থিত হইয়া থাকে, সুতরাং শর, মেঘ, পক্ষী প্রভৃতিও পৃথিবীর সঙ্গে সঙ্গে ঘোরে, তাহাতেই তাহাদের কার্য্যে বাধা হয় না।

পৃথিবী ঘুরিলে পৃথিবীবেগজনিত বায়ুদ্বারা বৃক্ষ-পর্ব্বতাদি পতিত হইত; এ কথাও অতি অকিঞ্চিৎকর। কারণ পৃথিবীর সঙ্গে সঙ্গে বায়ুমণ্ডলও তুল্যবেগে ঘুরিতেছে, তাহাতেই বেগজনিত বায়ু উত্থিত হইতে পারে না।

মহামনা সূর্য্যসিদ্ধান্তকার প্রভৃতি কার্য্যকারণ ভাব-গুলির পর্য্যালোচনা না করিয়া কেন যে আর্য্যভট্টের মতের বিরোধী হইয়াছিলেন তাহা উপলব্ধি করা সহজ ব্যাপার নহে। যাহা সত্য তাহা কখনও চাপা পড়িয়া থাকে না, তাই আজ আর্য্যভট্টের মত সমস্ত জগতে নির্ব্বিবাদে প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছে। পৃথিবী কত সময়ের মধ্যে কত দূরের পথ চলে এবং পৃথিবীর দক্ষিণোত্তরদিক কেন চাপা হইল, ইত্যাদি বিষয় আর্য্য-গ্রন্থে বহু কথা থাকিলেও আজ তাহার অবতারণা করিব না, মাত্র মাধ্যাকর্ষণ সম্বন্ধে ২।১টী কথা বলিয়া আজ প্রস্তাবের উপসংহার করিব।

পাশ্চাত্য পণ্ডিত নিউটন একদিন ভূতলে আতাফল পতিত হইতে দেখিয়া পৃথিবীর মাধ্যাকার্ষণ শক্তির আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তৎপূর্ব্বে পৃথিবীর আকর্ষণ শক্তির বিষয় কেহই কিছু জানিত না, অনেকেই এই বিশ্বাস পোষণ করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু নিউটনের জন্মের বহু পূর্ব্বে মহামনা আর্য্যভট্ট যে ধরণীর আকর্ষণ শক্তিরও আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন তাহা অতি অল্প লোকেই বিশ্বাস করিয়া থাকেন। আর্য্যভট্ট তারস্বরে বলিয়াছেন—

আকৃষ্টশক্তিশ্চ মহী যৎ প্রক্ষিপ্যতে তৎতয়া ধার্য্যতে।

পৃথিবীর আকর্ষণ শক্তি আছে, কারণ যাহা প্রক্ষিপ্ত হয় তাহাই পৃথিবী ধারণ করিয়া থাকে।

মহামতি ভাস্করাচার্য্য গোলাধ্যায়ে ঐ কথাই স্পষ্টরূপে কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন।

যথা—আকৃষ্ট শক্তিশ্চ মহী তয়া যৎ খস্থং গুরু স্বাভি-মুখং স্বশক্ত্যা আকৃষ্যতে—

পৃথিবীর আকর্ষণ শক্তি আছে, যেহেতুক কোন গুরু বস্তু হস্তাদির বলে পৃথিবী হইতে উৎক্ষিপ্ত হইলে যখন সেই বেগের নিবৃত্তি হয় তখন ঐ বস্তুর সকলদিকেই তুল্য সম্বন্ধ থাকে, তথাপি অন্য কোন দিকে না গিয়া ঐ বস্তু যে পৃথিবীর দিকে গমন করে তাহাতেই পৃথিবীর আকর্ষণ শক্তি আছে বলিয়া স্পষ্ট অনুমান হয়।

শ্রীগিরিশচন্দ্র সেন কবিরত্ন।

পালরাজগণ।

উপক্রমণিকা।

চতুর্ব্বিংশতি বৎসর পূর্ব্বে আমি পালরাজন্যবর্গের বিবরণ প্রকাশ করিয়াছিলাম। (১) ইহার সাত বৎসর অন্তে ধর্ম্মপালের তাম্রশাসন সমালোচনা উপলক্ষে লিখিয়াছিলাম যে, :—

"আমরা ইতিপূর্ব্বে ক্ষোদিত লিপির সাহায্যে পাল ও সেন রাজগণের ইতিহাস প্রকাশ করিয়াছি। কিন্তু আমাদের প্রবন্ধ ও পুস্তিকা প্রকাশ হওয়ার পর এরূপ প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়াছি, যদ্দ্বারা আমাদের মত কিঞ্চিত্ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। সুতরাং পুনর্ব্বার এবিষয়ে আমাদিগকে লেখনী ধারণ করিতে হইবে।" (২)

তদনন্তর এই দীর্ঘকাল মধ্যে পাল গৌড়েশ্বরদিগের নামসংযুক্ত আরও কতকগুলি ক্ষোদিত লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। অধুনা ৭ খানা তাম্রশাসন, ২৮ খানা শিলালিপি এবং ১ খানা পিত্তল লিপি, সর্ব্বশুদ্ধ ৩৬ খানা ক্ষোদিত লিপির বিবরণ আমরা অবগত হইয়াছি। (৩) যথা:—

(১) নব্যভারত। ১২৯৪ বঙ্গাব্দ।

(২) সাহিত্য। ১৩০১ বঙ্গাব্দ।

(৩) পণ্ডিত প্রবর কিলহরণ মপ্রণীত List of the Northern Inscriptions নিবন্ধে (App to Epigraphia Indica. Vol.. V.) পালরাজগণের অষ্টাদশ খণ্ড ক্ষোদিত লিপির উল্লেখ করিয়াছেন। তৎপর সুবিখ্যাত ঐতিহাসিক স্মিথ সাহেব পালরাজগণের ৩৫ খানা ক্ষোদিত লিপির বর্ণনা করিয়াছেন। (Indian Antiquary. Vol.XXXVIII. pp. 234—43.) তদনন্তর আরও এক খণ্ড শিলা লিপির বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। (Journal Royal Asiatic Society. 1909. p. 151.)

৭ খানা তাম্রশাসন :—

১। খালিমপুরের তাম্রশাসন। মহারাজ ধর্ম্মপাল প্রদত্ত।

২। মুঙ্গেরের তাম্রশাসন। মহারাজ দেবপাল প্রদত্ত।

৩। ভাগলপুরের তাম্রশাসন। মহারাজ নারায়ণ পাল প্রদত্ত।

৪। দিনাজপুরের তাম্রশাসন। মহারাজ মহীপাল প্রদত্ত।

৫। আমগাছির তাম্রশাসন। মহারাজ বিগ্রহপাল প্রদত্ত।

৬। কমোলীর তাম্রশাসন। মহারাজ কুমারপালের সামন্ত বৈদ্যদেব প্রদত্ত।

৭। মনহালীর তাম্রশাসন। মহারাজ মদন পাল প্রদত্ত।

২৮ খানা শিলালিপি।

১। বুদ্ধগয়ার চতুর্ম্মুখ মহাদেব মূর্ত্তি। ইহাতে মহারাজ ধর্ম্মপালের নাম ক্ষোদিত আছে।

২। ঘোসরোওয়ার শিলালিপি। মহারাজ দেব পালের সময়ে ক্ষোদিত।

৩। ৪। } মহারাজ শূরপালের নাম সংযুক্ত দুই খানা শিলালিপি।

৫। বিহারের বুদ্ধ মূর্ত্তির পদতলে মহারাজ বিগ্রহ পালের নাম ক্ষোদিত।

৬। গয়া-অক্ষয়-বট মন্দিরে মহারাজ বিগ্রহপালের নাম ক্ষোদিত।

৭। গয়ার বিষ্ণুপদ মন্দিরের নিকটবর্ত্তী, নারায়ণ পালের নাম ক্ষোদিত।

৮। বোদাল স্তম্ভলিপি। ইহার বিবরণ পশ্চাৎ বিশেষ ভাবে লিখিত হইবে।

৯। নালন্দার দেবীমূর্ত্তিগাত্রে মহারাজ (দ্বিতীয়) গোপালের নাম ক্ষোদিত।

১০। বুদ্ধগয়ার মূর্ত্তিগাত্রে মহারাজ (দ্বিতীয়) গোপালের নাম ক্ষোদিত।

১১। বিক্রমশীল বিহারের মন্দিরগাত্রে মহারাজ (দ্বিতীয়) গোপালের নাম ক্ষোদিত।

১২। নালন্দা মন্দিরের ক্ষোদিত লিপি, মহারাজ মহীপাল।

১৩। বুদ্ধগয়ার বুদ্ধমূর্ত্তিতে ক্ষোদিত মহারাজ মহীপাল।

১৪। সারনাথের ভগ্ন বুদ্ধমূর্ত্তির নিম্নে ক্ষোদিত মহারাজ মহীপাল।

১৫। তিত্তরোয়ার বুদ্ধমূর্ত্তির নিম্নে ক্ষোদিত মহারাজ মহীপাল।

১৬। গয়ার, কৃষ্ণদ্বারকা মন্দিরের দ্বারস্থ ক্ষোদিত লিপি, মহারাজ নয়পাল দেব।

১৭। গয়ার আর একখানা শিলালিপি, মহারাজ নয়পাল দেব।

১৮। বিহারের বুদ্ধ মূর্ত্তির পদমূলে ক্ষোদিত। মহারাজ বিগ্রহপাল।

১৯। বিহারের একটী দেবী মূর্ত্তির পদমূলে ক্ষোদিত, মহারাজ রামপাল।

২০। চণ্ডীমোর শিলালিপি, মহারাজ রামপাল দেব।

২১। বিহার পর্ব্বতস্থিত ষষ্ঠীমূর্ত্তির পদমূলে ক্ষোদিত, মহারাজ মদনপাল দেব।

২২। জয়নগরের দেবমূর্ত্তির পদমূলে ক্ষোদিত, মহারাজ মদনপাল দেব।

২৩। গয়া, গদাধরের মন্দিরগাত্র ক্ষোদিত, মহারাজ গোবিন্দপাল দেব।

২৪। গয়ার ক্ষোদিত লিপি, মহারাজ গোবিন্দপাল দেব।

২৫। রামগয়ার দশ অবতার মূর্ত্তিগাত্র ক্ষোদিত, মহারাজ মহেন্দ্রপাল দেব।

২৬। গুণরিয়ার বুদ্ধমূর্ত্তির সিংহাসনে ক্ষোদিত, মহারাজ মহেন্দ্রপাল দেব।

২৭। মহারাজ মহেন্দ্রপালের শিলালিপি।

২৮। গয়ার একটী মন্দিরে ক্ষোদিত "যক্ষপাল নরেন্দ্র"।

১ খানা পিত্তল লিপি :—

উল্লেখিত তাম্রশাসন ও ক্ষোদিত লিপি সমূহের সাহায্যে পাল রাজবংশের নিম্নলিখিত বংশাবলী সংগৃহীত হইল। খালিমপুরের তাম্রশাসনে লিখিত আছে যে, সমুদ্র হইতে যেরূপ লক্ষীর উৎপত্তি তদ্রূপ সর্ব্ববিদ্যা-বিশারদ দয়িত বিষ্ণু হইতে মহান্ "অবনিপাল" বংশের উৎপত্তি হইয়াছে। তদ্দ্বারা অনুমিত হয় যে, মহাত্মা শিবজী কিম্বা বীরকেশরী রণজিৎ সিংহের ন্যায় মহাত্মা দয়িত বিষ্ণু স্বীয় বাহুবলে একটী বিশাল রাজ্যের ভিত্তি সংস্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। উপযুক্ত পিতার উপযুক্ত পুত্র শ্রীমন্ বাপ্যট পার্শ্ববর্ত্তী রাজন্যবর্গকে জয় করিয়া স্বীয়রাজ্যসীমা প্রসারিত করিয়াছিলেন। সুতরাং বংশাবলী হইতে দয়িত বিষ্ণু কিম্বা বাপ্যটের নাম পরিত্যাগ করা যাইতে পারে না। বংশের স্থাপন কর্ত্তা দয়িত বিষ্ণু এবং তাহার পুত্র বাপ্যট কিরূপ উপাধি ধারণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, তাহা আমরা অবগত নহি। কিন্তু মহাসামন্ত (মহারাজ) বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে।

মহারাজাধিরাজ হর্ষবর্দ্ধনের মৃত্যুর পর উত্তর ভারতে একটী ভীষণ বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল। হর্ষের মৃত্যুর কিছুকাল পূর্ব্বে গৌড়েশ্বর শশাঙ্ক (নরেন্দ্র গুপ্ত) দেব কালকবলিত হন। উভয়কারণে পূর্ব্ব ভারত কোন পরাক্রমশালী ব্যক্তির রাজপাট সংস্থাপনের সুযোগ হইয়াছিল। সেই সুযোগে বীরবর দয়িত বিষ্ণু পশ্চিমবঙ্গে একটী পরাক্রমশালা রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। শকাব্দের ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষার্দ্ধভাগে যে বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার সময় গণনাদ্বারা অনুমিত হয় যে, শকাব্দের ৫৬৯—৫৮০ অব্দের মধ্যবর্ত্তী সময়ে মহাত্মা দয়িত বিষ্ণুর অভ্যুদয়। মগধাধিপতি আদিত্য সেন এবং নেপালের ঠাকুরীবংশীয় সামন্ত অংশুবর্ম্মন্ যৎকালে "মহারাজাধিরাজ" উপাধি ধারণ করেন, মহাত্মা দয়িত বিষ্ণু তৎকালে রাঢ় প্রদেশে স্বীয়বংশ তরুর বীজ বপন করিয়াছিলেন।

বংশাবলী।

১। দয়িতবিষ্ণু।

২। বাপ্যট।

৩। মহারাজাধিরাজ গোপাল।
মহারাণী দেদ্দদেবী। মহারাণী মৈত্রি দেবী।

৪। মহারাজধিরাজ ধর্ম্মপাল। বাকপাল। (প্রধান সেনাপতি)
মহারাণী রন্নাদেবী। জয়পাল। (প্রধান সেনাপতি)

যুবরাজ ত্রিভুবনপাল। ৫। মহারাজাধিরাজ দেবপাল। ৭। মহারাজাধিরাজ বিগ্রহপাল।
মহারাণী লজ্জা দেবী।

যুবরাজ রাজ্যপাল। ৬। মহারাজাধিরাজ শূরপাল।

৮। মহারাজাধিরাজ নারায়ণপাল।

৯। মহারাজাধিরাজ রাজ্যপাল।
মহারাণী ভাগ্যদেবী।

১০। মহারাজাধিরাজ গোপাল (দ্বিতীয়)।

১১। মহারাজাধিরাজ বিগ্রহপাল (দ্বিতীয়)।

১২। মহারাজাধিরাজ মহীপাল।

১৩। মহারাজাধিরাজ নয়পাল।

১৪। মহারাজাধিরাজ বিগ্রহপাল (তৃতীয়)।
(২ রাণী, চেদীর রাজকন্যা ও রাষ্ট্রকুটা রাজকন্যা)।

১৫। মহারাজাধিরাজ মহীপাল। (দ্বিতীয়) ১৬। মহারাজাধিরাজ শূরপাল। দ্বিতীয়) ১৭। মহারাজাধিরাজ রামপাল।
মহারাণী মদনদেবী।

১৮। মহারাজাধিরাজ কুমারপাল। ২০। মহারাজাধিরাজ মদনপাল।

১৯। মহারাজাধিরাজ গোপাল (তৃতীয়)। মহারাণী চিত্রমতিকা দেবী।

২১। মহারাজাধিরাজ গোবিন্দপাল।

২২। মহারাজাধিরাজ মহেন্দ্রপাল।

সংখ্যা।	নাম।	অভিষেকের আনুমানিক শকাব্দ।	ক্ষোদিতলিপিত প্রাপ্ত অব্দ।	আনুমানিক শাসন কাল।	মন্তব্য।
১	দয়িতবিষ্ণু।	৫৭৫	—	৩০	
২	বাপ্যট।	৬০৫	—	৪৫	
৩	গোপাল।	৬৫০	—	৪৫	আবুলফাজেলের মতে ৫৫ বৎসর, তারানাথের মতে ৪৫ বৎসর।
৪	ধর্ম্মপাল।	৬৯৫	৮৪০ সম্বত ৩২ রাজকীয় অব্দ।	৬৪	আবুলফাজেলের মতে ৯৫ বৎসর, তারানাথের মতে ৬৪ বৎসর।
৫	দেবপাল।	৭৫৯	৩৩ রাজকীয় অব্দ।	৪৮	আবুলফাজেলের মতে ৮৩ বৎসর, তারানাথের মতে ৪৮ বৎসর।
৬	শূরপাল।	৮০৭	১৩ রাজকীয় অব্দ।	১৫	তারানাথের মতে দেবপালের পুত্রের নাম রামপাল। তাঁহার শাসন-কাল ১৩ বৎসর।
৭	বিগ্রহপাল।	৮২২	—	১২	বিগ্রহ পালের শাসনকাল বোধ হয় ১২ বৎসর হইতেও ন্যূন হইবে।
৮	নারায়ণপাল।	৮৩৪	১৭রাজকীয় অব্দ।	২০	
৯	রাজ্যপাল।	৮৫৪	—	১২	
১০	গোপাল (দ্বিতীয়)	৮৬৬	—	২০	
১১	বিগ্রহপাল (দ্বিঃ)	৮৮৬	—	১৬	
১২	মহীপাল।	৯০২	১০৮৩ সম্বৎ ৪৮রাজকীয় অব্দ।	৫২	তারানাথের মতে শাসনকাল ৫২ বৎসর।

১৩	নয়পাল।	৯৫৪	{ ১৫ রাজকীয় অব্দ। }	৩৫	তারানাথের মতে শাসনকাল ৩৫ বৎসর।
১৪	বিগ্রহপাল (তৃঃ)	৯৮৯	—	১৩	
১৫	মহীপাল (দ্বিঃ)।	১০০২	—	২	
১৬	শূরপাল (দ্বিঃ)।	১০০৪	—	২	
১৭	রামপাল।	১০০৬	—	৪৬	তারানাথের মতে শাসনকাল ৪৬ বৎসর।
১৮	কুমারপাল।	১০৫২	—	৬	
১৯	গোপাল (তৃঃ)।	১০৫৮	—	৪	
২০	মদন পাল।	১০৬২	১৯ রাজকীয় অব্দ	২১	
২১	গোবিন্দ পাল।	১০৮৩	{ ১২৩২ ১২৩৫ সম্বৎ }	১৪	
২২	মহেন্দ্রপাল।	১০৯৭	—	১৯	১১১৬ কিম্বা ১১১৭ শকাব্দে রাজ্য-চ্যুত হইয়াছিলেন।

শকাব্দের ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ ভাগে পালবংশের অভ্যুদয় এবং শকাব্দের দ্বাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে তাহার বিলোপ সাধিত হইয়াছিল। আনুমানিক গণনা অনুসারে পালরাজগণ ৫২২ বৎসর রাজদণ্ড পরিচালন করিয়াছেন। (৪) ২২ জন রাজার শাসন কাল গড়ে ২৩।৮।৭ দিন হইতেছে। ইহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক বলিতে হইবে। রাঢ়দেশে ইঁহাদের অভ্যুদয় এবং মগধে ইঁহাদের বিলোপ। প্রাচ্য চালোক্য রাজবংশের সেনাপতি বিজয় সেন দ্বারা পালরাজগণ বাঙ্গালা হইতে তাড়িত হইয়াছিলেন বলিয়া আমরা বিবেচনা করি। পরবর্ত্তিপালরাজগণ কেবল মাত্র মগধদেশের অধিপতি ছিলেন। তৎকালে দণ্ডপুর বিহার (বা ওদন্তপুরী) (৫) তাঁহাদের রাজধানী ছিল। *মুসলমান সেনাপতি মহম্মদ বখ্‌তিয়ার খিলজী এই নগরী* বিনাশ করেন। সেই সকল বৃত্তান্ত যথা স্থানে বর্ণিত হইবে।

শ্রীকৈলাসচন্দ্র সিংহ বিদ্যাভূষণ।

(৪) * আবুল ফাজেলের মতে ৬৯৮ বৎসর পালরাজগণ বাঙ্গালা শাসন করিয়াছেন। কিন্তু তারানাথের মতে পালরাজগণ ৪৭৮ বৎসর বাঙ্গালা শাসন করিয়া লবাসনদ্বারা বাঙ্গালা হইতে বিতাড়িত হইয়াছিলেন।

(৫) ওদন্তপুরীকে আমি দাঁতন বলিয়া স্বীকার করিতে অক্ষম। ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র দাঁতনকে প্রাচীন দন্তপুর অবধারণ করিয়াছিলেন।

শঙ্কর দর্শনের সমালোচনা। *

ভারতবর্ষে যত দার্শনিক জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তন্মধ্যে শঙ্করাচার্য্যই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। সপ্তম শতাব্দীতে তাঁহার আবির্ভাব। তাঁহার পূর্ব্বেও কোন কোন প্রসিদ্ধ দার্শনিকের আবির্ভাব হইয়াছিল; কিন্তু শঙ্করের সহিত কাহারও তুলনা হয় না। শঙ্করের দর্শন অতি উচ্চ অঙ্গের চিন্তায় পূর্ণ। কেবল উচ্চ নহে, অত্যন্ত গভীর। গভীরতা ও প্রশস্ততা এই দুই গুণই শঙ্করের দর্শনে দৃষ্ট হয়। আমরা শঙ্করের দর্শন সমালোচনা করিব স্থির করিয়াছি। কিন্তু আশঙ্কা হয়, প্রকৃত ভাবে তাঁহার দর্শনের সমালোচনা করিতে পারিব কি না? শঙ্করের দর্শন এত গভীর যে তাহার মধ্যে মগ্ন হইয়া তাহার তলস্পর্শ করা আমাদের সাধ্য কি না, বুঝিতে পারি না।

শঙ্করের দর্শন এ দেশের প্রধান দর্শন। আরও অনেক দার্শনিক জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু শঙ্করের তুলনায় তাঁহারা অনেক পরিমাণে নিম্ন স্থানের অধিকারী। একথা বলি না যে, শঙ্করের দর্শনে কোন ভ্রান্তি নাই। ইহাও বলি না যে, শঙ্কর ব্রহ্মলাভের প্রকৃত পন্থা আবিষ্কৃত করিয়া গিয়াছেন, এই কথাই বলি যে, শঙ্কর যে দর্শন ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহার গভীরতা ও প্রশস্ততার সহিত তুলনা করিলে, আর সকল দর্শন অনেক নিম্নস্থানে পড়িয়া যায়। শঙ্করের যুক্তিশৃঙ্খল এমন অকাট্য, যে, কাহারও সাধ্য নাই যে, তাহার মধ্যে, কোন স্থানে তর্ক সম্বন্ধীয় ভুল দেখাইতে পারেন।

আমরা শঙ্করের মতের দুইদিক্ দেখাইব। তাঁহার ভ্রান্তির দিক্ এবং তাঁহার সত্য প্রদর্শনের দিক্। আমরা প্রথমে তাঁহার সত্যপ্রদর্শনের দিক্ দেখাইব। তিনি বলেন যে, এক ব্রহ্ম পদার্থ ব্যতীত দ্বিতীয় কিছু নাই। এই কথাটি এমন অখণ্ডনীয় যুক্তিজাল দ্বারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, যথার্থই তাহার মধ্যে কোন স্থলে একটি তর্ক সম্বন্ধীয় ভুল প্রদর্শন করা অসম্ভব। আমরা ক্রমে ক্রমে শঙ্করের যুক্তিশৃঙ্খল দেখাইব।

এবিষয়ে শঙ্করের যুক্তিশৃঙ্খল কি? তাহা এই যে, এ সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের মূল অবশ্য ব্রহ্মশক্তি। ছিল ব্রহ্মশক্তি, হইল জগৎ। অথাৎ ব্রহ্মশক্তির পরিণতি জগৎ। কিন্তু শক্তি বলিলেই শক্তিমান্ বুঝায়। শক্তির সহিত শক্তিমান্ এক। সুতরাং এজগৎ কেবল শক্তির বিকার নহে শক্তিমানের বিকার। এস্থলে বিকার অর্থ প্রকাশ। এজগৎ শক্তির প্রকাশ, অর্থাৎ শক্তির সহিত শক্তিমানের প্রকাশ। নতুবা কেবল শক্তির প্রকাশ বলিলে চলে না। তবেই হইল, সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড এক ব্রহ্মের প্রকাশ। সকলই তাঁরই প্রকাশ। সকলই তিনি। এমন কিছু নাই, যাহা তিনি নন।

আর একটি যুক্তি এই যে, শক্তি অবশ্য জ্ঞানময়ী। ব্রহ্মশক্তি অবশ্য অন্ধশক্তি হইতে পারেনা। সুতরাং শক্তি যেমন জগতের মূল; সেইরূপ জ্ঞানও জগতের মূল। কিন্তু জ্ঞান বলিলেই জ্ঞাতা বুঝায়। জ্ঞাতা, জ্ঞেয়, জ্ঞান। এই তিনে এক বস্তু। জ্ঞান বলিলেই জ্ঞাতা বুঝায়। জ্ঞান আছে, কিন্তু জ্ঞাতা নাই ইহা সম্ভব নহে। আবার জ্ঞান আছে, কিন্তু জ্ঞেয় নাই, ইহাও সম্ভব নহে। তবেই হইল এ জগৎ যখন জ্ঞানের প্রকাশ, তখন ইহা অবশ্য জ্ঞাতারও প্রকাশ, সুতরাং জগৎ ও জগদীশ্বর এ উভয়ের সত্তা এক হইয়া গেল।

সংক্ষেপতঃ এই দুইটি শঙ্করের অদ্বৈতবাদের যুক্তি। আরও যুক্তি আছে, কিন্তু তাহা বলা অনাবশ্যক। এখন কথা এই যে, সকলই যদি ব্রহ্ম হইয়া গেল, তবে কে স্রষ্টা আর কে সৃষ্ট, কে উপাসক, আর কে উপাস্য, সকলই যখন একীভূত হইল তখন দুইয়েব মধ্যে প্রভেদ কেমন করিয়া সম্ভব হইবে? সুতরাং সোঽহং সেই আমি, ইহাই সাধনের বিষয়। সোঽহং চিন্তা করিতে করিতে যখন স্পষ্ট উপলব্ধি হইবে যে, সেই আমি, তখনই সিদ্ধি।

ইহাই শঙ্করের দর্শন, এবং ইহাই তাঁহার সাধনপ্রণালী। এখন কথা এই যে, এই দর্শন এবং এই সাধন-

* শঙ্করাচার্য্যের দর্শন সম্বন্ধে উপরি প্রকাশিত সমালোচনাটী আমার লিখিত নহে। ইহার লেখক আপনাকে স্বর্গীয় রাজা রামমোহন রায় বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। তিনি আমাকে মিডিয়ম্ করিয়া এই প্রবন্ধটী আদ্যোপান্ত লিখিয়াছেন। ইহার একবর্ণও আমার নহে।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক।

প্রণালী নির্দ্দোষ কি না? এখন দেখা আবশ্যক, এই অদ্বৈতবাদের যে যুক্তিশৃঙ্খল, তাহার মধ্যে কোন ভ্রান্তি আছে কি না? আমরা কোন ভ্রান্তি দেখিতে পাই না। তবে কেমন করিয়া বলিব যে, এ অদ্বৈতবাদ যুক্তি-বিরুদ্ধ?

যুক্তি বিরুদ্ধ না বলিতে পারিলেও, একটি পথ আছে যদ্দ্বারা আমরা ইহার সিদ্ধান্ত অযুক্ত বলিতে সাহস করি। সে পথ কি? সে পথ এই যে, আমরা দেখিতেছি যে, যিনি অনন্ত তিনি পরিমিত হইয়াছেন। পরমাত্মা ও জীবাত্মা এই দুই ব্যতীত আর কি আছে? পরমাত্মা, অনন্ত, জীবাত্মা পরিমিত। জীবাত্মা যে পরিমিত, ইহা প্রত্যক্ষ। ইহার জন্য অন্য প্রমাণের প্রয়োজন নাই। এখন প্রশ্ন এই যে, অনন্ত কেমন করিয়া পরিমিত হইলেন? এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া অতীব কঠিন। ইহা বলিতেই হইবে যে, অনন্তের মধ্যে এমন নিগূঢ় শক্তি আছে, যাহাতে তিনি পরিমিত হইতে পারেন। কিন্তু কেমন করিয়া পারেন, তাহা আমাদের বুদ্ধির অতীত। আমরা দেখিতেছি, জীবাত্মার এক দিক পরিমিত, আবার আর এক দিক্ অনন্ত। জীবাত্মা যে সম্পূর্ণ পরিমিত ইহা বলিতে পারিনা।

সম্পূর্ণ পরিমিত বলিলে একটি বিশেষ দোষ হয়। যে পরিমিত, সে কেমন করিয়া জানিতে পারে যে সে পরিমিত? যে পরিমিত, সম্পূর্ণ পরিমিত, তাহার পক্ষে জানা যে সে পরিমিত, ইহা অসম্ভব। অসম্ভব কেন? এই জন্য যে, যাহাতে যাহা নাই সে তাহা কখনই জানিতে পারে না। অন্ধের পক্ষে কি বর্ণের জ্ঞান সম্ভব? বধিরের পক্ষে কি সঙ্গীতের জ্ঞান সম্ভব? আমাদের দেশে একটি কথা আছে "যাহা নাই, ভাণ্ডে তাহা নাই ব্রহ্মাণ্ডে।" অর্থাৎ যাহাতে যাহা নাই, তাহা ব্রহ্মাণ্ডে থাকিলেও, সে তাহা জানিতে পারে না। যাহার দয়া নাই, সে দয়ালুর দয়া যে কি পদার্থ, তাহা কেমন করিয়া বুঝিবে? মনে কর, কোন ব্যক্তির কোন মনোবৃত্তি নাই। তাহা হইলে সে ব্যক্তি কি কখন বুঝিতে পারেন যে, অন্য ব্যক্তিতে সেই মনোবৃত্তি কি প্রকার? সেই জন্য বলি যে, যে ব্যক্তি সম্পূর্ণরূপে পরিমিত, তিনি বুঝিতে পারেন না যে তিনি পরিমিত। কেন পারেন না? এই জন্য যে, পরিমিত বলিলেই অনন্ত বুঝায়; এবং অনন্ত বলিলেই পরিমিত বুঝায়। পরিমিত অর্থ কি? যাহা অনন্ত নয়। অনন্ত অর্থ কি? যাহা পরিমিত নহে।* এই দুটি আপেক্ষিক জ্ঞান। আপেক্ষিক জ্ঞানের কয়েকটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করি। যেমন, ভাল বলিলেই মন্দ বুঝায়। মন্দ বলিলেই ভাল বুঝায়। যেমন, দীর্ঘ বলিলেই হ্রাস বুঝায়, এবং হ্রাস বলিলেই দীর্ঘ বুঝায়। যেমন, উত্তর বলিলেই দক্ষিণ বুঝায়, এবং দক্ষিণ বলিলেই উত্তর বুঝায়। ইহারই নাম, আপেক্ষিক জ্ঞান। আপেক্ষিক জ্ঞান, বাস্তবিক এক জ্ঞান। অথবা এক জ্ঞানের দুইদিক্। সেইরূপ, পরিমিত ও অনন্ত। পরিমিত বলিলে অনন্ত বুঝায়, এবং অনন্ত বলিলে পরিমিত বুঝায়। সেই জন্য বলিতেছি যে, যাহার পরিমিতের জ্ঞান নাই, তাহার অনন্তেরও জ্ঞান নাই। কেননা, এ দুই এক জ্ঞান। অথবা এক জ্ঞানের দুই দিক্।

এখন দেখা গেল, জীবাত্মার অনন্তের জ্ঞান আছে।† জীবাত্মার অনন্তের জ্ঞান যদি থাকে, তবেই সিদ্ধান্ত হইল যে, জীবাত্মা সম্পূর্ণরূপে পরিমিত পদার্থ নহে। কেননা, যাহা পরিমিত, তাহার কখন অনন্তের জ্ঞান থাকিতে পারেনা। অনন্তের পক্ষেই অনন্তের জ্ঞান থাকা সম্ভব। কিন্তু জীবাত্মা যে পরিমিত, এ বিষয়ে ত কোন সংশয়ই নাই। আবার যখন জীবাত্মার অনন্তের জ্ঞান রহিয়াছে, তখন ইহাও বলিতে হইবে যে, জীবাত্মা কখনই সম্পূর্ণরূপে পরিমিত নহে। এই দুই বিপরীত তত্ত্বের মধ্যে মীমাংসা করিয়া লইতে হইবে। সে মীমাংসা কি? সে মীমাংসা দ্বৈতাদ্বৈতবাদ।

দ্বৈতবাদ এই জন্য যে, জীবাত্মা ও পরমাত্মার প্রভেদ রহিয়াছে। প্রভেদ কি? জীবাত্মা পরিমিত, পরমাত্মা অনন্ত। অদ্বৈত কি? জীবাত্মার যখন অনন্তের জ্ঞান

---

* পরিমিত ও অনন্ত এই দুইটি আপেক্ষিক শব্দ এই মাত্র বুঝাগেল, কিন্তু শব্দ দুইটীর অর্থ কি ইহা কিছুই বুঝাগেলনা। এইরূপ যুক্তি প্রদর্শন Verbal criticism. সং সং।

† জীবাত্মার অনন্তের জ্ঞান আছে ইহা এ পর্য্যন্ত প্রমাণিত হয় নাই, ধরিয়া লওয়া হইতেছে। সং সং।

রহিয়াছে, তখন জীবাত্মাতে নিশ্চয়ই অনন্তত্ব রহিয়াছে। তাহা হইলেই হইল যে জীবাত্মা সেই অনন্তের প্রকাশ। অনন্ত এক ভিন্ন দুই হইতে পারেনা। জীবাত্মার মধ্যেও যখন অনন্তত্ব দেখিতেছি, তখন বলিতেই হইবে যে, যেমন দ্বৈত, সেইরূপ অদ্বৈত। দ্বৈতাদ্বৈতবাদই যথার্থ তত্ত্ব।

কিন্তু শঙ্কর অদ্বৈতবাদের সম্পূর্ণ পক্ষপাতী। আমরা অদ্বৈতবাদের সত্য পরিষ্কাররূপে বুঝিতে পারি। অর্থাৎ এই বুঝিতে পারি যে, সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড ব্রহ্মশক্তি হইতে উৎপন্ন। ছিল ব্রহ্মশক্তি হইল জগৎ। পূর্ব্ববর্ত্তী ব্রহ্মশক্তি, পরবর্ত্তী জগৎ। কারণ ব্রহ্মশক্তি, কার্য্য জগৎ। এইরূপে চিন্তা করিলেও বুঝা যায় যে, আমাদের যে মত, ইহাই সত্য। কেন না, পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী; কারণ ও কার্য্য, এই দুইয়ের মধ্যে যেমন ভেদ রহিয়াছে; সেইরূপ অভেদও রহিয়াছে। কারণ ও কার্য্য, ভিন্নও বটে, অভিন্নও বটে। কারণ কার্য্যরূপে পরিণত হয়। যাহা কারণ, তাহাই কার্য্য হয়, ইহাই কি সত্য নয়? যেমন, এক ঘটি জল মাটিতে ঢালিয়া দিলাম, মৃত্তিকা শীতল হইল। এখানে কি হইল? জলের শীতলতা মৃত্তিকার শীতলতায় পরিণত হইল। আর একটি দৃষ্টান্ত। আমি এক জনের পৃষ্ঠে মুষ্ট্যাঘাত করিলাম। সে বেদনা পাইল। এস্থানে কি হইল? আমার শক্তি, সে ব্যক্তির পৃষ্ঠে গিয়া তাহার মাংসপেশীতে এরূপ একটি ক্রিয়া করিল. যাহাতে তাহার পৃষ্ঠে বেদনা বোধ হইল। এস্থলে দেখা আবশ্যক, ঐ বেদনা কি? বেদনা একটি অনুভূতি। অনুভূতি কার্য্য, আমার শক্তি কারণ। শক্তি পূর্ব্ববর্ত্তী বেদনা পরবর্ত্তী। এস্থলে ভেদ দেখিতেছি। কিন্তু অভেদ কি কিছুই নাই? অভেদ আছে বই কি? অভেদ এই যে, আমার শক্তি সেই ব্যক্তির পৃষ্ঠে গিয়া বেদনারূপে পরিণত হইল। শক্তি বেদনা হইল। কিন্তু কেবল শক্তি বেদনা হইতে পারেনা। যদি মাংসপেশী প্রভৃতির যোগ না থাকিত, তাহা হইলে বেদনা হইত না। তবেই বলিতে হইবে, কেবল শক্তি কারণ নয়। শক্তি এবং মাংসপেশী প্রভৃতির যোগ ঐ বেদনার কারণ *।

আর দৃষ্টান্তের প্রয়োজন নাই। যাহা কারণ, তাহাই কার্য্যরূপে পরিণত হয়। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে এই নিয়ম। সেইরূপ, জগৎ ও জগৎ কারণ সম্বন্ধে। যিনি জগৎকারণ ব্রহ্ম, তিনি কার্য্য জগৎরূপে পরিণত হইয়াছেন। ইহাই সত্য মত। কিন্তু ইহাও সত্য যে, তিনি জগতের অতীত রূপেও আছেন। তিনি জগতের অন্তর্গত অথচ জগতের অতীত। এই দুটি তত্ত্বই সত্য। তিনি জগতের অন্তর্গত, ইহা বুঝি কি প্রকারে? পরমেশ্বর যখন জীবরূপে প্রকাশ হইয়াছেন, তখন তিনি অবশ্য জগতের মধ্যে। আবার তিনি যখন জীবের প্রকাশক, যখন তাঁর জ্ঞান, তাঁর প্রেম, তাঁর শক্তি লইয়া জীব, তখন অবশ্য তিনি জগতের অতীত। পরব্রহ্মের এই দুই অবস্থা এই দুই অবস্থার নাম হিরণ্যগর্ভ ও তুরীয়। আমি মনে করি, যিনি হিরণ্যগর্ভ, তিনিই তুরীয়। দুই একই।

এখন দেখিতে হইবে যে, যিনি হিরণ্যগর্ভ তিনিই যদি তুরীয় হন, তাহা হইলে, এ দুইয়ে স্বরূপতঃ প্রভেদ কিছু আছে কিনা? আমার মতে কিছুই নাই। একই ব্রহ্ম, উভয়স্থলেই এক। বেদান্ত মতে, এ দুইয়ে বাস্তবিক কোন প্রভেদ নাই। যিনি হিরণ্যগর্ভ, তিনিই তুরীয় ব্রহ্ম, এই আমার মত। কিন্তু এক শ্রেণীর দার্শনিক আছেন, তাঁহারা বলেন যে, যিনি হিরণ্যগর্ভ, তিনি অনন্ত নহেন। তিনি অনন্ত হইলে তাঁহাতে পরিবর্ত্তন সম্ভব নহে। কিন্তু আমরা দেখিতেছি যে, জগতে পরিবর্ত্তন হইতেছে; সুতরাং যিনি জগতের অন্তর্গত হইয়া রহিয়াছেন, তিনি অবশ্য অনন্ত নহেন। অনেকের এই মত। আমি এই মতে সায় দিতে পারি না। না পারিবার অবশ্য কারণ আছে। এক একটি করিয়া কারণ বলিতেছি।

প্রথম, যিনি পূর্ণব্রহ্ম তিনি তুরীয় অবস্থায় থাকিয়া অপরিবর্ত্তিতরূপে আছেন। তবে হিরণ্যগর্ভকে সৃষ্টি করিল কে? যদি বল, হিরণ্যগর্ভ অনাদিকাল হইতে রহিয়াছেন, তাহা হইলে, এই প্রশ্ন আসে যে, এ জগৎসৃষ্টি করিল কে? পূর্ণব্রহ্ম কি করেন নাই? তবে পূর্ণব্রহ্মের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ কি? স্রষ্টা ও সৃষ্ট, এই

* এই দৃষ্টান্তটী প্রতিপাদ্য বিষয়ের অনুকূল বলিয়া গৃহীত হইবার যোগ্য কি? সং সং।

সম্বন্ধ কি নয়? যদি না হয়, তবে কি সম্বন্ধ? তিনি আমাদের কে? এ প্রশ্নের কোন উত্তরই পাই না। যদি তিনি নিষ্ক্রিয় হন, তাহা হইলে, অবশ্য, তিনি এই জগৎ সৃষ্টি করেন নাই। তবে এ জগৎ কে সৃষ্টি করিল? যদি বল, হিরণ্যগর্ভ এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা হইলে হিরণ্যগর্ভকে সৃষ্টি করিল কে? যদি বল, হিরণ্যগর্ভ অনাদিকাল হইতে আছেন, তাঁহার স্রষ্টা নাই, তাহা হইলে, একজন পূর্ণব্রহ্ম মানিবার প্রয়োজন কি? আর যদি বল, পূর্ণব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভকে শক্তি দিয়াছেন, সেই অনুসারে হিরণ্যগর্ভ জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা হইলে, এই প্রশ্ন উঠিতেছে, যে, যিনি নিষ্ক্রিয় তিনি কেমন করিয়া হিরণ্যগর্ভকে শক্তি দিলেন? যদি শক্তি দিতেই পারেন, তবে সেই শক্তিদ্বারা একটা জগৎ সৃষ্টি করিতে পারেন। তবে ব্রহ্ম অপরিবর্ত্তনীয় অনন্ত বলিয়া তাহাকে নিষ্ক্রিয় বলিবার প্রয়োজন কি?

তবেই দেখা গেল যে, যিনি পূর্ণব্রহ্ম পরমেশ্বর, তিনি জগৎকারণ নহেন, ইহা নিতান্তই ভ্রান্ত মত। যিনি অনন্ত তাঁহার পক্ষে সকলই সম্ভব। যিনি সর্ব্বশক্তিমান্, তিনি জগৎসৃষ্টি করিতে অক্ষম, এ কেমন মত? আমি কিছু কাজ করিতে পারি। কিন্তু যিনি সর্ব্বশক্তিমান্ তিনি কিছুই করিতে পারেন না। * এ কেমন কথা? এ সকল দার্শনিক মতের বিচার করিলে, সুস্পষ্টরূপে তাহার অসারত্ব বুঝিতে পারা যায়। যদি অনন্ত হইলে নিষ্ক্রিয় হইতে হয়, আর সান্ত হইলে, কর্ম্মশীল হওয়া যায়, তাহা হইলে, এমন অনন্ত অপেক্ষা পরিমিত শ্রেষ্ঠ। অনন্ত কি? না, যিনি কিছুই করিতে পারেন না। আর পরিমিত কি? না যিনি অনেক কার্য্য করিতে পারেন। তবে, অনন্ত অপেক্ষা পরিমিত শ্রেষ্ঠ নহে? দার্শনিক সূক্ষ্ম যুক্তি অনেক সময় মানুষকে এমন ভ্রান্তিতে লইয়া যায়, যাহা আশ্চর্য্য। এইরূপ সূক্ষ্মযুক্তির অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। একটী দৃষ্টান্ত প্রদান করি। হিমালয় পর্ব্বত অনন্ত ভাগে বিভাজ্য। অতএব হিমালয়ের অনন্ত ভাগ। এবং ঐ ক্ষুদ্র মৃত্তিকা স্তূপ অনন্ত ভাগে বিভাজ্য। সুতরাং উহারও অনন্ত ভাগ। যাহার ভাগ সকল সমান, তাহার সমষ্টি সমান। সুতরাং হিমালয়ও ঐ ক্ষুদ্র মৃত্তিকাস্তূপ সমান।

সেইরূপ যুক্তিতে একটা সিদ্ধান্ত হইলেই যে তাহা মানিতে হইবে, এমন নহে। সকল দিক্ দেখিতে হইবে। যেমন, তিনি অনন্ত, অপরিবর্ত্তনীয়, সেইরূপ আবার সর্ব্বশক্তিমান্। তিনি আমাদের সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়কর্ত্তা। একটা যুক্তি অবলম্বন পূর্ব্বক তাঁহাকে নিষ্ক্রিয় প্রতিপন্ন করিয়া জগতের সৃষ্টি অপ্রমাণ করা কখনই সঙ্গত নহে। সকল দিক্ দেখিয়া, সকল দিকের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া মীমাংসা করিতে হইবে। একটা যুক্তি যথেষ্ট নহে সকল দিকের যুক্তি ও সকল তত্ত্বের সামঞ্জস্য করিতে হইবে। একটা যুক্তি অবলম্বন পূর্ব্বক এমন মীমাংসার উপনীত হওয়া যায়, যাহা অত্যন্ত অযুক্ত ও অসার। মূলতত্ত্বের বিরোধী।

এখন এই সকল কথা শঙ্করের দর্শন সম্বন্ধে প্রয়োগ করা যাউক। শঙ্কর বলেন যে, এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম, এই ব্রহ্মাণ্ডরূপে পরিণত হইয়াছেন। তিনি সকলই। যাহা কিছু দেখিতেছি, শুনিতেছি, আস্বাদ করিতেছি, স্পর্শ করিতেছি, সকলই সেই ব্রহ্মের প্রকাশ। সকলই যদি ব্রহ্মের প্রকাশ হইল, এবং আমিও যদি সেই ব্রহ্মের প্রকাশ তাহা হইলে কে কাহার উপাসক? সোঽহং সেই অমি এই ধ্যান করিতে করিতে ক্রমে এই জ্ঞান পরিস্ফুট হইবে, যে, আমি সেই। এই মত ও এই সাধনপ্রণালী আমি স্বীকার করি না। কেন করি না, তাহা পরিষ্কার করিয়া বলিব।

প্রথম এই যে, সকলই যে তার প্রকাশ, ইহা আমি স্বীকার করি। স্বীকার করি বলিয়াই যে, তিনি আর আমি সম্পূর্ণ এক, ইহা বলিতে পারি না। অদ্বৈত ব্রহ্ম, ইহা সত্য; কিন্তু এই অদ্বৈতের মধ্যে, দ্বৈত নিশ্চয়ই

* নিষ্ক্রিয় বলিলে কাজ করিতে পারেন না এমন অর্থ বুঝায়না। নিষ্ক্রিয় শব্দের অর্থ যিনি কোন কাজ করেন না। বস্তুতঃ যিনি পূর্ণকাম তিনি কোন্ উদ্দেশ্য সাধনজন্য কার্য্য করিবেন? প্রয়োজন মনুদ্দিশ্য ন মন্দোঽপি প্রবর্ত্ততে এই ন্যায় অনুসারে ব্রহ্মকে ক্রিয়াশীল হইতে হইলে প্রয়োজনের অবকাশ হয়, প্রয়োজনের অবকাশ হইলে ব্রহ্মের পূর্ণতায় দোষস্পর্শ হয়। এইজন্যই পূর্ণব্রহ্ম নিষ্ক্রিয়।
সং সং।

আছে। সেই দ্বৈত কোথায়? তাহা বুঝা আবশ্যক। আমি দেখিতেছি তিনি সর্ব্বভূতে প্রকাশমান। এখন প্রশ্ন এই যে, কে কাহাকে দেখিতেছে? আমি যে তাহাকে দেখি, ইহা অনেক সাধনসাপেক্ষ। ব্রহ্মদর্শন কি সহজ কথা? অনেক তপস্যার ফল। প্রাচীন কালের মহর্ষিগণ তাঁহাকে যে দর্শন করিয়াছিলেন, ইহা অনেক সাধনের ফলে। কিন্তু ব্রহ্ম আপনাকে যে আপনি দর্শন করেন তাহা কি সাধনের ফলে? তবেই হইল যে, অদ্বৈতের মধ্যে দ্বৈত আছে।

দ্বিতীয় সকলই তাঁহার প্রকাশ। অর্থাৎ, সেই অনন্ত পরিমিতরূপে প্রকাশ হইয়াছেন। কিন্তু অনন্ত কেমন করিয়া পরিমিত হন, তাহা বুঝা যায় না। কিন্তু তিনি যে পরিমিত হন, ইহা নিশ্চয়। কেমন করিয়া নিশ্চয় জানা যায়, তাহা ক্রমে বলিব। ইহার প্রমাণ আছে। জ্ঞানী লোকে প্রমাণ ভিন্ন, কিছুই স্বীকার করিতে চান না কিন্তু সে প্রমাণ কি?

প্রথম প্রমাণ এই যে, তাঁহার জ্ঞান ও আমার জ্ঞান এক, ইহা সুস্পষ্ট বুঝা যায়। কিরূপে বুঝাযায় বলিতেছি। মনে কর, বর্ত্তমান মুহূর্ত্তে আমার অন্তরে একটা কি দুইটা জ্ঞান রহিয়াছে। কিন্তু আমি লক্ষ লক্ষ বিষয় জানি। সে সকল জ্ঞান এখন কোথায়? কেহ বলিবেন, সে সকল জ্ঞান মস্তিষ্কে রহিয়াছে। কিন্তু মস্তিষ্ক জড়। জড়ে জ্ঞান কেমন করিয়া থাকিবে? কিন্তু মস্তিষ্ক যে জড়, ইহা যদিও সাধারণ মত, কিন্তু ইহা প্রকৃত মত নহে। প্রকৃত মত এই যে, সমুদয় জড় জগৎ যাহা কিছু সকলই জ্ঞানময়। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ শব্দ এই পাচটি বিষয় লইয়া জগৎ। কিন্তু এই পাচটি বিষয় জ্ঞান মাত্র। রূপ দর্শন জ্ঞান, রস আস্বাদ জ্ঞান, গন্ধ আঘ্রাণ জ্ঞান, স্পর্শও এক প্রকার জ্ঞান, শব্দ শ্রবণ জ্ঞান। এই পাচটি বিষয় যখন জ্ঞান হইল, তখন সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড জ্ঞানময় বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে। সকলই যখন জ্ঞান, জ্ঞান ছাড়া কিছুই নহে, তখন যে জ্ঞান আমাতে থাকে না তাহা অবশ্য জ্ঞানে থাকে। *

তার পর একটি প্রশ্ন এই যে আমার যে জ্ঞান আমাতে থাকে না, তাহা অন্য জ্ঞানে থাকে, তাহা হইলে সে অন্য জ্ঞান কাহার জ্ঞান? সে জ্ঞান নিশ্চয়ই পরমাত্মার জ্ঞান। কেন না, জীবাত্মা ও পরমাত্মা, এই দুই ভিন্ন তো আর নাই। যদি জীবের জ্ঞানে না থাকে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই পরমাত্মার জ্ঞানে থাকিবে। আর কি আছে?

এখন কথা এই যে, যখন সকল ব্রহ্মাণ্ডই জ্ঞানময়, তখন আমার যে জ্ঞান আমাতে থাকে না, তাহা অবশ্য পরমাত্মার জ্ঞানে থাকিবে। এ সিদ্ধান্ত অখণ্ডনীয়। শঙ্কর বলেন, সকলই ব্রহ্ম। আমিও বলি সকলই ব্রহ্ম। কিন্তু শঙ্কর বলেন যে, সকলই যদি ব্রহ্ম হইল, তবে উপাস্য উপাসক সম্বন্ধ কেমন করিয়া থাকিবে? † সেই জন্য, তিনি বলেন যে সর্ব্বদা সোঽহং জপ করিয়া আপনাকে ব্রহ্মাবস্থায় উপনীত কর। এমতের সহিত আমরা সায় দিতে পারি না। কেন পারি না, ক্রমে বলিতেছি সেই যদি আমি তবে সে এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্ত্তা, আমি একটি তৃণকণাও সৃষ্টি করিতে পারিনা কেন? সে আপনাকে আপনি নিত্যসিদ্ধ রূপে অনাদি অনন্তকাল জানিতেছে, আমি অনেক তপস্যায় জানি কেন? এই দুই স্থলে যে সুস্পষ্ট প্রভেদ লক্ষিত হয়, তাহার ব্যাখ্যা কেমন করিয়া হইবে? সেই জন্য আমি বলি, শঙ্করের যে অদ্বৈতবাদ তাহা নির্দ্দোষ বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। অদ্বৈতবাদের মধ্যে দ্বৈত ভাব দেখিতেছি। এ দ্বৈত ভাব অতি স্পষ্ট। সুতরাং যে মতকে সত্য মত বলিয়া মনে হয় তাহাকে অদ্বৈতবাদ না বলিয়া দ্বৈতাদ্বৈতবাদ বলা উচিত।

শঙ্কর বলেন, সকলই ব্রহ্ম। আমরাও বলি সকলই ব্রহ্ম। এ বিষয়ে মতভেদ নাই। মতভেদ এই স্থানে যে, সকলই ব্রহ্ম বলিয়া যে জীবব্রহ্মে কোন প্রভেদ নাই, এরূপ হইতে পারে না। শঙ্কর জীব ব্রহ্মে প্রভেদ সম্পূর্ণ

---

* মালব্রাঙ্ক, ডেকার্ট, বার্কে প্রভৃতি দার্শনিকগণ বহুপূর্ব্বে এরূপ যুক্তি প্রয়োগ করিয়াছেন; উহার পুনরাবৃত্তি করিয়া সবিশেষ লাভ নাই। সং সং।

† ব্যবহারিকদশায় এ সম্বন্ধ থাকিবার পক্ষে বাধা কি? সং সং।

অস্বীকার করিতেছেন, এমন নহে। তিনি যখন বলিতেছেন, সকলই ব্রহ্ম, কে কার উপাসনা করিবে? তখন এক প্রকার অস্বীকার করা হইতেছে। আবার যখন বলিতেছেন, সোঽহং মন্ত্রজপ করিয়া ক্রমে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে হইবে, আমি যে সেই, এই ব্রহ্মবুদ্ধি জাগ্রত করিতে হইবে, তখন প্রকারান্তরে স্বীকার করা হইতেছে যে, অদ্বৈতের মধ্যেও দ্বৈত রহিয়াছে। কেন না, যিনি পূর্ণব্রহ্ম পরাৎপর তিনি অনাদি অনন্তকাল জানিতেছেন যে তিনি ব্রহ্ম। আর জীবকে অনেক সাধন, অনেক তপস্যা করিয়া জানিতে হইবে যে তিনি ব্রহ্ম, জীবে ব্রহ্মবুদ্ধি অনেক তপস্যার ফল। আর পরমাত্মার ব্রহ্মবুদ্ধি নিত্যসিদ্ধ। ইহা কি দ্বৈতভাব নহে? সুতরাং অদ্বৈতবাদ না বলিয়া ইহাকে দ্বৈতাদ্বৈতবাদ বলাই ভাল।

শঙ্করের আর একটি কথার প্রতিবাদ আবশ্যক। সে কথাটি এই যে, আত্মা ও পরমাত্মা যখন সমগুণান্বিত পদার্থ, তখন এ দুই নিশ্চয় এক। এস্থলে বিবেচ্য বিষয় এই যে, সমগুণান্বিত হইলেই কি এক হয়? জগতে সমগুণান্বিত পদার্থ কি অনেক নাই? কিন্তু সেই সকল কি সকল স্থলে এক? কখনই না। যেমন মনে কর, এক ঘটি জল। তাহার পার্শ্বে আর এক ঘটি জল। এই দুই ঘটি জল, সমগুণান্বিত পদার্থ। এই দুই ঘটি জল সমগুণান্বিত বলিয়া কি এক হইতে পারে? * সেই আত্মা ও পরমাত্মা, সমগুণান্বিত বলিয়া এক এ যুক্তি বলবৎ বলিয়া মনে হয় না। এই যুক্তির উপরেই যদি তাঁহার অদ্বৈতবাদ প্রতিষ্ঠিত হইত, তাহা হইলে, বুদ্ধিমান লোকে উহা কখনই গ্রহণ করিতে পারিতেন না। তবে অন্য যুক্তি অবশ্য আছে। অন্য যুক্তি আছে বলিয়াই আমরা তাঁহার অদ্বৈতবাদ স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছি।

সে অন্য যুক্তি কি? তাহাও বলিয়াছি। কিন্তু সে অন্য যুক্তি শঙ্করের নিজের নহে। তাহা জর্ম্মান দেশীয় পণ্ডিত হিগেলের। † সে যুক্তি, এই প্রবন্ধে পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। পুনরুল্লেখ অনাবশ্যক। শঙ্কর যে অদ্বৈতবাদের প্রধান প্রচারক, তিনি উহার ভিত্তিমূল দৃঢ়বদ্ধ করিতে পারেন নাই। একবারে পারেন নাই এমন বলিতেছি না। হিগেল যেমন করিয়াছেন তেমন পারেন নাই। শঙ্কর বলেন, ব্রহ্মশক্তি হইতে জগৎ, কিন্তু শক্তি বলিলেই শক্তিমান্ বুঝায়। সুতরাং শক্তি হইতে জগৎ হইয়াছে বলিলেই শক্তিমান্ হইতে জগৎ। শক্তি জগৎরূপে পরিণত হইয়াছে বলিলে, শক্তিমান্ জগৎরূপে পরিণত হইয়াছেন বলিতে হয়। ইহাই শঙ্করের যুক্তি। কিন্তু আমার বিবেচনায় হিগেলের যুক্তি ইহা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। হিগেল জীবাত্মার জ্ঞান ও পরমাত্মার জ্ঞান, এই উভয়ের একত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছেন। জ্ঞানের একত্ব প্রতিপন্ন করাতে কি উভয়ের বাস্তবিক একত্ব প্রতিপন্ন করা হইল না? জীবাত্মা ও পরমাত্মা উভয়ই জ্ঞান পদার্থ। জ্ঞানই তাঁহাদের স্বরূপ। সুতরাং উভয়ের জ্ঞানের একত্ব সিদ্ধান্ত করাতে কি তাঁহাদের স্বরূপের একত্ব সিদ্ধান্তিত হইল না?

শঙ্করের যুক্তি মন্দ নয়, আমরা স্বীকার করি, কিন্তু হিগেলের যুক্তি তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কিন্তু শঙ্করের সমগুণান্বিত পদার্থ সম্বন্ধীয় যে যুক্তি তাহার বল আমরা কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। শঙ্করের প্রথম যুক্তি, এবং হিগেলের যুক্তি এক করিয়া একটা প্রবলতর যুক্তি গঠিত হয়। কিন্তু শঙ্করের দ্বিতীয় যুক্তির বল আমরা কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। নগেন্দ্র বলেন বুঝিতে পারিলাম না। আমি বলি ভুল বলিয়া মনে করি। গঙ্গা ও যমুনা সমগুণান্বিত পদার্থ। উভয়ে মিলিয়া এক হইল। আবার উভয়ে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতেও পারে। তবেই হইল, যে, তাহারা স্বরূপতঃ এক নহে। সমগুণান্বিত পদার্থ সম হইতে পারে, কিন্তু এক হইবে কেমন করিয়া?

শঙ্কর দর্শনের দুই একটি ভ্রান্তি প্রদর্শন করিয়া, আমি এক্ষণে জর্ম্মান দার্শনিক হিগেলের সহিত তাঁহার

* দেশ ও কালের অনুরোধে পৃথক্ বলিয়া বিবেচিত হইলেও বস্তুতঃ এক। সং সং।

† বহুকালের পরবর্ত্তী হিগেলের যুক্তি শঙ্কর কিরূপে প্রাপ্ত হইলেন? সং সং।

তুলনা করিব। শঙ্কর ও হিগেল দুইজনই অতি উচ্চ শ্রেণীর দার্শনিক, ইহাতে লেশমাত্র সংশয় নাই। শঙ্করের বিশেষ অদ্বৈতবাদের দিকে তাঁহার মনের প্রবল গতি। হিগেলের বিশেষ এই অদ্বৈতবাদের মধ্যে দ্বৈতভাব প্রদর্শন। আমি হিগেল দর্শনের এই বিশেষ ভাবটি ব্যাখ্যা করিব। আমার জীবদ্দশায় আমি হিগেলের লিখিত গ্রন্থ পাঠ করি নাই। তাহার কারণ তখন হিগেল জন্ম গ্রহণ করেন নাই। ক্যাণ্ট আমার সমসাময়িক লোক। কিন্তু তখন ক্যাণ্টের গ্রন্থ ইংরেজী ভাষায় অনুবাদিত হয় নাই আর আমিও জর্ম্মান ভাষা জানিতাম না।

এখন হিগেল দর্শনের বিশেষত্ব প্রদর্শনে প্রবৃত্ত হই। হিগেলের মতে জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন। জীব ব্রহ্মেরই প্রকাশ। কিন্তু এই অভেদের মধ্যেও ভেদ আছে। সেই ভেদ কি একটি একটি করিয়া দেখাইব। প্রথম, পরমেশ্বর নিত্যসিদ্ধ। জীবের সিদ্ধিলাভ কাল-সাপেক্ষ। শঙ্করের মতে সকলই ব্রহ্ম। আমি ব্রহ্ম, তুমি ব্রহ্ম, সকলই ব্রহ্ম। তবে সেই যে ব্রহ্মবুদ্ধি, তাহা আমাদের নাই। না থাকিবার কারণ মায়া। মায়া কি? "অব্যক্তনাম্নী পরমেশশক্তিঃ।" মায়া, পরমেশ্বরের অব্যক্ত শক্তি। মায়া যদি পরমেশ্বরের অব্যক্ত শক্তি হইল, তবে এই মায়া কেমন করিয়া ব্রহ্মকে অজ্ঞানান্ধকারে ডুবাইয়া রাখে? আমি ব্রহ্ম, তুমি ব্রহ্ম, সকলই ব্রহ্ম, আমরা সকলেই ব্রহ্ম। তবে কেন আমরা অজ্ঞানান্ধকারে নিমজ্জিত? শঙ্কর ইহার ঐ এক উত্তর দিয়াছেন যে, আমরা ব্রহ্মের প্রকাশ হইলেও ব্রহ্ম শক্তিদ্বারা আমাদের জ্ঞান আচ্ছন্ন।

এখন প্রশ্ন এই যে, যে ব্রহ্মের প্রকাশ, আর স্বয়ং ব্রহ্ম এক কি না? যদি এক হয়, তবে ব্রহ্ম ও ব্রহ্মের প্রকাশ সমানই হইল। তাহা হইলে, ব্রহ্ম, নিজ শক্তি দ্বারা কেমন করিয়া আচ্ছন্ন হইবে? আমার শক্তি দ্বারা আমি কি অজ্ঞানাভিভূত হইতে পারি? যিনি পূর্ণব্রহ্ম, তিনি মায়াতীত। তবে জীব আর পূর্ণব্রহ্মে অনেক প্রভেদ। সমান হয় কেন? নিশ্চয়ই সমান বলা হইতেছে, নতুবা 'সোঽহং' বলিতে বলিতে জীবের ব্রহ্ম বুদ্ধি কেমন করিয়া হইবে?

'সোঽহং' অর্থ সেই আমি। তাহা হইলেই কি বলা হইল না যে সে আর আমি সমান? তিনিই জীব হইয়াছেন, ইহাই শঙ্করের মত। তিনিই যদি জীব হইলেন, তাহা হইলে, তিনি এক; জীব অসংখ্য বলিতেই হইবে, তিনি অসংখ্যরূপ ধারণ করিয়াছেন। প্রত্যেক জীব যদি ব্রহ্মের সঙ্গে সমান হয়, অর্থাৎ প্রত্যেক জীব যদি পূর্ণব্রহ্মের প্রকাশ হয়, তাহা হইলে যে বহু ব্রহ্ম হইয়া গেল। আমি ব্রহ্ম, তুমি ব্রহ্ম, প্রত্যেক জীব এক এক ব্রহ্ম, তাহা হইলে ব্রহ্মের একত্ব কেমন করিয়া থাকে? যত জীব, তত ব্রহ্ম হয়। 'একমেবাদ্বিতীয়ং এই বেদবাক্যের সহিত কেমন করিয়া সামঞ্জস্য থাকে? এযুক্তি অখণ্ডনীয়। *

আর একটি কথা এই যে, যিনি পূর্ণ, তিনি কেমন করিয়া অপূর্ণ হইবেন? জীব অপূর্ণ, একথা সকলেই স্বীকার করেন। জীব যদি অপূর্ণ, তবে জীব কেমন করিয়া ব্রহ্ম হইল? বলিতে পার, সাধন করিতে করিতে জীব পূর্ণ হইবে। তবে যত লোক সাধন করিয়া সিদ্ধ হইবে, সকলেই প্রত্যেক পূর্ণব্রহ্ম হইবে। কয়টা পূর্ণ-ব্রহ্ম হইবে। পূর্ণব্রহ্ম একই থাকিতে পারে। পূর্ণপদার্থ কখনই দুই হয় না। কিন্তু যত লোক সাধন করিয়া সিদ্ধ হইবে, সকলেই যদি পূর্ণ হয়; তাহা হইলে, এক পূর্ণ পদার্থ তো হইল না, বহু পূর্ণপদার্থ হইয়া গেল। † ইহা কি অসম্ভব নহে? এমন সহজ কথাটা লোক বুঝিতে পারে না, ইহাই আশ্চর্য্য।

ক্রমে আমরা শঙ্কর দর্শনের আরও কয়েকটা দোষ দেখাইব। 'সোঽহং' বলিলে, তাহার অর্থ হইল, আমি সেই। আমি যদি সেই হইলাম, তাহা হইলে, অবশ্য বলিতে হইবে যে, সে যেমন পূর্ণ, আমিও সেইরূপ পূর্ণ। কিন্তু আমার পূর্ণতা কোথায়? সে অসীম ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্ত্তা। আমি একতৃণকণাও সৃষ্টি করিতে পারি না। সে অসীম শূন্যকে পূর্ণ করিয়া রহিয়াছে, আমি জগতের একটি স্থানে বদ্ধ। সে যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে

* ইহার প্রতিবাদ অনাবশ্যক। সং সং।

† অসংখ্য নদ নদী সাগরে প্রবিষ্ট হইয়া সাগরস্বরূপ হইয়া গেল; কিন্তু তাই বলিয়া সাগর কি বহুত্ব প্রাপ্ত হইল? সং সং।

পারে, আমি তাহার ইচ্ছা ব্যতীত কিছুই করিতে পারি না। তবে কেমন করিয়া বলিব আমি সেই।

আর একটি কথা। শঙ্কর বলেন যে, জীবাত্মা ও পরমাত্মা সমগুণান্বিত। সুতরাং পরস্পর মিলিত হইলে এক হইয়া যাইবে। পরমাত্মা যখন সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বগত, তখন অবশ্য জীবাত্মার সঙ্গে এক হইয়া গিয়াছেন। দুই নদী পরস্পর মিলিত হইলে, যেমন এক হইয়া যায়। দৃষ্টান্তটি শঙ্করের নহে, আমার। অথবা নগেন্দ্রের। তিনি গঙ্গা যমুনার দৃষ্টান্ত দিয়াছিলেন। এ কথার উত্তর এই যে, গঙ্গা যমুনা, সমগুণান্বিত বলিয়া যেমন এক হইতে পারে, সেইরূপ বিচ্ছিন্নও হইতে পারে পরমেশ্বরের ইচ্ছায় মিলিতে পারে, এবং তাঁহার ইচ্ছায় বিচ্ছিন্নও হইতে পারে।

আর একটি কথা বলিয়া এ প্রবন্ধ শেষ করিব। আমাদের দেশের শঙ্কর ও জর্ম্মান দেশের হিগেল; এই দুই জনের দর্শন সমালোচনা করিলে সুস্পষ্ট বুঝা যায় যে, হিগেল যাহা বলিয়াছেন, তাহাই অনেক অংশে যুক্তি-যুক্ত। হিগেল বলেন, যে জীব পরমাত্মার পরিমিত প্রকাশ। পরমাত্মা কেমন করিয়া পরিমিত হইলেন, তাহা আমরা বুঝিনা। কখন বুঝিবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু আমরা যে বাস্তবিক তাঁহারই প্রকাশ, তাহাতে সংশয় নাই। পরিমিত প্রকাশ বলিলে অনেক আপত্তি নিরাকরণ হয়। আমরা শঙ্করের মতে পূর্ব্বে যে সকল আপত্তি করিয়াছি সকলই খণ্ডিত হইতে পারে। কিন্তু পূর্ণ প্রকাশ না বলিয়া পরিমিত প্রকাশ বলা আবশ্যক। শঙ্কর অদ্বৈতবাদ সমর্থন করেন। হিগেল দ্বৈতাদ্বৈত মত সমর্থন করেন। আমাদের বিবেচনায় দ্বৈতাদ্বৈত মতই অধিকতর যুক্তিসিদ্ধ।

জীব, পরমাত্মার পরিমিত প্রকাশ এ কথা বলিলে আপত্তি করিবার আর কিছুই থাকে না। জীবেও পরব্রহ্মে ভেদ ও অভেদ উভয়ই আছে। অভেদ কিসে? না জীবের সত্তা ও পরমাত্মার সত্তা, এক সত্তা দুই সত্তা নহে। আর কিসে? না, পরমাত্মার শক্তি আর জীবের শক্তি এক, জীব আর কিছুই নহে, পরমাত্মার পরিমিত প্রকাশ। সুতরাং সেই আমি বলিবার অধিকার রহিল না।

তার পর ভেদ কিসে? ভেদ অনেক বিষয়ে। তিনি উপাস্য, আমি উপাসক। তিনি ভক্তিভাজন, আমি ভক্ত। তিনি পিতা, আমি পুত্র। তিনি উৎস, আমি নদী। তিনি বীজ, আমি বৃক্ষ। তিনি কারণ, আমি কার্য্য। তিনি আমার প্রাণ, তিনি আমার আশ্রয়, তিনি আমার সর্ব্বস্বধন। আমার নিজের কিছুই নাই। আমি আপনি আপনার নহি, তাঁহার। তবে কেমন করিয়া বলিব, 'সোঽহং।'

শঙ্কর ও হিগেল এই দুইজনের মধ্যে হিগেলের মতই শ্রেষ্ঠ। ইহাতে পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার যে সকল সম্বন্ধ সকলই রক্ষা পায়। তবে শঙ্করের দর্শনের গভীরতা ও প্রশস্ততা অতি চমৎকার। অদ্য এই পর্য্যন্ত।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। *

আয়ুর্ব্বেদ ও আধুনিক রসায়ন।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

(৪)

স্বর্ণের মারণ—স্বর্ণকে মারিত করিবার জন্য অনেকগুলি মতান্তর ও প্রক্রিয়া আছে, তাহার মধ্যে যেটি সচরাচর ব্যবহৃত হয় তাহার আলোচনা করা যাইবে।

সুবর্ণকে অতি সূক্ষ্মপাত করণানন্তর দ্বিগুণ পরিমাণ পারদের সহিত মিশ্রিত করিয়া উহাকে অম্লরস দ্বারা মর্দ্দন করিবে, তৎপর পিণ্ডাকৃতি করিয়া উভয়ের সম পরিমাণ গন্ধকচূর্ণ ঐ গোলকের অধঃ ও উর্দ্ধদেশে প্রদান করিবে। অনন্তর মূষা মধ্যে ঐ পিণ্ডাকৃতি পদার্থ রাখিয়া বস্ত্রখণ্ড ও সজল মৃত্তিকাদ্বারা লেপন পূর্ব্বক উত্তমরূপে রুদ্ধ করিবে। তদনন্তর ৩০ খানা বিলঘুঁটে-দ্বারা পুটপাক করিবে। এইরূপে চতুর্দ্দশ বার পুটপাক

* পূর্ব্ব কি পশ্চিম বাঙ্গালাবাসিগণের মধ্যে কেহ যদি এই প্রবন্ধের উত্তর দেন, তাহার প্রত্যুত্তর দিতে আমি প্রস্তুত আছি।

করিবে এবং প্রত্যেক পাকেই গন্ধকদ্বারা লিপ্ত করিয়া পুট দিতে হইবে। এই নিয়মে পাক করিলে সুবর্ণ নিরুথ ভস্ম হয় অর্থাৎ ঐ ভস্মীভূত স্বর্ণ আর পুনরায় প্রকৃতিস্থ হইতে পারে না। *

উপরিউক্ত প্রক্রিয়ার প্রথমে সুবর্ণ ও পারদে মিশ্রিত হইয়া মিশ্রধাতু (amalgam) উৎপন্ন হয়। পরে পারদ ও গন্ধক সংযুক্ত হইয়া কজ্জলীতে পরিণত হয় এবং বার বার পুটপাক কালে উর্দ্ধগামী হইয়া যায়। ফলে স্বর্ণ সূক্ষ্ম গুঁড়া অবস্থায় নিম্নে পড়িয়া থাকে। †

আজ কাল অনেক কবিরাজ মহাশয়েরা স্বতন্ত্র জারিত স্বর্ণ প্রস্তুত করেন না। স্বর্ণঘটিত মকরধ্বজ প্রস্তুত কালে যে স্বর্ণভস্ম বোতলের নিম্নে পড়িয়া থাকে তাহাই ব্যবহার করিয়া থাকেন। সেখানেও একই রাসায়নিক ক্রিয়া সাধিত হইয়া থাকে। কজ্জলী মকরধ্বজ আকারে উর্দ্ধগামী হয় এবং স্বর্ণ সূক্ষ্ম গুঁড়া অবস্থায় নিম্নে পড়িয়া থাকে।

জারিত স্বর্ণের রাসায়নিক বিশ্লেষণ—ডাক্তার ওয়াইজ স্বর্ণভস্মকে অক্সাইড্ অব গোল্ড (oxide of gold) মনে করিয়াছেন। ‡ কিন্তু বাস্তবিক উহা অক্সাইড্ নহে। আমি দুইটি নমুনা পরীক্ষা করিয়াছি।

প্রথম। দেখিতে হরিদ্রাভ, খুব সূক্ষ্ম। কতক অংশ জলের উপর "হংসবৎ সমুত্তরতি"। পারদ নাই। গন্ধক নাই। নাইট্রিক বা হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডে (Nitric বা Hydrochloric acid) দ্রবণীয় নহে। নাইট্রো-হাইড্রো-ক্লোরিক অ্যাসিডে (aqua regia) সম্পূর্ণ দ্রবণীয়। উহা যে স্বর্ণের সূক্ষ্ম গুঁড়া ভিন্ন আর কিছুই নহে তাহা এগেটের বা পাথরের খলে মাড়িয়া দেখিলেই সহজে উপলব্ধি হইবে। খলে খানিকক্ষণ মাড়িলে উজ্জ্বল সাধারণ স্বর্ণের ন্যায় উহা চক্‌চক্‌ করিতে থাকে। ভাবপ্রকাশ বলিয়াছেন যে স্বর্ণভস্ম নিরুথ হইয়া থাকে অর্থাৎ উহাকে আর স্বর্ণে পরিণত করা যায় না। ওরূপ ধারণা নিতান্ত ভ্রমাত্মক, বলা বাহুল্য অতি অনায়াসে স্বর্ণভস্মকে সাধারণ স্বর্ণে পরিণত করা যায়।

দ্বিতীয়। দেখিতে প্রথম নমুনা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ধূসর বর্ণের। পারদ বা গন্ধক নাই। ইহার অতি সামান্য অংশ নাইট্রিক বা হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডে দ্রবণীয় ছিল। ইহা হইতে বুঝা যায় যে কিঞ্চিৎ অক্সাইড্ অব গোল্ড মিশ্রিত ছিল। খুব বেশী অংশ কেবল নাইট্রো-হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডে দ্রবণীয়। ইহাকেও এগেটের (agate) বা পাথরের খলে মাড়িলে চক্‌চকে সাধারণ স্বর্ণে পরিণত হয়। অতএব ইহাও সূক্ষ্ম স্বর্ণের গুড়া ভিন্ন আর কিছুই নহে, কিঞ্চিৎ অক্সাইড্ অব গোল্ড মিশ্রিত আছে।

স্বর্ণপর্প্পটী।

স্বর্ণপর্প্পটী—স্বর্ণের কোনও নূতন যৌগিক (compound) নহে। উহা সূক্ষ্ম স্বর্ণ, কজ্জলী ও অবিকৃত (free) গন্ধকের একটি মিশ্রণ (mixture)। "হিঙ্গুলোত্থ পারদ ৮ তোলা ও স্বর্ণ ১ তোলা পরিমাণে গ্রহণপূর্ব্বক উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া মিশ্রিত করতঃ তৎসহ ৮ তোলা গন্ধক মিশাইয়া লৌহ পাত্রে দৃঢ়রূপে মর্দ্দনপূর্ব্বক কজ্জলী প্রস্তুত করিয়া রসপর্প্পটীর বিধিমতে পর্প্পটী প্রস্তুত করিলে তাহাকে স্বর্ণপর্প্পটী বলা যায়।" *

রাসায়নিক বিশ্লেষণ—দেখিতে কৃষ্ণবর্ণ ছোট ছোট খণ্ড। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে উহার উপাদান—(১) সূক্ষ্ম স্বর্ণের গুঁড়া, (২) কজ্জলী (black sulphide of mercury), (৩) অবিকৃত গন্ধক। পারদের সমপরিমাণ গন্ধক লওয়া হয় বলিয়া অবিকৃত গন্ধকের ভাগ খুব বেশী, কারণ পারদ উহার ওজনের ছয় ভাগের

* ভাবপ্রকাশ, পূর্ব্বখণ্ড—৬১২ পৃঃ।

† অধ্যাপক রায় মহাশয় বলিয়াছেন (History of Hindu chemistry Vol I. P. 59) যে "the gold is in reality converted into the sulphide and afterwards into metallic gold in a fine state of powder" কিন্তু বাস্তবিক স্বর্ণ ও গন্ধক সংযুক্ত হইয়া সাল্‌ফাইড্ হয় না (See Roscoe and schorlemmre's treatise on Chemistry, metals. Vol. II. Gold and Sulphur do not combine directly).

* Wise : commentory on the Hindu System of Medicine P. 121.

* রসেন্দ্রসারসংগ্রহ—স্বর্ণপর্প্পটী,—১৪১ পৃঃ।

একভাগ মাত্র গন্ধকের সহিত সংযুক্ত হয়। যাহা হউক পর্প্পটী প্রস্তুতকালে সাবধান হইতে হইবে যেন সমস্ত পারদই গন্ধকের সহিত সংযুক্ত হয়, নচেৎ পারদ অবিকৃতভাবে থাকিলে বিষক্রিয়া করিবে।

তাম্র।

প্রাচীন ইতিহাস—পূর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছে।

ধাতুপ্রস্তুত ক্রিয়া (metallurgy)—তান্ত্রিক গ্রন্থ সমূহ পাঠ করিলে বেশ বুঝা যায় যে তাম্র (১) তুঁতে, (২) মাক্ষিক ও (৩) বিমল হইতে রাসায়নিক উপায়ে প্রস্তুত হইত।

(১) **তুত্থক** (তুঁতে, copper sulphate)—"তুঁতের ওজনের চতুর্থাংশ সোহাগা মিশাইয়া করঞ্জের তৈলে একদিবস ভিজাইয়া রাখিবে। পরে বদ্ধমূষায় কাঠের কয়লার অগ্নিতে দগ্ধ করিবে। এইরূপে ইন্দ্রগোপের ন্যায় সুন্দর লালরঙ্গের সত্ব (অর্থাৎ তাম্র) পাওয়া যাইবে।" *

(২) **মাক্ষিক** (pyrites)—বৈদ্যকে দুই প্রকার মাক্ষিকের উল্লেখ আছে—স্বর্ণমাক্ষিক ও রৌপ্যমাক্ষিক। আধুনিক কবিরাজ মহাশয়েরা যে দ্রব্য স্বর্ণমাক্ষিক ও রৌপ্যমাক্ষিক বলিয়া ব্যবহার করেন তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি তাহাতে তাম্র আদৌ নাই লৌহ আছে। অতএব উহারা copper pyrites নহে, iron pyrites। এই মাক্ষিক লইয়া গোলমাল হইবার কারণ এই যে তাম্র এবং লৌহ দুই ধাতুরই মাক্ষিক আছে। লৌহ মাক্ষিকের স্বর্ণ ও রৌপ্য সদৃশ প্রকারান্তর আছে, এবং তাম্রের মাক্ষিকের রংও স্বর্ণের ন্যায়। এখন উভয়কে স্বর্ণমাক্ষিক বলিলে বস্তু নির্ণয়ে ভ্রান্তি আসিবে। এই ভ্রান্তি নিবারণ করিতে হইলে এই মাক্ষিকগুলির নামের পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। আমার মতে নিম্নলিখিত নামকরণ করিলে বস্তু নির্ণয়ের সুবিধা হইবে, নহিলে লৌহের স্থানে তাম্র বা তাম্রের স্থানে লৌহ ব্যবহার অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়িবে। "মাক্ষিক" শব্দ সাধারণ নাম থাকুক। মাক্ষিক দুই প্রকার—"তাম্রমাক্ষিক" (copper pyrites) এবং "লৌহমাক্ষিক" (iron pyrites)। প্রথমটিতে তাম্র ও লৌহ দুইই আছে, অপরটিতে কেবল লৌহ আছে। আবার বর্ণভেদে উহারা "শ্বেত" বা "পীত" পদবাচ্য হইবে, যথা,—পীত বর্ণের লৌহমাক্ষিককে "পীত লৌহমাক্ষিক" এবং শ্বেত বর্ণের লৌহমাক্ষিককে "শ্বেত লৌহমাক্ষিক" বলা যাইবে। কোন্ মাক্ষিকে লৌহ বা তাম্র অথবা দুইই আছে, তাহা রাসায়নিক পরীক্ষায় স্থির করিতে হইবে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে ভাবপ্রকাশ * স্বর্ণমাক্ষিকে "কিঞ্চিৎ সুবর্ণ" ও রৌপ্যমাক্ষিকে "কিঞ্চিৎ রজত" আছে বলিয়াছেন তাহা ঠিক নহে।

তাম্রমাক্ষিক হইতে পুরাকালে নিম্নলিখিত উপায়ে তাম্র আহৃত হইত:—"মাক্ষিককে বারম্বার মধু, গন্ধর্ব্বের তৈল, গোমূত্র, ঘৃত এবং কদলীমূলের রসে নিষিক্ত করিয়া মূষার মধ্যে মৃদুভাবে দগ্ধ করিলে তাম্রের রংবিশিষ্ট সত্ব প্রাপ্ত হওয়া যায়।" † এই উপায়ে অবশ্য বিশুদ্ধ তাম্র প্রাপ্ত হওয়া যাইবে না, কারণ তাম্রমাক্ষিকে তাম্র ও লৌহ দুইই আছে। আজকালও তাম্রমাক্ষিক হইতে তাম্র উৎপন্ন হয় কিন্তু এই লৌহকে দূরীভূত করিতে বিশেষ প্রক্রিয়ার সাহায্য লওয়া হইয়া থাকে।

(৩) **বিমল**---কোন্ দ্রব্যকে বিমল বলা যাইতে পারে তাহা সঠিক নির্ণয় করা কঠিন। যখন বিমল হইতে তাম্র আহৃত হইত তখন উহা তাম্রমূলক কোন

---

* সস্যকস্য তু চূর্ণং তু পাদসৌভাগ্যসংযুতম্।
করঞ্জতৈলমধ্যস্থং দিনমেকং নিধাপয়েৎ॥
মধ্যস্থমন্ধমূষায়াং ধ্মাপয়েৎ কোকিলত্রয়ম্।
ইন্দ্রগোপাকৃতি চৈব সত্বং ভবতি শোভনম্॥
রসরত্নসমুচ্চয়, দ্বিতীয় অধ্যায়,—১৩৩—১৩৪।

* ভাবপ্রকাশ, পূর্ব্বখণ্ড,—৪২৪ পৃঃ।

† ক্ষৌদ্রগন্ধর্ব্বতৈলাভ্যাং গোমূত্রেণ ঘৃতেন চ।
কদলীকন্দসারেণ ভাবিতং মাক্ষিকং মুহুঃ।
মূষায়াং মুঞ্চতি ধ্মাতং সত্বং শুল্বনিভং মৃদু॥
রসার্ণব, সপ্তম অধ্যায়,—১২-১৩।
ও রসরত্নসমুচ্চয়, দ্বিতীয় অধ্যায়,—৮৯-৯০

খনিজ (ore) পদার্থ হইবে। কেহ কেহ উহাকে রৌপ্যমাক্ষিক বলিয়াছেন।‡ আমার মনে হয় উহা copper glance নামক খনিজ পদার্থ। রসরত্নসমুচ্চয়কার বলিয়াছেন বিমল তিন প্রকার, স্বর্ণ, রৌপ্য ও পিত্তলের বর্ণযুক্ত। উহা গোলাকার, কোণ সংযুক্ত এবং ফলকান্বিত।* এই বর্ণনা তাম্রমাক্ষিক ও copper glance এই দুই খনিজের সহিতই কতক কতক মিলে। কিন্তু যখন তাম্রমাক্ষিকের স্বতন্ত্র নাম ও বর্ণনা রহিয়াছে, তখন বুঝিতে হইবে বিমল তাম্রমাক্ষিক নহে। অতএব উহাকে copper glance বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

বিমল হইতে নিম্নলিখিত উপায়ে তাম্র প্রস্তুত হইত :—

(ক) বিমলকে সোহাগা, কুচের রস, এবং মেষশৃঙ্গীর ভস্মের সহিত পিশিয়া মুষার মধ্যে পাক করিলে স্বর্ণের রঙের সত্ত্ব পাওয়া যায়। †

(খ) "বিমলকে ফটকিরি, হিরাকস, সোহাগা, শিগ্রুবৃক্ষের রস, কদলীবৃক্ষের রসে নিষিক্ত করিয়া মোক্ষক বৃক্ষের ক্ষারের সহিত মিশাইবে, পরে বদ্ধ মুষায় দগ্ধ করিলে চন্দ্রার্ক সদৃশ সত্ত্ব পাওয়া যায়।

এই সকল ধাতু প্রস্তুত প্রক্রিয়া অতি সংক্ষেপে দুই একটি সূত্রে লিখিত হইয়াছে। তাহা হইতে উহাদের বিস্তৃত বিবরণ ও রাসায়নিক ক্রিয়া অনুমান করা কঠিন। আমার বোধ হয় যে সকল গাছ গাছড়ার রস এই সকল প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা হইতে পুড়িয়া কেবল অঙ্গার (carbon) তাম্র প্রস্তুত করে সহায়তা করে। ‡ এবং কদলীর রস পুড়িয়া যে ক্ষার উৎপাদন করে সেই ক্ষারও (alkali carbonate) উহার সহায়তা করে। অঙ্গার ও ক্ষার পদার্থ খনিজ দ্রব্য হইতে ধাতু প্রস্তুত করে সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

‡ রসেন্দ্রসারসংগ্রহ, বিমলশুদ্ধি,—৪০ পৃঃ।

* বিমলস্ত্রিবিধঃ প্রোক্তো হেমাদ্যস্তার পূর্ব্বকঃ।
তৃতীয়ঃ কাংস্যবিমলস্তত্তৎকান্ত্যা স লক্ষ্যতে ॥
বর্ত্তুলঃ কোণসংযুক্তঃ স্নিগ্ধশ্চ ফলকান্বিতঃ।
রসরত্নসমুচ্চয়, দ্বিতীয় অধ্যায়—৯৬-৯৭।

† সটঙ্কণকুচম্রাবৈমে্ষশৃঙ্গ্যাশ্চ ভস্মনা।
পিষ্ট্বা মূষোদরে লিপ্তঃ সংশোষ্য চ নিরুধ্য চ ॥
ষট্প্রহরকোকিলৈর্ধ্মাতো বিমলঃ শীতসম্ভিতঃ।
সত্ত্বং মুঞ্চতি তদ্যুক্তো রসঃ স্যাৎ স রসায়নঃ ॥
ঐ, ১০১-১০২।

‡ বিমলং শিগ্রুতোয়েন কাক্ষীকাসীসটংকণৈঃ।
বজ্রকন্দসমাযুক্তং ভাবিতং কদলীরসৈঃ ॥
মোক্ষকক্ষারসংযুক্তং ধ্মাপিতং মূকমূষগম্।
সত্ত্বং চন্দ্রার্কসংকাশং পতেচ্চতি ন সংশয়ঃ ॥ ঐ, ১০৩-১০৪।

তাম্রসংযোগে অগ্নিশিখার রং (flame colouration)—তাম্র বা তাহার কোনও যৌগিক অগ্নিশিখায় ধরিলে সেই শিখা নীলবর্ণে রঞ্জিত হয়। রসরত্নসমুচ্চয়ও বলিয়াছেন "শুল্বে নীলনিভা"।

তাম্রের শোধন—তাম্রকে "শোধিত" করিবার জন্য কয়েকটি মতান্তর প্রক্রিয়া আছে :—

(ক) "তাম্রের অতি সূক্ষ্ম পাত করিয়া অগ্নিতে পোড়াইবে, পরে উহা জ্বলন্ত অঙ্গারবৎ তপ্ত থাকিতে থাকিতে তৈল, তক্র, কাঞ্জি, গোমূত্র এবং কুলত্থকলায়ের কাথ, এই কয়েক দ্রব্যের প্রত্যেকটিতে তিন তিন বার করিয়া নিমগ্ন করিলে তাম্র বিশুদ্ধ হয়" *। এই প্রক্রিয়ায় তাম্রকে অগ্নিবৎ উত্তপ্ত করিবার সময় তাম্র খানিকটা করিয়া কপার অক্সাইডে (Copper oxide) পরিণত হইবে। উহাকে তৈল, তক্র প্রভৃতিতে নিমজ্জিত করিবার অর্থ বুঝিতে পারিলাম না।

(খ) "সৈন্ধব লবণ আকন্দক্ষীরসহ মর্দ্দন পূর্ব্বক তদ্দ্বারা তাম্রপত্র লেপন করতঃ অগ্নিতে সন্তপ্ত করিয়া নিসিন্দার রসে নিক্ষেপ করিবে। এইরূপে সাতবার করিলে তাম্র শোধিত হয়" †, এই প্রক্রিয়ায় প্রথমে সম্ভবতঃ লবণ সংযোগে কপার ক্লোরাইড (Copper chloride) প্রস্তুত হয়, পরে বার বার উত্তপ্ত করিলে কপার অক্সাইডে (Copper oxide) পরিণত হয়।

তাম্র মারণ—তাম্রকে সম্যকরূপে মারিত না করিলে তাম্র বিষক্রিয়া করিয়া থাকে। তাম্রকে মারিত করিবার কয়েকটি মতান্তর প্রক্রিয়া আছে। তার সকলটির প্রধান উদ্দেশ্য হইতেছে— তাম্রকে কপার সল্‌ফাইডে (Copper sulphide) পরিণত করা। সেই উদ্দেশ্যে তাম্রের খুব সূক্ষ্মপত্র উহার চারি অংশের এক অংশ পারদ সহিত মিলিত করিয়া দ্বিগুণ গন্ধক সংযোগে

* ভাবপ্রকাশ—তাম্রশোধন।

† রসেন্দ্রসারসংগ্রহ—তাম্রশোধন।

বেশ পেষণ করিয়া দুইখানি সরার মধ্যে পুরিয়া মুখবন্ধ করতঃ পুটপাক করা হয়। বাস্ত্যাদি দোষ দূরীভূত না হওয়া পর্য্যন্ত ওলের মধ্যে পুরিয়া বার বার পুটপাক করা হয়। এই প্রক্রিয়ায় নিম্নলিখিত রাসায়নিক ক্রিয়া সংঘটিত হইয়া থাকে—প্রথমে তাম্র ও পারদে মিলিত হইয়া (Copper amalgam) প্রস্তুত হয়। পরে গন্ধক সহযোগে কপার সলফাইড ও মার্কারি সালফাইডে পরিণত হয়। পুটপাক কালে পারদ ও মার্কারি সাল-ফাইড ঊর্দ্ধগামী হইয়া থাকে এবং সরার নিম্নে কপার সলফাইড পড়িয়া থাকে। বার বার পুটপাক করিবার অর্থ এই যে অবিকৃত তাম্র যেন উহাতে না থাকে, সমস্ত তাম্রই যেন সলফাইডে পরিণত হয়। ওল কি জন্য ব্যবহৃত হয় বুঝিতে পারি নাই।

রাসায়নিক বিশ্লেষণ। ডাঃ উদয়চন্দ্র দত্ত মারিত তাম্রের রাসায়নিক পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে উহা সল্‌ফাইড অব্ কপার (copper sulphide).)। আমি দুইটি নমুনা পরীক্ষা করিয়াছি। দেখিতে খুব কাল। উহারা কিউপ্রাস্ সল্‌ফাইড (cuprous sulphide), কিউপ্রিক সল্‌ফাইড (cupric sulphide) নহে।

তাম্র পর্প্পটী।

"পারদ ২ভাগ, গন্ধক ২ভাগ, তাম্রভস্ম ১ভাগ একত্র মর্দ্দন পূর্ব্বক লৌহনির্ম্মিত হাতায় ঘৃতসহ গলাইয়া গোবরের উপরে কলার পাতা পাতিয়া তদুপরি উক্ত গলিত পদার্থ ঢালিয়া গোময় পূরিত কদলীপত্রের পুটলী দ্বারা চাপিয়া পর্প্পটী প্রস্তুত করিবে। অতঃপর উহা চূর্ণ করিয়া বামনহাটী মুণ্ডিরী, বকফুলের পাতা, ত্রিফলা, জয়ন্তী নিসিন্দা, ত্রিকটু, বাসক, ঘৃতকুমারী, ও আদা ইহাদের প্রত্যেকের রস দ্বারা সাত বার করিয়া ভাবনা দিয়া তাম্র নির্ম্মিত খর্পরে করিয়া গন্ধ দূর না হওয়া পর্য্যন্ত পুটপাক করিয়া লইবে।" * এই উপায়েও কিউপ্রাস্ সল্‌ফাইড (cuprous sulphide) প্রস্তুত হইবে, পারদ ঊর্দ্ধগামী হইয়া যাইবে এবং গাছ গাছড়া পুড়িয়া কিঞ্চিৎ ভস্মে পরিণত হইবে। অধ্যাপক রায় মহাশয় তাম্রপর্প্পটীর রাসায়নিক বিশ্লেষণ করিয়া উহাকে প্রায় বিশুদ্ধ কিউপ্রাস্ সল্‌ফাইড বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। †

শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী।

* রসেন্দ্রসারসংগ্রহ—তাম্রপর্প্পটী,—২০৮ পৃঃ।

† Ray, History of Hindu Chemistry, Vol. I., p. 144.

হিমালয়

হে সুন্দর হে মহান্ বিধাতার সৃষ্টির গরিমা
নাহি জানি কিরূপেতে গাহিব যে তোমার মহিমা!
কত রূপে কত ভাবে হেরিয়াছি হে গিরি সম্রাট্,
তবু মোর মৌন ভাষা, রুদ্ধ মোর হৃদয় কবাট।
কি বিরাট! কি গম্ভীর! কি নিস্তব্ধ তব চারিধার,
অন্তরের উপভোগ্য, নহে সে যে বাক্যে বলিবার।
ধরিত্রীর অঙ্গ ভেদি উঠিয়াছ তুমি হিমাচল
তুষার-ধবল-দীপ্ত গৌরব-কিরীট ঝলমল।
কে জানে সে কোন্ যুগে ওহে যোগী! ওহে শ্রেষ্ঠঋষি
এমনি আপন ধ্যানে রহিয়াছ অচঞ্চল বসি।
ভীষণ মেঘের মন্দ্র বজ্রের সে প্রলয় আহ্বান,
নির্ঝরের কলরোল বিহগের দিবানিশি গান
তরু পল্লবের পরে পবনের উন্মত্ত নিঃশ্বাস
প্রখর রৌদ্রের করে দগ্ধদেহে অকম্পিত ত্রাস!
একি শান্তি! একি তৃপ্তি! একি তীব্র অশনি নয়নে
তবু তুমি সঙ্গিহীন আছ রত আপন ধেয়ানে!
শ্যামল বিটপী লতা বেড়িয়াছে হে যোগী তোমায়,
পাষাণে নির্ম্মিত তনু হিয়াও কি গঠিত তাহায়?
তুমি নহ অচেতন তুমি নহ নির্জীব অসার,
তোমার চেতনা অই গরজিছে বজ্রের হুঙ্কার!
এতদিনে চিনিয়াছি বুঝিয়াছি হে গিরি তোমায়
তাই আজি আসিয়াছি তোমারি ও চরণের ছায়।
মেঘমুক্ত নীলাম্বর, এই স্নিগ্ধ প্রভাতের বেলা,
ভক্তিপ্লুত চিতে দেব, বসে আছি একান্ত একেলা।
সংসারের দুঃখ-দৈন্য এত উচ্চে নাহি পশে কাণে,
ক্ষুদ্র সুখ ক্ষুদ্র দুঃখ পড়ে আছে দূর গৃহ-কোণে।

মুক্ত বায়ু ধীরে ধীরে বলিয়াছে হৃদয়ের কথা,
এতদিনে পরিত্রাণ, নাহি তোর আর কোন ব্যথা।
বিলুণ্ঠিত ধূলি মাঝে হিংসা-দ্বেষ পার্থিব জঞ্জাল,
আজি এ হৃদয় মোর হ'য়ে গেছে বিরাট বিশাল।
ও কিও! সৌন্দর্য্য নব, কি মহান্ কনক মণ্ডিত,
তুলিয়াছ গর্ব্বে শির কত উচ্চে কত না উন্নত।
তরুণ-অরুণ-রেখা রঞ্জিয়াছে শুভ্র কলেবর,
মণি-মুক্তা ঝলসিত সুশোভিত ওহে! গিরিবর!
ঊর্দ্ধে নীল নভঃস্থল সরাইয়া জলদ গুণ্ঠনে,
চুমিছে ললাট তব স্নেহময় প্রেম আলিঙ্গনে।
তুমি ভারতের সাক্ষী তুমি তার গৌরব পতাকা,
যত গর্ব্ব, যত বীর্য্য সবি তার তব অঙ্গে লেখা।
তব সুপ্ত গিরি-গৃহে নির্জ্জন সে অরণ্য ছায়ায়,
কত জ্ঞান কত বিদ্যা জেগেছিল নিজ মহিমায়।
জগতের সভ্যতার পূর্ণতার পুণ্য-ইতিহাস,
বেদের সে মহাগীতি হ'য়েছিল তোমাতে বিকাশ।
তুমি তীর্থ, তুমি পুণ্য ভারতের স্বরগের দ্বার,
তব তপোবনে-বনে আজো জাগে বীণার ঝঙ্কার!
সে সঙ্গীতে মুগ্ধ স্তব্ধ সমগ্র এ বিশাল জগৎ।
তুমি রত্ন, রত্নাকর ভারতের গৌরব মহৎ।
বহে গঙ্গা জটা হ'তে, ব্রহ্মপুত্র ধেয়ে নেচে চলে;
শস্যে পূর্ণ বসুন্ধরা শ্যামল অঞ্চল খানি দোলে।
ওহে মৌনি! ওহে মুগ্ধ! তোল আঁখি বল একবার,
অতীত-গৌরব-বাণী সে মহত্ব সে বীর্য্য হুঙ্কার;
কত কীর্ত্তি কত রঙ্গ কত তেজ দেখিয়াছ গিরি,
বল পুনঃ ভীমমন্দ্রে মোরা সবে শুনিয়া শিহরি।
সেই যবে এসেছিল অসভ্যতা অন্ধকারে ঢাকা
অনার্য্যের অধ্যুষিত দেশ মাঝে জ্ঞানালোক মাখা
আর্য্যগণ একে একে লঙ্ঘি গিরি! তব কলেবর,
কাব্যে ছন্দে গেয়েছিল কত স্তুতি গীত মনোহর।
প্রভাতে মিলিত কণ্ঠে আরাধিত দেব বিবস্বানে
মধ্যাহ্নে লাঙ্গল হাতে কর্ষিতেন ভূমি ক্ষুন্নমনে।
তরুচ্ছায়া অন্তরালে নদীতীরে কুটীরের ছায়,
দোহনে নিরত রহি গাভীদের স্নেহ-মমতায়
দুহিতা বনিতা মিলি কত স্বপ্ন করিত রচনা
সে আজ কল্পনা শুধু—হৃদয়ের মরমবেদনা!
সন্ধ্যায় জ্বলিত কুণ্ড, শীত-ভীতি দূরে যেত চলে,
শ্লোকে-ছন্দে কাব্যকথা আলোচিত হতো কুতূহলে।
আজি সে তর্কের কথা, ইতিহাস করিছে রটনা,
পণ্ডিত অঙ্কয় পাতি করিছেন সময় গণনা।
নাহি সেই বৃথাতর্কে এ অজ্ঞের কোন প্রয়োজন,
কল্পনা করেছে সৃষ্টি মোর তরে কনক স্বপন।
হে মায়াবী! রচিয়াছ কি কৌশলে কি যে মায়া-জাল,
এই হাসে দীপ্ত দিবা এই বজ্রে বাজে রুদ্রতাল।
ডালিয়া ঢুলিয়া হাসে আঁখি কোণে সলাজ লালিমা
কতফুল, কতশোভা কত রূপ কোথায় উপমা?
গিরিরাজ! কোথা উমা? বসন্তের মল্লিকার মালা,
কোথায় মেনকা রাণী? স্নেহময়ী তনয়া বৎসলা!
কোথা সেই গিরি-কুঞ্জ? একদিন যার ঘন ছায়
পঞ্চশর ভস্মীভূত ধূর্জ্জটির রোষ গরিমায়!
আজি আমি হেরিতেছি ধ্যান-স্তব্ধ মানস-নয়নে
বসন্তে রচেছে কুঞ্জ ভূধরের নিভৃত গহনে।
চন্দন-সরল-তরু অশোকের স্তবক গরিমা,
চূত-চম্পকের রূপে বকুলের সলাজ মহিমা!
মেঘশ্যাম স্নিগ্ধচ্ছায়া মলয়ের উন্মাদ উচ্ছ্বাস
ময়ূর ময়ূরী নাচে গাহে পাখী ললিত বিভাস।
ধ্যান মগ্ন শিলাসনে বসি যোগী শশাঙ্কশেখর,
রজতগিরির মত শুভ্র দেহ নিস্পন্দ নিথর।
সীমান্ত ভূধর কুঞ্জে গর্জ্জি উঠে প্রপাত ভীষণ,
পুষ্পিত কূজিত কুঞ্জ মধুপের প্রণয় গুঞ্জন,—
জানে না—শোনে না কর্ণে, যোগী রত আপন ধেয়ানে,
পুষ্পশর কি করিছে কার তরে নীরব গহনে।
জানু পাতি করযোড়ে যোগেশ্বর চরণ ছায়ায়
হৃদয়ের প্রেম মালা কে রমণী পরাইতে যায়?
পুষ্প ধনু করে লয়ে হাসিমুখে চঞ্চল মদন
জম্বু কদম্বের কুঞ্জে রচিয়াছে আপন আসন।
কোকিল আকুল কণ্ঠে না গাহিতে প্রথম রাগিণী,
যোগীর হৃদয়ে বাজে পুষ্পশর দুরন্ত অশনি।
জ্বলিল প্রলয় নেত্র-দীপ্ত সূর্য্য করাল ভীষণ,
কোথায় বসন্ত, জায়া? ভস্মীভূত দুরন্ত মদন।

ধ্যানভঙ্গে মত্ত দৃষ্টি. একি রূপ! কে গো অই বালা?
হাসিমুখে বামকণ্ঠে বেঁধে দিল প্রণয়ের মালা।
গীতগানে ভরে গেল গিরীন্দ্রের নিভৃত গহন,
প্রেমের বিজয় বার্ত্তা প্রচারিল নিখিল ভুবন।

* * * *

আর এক দিন যবে বিরহের সুতীব্র অনল
দিকে দিকে রচেছিল মহেশের অশ্রু-দাবানল
কি সে ব্যথা! কি যাতনা! সতীস্কন্ধে গাহিছে শঙ্কর
"কোথা সতি! ওরে সতি! পাগল সে প্রমথ ঈশ্বর।"
প্রতিধ্বনি গাহে বনে প্রণয়ের অনন্ত যাতনা,
পত্নী প্রেমে আত্মহারা উন্মাদের অনন্ত বেদনা!
নির্ঝর নয়ন বারি বয়ে চলে করি ঝর্ ঝর,
স্তব্ধ গিরীন্দ্রের বুক, পাষাণ ও যে কাঁদিয়ে কাতর।
সে ভীষণ শোক-দৃশ্য নয়নের সম্মুখে আমার,
কে যেন গো! এনে দিল মায়া জাল করিয়ে বিস্তার!
কি হেরিছ উর্দ্ধনেত্রে? হে "কাঞ্চন" কার প্রতীক্ষায়,
বর্ষ পরে বর্ষ কাটে দিন গুলি দ্রুত চলে যায়?
সংসারের দুঃখ-দৈন্যে জর্জ্জরিত কাটিছে দিবস,
দাও শান্তি সুশীতল হে যোগীন্দ্র! হে মহাতাপস!
অন্তরের মলিনতা পঙ্কিলতা যাক্ দূরে চলে,
আপনা খুঁজিতে দাও আপনার নিভৃত অতলে।
শোকের প্রলয় ঝড়ে উন্মূলিত সুখ তরুবর,
তাই আজি আসিয়াছি জুড়াইতে তাপিত অন্তর।
বিধাতার মহাসৃষ্টি অনন্তের মহান্ বিকাশ,
আমার প্রাণের নিধি কিরূপে গো! হেথা সুপ্রকাশ!
ক্ষুদ্রত্ব গিয়েছে চলে নিবিয়াছে শোকের অনল,
হৃদয়ে জেগেছে শান্তি বহিতেছে প্রেম পরিমল।
জড়ের ভিতরে অই বিরাজিত রাজরাজেশ্বর,
ওরে মোর মৌনি কণ্ঠ গাহ আজি গীত মহত্তর।
জয় জয় হিমালয়, নমো নমো নিখিলের নাথ,
এ বিজন গিরিকুঞ্জে হ'লো আজি তোমার সাক্ষাৎ।
শোক গেছে পাপ গেছে গেছে মোর অন্তর কালিমা,
গ্লানি ধৌত হৃদে জাগে অনন্তের অনন্ত মহিমা।
যে শান্তি লভিছ গিরি ঝাঁপাইয়া হিম কলেবরে,
অটুট অক্ষয় হ'ক তাহা মোর মর্ম্মের মাঝারে।
বিদায়ের সন্ধিক্ষণে লহ মোর ভক্তি নমস্কার,
আর এক কৌটা অশ্রু শোক ক্ষুব্ধ হৃদি অর্ঘ্যতার।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

তীর্থযাত্রা।

(১)

চিরকাল প্রজার রক্ত শোষণ করিয়া বৃদ্ধ বয়সে জমিদার গঙ্গাগোবিন্দ রায় তীর্থযাত্রার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন।

দশজনে কানাকানি করিতে লাগিল,, "বৃদ্ধের বুঝি আখেরের চিন্তা হইয়াছে।" সঙ্গে সঙ্গে চোখ্ টেপাটিপি হাত নাড়ানাড়ি অনেকদিন চলিল। কারণ, মুখ ফুটিয়া গঙ্গাগোবিন্দের নিন্দা করিতে পারে এরূপ সাহস কাহারও ছিল না।

এ দিকে জমিদার ভবনে ক্রমাগত তিনদিন গুপ্ত মন্ত্রণা চলিল। সকল মন্ত্রণায় মন্ত্রী এক ধূমকেতু অর্থাৎ দেওয়ান দীননাথ বিশ্বাস। দীননাথ সকল কার্য্যে জমিদারের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ; এমন কি প্রজার বাড়ী ভাঙ্গিয়া দিবার জন্য তাহাকে লাঠি হাতে যুদ্ধ করিতে অনেকে দেখিয়াছে। তাহার কুদৃষ্টিতে পড়া অপেক্ষা ধূমকেতুর পুচ্ছ দর্শন যে অধিক অমঙ্গলজনক এরূপ ভ্রমাত্মক ধারণা ক্ষুদ্র ন—গ্রাম কাহারও মস্তিষ্কে স্থান পাইত না।

তিনদিন মন্ত্রণার পরে চতুর্থদিন প্রাতঃকালে গ্রামের বাড়ীতে বাড়িতে লাল পাগড়ী-পরা জমিদারের লাঠিয়ালদিগের আগমন হইতে লাগিল। তাহারা গ্রামবাসীদিগকে জানাইয়া দিল, "জমিদার মহাশয় আগামী কল্য তীর্থযাত্রা করিবেন। পাথেয় সংগ্রহের জন্য সকলকেই কিছু কিছু চাঁদা দিতে হইবে—পরিমাণ আট আনা হইতে পাঁচ টাকা।" সঙ্গে সঙ্গে তহশীলদারগণ খাতা হস্তে ছুটাছুটি আরম্ভ করিল।

৺ রামতারণ চক্রবর্ত্তীর বাড়ীতে এখন তাঁহার বিধবা স্ত্রী এবং একটী পাঁচ বৎসরের শিশুপুত্র ভিন্ন আর

কেহই থাকে না। তহশীলদার ভগ্ন কুটীরের দ্বারে করাঘাত করিয়া বলিলেন, "ঘরে কে আছ, শীঘ্র তীর্থ যাত্রার চাঁদা দাও।" ভিতর হইতে বিধবা আপনার অক্ষমতা জানাইয়া বলিলেন, "সূতা কাটিয়া, পৈতা তুলিয়া কোনও-রূপে আমার ও ছেলেটীর একবেলা আহার জুটে। আমি চাঁদা কোথা হইতে দিব?"

তহশীলদার রুক্ষস্বরে বলিল "আপনার অভাবের কাহিনী শুনিবার অবসর আমার নাই। যদি সহজে না দেন, তবে বাধ্য হইয়া আপনার ঘটী বাটী বিক্রয় করিয়া আদায় করিতে হইবে।

অপমানের ভয়ে বিধবা অতি কষ্ট-সঞ্চিত আধুলিটী বাহির করিয়া দিয়া ছেলেটীকে কোলে লইয়া কাঁদিতে বসিলেন। আজ যে দুইজনকেই উপবাস করিতে হইবে।

জমীর সেখ তাহার দুই পুত্র ও চারিটী গরু লইয়া লাঙ্গল স্কন্ধে মাঠে যাইতেছিল। তহশীলদার ও লাঠি-য়ালেরা তাহাকে চাঁদার জন্য ধরিয়া বসিল। জমীর অনেক কাকুতি মিনতি করিয়া তিনদিনের সময় চাহিল। কিন্তু, তহশীলদারের পাষাণ হৃদয় কিছুতেই গলিলনা। জমীরের জেষ্ঠ পুত্র আর সহ্য করিতে না পারিয়া বলিয়া উঠিল "আচ্ছা মহাশয়, যদি আমরা না দেই তবে কি জোর করিয়া লইবেন?"

এই কথা শুনিয়া তহশীলদারের ধৈর্য্য চ্যুতি ঘটিল তাহার আদেশে লাঠিয়ালেরা বলপূর্ব্বক লাঙ্গল ও গরু কয়টা কাড়িয়া লইয়া প্রকাশ্য নিলাম বিক্রয় করিয়া ফেলিল জমীর মাথায় হাত দিয়া কাঁদিতে লাগিল।

এইরূপে গরিবের বুকের রক্তে গঙ্গা গোবিন্দের স্বর্গের সিঁড়ি প্রস্তুত হইতে চলিল। সকলে ভাবিল ইহার আর প্রতীকার নাই। কিন্তু, অনন্ত আকাশের মধ্য হইতে শনিঠাকুর টিপি টিপি হাসিলেন,—কিছুই তাহার দৃষ্টি এড়ায় নাই।

(২)

জমিদার বাড়ীর পাশ দিয়াই ব্রহ্মপুত্র তরতর বেগে প্রবাহিত হইতেছে। ফটকের সম্মুখে ক্ষুদ্র একটা বাগান, তাহার পরেই নদী, শরতের রৌদ্রোজ্জ্বল প্রভাতে প্রকৃতির গায় নবজীবনের চিহ্ন দেদীপ্যমান। নদীর আর বর্ষা-কালের প্রবল উচ্ছ্বাস নাই, চারিদিকে বর্ষার প্রাবল্যের পরে শরতের শান্তি বিরাজ করিতেছে। জগৎ যেন যৌবন হইতে ক্রমশঃ প্রৌঢ়তার দিকে ঝুঁকিয়া পড়িতেছে।

নদীতটস্থ বাগান শেফালিকা ফুলের গন্ধে ভরপুর। ঘাটে জমিদারের প্রকাণ্ড বজরা পালে সুসজ্জিত হইয়া বিস্তৃতপক্ষ বিহঙ্গমের ন্যায় শোভা পাইতেছে। আজ গঙ্গা গোবিন্দের তীর্থ যাত্রার দিন। সেই জন্য জমিদার বাড়ীর চারিদিকে ব্যস্ততার চিহ্ন দেখা যাইতেছে। ভৃত্যেরা তাড়াতাড়ি করিয়া জিনিষপত্র বজরায় তুলিয়া দিতেছে। শীঘ্রই বজরা ছাড়িয়া দিবে।

ম—জেলা হইতে নৌকা পথে বারাণসী যাওয়া সুবিধা জনক বলিয়া গঙ্গাগোবিন্দ শ্রেষ্ঠ বজরাখানা সজ্জিত করিতে আদেশ করিয়াছেন। বারানসী পঁহুছিতে প্রায় তিন মাস লাগিবে, তাই তিন মাসের উপযুক্ত খাদ্য সামগ্রী সংগৃহীত হইয়া বজরা বোঝাই করা হইতেছে।

গঙ্গাগোবিন্দ তীর্থ যাত্রায় দুই চারি জন ভৃত্য ভিন্ন কাহাকেও সঙ্গে লইবেন না মনে করিয়াছিলেন। আহার বিহারে তিনি সনাতন নিয়ম মানিয়া চলিতে পারিতেন না, তথাপি তিনি যে সনাতন ধর্ম্মের একজন বিখ্যাত চাঁই, তাহা লম্বশিখ পণ্ডিতগণ তাঁহাকে স্তুতিচ্ছলে বেশ বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। সুতরাং জমিদার মহাশয় পান-ভোজন যবনিকার অন্তরালেই চালাইতে বাধ্য হইতেন। গৃহিণী পর্য্যন্ত তাহার খবর রাখিতেন না। তাই, যখন গৃহিণী আসিয়া স্বামীর সঙ্গে তীর্থযাত্রার অভিপ্রায় জানাইলেন, তখন গঙ্গাগোবিন্দ দেখিলেন, তীর্থ যাত্রার সব আমোদটুকু পণ্ড হইয়া যায়! কিন্তু লোকলজ্জার ও চক্ষু লজ্জার ভয়ে তিনি গৃহিণীকে প্রত্যাখ্যান করিতে পারিলেন না। গৃহিণী যখন চলিলেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার বিশ্বস্তা দাসী লক্ষ্মীমণি এবং পুরহিত ঠাকুরও চলি-লেন আর ভৃত্য হরিচরণ যখন কাতর ভাবে তীর্থ ভ্রমণের ইচ্ছা জ্ঞাপন করিল, তখন, জমিদার মহাশয় সোৎসাহে তাহার দরখাস্ত মঞ্জুর করিলেন। কারণ, নৌকায় ডাকাত পড়িলে হরিচরণের বাহুবল ভিন্ন আর দ্বিতীয় উপায় কিছুই ছিলনা।

মাঝিদিগের—"বদর, বদর," নৌকাস্থিত যাত্রীদিগের "সিদ্ধিদাতা গণেশ, গণেশ," এবং পুরস্ত্রীগণের মঙ্গল সূচক হুলুধ্বনির ভিতর বজরা ছাড়িয়া দিল।

(৩)

প্রায় দুইমাসে গঙ্গাগোবিন্দের বজরা মালদহের নিকটবর্ত্তী হইল। এই দীর্ঘ নৌকাবিহারের প্রথম ভাগটা তাঁহার নিকট আমোদ আহ্লাদ ও পানভোজনের অভাবে বড়ই তিক্ত বোধ হইল। কিন্তু অবশেষে একটা সুখ-চিন্তা গঙ্গাগোবিন্দের আকুল হৃদয়কে কতকটা শান্ত করিল—আমোদ হইলনা বটে, কিন্তু তিনি তীর্থ-যাত্রার জন্য যে দশ সহস্র মুদ্রা চাঁদা আদায় করিয়াছিলেন, তাহার অধিকাংশ মজুদ থাকিবে; তীর্থ ভ্রমণ করিয়া যখন বাড়ীতে উপস্থিত হইবেন, তখন বিলাতী জল ও বিলাতী খাদ্যের শ্রাদ্ধ করিলেই চলিবে!

কোনও কোনও দার্শনিকের মতে জাগ্রদাবস্থায় মানুষের মন কখনো চিন্তাশূন্য থাকিতে পারেনা। সুতরাং গঙ্গাগোবিন্দ বসিয়া বসিয়া—অভীষ্ট চিন্তা করিতে লাগিলেন। সূর্য্য অস্তগমনে উন্মুখ হইল। এ বিশ্বের সকল পদার্থই আবর্ত্তনশীল ঐ যে ভাগীরথী কুলু কুলু ধ্বনি করিতে করিতে আপনার জীবনস্রোতকে সাগরের দিকে ছুটাইতেছে, তাহা কেবল মায়া। ঐ জলরাশি বাষ্প ও বৃষ্টিরূপে স্থলে গমন করিবে আবার ভাগীরথীর স্রোতে মিশ্রিত হইয়া সাগর যাত্রা করিবে। আজ যে সূর্য্য অস্ত গেলেন, কাল তিনিই আবার কিরণমণ্ডিত হইয়া পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিতে অসিবেন। এই আবর্ত্তন শুধু জড় জগতেই আবদ্ধ নহে, মানবের অন্তর্জগতেও ইহাকে দেখিতে পাওয়া যায়! মানুষ তোমার চক্ষুর সম্মুখে সারি বাঁধিয়া বহু গন্তব্য পথে চলিতেছে, দেখিতেছ। —বুঝিয়া রাখ ইহাও মায়ার খেলা। ঐ যাত্রীদিগের অন্তরাত্মা ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চারিটার একটাকে কেন্দ্র করিয়া ঘুরিয়া মরিতেছে। সেইরূপ, পাল-তোলা বজরায় আরোহণ করিয়া গঙ্গাগোবিন্দ বাহ্যতঃ একটা লক্ষ্যের দিকে দ্রুতবেগে ছুটিতেছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার মন "চোক ঢাকা বলদের মত" একটা কুৎসিৎ বাসনার চারিদিকে ঘুরপাক খাইতেছিল।

অভীষ্ট সুখ চিন্তায় গঙ্গাগোবিন্দের মুখশ্রী হাস্যমণ্ডিত হইয়া উঠিল।

বিশুষ্কবদনা গৃহিণী আসিয়া খবর দিলেন, লক্ষ্মীমণির কলেরা হইয়াছে।

গঙ্গাগোবিন্দ বজ্রাহতের ন্যায় পত্নীর দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার হৃদয়ে মৃত্যুভয় তাণ্ডব নৃত্য করিয়া উঠিল।

"কলেরা হইয়াছে—কখন? হায়, আমি তখনই বলিয়াছিলাম এতলোক এই ক্ষুদ্র বজরায় চলিতে পারেনা।"

গৃহিণী বলিলেন, "এ' দুঃখ করিবার সময় নহে, লক্ষ্মীকে দেখিবে চল।"

গঙ্গাগোবিন্দের হৃদয়ে যে কলুষ প্রবৃত্তিটা কিছুদিন যাবত্ নিদ্রিত ছিল, ভয় আজ তাহাকে আবার জাগাইয়া দিল।

"লক্ষ্মীকে দেখিতে যাইব? তুমি পাগল হইয়াছ। কলেরা ছুঁয়চে রোগ, যে লক্ষ্মীর কাছে যাবে, তারই হইবার সম্ভাবনা।"

এই বলিয়া তিনি চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া সকলকে বলিয়া দিলেন কেহ যেন লক্ষ্মীর কাছে না যায়।

ভৃত্য হরিচরণ একপাশে বসিয়া তামাকু টানিতেছিল। গঙ্গাগোবিন্দের আদেশে বিচলিত হইল না। লক্ষ্মীর শয্যাপার্শ্বে বসিয়া তাহার সেবা করিতে লাগিল।

মধ্য রাত্রে যখন লক্ষ্মীর দেহ অবসন্ন হইয়া আসিতেছিল, তখন দেখাগেল হরিচরণও কলেরায় আক্রান্ত হইয়াছে।

সমস্ত বজরায় বিষাদছায়া ঘনীভূত হইয়া আসিল।

(৪)

পরদিন প্রভাতে গঙ্গাগোবিন্দকে গভীর চিন্তায় মগ্ন দেখা গেল।

সারারাত্রি জাগ্রত্-স্বপ্ন দেখিয়া তিনি অস্থির হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাহার মানসনয়নের সম্মুখে একটা বিকটাকার যমদূত সুদীর্ঘ দণ্ড হস্তে আসিয়া উপস্থিত হইল। ভীত জমিদার তাহাকে চিনিতে পারিয়া মস্তক অবনত করিলেন। দূতের হাতে গঙ্গা-

গোবিন্দের জীবন চিত্র উন্মুক্ত ছিল। জমিদার দেখিলেন, সে চিত্রের সর্ব্বত্রই মসীরঞ্জিত, সূচ্যগ্র স্থানও সাদা নহে। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল। এরূপ অবস্থায় কেহ মরিতে সাহস পায় না। গঙ্গাগোবিন্দ প্রতিজ্ঞা করিলেন, যেরূপেই হউক এ যাত্রা বাঁচিতেই হইবে!

দেখিতে দেখিতে দিনটী কাটিয়া গেল। লক্ষ্মীর আসন্ন-কাল উপস্থিত হইল, হরিচরণ তখনও জল জল বলিয়া চিৎকার করিতেছিল।

গঙ্গাগোবিন্দ দুইজন মাঝিকে আদেশ করিলেন, "ইহাদিগকে জলে ফেলিয়া দিয়া শীঘ্র বজরা পরিষ্কার করিয়া নে!"

লক্ষ্মীর মুখে একটা বেদনার চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল, তাহার কথা বলিবার শক্তি ছিল না। হরিচরণ নিঃশব্দে জমিদারের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

মাঝিরা অবাক্ হইয়া পরস্পরের দিকে তাকাইতেছিল। গঙ্গাগোবিন্দের আদেশ কোনও দিন অন্যথা হয় থাকে নাই। তারপর, মৃত্যুচিন্তায় তিনি উন্মত্তপ্রায় হইয়াছিলেন; মাঝিদের বিলম্ব তাঁহার কাছে অসহ্য বোধ হইল। গঙ্গাগোবিন্দ পকেট হইতে রিভল্‌বার্ বাহির করিয়া একজন মাঝির দিকে বাগাইলেন। মাঝি ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া লক্ষ্মীকে তুলিয়া জলে ফেলিয়া দিল।

ক্ষুব্ধ গঙ্গার জলরাশি রাক্ষসের ন্যায় তাহাকে গ্রাস করিল. তারপর সব চুপ্ চাপ্।

এই বার হরিচরণের পালা। সে একদৃষ্টে সব দেখিতেছিল। নিষ্ঠুর জমিদারের নিকট দয়ার প্রত্যাশা নাই জানিয়া সে জোড়হাতে মাঝিকে বলিল, "ভাই, তুই আমাকে জলে না ফেলিয়া ডাঙ্গায় ফেলিয়া দে।"

সেই মিনতির স্বরে মাঝির চক্ষে জল আসিল, গঙ্গাগোবিন্দ কোনও আপত্তি করিলেন না দেখিয়া সে হরিচরণকে নদীতীরে একটা প্রকাণ্ড অশ্বথ বৃক্ষের তলায় রাখিয়া আসিল।

তখন পাখীরা কলরব করিয়া বাসায় চলিয়াছে। বৃক্ষসমূহের মস্তকে সন্ধ্যার স্বর্ণপ্রভা নিবিয়া গিয়াছে।

(৫)

হরিচরণ যে স্থানে পড়িয়া যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতেছিল, তাহার অনতিদূরেই মালদহ জেলার ক্ষুদ্র মির্দ্দা গ্রাম। গ্রামে দুইটী আশ্চর্য্য প্রকৃতির লোক ছিল। একজন রমেশ ওরফে বখাটে ছেলেদের 'কাপ্তেন'। রমেশ ধনীর ছেলে, সৌভাগ্যের ক্রোড়ে লালিত হইয়াছিল। কিন্তু বাল্যকাল হইতেই ছেলেটা কেমন বিগড়াইয়া গিয়াছিল! সে একদল বখাটে ছেলের সর্দ্দার হইয়া পড়াশোনায় অমনোযোগী হইয়া উঠিল। যেখানে পীড়িতের আর্ত্তনাদ বখাটের দল সেইখানেই আপনাদের সেবা-তৎপর হস্ত লইয়া উপস্থিত হইত। কোনও গৃহে আগুন লাগিলে সকলের পূর্ব্বে বখাটে 'কাপ্তেন' দলবল লইয়া অগ্রসর হইত। কোনও গ্রামে দুর্ভিক্ষ লাগিলে 'বখাটের' দল দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বিপন্নের সাহায্য করিত। কিন্তু যখন বাইনাচ্, থিয়েটার অথবা অন্যান্য সৎকার্য্যের বিরাট বন্দোবস্তের জন্য বখাটের সাহায্য চাওয়া হইত, তখন 'কাপ্তেন' গ্রামছাড়িয়া পলাইত। রমেশের মাষ্টার তাহার পিতাকে বলিলেন, "ছেলেটার মাথা বেশ পরিষ্কার ছিল, মনদিয়া লেখাপড়া করিলে খুব ভাল হইত।" পিতা অনেক দিন রমেশকে কি বলিবেন মনে করিতেছিলেন, কিন্তু 'বখাটের' মুখের দিকে চাহিলেই সব ভুলিয়া যাইতেন—তাহার মুখে একটা অলৌকিক দীপ্তি খেলিয়া বেড়াইত।

কিন্তু সকলকে আশ্চর্য্যান্বিত করিয়া বখাটে কাপ্তেন যখন এণ্ট্রান্স হইতে বি, এ, পর্য্যন্ত কৃতিত্বের সহিত পাস করিল তখন বন্ধুরা বলিলেন, ভাল পড়াশোনা করিলে রমেশ একটা দিগ্‌গজ হইয়া উঠিত।

বি, এ, পাশ হইলে পিতা বখাটেকে চাকুরী করিয়া দিতে বিশেষ চেষ্টা করিলেন, কিন্তু বখাটে কিছুতেই রাজী হইল না। সে তাহার পল্টনের সংখ্যাবৃদ্ধি করিতে লাগিল।

মির্দ্দা গ্রামের দ্বিতীয় আশ্চর্য্য জীব তর্কালঙ্কার মহাশয়। লোকে তাহাকে "সর্ব্বত্যাগী" তর্কালঙ্কার বলিত। গ্রামের এক পার্শ্বে তাঁহার ক্ষুদ্র কুটীর। শিশুকাল হইতেই তর্কালঙ্কার মহাশয় আত্মীয় বন্ধুবান্ধব হীন।

নিজের ক্ষুদ্রগৃহে একাকী বাস করেন। দিবসের অধিকাংশ সময় পূজা অর্চনায় কাটিয়া যায়, সুতরাং রাত্রিতে শয়নের পূর্ব্বে হবিষ্যান্ন গ্রহণ করিয়া তিনি কুশ-শয্যায় নিদ্রা যান। মধ্যে মধ্যে ২।৪ জন লোক তাঁহার কাছে ধর্ম্মোপদেশ শুনিতে আসিয়া তাঁহার অপার্থিব সরলতায় ও সৌজন্যে মুগ্ধ হয়।

শীতের প্রদোষে তর্কালঙ্কার মহাশয় নামাবলী গায় প্রাঙ্গণের এক কোণে তুলসীকুঞ্জে বসিয়া ধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন। শীতের চন্দ্রালোক কুয়াসা-মলিন হইয়া তাহার জটামণ্ডিত মস্তকে পতিত হইতেছিল। কৈলাস-শিখরে মহাদেব যেন ধ্যানমগ্ন ছিলেন!

এমন সময় বখাটে 'কাপ্তেন' দুইজন সঙ্গী সহ মৃতপ্রায় হরিচরণের দেহ বহন করিয়া প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইল। বখাটেরা সকলেই তর্কালঙ্কার মহাশয়ের শিষ্য।

কাপ্তেন মৃদুস্বরে ডাকিল "বাবা।"

"সর্ব্বত্যাগী" কে পরিচিত সকলেই বাবা বলিয়া ডাকিত।

তিনি তখন গভীর ধ্যানে বিভোর ছিলেন। বখাটেদের ডাক শুনিতে পাইলেন না। তাহারা আবার ডাকিল, "বাবা"।

তর্কালঙ্কার মহাশয় চক্ষুরুন্মীলন করিয়া বখাটেদিগকে তদবস্থ দেখিতে পাইলেন। ধীরে ধীরে বলিলেন "কি হইয়াছে, বাবা।"

'কাপ্তেন' সংক্ষেপে সব কথা বলিল।

সর্ব্বত্যাগী ব্যস্ত সমস্ত হইয়া বলিলেন, "ইহাকে আনিয়া বেশ করিয়াছ, কিন্তু আমরা কি উপযুক্তরূপে ইহার সেবা করিতে পারিব? সেবায় ক্রটি হ'লে নারায়ণ যে বিমুখ হইবেন, বাবা।"

কি কোমল স্বর—জগতের মাতৃ-স্নেহ যেন সে স্বরে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছিল।

সর্ব্বত্যাগী কুটীরে আসিয়া কুশাসনের উপর আপনার একমাত্র সম্বল কম্বলখানা বিছাইয়া দিলেন, তারপর বখাটেদের সঙ্গে মিশিয়া রোগীর সেবায় মনোনিবেশ করিলেন। আজ আর তাহার আহার নিদ্রায় প্রয়োজন নাই!

পরের সেবা মানুষের হৃদয়ে ভগবানের স্বর্ণ-সিংহাসন পাতিয়া দেয়, তাহার সম্মুখে পৃথিবীর সকল সুখসম্পদ ধূলিকণার ন্যায় তুচ্ছ!

(৬)

প্রায় একমাস পরে একখানা বজরা পাল-তুলিয়া গঙ্গা বক্ষ চিরিয়া ছুটিতে ছিল। বজরাখানা বৃহৎ কিন্তু এক প্রকার জন মানব শূন্য। সম্মুখে ও পশ্চাতে দুইজন মাঝি দাঁড় ও হাল ধরিয়াছিল। ছাদের উপরে আর একজন মাঝি বিষণ্ণবদনে বসিয়াছিল।

ভাটিয়ালস্রোতে বজরা তীরবেগে চলিতেছিল। ছাদের উপর হইতে মাঝি বলিল, "ঐ না, সেই বটগাছটা

যে হাল ধরিয়াছিল সে রুক্ষস্বরে বলিল, "তুই কি পাগল হইয়াছিস্, কেবল যা 'তা' বকিস্ কেন? কোন্ বট গাছটা?"

"যে গাছটার তলায় হরিচরণকে ফেলিয়া দিয়াছিলাম।"

"অত আমার মনে নাই, আর হইলেই বা তোর তা'তে কি?

"আমার বেশ মনে আছে ঐ সেই বটগাছটা। উহার কাছে বজরা ভিড়াইতে হইবে।"

কয়েক দিন যাবত লোকটার পাগলামিতে মাঝিরা বিরক্ত হইতেছিল, সুতরাং তাহার কথায় কর্ণপাত করা উচিত মনে করিল না। বজরা যখন গাছটার কাছে আসিল তখন সে আবার মাঝিদিগকে বজরা ভিড়াইতে বলিল। কেহ তাহার কথা শুনিলনা দেখিয়া মাঝি বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে একটা জিনিষ বাহির করিল—তাহা একটা গুলিভরা পিস্তল! তার পর উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল, "দেখ্ শা-রা এই জিনিষটার ভয় দেখাইয়া গঙ্গাগোবিন্দ আমাকে দিয়া কত পাপ করাইয়াছে তাহার অন্ত নাই, কত অসহায় পীড়িতকে আমি গঙ্গাজলে ফেলিয়া দিয়াছি। অবশেষে নিজের ভাইকে পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে বাধ্য হইয়াছি! কিন্তু আজ তার প্রতিশোধ লইব—মৃতপ্রায় গঙ্গাগোবিন্দকে ঐ গাছ তলায় ফেলিয়া যাইব। যে আমার কথা না শুনিবে একগুলিতে তা'র মাথা উড়াইয়া দিব।"

মাঝির চক্ষে উন্মত্ততার চিহ্ন পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। অন্য মাঝিরা দ্বিরুক্তি না করিয়া অশ্বথ তলায় বজরা বাঁধিল।

উন্মত্ত মাঝি ছাদের উপর হইতে নামিয়া বজরার ভিতর হইতে গঙ্গাগোবিন্দকে টানিয়া বাহির করিল।

তারপর তাঁহাকে স্কন্ধে করিয়া অশ্বথ তলায় ফেলিয়া আসিল। গঙ্গাগোবিন্দের শরীর তখন চেতনা রহিত হইয়াছিল।

এইরূপে গর্ব্বিত জমিদারের অদৃষ্ট চক্রের আবর্ত্তন পূর্ণ হইল।

পীড়িত দাসদাসী ও মাঝিদিগকে জীবন্তে গঙ্গা-সলিলে সমাহিত করিয়াও গঙ্গাগোবিন্দ আত্মরক্ষা করিতে পারিলেন না। বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে দণ্ডবৎ করিয়া তিনি তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরিতেছিলেন। পথি মধ্যে গৃহিণী পড়িলেন, আর চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। অবশেষে গঙ্গাগোবিন্দের পালা আসিল। কলেরায় আক্রান্ত হইয়া একদিন রাত্রিশেষে ভীষণ যমদূতের কথা ভাবিতে ভাবিতে তিনি চেতনা হারাইলেন।

(৭)

একজন দীর্ঘাকার পুরুষ কলসী কাঁধে অশ্বথতলায় জল লইতে আসিল। তখন দ্বিপ্রহরের রৌদ্রে চারিদিক ঝাঁ ঝাঁ করিতেছিল।

লোকটী বৃক্ষতলে দাঁড়াইয়া দেখিল পদতলে একটা মানুষ মৃতপ্রায় অবস্থায় পড়িয়া ছট্‌ফট্ করিতেছে। তাহার মুখ দেখিয়া সে চমকিয়া উঠিল এবং কাঁধ হইতে কলসী নামাইয়া সেই মুমূর্ষু ব্যক্তিকে তুলিয়া লইয়া গ্রামে দিকে চলিয়া গেল।

"সর্ব্বত্যাগী" তখন পূজার জন্য ফুল কুড়াইতেছিলেন। লোকটীকে দেখিয়া বলিলেন, "বাবা, হরিচরণ এ কি?"

হরিচরণ সব কথা বুঝাইয়া বলিল। রোগমুক্ত হইয়া হরিচরণ তর্কালঙ্কার মহাশয়ের আশ্রমেই বাস করিতে-ছিল।

সর্ব্বত্যাগী হস্ত উন্নমিত করিয়া ভক্তি গদগদ কণ্ঠে বলিলেন, "নারায়ণ, নারায়ণ, কে বলে তোমার রাজ্যে বিচার নাই। তুমি যে ন্যায় বিচার কর জগতের লোক তাহা বুঝিতেও অক্ষম।"

তিন দিন পরে চক্ষু মেলিয়াই গঙ্গাগোবিন্দ দেখিলেন সম্মুখে হরিচরণ দাঁড়াইয়া আছে। তাঁহার সন্দেহ রহিল না যে তিনি মরিয়া স্বর্গে আসিয়াছেন। গঙ্গাগোবিন্দ তর্কালঙ্কার মহাশয়কে জটাজুটধারী মহাদেব বলিয়া মনে করিলেন। হরিচরণ হয়তঃ মহাদেবের কাছে বিচার প্রার্থী হইয়াছে! কিন্তু যমলোক হইতে শিবলোকে কিরূপে প্রমোশন্ পাইলেন তাহা তিনি কিছুতেই বুঝিতে পারিলেন না।

ক্রমে ক্রমে যখন চক্ষুর মোহ কাটিয়া গেল এবং জীব-লোকের সকল দৃশ্যই একে একে তাঁহার সম্মুখে প্রতিভাত হইয়া উঠিল, তখন গঙ্গাগোবিন্দ কৌতূহল থামাইতে না পারিয়া বলিলেন, "হরিচরণ, আমি কি স্বপ্ন দেখিতেছি, আমি কোথায়, তুমিই বা কোথা হইতে আসিলে?"

হরিচরণ সব কথা ভাঙ্গিয়া বলিল। হায়, যে হরি-চরণকে গঙ্গাগোবিন্দ মৃত্যুর গ্রাসে ফেলিয়া দিয়াছিলেন, সেই তাঁহার প্রাণরক্ষা করিয়াছে!

গঙ্গাগোবিন্দের বিশাল বক্ষঃস্থলে একটা তুমুল কাণ্ড আরম্ভ হইল। তাঁহার বক্ষঃপঞ্জর ষ্টীম-ইঞ্জিনের বয়লারের ন্যায় শক্ত না হইলে সে প্রবল-উচ্ছ্বাসের বেগে ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া যাইত।

গঙ্গাগোবিন্দের হৃদয়ের কোমলতারাশি পাপস্পর্শে বরফীভূত হইয়া গিয়াছিল, আজ গলিয়া অশ্রুরূপে পতিত হইতে লাগিল। তিনি জীবনে কখনো অশ্রুবিসর্জ্জন করেন নাই।

ধীরে ধীরে গর্ব্বিত জমিদার আপনার কুশ-শয্যা হইতে গড়াইয়া আসিয়া হরিচরণের পদতলে পড়িয়া দুই হাতে তাহার পা জড়াইয়া ধরিলেন।

"হরিচরণ, আমার ন্যায় পাপী আর এ জগতে নাই। আজ তোমার চরণ-তলে আশ্রয় লইলাম, ইহাই আমার পবিত্র তীর্থ স্থান। এ আশ্রয় হইতে আমাকে বিচ্যুত করিও না।"

আকাশ হইতে শনিঠাকুর আবার হাসিলেন।

শ্রীগুরুদাস চক্রবর্ত্তী।

সম্মিলনে।

মেঘেরে চিরিয়া তড়িৎ ছুটিছে
মিলিতে ধরার বক্ষে,
লক্ষ নয়ন করে হানাহানি
মিলিতে চক্ষে চক্ষে!
শত শত ভুজ কামনা করিছে
বন্দী করিতে অঙ্গে,
পল্লবরাশি ধাইছে আকাশে
ধরিতে অগাধ শূন্যে।
চাঁদেরে লক্ষি' চকোর উড়িছে
অম্বর-পথ-যাত্রী,
দিবার সহিত মিলন লাগিয়া
জাগ্রত রহে রাত্রী!
উছলি' সাগর তটভূমি চুমি'
নিত্য করিছে রঙ্গ,
চন্দ্র রবিরে সমুখে রাখিয়া
যাচে তার তেজ-সঙ্গ!
অগ্নির শিখা আঁধারের মাঝে
চাহে মিলাইতে নিত্য
আঁধার আবার গোপনে আসিয়া
ভরি দেয় সব চিত্ত!
চন্দ্র, ধরণী-মিলন-বন্ধে
ঘুরিছে নিত্য চক্রে,
ধরিত্রী'পরে ফেলে কটাক্ষ
ভ্রমণ-কক্ষা-বক্রে!
ধরণী আবার রবির লাগিয়া
ঘুরিছে বর্ষে বর্ষে,
সফল মিলন-কামনার আশে
কভু কাঁপি উঠে হর্ষে!
চন্দ্র তপনে গগনে গগনে
অগণ্য তারাগণে
বিশাল-মিলন-প্রবাহ বাহিত
ভূমার সম্মিলনে!

শ্রীত্রিগুণানন্দ রায়

প্রাণিদেহের উত্তাপ।

দেহকে উত্তপ্ত রাখা প্রাণীর একটা বিশেষত্ব। উদ্ভিদের দেহেও তাপ আছে, কিন্তু প্রাণিদেহে ইহা যেমন সুস্পষ্ট উদ্ভিদের দেহে তেমন নয়। সাধারণ নির্জীব বস্তুকে কোন স্থানে রাখিলে, সেখানকার উষ্ণতা সে গ্রহণ করে। লৌহ-গোলককে রৌদ্রে রাখিলে সেটি রৌদ্রের উষ্ণতাই গ্রহণ করে; বরফে ডুবাইয়া রাখিলে বরফের উষ্ণতাই গোলকটির উষ্ণতা হইয়া দাঁড়ায়। অর্থাৎ চারিদিকের বায়ু-মৃত্তিকার ন্যায় উষ্ণ হইবার একটা চেষ্টা নির্জীব পদার্থ মাত্রেই আছে। সজীব বস্তু তাপের গ্রহণ বর্জ্জনে এই নিয়ম মানিয়া চলে না। নানা জাতীয় প্রাণীর মধ্যে প্রত্যেকেরই দেহে একএকটা নির্দ্দিষ্ট উষ্ণতা আছে। সেই উষ্ণতাকে রক্ষা করিয়া যখন চলা-ফেরা করিতে পারে, তখনি প্রাণী সুস্থ থাকে। কোন কারণে উষ্ণতার ন্যূনাধিক্য ঘটিলেই বুঝিতে হয় তাহারা অসুস্থ। সুস্থ মানুষের দেহের উষ্ণতার মাত্রা ফার্ণহিটের যন্ত্রের প্রায় সাড়ে আটানব্বই ডিগ্রি। খুব শীতল বা গরম স্থানে রাখিলেও সুস্থ মানবদেহের উষ্ণতা এই সীমার উপরে উঠে না এবং নীচেও নামে না। যদি সেই সাড়ে আটানব্বই কখন নিরেনব্বই হইয়া দাঁড়ায়, তখন বুঝিতে হয় মানুষ অসুস্থ। সুস্থ মানবদেহেরই যে, উষ্ণতার মাত্রা নির্দ্দিষ্ট আছে তাহা নয়, আণুবীক্ষণিক জীবাণু হইতে আরম্ভ করিয়া অতিকায় হস্তী গণ্ডার প্রভৃতি সকল জীবেরই দৈহিক তাপ নির্দ্দিষ্ট আছে।

প্রাণিদেহের তাপ রক্ষার বিষয়টা প্রাচীন পণ্ডিতদিগেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। জলস্থল ও আকাশের কোন স্থূল ঘটনা মহাপণ্ডিত আরিষ্টটলের তীক্ষ্ণদৃষ্টিকে এড়াইতে পারে নাই। সেই অবৈজ্ঞানিক যুগে প্রত্যেক প্রাকৃতিক ঘটনারই তিনি এক একটা সহজ ব্যাখ্যা দিবার চেষ্টা করিতেন। প্রাণিদেহের উষ্ণতা সম্বন্ধে তিনি বলিতেন, কাঠ পোড়াইয়া বা কাঠে কাঠে ঘর্ষণ করিয়া আমরা যে তাপ উৎপন্ন করি, তাহা শারীরিক তাপ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। মহাকাশের অধিবাসী জ্যোতিষ্কগণ যে অগ্নি ধারণ করিয়া আছে, তাহারি দুই

এক স্ফুলিঙ্গ প্রাণিদেহে আশ্রয় গ্রহণ করে বলিয়াই তাহা এত উষ্ণ। মহাকাশের জ্যোতিষ্কদিগের অত্যাশ্চর্য্য গতিবিধি লক্ষ্য করিয়া আরিষ্টটল্ তাহাদিগকে বুদ্ধিমান জীবের পর্য্যায়ে ফেলিতেন।

এই ত গেল দেহ-তাপের পুরাবৃত্তের কথা। বলা বাহুল্য পরবর্ত্তী বৈজ্ঞানিকগণ ঐ সকল কথায় বিশ্বাস করেন নাই। সপ্তদশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিকগণ অক্সিজেনের অস্তিত্ব জানিতেন না। কাঠ ও কয়লা ইত্যাদির দহনের কারণ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া, ইঁহারা বায়ুতে মিশ্রিত কোন এক দাহ্য পদার্থের অস্তিত্ব কল্পনা করিয়া লইতেন এবং তাহাই কাঠ কয়লাকে পোড়ায় বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতেন। প্রাণিদেহের তাপের কথা জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা বলিতেন, সাধারণ দাহ্য পদার্থ যেমন বায়ুতে পুড়িয়া তাপের উৎপত্তি করে, বায়ুতে মিশ্রিত সেই অজ্ঞাত পদার্থ ভুক্ত দ্রব্যকে দেহের অভ্যন্তরে পোড়াইয়া সেইপ্রকারে দেহকে উষ্ণ রাখে। প্রিষ্টলি ও ল্যাভোসিয়ার কর্তৃক অক্সিজনের আবিষ্কার হইলে সকলেই বুঝিয়াছিলেন, বায়ুর অক্সিজেনই দাহ্য পদার্থের অঙ্গার ও হাইড্রোজেনের সহিত মিলিত হইবার সময়, যে তাপের উৎপত্তি করে তাহাই অগ্নির তাপ। অগ্নি-তাপের এই ব্যাখ্যানে দেহ-তাপেরও উৎপত্তি নির্ণীত হইয়া পড়িয়াছিল। বৈজ্ঞানিকগণ বলিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, সাধারণ দাহ্যবস্তুর উপাদান যেমন বায়ুর অক্সিজেনের সহিত মিলিয়া তাপের উৎপত্তি করে, ভুক্তদ্রব্যের অঙ্গার ও হাইড্রোজেন্ ঠিক্ সেইপ্রকারে অক্সিজেনের সহিত মিলিয়া দেহ-তাপের সৃষ্টি করে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে অক্সিজেনের আবিষ্কার হইলে দেহজ তাপের এই সিদ্ধান্তটিই প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল, আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণও মূলে ইহাকে স্বীকার করিতেছেন। ল্যাভোসিয়ার সাহেব বলিতেন, প্রাণীর শ্বাসযন্ত্রই তাপের উৎপত্তি স্থান; শোণিতের সহিত সেই তাপ সর্ব্বাঙ্গে চালিত হইলে দেহ উত্তপ্ত হয়। বলা বাহুল্য তাপোৎপত্তির স্থান সম্বন্ধে এই সিদ্ধান্তটিকে এখন আর কেহ স্বীকার করেন না। মাংসপেশী (Muscles) এখন শারীরিক তাপের কেন্দ্র বলিয়া স্বীকৃত হইতেছে; এবং তন্মধ্যে হৃৎপিণ্ড ও যকৃত্ প্রভৃতির পেশীতে যে তাপ উৎপন্ন হয়, তাহাই পরিমাণে অধিক বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে।

শরীর হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পরও যে, রক্তহীন মাংসপেশী তাপের উৎপত্তি করে, জর্ম্মান্ পণ্ডিত হেলেম্‌হোজ্ একাধিক পরীক্ষায় তাহা সুস্পষ্ট দেখাইয়াছেন। ভেকের দেহ হইতে নিঃশেষে সমস্ত রক্ত বহির্গত করিয়া, শিরায় উপশিরায় লবণের জল চালাইতে থাকিলে, দেহের উষ্ণতা কমে না; সুস্থ অবস্থায় শ্বাস প্রশ্বাসের সহিত যেমন অঙ্গারক বাষ্প বাহির হয়, এখানেও তাহা সেই প্রকারেই বাহির হইতে থাকে। রক্তের সহিত যে দেহের উষ্ণতার বিশেষ সম্বন্ধ নাই, তাহা এই পরীক্ষায় বেশ বুঝাযায়।

দেহের উষ্ণতা লইয়া প্রাণিজাতিকে উষ্ণ শোণিত (Homoiothermic) এবং শীতল শোণিত (Poikilothermic) নামক যে দুই শ্রেণীতে বিভাগ করা হয় তাহার বিশেষ পরিচয় প্রদান নিষ্প্রয়োজন। যে সকল প্রাণী চারি পার্শ্বের উষ্ণতা অনুসারে দেহের উষ্ণতাকে পরিবর্ত্তিত করিতে পারে, সেগুলি শীতল শোণিত প্রাণী নামে পরিচিত। সর্প, সরীসৃপ, ভেক ও পতঙ্গ প্রভৃতি প্রাণী এই শ্রেণীভুক্ত। স্তন্যপায়ী প্রাণী বা পক্ষিজাতি খুব ঠাণ্ডা বা গরমে পড়িলেও দেহের উষ্ণতাকে এক একটি নির্দ্দিষ্ট সীমার উপরে বা নীচে যাইতে দেয় না। এই জন্য ইহারা উষ্ণশোণিত প্রাণী বলিয়া পরিচিত। কেবল দেহের উষ্ণতা দেখিয়া প্রাণি জাতির এই শ্রেণীবিভাগ প্রচলিত থাকিলেও, জীবতত্ত্ববিদ্‌গণ আজকাল এ বিভাগকে বিজ্ঞানসম্মত বলিতে চাহেন না। মধুমক্ষিকা পতঙ্গশ্রেণীবিভক্ত। উত্তাপ পরীক্ষা করিলে ইহাদিগকে শীতল শোণিত প্রাণীর দলে ফেলিতে হয়। কিন্তু ঘোর শীতের সময়েও মৌ-চাকের ভিতরকার উষ্ণতাকে বাহিরের উষ্ণতা অপেক্ষা প্রায় সত্তর ডিগ্রি অধিক দেখা যায়। ভেক বা মৎস্যকে ঈষদুষ্ণ জলে ছাড়িয়া দিলে তাহাদের দেহের উষ্ণতা অতি অল্প সময়ের মধ্যে জলের অনুরূপ হইয়া দাঁড়ায়। ভেক ও সর্প প্রভৃতি যেমন শীতকালে মৃতবৎ হইয়া নিদ্রা যায়, শীতপ্রধান দেশের অনেক স্তন্যপায়ী সেই প্রকার দীর্ঘ শিশিরসুপ্তি (Hibernation)

উপভোগ করে। উষ্ণশোণিত প্রাণী হইলেও, এই সময়ে ইহাদের দেহের উষ্ণতা স্পষ্ট কমিয়া বাহিরের বায়ুর উষ্ণতার সমান হইয়া দাঁড়ায়। তা' ছাড়া মানব শিশু ও পক্ষি-শাবক প্রভৃতিও যে, অবস্থা বিশেষে শীতল শোণিত প্রাণীর ন্যায় দেহ-তাপকে নিয়মিত করিতে পারে তাহারও অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া গিয়াছে। কাজেই সুস্পষ্ট রেখাপাত করিয়া শীতল শোণিত ও উষ্ণ শোণিত এই দুই ভাগে প্রাণীকে ভাগ করা চলে না; করিতে গেলেই সঙ্কটে পড়িতে হয়।

যাহা হউক কিপ্রকারে প্রাণিদেহে তাপের উৎপত্তি হয় এখন আলোচনা করা যাউক। এই বিষয়ের মীমাংসা করিতে গিয়া, বৈজ্ঞানিকগণ দেহকে একটা যন্ত্রের সহিত তুলনা করিয়াছেন। কাঠ বা কয়লার যে শক্তি সুপ্তাবস্থায় (Latent) থাকে, বাষ্পযন্ত্রের চুল্লীতে পোড়াইতে আরম্ভ করিলে তাহাই জাগ্রত তাপ শক্তিতে পরিণত হইয়া কলকে চালায়। প্রাণিদেহের ভিতরে পড়িয়া ভুক্ত দ্রব্যের সুপ্ত শক্তিও ঠিক সেইপ্রকারে জাগিয়া উঠে এবং দেহকে উত্তপ্ত করিয়া ও শরীরের পেশীগুলিকে চালাইয়া উদাহরণের কয়লার শক্তির ন্যায়ই আত্মপরিচয় দিতে আরম্ভ করে। বাষ্পযন্ত্র ও দেহযন্ত্রের আকার প্রকার ও গঠনোপাদানে অসদৃশ্য অমিল থাকিলেও, বৈজ্ঞানিকের চক্ষে উভয়ই যন্ত্র।

আমাদের টাকা কড়ির জমাখরচে, জমার অঙ্ক কখন কখন খরচের অঙ্ক অপেক্ষা ছোট হইয়া দাঁড়ায়। প্রকৃতির জমাখরচে এই ফাজিল হিসাবের স্থান নাই। যে শক্তি লইয়া হিসাব পত্তন করা হয়, খরচের খতিয়ানে তাহার কড়াক্রান্তির অমিল দেখা যায় না। যে পরিমাণ শক্তি কয়লায় সুপ্ত থাকে, পোড়াইবার সময় ঠিক তাহাই তাপ প্রভৃতি প্রত্যক্ষ শক্তিতে পরিণত হয়। জমাখরচে সুপ্ত ও জাগ্রত শক্তির মধ্যে একটুও অমিল দেখা যায় না। কোন ক্ষুদ্র প্রাণীকে তাপ-পরিমাপক (Calorimeter) যন্ত্রের ভিতরে আবদ্ধ রাখিয়া সেটি ঘণ্টায় কত তাপ উৎপন্ন করিতেছে হিসাব করিতে গেলে দেখা যায়, পরীক্ষাকালে সে যতটা ভুক্ত দ্রব্য হজম করে, তাপের পরিমাণও ঠিক সেই অনুসারে বাড়িয়া চলে। সুতরাং দেখা যাইতেছে কাঠ বা কয়লাকে কলে ফেলিয়া জ্বালানো ও খাদ্য দ্রব্যকে উদরে ফেলিয়া হজম করা একই ব্যাপার। দাহ্য বস্তুতে যে শক্তি সুপ্তাবস্থায় থাকে পোড়াইতে গেলে যেমন তাহার অধিক এক কণা শক্তিও কোন আশ্রয় গ্রহণ করে না, তেমনি ভুক্ত দ্রব্যের যে অংশটাকে পরিপাক করা হয় তাহার অন্তর্নিহিত শক্তির অধিক এক কণাও দেহে উৎপন্ন হয় না। কয়লার দহন ও খাদ্যের হজম, এই দুইয়ের মধ্যে একমাত্র পার্থক্য এই যে,দহনে দাহ্য বস্তুর সুপ্তশক্তি অতি অল্পকাল মধ্যে জাগ্রত হইয়া পড়ে, হজমে ভুক্ত দ্রব্যের সেই শক্তি বন্ধনমুক্ত হইতে অধিক সময় লয়। এই জন্যই পোড়াইবার সময় সমগ্র শক্তিকে অল্পকাল মধ্যে একত্র পাইয়া আমরা তাপের মাত্রাকে অধিক দেখি এবং জঠরানলে বহুক্ষণ ধরিয়া ধীরে ধীরে দগ্ধ হইয়া ভুক্ত দ্রব্য যে তাপ বাহির করে তাহার পরিমাণকে অল্প মনে করি। খাদ্য হজম করিবার কলটিকে প্রকৃতি দেবী যদি বাষ্পযন্ত্রের চুল্লীর মত করিয়া গড়িতেন, তবে ভুক্ত দ্রব্য উদরে পড়িয়া কয়লার মতই অল্প সময়ের মধ্যে পুড়িয়া ভয়ানক তাপের উৎপত্তি করিত। তখন মানুষ, গরু, ঘোড়া এবং ছাগল প্রত্যেকেই এমন এক একটা বিকট যন্ত্র হইয়া দাঁড়াইত যে, খাবার হজমের সময়ে তাহাদের নিকটে দাঁড়ানো দায় হইত।

বাষ্পযন্ত্রকে চব্বিশ ঘণ্টা অবিরাম চালাইলে সেটী কয়লা পোড়াইয়া যত তাপ উৎপন্ন করিল, তাহা গণনা করা যায়। ভুক্ত দ্রব্য অক্সিজেন ইত্যাদির সহিত মিশিলে হজমের সময়ে যে দহন আরম্ভ হয়, তাহাতে কত তাপ উৎপন্ন হয় স্থিরকরাও কঠিন নয়। এক সের জলকে সেন্টিগ্রেডের এক ডিগ্রি পরিমাণে উষ্ণ করিতে যে তাপের প্রয়োজন, তাহার পরিমাণ বড় অল্প নয়। হিসাব করিলে দেখা যায়, সুস্থ মানুষ চব্বিশ ঘণ্টায় দেহে যে তাপ উৎপন্ন করে, তাহাতে তিন হাজার সের, (সাড়ে সাঁইত্রিশ মণ) জলকে অনায়াসে এক ডিগ্রি পরিমাণে উষ্ণ করা যাইতে পারে অর্থাৎ ত্রিশ সের বরফের ন্যায় শীতল জলকে ঐ তাপে ফুটাইতে পারা যায়। কোন কারণে যদি দেহের

সমবেত তাপের পরিমাণ ইহা অপেক্ষা অধিক বা অল্প হইয়া দাঁড়ায়, তবে তাহা দ্বারা শরীরের কার্য্য চালানো দায় হয়; মাল গাড়ীর এন্‌জিনের মত তখন দেহ যন্ত্রটা কোন গতিকে চলাফেরা করে মাত্র।

কলের চুল্লীতে যত ভাল কয়লা পোড়ানো যায়, কাজও তত ভাল হয়। অল্প ছাই রাখিয়া যাহা প্রায় নিঃশেষে পুড়িয়া যায়, তাহাই ভাল কয়লা। পাথর ও নানা আকরিক পদার্থ মিশানো কয়লা পুড়িবার সময়ে অতি অল্প তাপ উৎপন্ন করিয়া স্তূপীকৃত ভস্মে পরিণত হয়। নিকৃষ্ট কয়লার একমণে যে কাজ পাওয়া যায়, উৎকৃষ্ট কয়লার আধ মণেই হয়ত সেই কাজ হয়। দেহের কলে তাপ উৎপন্ন করিবার জন্য আমরা খাদ্যাকারে যে ইন্ধন যোগাই, তাহারো ভালমন্দ আছে। অর্দ্ধসের চাউলের দাহনে দেহ-যন্ত্রে যে তাপের উৎপত্তি হয়, অর্দ্ধ ছটাক ভাল খাদ্যে তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক তাপ জন্মাইতে পারা যায়। কোন্ খাদ্য হজম হইবার সময়ে কি পরিমাণ তাপ উৎপন্ন করে, তাহার একটা হিসাব স্থির করা কঠিন নয়। এই প্রকার হিসাবে জানা গিয়াছে, পনর গ্রেন্ ওজনের মাংস হজম হইবার সময়ে যে তাপ নির্গত করে, তাহাতে প্রায় দুই সের ওজনের জলকে সেন্টিগ্রেডের এক ডিগ্রি পরিমাণে উষ্ণ করা যাইতে পারে, কিন্তু ঠিক্ সেই পরিমাণ ঘৃত বা চর্ব্বি হজম করিলে তাপের পরিমাণ উহার দ্বিগুণেরও অধিক হইয়া দাঁড়ায়। সুতরাং আমাদের প্রধান আহার্য্যগুলির এই প্রকার একটা তালিকা প্রস্তুত করিতে পারিলে, সুগৃহিণীগণ কেবল রসনার তৃপ্তি বিধানের প্রতি দৃষ্টি না দিয়া স্বাস্থ্যবিধানের উপরেও একটু দৃষ্টি রাখিতে পারিবেন বলিয়া আশা হয়।

কোন্ খাদ্য হইতে কি পরিমাণ তাপ পাওয়া যায়, তাহা মোটামুটি স্থির থাকিলেও খুঁটিনাটিতে যথেষ্ট মতদ্বৈধ আছে। জগদ্বিখ্যাত জীবতত্ত্ববিদ্ লিবিগ্ (Liebig) সাহেব আমাদের সাধারণ খাদ্যকে মাংসবর্দ্ধক ও তাপবর্দ্ধক এই দুই প্রধানভাগে ভাগ করিতেন। এই বিভাগ অনুসারে আমিষ খাদ্য মাংসবর্দ্ধক এবং শ্বেতসার (Starch), চিনি ও তৈল ঘৃতাদি তাপবর্দ্ধক বলিয়া আজও স্বীকৃত হইতেছে। তবে লিবিগ্ সাহেব আমিষ খাদ্যকে কেবলি মাংসবর্দ্ধক বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ তাহা স্বীকার করিতেছেন না। ইঁহাদের মতে, আমিষের কোন অংশই বৃথা যায় না। ইহাতে যে নাইট্রোজেন্ থাকে তাহা দেহের ক্ষয়পূরণ করে এবং তারপরে নাইট্রোজেন্ বর্জ্জিত যে অংশটা অবশিষ্ট থাকে উহা তাপোৎপত্তির কার্য্যে নিযুক্ত হয়।

আমাদের দেহে নিয়ত যে তাপের উৎপত্তি হইতেছে, তাহার কত ভাগ কি প্রকারে দেহ হইতে নির্গত হয়, ইহারও একটা মোটামুটি হিসাব করা হইয়াছে। এই হিসাবে দেখা যায়, সমবেত তাপের শতকরা ৭৩ ভাগ দেহ হইতে বিকীর্ণ হইয়া পার্শ্বের বায়ুকে উত্তপ্ত করে এবং ২২ ভাগ শ্বাসযন্ত্র ও চর্ম্মের জলীয় অংশকে বাষ্পীভূত করে। ইহার পর যে পাঁচ ভাগ অবশিষ্ট থাকে, কেবল তাহাই প্রশ্বাসের বায়ু ও মলমূত্রাদিকে গরম করিতে ব্যয়িত হয়। কম্বল বা অপর পশমী বস্ত্র গায়ে জড়াইলে কেন উষ্ণতা অনুভূত হয়, দেহ নির্গত তাপের কথা মনে করিলে তাহা বেশ বুঝা যায়। পশমী বস্ত্র তাপের পরিচালক নয়; কাজেই এই প্রকার কাপড়ে শরীর আবৃত রাখিলে, পূর্ব্বোক্ত শতকরা ৭৫ ভাগ তাপ দেহ ত্যাগ করিয়া দূরে যাইতে পারে না;—শরীরের চারি পাশের বায়ুতেই তাহা আবদ্ধ থাকে। এই কারণেই পশমী কাপড় গরম কাপড় নামে খ্যাত।

সভ্য মানুষ এত শিল্পকুশলী হইয়াও শিল্পনৈপুণ্যে অদ্যাপি প্রকৃতির সমকক্ষ হয় নাই। প্রাণীর দেহ কেবল মাত্র যন্ত্র নয়, এপ্রকার সর্ব্বাঙ্গসুন্দর আর একটী যন্ত্র ইউরোপ বা আমেরিকার কোন কারখানায় মেলা ভার। আজ কাল আমরা যে সকল বাষ্পযন্ত্রকে খুব ভাল বলি, তাহাতে কয়লা পোড়াইলে কয়লার শক্তির শতকরা বার ভাগ মাত্র চাকা ইত্যাদি ঘুরাইয়া কাজ করে, অবশিষ্ট ৮৮ ভাগ তাপ ইত্যাদির আকার গ্রহণ করিয়া নষ্ট হইয়া যায়। এই অপচয় বড় কম নয়। প্রকৃতির স্ব-হস্তনির্ম্মিত যন্ত্রে যে অপব্যয় নাই, একথা বলা যায় না; কিন্তু বাষ্প-যন্ত্রের অপচয়ের তুলনায় ইহার পরিমাণ

অনেক অল্প। হিসাব করিলে দেখা যায়, খাদ্য দ্রব্য হইতে দেহে যে শক্তির উৎপত্তি হয়, তাহার শতকরা পঁচিশ ভাগ প্রকৃত কাজে লাগে এবং অবশিষ্ট ৭৫ ভাগ দেহকে গরম করিয়াই ব্যয়িত হয়। কিন্তু এই গরম করা ব্যাপারটাকে কোনক্রমে অনাবশ্যক কাজ বলা যায় না। দেহ সামগ্রী (Protoplasm) দ্বারা কাজ চালাইতে হইলে, তাহাকে উষ্ণ রাখা একান্ত প্রয়োজন। সুতরাং দেহ-শক্তির যে শতকরা ৭৫ ভাগ তাপে পরিণত হয় তাহাকে কোন ক্রমে অপব্যয় বলা চলে না। কিন্তু বাষ্প যন্ত্রে সেই ৮৮ ভাগের সত্যই অপব্যয় হয়।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি শারীরিক উষ্ণতাকে নির্দ্দিষ্ট রাখা এক শ্রেণীর প্রাণীর প্রধান ধর্ম্ম। মানুষ এই শ্রেণীরই অন্তর্গত। অতি শীতে বা অতি গরমে মানব দেহের সেই সাড়ে আটানব্বই ডিগ্রি উষ্ণতার কখনই পরিবর্ত্তন হয় না। যে প্রক্রিয়ায় দৈহিক উষ্ণতা এই প্রকার চির নির্দ্দিষ্ট থাকে, আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ তাহারো সন্ধান পাইয়াছেন। ইঁহারা এই ব্যাপারটীর ব্যাখ্যানে বলেন, উন্নত প্রাণীর দেহকে যে স্নায়ুমণ্ডলী (Nervous System) আচ্ছন্ন করিয়া আছে, তাহাই দৈহিক উষ্ণতাকে স্থির রাখে। মনে করা যাউক যেন কোন স্তন্যপায়ী প্রাণী বা মানুষকে বরফ-গলা জলে ডুবাইয়া তাহার তাপ হরণ করা যাইতেছে। কিয়ৎকালের জন্য তাহার দেহের তাপ অবশ্যই কমিয়া আসিবে; কিন্তু শেষে দেখা যাইবে, বরফ-জল স্থায়ী ভাবে দেহ তাপকে কমাইতে পারিতেছে না। জল যেমন তাপ হরণ করিতেছে, তেমনি কোথা হইতে নূতন তাপ আসিয়া ক্ষয়ের পূরণ করিতেছে। আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ এই অদ্ভুত ব্যাপারের ব্যাখ্যানে বলিতেছেন, গাত্রের উষ্ণতা কমিবামাত্র সর্ব্বাঙ্গের স্নায়ুজাল তাপ হরণ সংবাদ স্নায়ু কেন্দ্র গুলিতে পৌঁছাইয়া দেয়। স্নায়ু কেন্দ্র এই দুঃসংবাদে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে না; সর্ব্বাঙ্গের পেশীগুলি যাহাতে সঙ্কুচিত হইয়া যথাবিধি তাপ উৎপন্ন করে তাহার জন্য সমগ্র দেহে উত্তেজনা প্রেরিত হয়। স্নায়ুর আদেশকে অবহেলা করার সামর্থ্য কোন অঙ্গেরই নাই। কাজেই স্নায়বিক উত্তেজনায় পেশী সঙ্কুচিত হইয়া তাপ উৎপন্ন করিতে থাকে, এবং এই তাপই ক্ষয়পূরণের পক্ষে প্রচুর হয়। অধিক শীতে দেহের কম্পন হয়, তাহা ঐ স্নায়বিক উত্তেজনাজাত পেশীর সঙ্কোচ ব্যতীত আর কিছুই নয়।

জমাখরচের খাতায় জমার অঙ্কে যখন বৃদ্ধি দেখাযায় হিসাবী লোককে ইহার দুই প্রকার কারণ উল্লেখ করিতে দেখা যায়। খরচের পরিবর্ত্তন না করিয়া জমার ঘরে নূতন কিছু যোগ করিতে থাকিলে জমার বৃদ্ধি হয়; তা' ছাড়া খরচ কমাইতে থাকিলেও জমার অঙ্ক বাড়িয়া চলে। নানাপ্রকার ব্যাধিতে আমাদের দৈহিক উত্তাপের যে বৃদ্ধি দেখা যায় তাহাতে খরচ কমা ও জমা বাড়া এই দুয়েরই কার্য্য ধরা পড়িয়াছে। সুস্থ মানুষের দেহের উষ্ণতা প্রায় সাড়ে আটানব্বই ডিগ্রি, কিন্তু জ্বর হইলে তাহা বাড়িয়া কখন কখন একশত ছয় বা সাত হইয়া দাঁড়ায়। সত্য সত্য তাপ বাড়িয়া এই উষ্ণতা প্রকাশ করে, কিংবা অসুস্থ মানুষ তাপ-বিকিরণ করিতে না পারিয়া স্বাভাবিক তাপকে জমাইয়া এই বৃদ্ধি দেখায়, শরীরতত্ত্ববিদ্‌গণ বহু চেষ্টাতেও নিঃসন্দেহে তাহা স্থির করিতে পারেন নাই। বিখ্যাত ইংরেজ শরীরবিদ্ ডাক্তার হোয়াইট্ (Dr. Hale White) সম্প্রতি এসম্বন্ধে যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহাই এখন যথার্থ বলিয়া স্বীকৃত হইতেছে। ইনি বলিতেছেন, নিউমোনিয়া অর্থাৎ শ্বাস-যন্ত্রের প্রদাহ এবং রিসিপেলাস্ প্রভৃতি রোগে দেহতাপের যে বৃদ্ধি হয়, তাহা প্রকৃতই তাপবৃদ্ধির ফল। এই অবস্থায় দেহে সত্যই তাপের বৃদ্ধি হয়, কিন্তু খরচ পূর্ব্বের মতই চলে; সুতরাং দেহ পূর্ব্বাপেক্ষা উষ্ণ হইয়া পড়ে। শরীরের কোন অংশে পুঁজের সঞ্চয় হইতে থাকিলে যে তাপ বৃদ্ধি হয়, তাহার কারণ উহারি ঠিক বিপরীত। অর্থাৎ এই অবস্থায় তাপের উৎপত্তি পূর্ব্বের ন্যায়ই চলে, কিন্তু শরীরের তাপ বিকিরণ শক্তি কমিয়া আসে বলিয়া, উষ্ণতার মাত্রা বৃদ্ধি পাইয়া যায়।

ম্যালেরিয়া প্রভৃতি জ্বরে দৈহিক উষ্ণতার যে আকস্মিক বৃদ্ধি দেখা যায়, তাহার কারণটা কিছু স্বতন্ত্র। বাহির হইতে কোনপ্রকার আঘাত-উত্তেজনা পাইলেই জীবদেহের আহত অংশ সহজে উত্তেজিত হইয়া পড়ে;

কিন্তু মৃত বা নির্জীব পদার্থে আঘাত দিলে, তাহা ঐ প্রকার সাড়া দেয় না। সজীব পদার্থের এই সাড়া দেওয়া ব্যাপারে একটা গভীর তত্ত্ব নিহিত আছে। বৈজ্ঞানিকগণ দেখিয়াছেন, আঘাতে উত্তেজিত হইয়া পড়া জীবনীশক্তিরই প্রধান লক্ষণ এবং উত্তেজিত হইয়া সাড়া দেয় বলিয়াই আহত অংশ আঘাতের অপকারিতা হইতে মুক্তি লাভ করে। সুতরাং সবল রোগীর দেহে ম্যালেরিয়ার সেই কোটি কোটি জীবাণু আশ্রয় গ্রহণ করিয়া যখন দেহ-কোষগুলিতে আঘাত দিতে থাকে, তখন সেই আহত কোষগুলি নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিতে পারে না; অস্তিত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য তাহারা আপনা হইতেই চঞ্চল ও উত্তেজিত হইয়া প্রতিক্রিয়ার আরম্ভ করিয়া দেয়। কাজেই ইহাতে দেহের তাপের মাত্রা বাড়িয়া চলে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, সাধারণ জ্বরে দেহের যে উষ্ণতা বৃদ্ধি হয়, তাহা ব্যাধি নয়, বরং ব্যাধি প্রশমনেরই একটা উপায়। কিছুদিন পূর্ব্বেও চিকিৎসকগণ নানা ঔষধ প্রয়োগে জোর করিয়া জ্বরের তাপ কমাইবার চেষ্টা করিতেন। আজকাল এই চিকিৎসা-পদ্ধতির বড় প্রচলন দেখা যায় না। যে সকল ঔষধ জীবাণু-নাশ করিয়া উত্তেজনার মূল কারণটিকে উন্মূলিত করে, সাধারণ জ্বরের চিকিৎসায় এখন তাহাদেরি আদর বাড়িতেছে। কুইনিন্ জ্বরের তাপকে কমায় না, যে সকল জীবাণু দেহে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তাপের উৎপত্তি করে তাহাদিগকে নষ্ট করে বলিয়াই উহার এত আদর।

জ্বরে যে তাপের বৃদ্ধি দেখা যায়, তাহা দেহ রক্ষার জন্যই হয় সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া অত্যধিক তাপ যে স্বাস্থ্যের হানিকর নয়, এ কথা কখনই বলা যায় না। পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে মানব-দেহের উষ্ণতা কোন ক্রমে দীর্ঘকালের জন্য ১০৮ ডিগ্রি হইয়া দাঁড়াইলে মস্তিষ্ক স্থায়িরূপে বিকৃত হইয়া পড়ে। এই অবস্থায় মানুষের মৃত্যু নিশ্চিত। তারপরে যদি উষ্ণতা বাড়িয়া ক্ষণিকের জন্যও ১১৬ ডিগ্রি হইয়া দাঁড়ায়, তবে আর কোন ক্রমে নিস্তার থাকে না। সর্দ্দি-গর্ম্মি (Sun Stroke) পীড়াটা মস্তিষ্ক-বিকৃতিরই ফল। পক্ষান্তরে কোন কারণে যদি দেহের উষ্ণতা দীর্ঘকালের জন্য সেই সাড়ে আটানব্বইয়ের নীচে নামে তাহা হইলেও জীবন রক্ষা দায় হয়। অধিক শীত দেহের সর্ব্বাংশকে ধীরে ধীরে নির্জীব করে। কিছুকালের জন্য শারীরিক উষ্ণতা আশী ডিগ্রির নীচে আসিয়া দাঁড়াইলে, মানুষের মৃত্যু প্রায়ই অনিবার্য্য হইয়া দাঁড়ায়।

শ্রীজগদানন্দ রায়।

প্রার্থনা।

অন্তর্য্যামী জানিছ সকল
প্রয়োজন কিবা বলিবার
কি বলিব বুঝিনা যখন
চাহিব কি বিপুল ব্যাপার!
পরাহত বচন অক্ষর
ভাষা নাই করিতে ব্যকত
হৃদয়ের আকুল উচ্ছ্বাস
চিরদিন ও চরণে নত।
দিও নাথ এমন দর্শন
যে দর্শনে পূরে সব সাধ
পৃথিবীর দৃশ্য আঁখি মেলে
দেখিবারে ঘটায় বিবাদ!
শুনাইও সে সুধা শ্রবণে
যাহে হয় বধির শ্রবণ
পৃথিবীর বৃথা কোলাহল
নাহি পশে শ্রবণে কখন।
দিও প্রাণে এমন আলোক
ঘুচে যাহে প্রাণের আঁধার
অপরূপ চিন্ময় সুন্দর—
উজলিবে হৃদয় আগার
দিও নাথ এমন রতন
যাহা পেলে তুচ্ছ সমুদয়
ত্রিলোকের সৌভাগ্য সম্পদ—
শ্রীচরণ দিওগো আমায়,
কর মোরে নির্ব্বোধ অজ্ঞান
দিয়ে সেই অচিন্ত্য চিন্ত।

যে চিন্তায় চিন্তামণি লভি
বৃথা চিন্তা করে পলায়ন।
দিও মোরে সেই নিত্য প্রেম
যাহে হয় সব একাকার
তোমা ময় হেরিয়া জগত
বিলাইব মমতা আসার।
কি আর বলিব প্রভু
জানিতেছ অন্তর বাসনা
তোমাময় কর এ জীবন
নাহি মম অপর সাধনা।

অম্বিকাসুন্দরী দাশ গুপ্তা

মায়ের রাগ।

ইছামতীর তীরে তাহারা ছেলেবেলায় একত্র অনেক খেলা করিয়াছিল। তাহাদের বয়সে বেশ পার্থক্য ছিল, কিন্তু বাল্যের কতকটা সময় দুই চারি বৎসরের পার্থক্য একত্র খেলা করিবার পক্ষে একটা অন্তরায় বলিয়া গণনার মধ্যেই আসে না।

কিন্তু তার পর? তারপর পুরুষ ও নারীর মধ্যে একটা ভেদজ্ঞান আসে, কাজেই তাহাদের কাজের ক্ষেত্র স্বতন্ত্র হইয়া যায়।

ইছামতীর তীরেই বিধবা তাহার একটি মাত্র পুত্রকে লইয়া বাস করিত। ছেলেটি ছাত্রবৃত্তিতে বৃত্তি-পাইয়াছিল; আবার প্রবেশিকায় যখন তাহার বৃত্তি লাভ হইল বৃদ্ধা তখন অবসর পাইলে একই চিন্তার রোমন্থন করিতে লাগিল,—বড়ঘরে ছেলের বিবাহ দিয়া একটি ফুটফুটে বৌ ঘরে আনিবে।

কিন্তু ইছামতীর দুই তীরে যে নিবিড় শ্যামলতার ছবি আর তার মাঝখানে স্বচ্ছন্দ প্রবাহিত যে কালো জলস্রোত এই দুইয়ের মধ্যে কি যে একটা মোহ ছিল তাহা বৃদ্ধা না বুঝিলেও তার ছেলে তাহা বেশ বুঝিত। প্রতিবেশীর মেয়ে রাধার জরিপেড়ে নীলাম্বরী শাড়ী ও টানা-টানা চোখের কাজলের সহিত সে যেন ইহাদের একটা সাদৃশ্য অনুভব করিত।

বৃদ্ধার কাছে রাধাকে বউ করিবার কথা লোকে বলিয়াছিল। বৃদ্ধা তাহাতে রাজি হয় নাই। তাহার পাশকরা কার্ত্তিকের মত ছেলেটি, সে কি না প্রতিবেশীর ঐ আধময়লা মেয়ে রাধার সঙ্গে ছেলের বিয়ে দিবে! প্রাণ গেলেও না। বৃদ্ধা তাহার বিরক্তির আবেগ শিথিল ওষ্ঠাধরে চাপিতে পারিল না। ইহার পর হইতে সে মনে মনে তাহার পূর্ব্বের সুখস্বপ্ন আরো বেশি করিয়া জপিতে লাগিল।

কিন্তু কেহ জানিবার পূর্ব্বেই একদিন গভীর রাত্রে পুরোহিত আসিয়া রাধার সহিত বৃদ্ধার ছেলের হাত বাঁধিয়া দিয়া গেল। কন্যার গৃহে যখন মঙ্গলসূচক শঙ্খ বাজিতেছিল বৃদ্ধা তখন তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় প্রতিবেশীর গৃহে আসন্নপ্রসবা বধূর পুত্ররত্ন লাভ হইল এইরূপ কল্পনা করিতেছিল।

পরদিন যখন চেলিপরিহিতা, অবগুণ্ঠিতা রাধা পাল্কী হইতে নামিল তখন কেহ তাহার অভ্যর্থনা করিল না। নিরানন্দ, শূন্য প্রাঙ্গণের উপর দিয়া বরবধূ দুজনে দাবায় উঠিল। কুটিরের মেঝেয় মাদুরের উপর বৃদ্ধা বসিয়াছিল। তাহাদের দেখিয়া সে দুই হাতে বুক চাপড়াইয়া কাঁদিতে লাগিল। বরবধূ নির্ব্বাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

রাধা বাড়ী হইতে আসিবার সময়েই কাঁদিয়া আসিয়াছিল, নূতন গৃহে এই নূতন অভ্যর্থনায় তাহার চক্ষুর্দ্বয় আবার আর্দ্র হইল। বৃদ্ধা তাহাকে বার বার দূর হইয়া যাইতে বলিল। নিজের ছেলেটিকে সে কিছুই বলিল না—তাহার সমস্ত রাগটা রাধার উপর গিয়া পড়িল। রাধা পাকশালার দাবায় আশ্রয় লইল।

রাত্রি দ্বিপ্রহরে বৃদ্ধা গৃহ হইতে কেরোসিন তৈলের একটি ডিবা লইয়া রাধার সন্ধান আরম্ভ করিল। নিজের গৃহের দাবায় তাহাকে না পাইয়া অবশেষে রন্ধনগৃহের দাবায় তাহাকে নিদ্রিতাবস্থায় দেখিতে পাইল। নিদ্রিতা-বস্থায় অবগুণ্ঠন-মুক্ত বধূকে দেখিয়া সে বুঝিল এ আগে-কার সে আধময়লা রাধা নয়। চক্ষু দুইটি মুদ্রিত হইলেও তাহা যে ঘনপক্ষ ও আয়ত তাহা সে বেশ বুঝিতে পারিল। একটি অপূর্ব্ব লাবণ্য তাহার সেই নিদ্রামূর্চ্ছিত সুকোমল

তনুটিকে ভরপূর করিয়া রাখিয়াছে তাহাও সে অনুভব করিল; কিন্তু রাগ পাছে পড়িয়া যায় এই জন্য সে চেষ্টা করিয়া একটু কঠোর স্বরে বলিল, "ওঠ্ ওঠ্ বেরো এ বাড়ী থেকে, তুই এখানে থাক্‌তে আমি জল স্পর্শ করিব না।"

বৃদ্ধা তাহাকে হাত ধরিয়া বাহির করিয়া দিল।

আষাঢ় মাস গিয়া শ্রাবণ পড়িয়াছে। বর্ষার জল লাগিয়া বৃদ্ধার বাত বাড়িয়াছে। স্নান একপ্রকার বন্ধ। যদি বা কোনদিন স্নান ঘটে তো স্নানান্তে কাপড় খানি কাচিয়া তাহার জল নিঙ্‌ড়াইবার জন্য প্রতিবেশিনীর সাহায্য লইতে হয়। বুড়ী যত দিন উঠিতে পারিয়াছিল তত দিন বাড়ীর একটা শ্রী ছিল; বর্ষা পড়িলেও তাহার অন্দরের উঠানে একটি ঘাসও মাথা তুলিতে পারে নাই। ছেলেটি রন্ধনশালায় যাইতে বাধ্য হইয়াছে। অনভ্যাস-বশতঃ রন্ধন কার্য্যে তাহার প্রায়ই অস্বাভাবিক বিলম্ব হয় ও নিত্য নূতন ত্রুটি থাকিয়া যায়।

একদিন মধ্যাহ্নে বৃদ্ধা লাঠির উপর ভর দিয়া উঠানে নামিল। নিড়ান লইয়া পূর্ব্বের অভ্যাস মত ঘাস ও বুনো গাছের চারা উঠাইবার চেষ্টা করিয়া দেখিল, কিন্তু কব্জিতে জোর পাইল না, তখন আবার হতাশ ভাবে লাঠিতে ভর দিয়া দাবায় উঠিয়া নিড়ানটি চালের বাতায় গুঁজিয়া রাখিল। ছেলে আসিয়া দেখিল মা তখনো হাঁফাইতেছে। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে জননী কতকটা আত্ম-গোপন করিয়া বলিল, "কিছু না, একটু ঘাস নিড়াতে উঠানে নেমেছিলাম তাই।"

পুত্র সেইদিন রাত্রে বৃদ্ধাকে কিছু না বলিয়া রাধাকে গৃহে লইয়া আসিল।

রন্ধনগৃহের দাবায় হোগলা দিয়া ঘেরা একটি ছোট কুঠরির মত ছিল। বরবধূ সেইখানে আশ্রয় লইল। খিড়কির ঘাটে জলের ধারে রাশি রাশি কেয়াফুল ফুটিয়া-ছিল তাহার সৌরভ তাহাদের সেই ক্ষুদ্র নীড়টিতে আসিয়া পৌঁছিতেছিল। শয়নের পূর্ব্বে বর বধূকে জিজ্ঞাসা করিল, "রাধা ও কি, কেয়াফুলের গন্ধ নয়?" রাধা ম্লান হাসি হাসিয়া ঘাড় নাড়িয়া হাঁ বলিল। হঠাৎ বরের কি মনে হইল সে ছুটিয়া দাবা হইতে নামিয়া বাহিরে চলিয়া গেল; অল্পক্ষণের মধ্যেই সে কোঁচার কাপড়ে একরাশ রজনীগন্ধা ও কদম্বফুল আনিয়া তাহাদের সেই অনাড়ম্বর বিছানার উপর ঢালিয়া দিয়া বলিল, "রাধা আমি ভুলে গিয়াছিলাম, আজ যে আমা-দের ফুলশয্যা, এস আজ আমাদের ফুলশয্যার রাত্রি যেন ব্যর্থ না হয়।" এই বলিয়া দুইখানি কালো মেঘের মাঝখানে এক টুক্‌রা সোনালি মেঘের মত তাহার সিন্দূরাঙ্কিত স্বল্পপরিসর ললাটে একটি চুম্বন মুদ্রিত করিয়া দিল।

পরদিন প্রাতে বৃদ্ধা যখন শয্যা ত্যাগ করিয়া ঘরের বাহিরে আসিল তখন রৌদ্রে উঠান ভরিয়া গিয়াছে। অন্ধকার গৃহ হইতে বাহিরে আসিলে তাহার চক্ষে তীব্র আলোক পড়িল। দুই তিনবার থানের খুঁটে চোক মুছিয়া সে দেখিল গৃহের দাবা উঠান ও চারিদিক পরিচ্ছন্ন ও পরিষ্কৃত। কাল যে উঠান ঘাস ও চারা বুনো গাছে পূর্ণ ছিল আজ তাহা গোময় লিপ্ত হওয়ায় তক্ তক্ করিতেছে। দাবাগুলিরও শ্রী ফিরিয়া গিয়াছে। বৃদ্ধার কৌতূহল জন্মিল। কৌতূহলবশতঃ তাহার দুর্ব্বলতা যেন কতকটা হ্রাস পাইল। বিনা লাঠিতে বৃদ্ধা ধীরে ধীরে উঠানে নামিল, তাহার পর রন্ধনশালার নিকট গিয়া দেখিল কেহ তাহার ভিতরে কাজ করিতেছে। বৃদ্ধার কেমন একটা উৎকণ্ঠা জন্মিল; কোনো কথা কহিবার পূর্ব্বেই রাধা আসিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া তাহাকে একটি প্রণাম করিল। বৃদ্ধা কিছুই বলিল না, দাবার খুঁটি ধরিয়া বসিয়া পড়িল। অনেকক্ষণ সে এইরূপে বসিয়া থাকিয়া অবশেষে সেখান হইতে উঠিয়া গিয়া শয়নগৃহের দাবায় মাদুর পাতিয়া শয়ন করিল।

মধ্যাহ্ন অতীত প্রায়, এমন সময় পুত্র সভয়ে গৃহে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল বধূ তাহার জননীর পায়ে কবি-রাজী তৈল মালিশ করিতেছে। বৃদ্ধা অর্দ্ধনিমীলিত নেত্রে বধূর এই স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সেবার দুর্লভ সুখটুকু উপভোগ করিতেছিল। পদশব্দে পুত্রের আগমন জানিতে পারিয়া বৃদ্ধা সেই অর্দ্ধনিমীলিতাবস্থাতেই বলিল, "বাবা এতদিন বৌমাকে খালিহাতে রেখেছ কেন, দু'গাছা যেমন-তেমন দিয়ে কাচের চুড়িগুলো ভেঙে দিয়ো।"

পুত্রের মুখমণ্ডল হইতে আশঙ্কার মেঘ কাটিয়া গেল; সে বলিল, "মা তোমার রাগ পড়েছে? আজ তিন মাস পরে তুমি আমার সঙ্গে ভালো করে কথা কইলে!"

বৃদ্ধা বলিল, "বাবা মায়ের রাগ আর ছেলের উপর কতদিন থাকে? মায়ের রাগ বৈতো নয়!"

পুত্র আসিয়া আর্দ্রনেত্রে মাকে প্রণাম করিল। মা তাহার মস্তক আঘ্রাণ করিলেন। বধূ সেখান হইতে উঠিয়া রন্ধনশালার দিকে চলিয়া গেল। এমন অনাড়ম্বর অথচ যথার্থ পাকস্পর্শের অনুষ্ঠান সে গ্রামে আর কাহারো বাড়ীতে কখনো হয় নাই।

শ্রীইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়।

কামিনী।

সুন্দরী তুমি অন্তরে মম
শুভ্র কুসুম কামিনী!
নন্দন হতে নশ্বর বলে'
রঞ্জিছ তুমি মর্ত্ত্যের কোলে,
মাধুরী বিভোর কান্তি তোমার
কানন কুঞ্জ বাসিনী!

প্রীতিতে চিত্ত ভরিয়া নিত্য
হাসিছ ফুল্ল হাসিনী!
আপন মানসে বিকাশগুচ্ছে
সুরভি অঙ্গ-মণ্ডিতা!
নন্দিত মনে মত্ত পবন
অন্তরে ভরি গন্ধ শোভন,
গহনে ভবনে হিল্লোলে চলে
পল্লব অবগুণ্ঠিতা!
অঞ্জনে মধু গুঞ্জরে অলি
মুগ্ধ ভ্রমর চুম্বিতা!

তোমারি লাবণ্য অমল সুরভি
ললিত ললনা অঙ্গে
হৃদি কোষ ভরা আছে তব মধু,
লজ্জা রেখেছে আবরিয়া বধূ
তোমারি সুষমা চির মনোরমা
বদ্ধ ললনা সঙ্গে;
পরশের ভর সহিতে কাতর
ঝরিছ বিকাশ সঙ্গে

শিশির সিক্ত ফুল্ল হৃদয়ে
রচিছ কাহার অর্ঘ্য?
রূপ রসে কারে দিতেছ আরতি
সমীরে দুলিয়া করিছ প্রণতি
শরণ লইতে করিছ চরণে
আপনারে উৎসর্গ?
মাধুরী এনেছ নন্দন হতে
ধরায় এনেছ স্বর্গ।

শ্রীবিজয়াকান্ত লাহিড়ী চৌধুরী।

আলোচনা।

নমঃশূদ্র জাতি।

বাহ্য জগৎ হইতে খাদ্য আহরণ এবং স্বীয় শরীরে উহার সমীকরণ জীবনের প্রধান চিহ্ন। যদি কোন ও প্রাণী বাহ্য জগৎ হইতে খাদ্য আহরণ করিয়া উহাকে স্বীয় শরীরের অংশরূপে পরিণত করিতে না পারে, তবে তাহার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। ইহা প্রাণিজগতের সুবিদিত নিয়ম।

সমাজ সম্বন্ধেও এই নিয়ম খাটে। সমাজ যত দিন জীবন্ত থাকে, ততদিন উহা অপরাপর সমাজ হইতে লোক গ্রহণ করিয়া স্বীয় পুষ্টি সাধন করিতে পারে, উহাদিগকে আপনারই অঙ্গ করিয়া লইতে পারে। হিন্দু সমাজ যে এখনও কথঞ্চিৎ জীবন্ত আছে, প্রত্যেক লোকগণনায়, তাহার একটু আভাস পাওয়া যায়। এখনও অনেকানেক পার্ব্বত্য অনার্য্য জাতি ক্রমে সভ্য হইয়া হিন্দু হইয়া যাইতেছে। এজন্য হিন্দু সমাজের কোনও চেষ্টা নাই, হিন্দু সমাজে প্রকৃত মিশনরী বা প্রচারক নাই। এই বিষয়ে, হিন্দুসমাজকে জীবরাজ্যের নিম্নতম শ্রেণীর সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। জীব-রাজ্যের নিম্নতম সীমায় এমন জীব আছে যাহারা নড়ে

চড়ে না, এক জায়গায় স্থির হইয়া থাকে। উহাদের অঙ্গ খাদ্য সলিলে ডোবান থাকে। আহার্য্য সামগ্রী ভাসিতে ভাসিতে আসিয়া ঐ সকল জীবের শরীর স্পর্শ করে এবং উহারা তখন ঐ সকল শরীরস্পর্শি খাদ্য গ্রহণ করে। খাদ্য সংগ্রহের জন্য উহারা নিজে কোনও চেষ্টা করে না। বর্ত্তমান হিন্দুসমাজের অবস্থা ও ঠিক ঐ রূপ। স্বীয় অঙ্গ-পুষ্টির জন্য হিন্দুসমাজ চেষ্টা বিরহিত। তথাপি হিন্দুসমাজ সংস্পর্শী পার্ব্বত্য জাতিরা আপনা আপনি আসিয়া ক্রমে হিন্দু সমাজদেহে প্রবেশ করিতেছে। যে সকল সমাজে প্রচারক আছে, তাহারা উচ্চতর প্রাণীর মত, নিজের অঙ্গপুষ্টির জন্য বিবিধ চেষ্টা করিয়া থাকে।

হিন্দুদের এই নিশ্চেষ্ট ভাব বরাবর ছিল না। প্রাচীন কালে অনেক অহিন্দু, অনেক অনার্য্য হিন্দু হইয়া ছিল, এবং তজ্জন্য সমাজের চেষ্টাও ছিল। এ বিষয়ে বহুতর প্রমাণ সংগৃহীত করিয়া শ্রীযুক্ত রায় সাহেব দেবদত্ত রাম কৃষ্ণ ভাণ্ডারকার এম, এ মহোদয় ইণ্ডিয়ান এন্‌টি-কোয়ারি (Indian Antiquary) পত্রে একটি উপাদেয় প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে অনেক অনার্য্য হিন্দু সমাজে প্রবেশ করিয়াছেন, এবং তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি শ্রেষ্ঠবর্ণে পরিগৃহীত হইয়াছেন। ইহা খুবই সম্ভব, কেননা হিন্দু সমাজ তখন পূর্ণরূপে জীবন্ত সমাজ ছিল। জীবনের প্রধানচিহ্ন বাহ্যজগত হইতে খাদ্য আহরণ ও উহাকে নিজের করিয়া লওয়া। অতএব তখনকার হিন্দু সমাজে যে অহিন্দুর প্রবেশ খুবই হইত ইহা সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত।

পূর্ব্ববঙ্গের নমঃশূদ্রজাতি সংখ্যাধিক্য, শারীরিক বল, ঐক্য ও তেজস্বিতার জন্য প্রসিদ্ধ। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে, উহারা প্রধানতঃ বঙ্গের আদিমনিবাসী অনার্য্যদিগের সন্তান। এ বিষয়ে আবার কেহ কেহ আপত্তিও করেন। তাঁহারা বলেন যে "অহিন্দুর হিন্দুত্ব প্রাপ্তি ঘটিলে, উহারা কোনও চিরপ্রসিদ্ধ জাতির মধ্যে গৃহীত হইতে পারে না। অতএব চণ্ডালেরা অনার্য্য নহে, উহারা বস্তুতই ব্রাহ্মণীর গর্ভে শূদ্রের ঔরসে জন্মিয়াছে।" এ যুক্তিটী এবং এ সিদ্ধান্তটী উভয়ই ভুল। অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে যে সকল অহিন্দু (আহোম, কাছার প্রভৃতি) হিন্দু হইয়াছে, তাহারা যে প্রায়শঃ মন্বাদি শাস্ত্রসিদ্ধ জাতির মধ্যে গৃহীত হয় নাই, তাহা ঠিক্। কিন্তু হিন্দুসমাজ প্রাচীন সমাজ। পাঁচ ছয়শত বৎসরের ইতিহাস দ্বারা ইহার প্রকৃতি নির্ণীত হইতে পারে না। তজ্জন্য সংস্কৃত ও পালি গ্রন্থাদির আশ্রয় লইতে হয়। প্রাচীনতর যুগে অনার্য্যেরা (অহিন্দুরা) হিন্দু হইতে পারিত এবং উহারা চিরপ্রসিদ্ধ জাতির মধ্যেও গণ্য হইতে পারিত। এবিষয়ে প্রোক্ত ভাণ্ডারকার মহোদয়ের প্রবন্ধই যথেষ্ট প্রমাণ। তাহা ছাড়া, আমাদের স্মৃতিতেও ম্লেচ্ছদের হিন্দুত্ব প্রাপ্তি সম্বন্ধে এবং নমঃশূদ্রদের উৎপত্তি ও পরিপুষ্টি সম্বন্ধে একটী অকাট্য নূতন প্রমাণ পাইয়াছি। মনুর প্রামাণিক ভাষ্যকার মেধাতিথি লিখিয়াছেন (২।২৩ শ্লোক)।

যদি কশ্চিৎ ক্ষত্রিয়াদিজাতীয়ো রাজা সাধ্বাচরণো ম্লেচ্ছান্ পরাজয়েত চাতুর্ব্বর্ণ্যং বাসয়েৎ ম্লেচ্ছাংশ্চ আর্য্যাবর্ত্ত ইব চাণ্ডালান্ ব্যবস্থাপয়েৎ সোঽপি স্যাৎ যজ্ঞিয়ঃ।" অর্থাৎ "যদি কোনও ক্ষত্রিয়াদিজাতীয় সদাচারপরায়ণ রাজা ম্লেচ্ছদিগকে পরাজিত করেন এবং উহাদের অধিকৃতস্থানে ব্রাহ্মণাদিবর্ণচতুষ্টয়ের উপনিবেশ স্থাপন করাইয়া [পরাজিত] ম্লেচ্ছদিগকে চণ্ডালরূপে হিন্দু-সমাজের অঙ্গীভূত করিয়া লন, তাহা হইলে, সে স্থান ও যজ্ঞিয় দেশ (অর্থাৎ হিন্দুর দেশ) বলিয়া গণ্য হইতে পারে। এইরূপ [ম্লেচ্ছদিগের চণ্ডালত্ব লাভ] আর্য্যা-বর্ত্তে ঘটিয়াছিল।

এখানে স্পষ্টই বলা হইল যে অনার্য্য ম্লেচ্ছেরা আর্য্যা-বর্ত্তে চণ্ডাল সমাজে গৃহীত হইয়াছিল।

শ্রীবনমালি বেদান্ততীর্থ।

উইল

(১)

রমানাথ বাবুর মৃতদেহ আঙ্গিনার বাহির হইতে না হইতেই জামাতা গোপীকৃষ্ণ নিজকে শ্বশুরের ত্যক্ত সম্পত্তির একমাত্র অধিকারী বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। তাঁহার উজ্জ্বল আশা—স্ত্রী সরোজিনী—রমানাথের একমাত্র কন্যা, নয় মাসের অন্তঃস্বত্বা।

রমানাথ বাবুর ভ্রাতুষ্পুত্রটীও বড় সহজপাত্র নহে। সে গোপীকৃষ্ণের প্রতি পদক্ষেপে বিঘ্ন উৎপাদন করিতে লাগিল। ফলে সেই শোক সন্তপ্ত পরিবারের মধ্যে প্রতিনিয়ত একটা অভাবনীয় ঘটনা সংঘটিত হইয়া যাইতে লাগিল এবং সেই শোক বিধবার হৃদয়কে ভয়ানক বিচলিত ও পীড়িত করিতে লাগিল।

রমানাথ উইল রাখিয়া গিয়াছেন। উইলে তিনি তাহার বিধবা পত্নীকে ক্রমে দেড় গণ্ডা পোষ্যপুত্র গ্রহণের অধিকার দিয়াছেন; পোষ্যপুত্রের অভাবে সমস্ত সম্পত্তি ভ্রাতুষ্পুত্র পাইবে। কন্যা সরোজিনী "মাসোহারা" পাইবেন মাত্র।

গোপীকৃষ্ণ বলিতেছেন "উইল—কৃত্রিম। রমানাথ বাবু কোন উইল করিয়া যাইতে পারেন নাই।" যাহা হউক এই উইল লইয়া নর্ত্তন, কুর্দ্দন, আস্ফালন উল্লম্ফনের অবধি রহিল না। একপক্ষ যতই মৃতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিত এবং তাহার পৈত্রিক নাম ও ভিটা বজায় রাখিতে প্রয়াস পাইতেছিলেন, অপর পক্ষ ততই উপেক্ষার সহিত সেই ইচ্ছা ও প্রয়াস ভিত্তিহীন করিয়া দিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এইরূপ তুমুল ঝটিকার মধ্যে রমানাথ বাবুর শ্রাদ্ধ ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া গেল।

(২)

মাসাধিক কাল চেষ্টা করিয়াও যখন গোপীকৃষ্ণ কিছুই করিতে পারিলেন না, তখন সেই পরিবারের অভ্যন্তরে একটা গুপ্তবহ্নি প্রজ্জলিত করিয়া স্বকার্য্য সাধনের উপায় খুজিতে প্রবৃত্ত হইলেন। গোপীকৃষ্ণ প্রত্যহ রজনীতে নূতন নূতন মন্ত্রে সরোজিনীকে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। সরোজিনীও স্বামীর মন্ত্রের সদ্ব্যবহার করিবার সুযোগ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন।

পতিবিয়োগবিধুরা বিধবা, শোকে জর্জ্জরিত। তাঁহার অনায়ক সংসার,—পতির নাম, যশঃ সকল ভাসিয়া যাইবার উপক্রম, এমন সময় আত্মীয়স্বজনের সহানুভূতিই একমাত্র সান্ত্বনার স্থল। তাহার পরিবর্ত্তে তিনি তাঁহার একমাত্র সুহৃদের লুব্ধদৃষ্টি দেখিয়া নিতান্তই অবসন্ন হইয়া পড়িলেন।

(৩)

গোপীকৃষ্ণ দেখিলেন শ্রাদ্ধ ব্যাপারে তাহার মতামত শীতলাকান্ত অনুমাত্রও গ্রাহ্য না করিয়া নিজ অভিপ্রায় অনুসারে প্রচুর ব্যয়বাহুল্য দ্বারা নিজ মুক্ত হস্তের পরিচয় প্রদান করিলেন। প্রলুব্ধ ভাবী উত্তরাধিকারী গোপীকৃষ্ণের পক্ষে তাহা বড়ই অসহ্য বোধ হইল। তিনি শ্বাশুরীকে ইহার জন্য বিস্তর তিরস্কার করিলেন এবং শীতলাকান্তের নিকট নিকাশ তলব করিলেন।

শীতলাকান্ত "নিকাশ দায়ে" থাকিতে ইচ্ছুক নহেন। গোপীকৃষ্ণের কথায় তিনি কর্ণপাতও করিলেন না কিন্তু নিকাশ প্রদান করা তাহার পক্ষে একটী গুরুতর কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করতঃ তৎসম্পাদনে যত্নশীল হইলেন। কিন্তু অকস্মাৎ সকল বিষয় চাপা পড়িয়া গেল। বিধির অবশ্যম্ভাবী বিধান অনুসারে গোপীকৃষ্ণের অন্তর্নিহিত সকল আশা ভরসার মূলচ্ছেদ করিয়া সরোজিনী একটা কন্যা সন্তান প্রসব করিল। নিরাশ হৃদয়ে গোপীকৃষ্ণ শ্বশুর বাড়ী পরিত্যাগ করিলেন।

(৪)

গোপীকৃষ্ণ গৃহে যাইয়া বিধবা শাশুরীকে হস্তগত করিবার পরামর্শ আটিতে লাগিলেন। সরোজিনী তখনও পিত্রালয়ে। গোপীকৃষ্ণ সরোজিনীকে আনিতে লোক পাঠাইলেন।

বিধবা বেদনার উপর বেদনা অনুভব করিলেন। এ সংসারে এখন একমাত্র সরোজিনীই তাহার অবলম্বন, সরোজিনীর বর্ত্তমান অবস্থায় তাহাকে স্থানান্তরে ছাড়িয়া দিতে বিধবার প্রাণ ফাটিয়া যাইতে লাগিল, তিনি সরোজিনীকে আরো কিছু কাল রাখিতে চাহিলেন।

সরোজিনী কিন্তু থাকিতে চাহিল না। মেয়ে অভিমানের কান্না কাঁদিয়া মায়ের কাটা ঘায়ে অতি সন্তর্পণে নুনের ছিটা দিতে লাগিল। মেয়ে অভিমান ভরে বলিল "তোমার নিকট থাকিয়া দুদিন সুখে কাটাইলে আর আমার কি হইবে? তোমার দুটো মুখের কথায় ত আর আমার পেট ভরিবে না" ইত্যাদি।

মেয়ের কথা মা শুনিলেন, বুঝিলেন; বুঝিয়া কাঁদিলেন। সরোজিনী সময় বুঝিয়া বলিল মা কাঁদিতেছ কেন? যখন তুমি নিজেই আমায় ঠেলিয়া ফেলিলে, তখন আর এ কান্নার অর্থ কি?

বিধবা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন "সরোজিনী বেদনার উপর আর বেদনা দিস্ না! আমার কি ইচ্ছা, যে তুই কষ্ট ভোগ করিস্?"

সরোজিনী যখন বুঝিল তাহার ক্ষুদ্র অভিমান মহৌষধির কার্য্য করিয়াছে তখন মার সঙ্গে নিজেও কাঁদিয়া ফেলিল। কাঁদিতে কাঁদিতে মাকে বলিল "মা সকলে আমাকে ত্যাগ করিতে পারেন, দাদা আমার নামও না লইতে পারেন, কিন্তু তুমি আমাকে ফেলিবে কেমন করিয়া? তুমি আমাকে ছাড়িতে পার না।"

শুনিয়া মা কাঁদিলেন; সরোজিনীও কাঁদিল। এই রূপে সে দিন কান্না কাটিতেই চলিয়া গেল। রাত্রে মা মেয়েতে অনেক কথাবার্ত্তা হইল। পর দিন সরোজিনী নিজেই লোক বিদায় করিয়া দিল। তাহার যাওয়া হইল না।

(৫)

কয়েক দিবস পর গোপীকৃষ্ণ পুনরায় আসিয়া দেখা দিলেন। এবার তিনি সরোজিনীকে নিজেই লইয়া যাইতে আসিয়াছেন। সরোজিনী অনেক কাঁদিয়া কাটিয়া মাকে ও সঙ্গে যাইতে অনুরোধ করিল, মেয়ের শরীরের অবস্থা দেখিয়া, বিধবা অনিচ্ছা সত্বেও যাইতে স্বীকৃত হইলেন। শীতলাকান্ত বাধা দিতে পারিলেন না। কিন্তু বুঝিলেন কার্য্যটা ভাল হইতেছে না।

বিধবা তাহার ক্ষুদ্র দৌহিত্রীটীকে বক্ষে লইয়া নৌকারোহণ করিলেন।

(৬)

সরোজিনী ও গোপীকৃষ্ণ প্রাণপণে বিধবার সেবা করিতে লাগিলেন। সরোজিনী অবসর পাইলেই তাহার ভবিষ্যত্ জীবনের একটা ঘোর অন্ধকারময় কাল্পনিক ছায়াচিত্র অঙ্কিত করিয়া মাকে দেখাইতেন এবং তাহাকে পোষ্যপুত্র গ্রহণরূপ একটী সম্পূর্ণ অসঙ্গত কার্য্য হইতে বিরত থাকিতে উপদেশ প্রদান করিতেন। গোপীকৃষ্ণ ও পাকেপ্রকারে উইলের কৃত্রিমতাটা বুঝাইয়া দিতে ক্রটী করিতেন না।

বিধবা এ সকল কথায় কোন উচ্চবাচ্য করিতেন না। কন্যাকে বুঝাইতেন "আমি থাকিতে যাহাতে তোমার কোন কষ্ট না হয় তাহা যে প্রকারেই হয় করিব।"

জামাতা গোপীকৃষ্ণ যখন শাশুরীকে এত করিয়াও উইলের কৃত্রিমতার সম্বন্ধে বিশ্বাস করাইতে পারিলেন না তখন তিনি অগত্যা শাশুরীর নিকট উইলটা দেখিতে চাহিলেন। বিধবা সস্নেহে বলিলেন "উইলটা আমার কাছে নাই বাবা।"

শাশুরীরএই স্নেহ মাখা উত্তর গোপীকৃষ্ণের কর্ণে বড়ই কর্কশ বোধ হইল। গোপীকৃষ্ণ আচ্ছা বলিয়া সেদিন রাগ করিয়া উঠিয়া গেল। ইহার পর গোপীকৃষ্ণ আরো ২।১ দিন দেখিলেন। কিন্তু কিছুতেই শাশুরীর মনের কপাট মুক্ত করিতে পারিলেন না। শেষে গোপীকৃষ্ণ অভিনব কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

(৭)

সেদিন একাদশীর উপবাস। গোপীকৃষ্ণ রাত্রে আহারের পর যাইয়া শাশুরীর নিকট বসিলেন। এ কথা সেকথা লইয়া অনেক বিষয়ে আলাপ হইল। সে দিন তাহার মুখ হইতে স্বার্থ সম্বন্ধে একটী কথাও বাহির হইল না। গোপীকৃষ্ণ নিজ হস্তে শাশুরীর জল খাওয়ার আয়োজন করিয়া দিলেন। তারপর অনেক রাত্রির পর—গোপীকৃষ্ণ উঠিয়া আসিলেন।

প্রত্যূষে উঠিয়া সরোজিনী দেখেন মা এখনও উঠেন নাই। আজ মার উঠিতে বিলম্ব হইতেছে কেন? সরোজিনীর হঠাৎ মনে হইল কাল গিয়াছে একাদশীর

স্বর্গীয় দুর্গামোহন দাস।

উপবাস। সরোজিনী ক্ষিপ্র হস্তে গৃহকর্ম্ম শেষ করিয়া ফেলিলেন, তথাপি মা উঠিলেন না। সরোজিনী দরজা খুলিয়া ঘরে প্রবেশ করিয়া মাকে ডাকিলেন। তারপর মার স্পন্দনরহিত মৃতদেহের উপর পড়িয়া চিৎকার করিতে লাগিলেন।

গোপীকৃষ্ণ সুযোগ অনুসন্ধান করিতেছিলেন, সরোজিনীর রোদন শুনিয়া দৌড়িয়া আসিয়া অলক্ষিতে বিধবার ক্ষুদ্র পেটিকাটী গ্রহণ করিলেন।

হায়, হায়, গোপীকৃষ্ণ উৎসুক নেত্রে পেটিকা তন্ন তন্ন করিয়া খুজিলেন তাহাতে উইল নাই। তৎপরিবর্ত্তে পাইলেন একখানা চিঠি—সে চিঠি জজের উকিলের উইলের প্রাপ্তি স্বীকার পত্র।

ছবি খাঁ

গৌরনদী থানা ও কোটালীপাড়ার প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই ছবি খাঁর জাঙ্গাল আছে। কোন কোন গ্রামে তৎকর্ত্তৃক খনিত দুই একটী বিশাল দীর্ঘিকা আজিও ছবি খাঁর কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। কতযুগ চলিয়া গিয়াছে, তথাপি এই সকল জলাশয়ের সলিল-সম্পদ হ্রাস পায় নাই। আজিও ছবিখাঁর পাড় ও ধরাধরের পাড়ের নিঃস্ব পল্লীবাসীগণ এই সকল পুরাতন জলাশয়ের নির্ম্মল জলে তৃষ্ণা নিবারণ করিতেছে, জলাশয়ের উচ্চ পাড়ের বন জঙ্গল দুর করিয়া, সেই সলিল নিসিক্ত উচ্চ ভূমিতে উৎপন্ন শস্যে জীবন ধারণ করিতেছে। কিন্তু জানিনা আজ তাহারা দিনান্তে একবারও কৃতজ্ঞ হৃদয়ে ছবি খাঁর নাম স্মরণ করে কিনা। গ্রামে গ্রামে ছবি খাঁর কীর্ত্তি বিরাজিত, ছবি খাঁর নামে একটি গ্রামের নামকরণ হইয়াছে, কিন্তু ছবি খাঁর জীবন কাহিনী আজ আর কেহ জানে না। তাহার পরিচয়, তাহার জীবন বৃত্তান্ত অতীতের কোন গভীর অন্ধকার গহ্বরে হারাইয়া গিয়াছে কে বলিবে। কিছু দিন পূর্ব্বে দুই একটি পল্লী-বৃদ্ধ সন্ধ্যার পরে উৎসুক পৌত্র পৌত্রীর নিকটে ছবিখাঁ সম্বন্ধে দুই একটি অসম্ভব উপাখ্যান বলিয়া তাহাদের কৌতুহল উদ্রিক্ত করিতেন, কিন্তু এই প্রকার বৃদ্ধের সংখ্যা দিন দিনই কমিয়া যাইতেছে।

আজকাল বৃদ্ধ কৃষকগণকে ছবি খাঁর গল্প জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা বলে—ছবি খাঁ নবাবের আমলের লোক, —জাঙ্গাল তৈয়ার করিতেন, স্থানে স্থানে মৃত্তিকা মধ্যে বহু অর্থ প্রোথিত করিয়া রাখিতেন, ইহার বেশী আর আমরা কিছুই জানি না। হয়ত বৃদ্ধ কৃষক তাহার ক্ষেত্র পার্শ্বস্থ একটি প্রাচীন রাস্তার ভগ্নাবশেষ দেখাইয়া বলিবে—ঐ ছবি খাঁর একটি জাঙ্গাল। কালের পরাক্রমে এই সকল জাঙ্গাল জমির প্রশস্ত আলিতে পরিণত হইয়াছে, লুব্ধ কৃষকের হলচালনায় বোধ হয় আর কয়েক বৎসরের মধ্যেই বহু জাঙ্গালের অস্তিত্ব একেবারে লুপ্ত হইবে।

ছবি খাঁর প্রধান কীর্ত্তি—আল্লার মসজিদ নামক প্রাচীন মসজিদ, বহুসংখ্যক জাঙ্গাল ও ধরাধর ছবি খাঁর পাড় এবং গোবর্দ্ধনের দীঘি। এক জলাশয় ভিন্ন আর সকলগুলির অবস্থাই অত্যন্ত শোচনীয় এবং হয়ত অল্পকাল পরেই এই প্রাচীন কীর্ত্তিগুলি একেবারে ধ্বংস হইয়া যাইবে।

বাখরগঞ্জের ইতিহাসে ছবি খাঁ অপেক্ষা কাহাকেও উচ্চস্থান দেওয়া যায় না। তিনি লোকহিতের জন্য যত অর্থব্যয় করিয়াছেন, জনসাধারণের হিতার্থে পথ ঘাট নির্ম্মাণে, জলাশয় খননে, উপাসনা মন্দির গঠনে, সেকালে এত অর্থ ব্যয় বোধ হয় আর কেহ করেন নাই। সুতরাং, উপকৃত জনসাধারণের কৃতজ্ঞতা তাহার জীবন কাহিনীকে বিস্মৃতির অন্ধকার হইতে বাচাইয়া রাখিবে, এ আশা বোধহয় তাহার পক্ষে অসঙ্গত হইত না। কিন্তু ছবি খাঁ যদি কখনও এ আশা করিয়া থাকেন তবে তাহা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছে। তাহার জীবন কাহিনী এখন বাখরগঞ্জের অধিবাসীগণের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। আমরা তাহার সম্বন্ধে প্রচলিত দুই একটি গল্প হইতে তাহার জীবন-বৃত্তান্ত যথাসম্ভব পুনরুজ্জীবিত করিতে বর্ত্তমান প্রবন্ধে চেষ্টা করিব।

ছবি খাঁ সম্বন্ধে দুইটি গল্প প্রচলিত; এই গল্প দুইটির মধ্যে সামান্যই অনৈক্য পরিলক্ষিত হয়। প্রথমটি এই —ছবি খাঁ বাল্যে পিতামাতার নিকট হইতে অপহৃত

হন ; তস্করেরা তাহাকে সুন্দরবনে লইয়া যায়, এইখানে তিনি তস্করগণ কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হইয়া অবশেষে যৌবনে নবাব সরকারে চাকরী গ্রহণ করে। তাহার পিতা-মাতা ইতিমধ্যে তাহাকে সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইয়াছিলেন, আর তিনিত আবাল্য সুন্দর বনের দস্যুভবনে প্রতি-পালিত হইয়া অন্য পিতামাতার কথা জানিতেনই না। নবাব সরকারে উচ্চপদ লাভ করিবার পর ঘটনা ক্রমে হঠাৎ তাহার মাতার সহিত সাক্ষাৎ হয়। নদীপথে নৌকা ডুবিয়া তাহার (ছবি খাঁর) পিতার মৃত্যু হইয়াছিল ; বিপন্না মাতা আশ্রয় খুঁজিতে খুঁজিতে অবশেষে অপরিচিত পুত্রের নিকট উপস্থিত হইলেন। মাতা বা পুত্র কেহই কাহাকেও চিনিতেন না ; কিছুদিন পরে উভয়ে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হইলেন। কিছুকাল একত্র বাস করিবার পর অবশেষে ছবি খাঁর অঙ্গে একটা চিহ্ন দেখিয়া জননী তাহার বহুদিনের হারান পুত্রকে চিনিলেন। পুত্রের নিকট কিন্তু এ পরিচয় প্রাপ্তি আদৌ সুখপ্রদ হইল না ; অজ্ঞানকৃত পাপের জন্য তিনি অনুতপ্ত হইলেন। মৌলবীগণের নিকট তিনি তাহার এই অজ্ঞানকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা জিজ্ঞাসা করিলেন। অব-শেষে তাহাদের উপদেশে তিনি রাস্তাঘাঠ নির্ম্মাণ, জলাশয় খনন ও মসজিদ গঠন করিতে আরম্ভ করেন। পাপক্ষালনের নিমিত্ত তিনি মক্কাতীর্থে গমন ও হজ্ব উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। (এইজন্য লোকে তাহাকে হাজি ছবি খাঁ বলিত।) এদিকে রাস্তাঘাট নির্ম্মাণেই নবাব সরকারে দেয় সমস্ত রাজস্ব ব্যয়িত হইতে লাগিল। রাস্তাঘাট নির্ম্মাণের ব্যয়ের পর যে অর্থ অবশিষ্ট থাকিত তাহা তিনি রাস্তার প্রান্তে প্রোথিত করিয়া রাখিতেন। (কেহ কেহ অনুমান করেণ যে ভবিষ্যতে রাস্তাগুলির সংস্কার করিবার ব্যয় নির্ব্বাহের জন্যই তিনি পথপ্রান্তে অর্থ প্রোথিত করিয়া রাখিতেন। এই অনুমান নিতান্ত অযৌক্তিক বলিয়া বোধ হয় না। এখনও ভগ্ন জাঙ্গালের স্থানে স্থানে অনেক কৃষক ইষ্টক বেষ্টিত অর্থ লাভ করিয়া থাকে বলিয়া শুনা যায়। অনেক দরিদ্র কৃষকের আকস্মিক অবস্থান্তরের কারণ ছবি খাঁর জাঙ্গালে গুপ্তধন প্রাপ্তি বলিয়া উল্লিখিত হয়।) কাযেই নবাবের সরকারে আর রাজস্ব পাঠাইতে পারিতেন না। অল্পদিন মধ্যেই নবাবের কাণে এই সকল কথা উঠিল, তিনি ছবি খাঁকে ধৃত করিতে আদেশ করিলেন। তাহার আদেশে ছবি খাঁ নবাবসৈন্য কর্ত্তৃক ধরাধরের পাড়ে ধৃত হন। (ধরাধরে পাড়ের প্রাচীন জলাশয় ছবি খাঁ কর্ত্তৃক খনিত হইয়াছিল। এই দীর্ঘিকার তীরস্থ গ্রামে নবাবের সৈন্য ছবি খাঁকে বন্দী করিয়াছিল বলিয়া গ্রামের নাম ধরাধরের পাড় হইয়াছে।) কিছুকাল কারাগারে বাস করিবার পর নিষ্ঠুর নবাবের আদেশে ছবি খাঁ প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন। মিঃ বেভারিজ তাহার বাখরগঞ্জের ইতিহাসে এই গল্পটিরই উল্লেখ করিয়াছেন, এবং ছবি খাঁর বহু কীর্ত্তির সমাবেশ স্থান কসবা গ্রামের মুসলমানগণের মধ্যে কেহ কেহ এই গল্পটি সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়া থাকে। দ্বিতীয় গল্পটি আমি পিঙ্গলাকাঠী গ্রামের এক বৃদ্ধ মুসলমান কৃষকের নিকট শুনিয়াছি ; এই গল্পটিও মুসলমানগণের মধ্যে সত্য বলিয়া প্রচলিত।

এই বৃদ্ধ আমাকে বলেন, ছবি খাঁর মাতার সহিত বিবাহিত হওয়ার কথা মিথ্যা এবং অসম্ভব। বাল্য-কালে তিনি কোন অজ্ঞাত কারণে পিতৃগৃহ হইতে পলায়ন করিয়া গৌরনদী অঞ্চলে আসেন। এখানে তিনি নবাব সরকারে উচ্চপদ এবং প্রভূত সম্মান লাভ করিলেন। ধনসম্পদের মধ্যে ছবি খাঁ পিতার কথা একেবারে ভুলিয়া গেলেন কিন্তু তাহার পিতামাতা পুত্রকে ভুলিতে পারিলেন না। পুত্রশোকে তাহার পিতার মৃত্যু হইলে, মাতা হারানিধির অন্বেষণে গৃহত্যাগ করিয়া দেশে দেশে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। পুত্রশোকে ও ভ্রমণের শ্রমে তাহার দুরবস্থার একশেষ হইল, অবশেষে তিনি ছবি খাঁরই দাসী হইলেন। বহুদিনের অদর্শনে মাতা ও পুত্র উভয়েই উভয়ের আকৃতি সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইয়াছিলেন, কেহই কেহকে চিনিতে পারিলেন না;—ছবি খাঁ মাতার প্রতি প্রভুর ন্যায় ব্যবহার করিতে লাগিলেন, মাতাও পুত্রকে প্রভুজ্ঞানে পরিচারিকার ন্যায় সেবা করিতে লাগিলেন। এই ভাবে কিছু দিন কাটিয়া গেল। ছবি খাঁ একদিন স্নানের পূর্ব্বে মাতাকে শরীরে তৈল মাখাইয়া দিতে আদেশ করিলেন। পুত্রের চরণে

তৈল মর্দন করিতে করিতে একটি অস্ত্রঘাত চিহ্ন দেখিয়া জননী ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন। তখন মাতাপুত্রের পরিচয় হইল। ছবি খা আপনার অজ্ঞান কৃত পাপের জন্য অনুতপ্ত হইয়া তাহার প্রায়শ্চিত্তের জন্য প্রস্তুত হইলেন।

রাজসকারে উচ্চপদ লাভ করিবার পরই ধর্ম্মপ্রাণ ছবিখাঁ আপনার উপার্জ্জিত সমস্ত অর্থ রাস্তা নির্ম্মাণ, পুষ্করিণী খনন ও মসজিদ গঠন প্রভৃতি সৎকার্য্যে ব্যয় করিতেছিলেন। এই প্রকার নানাবিধ সৎকার্য্য করিয়া তিনি জনসাধারণের অত্যন্ত প্রীতি ও শ্রদ্ধা ভাজন হইয়াছিলেন। কিন্তু তাহার শত্রুগণ নবাবের নিকট অভিযোগ করিল যে ছবি খাঁ বাদসাহের প্রাপ্য রাজস্ব নবাব সরকারে না পাঠাইয়া তাহার নানাবিধ অসদ্ব্যবহার করিতেছে। নবাব তাহাকে ধৃত করিতে আদেশ করিলেন, কিন্তু এই জনপ্রিয় কর্ম্মচারীকে বন্দী করা নবাব সৈনিক গণের সাধ্যায়ত্ব হইল না। কিন্তু যখন ছবি খা জানিলেন যে চিনিতে না পারিয়া তিনি মাতার প্রতি দাসীর ন্যায় ব্যবহার করিয়াছেন, তখন তিনি তাহার অজ্ঞানকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্তের নিমিত্ত নবাবের নিকট আত্মসমর্পণ করিলেন। নিষ্ঠুর নবাব তাহার কণ্ঠপর্য্যন্ত মৃত্তিকায় প্রোথিত করিয়া লোষ্ট্রাঘাতে তাহার প্রাণবধ করিতে আদেশ দিলেন। এই ভাবে একজন ধার্ম্মিক মুসলমান বিনা দোষে প্রাণ হারাইলেন।

এই দুইটি গল্প হইতে ছবি খাঁ সম্বন্ধে এই মাত্র জানা যায় যে,—তিনি বাল্যে পিতা মাতা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছিলেন, যৌবনে মাতার প্রতি কোন অপরাধ করিয়া অনুতপ্ত হৃদয়ে সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে কৃত সঙ্কল্প হন। মৌলবীগণের উপদেশে তিনি রাস্তা নির্ম্মাণ দীর্ঘিকা খনন ও মন্দির গঠন করিতে আরম্ভ করেন; এই সমস্ত কার্য্যে প্রভূত অর্থব্যয় হইত বলিয়া ছবিখাঁ নবাবের প্রাপ্য বার্ষিক রাজস্ব পাঠাইতে পারিলেন না। নবাবের আদেশে তিনি বন্দী ও নিষ্ঠুররূপে নিহত হইলেন।

ছবি খাঁর মৃত্যু সম্বন্ধেও একটি গল্প প্রচলিত আছে। নবাব নাকি তাহাকে বলিয়াছিলেন, আমার প্রাপ্য রাজস্বে তুমি যে সকল সৎকার্য্য করিয়াছ যদি সেই সকলের কীর্ত্তি আমার বলিয়া ঘোষণা কর, তবে আমি তোমার প্রাণ রক্ষা করিব। কিন্তু ছবি খাঁ কিছুতেই নবাবকে আপনার যশের অংশী করিতে সম্মত হইলেন না। ক্রুদ্ধ নবাব তখন তাহার কণ্ঠ পর্য্যন্ত মৃত্তিকায় প্রোথিত করিতে আদেশ দিলেন। যখন ছবিখাঁর দেহ কণ্ঠ পর্য্যন্ত মৃত্তিকায় প্রোথিত হইল, তখন আবার নবাব তাহার নিকট আসিলেন, আবার তিনি তাহার প্রাপ্য রাজস্বে নির্ম্মিত রাস্তা ঘাট প্রভৃতির নির্ম্মাণের যশের অংশ দাবী করিলেন। কিন্তু নিশ্চয় মৃত্যু জানিয়াও ছবি খাঁ পূর্ব্বের ন্যায় নির্ভীক ভাবে উত্তর দিলেন—'কাম (কায-বাখরগঞ্জের প্রচলিত ভাষা) তোমার, নাম আমার।' (বাখরগঞ্জে ছবি খাঁর এই মৃত্যুকালীন উক্তি প্রবাদবাক্যে পরিণত হইয়াছে।) তখন নবাবের আদেশে তাহার মস্তক ছিন্ন হইল। অতি বিশ্বাসী দুই একজন কৃষক, বলিয়া থাকে,—ছিন্ন হইবার পরও ছবিখাঁর মস্তক নবাবের দিকে চাহিয়া বলিয়াছিল—কাম তোমার নাম আমার।

ছবি খাঁ নবাব সরকারে কোন পদে নিয়োজিত ছিলেন তাহা জানা যায় না। মিঃ বিভারিজ বলেন, ছবি খাঁ কোতয়াল ছিলেন এবং তাহা হইতেই কোটালী পাড়া পরগণার নাম করণ হইয়াছে। কিন্তু মিঃ বিভারিজের এই সিদ্ধান্ত সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। কারণ ছবি খাঁ যে রাজস্ব আত্মসাৎ করার অপরাধে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার বিশেষ কোন কারণ নাই। (তাহার সম্বন্ধে যে কয়েকটি গল্প প্রচলিত আছে, তাহার প্রত্যেকটিতেই তাহার মৃত্যুর একই কারণ প্রদত্ত হইয়াছে।) কিন্তু কোতোয়ালের সহিত রাজস্বের কোন সম্পর্কই নাই, তাহার কর্ত্তব্য শান্তি রক্ষা; বর্ত্তমানে ডিষ্ট্রীক্ট পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের যে কর্ত্তব্য কোতোয়ালের কর্ত্তব্য কতকটা তাহার অনুরূপ ছিল।* এদিকে ছবিখাঁর অধীনে এক দল সৈন্য ছিল

* The office of kotwal embraces the regul:tion of the town police and the public marke The kotwal also regulates the hire of cattle and provides carriage for the government and for the travell:rs.

Briggs eFrista VOL I P. 288 foct note.

বিশ্বাস করিবার কারণ আছে। সুতরাং তিনিও বর্ত্তমান গৌরনদী ও কোটালীপাড়া অঞ্চলের ফৌজদার এই অনুমান করাই বোধ হয় যুক্তি যুক্ত হইবে। ছবিখাঁর প্রদত্ত নিষ্কর লাখেরাজ ভোগী একজন মুসলমান ভদ্রলোক বলেন, ছবি খাঁ এই প্রদেশের সুবাদার ছিলেন বলিয়া প্রবাদ আছে। এই প্রবাদ আমাদের মতের পোষকতাই করিতেছে, অজ্ঞ কৃষকগণ বোধ হয় ফৌজদারকেই সুবাদার করিয়া তুলিয়াছে।

ছবি খাঁর সময় নির্ণয় করিতে হইলে আমাদিগকে কসবা গ্রামস্থ তাহার নির্ম্মিত মসজিদ ও তৎকর্ত্তৃক খনিত জলাশয় গুলির বিষয় আলোচনা করিতে হইবে। কসবা বর্ত্তমান পালরদী হইতে একমাইল দূরে। গ্রামটিতে মাত্র একটি ভদ্র মুসলমান পরিবার আছে, আর সমস্ত গ্রামবাসীগণই ইতর শ্রেণীর কৃষক। এই ভদ্র পরিবার ছবি খাঁর প্রদত্ত লাখেরাজ ভূমি আজও ভোগ করিতেছে। এই পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা কাজি মুস্তাফা দিল্লী হইতে কাজি নিযুক্ত হইয়া আকবরের রাজত্বের শেষভাগে অথবা জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে কসবা গ্রামে আসেন। কসবায় ছবি খাঁ চারিটি মস্‌জিদ নির্ম্মাণ ও অনেকগুলি জলাশয় খনন করিয়াছিলেন। এই সকল মস্‌জিদের তত্ত্বাবধানের ভার তিনি কাজি মুস্তাফাকে দিয়াছিলেন। সুতরাং ছবি খাঁ যে জাহাঙ্গীরের রাজত্ব সময়ে ফৌজদারের পদে নিযুক্ত ছিলেন এ সিদ্ধান্ত অযৌক্তিক হইবে না। কাজি মুস্তাফার বর্ত্তমান বংশধরের নাম কাজি গোলাম মুস্তফা ওরফে মধু কাজি। মধু কাজি, কাজি মুস্তাফা হইতে অধস্তন নবম পুরুষ। মধু কাজি হইতে উর্দ্ধতন চতুর্থ পুরুষের সময়ে নির্ম্মিত মসজিদে যে উৎকীর্ণ লিপি পাওয়া যায় তাহাতে তিনি ১৬৬ বৎসর পূর্ব্বে (বঙ্গাব্দ ১১৫১) ঐ মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। সুতরাং কাজি মুস্তাফা অন্ততঃ তিন শত বৎসর পূর্ব্বে কসবা গ্রামে আসিয়াছিলেন এবং সেই সময় হাজি ছবি খাঁ জীবিত ছিলেন সিদ্ধান্ত করিলে অসমীচীন হইবে না।

এইখানে কসবা সম্বন্ধে দুই একটি কথা না বলিলে প্রবন্ধ অসম্পূর্ণ থাকিবে। কসবা গ্রামে ছবি খাঁ চারিটি মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহার এতগুলি কীর্ত্তির সমাবেশ আর কোথাও দেখা যায় না। এই জন্য বোধ হয় কসবার সহিত ছবি খাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। কসবা অতি প্রকাণ্ড গ্রাম, ইহা এখনও তিন ভাগে বিভক্ত। বোধ হয় প্রাচীনকালে এই গ্রামটি অতি সমৃদ্ধ ছিল।

এখন আমরা ছবি খাঁর নির্ম্মিত আল্লার মসজিদের কথা বলিয়া আমাদের প্রবন্ধ শেষ করিব। কসবা গ্রামে যে চারিটি মসজিদ নির্ম্মিত হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে এখন দুইটি মাত্র বর্ত্তমান। অপর দুইটি মানবের লালসায় ধ্বংস হইয়াছে। কালের পরাক্রম উপেক্ষা করিয়া তাহারা আজ পর্য্যন্ত অনায়াসে থাকিতে পারিত যদি মানবের অর্থলোলুপ হস্ত ইষ্টক লোভে তাহাদিগকে চূর্ণ করিয়া না ফেলিত। যে দুইটি মসজিদ আজও ছবি খাঁর স্মৃতি রক্ষা করিতেছে তাহার মধ্যে একটি নিতান্ত ক্ষুদ্র, মাত্র একটি গুম্বজবিশিষ্ট; অপরটি নয় গুম্বজ বিশিষ্ট বিশালায়তন প্রকাণ্ড মসজিদ। এইটিই জন সাধারণের নিকট আল্লার মসজিদ নামে বিখ্যাত। মসজিদের ভিতর চারিটি প্রস্তর স্তম্ভ আছে। প্রত্যেক স্তম্ভ তিন খানি প্রস্তর সংযোগে নির্ম্মিত। স্তম্ভগুলির উচ্চতা ১০ ফিট। পশ্চিম দিকের স্তম্ভ দুইটি অপর দুইটি অপেক্ষা স্বল্পায়তন, বোধ হয় ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে। স্তম্ভ চারিটির গঠন প্রণালীতে বৈষম্য লক্ষিত হয়, মুসলমানসাধারণের ভক্তি স্তম্ভগুলিকে তৈল ও সিন্দুর লিপ্ত করিয়াছে। মসজিদটির বাহিরের অবস্থা বড়ই শোচনীয়, ছাদ বৃক্ষ লতায় এরূপ আচ্ছাদিত যে নয়টি গুম্বজের একটি ও দৃষ্ট হয় না। প্রাচীরের বাহিরের দিক প্রায় সর্ব্বত্রই ভগ্ন ও ফাঁটা। বাখরগঞ্জের ইতিহাস লেখক সহৃদয় মিঃ বিভারিজ মসজিদের উপরের জঙ্গল নিজব্যয়ে পরিষ্কার করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার পর আবার প্রায় ৪০ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে, মানব-শিল্পের ধ্বংসাবশেষের উপর প্রকৃতি দেবী অপ্রতিহত ভাবে আপনার শ্যাম সুষমা বিকাশ করিতেছেন।

মসজিদের ছাদের উপর জাত বৃক্ষ গুলির শিকর প্রাচীর গাত্র ভেদ করিয়া মৃত্তিকা পর্য্যন্ত পৌছিয়াছে।

সংস্কার না করিলে হয়ত ধার্ম্মিক ছবিখাঁর এই প্রাচীন কীর্ত্তি অল্পদিনের মধ্যেই ইষ্টকস্তূপে পরিণত হইবে।

মুসলমানগণের বিশ্বাস এই মসজিদে মানত করিলে সর্ব্ব প্রকার বিপদ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। আমরা যে দিন মসজিদ দেখিতে গিয়াছিলাম, সেদিন দক্ষিণ সাহাবাজ পুরের ন্যায় বাখরগঞ্জ জিলার দূরতম অংশ হইতে কয়েক জন মুসলমান মানত পূর্ণ করিবার জন্য এই মসজিদে আসিয়াছিল।

মসজিদের আয়তন ভিতরের দিকে ৩৭॥ × ৩৭॥ ফিট। প্রাচীরের বেধ পাঁচ হাত। মসজিদের ভিতর এখনও বেশ পরিস্কার। তবে অর্থলোভী মনুষ্যের হস্ত গুপ্তধন লোভে পবিত্র মসজিদের প্রাচীর ও ভগ্ন করিতে সঙ্কুচিত হয় নাই। তাই ভিতরের দিকেও মসজিদ প্রাচীরে কয়েকটি ভগ্ন স্থান লক্ষিত হইল।

মসজিদের সম্মুখের দ্বারের উপরে একখানি উৎকীর্ণ লিপি ছিল, কিন্তু বহুদিন হয় তাহা হারাইয়া গিয়াছে। এই উৎকীর্ণ লিপি পাওয়া গেলে ছবি খাঁর সময় নিঃসন্দেহরূপে স্থির করা যাইত। হয়ত ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের বিষয় এই উৎকীর্ণ লিপি খানি কোন অজ্ঞ কৃষকের কুটীরের সোপানে পরিণত হইয়াছে।

আমরা ধর্ম্মপ্রাণ মুসলমান জমিদারদিগের নিকট প্রার্থনা করি তাহারা যেন এই মস্‌জিদটির জীর্ণ সংস্কার করিয়া বাখরগঞ্জের একটি প্রাচীন কীর্ত্তি ধ্বংসের হস্ত হইতে রক্ষা করেন। ছবি খাঁর মস্‌জিদই বোধ হয় বাখরগঞ্জের প্রাচীন শিল্পের একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন। বিশেষতঃ যে মহাত্মার সহিত এই মস্‌জিদের নাম সংশ্লিষ্ট তাহার গৌরব রক্ষা করিতে যে প্রত্যেক বাখরগঞ্জবাসী শিক্ষিত ভদ্রলোকই সচেষ্ট হইবেন তাহাতে আমরা বিন্দুমাত্রও সন্দেহ রাখি না।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন

নিশি-ডাক।

(ইংরেজী হইতে)

(১)

নিঃস্বন নিশিতে আসে ভেসে ভেসে
কোথা থেকে কা'র পরিচিত স্বর!
কোথা ফের যায় ভেসে নিশি শেষে
—লোক-কোলাহলে হয় অগোচর!

(২)

জনরব হ'তে দূরে অতি দূরে,
সাগরের সৌধ সৈকত-ভূমিতে
বিজন বিপিনে, শুষ্ক গিরি-চূড়ে
প্রতিধ্বনি তার আসে আচম্বিতে।

(৩)

নিবিড় তিমিরে ঘেরে আত্মা যবে,
শুনি সেই ধ্বনি, স্পষ্ট, স্পষ্টতর;
সকাতরে প্রেম-ভরা কণ্ঠরবে
ডাকে মোরে হায়! কোন বন্ধুবর?

(৪)

কোন দুর্গ হ'তে, এ কোন প্রহরী,
নাদে শঙ্খ ঘন, গভীর নিশিতে?
মৃত্যুর মুহূর্ত্তে যেনরে শর্ব্বরি!
তোর এ রহস্য পারিগো জানিতে।

ন—না—ম

মালয় যাত্রা।

আমি বিগত ১২ই জ্যৈষ্ঠ আমার জন্মভূমি চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত মাদার্সা হইতে মালয় ষ্টেট্‌ অভিমুখে যাত্রা করি। সঙ্গে আমার বড়দাদার স্ত্রী, এবং তাঁহার ৭ বৎসর বয়স্কা একটী কন্যা। আমাদিগকে ষ্টীমারে উঠাইয়া দিবার জন্য আমার পিতা, প্রিয়বন্ধু যতীন্দ্র বাবু, এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতাও এই সঙ্গে যাত্রা করিলেন। আমরা যখন বাড়ী হইতে বাহির হইলাম, তখন হইতে একটু একটু বৃষ্টি পতন আরম্ভ হইল; যখন সাম্পানে আরোহণ

করিলাম, তখন বৃষ্টি একটু অধিক মাত্রায় হইতে লাগিল; সাম্পান যখন হালদা নদী অতিক্রমণ করিয়া কর্ণফুলী নদীতে পতিত হইল, তখন ভয়ানক ঝটিকা ও বৃষ্টি আরম্ভ হইল। বালিকাটী ক্ষণে ক্ষণে বমি করিতে লাগিল। কিন্তু আমার প্রিয়বন্ধু যতীন্দ্র বাবুর শুশ্রূষায় শীঘ্রই প্রকৃতিস্থ হইল।

আমরা যথাসময় চট্টগ্রামের সদর ঘাট পৌঁছিয়া জানিতে পারিলাম, ষ্টীমার পরদিন যাইবে কাজেকাজেই আমাদের সেইদিন সহরে থাকিতে হইল। পরদিন নির্দ্দিষ্ট সময়ে পুনরায় ষ্টীমারঘাটে পৌঁছিলাম। যতীন্দ্র বাবুকে গাড়ীর নিকট দাঁড় করাইয়া, আমি টিকিট কিনিবার জন্য আফিসে গেলাম, তথায় টিকিট চাহিলে একজন বুকিংক্লার্ক আমাকে বলিলেন, "সেকেণ্ডক্লাসের টিকিট পাইবেন না কারণ সমস্ত কেবিনই (cabin) বুক্ হইয়াছে।" আমি তাঁহার কথার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে না পারিয়া, কাপ্তান সাহেবকে জানাইবার অভিপ্রায়ে ষ্টীমারে গেলাম। ষ্টীমারে উঠিবা মাত্র একজন দরোয়ান আমাকে বলিল, "এস্তরফ আনেকা হুকুম নহি হ্যায়।" এমন সময় একজন সাহেব আসিল, তাহাকে দেখিবামাত্রই দরোয়ানজি রাস্তা ছাড়িয়া দিলেন, আমিও ঐ সঙ্গে প্রবেশ করিলাম। প্রথমতঃ কেরাণী সাহেবের নিকট আমার উপস্থিত কারণ বলিলাম; তিনি একজন ইয়োরোপীয়, এবং অতিশয় ভদ্রলোক, বাংলা-ভাষা এমনকি চট্টগ্রামের ভাষা পর্য্যন্ত বলিতে পারেন। তিনি আমাকে কাপ্তান সাহেবের নিকট লইয়া গেলেন, সদাশয় কাপ্তান সাহেব আমার উপস্থিত বিপদের কথা অবগত হইয়া, বুকিংক্লার্কের নিকট একখানা পত্র দিলেন। আমি পত্রখানি বুকিংক্লার্ককে দেওয়া মাত্রই সেকেণ্ডক্লাসের টিকেট দিলেন। আমিও একবার আমার দেশীয় বাঙ্গালী প্রভুকে স্বজাতিপ্রিয়তার এবং প্রভুভক্তির জন্য দুই একটী কথা বলিয়া বিদায় লইলাম।

বেলা ১২ টার সময় আমরা গিলেণ্ডার কোম্পানীর "কোহিনুর" নামক ষ্টীমারে আরোহন করিলাম। অপরদিকে আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও বাবা আমাদিগের দিকে তাকাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তাঁহাদের সেই অবস্থা দেখিয়া আমিও রোদন সম্বরণ করিতে পারিলাম না। আমাদের চক্ষু নির্নিমেষে পরস্পরের দৃষ্টি প্রতি প্রেরিত, এমন সময় ষ্টীমার ছাড়িয়া দিল এই সময় "গচ্ছতি পুরঃশরীরং ধাবতি পশ্চাদসংস্থিতংচেতঃ, এই কবিবাক্যের প্রকৃত অর্থ অনুভব করিতে লাগিলাম। ষ্টীমার কর্ণফুলীনদী অতিক্রম করিয়া বেলা ৫ টার সময় বঙ্গোপসাগরে পতিত হইল। আমার জীবনে এই প্রথম সমুদ্র দর্শন, কর্ণফুলীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গগুলি বঙ্গোপ-সাগরের মহাতরঙ্গে মিশিয়া যেন স্বাভাবিক সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে জীব-জগৎকে শিক্ষা দিতেছে—"তোমাদেরও একদিন এইরূপ সন্ধ্যা উপস্থিত হইবে, এই সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে তোমাদেরও অন্তলীলা অনন্তে মিশিয়া যাইবে।" আমরা আনন্দে এবং সমুদ্রযাত্রার প্রথম উৎসাহে অতিশয় সুখের সহিতে এই রাত্রি কাটাইলাম। রাত্রি প্রভাত হইল। প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্রও যেন রূপান্তরিত হইল, জলের ধবলিমা আর দেখা যাইতেছে না, নীলবর্ণ জল যেন আকাশচ্ছটার অনুকরণ করিতেছে। একমাত্র তরঙ্গগুলিই সমুদ্র ও আকাশের বিভিন্নতার পরিচয় দিতেছে। তরঙ্গগুলি ক্রমশঃ বৃহদাকারে পরিণত হইতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে ষ্টীমারখানিও হেলিয়া দুলিয়া চলিতে লাগিল। সেই মহোর্ম্মির ভীষণ দৃশ্য দেখিয়া আমিও অতিশয় ভীত হইলাম। ভীষণ তরঙ্গগুলি ষ্টীমারটীকে যেন এক একবার গ্রাস করিতেছে; মধ্যে মধ্যে ষ্টীমারে জল উঠিতেছে; আরোহীরা কোলাহল আরম্ভ করিতেছে। কাহারও ট্রাঙ্ক ষ্টীমারের একদিক হইতে অপর দিকে যাইতেছে, কেহ আছাড় খাইয়া গড়াইতেছে। অধিকাংশ লোকই বমি করিতেছে। সেই ভীষণ বমনোদ্গার শুনিয়া আমার প্রাণে ভীষণ আতঙ্ক উপস্থিত হইল। কেবিনের ভিতরে যাইয়া দেখিলাম বালিকাটী বমি করিতেছে এবং আমার বড়দাদার স্ত্রীও বমি করিতে করিতে কাঁদিতেছেন। বালিকাটির নাড়ী পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম, তাহার জ্বর হইয়াছে। আমি অনন্যোপায় হইয়া পূর্ব্ব পরিচিত কেরাণী সাহেবের নিকট উপস্থিত হইয়া সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলাম। তিনি তৎক্ষণাৎ আমার সঙ্গে আসিলেন; এবং বালিকাটীর শরীর পরীক্ষা করিয়া

বলিলেন, "কোন ভয় নাই।" তিনি বয়কে একটু চা দিতে বলিলেন, বালিকাটী সাহেবের ভয়ে চা খাইল এবং ক্রমশঃ সুস্থ হইল।

এইরূপে ষ্টীমার অনবরত সমুদ্রপথ অতিক্রম করিয়া চলিতে লাগিল; আর কিছুই দেখা যাইতেছে না, মধ্যে মধ্যে উড্ডীয়মান মৎস্য সকল (Flying fish) জল রাশি হইতে উত্থিত হইয়া আবার জল মধ্যে নিমগ্ন হইতেছে। দুই দিন এইরূপে অতীত হইল, পরে ২।১টী পাহাড় এবং বহুদূর ব্যাপী একটী নীলবর্ণ রেখার ন্যায় সমুদ্রের উপকূল দেখিলাম। কেরাণী সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম ঐটী ব্রহ্মদেশ। এই মনোরম দৃশ্যের অধিক বর্ণনা করিবার শক্তি আমার নাই, তবে যাহারা কালিদাসের রঘুবংশ পড়িয়াছেন তাঁহাদের সম্মুখে "দূরাদয়শ্চক্রনিভস্যতন্বীতমালতালী বনরাজিনীলা। আভাতি বেলা লবণাম্বুরাশের্ধারা নিবদ্ধেব কলঙ্ক-রেখা॥" এই শ্লোকটীর দ্বারা একটী পরিস্ফুট ছবি উপস্থিত করা যায়। যথা সময়ে ষ্টীমার রেঙ্গুনের (Rangoon) ঘাটে পৌঁছিল। দলে দলে কুলী আসিতে লাগিল, তাহারা সকলে মাদ্রাজী। আমি একজন কুলীকে আমার মালপত্র নেওয়ার জন্য ৵০ দিতে প্রতি-শ্রুত হইলাম, সেও তাহাতে স্বীকৃত হইল; কিন্তু পুলের উপর উঠিবা মাত্র আমাকে একটু কর্কশ ভাষায় বলিল তোমাকে ১৲ টাকা দিতে হইবে, এমন সময় জনৈক সাহেব আমাদের মালপত্র পরীক্ষা করিতে আসিলেন, এবং আমাদের ট্রাঙ্ক ও বিছানা দেখিয়া আমাদিগকে যাইতে অনুমতি দিলেন। পূর্ব্বোক্ত কুলীটী আমার নিকট টাকা চাহিতে লাগিল আমাকে একা দেখিয়া তাহার সাহস আরও বাড়িয়া গেল। কিন্তু আমার ভাগ্য-বলে পূর্ব্ব পরিচিত কেরাণী সাহেবের দেখা পাইয়া সমস্ত ব্যক্ত করিলে, তিনি কুলীকে সজোরে ৫।৭ বার পদাঘাত করিয়া কুলীর ম্যানেজারকে বলিলেন, "এই ভদ্রলোক-টীকে গাড়ীতে উঠাইয়া দাও।" তখন আমি একবারে নিরাপদ হইলাম, ইহাকে বলে "মূর্খস্য লাঠ্যৌষধং।" আমি যথা সময় রেঙ্গুনে আমার জনৈক আত্মীয়ের বাসায় উপস্থিত হইলাম। রেঙ্গুন ও কলিকাতার ন্যায় নদীরতীরে অবস্থিত, ঘর, বাড়ী, রাস্তা- প্রভৃতি কলিকাতার ন্যায়। এখানকার আদিম নিবাসী, "বর্ম্মা"। তাহারা বৌদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বী, হিন্দুর দেবালয়ের ন্যায় তাহাদেরও "ক্যাং বা ফয়া আছে। রেঙ্গুনের মধ্যে চুল্যা পেগোডা ও বড় ফয়া সর্ব্বপেক্ষা প্রসিদ্ধ। বড়ফয়াতে অনেকগুলি দেবমূর্ত্তি আছে বুদ্ধের মূর্ত্তিই অধিক। এইরূপ কিংবদন্তী আছে যে এই ফয়ার নিচে ভূতপূর্ব্ব "বর্ম্মা রাজার কেল্লা ছিল।

রেঙ্গুনে আমরা তিন দিন বিশ্রাম করিয়া পরে বৃটিশ ইণ্ডিয়া ষ্টীম নেভিগেশন কোম্পাণীর "ডিলুয়ারা" নামক ষ্টীমারে পিনাঙ্ (Penang) অভিমুখে যাত্রা করিলাম। মেয়েদের জন্য সেকেণ্ডক্লাসের এবং আমার জন্য তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট ক্রয় করিলাম। ষ্টীমার ঘাটে যাইয়া দেখিলাম যাত্রীদের মধ্যে সকলেই চাইনীজ এবং ইয়োরোপীয়ান্, কেবল মাত্র আমরাই বাঙ্গালী, আমার পরিচ্ছদ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ন্যায় ধুতি চাদর জামা প্রভৃতি; তাহা দেখিয়া কেহ কেহ আমাকে বলিল, তুমি এই পোষাকে সেকেণ্ডক্লাসের গেট্ (gate) দিয়া যাইতে পারিবে না। আমি সাহসের উপর নির্ভর করিয়া চলিলাম কিন্তু টিকেট কালেক্টর আমাকে যাইতে নিষেধ করিলেন পরে আমার সহিত স্ত্রীলোক দেখিয়া যাইতে অনুমতি দিলেন। প্রথমতঃ মেম্‌সাহেব মেয়েদের শরীর পরীক্ষা করিয়া, আমাকে ডাক্তার সাহেবের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। ডাক্তার সাহেব নাড়ী পরীক্ষা করিয়া, আমাকে যাইবার অনুমতি দিলেন। ষ্টীমারে উঠিয়া দেখি, সকলেই ইংরেজী কথা বলিতেছে। আমি একজন বাঙ্গালী বয়কে দেখিয়া বাঙ্গালা ভাষায় কয়েকটী কথা জিজ্ঞাসা করি-লাম। সে একরকম অদ্ভুত ইংরেজী ভাষায় তাহার উত্তর দিল, আমি তাহা বুঝিতে পারিলাম না, পরে একটু কর্কশ ভাবে বাঙ্গাল ভাষায় বলিল, "ইংরেজী না জানিলে বিদেশ ভ্রমণ করিতে আস কেন?" আমি তাহার নিকট অপদস্ত হইয়া ষ্টীমারের একজন ইয়োরোপিয়ান কর্ম্ম-চারিকে আমাদের কেবিনের কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি আমাকে সঙ্গে করিয়া কেবিনে নিয়া সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়াদিলেন। আমি তাঁহার উদারতা দেখিয়া অতিশয় বিস্মিত হইলাম। সাহিত্য সম্রাট্ বঙ্কিম বাবু একস্থানে

লিখিয়াছেন—"পৃথিবীতে যতপ্রকার নিকৃষ্ট লোক আছে, তন্মধ্যে খানসামাগুলিই সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট" বস্তুতঃ এই কথাটীর যাথার্থ্য আমি হাতে হাতে জানিতে পারিয়াছি। ৪ দিনের পর ষ্টীমার পিনাঙ্ পৌছিল। তখন শুনিলাম, আমাকে কোয়ারেন্টিনে (Quarantine) যাইতে হইবে। ভারতবর্ষের লোক যখন ঐ অঞ্চল দিয়া যাতয়াত করে, তখন তাহারা সংক্রামক রোগ বিশেষের দ্বারা আক্রান্ত কিনা পরীক্ষার জন্য গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত ঐ কোয়ারেন্টিনে আবদ্ধ থাকে; কেবল মাত্র ১ম ও ২য় শ্রেণীর যাত্রীরা ঐ কোয়ারেন্টিনে না যাইয়া বাঁচিতে পারে। আমি এই কথা শুনিয়া বড়ই ব্যস্ত হইলাম, পরে ডাক্তার সাহেব আমার পরীক্ষা করিতে আসিলেন, আমি তাঁহাকে বলিলাম যদি আমাকে কোয়ারেন্টিনে যাইতে হয়, তাহা হইলে আমার সঙ্গের স্ত্রীলোকেরা বড়ই বিপন্ন হইবে। তিনি বলিলেন "তোমাকে কোয়ারেন্টিনে যাইতে হইবে না।" তিনি আমাকে 'সার্ভেণ্ট দিগের শ্রেণীতে (Servent class) ভর্ত্তি করিয়া একখানি পাশ দিলেন, আমি তাহা সঙ্গে রাখিলাম, এবং সাম্পানে আরোহণ করিয়া পিনাঙ সহরে উপস্থিত হইলাম। প্রথমতঃ বড়ই বিপন্ন হইয়া পড়ি, কারণ সেখানকার অধীবাসী সকলেই চীনা ও মালাই। আমি তাহাদের কথা বুঝিতে পারিতেছি না, তাহারাও আমার কথা বুঝিতে পারিতেছে না। যাহা হউক হাতের ইঙ্গিতে ২ খানি "রিক্‌সা" ভাড়া করিলাম। রিক্‌সা একরকমের গাড়ী, ইহা দেখিতে টম্‌টমের মত তাহাতে ২জন মাত্র যাইতে পারে, একজন মানুষেই টানিয়া লইয়া যায়। আমরা যখন রিক্‌সায় উঠিয়াছি তখন একজন মালাই ও একজন চীনা যুবক আমাকে লক্ষ্য করিয়া কি বলিতে লাগিল। আমি তাহাকে ইংরেজী বলিবার জন্য বলিলাম। সে ইংরেজী জানেনা এবং হিন্দিও জানেনা। আকার ইঙ্গিতে বুঝিতে পারিলাম, তাহারা আমাদের জিনিষ পত্র পরীক্ষা করিতে আসিয়াছে। তাহাদের নিকট ট্রাঙ্ক খুলিয়া দিলাম। তাহারা তাহাতে স্বীকৃত না হইয়া আমাদিগকে আফিসে যাইতে বলিল, আমরা আফিসে যাইয়া দেখি, তাহাতে প্রদীপ নাই, এমন সময় আর একজন লোক হিন্দিতে বলিল "ইহাদিগকে ২৲ দিলে তোমাদিগকে ছাড়িয়া দিবে।" আমি ভাবিলাম ইহারা গভর্ণমেণ্টের লোক, তাহারা জিনিষ পত্র পরীক্ষা করিতে টাকা লইবে কেন। পরে প্রভুরা রাগে আচ্ছন্ন হইয়া প্রদীপ জ্বালিল এবং সমস্ত দেখিল, আমার নিকট এক শিশি কুইনাইন ছিল, তাহারা ইহাই সন্দেহ জনক মনে করিয়া কিছু মুখে দিয়া দেখিল। কুইনাইনের আস্বাদ গ্রহণ করিয়া তাহাদের মুখ খানি কি এক অপূর্ব্ব দৃশ্যে পরিণত হইয়াছিল, তাহা ভাবিলে, আমার পক্ষে এখনও হাস্যসম্বরণ করা কঠিন হইয়া পড়ে। যাহা হউক, আমি তাহাদের নিকট হইতে মুক্তি লাভ করিয়া, পিনাঙ্ রোডস্থ রাধাগোবিন্দের মন্দিরে আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। এই মন্দিরের পুরোহিত বাঙ্গালী বিশেষতঃ চট্টগ্রামবাসী, সুতরাং আমাদের বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল।

পিনাঙ্ সমুদ্রের মধ্যবর্ত্তী একটী দ্বীপ। এখানকার অধিবাসী মালাই ও চীনা; হিন্দুদের একমাত্র থাকিবার স্থান রাধাগোবিন্দের মন্দির। অবশ্য ইহা আগন্তুকের পক্ষে। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য দেবমন্দিরও আছে। পিনাঙ্ সহর তেমন বড় নয়, তবে দেখিতে বেশ সুন্দর। এখানকার মলাইদের পোষাক লুঙ্গী, এবং কোট; এবং চিনাদের পোষাক পেণ্টুলনকোট। বাঙ্গালীদের পোষাককে তাহারা ভাল চক্ষে দেখে না, এমন কি ঘৃণা করে, চীনা আরোহী পাইলে বাঙ্গালীকে রিক্‌সায় পর্য্যন্তও উঠাইতে চায় না। আমি এই সব ব্যাপার দেখিয়া পোষাক পরিবর্ত্তন করিলাম।

এখানকার টাকা পয়সা আমাদের দেশের মত নহে। এই দেশে টাকাকে "রিঙ্গি" বলে, পয়সাকে "কাছি" বা "ছেণ্ট্" (Cent) বলে। এই দেশের এক টাকা আমাদের দেশের ১৸৹ আনার সমান।

পিনাঙে নানাকারণে আমাদের ১ সপ্তাহ থাকিতে হইয়াছিল। এই সময়ে আমি অবশ্য প্রয়োজনীয় মালাই কথা কয়েকটী শিক্ষা করিয়া লইলাম। যথাসময়ে আমরা পিনাঙ্ হইতে মালয়-ষ্টেট্ অভিমুখে যাত্রা করিলাম। আমরা যে স্থানে যাইব, তাহার নাম "কোয়ালা সাওয়া" পিনাঙ্ হইতে ৩০০মাইল বা ততোধিক ব্যবধান। এই

স্থানে রেলে যাইতে হয়, আমরা মেইল গাড়িতে (mail train) যাত্রা করিলাম। রেল কিছু দূর পর্য্যন্ত গ্রামের মধ্যদিয়া গিয়াছে, তার পর ভীষণ অরণ্য, স্থানে স্থানে বিস্তৃত ও গগনস্পর্শী পর্ব্বত ভেদ করিয়াও গিয়াছে। তাহার মধ্যে মধ্যে রবারের বাগান; ইংরেজ জাতিই এই রেল পথের এবং রবার বাগানের প্রতিষ্ঠাতা। ধন্য ইংরেজের অধ্যবসায়, ধন্য তাঁহাদের বুদ্ধিমত্তা, ধন্য তাঁহাদের সাহস! যে সমস্ত পর্ব্বতে সিংহ ব্যাঘ্রের বসতি ছিল, এবং যে সমস্ত পর্ব্বত পূর্ব্বে লোকের অগম্য ছিল, এখন ইংরেজের অধ্যবসায়ের ফলে সেই সমস্ত স্থানে নগর হইয়াছে, এবং কোটী কোটী টাকা উৎপন্ন হইতেছে, লক্ষ লক্ষ লোকের জীবিকা নির্ব্বাহ হইতেছে! ইংরেজ জাতির এই সমস্ত গুণ দেখিলে—"Britons shall never be slaves", এই কবি-বাক্যের সত্যতা অক্ষরে অক্ষরে উপলব্ধি করা যায়।

যাহা হউক আমরা নির্দ্দিষ্ট সময়ে "কোয়ালা সাওয়া" পৌঁছিলাম। আমার বড় দাদা এই স্থানে থাকেন এবং এখানকার "লিঙ্গি" প্লানটেশন কোম্পানীর "হস্‌পিটালে" কাজ করেন। ইহা একটী গ্রাম মাত্র। আমি এই স্থানে থাকিয়া মালয় ষ্টেটের কিছু কিছু তথ্য অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম। এই দেশের অধিবাসীও মালাই; কিন্তু তাহারা এখন একরূপ শ্রুতিমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়া আছে। মাদ্রাজের কিলিঙ্‌ (Klings) শব্দটির সহিত কলিঙ্গ শব্দের সহিত কোন সম্বন্ধ আছে কি না, বিশেষজ্ঞগণ বিচার করিয়া দেখিবেন। কিলিঙ্‌ জাতিতে এই স্থানটী পরিপূর্ণ। চীনাদের সংখ্যাও কম নহে, মালাইর সংখ্যা খুব কমই দেখিতে পাওয়া যায়। তবে "পাহাং" "দোহোর" প্রভৃতি স্থানে বহু সংখ্যক মালাই বাস করে। ইহারা ২ শ্রেণীতে বিভক্ত; সভ্য বা শিক্ষিত ও বন্য। বন্য মালাইরা পাহাড়ের নীচে এক রকম ঘর নির্ম্মাণ করে। হোগলা পাতাই ঘরের প্রধান উপকরণ। বন্য মালাইরা বড়ই অলস; একদিন কাজ করিয়া যাহা কিছু পায়, তাহা শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত পুনরায় উপার্জ্জনের চেষ্টা করে না। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাহাদের মধ্যে এখন বিলাসিতা প্রবেশ করিয়াছে। যদি কেহ মাসিক ১০৲ টাকা উপার্জ্জন করে, তাহা হইলে তাহার বাইসিকল (Bicycle) অবশ্যই চাই। যাহাদিগকে শিক্ষিত মালাই বলিতেছি তাহাদের মধ্যেও শতকরা ৬০ জন শিক্ষিত কি না সন্দেহ; তাহারা শিক্ষার জন্য চেষ্টা মাত্রও করে না। তাহারা মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া পরিচিত, কিন্তু সাধারণ মুসলমানদিগের ন্যায় তাহাদিগের প্রার্থনাদির জন্য মসজিদ্‌ প্রভৃতি বড় দেখা যায় না। "যাভায়" যে সমস্ত মালাই বাস করে, তাহাদিগের মধ্যে অনেকেই হিন্দু বলিয়া শুনা যায় এবং আমি বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইয়াছি যে "যাভায়" রামচন্দ্র ও হনুমান প্রভৃতির মূর্ত্তি আছে এবং তাহার পূজা হয়। "দোহোর" মালয় রাজ্যের সুলতানের বাসস্থান, এই স্থানটিও নদীর তীরে অবস্থিত বলিয়া দেখিতে বেশ সুন্দর। কোয়ালা লাম্পুর মালয় ষ্টেটের রাজধানী, ইহা এই দেশের মধ্যে বড় নগর। স্থানটী বেতের জন্য প্রসিদ্ধ।

এই স্থানে আমি প্রায় ১৫ দিন ছিলাম তৎপর সিঙ্গাপুর (Singapur) অভিমুখে যাত্রা করি। এইস্থান হইতে সিঙ্গাপুর রেল পথেই যাওয়া যায়। আমি যে দিন যাত্রা করি, তাহার পরদিনই সিঙ্গাপুর পৌঁছি। ষ্টেশনে নামিয়া একখানা রিক্‌সা ভাড়া করিয়া, আমার বড়দাদার জনৈক বন্ধুর বাসায় থাকিবার বন্দোবস্ত করিলাম। পূর্ব্বে সিঙ্গাপুরের কত গুণ-গীত শ্রবণ করিয়াছি, আজ স্বচক্ষে দেখিয়া বড়ই আনন্দ অনুভব করিলাম, সিঙ্গাপুরে নানা দেশীয় লোক বাস করে; তবে অধিকাংশই চাইনীজ (Chinese) তাহাদের ভাষা মালাই, চীনাভাষা তাহারা প্রায়ই ব্যবহার করে না, কেবল মাত্র লিখিবার সময়ই ব্যবহার করিয়া থাকে। এইস্থানে মাদ্রাজী লোকও যথেষ্ট বাস করে। তাহারা তামিল (Tamil) ভাষা ব্যবহার করিয়া থাকে, হিন্দুস্থানী লোকের সংখ্যাও কম নহে। এইস্থানে হিন্দুদের অনেকগুলি দেব-মন্দির আছে: মন্দিরের পুরোহিত মাদ্রাজী, এখানকার চাইনীজেরা সকলেই বৌদ্ধ। তাহাদেরও অনেকগুলি ধর্ম্ম-মন্দির আছে। প্রত্যেক ধর্ম্ম মন্দিরেই বুদ্ধের প্রতিমূর্ত্তি দেখা যায়। হিন্দুদের

ব্রাহ্মণের ন্যায় তাহাদেরও ফুঙ্গী বা পুরোহিত আছে, ফুঙ্গীরা সর্ব্বত্র সম্মান পাইয়া থাকে। চীনাদের ধর্ম্মে ভিক্ষুক প্রায়ই দেখা যায় না, সকলেই একটা না একটী কাজ লইয়া আছে। আলস্য তাহাদের মধ্যে একেবারেই নাই বলিলেই হয়। তাহারা পরের গলগ্রহ হইয়া কখনও থাকে না, সকলেই স্ব স্বাধীন জীবিকার উপায় নির্ভর করিয়াই থাকে। ভারতবাসীর এই বিষয়টী তাহাদের নিকট হইতে খুব ভাল রূপে শিক্ষা করা উচিত।

ষ্ট্রেট্ সেটেলমেণ্ট নামক ইংরেজাধিকৃত উপনিবেশ গুলির মধ্যে সিঙ্গাপুর খুব বড় নগর এবং বাণিজ্যের জন্য সর্ব্বপ্রকারেই প্রসিদ্ধ। এইস্থানে পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বস্থান হইতে বাণিজ্য-দ্রব্যের আমদানী ও রপ্তানি হইয়া থাকে। সিঙ্গাপুর সমুদ্রের তীরে অবস্থিত বলিয়া বাণিজ্যের পক্ষে বড়ই সুবিধাজনক। সিঙ্গাপুরের প্রাকৃতিক দৃশ্য বড়ই মনোরম। নগরের পূর্ব্ব ও দক্ষিণ সীমা সমুদ্রের তীর। তটের উপর দিয়া প্রশস্ত রাজপথ গিয়াছে। রাজপথের দুই ধারে নানা রকম বৃক্ষশ্রেণী বিরাজিত। রাস্তায় সংলগ্ন বড় বড় উদ্যান, এই উদ্যানে বসিয়া সমুদ্রের দৃশ্য দেখিতে মনে বড়ই আনন্দ উপস্থিত হয়, মধ্যে মধ্যে ফেনিল জলরাশিতে 'তিমি'র (Whale) উল্লম্ফন এবং তৎসংশ্লিষ্ট জলোদ্গম দেখিলে, মহাকবি কালিদাসের বর্ণিত "সসত্বমাদায় নদী মুখাম্ভঃ সম্মীলয়ন্তো বিবৃতাননত্বাৎ। অমী শিরোভি স্তিময়ঃ সরন্ধ্রৈ রূর্দ্ধংবিতিন্বন্তি জলপ্রবাহান্॥" কবির কল্পনা প্রসূত বলিয়া বোধ হয় না। অসংখ্য তরঙ্গরাশির পরস্পর সংমিশ্রণ ও বিশ্লেষণ দেখিলে,—

"মুখার্পণেষু প্রকৃতিপ্রগল্ভাঃ স্বয়ং তরঙ্গাধিরদানদক্ষঃ।
অনন্যসামান্যকলত্রবৃত্তিঃ পিবত্যসৌ পায়য়তে চ সিন্ধুঃ॥"

এই শ্লোকটির প্রকৃত তাৎপর্য্য অনুভব করা যায়। সন্ধ্যার সময় এই দৃশ্য রূপান্তরে পরিণত হয়,—সমুদ্র বক্ষে ভাসমান বহু দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত অর্ণবপোতের প্রদীপগুলি যেন নক্ষত্রাকার ধারণ করিয়া, সেই অনন্ত প্রশান্ত দিগন্তব্যাপী মহোদধিকে আকাশ রূপে পরিণত করে। সহরের প্রায় সব বড় বড় রাস্তাতেই ইলেক্‌ট্রিক্ ট্রাম আছে। আহার্য্য দ্রব্যের মধ্যে নারিকেল খুব পাওয়া যায়। সিঙ্গাপুরের নিকটবর্ত্তী এক একটী নারিকেল বাগান ২।৩ মাইল পর্য্যন্তও বিস্তৃত দেখা যায়।

সিঙ্গাপুরে আমি এক সপ্তাহ থাকিয়া আপ্‌কার কোম্পানীর "গিরিগরি আপ্‌কার" নামক ষ্টীমারে পুনরায় কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করি।

আমি এবারও তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট ক্রয় করি। কিন্তু ডেকে কোম্পানীর সুবন্দোবস্ত থাকায় আমার কোনই কষ্ট হয় নাই। ষ্টীমার অনবরত ভারত মহাসাগর অতিক্রম করিয়া ৬ দিনের পর "আণ্ডামান" দ্বীপে দেখা দিল। ৩ দিনের পর আমরা কলিকাতায় পৌঁছিলাম।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে—আমরা অনেক সময় সমুদ্র যাত্রার বিরোধী হইয়া থাকি; এমন কি সমুদ্রযাত্রীদিগকে সমাজচ্যুত করি। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝা যায়, সমুদ্রযাত্রা দ্বারা আমাদের অনেক বিষয়ে শিক্ষা লাভ হয়। অনেক অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারি, বিভিন্ন দেশের লোকের হাব ভাব জানিতে পারি, এবং পরমপিতা পরমেশ্বরের বিশ্বরূপকতার উপলব্ধি ও আমাদের আন্তরিক সঙ্কীর্ণতা পরিহার করিয়া ভগবদ্ভক্তি লাভে ধন্য হইতে পারি।

শ্রীতারাচরণ ব্যাকরণতীর্থ।

সে

কুঞ্চিত অলক নহে ত'ার,
নিবিড় চাঁচর নয় চিকুর সম্ভার,
নাসা নয় জিনি তিলফুল,
কর্ণে দুটী নাহি শোভে দুল,
খঞ্জন গঞ্জন নয় তাঁর দুই আঁখি ;
তবু ভুলে থাকি!

২

নহে সে যে রূপসী রমণী,
কল্পনা তুলিতে আঁকা সৌন্দর্য্যের খনি ;
ঘোমটায় মুখ ঢাকা ;—
তা'র সরলতা মাখা
নধর অধরে ফুটে উঠে মৃদুহাসি ;
—তাই ভালবাসি।

৩

কণ্ঠে তার নাহি রত্নহার,
থরে থরে অঙ্গে নাহি শোভে অলঙ্কার,
কটি তটে রিণি ঝিনি—
হয় না মেখলা ধ্বনি।
উজ্জ্বল সিন্দূর রেখা তা'র শিরোমণি
দিবস রজনী।

৪

নাহি তা'র গর্ব্ব অভিমান,
সম্পদে বিপদে এক পতিগত প্রাণ ;
লাঞ্ছনা গঞ্জনা মাঝে,
ব্যাপৃত গৃহের কাজে,
নাহি মুখে উচ্ছাস—লেশ বিরক্তির।
—শান্ত অতি ধীর!

৫

পর দুঃখে সতত ব্যাকুল,
শঙ্কিত অন্তর সদা, পাছে হয় ভুল,
নিত্য মতি গৃহ কর্ম্মে ;
নিপীড়িত হয় মর্ম্মে,
সহস্র কর্ত্তব্য মাঝে হ'লে দৃষ্টি হারা
তা'র ধ্রুবতারা!

৬

তাই আমি এত ভালবাসি,
রূপসী সে নহে—তার আছে গুণরাশি,
গৃহিণী সে নিজ ঘরে,
দেবী, রুগ্নশয্যা' পরে,
শান্তিদাত্রী তাপিতের, স্নেহ-মন্দাকিনী
(চির) জীবন-সঙ্গিনী।

শ্রীপ্রিয়কুমার চট্টোপাধ্যায়

চিত্র পরিচয়।

এবার যে মঠটির চিত্র প্রকাশিত হইল, তাহা বাখরগঞ্জ জিলার একটি প্রাচীন কীর্ত্তি। মঠটি প্রায় এক শত ফিট বা ততোধিক উর্দ্ধ। ইহার গগনস্পর্শী চূড়া তিন মাইল দূর হইতে দেখা যায়। দেড় শতাব্দী পূর্ব্বে মাহিলাড়া গ্রামের রূপরাম সরকার নামক একজন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভদ্রলোক এই বিশাল মঠটি তাহার কোন পূজনীয় আত্মীয়ের সমাধির উপর নির্ম্মাণ করেন!

রাখরগঞ্জ জিলার আরও দুই একটি প্রাচীন মন্দির এই সময়ে নির্ম্মিত। বোধ হয় প্রসিদ্ধ রাজা রাজবল্লভের প্রভাবই ইহার কারণ। (বাখরগঞ্জের বোজর গোসেদপুর পরগণার জমিদারি রাজবল্লভ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন—বেভারিজ কৃত বাখরগঞ্জের ইতিহাস।)

মঠের চূড়ার কিয়দংশ কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বজ্রাঘাতে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। ঐ ভগ্ন অংশ আমাদের চিত্রে দেখা যাইতেছে না। এই উচ্চ মঠটি দক্ষিণের দিকে অনেক হেলিয়া পড়িয়াছে, কিন্তু উত্তর দিক হইতে ফটো লওয়া হইয়াছে বলিয়া আমাদের চিত্রে তাহা দেখা যাইতেছে না। কবে যে মঠটি এই ভাবে হেলিয়া পড়িয়াছিল তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই। অনেক অশীতিপর

বৃদ্ধও তাহাদের বাল্যাবধি মঠের এই অবস্থা দেখিয়া আসিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, মঠটি নির্ম্মাণ কালাবধিই একদিকে হেলান। যদি তাহা সত্য হয়, তবে শিল্পী উচ্চ অঙ্গের বৈজ্ঞানিক গৌরবের অধিকারী সন্দেহ নাই মঠটিকে একটি Leaning tower বলা যাইতে পারে।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন।

গ্রন্থ-পরিচয় ও সমালোচনা।

শেরপুরের ইতিহাস—রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষৎকর্ত্তৃক প্রকাশিত, শ্রীযুক্ত হরগোপাল দাস-কুণ্ডুপ্রণীত।

রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার এক অতিরিক্ত সংখ্যায় এই মূল্যবান্ গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে বগুরা শেরপুরের বৈদিক কাল হইতে অধুনাতন সময় পর্য্যন্ত একখানি ইতিহাস সঙ্কলিত। অবশ্যই অতি প্রাচীন কালের ইতিবৃত্ত অনেকটা অনুমানের উপর নির্ভর করিতে হয়। কিন্তু মুসলমান রাজত্বের সময় হইতে গ্রন্থকার বহু গবেষণা দ্বারা শেরপুরের পুরাবৃত্ত নির্দ্ধারণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন এবং অনেক পরিমাণে সফলকাম হইয়াছেন। কিন্তু প্রাচীন কথা বলিতে বলিতে হঠাৎ অতি নূতনের সন্নিবেশ কেমন 'খাপ্ ছাড়া' হইয়াছে। মরিচা-শেরপুরের নাম মুরুচা-শের-পুরের অপভ্রংশ ও মুসলমান আমলের সংস্থাপিত মুরুচা বা দুর্গের নামানুসারে ইহার নামকরণ এবং দশকাহনিয়া শেরপুর হইতে ইহাকে পৃথক্ করিবার কারণ নির্দ্দেশ পূর্ব্বক লেখক সহসা বর্ত্তমান মিউনিসিপালিটী কর্ত্তৃক রাস্তার উন্নতি, বর্ত্তমান আদমসুমারির লোকসংখ্যা ইত্যাদি প্রায় যুগপৎ উল্লেখ করিয়া প্রাচীন নূতনে এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ করিয়া ফেলিয়াছেন।

আমাদের বিবেচনায় প্রাচীন ঘটনা কি বিষয়ের একস্থ সন্নিবেশ করিয়া পরে নূতন ঘটনায় হস্তক্ষেপ করিলে ভাল হইত। গ্রন্থকার ৩১ পৃষ্ঠায় প্রচলিত ব্রতের উল্লেখ করিতে বলিতেছেন :--

"মকর সংক্রান্তির দিন বগুড়া প্রদেশে গরু ছাড়িয়া দেওয়ার প্রথা আছে। প্রবাদ যে বিরাট রাজার গোগৃহ এইরূপ গরু ছাড়িয়া দেওয়া হইত। সুতরাং এ অঞ্চল গোগৃহ অন্তর্ভুক্ত বলিয়া প্রথাটি অতীতের নিদর্শন স্বরূপ প্রচলিত হইয়া পড়িয়াছে।" "অতীতের নিদর্শন" দেখিয়া নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে লেখক মহাভারতের বিরাট্ পর্ব্বের গরু হরণের কথা মনে করিতেছেন। কিন্তু সাধারণে তাহাকে বিরাটের "গোগৃহ" বলিলেও বস্তুতঃ বিরাট্ রাজার কোনও "গোগৃহের" উল্লেখ মহাভারতে নাই। প্রকৃত প্রস্তাবে "গোগ্রহ" অর্থাৎ অর্জ্জুন কর্ত্তৃক বিরাট রাজার অপহৃত "গো" পুনরায় 'গ্রহ' বা ফিরাইয়া আনাই "গোগ্রহ" শব্দের অর্থ। ভাষায় "গোগৃহ" ঐ "গোগ্রহেরই" অপভ্রংশ মাত্র। সুতরাং গ্রন্থকারের কথিত প্রবাদ যে অমূলক ভ্রমপূর্ণ জনশ্রুতি তাহা এতদ্দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে।

গ্রন্থকার প্রাচীন লুপ্তপ্রায় কীর্ত্তিগুলি, বিশেষতঃ ভবানীপুরের সাধক রাজা রামকৃষ্ণের ভবানী মন্দির প্রভৃতির যে বিশদ বর্ণনা ও বিবরণ প্রদান করিয়াছেন, তাহা বস্তুতই ভাষাভাণ্ডারে মূল্যবান্ রত্ন, ঐতিহাসিকের অনর্ঘ সামগ্রী। যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট আলোক-চিত্রগুলি যেমন বুঝিবার পক্ষে সহায়, তেমন সৌন্দর্য্যে মনোহর। সংগৃহীত মুর্ত্তিগুলির বিবরণে পুরাতত্ত্বের কিছু না থাকিলেও হয়তো তাহারা অতীত আলোচনার পক্ষে কালে সহায় সম্বল হইতে পারে।

দশম অধ্যায়টিতে সমাজ ও রাজনীতির আলোচনা হইয়াছে। ইহার বিশেষত্ব কিছু দেখা গেল না। বর্ত্তমানে যাঁহাদের বয়স ৪০ কি ৫০ বৎসর হইয়াছে, তাঁহারা বঙ্গদেশের প্রায় প্রত্যেক পল্লীতেই যে এই অধ্যায়ের বর্ণিত আচার ব্যবহার সামাজিক রীতিনীতির সাক্ষ্য প্রদান না করিতে পারিবেন, আমাদের এমন বোধ হয় না। রুচি, পোষাক, অলঙ্কার, ব্যায়াম, আমোদ প্রমোদ, খেলা, ইত্যাদির বিবরণে বিশেষত্ব বা গবেষণার কোনই পরিচয় নাই। প্রাচীন কবিতা কি গ্রন্থ কি ব্রতকথা, উপকথা প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া তাহা হইতে অতি প্রাচীন কালের সমাজ চিত্র দেখাইতে পারিলে তাহা প্রকৃতই মূল্যবান্ হইত।

৩০।৪০ বৎসরের আগেকার কথা লিখিলে ইতিহাসের ইতিহাসত্ব বা প্রাচীনত্ব কোথায়?

এই মূল্যবান্ গ্রন্থ খানিকে আমরা সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর দেখিতে অভিলাষী হইয়াই উল্লিখিত দোষগুলি দেখাইয়া দিতে প্রয়াসী হইয়াছি। বস্তুতঃ গ্রন্থকার সুসজ্জিত সরল প্রাঞ্জল ভাষায় শেরপুরের যে ইতিহাস রচনা করিয়াছেন, তজ্জন্য বাঙ্গালীমাত্রেই তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। তিনি যেরূপ পরিশ্রম স্বীকার করিয়া শেরপুরের সর্ব্বাঙ্গীন বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছেন তাহা প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই। যদি তিনি "মজনুর-কবিতা" কি ১০০ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত "বিচার পদ্ধতি" জাতীয় আরো পাচালি কি গ্রাম্য-গীতি সংগ্রহ করিয়া মূল গ্রন্থে না হউক পরিশিষ্টে সন্নিবেশিত করিতে পারিতেন তাহা হইলে তাহা সাহিত্য ভাণ্ডারে অপূর্ব্ব দান বলিয়া পরিগণিত হইত এবং "শেরপুর থানার অন্তর্গত গ্রাম সমূহের নাম" হইতে সাধারণ বাঙ্গালীর নিকট অধিকতর আদর লাভ করিত।

আমাদের মনে হয় 'শেরপুর' লিখিতে তালব্য "শ" ব্যবহার করা উচিত। কারণ "শের" কথার 'শ' এর ফার্সী উচ্চারণ তালব্য।

কা।

অঞ্জলি—(গীতিকাব্য) শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত প্রণীত—"সাধনাকুঞ্জ" চট্টগ্রাম।

অঞ্জলি একখানি ক্ষুদ্র "গীতিকাব্য।' ইহার ভাষাটী যেমন সরস-কোমল, স্থানে স্থানে ভাবও অতি সুন্দর। ইংরেজী Lyrics এর অনুকরণে বাঙ্গালায় এই ক্ষুদ্র কবিতাগুলি চিত্তের কোনও নির্দ্দিষ্ট একটী ভাব ফুটাইয়া তুলিতে প্রয়াসী হয়। কবি যে পরিমাণে সেই চিত্রটী তুলিকায় পরিস্ফুট করেন, তাঁহার লেখনী ধারণ সেই পরিমাণে সার্থক। বঙ্গভাষা জীবেন্দ্রকুমারকে সার্থক কবি বলিয়া সাদরে গ্রহণ করিবে। আমরা তাঁহার কবিতার দুই একটী নমুনা দিয়া পাঠকের কুতূহল চরিতার্থ করিব :—'অভিসার কবিতায় তটিনীর সাগর-প্রেম বর্ণিত হইয়াছে। "পর্ব্বত গৃহ ছাড়ি বাহিরয় যবে নদী সিন্ধুর উদ্দেশ্যে" সেই সময়ে কাঙ্ক্ষিত জনের সহিত মিলনের ব্যাকুলতায় বুঝি এমন সুন্দর কবিত্ব আর বঙ্গভাষায় নাই।

"কোথা সে সাগর মোর!
দিবস-যামিনী ভ্রমি একাকিনী
পথের না পাই ওর!
তুষার-শোভিত কোন্ গিরিশিরে,
তপণ কিরণ চুম্বনে ধীরে,
জনম লভিনু মনে আছে কিরে,
কত নিশা হ'লো ভোর!
গুহা জননীর নিভৃত কোলে,
কবে খেলিতাম হাসি কলরোলে,
মনে আজ ভাল নাই সে সকলে,
ঢেকেছে কুয়াশা ঘোর!
কোথা সে সাগর মোর।

আবার,

প্রেমে গলে অবিরত
চলেছি তুষিয়া ভুবন ভরিয়া
শুষ্ক কণ্ঠ কত শত!
কত মরুভূমি সরস করিয়া,
প্রাণের প্রবাহ চলেছে ছুটিয়া,
কোথা প্রিয়তম খুঁজিয়া খুঁজিয়
ধরি নিতি নব পথ!
লক্ষ তরণী সারসের প্রায়,
পক্ষ সাঁপটিয়া দূরে ভেসে যায়
ব্যাকুল হৃদয়ে বুকে করি তায়।
সাধি যে প্রণয়-ব্রত।
প্রেমে গলে অবিরত।

সহৃদয় পাঠকের অবশ্যই টেনিসনের Brook এর কথা মনে পড়িবে। সে Brook বালিকা—পল্লীর নিভৃত অন্তরালে ক্রীড়াপরায়ণা, উপল-খণ্ডে কল-হাসিনী (Bubble by the pebble); আর এই তটিনী মিলনমত্তা যুবতী। ভাষা ও তদনুরূপ। Ruskin বলিয়াছেন "Many thoughts are so dependent upon the language in which they are clothed, that they would lose half their beauty if otherwise expressed" —অনেক ভাব মধুর ভাষার সহিত এমনই জড়িত যে, অন্য ভাষায় তাহা প্রকাশ করিলে হয়তো অর্দ্ধেক সৌন্দর্য্যের বিলোপ হইবে।

"পঙ্ক সাঁপটিয়া দূরে ভেসে যায়—" সাঁপটিয়াতে চন্দ্রবিন্দু কেন? এখানে 'পঙ্ক সাপটিয়ার অর্থই বা কি? অন্যত্র আছে "প্রেম অর্ঘ্য বিমলিন" 'বিমলিন' না লিখিয়া 'অমলিন' লিখিলে কবিতাটী নিখুঁত হইত।

৭৭ পৃঃ 'গান্ধারী'—কবিতায় "নবোঢ়া গান্ধারী," "জননী গান্ধারী" "বিহ্বলা গান্ধারী" "মহিষী গান্ধারী" চারিটী মহিমাময় চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে।

সিদ্ধ হস্ত চিত্রকর যেমন লঘু হস্তে দুই চারিটী তুলিকা বিন্যাসে পূর্ণ চিত্র অঙ্কিত করেন—গান্ধারী তেমনই একটী শব্দ-চিত্র।" কিন্তু "ব্যাকুলা গান্ধারী" মহাভারতের স্ত্রীপর্ব্বের গান্ধারী নহেন। কবি বোধ হয় "পুত্র পৌত্রে বিহীনা" গান্ধারীকে নবীন বাবুর সুভদ্রার অনুকরণে অঙ্কিত করিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা নহে। গান্ধারী বিধবা পুত্রবধূও বিধবা কন্যাকে দেখাইয়া শ্রীকৃষ্ণকে যে ধিক্কার দিতেছেন আমরা সেই সজীব চিত্র দেখিলে সুখী হইতাম।

অর্থহীন অনুকরণ চিরকালই নিষ্ফল। এ বিষয়ে রবীন্দ্রের অনুকারক-দল সাক্ষ্য দান করিবে। কাব্যের প্রাণ ভাব, ভাষা নহে। তাই—"মর্ম্ম-গীতি" তে

"শ্মশানে বসি, দিবস-নিশি
কাঁদিছে ভারত লক্ষ্মী!
নয়ন ধারে শোণিত ঝরে;
যতেক অসুর যক্ষি (!)
ভ্রমিছে পুলকে ভক্ষি!—
নাহি কি একটী রক্ষী?
একটী মায়ের সুত
জীবিত?"

ইত্যাদি নিতান্তই অসহনীয়। এ যে কেবল অস্থি পঞ্জর লইয়া হিতোপদেশের সিংহ রচনা। সিংহ কবিকে কবলিত করিয়া না বসে!

"জননী জন্মভূমি" কবিতাটী চট্টগ্রামবাসী কবির অনুরূপই হইয়াছে। চট্টগ্রাম 'নবীন' কবির জননী এবং 'অঞ্জলি' পড়িয়া স্থানে স্থানে মনে হয় "Meet nurse for a poetic child."

এখন আমাদের দুই চারিটী আপত্তির কথা বলিব।

৩ পৃঃ "শুদ্ধ বিমানে শারদ চাঁদিমা
সারাটী যামিনী জাগি,
ভরিছে অর্ঘ্য শত উপচারে"

শেষ ছত্রের 'অর্ঘ্য, শব্দের অর্থ কি?

আবার,

"বিহগ-সমাজ হৃদয় খুলিয়া
বালিকা উষার ক্রোড়ে—
তোমার আরতি করে ওহে দেব"

"ক্রোড়ে হৃদয় খুলিয়া আরতি করে" এ কি রকম উপমা বা উৎপ্রেক্ষা?

"কুসুম রেণুকা নিতেছে মাগিয়া"

রেণুকা কি? রেণুকা যে পরশুরামের মাতা! "কুসুম পরাগ" বা "কুসুমের রেণু" লিখিলেই তো হইত।

১৪ পৃঃ 'নিরাশ সাগর' অশুদ্ধ।

কতকগুলি কবিতা যথা:—"বউকথা কও" 'বর্ষা' "উদ্দেশ্য" "প্রেমের বন্ধন" ইত্যাদি বাদ দিলেও গ্রন্থের সৌন্দর্য্য হানি না হইয়া ববং বৃদ্ধি হইত। Inspiration এই কবিতা হয় "যা লিখি তাহাই পদ্য" নহে।

'ঊর্ম্মিলা' কামিনী রায়ের 'পুণ্ডরীক' কি 'মহাশ্বেতার' অনুকরণের নিষ্ফল প্রয়াস!

কা।

কুল-লক্ষ্মী।—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায় প্রণীত। কলিকাতা বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী হইতে শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

নব-পরিণীতা বঙ্গীয়কুলবালাগণ শ্বশুর গৃহে যাইয়া যাহাতে শীঘ্রই সকলের মনোরঞ্জন করিতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যে এই গ্রন্থখানি লিখিত হইয়াছে। গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য অতি মহৎ এবং সেই উদ্দেশ্য সাধনে তিনি বহু পরিমাণে কৃতকার্য্য হইয়াছেন বলিয়াই আমাদিগের বিশ্বাস। গ্রন্থখানি পাঁচ ছয়টি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। পরিচ্ছেদগুলির নাম, স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা, স্ত্রীলোকের গুণ, স্ত্রীলোকের দোষ, পরিজনের প্রতি কর্ত্তব্য, দৈনিক গৃহকার্য্য ও পৌরাণিক নীতিকথা। সমস্তগুলি পরিচ্ছেদই জ্ঞানগর্ভ উপদেশে পূর্ণ এবং বিষয়াংশে শিক্ষাপ্রদ। গ্রন্থের ভাষা প্রাঞ্জল, রচনা সুন্দর ও সরস।

গ্রন্থকার ইংরেজীতে সুশিক্ষিত হইলেও জাতীয় আচার-পদ্ধতি ও রীতিনীতিতে প্রগাঢ় অনুরাগসম্পন্ন। সুতরাং বঙ্গীয় হিন্দুকুললক্ষ্মীগণের জন্য এইরূপ প্রয়োজনীয় গ্রন্থ রচনায় তাঁহার উদ্যম একান্তই প্রশংসার্হ। বাঙ্গালায় যে কয়খানি উৎকৃষ্ট স্ত্রীপাঠ্য গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, আমাদিগের বিবেচনায় এই গ্রন্থখানিও উহাদিগের মধ্যে অন্যতম। গ্রন্থখানির আদ্যন্তই হিন্দু-কুল-ললনার জ্ঞাতব্য বিষয়ে পরিপূর্ণ। বাবু সুরেন্দ্রনাথ বর্ত্তমান যুগে এইরূপ সুন্দর গ্রন্থখানি লিখিয়া আর একখানি উৎকৃষ্ট স্ত্রীপাঠ্য গ্রন্থ বঙ্গভাষা-ভাণ্ডারে উপহার দিয়াছেন।

সাবিত্রী সত্যবান্ (দ্বিতীয় সংস্করণ) ও শৈব্যা (প্রথম সংস্করণ)।—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায় প্রণীত। এই উভয় গ্রন্থেরই প্রকাশক খ্যাতনামা গ্রন্থপ্রকাশক শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়। এই উভয় গ্রন্থই ডবল ক্রাউন ষোল পেজি আকারে কিঞ্চিদধিক দুই শত পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। প্রত্যেকখানি গ্রন্থের মূল্য ১।০ টাকা। দুইখানি গ্রন্থই নয়নাভিরাম বেশভূষায় সুসজ্জিত। উভয় গ্রন্থেই কতিপয় সুন্দর চিত্র সন্নিবেশিত হইয়াছে। এণ্টিক কাগজে পরিপাটিরূপে মুদ্রিত। সুন্দর কাপড়ের মলাটে ঝল্-মল্ রূপার জলে নাম লিখিত। বাঙ্গালায় স্ত্রীলোকদিগকে উপহার প্রদানের নিমিত্ত যে কয়খানি উৎকৃষ্ট পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে, এই সমালোচ্য গ্রন্থদ্বয় সে সকলের মধ্যে সম্মানের আসন পাইবার উপযুক্ত। আমরা এই গ্রন্থ দুইখানির বাহ্য-পারিপাট্য দেখিয়া যেমন মোহিত হইয়াছি, গ্রন্থের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়াও তেমনই প্রীতি লাভ করিয়াছি।

সাবিত্রী শৈব্যা প্রভৃতি পতিব্রতা রমণীর পৌরাণিক পুণ্যপ্রদ কাহিনী সম্পর্কে বাঙ্গালায় বিভিন্ন লেখক কর্ত্তৃক বহুগ্রন্থ রচিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। শৈব্যা ও সাবিত্রী সম্পর্কে আমরা এ পর্য্যন্ত আরও দুই তিনখানি গ্রন্থ পাঠ করিয়াছি। প্রিয় বস্তু যেমন কখনও পুরাতন হয় না, সাবিত্রী ও শৈব্যা প্রভৃতি পতিপ্রাণা সতীর পবিত্র কাহিনীও তেমনই কখনও পুরাতন বিবেচিত হয় না। কিন্তু কৃতিত্ব তাঁহার,—যিনি সেই চিরপুরাতন কাহিনীকে ভাষার সরল সৌন্দর্য্যে ও রচনার সরল মাধুর্য্যে নূতন করিয়া লোকচক্ষুর সম্মুখে উপস্থাপিত করেন। সুরেন্দ্র বাবু তাহাই করিয়াছেন। সাবিত্রী ও শৈব্যার উপাখ্যান ভাগ আমাদিগের নিকট অতি প্রাচীন। কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ সেই প্রাচীন পুণ্য কাহিনীকে আপনার প্রতিভায় প্রাঞ্জল ভাষায় নূতনরূপে বর্ণনা করিয়া বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। সাবিত্রী সত্যবানের রচনা সরল অথচ মধুর। গ্রন্থখানি আদ্যন্তই পাঠে প্রীতিকর। 'শ্মশানে শৈব্যা' পরিচ্ছেদ পাঠ করিয়া কোন কোন স্থলে আমরা অশ্রু সম্বরণ করিতে পারি নাই।

উভয় গ্রন্থেরই স্থানে স্থানে মুদ্রাকর-প্রমাদ পরিলক্ষিত হইয়াছে। ইহা বাঙ্গালার মুদ্রাকরদিগের এক চিরন্তন অপবাদ। এ অপবাদ কি দূরীভূত হইবে না? গ্রন্থের রচনা সম্পর্কেও সর্ব্বত্র সমান সাবধানতা পরিলক্ষিত হয় নাই। যথা,—"সাবিত্রী সেরূপ স্বর, সেরূপ স্বর্গীয় চিত্র যেন আর কখনও দেখেন নাই।" (সাবিত্রী-সত্যবান্ ৬৩ পৃঃ)। "তাহারা মনের সুখে দিবারাত্রি চারিদিকে ভ্রমিয়া বেড়াইতে লাগিল।" (শৈব্যা ১৪ পৃঃ) "সে এখন চিরজীবনের জন্য অদর্শন হইতেছে।" (শৈব্যা ১৫৬ পৃঃ)। এতদ্ব্যতীত "সকালে-সন্ধ্যায়", "গায়তাড়িত" প্রভৃতি কএকটি সমাস ও আমাদিগের নিকট ভাল বোধ হয় নাই। যাহা হউক, এই সকল গ্রন্থের সামান্য ত্রুটি ভবিষ্যৎ সংস্করণে সংশোধিত হইলে পুস্তক দুইখানি নিখুঁত হইবে।

ঢাকারিভিউ ও সম্মিলন

১ম খণ্ড। | ঢাকা, পৌষ, ১৩১৮ সাল। | ৯ম, সংখ্যা।

অভিষেক-সঙ্গীত।

(১)

গাওরে আজি ভারতবাসী —হিমাদ্রি অবধি সমুদ্রতীর—
ত্রিংশ কোটী মিলিত কণ্ঠে তোলরে তান সুগভীর,
পুণ্য-ভূমে অভিষেক আজ নবীন রাজদম্পতীর,
রত্ন-আসনে মহিষী সনে বিরাজে জর্জ্জ্ ধীমান্ ধীর।

(কোরাস্)

ত্রিংশ কোটী কণ্ঠে গাও 'জয় মহিষী নৃপতির',
প্রাচীর ভালে গৌরবে জ্বলে উজল রবি প্রতীচীর।

(২)

এ শুভ উৎসবে থেক না নীরবে গভীর আরাবে মাতাও প্রাণ,
বোম্বে, ব্রহ্ম, কন্যা, কাশ্মীর, ব্যাপি বিশাল হিন্দুস্থান।
ভারতসন্তান যে আছে যেথানে ধনবান্ দীন পিহিত-চীর,
বলরে 'স্বাগত ভারত ভূপতি!' করবে প্রণতি নোয়ায়ে শির।

(কোরাস্)

ত্রিংশ কোটী কণ্ঠে গাও 'জয় মহিষী নৃপতির,'
প্রাচীর ভালে গৌরবে জ্বলে উজল রবি প্রতীচীর।

(৩)

কম্পিত করি সাগর গিরি কররে শুভ শঙ্খনাদ,
রাজপূজা আজি ভারত-ভবনে বহুদিনের পূর্ণ সাধ,
পুষ্পমাল্যে ভূষিত দেহ করহ রাজদম্পতীর,
ঢালরে চরণে প্রীতির অঞ্জলি পাদ্য-অর্ঘ্য ভকতির।

(কোরাস্)

ত্রিংশ কোটী কণ্ঠে গাও 'জয় মহিষী নৃপতির,'
প্রাচীর ভালে গৌরবে জ্বলে উজল রবি প্রতীচীর।

(৪)

হের কি কান্ত দিগ্‌দিগন্ত ঢালে হেমন্ত বিভূতি তার—
উজল আস্যে সজীব হাস্য করে রাজস্ব শস্য-ভার,
কানন কুঞ্জে কুসুম পুঞ্জে দ্রব সোহাগ শিশির নীর,
প্রকৃতি রাণী কুশল বাণী বিহগ-কণ্ঠে ধ্বনিছে ধীর।

(কোরাস্)

ত্রিংশ কোটী কণ্ঠে গাও 'জয় মহিষী নৃপতির,'
প্রাচীর ভালে গৌরবে জ্বলে উজল রবি প্রতীচীর।

(৫)

রাজা কে এমন অধিকারে যাঁর সূর্য্য অস্ত নাহিক হয়?
নিখিল ধরণী আদেশে যাঁহার বিজয়-পতাকা হরষে বয়?
পরম উদার প্রীতির আধার কে হেন আছে অজেয় বীর?
জগত-লোভন মণি সুশোভন কোহিনুর কার উজলে শির?

(কোরাস্)

ত্রিংশ কোটী কণ্ঠে গাও 'জয় মহিষী নৃপতির,'
প্রাচীর ভালে গৌরবে জলে উজল রবি প্রতীচীর।

(৬)

সপ্ত অতলে কল্লোলি চলে যুদ্ধ-তরণী অকুতোভয়
দুর্জ্জয় সেনা গর্জ্জে সঘনে 'রুল ব্রিটানিয়া' ভুবনময়।
বজ্র সমান ভীষণ প্রতাপ, অচল সমান অটল স্থির,
বিশ্ববিজয়ী রাজ-অধিরাজ মুকুট-রত্ন ধরিত্রীর।

(কোরাস্)

ত্রিংশ কোটী কণ্ঠে গাও 'জয় মহিষী নৃপতির,'
প্রাচীর ভালে গৌরবে জলে উজল রবি প্রতীচীর।

(৭)

চিরজীবী হও তুমি মহীপাল, তোমার তুলনা কোথায় আর?
চিরজীবিনী রাণী-মা তুমি ভূতলে অতুল শোভার সার।
চঞ্চলা চির অঙ্ক-শায়িনী, চির বিনম্র অরাতি শির—
হোক্ বরষিত ঈশ-আশীর্ব্বাদ শিরসি রাজদম্পতীর।

(কোরাস্)

ত্রিংশ কোটী কণ্ঠে গাও 'জয় মহিষী নৃপতির,'
প্রাচীর ভালে গৌরবে জলে উজল রবি প্রতীচীর।

শ্রীমনোমোহন সেন
ময়মনসিংহ।

মহাকবি উমাপতি ধর ও কবিশ্রেষ্ঠ রাণক শূলপাণি।

সংক্ষিপ্ত দুরবগাহ দুর্গসিংহ রচিত কাতন্ত্র বৃত্তিকে বুঝাইয়া দিবার জন্য উমাপতির রচিত বলিয়া যে সকল কারিকা প্রচলিত, সেই সকল কারিকাকে মধ্যবর্ত্তী করিয়া বাল্যে উমাপতির সহিত পরিচয়। কৈশোরে মহাকবি জয়দেব রচিত-গীতগোবিন্দের "বাচঃ পল্লবয়ত্যুমাপতিধরঃ" এই শ্লোকাংশের ইঙ্গিতে উমাপতির সহিত কথঞ্চিৎ পরিচয়। যৌবনে ও বার্দ্ধকে প্রদ্যুম্নেশ্বরের মন্দিরোৎকীর্ণ প্রশস্তিকে সম্মুখে স্থাপিত করিয়া সেই শ্লোক মালার ভিতরে স্বহস্তলিখিত যে উমাপতির তৈলচিত্র উদ্ভাসিত হইয়াছে তাহা বিলোকন করিয়া উমাপতির সহিত দৃঢ় সম্বন্ধ ও সুদৃঢ় পরিচয়।

ঢাকার দরবারে আহূত হইয়া প্রয়োজনানুরোধে রাজসাহীর পথে ঢাকা যাত্রা করি। সর্ব্বজন-পরিচিত ইতিহাসে নূতন যুগের প্রবর্ত্তক সাহিত্য-রঙ্গালয়ে আত্মগোপনকারী সূত্রধার বন্ধুবর শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ের অদম্য উদ্যম ও উদ্দাম পরিশ্রমে, বৃদ্ধ সাহিত্যিকদিগের আশীর্ম্মাল্যে অলঙ্কৃত, লক্ষ্মী সরস্বতীর সাপত্ন্য কলহের অপনোদনকারী প্রিয়পুত্র কল্যাণভাজন দিঘাপতিয়ার কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায়ের হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ, ম্যালেরিয়া বিষে আক্লিন্ন-বারেন্দ্র ভূমির গ্রাম, পল্লী, বন, অরণ্যানীতে অনাবৃত মস্তকে বর্ষাতপ বহন করিয়া ক্ষুৎপিপাসায় নিপীড়িত হইয়া অবিশ্রান্ত ভ্রমণ ও অজস্র ধনধারার বর্ষণে, অত্রত্য সংস্কৃত বিদ্যালয়ের ইংরেজিভাষার শিক্ষক অপক্ষপাতে সত্যপ্রিয় উদ্যমশীল যুবক সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ্রের অক্লান্ত সবল বাহুর অশ্রান্ত পরিস্পন্দন ও লৌহবৎ কঠিন বারেন্দ্রভূমিরবক্ষে অবিশ্রান্ত কুদ্দাল পাতনের ফলে যে সকল তালপ্রাংশু স্থূলপ্রস্তরস্তম্ভ, তোরণ পার্শ্ববর্ত্তী প্রস্তর-ফলক, ক্ষুদ্রবৃহৎ অন্যবিধ প্রস্তর খণ্ড ও নানাবিধ দেবদেবীর মূর্ত্তি ভূগর্ভ হইতে উত্তোলিত ও নানা উপায়ে আনীত হইয়া অত্রত্য পুস্তকালয়ের প্রাঙ্গনে ও গৃহের সুবৃহৎ অভ্যন্তরে স্থাপিত ও যত্ন সহকারে রক্ষিত হইতেছে, সেই সমস্ত প্রাচীন কীর্ত্তিকলাপ দেখিবার জন্য কৌতুহল জন্মে।

চন্দ্রকর প্রদর্শিত পথে পুস্তকালয়ে উপস্থিত হইয়া তৎকৃত ভাষ্য বিবৃতিদ্বারা পুষ্প, পত্র, লতিকায় খচিত মসৃণ নিকষোপলে নিপুণ ভাস্করের নিপুণ হস্তে উৎকীর্ণ সুন্দর সুন্দর দেব দেবীর মূর্ত্তিগুলি দেখিয়া স্থূল দীর্ঘ কৃষ্ণ প্রস্তরের স্তম্ভগাত্রে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম লতাপত্রপুষ্পে খোদিত চিত্রমালা অবলোকন করিয়া জ্যোতির্ম্ময় অসিত শিলাফলকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিবিধ উজ্জ্বল উদ্ভাসিত কুসুম-কিশলয়ে অলঙ্কৃত বল্লী, স্তম্ভ, তরুরাজির, পশু, পক্ষী, মানব মানবীর প্রতিকৃতি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া কিয়ৎকালের জন্য চক্ষুর পরিবর্ত্তন করিতে পারি নাই; মনকে বিষয়ান্তরে ব্যাপৃত করিবার জন্য অভিলাষ জন্মে নাই। অতৃপ্ত নয়নে বহুকাল সেইগুলি দেখিয়াছি, অতৃপ্ত মনে বহুকাল সেইগুলির অনুধ্যান করিয়াছি। চিত্রন্যস্তচক্ষুঃ, চিত্রাসক্তচিত্ত আমার মুহূর্ত্তকালেরজন্য চিত্র ভিন্ন সমস্ত বস্তুই বিলুপ্ত হইয়াছিল।

ভুবনেশ্বর মন্দিরের চিত্র, কোণার্ক মন্দিরের চিত্র, কার্লী গুহার চিত্র, উৎকৃষ্ট; সেই সমস্ত চিত্র অপেক্ষা আরও উৎকৃষ্ট চিত্র আছে, এ ধারণা পূর্ব্বে ছিল না। বাঙ্গালীর অভ্যস্ত বিদ্যা হলচালনা, ধান্যকর্ত্তন, ভারবহন এতদ্ভিন্ন এইরূপ একান্ত স্থূল কর্ম্মভিন্ন অন্য সূক্ষ্মতম কলাবিদ্যায় তাহাদিগের কুঠারকঠোর হস্ত যে প্রযুক্ত হইত ইতঃপূর্ব্বে আমার তাদৃশ ধারণা ছিল না, সেইরূপ বিশ্বাস কোন দিন উৎপন্ন হয় নাই, হইবে বলিয়াও কোন দিন আশা করিতে পারি নাই। প্রস্তর উৎকীর্ণ করিয়া তাহা হইতে প্রতিকৃতি বাহির করা দূরের কথা প্রস্তর কর্ত্তনে যে তাহাদিগের সামর্থ্য ছিল, তাহাও এতদিন আমাদিগের চিন্তার অগোচর ছিল। আজ আমার এতদিনের এই ভ্রমধারণা মুহূর্ত্তেরমধ্যে ধূলিসাৎ হইয়া গিয়াছে, রাজসাহীর এই মহাপুরুষত্রয়ের যত্ন-উদ্ধৃত, আনীত ও রক্ষিত প্রস্তরশিল্পেরপ্রভাবে, আমি আজ এক নূতন অতীত জগতে উপস্থিত হইয়া বাঙ্গালীর গৌরবে গর্ব্বিত হইয়াছি, বাঙ্গালীর শিল্পনৈপুণ্যে আত্মপ্রসাদ

অনুভব করিয়াছি ; বাঙ্গালীহস্তের চিত্রোৎকর্ষে বিস্ময় ও আনন্দে অভিভূত হইয়াছি।

পাঠক পাঠিকার আপত্তি হইতে পারে কে বলিল উহা বাঙ্গালীর হস্তখোদিত, চিত্রী-গ্রীকচিত্রকরের সহিত সমুদ্রকূলবর্ত্তী স্বশিষ্য ভারতীয়চিত্রকরের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের ফলে ঐ সমস্ত প্রস্তরোৎকীর্ণ চিত্রমালার উৎপত্তি। কিন্তু এইরূপ উৎপত্তির সম্বন্ধে উপপত্তির একান্ত অপ্রাপ্তি।

আমরা বলিতে পারি বর্ষান্তর হইতে, দেশান্তর হইতে বা এই বঙ্গদেশেরই অংশান্তর হইতে শিল্পী আসিয়া এ চিত্র উৎকীর্ণ করে নাই, যে স্থানের ভূগর্ভে এই সকল চিত্রের প্রাপ্তি হইয়াছে তাহারই সন্নিহিত কোন এক স্থানে অবস্থিত শিল্পিশ্রেষ্ঠের হস্তকৌশলে এই চিত্রমালা নির্ম্মিত।

ধর্ম্মের প্রনপ্তা (প্রপৌত্র), মনদাসের নপ্তা (পৌত্র), বৃহস্পতির পুত্র বারেন্দ্র শিল্পী রাণক শূলপাণি প্রদ্যুম্নেশ্বর মন্দিরের প্রশস্তি ফলকে প্রশস্তি পত্রের উৎকিরণকারী। কবি উমাপতিধর যে শ্লোকে আত্মপরিচয় প্রদান করিয়াছেন, সেই শ্লোকের অব্যবহিত পরবর্ত্তী শ্লোকে রাণক শূলপাণির পরিচয় প্রদান করিয়া শূলপাণির মর্য্যাদা কত ঊর্দ্ধে ছিল বুঝাইয়া দিয়াছেন, আরও বুঝাইয়া দিয়াছেন, —কবি যেমন শব্দের ঝঙ্কারে শ্রোতার মন সুধাসিক্ত করেন, নূতন ভাবের সমাবেশে শ্রোতাকে আনন্দধারায় অবগাহিত করেন, শ্রেষ্ঠশিল্পীও সেইরূপ প্রতিকৃতিতে একটী অনির্ব্বচনীয় প্রসন্নভাবের সমাবেশে লাবণ্যতরঙ্গের উৎপ্লবনে দ্রষ্টাকে নেত্র ও চিত্তের সহিত আনন্দসরোবরে নিমজ্জিত করেন। এই জন্য উভয়েরই তুল্য আসন পাইবার যোগ্যতা আছে, সমান অর্চ্চনা পাইবার সামর্থ্য আছে। তাই গুণগ্রাহী রাজা কবিউমাপতির ও শিল্পি-শূলপাণির তুল্য আসনের ব্যবস্থা করিয়া নিজের গুণগ্রাহিতার পরিচয় দিয়াছেন। এই ঘনিষ্ঠ শ্লোকদ্বয়েনিবদ্ধ উভয়ের পরিচয়রূপ ব্যঞ্জনাবৃত্তির এটিও একটি ব্যঙ্গ্যার্থ। বাচ্যার্থ অপেক্ষা ব্যঙ্গ্যার্থের আতিশয্য হইলে, কাব্যের প্রশংসা, কাব্যের শ্রেষ্ঠতা ; ব্যঙ্গ্যার্থশূন্যকাব্য অধম কাব্য মধ্যে পরিগণিত, আলঙ্কারিকদিগের ইহাই অঙ্গীকৃত অভিমত। এ স্থলে ইহাও বক্তব্য যে রাণক শূলপাণি কেবল প্রশস্তি কবিতার অক্ষরগুলির উৎকিরণ মাত্র করিয়াই রাজার নিকটে তাদৃশ সম্মান ও উমাপতির নিকটে প্রশস্তি কবিতার বিশেষতঃ রাজ-পূজিত মহাকবির নামের সঙ্গে আত্ম পরিচয়রূপ অভ্যর্থনা পাইবার যোগ্যতা লাভ করিয়াছিলেন, এইরূপ অনুমান করাও কর্ত্তব্য নয়, করিলে—রাজার উপরে, রাজ কবির উপরে, রাজ সভাসদের উপরে অবিচার করা হয়। এই অকিঞ্চিৎকর কার্য্য করিয়া কেহ কখনও সভ্য রাজার নিকটে ঈদৃশ উচ্চ সম্মানে অধিকারী হয় না। রাণক শূলপাণিও এই ক্ষুদ্রতম কার্য্যমাত্র করিয়াই সুসভ্য সেনবংশীয় রাজার নিকটে পূর্ব্বোক্ত পূজা পান নাই। শিল্পী শূলপাণি প্রদ্যুম্নেশ্বরের পর্ব্বতোপম মেঘচুম্বী প্রাসাদের নির্ম্মাণে স্থাপত্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন, প্রস্তর ফলকে ও প্রস্তর স্তম্ভে বিবিধ চিত্রের উৎকিরণ করিয়া শিলাখণ্ড হইতে স্বর্গীয়ভাবে উদ্ভাসিত নানা দেবমূর্ত্তির উদ্ভাবন করিয়া ভাস্কর্য্যের অশেষ প্রকারে শেষ নিদর্শন দেখাইয়াছেন ; তাই তিনি রাজার নিকটে পূজিত, কবির নিকটে অভ্যর্থিত, সভাসদের নিকটে সম্মানিত, দেশী ও বিদেশীর নিকটে সসম্মানে কীর্ত্তিত হইয়াছেন।

এক সময়ে বারেন্দ্রভূমি যে ভাস্কর্য্যে পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চস্থান অধিকার করিয়াছিল, বারেন্দ্র শিল্পের আদর্শে চীন তিব্বতে যে চিত্রের উৎকিরণ হইত, লামা তারানাথ তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন। বর্ত্তমান সভ্যতা দেখিয়া সেই দেশের অতীত যুগের সভ্যতা অনুমিত হইবেনা ; সভ্যতার বর্ত্তমান অভাব দেখিয়া সেই দেশের অতীত যুগে সভ্যতার অভাব অনুমান করিলেও চলিবে না।

একপুরুষ পূর্ব্বে স্থাপত্য ভাস্কর্য্যের ভারতে আদর ছিল না, স্থপতি ও ভাস্কর সমাজের চক্ষে হীন ব্যবসায়ী বলিয়া পরিচিত ছিল ; কিন্তু হিন্দুসাম্রাজ্যের সময়ে সমাজে শিল্পের সমাদর ছিল ; শিল্পী তখন সমাজের নিকটে ঘৃণনীয় না হইয়া বরণীয় হইতেন। শিল্পিশ্রেষ্ঠ শূলপাণির "রাণক" এই উপাধি দেখিয়াও আমরা সেইরূপ অবধারণ করিতে পারি।

আমরা তাম্রশাসনে অনেকবার রাণক শব্দ দেখিয়াছি, আবার প্রত্যেক তাম্রশাসনেই "রাজ্ঞী" শব্দের

পরেই "রাণক" শব্দের সমাবেশ রহিয়াছে। ইহাদ্বারা স্পষ্টতঃ বুঝিতে পারি, রাজ্ঞীর নীচেই রাণকের সম্মান। সুতরাং রাণকের পদ অকিঞ্চিৎকর নয়, সম্মানও যৎকিঞ্চিৎ নয়, রাণক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। বন্ধুবর অক্ষয় কুমারের মতে এই রাণক শব্দ হইতেই রাণা শব্দের সৃষ্টি। রাজমণ্ডলে উদয়পুরের রাণার সম্মান সর্ব্বোচ্চে প্রতিষ্ঠিত।

রাণা হইয়া, এত উচ্চ সম্মানের অধিকারী হইয়া, শূলপাণি উৎকিরণ কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন, শিল্পকলায় একশেষ দক্ষতা লাভ করিয়াছিলেন। সে কালে শিল্প নৈপুণ্যের নিন্দা ছিলনা, সমাজে পূজা ছিল। তাই, রাজকবি উমাপতিধর শিল্পীর তিন পুরুষের পরিচয় দিয়া "বারেন্দ্রক শিল্পিগোষ্ঠী চূড়ামণি রাণক শূলপাণিঃ" এইরূপ লিখিয়া বারেন্দ্র শিল্পিসভার চূড়ামণি বলিয়া শূলপাণির যথাযথ পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

"শিল্পিসভা" এই পদ দেখিয়া আমরা বুঝিতে পারি সে কালে শিল্পোন্নতির জন্য শিল্পীদিগের সভা ছিল; সেই সভায় সমবেত-শিল্পি-সভ্যমণ্ডলীর উদ্ভাবন ও অবধারণে শিল্পোন্নতির পথ অবধারিত হইত, সেই শিল্পি-সভার অধীনে যে সকল শিল্প বিদ্যালয় ছিল; তাহাতে সেই অবধারিত প্রণালী অবলম্বনে শিক্ষা প্রদান হইত। শিল্পি-সভার "বারেন্দ্রক" বিশেষণ পদ দেখিয়া আমরা আরও বুঝিতে পারি, ভারতে তখন একটীমাত্র শিল্পি-সভা ছিলনা, আরও কতিপয় শিল্পিগোষ্ঠী ছিল। এই "বারেন্দ্রক" পদ দিয়া কবি সেইগুলির ব্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। ব্যঞ্জনাবৃত্তিদ্বারা কবি আরও বুঝাইয়া দিয়াছেন, অন্যান্য শিল্পিগোষ্ঠী অপেক্ষা বারেন্দ্র শিল্পিগোষ্ঠীরই প্রাধান্য। সেই সর্ব্ব প্রধান শিল্পিগোষ্ঠীর সর্ব্বপ্রধান শিল্পীই রাজার এই কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন, কবির ইহাও বলিবার বিষয়।

যে সময়ে ধর্ম্মের নাম জনসমাজে বিলুপ্ত হয় নাই, বৃদ্ধেরা মনদাসকে দেখিয়াছে, যুবকেরা তাঁহার নাম সাদরে শুনিয়াছে; বৃহস্পতি ত তাৎকালিক নরনারীর নিকটে সুপরিচিত বলিলেই হয়। উমাপতি এই তাৎকালিক জনসমাজে সুবিদিত পুরুষত্রয়ের মধ্যে কাহারও প্রপৌত্র, কাহারও পৌত্র, কাহারও পুত্র বলিয়া শূলপাণির পরিচয় দিয়াছেন। এই পুরুষত্রয় তাৎকালিক জনসমাজে এতই প্রখ্যাত যে তাঁহাদিগের বিদ্যাবত্তা ও খ্যাতিপ্রতিপত্তির উল্লেখকরা আবশ্যক মনে করেন নাই।

স্বর্গীয় ভুবনমোহন বিদ্যারত্ন মহাশয়ের পরিচয় ব্যপদেশে অনেকের মুখে শুনিয়াছি "ইনি নবদ্বীপের সর্ব্বপ্রধান নৈয়ায়িক, গদাধরের বংশধর", ন্যায়দর্শনের গ্রন্থকার গদাধর এতই প্রসিদ্ধ যে, তাঁহার আর পরিচয় দিতে হয় না। পক্ষান্তরে গদাধর যদি নৈয়ায়িক না হইয়া অন্য শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য লাভ করিতেন তাহা হইলেও নৈয়ায়িক ভুবনমোহনের পরিচয়ে গদাধরের নামোল্লেখ হইত না। উমাপতি শূলপাণির পরিচয়েও সেই সমাজ প্রচলিত রীতির অনুসরণ করিয়াছেন। যে কবি নর নারীর রীতি, নীতি, আচার, ব্যবহার, হাব, ভাব, সূক্ষ্মভাবে বিলোকন করিতে পারে ও স্বীয় কাব্যের যথাস্থানে সেই ভাবের দুই একটী শব্দের প্রয়োগ করিতে পারে, তাহাকেই ত প্রকৃত কবি, মহাকবি বলা যায়। উমাপতির মনুষ্য দুর্ল্লভ এই গুণ ছিল। উমাপতি শিল্পীর শ্রেষ্ঠতা বুঝাইবার জন্য, তাঁহার শিল্পের উৎকর্ষ প্রতিপাদন করিবার জন্য শিল্পীর পূর্ব্বপুরুষদিগের নাম কীর্ত্তন করিয়াছেন। শূলপাণিতে হঠাৎ শিল্পকলা সংক্রান্ত হয় নাই এবং সেই কলা হঠাৎ উৎকর্ষ লাভ করে নাই, উহা পুরুষ পরম্পরার ঐকান্তিক অনুধ্যান ও ঐকান্তিক উপাসনার ফল।

ব্যঙ্গ্যার্থপ্রধান কাব্যের সৃষ্টি করিতে উমাপতি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। মহাকবি জয়দেব তাঁহার গীতগোবিন্দে সেনরাজার সভাকবিপঞ্চকের সমসময়ের কবিপঞ্চকের উল্লেখ করিতে যাইয়া প্রথমেই উমাপতির নাম কীর্ত্তন করিয়াছেন। জয়দেব কর্ত্তৃক সর্ব্বাগ্রে এই পূজার ব্যবস্থা দেখিয়া উমাপতির শ্রেষ্ঠত্ব কথঞ্চিৎ উপলব্ধি করিতে পারি। জয়দেব বলিয়াছেন, "বাচঃ পল্লবয়ত্যুমাপতিধরঃ"। ব্যাকরণের অনুশাসনে করোত্যর্থে নামের পরে ণিচ্ বা ইণ্ প্রত্যয় হয়, সেই প্রত্যয় পরে থাকিলে মত্বর্থীয় প্রত্যয়ের লোপ হয়। সুতরাং প্রাগুক্ত

শ্লোকাংশের অর্থ উমাপতিধর বাণীকে পল্লবিত করেন। পত্রগুচ্ছের নাম পল্লব, বৃক্ষলতারই পল্লবোদ্গম হয়, বৃক্ষলতারই পল্লব আছে। বাণীকে পল্লবিত করেন বলিলে বুঝিতে হইবে, বাণী একটি লতা স্বরূপা। কোন্ কালে বৃক্ষলতায় নবপল্লবের উদ্গম হয়? উত্তরে বলিব, আর কোন কালে হয়না, বসন্ত কালে হয়। বসন্ত ঋতু আসিয়া বৃক্ষলতা হইতে সমস্ত পুরাতন পত্রের উৎসাদন করিয়া নূতন পল্লবের উৎপাদনে বৃক্ষলতাকে বিভূষিত করে। জয়দেবের এই সংক্ষিপ্ত কথায় বুঝিতেছি, বসন্ত যেমন লতাকে পল্লবিত করে, কবি উমাপতিও সেইরূপ বাণীকে পল্লবিত করেন। ইহাদ্বারা আরও বুঝিতেছি ঋতুর মধ্যে যেমন বসন্ত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবির মধ্যে উমাপতিও সেইরূপ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। পল্লবে অলঙ্কৃত বৃক্ষলতাকে দেখিলে তৎক্ষণাৎ চক্ষুঃ প্রীত ও মোহিত হয়, উমাপতির শব্দঝঙ্কারে ঝঙ্কৃত শব্দালঙ্কারে অলঙ্কৃত ডম্বরবদ্ধ কবিতা শুনিলে তৎক্ষণাৎ কর্ণ ও সেইরূপ প্রীত ও মোহিত হয়। "অবিদিতগুণাপি সৎকবিভণিতির্বমতি শ্রুতৌ মধুধারাং" এই কবিতায় অনেক কথায় কবি যাহা বলিয়াছেন, কবি জয়দেব অল্পাক্ষরে একটি মাত্র দৃষ্টান্ত দেখাইয়া তাহাই বলিয়াছেন। পল্লব সমাচ্ছন্ন তরু লতার ফল পুষ্প যত্নলভ্য, শিক্ষিত চক্ষুঃ পল্লবের অন্তরালে অবস্থিত ফল পুষ্পের সত্তা বুঝিতে পারে, অন্তর্নিবিষ্ট ফল পুষ্পের ছটা পল্লবগুচ্ছের আবরণ ভেদ করিয়া উপরে বাহির হইয়া পড়ে, শিক্ষিত চক্ষুঃ তাহা বুঝিতে পারে। শিক্ষিত চক্ষুর প্রণোদনে শিক্ষিত মানব তাহা বুঝিয়া পল্লবমালার মধ্য হইতে ফল, পুষ্পের আহরণ করিয়া তাহা ভোগ করিতে সমর্থ হয়।*

জয়দেব এই "পল্লবয়তি" বলিয়া সেই অর্থেরও সমর্থন করিয়াছেন। জয়দেব বলিতেছেন—শ্রোতৃবর্গ, উমাপতির কেবল শব্দঝঙ্কারে মোহিত হইয়া নিশ্চেষ্ট হইও না, এই পল্লবের ভিতরে অনেক সুমিষ্ট ফল, অনেক সুরভি কুসুম, লুক্কায়িত আছে, এই শব্দতরঙ্গের ভিতরে অনেক মহার্ঘ্য রত্ন অবস্থিতি করিতেছে, শিক্ষিত চক্ষুর সাহায্যে অন্বেষণ কর, দিব্য চক্ষে বিলোকন কর, বাহির হইয়া পড়িবে, উপভোগ করিয়া কৃতার্থ হইবে।

তাই বলিতেছিলাম, উমাপতির কবিতায় ব্যঙ্গ্যার্থের প্রাচুর্য্য আছে, উমাপতির হস্তসঙ্কেতে সে গুলি বুঝা যায়, উমাপতি যে মধূচ্ছিষ্ট শলাকায় ব্যঞ্জনাবৃত্তির একটী স্নিগ্ধ জ্যোতিঃ দীপশিখা জ্বালাইয়া রাখিয়াছেন, তাহাদ্বারা সেই মহার্ঘ্য রত্ন গুলির উপলব্ধি হয়।

আলঙ্কারিকেরা ঈশ্বরের প্রতি দেবতার প্রতি পিতা মাতার প্রতি ভক্তি, পুত্র কন্যা প্রভৃতির প্রতি বাৎসল্য, পতি বা পত্নীর প্রতি প্রেম এ সমস্তকেই এক আদিরসের ভিতরে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। আদি রসের স্থায়ীভাব রতি, সর্ব্বত্র রতির (রাগের) সদ্ভাব আছে। ভক্তি, বাৎসল্য, প্রেম এক রতিরই নামান্তর।

ব্রহ্মানুভূতির ন্যায় রসের অনুভূতি ইহাও শাস্ত্রকারদিগের উপদেশ। সুতরাং রস ব্রহ্মস্বরূপ।* আবার আদিরসে যেরূপ ধারাবাহিক আনন্দনির্ঝরের প্রবাহ আছে, অন্যরসে তাদৃশ নাই, এই জন্যই এই রসের সর্ব্ব প্রথমে কীর্ত্তন; এই জন্যই এই রসের নাম আদিরস; এইজন্যই এই রসের নাম উজ্জ্বল রস। উমাপতি এই প্রশস্তির প্রথমে মঙ্গলাচরণ করিতে যাইয়া আদিরসে কবিতা লিখিয়াছেন। প্রদ্যুম্নেশ্বরের মন্দিরের প্রশস্তি, প্রদ্যুম্নেশ্বর দেবতা, ঈশ্বর; আবার কবিতায় রাজার গুণগাথা থাকিবে, যশঃ কীর্ত্তন থাকিবে; সুতরাং সর্ব্বত্র আদিরসেরই সত্তা, আদিরসই কাব্যের অঙ্গী, অন্যরস

---

* "বাচঃ পল্লবয়ত্যুমাপতিধরঃ" জয়দেবের এই উক্তি প্রশংসাপর কি নিন্দাপর সে বিষয়ে মতভেদ থাকিতে পারে। অর্থ সম্পদের তাদৃশ প্রকর্ষ না থাকিলে বাক্যের আড়ম্বর ও শব্দের সৌষ্ঠব বিধানকে— যাহাকে আলঙ্কারিকগণ অবর কাব্যের মধ্যে পরিগণিত করেন—পল্লবিত করা বলে। অলং পল্লবিতেন, পল্লবগ্রাহিতা প্রভৃতি শব্দ নিচয়ের সৃষ্টি এই ভাব হইতেই হইয়াছে মনে হয়। জয়দেব এই ভাবে "পল্লবয়তি" ক্রিয়াপদটি ব্যবহার করেন নাই, ইহা কিরূপে বলিব? "সন্দর্ভশুদ্ধিং গিরাং জানীতে জয়দেবএব" এই বাক্যের সঙ্গে উহা পাঠ করিলে ব্যঞ্জনা বৃত্তিদ্বারা কি উপস্থাপিত হইতে পারে? সং সং

* এই চরাচর বিশ্ব ব্রহ্মস্বরূপ। রস যে ব্রহ্মস্বরূপ তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না। কিন্তু যে ভাবে অনুমিতি করা হইয়াছে তাহা রীতি শুদ্ধ হয় নাই। রসাস্বাদজন্য আনন্দ ব্রহ্মানন্দসহোদর; ব্রহ্মানন্দ নহে। সং সং।

তাহার অঙ্গ। এই আদিরস পার্থিব নহে, ইহা ভগবানের নিকট হইতে অভিব্যক্ত। এক অদ্বিতীয় ঈশ্বর কেবল রসানুভূতির জন্য দ্বিধা বিভক্ত হইয়াছেন; আলম্বন ভিন্ন রসের আবির্ভাব হয় না। এই তত্ত্ব বুঝাইতে যাইয়া লীলা মূর্ত্তি পার্ব্বতীর সহিত লীলামূর্ত্তি পরমেশ্বরের ভাবময় লীলার বর্ণনে উমাপতি প্রবৃত্ত। কবিতায় কিরূপ স্বাভাবিকতা আছে, কিরূপ ব্যঙ্গ্যার্থের সদ্ভাব আছে, রুচিবিকারের দিনে সেই সমস্ত রসের অবতারণা করিয়া মার্জ্জিত রুচি পাঠকপাঠিকাকে আতঙ্কিত ও হঠাৎ মূর্চ্ছিত করিতে চাইনা। তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, উমাপতি মঙ্গলাচরণ করিতে যাইয়া মহাদেবের মুখপঙ্ককে হাসির রেখা ফুটাইয়াছেন। হাস্য রেখা যে মঙ্গলজনক পদার্থ, আবার মহাদেবের অনেক নাম থাকিলেও উমাপতি "শম্ভু" এই নামটি গ্রহণ করিয়াছেন, কারণ তাহাতে যে শং মঙ্গল আছে। পার্ব্বতীর শত সহস্র নাম থাকিলেও লীলাময়ীর লীলাকারিণী এই অর্থ বুঝাইবার জন্য দীপ্তিশালিনী বা দীপ্তিকারিণী অর্থ বুঝাইবার জন্য এই কবিতায় দেবী (দিব্যুক্রীড়া দীপ্ত্যোঃ) শব্দ গৃহীত হইয়াছে। ভয়বাচক নানাশব্দ সত্বেও যে কবি এই শ্লোকের প্রথম চরণে হর্ষগর্ভভয়ের আবেগ বুঝাইবার জন্য সাধ্বস শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, আর "মাল্যচ্ছটাহত" ইত্যাদি বলিয়া প্রথমে আহত, পরে হৃত এই দুইটী অর্থ সমর্থনের জন্য যে চাতুর্য্য প্রকটন করিয়াছেন, ইহার জন্য কবির পূজা অব্যাহত। মৌলিস্থ চন্দ্রের প্রভায় দেবীর মুখ লজ্জায় মুকুলিত হইয়াছে। কবি এ স্থলে চন্দ্রপ্রভার উল্লেখ করিয়া মুকুলিত শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, ইহাদ্বারা দেবীর মুখে পদ্মত্বের আরোপ হইতেছে, এটিও ব্যঞ্জনা-লব্ধ অর্থ, কারণ সাবধান কবি পদ্ম শব্দের প্রয়োগ করেন নাই।

দ্বিতীয় শ্লোকে উমাপতি মন্দিরাধিষ্ঠিত প্রদ্যুম্নেশ্বরের বর্ণনা করিয়া তাঁহার প্রণাম করিয়াছেন। বিষ্ণুর চারিটি ব্যূহ,—বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ। সুতরাং প্রদ্যুম্ন বিষ্ণুমূর্ত্তি। উপনিষদে আছে, আমি জন্মগ্রহণ করিব, আমি বহু হইব; ব্রহ্মের প্রথমে এই কামনা হয়, এই কামনায় জগতের উৎপত্তি। কামনা, ইচ্ছা, অভিলাষ, কাম এক অর্থ। ভগবানের এই কাম মূর্ত্তির সহিত সংহার মূর্ত্তি মহাদেবের মিলন; এই মিলনেই প্রদ্যুম্নেশ্বরের আবির্ভূতি, কামবিজয়ীর সহিত কামের মিলন, অপূর্ব্ব ভাবের সমাবেশ! সৃষ্টিও সংহার যে একই পদার্থ; আমরা এই সুখবোধ্য সরল -তরল প্রবন্ধে সেই জটিল দার্শনিক তত্ত্বের অবতারণা করিব না, সেই গুরুগম্ভীর দার্শনিক বিষয় বুঝাইবার জন্য যত্ন ও চেষ্টা করিবনা। কিন্তু মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠাপয়িতা রাজা এই তত্ত্ব বুঝিতেন, রাজকবি এই তত্ত্ব জানিতেন, শিল্পী এই তত্ত্বের উপলব্ধি করিতে সমর্থ ছিলেন, তৎকালবর্ত্তি—মানবসমাজের এই তত্ত্ব সম্যক্ রূপে সুবিদিত ছিল। নহিলে এই মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা হইতনা।

কবি উমাপতির যে দার্শনিক জ্ঞান ছিল, তদ্‌বিষয়ক প্রমাণের অনুসন্ধানে অধিক দূরে যাইতে হইবে না; এই প্রশস্তির ১৮শ শ্লোকের প্রথম দ্বিতীয় চরণে তিনি কি বলিয়াছেন দেখিলেই উমাপতির দর্শনশাস্ত্রের অভিজ্ঞতা বুঝিতে পারা যায়। তিনি বিবেকাদৃতে ইত্যাদি বলিয়া বুঝাইয়াছেন সাংখ্যদর্শনোক্ত সত্ত্ব—পুরুষান্যতা খ্যাতির অভাবে পুরুষ এক একটি গুণের (আধিক্যের) সাহায্যে গুণত্রয়ের (প্রকৃতির) পরিণামে জাত (অভিব্যক্ত) জগতের সংহার করেন, রক্ষা করেন, সৃষ্টি করেন। প্রতিষ্ঠাপয়িতা রাজা যদি এই তত্ত্ব না বুঝিতেন দর্শক যদি পাঠমাত্র এই অর্থের উপলব্ধি করিতে না পারিতেন, তবে কবি কখনই প্রশস্তির মত সর্ব্বজনপাঠ্য সর্ব্বজনবোধ্য কবিতার মধ্যে এইরূপ দুর্ব্বোধ বিষয়ের অবতারণা করিতেন না। পাণ্ডিত্য প্রদর্শনের জন্য এই শ্লোকের অবতারণা নয়, এই শ্লোকে কবিত্ব আছে—তৃতীয় ও চতুর্থ চরণে। উপমানের সাধর্ম্ম্য প্রদর্শনের জন্য প্রথম দুই চরণ, দ্বিতীয় দুই চরণে কবি উপমানের অপকর্ষ বুঝাইয়া উপমেয়ের উৎকর্ষ জ্ঞাপন করিয়াছেন; তাহাদ্বারা ব্যতিরেক অলঙ্কার প্রকটিত হইয়াছে। সুতরাং প্রথম দুই চরণে যাহা আছে তাহা আনুষঙ্গিক, আনুষঙ্গিক বিষয়ে কেহ দুর্ব্বোধ বিষয়ের সমাবেশ করে না, সর্ব্বজন সুখবোধ্য বিষয়ের সমাবেশ করে। ইহাদ্বারা আমরা স্পষ্টতঃ

বুঝিতে পারি, সে সময়ের বাঙ্গালীরা সাংখ্য, পাতঞ্জল পড়িবার জন্য, বেদবেদান্ত পড়িবার জন্য, কাশীর আশ্রয় লইত না, সে সময়ে বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র দার্শনিক জ্ঞানের ছড়াছড়ি ছিল। রঘুনাথ শিরোমণি মিথিলা হইতে ন্যায়দর্শন আনিয়া বঙ্গদেশে প্রচার করিয়াছেন, এই কল্পিত কিম্বদন্তীর মূলে অণুমাত্র ঐতিহাসিক সত্য নাই। তাহা হইলে পূর্ব্ববর্ত্তী বারেন্দ্র কুল্লুকভট্ট মনু-সংহিতার টীকা লিখিতে যাইয়া "সুহৃদস্তর্কাঃ" বলিয়া সাহায্যের জন্য নিজবন্ধু তর্কশাস্ত্রের আহ্বান করিতেন না; বহুপূর্ব্বে রাঢ়ে বসিয়া শ্রীধরাচার্য্য ন্যায় কন্দলী লিখিতে সমর্থ হইতেন না।

আমরা উমাপতির কবিতা বুঝাইতে যাইয়া অবান্তর কথায় অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি উমাপতির দ্বিতীয় কবিতাটি এই—

লক্ষ্মীবল্লভশৈলজাদয়িতয়ো রদ্বৈতলীলাগৃহং
প্রদ্যুম্নেশ্বরশব্দলাঞ্ছন মধিষ্ঠানং নমস্কুর্ম্মহে।
যত্রালিঙ্গনভঙ্গকাতরতয়া স্থিত্বান্তরে কান্তয়ো
র্দেবীভ্যাং কথমপ্যভিন্নতনুতা শিল্পেঽন্তরায়ঃ কৃতঃ॥

লক্ষ্মীবল্লভ এবং পার্ব্বতীপ্রিয়ের অদ্বৈতলীলার গৃহ প্রদ্যুম্নেশ্বর এই শব্দ লাঞ্ছনে (সংজ্ঞায়) লাঞ্ছিত (খ্যাত) তাঁহাদিগের অধিষ্ঠানকে প্রণাম করিতেছি। প্রণাম করিতেছি এই অর্থ, ব্যক্ত করিবার জন্য কবি "নমস্কুর্ম্মহে" এই শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। এই ক্রিয়া পদে আত্মনেপদীয় বিভক্তির উত্তম পুরুষের বহুবচন "মহে" এই বিভক্তি প্রযুক্ত হইয়াছে। যে স্থলে কর্ত্তায় কর্ম্মজন্য ফলের অভিলাষ আছে, সেই স্থলে আত্মনেপদীয় বিভক্তির প্রয়োগ হইবে, ব্যাকরণের এই ব্যবস্থা, "ফলবৎ কর্ত্তরি আত্মনেপদং।" উমাপতি এই প্রণাম করিয়া আত্মবিঘ্ন প্রশমনের আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন; ইহাদ্বারা এইরূপ বুঝা যাইতেছে। আবার কর্ত্তৃপদ বয়ং ইহার উল্লেখ না করিয়া ক্রিয়াপদে যে উত্তমপুরুষের বিভক্তি আছে, তাহাদ্বারা বয়ং এর ধ্বনি করিতেছেন, এই ধ্বনিতে ব্যক্ত হইতেছে আমরা অর্থাৎ কবি, রাজা, রাজ্ঞী রাজার পুত্রাদি পরিবারবর্গ, পরিষদ্‌বর্গ এমনকি, রাজার সহিত সমস্ত প্রজাপুঞ্জ আমরা সকলে মিলিত হইয়া প্রদ্যুম্নেশ্বরের বন্দনা করিতেছি। দ্বিতীয় দুই চরণে আছে, দেবদ্বয়ের অদ্বৈতলীলা গৃহ যে অধিষ্ঠানে (মূর্ত্তিতে) আলিঙ্গনভঙ্গের কাতরতায় অন্তরে অবস্থিত হইয়া দেবীদ্বয় লক্ষ্মী এবং শৈলজা কান্তদ্বয়ের অভিন্নতনুতা সিদ্ধিবিষয়ে কোন প্রকারে বিঘ্নের উৎপাদন করিয়াছেন। হরিহর মূর্ত্তি এক হইলেও তাহার অর্দ্ধাঙ্গে বিষ্ণুমূর্ত্তির ও অর্দ্ধাঙ্গে শিবমূর্ত্তির বিকাশ। এক মূর্ত্তিতে এইটুকু প্রভেদই বা থাকে কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে কবি শিল্পীর স্কন্ধ হইতে সে দোষের অপসারণ করিয়া দেবীদ্বয় স্ব স্ব স্বামীর অলিঙ্গন ভঙ্গ ভয়ে অন্তরে থাকিয়া এই প্রভেদটুকুর সাধন করিয়াছেন,—গম্যমান উৎপ্রেক্ষার সাহায্যে দর্শকদিগকে সেই ভাবে প্রতিবুদ্ধ করিয়াছেন। কবি এই শ্লোকে "অন্তর" শব্দের ব্যবহার করিয়া কি পর্য্যন্ত কবিত্বের প্রকটন, কি পর্য্যন্ত মাধুর্য্যের প্রণয়ন করিয়াছেন ভাষায় ব্যক্ত করিবার অধিকার আমার নাই। "অন্তরমবকাশাবধি—পরিধানান্তর্দ্ধি ভেদতাদর্থ্যে। ছিদ্রাত্মীয় বিনাবহিরবসর মধ্যেঽন্তরাত্মনিচ" এই অমরসিংহোক্ত অন্তর শব্দের প্রায়ঃ সমস্ত অর্থই যেন কবি গ্রহণ করিয়াছেন। যখন শিল্পী হরিহরের অভিন্ন তনুর সৃষ্টি করিতেছিল, তখন দেবীদ্বয় অন্তরে থাকিয়া অন্তর্ধানে থাকিয়া অদৃশ্যে থাকিয়া বিঘ্ন উৎপাদন করিয়াছিলেন, এ অর্থ হইতে পারে, অন্তরে থাকিয়া মধ্যে পড়িয়া এইরূপ করিয়াছেন, হইতে পারে, প্রয়োজনে পড়িয়া এ অর্থও হইতে পারে, শিল্পীর ছিদ্রে অবস্থিত হইয়া ছিদ্র বাহির করিয়া ইহাও হইতে পারে, * আত্মীয় কান্তদ্বয়ে অবস্থিত হইয়া † শিল্পীর অন্তরাত্মায় অন্তঃকরণে অবস্থিতি করিয়া অবসরে থাকিয়া অবসর বুঝিয়া বা ভেদে দাঁড়াইয়া ইহার কোন্ অর্থের পরিহার করিয়া কোন্ অর্থ গ্রহণ করিব বুঝিনা; কবি বুঝি এই সমস্ত অর্থগুলিই গ্রহণ করিয়াছেন, এই একটি শব্দ দ্বারা এই সমস্ত অর্থেরই প্রকাশ করিয়াছেন। কান্তদ্বয় এক হইতে পারেন, হউন, আমরাত এক হই নাই,

* এই অর্থ কষ্টকল্পনাসাধ্য।

† অন্তর শব্দের আত্মীয় অর্থ গ্রহণ করিলে কান্তয়োঃ এই সপ্তমীর দ্বিবচনের সহিত অন্তরে এই একবচনের অন্বয়োপপত্তি ঘটেনা। সং সং

আমরাত ভেদে রহিয়াছি, ভিন্ন ভিন্ন দেহে রহিয়াছি, আমরা কি করিয়া এই অভেদে অনুমোদন করিব; এইরূপ মনে করিয়াই যেন দেবীদ্বয় ইত্যাদি। যখন এক স্বামীর দুই পত্নী, দুই পত্নী হইলে তাহারা যখন চুলোচুলি করিয়া স্বামীকে চুলচিরা ভাগ করিয়া লয় তখন ভিন্নভিন্ন স্বামীকে দেবীদ্বয় অভিন্ন করিতে দিবেন কেন? ইহাও কবির একটি ব্যঙ্গ্যার্থ।

লাঞ্ছনা শব্দের অর্থ সংজ্ঞা, সংজ্ঞাবাচক অন্যান্য শব্দ সত্বেও লাঞ্ছন শব্দ প্রয়োগের প্রয়োজন কি? প্রয়োজন আছে, লাঞ্ছন শব্দের আর একটি অর্থ কলঙ্ক। নির্গুণ ব্রহ্ম অশব্দ, তিনি নামরূপের অতীত, এই যে তাঁহাকে শব্দ সঙ্কেতে বুঝিতে যাইতেছি, এটি তাঁহার কলঙ্ক, বিশেষণে পদার্থের ব্যাপকতা ভঙ্গ করে, বিশেষণে পদার্থকে খাটো করে। পদ্ম বলিলে আমরা সমস্ত পদ্মকে বুঝি, নীলপদ্ম বলিলে সমস্ত পদ্মকে বুঝি না। শব্দও একটি পদার্থের বিশেষণ। সগুণ পক্ষে কামজয়ী কামের সহিত মিশিয়া যাইতেছেন, এটি তাঁহার কলঙ্ক, কামরূপ নিষ্কামের সহিত মিশিতেছেন, এটিও তাঁহার কলঙ্ক। আবার তাঁহাদিগের উপরে দেবীদ্বয়ের এত প্রভুত্ব, এত সামর্থ্য, এত আধিপত্য যে তাঁহারা এক হইতে ইচ্ছা করিয়াও এক হইতে পারিতেছেন না, এটি একান্ত স্ত্রৈণ ভাবের সাধক; সুতরাং কলঙ্ক। কত কি, দেখাইব? উমাপতির প্রত্যেক শব্দ প্রয়োগেরই তাৎপর্য্য আছে, ব্যঞ্জনা আছে।

যে কবি উৎপ্রেক্ষালঙ্কারে কবিতা লিখিয়া তাহার দ্যোতক শব্দের পর্য্যন্ত প্রয়োগ করেন নাই, তাঁহাকে যাঁহারা জয়দেবের "বাচঃ পল্লবয়তি" দেখিয়া বহুভাষী বলেন, তিনি বাক্যকে বহুলীকৃত করিতেন বলিয়া তাঁহার কলঙ্ক কীর্ত্তন করেন; তাঁহাদিগকে আমরা উমাপতি রচিত এই প্রশস্তিটি দেখিবার জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করি। উমাপতির সমস্ত কবিতাগুলির এই ভাবে ব্যাখ্যা করিলে প্রবন্ধের কলেবর অতি বৃহৎ হইয়া পড়িবে, পাঠক পাঠিকারও ধৈর্য্যচ্যুতি হইবে, সেই আশঙ্কায় এই প্রবন্ধে আর আমরা উমাপতির কবিতার ব্যাখ্যা করিব না। বন্ধুবর অক্ষয়কুমার বিশুদ্ধ পাঠের উদ্ধার করিয়া লেখমালা নামে পালবংশীয় রাজাদিগের ও সেনবংশীয় রাজাদিগের প্রশস্তিপত্রের শ্লোকাবলী ও তাম্রশাসনের শ্লোকাবলী মুদ্রিত করিতেছেন, ও সেই সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক শ্লোকের বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইতেছে। পাঠক পাঠিকার অভিলাষ জন্মিলে তাঁহারা তাহা দেখিয়া কৌতূহল নিবৃত্তি করিতে পারিবেন। আর আমি যদি পাঠক পাঠিকার আশ্বাসবাণী, অভয়বাণী পাই তবে বারান্তরে উমাপতির কবিতার বিস্তৃত ব্যাখ্যা লইয়া তাঁহাদিগের নিকটে পুনরায় উপস্থিত হইব,—অঙ্গীকার করিতেছি।

ব্যঙ্গ্যার্থ প্রধান কবিতা লিখিতে উমাপতির ন্যায় অল্প কবিই জগতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন; এবিষয়ে উমাপতি সিদ্ধহস্ত ছিলেন; এইজন্য তিনি মহাকবির শ্রেষ্ঠ আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। রাণকশূলপাণিও সে সময়ে শ্রেষ্ঠশিল্পী ছিলেন, তিনিও শ্রেষ্ঠ-মহার্ঘ আসনের অধিকারী ছিলেন। যাঁহারা কোনার্ক মন্দিরের গোটা অশ্বের প্রস্তর মূর্ত্তি, সেই মন্দিরে ও কলিঙ্গ উৎকলের অন্যান্য মন্দিরের দ্বারদেশের উপরে সিংহাক্রান্ত হস্তিমূর্ত্তি দেখিয়াও বলিয়া থাকেন, "ভারতীয় শিল্পী প্রস্তরমূর্ত্তিরই উৎকিরণ করিতে পারিয়াছে, প্রস্তরফলকের অবলম্বন শূন্য করিয়া পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত সর্ব্বাঙ্গের উৎকিরণ পারে নাই, এক্ষণে যাহা হইতেছে তাহা ইউরোপীয় শিল্পীর প্রভাবে বা তাহাদিগের নিকটে শিক্ষার ফলে" তাঁহাদিগের নিকটে আমার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ তাঁহারা যেন প্রাচীন ভারতের ভাস্করদিগের উপরে কিঞ্চিৎ দয়াপরবশ হইয়া, রাজসাহীর পুস্তকালয়ে উপস্থিত হইয়া আনীত মূর্ত্তিগুলির ভিতরে অবস্থিত গরুড়ের প্রতিকৃতিটি বিলোকন করেন, উপসংহারে এইমাত্র আমার বক্তব্য বা প্রার্থনা।

শ্রীযাদবেশ্বর তর্করত্ন।

এক্‌লা নিতাই

আমি এক্‌লা নিতাই,
তোম্‌রা সবাই ঢাক ঢোল,
কেউ পাখোয়াজ কেউ বা খোল,
উঠ্‌ছে তোমাদের হাজার বোল,
পাছে বাওয়া আছে যে ভাই,
আমি ক্ষুদ্র খঞ্জরী,
ফস্‌কে যায় যে শব্দ করি,
বাওয়া শূন্য—হরি, হরি,
হাওয়ায় আমি মরে যাই!
আমি এক্‌লা নিতাই!

২

বীণ বেহালা শরদ্‌ সেতার
শত তারে সুর ধরে তার,
আমার, সুর ধরিতে নাই কেহ আর
এক তারেতে বাজি সদাই,
হার্ম্মোনিয়ম্‌ একর্ডিনা,
কেউ বাজেনা সঙ্গী বিনা,
আমার, কাড়ার শব্দে চাড়া ফাটে
তাড়া দেয় যে পাড়ার সবাই!
আমি এক্‌লা নিতাই!

৩

কোন টেম্‌গোপালের নাতি,
নাইক আমার সঙ্গে সাথী
এক্‌লা বসে আঁধার রাতি
শূন্য মাঠে শিঙ্গা বাজাই!
আমি এক্‌লা নিতাই!

আমার ভাবে আমি ভোর,
দোহার পত্র নাহি মোর,
এক্‌লা আমি পাছে নাচি
এক্‌লা মোড়ায় গান গাই,
আমার তালে আমি থাকি,
চরণে মান চেপে রাখি,
আমার মানে করতালি
জগতে কেউ দিতে নাই!
আমি এক্‌লা নিতাই!

৫

এক্‌লা আমি কাঁদি হাসি,
এক্‌লা ডুবি এক্‌লা ভাসি,
অপার অকূল বিপদ রাশি
কূল কিনারা নাহি পাই,
এক্‌লা আমি ধরি হাল,
এক্‌লা আমি উড়াই পাল,
বিনা দাঁড়ী দিচ্ছি পারি
ঝড় তুফান উজানে বাই!
আমি এক্‌লা নিতাই!

৬

পরের রক্ত মাংসে তুষ্ট
সংসারের সে শকুন দুষ্ট,
আমি তারে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ
অবহেলে নিত্যি দেখাই,
তার সে নিন্দা তার সে গালি,
তারি সে কলঙ্ক কালী!
আমার চখে কৃষ্ণ কালী
কাজল দিছে মদন গোঁসাই!
আমি এক্‌লা নিতাই!

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস

মেজর রেনেলের সমসাময়িক পূর্ব্ববঙ্গ।

(ডাএরি)।

১৩১৩ সনের কার্ত্তিক মাসের নব্যভারতে, "রেনেলের সমসাময়িক পূর্ব্ববঙ্গ" নামে একটী প্রবন্ধ বাহির হয়। বাঙ্গালার সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় মহাশয়ের নিকট হইতে, রেনেলের ম্যাপ পাইয়া ঐ প্রবন্ধ লিখিতে সমর্থ হই। ঐপ্রবন্ধ প্রকাশিত হইবার পরে শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়, তদীয় বিক্রমপুরের ইতিহাসের প্রথম অবতরণ "আরতি" পত্রিকায় প্রবন্ধের কতকাংশ অর্থাৎ কালীগঙ্গা নদীর তীরবর্ত্তী ও বিক্রমপুরের অল্প কতটা স্থানের নাম উহাতে উদ্ধৃত করিয়াছিলেন এবং পরে তাহা তাঁহার বিক্রমপুরের ইতিহাসে স্থান লাভ করিয়াছে। মৎপ্রকাশিত ফরিদপুরের ইতিহাসে ঐ প্রবন্ধটী সম্পূর্ণভাবেই পুনঃমুদ্রিত হইয়াছে। পাঠক মহোদয়গণ ঐ সকল পত্রিকা ও পুস্তক পাঠ করিলেই আমার পূর্ব্বলিখিত প্রবন্ধের সমুদয় অবগত হইতে পারিবেন, অতএব এইস্থলে উহার পুনরাভাস প্রদান করিতে বিরত থাকিলাম।

সম্প্রতি ১৯১০ সনের এসিয়াটীক জার্ণেলে মেজর রেনেলের জরিপ কার্য্যের বিস্তৃত ডায়েরী বাহির হইয়াছে। তদীয় দুহিতা "লেডী রব" (Lady Rob) হইতে প্রাপ্ত হইয়া সোসাইটী এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। ফরিদপুরের এসিষ্টাণ্ট সেটেলমেণ্ট অফিসার, "এফ, ডি, এস, কপি" ও বেঙ্গল পাষ্ট এবং প্রেজেণ্ট লেখক, "জে, টি, রেনকিল" মহোদয়দ্বয়, ডায়েরি লিখিত স্থানগুলির কতকটা নূতন কথায় উল্লেখ করিয়া, সোসাইটীর প্রকাশিত গ্রন্থে সন্নিবেশ করিয়াছেন। আমরা উহা অবলম্বন করিয়া আপাততঃ ঢাকাবিভাগস্থ নদী ও স্থানগুলির বিবরণ প্রকাশ করিতে প্রয়াস পাইলাম। যে যে স্থানে মুলগ্রন্থের সহিত আমাদের মতানৈক্য ঘটে তাহাও প্রদর্শন করিতে ক্রটী করিবনা।

১৭৬৪ সনের ২১ জুন হইতে, একরূপ বর্ত্তমান পূর্ব্ববঙ্গের নদীর পরিমাপ কার্য্য আরম্ভ হয়। ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত হাবাসপুর গ্রামই উহার প্রথম কেন্দ্ররূপে নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে। এই গ্রামের নীচে একটী খাড়ী, যাহাপুর ইহার তীরে। ২২ জুলাই হাবাসপুর হইতে কতকগুলি জঙ্গলপূর্ণ বিল অতিক্রম করিয়া, সুজা নগরের দিকে অগ্রসর, পরে সোলাপুর নামক স্থানে উপনীত। ২৭ তারিখে ডাএরিতে উল্লেখ আছে এই স্থানটী উত্তম কর্ষণযোগ্য ও প্রচুর সুপারী বৃক্ষ ও পানের বরোজ সমন্বিত। এই স্থানের সাড়ে সাত মাইল দূরে শ্রীরামপুর গ্রাম। তথায় একটী ক্ষুদ্র ধবলদেব মন্দির আছে। ইহার প্রান্তবাহী নদীর নাম চন্দনা, তৎপর কুমার নদ।

অতঃপর ডায়েরির অবিকল অনুবাদ প্রদত্ত হইল, সহৃদয় পাঠক আমার ভাষার প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া মূলবিষয়টী বুঝিয়া লইতে প্রয়াস পাইবেন। এই বৃহৎ ব্যাখ্যার ভুলও বিস্তর হইবার সম্ভাবনা; তবু আমরা যথাসাধ্য নির্ভুল সংগ্রহের ক্রটী করিবনা। এই কার্য্যটী সম্পন্ন করিয়া উঠিতে পারিলে, বাঙ্গালা ভূগোল, ইতিহাস লেখকদের পক্ষে কালে কতকটা সাহায্য হইতে পারিবে ইহাই বিশ্বাস।

বাঙ্গালার ঐতিহাসিক বিভাগে আর এক ব্যাপার উপস্থিত। কোন একটা কিছু বাহির হইলে, পুনঃ পুনঃ তাহারই প্রতিকৃতি বা তুল্যবিষয়েরই আবির্ভাব হইতে থাকে। অধিকাংশ স্থলে সেই একই কাঠাম, একই মূর্ত্তি, কেবল রংফলানের কারিকরিটুকু বেশী। এই ইতিহাসের ও ভূগোলের অভাবের দিনে যদি আমরা,একই বিবরণের পুনরালোচনা না করিয়া কোন একটা নূতন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়া ক্রমে ভাণ্ডার পূর্ণ করিয়া লইতে পারি, তবে এমন একদিন উপস্থিত হইবে যখন উহা মার্জ্জিত করিয়া কোন কোন মহাপুরুষ ঐগুলির চাকচিক্য সমধিক করিয়া লইতে সক্ষম হইবেন।

জুন। ২২শে, ২৩শে ও ২৪শে তারিখের কয়েক ঘণ্টা করিয়া আমরা সেই নদীটির (*) জরীপ কার্য্যে নিযুক্ত

* গোয়ালন্দ হইতে কলিকাতা পর্য্যন্ত রেলপথ ইহার উপরদিয়া কতকটা চলিয়া গিয়াছে। ইহা বর্ত্তমান সময়ে বাওরে পরিণত হইয়াছে।

হইলাম। এই নদী খাল হইতে তিন মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত। আবার এই নদী হইতে সুজানগর গ্রাম ৩ মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত [অর্থাৎ এই খাল ও গ্রামের মধ্যে ৬ মাইলের বেশী পথ ব্যবধান ; সেই বেশীটুকই নদীর বিস্তার] এই খালের উৎপত্তি স্থান হইতে নদীর গতি কয়েক মাইল পর্য্যন্ত প্রায় পূর্ব্ব দিকে। ২৩ তারিখ বৈকাল বেলা উত্তর পশ্চিম দিক্ হইতে একটা প্রবল ঝড় আসিল। ২৪শে তারিখ সকাল বেলাও ঝড় বহিয়াছিল। কিন্তু অবশিষ্টকাল আকাশের বেশ সুন্দর অবস্থা ছিল। এই দিন খালের আরও এক মাইল জরিপ হইয়াছিল। এই খালটি অত্যন্ত বক্র। এই খালে এই সময়ে প্রায় ১৩ হাত জল ছিল। জল বৃদ্ধির জন্য আরও ৫ হাত ধরিয়া লইলাম।

২৪শে জুন হইতে ৩রা জুলাই পর্য্যন্ত আকাশের অবস্থা বেশ সুন্দর ছিল। মধ্যে মধ্যে কয়েক পশলা অল্প বৃষ্টি হইয়াছিল মাত্র। পূর্ব্ব দক্ষিণ হইতে বেশ সুন্দর বাতাস বহিতেছিল। এই সময়ের মধ্যে আমরা খালের আরও ৩০ মাইল জরিপ করিয়া ফেলিলাম। এই খালের সাধারণ গতি পূর্ব্ব দক্ষিণে। গত দুই দিনে আমরা খালের যে অংশ জরীপ করিয়াছিলাম তাহা নিতান্তই বক্র।

দেশের অবস্থা বরাবর পরিবর্ত্তনশীল। কোথায়ও কয়েক মাইল পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত নিবিড় অরণ্য, কোথায়ও সুবিস্তৃত হরিৎক্ষেত্র সাধারণতঃ কর্ষি স্থান অতি অল্পই দৃষ্ট হইল। Sunapura র (সোনাপুরার) নিকটে (ভাঁটাদিয়া আসিলে খালের প্রায় ৯ মাইল পথ) অনেক গুলি পানের বরোজ ও সুপারির বাগান পরিদৃষ্ট হয়। এখান হইতে ৭½ মাইল দূরে শ্রীরামপুর গ্রামে পাঁচটি ছোট নদী (Reaches ?) দ্বারা গঠিত উপদ্বীপাকার ভূখণ্ডে কয়েকটি শাদা মঠ আছে। এই খালে অত্যধিক সংখ্যায় কুম্ভীর ও ঘুঘু দেখিতে পাওয়া যায়। কুম্ভীরগুলি অতি মৃদু কোনও শব্দ শুনিতে পাইলেই সন্ত্রস্ত হইয়া জলে নামিয়া যায় বা ডুব দেয়।

স্থানীয় লোকের নিকট এই খাল (Chunnanah) চন্নমা নামে পরিচিত। আমরা শুনিলাম এই খাল কুমার খালে (? কুমারখালী, Comare creek) পড়িয়াছে। এই কুমার খাল এখান হইতে নিম্ন দিকে ৪ মাইল দক্ষিণে। এই খালের সাধারণতঃ সর্ব্বত্রই বিস্তার প্রায় ২০০ গজ, কিন্তু গভীরতার কোনও স্থিরতা নাই। কোথায়ও বা ৫০ হাত গভীর, কোথায়ও বা গভীরতা মাত্র ৬ হাত।

আমরা ২৬শে ও ২৯শে জুন তারিখে দুই খানা লবণ বোঝাই নৌকা দেখিতে পাইলাম, ইহার একখানা কলিকাতা হইতে সুন্দর বনে ও খুলনার পথে (Culna, see foot note) ও অন্যখানা জয়নগর হইতে বারাসীয়া খালের পথে আসিয়াছে। দুই খানাই পাটনায় যাইবে। একখানায় ৩৫০০ মণ লবণ ছিল। এই নৌকা খানা ৪½ হাত জল টানিয়া ছিল।

২৯ তারিখ গবর্ণরের নিকট হইতে (দুই জন হরকরা বরাবর) একখানা পত্রপ্রাপ্ত হইলাম।

জুলাই আরম্ভ—৩রা হইতে ৮ই জুলাই তারিখ পর্য্যন্ত ঋতুর উপযুক্ত বর্ষা হইয়াছিল পূর্ব্ব ও দক্ষিণ পূর্ব্ব হইতে ঝড় প্রবল বেগে বহিতেছিল। বাহিরে যাইতে না পারায় আমি খালের মানচিত্র নকল করিতে আরম্ভ করিয়া ৭ই তারিখ রাত্রির মধ্যে সমস্ত শেষ করিলাম। যে দুই জন হরকরা গভর্ণরের পত্র লইয়া আসিয়াছিল তাহাদিগকে দিয়া তাহার পরদিন প্রাতঃকালেই গবর্ণরের নিকট মানচিত্রের নকলাদি পাঠাইয়া দিলাম।

৫ই তারিখ ৪০০০মণ লবণ বোঝাই একখানা নৌকা দেখিলাম। এখানা ৪½ হাত জল টানিয়াছিল। এখানা ও পাটনা যাইতেছে।

৮ই তারিখ আমরা পুনরায় জরীপে নামিলাম। আজ প্রায়ই বৃষ্টি হইতেছে। আমি জল বাড়িবার জন্য হাতা ধরিয়া রাখিলাম। আজ বৈকালে আমরা ২।৩ মাইল দক্ষিণ পূর্ব্বে একটি অত্যুচ্চ মঠ দেখিতে পাইলাম। ইহা মথুরাপুর গ্রামের সন্নিধানে অবস্থিত। (১)

(১) মথুরাপুর কুমারের সঙ্গম স্থলে প্রায় ৭০ বৎসর পূর্ব্বে বৈদ্যবংশীয় সংগ্রাম সাহকর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়। এইটী ভুল সিদ্ধান্ত কারণ ১৬৫৩ খৃঃ অব্দের পূর্ব্বে সংগ্রাম জীবিত ছিল। ফরিদপুরের ইতিহাস ৭৬ পৃঃ দেখ।

১০ই তারিখ আমরা মথুরাপুরের মঠ অতিক্রম করিলাম। ইহা খালের পূর্ব্বতীরে অবস্থিত। এই মঠের উপরেরদিকে দুই মাইল দূরে একটি বড় খাল পূর্ব্বদিকে প্রবাহিত হইয়াছে। এই সময়ে এই খাল দিয়া বড় নৌকাদি যাতায়াত করিতে পারে কিন্তু গ্রীষ্মকালে ইহা স্থানে স্থানে একবারেই শুকাইয়া যায়। এই খালদিয়া জয়নগর ও হবিগঞ্জ যাওয়া যায়।

এইস্থান হইতে এই খাল আর পূর্ব্বনামে (চন্দনা) পরিচিত নহে। এই স্থান হইতে ইহা কুমার নাম ধারণ করিয়াছে। ইহা পাঁচমাইল পর্য্যন্ত প্রায় দক্ষিণ পশ্চিমে প্রবাহিত হইয়াছে। ইহা ক্রমেই সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিয়াছে বটে কিন্তু পূর্ব্বাপেক্ষা ইহা গভীরতর।

১১ই তারিখ আমারা বদবাসন বা গোপালপুর গ্রাম বা হাজিগঞ্জ খাল (২) অতিক্রম করিলাম। ইহা পূর্ব্ব কুমারের উৎপত্তিস্থান হইতে ১ মাইল মোহানার দিকে অবস্থিত। এই এক মাইল পথ নিতান্তই দুরতিক্রম্য এক্ষানে অনেক বরজ আছে।

১২ তারিখ সন্ধ্যার সময় আমর একটীস্থানে উপস্থিত হইলাম সেখান হইতে খালটি দুইভাগে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে। বৃহত্তরটির নাম বারাসীয়া, ইহার গতি প্রথমে দক্ষিণ ও পরে পূর্ব্ব দক্ষিণ দিকে। আমরা শুনিলাম ইহাতে সমস্ত সময়েই নৌকাদি যাতায়াত করিতে পারে। আমরা আরও শুনিলাম যে এই নদী জয়নগর ও খুলনার পথে গিয়াছে। ক্ষুদ্রতরটির গতি কতকটা উত্তর পশ্চিম দিকে। এই নদীটি বেশ গভীর কিন্তু সাধারণতঃ ইহার পরিসর মাত্র ৭০ গজ। এই খালের নাম কুমার। সাধারণ দৃষ্টিতে বোধহয় যে এই খাল দিয়া গেলে সহজেই কলিকাতায় পৌঁছান যায়। এই ভাবিয়া এই খালের জরীপ করা প্রথম কার্য্য বিবেচনা করিলাম। যদি ইহাতে নৌকা না চলে তবে বারাসীয়া খাল জরীপ করিতে আরম্ভ করিব এইরূপ স্থির করিলাম

১৩ই তারিখ আমারা কুমার খালের জরীপ আরম্ভ করিলাম। তখন ইহাতে জল ১৪ হইতে ২১ হাত পর্য্যন্ত ছিল। বর্ষাতে ৭হাত জল উঠে এইরূপ ধরিয়া লইয়া গ্রীষ্মকালে অন্যূন ৭হাত জলের গভীরতা থাকে, স্থির করিলাম। কুষ্টীয়া খালের পূর্ব্বদিকের শাখা অর্থাৎ বারাসীয়া খাল ২½ মাইল যাইয়া কুমার নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। এই কালে ইহার জল অত্যন্ত কাল। স্থানীয় লোকেরা ইহার ছোটডোমন খাল নাম দিয়াছে। ইহার পূর্ব্বতীরে ঠিক যেখানে এই খাল কুমার নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে সেইখানে ছোটডোমন গ্রাম অবস্থিত। এখান হইতে কুমারের গতি কয়েক মাইল পর্য্যন্ত কতকটা দক্ষিণ পশ্চিম।

১৪ই তারিখে ছোটডোমন হইতে ৩ মাইল পশ্চিমে যাইয়া এইখাল উত্তরে গতি পরিবর্ত্তন করিয়াছে। উত্তরেও ৩ মাইল পথ যাইয়া প্রায় ৩ মাইল পর্য্যন্ত ইহা দক্ষিণ পশ্চিমে প্রবাহিত। জলের গভীরতা ৩৪ হাত; ৮হাত পর্য্যন্ত (গ্রীষ্মকালে)। তীর প্রায়ই জঙ্গলাকীর্ণ। আমাদিগকে এই জঙ্গলাকীর্ণ ভূভাগের জরীপ করিতে বিশেষ আয়াস স্বীকার করিতে হইয়াছিল।

১৫ই তারিখ আমরা কুমার খালের জরীপ করিতে লাগিলাম। আজ এখানে অনেক ঘুঘু দেখিলাম; দুই একটা খুব বৃহৎকায়। স্থানীয় লোকদিগের নিকট শুনিলাম তাহারা পূর্ব্বে কখনও এই পথে কোন ইউরোপীয়ের গমন প্রত্যেক্ষ করেন নাই।

১৬ই তারিখ আমরা কুমার খাল পথে চলিয়া অন্য একটি বিস্তৃত খাল দেখিলাম; ইহা উত্তর পশ্চিম হইতে আসিয়া কুমারের সহিত মিলিত হইয়াছে। স্থানীয় লোকদিগের নিকট অবগত হইলাম যে ইহা কুষ্টীয়া খালের পশ্চিম শাখা। এই খালে কতদূর নৌকা চলে তাহা তাহারা বলিতে সক্ষম হইল না অথবা এই খাল ও কুষ্টীয়া খালের মধ্যে দক্ষিণ পশ্চিম অন্য কোন ও শাখা আছে কিনা তাহাও তাহারা বলিতে পারিল না। এ খালটীর নাম ও কুমার। এই খান হইতে দুইটি খাল একত্র মিলিত হওয়ায় ইহার স্রোতঃ খরতর ভাবে দক্ষিণ ও পূর্ব্বে বিস্তৃত ভাবে প্রবাহিত হইয়া বারাসিয়া নামে খ্যাত হইয়াছে।

আমাদের সহিত কয়েকজন মাঝির দেখা হইল তাহাদের নিকট হইতে জানিলাম যে এই বারাসিয়া

(২) রেনেলের ক্যাম্পে একটী আরিয়াখা নদীর দক্ষিণ পূর্ব্বদিকে।

খাল বাখরগঞ্জেরদিকে প্রবাহিত হইয়াছে। এই বাখরগঞ্জ নামে গণ্ড গ্রামটি সুন্দরবনের পূর্ব্ব সীমানায় অবস্থিত। আমরা তাহাদের নিকট হইতে আরও জানিলাম যে কয়েক ক্রোশ দূরে (down) এক গাছ (?) খাল বারাসীয়া খালের সহিত মিলিত হইয়াছে। তিন চারি দিনের পথ দূরে আর একটী খাল পশ্চিম দিক হইতে আসিয়া মিলিত হইয়াছে * যদি এই সংবাদ সত্য হয় তবে আমাদের এখনও অভীপ্সিত পথ আবিষ্কারের সম্পূর্ণ আশা রহিয়াছে। এই নদীর গতির বিষয় বিবেচনা করিলে এসম্বন্ধে কতকটা প্রতীতি জন্মে। হুগলী নদীর সহিত Betwallerah এর নিকট যে একটি খাল মিলিত হইয়াছে এটি তাহারই একটি শাখা বলিয়া আমার সন্দেহ হয়।

১৮ই তারিখ প্রাতঃকালে আমার একজন সহকারী যাহাকে আমি উত্তর পশ্চিম কুমার নদের (অর্থাৎ কুষ্টীয়া খালের পূর্ব্ব শাখার) গতি নির্ণয় করিবার জন্য পাঠাইয়াছিলাম, সে ফিরিয়া আসিয়া আমাকে জানাইল যে এই নদী দিয়া ৭।৮ মাইল পর্য্যন্ত উজানের দিকে নৌকা চলিতে পারে। আমি স্থানীয় লোকের নিকট অবগত হইলাম যে আরও কয়েক মাইল পরে দক্ষিণ পশ্চিম হইতে অন্য একটি খাল মিলিত হইয়াছে। এই কথার উপর বিশ্বাস করিয়া আমি বারাসীয়ার জরীপ ত্যাগ করিলাম। এবং কুমার নদীর উত্তর পশ্চিম শাখা জরিপ করিতে আরম্ভ করিলাম, পূর্ব্বোক্ত খাল Rangafulla বা Southern Lake এর সহিত মিলিত হইয়াছে এই আশায় জরীপ আরম্ভ করিলাম।

বারাসত খালের পশ্চিম তীরে অবস্থিত মদাপুর। বারাসত খালের জরীপ বন্ধ করিলাম।

১৯শে। বারাসত হইতে পাঁচ মাইল দূরে উত্তরদিক্ হইতে একটি খাল বারাসত খালের সহিত মিলিত হইবে। গ্রীষ্মকালে এই খাল দিয়া নৌকাদি চলে না। এই খাল বিল হইতে আসিয়াছে। ইহার জল সেই হেতু অত্যন্ত কাল। এই স্থানে মাটির স্তূপের উপর একটি একটি গ্রাম গঠিত হইয়াছে। বন্যাপ্লাবনে নিকটস্থ সমস্ত ভূভাগ ডুবিয়া গিয়াছে। মাত্র খালের তীর ও এই গ্রামগুলিই এখানকার একমাত্র দৃষ্টির বিষয়ীভূত।

এই খালের মুখ হইতে এক মাইল দূরে আবিপুরের (Awaypour) লোকদিগের নিকট অবগত হইলাম যে কোন কোন সময়ে ২ হাতের অধিক জল না থাকায় ৩০০ মণ বোঝাই নৌকা চলিতে পারে না। আরও উজান পথে অধিক সংবাদ জানিবার জন্য রওনা হইলাম। এদিকে ৪ হইতে ১০ হাত পর্য্যন্ত জল থাকে।

আবিপুর হইতে ১১/২ মাইল দূরে একটি খাল দক্ষিণ ও দক্ষিণ পশ্চিম দিক হইতে মিলিত হইয়াছে। স্থানীয় লোকদিগের নিকট আমার সহকারী অবগত হইয়াছিলেন যে বহুদূর নৌকাদি চলে। কিন্তু দেখা গেল সে সংবাদ ঠিক নহে।

২০শে তারিখ আমাদের সহিত একজন নৌকার মাঝির দেখা হয়। লোকটাকে বেশ বুদ্ধিমান বলিয়া বোধ হইল। আবিপুরের নিকটস্থ খাল দিয়া ২০০ মণ বোঝাই নৌকা চলে না এইরূপ সে আমাকে বলিল। তাহার নিকট হইতে আরও অবগত হইলাম যে ইহা custa খালের পশ্চিম দিকস্থ শাখা এবং আবিপুর হইতে ৫ ক্রোশ পশ্চিমে বক্সিপুর হইতে (পশ্চিম দিকে) এই খালের সহিত মিলিত হইয়াছে। তাহার নিকট হইতে আরও অবগত হইয়াছিলাম যে আবিপুর হইতে বক্সিপুর মাত্র ১৮ ক্রোশ ব্যবধান। কিন্তু আমার বোধ হয় জলঙ্গী নদীর পূর্ব্বতীরে যে বক্সিপুর নামক গ্রামের অবস্থিতি আছে সেই বক্সিপুর গ্রামও এই লোকটির কথিত বক্সিপুর গ্রামে কোনও প্রভেদ নাই।

আমাদের অনুসন্ধানের ফলে এইরূপ বোধ হইবে যে জলঙ্গীর পূর্ব্বধারে প্রবাহিত গঙ্গা হইতে যে সকল (নৌকাদি চলে এমন) খাল বাহির হইয়াছে তাহাদের মধ্যে বারাসত খালই সর্ব্বাপেক্ষা পশ্চিমে অবস্থিত। আরও বোধ হয় যে ইহাই কলিকাতা যাইবার সর্ব্বা-

---

* এইটি বোধ হয় নবগঙ্গা হইবে। হাণ্টার সাহেব লিখিয়াছেন যে ইহা প্রতিবৎসর শুকাইয়া যায় ও গ্রীষ্মকালে এই নদীতে নৌকাদি চলে না।

See Hunters Imp. Gaz. X, P 125

এই খাল দিয়া কলিকাতা হইয়া Rangafulla অথবা Southern Lakes পর্য্যন্ত যাওয়া যায়।

পেক্ষা সংক্ষিপ্ত পথ। কিন্তু লোকজনের মাহিয়ানাদি দিবার উপযুক্ত অর্থের ও সুন্দরবন যাইবার উপযুক্ত নৌকার অভাব হওয়ায় আমি ঢাকায় যাইয়া উপযুক্ত অর্থের সংস্থান করিয়াও নৌকা সংগ্রহ পূর্ব্বক অগ্রসর হইতে স্থিরমনাঃ হইলাম। বিশেষতঃ এতদ্ভিন্ন আরও কারণ এই যে এখন পূর্ণ বর্ষাকাল আসিয়াছে। জলের গভীরতা স্থির করা সম্ভবপর হইতেছিল না। কখনও প্লাবনে জল উঠিতেছিল আবার কখনও জল চলিয়া যাইতেছিল।

আমি এক্ষণে ছোট ডোমন (বা Eastmost branch of custeca creek) খালের নিকটেই ছিলাম। এই খালের যতদূর নৌকা চলে ততদূর পর্য্যন্ত একটা খসড়া (উপর উপর) জরীপ করিলাম। জলঙ্গী ও কুষ্টিয়া খাল হইতে জয়নগর ও হবিগঞ্জ যাইবার ইহাই সর্ব্বজন বিদিত পথ। এক্ষণে জল খুব বাড়িয়াছিল অনেকদূর পর্য্যন্ত যাইতে সক্ষম হইয়াছিলাম। সাধারণতঃ মে মাসের শেষে জল বাড়িতে আরম্ভ হয়।

আমরা ২০শে জুলাই হইতে ২৬ শে জুলাই পর্য্যন্ত Lettydoman, কলসীদহ (culsedaw) ও Bacont এর খাল (?) দিয়া প্রায় ৩০ মাইল পর্য্যন্ত চলিয়া গেলে কলমবাড়ী (columbery) উপস্থিত হইলাম। এই স্থান Maddapour (মদাপুর) হইতে আটমাইল দক্ষিণ পশ্চিম ও আবায়পুর (?) (Awaypor) হইতে ৫½ মাইল উত্তরে অবস্থিত। এখানকার খাল এতদূর অপ্রশস্ত যে নৌকাদি চলে না। এই খালের মানচিত্র সবিস্তার বিবরণ দ্রষ্টব্য। বর্ত্তমান সপ্তাহের দিন রাত্রির অবস্থা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

২১ সে জুলাই তারিখে সমস্ত দিন মেঘাচ্ছন্ন ছিল। সমস্তদিন একটুও বাতাস ছিলনা (? Calm) ২২ শে তারিখে পূর্ব্বাহ্নে অত্যধিক গ্রীষ্ম অনুভূত হইয়াছিল এবং অপরাহ্নে মুষলধারে কয়েক পশলা বৃষ্টি হইয়া গেল। ২৩ শে তারিখ সমস্ত দিন মুষলধারে বৃষ্টি পড়িয়াছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রবল বাত্যা প্রবাহিত হইয়াছিল। ২৪ শে তারিখ প্রাতঃকালেও খুব বৃষ্টিছিল ও সময়ে সময়ে খুব প্রবল ঝড় বহিয়াছিল। অপরাহ্ন কালে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া রহিল। ২৫শে তারিখ সকালে বৃষ্টি হয় নাই আকাশও বেশ পরিষ্কার ছিল, কিন্তু বৈকাল হইতে সমস্ত রাত্রি মধ্যে মধ্যে বৃষ্টি হইয়াছিল। ২৬শে তারিখ ও সকালে আকাশে মেঘছিল বৈকালে সামান্য বৃষ্টিও হইয়াছিল, সন্ধ্যার সময় আকাশ পরিষ্কার হইয়া গেল।

এই দিন প্রাতঃকালে খালের জরীপ শেষ করিয়া কুমার হইতে আমরা ভাঁটা ধরিয়া ঢাকারদিকে রওনা হইলাম। বৈকালে আমরা কুমারের পূর্ব্বপার্শ্বে মথুরাপুর নিকটে উপস্থিত হইলাম। এখানে গত ১০ই তারিখের পর প্রায় ২ হাত জল বাড়িয়াছে আজ সন্ধ্যাকালে আমরা খালের পথে প্রায় ৩ মাইল পথ চলিয়াছিলাম। খালের স্রোতের গতি পূর্ব্বদিকে ছিল। এখানে জল অনেককম (তীর হইতে জল অনেক নীচে। আমারা শুনিলাম বর্ষাকালেও এখানকার জল তীর পর্য্যন্ত উঠেনা। এখানকার ক্ষেত্র বেশ মনোরম ও সুন্দর রূপে কর্ষিত হইয়া থাকে।

২৭শে তারিখ আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল। সকালও বৈকালের অবস্থা বেশ আনন্দদায়ক কিন্তু মধ্যাহ্নে অত্যন্ত গ্রীষ্ম অনুভূত হইয়াছিল। আজ আমরা অনুমান ২৫ মাইল খালের পথ চলিয়া সায়ংকালে জয়নগরে পৌছিলাম। খালের দক্ষিণ পার্শ্বে এই গ্রাম অবস্থিত এবং মথুরাপুর হইতে (স্থলপথে) ইহার দূরত্ব মাত্র ৮½ মাইল কিন্তু জল পথে যাইতে হইলে প্রায় ২৮ মাইল পথ অতিক্রম করিতে হয়। জয়নগর হইতে ১৪ মাইল প্রায় উত্তর পূর্ব্বে একটি ছোট খাল আছে। এই খাল গঙ্গানদীর সহিত মিলিয়াছে। এইখাল দিয়া গেলে সংক্ষেপে হাজিগঞ্জ ও ঢাকায় যাওয়াযায়। কিন্তু আমাদের অজ্ঞতা বশতঃ আমরা এখানে প্রবেশ করি নাই।

ঢাকা হইতে কলিকাতা পর্য্যন্ত যে রাস্তা গিয়াছে সেই রাস্তার সহিত এইখানে গঙ্গানদী মিলিত হওয়াতে, হাজিগঞ্জ গ্রাম নিশ্চয়ই বিখ্যাত জনপদে পরিণত ছিল। এই গ্রাম বর্ত্তমান সহর ফরিদপুর হইতে ৫ মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত ছিল।

Burrashee খাল ও জয়নগরের দুরত্ব ১১/২ মাইল। ২৮শে তারিখ প্রাতে অল্পক্ষণ স্থায়ী কয়েক পশলা বৃষ্টি হইয়া গেল। মধ্যাহ্নাকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল অপরাহ্নে আবার প্রবলভাবে বর্ষাপাত হইয়াছিল। খাল পথের ১৭ মাইল অতিক্রম করিলাম, এই পথটুকু পূর্ব্বদিনের অপেক্ষা উত্তম। এই খালের উভয় তীরস্থ ভূখণ্ড বড়ই সুন্দর। প্রাতঃকালে গভর্ণর লিখিত দুই খানি পত্র পাইলাম। Jadymundy তে রাত্রি কাটাইলাম।

২২শে তারিখ। আকাশ প্রায় পরিষ্কার হইয়া আসিয়াছে। কিন্তু পূর্ব্বদিক হইতে বায়ুর গতি প্রবল থাকায় আমরা (কার্য্যে ?) বিশেষ অগ্রসর হইতে পারিলাম না। এই দিন ১৯ মাইল পথ চলিয়া রাত্রিতে Sadundyতে (ছাদেন্দী) উপস্থিত হইলাম। এদেশে অনেকস্থানে জমির উপর জল উঠিয়াছে।

৩০শে তারিখ পূর্ব্বদক্ষিণ হইতে বাতাস বহিতে ছিল ও সঙ্গে সঙ্গে মধ্যে মধ্যে কয়েক পশলা বৃষ্টিও হইতেছিল। এ দেশ প্রায়ই বন্যাপ্লাবিত। আজ বায়ু আমাদের সম্পূর্ণ প্রতিকূল থাকায় আমরা মাত্র ৮ মাইল চলিতে সক্ষম হইয়াছিলাম। Cusseempour (কাশিম-পুরে) রাত্রি যাপন করিয়াছিলাম।

৩১ জুলাই তারিখে ও আকাশের অবস্থা পূর্ব্ববৎ। এই দিন তিন মাইল পথ যাইয়া দেখিলাম এই খাল দুইটি শাখায় বিভক্ত হইয়াছে। আমরা উত্তরদিকের শাখার ভিতর দিয়া চলিতে লাগিলাম। ইহাই হবিগঞ্জ ও ঢাকায় যাইবার সোজা পথ। আজ মাত্র ৭ মাইল যাইয়া হবিগঞ্জের ৪ মাইল দূরে অবস্থিত Comarcandy কোমারকান্দী গ্রামে রাত্রি যাপন করিলাম।

আগষ্ট; আজ ১লা আগষ্ট। সকালে কয়েকপশলা বৃষ্টি হইয়াছিল ও পূর্ব্ব দিক্ হইতে বাতাস বহিতে ছিল। আমরা পূর্ব্বাহ্নেই হবিগঞ্জ অতিক্রম করিলাম হবিগঞ্জ এই খালের দক্ষিণতীরে অবস্থিত ও জয়নগর হইতে ২৭ মাইল ESE1/2S অবস্থিত। হবিগঞ্জ হইতে ১ মাইল দূরে এই খাল বদরাসনের (Budarshan) খালের সহিত মিলিত হইয়াছে। নিকটস্থ ভূভাগ এতদূর বন্যাপ্লাবিত যে বিল হইতে খালের পৃথককরণে আমাদের বিশেষ আয়াস স্বীকার করিতে হইয়াছিল।

বদরাসন খালের দুই মাইল পথ অতিক্রম করিলে আমরা দেখিলাম যে ইহা সেখানে উত্তর পূর্ব্ব হইতে অন্য একটি সুপ্রশস্ত (?) খালের সহিত মিলিত হইয়াছে। এখান হইতে আমরা উত্তর পূর্ব্বে পাঁচমাইল গেলে, গঙ্গানদী (পদ্মা) দেখিতে পাইলাম। গঙ্গার স্রোত অত্যন্ত প্রবল হওয়ায় আমরা সন্ধ্যার সময় গঙ্গার মুখে নৌকা না দিয়া তথায়ই নঙ্গর করিলাম।

আমরা এখান হইতে প্রায় ৫। ৭ মাইল উত্তর পূর্ব্বে রাজনগরের মঠ (Pagoda) দেখিতে পাইলাম।

(ক্রমশঃ)

শ্রীআনন্দনাথ রায়।

তুমি

নিশার মতন গম্ভীর তুমি
সন্ধ্যার মতন শান্ত;
মধ্যাহ্ন সম দীপ্ত, প্রখর
প্রভাতের মত কান্ত।
বজ্র কঠোর ভয়াল, ভীষণ
ভৈরব-ভীম রুদ্র;
কুসুম কোমল স্নিগ্ধ, মধুর
বালুকণা প্রায় ক্ষুদ্র।
ভূধর সমান সুবিশাল তুমি
গভীর সাগর সম;
আঁধারের মত নিবিড়, সঘন
জ্যোৎস্নার মত কম্র।

শ্রীহেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

আয়ুর্ব্বেদ ও আধুনিক রসায়ন।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)।

(৫)

যশদ (Zinc)।

প্রাচীন ইতিহাস বৈদিক গ্রন্থে ও আয়ুর্ব্বেদীয় যুগের গ্রন্থসমূহে যশদের উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। ইহা হইতে বুঝিতে হইবে যে যশদ পরবর্ত্তী তান্ত্রিক যুগে ধাতু বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছিল। প্রথমে যশদ রসক (Calamine) হইতে প্রস্তুত হইত এবং দেখিতে বঙ্গের (Tin) মত বলিয়া নাগার্জ্জুনকৃত রসরত্নাকর, রসার্ণব, রসরত্নসমুচ্চয় প্রভৃতি তান্ত্রিক গ্রন্থসমূহে "রসকসত্ব" ও "বঙ্গাভ" বলিয়া কথিত হইত। মদনপালনির্ঘণ্টুতে উহা 'জসদ' নামে স্বতন্ত্র ধাতুরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই নির্ঘণ্টু ১৩৭৪ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত হইয়াছিল বলিয়া কথিত আছে।* শার্ঙ্গধর তাঁহার সংগ্রহগ্রন্থে (১৩৬৩ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত) নয়টি ধাতুর উল্লেখ করিয়াছেন কিন্তু তাঁহার গ্রন্থেও যশদের উল্লেখ নাই। তাঁহারই প্রায় সমকালীন সময়ে রচিত রসেন্দ্রচিন্তামণি ও রসেন্দ্রসারসংগ্রহ নামক গ্রন্থদ্বয়েও ধাতুবর্গের মধ্যে যশদের উল্লেখ দেখিতে পাইলাম না। আমার মনে হয় রথ (Roth) ও বুলার (Buller) রাজা মদনপালের আবির্ভাবের যে সময় নিরূপণ করিয়াছেন তাহা সঠিক হইলেও যে নির্ঘণ্টু তাঁহার দ্বারা রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ তাহা তাঁহার পরে রচিত; কারণ তাঁহারই সমকালীন বিশেষতঃ শার্ঙ্গধর প্রভৃতি তান্ত্রিক লেখকগণের গ্রন্থে ধাতুবর্গ মধ্যে যশদের উল্লেখ পাই না। পরবর্ত্তী কালে অর্থাৎ ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত ভাববিশ্বের ভাবপ্রকাশে আমরা সর্ব্বপ্রথম যশদের ধাতুমধ্যে স্থান ও জারণ, মারণ প্রভৃতির বেশ বিস্তৃত বিবরণ পাইয়া থাকি। † শার্ঙ্গধর ও রসেন্দ্রচিন্তামণি ধাতুবর্গের মধ্যে যশদকে স্থান না দিলেও খর্পরের উল্লেখ করিয়াছেন এবং শার্ঙ্গধর ভূনাগ (খর্পর) হইতে সত্ব পাতন বিধিও বর্ণনা করিয়াছেন।

ধাতুপ্রস্তুত প্রক্রিয়া (metallurgy)—তান্ত্রিকগ্রন্থসমূহ পাঠে বেশ বুঝা যায় যে **রসক** হইতেই যশদ প্রস্তুত হইত। রসক খর্পর নামেও অভিহিত হইত। অনেকে খর্পরকে যশদ ধাতু বলিয়া ভ্রম করিয়া থাকেন। খর্পর যে তুত্থকের ভেদ মাত্র এবং রসকেরই অন্য নাম তাহা ভাবপ্রকাশ স্পষ্ট করিয়াই বলিয়া দিয়াছেন।* নিম্নলিখিত শ্লোকগুলি পাঠ করিলে বেশ বুঝা যায় যে, রসরত্নসমুচ্চয়কারও রসক ও খর্পর একই দ্রব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

রসক হইতে যশদের প্রস্তুতপ্রণালী নাগার্জ্জুনের রসরত্নাকর হইতে আরম্ভ করিয়া অনেক তান্ত্রিক গ্রন্থেই বর্ণিত আছে। রসরত্নসমুচ্চয়ের বর্ণনা এত সুন্দর যে, তাহা আধুনিক বৈজ্ঞানিক গ্রন্থেরও উপযুক্ত হইতে পারে। এস্থলে রসরত্নসমুচ্চয় হইতে উহা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

"হরিদ্রা, ত্রিফলা, ধুনা, লবণ, **গৃহধূম**, সোহাগা, চতুর্থাংশ সারুষ্কর, অম্লরসের সহিত খর্পরকে বেশ করিয়া মর্দ্দন করিয়া বৃন্ত সংযুক্ত মূষার (tubulated retort) ভিতরে লেপ দিবে। পরে শুষ্ক করিয়া আর একটি মূষার দ্বারা ঢাকা দিয়া অগ্নিতে উত্তপ্ত করিবে। **যখন মূষার মুখ হইতে বহির্গত অগ্নিশিখা নীলবর্ণ হইতে শ্বেতবর্ণ হইবে,** তখন মূষাকে সাঁড়াশীর দ্বারা অধোমুখে ধারণ করিয়া

* Roy : History of Hindu Chemistry Vol. I, P. 86.
"জসদং বঙ্গসদৃশং রিতিহেতুশ্চ তন্মতম্" মদনপালনির্ঘণ্টু।
† ভাবপ্রকাশ, পূর্ব্বখণ্ড, ৬২৪ পৃঃ।
‡ শার্ঙ্গধরসংগ্রহ, উমেশচন্দ্র সেনগুপ্তের সংস্করণ, ৪৬ পৃঃ॥

* খর্পরীতুল্যং তুত্থান্যত্তদ্রসকং স্মৃতম্—ভাব প্রকাশ, পূর্ব্বখণ্ড ৪০১ পৃঃ। রসেন্দ্রসারসংগ্রহের অনুবাদক শ্রীকালীপ্রসন্ন কবিশেখর খর্পরকে দস্তা করিয়াছেন; কিন্তু উহা ঠিক নহে বলিবার যথেষ্ট কারণ থাকিলেও খর্পর মারণকালে ও অগ্নির উত্তাপে যখন উহাকে গলান হইয়াছে, তখন উহা রসক না হইয়া যশদ হওয়াই খুব সম্ভব। ধাতুরত্নমালাতেও এইরূপ খর্পর ও যশদ সম্বন্ধে গোল আছে। বেশ বুঝাযায় যে ভাবপ্রকাশের আগে যশদ ধাতু মধ্যে স্থান পাইবার পূর্ব্বে কাহারও কাহারও দ্বারা খর্পর বলিয়া অভিহিত হইত।

শীঘ্র শীঘ্র মাটিতে ঝাড়িবে। এইরূপে বঙ্গসদৃশ সত্ব পতিত হইবে। নাড়িবার সময় সাবধান হইতে হইবে যে মূষার নাল (tube)) ভাঙ্গিয়া না যায়।" *

উপরোক্ত যশদ প্রস্তুতপ্রক্রিয়ায় নিম্নলিখিত রাসায়নিক ক্রিয়া সম্পাদিত হইয়া থাকে। প্রথমে রসক অর্থাৎ জিঙ্ক কার্ব্বনেট্ (Zinc Carbonate) উত্তপ্ত হইয়া জিঙ্ক অক্সাইডে (Zinc Oxide) পরিণত হয়। পরে উহা অঙ্গারমূলক গৃহধূম (Soot) সংযোগে যশদে পরিণত হইয়া থাকে এবং কার্ব্বন মনক্সাইড্ (Carbon Monoxide) নামক দাহ্য গ্যাস বাহির হইতে থাকে। এই গ্যাস মূষার বৃন্তের উপর নীলাভ শিখা বিস্তার করিয়া জ্বলে। যখন উত্তাপ এত বেশী হয় যে যশদ বাষ্পাকারে উত্থিত হইয়া এই নীলাভ শিখাকে শ্বেতবর্ণ শিখায় পরিণত করে তখনই বুঝিতে হইবে যে রাসায়নিক ক্রিয়ার পরিসমাপ্তি হইয়াছে এবং মূষার ভিতরে তরল যশদ ঢালিয়া লইতে হইবে। প্রাচীনকালের রাসায়নিক প্রক্রিয়া সমূহে নানাবিধ গাছ গাছড়া অনাবশ্যকভাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, এখানেও হইয়াছে। উহারা পুড়িয়া কেবল অঙ্গারে পরিণত হয় এবং সেই অঙ্গার ধাতুপ্রস্তুত—প্রক্রিয়ার সহায়তা করে মাত্র, উহাদের দ্বারা অন্য রাসায়নিক ক্রিয়া সম্পাদিত হয় না। এই প্রক্রিয়া এস্থলে এরূপ সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে যে স্বতঃই মনে হয় যে গ্রন্থকার নিজে প্রক্রিয়া দেখিয়াই লিখিয়াছেন। দুঃখের বিষয় অন্যান্য প্রক্রিয়া মাত্র দুই একটি শ্লোকে অসম্পূর্ণভাবে বর্ণিত হইয়া থাকে। আজকালও যশদ এইরূপভাবেই রসক হইতে প্রস্তুত হইয়া থাকে, তবে নানাপ্রকার অনাবশ্যক গাছ গাছড়া ব্যবহার না করিয়া দুই ভাগ রসক ও এক ভাগ কয়লার গুঁড়া বৃন্তসংযুক্ত বদ্ধমূষায় উত্তপ্ত করা হয়।

যশদ শোধন—যশদের শোধন ও মারণ বঙ্গের ন্যায়। ভাবপ্রকাশে যশদকে অগ্নির উত্তাপে দ্রব করিয়া তৈল, তক্র কাঞ্জি গোমূত্র, কুলত্থকলায়ের কাথ এবং আকন্দের আটা এই কয়েকটি দ্রব্যের যথাক্রমে তিন তিনবার নিক্ষেপ করিবার ব্যবস্থা আছে। * এই শোধন প্রক্রিয়ার যে কি আবশ্যক কিছু বুঝিলাম না। যশদকে উত্তপ্ত করিবার সময় খানিকটা যশদ জিঙ্ক অক্সাইডে (Zinc Oxide) পরিণত হইতে পারে। সে কার্য্য পরবর্ত্তী মারণপ্রক্রিয়ায় সাধিত হইবে।

যশদ মারণ ঃ—একটি মৃত্তিকানির্ম্মিতপাত্রে যশদ গলাইয়া তাহার চারি অংশের এক অংশ তেঁতুল বৃক্ষের ও অশ্বত্থবৃক্ষের ত্বক্ চূর্ণ করতঃ উহাতে নিক্ষেপ করিয়া লৌহের হাতাদ্বারা চালনা করিবে, দুই প্রহর অগ্নির উত্তাপে রাখিয়া এইরূপ চালনা করিলেই যশদ ভস্ম হইবে। তৎপরে উক্ত ভস্মের সমপরিমাণ হরিতাল উহাতে নিক্ষেপ করতঃ অম্লদ্বারা মর্দ্দন করিয়া গজপুটে পাক করিবে। পুনরায় অম্লদ্বারা মর্দ্দন করতঃ দশ অংশের এক অংশ হরিতালসহ এক প্রহরকাল পুটে পাক করিবে। এই প্রকার দশবার পাক করিলেই যশদ মারিত হইবে। †

উপরোক্ত মারণ প্রণালীতে নিম্নলিখিত রাসায়নিক প্রক্রিয়া সংঘটিত হইয়া থাকে। গলিত যশদকে বায়ু সংযোগে দ্বিপ্রহর কাল উত্তপ্ত করিয়া নাড়িতে থাকিলে ক্রমে জিঙ্ক অক্সাইডে (Zinc Oxide) পরিণত হইবে। তেঁতুল ও অশ্বত্থবৃক্ষের ছালচূর্ণের কি প্রয়োজন ঠিক বুঝিতে পারি নাই। সম্ভবতঃ ঐ চূর্ণ উত্তাপসংযোগে কার্ব্বনেটে পরিণত হয় এবং সেই কার্ব্বনেট যশদকে জিঙ্ক কার্ব্বনেট (Zinc Carbonate) ও পরে জিঙ্ক অক্সাইডে পরিণত করিতে সহায়তা করে। হরিতাল সংযোগে পুটপাক কালে প্রায় সমস্ত হরিতালই ঊর্দ্ধগামী হইয়া যায়।

হরিদ্রাত্রিফলারাল সিন্ধুধূমৈঃ সটঙ্কণৈঃ ॥
সারুষ্করৈশ্চ পাদাংশৈঃ সাম্লৈঃ সংমর্দ্য খর্পরম্।
লিপ্তং বৃন্তাকমূষায়াং শোষয়িত্বা নিরুধ্য চ ॥
মূষাং মূষোপরি ন্যস্য খর্পরং প্রধমেৎ ততঃ।
খর্পরে প্রহৃতে জ্বালা ভবেন্নীলা সিতা যদি ॥
তদা সংদংশতো মূষাং ধৃত্বা কৃত্বা অধোমুখীম্।
শনৈরাস্ফালয়েদ্ভূমৌ যথা নালং ন ভজ্যতে ॥
বঙ্গাভং পতিতং সত্বং সমাদায় নিয়োজয়েৎ ॥

রসরত্নসমুচ্চয় ২পৃঃ।

* ভাব প্রকাশ, পূর্ব্বখণ্ড, ৬২৩ পৃঃ।

† ভাবপ্রকাশ, পূর্ব্বখণ্ড, ৬২৩ পৃঃ।

মারিত যশদের রাসায়নিক বিশ্লেষণ ঃ—দেখিতে শ্বেতবর্ণের অথবা ঈষৎ ধূসর বর্ণের গুঁড়া। অসংযুক্ত যশদ (Free Zinc) নাই। আর্সেনিক ঈষৎ আছে। বালুকার ভাগ কিছু বেশী। অধিকাংশ ভাগই জিঙ্ক অক্সাইড (Zinc Oxide)। অঙ্গারজনিত পদার্থ (Organic matter) নাই। জলে দ্রবণীয় অংশে পোটাশিয়াম (Potassium) ঘটিত যৌগিক আছে—ক্লোরাইড (Chloride) কার্ব্বনেট্ (Carbonate) ও ফস্ফেট (Phosphate)। জলে দ্রবণীয় অংশ শতকরা ৩।৪ ভাগ মাত্র। তবেই দেখা গেল মারিত যশদ প্রধানতঃ জিঙ্ক অক্সাইড, বাকি সকল পদার্থ তেঁতুল ও অশ্বত্থ বৃক্ষের ত্বক্‌চূর্ণ ব্যবহার জন্য আসিয়াছে।

শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী।

কার্য্য ও কারণ।

আমি, স্বপনে তাহারে পাই,
তাই আমি ঘুম যাই;
আমি, জাগিয়া তাহারে দেখি,
তাই আমি জেগে থাকি।

শ্রীদুর্গামোহন কুশারী।

বীণা

সুধু পথের পানে চাহিয়ে রব,
তুমি এলে কিনা;
যদি আশাই আমার বজায় থাকে,
বাজ্‌বে আমার বীণা;
আর বীণাই যদি বাজে আমার,
আর কিছু না চাই;
তবে দুঃখ তেমন নাইকো, তোমায়
পাই কি না-ই পাই।

শ্রীদুর্গামোহন কুশারী

অকলঙ্ক শশী।

সে শশী আর নাই। বিগত ১৩১৬ সনের আশ্বিন মাসে পূর্ব্ববঙ্গের একটা অঞ্চল শোকতিমিরে আচ্ছন্ন করিয়া অস্তগমন করিয়াছে। তাহার অকাল মৃত্যুতে, তাহার জন্মস্থান মাণিকগঞ্জের ত কথাই নাই তাহার কর্ম্মস্থান জলপাইগুড়ীতে যে হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হইয়াছে তাহা কখনও থামিবে কি না জানি না।

এ সংসারে মানুষের পরলোক-গমন ত নিত্য ঘটনা। প্রতিদিন প্রতিমুহূর্ত্তে শত শত লোক কালকবলে পতিত হইতেছে। কিন্তু তাহাদের কয় জনের মৃত্যুতে এরূপ আত্মীয় অনাত্মীয় ভদ্রাভদ্র, আপামর সাধারণকে অশ্রুপাত করিতে দেখা যায়? তাহাদের কয়জনের শব বহন করিবার জন্য ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য, জাতিনির্ব্বিশেষে সকলকে সমান ভাবে আগ্রহ প্রকাশ করিতে দেখা যায়? জলপাইগুড়ীতে শশীর শব বহন করিবার জন্য যাঁহারা এরূপ আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের চোখে শশী নিশ্চয়ই সাধারণ মানুষ ছিল না। তাঁহারা নিশ্চয়ই শশীর কোন অসাধারণ গুণে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তাহার এরূপ কি গুণ ছিল, আমরা এই প্রবন্ধে সে সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

প্রায় ৩০ বৎসর পূর্ব্বে ফরিদপুর জেলাস্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণীতে তাহার সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ। সেই স্কুলে আমরা এক সঙ্গে ছয় বৎসর অধ্যয়ন করিয়া ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হই। শশীর জ্যেষ্ঠ সহোদর হেমও আমাদের সঙ্গে ছিল। আমরা ৩ জনেই প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তি পাইয়াছিলাম। ফরিদপুরের পাঠ শেষ করিয়া আমরা কলিকাতায় যাই, এবং ৪।৫ বৎসর কাল এক মেসে থাকিয়া পাঠ শেষ করি। আমার কলিকাতা ত্যাগের পর শশী আরও দুই বৎসর সেখানে ছিল এবং এম্, এ ও বি, এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিল। আমারই ন্যায় সে দুইবার ডিপুটীগিরির প্রতিযোগী পরীক্ষা দিয়াছিল, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। ওকালতী পরীক্ষা পাশ করিয়া সে ফরিদপুরে কিছুদিন থাকিয়া

কার্য্য করে ও পরে জলপাইগুড়ীতে গিয়া ওকালতী আরম্ভ করে। প্রতিযোগী পরীক্ষায় অকৃতকার্য্যতাই তাহার ভবিষ্যৎ জীবনের সফলতার প্রধান কারণ।

তাহার জীবনের সফলতা কি সে বড় উকিল হইয়াছিল বলিয়া? তাহা নহে। এই বঙ্গদেশের অনেক জেলাতেই সেরূপ অনেক বড় উকিল দেখা যায়। এমন কি সেই জলপাইগুড়ীতেও শশীর চেয়ে অধিক বিদ্বান্ বিচক্ষণ অর্থশালী উকিল ছিলেন এবং আছেন। শশীর জীবনের সফলতা উকীল বলিয়া নহে—ইহার কারণ তাহার হৃদয়ের অনন্যসাধারণ মহত্ব।

সচরাচর আমরা সকলে সংসারগত-জীবন প্রাণী। খাইয়া পরিয়া জীবনের সুখে কালকাটানই আমাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য মনে করি। সেই উদ্দেশ্যেই আমরা বিদ্যা উপার্জ্জন করি এবং বিদ্যাশিক্ষা করিয়া দাসত্ব কিম্বা কোন ব্যবসায় অবলম্বন করি। প্রতিপদক্ষেপে আমরা জীবনের সেই একমাত্র লক্ষ্য স্থির রাখিয়া চলি, পাছে কোন ক্রমে আমাদের সেই সংসার সুখের ব্যাঘাত ঘটে। সর্ব্বদা পরিণামের জন্য ভীত হইয়া আমরা প্রতি কার্য্যে লাভক্ষতি গণনা করিয়া চলি। উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খল জীবন অপেক্ষা এরূপ সংযত জীবন শতগুণে প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই। কিন্তু এরূপ জীবনে প্রকৃত মহত্বের বিকাশ হইতে পারে কি?

মানুষের মহত্বের বীজ তাহার হৃদয়ের উচ্চতম ভাবে। প্রথমোক্ত সংসারগত জীবনকে আমি অন্যত্র life of facts বলিয়াছি, এবং এইরূপ ভাবময় জীবনকে life of ideas বলি। এরূপ ভাবময় জীবন যাঁহার, তিনি সেইভাবের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া সংসারের লাভ লোকসান, সুখ দুঃখ, মান অপমান কিছুই গ্রাহ্য করেন না; সেই উচ্চ ভাবই তাঁহার নিকট একমাত্র বাস্তব পদার্থ (real) আর সব অবাস্তব, ছায়াময় (unreal)। শ্রীরামচন্দ্র যখন পিতৃসত্য পালনের জন্য বনগমন করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার নিকট সেই পিতৃসত্যই একমাত্র সত্যবস্তু এবং অযোধ্যার রাজসিংহাসন মিথ্যা বোধ হইয়াছিল। এই সেদিন কলিকাতায় যে সতী রমণী পতির আসন্নমৃত্যু আশঙ্কা করিয়া পতির সহগমন উদ্দেশ্যে জীবন বিসর্জ্জন করিলেন, তাঁহার হৃদয়ে পতির সঙ্গসুখই একমাত্র সত্য বস্তু, এবং এই সংসার, নিজের সন্তান, এমন কি নিজের স্থূল শরীরও নিতান্ত অসার বলিয়া বোধ হইয়াছিল। এইরূপ এক একটী হৃদয়ের উচ্চভাবকে অবলম্বন করিয়া মনুষ্যত্ব বিকাশ লাভ করে, এবং সেই মানুষকে তোমার আমার ন্যায় সাধারণ জীব অপেক্ষা অনেক ঊর্দ্ধে উত্তোলিত করে।

শশীর জীবনের ঘটনাবলী পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায়, সে পরসেবাকেই জীবনের সার ব্রত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল। গীতা ত ইহাকেই কর্ম্মযোগ বলিয়াছেন। সেই কর্ম্মযোগী সংসারের জন্য জীবনপাত করিয়াছে, অথচ সংসারে তাহার কিছুমাত্র আসক্তি ছিল না। এরূপ নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠান ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠা আধুনিককালে একান্তই দুর্ল্লভ।

টাকশালের ছাপ লইয়া যে সকল মুদ্রা বাহির হয় সেগুলি যেমন সব সমান, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ (অর্থাৎ বি, এ, —এম, এ, —বি, এল—ইত্যাদি উপাধি) লইয়া যত নব্য যুবক বর্ষে বর্ষে বাহির হইয়া থাকেন তাঁহাদের সকলেই প্রায় একই প্রকার। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাপদ্ধতিতে কর্ম্মযোগী প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা নিশ্চয়ই নাই। কর্ম্মযোগীর কথা দূরে থাকুক, ইংরেজী শিক্ষার প্রথম আমলে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে যেরূপ কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও সত্যানুরাগ ছিল তাহাও দিন দিন দুর্লভ হইতেছে। তবে শশী তাহার এরূপ চরিত্র কোথা হইতে পাইল? প্রথমতঃ পৈতৃক সংস্কার, দ্বিতীয়তঃ সদ্‌গুরুর উপদেশে ও আদর্শে সেই সকল সংস্কারের ক্রমবিকাশ।

ঢাকা জেলার মাণিকগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত পাট গ্রামের বৈদ্যজাতীয় নিয়োগী পরিবারে শশীর জন্ম। এই বৃহৎ একান্নবর্ত্তী পরিবারে স্বজনপ্রীতি, আচারনিষ্ঠা, দেবসেবা ও অতিথিসেবায় ঐকান্তিক অনুরাগ এবং সার্ব্বজনীন উদারতা যেরূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছি তাহা আজকালকার দিনে বড় দেখিতে পাওয়া যায় না। শশী এইরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া ইহার অনেকগুণি গুণ রক্তমাংসের সহিত প্রাপ্ত হইয়াছিল। কালীপ্রসাদ

নিয়োগী, রামকুমার নিয়োগী ও নন্দকুমার নিয়োগী তিন সহোদর ছিলেন। কালীপ্রসাদ নিঃসন্তান, রামকুমারের দুই পুত্র, প্রসন্নকুমার ও যোগেন্দ্রকুমার, নন্দকুমারের তিন পুত্র হেমকুমার, শশিকুমার ও রাজেন্দ্রকুমার। বাল্যকাল হইতে লক্ষ্য করিয়াছি, এই সকল ভ্রাতাদের ব্যবহার দেখিয়া কে মনে করিবে ইঁহারা পাঁচটি সহোদর ভ্রাতা নহেন? যেমন বাড়ীতে, তেমন ফরিদপুরের বাসায়, তেমন কলিকাতার মেসে সর্ব্বত্রই সেই এক ভাব যেন একটি আত্মার ভিন্ন ভিন্ন শরীরে লীলাখেলা। বলা বাহুল্য শশী এই স্বজনপ্রীতি নিজ গৃহেই শিক্ষা করিয়াছিল, পরে উদারশিক্ষাদ্বারা সেই প্রীতি ক্রমশঃ সম্প্রসারিত হইয়া সমস্ত সমাজ বা দেশকে আলিঙ্গন করিয়াছিল। স্বজনের প্রতি যাহাদের হৃদয়ের প্রীতি নাই, তাহাদের স্বদেশপ্রীতি বা জাতীয়তার মূল কোথায় জানি না।

শশী বাল্যকালে যখন স্কুলে পড়িত, তখন তাহার মধ্যে তেমন কোন বিশেষত্ব দেখা যায় নাই। তবে লেখাপড়ার প্রতি তাহার অত্যন্ত অনুরাগ ছিল এবং তাহার চরিত্রে এমন একটা উদারতা, তেজস্বিতা ও সরলতা ছিল যাহা অনেকের মধ্যে দেখা যায় না। শশী বড়ই স্পষ্টবাদী ছিল। মুখের উপর স্পষ্ট কথা শুনাইয়া দিতে কাহাকেও ভয় করিত না। এজন্য আমরা সকলেই ভয়ে ভয়ে তাহার সহিত কথা কহিতাম। এমন যে প্রবল পরাক্রান্ত ভুবনবাবু হেডমাষ্টার, যাঁহার ভয়ে সমগ্র জেলাস্কুল কম্পিত ছিল—শশী একদিন চতুর্থশ্রেণীতে পড়ার সময় তাঁহাকে মুখের উপর বলিয়াছিল "আপনি যে আমাকে এরূপ অন্যায় তিরস্কার করিলেন, এজন্য আমি স্কুলের সেক্রেটারী ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের নিকট আপীল করিব!" এই ভুবন বাবুই আমাদিগকে পিতার ন্যায় স্নেহ করিতেন এবং এখনও করিয়া থাকেন। তাঁহার ন্যায় কর্ত্তব্যপরায়ণ শিক্ষক ও উদারচরিত্র লোক অতি অল্পই দেখা যায়। কিন্তু তিনি ব্রাহ্ম ছিলেন বলিয়া তাঁহার ও আমাদের মধ্যে যেন কেমন একটা ব্যবধা[illegible] [illegible] [illegible]রতাম। ৺মুকুন্দচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ যখন দ্বিতীয় শিক্ষক হইয়া আসিলেন, তখন আমরা যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইলাম। তিনি ইংরেজী পড়িয়াও একজন প্রকৃত নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ছিলেন। একজন টোলের পণ্ডিতের সহিত তাঁহার ছাত্রদের যেরূপ সম্বন্ধ তাঁহার সহিতও আমাদের সেইরূপ গভীর আন্তরিক সম্বন্ধ হইয়াছিল। আমরা অনেক বিষয়ে তাঁহাকে জীবনের আদর্শ বলিয়া মনে করিতাম। শশীর জীবনে যে হিন্দুধর্ম্মের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ, সংযমশীল শুদ্ধাচার ও দেবদ্বিজে ভক্তি দেখা যাইত, তাহাতে মুকুন্দবাবুর প্রভাব স্পষ্ট লক্ষিত হয়।

মুকুন্দ বাবুকে আচার্য্য করিয়া আমরা একটী "বাল্যাশ্রম" স্থাপন করিয়াছিলাম। আমরা প্রতি রবিবারে সেখানে হিন্দু ধর্ম্ম ও নীতি সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ করিতাম কেহ কেহ বক্তৃতাও করিতেন। ইহাছাড়া স্কুলে ষ্টুডেন্টক্লব (Student's club) নামে আমাদের আর একটি আলোচনা সভা (debating club) ছিল। প্রতি শনিবারে ইহার অধিবেশন হইত। সকল শ্রেণীর ছাত্রই ইহাতে যোগ দিত। যে ছাত্র পলাইতে চেষ্টা করিত, ভুবন বাবু তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া আনিতেন। তিনি নিজে বা অন্য কোন শিক্ষক ইহার সভাপতি হইতেন। শশীও ইহার একজন প্রধান উদ্যোগী সভ্য ছিল। তাহার বাঙ্গালা প্রবন্ধগুলি খুব উৎকৃষ্ট হইত। তাহার রচনারীতি অলঙ্কারবহুল ও শব্দাড়ম্বর পূর্ণ ছিল, সেইজন্য আমরা তাহার খুব প্রশংসা করিতাম। কিন্তু পরবর্ত্তী জীবনে সেই সংস্কৃতশব্দবহুল গম্ভীর রচনারীতি তাহার ভাল লাগিত না। ইহাকে সে "আলোচা'ল ছড়ান" ষ্টাইল বলিত। গত ১৯০১ সনে জলপাইগুড়ীতে সে "ত্রিস্রোতাঃ" নামক এক মাসিক পত্রিকা বাহির করিয়া, আমাকে প্রবন্ধ লেখার জন্য অনুরোধ করিয়াছিল। "শরতের বি[illegible]শ" নামক একটি প্রবন্ধ লিখিয়া দিই। ৺চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় তাহা পড়িয়া "চমৎকার" বলিয়াছিলেন। কিন্তু শশী লিখিয়াছিল "ওরূপ আলোচাল' ছড়ান" (অর্থাৎ অনুস্বার বিসর্গ যুক্ত) লেখা ত আমার নিজেরই আছে। ভবিষ্যতে তোমার নিজের সহজ সরল রীতিতে প্রবন্ধ লিখিবে।" তাহার ফরমাস মত আমি "জগন্নাথ দেবের ইতিবৃত্ত" লিখিয়া পাঠাই। ইহা তাহার খুব

মনঃপূত হইয়াছিল। এই ক্লাবের কথা বলিতে গিয়া কত কথাই মনে পড়ে। আমরা ক্লাবের সভ্যগণ মাসিক /০ এক আনা করিয়া চাঁদা দিতাম। ইহাতে যে টাকা উঠিত তাহা দ্বারা "প্রচার", "ভারতী", "নবজীবন" প্রভৃতি মাসিক পত্রিকা লওয়া হইত। "নবজীবন" যে দিন প্রথম আসিল, সে দিন তাহা কে আগে পড়িবে ইহা লইয়া আমাদের মধ্যে একটা কাড়াকাড়ি পড়িয়া গেল। বলাবাহুল্য বয়োজ্যেষ্ঠ ছাত্রগণই তাহা প্রথমে হস্তগত করেন ও তৎপর ক্রমে ক্রমে আমরা তাহা পড়িতে পাই। এতদ্ভিন্ন যখন যে নূতন বাঙ্গালা বই বাহির হইত আমাদের মধ্যে কোন ছাত্র তাহা নিজের পয়সায় কিনিয়া আনিতেন; পড়া শেষ হইলে, তাহা লটারিতে বিক্রয় করা হইত, এবং সেই পয়সাতে আবার নূতন বই আসিত।

ফরিদপুরে একটি সখের নাট্যসম্প্রদায় ছিল। ফরিদপুরের সুপ্রসিদ্ধ উকীল শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ মজুমদার তাহার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। সেই থিয়েটারে "অশ্রুমতী" "সরোজিনী," "মেঘনাদ বধ" প্রভৃতি নাটক অভিনীত হইত। আমাদের বালকোচিত কোমল হৃদয়ে এই সকল নাটকের উচ্চভাব মুদ্রিত হইয়াছিল। ফরিদপুর ছাড়িয়া কলিকাতায় আসিয়া আমরা খুব কদাচিৎ থিয়েটার দেখিতাম। তখন থিয়েটারের দিকে আদৌ আমাদের খেয়াল ছিল না। তাই জলপাইগুড়ীতে শশীর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত "আর্য্যনাট্যসমাজের" বৃত্তান্ত শুনিয়া আমার সেই ফরিদপুরের নাট্যসম্প্রদায়ের কথা মনে পড়ে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ফরিদপুর হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আমরা কলিকাতায় পড়িতে আসি এবং প্রায় পাঁচ বৎসর কাল একসঙ্গে বাস করি। এই কয়েক বৎসর আমাদের পক্ষে একটা জীবনসংগ্রাম বলিলে অত্যুক্তি হয় না। একে ত বিদ্যাশিক্ষার জন্য কঠোর পরিশ্রম, তাহার উপর শশী ইংরেজী ও সংস্কৃতে অনারস্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিল। তাহার দুই বৎসর পরে শশী সংস্কৃতকলেজ হইতে প্রথম বিভাগে এম, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় এবং তাহার পর বৎসরে বি, এল পাশ করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় শশী তেমন brilliant result (সর্ব্বোৎকৃষ্ট ফল) দেখাইতে পারে নাই।

কিন্তু অনেক দেখিয়া শুনিয়া আমার ধারণা হইয়াছে, কলেজে সর্ব্বপ্রধান হইলেই জীবনযাত্রায় সর্ব্বপ্রধান হওয়া যায় না। বরং দেখিয়াছি অনেক ছাত্র পরীক্ষায় সর্ব্বোৎকৃষ্ট ফল দেখাইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অকর্ম্মণ্য হইয়াছে। তাহার দুইটি কারণ আছে। প্রথম কারণ এই, এই সকল যুবকের যতকিছু মানসিক শক্তি তাহা পরীক্ষা পাশ করিতেই খরচ হইয়া যায়, পরে সংসারে প্রবেশ করিয়া কার্য্য করিবার আর কোন সামর্থ্য থাকে না। দ্বিতীয় কারণ পড়া মুখস্থ করার সঙ্গে হাতেকলমে কাজ করার বড় ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ নাই। শশীর মধ্যে এই হাতেকলমে কাজ করিবার শক্তি লুকায়িত ছিল, কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিলে তাহা ফুটিয়া উঠিল। পঠদ্দশায় শশীকে কোন একটা সভা সমিতিতে দাঁড়াইয়া বক্তৃতা করিতে শুনিয়াছি বলিয়া মনে হয় না, কিন্তু যখন সে জলপাইগুড়ীতে ওকালতী আরম্ভ করিল তখন অল্পদিনের মধ্যে সে একজন বাগ্মী হইয়া উঠিল। তাহার এরূপ অসাধারণ প্রতিভা দেখা গেল, যে, হাতে কোন একটা মোকর্দ্দমা পড়িলে সে সেই মোকর্দ্দমাকে এক নূতন আকারে খাড়া করিতে পারিত। ইহার পর তাহার তীব্র স্মৃতিশক্তি, অদম্য উৎসাহ, অবিশ্রান্ত পরিশ্রম এবং সর্ব্বাগ্রে তাহার অতিক্ষুদ্র কার্য্যেও পূর্ণ আন্তরিকতা এই সকল গুণে অল্পকালের মধ্যেই সে জলপাইগুড়ীতে একজন প্রধান উকীল হইয়া উঠিল। ৪।৫ বৎসরের মধ্যেই তাহার মাসিক আয় চারি পাঁচ শত টাকা হইল। কেবল জলপাইগুড়ী বলিয়া নহে, তাহার নিকটবর্ত্তী অন্যান্য জেলা হইতেও দৈনিক একশত দেড়শত টাকা ফিতে তাহার আহ্বান হইতে লাগিল। তাহার ওকালতী সম্বন্ধে জলপাইগুড়ীর একটী বাবু লিখিয়াছেন,—

"তিনি যখন যে মোকর্দ্দমাটি লইতেন, প্রাণ দিয়া সেটিতে লাগিতেন, প্রত্যেক টুকরা কাগজ বিশেষ করিয়া দেখিতেন শুনিতেন; প্রত্যেক মোকর্দ্দমার জন্য একখানা নোট বই করিতেন; প্রত্যেক মোকর্দ্দমাতেই কিছু না

কিছু নূতন বাহির করিতেন। তার পর নূতন বই কেনা ও পড়ার ত কথাই নাই। স্মরণশক্তি তীব্র থাকাতে একবার যাহা পড়িতেন আবশ্যক মত তাহা পুনরায় বাহির করিতে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইত না। মক্কেলের কাছে টাকার জন্য মুখে পীড়াপীড়ি করিতেন বটে, কিন্তু মোকর্দ্দমা গ্রহণ করিলে তাহা আর ছাড়িতে পারিতেন না। ফৌজদারী মোকর্দ্দমায় আসামীর পক্ষে মোকর্দ্দমা লওয়ার সময় খুব হিসাব ধরিতেন, ১।২ বা ৩ দিন সেই মতই টাকা পাইতেন। তার পর কমিতে আরম্ভ হইয়া শেষে বিনা পয়সায় কাজ করিতে হইত। তখন মাথায় মোকর্দ্দমা চাপিত, টাকা নহে। আসামী খালাস করিতেই হইবে এই ঝোঁকে টাকার লোভ উড়িয়া যাইত।

"এইত হইল সাধারণ মক্কেলের কথা। ভদ্রলোক বিপদে পড়িয়া আসিলে বিনা পয়সায় তাহার জন্য পরিশ্রম করিতেন। সে আবার যে সে পরিশ্রম নয়, ৫।৭ দিন ধরিয়া অবিশ্রান্ত কাজ করিতেছেন; রোজগার এক পয়সাও নাই; সংসারখরচ সঞ্চয় হইতে চলিতেছে, তথাপি উদ্যমের অভাব নাই। লোকেও জানিত অসময়ে শশী বাবুর কাছে দাঁড়াইলে তিনি উদ্ধার করিবেন। কয়জন খ্যাতনামা উকীল এরূপ করিতে পারেন? ইহাইত সেই "কর্ম্মযোগ"!

সে কি কেবল এই ওকালতী করিয়াছে? যে কোন কার্য্য সে সাধারণের হিতকর হইবে বলিয়া বুঝিয়াছে প্রাণপণে তাহা সম্পন্ন করিয়াছে। জলপাইগুড়ীর দাতব্য চিকিৎসালয় এক কুঁড়ে ঘরে পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়িয়াছিল। শশী কমিটির অধ্যক্ষ হইয়া তাহার পাকাঘর ও বিস্তর উন্নতি সাধন করিয়াছে। ডেপুটী কমিশনারকে ধরিয়া, জমিদার ও চা-করদিগের খোসামোদ করিয়া অনেক অর্থ সংগ্রহ করিল এবং সেই টাকায় ডাক্তারখানার প্রকাণ্ড পাকাঘর হইল, অস্ত্র-চিকিৎসার প্রচুর আয়োজন হইল, স্ত্রীলোকের জন্য পৃথক ঘর, ডাক্তারের বাসভবন, কম্পাউণ্ডারের বাসা, ধাত্রীর বাসা—এমনকি দুঃস্থ ভদ্রলোকের পীড়িত হইয়া ডাক্তারখানায় থাকিবার ঘর পর্য্যন্ত প্রস্তুত হইল। অর্থাৎ একটী উৎকৃষ্ট ডাক্তারখানার জন্য যাহা কিছু প্রয়োজন সব বন্দোবস্ত হইল। সে যে কাজে হাত দিত, তাহার কোন অঙ্গই বাদ পড়িতে দিত না—তাহা সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করিয়া তবে ছাড়িত। এই অসাধারণ আন্তরিকতা ও সর্ব্বগ্রাহিতা তাহার চরিত্রের একটি বিশেষত্ব। শশী সর্ব্বদাই বলিত সৎ ইচ্ছা থাকিলে ও তাহার সঙ্গে একটু চেষ্টা থাকিলে কোন কার্য্যেই টাকার অভাব হয় না।

জলপাইগুড়ীর "আর্য্য নাট্যসমাজ" ও তৎসংলগ্ন পাবলিক হল এবং লাইব্রেরী শশীর পুরুষকারের আর একটী জলন্ত দৃষ্টান্ত। এ সম্বন্ধে সেই জলপাইগুড়ীর বন্ধু লিখিয়াছেন—

"পাঁচসিকা সংস্থান লইয়া ১২০ ফুট লম্বা, ৬০ ফুট কি সেইরকম একটা চৌড়া থিয়েটারঘর প্রায় ৩ বিঘা জমির উপর খাড়া করার ব্যবস্থা। কোথা হইতে টাকা জুটিবে তাহার ঠিক নাই। পিছনে লক্কামারা থিয়েটারের যুবক, বালক বা সেই রকম পাতলা গোছের লোক। এই দলে নানাজাতীয় নানা প্রকৃতির লোক মিশিয়াছে। সকলকে ভালবাসিয়া, আদর দিয়া শাসনে রাখা হইয়াছে। চরিত্র সংরক্ষণের বা সংশোধনের জন্য বিধিব্যবস্থা রাখা হইয়াছে। সকলের অভাব অভিযোগ বিপদ আপদ বুঝিয়া শুনিয়া তাহার নিরাকরণের চেষ্টা করা হইয়াছে। আবার সেই দলকে সঙ্গে করিয়া বিপন্নের রক্ষার জন্য, রোগীর সেবার জন্য, মৃতের সৎকারের জন্য চেষ্টা করা হইয়াছে।" আর একজন বন্ধু এই থিয়েটারের দলকে উপলক্ষ করিয়া শশীকে "King Arthur and his Round Table" এর সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন।

বাস্তবিক পক্ষে পরোপকার ও পরসেবাকে সে জীবনের ব্রত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল। মহাকবি কালীদাস রঘুবংশীয় রাজাদের কথা লিখিয়াছেন যে তাঁহারা ত্যাগের জন্য অর্থোপার্জ্জন করিতেন ("ত্যাগায় সম্ভৃতার্থানাং")। শশীর সম্বন্ধে ও সেই কথা খাটে। সে এত উপার্জ্জন করিয়াছে, কিন্তু কেবল মুক্তহস্ততার জন্য তাহার শেষ পর্য্যন্ত অর্থাভাব ঘুচে নাই। এ সম্বন্ধে সেই জলপাইগুড়ীর বন্ধু বলেন।

"এখানে বাসায় প্রতিবেলায় ৪০। ৫০ খানি পাতা পড়িত। কত উমেদার, অল্পবেতনের চাকুরে, স্কুলের ছাত্র অন্ন পাইত। ব্রাহ্মণ স্বজাতি কায়স্থ বিচার ছিল না। হিন্দু হউক, মুসলমান হউক কোন ভদ্রলোক কঠিন পীড়াগ্রস্ত হইলে, ও শুশ্রূষার আবশ্যক হইলে শশী সেখানে তাহার থিয়েটারের রেজিমেণ্ট লইয়া হাজির। ... ... লোক অভাবে মৃতের সৎকার হইতেছে না একথা শুনিলে রাত দুপুরে ঝড়বৃষ্টিতেও শশীকে ঘরে রাখা যাইত না, যেমন করিয়া হউক দায় উদ্ধার করিবেই। ... ... একবার থিয়েটারের একটী ছোকরার আধা বসন্ত পান বসন্ত হইয়া ছিল, বাড়ীর সকলের তিরস্কারের ভয়ে গোপনে গিয়া তাহাকে দেখিয়া আসিলেন। কলেরাতো গ্রাহ্যই করিতেন না। ... ... গোপনীয় দান এত বেশী ছিল, যে তাঁহার বাড়ীর লোকেত জানিতই না, নিজেও তাহার কোন রকম হিসাব রাখিতেন না। বন্ধুগণ বিপদে পড়িয়াছেন, টাকা চাহিলেন, যদি বুঝিলেন যে সাহায্য আবশ্যক, যেমন করিয়া হউক তাহা করিতেন। তা', কি সেই টাকা "দান" বা "ঋণ" বলিয়া দিতেন? কিছু না। টাকা চহিয়াছিলেন, দিলেন।"

"সে দিন একজন প্রবীন উকীল ব্যারামে পড়িয়া স্থান পরিবর্ত্তনের জন্য পুরী যাওয়া স্থির করেন; হাতে কিছু মাত্র পয়সা নাই; দেনা বিস্তর। এক কালে বহুলোককে তিনি অন্নদান করিয়াছেন, জাতিতে ব্রাহ্মণ। শশীবাবুর কাছে ছয়শ টাকা চাহিলেন। চিকিৎসা অভাবে এমন লোক মারা যাইবেন, ইহা তিনি কল্পনায়ও আনিতে পারিলেন না; টাকা দিতে স্বীকার করিলেন। কিন্তু হাতে টাকা নাই, রাজেনকে যোগাড় করিয়া দিতে বলিলেন, এতগুলা টাকা দিতে রাজেন সঙ্কোচ বোধ করিল। তিনি বলিলেন— ... ... 'টাকার জন্য এমন লোক মারা যাইবেন, তাহা হইতে পারেনা, যেমন করিয়া হয় টাকা দাও, বাঁচিয়া থাকিলে অনেক ছয়শ টাকা আনিতে পারিব।' এই টাকা ধার করিয়া দেওয়া হইল। দুঃখের বিষয় সেই বৃদ্ধ উকীলটীও ইহার মারা গিয়াছেন; শুনা যায় শশীর মৃত্যু সংবাদে তাহার মূর্চ্ছা হইয়াছিল। তাঁহার পুত্রগণ শশীর এই ঋণ পরিশোধ করিয়াছিল।

এইরূপ হৃদয় যাহার তাহার সঞ্চয় হইবে কিরূপে? একদিন কোন প্রবীণ ব্যক্তি তাহাকে ভবিষ্যতের জন্য কিছু কিছু সঞ্চয় করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। তাহার উত্তরে শশী বলিল—

"আচ্ছা, আপনি যে আমাকে টাকা জমাইতে বলিতেছেন, আপনি কি জমাইতে পারেন? অমুক কি পারিয়াছেন? অমুক কি পারিয়াছেন? এতগুলি ভদ্রলোক যদি টাকা রাখিতে পারেন নাই, আর উহাদের অভাব হইলে যদি তাঁহাদের স্ত্রী পুত্রের কষ্ট হয়, আমার অভাবে ও না হয় তাই হইবে। আমিত আপনাদেরই মত, আমার ছেলেপুলেরাত আপনাদের ছেলেপুলের চেয়ে বিভিন্ন প্রকারের নয়?

আর একজন বন্ধু তাহাকে সঞ্চয় করিতে বলিয়া এই উত্তর পাইয়াছিলেন, "অনেক টাকা উপার্জ্জন করিয়াছি, বাঁচিয়া থাকিলে আরও কত উপার্জ্জন করিব কিন্তু যতটুকু পরসেবা করিতে পারি সেই টুকুই লাভ।" বন্ধুবর বলেন—শশীর এই উত্তর শুনিয়া আমার ক্ষুদ্রতা শশীর প্রশস্ত ও প্রশান্ত অন্তঃকরণের সামনে পরাজিত হইয়া গেল!"

শশীর এইত এত কাজ, তবুও অন্যান্য অনেক বড় উকীলের মত সে কেবল নথী আর নজীর লইয়া ব্যস্ত থাকিত না। জ্ঞান চর্চ্চা, ধর্ম্ম চর্চ্চা ইত্যাদি বাজে কাজে অর্থাৎ যে সকল কাজে পয়সা ঘরে আসে না সেইরূপ কাজেও তাহার যথেষ্ট মনোযোগ ছিল। সে সংস্কতে এম্ এ পাশ করিয়াছিল, উকীল হইয়াও সংস্কৃত সাহিত্য দর্শনাদি রীতিমত অধ্যয়ন করিত। শুনিয়াছি একজন প্রতিবেশী ছাত্রকে সে পড়াইত। সভাসমিতিতে পাঠের জন্য সংস্কৃত শ্লোক রচনা করিয়া দিত। বাঙ্গালা সাহিত্যে তাহার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। "ত্রিস্রোতাঃ" মাসিকপত্রিকা তাহার প্রমাণ। ইহাতে সে কয়েকটি দার্শনিক প্রবন্ধ লিখিয়াছিল। তিন বৎসর চলিয়া নানা কারণে এই পত্রিকা উঠিয়া গেল। পরে আর কয়েকটি বন্ধুর সহিত মিলিয়া সে আর্য্যনাট্যসমাজের সংলগ্ন একটি

সাধারণ পুস্তকালয় স্থাপন করিয়াছিল। সেই পুস্তকালয়ে সাহিত্যানুরাগী বন্ধুবান্ধবের সহিত মিলিত হইয়া অবসরকালে সাহিত্য চর্চ্চা করিত।
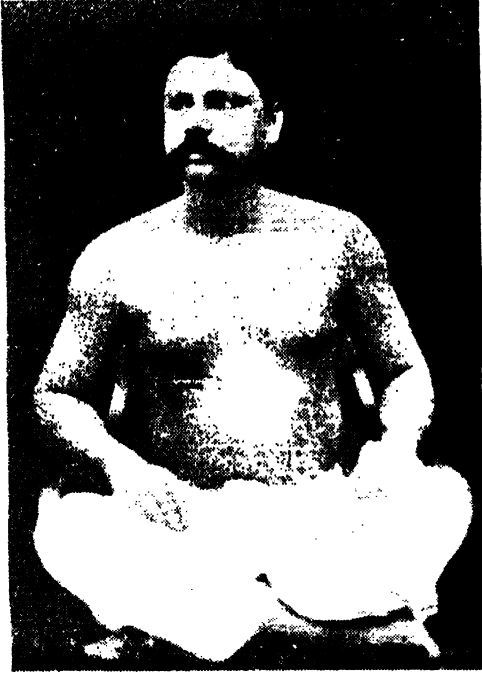
তাহার দৈনন্দিন জীবন প্রণালী অতি বিশুদ্ধ ও নির্ম্মল ছিল। মহামতি গ্লাডষ্টোন সম্বন্ধে কোথায় পড়িয়াছি, তাঁহার অত্যধিক কঠোর নৈতিকজীবনের জন্য তাঁহার বন্ধুগণও তাঁহাকে ভয় করিতেন। শশীর সম্বন্ধেও কতকটা সেই কথা খাটে। তাহার সম্মুখীন হইলে আমরা আমাদের দুর্ব্বলতা স্মরণ করিয়া ভীত ও লজ্জিত হইতাম। সে প্রত্যহ প্রভাতে উঠিয়া নিজের পূজাআহ্নিক শেষ না করিয়া জল গ্রহণ করিত না, কিম্বা কোন বিষয়কর্ম্মে লিপ্ত হইত না। এ জীবনে কখনও মাদক দ্রব্য স্পর্শ করে নাই—এমন কি তামাকও খাইত না। নিজে এরূপ বিশুদ্ধ চরিত্র থাকিয়া, বিপথগামীকে সুপথে আনার যথেষ্ট চেষ্টা করিত। তাহার চরিত্রের এরূপ অদ্ভুত আকর্ষণী শক্তি ছিল যে, সকল বয়সের সকল শ্রেণীর লোকই তাহার আলাপ ব্যবহারে মুগ্ধ হইত। সে লোককে অতি সহজেই আপনার করিয়া লইতে পারিত। কিন্তু তাহার ভিতরে কি ছিল, তাহা অপরিচিত লোকে অনেক সময়ে ধরিতে পারিতেন না। কথাবার্ত্তার আদব কায়দা কিন্তু সে মোটেই জানিত না। এ বিষয়ে সে শিশুর ন্যায় সরল ছিল। বাসায় কোন অপরিচিত লোক আসিলে অনেক সময়ে তাহার মুখ দিয়া কথা বাহির হইত না। কিছু বলিবার না থাকিলেও বলা, তাহার স্বভাব ছিল না। সে মনে ও মুখে এক ছিল। কোন অপরিচিত লোক হয়ত, তাহাকে গর্ব্বিত মনে করিতে পারিতেন; কিন্তু গর্ব্ব, অহঙ্কার সেই উন্নত চরিত্রের ত্রিসীমাও স্পর্শ করে নাই। ফলকথা, হৃদয়ের উচ্চভাব লইয়া, ভবিষ্যতের সুখ দুঃখ, লাভালাভ, জয়াজয় গণনা না করিয়া পরসেবা করাই শশীর জীবনের বিশেষত্ব। একজন প্রকৃত বীরপুরুষ না হইলে, কেহ এরূপ সাহসের সহিত কাজ করিতে পারে না। অর্থ উপার্জ্জন করিতে হইলে যেরূপ পুরুষকার যেরূপ বীরত্ব চাই, ত্যাগ করিবার জন্য আরোও অধিক বীরত্বের প্রয়োজন। যাহাদের কিছুমাত্র সংসার সুখে আসক্তি আছে, তাহারা কখনও এরূপ সাহস দেখাইয়া ত্যাগ করিতে পারে না।

বড়ই ক্ষোভের বিষয়, এরূপ একটি মহামূল্য জীবন যৌবন শেষ হইতে না হইতেই চলিয়া গেল। মা সর্ব্বমঙ্গলার কি মঙ্গল ইচ্ছা জানি না, তাঁহার এই প্রিয় সন্তানটিকে কোন্ মহান্ অভিপ্রায়ে এত শীঘ্র শীঘ্র কোলে তুলিয়া লইলেন আমরা বুঝি না। হয় ত এই শোকতাপদগ্ধ সংসারে তাহার ন্যায় পুণ্যাত্মার বেশী দিন থাকা উচিত ছিল না, হয় ত এখানে থাকিলে তাহার বিশাল হৃদয়ের সম্যক্‌স্ফূর্ত্তি হইত না—হয়ত সে কোন যোগভ্রষ্ঠ কর্ম্মযোগী কর্ম্মক্ষয়ের জন্য কিছুকালের তরে ধরাধামে অবতরণ করিয়াছিল, কর্ম্মাবসানে স্বস্থানে প্রস্থান করিয়াছে। যে কারণেই হউক, সে এই মর্ত্ত্যধাম হইতে প্রস্থান করিয়া স্বকর্ম্মোপার্জ্জিত পুণ্যলোক প্রাপ্ত হইয়াছে সন্দেহ নাই।

কিন্তু সে যে এত তাড়াতাড়ি চলিয়া যাইবে, ইহা স্বপ্নেরও অগোচর। কেবল চারিদিনের নিউমোনিয়া জ্বরে সব শেষ হইল। টেলিগ্রাফ করিয়া কলিকাতায় সুপ্রসিদ্ধ হোমিঃ ডাক্তার ডি এন্ রায়কে আনান হইল,

কিন্তু তিনি আসিয়া ঔষধ প্রয়োগের সময় পাইলেন না, তাঁহার আসিবার আধঘণ্টার মধ্যেই সব ফুরাইল। তাহার সেই প্রাণের প্রাণ ভ্রাতারা ও টেলিগ্রাফ পাইয়া আসিয়া একবার চোখের দেখাও দেখিতে পাইলেন না। সে যে বড় তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল কাহাকেও কোন কথা বলিয়া যাইতে পারিল না! বহু পুণ্য ফলে সেই নিয়োগি গৃহে শশীর ন্যায় কুলপ্রদীপের জন্ম হইয়াছিল। সেই অকলঙ্ক শশীর পুণ্যস্নিগ্ধকিরণে কিছু কালের জন্য এই গৃহটি আলোকিত হইয়াছিল। কিন্তু তাহাকে ধরিয়া রাখিবে কে? সেই ত্রিদিবের জ্যোতিঃ, পারিজাতের পরিমল, সুধাকরের সুধা ক্ষণপ্রভার ন্যায় কোথায়ও বেশীক্ষণ থাকিতে পারে না। ঐ দেখ, একদিন নিশি-শেষে সেই অকলঙ্ক শশী ভূলোক দ্যুলোক এক অপূর্ব্ব স্নিগ্ধোজ্জ্বল আলোকে আলোকিত করিয়া চন্দ্রলোকে মিশিয়া গেল।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ।

আত্ম-পরিচয়

আরণ্য কাণ্ড ৫।২৮।৩৩)

ইন্দ্রের প্রদীপ্ত দীপ্তি সুদূর আকশ-পথে
ধীরে ধীরে গেল মিশাইয়া;
গহন দণ্ডক বনে সন্ধ্যার অরুণ ছায়া
অতর্কিতে আসে ঘনাইয়া।
অদূরে পম্পার তীরে তপোবন-তরুশিরে
দিগ্বধূর সোণার অঞ্চল;
হোমগন্ধি সান্ধ্যবায়ে বিকম্পিত ধীরে ধীরে
প্রতিচ্ছায়া নাচে ছল ছল!
স্বচ্ছতোয়া মন্দাকিনী ধীরগতি চলিয়াছে—
পুণ্যধারা—অনন্য-শরণা;
পূত পূজা-পুষ্পারাশি ধীরগতি যায় ভাসি
মাল্যদাম করিয়া রচনা।
আকণ্ঠ ডুবায়ে জলে কোন ঋষি স্নান-রত;
কেহ পথে সিক্ত জটা-ভার;
জলকুম্ভ লয়ে শিরে বল্কল বসনে ধীরে
চলে কত তাপস-কুমার!
স্তব্ধ সন্ধ্যা! অন্তরীক্ষে তারকামণ্ডল স্তব্ধ!
শান্ত স্থির আশ্রম মণ্ডল!
সন্ধ্যাহুতি পান করি তরুণ তাপসী সমা
হোমশিখা করে ঝলমল!
সুবিশাল অগ্নিশালে জ্বলিতেছে হোমানল:
অগ্নিদীপ্ত বৃদ্ধ মুনিগণ:
আশ্রম বালক কণ্ঠে সমীরিত সাম-গীতি,
শান্তিরসে ভরিছে ভুবন।
মহাঋষি শরভঙ্গ সুদূর নীলিমা পানে
অনিমেষ রয়েছেন চাহি:
সায়ন্তনী শান্তি মাঝে বিশাল হৃদয় তাঁর
উঠিতেছে যেন রবগাহি'।
সান্ধ্য সবনের শেষে, বালকেরা বটুবেশে
তাঁরে আসি' করে প্রণিপাত;
তাঁর স্নেহ-দৃষ্টি হতে ব্রাহ্মী শোভা অপরূপ
ঝরে যেন আনন্দ-প্রপাত।
হেনকালে নতশিরে প্রণমিলা পদে ধীরে
রাম সীতা, অনুজ লক্ষণ;
মহর্ষি চকিতে উঠি ফল পুষ্পে ভরি' মুঠি
পূত অর্ঘ্য দিলা সসম্ভ্রম!
পশু, পক্ষী তরুতা শিহরি' উঠিল হর্ষে
পেয়ে এক পাবন অতিথি;
আশ্রম জননী-বুকে উৎসরি উৎসরি' উঠে
নিখিলের প্রাণ ভরা প্রীতি!
মহর্ষি কহিলা হাসি—"ধন্য এ আশ্রম ভূমি,
পেয়ে তোমা কুটিরের দ্বারে!
মোরা ঋষি বনবাসী নাহি জানি কোন্ মতে
সৎকারিব যোগ্য উপচারে!
সহস্র বৎসর ধরি' ধ্রুব-সত্য লোকচয়
বহুতপে করেছি অর্জ্জন!
হে পুণ্য অতিথিমোর—সমর্পিনু সব তোমা;
আজি তাহা করহ গ্রহণ!

শ্রেষ্ঠ, শ্রেষ্ঠতর লোকে যত সুখ, শ্রেয়ঃ, শান্তি
ছিল মম, হউক তোমার।
লও এই প্রীতি অর্ঘ্য—এ সৎকার অনাময়
স্নেহবতী আশ্রম মাতার।"
ঋষির নির্ম্মল স্নিগ্ধ শ্রদ্ধার প্রবাহে পূত
স্নাত করি' রামের হৃদয়,
মধুকণ্ঠে উঠে গাহি,—"তৃপ্ত আজি, ধন্য আজি ;
নাহি চাহি' তব পুণ্য-চয়।
আমি নিজ তপস্যায় অকুণ্ঠিত প্রাণব্রতে
পুণ্যলোক করি আহরণ ;
আত্মশক্তি, আত্মভূমি শরণ, বরণ করি
সার্থকতা লভিব পাবন।
শক্তির সাধন পথে যে আনন্দ, অপর্য্যাপ্ত,
স্বতঃজাগে বুকে সাধকের ;
কি মধুর ধ্রুব তাহা ; তারি'বলে হয় জিত
পুণ্যলোক যুগ যুগান্তের !
ঘুরি'ফিরি'বহুদ্বার ভিক্ষালব্ধ অধিকার,
দানে যাহা বহুভাগ্যে জুটে ;
আত্মার সকল গর্ব্ব হয় তাহে শুধু খর্ব্ব;
সব শক্তি প্রতিপলে টুটে।
আশীষ করুন ঋষি,—জন্ম জন্মান্তর বসি
কৃচ্ছ্র তপে দুঃখের সাধনে ;
সকল মানবজাতি পাক্ আত্ম পরিচয়,
সুখে দুঃখে উথানে পতনে !"
শুনি' এ উদার বাণী, নিলা রামে বুকে টানি'
শরভঙ্গ সৌম্য দরশন ;
অদূরে স্বাধ্যায় শেষে শান্তি ঋক্ হয় গীত
পূর্ণ করি' ভূতল গগন !

শ্রীগঙ্গাচরণ দাস গুপ্ত।

সংসার চিত্র।

লক্ষ্মী।

রমানাথের মা রমানাথের জন্য একটী চাঁদপানা বউ ঘরে আনিয়া, মনাগুনে পুড়িতে লাগিলেন। তাহার একটা বিষম ভাবনা হইয়া দাঁড়াইল। যে রমানাথ পাছে বউএর টুকটুকে মুখখানা দেখিয়া মাতৃ সেবা ভুলিয়া যায়।

ফলে তাহাই হইল। মায়ের অহেতুক মনোভাব রমানাথের নিকট অজ্ঞাত রহিল—সে লক্ষ্মীর রাঙ্গামুখ দেখিয়া একটু অতিরিক্ত মাত্রায় চঞ্চল হইয়া উঠিল।

রমানাথ এখন প্রতি শনিবার বাড়ী আসে এবং সোমবার ভোর বেলায় যাইয়া মহকুমায় আফিস করে। পূর্ব্বে সে এত ঘন ঘন বাড়ী আসিত না। যখন আসিত, মায়ের নিকট বসিয়া মায়ের পাখার বাতাসে শরীর শীতল করিত, তারপর মায়ের পার্শ্বে শুইয়া অনেক রাত পর্য্যন্ত গল্প করিত, মার স্নেহ হস্ত নিজ মাথায় তুলিয়া দিয়া মার মুখে গল্প শুনিত—মা ছেলের মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে কত কথা বলিতেন ছেলে শুনিয়া শুনিয়া মাতার স্নেহ শীতল হস্তস্পর্শ-সুখানুভব করিতে করিতে নিদ্রা যাইত।

এখন রমানাথ বাড়ী আসিয়া আর তাহা করে না। পিতা মাতার পা'র ধুলা লইয়া একবারে রান্না ঘরে যাইয়া আহার করে, তারপর শুইবার ঘরে যাইয়া শুইয়া থাকে। পুত্রের ভাব দেখিয়া মাতা বড়ই অসন্তুষ্ট হইলেন এবং পুত্রবধূই এইরূপ পরিবর্ত্তনের একমাত্র কারণ বলিয়া স্থির করিলেন।

রমানাথের মা'র স্থির বিশ্বাস যে বউটা ঘরে আসিয়া তাঁহার প্রাণের ছেলে রমানাথকে "অযুদ" করিয়াছে। নতুবা এমন মাতৃভক্ত ছেলে দুদিনেই এরূপ "পাগলা" হইয়া যইাবে কেন ?

ভাবিয়া চিন্তিয়া রমানাথের মা ছেলের জন্য শ্যামার মার নিকট হইতে একটা "টোট্‌কা" লইলেন এবং শনিবার দিন তাহা রমানাথের কোমরে বাঁধিয়া দিলেন।

"টোটকায়" ফল হইল না। রমানাথ যথারীতি শনিবার বাড়ী আসিত।

এবার রমানাথের মা আর এক কৌশল অবলম্বন করিলেন। রমানাথকে শনিবারে মহকুমায় কার্য্যে ব্যাপৃত রাখিবার জন্য কতকগুলি "ফরমাইস" পাঠাইলেন

মাতার ফরমাইস বাহুল্য রমানাথকে মহকুমায় বাঁধিয়া রাখিতে পারিল না। মাতৃভক্ত পুত্র আপ্রাণ চেষ্টায় মাতৃকার্য্য উদ্ধার করিয়া আসিয়া গভীর নিশীথে গৃহে পহুছিল। রমানাথ-জননী নিরাশ হইলেন। শেষ উপায়ান্তর না দেখিয়া প্রাণাধিক পুত্রের কল্যাণ মানসে মাতা আপাততঃ বধূকে তাহার পিত্রালয়ে পাঠাইয়া নিশ্চিন্ত হইলেন।

শনিবার রমানাথ গৃহে আসিয়া দেখিল গৃহ শূন্য।

রমানাথ স্নেহময়ী জননীর আগ্রহে সে দিন জননীর পার্শ্বেই শয়ন করিল। প্রাতে উঠিয়া "আফিসে অনেক কাজ "মুলতবি" আছে" বলিয়া মহকুমায় চলিয়া গেল। মা অনেক আপত্তি উত্থাপন করিলেন—রমানাথ থাকিতে পারিল না।

রমানাথের মা বউ আনাইলেন না; রমনাথও আর ঘাড়ে মুলতবি চাপ লইয়া বাড়ী আসিয়া বৃথা সময় নষ্ট করার কোন আবশ্যকতা বুঝিল না। আপাততঃ এ অবস্থা ছেলের শুভাশুভের দিকে লক্ষ্য করিয়া রমানাথের মা সহ্য করিয়া লইতে লাগিলেন।

রমানাথের বৃদ্ধ পিতাকে বউ বড়ই যত্ন করিত। বধূর অভাব বৃদ্ধ প্রতিমুহূর্ত্তে অনুভব করিতে লাগিলেন। রমানাথের মাও যে সে অভাব অনুভব না করিতেছিলেন তাহা নহে; তিনি সংসারের প্রতি কার্য্যে বিশৃঙ্খল ভাব লক্ষ্য করিতেছিলেন—লক্ষ্মীর অভাবে বাস্তবিকই গৃহ লক্ষ্মীছাড়া হইয়া উঠিয়াছিল—বুঝিয়াও পুত্রের কল্যাণ কামনায় মাতা সাধ্যানুসারে সে সকল অসুবিধা বক্ষ পাতিয়া লইতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন।

বৃদ্ধ আভ্যন্তরীণ অবস্থা কিছুই জানিতেন না। কষ্টে পড়িয়া বউকে বাড়ী আনিতে জেদ করিলেন। লক্ষ্মী গৃহে আসিল। শনিবার রমানাথও আসিয়া পিতামাতার পায়ের ধূলা লইল।

মাতা পুত্রের কল্যাণ কামনায় অনেক 'টুটকা', রক্ষাকবচ, মাদুলী ব্যবহার করাইয়া, অনেক ঠাকুর দেবতার 'মানসিক' 'করিয়াও' যখন কিছুতেই পুত্রবধূর কবল হইতে পুত্রকে রক্ষা করিতে পারিলেন না, তখন বধূর উপর অগত্যা "আম হুকুম" প্রকাশ করিলেন—বলিলেন "তুমি রাত বরাবর" আমার সঙ্গে থাকিও কর্ত্তা ৩।৪ বার বাহিরে উঠেন, আমার কি আর শক্তি আছে যে"— ইত্যাদি।

মা বউকে চ'খের উপর রাখিলেন।

(২)

রমানাথের পিতা গৃহিণীকে বলিলেন ছেলেটা বাড়ীতেও আইসে না, খরচপত্রও দেয় না, তার কি কোন খবর লইতে নাই?

গৃহিণী বলিলেন—"ছেলে এত ঘরমুখো হওয়া কি ভাল? বাইরে দশজনের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া থাকাই ভাল, নতুবা চ'খ মুখ ফুটে না। কত ছেলে কত রকম 'খেয়াল' করে, আমার রমানাথের কি সেই সকল কিছু আছে? একটু এদিক ওদিক দেখ্‌লেও মনে সুখ হয়।"

কর্ত্তা বলিলেন—"ও সকল সেকালের ধাত তোমার যায় নাই। আজই তা'কে খবর দাও। যে লোক মহকুমায় যাইবে, তাহার সঙ্গে আমার পেন্‌সনের কাগজটাও পাঠাইও।

গৃহিণী মহকুমায় লোক পাঠাইলেন। প্রেরিত লোক যথাসময়ে মহকুমা হইতে আসিয়া জানাইল সে রমানাথকে বাসায় যাইয়া পায় নাই। তিনি বাসায় থাকেন না। কোথায় থাকেন কেহ বলিতে পারে না। বারংবার ঘুরিয়া সে তাহাকে আফিসে একবার পাইয়া পেন্‌সেনের কাগজ দিতে পারিয়াছে। তিনি বলিয়া দিয়াছেন পেন্‌সেনের টাকা লইয়া শনিবার আসিবেন। ইত্যাদি।

ইহার পর শ্যামার মা আসিয়া গৃহিণীর নিকট হাসিমুখে বিস্তৃত মুখবন্ধের সহিত জানাইল যে তাহার অব্যর্থ টুটকার গুণ দু দিন আগেই হউক আর দু দিন পরেই হউক প্রত্যক্ষ দেখা যায়। রমানাথের ব্যাপারেও প্রত্যক্ষ দেখা গেল। এই টুটকা দ্বারা সে আরও দুই কুড়ি সাতজন লোককে ডাইনীর হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছে। লোকের আশীর্ব্বাদ থাকিলে ভবিষ্যতের আশাও সে পোষণ করে ইত্যাদি ইহার পর স্বর নিম্ন করিয়া রমানাথের মার কানের কাছে শ্যামার মা আরও

২। ১টী কথা বলিয়া তাহার এই সুদীর্ঘ মুখবন্ধের উপসংহার করিল।

শ্যামার মার মুখে রমানাথের বিশেষ সংবাদ শুনিয়া গৃহিণী পরম আনন্দিত হইলেন। আনন্দের কারণ পুত্রের মুখ চোখ ফুটিয়াছে, এখন কর্ত্তার অভাবে জ্ঞাতি গুষ্ঠির সঙ্গে ও দশের সঙ্গে "জুঝিয়া বুঝিয়া" চলিতে পারিবে।

যাই হউক গৃহিণী আর অপেক্ষা করিতে পারিলেন না, হাসিমুখে ঘরে আসিয়াই কর্ত্তাকে এই শুভ সংবাদ প্রদান করিলেন। এবং তাঁহার বহুব্যয় আয়াস সাধ্য চেষ্টাতেই যে ছেলের চোখ মুখ ফুটিয়াছে, মতিগতির পরিবর্ত্তন হইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে তাহার আভাষও প্রদান করিলেন।

বৃদ্ধ ক্রোধে ও দুঃখে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে বলিলেন—"তুমি সর্ব্বনাশ করিয়াছ। আমার বংশের দুলালকে জাহন্নামে দিয়াছ। এ ইতর প্রবৃত্তি তোমায় কে দিল? মা হইয়া তুমি সন্তানের সর্ব্বনাশ করিলে তাহার পরকালটা নষ্ট করিলে?

গৃহিণী হঠাৎ যেন আকাশ হইতে পড়িয়া গেলেন। ধন্যবাদের পরিবর্ত্তে এইরূপ অপ্রত্যাশিত তিরস্কারে অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইয়া তিনি বলিলেন "আমি ত ভালর জন্যই করিলাম। ছেলে যেরূপ 'ঘর মুখো' হইয়া যাইতেছিল, এ অবস্থায় আমাদের অভাবে কি এই ছেলে সংসার করিয়া দশের সহিত বুঝপ্রবোধ" করিয়া থাকিতে পারিত।

বৃদ্ধ চিৎকার করিয়া বলিলেন তোমদের বুদ্ধিই প্রলয়ংকরী। তুমি কৈকেয়ীর ন্যায় সোণার সংসার ছারখার করিলে, পেটের ছেলেকে নির্ব্বাসিত করিলে, কচি বউটাকে চোখের জলে ভাসালে, শেষ বুড়া বয়সে আমাকেও ঘরে বাসিমরা করে নরকে ডুবাবে

গৃহিণী কর্ত্তার মুখে নিজ সংসারের এইরূপ পরিণাম শুনিয়া তাহা বিশ্বাস করিবার কোন কারণ দেখিতে পাইলেন না। তিনি সরলভাবে বলিলেন—আপনারা সহরে থাকিয়া যখন চাকুরী করিতেন, তখন এত ঘন ঘন বাড়ী আসিতেন না। ন মাসে ছ বছরে আসিলেও আমরা চোখ দিয়া দেখিতে পাইতাম না। শাশুড়ীর মুখে কত কথাই শুনিয়াছি। তিনি বলিতেন এইরূপ না করিলে লোকে সম্মান করে না। সংসার করিয়া খাইবার বুদ্ধি হয় না।"

কর্ত্তা ঘৃণার সহিত বলিলেন—সেকালের কথা ছাড়িয়া দাও। আমাদের সে দিন এখন নাই। আমাদের মা খুড়ী কি বাড়ী আসিলে বউ লুকাইয়া রাখিতেন? তুমি যাহা করিয়াছ তাহার ফল হাতে হাতে পাইবে। এখন যাও নিজে যাইয়া ছেলেকে লইয়া আইস।

গৃহিণী বলিলেন—আমার রমানাথ তেমন ছেলে নয়। সে শনিবার নিশ্চয়ই আসিবে।

কর্ত্তা বলিলে "নিশ্চয়ই না।"

(৩)

শনিবার রমানাথ বাড়ী আসিল না। কর্ত্তা গৃহিনীকে বলিলেন এখন দেখ্‌লে তোমার রমানাথ কেমনটি হয়েছে?

গৃহিণী পুনরায় মহকুমায় লোক পাঠাইলেন। সে লোক যাইয়া রমানাথের খোজই করিতে পারিল না। রমানাথ এখন প্রায়ই আফিসে যায় না।

সংবাদ পাইয়া গৃহিণী কাঁদিয়া অস্থির হইলেন।

কর্ত্তা বলিলেন "এখন কাঁদিলে কি হইবে? ঘরে আগুন দিয়া বসিয়া হা হতোস্মি করিলে পুড়িয়া মরণ ব্যতীত উপায় নাই। আমাদের সেকালের অবস্থা ভাবিয়া আমি ছেলেকে বিবাহ করাইয়া মহকুমায় চাকুরী দিয়া ঘরে রাখিলাম—তুমি কি না আমার পাকা ধানে মই দিলে।"

পরদিন পাল্কি করিয়া গৃহিণী নিজেই ছেলে ধরিতে গেলেন। একজন আত্মীয়ের বাসায় উঠিয়া তাহার দ্বারাই রমানাথকে ডাকাইলেন। সংবাদ আসিল রমানাথ আফিসের পর আসিয়া মায়ের সহিত সাক্ষাৎ করিবে। মাতা ঠাকুরাণী প্রাণাধিক পুত্রের চাঁদমুখ দর্শন আশায় বসিয়া রহিলেন। রমানাথ আসিল না।

পরদিন পুনরায় লোক পাঠাইলেন। সে দিন আর তাহাকে পাওয়াই গেল না।—আফিস কামাই, এবিষয়

অধিক জানাজানি হইলে চাকুরী থাকিবে না। মাতা অনন্যোপায় হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

সন্ধ্যার পর দুই তিনজন ভদ্রলোকের চেষ্টায় রমানাথ ধৃত হইল। তাহার অবস্থা দেখিয়া মাতা আকুল হইয়া পড়িলেন। দুগ্ধ পোষ্য শিশুটীর ন্যায় নিজ বক্ষে টানিয়া লইয়া শরীরে হাত বুলাইতে বুলাইতে কত উপদেশ দিতে লাগিলেন। রমানাথের কর্ণে তাহার একটী বর্ণও প্রবেশ করিল না। রমানাথ তখন জ্ঞান লুপ্ত মাতাল।

পরদিন রমানাথ পুনরায় পলাইল অনন্যোপায় দেখিয়া আত্মীয় স্বগণ সকলেই রমানাথের মাকে বউ লইয়া মহকুমায় যাইবার পরামর্শ দিলেন। অগত্যা তিনি কর্ত্তার পরামর্শ গ্রহণ জন্য বাড়ী আসিলেন।

(৪)

কর্ত্তা বলিলেন—এখন কৃত কর্ম্মের ফলভোগ কর। দুই দিন যাইতে না যাইতেই দেখিতেছি অনাহারে মরিবে। ছেলের কামাই বন্ধ করলে। পেনসনের যে টাকাটা জমিয়াছিল তাহার গোল্লায় গেল। এখন সর্ব্বস্ব খোয়াইয়া গিয়া মহকুমায় পড়িয়া মর।”

গৃহিণী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন “আমি কি জানি ২ দিনেই আমার রমানাথ এমন বিগড়াইয়া যাইবে। হায়, হায়, আমি কু লক্ষণে বউ ঘরে আনিয়া এমন ছেলে হারাইলাম”।

গৃহীণীর রাগটা এখন বউর উপর ষোল আনা মাত্রায় চাপিয়া পড়িল। বালিকা লক্ষ্মী যাতনার উপর যাতনা পাইয়াও কর্ত্তব্য ভুলিল না। আপ্রাণ চেষ্টায় শ্বশুর, শাশুড়ীর মনস্তুষ্টি সাধনে যত্ন করিতে লাগিল।

(৫)

একদিন মধ্য রাত্রে রমানাথের ডাক শুনিয়া মা জাগিয়া উঠিলেন। তাঁহার মনে আনন্দ ধরে না। বউ উঠিয়া রান্না ঘরে গেল। কর্ত্তা গৃহিণীকে ডাকিয়া কর্ত্তব্য বুঝাইয়া দিলেন।

রমানাথ বলিল আহার হইয়াছে, রান্নার প্রয়োজন নাই। সে দিন রমানাথ মার সঙ্গে অনেক কথাবার্ত্তা বলিল শেষে ঘরে যাইয়া শয়ন করিল।

লক্ষ্মী বহুদিন পরে স্বামীকে পাইয়া অশ্রুজলে বক্ষ বিধৌত করিয়াছিল। রমানাথ হাস্য করিয়া বলিল কাঁদিয়াই কি রাত পোহাবে নাকি? কথাই কওনা ভাল আছত?

লক্ষ্মী বলিল “যেমন রাখিয়াছ, তেমনই আছি। তুমি কেমন আছ?

রমানাথ দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল “বড়ই অশান্তিতে আছি। লক্ষ্মী তুমি থাকিতে আমার এ অশান্তি।” রমানাথের কথায় লক্ষ্মীর প্রাণে আঘাত লাগিল। লক্ষ্মী অধিকতর আবেগের সহিত বলিল “তোমার কি অশান্তি আমি তাহার কি করিতে পারি বল? আমি প্রাণ দিলে যদি তোমার মনে শান্তি হয় বল,যাহা করিতে বল তাহাই করিব।

রমানাথ চুপ করিয়া রহিল।

লক্ষ্মী বলিল—“চুপ করিয়া রইলে যে, তোমার মনের কথা আমাকে বলিতে বাধা আছে কি?”

রমানাথ দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিল “কিছুই না”। লক্ষ্মী “তবে বল”।

রমানাথ লক্ষ্মীর মুখেরদিকে সকরুণ নেত্রে চাহিয়া বলিল “লক্ষ্মী বড়ই অভাবে পড়িয়াছি। পাওনাদারের তাগাদায় আফিসে পর্য্যন্ত থাকিতে পারি না। লক্ষ্মী উপায় কি?

লক্ষ্মী “কত টাকা তোমার দেনা? আমাকে কি করিতে হইবে বল?

রমানাথ চিন্তা করিয়া বলিলেন “আপাততঃ একশত টাকা হইলেই খুচরা দেনা শোধ করিতে পারি।”

লক্ষী বলিল—টাকা আমি কোথায় পাইব? আমার হাতের বালা, গলার হার লইলে যদি ঋণ শোধ হয় —লইয়া যাও। এর জন্য যন্ত্রণা সহ্য করিতে হয় আমি করিব।”

রমানাথ তাহাই চায়। তাহারই জন্য সে আজ গৃহে আসিয়াছে। লক্ষ্মীর হাত হইতে জোর করিয়া রমানাথ বালা লইয়া যাইবে ইহা সে কল্পনা করিয়া আসিয়াছিল। তাহাকে এত দূর যাইতে হইল না, ইহাতে সে বিধাতাকে ধন্যবাদ প্রদান করিল।

ভোরে উঠিয়া গৃহিণী আর রমানাথকে দেখিতে পাইলেন না। লক্ষ্মীর হাতের দিকে চাহিয়া দেখিলেন সোণার বালা নাই। তখন তাঁহার আর অবস্থা বুঝিতে কিছুই বাঁকি রহিল না। তিনি লক্ষ্মীকেই সকল অপ-রাধের মূল বিবেচনা করিয়া তীব্র তিরস্কারে জর্জ্জরিত করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মী স্বামীর জন্য সকল অত্যাচার নীরবে সহ্য করিতে লাগিল।

কর্ত্তা শুনিয়া ক্রোধে অধীর হইয়া বলিলেন "পাষণ্ডকে আর বাড়ীর ত্রিসীমায় প্রবেশ করিতে দিও না।"

(৬)

পুত্রের এই জঘন্য ব্যবহার বৃদ্ধ পিতার মনে প্রচণ্ড আঘাত প্রদান করিল। এই আঘাতে বৃদ্ধ শয্যা লইলেন। রমানাথের নিকট পিতার গুরুতর পীড়ার সংবাদ গেল। রমানাথ আজ কাল করিয়া আসিতে আসিতে বৃদ্ধের পরমায়ুদ্রুতবেগে ক্ষয় হইতে লাগিল। লক্ষ্মী সারাদিন শয্যা পার্শ্বে বসিয়া শ্বশুরের সেবা করিয়া শাশুরীর অবিরত তিক্ত বর্ষণে লক্ষ্মী বিচলিত হইল না। মৃত্যুকালে বৃদ্ধ লক্ষ্মীকে আশীর্ব্বাদ করিলেন—"মা, তুমি যথার্থ ই লক্ষ্মী, তুমি আমার গৃহ উজ্জ্বল ও শান্তিময় কর।

পিতার মৃত্যুর পর রমানাথ গৃহে আসিল। আসিয়া সে মহা অশান্তিতে পড়িয়া গেল। লক্ষ্মীকে তাহার মা একেবারেই দেখিতে পারেন না। লক্ষ্মী অনবরত সংসারে খাটিতেছে আর শুধুই ভর্ৎসনা শুনিতেছে—সে ভর্ৎসনার কোন মূল্য নাই, কোন অর্থ নাই।

দেখিয়া শুনিয়া এক দিন রমানাথ বলিল "তোমাদের এই অপ্রীতিকর অবস্থা দেখিয়া মনে হয় এখনই বাড়ী ত্যাগ করি।"

মা রাগ করিয়া বলিলেন "কেন আমি কি সংসারের কেউ নাই। সকলই যার তার ইচ্ছা মত চলিবে। একটু মুখের কথাও বলিতে পারিব না।"

রমানাথ বলিল আমাদের এমন কি দশ পাঁচ গণ্ডা জমিদারী আছে, যে এদিকে নষ্ট হলো ও দিকে নষ্ট হলো সারা দিন "বকাবকি" না করিলে চলে না।"

মা ক্ষুণ্ণ হইয়া কাঁদিতে বসিলেন। তাঁহার কান্নার মর্ম্ম—কর্ত্তার মৃত্যুর দুদিন যেতে না যেতেই পেটের ছেলে পরের হলো।

দেখিয়া শুনিয়া শ্রাদ্ধের পর রমনাথ বউকে পিত্রালয়ে ও মাকে বাড়ীতে থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া নিজ স্বেচ্ছা-চারিতা বৃদ্ধির সুবিধা করিয়া লইল।

(৭)

পতির মৃত্যু এবং পত্রের তীব্র ব্যবহারে রমানাথের মা মর্ম্মান্তিক যাতনা অনুভব করিতে লগিলেন। কর্ত্তার ভবিষ্যৎবাণী অক্ষরে অক্ষরে ফলিতেছে দেখিয়া তাঁহার অন্তরও নিরাশায় ভাঙ্গিয়া পড়িল। তিনি অল্পদিনের মধ্যেই পীড়িত হইয়া পড়িলেন। রমানাথ তাঁহার সংবাদও পাইল না।

লক্ষ্মী লোকমুখে শাশুড়ীর পীড়ার সংবাদ শুনিয়া অস্থির হইয়া উঠিল। শাশুড়ী তাহার সংবাদ না লইলেও সে নিজ হইতেই আসিয়া শাশুড়ীর পদতলে লুটাইয়া পড়িল এবং তাঁহার সেবা শুশ্রূষার ভার গ্রহণ করিল।

লক্ষ্মীর আপ্রাণ চেষ্টায় শাশুড়ী আরোগ্যলাভ করিলেন। এতদিনে শাশুড়ী বুঝিলেন বউ যথার্থই লক্ষ্মী তিনি ঘরের লক্ষ্মীকেই এতদিন পায়ে ঠেলিয়াছিলেন—তাই তাঁহার আজ এদুর্দ্দশা তাই লক্ষ্মীর সংসার আজ লক্ষ্মী ছাড়া।

শাশুড়ী আরোগ্যলাভ করিলে লক্ষ্মী নিশ্চেষ্টভাবে থাকিয়া পতির স্বেচ্ছাচারিতার প্রশ্রয় দেওয়া আর সঙ্গত মনে করিল না। লক্ষ্মী স্বামীকে সুপথে আনিবার জন্য শাশুড়ীকে লইয়া মহকুমায় যাইবার প্রস্তাব করিল। শাশুড়ী লক্ষ্মীর প্রস্তাবে সম্মতি দান করিলেন।

(৮)

রমানাথ ধরা দিল না। লক্ষ্মী ছাড়িবার মেয়ে নহে সে শাশুড়ীকে প্রবোধ দিয়া মুন্‌সেফ বাবুর বাসায় যাইয়া তাঁহার নিকট সকল অবস্থা জানাইতে অনুরোধ করিল। রমানাথের মা আত্মীয়স্বজনের সম্মতি লইয়া তাহাই করিলেন।

মুন্‌সেফ দেবেন্দ্রবিজয় বাবু একজনদার্শণিক পণ্ডিত লোক; যথা সময়ে তিনি রমানাথকে তাহার গৃহে আহ্বান

করিয়া উপদেশচ্ছলে জীবনের কর্ত্তব্য, পুত্রের কর্ত্তব্য, স্বামীর কর্ত্তব্য, গৃহীর কর্ত্তব্য বুঝাইয়া দিলেন।

মানুষ চরিত্রভ্রষ্ট হইলে কিরূপ জঘন্য হয়, নীচাশয় হয়, প্রবঞ্চক হয়, চোর হয়; পুত্রের অযত্নে মায়ের কিরূপ দুর্গতি হয় দেখাইলেন। স্বামীর অনাদরে ও হতাদরে সংসার কিরূপ নরকে পরিণত হইতে পারে তাহা বুঝাইলেন। রমানাথ তাহা একাগ্র মনে শ্রবণ করিল।

মুনসেফ বাবু রমানাথকে মিষ্ট ভাষায় এই সকল বুঝাইয়া বলিলেন—রমানাথ দেখ, ভ্রান্তি মানুষেরই হয়, এবং অনুতাপই তাহার প্রায়শ্চিত্ত। গত কার্য্যের জন্য অনুতাপ কর। লজ্জিত হইওনা কিন্তু দেখিও ভ্রান্তি যেন দ্বিতীয়বার না আইসে। এখন গৃহে যাও! প্রতিদিন এই সময়ে আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিও।

রমানাথ গৃহে আসিয়া মাতৃ চরণে প্রণাম করিল। লক্ষ্মীকে বাহুবন্ধনে আবদ্ধ করিয়া প্রেমের অজস্র উপহার বর্ষণ করিল।

মাতা উদ্বেলিত হৃদয়ে বলিলেন "কর্ত্তা মৃত্যুকালে যথার্থই বলিয়াছিলেন—মা আমাদের লক্ষ্মী।"

রুরু ও প্রমদ্বরা।

সদ্যোজাত সুতা ত্যাজি মেনকা যখন
চলি গেল, তপোবনে পশিল তখন
"স্থূল কেশ" ঋষি কর্ণে শিশুর ক্রন্দন!
অমনি সে পাতি পাতি করি অন্বেষণ
জীবন্ত ফুলের কুঁড়ি দেখিতে পাইয়া
নীরস বক্ষেতে "যতি" লইল তুলিয়া।
স্নেহ-স্নিগ্ধ ছায়াহীন তাপস কুটিরে
সে অপূর্ব্ব নারী শিশু লয়ে ধীরে ধীরে
করিল প্রবেশ, স্বপ্নে আবিষ্টের মত।
মায়ার মোহন সুর বাজি শত শত
মুহূর্ত্তে হইল জ্ঞান সন্ন্যাসী হৃদয়ে
বহিল করুণাধারা নির্ঝরিণী হয়ে
সে উপল তলবাহি। দেখিল সংসার
স্নেহ ভালবাসা পূর্ণ সুখের আধার!
গৃহীর কামনা ধন সন্তানের মত
তাপসীর যত্নে শিশু হইয়া লালিত
বাড়িতে লাগিল ক্রমে শুক্লশশী সম
ঢালিয়া রূপের জ্যোতি মহান্ আশ্রম
লয়ে গেল উচ্চ হতে সর্ব্বোচ্চ শিখরে।
অমল কমলে পূর্ণ যেন পরিমল
যখনি সুন্দর শিশু হাসে খল খল,
ঋষি ভাবে সেই যেন পূজা উপচার
নির্ম্মল নিষ্পাপ পুষ্প যোগ্য দেবতার।
কঠোর তপস্যা পন্থা সে পুষ্প সৌরভে
সহজ সুগম হ'ল স্নেহের গৌরবে।
কত বর্ষ পরে বর্ষ দিনান্তে সে দিন
অনন্ত কালের স্রোতে হ'য়ে গেল লীন।
সাথে সাথে "প্রমদ্বরা" কোরক জীবন
বিকাশি উঠিল স্মিত পদ্মের মতন।
ঝলকিয়া লাবণ্যের কূটস্থ মহিমা
রূপে গুণে একখানি জীবন্ত প্রতিমা!
বদ্ধছিল যে সৌরভ অস্ফুট মুকুলে
ছুটিল চৌদিকে তাহা যৌবন হিল্লোলে।
মোহিল 'রুরুর' প্রাণ হেরি সে মাধুরী,
প্রমদ্বরা প্রাণ সেকি করে নাই চুরি?
কোন অতর্কিত ক্ষণে কেমনে কি জানি
প্রবেশি সিঁদেল চোর নিল প্রাণ খানি।
মহিয়সী সুষমার পূত পদতলে
প্রেমাঞ্জলি দিল দোঁহে হৃদি ফুল দলে;
দুজনেরি সাধ হ'ল বাঞ্ছিত রতনে
বাঁধিবারে চির তরে বিবাহ বন্ধনে।
তার পরে শুভদিন হ'য়ে গেল স্থির
সে দিনের আশে দোঁহে হইলা অধীর।
এক দিন "প্রমদ্বরা" সখীগণ সনে
মনের হরষে গেল কুসুম চয়নে,
সেথা কাল ফণী তারে সহসা দংশিল

অমনি লাবণ্যলতা ঢলিয়া পড়িল!
হায় রে! অদৃষ্ট ফের বিধি নিরূপণ,
এত আশা ভালবাসা সুখের জীবন
মুহূর্ত্তে হইল লীন নিশ্বাসের সনে
প্রণয়ের সাধ বুঝি মিশিল স্বপনে।
নিদারুণ বাণী যবে শ্রবণে পশিল,
প্রেতাত্মার মত রুরু ছুটিয়া আসিল
সংজ্ঞাহীন। কিম্বা ধরে ছিল ব্যোমকেশ
পার্ব্বতীর দেহত্যাগে যে ভীষণ বেশ
সে বিকট বেশে "রুরু" আরম্ভিল স্তব
বিশ্বদেবতার কাছে। সে যে অভিনব
সৃজিয়া উপায়। স্বীয় অর্দ্ধ আয়ু দিয়া
ফিরাইয়া আনিবে সে প্রাণহীন প্রিয়া।
অনাহারে অনিদ্রায় লুটা'য়ে ভূতলে
প্রাণপণে বক্ষ চাপি পীড়ি মর্ম্মস্থলে
চাহে যেন উৎপাটিতে দাবদগ্ধপ্রাণ।
করুণ ক্রন্দনে তার, বিদ্ধ হ'ল বাণ
বন্য পশু পাখী বুকে, শোকের আগুনে
ছার খার করি যেন ফেলিল সে বনে।
"ফিরাইয়া দাও দেব, প্রমদ্বরা প্রাণ"
'রুরুর' সম্বল শুধু এই এক ধ্যান।
একাগ্র বিশ্বাস আর শুদ্ধ ভক্তি দলে
আন্তরিক পূজা কভু যায় কি বিফলে?
সহসা টলিল স্বর্গে দেবের আসন,
"রুরুর" মর্ম্মের পূজা করিলা গ্রহণ।
নির্ম্মল নিষ্কাম শুদ্ধ স্বরগের প্রেম
স্বার্থপূর্ণ ধরণীতে বিশোধিত হেম,
সে প্রেমের বলে হয় অসাধ্য সাধন
তাই ফিরে পে'ল "রুরু" বাঞ্ছিত রতন।

শ্রীসুরমাসুন্দরী ঘোষ

পাপিয়া রবে।

(Keats এর Nightingale কবিতার অনুসরণ)

(১)

সহসা বিবশ হিয়া কেন বা হইল
পাখী রে! তোমার অই সুস্বর পরশে;
নিদ্রালস অবসাদে কেন বা দহিল
কাতর পরাণ মোর আঁখির নিমেষে।
যেন বা ক'রেছি পান ধুতুরা মদকে
অথবা নিঃশেষে বুঝি, পূর্ব্বে কতক্ষণ
অহিফেন বিষ পান ক'রেছি পুলকে
হইয়াছি বৈতরণী সলিলে মগন।
নাহি কিছু ঈর্ষা মনে সুখভাগ্যে তব
রে বিহঙ্গ! লঘুপুচ্ছ দেব অটবীর;
কিন্তু তুমি সদা সুখী সুখে নব নব
জানি আমি মদগর্ব্বে নহ তো অধীর।
অগণিত তরুচ্ছায় শ্যামল বিপিনে
নিদাঘ সঙ্গীত গাও পূর্ণকণ্ঠ স্বনে।

(২)

অমৃত মদিরা এ যে! আহা কোথা ছিল?
ধরণী নিভৃত কক্ষে হইল শীতল;
বুঝিবা সুগন্ধ ফুল রাজ্যের হরিল
বঞ্চিয়া মন্দার পুষ্পে নিল পরিমল।
সুশোভন নৃত্য আর প্রদেশ শ্যামল
(?) গুঞ্জরি সঙ্গীত শুনি উল্লাসে মগন;
পানপাত্র পরিপূর্ণ, উষ্ণ সমতল
মন্দাকিনী সুধাধারা কুঙ্কুম বরণ।
সুশোভিত বারিবিম্ব পান পাত্র মুখে
রক্তিম রঞ্জিত আহা সুবর্ণ বরণে,
আকণ্ঠ পিয়াসা, পান করিয়া পুলকে
ত্যজিয়া সংসার গেহ যাই তব সনে।
তোমারে ভাসায়ে পাখি! হৃদি পারাবারে
মিশে যাই অটবীর বিজন আঁধারে।

(৩)

মিশিব অনন্ত সনে, হব বিস্মরণ—
কভু না জেনেছ যাহা শ্যামপর্ণদলে ;
অবসাদ, নৈরাশ্যের তামস ভীষণ
নিয়ত বেষ্টিত নর যাহে ধরাতলে।
দুঃখে ভরা বসুন্ধরা যেথা রাত্রি দিন
উঠিতেছে মানবের কাতর ক্রন্দন,
অবিরত দীর্ঘশ্বাস রোগে তনু ক্ষীণ
অবিরল হা হুতাশ দুশ্চিন্তা দহন।
জীবন সায়াহ্নে যেথা নাহিক বিরাম
যৌবন মধ্যাহ্নে রবি কালরাহু গ্রাসে ;
প্রণয় যাতনা মাখা, জীবন সংগ্রাম
পলে পলে আক্রমণ চাহে প্রাণনাশে।
সুন্দরী রাখিতে নারে চঞ্চল লোচন
নবীন প্রণয় পুষ্পে কীটের দংশন।

(৪)

কোথা যাবে প্রাণসখা ! যেওনা ফেলিয়া
আমিও অচিরে তব হব সহচর ;
কবিতা অদৃশ্যে তার পক্ষ বিস্তারিয়া
বহিবে আমারে শূন্যে দিগ্ দিগন্তর।
একি হেরি! হাসিতেছে মধুরা যামিনী
ইন্দুরাণী বসেছেন স্বর্ণ সিংহাসনে,
ঘিরিয়াছে চারিদিকে হীরক শোভিনী
অযুত নক্ষত্রবালা সহচরীগণে।
আলোক আসিছে ধীরে স্বরগ হইতে
ক্ষুদ্র বাতায়ন পথে পল্লব নিভৃতে।

(৫)

জন্ম তব মৃত্যু লাগি নহে কদাচন
অমর বিহগ তুমি অমর নিবাসী।
সুধা কণ্ঠে ভরিয়াছ নন্দন কানন
কালিন্দীর কাম্যবনে এবে অভিলাষী।
ব্রজাঙ্গনা চরণের নূপুর নিক্কণ
পূতধারা কলস্বনা যমুনা তটিনী
চকিতা হরিণী, বংশীবট বৃন্দাবন
উঠিবে গগনে সেথা তব জয়ধ্বনি
ব্রজেশ্বর বংশী সনে গাহিবে বিপিনে
আকুলি ব্রজের নারী যমুনা পুলিনে।

শ্রীঅন্নদা প্রসাদ মজুমদার।

জড় ও আত্মার অভেদ-ভাবের পরীক্ষা।

যাঁহারা ইংরেজী দর্শন পাঠ করিয়াছেন—তাঁহারা অবশ্যই বিশপ বার্ক্লির (Bishop Berkley) ভাব-বাদের (idealism) সহিত বিশেষরূপেই পরিচিত। বিশপ বার্ক্লির মতে জড়বস্তুর স্বতন্ত্র কোন সত্তা নাই, তৎসমস্তই মনের ভাব-বিশেষ মাত্র। বার্ক্লির এই মত জড়বাদী পাশ্চাত্য সমাজে একরূপ উপেক্ষিত হইয়াই আসিতেছিল—কিন্তু সম্প্রতি আত্মতত্ত্ববিদ্‌দিগের পরীক্ষাদ্বারা Berkley মতের যে প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে জড়বাদী-দিগের নিকট বার্ক্লিমত যে বিশেষ অনুধাবনার বিষয় হইবে সন্দেহ নাই।

"আমরা নিম্নে রিভিউ অব্ রিভিউজ্ (Review of Reviews) নামক সুবিখ্যাত পত্রিকা হইতে পূর্ব্বের কয়েকটী পরীক্ষার বিবরণ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।"

প্রথমে আমরা ১৯০৬ খৃঃ জানুয়ারি মাসের পত্রিকায় প্রকাশিত বিবরণটী প্রদান করিব। ইহা ঐ বৎসরের জানুয়ারি মাসের অকাল্ট রিভিউতে (Occult Review) প্রকাশিত হয় এবং উহারই মর্ম্ম "জড়ের রহস্য" (The mystery of matter) এই সংখ্যার রিভিউ অব্ রিভিউজেতে উদ্ধৃত হয়। উক্ত পত্রিকার সুযোগ্য সম্পাদক ষ্টেড্ সাহেব এতদুপলক্ষে এইরূপ লিখিয়াছেন—"ইহাতে সম্মোহিতব্যক্তির (Hypnotized) দৃষ্টিতে জড়ের অজড় ভাব (unmateriality of matter) অতি আশ্চর্য্যরূপে প্রতিভাত হইয়াছে।

"কয়েকটী বন্ধু, পরীক্ষার জন্য, তাঁহাদের মধ্যে একজনকে সম্মোহিত করেন—তখন তাহারা দেখিতে পাইলেন যে ঐ ব্যক্তি তাঁহার মস্তকের পশ্চাদ্দিকের

দ্বারা দৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছেন এবং বদ্ধ পুস্তকের মধ্যের চিত্রসকলের বর্ণনা করিতে পারিতেছেন। তৎপর তাঁহারা সম্মোহিত ব্যক্তি যে জড়বস্তুর মধ্যদিয়া দর্শন করিতে পারেন তাহা প্রমাণিত করিবার জন্য পরীক্ষা করিতে লাগিলেন অর্থাৎ কেবলমাত্র মনের ইঙ্গিতেই (suggestion) যে সম্মোহিত ব্যক্তির নিকট স্থুলবস্তু সকল কাচের ন্যায় স্বচ্ছভাব ধারণ করে তাহারই পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা প্রথমতঃ সেই সম্মোহিত ব্যক্তিকে বলিলেন যে তাঁহাদের মধ্যে একজন যিনি পরিচ্ছদ--আল্মারাস্থিত ঘড়ীর সম্মুখে দণ্ডায়মান ছিলেন —তিনি ঐ কুঠরী পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। তৎপর ইঁহারা তাঁহাকে সংজ্ঞাপ্রদান করাইয়া সময় জিজ্ঞাসা করিলেন! তিনি ঘড়ীরদিকে দৃষ্টিপাত করিলেন ইহা তখনও সম্পূর্ণরূপেই তথাকথিত অনুপস্থিত ব্যক্তির দ্বারাই দৃষ্টির অন্তরালবর্ত্তী থাকিলেও তিনি সময় বলিয়াছিলেন। তৎপর তাঁহারা আবার তাঁহাকে সম্মোহিত করিলেন; এবং তাঁহাকে বলিলেন যে কাংস্যদীপাধার সকল আল্মারা হইতে সরাইয়া ফেলা হইয়াছে। তখন তিনি সংজ্ঞালাভ করিয়া অনায়াসেই ভারী দীপাধারের নিম্নে স্থাপিত কাগজের খণ্ডসকল দেখিতে পাইলেন। তিনি ঐ সকল গণিয়া উহাদের সংখ্যা যে সাত তাহা বলিয়া দিলেন। যাঁহারা তথায় উপস্থিত ছিলেন তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন যে উহাদের সংখ্যা আট হইবে কিন্তু দীপাধার তোলা হইলে সাতটি কাগজ খণ্ডই তথায় দেখিতে পাওয়া গেল।

"ইহাতে জড় যে মনেরই রূপান্তর মাত্র তাহাই নিশ্চয়রূপে প্রমাণ করে। ইঙ্গিতের দ্বারা মনোভাব পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে জড়ও অদৃশ্য হইয়া পড়ে (অর্থাৎ জড়ের জড়ত্ব ঘুচিয়া যায়)। অপর একটী পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে যদিও জড় দৃষ্ট না হউক তাহা স্পর্শেন্দ্রিয়দ্বারা অনুভূত হইতে পারে।"

"পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিকে সম্মোহিত করিয়া বলা হইল যে বিড়ালটি কুঠরী হইতে চলিয়া গিয়াছে। তাঁহারা বিড়ালের শরীরের নিম্নে তাঁহার নিজের চাম্‌চেটী গড়াইয়া দিয়া তাঁহাকে সংজ্ঞাপ্রাপন করাইলেন। চাম্‌চেটীর অভাব তিনি বুঝিতে পারিয়া শীঘ্রই বিড়ালের দেহমধ্যদিয়া ইহাকে দেখিতে পাইলেন; তখন তিনি ইহাকে কুঁড়াইয়া আনিতে গেলেন—কিন্তু কোন কোমল উষ্ণবস্তুর দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হইয়া ইহা ধরিতে পারিতেছেননা বলিয়া কহিলেন। তাঁহারা তখন বিড়ালটীকে তাঁহার হাতে রাখিলেন। কিন্তু তিনি তখন কিছুই দেখিতে পাইলেন না, কেবল কোমল কোন বস্তুই স্পর্শেরদ্বারা অনুভব করিতে লাগিলেন। **সম্ভবতঃ ইঙ্গিতকারীর মনের ইঙ্গিত দর্শন ও স্পর্শনেই** সীমাবদ্ধ ছিল। যেরূপই হউক উক্ত পরীক্ষাসকল কৌতুকজনক ও অনুমানের উদ্বোধক।"

এক্ষণে আমরা রিভিউ অব্ রিভিউজের ১৯১০ খৃঃ আগষ্ট মাসের বিবরণ উদ্ধৃত করিতেছি।

অফেলিয়া নামক সিদ্ধা রমণী প্রতিরূপ-দেহ সৃষ্টি করিয়া যখন স্বয়ং প্রকোষ্ঠের ভিতরে থাকিয়া প্রতিরূপ-দেহ বাহিরে অবস্থাপিত-করে তখন দর্শকেরা প্রতিরূপ-দেহকে জলপাত্র, রুমাল, পেন্সিল ও অন্যান্য ব্যবহার্য্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জিনিস প্রভৃতি প্রদান করিলে তৎসমস্ত তৎক্ষণাৎই অফেলিয়ার করতলগত হয়—যেন মধ্যে কোন দেওয়ালের ব্যবধান নাই—ইহাদের উপরের ছাপচিহ্ন ও অপরিবর্ত্তিত অবস্থায়ই থাকে।

উপরে আমরা দেখিয়াছি কেবল বস্তুমাত্রেরই দেওয়ালের মধ্য দিয়া গতায়াত হইতে পারে, কিন্তু জীবিত ব্যক্তিরও যে সিলমোহরকরা তালাচাবিবদ্ধদ্বার গৃহপ্রাচীরের মধ্যদিয়া যাতায়াত হইতে পারে তাহারও বৃত্তান্ত প্রকাশিত হইয়াছে।

অফেলিয়া সম্বন্ধে করেলিজ্ (Corrales) লিখিয়াছেন আমরা দরজা জানালা বন্ধ করিয়া ইহাদের উপর সিল-মোহর করিলাম, আমাদের অধিকারবর্ত্তিনী (control) যাহাতে না যাইতে পারে তৎসম্বন্ধে উপস্থিত সকলে সতর্কতা অবলম্বন করিয়া নিশ্চিন্ত ও প্রস্তুত হইলে পর অফেলিয়া কুঠরী হইতে বাহির হইয়া গিয়া আবার ফিরিয়া আসিলেন যেন তাঁহার প্রতিবন্ধকতার জন্য তথায় কোন প্রাচীরই বিদ্যমান ছিল না। এই কার্য্যটী চিন্তার ন্যায় দ্রুতগতিতে সম্পাদিত হইল। পরীক্ষা-

কারীদের একজন এক, দুই, তিন বলিতে না বলিতেই যুবতী প্রকোষ্ঠ হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। আমরা প্রদীপ ধরিয়া সিলমোহর সকল পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম—সমস্তই পূর্ব্ববৎ যথাস্থানে রহিয়াছে। এই বিস্ময়-জনক ব্যাপার কেবল অফেলিয়া দ্বারাই সঙ্ঘটিত হয় তাহা নহে—কিন্তু তাঁহার ছোট ভাই ভগিনীগণের দ্বারাও সম্পাদিত হইতে পারে। আমি ইহাও বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত যে—যে কেহই ইহা করিতে পারে।

এতদ্ব্যতীত অফেলিয়া যে শূন্যের মধ্যদিয়া গমন করিতে পারে তাহাও এখানে উল্লেখযোগ্য। এই কৌতুহলাবহ বিবরণটী সেনর্ এ ব্রিনিস্ (Senor A Brenes) প্রদান করিয়াছেন ঃ—

একবার অফেলিয়ার পিতার সহিত তাঁহার সহরে যাওয়ার কথা হয়। কিন্তু অফেলিয়া তখনও যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হইতে না পারায় তাঁহার পিতা একাই রওয়ানা হইলেন, এবং ধীরে ধীরে চলিতে লাগিলেন যেন অফেলিয়া পশ্চাতে আসিয়া তাঁহাকে ধরিতে পারে। তিনি, ডিলা ফেব্রিকা (dela Fabrica) নামক চৌমাথায় উপনীত হইয়াছেন এমন সময় তথায় হঠাৎ একটী গভীর নিঃশ্বাস-শব্দ শুনিতে পাইলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার কন্যা অফেলিয়াকে মৃত্তিকা গর্ভ হইতে উত্থিত হইতে দেখিতে পাইলেন। এই সময় একটী শ্রম-জীবী স্ত্রীলোক ও একটী অল্পবয়স্কা বালিকা ঐ পথে যাইতেছিল তাহারাও এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়া একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিলেন। অফেলিয়া বলেন যে তিনি যখন বাড়ী হইতে রওয়ানা হন তখন তাঁহার পিতা অনেক দূর অগ্রসর হইয়া গিয়াছেন ভাবিয়া তাঁহার সন্নিকটে বাহিত হওয়ার ইচ্ছাটীকে তিনি মনে মনে কল্পিত করিয়া লইলেন। কল্পনামাত্রই তিনি শুনিতে পাইলেন যেন মেরী (Mary) বলিতেছেন "আমি তোমাকে খুসী করিতে যাইতেছি—এক, দুই, তিন গণনা কর।" আমি শেষ কথাটী উচ্চারণ করিবা-মাত্রই আপনাকে উদ্দিষ্ট স্থানে পিতার সম্মুখে দেখিতে পাইলাম। এই স্থান তাহাদের গৃহ হইতে সরল-রেখাক্রমে প্রায় ছয়শত গজ দুরবর্ত্তী।

অফেলিয়ার ভাই ভগিনী-শিশুত্রয়কে কিরূপে তাহারা তালাচাবিবদ্ধ দ্বারের মধ্যদিয়া বাহির হয় ও ভিতরে যায় জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা বলে যে তাহারা প্রথম তাহাদের বাহুর নিম্নে চাপ অনুভব করে তৎপরেই বায়ুতে উত্থাপিত হইয়া যথাদৃষ্ট স্থলে অবস্থাপিত হয় এতদরিক্ত তাহারা আর কিছুই বলিতে পারে না।"

পূর্ব্বোক্ত পরীক্ষা বিবরণ হইতে আমরা জড়কে স্পষ্ট আত্মারই বাহ্য-বিকাশ বলিয়া বুঝিতে পারি। তাহাতেই আমাদের ইচ্ছামাত্রই জড় কখনও সূক্ষ্ম হইতেছে কখনও বা লঘু হইতেছে আমরা দেখিতে পাইলাম। প্রকৃতপক্ষে জড়কে আমরা আত্মারই স্থূলাবস্থা বলিতে পারি এবং আত্মাকে জড়ের সূক্ষ্মাবস্থা বলিতে পারি। মনের একাগ্রতা যতই বর্দ্ধিত হইবে অর্থাৎ ইচ্ছা যতই অন্তর্মুখী হইবে ততই সূক্ষ্মভাব বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে। আর মন যতই বিচ্ছিন্ন হইবে অর্থাৎ ইচ্ছা যতই বহির্মুখী হইবে ততই স্থূলভাব বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে। সুতরাং ইচ্ছাই জড় ও আত্মার মূলশক্তি ও মানদণ্ড। এই জন্যই ইচ্ছার সাধনা দ্বারাই জড় ও আত্মার রহস্য আমাদিগের আয়ত্ত হইতে পারে। অতএব ইচ্ছার অসাধ্য বিশ্বে কিছুই নাই। তাহাতেই থিওসফিষ্টেরা ইচ্ছাশক্তিকে (Will force) সমস্ত আধ্যাত্মিক সম্পদের মূলীভূত বলিয়া সাধনা করিয়া থাকেন। অফেলিয়া পিতার নিকট যাইবার নিমিত্ত এই ইচ্ছাশক্তিরই আরাধনা করিয়া লইয়াছিলেন। হিন্দুগণ যে তাঁহাদের আত্মশক্তিকে ইচ্ছাময়ী বলিয়া থাকে তাহাতেও ইহার পূর্ব্বোক্ত প্রভাবই প্রমাণিত হয়। হিন্দুদিগের যোগ এই ইচ্ছাশক্তিরই উপাসনা। হিন্দুগণ যোগে যে সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন পাশ্চাত্যদিগের সিদ্ধি তাহার নিম্নস্তরে মাত্র উঠিতে পারিয়াছে। হিন্দুযোগে আমরা যোগসিদ্ধির অষ্টৈশ্বর্য্যের যে উল্লেখ দেখিতে পাই তাহার সহিত পাশ্চাত্য প্রাগুক্ত সিদ্ধির তুলনা করিলেই উভয়ের প্রভেদ আমরা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইব। হিন্দুযোগের অষ্টৈশ্বর্য্য এই-"অণিমা লঘিমা প্রাপ্তিঃ প্রাকাম্যং মহিমাতথা। ঈশিতা বশিতা-চৈব তথাকামাবসায়িতা।" (১) অণিমা (২) লঘিমা

(৩) প্রাপ্তি (৪) প্রাকাম্য (৫) মহিমা (৬) ঈশিত্ব (৭) বশিত্ব (৮) কামাবসায়িতা।

অমরকোষ অভিধান টীকায় ইহাদের এইরূপ ব্যাখ্যা পাওয়া যায় (১) "যৎপ্রভাবাৎ দেবাঃ সিদ্ধাশ্চ সূক্ষ্মীভূয় সর্ব্বত্র বিচরন্তি কৈশ্চদপি নলক্ষ্যন্তে।" যাহার প্রভাবে দেব ও সিদ্ধ পুরুষগণ সূক্ষ্মরূপে অপরের অলক্ষিত থাকিয়া বিচরণ করেন;—তাহাই "অণিমা"।

(২) লঘোর্ভাবঃ লঘিমা—লঘুভাবই "লঘিমা" (অর্থাৎ যাহাতে ইচ্ছামত লঘু হওয়া যায়)।

(৩) প্রাপ্তিরঙ্গুল্যগ্রেণ চন্দ্রাদেঃ—অঙ্গুলির অগ্রভাগের দ্বারা চন্দ্রাদিকে ধরিতে পারাই "প্রাপ্তি"।

(৪) প্রকামস্তভাবঃ ইচ্ছানভিঘাতঃ—প্রকৃষ্টকামনার ভাব অর্থাৎ যাহাতে ইচ্ছার ব্যাঘাত না হয় তাহাই "প্রাকাম্য"।

(৫) মহতো ভাবঃ (মহিমা)—যেন ব্রহ্মাণ্ডেঽপি নমাতি। যাহাতে ব্রহ্মাণ্ডেও স্থান না হয় (অর্থাৎব্রহ্মাণ্ড হইতেও অধিক বিস্তারিত হইতে পারা যায়) তাহাই "মহিমা।"

(৬) ঈশোঽস্যাস্তি ঈশিনোভাবঃ যেন স্থাবরা অপ্যাজ্ঞাকারিণঃ—যাহাতে স্থাবর সকলও আজ্ঞাবহন করে তাহাই "ঈশিত্ব"।

(৭) বশোঽস্যাস্তি বশিনোভাবো বশিতা যয়াভূভাব প্যুন্মজ্জন নিমজ্জনে। যাহাতে ভূমিতে ও নিমগ্ন হইতে পারা যায় এবং তাহা হইতে উন্মজ্জিত অর্থাৎ উদ্গত হইতে পারা যায়; তাহাই "বশিত্ব"।

(৮) কামাবসায়িনোভাবঃ সত্যসঙ্কল্পতা—যাহাতে সঙ্কল্পের সফলতা হয় তাহাই "কামাবসায়িতা"।

এখানে বলাবাহুল্য যে পাশ্চাত্য সিদ্ধি হিন্দুযোগের দুই তিনটী ঐশ্বর্য্যেরই মাত্র সন্ধান পাইয়াছে। অফেলিয়া যে প্রাচীর ভেদ করিয়া অন্তঃ ও বহিঃ প্রবেশ করিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার অণিমা গুণেরই পরিচয় আমরা পাইতেছি; তাঁহার পিতার নিকট শূন্যদিয়া গমনে আমরা লঘিমাগুণের পরিচয় পাইতেছি এবং সম্মোহনকারীদিগের ইঙ্গিতমত দর্শন ও স্পর্শনের যে বিবরণ আমরা পাইয়াছি তাহা "ঈশিত্বে" প্রভাব বলিয়াই আমরা মনে করিতে পারি।

সুতরাং আমরা বুঝিতে পারিয়াছি জড় ও আত্মার অভেদের যে পরীক্ষায় আজ পাশ্চাত্য সমাজে হইতেছে সেই পরীক্ষায় হিন্দুদিগের মধ্যে বহুপূর্ব্বেই অধিক কৃতকার্য্যতার সহিতই সমাধা হইয়াছিল। এই পরীক্ষার শেষফল রূপেই হিন্দু অদ্বৈততত্ত্ব বা আত্মতত্ত্বের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন। হিন্দু বুঝিয়াছিলেন জগৎ বা জড় সত্যবস্তু নহে—ইহা আত্মার ইচ্ছাশক্তিরই বিক্ষেপমাত্র। ব্রহ্ম বা আত্মাই জগতের প্রকৃত সত্যবস্তু। তাই হিন্দুর দর্শন বলিতেছে "ব্রহ্মসত্যং জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ।" ব্রহ্মই সত্য, জগৎ মিথ্যা মাত্র—জীব (আত্মা) ব্রহ্ম বই আর কিছুই নহে।

শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

রমেন্দ্রনারায়ণ অতিথিশালা।

১২ই ডিসেম্বর ১৯১১।

(১)

এসহে পথিক—পান্থ!
কে আছ কোথায়, ক্ষুধা পিপাসায়
আকুল অধীর ক্লান্ত!
পথশ্রমে ক্ষীণ, আশ্রয় বিহীন,
যে হও সে হও ধনী কিম্বা দীন,
বণিক ভিখারী গৃহী উদাসীন,
এস গো যে জন শ্রান্ত,
ক্ষুধা পিপাসায় ক্লান্ত!

(২)

এসহে পথিক—পান্থ।
রমেন্দ্র করিছে আদরে আহ্বান,
এস এস হিন্দু এস মুসলমান,
এস বৌদ্ধ জৈন এস খিরিষ্টান,
ভেদ বুদ্ধি হেথা নাহিক ভ্রান্ত,

সকলে সমান আদর স্নেহ,
প্রীতি মমতায় পূর্ণ এ গেহ,
বিমুখ হইয়ে ফিরেনা কেহ,
ক্ষুধিত কাতর ক্লান্ত,
এসহে পথিক—পান্থ!

(৩)

এসহে অতিথি পান্থ!
হেথা অন্নজল স্নেহ সুশীতল
অবসন্ন দেহে দিবে নব বল,
যতনে সেবিবে সেবক মণ্ডল
আরামে হইবে শান্ত,
যে বাসনা যার পাইবে আহার,
করুণার হেথা অবারিত দ্বার,
সময়ের কোন নাহিক বিচার,
কিবা নিশি দিবা কিবা দিনান্ত—!
এসহে পথিক—পান্থ!

(৪)

এসহে অতিথি—পান্থ!
রমেন্দ্রের চির পুণ্য পূত দানে,
কত দীন দুঃখী বাঁচিয়াছে প্রাণে,
সম দৃষ্টি ছিল পাপী পুণ্যবানে,
সদা, সদয় নয়ন প্রান্ত,
সেত কভু কারে ভাবে নাই পর,
সে ছিল মমতা দয়ার সাগর,
পথের পথিক তারেও সে ঠিক্
আপনার বলে জানৃত!
ত্রিদিব হইতে কাঁদে তার প্রাণ,—
অই শুন তার আকুল আহ্বান,
এই অট্টালিকা তারি দয়া-দান,
তোমাদের তরে পান্থ,
এখানে হইবে স্নেহে সুশীতল,
ক্ষুধা পিপাসায় পাবে অন্ন জল
শয্যা উপাধান পাইবে সকল
ক্ষুধিত কাতর ক্লান্ত,
এসহে পথিক—পান্থ!

(৫)

এসগো অতিথি—পান্থ!
যে জন এখানে আসিবে যখন,
পাবে অন্নজল আদর তখন,
দাতার এমনি পুণ্য আয়োজন
রহিয়াছে অবিশ্রান্ত,—
এদেশে আসিয়া ওগো পরবাসী,
থেকনা থেকনা কেহ উপবাসী
লহ অন্নজল কৃপা করে আসি
ক্ষুধিত তৃষিত ক্লান্ত,
ওগো বিদেশী-পথিক-পান্থ!

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস

মার্জ্জনা।

(১)

রতনপুর ক্ষুদ্র গ্রাম। ক্ষুদ্র অথচ পরিচ্ছন্ন একখানা কুটীরের দাওয়ায় কুশাসনে বসিয়া রামরতন ভট্টাচার্য্য একখানা জীর্ণপ্রান্ত কৃত্তিবাসী রামায়ণ পড়িতেছেন। ব্রাহ্মণ বৃদ্ধ, শুভ্রকেশ, সৌম্যমূর্ত্তি, শ্মশ্রুগুম্ফমুণ্ডিত বদন, এবং ঈষৎ স্থূলকায়। উন্নত ললাট এবং প্রশস্ত বক্ষঃস্থল যৌবনে শারীরিক বলের সাক্ষীস্বরূপ বর্ত্তমান। ভট্টাচার্য্য মহাশয় গ্রামের সকলেরই পূজনীয়; গ্রামবাসী ইতর ভদ্র সকলেরই আপদে বিপদে এই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ সর্ব্বাগ্রে সাহায্য করিতে উপস্থিত। প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া নিত্যকর্ম্মাদি সমাধা করিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় গ্রামের সকলের বাড়ীতে যাইয়া যথাসাধ্য সকলের অভাব মোচন করিতে যত্নবান হইতেন। এই উদারচেতা, সন্তুষ্টচিত্ত, সরলপ্রকৃতি ব্রাহ্মণ বাস্তবিকই গ্রামের শীর্ষ-স্থানীয় ছিলেন।

ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের করুণ হৃদয় যখন বনবাস সময়ে সীতার সকরুণ বিলাপ কাহিনীর সহিত একতালে মিশিয়া তন্ময় হইয়া গিয়াছে, তখন হঠাৎ গ্রামের হারাণ মণ্ডলের আগমনে তাঁহার পাঠে বাধা জন্মিল। অনিচ্ছায় রামায়ণ

খানি বন্ধ করিয়া তিনি প্রসন্ন বদনে হারাণের দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

'কি হারাণ, কি মনে করে? এস,—বোসো।' বৃদ্ধ মণ্ডল ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পদধূলি লইয়া দাওয়ার একপার্শ্বে একখানা পিঁড়ার উপর উপবেশন করিল। পার্শ্বস্থ কলিকাতে তামাক সাজিতে সাজিতে হারাণ আরম্ভ করিল,—

'দাদাঠাকুর, এতদিন পরে বাপের ভিটা ছাড়তে হোলো। সে দিন নবীন সরকার লোকজন নিয়ে গিয়ে জোর করে আমার বাড়ীর বড় আমগাছটা কেটে নিয়ে গেল; আজ আবার আমার বড় ছেলে মানিককে পাইক পাঠিয়ে ধরে নিয়ে গেছে। যাবার সময় তারা শাসিয়ে গেল, যে, সহজে গ্রাম না ছাড়লে এক মাসের মধ্যে উদ্‌বাস্ত করবে। সাতপুরুষ এ গ্রামে বাস করে গেল, এখন এ বুড়ো বয়সে ছেলেপুলে নিয়ে কি করি বল ত, দাদাঠাকুর। বড় বিপদে পড়েই তোমার কাছে পরামর্শের জন্যে এসেছি।'

নবীন সরকার রূপনগরের বিখ্যাত জমীদার চৌধুরী বাবুদের নায়েব। লোকটী ক্ষুদ্রকায়, অত্যন্ত ধূর্ত্ত, কুট-বুদ্ধিশালী, অসচ্চরিত্র, এবং চণ্ডালাপেক্ষাও নিষ্ঠুর প্রকৃতি।

হারাণের কথা শুনিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় বিরলকেশ মস্তকে হাত বুলাইতে বুলাইতে, যেন কথাটা ভাল করিয়া তলাইয়া বুঝিতে লাগিলেন। কৃত্তিবাসের সুমধুর পয়ার ছন্দের ঝঙ্কার তখনও সরল ব্রাহ্মণের হৃদয় তন্ত্রীতে বাজিতেছিল, এবং স্বামীবিয়োগবিধুরা বনবাসিনী সীতার বিশ্বদ্রাবী করুণ বিলাপ কাহিনী তখনও তাহার পরদুঃখকাতর হৃদয় খানিকে থাকিয়া থাকিয়া যেন মথিত করিতেছিল। অমর কবির বীণাঝঙ্কারের পর সহসা ব্রাহ্মণের হৃদয়ে সংসারের কুটনীতি প্রবেশলাভ করিতে পারিল না। ভট্টাচার্য্য মহাশয় হারাণকে বলিলেন—

'তা নবীনকে একটু বুঝিয়ে বল্‌লেই সব গোল চুকে যাবে। আহা, মানিককে নিয়ে গিয়ে কোনরূপ নির্য্যাতন করেনি ত? যাই আমি এখনই নবীন সরকারের বাড়ী। তুমি বাড়ী যাও হারাণ,—কিছু চিন্তা কোরো না। আমি বলে কয়ে যা হয় একটা নিষ্পত্তি করে দেবো। আহা, মানিকের মা বুঝি বড় কাতর হয়েছে? যাও হারাণ, তুমি বাড়ী যাও।'—বলিয়া রামরতন ভট্টাচার্য্য স্কন্ধে একখানা চাদর ফেলিয়া, পায়ে অর্দ্ধছিন্ন চটিজুতা জোড়াটি দিয়া, ছাতা হাতে, নবীন সরকারের বাড়ী যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন।

হারাণের বার্দ্ধক্য রেখাঙ্কিত চিন্তাক্লিষ্ট মুখখানা কিন্তু ইহাতে একটুও শান্ত হইল না। সে গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল,—

'না, দাদাঠাকুর, নবীন সরকার অত সোজা লোক নয়। আগে ভেতরকার কথাটা শোন, তাহলেই সব ব্যাপারটা ভাল বুঝতে পারবে।'—বলিয়া হারাণ একটু কাশিয়া, যেন একটু কম্পিতকণ্ঠে আরম্ভ করিল,— 'তুমি ত জানই, দাদাঠাকুর, আমার ছোট মেয়ে কামিনী আজ দু বছর হল বিধবা হয়ে আমার বাড়ীতেই আছে। সেই অবধি মেয়েটা যেন একেবারে মরে আছে; দিনান্তে কত করে তাকে চারটী ভাত মুখে দেওয়ানো যায় না; বাছা আমার সেই অবধি কারুসঙ্গে মুখ ফুটে একটী কথাও কয় না।' বৃদ্ধ হারাণ বস্ত্রাঞ্চলে একবার চক্ষু মুছিল। 'কতকদিন হল, কামিনী নায়েবের বাড়ীর কাছে সরকারী পুকুরে জল আন্‌তে যায়। ঐ নবীন সরকারের সেদিন আমার মেয়ের উপর কুদৃষ্টি পড়ে। তারপর নাকি কাকে দিয়ে কি বলেও পাঠিয়েছিল। কামিনীর মা জান্‌তে পেরে, খ্যাংড়াপেটা করে তাকে বিদেয় করেছে। সে দিন থেকে সতীলক্ষ্মী মা আমার কেঁদে কেঁদে আহার নিদ্রা ত্যাগ করেছে। দাদাঠাকুর, তুমি আমার মায়ের পেটের ভাইয়ের চেয়েও আপন,—তোমাকে আমার কিছুই গোপন করবার নাই। বিফল মনোরথ হয়ে, সেই আক্রোশে নবীন সরকার আমার বিরুদ্ধে নানারূপ চক্রান্ত কচ্ছে। তুমি গিয়ে বল্‌লেই অম্‌নি সে খুসী হয়ে সব গোল মিটিয়ে দেবে, তা মনেও ঠাঁই দিও না, দাদাঠাকুর। সব কথা বল্লুম,—এখন আমার যা হয় একটা উপায় কর।' একদমে কথাগুলি বলিয়া যেন বৃদ্ধ একটু আরাম বোধ করিল। মনের ভারটা একটু লঘু হইলে, হারাণ কলিকাতে

ফুঁ দিতে দিতে উহা ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের হাতে দিবার জন্য তাঁহার দিকে হস্ত প্রসারণ করিল।

'তুমি খাও হারাণ,—আমি এখন খাবনা'।—বলিয়া, ক্রোধে ও ঘৃণায় আরক্তবদন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ পুনর্ব্বার কুশাসনে উপবেশন করিলেন। ছাতাগাঁছা সবলে মুষ্টি বদ্ধ করিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় যেন নিজমনে বলিতে লাগিলেন,—

'বটে,—এতদূর! ঈশ্বর এত পাপ কখনও সহ্য কর্‌বেন না! পাপিষ্ঠকে এর শাস্তি ভাল করেই ভোগ কর্‌তে হবে।' পরে, হারাণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—'দেখ, হারাণ, এ গ্রামে থেকে নবীন সরকারের সঙ্গে বিবাদ করা সহজ হবে না। তুমি এক কাজ কর। আমি শুনেছি, আমাদের জমীদার সন্তোষবাবু অতি সচ্চরিত্র হৃদয়বান্ যুবক। তুমি তাঁর সঙ্গে গিয়ে দেখা করে সব কথা খুলে বল্‌বে। তিনি অবশ্যই এর প্রতিবিধান করবেন। কালই ভোরে তুমি রূপনগর চলে যাও। কিন্তু, কথাটা খুব গোপন রেখো। বাড়ীতেও কাউকে বোলো না। নবীন সরকার জান্‌তে পারলে অনর্থ ঘটাবে। আর, আমি এখনই যাচ্ছি সে বেটার কাছে। তাকে গুটী দুচার কথা শুনিয়ে দিয়ে আসি। কিছু না বলে, এ অত্যাচার সহ্য করতে রামরতন ভট্টাচার্য্য পারবে না'।—বলিয়া, ছাতাটী আরও দৃঢ় মুষ্টিতে ধরিয়া, ব্রাহ্মণ উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

'আমিও তাই ভেবেই তোমার কাছে এসেছিলেম, দাদাঠাকুর। যা হোক, তুমিও যখন বল্‌ছ, তখন আমার মনে আর কোন গোল নাই। আমি কালই ভোরে জমীদার বাড়ী যাব'।—বলিয়া, হারাণ উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং আভূমি প্রণত হইয়া ব্রাহ্মণের পদধূলি মস্তকে গ্রহণ করিয়া বিদায় গ্রহণ করিল।

ভট্টাচার্য্য মহাশয়ও কিঞ্চিৎ পরেই নবীন সরকারের বাড়ীর দিকে চলিলেন।

(২)

বৃহৎ টিনের আটচালায় বসিয়া ক্ষুদ্রকায়, কৃষ্ণবর্ণ নবীন সরকার আলবোলা টানিতে টানিতে, তাকিয়া ঠেস দিয়া বসিয়া, গ্রামস্থ প্রজাদের বিবাদ নিষ্পত্তি করিতেছেন; কোন প্রজার বা দেনা পাওনা সম্বন্ধে আপত্তি শুনিতেছেন; কোন দরিদ্র প্রজার নিকট হইতে বা সহজে খাজানা আদায় করিতে না পারিয়া, তাহার করুণ আর্ত্তনাদের প্রতি লেশমাত্র মনোযোগ না দিয়া তাহাকে উপযুক্ত শাস্তি দিবার জন্য নিকটস্থ কৃতান্ত সহচরতুল্য বাগ্‌দী পাইকের হস্তে সমর্পণ করিতেছেন। সুগন্ধি তাম্রকূটের কুণ্ডলায়িত ধূমরাশির মধ্যে বসিয়া সরকার মহাশয় যেন 'দ্বিতীয়-কৃতান্তমিব' শোভা পাইতেছেন; এক একবার হুঙ্কার করিয়া দরিদ্র প্রজাদিগকে কম্পিত করিয়া, নিজের অখণ্ড প্রতাপ চারিদিকে ঘোষণা করিতেছেন; মধ্যে ২ পার্শ্বোপবিষ্ট শীর্ণকায় মসীজীবী গোমস্তাদ্বয়ের প্রতি খাজনা আদায় ইত্যাদি সম্বন্ধে আদেশ প্রচার করিতেছেন।

এমন সময় ছাতা মাথায় ভট্টাচার্য্য মহাশয় কাচারী বাটীর নিকটে উপস্থিত হইলেন। দূর হইতে তাহাকে দেখিয়াই নবীন সরকার তাকিয়া হইতে ঈষদুত্থিত হইয়া—'আসুন ভট্টাচার্য্য মহাশয়! অনেক দিন এ বাড়ীতে আপনার পদধূলি পড়ে নি।'—বলিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন। ছাতা বদ্ধ করিয়া ব্রাহ্মণ ঘরে প্রবেশ করিলেন, এবং নবীন সরকার উঠিয়া পদধূলি গ্রহণ করিতে উদ্যত হইতেই,—'না, থাক্,'—বলিয়া একটু সরিয়া দাঁড়াইলেন। সরকার মহাশয় ভট্টাচার্য্যের নিকট হইতে এই অপ্রত্যাশিত ব্যবহারে যেন একটু আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া, উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিলেন।

না বসিয়াই, ভট্টাচার্য্য মহাশয় ঘৃণামিশ্রিত স্বরে বলিলেন, —'নবীন, গৃহস্থের সর্ব্বনাশ করিলে, ঈশ্বর কি তোমায় ভাল করিবেন? ঘটনা ক্রমে তুমি অর্থবান ও ক্ষমতাবান হইয়াছ,—তাই বলিয়াই কি তুমি দরিদ্র প্রজার সর্ব্বনাশ করিবে?

এই অপ্রত্যাশিত তিরস্কারে নবীন সরকার যেন একটু থতমত খাইয়া গেল। তাহাকে কথা কহিবার অবসর না দিয়া, ভট্টাচার্য্য মহাশয় পুনরায় তীব্রতর স্বরে আরম্ভ করিলেন,—

'হারাণ মণ্ডল গ্রামের একজন মাতব্বর প্রজা,—অতি-নিরীহ ভালমানুষ, কখনও কাহারও অনিষ্ট করে না।

তুমি তাহার সর্ব্বনাশ সাধনে উদ্যত হইয়াছ। আমি সব শুনিয়াছি। এ পাপ ভগবান কখনও সহ্য করিবেন না। নিজের পাপে নিজে মরিবে। পাপে ত্রিভুবনজয়ী রাবণেরও ক্ষয় হইয়াছিল। তুমি ভাবিয়াছ, তুমি সে নিয়মের বাধ্য নও। নবীন, এখনও সাবধান হও। প্রবৃত্তির দাস হইয়া কেন বৃথা পাপে লিপ্ত হও? ব্রাহ্মণের বাক্য এখন যদি হেয় জ্ঞান কর, তবে এর সমুচিত ফল হাতে হাতেই পাইবে। আমি বৃদ্ধ হইয়াছি! কদিনই বা বাঁচিব? তোমাকে স্পষ্ট কথা বলিতে আমার ভয় কি!'—বলিতে বলিতে ক্রোধকম্পিত বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ সশব্দে কাচারী ঘর হইতে বাহির হইয়া গৃহাভিমুখে চলিয়া গেলেন।

এতগুলি প্রজা ও অধীনস্থ কর্ম্মচারীগণের সম্মুখে এইরূপে অপদস্থ হইয়া নবীন সরকার ক্রোধে ও ক্ষোভে পদদলিত ফণীর ন্যায় গর্জ্জন করিয়া মনে মনে ব্রাহ্মণের মুণ্ডপাত করিতে লাগিল, এবং ইহার সমুচিত শিক্ষা প্রদানের জন্য কৃতসংকল্প হইল; কিন্তু কূটবুদ্ধি নায়েব প্রকাশ্যে কিছুই ব্যক্ত করিল না। সেদিন আর কাচারী হইল না। সকলেই পরোপকারী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বিপদ আশঙ্কা করিয়া গৃহে ফিরিল।

* * * * * *

ইহার কিছুদিন পরে, হঠাৎ একদিন রতনপুরে একজন কনেষ্টবল ও চারিজন গ্রাম্য চৌকীদার সহ দারোগা বাবুর আবির্ভাব হইল। ভয়চকিত গ্রামবাসী নিজ নিজ গৃহে বসিয়া প্রমাদ গণিল। চৌকীদার রহিম সেখ রামরতন ভট্টাচার্য্যের বাটীর দ্বারে দাঁড়াইয়া—'ভট্টাচার্য্য মশায় বাড়ীতে আছেন?'—বলিয়া হাঁক দিতেই, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিলেন।

'আপনারই নাম রামরতন ভট্টাচার্য্য?'—বলিয়া, দারোগা বাবু বাটীর ভিতরে প্রবেশ করিলেন।

'হাঁ মহাশয়, আমাকে কিছু প্রয়োজন আছে?'

'আপনার বিরুদ্ধে চোরাইমাল লুকাইয়া রাখিবার অভিযোগ উপস্থিত আছে। সরকারী কার্য্যানুরোধে আমাদিগকে আপনার বাটী অনুসন্ধান করিতে হইবে। আপনি যথাসম্ভব শীঘ্র বাটীর স্ত্রীলোকদিগকে স্থানান্তরিত করুন।'

অপমানে ও ক্ষোভে নির্ভীক হৃদয় ব্রাহ্মণের মুখমণ্ডল আরক্তিম হইয়া উঠিল। ব্রাহ্মণের অদৃষ্টে এরূপ অপমান এই নূতন। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কিছুই বুঝিতে বাকী রহিল না। তিনি দারোগা বাবুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—

'আসুন, আপনি অতিথি। যতক্ষণ স্ত্রীলোকগণ স্থানান্তরিত না হন, ততক্ষণ আপনি বসুন্।'—বলিয়া আমাদের পূর্ব্ব—পরিচিত গৃহের দাওয়ায় দারোগা বাবুর জন্য একখানা বেতের মোড়া, এবং কনেষ্টবল ও চৌকীদারগণের জন্য একখানা চাটাই স্বহস্তে পাতিয়া দিলেন, এবং তাহাদের তামাক খাইবার বন্দোবস্তাদি করিয়া দিলেন।

এই সৌম্যমূর্ত্তি, অতিথিপরায়ণ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে দেখিয়া, দারোগা বাবুর মনে, তাহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সম্বন্ধে ঘোর সন্দেহ জন্মিয়া গেল। তিনি পুলিশের লোক—সহজেই সমস্ত অবস্থা বুঝিতে পারিলেন। ব্রাহ্মণের নির্দ্দোষিতা সম্বন্ধে তাহার মনে দৃঢ় প্রতীতি জন্মিল। কিন্তু তিনি সরকারী ভৃত্য, আইন ছাড়িয়া চলিবার তাহার সাধ্য নাই; সুতরাং ব্রাহ্মণের গৃহতল্লাস তাঁহাকে করিতে হইবেই।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় যখন স্ত্রীলোকগণকে স্থানান্তরিত করিয়া বাহিরে আসিলেন, তখন দারোগা বাবু একান্তে লইয়া গিয়া, তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া সমস্ত ব্যাপারটা খুলিয়া বলিতে বলিলেন। হারাণের কন্যা-সম্বন্ধীয় ব্যাপারটী বাদ দিয়া, ব্রাহ্মণ আর সমস্তই দারোগা বাবুর নিকট বিবৃত করিলেন। দারোগা বাবু তাঁহাকে পুনরায় আশ্বাস দিয়া বলিলেন,—

'আপনার কোন ভয় নাই। আমি আপনার জন্য যথাসাধ্য করিব।'

আইনের নিয়মানুসারে সমস্ত ঘর অনুসন্ধান আরম্ভ হইল। দারোগা বাবু একাকী প্রত্যেক ঘরে গিয়া দেখিলেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের শয্যার নীচ হইতে হঠাৎ কতকগুলি স্বর্ণালঙ্কার বাহির হইল। দারোগা বাবু ব্রাহ্মণের দিকে চাহিলেন। বৃদ্ধের বিস্ময়-বিস্ফারিত নয়নের দিকে চাহিয়া, তাঁহার নির্দ্দোষিতা সম্বন্ধে তিনি

অধিকতর বিশ্বাস করিলেন। যাইবার সময় দারোগা বাবু চিন্তাক্লিষ্ট ব্রাহ্মণকে আর একবার আশ্বাস দিয়া গেলেন।

গ্রামে সকল সংবাদ রাষ্ট্র হইল। সেদিন বৈকাল ঘটা করিয়া তাঁহার পদধূলি লইয়া আসিল। অত্যাচারী নায়েবের ভয়ে, গ্রামের কেহ মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে পারিল না।

ক্রমশঃ—

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ বসু।

পাল রাজগণ।

(শুদ্ধিপত্র)

পত্রাঙ্ক।	পংক্তি।	অশুদ্ধ।	শুদ্ধ।
২৬৩	৩নং নোট ৮ পংক্তি	1909	1910
২৬৪	৩ পংক্তি	পিত্তললিপি	১। মোজাফরপুর জেলার অন্তর্গত ইমাদপুর গ্রামে, দুইখানা পিত্তল নির্ম্মিত দেবতার কাঠাম প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। তাহাতে "শ্রীমন মহীপালের ৪৮ অব্দে" লিখিত আছে।
২৬৬	মন্তব্য ৮ পংক্তি	রামপাল	রাসপাল। (বোধ হয় যুবরাজ রাজ্যপাল)।
২৬৭	৪নং নোট ৩ পংক্তি	লবাসন	লবসেন

১ম খণ্ড ঢাকা, মাঘ, ১৩১৮ সাল ১০ম, সংখ্যা।

বাঙ্গলা ভাষা। *

প্রত্যেক দেশের লোক উত্তরাধিকার সূত্রে স্বদেশের প্রাকৃতিক অবস্থা, সমাজগত আচার ব্যবহার প্রভৃতি যে সকল বস্তু লাভ করে স্বদেশের ভাষা তাহার অন্যতম। সুতরাং নিজ নিজ দেশের ভাষার প্রতি অনুরাগ—ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধন ও বিশুদ্ধতা সংরক্ষণ, ভাষার যে যে অঙ্গ দুর্ব্বল তাহা সবল করিবার চেষ্টা করা, যে যে অঙ্গ নাই তাহা পূরণ করিবার চেষ্টা করা, ভাষাকে অপরের আক্রমণ হইতে রক্ষা করা অর্থাৎ শিক্ষিত লোক অসাবধানে বা ইচ্ছাপূর্ব্বক যখন অশুদ্ধ ভাষা ব্যবহার করেন যাহা সাধারণে অনুকরণ করিতে পারে তখন তাহার প্রতিবাদ করা প্রত্যেক শিক্ষিত ভদ্রলোকের কর্ত্তব্য। বঙ্গভাষা ও বঙ্গের শিক্ষিত ব্যক্তিরও এই সাধারণ নিয়মের বহির্ভূত হওয়া উচিত নহে। আমি এই প্রবন্ধে বঙ্গভাষার প্রকৃতি ও গঠন প্রণালী, বঙ্গভাষার বর্ণ মালা, বানান ও উচ্চারণ, বঙ্গভাষার লিখন ও কথোপকথন এবং বঙ্গভাষা প্রয়োগের বিশুদ্ধি ও অশুদ্ধি বিষয়ে কিঞ্চিৎ সমালোচনা এবং বঙ্গভাষার উন্নতিকল্পে দুই একটা প্রস্তাব উত্থাপন করিব। আমার অনুরোধ বঙ্গদেশের মস্তিষ্ক স্বরূপ সাহিত্যপরিষৎ ও সাহিত্যসভা এবং সাময়িক পত্রিকা ও সংবাদপত্রের সম্পাদকগণ আমার এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় লইয়া একটু সমালোচনা করেন।

বঙ্গভাষার প্রকৃতি ও গঠনপ্রণালী।

ইংরেজী, সংস্কৃত, হিন্দি প্রভৃতি অপেক্ষা বঙ্গভাষা স্বভাবতঃ কিছু ভারি। অর্থাৎ একই অর্থ প্রকাশ করিতে

---

* বঙ্গদেশের এবং বঙ্গভাষার চলিত নাম ভিন্ন ভিন্ন রূপে লিখিত হইয়া থাকে যথা, বাঙ্গালা, বাঙ্গলা, বাঙ্‌লা, বাংলা এবং বাংগলা। কিন্তু উচ্চারণে কোন গোল নাই—সকলেই "বাঙ্‌লা" বলেন। শব্দটা যে সংস্কৃত বঙ্গ শব্দ হইতে হইয়াছে তাহার সন্দেহ নাই। সুতরাং সেই শব্দের বানান যতদূর রাখা যায় তাহা রাখা উচিত মনে করিয়া এই প্রবন্ধে "বাঙ্গলা" শব্দ ব্যবহৃত হইল।

হইলে বঙ্গভাষায় যতগুলি স্বর বা syllable এর প্রয়োজন হয় অন্য ভাষায় তাহার কম লাগে। একটা ছোট ভাব ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় প্রকাশ করিলেই ইহা উপলব্ধ হইবে।

ইংরেজী whatever you do, do well, হিন্দীতে "জো কুচ্ছ্ করনা অচ্ছী তরেহ্‌সে করনা" বাঙ্গলায় "যাহা কিছু করিবে, ভাল করিয়া করিবে" এই তিনটী বাক্য একই ভাব প্রকাশ করে কিন্তু ইংরেজীতে এই ভাবটী প্রকাশ করিতে আটটী মাত্র স্বর লাগে, হিন্দীতে লাগে এগারটী এবং বাঙ্গলায় লাগে পোনরটী। কলিকাতা হইতে কাহারও বোম্বাই যাইবার সময়ে যদি পাঁচশত টাকা লইয়া যাইতে হয় তাহা হইলে তিনি যেমন গুরুভার টাকার পরিবর্ত্তে মোহর অথবা নোট লইয়া যান তেমনই একই অর্থ প্রকাশ করিতে হইলে অল্প স্বরবিশিষ্ট বাক্য প্রয়োগ করিবার ইচ্ছাই স্বাভাবিক। এই জন্যই যাহারা ইংরেজী জানে না তাহারাও লাইব্রেরি বলে কিন্তু পুস্তকালয় বলে না, ডিস্‌পেন্‌সারি বলে; ঔষধালয় বলে না। কেহ কেহ যে দাওয়াইখানা বলে অথচ ঔষধালয় বলে না তাহা বোধ হয় বিশেষ বিধির অন্তর্গত। অধিক স্বর লাগে বলিয়াই ব্যবসায় বাণিজ্যের বা টেলিগ্রাফের ভাষা বাঙ্গলা হওয়া কঠিন। আমি দেখিয়াছি বাঙ্গলা সাময়িক পত্রিকার সম্পাদকেরাও কোন প্রবন্ধ পাইলে তাহার উপরে ইংরেজীতে হয় approved না হয় not approved লিখিয়া থাকেন। কেননা একেত বাঙ্গলা অক্ষর লিখিতে ইংরেজী অপেক্ষা অধিক সময় ও শ্রম ব্যয়িত হয়, তাহার উপর আবার বাঙ্গালা "মনোনীত" বা "মনোনীত নহে" পুনঃ পুনঃ লিখিতে হইলে ধৈর্য্যচ্যুতি ও ক্লান্তির সম্ভাবনা। বাঙ্গলা ভাষা এইরূপ ভারি হওয়ায় অন্যতম অপরিহার্য্য কারণ এই যে, বাঙ্গলায় ক্রিয়া বিশেষণ পদ প্রস্তুত করিতে হইলে বিশেষণের সহিত, করিয়া, ভাবে, রূপে প্রভৃতি একাধিক স্বরবিশিষ্ট প্রত্যয় যোগ করিতে হয়। ইংরেজীতে বিশেষণে একটী একস্বর প্রত্যয় অর্থাৎ ly যোগ করিলেই ক্রিয়াবিশেষণ হয়। সংস্কৃতে ম্ বা ং যোগ করিলেই হয় অর্থাৎ স্বর মোটেই লাগে না।

কেহ কেহ বলেন যে বাঙ্গালা ভারি হওয়ার একটা কারণ এইযে ইহাতে ক্রিয়াপদের বড় অপ্রচুরতা। করা, যাওয়া, খাওয়া, দেখা প্রভৃতি বহু ক্রিয়াপদ বাঙ্গলার নিজস্ব বটে কিন্তু বহুতর ক্রিয়াপদ সেই সেই ক্রিয়া—জ্ঞাপক সংজ্ঞার সহিত কৃ ও ভূ ধাতুর অথবা করা ও হওয়া ধাতুর ভিন্ন ভিন্নরূপের যোগ হইয়া নিষ্পন্ন হয় সুতরাং তাহা দীর্ঘায়ত হইয়া পড়ে। "He has passed," "He has failed" "It seems" বাঙ্গলায় হয় "তিনি পাস হইয়াছেন" "তিনি ফেল হইয়াছেন", "বোধ হয়।" Investigate. অনুসন্ধান করা বা গবেষণা করা, beat প্রহার করা, kill হত্যাকরা, smell ঘ্রাণ লওয়া, ঘ্রাণ পাওয়া বা আঘ্রাণ করা, ask প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসা করা ইত্যাদি অসংখ্য ক্রিয়াপদের প্রয়োগ দ্বারা বাঙ্গলা দীর্ঘায়ত হয় বটে কিন্তু এরূপ প্রয়োগ সাধু ভাষায় অপরিহার্য্য। অনেক গ্রন্থকার বিশেষতঃ কবিগণ স্বতন্ত্র ক্রিয়া পদের অপ্রচুরতা দেখিয়া অনুসন্ধানিল, প্রহারিল, বধিল, ঘ্রাণিল প্রভৃতি শব্দ সৃষ্টি করিয়াছেন। কবি ও কাব্যের ভাষার কথা স্বতন্ত্র, কিন্তু প্রচলিত সাধু ভাষায় এইরূপ প্রয়োগ সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। নূতন কোন ক্রিয়াপদ প্রস্তুত করিতে হইলে দেখা উচিত যে তাহাতে সকল বিভক্তি ও প্রত্যয় যুক্ত হইতে পারে কিনা; যদি অনুসন্ধানিল, বধিল, ঘ্রাণিল প্রভৃতি পদ হয় তবে তাহাদের মধ্যম পুরুষের অনুজ্ঞায় কিরূপ হইবে? তাহাদের মূল পদ, যেমন হওয়া, দেখা, খাওয়া, করা ইত্যাদি, তাহারই বা রূপ কি হইবে? অনুসন্ধানা, বধা, ঘ্রাণা হইবে কি?

কিন্তু উক্ত হেতু ভিন্ন একটী গুরুতর হেতু আছে যে জন্য অনুসন্ধানিল, ঘ্রাণিল প্রভৃতি পদ ব্যবহৃত হওয়া উচিত নহে। পূর্ব্বকালে বহু বস্তু, বহু কল্পনা, বহু জন্তু বহু ভাষা অতিকায়, জটিল, শ্লথগতি এবং এখনকার লোকের পক্ষে বিভীষণ ছিল। কিন্তু অভিব্যক্তির নিয়মানুসারে সকল বস্তুই অল্পায়তন, লঘুকলেবর ও সুগম হইয়াছে ও হইতেছে। এখন আর ম্যামথ প্রভৃতি অতিকায় জন্তু নাই। দুই একশত বৎসরের মধ্যে হাতীরও লোপ হইবে বলিয়া বোধ হয়। এখন আর

কুড়ি হাত দশ মুণ্ড মনুষ্যের কল্পনাও হয় না। সংস্কৃত, গ্রীক, লাটিন, আরবী প্রভৃতি অনন্ত জ্ঞানের ভাণ্ডার সকলকে দুষ্প্রবেশ্য করিবার জন্যই যেন উহাদের বহির্ভাগ ও অভ্যন্তর বিভক্তি, লিঙ্গভেদ, বচনের বহুত্ব প্রত্যয়ের অনন্তত্ব প্রভৃতি দ্বারা কণ্টকিত। কিন্তু কালের বিবর্ত্তনে এই সকল ভাষার ও কত পরিবর্ত্তন হইয়াছে। গ্রীকে এখন আর দ্বিবচন নাই। বৈদিক সংস্কৃত ও লৌকিক সংস্কৃতে কত প্রভেদ তাহা পণ্ডিতেরা অবগত আছেন। আবার সাহিত্যিক লৌকিক সংস্কৃত অপেক্ষা মহারাষ্ট্র দেশ প্রচলিত কথোপকথনের সংস্কৃত কত সুগম তাহা অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা বিলক্ষণ জানেন। যখন বিভক্তি রূপ কণ্টক ভাষার শরীর হইতে আর টানিয়া বাহির করা যায় না অথচ কর্ম্মশীল লোকের তাড়াতাড়ি মনোভাব ব্যক্ত করিবার প্রয়োজন আসিয়া উপস্থিত হয় অথচ সেই বিভক্তিময় ভাষা আয়ত্ত করিবার অবকাশ থাকে না তখন অপেক্ষাকৃত অল্প বিভক্তিযুক্ত ভাষার জন্ম হয়। এইরূপে ভাষা হইতে বিভক্তির সম্পূর্ণ লোপ হওয়াই ভাষার চরম অভিব্যক্তি বলিয়া বোধ হয়। ইংরেজীতে কয়েকটা মাত্র বিভক্তি আছে কিন্তু শব্দের লিঙ্গভেদ উঠিয়া গিয়াছে *। বাঙ্গলা ও উত্তর ভারতবর্ষে প্রচলিত সংস্কৃত মূলক ভাষা সকল এখনও বিভক্তিবহুল আছে বটে কিন্তু এই সমস্ত বিভক্তির সংখ্যা সংস্কৃত বিভক্তি অপেক্ষা অনেক কম। সংস্কৃতে যে সম্পূর্ণ অযৌক্তিকভাবে শব্দের লিঙ্গ ভেদ আছে বাঙ্গালায় তাহাও উঠিয়া যাইতেছে। সংস্কৃত দার ও কলত্র উভয় শব্দেরই অর্থ স্ত্রী। অথচ প্রথমটা পুংলিঙ্গ, দ্বিতীয়টা ক্লীবলিঙ্গ। ইহার কি কোন বৈজ্ঞানিক যুক্তি আছে? কিন্তু বঙ্গীয় লেখকেরা এখন বরং "শস্য শালিনী বঙ্গদেশ" লিখিবেন তথাপি "সংস্কৃত বড় সুন্দরী ভাষা" লিখিবেন না। এখন আর পাত্র শব্দ ক্লীবলিঙ্গ নহে। এখন পাত্র হইয়াছে পুরুষ এবং নূতন ব্যাকরণদুষ্ট পাত্রী আসন্নবিবাহা কন্যাকে বুঝায়। যদি বিভক্তির লোপ সাধনই অভিব্যক্তির নিয়ম হয় তাহা হইলে অনুসন্ধানিল, গ্রাণিল প্রভৃতি ক্রিয়াপদ সৃষ্টি করিয়া ক্রিয়াপদের রূপের সংখ্যা বাড়াইয়া সেই নিয়মের পরিপন্থী হওয়া উচিত নহে, বরং যথাসাধ্য করা ধাতুর যোগে সমস্ত ক্রিয়াপদ নিষ্পন্ন করাই সমীচীন।

বাঙ্গলা ভাষার আরও কয়েকটা অভাব আছে। ইংরেজী participle adjective এবং সংস্কৃতে শতৃ শানচ্ প্রত্যয় দ্বারা নিষ্পন্ন পদের অনুরূপ পদ বাঙ্গলায় সর্ব্বদা প্রযুক্ত হইতে পারে না। Laughing man, running train, falling body প্রভৃতির ভাল বাঙ্গলা কি হয় তাহা আমি জানি না। ইংরেজীতে যৎশব্দ (relative pronoun) দিয়া যে বড় বড় বিশেষণ বাক্য (adjective sentence) রচিত হয় বাঙ্গলায় তদ্রূপ হয় না। ছোট ছোট বাক্য রচিত হইলেও বিশেষ্যকে পুনরাবৃত্তি করিতে হয়। কিন্তু বাঙ্গলা ভাষা অপেক্ষা বহু সহস্র গুণ অনুশীলিত ফ্রেঞ্চ ভাষাতেও সেইরূপ হয়।

কিছুদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আমার বিশ্বাস ছিল যে বাঙ্গলায় নির্দেশক সংখ্যাবাচক শব্দ (ordinals) হইতে পারে না; 62nd, 53rd, 55th প্রভৃতি শব্দের বাঙ্গলা কি হইতে পারে তাহা আমি ভাবিয়া পাইতাম না। কিন্তু গত সাহিত্য সম্মিলনে ময়মনসিংহে একজন প্রবন্ধ পাঠকের মুখে বাষট্টিতম, তিপ্পান্নতম, পঞ্চান্নতম প্রভৃতি শব্দ শুনিলাম। বাঙ্গলা সংখ্যাবাচক শব্দের সহিত সংস্কৃত প্রত্যয় লাগাইয়া এই সকল সঙ্কর শব্দ প্রস্তুত হইয়াছে। কিন্তু সঙ্কর হইলেও এই সকল শব্দ সুন্দর কার্য্যোপযোগী। কিন্তু ভগ্নাংশ সকল ইংরেজীর মত সংক্ষেপে বাঙ্গলায় ব্যক্ত হইতে পারে কি না তাহা আমি এখনও অবগত নহি।

বাঙ্গলা ভাষায় ইংরাজীর মত হওয়া ধাতুর অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের রূপ অন্য ধাতুর ক্ত প্রত্যয়ান্ত পদের সহিত যুক্ত হইয়া কর্ম্মবাচ্য প্রস্তুত হয়। সংস্কৃতে কি কর্ম্মবাচ্যে কি ভাববাচ্যে প্রত্যেক পদে ভিন্ন রূপ হয়। একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি ঃ—বলির্ববন্ধে, জলধির্মমন্থে, অমৃতং জহ্রে, দৈত্যকুলং বিজিগ্যে, বসুধা উহে ইহার বাঙ্গলা, বলি বদ্ধ হইয়াছিল, সমুদ্র মথিত হইয়াছিল, অমৃত আহৃত হইয়াছিল, দৈত্যকুল পরাজিত হইয়াছিল, বসুধা উদ্ধৃত হইয়াছিল। কেহ কেহ প্রত্যেক ধাতুর সম্পূর্ণ ভিন্ন রূপ হয় না বলিয়া

* ইংরেজী অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ কি ইহা স্বীকার করিবেন? সং সং.

বাঙ্গলার প্রতি অসন্তুষ্ট। কিন্তু আমার বিবেচনায় ইহাতে বাঙ্গলার শক্তি বাড়িয়াছে বই কমে নাই। কিন্তু তাহা হইলেও বাঙ্গলায় কর্ম্মবাচ্য বড় অসম্পূর্ণ কেননা সকল ক্রিয়ার কর্ম্মবাচ্য হইতেই পারে না। দুই একটা উদাহরণ দিতেছি I am told ইহার অনুবাদ বাঙ্গলায় কি হইবে? I am owed three Rupees by you ইহার ও বাঙ্গলা অনুবাদ "তুমি আমার তিন টাকা ধারো ভিন্ন কর্ম্মবাচ্যে হইতে পারে না।

বাঙ্গলায় বাক্যের শেষে ক্রিয়া ব্যবহৃতহয়। ইহাও স্বাভাবিকতার পরিপন্থী। প্রথমে কর্ত্তা, কর্ত্তা হইতে ক্রিয়া উদ্ভূত হইয়া কর্ম্মে পর্য্যবসিত হয়। ইংরেজীভাষা এই স্বাভাবিক পৌর্ব্বাপর্য্যের অনুসরণ করে বলিয়া বাঙ্গলা, হিন্দী ফ্রেঞ্চ প্রভৃতি ভাষা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ভারতবর্ষে এক খাসিয়া ভাষা ভিন্ন অন্য কোন ভাষা এই স্বাভাবিক পৌর্ব্বাপর্য্য অনুকরণ করে কি না জানি না।

উপরে বাঙ্গলা ভাষার মোটামুটি যে কয়েকটা অভাব ত্রুটি ও অসুবিধার কথা বলিলাম কালে তাহার প্রতি-বিধান হইবে কি না বলিতে পারি না। কিন্তু বিকলাঙ্গ স্থূলদেহ ব্যক্তি ও অঙ্গপরিচালনা দ্বারা সুস্থাঙ্গ ও লঘুকলেবর হয়। সুতরাং বাঙ্গলা ভাষা আর কিছুদিন অনুশীলিত হইলে তাহার উন্নতি হইবে বলিয়া আশা করা যায়। আমি যাহা বাঙ্গলা ভাষার জন্মগত রোগ বলিয়া নির্দ্দেশ করিলাম যদি পণ্ডিতেরাও সেই গুলিকে রোগ বলিয়া বিবেচনা করেন তাহা হইলে আরোগ্যও অচিরাৎই হইবে। যাঁহারা কখনও ইংরেজী বা সংস্কৃত হইতে বাঙ্গলায় অনুবাদ করিয়াছেন তাঁহারাই বাঙ্গলা ভাষার অভাব ও দারিদ্র্য উপলব্ধি করিয়াছেন। স্বর্গীয় কৃষ্ণমোহন বন্দোপাধ্যায় ও অন্যান্য পাদ্রীগণ যে সকল পুস্তক বাঙ্গালায় অনুবাদ করিয়াছেন সেই সকল পুস্তকের বাঙ্গলা অত্যুৎ-কৃষ্ট না হইলেও সেই সকল অনুবাদ যে প্রকৃত তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু সেই সকল পুস্তক ব্যতীত ভাষান্তর হইতে যথাযথ অনূদিত পুস্তক বাঙ্গলায় নাই বলিলেই হয়। অনুবাদকেরা প্রায়ই লেখেন যে বঙ্গীয় পাঠকের উপযোগী করিয়া তাঁহারা নিজ নিজ অনুবাদ পরিবর্ত্তন ও পরিবর্জ্জন করিয়াছেন। ইহার আসল কারণ আমার এই বোধ হয় যে তাঁহারা সকল স্থানের অনুবাদ করিতে সমর্থ হন নাই।

বর্ণমালা, বানান ও উচ্চারণ।

বোধ হয় কোন ভাষার বর্ণমালাই সম্পূর্ণ নহে। আরবীতে চ ও গ নাই। চ ও গ এর কার্য্য স ও জ এর দ্বারা সাধিত হয়। সুতরাং সংস্কৃত চতুরঙ্গ স্থানে আরবীতে হয় সৎরঞ্জ। তাহাই ঈষৎ পরিবর্ত্তিত হইয়া দাবা খেলার নাম বাঙ্গলায় সতরঞ্চ খেলা হইয়াছে। ইংরেজীতে ত, থ, দ, ধ নাই। ফ্রেঞ্চ ইটালীয় প্রভৃতি ভাষায় ট, ঠ, ড, ঢ নাই। সুতরাং বাঙ্গলা ভাষার বর্ণমালা যে অসম্পূর্ণ হইবে ইহা বিচিত্র নহে। বাঙ্গলা ও আসামীতে সংস্কৃত অকার নাই। But শব্দে u অক্ষরের যে উচ্চারণ সংস্কৃত অকা-রের ঠিক সেই উচ্চারণ। কিন্তু all শব্দে a অক্ষরের যে উচ্চারণ বাঙ্গলা ও আসামী ভাষায় অকারের ঠিক সেই উচ্চারণ। এই উচ্চারণ সংস্কৃতে নাই। এবং বঙ্গদেশের পশ্চিমে ভারতবর্ষের কোন দেশেই নাই। সুতরাং সংস্কৃত অকারের উচ্চারণ বুঝাইবার জন্য বাঙ্গলায় একটা অক্ষ-রের প্রয়োজন। Bat শব্দের a অক্ষরের উচ্চারণ বাঙ্গলায় আছে কিন্তু সেই উচ্চারণানুরূপ কোন বর্ণ নাই। বাঙ্গলায় আমরা লিখি "এক" কিন্তু তাহার একারের যে রূপ উচ্চারণ করি তাহা জ্ঞাপন করিবার জন্য অনেকে অকা-রের গায়ে য ফলা দিয়া এবং তাহার গায়ে আকার লাগাইয়া এক অদ্ভুত পদার্থ সৃষ্টি করিয়াছেন। যদি কেহ বলেন যে অকারের গায়ের ওটা য ফলা নহে উহা bat শব্দের a র উচ্চারণ দ্যোতক চিহ্ন মাত্র তাহা হইলে আমার বক্তব্য এই যে এই কথাটা ঠিক নহে। কেন না যেখানেই এই a র উচ্চারণ ব্যঞ্জনের সহিত যুক্ত হয় সেখানেই সেই ব্যঞ্জনে য ফলা ও আকার দিয়া লিখিতে হয়। কিন্তু bat এর a র উচ্চারণ এবং য ফলার সহিত আকারের উচ্চারণ কখনই একরূপ নহে। আমরা যেখানেই য ফলা ব্যবহার করি তাহার পূর্ব্বস্বর গুরু হইয়া যায় এবং যে ব্যঞ্জনে য ফলা যুক্ত হয় তাহা দ্বিত্বরূপে উচ্চারিত হয়। ফল কথা এই যে bat এর a একটী অবিমিশ্র স্বর কিন্তু আকার যুক্ত য ফলা স্বর যুক্ত ব্যঞ্জন। সুতরাং একট

অন্যটার প্রতিনিধি হইতে পারে না। আমার বোধ হয় একারেরই কিছু পরিবর্ত্তন করিয়া bat এর a র জ্ঞাপন করা উচিত।

বাঙ্গালায় ই ঈ আছে বটে কিন্তু অনেক সময়েই আমরা ইকারের উচ্চারণ করি না। আমরা দিন কে দীন রূপে উচ্চারণ করি *। দ্রুত ভাবে কোন কাজ করা আমাদের প্রকৃতি নহে। আমার বোধ হয় যখন আমাদের শরীর ও মন পূর্ণ মাত্রায় স্ফূর্ত্তি লাভ করিবে তখন আমরা চট্ করিয়া দিন্ বলিতে পারিব।

উ ঊ সম্বন্ধেও উল্লিখিত মন্তব্য প্রকাশ করা যাইতে পারে। আমরা লিখি "গুড়" কিন্তু উচ্চাচণ করি "গূড়"।

আমরা উচ্চারণে ই বর্ণ উ বর্ণের মাত্রায় প্রভেদ করি না বলিয়া আমাদিগকে সর্ব্বদাই হ্রস্ব ই দীর্ঘ ঈ ইত্যাদি বলিতে হয়। আবার শ্রীহট্টের লোকে ওকারকে উকার রূপ উচ্চারণ করেন গোলোক কে গুলুক বলেন। সুতরাং তাঁহারা ওকার কে বলেন সন্ধ্যক্ষর উ।

আমাদের মধ্যে ই উ এবং কখন কখন অবর্ণের মাত্রার ভেদ নাই বলিয়া বাঙ্গালায় ইন্দ্রবজ্রা, উপজাতি, মালিনী, শিখরিণী, তোটক, তূণক (trochaic) এবং (iambic) ছন্দে কবিতা রচিত হয় নাই। ভারতচন্দ্র, বলদেব পালিত প্রভৃতি কবিগণ সংস্কৃতচ্ছন্দে বাঙ্গালায় কবিতা লিখিয়াছেন বটে কিন্তু তাহা স্বাভাবিক নহে। সুতরাং এখন কোন কবিই ব্যঙ্গচ্ছল ভিন্ন সেরূপ ছন্দে কাব্য লেখেন না।

ঋকারের প্রকৃত উচ্চারণ বাঙ্গালা দেশে নাই—উড়িষ্যায় আছে। কিন্তু তাহা না থাকিলেও, বাঙ্গালা ঋকার হ্রস্ব ই যুক্ত র ফলা হইতে পৃথক্। অনেকেই কিন্তু ইহার ভুল উচ্চারণ করেন। আমি অনেক সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতকেও তাদৃশ, যাদৃশ, জতুগৃহ, সরীসৃপ্ প্রভৃতিকে তাদ্‌রিশ, যাদ্‌রিশ, জতুগ্‌গৃহ, সরীসৃপ উচ্চারণ করিতে শুনিয়াছি। অর্থাৎ তাঁহারা ঋকে ব্যঞ্জন বর্ণ রূপ উচ্চারণ করেন। এইরূপ উচ্চারণ করা যে ভুল তাহা একটী মাত্র দৃষ্টান্তদ্বারা বুঝাইতে চেষ্টা করিব। মনে করুন একটা মালিনীচ্ছন্দের শ্লোকের প্রথম চারিটা অক্ষর জতুগৃহ। মালিনীচ্ছন্দের প্রথম ছয়টা স্বরই হ্রস্ব হওয়া উচিত। যদি কেহ জতুগ্‌গৃহ উচ্চারণ করেন তাহা হইলে দ্বিতীয় স্বরও গুরু হইয়া যাইবে সুতরাং ছন্দোভঙ্গ হইবে।

বাঙ্গালা ভাষায় হ্রস্ব একার নাই—হিন্দীতেও নাই। সংস্কৃত বৈয়াকরণেরা বলেন যে ইকারই হ্রস্ব একার। ইংরেজীতেও বোধ হয় পূর্ব্বে অভিধানিকেরা তাহাই মনে করিতেন। Walker's Dictionary তে College damage প্রভৃতির উচ্চারণ colij, damij রূপে লিখিত হইত। Webstor's Dictionary তে Sunday, Monday প্রভৃতি শব্দের উচ্চারণ Sundy, Mondy বলিয়া লেখা হইত। ইংরেজী ticket বাঙ্গালায় টিকিট হইয়া গিয়াছে। College কে এখনও হিন্দুস্থানীরা কালিজ বলেন। বাঙ্গালায় যে একার হ্রস্বরূপে উচ্চারিত না হয় এমন নহে। "এই" "এস" (আইস) প্রভৃতি শব্দের একার হ্রস্বরূপেই উচ্চারিত হয়। কিন্তু একারের হ্রস্ব ও দীর্ঘ উচ্চারণের প্রভেদ আমার নিকট অতি অকিঞ্চিৎকর বোধ হয়। তথাপি হ্রস্ব একার সূচক একটা চিহ্ন থাকা ভাল।

হ্রস্ব ওকারও বাঙ্গলায় নাই। ব্যাকরণের মতে ওকারের হ্রস্ব উকার। কিন্তু বাঙ্গালায় হ্রস্ব ওকারের উচ্চারণ বহু স্থানে হয়। খাওয়া, যাওয়া,প্রভৃতি শব্দের ও হ্রস্ব। এই সকল শব্দের শেষ অক্ষর য়া না হইয়া আ হওয়া উচিত। কেন যে য়া লেখা হয় তাহা আমি বুঝিতে পারিনা। ইংরেজীতে বর্ণান্তরিত করিতে হইলে উহাদের স্থানে khaoa, jaoa, ই লেখে; কিন্তু khaoya, jaoya, লিখিত হয় না। Soda Water কথাটা বাঙ্গালায় সোডা ওয়াটার লিখিত হয়। ইহাও নিতান্ত অশুদ্ধ কেননা ইংরেজীতে য় কারের লেশ মাত্র নাই। প্রাকৃত ভাষার নিয়মানুসারে দুই স্বরের মধ্যস্থিত অসংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের লোপ হয়। সুতরাং সংস্কৃত গোপাল শব্দ প্রাকৃতে গোআল হয়। বাঙ্গালায় তাহার গোয়াল বা গোয়ালা আকার ধারণ করা যুক্তিযুক্ত নহে। পুস্তক ও পত্রিকা লেখকদিগের প্রতি আমার সবিনয় অনুরোধ এই যে তাঁহারা নিজ

* বঙ্গের সর্ব্বত্র এরূপ উচ্চারণ নহে। সং সং

নিজ পত্রিকা ও পুস্তকে এইরূপ অশুদ্ধ বানান উঠাইয়া দিয়া উচ্চারণানুযায়ী বানান প্রচলিত করেন। আমি সর্ব্বত্র উচ্চারনানুযায়ী বানানের পক্ষপাতী নহি। কেননা আমরা "সকল" ও "স্বর" শব্দকে যথাক্রমে শকল ও শ্বর রূপে উচ্চারণ করি বলিয়া আমাদের সেইরূপ বানান করা উচিত নহে। যেহেতু তাহাতে অর্থের ব্যাঘাত হইতে পারে এবং মূল সংস্কৃত হইতে বাঙ্গলা অনেক দূরে আসিয়া পড়ে। কিন্তু হওআ খাওআ প্রভৃতি লিখিলে সেরূপ আশঙ্কা কিছুই নাই। স্বর্গীয় রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়ের সম্পাদিত বিবিধার্থ সংগ্রহে পড়িয়াছি যে পূর্ব্বে ওকারের গায়ে আকার দিয়া এই সকল শব্দ লিখিত হইত। ইহাতে আমি কোন দোষ দেখিতে পাইনা। রোমান অক্ষরের দুই তিনটী স্বর ঈষদ্‌বিকৃত করিয়া dipthong, tripthong প্রস্তুত হইয়া থাকে। বাঙ্গলায় সেরূপ করিলে দোষ কি? যদি দোষই হয় তাহা হইলে ওকারের পরে সম্পূর্ণ আ লিখিলেই ত চলে। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয় বাঙ্গলা ভাষার বানান সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিতেছেন এমন কি লিখন প্রণালীতে ও অভিনবত্ব প্রবেশ করাইতে চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু এই অশুদ্ধ বানান গুলির প্রতি তাঁহার অভিনিবেশ আকৃষ্ট হইয়াছে বলিয়া আমার মনে পড়িতেছেনা। আমি একজনকে বলিতে শুনিয়াছি যে একটা স্বরের পর আর একটা স্বরের ব্যবহার ভাল দেখায় না। কিন্তু আমরা লিখিত বাঙ্গলায় হই, খাই, দিই, শুই, এই, প্রভৃতি বহু শব্দে এক স্বরের পর আর এক স্বর ব্যবহৃত হইতে দেখিতে পাই। তবে ওকারের পর আকার বসিবে না কেন? বিশেষতঃ যখন বিদেশী বা সংস্কৃত মূলক শব্দ লিখিত হয়?

অন্যান্য ভাষায় আরও স্বর আছে। একখানা ব্যাকরণে পড়িয়াছি (কিন্তু কোন্ ভাষার ব্যাকরণ তাহা মনে নাই) যে সেই ভাষায় এমন একটা স্বর আছে যে যাহা উচ্চারণ করিতে হইলে নিম্নলিখিত চেষ্টার প্রয়োজন হয়। উ উচ্চারণ করিতে হইলে ওষ্ঠদ্বয় যে আকার ধারণ করে, ওষ্ঠদ্বয়কে তদাকৃতি করিয়া ই উচ্চারণ করিতে হইবে। সংস্কৃত ঋ উচ্চারণ করিতে হইলে র কারের সহিত প্রায় এইরূপ একটা স্বর যোগ করিয়া দ্রুত ভাবে উচ্চারণ করিতে হয়। সৌভাগ্যক্রমে এরূপ উচ্চারণ বাঙ্গলায় নাই। আমাদের প্রতিবেশী উর্দ্দু ভাষায় ع (আইন) ও বাঙ্গালায় নাই। উর্দ্দু বৈয়াকরণেরা বলেন যে, মহিষ ডাকিলে যে শব্দ হয় তাহাই আইনের উচ্চারণ।

এখন কয়েকটা স্বরান্ত বাঙ্গলা শব্দের নবপ্রবর্ত্তিত বানানের কথা বলিয়া প্রবন্ধের এই অংশের উপসংহার করিব। আমরা বহুকাল হইতে ছোট, খাট, বার, তের, পোনের, কোন, ত, মত (সদৃশ) ইত্যাদি বহু শব্দ লিখিয়া আসিতেছি। কিন্তু সম্প্রতি প্রবাসী ও ভারতী পত্রিকায় এই সকল শব্দ ছোটো, বারো, তেরো, পোনেরো, কোনো, তো, মতো, রূপে লিখিত হয়। এই সকল শব্দে ওকার যোগ করিবার পরিশ্রম ও সময় বাড়াইবার কি প্রয়োজন তাহা বুঝা যায় না। বাঙ্গালায় শত সহস্র শব্দের অকারকে ওকার রূপে উচ্চারণ করিতে হয়। কোন শব্দে অকারের পর ইকার বা উকার থাকিলে অকারের উচ্চারণ ও হয়— ব্যঞ্জন বর্ণ ব্যবধান থাকিলে ও হয় যথা হই, হউক, করিতে, করুক ইত্যাদি। এই সকল স্থলে হোই, হোউক, কোরি, কোরুক লেখা উচিত কি? যদি না হয় তাহা হইলে ছোটর ছোটত্ব ঘুচাইয়া লম্বা করিয়া ছোটো লিখিব কেন? ইহার মধ্যে কোন কোন শব্দের অনুরূপ হলন্ত শব্দ আছে যথা কোন ও কোন্, মত (সদৃশ) ও মত্ (অভিপ্রায়), বার (১২) ও বার্ (দিন), ইত্যাদি। পাছে শীঘ্র অর্থ বোধ না হয় এই জন্য এই সকল শব্দ উচ্চারণানুরূপ লেখা উচিত একথা কেহ কেহ বলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় কোন না লিখিয়া "কোনও" লিখিতেন। বিদ্যানিধি মহাশয় কোন্ লেখেন। কিন্তু কোন বা কোন্ মত বা মত্ বুঝিতে কতক্ষণ সময় লাগে? সংস্কৃত কোন কোন শব্দের অনেক অর্থ আছে—ইংরেজীতেও সেরূপ শব্দ আছে; wind শব্দের উচ্চারণ কখন উইণ্ড (বায়ু) কখন ওআইণ্ড (পাক দেওয়া) wound শব্দের উচ্চারণ কখনও প্রায় "উণ্ড", কখন ওআউণ্ড। (প্রায় বলিবার

কারণ এই যে wound, wood, would প্রভৃতি শব্দের w অক্ষরের প্রতিনিধিত্ব করিবার উপযুক্ত বর্ণ বাঙ্গালায় নাই—ইংরেজী শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই জানেন যে উ তাহার পরিবর্ত্তে বসিতে পারে না।)

এখন আমরা বাঙ্গালায় ব্যঞ্জনের প্রচুরতা অপ্রচুরতার বিষয়ে সমালোচনা করিব।

স্পর্শ বর্ণের ঙ, ঞ ও ণ ছাড়া অন্য কোন বর্ণের উচ্চারণে কোন গোল যোগ নাই। শিশুদিগকে বর্ণ-মালা শিখাইবার সময়ে ঙ এবং ঞকে যথাক্রমে উঅঁ বা উঁঅ এবং ইঁয় বলিয়া শিখান হইয়া থাকে। কিন্তু উহাদের প্রকৃত নাম শেখানই উচিত। ঙ কারের সহিত যখন গ যুক্ত হয় তখন অনেকেই ঙ্ঙ উচ্চারণ করেন—যথা বঙ্গকে বঙ্ঙ গঙ্গাকে গঙ্ঙা ইত্যাদি। গ্রীকে দুইটা গ একত্র থাকিলে প্রথমটার উচ্চারণ হয় ঙকারের। গ্রীকে গঙ্গা লিখিতে হইলে গগ্গা লিখিত হয়। জকারের সহিত যখন ঞ যুক্ত হয় তখন জকারে উচ্চারণ কিছু কষ্ট সাধ্য হয়। এই উচ্চারণ করিতে বাঙ্গালীরা মহারাষ্ট্রীয়েরা উভয়েই ভুল করেন। বাঙ্গালীরা জ্ঞানকে গ্যাঁন বলেন, মহারাষ্ট্রীয়েরা বলেন দ্নান। মহারাষ্ট্রের বিখ্যাত জ্ঞানো-দয় পত্রিকা ইংরাজীতে Dnanoday লিখিত হইয়া থাকে। চ কারের পর ঞ যুক্ত হইলে তাহার উচ্চারণ আরও কঠিন হয়। বাঙ্গলায় যাচ্ঞা শব্দটার চলিত উচ্চারণ যাচ্ঙা কিন্তু প্রায় যাচ্ঞা হওয়া উচিত। ণ কারের উচ্চারণ বাঙ্গালায় নাই। হিন্দুস্থানীদের মধ্যেও নাই বলিলেই হয়। কিন্তু ট, ঠ, ড, ঢ, র উপরে থাকিলে আমরা ণ কারের উচ্চারণ করিতে পারি ও করিয়া থাকি।

কিন্তু ন ও ণর মধ্যে যে প্রভেদ তাহা অকিঞ্চিৎকর। দয়ানন্দ সরস্বতী ণ স্থানে ন ই উচ্চারণ করিতেন। ট বর্গের ড ও ঢ অনেক স্থলে আমরা ড় ও ঢ় রূপে উচ্চারণ করি। পূর্ব্ববঙ্গের ড় উচ্চারিত হয় না। তাহার পরিবর্ত্তে ব় হয়। সুতরাং ড়কে সে অঞ্চলে বর্গীয় ব় বলে। ঢ় ও পূর্ব্ববঙ্গের সর্ব্বত্র উচ্চারিত হয় না। কিন্তু ঢ়কে কি বলে তাহা জানি না। আমরা যকে জ রূপে উচ্চারণ করি বলিয়া যকে অন্তঃস্থ জ বলিয়া থাকি।

পূর্ব্ববঙ্গের লোকের পক্ষে বর্গের চতুর্থ বর্ণ উচ্চারণ করা কষ্টসাধ্য। ইহার কারণ আমি বুঝিতে পারি না। তাঁহারা খ, ছ, ঠ, থ, ফ বলিতে পারেন। কিন্তু ঘ, ঝ, ঢ, ধ, ভ বলিতে পারেন না। আসামে মিরি নামে এক জাতি আছে সেই জাতীয় লোকেরা কোন মহাপ্রাণ বর্ণই উচ্চারণ করিতে পারে না হ স্থানে অ, খ স্থানে ক, ঘ স্থানে গ বলে। আসামের আর্য্য-নিবাসিগণ চ ও ছ উচ্চারণ করিতে পারেন না। উভয়-বর্ণকেই স, (sa) রূপে উচ্চারণ করেন। আমরা যেমন শ, ষ, স এই তিনটাকেই শ রূপে উচ্চারণ করি তেমন তাঁহারা এই তিনটা বর্ণকেও স বলিয়া উচ্চারণ করেন। সুতরাং আমাদের তিনটা শ তাহাদের পাঁচটা স। আমরা বলি তালব্য শ, মূর্দ্ধণ্য শ, দন্ত্য শ, তাঁহারা বলেন প্রথম স অর্থাৎ চ, দ্বিতীয় স অর্থাৎ ছ, তালব্য স অর্থাৎ শ, মূর্দ্ধণ্য স অর্থাৎ ষ এবং দন্ত্য স।

য বাঙ্গলায় কখনও জরূপে, কখনও য়রূপে উচ্চারিত হয়। কিন্তু ইহাতে আকার দিয়া কখনও আকারের উচ্চারণের স্থলে লেখা উচিত নহে। ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে।

অন্তঃস্থ বর্ণের মধ্যে একটা ব আছে বটে কিন্তু তাহার উচ্চারণ হয় না। দন্ত্যোষ্ঠ্য ব যেখানে যেখানে উচ্চারিত হয় সেখানে ব না লিখিয়া বিদ্যানিধি মহাশয়ের মত ব্ব লেখা উচিত।

বাঙ্গলাদেশে কোন কোন শব্দে চলিত ভাষায় হকারের উচ্চারণ হয় না যথা মহাশয়, ব্রাহ্মস্পর্শ প্রভৃতি শব্দে। পূর্ব্ববঙ্গে হ কার স্থানে প্রায়ই স্বরবর্ণের উচ্চা-রণ হয় এবং পূর্ব্ববঙ্গে ও আসামে শ ষ স স্থানে অনেক সময়ে হ উচ্চারিত হয়। আসামে আশ্বিন মাস আহিন, আষাঢ় অহার এবং মাস, মাহ্ রূপে লিখিত ও উচ্চারিত হইয়া থাকে। পশ্চিম দেশীয় কোন হাস্যরসপ্রিয় কবি বলিয়াছেন পূর্ব্ববঙ্গের লোকের যেখানে শতায়ুর্ভব বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে হয় সেখানে হতায়ুর্ভব বলিয়া আশীর্ব্বাদ করেন সুতরাং পূর্ব্বদেশীয়দের আশীর্ব্বাদ লইবে না। আশীর্ব্বাদং ন গৃহ্লীয়াত পূর্ব্বদেশনিবাসিনাম্। শতায়ুরিতি বক্তব্যে হতায়ুরিতি ভাষিণাম্।

উপরে যে সকল বর্ণের উল্লেখ হইল তদ্ভিন্ন আর তিনটী উচ্চারণজ্ঞাপক চিহ্ন বাঙ্গলায় আছে তাহা ং (অনুস্বার) ঃ (বিসর্গ) এবং ँ (চন্দ্রবিন্দু)। ইহার মধ্যে অনুস্বার ও বিসর্গের প্রকৃত উচ্চারণ বাঙ্গলায় হয় না। অনুস্বার বাঙ্গলাদেশের সর্ব্বত্রই এবং আসামে ও মিথিলায় ঙ্ রূপে উচ্চারিত হয়। কিন্তু ইহার প্রকৃত উচ্চারণ চন্দ্রবিন্দুর প্রায় অনুরূপ। প্রভেদের মধ্যে এই যে চন্দ্রবিন্দু যুক্ত হইলে কোন লঘুস্বর গুরু হয় না কিন্তু অনুস্বার যুক্ত হইলে লঘুস্বর গুরু হয়। বিসর্গের উচ্চারণ ও বাঙ্গলায় হয় না। যদি বাঙ্গলার স্কুলে ও টোলে শিক্ষা দেওয়া হয় তাহা হইলে এই দুইটী উচ্চারণের উদ্ধার সাধন হইতে পারে। চন্দ্রবিন্দুর উচ্চারণ বোধ হয় বঙ্গদেশে অল্প দিন হইল প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। কেননা আমরা পুরাতন পুস্তকে চান্দ, কান্দিল ইত্যাদি বানান দেখিতে পাই। পূর্ব্ববঙ্গের লোকে চন্দ্রবিন্দু উচ্চারণ করিতে পারেন না। অন্যপক্ষে রাঢ় দেশে ও আসামে চন্দ্রবিন্দুর ছড়াছড়ি।

বাঙ্গলা বর্ণমালায় যে সকল উচ্চারণ জ্ঞাপক শব্দ আছে তাহা নিঃশেষে বলা হইল। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে সকল বর্ণের প্রকৃত উচ্চারণ হয় না। আসামে উচ্চারণ সংস্কারের বিশেষ চেষ্টা হইতেছে। কিন্তু বঙ্গদেশে স্কুলে উচ্চারণ শিক্ষা দেওয়া হয় না। ছাত্রদিগকে প্রত্যেক বর্ণের উচ্চারণ বুঝাইয়া দিয়া স্কুলের সময়ে কথা কহিতে সেই সেই উচ্চারণ করিতে—পদ্মকে পদ্‌ম ভিক্ষাকে ভিক্‌ষা, অন্তঃস্থ ব কে ৱ, স কে sa বলিতে বাধ্য করা উচিত। আসামীরা সাহেব লিখিতে চাহাব অথবা চাহেব লিখিয়া থাকেন। আমরা সেক্সপিয়ার (Shakespeare) লিখিতে সেক্ষপীর লিখিয়া থাকি। এই উভয়ই সমান অন্যায়। যদিও আসামীরা চ কে স বলেন এবং আমরা স কে শ বলি তথাপি যখন চ ও স র এক একটা স্বীকৃত উচ্চারণ আছে এবং স ও শ উচ্চারণ করিবার স্বীকৃত স্বতন্ত্র বর্ণ আছে তখন সাহেব ও শেক্সপিয়ার লিখিতে কখনই চাহাব ও সেক্ষপীর লেখা উচিত নহে। এইরূপ প্রায়ই লিখিত হয়, যে অমুক ছাত্র পাশ হইয়াছে, জিনিসটা পার্শেলে পাঠাইতে হইবে। বলা বাহুল্য যে পাশ ও পার্শেলের পরিবর্ত্তে পাস ও পার্সেল লেখা উচিত। ইংরেজীতে st স্থলে আমরা ষ্ট লিখিয়া থাকি, ইহাও অন্যায়। য স্থানে স ব্যবহার করা উচিত। হিন্দুস্থানীরা তাহাই করিয়া থাকেন।

কতকগুলি উচ্চারণ লিখিবার উপযোগী অক্ষর বাঙ্গালায় নাই। যথা F, V, Z, ZH এবং পারসী ق (কাফ), خ (খে এবং غ (গাইন)। ইহার মধ্যে পারসী উচ্চারণ কয়েকটা ছাড়িয়া দিলেও চলে। কেননা আমরা কখনই সেই সকল উচ্চারণ বাঙ্গলায় করিনা। কিন্তু অপর কয়েকটা উচ্চারণ আমরা সর্ব্বদাই বাঙ্গলায় করিয়া থাকি। ঘড়ীটা fast, violet রঙ্গ, zebra, leisure প্রভৃতি শব্দ আমরা বাঙ্গলা বলিবার সময়ে সর্ব্বদাই ব্যবহার করি। এই কয়েকটী বর্ণকেই সংযুক্ত বর্ণ বলিয়া বোধ হয়। ফ এ ৱ ফলা দিয়া উচ্চারণ করিলে F উচ্চারিত হয়। হিন্দুস্থানীরা F এর স্থলে ফর নিচে একটা বিন্দু দিয়া থাকেন। বাঙ্গলায় ও উহা অনায়াসেই হইতে পারে। সেইরূপে ভ এ ৱ ফলা দিলে Vর উচ্চারণ হয়। সংস্কৃত ৱ এবং ইংরেজীর Vর এক উচ্চারণ নহে। V মহাপ্রাণ বর্ণ কিন্তু ৱ অল্পপ্রাণ। তাহা হইলেও ৱ দ্বারা Vর উচ্চারণ প্রকাশিত হইয়া থাকে। আমার বিবেচনায় ইংরেজী V স্থানে বাঙ্গালায় ভ় লেখা উচিত। গ্রীকবৈয়াকরণেরা বলেন যে দ বা ত র সহিত স যুক্ত হইলে Z এর উচ্চারণ হয়। কিন্তু আমার বোধ হয় যে জ এর সহিত স যুক্ত হইলে Z এর উচ্চারণ হয়। যাহাই হউক জ এর নীচে একটা বিন্দু দিয়া Z লেখা উচিত। হিন্দুস্থানীরা তাহাই করিয়া থাকেন। ঘ এর সহিত ড যুক্ত করিয়া দ্রুত উচ্চারণ করিলে ZH এর উচ্চারণ হয়। সুতরাং ZH এর উচ্চারণ বাঙ্গালায় প্রকাশ করিতে হইলে য এর নীচে বিন্দু দিলেই চলিতে পারে।

বাঙ্গালা ভাষা-শুদ্ধাশুদ্ধ।

এখন বাঙ্গালা ভাষা সম্বন্ধে অল্প কয়েকটী কথা বলিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিব। ইংরেজেরা নিজের ভাষা কত সাবধান হইয়াই বলেন ও লেখেন। তথাপি যদি কোন

বক্তা বা লেখক অসাবধানে বা অজ্ঞান প্রযুক্ত কোন অশুদ্ধ শব্দ প্রয়োগ করেন তাহা হইলে অনতিবিলম্বেই তাহার তীব্র সমালোচনা হয়। বাঙ্গালায় সেরূপ সমালোচনা প্রায়ই হয় না। কত শব্দের ভ্রান্ত প্রয়োগ চলিয়া যাইতেছে। পণ্ডিতদিগের ভুল যদি ধরিয়া দেওয়া না হয় তাহা হইলে অল্প শিক্ষিত লোকে সেই ভুলকে শুদ্ধ ভাবিয়া তাহার অনুকরণ করে। সুতরাং ভাষার বিশুদ্ধতা ও পবিত্রতা নষ্ট হয়। বাক্‌শুদ্ধিই পণ্ডিতদিগকে পূত ও বিভূষিত করে। এক একজন পাদ্রী সমস্ত সপ্তাহ পরিশ্রম করিয়া রবিবারের উপদেশ (sermon) প্রস্তুত করেন। তাঁহারা উপদেশ দানকালে এবং ব্যারিষ্টরেরা আদালতে বক্তৃতা করিবার সময়ে যেরূপ উচ্চারণ করেন তাহাই অপর সাধারণ অনুকরণ করে। কোন বানানের পরিবর্ত্তন যত দিন Times পত্রিকা স্বীকার না করেন ততদিন সাধারণ কর্ত্তৃক তাহা গৃহীত হয় না। কিন্তু Times পত্রিকাও হঠাৎ কোন একটা বানানের পরিবর্ত্তন করিলে তাহারও প্রতিবাদ হইয়া থাকে। ঐতিহাসিক গ্রীন্ এবং আরও কয়েকজন holidayকে holyday রূপে বানান করেন। Times পত্রিকা ও একবার holyday লিখিয়াছিলেন। তাহার তীব্র প্রতিবাদ হইয়াছিল। কিন্তু আমরা বাঙ্গালীরা কি ভাষার বিশুদ্ধতা সংরক্ষণ কল্লে তেমন কিছু করিয়া থাকি? গৌরীপুরের সাহিত্য সম্মিলনে একজন খ্যাতনামা সাহিত্যিক (শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়) লিখিত প্রবন্ধে কোন কোন মনোভাবকে স্থাপত্যকলাদ্বারা "কায়াদানের" কথা লিখিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও "কায়া" শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু কায়া বলিয়া কি একটা শব্দ আছে? কায়মনোবাক্য, কায়েন মনসা বাচা প্রভৃতি প্রচলিত কথা হইতে জানা যায় কায় শব্দ অকারান্ত। গণশব্দ স্থানে বাঙ্গলায় গণা হয়, এবং কোন কোন প্রদেশে কোণকে কোণা বলে। কিন্তু এই দুইটা শব্দ বাঙ্গলায় সর্ব্বদা নাড়া চাড়া হয় বলিয়া কিছু নষ্ট হইয়াছে। কায় শব্দের ব্যবহার বাঙ্গলায় খুবই কম। সুতরাং তাহাকে বিকৃত করা চলেনা। কায়া বলিয়া একটা শব্দ আছে এই ভ্রান্ত ধারণার সহিত অক্ষয় বাবুর বাভ্রবী কায়া নামক দেবীমূর্ত্তির আবিষ্কারের কোন সম্বন্ধ আছে কি? নতুবা বাভ্রবী কায়া শব্দ কিরূপে হইল?

চওড়া বা বিস্তৃত অর্থে প্রশস্ত শব্দের ভ্রান্ত ব্যবহার হইতে বাঙ্গলা দেশের অনেক পণ্ডিত ব্যক্তিও অব্যাহতি পান নাই।

ভারতী পত্রিকায় এক প্রবন্ধ লেখক কোন বনদেশ সুগন্ধে "মুখরিত" হওয়ার কথা লিখিয়াছেন। সুগন্ধে সুশ্রাব্য ও সুরঞ্জিত লিখিলে আরও ভাল হইত।

দক্ষিণাপথ বা ভারতবর্ষের দক্ষিণ দেশকে দাক্ষিণাত্য বলা বাঙ্গালীদিগের একটা রোগবিশেষ হইয়াছে। সংস্কৃতে সেই প্রদেশকে দক্ষিণ বা দক্ষিণাপথ বলে। সেই প্রদেশে যাহা হয় তাহাকে দাক্ষিণাত্য বলে। দাক্ষিণাত্য ব্রাহ্মণ, দাক্ষিণাত্য আচার ব্যবহার হইতে পারে। কিন্তু দাক্ষিণাত্য দেশ হইতে পারে না। কেহ কেহ পশ্চিম দেশ না বলিয়া পাশ্চাত্যদেশ বলিয়া পাণ্ডিত্য প্রকাশ করেন।

যথেষ্ট শব্দের অর্থ যত প্রয়োজন। কিন্তু এই শব্দটা বহুপরিমাণ অর্থে বাঙ্গলায় ব্যবহৃত হয়।

অপর্য্যাপ্ত অর্থে অপ্রচুর। এই অর্থে ইহা ভগবদ্গীতায় ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু বাঙ্গালায় ইহা প্রয়োজনাতিরিক্ত অর্থে ব্যবহৃত হয়।

সমর্থ অর্থে সক্ষম শব্দের ব্যবহার এক অদ্ভুত কার্য্য। ব্রাহ্মসমাজের একজন প্রচারককে আবার ইহার উপর অসক্ষম শব্দ প্রয়োগ করিতে শুনিয়াছি।

যাহা হউক এ সকল অকিঞ্চিৎকর বিষয়। বাঙ্গলাভাষা সম্বন্ধে প্রধান কথা এই যে ভদ্র ও শিক্ষিত লোক সাধু ভাষায় অর্থাৎ যে ভাষায় পুস্তক লিখিত হয় সেই ভাষায় কথা কহেন না। আর কোন সভ্য দেশেই বোধ হয় এরূপ নহে। পূর্ব্বে পূর্ব্বে বক্তৃতাতে কখন কখন সাধুভাষা শুনা যাইত। কিন্তু এখন আর তাহা নাই। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় কলিকাতার প্রাদেশিক ভাষায় প্রবন্ধাদি লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। কিন্তু তাহা কি উচিত? বঙ্গের প্রত্যেক প্রদেশে এমন কি প্রত্যেক জেলায় ভিন্ন ভিন্ন প্রাদেশিক ভাষা প্রচলিত

একটা বড় সভায় যদি বাঁকুড়া, চট্টগ্রাম, ঢাকা, কলিকাতা, রঙ্গপুর, কুচবিহার প্রভৃতি জেলা হইতে লোক গিয়া প্রত্যেকেই নিজ নিজ প্রাদেশিক ভাষায় বক্তৃতা করেন তাহা হইলে সকল শ্রোতারা কি তাহা বুঝিতে পারিবেন? যদি বলা যায় যে কেবল কলিকাতায় প্রচলিত প্রাদেশিক ভাষাই সকলের ব্যবহার করা উচিত কেননা কলিকাতাই বঙ্গদেশের রাজধানী। কিন্তু কলিকাতা বঙ্গের এক প্রদেশের মাত্র রাজধানী—আর এক প্রদেশের রাজধানী ঢাকা। তাহা হইলে বঙ্গদেশে কি দুইটা ভাষা প্রচলিত হওয়া উচিত। আজ কাল সর্ব্বত্রে একীকরণের চেষ্টা হইতেছে। এমন সময়ে কি ভাষার বিচ্ছেদ ঘটান উচিত? কলিকাতার বা ঢাকার প্রচলিত ভাষা অন্য স্থানের লোকে কখনই আয়ত্ত করিতে পারিবে না। সুতরাং প্রত্যেক শিক্ষিত লোকেরই বিদ্যাসাগরের ভাষায়, অক্ষয়কুমারের ভাষায়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ভাষায়, বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায়, কালীপ্রসন্নের ভাষায় কথোপকথন করিতে শিক্ষা করা উচিত। এখন সর্ব্বত্র যদি এই নিয়ম হয় যে স্কুলের শিক্ষক ও ছাত্রগণ অন্ততঃ স্কুলের সময়ে পরস্পরের সহিত সাধুভাষায় কথা কহিবেন তাহা হইলে দশ বৎসরের মধ্যে বাঙ্গলা ভাষার এমন উন্নতি হইবে যে তাহা ভাবিলেও পুলকিত হইতে হয়। অবশ্য অশিক্ষিত লোকের মধ্যে প্রাদেশিক ভাষা চিরকালই থাকিবে।

শ্রীবীরেশ্বর সেন।

অর্জ্জুন-মিশ্র।

অর্জ্জুন-মিশ্র, পর্ণকুটীরে, দৈন্যে বক্ষে করি,
ছিলেন বিদ্যারত,
জ্ঞানের রত্ন মাণিকে, আপন দুঃখের তরী
সাজায়ে মনের মত!
সম্বলের মাঝে ব্রাহ্মণীর সেবা
জোছনায় মাখা নীলবন শোভা,—
আর কিছু তাঁর নাহিরে,
এ সুখ দুখের বাজারে!

বলেন মিশ্র হরি হে! পদে শুধু রেখো মতি,
ভব পার হ'ব বটের পত্রে,—রাখি শকতি!

২

গীতা অধ্যয়নে নিরত ব্রাহ্মণ, নিজ মনে
একদা প্রাতঃকালে—
লেখা আছে শ্লোকে,—"অনন্য চিন্তায় যেইজনে
ডাকে দীনবন্ধু বলে,
দয়া করে তারে আপনি ঠাকুর,
এনে দেন কত সম্পদ প্রচুর
আপনার শিরে বহিয়া:—
লক্ষ্মীর ভাণ্ডার লুটিয়া!
ভাবেন মিশ্র, দৈন্য তিনি ঘুচান নিঃসংশয়,
কিন্তু "শিরে বহিদেন,"—এর নাহি ত প্রত্যয়!"

৩

তাল পত্রের জীর্ণ পুঁথিতে, টানি দীর্ঘ রেখা
দিবা লাল কালিতে,
"বহাম্যহং" কাটি লিখিলেন মনোমত লেখা
"দদাম্যহং" শ্লোকেতে! *
তারপর ত্বরা চলিলেন ছুটি,
কাঁধে তুলি লয়ে ভিক্ষার ঝুলিটি,
ব্রাহ্মণের রিক্ত কুটীরে,
তণ্ডুল কণিকা নাহিরে!
ফিরেন ব্রাহ্মণ প্রতি দ্বারে দ্বারে:—গেল বেলা,
আজি ভিক্ষা মিলেনা কমলার হাটে,—একি খেলা!

৪

শূন্য কুটীরে, ব্রাহ্মণী সাঁঝে, বলেন "শ্রীহরি!"
চাহিয়া নীলিমা পানে,—
"ভক্ত তোমার, রিক্ত করে, আজ যদি আসে ফিরি,
কলঙ্ক লাগিবে নামে!"
হেন কালে দুটী ব্রাহ্মণ কুমার
উপনীত তাঁর কুটীরের দ্বার,

* অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তোমাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥
গীতা ৯।২২

বলে সকরুণ ভাষেতে,
"আর যে পারি না বহিতে!"
ভারে ভারে তণ্ডুল-ঘৃত নামায়ে কুটীরে, বলে,
মিশ্র-বাবার ভিক্ষার ধন, লহ ঘরে তুলে!"

৫

সিক্ত শাখায় নব-যুথি সম, হেরিল কুমার দুটী,
মুগধা বন্ধ্যানারী ;—
মাতৃ-স্নেহের ব্যথা অভিনব, ঝঙ্কারি' উঠি'
জলে আঁখি দিল ভরি!
"কোন্ অভাগীর নীলমণি তোরা,
বলেন ব্রাহ্মণী স্নেহে আত্মহারা,
কে জানি, কেমনে চাপালে,
পাষাণ সোণার কমলে!"
বলে শিশু দুটী, "মিশ্রঠাকুর আজি নগরে,
দিলেন বহিতে ভিক্ষার ভার নিজ কুটীরে!"

৬

জড়ায়ে অশ্রু কণ্ঠবীণায়, বলে দুটী ধীরে
দেখ মা, পীঠের'পরে,
মিশ্র ঠাকুর দে'ছে কষাঘাত, নির্ম্মম করে,
কত না শোণিত ঝরে!
রুদ্ধ মাতৃ স্নেহ বাজিল ব্যথায়,
আহা কি নিঠুর পুরুষ ধরায়,
রক্ত ঝরি অই যায় রে
কাঁচা নবনীর শরীরে!
অসম্ভব, স্বামীর মম, এ হেন নিষ্ঠুরতা,
দুঃখী নিজে সে ;—দিবে না, দুঃখের উপরে ব্যথা!"

৭

দ্রব্যের ভার অঙ্গনে রাখি, তারা হেসে হেসে
কোথা বা গেল চলে,
লক্ষ্য তারার নীলাকাশ যেন, চোখের নিমেষে
লুকালো মেঘের কোলে!
মিশ্র ঠাকুর আসিয়া ক্ষণ পরে,
পড়েন বসিয়া কুটীরের দ্বারে,—
অশ্রুরেখা নাহি নয়নে,
নিরাশা শিথিল চরণে!

বলেন, "ব্রাহ্মণি, নিষ্ফল যাত্রা, শূন্য ভিক্ষা ঝুলি,
কর্ম্মফল উপবাস, দুষিও না বনমালী!"

৮

ব্রাহ্মণী বলেন, "সে কি কথা, বলহে ঠাকুর,
ভিক্ষায় মিলেছে এত!
পাঠায়েছ ঘরে রাজ্যের ধন, মাথায় শিশুর,
রেখে গেছে অই কত!
একি লীলা, স্বামি, আজিকে তোমার,
রক্ত বহায়েছ করিয়া প্রহার
এমন ননীর পীঠেরে,—
লোভেতে ধরম গেলরে!
বলেন মিশ্র ঃ—"ব্রাহ্মণী স্বপন দেখিছ নাকি!
প্রলাপ কহিছ, তবে উন্মাদের নাহি বাকি!

শুনি সব কথা, ব্রাহ্মণ বলেন অশ্রু-নীরে,
"তুমি হে ধন্যা নারী,
'নয়ন যাহারে পায় না দেখিতে, দয়া করে
তোমা দেখা দিল হরি!
নিজে নারায়ণ শিশুরূপে বয়ে
জনমের দুখ দিলেন ঘুচায়ে!
দাম্ভিকের মত, কেটেছিনু শ্লোক, তাই হরি,
নিজে বহি ভক্তের ভার, শাস্ত্র বুঝালে, মরি!

১০

তাল পত্রের পুঁথি খানি পুনঃ তুলি নিজ করে
ব্রাহ্মণ মুগ্ধ প্রায়,
বাক্য পুরাতন, লিখিলেন শ্লোকে ভক্তিভরে
যথা স্থানে পুনরায়!
অভাব ভাবনা দূর করিবারে
নিত্য প্রয়োজন বহি নিজ শিরে
নিরঞ্জন অই রাজে গো
প্রকৃতির শ্যাম সাজে গো!
হের নর-নারী, দিব্য নেত্র মেলি, বিশ্ব-পুরে,
করে বাঞ্ছা-ফল, হাসে বনমালী সকল দ্বারে!

শ্রীসুরেশচন্দ্র সিংহ।

মুসলমানবিশ্ববিদ্যালয়।

বর্তমান সময়ে মুসলমান সমাজ কিরূপ দুরবস্থায় পতিত হইয়াছে তাহা কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। পৃথিবীর সভ্যজাতি সমূহের মধ্যে এক সময়ে মুসলমান জাতি সকলের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল, কিন্তু এক্ষণে অধিকাংশ দেশেই তাহারা জাতীয় উন্নতিতে সকলের পশ্চাত্ পতিত হইয়াছে। মুসলমানের এই জাতীয় অবনতি সকলদেশ অপেক্ষা আমাদের ভারতবর্ষেই চরম সীমায় উপস্থিত হইয়াছে।

দুই শত বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষে মুসলমানেরই সম্মান, প্রতিপত্তি ছিল। মুসলমান নামেরই গৌরব ছিল। কিন্তু আজ প্রায় তাহার বিপরীত ঘটিয়াছে। এই পরিবর্ত্তনের কারণ কি? অনেকেই মনে করিতে পারেন যে ভারতের শাসনদণ্ড হারাইয়াই মুসলমান এই দুরবস্থায় পতিত হইয়াছে। শাসনদণ্ড পরিচালনাই জাতীয় উন্নতির পরাকাষ্ঠা নয়। অনেক স্থলে অনেক অসভ্য জাতিও রাজত্ব করিতেছে; তাহাকে কি জাতীয় উন্নতি বলা যাইতে পারে? আমরা বর্ত্তমান সময়ে যে ন্যায়বান্ সদাশয় গবর্ণমেণ্টের অধীনে বাস করিতেছি তাহা মুসলমান শাসনের ন্যায়ই মুসলমানের জাতীয় উন্নতির অনুকূল নহে কি?

মুসলমানের অবনতির মূল কারণ শিক্ষার অভাব। পবিত্র হদীস শরীফে উক্ত হইয়াছে যে বিদ্যাশিক্ষা করা প্রত্যেক মুসলমান নর নারীর প্রতি ফরজ, কিন্তু আজকাল সর্ব্বাপেক্ষা মুসলমান জাতির মধ্যেই অশিক্ষিত লোকের সংখ্যা অধিক। ইহা অপেক্ষা অধিকতর আক্ষেপের বিষয় আর কি হইতে পারে? মুসলমানগণ শিক্ষা বিষয়ে কি জন্য এরূপ পশ্চাত্ পড়িয়াছেন তাহার কারণ অনুসন্ধান করিতে আমাদিগকে অধিকদূর অগ্রসর হইতে হইবে না। মুসলমান রাজত্বকালে পার্সি এদেশের রাজভাষা ছিল। সুতরাং হিন্দু মুসলমান সকলেই আগ্রহ সহকারে উহা শিক্ষা করিতেন। ইংরাজ রাজত্বের প্রথম সময়েও রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইবার নিমিত্ত আরবী ও পার্সি ভাষায় পারদর্শিতার আবশ্যক হইত। কিন্তু ক্রমে ক্রমে ইংরাজিভাষাই আফিস আদালতের ভাষা হইয়া দাঁড়াইল। সরকারে চাকুরী লাভের নিমিত্ত ইংরাজিশিক্ষা একান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিল।

হিন্দুগণ পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত ছিলেন। তাঁহারা আগ্রহ সহকারে ইংরাজি শিক্ষায় মনোনিবেশ করিলেন; কারণ পার্সি যেরূপ বিজাতীয় ভাষা ইংরাজি ও তাঁহাদের পক্ষে সেইরূপ। মুসলমানগণ বিজাতীয় ভাষা গ্রহণে অভ্যস্ত ছিলেন না বলিয়া তাহা সহজে গ্রহণ করিতে সমর্থ হইলেন না। কেহ কেহ বা ইংরাজি শিক্ষা ধর্ম্ম-বিগর্হিত বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন; কিন্তু লোকের সে ভুল ধারণা এক্ষণে দূর হইয়াছে। আজকাল আর কেহ ইংরাজীশিক্ষা ধর্ম্মবিরুদ্ধ বলিয়া মনে করেন না। বস্তুতঃ অর্থোপার্জ্জনের নিমিত্ত অথবা জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্যে কোন ভাষা শিক্ষা করা যে ধর্ম্মবিরুদ্ধ হইতে পারে না ইহা অতি সহজেই বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু শুধু ইংরাজি শিক্ষা দ্বারা মুসলমানের মুসলমানী রক্ষা হইতে পারে না। সঙ্গে সঙ্গে কিছু জাতীয় ধর্ম্মশিক্ষার ও প্রয়োজন।

আমাদের দেশে বর্ত্তমান সময়ে যে প্রকার শিক্ষা প্রণালী প্রচলিত রহিয়াছে ইহাদ্বারা মুসলমানের এই উভয় উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে না। এই জন্যই যদিও ইংরাজি শিক্ষার প্রতি মুসলমানের বিদ্বেষ দূরীভূত হইয়াছে তথাপি সাধারণ শিক্ষাক্ষেত্রে মুসলমানের আশানুরূপ উন্নতি লক্ষিত হইতেছে না। ইংরাজি শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে মুসলমান বালকগণের ধর্ম্মশিক্ষার ব্যবস্থা করিতে না পারিলে বর্ত্তমান প্রণালীর শিক্ষাদ্বারা মুসলমানের প্রকৃত উন্নতি সাধিত হইবার আশা নাই এবং তাহা ব্যতীত শিক্ষার প্রতি মুসলমান সাধারণের সহানুভূতি সম্ভব ও সর্ব্বথা বাঞ্ছনীয় নহে।

এই উভয় উদ্দেশ্যের একত্র সমাবেশ বর্ত্তমান সময়ে সমাজহিতৈষী মুসলমান অগ্রণীগণের প্রধান চিন্তার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মুসলমানদিগের জন্য একটী পৃথক্ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন ব্যতীত এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবার অন্য কোন উপায় দেখিতে পাওয়া যায় না। এই নিমিত্ত মুসলমানের স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ আরম্ভ হইয়াছে।

শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে বোধ হয় অনেকেই অবগত আছেন যে আলীগড় নগরে মুসলমান জাতীয়-বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য হিজ্ হাইনেস্ আগা খাঁ এবং রাইট্ অনারেবল আমীর আলী ও নওয়াব ভেকারুল মুল্ক প্রমুখ মুসলমান সমাজনেতৃগণ অক্লান্ত পরিশ্রম ও চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহারা যেরূপ কৃতকার্য্য হইয়াছেন তাহাতে অচিরে একটী মুসলমান জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইবে বলিয়া আশা করা যাইতে পারে। এই বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনকল্পে মুসলমানগণের সমবেত চেষ্টা ভারতের সর্ব্বত্রই পরিলক্ষিত হইতেছে সুতরাং অধুনা ইহার কিছু আলোচনা বাঞ্ছনীয় বোধ হইতেছে।

আ'জ মুসলমান সমাজে উচ্চশিক্ষা বিষয়ে যে কিছু উন্নতি পরিলক্ষিত হইতেছে তাহার একমাত্র উদ্ভাবয়িতা এবং উৎসাহদাতা আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ নেতা প্রাতঃস্মরণীয় সার্ সৈয়দ আহমদ। তিনি তাঁহার জীবনব্যাপী চেষ্টা দ্বারা এইরূপ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আবশ্যকতা স্পষ্ট প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। বস্তুতঃ বর্ত্তমান চেষ্টা ও উদ্যোগ আলীগড়ে তাঁহারই রোপিত বীজের পূর্ণ বিকাশ মাত্র। স্বর্গীয় সৈয়দের সুযোগ্য চিন্তাশীল পুত্র পরলোকগত সৈয়দ মাহমুদ ইংরাজি ১৮৭৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে এইরূপ জাতীয়-বিশ্ববিদ্যালয়ের আবশ্যকতা সম্বন্ধে একটী যুক্তিপূর্ণ মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়া বাণারস নগরের মুসলমান নেতৃগণের সম্মুখে উপস্থিত করেন। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় সেই সময় জাতীয় জড়তা এতই বর্দ্ধিত হইয়াছিল যে সৈয়দ মাহমুদের যুক্তিপূর্ণ মন্তব্যের প্রতি কেহ মনোযোগ করেন নাই। তৎপর ১৮৭৫ সালে আলীগড় নগরে বর্ত্তমান ভারতবর্ষীয় মুসলমানগণের কীর্ত্তিস্তম্ভ আলীগড় কালেজের ভিত্তি স্বরূপ একটী হাইস্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। অতঃপর ১৮৭৭ সালে দিল্লী দরবারের পর তৎকালীন রাজপ্রতিনিধি মহামতি লর্ড লিটন্ আলীগড় কলেজের ভিত্তি সংস্থাপন করেন। তৎকালে কলেজের আয় বার্ষিক পঞ্চদশ সহস্র মুদ্রার কিছু অধিক ছিল। সেই সময় রাজপ্রতিনিধিকে যে অভিনন্দনপত্র দেওয়া হয় তাহাতেই আমাদের প্রাতঃস্মরণীয় নেতা মহামতি সার সৈয়দ আহমদ ভাবী বিশ্ববিদ্যালয়ের আভাষ দিয়াছিলেন। কথাগুলি এতই মূল্যবান্ এবং চিন্তাশীলতায় পরিপূর্ণ যে আমি এখানে তাহা উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

"From the seed which we sow today, there might spring up a mighty tree whose branches like the banyan of the soil, shall send forth new and vigorous saplings; that this college may expand into a University whose sons shall go forth throughout the length and breadth of the land to preach the Gospel of free enquiry, of large-hearted toleration, and of a pure morality."

অর্থাৎ "অদ্য যে বীজ বপন করা হইল, কালে ইহা হইতে একটী বৃহৎ বৃক্ষ জন্মিয়া অশ্বথ বৃক্ষের ন্যায় তাহার শাখা প্রশাখা চতুর্দ্দিকে বিস্তার করিবে। এবং এই কালেজ কালে একটী বিশ্ববিদ্যালয় রূপে পরিণত হইয়া ইহার ছাত্রগণকে দেশের চতুর্দ্দিকে প্রেরণ করিবে, এবং তাহারা স্বাধীন চিন্তা, উচ্চ-হৃদয়-প্রসূত সহনশীলতা এবং পবিত্র নীতি সমস্ত দেশে প্রচার করিবে।" কি মহান্ ও উদার লক্ষ্য! ভারতীয় মুসলমানগণ আজও নেতার উপরিউক্ত উক্তির একবর্ণও এদিক্ ওদিক্ যাইতে ইচ্ছা করেন না।

ইংরাজী ১৮৯৭ সালে কালেজের বার্ষিক আয় ৭১০০০৲ হাজার টাকা দাঁড়ায়। ঐ বৎসর তৎকালীন রাজপ্রতিনিধি লর্ড এলগিন্‌কে মরহুম সার সৈয়দ যে অভিনন্দন পত্র প্রদান করেন তাহাতে তিনি বলিয়াছেন:—"The college, has during 22 years of its existence, made much greater progress in numbers, in buildings and in reputation than we ventured to hope. It is still, however, very far from the attainment of the ultimate end we have set before us, and of which we cannot hope to live to see the foundation in India, viz, of a University for the

Mahomedans of India, similar to the great English Universities of Oxford and Cambridge. ইহার মর্ম্ম এই—"গত ২২ বৎসর সময়ে এই কালেজ ছাত্র সংখ্যা, কালেজ গৃহ এবং অন্যান্য অনেক বিষয়েই আশাতীত সুখ্যাতি লাভ করিয়াছে, কিন্তু এখনও আমাদের শেষ লক্ষ্য পূর্ণ হইবার অনেক বিলম্ব আছে। ইংলণ্ডের কেম্ব্রিজ্ এবং অক্স্ফোর্ডের ন্যায় ভারতবর্ষে মুসলমানদের একটা বিশ্ববিদ্যালয় আমরা দেখিতে ইচ্ছা করি। হয়তো আমাদের জীবন কালে এই আশা পূর্ণ হইবে না।"

কালেজের বর্ত্তমান আয় বার্ষিক ২লক্ষ টাকার উপর। এখনও কি আমাদের নেতার আশা পূর্ণ হইবার সময় হয় নাই? যাঁহার জীবনব্যাপী চেষ্টা এবং দুরদর্শী অনুষ্ঠানে আ'জ ভারতীয় মুসলমানবর্গ এই নব উৎসাহে মাতিয়াছেন, সেই মহাত্মার আশা পূর্ণ করিবার চেষ্টা করা কি প্রত্যেক মুসলমানের কর্ত্তব্য নহে? আমাদের নিজের চেষ্টা থাকিলে দয়াবান্ গবর্ণমেণ্টের নিকট আমরা বিলক্ষণ সহানুভূতি এবং সাহায্য পাইব। প্রধান২ বহু রাজপুরুষ আলীগড় কালেজে পদার্পণ করিয়াছেন এবং তাঁহারা সকলেই একবাক্যে প্রতিষ্ঠাপয়িতার সাধু অনুষ্ঠানের প্রতি সহানুভূতি দেখাইয়াছেন। আমি এ স্থলে লর্ড ম্যাক্ডোনল্ড্ মহোদয়ের মন্তব্য উদ্ধৃত করিতে ইচ্ছা করি। লর্ড ম্যাক্ডোনাল্ড্ উত্তরপশ্চিম প্রদেশের ছোটলাট থাকাকালে আলীগড় কালেজ পরিদর্শন করিয়া বলিয়াছিলেন:—

"It is not too much to hope that this college will grow into the Mahomedan University of the future, that the place will become the Cordova of the East, and that in these cloisters Mahomedan genius will discover, and under the protection of the British crown, work out the social, religious and political regeneration of which neither Stamboul nor Mecca afford a prospect". ইহার তাৎপর্য্য এই—"ইহা আশা করা বোধ হয় অত্যধিক হইবে না যে কালে এই কালেজ একটা মুসলমান বিশ্ববিদ্যালয় রূপে পরিণত হইয়া পূর্ব্বদেশীয় কর্ডভারূপে গণ্য হইবে। এবং এই বিশ্ববিদ্যালয়ে নানা স্থানের মুসলমান ছাত্রগণ সমবেত হইয়া তাহাদের প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ দেখাইবে, এবং ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের পরিচালনাধীন, মুসলমান ছাত্রগণ এরূপ সামাজিক, নৈতিক এবং রাজনৈতিক উন্নতির পরাকাষ্ঠা দেখাইবে, যাহা ইস্তাম্বুল কি মক্কাতে সফল হওয়ার কোন আশাই নাই।" রাজপুরুষদের এই সকল উক্তি শুনিয়া কাহার হৃদয় আনন্দরসে আপ্লুত না হয়? তাই বলতেছিলাম যে আমাদের চেষ্টা থাকিলে রাজপুরুষদের সহানুভূতির অভাব হইবেনা। এস্থলে একটা কথা বলা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। কেহ কেহ এরূপ আশঙ্কা করেন যে মুসলমান জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইলে তাহাতে কেবল মুসলমানদের পৌরাণিক তত্ত্বই আলোচিত হইবে, আধুনিক পাশ্চত্য বিজ্ঞানাদির দিকে অমনোযোগ বশতঃ মুসলমান ছাত্রগণের অধোগতি হইবে। আমি এক কথায় বলিতে চাই যে তাঁহাদের এটা ভুল ধারণা। আলীগড় কলেজ স্থাপনের পর হইতে ইহার উন্নতি যাঁহারা পর্য্যালোচনা করিয়া আসিতেছেন, তাঁহারা সকলেই এক বাক্যে বলিবেন যে এই কালেজ প্রতিষ্ঠাপয়িতার অভিপ্রায় সম্পূর্ণ অন্যরূপ। মুসলমান সাহিত্য এবং দর্শনের প্রতি ও জাতীয় ইতিহাস ইত্যাদির প্রতি প্রধানতঃ লক্ষ্য রাখিয়া আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষায় উৎকর্ষ লাভ করা এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান আদর্শ বলিয়া গণ্য হইবে। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান এবং সাহিত্য শিক্ষার প্রতি অবহেলার যে আশঙ্কা তাহা একটা ঘটনা উল্লেখ করিলেই বোধ হয় সকলের দূর হইবে। কিছু দিবস পূর্ব্বে মহামতি লর্ড কার্জ্জন্ আলীগড় কালেজে আরবি চেয়ার স্থাপনের চেষ্টা করিলে এবং তৎকালীন প্রিন্সিপাল সার থিওডর মরিসন্ সাহেব পূর্ব্বদেশীয় শিক্ষার জন্য পোষ্ট গ্রাজুয়েট বৃত্তি স্থাপনের অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে, কালেজের ছাত্র এবং ট্রাষ্টিগণ একবাক্যে ঐ অভিপ্রায়ের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। কারণ তাঁহারা পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের চেয়ার স্থাপনেরই বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। এস্থলে

একটী প্রশ্ন হইতে পারে যে ভারতবর্ষে পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয় থাকা সত্ত্বেও মুসলমানগণের স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের আবশ্যকতা কি? আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি বর্ত্তমান শিক্ষা প্রণালী মুসলমানগণের উপযোগী নয়। কারণ উহাতে ধর্ম্ম শিক্ষার কোন ব্যবস্থা নাই। সে জন্য আমরা ন্যায়বান্ গবর্ণমেণ্টকে দোষ দিতে পারি না। কারণ গবর্ণমেণ্ট বিশ্ববিদ্যালয় গুলি সকল জাতির জন্য; তাহাতে জাতি বিশেষের ধর্ম্ম শিক্ষার ব্যবস্থা হইতে পারে না। সে ব্যবস্থা আমাদেরই করা কর্ত্তব্য। সেই উদ্দেশ্যেই আলীগড় কালেজের সৃষ্টি হইয়াছে এবং উহাতে ধর্ম্মশিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা আছে। কিন্তু সে ব্যবস্থা উদ্দেশ্য সিদ্ধির পক্ষে প্রচুর নয়। যে পর্য্যন্ত ধর্ম্মশিক্ষা এবং তদ্বিষয়ক পরীক্ষার বিধান ইউনিভার্সিটি কর্ত্তৃক না হইবে সে পর্য্যন্ত ঐ বিষয় ছাত্রগণের ততদুর মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারে না। মুসলমানগণ যেরূপ দরিদ্র তাহাতে উদরান্নের চেষ্টাতেই তাহারা ব্যস্ত। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে না পারিলে সে উদ্দেশ্য সফল হয় না বিধায় যে বিষয়ে পরীক্ষা দিতে হইবে তাহারই জন্য তাহারা বিশেষ চেষ্টা করে; অন্য বিষয়ে তাহাদের মনোযোগ আকৃষ্ট হয় না; তাহার ফলে ধর্ম্মবিষয়ে শিক্ষার ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও সে শিক্ষা আশানুরূপ হয় না। এতদ্ব্যতীত জাতীয় সাহিত্য ও জাতীয় ইতিহাস শিক্ষা না করিলে জাতীয় উন্নতি অসম্ভব। তাহারও ব্যবস্থা সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ে হইতে পারে না। প্রধানতঃ এই জন্যই মুসলমানগণের স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের আবশ্যক। পক্ষান্তরে এই বিংশ শতাব্দীতে যেরূপ দর্শন বিজ্ঞানের উন্নতি হইতেছে এবং বর্ত্তমান যুগে জনগণের অনুসন্ধান বৃত্তি যেরূপ প্রবল ও সেই সঙ্গে ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বিগণ যেরূপ ইস্লামের প্রতি আক্রমণ করিতেছেন তাহাতে কেবল অধুনা প্রচলিত পদ্ধতি অনুসারে স্বীয় ধর্ম্মশিক্ষা দ্বারা স্বধর্ম্ম রক্ষা ও প্রচার অসম্ভব। এই বিষয়ে সাফল্য লাভের নিমিত্ত অন্যান্য ধর্ম্মসম্বন্ধীয় পুস্তক এবং আধুনিক বিজ্ঞান দর্শনাদির আলোচনাও একান্ত আবশ্যক। প্রস্তাবিত ইউনিভার্সিটীতে যাঁহারা শিক্ষা পাইবেন তাঁহাদের দ্বারা ধর্ম্ম রক্ষা ও প্রচারেরও যথেষ্ট সাহায্য হইবে।

এক্ষণে যে সকল ইউনিভার্সিটী ভারতবর্ষে আছে তাহাতে মুসলমানগণের প্রতিনিধির সংখ্যা অতি বিরল সুতরাং উহাতে মুসলমানগণের উপযোগী শিক্ষার ব্যবস্থা হওয়া একরূপ অসম্ভব। ইহার উদাহরণের জন্য অধিক দূর যাইতে হইবে না। ভারতবর্ষের প্রধান বিশ্ববিদ্যালয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ই দেখুন; ইহার কার্য্যনির্ব্বাহক সভা অর্থাৎ সিণ্ডিকেটের সভ্য সংখ্যা ১৭ জন; তন্মধ্যে ৯ জন ইংরাজ ও ৮ জন হিন্দু; একটিও মুসলমান ইহাতে নাই। এতদ্ব্যতীত ইহার ফ্যাকাল্টি সমূহে ১৪৩জন সভ্য আছেন; তন্মধ্যে ইংরাজ ৬৭ জন, হিন্দু ৬৮ জন, মুসলমান মাত্র ৮ জন। ইহার অন্যান্য সবকমিটীতে ৩৩ জন সভ্য আছেন; তন্মধ্যে ইংরাজ ১২ জন হিন্দু ২১ জন, মুসলমান এক জনও নাই।

	ইংরাজ	হিন্দু	মুসলমান	সমষ্টি
সিণ্ডিকেট	৯	৮	০	১৭
Faculty of Art	৩২	৩০	৪	৬৬
,, of Science	১৪	১৩	০	২৭
,, of Law	৫	১৫	৪	২৪
,, of Medicine	৭	৭	০	১৪
,, of Engineer	৯	৩	০	১২
লাইব্রেরি কমিটী	৭	৭	০	১৪
ট্রান্সফার কমিটী	১	৪	০	৫
ছাত্রাবাস কমিটী	১	৫	০	৬
বোর্ড অব একাউণ্টস	০	৩	০	৩
বোর্ড অব মডারেটার	০			
ইন সায়েন্স	৩	২	০	৫

যে ইউনিভার্সিটীর কার্য্যনির্ব্বাহক সভা অর্থাৎ সিণ্ডিকেটে এক জনও মুসলমান সভ্য নাই সেই ইউনিভার্সিটিতে মুসলমানগণের স্বার্থ কতদূর রক্ষিত হইতে পারে তাহা সহজেই অনুমেয়। ইংরাজসভ্যগণ নিরপেক্ষ ভাবে সকল সম্প্রদায়ের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য করিয়া থাকেন সত্য কিন্তু তাঁহারা আমাদের অভাব অভিযোগ জানিবেন কিরূপে? আমাদের অভাব অভিযোগ সিণ্ডিকেটের কর্ণগোচর করিবার জন্যও একটি প্রতিনিধি নাই! এইরূপ মুসলমান মেম্বর শূন্য ইউনিভার্সিটির

নিকট আমরা কি আশা করিতে পারি? আমাদের প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষাসমিতি যে সকল অভাব অভিযোগের জন্য ক্রমাগত চিৎকার করিতেছে তাহার অধিকাংশ বিষয়ে এ পর্য্যন্ত কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় কর্ণপাত করে নাই। সুতরাং আমাদের জাতীয় বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অত্যাবশ্যকতা বোধ হয় আর কাহাকেও চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়াদিতে হইবে না।

এস্থলে একথাও বোধ হয় অযৌক্তিক হইবে না যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এ প্রদেশের কেবল মুসলমান কেন হিন্দু মুসলমান কোন সম্প্রদায়েরই উপযোগী নয়। এ প্রদেশের কাহারও স্বার্থ রক্ষিত হইতেছে না; কারণ উহার ফ্যাকাল্টি সমূহে ১৪৩ জন সভ্যের মধ্যে আমাদের প্রদেশের মাত্র ৯ জন সভ্য আছেন। ইহাতে প্রাদেশিক স্বার্থ কতদূর রক্ষিত হইতেছে তাহা সহজেই অনুমেয়।

মুসলমান-বিশ্ববিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠারূপ শুভকার্য্যের জন্য বর্ত্তমান বৎসর অপেক্ষা আর সুসময় হইতে পারে না। এই বৎসর আমাদের সম্রাট্ সদাশয় মহামতি পঞ্চম জর্জ্জ তাঁহার ভারতীয় প্রজাবর্গের অবস্থা স্বচক্ষে দর্শন করার জন্য স্বয়ং শুভাগমন করিয়াছেন। তাঁহার শুভাগমনের স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ আমরা যদি এই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিতে পারি তবে রাজভক্ত মুসলমান প্রজার হৃদয়ে সম্রাটের শুভাগমন চিরঅঙ্কিত হইয়া থাকিবে।

পরন্তু অক্সফোর্ড কিম্বা কেম্ব্রিজের ন্যায় ভারতবর্ষে অদ্যাবধি কোন রেসিডেন্শিয়াল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয় নাই। বর্ত্তমান বিশ্ববিদ্যালয়গুলি বালকগণের পরীক্ষা লইয়াই এবং পরীক্ষার জন্য পুস্তকাদি নির্ব্বাচন করিয়াই তাহাদের কর্ত্তব্য শেষ করিয়া থাকে। বালকগণের নৈতিক জীবনের উন্নতিকল্পে শিক্ষক ছাত্রের একত্র অবস্থান, একত্র সম্মিলন যে কিরূপ সুফলদায়ক তাহা বিলাতে অক্সফোর্ড, কেম্ব্রিজ এবং আমাদের দেশে আলীগড় কলেজ বিশেষরূপ প্রতিপন্ন করিয়াছে। ঈদৃশাবস্থায় প্রস্তাবিত রেসিডেন্শিয়াল মুসলমান বিশ্ববিদ্যালয় যে কিরূপ উপকারজনক হইবে তাহা সুধীজনমাত্রেই বুঝিতে পারিবেন।

কেহ কেহ এরূপ আপত্তি উত্থাপন করিতে পারেন যে উত্তর প্রদেশে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইলে তাহাতে আমাদের কি লাভ হইবে? তাঁহাদিগের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে ভারতীয় মুসলমানগণের বর্ত্তমান অবস্থা বিবেচনায় মুসলমানের জন্য পৃথক্ বিশ্ববিদ্যালয় একটীর অধিক হওয়া একপ্রকার অসম্ভব। সুতরাং এই প্রকার প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থান আলীগড় ব্যতীত অন্য কোথায়ও হইতে পারে না। আলীগড় কলেজের ন্যায় একটী উন্নত শিক্ষাকেন্দ্র যথায় স্থাপিত আছে সেইস্থান ব্যতীত অন্য কোথায়ও এরূপ একটী বৃহৎ অনুষ্ঠানের প্রথম সূত্রপাত হইতে পারে না।

এই বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইলে ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই ইহার অধীন স্কুল ও কলেজ স্থাপিত হইতে পারিবে। এবং পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম অথবা ভারতবর্ষের অন্য যে কোন প্রদেশস্থিত স্কুল বা কলেজ এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারিবে।

আলীগড় কলেজের কর্তৃপক্ষগণ যেরূপ অদম্য উৎসাহ এবং অক্লান্ত পরিশ্রমের সহিত এই অত্যাবশ্যক কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন তাহাতে আশা করা যায় যে তাঁহাদের চেষ্টা অচিরে ফলবতী হইবে এবং সত্বরই তাঁহারা আলীগড় কলেজকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করিতে কৃতকার্য্য হইবেন। এই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইলে মুসলমানের পার্থিব ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় শিক্ষার সামঞ্জস্য স্থাপিত হইয়া মুসলমান সমাজের একটী গুরুতর অভাব দূরীভূত হইবে।

মঙ্গলাচরণ।

১২ই ডিসেম্বর, ১৯১১।

রাগিণী আলাইয়া—তাল একতালা।

আজ আনন্দে মগন!
আসমুদ্র অভ্রভেদী হিমাচল,
আগান্ধার ব্রহ্ম বিশাল ভূতল,
অনুরাগে যেন বড়ই বিহ্বল,
মুগ্ধ যেন মন স্নিগ্ধবিলোকন!

আজি আমাদের ভাগ্য অতুলিত,
ভারত-সম্রাট্ ভারতে উদিত,
পশ্চিম হইতে পূর্ব্ব আশা-গত,
নব রবি যেন! অহো সুঘটন!

অস্ত-সূর্য্য সেই ইন্দ্রপ্রস্থ ধাম,
এবে ঝিল্লি-নিনাদিত দিল্লী নাম,
নরসিংহে অলঙ্কৃত অনুপাম,
সেই সুবিশ্রুত আজি সিংহাসন।

করুক চন্দ্রমা সুধা বিতরিত,
(আজি) এ আসন যোগ্য জনে বিভূষিত;
একচ্ছত্র হেন ভূপতি রঞ্জিত,
হয় নাই কভু এই সিংহাসন।

ভারতের সূর্য্যচন্দ্র সুখে নত;
আজি ভারতের রাজ্য শত শত,
এই সিংহাসন সমীপে বিনত,
সরস প্রভাতে হরষিত মন!

আজি ভারতের সহর, বন্দর,
গ্রাম, পল্লী, টোল, আশ্রম, নগর,
নদ, নদী, হ্রদ, কান্তার, প্রান্তর,
সাগর ভূধর, উজ্জ্বল-দর্শন!

শান্তি বিধায়িনী শ্রান্তি বিনাশিনী,
আজি ইন্দ্র-প্রস্থ-প্রান্তপ্রবাহিণী,
যমুনা প্রাচীনা কল-নিনাদিনী,
ধাইছে গাইছে সম্রাট্ কীর্ত্তন।

নির্ম্মল সলিলে অর্ঘ্য দান করি,
আনন্দিত-মন কালিন্দী সুন্দরী,
অতীত-সাক্ষিণী পয়সে রক্ষিণী
পুরাতন নৃপ-রুচির-সদন!

ওহে ভারতের রাজ-রাজেশ্বর!
বিজ্ঞ বাগ্মী প্রজারঞ্জন-তৎপর!
মধুমাখা হাসি বড় ভালবাসি,
ভালবাসি তব এ অভিষেচন!

তব দেব বড় প্রিয় হিন্দুস্থান,
তব সিংহাসনে মোরা ভক্তিমান্,
প্রীতিভক্তির এই আদান প্রদান
অতুল জগতে হেন সম্মিলন!

তুমি আমাদের, আমরা তোমার,
(আজি) এই অভিমান হৃদয়ে সঞ্চার,
কি দিয়ে তোষিব, কি দিয়ে ভূষিব,
যোগ্য উপহার-হীন প্রজাগণ।

রাজ-ভক্তি-মালা দিনু উপহার;
প্রীতিমুক্তাজালে গাঁথা এই হার,—
লহ রাজেশ্বর তোমার প্রজার;
তব অনুরক্ত ভক্ত প্রজাগণ।

তুমি দেব ভবে দেবাংশ-সম্ভব,
আর্য্য হিন্দুর ইহা বিশ্বাস-প্রভব;
চিরভক্ত অনুরক্ত হিন্দু সব—
বিশ্বাসে তাঁহারা শাস্ত্রের লিখন

পুণ্যবতী ধন্য সম্রাট্-মহিষী,
নানাগুণে পৃথিবীতে মহীয়সী,
স্নেহসহ যথা দয়া গরীয়সী,
তব সনে তাঁর শুভ সম্মিলন।

দেখিয়া তোমার হাসিমাখা মুখ,
স্নেহমাখা কথা শুনি বড় সুখ;
(আজ) উৎফুল্ল আনন, যত প্রজাগণ,
তুমি হে ভারত-নয়ন-রঞ্জন।

সারস্বত-তীর্থ-প্রিয়-সেবিগণ,
যাচে আজি ভগবানের সদন :—
সমহিষী তব শতায়ু বর্দ্ধন
বিশাল সাম্রাজ্যে শান্তি বিরাজন।

(তব) চির রাজ্য ভোগ, রোগ নিবারণ,
ক্রমশঃ প্রজার উন্নতি সাধন,
'সূর্য্যো নাস্তমেতি' যে রাজ্যে কখন,
হোক্ সে রাজ্যের ক্রমশঃ বর্দ্ধন।

কুঞ্জে কুঞ্জে ভৃঙ্গ গুঞ্জুক মঞ্জুল,
প্রস্ফুটিত হোক্ বকুল বঞ্জুল;
কোকিল কাকলী রবে বনস্থলী
হোক আজি সব মঙ্গল-মিলন।

কুন্দ-মকরন্দ করি বিকিরণ,
মন্দ গন্ধবহ বহুক্ সঘন;
নির্ঝর ঝর্ঝর রবে অনুক্ষণ,
করুক সুপেয় সবে বিতরণ।

শ্যামল প্রান্তর, বিমল অম্বর,
নব-দূর্ব্বাদল, সলিল নির্ম্মল,
অকাল বল্লভে নূতন পল্লবে
সুশোভিত হোক যত তরুগণ!

শ্রীপ্রসন্নচন্দ্র বিদ্যারত্ন।

আয়ুর্ব্বেদ ও আধুনিক রসায়ন।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

বঙ্গ (Tin)

প্রাচীন ইতিহাস—পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইহইয়াছে যে শুক্লযজুর্ব্বেদ ও মনুসংহিতাতে "ত্রপুর" উল্লেখ আছে। রঙ্গ, বঙ্গ, ত্রপু, পিচ্চট এই কয়টি বঙ্গের পর্য্যায়। সুশ্রুতের সময় হইতে যে ছয়টি ধাতু আয়ুর্ব্বেদে গৃহীত হইয়াছে তাহার মধ্যে বঙ্গ অন্যতম। সুপ্রসিদ্ধ মেগাস্থেনিস (Megasthenes) তাঁহার বিখ্যাত ভ্রমণবৃত্তান্তে ভারতের স্বর্ণ, রৌপ্য তাম্র, লৌহ, বঙ্গ প্রভৃতি ধাতুর ব্যবহার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। আইন আকবরীতে দেখিতে পাই যে পঞ্জাবের নদী সকলের বালুকা হইতে অন্যান্য ধাতুর সহিত বঙ্গও পাওয়া যাইত। টেভার্নিয়ার (Tavernier) তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্তে বঙ্গের উল্লেখ করিয়াছেন।

ধাতুপ্রস্তুত প্রক্রিয়া (Metallurgy)—বঙ্গের প্রস্তুতপ্রক্রিয়ার বিস্তৃত উল্লেখ আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থে দেখিতে পাই নাই। ইউরোপে প্রাচীনকাল হইতে টিন্‌ষ্টোন (Tinstone) নামক খনিজ পদার্থ হইতে বঙ্গ প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছে। রঙ্গের টিনষ্টোন ভিন্ন অন্য খনিজ পদার্থ সচরাচর মিলে না। প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে যখন ত্রপু ও বঙ্গের ভূরি উল্লেখ দেখা যায় তখন নিশ্চয়ই এই টিনষ্টোন হইতে বঙ্গ উৎপন্ন হইত। টিনষ্টোন দেখিতে শ্বেতবর্ণ কিন্তু ইহার সংস্কৃত প্রতিশব্দ আজ পর্য্যন্ত নিরূপিত হয় নাই। রসরত্নসমুচ্চয়ে "গৌরীপাষাণ" নামক একটি খনিজপদার্থের উল্লেখ সাধারণ রসবর্গের মধ্যে দেখা যায়। আমার মনে হয় যে এই গৌরীপাষাণই টিন্‌ষ্টোন। ইহার স্বরূপ বর্ণনায় দেখিতে পাই যে উহা "স্ফটিকাভ", "শঙ্খাভ" ও "হরিদ্রাভ" এবং উহার সত্ত্ব (অর্থাৎ বঙ্গ) "শুদ্ধ শুভ্র"। *

---

* স্ফটিকাভশ্চ শঙ্খাভো হরিদ্রাভস্ত্রয়ঃ স্মৃতাঃ।
তালবৎ বাহয়েৎ সত্ত্বং শুদ্ধং শুভ্রং প্রযোজয়েৎ॥
রসরত্নসমুচ্চয়। তৃতীয় অধ্যায়।

তাহা হইলে গৌরীপাষাণ যদি টিন্‌ষ্টোন* হয়, রসরত্নসমুচ্চয়ের মতে উহার সত্ত্বপাতনবিধি হরিতালের সত্ত্বপাতনবিধির অনুরূপ। টিন্‌ষ্টোন হইতে বঙ্গ প্রস্তুত করিতে হইলে উহার সহিত কয়লা মিশ্রিত করিয়া অগ্নির দ্বারা উত্তপ্ত করিতে হয়। হরিতালের সত্ত্বপাতনবিধিতে যে "ষোড়শিকাতৈলের" সহিত মিশ্রিত করিয়া সাত দিবস অগ্নিতে উত্তপ্ত করিবার ব্যবস্থা আছে, * তাহাতে উৎপন্ন অঙ্গার (carbon) সংযোগে গৌরীপাষাণ বঙ্গে পরিণত হইতে পারে।

বঙ্গের শোধন—বঙ্গ খুরক ও মিশ্রক ভেদে দুই প্রকার। খুরক বঙ্গ বিশুদ্ধ এবং মিশ্রক সীসক সংযুক্ত বলিয়াই বোধ হয়। খুরক বঙ্গ "ধবল, মৃদুল, স্নিগ্ধ, দ্রুতদ্রাব ও সগৌরব" এবং ইহাকে আঘাত করিলে শব্দ হয় না। অপর পক্ষে মিশ্রক বঙ্গ "শ্যামশুভ্র"। বঙ্গের শোধন সীসক ও যশদের মত। ভাবপ্রকাশের মতে বঙ্গ অগ্নির উত্তাপে গলাইয়া তৈল, তক্র প্রভৃতিতে তিন তিনবার নিক্ষেপ করিলে শোধিত হয়। এই শোধন প্রক্রিয়া নিরর্থক বলিয়া মনে হয়।

বঙ্গের মারণ—নিম্নলিখিত মারণ প্রক্রিয়াই প্রশস্ত। "শোধিত বঙ্গপত্র একটি লৌহময় হাঁড়ীর মধ্যে রাখিয়া উনানে বসাইয়া অগ্নিদ্বারা জ্বাল দিবে; বঙ্গ গলিয়া যাইলে উহাতে সমান পরিমাণ আপাংক্ষার পুনঃ পুনঃ নিক্ষেপ পূর্ব্বক ভস্ম না হওয়া পর্য্যন্ত স্থূলাগ্র লৌহদণ্ডদ্বারা মর্দ্দন করিবে; তৎপরে ভস্ম হইলে উহা জলে উত্তমরূপে ধৌতকরতঃ অঙ্গারাদি হীন করিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া পুনরায় দুগ্ধসহ মর্দ্দন পূর্ব্বক শারাব-সংপুটে তীক্ষ্ণ অগ্নিদ্বারা পুটপাক করিবে। ইহাতে বঙ্গ নিশ্চয়ই মারিত হইবে। * এই মারণ প্রক্রিয়ায় প্রথমে ক্ষার সংযোগে বঙ্গ কার্ব্বনেটে (carbonate) পরিণত হইবে, পরে উত্তাপ সংযোগে টিন্ অকসাইড (tin oxide) প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। জলে উত্তমরূপে ধৌত করিয়া লইলে অবশিষ্ট ক্ষার দ্রব্য জলে দ্রবীভূত হইয়া বাহির হইয়া যাইবে।

মারিত বঙ্গের রাসায়নিক বিশ্লেষণ—প্রথম নমুনা। দেখিতে শ্বেতাভ, খুব ধব্‌ধবে সাদা নহে। অসংযুক্ত বঙ্গ নাই। বালুকা (silica) মিশ্রিত আছে। নচেৎ বেশ বিশুদ্ধ টিন্ অকসাইড্ (tin oxide)। জলে দ্রবণীয় অংশ খুবই কম।

দ্বিতীয় নমুনা। দেখিতে ধূসর বর্ণ। উহাতে টিন্ অক্সাইড্ ছাড়া সীসক (oxide of lead) যথেষ্ট ছিল। বেশ বুঝা যায় যে এই নমুনাতে প্রথমে বিশুদ্ধ বঙ্গ না লইয়া বাজারের রাং ব্যবহৃত হইয়াছে। বাজারে রাং বলিয়া যাহা বিক্রীত হয় তাহা বিশুদ্ধ বঙ্গ নহে, উহা বঙ্গ ও সীসক এই দুই ধাতুর মিশ্রিত দ্রব্য। বঙ্গ বলিয়া রাং যেন কেহ ব্যবহার না করেন।

সীসক (Lead)

প্রাচীন ইতিহাস—সীসকের ব্যবহার বৈদিককাল হইতে চলিয়া আসিয়াছে, এমন কি অথর্ব্ব-বেদের নানাস্থানে সীসের মাদুলি ধারণের ব্যবস্থা আছে। শুক্লযজুর্ব্বেদে ও মনুতে সীসের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। আয়ুর্ব্বেদীয় যুগে সীস সুশ্রুতের সময় হইতে ধাতু মধ্যে স্থান পাইয়াছে। আইন আকবরীপাঠে জানা যায় যে দিল্লীসুবার অধীনে কুমায়ুন সরকারে অন্যান্য ধাতুর সহিত সীসও উৎপন্ন হইত এবং পঞ্জাবের নদী সমূহের বালুকা হইতেও সীসক সংগৃহীত হইত।

ধাতু প্রস্তুত প্রক্রিয়া (metallurgy)—সীস ধাতুর প্রধান খনিজ পদার্থ (ore) হইতেছে **অঞ্জন** (gabeen)। বৈদ্যকে নানাবিধ অঞ্জনের উল্লেখ আছে—সৌবীরাঞ্জন, স্রোতোঞ্জন, রসাঞ্জন ইত্যাদি।

"স্ফটিকাভ"—Cf. "tinstone or cassiterite crystallising in the quadratic system and possessing an *adamantine* lustre"—Roscoe and Schorlemmer Treatise on Chemistry, Vol. II, Part II.

* পলালকং রবেদুগ্ধৈর্দ্দিনমেকং বিমর্দ্দয়েৎ।
ক্ষিপ্ত্বা ষোড়শিকাতৈলে মিশ্রয়িত্বা ততঃ পচেৎ॥
অনাবৃতপ্রদেশে চ সপ্তযামাবধি ধ্রুবম্।
স্বাঙ্গশীতমধস্থং চ সত্ত্বং শ্বেতং সমাহরেৎ॥
রসরত্নসমুচ্চয়, তৃতীয় অধ্যায়।

* রসেন্দ্রসার সংগ্রহ—বঙ্গ মারণ

এই সকল অঞ্জনের বস্তু নির্ণয় সম্বন্ধে অনেক মতভেদ আছে। এই মতভেদ আমি পূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছি। মদনপালনির্ঘণ্টু মতে "সৌবীরাঞ্জনম্ কৃষ্ণম্" এবং ভাবপ্রকাশমতে "স্রোতোঽঞ্জনং কৃষ্ণং সৌবীরং শ্বেতমীরিতম্।" আধুনিক কবিরাজ মহাশয়েরা সৌবীরাঞ্জনকে শ্বেতসুর্ম্মা ও স্রোতোঽঞ্জনকে কৃষ্ণসুর্ম্মারূপে ব্যবহার করেন। এখানে স্রোতোঞ্জনই কৃষ্ণসুর্ম্মারূপে উল্লিখিত হইবে।

এই কৃষ্ণসুর্ম্মা হইতে কি প্রকারে সীস ধাতু আহৃত হইত তাহা এ পর্য্যন্ত সম্যক্‌রূপে নির্ণীত হয় নাই। এখানে সীস ধাতুর প্রস্তুত প্রক্রিয়া স্থির করিবার প্রয়াস পাইয়াছি এবং নিম্নলিখিত প্রক্রিয়াটি অনেকটা আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত তাহার সন্দেহ নাই। রসরত্নসমুচ্চয়কার বলিয়াছেন "অঞ্জনবর্গ হইতে সত্ত্বপাতন মনঃশিলার সত্ত্ব পাতনের অনুরূপ" * মনঃশিলার সত্ত্বপাতন প্রক্রিয়ায় দেখিতে পাই যে তাহার সহিত অষ্টমাংশ **কিট্ট (মণ্ডুর বা লৌহের মরিচা)** গুড়, গুগ্‌গুলু ও মাখম মিশ্রিত করিয়া **কোষ্ঠীযন্ত্রে** উত্তপ্ত করিলে তাহার সত্ব প্রাপ্ত হওয়া যায়।* অতএব কৃষ্ণসুর্ম্মা হইতেও এই প্রক্রিয়ায় সীসধাতু প্রাপ্ত হওয়া যাইত। এই প্রক্রিয়ার প্রথমে গুগ্‌গুলু, গুড় প্রভৃতি জৈব পদার্থ উত্তপ্ত হইয়া অঙ্গারে (Carbon) পরিণত হইবে এবং মণ্ডুর অঙ্গারের সহিত উত্তপ্ত হইয়া **লৌহ-ধাতুতে** পরিণত হইবে। পরে এই লৌহধাতু কৃষ্ণসুর্ম্মাকে সীস ধাতুতে পরিণত করিবে। বদ্ধ কোষ্ঠিযন্ত্রে উত্তপ্ত হওয়াতে উপরিস্থ উত্তপ্ত কলসী হইতে গলিত সীসধাতু নিম্নস্থ শীতল কলসী মধ্যে পতিত হইবে। অধুনাও সীসধাতু কৃষ্ণসুর্ম্মাকে লৌহ ও অঙ্গার সংযোগে উত্তপ্ত করিয়া প্রস্তুত হইয়া থাকে। †

সীসকের শোধন—ভাব প্রকাশ মতে সীসককে অগ্নিতে গলাইয়া তৈল, তক্র প্রভৃতি দ্রবপদার্থে তিন তিনবার নিক্ষেপ করিয়া শোধিত করিবার ব্যবস্থা আছে। রসেন্দ্রসার সংগ্রহে সীসক শোধনের নিম্নলিখিত প্রক্রিয়া বর্ণিত আছে। "একটি হাঁড়িতে আকন্দের ক্ষীর রাখিয়া তদুপরি আর একটি সচ্ছিদ্র হাঁড়ি রাখিয়া দিবে। অনন্তর সীসা বা বঙ্গ অগ্নিসংযোগে গলাইয়া সচ্ছিদ্র হাঁড়িতে ঢালিয়া দিলে উহা ছিদ্র দ্বারা আকন্দক্ষীর সংযুক্ত নিম্নস্থ হাঁড়ীতে পড়িবে। এই প্রকার তিন তিনবার করিলে সীসক ও রাং বিশোধিত হইবে।" এই দুইটি প্রক্রিয়াই নিরর্থক বলিয়া মনে হয়।

সীসক মারণ—সীসক মারণের কয়েকটি মতান্তর প্রক্রিয়া আছে। ইহাদের মধ্যে সচরাচর যে দুইটি প্রক্রিয়া প্রচলিত তাহার আলোচনা করা যাইবে।

প্রথম প্রক্রিয়া। একটি মৃত্তিকাপাত্রে সীস স্থাপন করতঃ অগ্নিসংযোগে দ্রব করিয়া উহার চারি অংশ তেঁতুল বৃক্ষের ও অশ্বত্থবৃক্ষের ত্বক্‌চূর্ণ নিক্ষেপ করিবে। পরে ঐ অগ্নির উপরে রাখিয়া এক প্রহর কাল লোহার হাতাদ্বারা চালনা করিলেই সীসা ভস্ম হইবে। অনন্তর ঐ ভস্মের সমপরিমাণ মনঃশিলা মিলিত করতঃ দ্বিগুণ কাঞ্জিতে পেষণ করিয়া গজপুটে পাক করিবে। তৎপরে শীতল হইলে পুনর্ব্বার কাঞ্জি ও মনঃশিলার সহিত মর্দ্দন করতঃ পুটে পাক করিবে, এই প্রকারে ষাটিবার পাক করিলে সীস মারিত হয়।* এই প্রক্রিয়ায় নিম্নলিখিত রাসায়নিক ক্রিয়া সাধিত হইতে পারে। প্রথমে সীসক তেঁতুল ও অশ্বত্থবৃক্ষের ত্বক্‌চূর্ণ সংযোগে লেড্‌কার্ব্বনেটে (lead carbonate) পরিণত হইবে। তৎপরে কাঞ্জি সংযোগে আংশিক ভাবে লেড্‌ এসিটেটে (lead acetate) পরিণত হইবে। মনঃশিলা উত্তাপ সংযোগে

*মনোহ্বাসত্ত্ববৎ সত্ত্বমাঞ্জনানাং সমাহরেৎ।

* অষ্টমাংশেন কিট্টেন গুড়গুগ্‌গুলুসর্পিষা
কোষ্ঠ্যাং রুদ্ধা দৃঢ়ং ধ্মাতা সত্ত্বং মুঞ্চেন্মনঃশিলা।
রসরত্নসমুচ্চয়। ২য় অধ্যায়।

† "This method of lead smelting depends upon the fact that at a high temperature, metallic *iron*, in contact with lead sulphide is converted into ferrous sulphide with separation of lead. The ores... are smelted in a blast-furnace with coke and *either* metallic iron or such materials as will yield iron under the furnace conditions"—Newt's Inorganic chemistry.

* ভাব প্রকাশ—সীস মারণ।

উর্দ্ধগামী হইয়া যাইবে। উত্তাপ সংযোগে লেড কার্ব্বনেট্ ও লেড্ এসিটেট্ ক্রমে লেড অক্সাইডে (lead oxide বা litharge) পরিণত হইবে।

দ্বিতীয় প্রক্রিয়া। বক ফুলের পাতা পেষণ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা সীসকপত্র লেপন করিয়া একটী হাঁড়ির ভিতরে রাখিয়া অগ্নির উত্তাপে গলাইয়া তন্মধ্যে সীসার চতুর্থাংশ বাসক ও আপাংক্ষার পুনঃ পুনঃ নিক্ষেপ পূর্ব্বক বাসকের দণ্ডদ্বারা নাড়িতে নাড়িতে দুই প্রহর পর্য্যন্ত পাক করিয়া পুনরায় বাসকের রসে মর্দ্দন পূর্ব্বক সাতবার পুটপাক করিলে সীসক নিশ্চয়ই মৃত হইয়া সিন্দুরের ন্যায় বর্ণ-বিশিষ্ট হইয়া থাকে জানিবে। † এই প্রক্রিয়ায় আপাংক্ষার সংযোগে প্রথমে লেড কার্ব্বনেট (lead carbonate) উৎপন্ন হইবে এবং উহা অধিক উত্তাপ সংযোগে প্রথমে লিথার্জ (litharge) পরে রেড্ লেড্ (red lead) অর্থাৎ মেটে সিন্দুরে পরিণত হইবে।

মারিত সীসের রাসায়নিক বিশ্লেষণঃ—মারিত সীসের নমুনা লইয়া বড়ই গোলে পড়িয়াছিলাম। একটি নমুনা শ্বেত, অপরটি হরিদ্রাভ, তৃতীয়টি লোহিত, চতুর্থটি শ্বেত। প্রথম নমুনা। দেখিতে ঈষৎ শ্বেত সূক্ষ্ম গুঁড়া। জলে দ্রবণীয় অংশ শতকরা ১০ ভাগ হইবে। লেড্ কার্ব্বনেট (lead corbonate) ইহার অধিকাংশ ভাগ। অসংযুক্ত সীসও বেশ আছে। জলে দ্রবণীয় অংশে পোটাসিয়ম কার্ব্বনেটই বেশী, ক্লোরাইড ও ফস্ফেট খুব কম। বালুকাও আছে।

দ্বিতীয় নমুনা। দেখিতে হরিদ্রাভ। কার্ব্বনেট নাই। প্রায় সমস্তটাই লেড্ অক্সাইড (litharge)। অসংযুক্ত সীসক নাই। জলে দ্রবণীয় অংশ শতকরা ৩।৪ ভাগ—পোটাসিয়ম কার্ব্বনেট, ক্লোরাইড ও ফস্ফেট্।

তৃতীয় নমুনা। দেখিতে লোহিতবর্ণ। মেটে সিন্দুর। বিলাতি দ্রব্য বোধ হয়।

চতুর্থ নমুনা। দেখিতে ঈষৎ শ্বেত। রাসায়নিক বিশ্লেষণের ফল প্রায় প্রথমটির মত।

বৈদ্যকের বিবরণ পাঠে মনে হয় যে শাস্ত্রকারেরা সীস মারিত করিয়া লেড্ অক্সাইড প্রস্তুত করিতেন। আধুনিক কবিরাজ মহাশয়দের নমুনায় কোনটি কার্ব্বনেট্ই আছে—অক্সাইডে পরিণত হয় নাই। আমার মনে হয় যে সীস হরিদ্রাভ বা লোহিতাভ তাহাই সম্যক্ মারিত সীস, নচেৎ ঈষৎ শ্বেতবর্ণের মারিত সীসে অসংযুক্ত সীসও থাকিতে পারে। (ক্রমশঃ)।

শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী।

† রসেন্দ্রসারসংগ্রহ—সীসমারণ।

বঙ্গমঙ্গল। *

মহিষী সঙ্গে বঙ্গভবনে
ভারত-ভূপতি, এসগো আজ;
গায়িছে সপ্ত কোটী নরনারী
"স্বস্তি, স্বাগত, রাজাধিরাজ।"

নাহি হেথা গত—গৌরব ছায়া—
স্তম্ভ, প্রাসাদ, মিনার, তাজ;
নাহি গিরিতটে পাষাণে গঠিত
দুর্গ অজেয়—অরাতি লাজ।

হেথা সংগ্রামে বিক্রম-গাথা
কীর্ত্তিত নহে চারণমুখে,
জয়-পরাজয় হেথা অক্ষয়
চিহ্ন রাখেনি ধরার বুকে।

হেথায় ধরণী স্নিগ্ধ শ্যামলা,
নহে সে ঊষর ধূসর মরু;
বন-উপবনে চিক্কণ ঘন
পল্লবে ঢাকা লতিকা তরু।

* গত ৩০এ ডিসেম্বর রাজা ও রাণীর কলিকাতা আগমন উপলক্ষে রচিত।

হেথা সমতল প্রান্তর যার
সীমান্তে নভো—নীলিমভাতি,—
সন্তানতরে জননী যেমন
স্নেহের আঁচল রেখেছে পাতি'!

হেথা সরোবরে প্রভাত কিরণে
ফুটে উঠে যত কমলদল,
প্রতিঋতু, নব ফুল সম্ভারে
ঢেকে দিয়ে যায় অবনীতল।

কল্লোল তালে হেথা নিরবধি
বহে চঞ্চল তটিনী চয়,
বিহঙ্গ-গীতে মুখরিত দিক্,
মন্দ মধুর সমীর বয়।

প্রচারিত হেথা প্রেমের ধর্ম্ম,—
মুক্তির পথ—পরমা প্রীতি।
অযুত ছন্দে অগণিত কবি
গাহিয়াছে হেথা প্রেমের গীতি।

মঙ্গলময়ী বঙ্গ জননী—
স্নেহউজ্জ্বলা, বরদা-বেশ;
হেথা ভারতীর কমলকুঞ্জ,
এযে গো শান্তি প্রীতির দেশ।

এসগো বঙ্গে মহিষী সঙ্গে,
হের প্রকৃতির মোহন সাজ;
নির্ম্মল পূত প্রীতি অর্ঘ্য
লহ উপহার, ভারত-রাজ!

শ্রীরমণীমোহন ঘোষ

গ্রহ পর্য্যবেক্ষণ।

বাল্যকাল হইতে আমরা নবগ্রহের কথা শুনিতে পাই। তন্মধ্যে রাহু ও কেতু বাস্তবিক কোন স্থূল পদার্থই নহে। চন্দ্রকক্ষার ও পৃথিবী-কক্ষার পাতবিন্দুদ্বয় (Nodes); এজন্য ইহাদিগকে কখন কখনও ছায়াগ্রহ বলা হইয়া থাকে।

রবি (সূর্য্য) গ্রহ নহে, অসংখ্য স্থির নক্ষত্রের মধ্যে পৃথিবীর নিকটস্থ (নয়কোটি পঞ্চাশ লক্ষ মাইল দূরবর্ত্তী) একটী নক্ষত্র (Fixed star)। সোম (চন্দ্র) পৃথিবীর উপগ্রহ। অবশিষ্ট মঙ্গল (Mars) বুধ (Mercury) বৃহস্পতি (Jupiter) শুক্র (Venus) ও শনি (Saturn) এই পাঁচটি প্রকৃত গ্রহ (Planet)। ইহারা নির্দ্দিষ্ট নিয়মে পশ্চিম হইতে পূর্ব্বাভিমুখে ঠিক পৃথিবীর ন্যায় সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে আবর্ত্তন করিতেছে। পৃথিবীর আপেক্ষিক গতি ও অবস্থান বশতঃ নির্দ্দিষ্ট সময়ের কতকদিন পর্য্যন্ত ইহারা পশ্চিমদিকে অগ্রসর হইতেছে বলিয়া প্রতীয়মান হয়। ইহাই গ্রহগণের বক্র গতি (Retrograde motion)। এই পাঁচটি গ্রহের গতিবিধি লক্ষ্য করা সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য। ইহারা সঞ্চরণ-শীল বলিয়া প্রায়শঃই এক একটি রাশি চক্রের এক এক অংশে অবস্থান করে; সুতরাং এক সময়ে বা এক রাত্রিতে সবগুলির দর্শন লাভ কদাচিৎ ঘটিয়া থাকে। অনেককাল পরে সম্প্রতি এই সুযোগ উপস্থিত। আশা করি সর্ব্বসাধারণ এই সময় গ্রহ কয়েকটি চিনিয়া রাখিবেন এবং এখন হইতে তাহাদের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিবেন।

২। সম্প্রতি সন্ধ্যাকালেই মধ্যগগনের পূর্ব্বাংশে কৃত্তিকার (সাত ভাইএর, Pleaides) সন্নিকটে রক্তোজ্জ্বল মঙ্গলগ্রহ ও তাহার দক্ষিণ পশ্চিমে শনিগ্রহ অনেকেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। মঙ্গল সরল গতিতে পূর্ব্বমুখে অগ্রসর হইতেছে। শনি এখনও বক্রী; পৌষ সংক্রান্তিতে বক্রগতি ত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে পূর্ব্বদিকে

সরিতে থাকিবে। অপর তিনটী গ্রহ ইহাদের বিপরীত দিকে বৃশ্চিক রাশিতে বিচরণ করিতেছে।

৩। বৃশ্চিক রাশিকে অনেকেই চেনেন। নামের অনুরূপ এমন সুস্পষ্ট আকার অপর কোন তারকা পুঞ্জেরই নাই। পুষ্পমাল্যের ন্যায় অত্যোজ্জ্বল ছয়টি নক্ষত্র (বিশাখা, Akrab) ইহার মস্তক ও সম্মুখস্থ পদদ্বয়; সুন্দর লোহিতকান্তি অনুরাধা নক্ষত্র (Antares) লইয়া সাতটি তারকার ঈষদ্ বক্ররেখাতে ইহার মধ্য শরীর; এবং তন্নিম্নে অর্দ্ধ গোলাকার তিন চারিটি উজ্জ্বল নক্ষত্র (জ্যেষ্ঠা) লইয়া ইহার পুচ্ছদেশ।

৪। আগামী মাঘ মাসের প্রথম সপ্তাহে প্রত্যুষে দক্ষিণ পূর্ব্ব গগনে দৃষ্টিপাত করিলেই সমুজ্জ্বল তারকাপুঞ্জে সুগঠিত বৃশ্চিক (কাঁকড়া বিছা, Scorpion) সুস্পষ্ট দেখিতে পাইবেন। ঐ দেখুন উহার মধ্য শরীরে অগ্নি-স্ফুলিঙ্গবৎ অনুরাধা নক্ষত্র কেমন শোভা পাইতেছে। উহার সন্নিকটেই উজ্জ্বল বৃহস্পতি, (Jupiter) তাহার কয়েক অংশ নিম্নেই সমুজ্জ্বল শুক্রগ্রহ (Venus), ঐ দেখুন সুবৃহৎ বৃহস্পতিকেও হীনপ্রভ করিয়া ফেলিয়াছে। ইহার ১৬° ডিগ্রি নিম্নে জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রের পূর্ব্বদিকে ঐ যে একাকী একটি জ্যোতিষ্ক চঞ্চল প্রভাতে ঝিক্‌মিক্ (twinkle) করিতেছে ঐটিই আমাদের সুদুর্লভ বুধ-গ্রহ (Mercury)। অপর গ্রহগুলি স্থিরপ্রভ, কেবল মাত্র বুধ গ্রহের প্রভাই স্থির নক্ষত্রের প্রভার ন্যায় চঞ্চল।

৫। বুধগ্রহ অপেক্ষাকৃত ছোট, এবং সূর্য্যের সন্নিকটে ২৫° ডিগ্রি মধ্যে বিচরণ করে বলিয়া ইহা প্রায়ই আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না। কখনও সূর্য্যোদয়ের ঠিক্ পূর্ব্বে পূর্ব্বাকাশে কখনও বা সূর্য্যাস্তের পরই পশ্চিমাকাশে ১০। ১৫ দিন মাত্র বুধকে স্পষ্ট দেখিতে পাওয়াযায়; তৎপর বিপরীত গতিতে ক্রমশঃ সূর্য্যাভিমুখে সরিতে সরিতে অদৃশ্য হইয়া যায় এবং কয়েক দিন পরেই সূর্য্যের অপরদিকে পুনরায় প্রকাশিত হয়।

৬। এইরূপে বক্র গতিতে পশ্চিমগগনে অদৃশ্য হইয়া গত ১১ই পৌষ বুধ পূর্ব্বআকাশে উদিত হইয়াছে এবং ১৮ই পৌষ পর্য্যন্ত পশ্চিমদিকে সরিয়া সূর্য্য হইতে ক্রমশঃ দূরবর্ত্তী হইয়াছে। তৎপর বক্রগতি পরিত্যাগ পূর্ব্বক সরল গতিতে ১° ডিগ্রির কম পরিমাণ পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হইতেছে। পক্ষান্তরে পৃথিবীর গতিবশতঃ সূর্য্যের পূর্ব্বাভিমুখ দৃশ্যমান গতি সম্প্রতি দৈনিক ১° ডিগ্রি অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক সুতরাং কয়েকদিন আমরা বুধকে ক্রমশঃ উপরে উঠিতে অর্থাৎ সূর্য্য হইতে দূরবর্ত্তী হইতেই দেখিতেছি। পৌষ সংক্রান্তিতে বুধ ও সূর্য্যের এই দূরত্ব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইবে। ২৪½° ডিগ্রি (Greatest elongation) তৎপর বুধের গতি ক্রমশঃ দ্রুততর হইতে থাকিবে। এবং সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী হইয়া বুধ কয়েকদিন মধ্যেই অদৃশ্য হইবে; পুনরায় ফাল্গুন মাসের শেষ সপ্তাহে সূর্য্যাস্তের পর পশ্চিমাকাশে পরিদৃষ্ট হইবে।

৭। বৃহস্পতির দৈনিক সরল গতি সম্প্রতি ⅕° ডিগ্রি মাত্র; সুতরাং প্রতিদিনই তাহাকে সূর্য্য হইতে দূরবর্ত্তী হইতে অর্থাৎ পশ্চিমদিকে সরিতে দেখা যাইতেছে। পক্ষান্তরে শুক্রের গতি ক্রমশঃই বর্দ্ধিত হইতেছে। এই দ্রুত গতিতে শুক্র ২৭শে পৌষ বৃহস্পতিকে পশ্চাতে ফেলিয়া দৈনিক কিছু কিছু সূর্য্যেরদিকে অগ্রসর হইবে এবং বৃহস্পতি হইতে দূরবর্ত্তী হইতে থাকিবে।

৮। ১লা ও ২রা মাঘ উষাকাশ পর্য্যবেক্ষণ করিলে কৃষ্ণা দ্বাদশীও ত্রয়োদশীর ক্ষীণ শশিকলার সহিত উল্লিখিত গ্রহাদির সুন্দর সমাবেশ দেখিবেন; পক্ষান্তরে অমাবস্যা বা তাহার পর পর্য্যবেক্ষণ করিলে গাঢ় অন্ধকারে উক্ত জ্যোতিষ্ক সমূহ উজ্জ্বলতর দেখিতে পাইবেন।

শ্রীগিরিশচন্দ্র দে বি, এ,

ভ্রান্তি বিনোদ।

পঙ্কেরে ছানিয়া তবে পা'বে পদ্মফুলে।
তেমনি সত্যেরো জন্ম সন্দেহে ও ভুলে।
এ জীবনই শেষ নহে; এ যে শুধু খনি!
খুঁড়িলে অনেক মাটি পরে পা'বে মণি।

শ্রীদেবকুমার রায় চৌধুরী

প্রার্থনা।

উজ্জ্বল তুমি, বিকশিত তুমি,
জ্যোতির জ্যোতি হে!
সুন্দর তুমি, সুবিমল তুমি,
মঙ্গল-ময় হে!
নিখিলবিশ্ব তোমারি প্রকাশে
প্রেমের মূরতি হে,
বিপুল ছন্দে নব আনন্দে
তোমারে বন্দে হে।
বীণাটী আমার বেঁধেদাও আজি
বিশ্বের সুরে হে,
তোমারি রাগিণী উঠুক ধ্বনিয়া
আমার মাঝারে হে!
চরণ পরশে বিকাশিত কর
সুন্দর কর হে,
সার্থককর সকল আমার
সার্থক কর হে!

শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা।

মার্জ্জনা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)।

রূপনগরের জমীদার সন্তোষকুমার রায় চৌধুরী নবীন যুবক। বিধাতা যেন অতি নিপুণহস্তে তাহার বরবপুখানা নির্ম্মাণ করিয়াছেন,—তাহার অঙ্গসৌষ্ঠব অনিন্দনীয়, উজ্জ্বল গৌরকান্তি। পুরুষের মধ্যে এরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর অবয়ব অতি অল্পই দেখা যায়। শারীরিক সৌন্দর্য্য অপেক্ষা তাহার চরিত্রটি আরও মধুর,—অতিশয় অমায়িক, বিনীত এবং সর্ব্বদাই প্রফুল্লবদন। সন্তোষকুমার প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে গত বৎসর বি, এ পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। তাহার আরও বিদ্যাচর্চ্চা করিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু, বি, এ পাশ করিবার অব্যবহিত পরেই তাহার পিতা গৌরীশঙ্কর রায় চৌধুরীর মৃত্যু হওয়াতে সন্তোষ কলিকাতা ছাড়িয়া দেশে থাকিয়া জমিদারী পর্য্যবেক্ষণ করিতে বাধ্য হইয়াছে। পিতা গৌরীশঙ্কর অত্যন্ত প্রতাপশালী জমীদার ছিলেন। লাঠির সাহায্যে এবং নানারূপ সদসদুপায়ে পৈতৃক সম্পত্তি প্রায় দ্বিগুণিত করিয়া তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বে জমীদারীর বার্ষিক আয় লক্ষাধিক মুদ্রায় পরিণত করিয়াছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর, তাঁহার একমাত্র পুত্র সন্তোষকুমার এই বিশাল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইয়াছে।

চিরকাল সহরে থাকিয়া অভ্যস্ত সন্তোষ গ্রামে আসিয়া প্রথমে যেন একটু অসুবিধা বোধ করিতে লাগিল। প্রথম প্রথম আবশ্যক মতে জমীদারীর কার্য্যাদি দেখিয়া অবসর সময়ে নানাবিধ পুস্তকাদিপাঠে সময় অতিবাহিত করিত। কিন্তু এরূপ সঙ্গীহীন একঘেয়ে জীবন অধিক দিন সন্তোষের ভাল লাগিল না। হঠাৎ তাহার শীকারের সখ্ লাগিয়া গেল। পাঠ্যাবস্থায় যখন কলেজের অবকাশ সময়ে সন্তোষ বাড়ী আসিত তখন দুপুরবেলা সে বন্দুক লইয়া পাখীশীকারে বাহির হইত,—তখন হইতেই তাহার লক্ষ্য বেশ স্থির ছিল। তখন বিদ্যাভ্যাসে ব্যস্ত থাকায়, এই শীকার ব্যাপারটা ভাল করিয়া সন্তোষের মনে স্থান পায় নাই। এখন হাতে কোন কাজ না থাকায়, সন্তোষ উহাই লইয়া পড়িল। বহু বেতনভোগী শীকারী জমীদারের আশ্রয়ে স্থান পাইল; দিনরাত বন্দুকের চোঙ্ পরিস্কার চলিতে লাগিল;—রূপনগরের পশুপক্ষী আগ্নেয়াস্ত্রের গর্জ্জনে দেশ ছাড়িয়া পালাইল।

যখন রূপনগরের চারি সীমায় বহু অনুসন্ধানেও কেবল লুব্ধ বায়সকুল ভিন্ন অপর কোন পক্ষী দুষ্প্রাপ্য হইয়া পড়িল, তখন হতোদ্যম হইয়া সন্তোষ কয়েকদিন বাটীতে থাকিয়া আবার পূর্ব্বের ন্যায় পুস্তক পাঠ আরম্ভ করিল। হঠাৎ একদিন একজন শীকারী আসিয়া জমীদারকে সংবাদ দিল, যে তাহার জমীদারীর অন্তর্গত হলুদিবাড়ীর জঙ্গলে প্রকাণ্ড দুইটা বাঘ আসিয়াছে। তাহাদের উৎপাতে পার্শ্বস্থ গ্রামের লোকের গরু বাছুর রাখা দুষ্কর হইয়াছে। সন্তোষ উৎসাহে লাফাইয়া উঠিল। ব্যাঘ্রশীকার তাহার জীবনে এ পর্য্যন্ত ঘটিয়া উঠে নাই; আজ এই সুযোগ উপস্থিত হওয়াতে সন্তোষ অত্যন্ত

উৎসাহিত হইয়া উঠিল ;—তখনই সে কর্ম্মচারীকে ডাকিয়া হুকুম দিল, যে আগামী কল্য প্রত্যুষে সে শিকারে বাহির হইবে ; ইহার মধ্যে যেন আবশ্যক সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া হয়।

প্রত্যুষে উঠিয়া শিকারীর বেশে সজ্জিত হইয়া, সন্তোষকুমার প্রিয় শিখ অনুচর ও সুনিপুণ শিকারী হরদেও সিংকে লইয়া এক বৃহৎ হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করিল। অন্য এক হস্তিপৃষ্ঠে তাঁবু ও কিছুদিন বাহিরে থাকিবার উপযোগী দ্রব্য সম্ভার বোঝাই করা হইল ; দুই তিন জন ভৃত্য ও সেই সঙ্গে হস্তিপৃষ্ঠে স্থান পাইল। সন্তোষকুমারের সঙ্গে পদব্রজে আরও প্রায় বিংশতি জন বন্দুকধারী সুশিক্ষিত, এবং গ্রাম্য বর্ষাধারী শিকারী চলিল।

যথানির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইয়া বহুঅনুসন্ধানেও ব্যাঘ্রদ্বয়ের কোন সন্ধান মিলিল না। অবশেষে শিকারীগণ ব্যাঘ্রের পরিবর্ত্তে দুইটী মৃগশাবক, কয়েকটী খরগোস, এবং সন্তোষকুমার কয়েকটী পক্ষী শিকার করিয়া, দিবাবসানে শ্রান্তদেহে বনপ্রান্তে গিয়া তাঁবু ফেলিল। শিকারলব্ধ পশু পক্ষীর সুপক্ক মাংসে উদরপূর্ত্তি করিয়া রাত্রিতে সকলে তাঁবুতে বিশ্রাম করিল। পরদিন অতি প্রত্যুষে পূর্ব্বের ন্যায় শিকারীর বেশে সজ্জিত হইয়া সন্তোষ বন্দুক ঘাড়ে করিয়া একাকী পদব্রজে পক্ষী শিকারে বাহির হইল। বন্ধুর বন্যপথে যাহাতে পায়ে আঘাত না লাগে, তজ্জন্য সন্তোষের পায়ে আজানুউচ্চ বুট ; রৌদ্র নিবারণের জন্য মাথায় সাহেবীধরণের টুপী (helmet ; পরিধানে শিকারীর বেশ (hunting suit) দুই স্কন্ধে চর্ম্মরজ্জু দ্বারা লম্বিত দুইটী ব্যাগ,—একটির মধ্যে এক-খানা বস্ত্র, গায়ের জামা, এবং আরও দুইটী আবশ্যক দ্রব্য, কিছু অর্থ, পানীয় জল ও কিছু খাদ্য সামগ্রী ; শিকার করিয়া যাহা কিছু পাওয়া যাইবে অন্য ব্যাগটীতে সেই সকল মৃত পক্ষী রক্ষিত হইবে ; বুকের উপরে বক্রভাবে স্থাপিত চর্ম্মাধারে অনেকগুলি টোটা এবং স্কন্ধে বন্দুক।

অরুণোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে এই নবীন যোদ্ধা বীরসাজে সজ্জিত হইয়া বিহঙ্গকুলের সহিত যুদ্ধ ঘোষণা করিতে বহির্গত হইল। গাছের আড়ালে পক্ষীর সন্ধানে উঁকি ঝুঁকি মারিতে মারিতে সন্তোষ ক্রমশঃই অগ্রসর হইতে লাগিল। শত্রুসৈন্য আগ্নেয়াস্ত্রের গর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গেই পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল। যে দু একটী অতিরিক্ত সাহসী কিম্বা নিতান্ত অসতর্ক, তাহারা গুলিবিদ্ধ হইয়া করুণ আর্ত্তনাদকরিতে করিতে ভূপতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। রণজয়ে উল্লসিত সন্তোষ শূন্যগর্ভ ব্যাগটী ক্রমে মৃত পক্ষিশাবকে পূর্ণ করিয়া তুলিল।

সূর্য্য যখন মধ্যাহ্নগগন ছাড়াইয়া পশ্চিমাকাশে ঈষৎ ঢলিয়া পড়িয়াছে, পরিশ্রান্ত সন্তোষের তখন হঠাৎ মনে পড়িল, যে তাঁবুতে ফিরিতে হইবে। বন্যপথ ঠিক করিয়া রাখা অসম্ভব। উৎসাহের বেগে আসিবার সময় সন্তোষ বুঝিতে পারে নাই, যে সে এতদূর চলিয়া আসিয়াছে। ক্ষুধাতৃষ্ণায় কাতর, এবং পরিশ্রান্ত হইয়া এখন বুঝিতে পারিল, যে সন্ধ্যার পূর্ব্বে সে তাঁবুতে পৌঁছিতে পারিবে না। অদূরে বনপ্রান্ত ছাড়াইলেই রতনপুর গ্রাম।

সন্তোষ অগত্যা কোন গৃহস্থের বাড়ীতে আশ্রয় লইবার উদ্দেশ্যে গ্রামের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। আমাদের পূর্ব্বপরিচিত ক্ষুদ্র রতনপুর গ্রাম চতুর্দ্দিক তরুপল্লবরাজিতে সমাচ্ছন্ন। গ্রাম প্রান্তে খোলা মাঠে গরু চরিতেছে ; বৃক্ষের ছায়ায় বসিয়া পাচনহস্তে রাখাল-বালকগণ নিজ নিজ গরুর প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া মেঠো সুরে গান গাহিতেছে। সে স্নিগ্ধ কোমল সুর সন্তোষের হৃদয় তন্ত্রীতে গিয়া আঘাত করিতে লাগিল। মাঠ পার হইয়া সন্তোষ গ্রামের দিকে চলিল। বালকগণ কৌতুহলপূর্ণ দৃষ্টিতে এই অদ্ভুত বেশধারী ব্যক্তিটীকে দেখিতে লাগিল। একটী বালক গ্রামের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা দুর্দ্দান্ত বলিয়া প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল। সে পশ্চাৎ হইতে পা টিপিয়া টিপিয়া অগ্রসর হইয়া, দূর হইতেই সন্তোষকে লক্ষ্য করিয়া বলিল,— 'সাহেব, কোথা যাচ্ছ?'

ঈষৎ হাসিয়া, সন্তোষ ব্যাগ হইতে একটী টাকা বাহির করিয়া বালকের দিকে ছুড়িয়া দিল, এবং জিজ্ঞাসা করিল,—

'এ গ্রামের নাম কি ?

দরিদ্র বালক দুর্দ্দান্ত হইলেও সহসা টাকাটী স্পর্শ করিতে সাহস৷ হইল না। শেষে, সাহেব তাহাদেরই ন্যায় বাংলাভাষায় কথা বলে দেখিয়া, সাহস পাইয়া আস্তে আস্তে টাকাটী মাটী হইতে কুড়াইয়া লইয়া বলিল,—'এটা রতনপুর।'

সন্তোষ বালককে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল,—

'এ গাঁয়ে বামুনের বাড়ী আছে? অতিথি হওয়া যাবে?'

বালক এবার বিপদে পড়িল। সাহেবের এ কথার সে কোন তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিল না। সাহেব বামুনের বাড়ীতে অতিথি হইবে কিরূপে?

সন্তোষ বৃথা বাক্যব্যয় করিয়া আর দেরী করিতে পারিল না; গ্রামাভিমুখে চলিতে লাগিল। কিয়দ্দুর অগ্রসর হইতেই, একটী ছোট গাছপালা ঢাকা বাড়ী তাহার চোখে পড়িল। বাড়ীতে তিনখানা খড়ের ঘর, কিন্তু অতিশয় পরিষ্কৃত; মাটীর দেয়ালগুলি সযত্ন-মার্জ্জিত। বাড়ীর সম্মুখভাগে একটী ছোট পুষ্করিণী;—তাহার একপার্শ্বে একটী প্রকাণ্ড বকুলফুলের গাছ চারিদিকে শাখাপ্রশাখা বিস্তার করিয়া, তলদেশ ছায়াচ্ছন্ন করিয়া দণ্ডায়মান। গাছের মোটা গুঁড়িটীর চারিদিকে মাটী উঁচু করিয়া বাঁধান; তদুপরি বেশ ঘন দুর্ব্বাদল জন্মিয়াছে। বকুলগাছের উপর একটী ঘুঘু ক্রমাগত তাহার গম্ভীরধ্বনি করিয়া দুপ্রহরের গাম্ভীর্য্যের সহিত নিজের গাম্ভীর্য্য মিশাইতে যেন ব্যস্ত। থাকিয়া থাকিয়া একটী কোড়াল পাখী গাছের পাতায় গা ঢাকিয়া, ঘুঘুটীকে শাসন করিবার জন্যই যেন, বিরক্তিব্যঞ্জক স্বরে 'ক—হ—হ—হ—হ' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিতেছে; পুকুরের জলে দুইটী হাঁস ক্ষণে ক্ষণে জলের মধ্যে মাথা ডুবাইয়া খাদ্য আহরণের চেষ্টায় আছে।

ধনী জমীদার পুত্র সন্তোষ জীবনে কখনও কাহারও বাড়ীতে অতিথি হয় নাই;—সে জানিত না কি বলিয়া কাহারও বাড়ীতে গিয়া উঠিতে হয়। একবার সেই ছোট বাড়ীটীর দ্বারদেশ পর্য্যন্ত আসিয়া সন্তোষ দাঁড়াইল, তাহার অত্যন্ত সঙ্কোচ বোধ হইতে লাগিল। ফিরিয়া গিয়া, সে বকুলগাছতলায়, দুর্ব্বার উপর গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়া বসিল;—ভাবিল, তাহার ঐ সাহেবী পরিচ্ছদ ছাড়িয়া, পুকুরে স্নান করিয়া, তাহার সঙ্গে যে আহার্য্য দ্রব্যাদি আছে, তাহাই ভোজন করিবে, এবং কিয়ৎক্ষণ ঐ গাছতলাতেই বিশ্রাম করিয়া তাঁবুতে ফিরিয়া যাইবে। তদনুসারে সে তাহার আঁটা সাহেবী পোষাক খুলিতে ব্যস্ত হইল; বহু আয়াসে সমস্ত খুলিয়া, সেগুলি সমস্ত বন্দুকের গায়ে জড়াইয়া, সন্তোষ তাহা বৃক্ষের একটী উচ্চ শাখার সহিত অদৃশ্য ভাবে বাঁধিয়া রাখিল, কারণ গাছতলায় বসিয়া থাকিতে থাকিতে হঠাৎ সন্তোষের মনে পড়িয়াছে, যে, এ বেশে গ্রামস্থ কেহ তাহাকে দেখিলে, তাহার পক্ষে আত্মগোপন করা অসম্ভব হইবে; এবং তাহার পরিচয় প্রকাশ হইলে, দরিদ্র গ্রামবাসিগণের যথেষ্ট উদ্বেগের কারণ হইবে। সাহেবী পোষাক ছাড়িয়া ব্যাগ হইতে কাপড় বাহির করিয়া, সন্তোষ তাহা পরিধান করিল, এবং পুষ্করিণীর শীতল জলে নামিয়া অবগাহন করিল। পুষ্করিণী হইতে উঠিয়া, আর্দ্রবস্ত্রে হঠাৎ সন্তোষের মনে পড়িল, যে সঙ্গে দ্বিতীয় বস্ত্র নাই। অপ্রস্তুত হইয়া, সে কি করিবে স্থির করিতে না পারিয়া, অবশেষে আর্দ্রবস্ত্রেই পুনরায় বৃক্ষতলে ফিরিয়া গিয়া উপবেশন করিল,—ভাবিল, প্রখর রৌদ্রতেজে শীঘ্রই সিক্তবস্ত্র শুষ্ক হইয়া যাইবে।

(৪)

আমাদের পূর্ব্বপরিচিত রামরতন ভট্টাচার্য্যের শুধু কুটীরের দাওয়াটীর সহিতই পাঠকগণ পরিচিত হইয়াছেন,—সমস্ত বাড়ীটীর পরিচয় এ পর্য্যন্ত পাঠককে দেওয়া হয় নাই। কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে যে ক্ষুদ্র বাড়ীটীর পরিচয় দেওয়া হইল, উহাই আমাদের বৃদ্ধ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বসত বাটী।

ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের একমাত্র কন্যা গৌরী মাধ্যাহ্নিক আহার সমাপন করিয়া, তাহার দুপ্রহরের বিশ্রামস্থল বকুলতলার দিকে যাইতেই, তাহার স্থান অন্য কর্ত্তৃক অধিকৃত দেখিতে পাইল। আগন্তুকের অদ্ভুত বেশভূষা দেখিয়া গৌরী প্রথমে বড়ই কৌতূহল অনুভব করিল; কিন্তু ক্ষণপরেই, কিছুদিন পূর্ব্বে তাহাদের বাড়ীতে যে

দারোগা আসিয়াছিল, তাহার বেশের সহিত ইহার কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য অনুভব করিয়া, ভয়ে বালিকার মুখ শুকাইয়া গেল,। সে ধীরে ধীরে, সন্তোষের অলক্ষ্যে, পুনর্ব্বার বাটীর ভিতর প্রবেশ করিয়া, তাহার স্বহস্ত রোপিত একটী অপরাজিতা লতার ঝোপের আড়ালে থাকিয়া আগন্তুকের গতিবিধি লক্ষ্য করিতে লাগিল। সন্তোষ যখন তাহার সাহেবী পোষাক খুলিয়া, বন্দুকে জড়াইয়া, গাছের ডালে বাঁধিয়া রাখিল, তখন তাহার কারণ বুঝিতে না পারিয়া, বালিকা বড়ই বিস্মিতা হইল। কিন্তু, সন্তোষের অনিন্দ্যসুন্দর নগ্নদেহ বালিকার মনে কি এক মোহন প্রভাব বিস্তার করিল যে, সে কিছুতেই আগন্তুককে তাহাদের অনিষ্টকারী বলিয়া সন্দেহ করিতে পারিল না। বালিকার হৃদয়তন্ত্রী কি জানি কি এক অজানা সুরে বাজিয়া উঠিল। সিক্ত বস্ত্রে যখন সন্তোষ নিরুপায় হইয়া এদিক ওদিক চাহিতেছিল, তখন সংসারানভ্যস্ত যুবকের অনভিজ্ঞতায় বালিকার ক্ষুদ্র হৃদয়টুকু করুণায় ভরিয়া উঠিল। যখন আর্দ্রবস্ত্রেই সন্তোষ বৃক্ষতলে গিয়া উপবেশন করিল, তখন গৌরী স্পষ্টই বুঝিতে পারিল যে, বস্ত্রাভাবেই যুবক সিক্তবস্ত্র ত্যাগ করিতে পারিতেছে না। অতিথি পরায়ণ পিতার কন্যা হইয়া, বালিকা দ্বারাগত অতিথির অভাব মোচন করিতে ব্যগ্র হইল। গৌরী তৎক্ষণাৎ শুষ্ক বস্ত্র আনিবার জন্য বাড়ীর ভিতরে ছুটিয়া গেল। শুধু অতিথির বস্ত্রাভাবই কি বালিকাকে চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছিল? বালিকাকে জিজ্ঞাসা করিলে, সে নিজেই তাহা বলিতে পারিত কিনা সন্দেহ।

শুষ্কবস্ত্র হস্তে গৌরী সন্তোষের অজ্ঞাতসারে তাহার পশ্চাদ্দিকে আসিয়া যখন বলিল, আপনার কাপড় লাগিবে কি? তখন, চমকিয়া উঠিয়া, সন্তোষ ফিরিয়া বালিকার দিকে চাহিল। বালিকার কর্ণমূল লজ্জায় আরক্ত হইয়া উঠিল।

চকিত সন্তোষ ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল লজ্জাবনত-মুখী, তপ্তকাঞ্চন-বর্ণা, অনুমান দ্বাদশ-বর্ষীয়া একটী বালিকা তাহার পশ্চাদ্দেশে দাঁড়াইয়া, তাহাকে ঐ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছে। হতবুদ্ধি সন্তোষ কতক্ষণ কিছুই বলিতে পারিল না। সমস্ত ব্যাপারটা ভালরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া, শেষে ভাঙ্গা কথায় সে কি যে উত্তর দিল, প্রকৃতিস্থ অবস্থায় থাকিলে, সে নিজেই তাহার অর্থ বুঝিতে পারিত না। মানুষের জীবনে কখনও কখনও এমন একটা মুহূর্ত্ত আসে, যাহা চলিয়া গেলে সে যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচে, অথচ, উহা চলিয়া যাইবে, এ কল্পনাতেও হৃদয় ব্যথিত হইয়া উঠে। সন্তোষের পক্ষে এমুহূর্ত্তটী অনেকটা সেইরূপ। উত্তরের প্রতীক্ষায় গৌরী যখন নিজের অজ্ঞাতসারে বিকাশোন্মুখ দেহভার ঈষন্নমিত করিয়া, বামপদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা মৃত্তিকায় চাপ দিতেছিল এবং বস্ত্রাঞ্চল খানিকে হাতের আঙ্গুলে জড়াইতেছিল, তখন সন্তোষ যে কি করিবে, ভাবিয়া কুল পাইতেছিলনা। পাশ্চাত্য শিক্ষায় উচ্চশিক্ষিত যুবকের অপরিচিতা কিশোরীর দিকে তাকাইতে কেমন যেন সুরুচি বিগর্হিত মনে হইতেছিল অথচ কেন যেন সে নয়নদ্বয়কে কিছুতেই স্ববশে আনিতে পারিতেছিল না। কি বলিয়া সম্ভাষণ করিলে যে ঠিক স্বাভাবিক হয়, তাহা ভাবিয়া সন্তোষ যতই ব্যাকুল হইতে লাগিল, ততই যেন সে স্বাভাবিকতার গণ্ডী অতিক্রম করিয়া দূরে সরিয়া যাইতে লাগিল। বাক্‌শক্তির এরূপ অক্ষমতা সে ইতি পূর্ব্বে কখনও অনুভব করিতে পারে নাই। বন্ধু-মণ্ডলীর মধ্যে বসিয়া কতদিন সে বাক্‌চাতুর্য্যে আসর জমাইয়া তুলিয়াছে, আর আজ কিনা সে এক গ্রাম্য বালিকার নিকট অকারণে অপ্রতিভ হইয়া, কয়েকটী অসংলগ্ন শব্দ ভিন্ন আর কিছুই বলিতে পারিল না।

ভ্রমরকৃষ্ণ উন্মুক্ত কেশপাশ পুনঃ পুনঃ বালিকার আনত মুখখানির উপর আসিয়া পড়িয়া, পুনঃ পুনঃ তাহাকে বিব্রত করিয়া তুলিতেছিল। এক গোছা চুল মুখের উপর হইতে সরাইয়া, শুষ্ক বস্ত্রখানি আগন্তুককে দিবার জন্য গৌরী তাহারদিকে হস্ত প্রসারিত করিল। কম্পিত হস্তে যুবক তাহা গ্রহণ করিল। তাহার ইংরেজী শিক্ষানুসারে সন্তোষ কি যেন একটা ধন্যবাদ সূচক কথা বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু অশিক্ষিতা পল্লীবালিকার নিকট তাহা নিতান্তই অর্থহীন হইবে মনে করিয়া, কথাটী আর বলা হইল না।

মৃদুস্বরে বালিকা আবার বলিল,—

'আপনি এই দুপুর বেলা গাছতলায় বসে আছেন কেন? আমাদের বাড়ীতে চলুন ঐ আমাদের বাড়ী বলিয়া, অঙ্গুলি সঙ্কেতে বালিকা বাড়ী দেখাইল। আমি বাবাকে পাঠিয়ে দিইগে—বলিয়া, গৌরী দ্রুতপদে গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিল। তাহার প্রত্যেক পদক্ষেপ সন্তোষ সতৃষ্ণনয়নে দেখিতে লাগিল; তাহার মনে হইল, কবিগণ যাহাকে মরালগমন বলেন, তাহা বুঝি এই।

গৌরী দৃষ্টি বহির্ভূতা হইলে, সন্তোষ গ্রীবাবক্র করিয়া তরুণীকে আর একবার দেখিতে চেষ্টা করিল। তাহাতেও যখন দেখা গেল না, সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া আর্দ্রবস্ত্র ত্যাগ করিয়া, শুষ্কবস্ত্রখানা পরিধান করিল। হায়, যাহার দেহরক্ষক ভৃত্য পর্য্যন্ত স্বর্ণখচিত বহুমূল্য মকমলের পোষাক পরিধান করে, আজ তাহাকে কিনা এক দরিদ্রা, গ্রাম্য বালিকার সামান্য দান গ্রহণ করিতে হইল! কিন্তু, এ দান গ্রহণে যে কত সুখ, কতটা আত্মপ্রসাদ, তাহার আভাস মাত্র পাইয়া আজ সন্তোষকুমার আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে। তাহার মনে হইল, আজ তাহার সর্ব্বস্ব দান করিয়া, তাহার পরিবর্ত্তে একখানা মাত্র বস্ত্র ভিক্ষা পাইয়াছে। সে কি শুধু বস্ত্র খণ্ড? যুবকের উন্মত্ত কল্পনায় তাহা স্বর্গের সুষমা, যৌবনের মোহময়ী মদিরা, বসন্তের প্রথম পিকঝঙ্কার, জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে দূরাগত বীণাশব্দবৎ সুমধুর সে বস্ত্রখণ্ডের কোমল স্পর্শে সন্তোষের সমস্ত শরীর পুলকে কণ্টকিত হইয়া উঠিল।

আর্দ্র বস্ত্রখানি ধৌত করিতে সন্তোষ পুনরায় পুকুরে নামিল। অনভ্যস্ত যুবক বস্ত্র ধৌত করিতে যাইয়া যখন তাহা আরও কর্দ্দমলিপ্ত করিতেছিল, তখন আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত ভট্টাচার্য্য মহাশয় তীর হইতে ডাকিয়া বলিলেন,—

'কাপড় থাক্, আপনি উঠে আসুন

ফিরিয়া চাহিয়া শান্তমূর্ত্তি বৃদ্ধব্রাহ্মণকে দেখিয়া, সন্তোষ বড়ই লজ্জা পাইল, এবং পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর সাবধানতার সহিত বস্ত্র ধৌত করিতে প্রবৃত্ত হইল। বালিকার লজ্জাবিনম্র, করুণামণ্ডিত মুখশ্রীর সহিত বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের স্নিগ্ধ প্রশান্ত মুখমণ্ডলের সাদৃশ্য অনুভব করিয়া, তাঁহার প্রতি সন্তোষের মনে স্বতঃই একটী সুগভীর শ্রদ্ধার উদয় হইল বস্ত্র ধৌত করিয়া সন্তোষ তীরে উঠিতেই, ব্রাহ্মণ তাহাকে তাঁহার বাটীতে আতিথ্য গ্রহণ করিতে নিমন্ত্রণ করিলেন। তাঁহাকে আর অধিক বলিতে হইল না। সিক্ত বস্ত্র স্কন্ধে সন্তোষকুমার ব্রাহ্মণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ তাঁহার গৃহে প্রবেশ করিল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাহাকে ক্ষুদ্র অথচ পরিষ্কৃত একখানা কুটীরের মধ্যে একখানা তক্তপোষের উপর বসাইয়া, তাহার স্কন্ধ হইতে সিক্ত বস্ত্রখানি লইয়া স্বহস্তেই বাহিরে রৌদ্রে দিলেন। সন্তোষ ইহাতে আপত্তি উত্থাপন করিতে করিতেই ভট্টাচার্য্য মহাশয় কার্য্য সমাধা করিয়া, তাহার পার্শ্বে আসিয়া তক্তপোষের উপর বসিলেন। বৃদ্ধের সমস্ত ব্যবহারই সন্তোষের নিকট অতি মধুর বোধ হইল।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় পরিচয়াদি জিজ্ঞাসা করিলে সন্তোষ আত্মপরিচয় কতকাংশ গোপন করিয়া বলিলেন। 'রায় চৌধুরীর পরিবর্ত্তে প্রকৃত উপাধি চট্টোপাধ্যায়', এবং কলিকাতা প্রবাসী জনৈক ছাত্র বলিয়া সন্তোষ নিজের পরিচয় দিলেন। কোন আত্মীয়ের বাড়ী যাইতে পথে এই স্থানে স্নানাহারের জন্য কিয়ৎকাল অপেক্ষা করিয়াছেন। সরলহৃদয় ব্রাহ্মণ সমস্তই বিশ্বাস করিলেন;—অতিথিকে ভ্রমেও একবার জমিদার বলিয়া সন্দেহ করিলেন না। সন্তোষের পিতা গৌরীশঙ্করের সহিত ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের যথেষ্ট হৃদ্যতা ছিল, কিন্তু বাল্যকালাবধিই কলিকাতায় থাকাতে, সন্তোষকে তিনি ইতিপূর্ব্বে কখনও দেখেন নাই।

যুবকের পরিচয় লইয়া, ভট্টাচার্য্য মহাশয় নিজেই আত্মপরিচয় দিতে লাগিলেন। নিজের নাম, এবং পিতার নাম বলিয়া, শেষে চাকুরীব্যপদেশে প্রবাসী একমাত্র পুত্রের নাম ও পরিচয় এবং তৎসঙ্গে একমাত্র কন্যা গৌরীর পরিচয় দিলেন। কন্যাটীকে শিশু অবস্থায় রাখিয়া গৃহিণী পরলোক গমন করিয়াছেন, ব্রাহ্মণ তাহাও বলিলেন। শেষে স্নেহার্দ্রস্বরে ব্রাহ্মণ কন্যার গুণের কথা বলিতে লাগিলেন,—'মা গৌরী আমার যেন সাক্ষাৎ গৌরী। পুত্রটী ত বারমাসই বিদেশেই থাকে।

এই অকর্ম্মণ্য বৃদ্ধটীর সমস্ত ভারই মা গৌরীর উপর। পূর্ব্বজন্মে গৌরী নিশ্চয়ই আমার মা ছিল; তা না হ'লে এত স্নেহ মমতা ও কোথায় পেল!'—বলিতে বলিতে ভট্টাচার্য্য মহাশয় বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষু মুছিলেন। সন্তোষের চক্ষুও ছল ছল করিতে লাগিল। কি যেন এক স্বর্গীয় বার্ত্তা তাহার কর্ণকুহরে মধুবর্ষণ করিতে লাগিল।

এইরূপ নানাপ্রকার বিশ্রম্ভালাপ হইতেছে, এমন সময় দরজার বাহির হইতে গৌরী মৃদুস্বরে বলিল,— 'বাবা, ভাত হয়েছে।'

সন্তোষ একটু কুণ্ঠিত হইয়া বলিল,—'অসময়ে এসে আপনাদের বড় কষ্ট দিলুম।'

ভট্টাচার্য্য মহাশয় সহাস্যবদনে বলিলেন,—'সে কি? আমি ত কিছুই কষ্ট করিনি; আপনার সঙ্গে বসে গল্প কচ্ছি। আর গৌরীর কথা? ওর ত এতেই সুখ। ওটী না হলে, কিছুতেই ওর মন ওঠে না;—যেন সাক্ষাৎ মা অন্নপূর্ণা।' উচ্ছ্বসিতহৃদয় বৃদ্ধ যে স্নেহের আবেগে পাশ্চাত্য সভ্যতার "এটিকেটের" গণ্ডী অতিক্রম করিয়া যাইতেছেন, সন্তোষের মনে একবারও তাহা উদয় হয় নাই। সেও ত উহাই শুনিতে চায়!

রন্ধনশালার সুপরিষ্কৃত, গোময়লিপ্ত দাওয়ায় সন্তোষের আহারের স্থান হইয়াছে। থালায় গরম ভাত ও সামান্য দু এক রকম ব্যঞ্জনাদি। ধনী জমীদার পুত্র এই সামান্য খাদ্য যেরূপ পরিতৃপ্তির সহিত ভোজন করিল, নানাবিধ সুপক্ক, পরম উপাদেয় ভোজ্যদ্রব্যও কোনদিন তাহার শতাংশের একাংশ পরিতৃপ্তির সহিতও আহার করিয়াছে বলিয়া তাহার মনে হইল না। আহার করিয়া যে এত তৃপ্তি হয়, সন্তোষ তাহার জীবনে এই প্রথম অনুভব করিল।

আহারের পর নানাবিধ আলাপে দিনের বাকী অংশটুকু কাটিয়া গেল। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পীড়াপীড়িতে সন্তোষ কিছুতেই সে রাত্রিতে তাঁহার বাড়ী হইতে যাইতে পারিল না। সন্তোষেরও যে যাইবার বিশেষ আগ্রহ ছিল, তাহা বলিতে পারি না; তবে, ভদ্রতার খাতিরে সন্ধ্যার পূর্ব্বে কয়েকবার যাওয়ার কথা বলিয়াছিল। ক্ষুধার উদ্রেক না হওয়া সত্ত্বেও, সন্তোষ রাত্রিতে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সহিত ভোজনে বসিল। গৌরী ভিন্ন সে বাড়ীতে আর কেহ নাই, সুতরাং উভয়বার তাহাকেই পরিবেশন করিতে হইয়াছে। সন্তোষের বোধ হইল যেন সে কোমলকরপল্লবের স্পর্শে অন্ন ব্যঞ্জনের অন্নব্যঞ্জনত্ব ঘুচিয়া গিয়া, অমৃতত্ব লাভ হইয়াছে।

পূর্ব্বোল্লিখিত ঘরেই রাত্রিতে সন্তোষের শয্যা রচনা হইয়াছে। সে দিন শুক্লা দ্বাদশী তিথি; মাথার উপরে নির্ম্মল চন্দ্র হাসিতেছে। সন্তোষের ঘর হইতে বকুল গাছটী দেখা যায়; চাঁদের আলো ঘন পত্ররাশির মধ্য দিয়া যে স্থান দিয়া পারিতেছে, আপনার রাস্তা করিয়া লইতেছে। বৃক্ষ তলদেশের অধিকার লইয়া জ্যোৎস্না ও অন্ধকারের মধ্যে তুমুল কলহ বাধিয়া গিয়াছে; কেহ কাহাকেও সূচ্যগ্র ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত নহে। আলো ও অন্ধকারের যুদ্ধ দেখিতে দেখিতে সন্তোষ শয্যায় শয়ন করিল। বহু চেষ্টাতেও নিদ্রাকর্ষণ হইল না; তাহার অশান্ত হৃদয়ে কি জানি কিসের তুফান বহিতেছিল। থাকিয়া থাকিয়া একটা অজানিত অভাব তাহার হৃদয়কে কেবলই পীড়ন করিতেছিল। কিসের যে সে অভাব, তাহা বহুচেষ্টাতেও সন্তোষ স্থির করিতে পারিল না। আজ যেন তাহার অন্তরতম প্রদেশে কোন অজানা বৈচিত্রময় রাজ্যের সম্মুখ হইতে একখানা পর্দ্দা উঠিয়া গিয়াছে; এত দিন তাহার যে মানসী প্রতিমা একটা ছায়ার ন্যায় পদার্থ মাত্র ছিল, আজ যেন তাহার পূর্ণাবয়ব মূর্ত্তিতে প্রাণ সঞ্চারিত হইতেছে। বদ্ধ ঘর যেন আজ সন্তোষের অনন্ত প্রসারিত হৃদয়ের পক্ষে বড়ই ক্ষুদ্র বোধ হইতেছে। সে ছুটিয়া ঘরের বাহিরে গিয়া বকুলতলায় বসিল। ক্ষুদ্র পুকুরটীতে অনেকগুলি কুমুদ ফুটিয়া চন্দ্রের দিকে সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া আছে। দূরে একটা জলচর ডাহুক ক্রমাগত একঘেয়ে শব্দ করিয়া নৈশ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছে; অবিশ্রান্ত ঝিল্লীরব নিস্তব্ধতার অঙ্গস্বরূপ হইয়া গিয়াছে,—উহা যে একটা পৃথক্ শব্দ, তাহা কাহারও মনে হইতেছে না।

সন্তোষের হৃদয় যেন একটা অপরিতৃপ্ত বাসনার অনলে থাকিয়া থাকিয়া দগ্ধ হইতেছে,—কিন্তু সে দাহেও আনন্দ আছে। যে বাসনার তাড়নে পতঙ্গ অগ্নিতে ঝাঁপ দেয়, কুরঙ্গ বংশীধ্বনি শ্রবণের লোভে ব্যাধের জালে জড়িত হয়, সেই বাসনা আজ যুবক সন্তোষের হৃদয় সমুদ্রকে আলোড়ন করিতেছে। যৌবনের প্রথম উচ্ছ্বাসের বেগ আজ শতমুখ প্রস্রবণের ন্যায় সন্তোষের উপর বর্ষিত হইতেছে। হৃদয়ের আবেগে সে গুন্ গুন্ করিয়া গাহিতে লাগিল।

"নিশি না পোহাতে জীবন প্রদীপ
জ্বালাইয়া যাও প্রিয়া
তোমার অনল দিয়া!
কবে যাবে তুমি সমুখের পথে
দীপ্ত শিখাটী বাহি
আছি তাই পথ চাহি!
পুড়িবে বলিয়া রয়েছে আশায়
আমার নীরব হিয়া
আপন আঁধার নিয়া।
নিশি না পোহাতে জীবন প্রদীপ
জ্বালাইয়া যাও প্রিয়া!"

হৃদয়ের মানসী প্রতিমার উদ্দেশে এই বিরহসঙ্গীত যেন সন্তোষের হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া একটা মর্ম্মভেদী হাহাকারের ন্যায় উঠিয়া অনন্ত আকাশে মিশিয়া যাইতে লাগিল। সঙ্গীতের করুণ সুরের সহিত মৃদু বায়ু মিশিয়া নিদ্রাদেবীর সাহায্যে অগ্রসর হইল। ধীরে ধীরে সন্তোষ বকুল গাছতলায় কখন যে নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িল, তাহা সে নিজে জানিতে পারিল না। রাত্রিশেষে প্রভাতের শুকতারা দীপ্তি পাইতেছে; হঠাৎ কতকগুলি দোয়েল বকুলগাছের উপর হইতে একত্র শিস্ দিতে আরম্ভ করিল। সেই শব্দে সন্তোষের ঘুম ভাঙ্গিয়া যাওয়াতে তাড়াতাড়ি সে উঠিয়া বসিল। কি জানি কেন, আর বিলম্ব না করিয়া, তখনই সন্তোষ পুনরায় শিকারীর বেশে সজ্জিত হইয়া বন্য পথ অতিক্রম করিবার জন্য প্রস্তুত হইল। আত্ম পরিচয় প্রকাশ হইবার ভয়ে সন্তোষ কাহাকেও না বলিয়াই যাত্রা করিল। যতক্ষণ দেখা গেল, সে কেবলই অপরিতৃপ্ত দৃষ্টিতে ক্ষুদ্র কুটীর খানার দিকে ফিরিয়া ফিরিয়া চাহিতে লাগিল। যখন বকুল গাছের সর্ব্বোচ্চ পল্লবটীও বন্য বৃক্ষাদির অন্তরালে অন্তর্হিত হইল, তখন যেন সন্তোষ জোর করিয়া মোহ ঘোর ছিন্ন করিয়া দ্রুতপদে বন্য পথ অতিক্রম করিতে লাগিল। হৃদয় তন্ত্রীতে থাকিয়া থাকিয়া কেবলই একটা করুণ সুর বাজিতে লাগিল। রাখাল বালক মাঠে গরু ছাড়িয়া দিয়া, বৃক্ষতলে বসিয়া, সন্তোষের হৃদয় তন্ত্রীর সহিত নিজের সুর মিলাইয়াই যেন গাহিল—

'কই, শ্যাম কুঞ্জে এল কই?'

(৫)

তাঁবুতে ফিরিয়া, সন্তোষ তখনই সকলকে গৃহযাত্রার জন্য প্রস্তুত হইতে আদেশ করিলেন। একঘণ্টার মধ্যে তাঁবু ইত্যাদি হস্তিপৃষ্ঠে উঠিল। কেহই জানিত না, এত শীঘ্র বাড়ী ফিরিতে হইবে। সকলেই ভাবিল,—'বড় লোকের মর্জ্জি!,

বাড়ী আসিয়া, দূরসম্পর্কিতা এক ঠান্‌দিদির সাহায্যে সন্তোষ রতনপুরের রামরতন ভট্টাচার্য্যের কন্যাকে বিবাহ করিবার ইচ্ছা মাতাকে জানাইল বলিল, এবার শিকারে গিয়া সে নিজে কন্যাটিকে দেখিয়া পছন্দ করিয়াছে।

এইস্থানে বলা আবশ্যক, সন্তোষকুমার এপর্য্যন্ত অবিবাহিত ছিল। পাঠ্যাবস্থাতেই তাহার পিতামাতা একমাত্র পুত্রের বিবাহ দিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন। কিন্তু, ছাত্রদের আধুনিক রীতি অনুসারে, পাঠ শেষ না করিয়া, সন্তোষ কিছুতেই বিবাহ করিতে প্রস্তুত হয় নাই। সন্তোষের মাতা হঠাৎ পুত্রের এতাদৃশ পরিবর্ত্তনে অত্যন্ত সুখী হইলেন। কিন্তু দরিদ্রের কন্যার সহিত একমাত্র পুত্রের বিবাহ দিতে তাঁহার মন সরিল না। তাঁহার ইচ্ছা তাঁহাদের সমকক্ষ ঘরে পুত্রের বিবাহ দেন। কিন্তু, অমঙ্গল আশঙ্কায়, মাতা শিক্ষিত, উপযুক্ত পুত্রের ইচ্ছার বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী হইলেন না।

দুই এক দিনের মধ্যেই নানারূপ মিষ্টান্ন ও উপঢৌকনাদি সঙ্গে করিয়া, জমীদার বাড়ীর একজন বৃদ্ধ বিশ্বস্ত

কর্ম্মচারী বিবাহের প্রস্তাব করিতে রতনপুর যাত্রা করিল। বৃদ্ধ ভট্টাচার্য্য মহাশয় প্রথমে প্রস্তাব শুনিয়া কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিলেন না; শেষে কর্ম্মচারী যখন তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া পুনরায় উহার সত্যতা সম্বন্ধে দৃঢ়রূপে বলিল, তখন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আনন্দে কাঁদিয়া ফেলিলেন।

আহা, তাঁহার দুঃখিনী, মাতৃহীনা—গৌরীর অদৃষ্টে কি বিধাতা এত সৌভাগ্য লিখিয়াছেন! কর্ম্মচারী শীঘ্রই একবার ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে জমীদার বাড়ীতে যাইয়া সমস্ত কথা বার্ত্তা সুস্থির করিয়া আসিতে অনুরোধ করিয়া যথাসময়ে রূপনগরে প্রস্থান করিল।

সরলচিত্ত ব্রাহ্মণের নিকট এখনও সমস্ত ব্যাপারটা আরব্যোপন্যাসের গল্পের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। কিরূপে এই বিবাহের সম্বন্ধ জমীদার বাড়ীতে উপস্থিত হইল, আকাশ পাতাল ভাবিয়াও ব্রাহ্মণ তাহা স্থির করিতে পারিলেন না। তাঁহার অতিথি সন্তোষ কুমার চট্টোপাধ্যায়ই যে রূপনগরের প্রতাপশালী জমীদার সন্তোষকুমার রায় চৌধুরী, সেরূপ সন্দেহ এখন পর্য্যন্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের মনে একবারের নিমিত্তও হয় নাই। সঙ্গীহীন, বস্ত্রহীন, তাঁহার ন্যায় দরিদ্রের কুটীরে অতিথি, বিদেশী এক যুবককে কিরূপেই বা ব্রাহ্মণ রূপনগরের লক্ষপতি জমীদার বলিয়া সন্দেহ করিবেন? গৌরীশঙ্কর রায় যখন বাটীর বাহির হইতেন, তখন তাঁহার সঙ্গে কত চোপদার, দ্বারবান্, কত লোকজন থাকিত; ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাহা কতবার স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন! তাঁহার পুত্র হইয়া, বিংশ শতাব্দীর নব্যযুবক সন্তোষকুমার যে রূপনগর হইতে এই ক্ষুদ্র রতনপুরে একাকী দরিদ্রের কুটীরে romance করিতে আসিবেন, সেকেলে ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাহা স্বপ্নেও ভাবেন নাই।

যাহাহউক, তৎপর দিবসই তিনি শুভ্র বস্ত্র পরিধান করিয়া, সযত্নরক্ষিত একটী ধোপদেওয়া কুর্ত্তি গায়ে দিয়া, পুত্রের আনীত একযোড়া নূতন ক্যান্‌ভাসের জুতা পায়ে দিয়া, জমীদার বাড়ী যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। যাইবার সময় প্রণতা কন্যার মস্তকোপরি নিজ কম্পিত দক্ষিণহস্তখানি রাখিয়া ব্রাহ্মণ সর্ব্বান্তঃকরণে তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

জমীদারের কর্ম্মচারী আসিয়া যখন বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপন করিল, তখন গৌরী বেড়ার আড়াল হইতে সমস্তই শুনিতে পাইল। সেই মুহূর্ত্তেই, এক অজ্ঞাত ভয়ে বালিকার বুকখানি দুরু দুরু করিয়া কাঁপিতে লাগিল, এবং থাকিয়া থাকিয়া তাহার অনিচ্ছা সত্ত্বেও কেবলই সেদিনকার যুবক অতিথির প্রফুল্ল মুখখানা আসিয়া তাহার হৃদয়ের চারিদিকে উঁকিঝুঁকি মারিতে লাগিল। গৌরী ত জমীদারের ঐশ্বর্য্য চাহে না,—সে চাহে সেই সুন্দর মুখখানি। সে চাহে কিনা তাহাও সে জানে না, কিন্তু, সেই মুখখানি যেন বালিকার তরুণ হৃদয়ে এক অপূর্ব্ব মোহময় আবেশ আনিয়া দেয়;—উহা ত সে কিছুতেই ভুলিতে পারিবে না। হায়, জমীদারের স্ত্রী হইলে, কুলবধূ হইলে, সে মুখখানা ভাবিবারও ত তাহার আর অধিকার থাকিবে না। জমীদারকে সে চায় না। কেন সে তাহার ঐশ্বর্য্যের লোভ দেখাইয়া তাহাকে এবং তাহার পিতাকে মুগ্ধ করিতে চেষ্টা করিতেছে! ভাবিতে ভাবিতে তরুণীর মুখমণ্ডল আরক্ত হইয়া উঠিল, ব্যথিত কপালের শিরা ফুলিয়া উঠিল, উচ্ছ্বসিত অশ্রুজল আর কিছুতেই বাধা মানিল না।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় জমীদার বাড়ী পৌঁছিলে, সন্তোষের প্রবীণ আত্মীয়গণ যথোচিত সম্মান পূর্ব্বক তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন। স্মিতমুখে সন্তোষ আসিয়া যখন তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিল, তখন বুদ্ধিমান্ ব্রাহ্মণ মুহূর্ত্ত মধ্যে সমস্ত ব্যাপার বুঝিতে পারিলেন। হর্ষগদ্‌গদ হইয়া, দুই হাতে তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া তিনি বলিলেন—

'বাবা' দরিদ্র ব্রাহ্মণকে আজ তুমি যেমন আশাতীতরূপে সুখী করিলে, আশীর্ব্বাদ করি, ভগবান্ তাঁহার কল্যাণ হস্তে চিরকাল তোমার মঙ্গল বিধান করুন। আমার গৌরী বড় সুশীলা মেয়ে,—রূপে লক্ষ্মী গুণে সরস্বতী। আশীর্ব্বাদ করি, দুঃখিনী মা আমার যেন পতিব্রতা হয়ে চিরদিন তোমার শান্তিদায়িনী হয়।'

যথাসময়ে সন্তোষকুমার বহুজন পরিবৃত হইয়া বাজি ও আলোতে রাতকে দিন করিয়া, স্বর্ণখচিত চতুর্দ্দোলে চড়িয়া, দরিদ্র ব্রাহ্মণের পর্ণকুটীরে বিবাহ করিতে আসিল। ক্ষুদ্র রতনপুর বাদ্যধ্বনিতে মুখরিত হইয়া উঠিল। শুভদৃষ্টির সময় যখন চারিচক্ষুর মিলন হইল, তখন গৌরী অপ্রত্যাশিত ভাবে তাহার সেই বাঞ্ছিত মুখখানি দেখিয়া যেন কতকটা হতবুদ্ধি হইয়া গেল। সরলা বালিকা ভাল করিয়া ব্যাপারটা বুঝিতে পারিল না;—আনন্দে তাহার চোখ দিয়া দুইফোটা জল গড়াইয়া পড়িল।

হায় সন্তোষ! শিকার করিতে আসিয়া এ কি শিকার করিয়া লইয়া চলিলে! এই কৌতুকাবহ শীকার কাহিনী লইয়া হাস্যপরিহাসাদি করিতে করিতে, শেষে, সন্তোষ ও গৌরীর নাকি বহু রজনী অনিদ্রায় কাটিয়া গিয়াছে; — সন্তোষের পরিহাসযোগ্যা কোন কোন আত্মীয়া যুবতীর রিপোর্ট এইরূপ। সত্যমিথ্যা সন্তোষ বাবু জানেন। রিপোর্টের সত্যতার জন্য রিপোর্টকারিগণ দায়ী, —লেখক নহে।

* *
* *

শুনা যায়, এই ঘটনার পর হারাণ মণ্ডলের উপর আর কোন অত্যাচার হয় নাই, ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বিরুদ্ধে আনীত মোকদ্দমাটীও অবিলম্বেই প্রমাণাভাবে ফাঁসিয়া যায়।

বিবাহের পর একদিন হঠাৎ নবীন সরকার ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বাড়ী আসিয়া অতিশয় ভক্তিভাবে সাষ্টাঙ্গে তাঁহাকে প্রণাম করিল। ধীরে উঠিয়া,, তাহাকে ঘরের এককোণে অপরাধীর ন্যায় চুপ করিয়া দাঁড়াইতে দেখিয়া, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ একটু স্নিগ্ধ হাস্য করিয়া কহিলেন,—

'নবীন, বহুপূর্ব্বেই আমি তোমাকে মার্জ্জনা করিয়াছি।'

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ বসু।

নিঃসঙ্গ।

১

চারিধারে বিস্তীর্ণ মাঠ ধূধূ করিতেছে, মধ্যে ছোট একটি বিল। এককালে সমস্তটাই বৃহৎ বিল ছিল, কাল-ক্রমে চারিধারের জল শুকাইয়া মাঠ হইয়াছে; কিন্তু মধ্যস্থ ছোট বিলটিতে এখনও গভীর জল থাকে। মাঠ হইতে মাটি উঠাইয়া স্তূপীকৃত করিয়া চতুর্দ্দিকে অনেক গ্রামের পত্তন হইয়াছে; বিশাল মাঠের ক্লান্তি-জনক শূন্যতার মধ্যে আম-কাঠাল-কদলীবন-শ্যামল সেই গ্রাম গুলির দিকে চাহিয়া নয়ন যেন জুড়াইয়া যায়। ছোট বিলটির চতুর্দ্দিকে গ্রামগুলি অনেকটা ঘনসন্নিবিষ্ট, তবুও কোনদিকেই দৃষ্টি অবরুদ্ধ হয় না, দুই গ্রামের মধ্যে মুক্ত পথদিয়া নয়ন অনায়াসে দিগন্তের প্রান্তে পরিভ্রমণ করিয়া আসিতে পারে।

বিলের উত্তর পারের কতকটা স্থান অন্যান্য পার অপেক্ষা অনেক উচু, বর্ষাকালেও সেখানে জল উঠেনা। অনেকদিন হইতে সেখানে মিত্রদের ফলের বাগানছিল। এখন ফলের গাছ অধিকাংশই মরিয়া গিয়াছে, কেবল দুই একটি আম গাছ, চারি পাঁচটি নারিকেল গাছ ও বিলের একেবারে পারে একটি প্রকাণ্ড বকুল গাছ ভূতপূর্ব্ব বাগানের ভগ্নাবশেষ স্বরূপ এখনও আছে।

মিত্রদের বিশ্বরঞ্জন যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বশেষ পরীক্ষা পাশ করিয়া বাহির হইল তখন পাড়ার লোকে অনেক আশা করিয়াছিল। বৃদ্ধ মিত্র মহাশয় এই একটি মাত্র পুত্র রাখিয়া পরলোকে গমন করেন। মিত্র গৃহিণী অনেক কষ্টে পুত্রটিকে মানুষ করিয়া তুলিয়া ছিলেন। টাকা পয়সার যে কষ্ট ছিল তাহা নহে; মিত্র মহাশয় বেশ দুপয়সা রাখিয়া গিয়াছেন কিন্তু বিশ্বরঞ্জন বাল্যকাল হইতেই অত্যন্ত স্বাধীন ও দুর্দ্দমনীয় স্বভাব। সে কোন দিনই অন্যায় সহিতে পারিত না। শরীরে অনন্য সাধারণ বল ছিল, নীচতা ও হীনতা দেখিয়া যখন সেই সুন্দর গৌর মুখমণ্ডল ক্রোধে রক্তবর্ণ হইয়া উঠিত, তখন পল্লীবালকগণ প্রমাদ গণিত। বিশ্বরঞ্জনের মা এই অসম সাহসী অনমনীয় বালকটিকে

লইয়া পাড়ার মধ্যে চির-অপরাধিণীর মত সশঙ্কোচে বাস কিরিতেন।

যৌবনে পদার্পন করিয়াও বিশ্বরঞ্জনের একগুয়ে স্বভাব গেল না। এম, এ, পাশ করিয়া বাড়িতে আসিয়া সে যখন প্রচার করিল যে সে চাকরী করিবে না, তখন পাড়ার লোকে যেন একটা আরাম মিশ্রিত কৌতুক অনুভব করিল। কিন্তু বিশ্বরঞ্জনের মা ইহাতে বিশেষ ক্ষুণ্ণ হইলেন না। সংসারে অনটন কিছুই ছিলনা, কাজেই একমাত্র পুত্র যে চাকরী লইয়া সাতসমুদ্র তের নদীর পারে চলিয়া যাইবে না, ইহাতে তিনি খুশীই হইলেন। কিন্তু বিশ্বরঞ্জন যখন বলিল যে সে বিবাহ করিবে না এবং বিলের পারে কুটীর বাঁধিয়া তাহাতে একাকী বাস করিবে, তখন মিত্র গৃহিণী হতবুদ্ধি হইলেন এবং কন্যাদায়গ্রস্ত পিতাগণ অতিশয় চটিয়া গেলেন।

কিন্তু বিশ্বরঞ্জন একবার মনস্থির করিলে তাহাকে তাহা হইতে টলান সম্ভবপর নহে। বিশ্বরঞ্জনদের গ্রাম হইতে পূর্ব্বোল্লিখিত বিল খুব নিকটে, মধ্যে একখানা ছোট মাঠ মাত্র ব্যবধান। পূর্ব্বোল্লিখিত ফলের বাগানে বকুল গাছের নীচে বিশ্বরঞ্জন ঘর বাঁধিতে লাগিল। অনতিবৃহৎ পরিস্কার খড়ের ঘর শীঘ্রই প্রস্তুত হইল;—ঘরের চতুর্দ্দিকে বৃহৎ ফুল বাগান করা হইল,—বিশ্বরঞ্জন স্বহস্তে তাহাতে অসংখ্য রকম ফুলের গাছ আনিয়া রোপন করিল। বকুল গাছের নীচ দিয়া বিলে নামিবার জন্য ঘাট নির্ম্মিত হইল। একখানা চিত্র বিচিত্র পান্‌সী আনিয়া বিলে ভাসান হইল। পল্লীবৃদ্ধ ও বৃদ্ধাগণ এরূপ অশ্রুতপূর্ব্ব পছন্দে বিস্ময়বিমূঢ় হইয়া অনেক মাথা নাড়িলেন; কিন্তু পল্লী যুবকগণ বিশ্বরঞ্জনের পক্ষে ছিল। তাহারা শত হস্তে তাহাকে সাহায্য করিতে লাগিল।

যখন সমস্ত ঠিক হইল তখন বিশ্বরঞ্জন নূতন গৃহে তাহার শয্যা, আসবাবপত্র ও সুবৃহৎ পুস্তকালয় লইয়া আসিল। বিশ্বরঞ্জনের নিঃসঙ্গ জীবন আরম্ভ হইল।

(২)

গভীর, শান্ত, নিস্তব্ধ, ধ্যানময় জীবন! ছোট-কুটীর খানিতে বসিয়া চারিদিকে চাহিয়া বিশ্বরঞ্জন যেন বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে আপনাকে হারাইয়া ফেলিত। যে দিকে চক্ষু চলে দিগন্তের প্রান্ত পর্য্যন্ত নবীনধান্যের তরঙ্গায়িত নীলিমা; মধ্যে মধ্যে শ্যামল গ্রামগুলি কত বিচিত্র সুখ দুঃখ লইয়া নিস্তব্ধ হইয়া রহিয়াছে! বৈশাখের উত্তপ্ত মধ্যাহ্নে বিশ্বরঞ্জন কুটীর বাতায়ন হইতে আনমনে চাহিয়া থাকিত,-দেখিত বিলের কাল জলের উপর কচি কল্‌মী পাতাগুলি সূর্য্যের প্রখর তাপে ঝলসিয়া গিয়াছে; ফলিমাছ রূপালি পুচ্ছের আঘাতে কল্‌মীদল আকুল করিয়া জলে লুকাইতেছে; পানিকাউর অবিশ্রান্ত জলে ডুবিয়া ডুবিয়া কি যেন হারানিধির সন্ধানে ব্যস্ত; দূরে একটী হিজল গাছের নীচে মলিন অঞ্চল পাতিয়া রাখাল শিশু ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, গাভীর দল গাছের ছায়ায় শুইয়া মুদিত নেত্রে রোমন্থন করিতেছে; একটি গাভী রাখাল শিশুর মাথার কাছে শুইয়া তাহার কেশ লেহনে প্রবৃত্ত, নয়ন হইতে যেন কত স্নেহ ঝরিয়া পড়িতেছে। বিলের জলে একটি নৌকা ডুবান, তাহার 'গলই' জলের উপর ভাসিয়া আছে, তাহার উপর একটি হ্রস্বগ্রীব দুগ্ধ-ধবল বক মুদিতনেত্রে বসিয়া।

বিশ্বরঞ্জনদের গ্রামের প্রান্তে মাঠের ধারে ছোট একটি পুকুর, বিশ্বরঞ্জনের কুটীর হইতে বড় বেশী দূর নয়। তাহার এক কোনায় আমগাছের ছায়ায় একটি ঘাট, ঘাটে একটি বধূ বাসন মাজিতেছে। নববধূ, ঘুমটা সরিয়া গিয়াছে, এখনও ঘুমটা দেওয়া অভ্যাস হয় নাই। বধূ আপন মনে বাসনের উপর ঝুকিয়া পড়িয়া তদ্গত চিত্তে বাসন মাজিতেছে। মনে মনে কি যেন চিন্তা করিতেছে, আর ধীরে ধীরে বাসনের উপর হস্তের বেগ কমিয়া আসিতেছে; অবশেষে হস্ত থামিয়া গেল, বধূ শূন্য দৃষ্টিতে মাঠের দিকে চাহিয়া রহিল, ছল ছল নয়ন হইতে দুই বিন্দু অশ্রু গড়াইয়া পড়িতেছিল। সহসা যেন তাহার চেতনা হইল, অঞ্চল কোনে নয়ন মুছিয়া, আবার দ্রুত হস্তে বাসন মাজিতে লাগিল। মনে চিন্তা স্রোত তখনও চলিতেছিল, আবার হাতের গতি সিথিল হইয়া থামিয়া গেল,—বধূ অবনতমুখী, বদন মণ্ডলে মৃদুহাস্যের সহিত লজ্জার স্বর্গীয় অরুণিমা ফুটিয়া উঠিয়াছে। অবশেষে বাসন ধুইয়া বাসনের 'পাজা' লইয়া সে পুকুরের পারে যাইয়া উঠিল। পঞ্চম বর্ষীয়া

ননদিনী সঙ্গে আসিয়াছিল; বধূ দেখিল হিজলের ছায়ায় ঘাসের উপর সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, বাতাস তাহার কাল কেশের গুচ্ছ লইয়া খেলা করিতেছে, সুপ্তদেহের উপর একটির পর একটি করিয়া রক্তবর্ণ হিজলের ফুল ঝরিয়া পড়িতেছে। ভ্রাতৃজায়ার ডাকে ব্যস্ত হইয়া সে উঠিয়া বসিল, ধীরে ধীরে দুজনে বাড়ী চলিয়া গেল।

বিশ্বরঞ্জন দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া চক্ষু ফিরাইল। তাহার কুটীরের অনতিদূর দিয়া পথ চলিয়া গিয়াছে। বন্ধুর, কঠিন, সরু, ধবল পথ,-পার্শ্ববিরল, প্রখর সূর্য্য কিরণে সে পথ কি রকম এক পীড়াদায়ক দীপ্তি ধারণ করিয়াছে, তাহার দিকে চাওয়া যায় না। একটি মাত্র পথিক সেই উত্তপ্ত পথ বাহিয়া ধীরে ধীরে যাইতে ছিল। ধীরে—ধীরে, প্রত্যেক পাদক্ষেপেই মনে হইতেছিল এই-বার বুঝি পথিক বসিবে। পথিক বসিল না, জীর্ণ ছাতার অন্তরালে ভাবনার রাজ্য সৃষ্টি করিয়া বিশ্বসংসার হইতে যেন একান্ত হইয়া ধীরে ধীরে সে চলিয়া গেল। দূরের মাঠে বাতাস কাঁপিয়া কাঁপিয়া উপরে উঠিয়া যাইতেছিল। সমস্ত বিশ্ব প্রকৃতিও যেন সেই রকম শুদ্ধতায়, পূর্ণতায়, ঝিমি ঝিমি, থর থর করিতেছিল।

এইরকমে নিঃসঙ্গ বিশ্বরঞ্জনের দিনগুলি কাটিতেছিল। সে যেন বাহ্য জগৎ ভুলিয়া দিবানিশি অন্তর্জগতে বাস করিত। আষাঢ়ের নবীন মেঘ গুরু গুরু করিয়া গর্জ্জন করিয়া উঠিলে, তাহার হৃদয় কি যেন অজ্ঞাত আশা আকাঙ্খায় দুরু দুরু করিয়া কাঁপিয়া উঠিত, তখন মেঘদূত তাহাকে কোন সান্ত্বনাই দিতে পারিত না। এই নিঃসঙ্গ বিষয়বিরাগী সৌন্দর্য্যের উপাসক কি চায়! কাহার অপেক্ষায় সে এমন করিয়া সাধনা করিতেছে? প্রবল বেগে বৃষ্টিধারা নামিয়া আসিত, দূরের গ্রামগুলি ঝাপসা দেখা যাইত, দুর্ভেদ্য রহস্যময় বৃষ্টিযবনিকা দিগ্বলয় আবরিয়া ফেলিত, আর বিশ্বরঞ্জন আপনার কুটীরে বসিয়া আপনার মধ্যে গভীরতর নামিয়া যাইত। বাহিরে বাজিত ঝম্ ঝম্ ঝম্, তাহার হৃদয়ে যেন কাহার ভৈরব নূপুর প্রতিধ্বনিত হইত ঝম্ ঝম্ ঝম্। বাহিরে গাছগুলি বাতাসের সঙ্গে মিশিয়া নুইয়া নুইয়া পড়িত, বিশ্বরঞ্জনের হৃদয় তাহাদের সঙ্গে তাল রাখিয়া গভীর আনন্দে তাণ্ডব নৃত্য করিত।

নিঃসঙ্গ বিশ্বরঞ্জনের নির্জ্জন বাসের এক প্রধান সঙ্গী ছিল তাহার ক্ষুদ্র বাঁশরীটি। যখন বাহিরের কিছুই তাহার মনকে আকৃষ্ট করিতে পারিত না, তখন বিশ্বরঞ্জন তাহার হৃদয়ের সমস্ত মাধুর্য্য বাঁশরীর তানে ঢালিয়া দিত অসীম পিপাসা অনন্ত বেদনা নিবেদন করিয়া বাঁশরী ফুকারিয়া উঠিত। ক্লান্ত পথিক সে তান শুনিয়া থমকিয়া দাঁড়াইত, গভীর নিশীথে সে তান শুনিয়া তরুণ তরুণীগণ তন্দ্রার ঘোরে শিহরিয়া উঠিত। ভাষার অতীত এক অনুভূতিতে তাহারা আকুল হইয়া উঠিত, তাহাদের কেবল এইমাত্র বোধ থাকিত যে বিশ্বরঞ্জনের বাঁশী বাজিতেছে।

বিশ্বরঞ্জনের দিনগুলি একটা ছল ছল ভরপুর সৌন্দর্য্য হইয়া প্রভাতে অরুণ কিরণে কমলিনীর মত হাসিয়া উঠিত; রাত্রির প্রহরগুলি এক গাঢ় সজাগ আনন্দ লইয়া একে একে কুমুদিনীর কিশলয়ের মত ধীরে ধীরে বিকশিত হইত। এই নির্জ্জন প্রদেশে প্রকৃতিদেবী যেন নিঃশঙ্ক, নিঃসঙ্কোচ হইয়া তাঁহার সমস্ত সৌন্দর্য্য ভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া দিতেন, বিশ্ব-রঞ্জন ধ্যানময় নয়নে সেই নগ্ন উন্মুক্ত সৌন্দর্য্য মদিরা পান করিয়া ভূমা আনন্দে বিভোর হইয়া উঠিত, সেই আনন্দ তাহার লেখনীমুখে ফুটিয়া উঠিত, এবং দেখিতে দেখিতে তাহা দেশময় ছড়াইয়া পড়িত। প্রাতে কোন কোন দিন গ্রামের বালকগণ এবং যুবকগণ বিশ্বরঞ্জনের উপদেশ ও পরামর্শ লইতে আসিয়া তাহার নির্জ্জন আনন্দ কুটীরকে হাস্য কোলাহলে মুখরিত করিয়া তুলিত। দুপুরে মধ্যে মধ্যে তাহার মাকে লইয়া গ্রামের বৃদ্ধাগণ বিশ্বরঞ্জনের মুখে রামায়ণ মহাভারত শুনিতে আগমন করিতেন, কোন কোন দিন বা বিশ্বরঞ্জনের বৌঠানগণ দল বাঁধিয়া সেই নির্জ্জন আশ্রমে আসিয়া তাঁহাদের এই নিঃসঙ্গ বিবাহবিরাগী দেবরটির সঙ্গে হাসিঠাট্টার দুটা কথা বলিয়া যাইতেন; তাঁহাদের মধুর অবির্ভাবে সেই ধ্যানময় আশ্রম যেন ক্ষণকালের জন্য চঞ্চল হইয়া উঠিত। বৈকালে প্রায়ই হুকাহস্তে গ্রামের

বৃদ্ধগণের আগমন হইত এবং জটিল সামাজিক সমস্যার কুটিল বিতর্কে আশ্রমের বায়ু ভার হইয়া উঠিত। এই সকল বিপ্লব বিক্ষোভে বিশ্বরঞ্জনকে স্পর্শও করিত না, সে তাহার অটল গৌরবাসনে থাকিয়া সকলের মনোরঞ্জন করিত।

(৩)

পূজা শেষ হইয়া গিয়াছে। ষষ্ঠীর শেষ রাত্রে শেফালীগন্ধে দোয়েলের শীষে, ফুল গাছের তলায় ছেলেদের উল্লাস কলরবে এবং ঢাকের শব্দে দেশময় যে আনন্দ তুফান উঠিয়াছিল, দশমীর রাত্রে প্রতিমাবিসর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে অশ্রুজলে তাহার পরিসমাপ্তি হইয়াছে। এই তিন দিন উন্মুক্ত প্রান্তর বাহিয়া থাকিয়া থাকিয়া উন্মাদন ঢাকের শব্দ আসিয়া বিশ্বরঞ্জনের প্রাণকে কেবলি আকুল করিয়া তুলিয়াছিল। সে হৃদয় ভরা আনন্দ লইয়া এক দিন গ্রামে প্রতিমা দেখিতে ছুটিয়া গিয়াছিল, কিন্তু বাড়ীর পর বাড়ী প্রতিমা দেখিতে দেখিতে তাহার হৃদয়ের উদ্বেল আনন্দ স্রোত যেন শুকাইয়া আসিতে লাগিল। একি কৃত্রিমতা! একি হৃদয় হীনতা! একি মলিন তমোময় ব্যসন,—সে ত্রাসে তাহার আনন্দ কুটীরে ছুটিয়া পলাইয়া আসিল। সেথায় বসিয়া কি আনন্দ! সমস্ত বঙ্গদেশের শক্তিযেন ঢাকের তালে তালে নাচিতেছে, বিশ্বরঞ্জন যেন অসুরমর্দ্দিনী দশপ্রহরণধারিণী শক্তিকে প্রত্যক্ষ দেখিতে লাগিল। বিশ্বময় কি উৎসাহ, কি আগ্রহ, কি উল্লাস!

দশমীর রাত্রে প্রতিমা ডুবানের বিষাদময় বাদ্য তখনও থাকিয়া থাকিয়া বাজিয়া উঠিতেছিল, বিশ্বরঞ্জনের চিত্ত অশান্ত হইয়া উঠিল। কেমন একটা অসহ্য অশোয়াস্তি তাহাকে আকুল করিয়া তুলিতে লাগিল। জননীকে দূরে দেখিয়া পিতৃক্রোড়স্থিত শিশু যেমন অশান্ত হইয়া মাতার কোলে যাইবার জন্য দুই হাত বাড়াইতে থাকে, বিশ্বরঞ্জনের মনের সমস্ত সুকুমার বৃত্তিগুলি যেন তেমনি অশান্ত হইয়া কোন্ এক অনির্দ্দেশ্য আনন্দের দিকে হস্ত প্রসারণ করিতে লাগিল। কে যেন আসিবে, কাহার যেন পদধ্বনি হৃদয়ের গোপন কুঞ্জে বাজিয়া উঠিতেছে, সে যেন প্রতি পাদক্ষেপে পুষ্পরাশি ফুটাইয়া অগ্রসর হইতেছে, বাতাস যেন তাহার গন্ধ লইয়া হৃদয়ে আসিয়া লাগিয়াছে। বিশ্বরঞ্জন তাহার আসন বকুল গাছের তলে আনিয়া স্থাপন করিল এবং তাহার উপর বসিয়া তাহার হৃদয় যেন এক অজানিত আনন্দে উছলিয়া উঠিতে লাগিল। দশমীর চন্দ্রের অনতিপারস্ফুট জ্যোৎস্নায় চতুর্দ্দিক রহস্যময় দেখাইতেছিল। একটি একটি করিয়া বৃন্তচ্যুত গন্ধ-অবশ বকুল ফুল বিশ্বরঞ্জনের দেহে ঝরিয়া পড়িতেছিল, বিশ্বরঞ্জন তাহাদের কোমল স্পর্শে শিহরিয়া উঠিতেছিল। সে কি কোমল স্পর্শ! কত জন্মান্তরের স্মৃতির দ্বার কত ভবিষ্যতের আকাঙ্খার দ্বার যেন তাহাতে খুলিয়া যায়।

বিশ্বরঞ্জনের চিত্র-বিচিত্র ক্ষুদ্র পান্‌সীটি বকুল গাছের নীচে ঘাটে সমীরণ হিল্লোলে নাচিতেছিল। বিশ্বরঞ্জন আসন হইতে উঠিয়া কুটীর হইতে তাহার বাঁশরীটি লইয়া আসিয়া ধীরে ধীরে ঘাটে নামিল এবং পান্‌সীতে উঠিয়া বন্ধন খুলিয়া দিল। ছোট বৈঠার আঘাতে চঞ্চল জল চন্দ্রকিরণে ঝিকি মিকি করিয়া উঠিল। ধীরে ধীরে তরণী চলিল, চতুর্দ্দিকে অসংখ্য কুমুদ পীত হৃদয় খানি উন্মুক্ত করিয়া চন্দ্রের দিকে চাহিয়া শুভ্রহাস হাসিতেছিল। বিশ্বরঞ্জন বাহিয়া বাহিয়া প্রত্যেক কুমুদের নিকট যাইতে লাগিল, তাহাদের কোমল হৃদয়ের ঢল ঢল আনন্দ যেন মৃদুগন্ধরূপে উছলিয়া উঠিতেছিল। বিশ্বরঞ্জন পানসী হইতে ঝুঁকিয়া পড়িয়া অতি সন্তর্পনে তাহাদের গন্ধ লইতে লাগিল, চন্দ্রের পানে প্রসারিত সেই স্বর্গীয় সৌরভ বিশ্বরঞ্জনের হৃদয়ের কানে কানে যেন কি আনন্দ বারতা বলিতে লাগিল। আনন্দবিভোর বিশ্বরঞ্জন বৈঠা রাখিয়া দিল, এবং সেই জ্যোৎস্নাপ্লাবিত বিলের মাঝে নৌকা ছাড়িয়া দিয়া বাঁশরীতে তান ধরিল। বিসর্জ্জনের দিনে বাঁশরীতে আগমনীর আনন্দ বাজিতে লাগিল,—যে তানে একদিন যমুনা উজান বহিয়াছিল, সেই বিশাল প্রান্তর ভরিয়া সেই তান আজ কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। চতুর্দ্দিকের গ্রামবাসিগণ শিহরিয়া শুনিল, বিশ্বরঞ্জনের বাঁশরীতে নূতন সুর বাজিতেছে!

নৌকা বিহার হইতে যখন বিশ্বরঞ্জন গৃহে ফিরিল তখন বিসর্জ্জনের ঢাকের ধ্বনি থামিয়া গিয়াছে। চতুর্দ্দিকের গ্রাম হইতে কেবলি হুলুধ্বনি শুনা যাইতেছিল,

প্রত্যেক গৃহে গৃহিনীগণ দশমীপ্রত্যাগতদিগকে হুলুধ্বনি সহকারে ধান দূর্ব্বা দিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে ছিলেন। হঠাৎ ফুল ছিঁড়িবার শব্দে চমকিত হইয়া বিশ্বরঞ্জন চাহিয়া দেখিল, রজনীগন্ধা গাছের কাছে একটি তরুণী দণ্ডায়মানা। বহুবিধ ফুল তুলিয়া সে আঁচল ভরিয়াছে, এখন নতমুখে একটি একটি করিয়া রজনীগন্ধা তুলিতেছিল। পরিধানে তার পাতলা নীল শাটি, চন্দ্র কিরণে তাহা ঝিক্ মিক্ করিতেছিল। আধ ঘুমটায় মুখখানি ঢাকা, দেখা যাইতেছিল না, অঙ্গের স্বর্গীয় গোলাপী আভা যেন নীলশাটি বিদীর্ণ করিয়া বাহির হইতেছিল।

একি আবির্ভাব! বিশ্বরঞ্জন কিছুক্ষণ মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল। তরুণী লঘুহস্তে রজনীগন্ধা গাছের ফুল নিঃশেষ করিতেছিল। অবশেষে এক মহা-আনন্দের প্রেরণায় বিশ্বরঞ্জন ধীরে ধীরে তরুণীর অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। পদশব্দে চমকিত হইয়া তরুণী মুখ তুলিল—বিশ্বরঞ্জনের নয়ন ধাঁধিয়া যেন বিদ্যুৎ চমকাইয়া গেল। পুনরায় ফিরিয়া চাহিতেই তরুণীর মূর্ত্তি যেন ধীরে ধীরে বাতাসে মিলাইয়া গেল!

কিন্তু সে যাহা দেখিয়াছে, যাহা পাইয়াছে তাহাই যথেষ্ট। অসীম উল্লাসে অসহ্য পুলককম্পন বক্ষে লইয়া সে গৃহে ফিরিল। সে রাত্রে তাহার নিদ্রা হইল সে ত নিদ্রা নহে, তাহা এক অপূর্ব্ব আনন্দ জাগরণ।

(৪)

লক্ষ্মী পূর্ণিমার জ্যোৎস্নাজোয়ারে সেই বিশাল প্রান্তর ভরিয়া এক নিস্তব্ধ আনন্দের তরঙ্গ উঠিতেছিল। ধীরে ধীরে স্নিগ্ধ সমীরণ বহিতেছিল, নারিকেল গাছের মাথায় মাথায় স্বপ্নময় ঝির ঝির ধ্বনি বাজিয়া উঠিতেছিল,—বকুলগাছের তলায় আলো ছায়ায় বিচিত্র খেলা! দূরে গ্রামগুলির স্তব্ধ বৃক্ষমণ্ডিত মূর্ত্তি জ্যোৎস্নালোকে ঝাপ্‌সা দেখা যাইতেছিল। নির্ম্মল শারদাকাশে জ্যোৎস্নোদ্ভাসিত দেহ দুই একখণ্ড লঘু স্বল্পায়তন মেঘ নির্ম্মল সরোবরে রাজহংসের মত ভাসিতেছিল।

বিশ্বরঞ্জন তাহার কুটীরের সমস্ত দরজা জানালা খুলিয়া দিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া আছে। জ্যোৎস্নালোক সমস্ত ঘর ভরিয়া শিশুর মত যেখানে সেখানে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। বিশ্বরঞ্জনের বাগানে সমস্ত ফুল একত্র ফুটীয়া উঠিয়াছে, আকুল বকুল—শেফালী হেনার গন্ধ কুটীর খানিকে ঘিরিয়া ঘিরিয়া উছলিতেছিল। বিশ্বরঞ্জনের চারিদিকে এক স্বপ্নস্বর্গ রচিত হইয়া উঠিয়াছিল।

লঘুপদশব্দে বিশ্বরঞ্জন মুখ তুলিয়া চাহিল, পুলকে তাহার শরীর শিহরিয়া উঠিল! দরজায় দাঁড়াইয়া সেই তরুণী! তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে চাঁদের কিরণ পড়িয়াছিল, প্রস্ফুটিত কুসুম হইতে মদির সৌরভের ন্যায়, পূর্ণিমার চন্দ্র হইতে শুভ্র জ্যোৎস্নার ন্যায় সেই আনন হইতে স্বর্গীয়মাধুরী নীরবে উছলিয়া পড়িতেছিল!

হৃদয়ের তারে তারে স্বর্গীয়বীনা ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল;—"প্রিয়তম, আমি আসিয়াছি।"

"আসিয়াছ প্রিয়তমে,—চির জীবনের সাধনার ধন আমার";—উন্মত্ত আলিঙ্গনে বদ্ধ দুইটি হৃদয়ের নিমেষে লক্ষ লক্ষ যুগ কাটিয়া যাইতে লাগিল, অতীত বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ বিলুপ্ত, একাকার হইয়া গেল।

* * * *

একি নূতন জীবন! বিশ্বের প্রত্যেক ক্ষুদ্রতম বস্তুটিও আনন্দ-মণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে, সমস্ত সৃষ্টি যেন অনায়াসে অত্যন্ত অন্তরঙ্গ হইয়া গিয়াছে। প্রেম মন্দাকিনীতে যেন জোয়ার আসিয়াছে। বিশ্বরঞ্জন এ পর্য্যন্ত নিজকে অত্যন্ত সন্তর্পনে সমাজের পঙ্কিল স্পর্শ হইতে বাঁচাইয়া চলিত। এখন এক আনন্দ প্রেরণায় সে সমাজে বাহির হইয়া পড়িল। তাহার পবিত্র স্পর্শে প্রাণপণ যত্নে, সমাজ যেন নবশ্রী ধারণ করিতে লাগিল। ক্ষুদ্র হিংসা কলহ, পরশ্রীকাতরতা সমাজ হইতে দূরে পলায়ন করিল, চতুর্দ্দিকে ধীরে ধীরে এক আনন্দবাজার গড়িয়া উঠিতে লাগিল। সমস্ত দিন বিশ্বরঞ্জন অক্লান্ত পরিশ্রম করিত, অসীম শক্তি যেন তাহার হৃদয়ে ধরিত না। এই শক্তিমান পুরুষের আবির্ভাবে দেশে এক নবীন ভাবের বন্যা বহিয়া গেল। অসহায় যেখানে আর্ত্তনাদ করিতেছে সেখানে বিশ্বরঞ্জন, দুঃস্থ যেখানে দুঃখে ম্রিয়মাণ বিশ্বরঞ্জনের আবির্ভাবে দেখিতে দেখিতে সে স্থান আনন্দে হাসিয়া উঠে। দিনে সে বিশ্বের মনোরঞ্জন করিয়া,

অশক্ত বিশ্বকে শক্তিদান করিয়া বেড়ায়। রাত্রে তাহার প্রেমউৎসব।

দিন শেষে ক্লান্ত রবির রক্তিমরেখা যখন বকুল গাছের শীর্ষ হইতে ধীরে ধীরে মুছিয়া যায়, সন্ধ্যার নেশায় যখন দিগদিগন্তের নয়নপল্লব নিমীলিত হইয়া আসে, বিশ্বরঞ্জনের বাগানে তখন শেফালী, গন্ধরাজ কামিনীর গন্ধ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে,—এক মধুর আবেশে বিশ্বরঞ্জনের সমস্ত আশ্রমখানা ভার হইয়া যায়। দেখিতে দেখিতে বিশ্বরঞ্জনের সারাদিনের কর্ম্ম-ক্লিষ্ট হৃদয় প্রভূত শান্তিতে পরিপ্লুত হইয়া উঠে, অসীম অনন্তে হৃদয় প্রসারিত করিয়া বিশ্বরঞ্জন আপনার অস্তিত্ব হারাইয়া ফেলে। নিঃশব্দ পদসঞ্চারে তরুণী আসিয়া বিশ্বরঞ্জনের বক্ষে ঝাপাইয়া পড়ে, বক্ষলগ্না প্রিয়ার হৃদয়ের উত্তাপ হৃদয়ে অনুভব করিয়া বিশ্বরঞ্জন সজাগ হইয়া উঠে। তারপর দুইটি অমর আনন্দময় সত্তার হৃদয়ে হৃদয় দিয়া কি অনন্ত প্রেম যাত্রা। ক্ষুদ্র পৃথিবী কত অলীক সুখ দুঃখের স্বপন লইয়া পদতলে অসাড় হইয়া পড়িয়া থাকে; মঙ্গলগ্রহ উদ্দেশ্যহীন আকাশ প্রদীপের মত একাধারে মিটিমিটি জ্বলিতে থাকে; বৃহস্পতি তাহার অষ্টচন্দ্র লইয়া দূরে বালকের ক্রীড়নকের মত শোভা পায়; সৌরজগতের অধিপতি আঁধার আকাশপথে কথঞ্চিৎ আলো বিচ্ছুরিত করে। উজ্জ্বল ছায়াপথ পান্থবিহীন প্রশস্ত রাজপথের মত শুব্ধ হইয়া পড়িয়া থাকে, তাহার উপর দিয়া কি অসীম আনন্দ পর্য্যটন! আনন্দঅবশ দুইটি হৃদয় অবশেষে ক্লান্তপক্ষ-বিহঙ্গমের ন্যায় ধরার নীড়ে পুনঃ ঢলিয়া পড়ে।

উষা যখন মাতৃহস্তসজ্জিতা দয়িতকক্ষগামিণী কন্যার মত লজ্জারুণ মৃদুহাস্যোদ্ভাসিত আননে পূর্ব্বদিকে প্রকাশিত হয়, যখন সকল পাখী একত্র কূজন করে এবং বাগানে সমস্ত ফুল একত্র ফুটিয়া উঠে তখন ধীরে ধীরে বিশ্বরঞ্জনের বাহুবন্ধন শিথিল করিয়া তরুণী অন্তর্হিত হয় এবং নবীন শক্তি লইয়া বিশ্বরঞ্জন দিবসের কাজের জন্য জাগিয়া উঠে।

(৫)

শুব্ধ মধ্যাহ্ন। বিশ্বরঞ্জন বকুলের ছায়ায় বসিয়া গীত-গোবিন্দ পড়িতেছিল। পড়িতেছিল আর মধ্যে মধ্যে পুঁথি বন্ধ করিয়া দিগন্তের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে চাহিয়া চিন্তা করিতেছিল। জয়দেবের মধুর কোমলকান্ত পদাবলীর লালসা জাগান তীব্র মদির তাহার হৃদয়ে যেন একটা নূতন উন্মাদনা জাগাইয়া দিয়া যাইতেছিল। একটা বিশ্বশোষী তৃষ্ণা, একটা অসহ্য উন্মাদন আকাঙ্খা তাহাকে আকুল করিয়া তুলিতেছিল। পৃথিবী যেন তাহার নিকট রঙিন্, উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। দারুণ অশোয়াস্তি অনুভব করিয়া সে গীতগোবিন্দ বন্ধ করিয়া রাখিয়া ঘরে যাইয়া বসিল। দেখিল কঙ্কন ঝঙ্কার এবং কলহাস্যে পথ মুখরিত করিয়া তাহার বধূঠাকুরাণীগণ তাহার আশ্রমে আগমন করিতেছেন।

আজ যেন বিশ্বরঞ্জন তাঁহাদের দিকে সহজ সরলভাবে চাহিতে পারিল না,—চোখে চোখ পড়িতেই সে একটা অননুভূতপূর্ব্বকুণ্ঠা ও সঙ্কোচ বোধ করিতে লাগিল। তাঁহারা যে স্ত্রীলোক এবং সে নিজে যে পুরুষ, এবং স্ত্রী পুরুষের মধ্যে যে একটা দৈহিক সম্পর্ক আছে, এই উপলব্ধিটাই ফিরিয়া ফিরিয়া যেন তাহাকে অত্যন্ত পীড়া দিতে লাগিল। এই নিঃসঙ্গ দেবরটির আশ্রমটিকে বধূঠাকুরাণিগণ পরম লোভনীয় স্থান মনে করিতেন, সপ্তাহান্তে একবার এই আনন্দ নিকেতনে আসিয়া বিশ্বরঞ্জনের সঙ্গে দুটা কথা কহিয়া যাইবার জন্য তাঁহারা সারা সপ্তাহ পরম আগ্রহে প্রতীক্ষা করিতেন। তাই আজও তাঁহারা আশ্রমে আসিয়া অবিরাম হাসি গল্প করিয়া যাইতে লাগিলেন। কিন্তু বিশ্বরঞ্জন যেন পূর্ব্বের ন্যায় শিশুর মত তাহাদের সঙ্গে মিশিতে পারিতেছিলনা! সে নতনয়নে চাহিয়া বধূঠাকুরাণীগণের হাসি ঠাট্টার উত্তর দিতে ছিল, চোখ তুলিয়া চাহিলেই যেন মহা অপরাধ হইয়া যাইবে! প্রবীনা বড় বধূঠাকুরাণী বিশ্ব-রঞ্জনের এই ভাবান্তর লক্ষ্য করিতেছিলেন। তিনি রহিয়া রহিয়া বিশ্বরঞ্জনকে মিষ্ট এবং ঝাল মিশ্রিত তীক্ষ্ণ বাক্য বাণে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। স্থির বুদ্ধি বিশ্বরঞ্জন নিজকে জীবনে আর কখনো এমন বিপন্ন বোধ করে নাই, সে লাল হইয়া ঘামিয়া উঠিল। বৌঠানগণ যখন চলিয়া গেলেন তখন সে হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল, যেন একটা অত্যন্ত পীড়াদায়ক নেশা তাহার কাটিয়া গেল।

সন্ধ্যা ধীরে নিস্তব্ধ মায়া বিস্তার করিয়া দিগদিগন্তে নামিয়া আসিল ; কিন্তু বিশ্বরঞ্জনের হৃদয় আজ উত্তপ্ত, অশান্ত, মত্ততাময়। সে আকুল হৃদয়ে প্রিয়তমার প্রতীক্ষা করিতে লাগিল এবং এই প্রদাহী আকুলতা তাহাকে পীড়া দিতে লাগিল।

লঘু পাদসঞ্চারে তরুণী কুটিরে প্রবেশ করিয়া বিশ্বরঞ্জনকে দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল, আর আর দিনেরমত আসিয়াই প্রিয়তমের বক্ষে ঝাপাইয়া পড়িলনা। তাহার আননে এক ভাষার অতীত বিষাদ ফুটিয়া উঠিল ; অসীম বেদনাপ্লুতস্বরে সে ডাকিল "প্রিয়তম"।— "আসিয়াছ" ?—অধীর উন্মত্ত বিশ্বরঞ্জন ত্বরিতে উঠিয়া আলিঙ্গন প্রয়াসে দুই বাহু প্রসারিত করিল।

চকিতে তরুণী পশ্চাতে সরিয়া গেল, বেদনা বিদীর্ণ হৃদয়ে সে বলিল "প্রিয়তম আমাকে স্পর্শ করিওনা"।

"পাষানপ্রতিমা, নিষ্ঠুরে, আমায় আর বঞ্চনা করিওনা"—পাগলের মত বিশ্বরঞ্জন আবার অগ্রসর হইল।

আবার তরুণী সরিয়া গেল।

"প্রিয়তম আমাকে ছুয়োনা, হারাইবে"

হিতাহিত জ্ঞানশূন্য বিশ্বরঞ্জন মদবিঘূর্ণিত লোচনে অগ্রসর হইয়া তরুণীকে প্রাণপণবলে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া পুনঃ পুনঃ চুম্বন করিতে লাগিল।

মরণাহতস্বরে তরুণী আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল— "প্রিয়তম, বিদায়" পরমুহূর্ত্তে বিশ্বরঞ্জনের আলিঙ্গন বদ্ধ তরুণীর দেহ ধীরে ধীরে বাতাসে মিলাইয়া গেল। নিঃসংজ্ঞ বিশ্বরঞ্জনের দেহ ধরার ধূলিতে লুণ্ঠিত হইতে লাগিল।

শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী।

আদর্শ শিক্ষাপদ্ধতি।

শিক্ষাসমাজ।

সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, ধর্ম্মসম্বন্ধীয় অথবা আর্থিক কোন আন্দোলন, অনুষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠানের সহিত কোন শিক্ষা সমিতি বা বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছুমাত্র সংস্রব থাকা উচিত নহে। শিক্ষা বিজ্ঞানের নিয়মানুসারে ও শিক্ষাতত্ত্ববিদগণের পরিচালনায় বিদ্যাদান ও শিক্ষা বিস্তারই ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। এ জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলি ইহার উদ্দেশ্যের মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে।

(ক) বিবিধ উপায়ে শিক্ষা বিস্তার করা,

(১) নিম্নশিক্ষাকে যথাসম্ভব অবৈতনিক করা,

(২) স্থানে স্থানে নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করা,

(৩) বালিকাদিগের শিক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা করা,

(৪) সাহিত্য, বিজ্ঞান, ঐতিহাসিক অনুসন্ধান প্রভৃতি শিক্ষা বিষয়ক প্রবন্ধ, পত্রিকা বা পুস্তিকাদি প্রকাশ করা,—

(৫) শিক্ষা সম্বন্ধীয় বিষয়ে প্রবন্ধাদি পাঠ অথবা প্রবন্ধ প্রতিযোগতার দ্বারা সমাজে বিদ্যাচর্চ্চা ও জ্ঞানানুশীলন উৎসাহিত ও বিস্তৃত করা।

(খ) শিক্ষকদিগের উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা করা— এই উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন করিলে সুফল লাভ হইতে পারে।

(১) ইঁহাদিগকে বিভিন্নদেশের পণ্ডিতব্যক্তি বা সুধীমণ্ডলী প্রভৃতি বিদ্যার জীবন্ত উৎস ও কেন্দ্রস্থানে প্রেরণ করা কর্ত্তব্য,—

(২) ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান কার্য্যের জন্য উপযুক্ত ধুরন্ধরগণের তত্ত্বাবধানে দেশের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ প্রয়োজনীয় ;

(৩) বিভিন্ন স্থানের বিদ্যালয়াদির শিক্ষা প্রণালী ও কার্য্যনির্ব্বাহ প্রভৃতি পরিদর্শনের দ্বারা অভিজ্ঞতা লাভের ব্যবস্থা করা সঙ্গত,

(৪) বিদ্যালয়ের পুস্তকাগারের ও বিজ্ঞানালয়ের উন্নতি সাধন করিয়া স্বক্ষেত্রে উন্নত চিন্তা ও গবেষণার সহায়তা বিধান,

(৫) দেশের প্রধান প্রধান পণ্ডিত ব্যক্তিগণের শুভাগমনের বন্দোবস্ত করিয়া তাঁহাদের উপদেশ ও পরামর্শ গ্রহণ।

(গ) শিক্ষকদিগের দ্বারা নিজ নিজ আলোচ্য বিষয়ে মাতৃ ভাষায় পুস্তক রচনা করাইয়া অধ্যাপনা কার্য্যের সুবিধান করা এবং জাতীয় সাহিত্যের পুষ্টি সাধন করা।

মানসিক শিক্ষার পর্য্যায়।

(১) কিয়ৎকাল পর্য্যন্ত প্রত্যেক ছাত্রকে সাহিত্য বিজ্ঞান এবং শিল্প এই ত্রিবিধ বিষয়ই শিক্ষা করিতে হইবে। এই সময়ের মধ্যে কয়েক বিষয় বর্জ্জন করিয়া অপর কয়েক বিষয় বাছিয়া লইতে দেওয়া উচিত নহে; নিম্নশিক্ষা এইরূপ সর্ব্বতোমুখী হইলেই ভিত্তি দৃঢ় ও বিস্তৃত হয় এবং উচ্চশিক্ষা সুফল প্রদান করে।

(২) ইহার পরে কিছুকাল শিক্ষার ব্যবস্থায় ছাত্রদিগের বিশেষ কৃতিত্ব অথবা অভিরুচি অনুসারে পাঠ্যের বিষয় বাছিয়া লইতে দেওয়া উচিত, কিন্তু কেবল একটিমাত্র বিষয় গ্রহণ করিতে দেওয়া সঙ্গত নহে। যে ছাত্র সাহিত্যে নিপুণ তাহাকে ইহার সংশ্লিষ্ট এবং সহায়তাকারী আরও দু'একটী বিষয় গ্রহণ করিতে হইবে। বিজ্ঞানে যাহার অভিরুচি তাহাকে ইহার সঙ্গে সঙ্গে আরও কয়েকটী বিষয় গ্রহণ করিতে হইবে।

(৩) সর্ব্বোচ্চশ্রেণীতে কেবল মাত্র একটী বিষয় শিক্ষা করিতে হইবে। ইহার পূর্ব্বে ছাত্রেরা যে বিষয় গ্রহণ করিয়াছে কলেজশ্রেণীতে তাহাদিগকে সেই বিষয়েরই বিশেষ আলোচনা করিতে হইবে। যথা, ইতিহাস রসায়ন ইত্যাদি।

শিক্ষাপ্রণালী।

মানুষের মন গঠনের ও বুদ্ধি বিকাশের প্রধান উপায় ছোট হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ বড় প্রশ্নের মীমাংসা করিতে চেষ্টা করা। যত বাধা কষ্ট দূর করিবার চেষ্টা করা যায় তত মনের শক্তি ও দৃঢ়তা বাড়ে। তাই লেখা পড়া সম্বন্ধে এরূপ নিয়ম হওয়া উচিত যে বই যে পড়িতেই হইবে তাহা নহে—আলোচ্য বিষয়গুলি ভাল করিয়া বিচার করিতে পারিলেই হইল। ইহাতে যথেষ্ট স্বাধীনতা থাকে। এবং ইহাতে দুইটা একটা পুস্তকের দাসত্ব না করিয়া শিক্ষকের সাহায্যে একই বিষয় নানা রকমে নানা মতের ভিতর দিয়া বুঝিয়া দেখিবার সুবিধা পাওয়া যায়। এই উপায়ে ইতিহাস, রাজনীতি, বিজ্ঞান, ভাষা ইত্যাদি সমস্ত বিষয়ই এক নূতন ভাবে মনে স্থান পায়। এবং নিজেও কিছু কিছু চিন্তা করায় এইরূপ পড়ার ফল দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়। কেবল ভাব জগতের কর্ত্তা না হইয়া বাস্তবের প্রতিও দৃষ্টি পড়ে। এইজন্য দেশ বিদেশে ভ্রমণ, নানা রকম লোকের সঙ্গে ভাবের আদান প্রদান, বস্তু সকলের সহিত পরিচয় ইত্যাদি নানা উপায়ে জ্ঞানকে সবল ও দৃঢ় করিবার প্রবৃত্তি হয়। আর দুই খান চারি খান বাঁধা বই না প'ড়িয়া কতকগুলি বিষয় আয়ত্ত করিতে চেষ্টা করিলে প্রধান লাভ হয়, —ছাত্রেরা যখন বই পড়ে, তখন কেবল পড়িতেছে এভাব থাকে না,—লেখক কি ভাবে লিখিয়াছেন—কোন বিষয়ের পর কোন বিষয়ের অবতারণা করা উচিত—কত উপায়ে কোন্ কোন্ "Content"এ একই বিষয় জানা যায় ইত্যাদি লেখার পদ্ধতি লেখকের মূল মন্ত্রগুলি পর্য্যন্ত স্ববশ হইয়া আসে। এ ভাব হইলে লেখা পড়িতে পড়িতে লিখিবার ইচ্ছা ও শক্তির উদ্রেক হয়। কেবল গ্রহণই না করিয়া পরকেও কিছু দিব—এ উচ্চ আশা মনে স্থান পায়। তখন অনুসন্ধিৎসু হইয়া জ্ঞানের অন্বেষণে ব্যাকুলভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়। এ অবস্থায় নিজেদের ইতিহাস বিজ্ঞান শাস্ত্র সাহিত্য ইত্যাদি সকল বিষয়ই পরের চোকে না দেখিয়া নিজেদের চোখে কিরূপ দেখায় ইহা ভাবিতে ও কাজে পরিণত করিতে উৎসাহ হয়। তখন অপরের ভাবগুলি নিজের ভাষায় অনুবাদ করিয়া বা অপরের কথার সারাংশ অল্প কথায় নিজে লিখিয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারা যায় না। তাহাতে কার্য্য ও ঘটনাবলী, সকল প্রকারের চিন্তাস্রোত ও কষ্টের আন্দোলন, এবং সকল প্রকারের দৃশ্য ও শ্রাব্য বস্তুর মধ্যে থাকিয়া প্রশ্নের পর প্রশ্নের দ্বারা মানুষ ও জড় প্রকৃতির লুক্কায়িত ভাণ্ডার হইতে অমূল্য তথ্যের আবিষ্কার করিতে প্রয়াস জন্মে। যথার্থ সত্য নির্ণয় করিয়া এক একটী বিজ্ঞান সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা হয়।

(ক) যথাসম্ভব পুস্তকের সাহায্য ব্যতিরেকে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা উচিত। অবশ্য বাঙ্গালা, সংস্কৃত ও ইংরেজী ভাষার জন্য উপযুক্ত সময়ে কয়েকটী—সাহিত্যরস যুক্ত পুস্তক ব্যবহার করা যাইতে পারে। তবে নিম্ন শ্রেণীতে ভাষা সমূহের প্রধান প্রধান অঙ্গগুলির সহিত—পরিচিত করিয়া দিবার জন্য শিক্ষকগণের পুস্তকের সাহায্য গ্রহণ করা সঙ্গত নহে। মুখে মুখে

ব্যাকরণের নিয়মগুলি আয়ত্ত করিয়া দিবার চেষ্টা করিলে ভাল হয়। ইতিহাস বিষয়ে নিম্ন শ্রেণী সমূহে কথকতার আকারে গল্পের ভিতর দিয়া সমগ্র ইতিহাসের স্তম্ভস্বরূপ প্রধান ঘটনা অন্দোলন ও মহাপুরুষদিগের কাহিনী শিখাইয়া দেওয়া উচিত, এবং উচ্চ শ্রেণীতে কেবল একটী মাত্র টেক্‌স্‌ট বুকের উপর নির্ভর না করিয়া—বিবিধ পুস্তকের সার সঙ্কলনের দ্বারা—শিক্ষা প্রদান করা কর্ত্তব্য।

উদ্ভিদ্ বিজ্ঞান, শরীর বিজ্ঞান, পদার্থ বিজ্ঞান এবং রসায়ন বিজ্ঞান এই চারি প্রকার বিজ্ঞানের প্রধান প্রধান বিষয়গুলি শিক্ষা দেওয়া উচিত। এজন্য আদৌ পুস্তকের ব্যবহার করিতে হইবে না। ছাত্রেরা বিদ্যালয়ে পরীক্ষা করিয়া উদ্ভিদের বিভিন্ন আব স্বয়ং নিরীক্ষণ করিয়া, এবং শরীরের বিভিন্ন অবয়বের—নমুনা দেখিয়া (ভেক ছাগলাদির অঙ্গচ্ছেদ করিতে হইবে), অস্থিবিদ্যা বিষয়ক মানচিত্র নিরীক্ষণ করিয়া এবং চিত্র অঙ্কন করিয়া প্রকৃতির বিবিধ অভিব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পরিচিত হইবার সুযোগ যাহাতে প্রাপ্ত হয় তাহার ব্যবস্থা করা বিধেয়।

সপ্তাহে কয়েক ঘণ্টা ছাত্রদিগকে চিত্র বিদ্যা শিক্ষা করিতে হইবে। সাধারণ বৈজ্ঞানিক ও সর্ব্ববিধ চিত্র অঙ্কনের ব্যবস্থা প্রয়োজনীয়। এতদ্ব্যতীত সূত্রধর এবং তন্তুবায়ের কর্ম্ম শিক্ষা করিলে হস্ত চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের নৈপুণ্য জন্মিবার পক্ষে সুবিধা হয়।

(খ) শিক্ষা প্রণালীর গুণে শিক্ষনীয় বিষয় সমূহের বাহুল্যে কোন অনিষ্ট সাধিত হয় না। বরং বিষয়গুলি পরস্পর সম্বদ্ধ বলিয়া উপকারই হইয়া থাকে। সময় বিভাগ এমনভাবে নির্দ্ধারিত করা উচিত যাহাতে ছাত্রেরা অতি সহজেই বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে মনোনিবেশ করিতে পারে। দৈনিক শিক্ষার সময় কিছু অধিক হইলেও শিক্ষার্থীদের মানসিক শৈথিল্য জন্মে না। বিজ্ঞান গৃহের পরীক্ষা, অথবা কারখানায় সমবেত হইয়া কর্ম্ম করা, চিত্রাঙ্কনে মনোনিবেশ এবং ঐতিহাসিক ভৌগোলিক বিবরণ শ্রবণ প্রভৃতি আমোদ জনক বিষয় শিক্ষা ব্যাপারের যদি প্রধান অঙ্গ হয়, গণিত অথবা সাহিত্যের শিক্ষার সময়ে ছাত্রদিগের অবসাদ বা শিরঃ-পীড়া উপস্থিত হয় না। শিক্ষণীয় বিষয়ের সংখ্যাধিক্য হইলেও ছাত্রদিগের পক্ষে শিক্ষা পদ্ধতি আনন্দদায়ক ও প্রীতিকর বোধ হইতে পারে। পুস্তকের ভারে আক্রান্ত থাকিতে হয় না এবং মুখস্থ করিবার প্রয়োজন হয় না বলিয়া তাহারা বিদ্যাভ্যাসে বিশেষ ক্লেশ বোধ করে না।

বিদ্যারম্ভের কাল হইতেই বয়সও ধারণার উপযোগী প্রাকৃতিক বিজ্ঞান শিক্ষার ফলে বাহ্যজগতের প্রকৃতি ও পরিবর্ত্তন নিরীক্ষণ করিতে করিতে জ্ঞানেন্দ্রিয় সমূহের সম্যক্ অনুশীলন হইতে থাকে।

মুদ্রিত পুস্তক আবৃত্তির পরিবর্ত্তে প্রকৃতির গ্রন্থপাঠ, এবং বিজ্ঞানাগারে পদার্থ সমূহের গুণ বিচার ও কৌতুকোদ্দীপক পরীক্ষা দ্বারা চিত্তের স্ফূর্ত্তি জন্মে এবং সাধারণতঃ শিক্ষা কষ্টকর ও ভীতিজনক না হইয়া আনন্দ-দায়ক হয়। প্রধানতঃ মাতৃভাষার সাহায্যে নিম্নশ্রেণী হইতে সর্ব্বোচ্চ শ্রেণী পর্য্যন্ত শিক্ষা প্রদান করিলে শিক্ষা দুরূহ না হইয়া বরং সহজ হয়; এবং যাহা শিক্ষা করা যায় তাহা বাক্য ও ভাষাগত না থাকিয়া ভাব ও বস্তুগত এবং জীবন্ত হইয়া প্রকৃত বাস্তব জীবনের বিবিধ অভাব মোচনে সাহায্য করে। অধিকন্তু শিক্ষা অল্পায়াস ও অল্পসময়, সুতরাং অল্পব্যয় সাধ্য হয়।

(গ) প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতির নিয়মানুসারে শিক্ষা-র্থীরা বৎসরান্তে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিলেই গৌরব প্রাপ্ত হয়। বৎসরের প্রতিদিন বিদ্যাভ্যাসে মনোযোগী না হইলেও ছাত্রদিগের কোন অসুবিধা ভোগ করিতে হয় না। এই রীতি বর্জ্জন করা উচিত। যাহাতে ছাত্রেরা প্রতিদিনই প্রতিদিনকার পাঠ সমাধা করিয়া ফেলিতে পারে তাহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি নিক্ষেপ করা কর্ত্তব্য। ছাত্রদিগের দৈনিক কার্য্যে মনোযোগী হইতে বিশেষ উৎসাহিত করিয়া তাহাদের চরিত্রের মধ্যে বিদ্যা চর্চ্চার অভ্যাস ও স্থির জ্ঞান পিপাসা সৃষ্টি করিয়া দিবার জন্য দৈনিক পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করা আবশ্যক। প্রতিদিন ছাত্রদিগের পাঠের মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়া একটি পুস্তকে লিখিয়া রাখা উচিত। বৎসরান্তে

দৈনিক পরীক্ষার ফল সমূহ যোগ করিয়া বাৎসরিক পরীক্ষার সহিত মিলাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। সুতরাং বৎসরান্তে ছাত্রদিগের উচ্চতর শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইবার সময় উচ্চ নীচ স্থান কেবল মাত্র ৩।৪ দিনের ক্রমাগত কয়েক ঘণ্টা করিয়া পরীক্ষা গ্রহণের দ্বারা নির্দ্ধারিত না হইয়া বৎসরের কার্য্য ফলের উপর নির্ভর করিবে।

প্রতি বৎসরে বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে বাৎসরিক ফলানুসারে পারিতোষিক বিতরণ করা হয়। পূর্ব্বে যে প্রণালী বিবৃত হইয়াছে তদনুসারে বাৎসরিক ফল নিরূপিত হইলে অনেক সময়ে শেষ বাৎসরিক পরীক্ষায় যে ছাত্রেরা উচ্চস্থান অধিকার করে তাহারাই সর্ব্বোচ্চ পারিতোষিকের অধিকারী হয় না। শেষ বাৎসরিক পরীক্ষায় নিম্নস্থান অধিকার করিয়াও যদি সমগ্র বৎসরের কার্য্য ফল সন্তোষজনক হয় তাহা হইলেও উচ্চ প্রশংসা প্রাপ্ত হইবার অধিকার দেওয়া উচিত।

(ঘ) সাধারণ শিক্ষাপদ্ধতির নিয়মে অভিভাবকেরা ছাত্রদিগের মানসিক উৎকর্ষের পরিচয় পাইবার সুযোগ প্রাপ্ত হয় না। বৎসরান্তে সন্তানদিগের উচ্চশ্রেণীতে উঠিবার কৃতকার্য্যতা, অকৃতকার্য্যতা দেখিয়া যৎকিঞ্চিৎ ধারণা করিতে পারেন মাত্র। কিন্তু অভিভাবকদিগকে ছাত্রদিগের শিক্ষার ফল জানাইবার জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত করা উচিত। দৈনিক পরীক্ষার ফল সমূহ প্রতিমাসের শেষে অভিভাবকদিগের নিকট একখানি মুদ্রিত বিজ্ঞাপন পত্রে প্রেরণ করা কর্ত্তব্য।

ক্রমশঃ।

শ্রীবিনয়কুমার সরকার।

গ্রন্থপরিচয় ও সমালোচনা।

ঝরাফুল—শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য ৷৷৵০ বারো আনা। গ্রন্থের ছাপা, কাগজ ভাল।

এই কবিতাপুস্তকখানি পাঠ করিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। আজকাল যে প্রকার কবিতা লিখিয়া লোক কবিযশলাভ করিতেছে তাহার তুলনায় এই কবিতাগুলি সম্মানের আসন পাইবার যোগ্য। সমালোচ্য গ্রন্থের "বাসনা", "মৃণু", "সন্ধ্যালক্ষ্মীর প্রতি", "সরযূর মৃত্যু" "আজ" এবং "পাগলিনী" শীর্ষক কবিতাগুলি বস্তুতঃই উপভোগ্য। এই কবির একটী বিশেষত্ব এই যে তিনি কথায় যে চিত্র আঁকেন, তাহা ছবির মত উজ্জ্বল হইয়া উঠে। এই জন্যই তাঁহার প্রাকৃতিক দৃশ্য বর্ণনাগুলি এত সুন্দর হইয়াছে। প্রায় সকল কবিতাই শব্দ এবং উপমাসম্পদে সম্পত্তিবান। কিন্তু "দ্বিপ্রহরে" এবং এই প্রকারের অন্য দুই একটী কবিতা পড়িয়া মনে হয় কবি কতকগুলি ফুল জড় করিয়া আনিয়া বিনা সূতায়ই মালা গাঁথিতে চাহিতেছেন, কারণ আদ্যন্ত পড়িয়াও কোন উদ্দেশ্যের খোঁজ পাওয়া যায় না। ব্যঙ্গ কবিতায় কবির হাত নাই, তাই যদিচ "বিংশ শতাব্দীর মেঘদূত" স্থানে স্থানে মন্দ হয় নাই তবুও তাহা না থাকিলে গ্রন্থের পক্ষে ভালই হইত।

ঝরফুলের প্রায় সকল ফুলগুলিই সুন্দর, নয়নের তৃপ্তিকর; কিন্তু ভয় হয় এগুলি কালে ফুলের মতই শুকাইয়া যাইবে। নন্দনের অম্লান পারিজাত ইহাতে আছে বলিয়া মনে হয় না। আর ফুল বাগানে বেড়াইয়া যে আমোদ, ঝরাফুল পড়িয়াও সেই আমোদ ভিন্ন অন্য কোন লাভ নাই। কিন্তু সন্তাপময় এই সংসারে যিনি আমাদিগকে এই প্রকার নির্দ্দোষ এবং অমিশ্র আমোদ দিতে পারেন তিনিও কবি এবং শ্রেষ্ঠ কবি তাহাতে সন্দেহ কি?

করুণানিধান বাবুর তরল ছন্দ এবং ভাষা জমাট বাঁধিয়া ভবিষ্যতে আমাদিগকে গাঢ়তর আনন্দ প্রদান করিবে ইহাই আমরা আশা করি।

গিরিকাহিনী—শ্রীপ্রিয়কুমার চট্টোপাধ্যায় প্রণীত এবং প্রকাশিত। মূল্যের উল্লেখ নাই। উত্তম কাগজে মুদ্রিত, সুদৃশ্য বাঁধাই। কিন্তু ছাপায় এত ভুল যে গ্রন্থকারের ত্রুটিস্বীকার সত্ত্বেও মুদ্রাকরের উপর বিরক্ত হইবার অধিকার আমাদের আছে।

পুস্তকখানি "গিরিকাহিনী" এবং "প্রবাসের ইতিহাস" এই দুই অংশে বিভক্ত। গিরিকাহিনীতে শিলঙের

দর্শনযোগ্য কতকগুলি স্থানের বর্ণনা এবং তৎসম্পর্কে খাসিয়াদের মধ্যে প্রচলিত কতকগুলি উপকথা আছে। গ্রন্থকার দেখিতে জানেন এবং যাহা দেখেন তাহা অন্যকে বলিবার আর্টও জানেন কিন্তু দুঃখের বিষয় ভাষার উপর তাঁহার এখনও তেমন অধিকার হয় নাই। বিশেষত্ব হীন "প্রথম কথা"টী মুদ্রিত না হইলেই ভাল হইত। ইহাতে একটী করুণকাহিনী সৃষ্টি করিবার নিষ্ফল চেষ্টা হইয়াছে। গ্রন্থকারের রুচির প্রশংসাও সর্ব্বত্র করা যায় না। যাহা হউক দার্জ্জিলিং সম্বন্ধে অনেক কথাই অনেকে লিখিয়াছেন কিন্তু শিলং এখনও বাংলার লোকের নিকট অপরিচিত তাই প্রিয়কুমার বাবুর এই উদ্যম প্রশংসনীয়। ভবিষ্যতে গ্রন্থের এই অংশ সংশোধিত হইয়া প্রকাশিত হইবে আমরা এই আশা করি।

গ্রন্থের দ্বিতীয় অংশে শিলং এবং খাসিয়াদের বিবরণ সাধারণভাবে লিখিত হইয়াছে। ইহা মন্দ নহে। কিন্তু ইহার নাম "প্রবাসের ইতিহাস" কেন হইল বুঝিতে পারিলাম না।

এই পুস্তকে ১০ খানা ছবি আছে; তন্মধ্যে "শিলং পথে", "শিলাসেতু", "শৈলসরোবর" এবং "দ্বিধারা জলপ্রপাত" উল্লেখযোগ্য।

শ্রীভবানী—

১ম খণ্ড। ঢাকা, ফাল্গুন, ১৩১৮ সাল ১১শ, সংখ্যা।

বাঙ্গলা-ভাষা।

কোন অশ্বের লোম কৃষ্ণ, কোন অশ্বের লোম শ্বেত; কোন অশ্ব ক্ষীণকায়, কোন অশ্ব মাংসল। অথচ প্রত্যেকটাই অশ্ব। লোমের বর্ণ পরিবর্ত্তিত এবং শরীরের মাংসের হ্রাস বৃদ্ধি হইতে পারে। সাদা ঘোড়া চুরি করিয়া চোরেরা অনেক সময়ে কলপ লাগাইয়া কাল করিয়া বিক্রয় করিয়া থাকে। কাল ঘোড়ার কপালে অশ্বব্যবসায়ীরা মহাদ্রাবক লাগাইয়া ঘা করিয়া দেয়, পরে সেই ঘা শুকাইলে যখন ক্ষত স্থানে কৃষ্ণ-লোমের পরিবর্ত্তে সাদা লোম বাহির হয় তখন সেই অশ্ব সুলক্ষণ বলিয়া বহুমূল্যে বিক্রয় করে। কিন্তু কোন অশ্বেরই অশ্বত্ব যায় না। স্থূলকায় ক্ষীণকায় হইলে বা ক্ষীণকায় স্থূলকায় হইলেও অশ্ব অশ্বই থাকে। সুতরাং মানিয়া লইতে হইবে যে অশ্বশরীরের লোম মাংস প্রভৃতি কোন পরিবর্ত্তনীয় বস্তুর উপর অশ্বত্ব নির্ভর করে না। মণিমাণিক্যখচিত সজ্জায় সজ্জিত হইলেও অশ্ব অশ্বই থাকে। সুতরাং ইহা স্থির সিদ্ধান্ত যে অশ্বে এমন কোন অপরিবর্ত্তনীয় বস্তু আছে যাহার উপর অশ্বত্ব নির্ভর করে। সেই অপরিবর্ত্তনীয় বস্তু অশ্বের কঙ্কাল। সেইরূপ প্রত্যেক শ্রেণীর জীবেরই ভিন্নরূপ কঙ্কাল আছে। প্রত্যেক ভাষারও সেইরূপ কঙ্কাল আছে যাহা পরিবর্ত্তিত হইতে পারে না। ইহা কয়েকটী দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিব। জিঅগ্রাফি, ফিলসফি প্রভৃতি গ্রীক শব্দ আরবী ও পারসী ভাষায় গৃহীত হইয়াছে। হোরা, কেন্দ্র, জামিত্র প্রভৃতি গ্রীকশব্দ, ঘোটক, ঘট, গঠন প্রভৃতি দ্রাবিড় শব্দ, Venice হইতে বণিজ্ বা বণিক্ শব্দ, Punic হইতে পণ্য শব্দ সংস্কৃতে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। লণ্ঠন, রেল প্রভৃতি শত শত ইংরেজী শব্দ বাঙ্গলায় ব্যবহৃত হইতেছে। অথচ আরবী, পারসী, সংস্কৃত ও বাঙ্গলা ভাষার বিশেষত্ব তাহাতে কিছু মাত্র যায় নাই। লাটিন, গ্রীক, সাক্সন, আরবী, সংস্কৃত ও অন্যান্য ভাষা হইতে বহুশব্দ পরিবর্ত্তিত বা অপরিবর্ত্তিত ভাবে ইংরেজী ভাষায় প্রচলিত আছে। কিন্তু ইংরেজী

ভাষা যাহা ছিল তাহাই আছে ও থাকিবে। যে সকল বাঙ্গালী ইংরেজী জানেন তাঁহারা বাঙ্গলা বলিবার সময়ে অনেক ইংরেজী শব্দ ব্যবহার করিয়া মিশ্র ভাষায় কথা কহিয়া থাকেন। কিন্তু এইরূপ মিশ্র ভাষায় বাঙ্গলার প্রত্যেক পদই ইংরেজীতে পরিবর্ত্তনীয় নহে। "তিনি আমাকে মারিয়াছেন" এই বাক্যটী মিশ্র ভাষায় প্রকাশ করা যাইতে পারে না। "রাজা নূতন রাজধানী নির্ম্মাণ করাইবেন" ইহা মিশ্র ভাষায় এইরূপ হইতে পারেঃ— King new capital নির্ম্মাণ করাইবেন। "কোনান্ ডইল্ একজন অদ্ভুত ক্ষমতাশালী লেখক—তিনি যে কেবল ছোট গল্প লিখিতে সিদ্ধ হস্ত তাহা নহে, নভেলেও তিনি সমান সৌভাগ্যশালী" ইহার মিশ্র বাঙ্গলা "Conan Doyle একজন wonderfully powerful writer তিনি যে only small story লিখিতে expert তাহা নহে, novel এ তিনি equally fortunate". ইত্যাদি দৃষ্টান্তে আমরা দেখিতে পাই যে মিশ্র ভাষায় প্রধানতঃ সর্ব্বনাম ও ক্রিয়াপদের পরিবর্ত্তন হইতে পারে না। সুতরাং সর্ব্বনাম ও ক্রিয়াপদই ভাষার কঙ্কাল স্বরূপ। ইহা যে কেবল বাঙ্গলা ভাষার বিশেষত্ব তাহা নহে। প্রত্যেক ভাষারই সেই সেই ভাষার ক্রিয়াপদ, সর্ব্বনাম, যোজক (conjunctions) প্রত্যয় (affixes, prefixes) এবং বিভক্তি (case-endings) প্রভৃতি লইয়া কঙ্কাল গঠিত হয়। অর্থাৎ প্রত্যেক ভাষাই ব্যাকরণের উপর নির্ভর করে। ম্যাক্স্ মূলর বলেন—"It matters not how many words may be derived in common from another language. It does not prove the identity of any two dialects. It is the grammar we must look to, to decide their identity." ব্যাকরণের মধ্যে আবার ক্রিয়া পদই প্রধান! সুতরাং ক্রিয়া পদকে ভাষার মেরুদণ্ড বলা যাইতে পারে। অনেকে হয় ত "destroy করা" "prove করা" প্রভৃতি দেখিয়া বা শুনিয়া হঠাৎ ভাবিতে পারেন যে ইংরেজী ক্রিয়াপদ ও মিশ্র বাঙ্গলায় ব্যবহার হয়। কিন্তু কিঞ্চিৎ অভিনিবেশ পূর্ব্বক দেখিলেই বুঝা যাইবে যে এই সকল কথায় ইংরেজী ক্রিয়া জ্ঞাপক শব্দকে বাঙ্গলা ক্রিয়া পদের ছাঁচে ঢালিয়া প্রস্তুত করা হইয়াছে অর্থাৎ বাঙ্গলা ব্যাকরণের অধীন করা হইয়াছে। অপরিবর্ত্তিত ইংরেজী ক্রিয়াপদ বাঙ্গলায় এবং বাঙ্গলা ক্রিয়াপদ ইংরেজীতে ব্যবহৃত হইতে পারে না। ইহার উদাহরণ দিবার প্রয়োজন নাই।

কিন্তু এই ক্রিয়াপদ বাঙ্গলা ভাষায় নানা আকারের আছে। আমরা ইহার কয়েকটা মাত্র পরীক্ষা করিব। সাধু ভাষায় লেখে "হইলাম" কিন্তু ইহার প্রাদেশিক পর্য্যায়, হলাম, হোলাম, হলেম বা হোলেম, হলুম, হনু, হলি (পুরুলিয়া) এবং হলু (আসামের)। লিখিত বা সাধুভাষার "হইয়াছে" শব্দের প্রাদেশিক প্রতিশব্দ হয়েছে, হয়েচে, হইছে, হয়াছে (পুরুলিয়া) এবং হোল্ (আসাম)। লিখিত "হইতেছে" শব্দের প্রাদেশিক প্রতিশব্দ হচ্চে, হোচ্ছে, হতেছে, হস্‌সে * (নদীয়ায় প্রচলিত), হইআছে (আসাম)। লিখিত "হইব" শব্দের প্রাদেশিক প্রতিশব্দ হব, হমু, হইমু, হইতাম (শ্রীহট্ট) এবং হস্ (আসাম)। লিখিত "হইতাম" শব্দের প্রাদেশিক প্রতিশব্দ—হোতাম, হোতেম, হতুম হোল্ হৈন্তেন (উপর আসাম) এবং হলাম হয় (ঢেকেরি অর্থাৎ নিম্ন আসামের ভাষা)। এইরূপ প্রত্যেক ধাতুরই ক্রিয়াপদে প্রত্যেক কালে ও প্রত্যেক পুরুষে নানাপ্রকার রূপ হইয়া থাকে। এখন সমস্যা এই যে দেশে এই জনশিক্ষার আরম্ভ সময় হইতে ক্রিয়াপদের প্রাদেশিক কোন একরূপ লিখিত ভাষায় এবং কথোপকথনে ব্যবহৃত হইবে, না সাধু ভাষার রূপেরই সর্ব্বত্র প্রচলন হইবে ? আমার বিবেচনায় সাধুভাষার রূপই প্রচলিত হওয়া উচিত। আমি প্রথম প্রবন্ধে যখন সাধুভাষা লেখায় এবং কথোপকথনে ব্যবহার করা উচিত বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছিলাম তখন বিশেষ্য বা বিশেষণ শব্দের বিষয় আমার মনে উদিত হয় নাই। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বক্তৃতায় এমন কি উপাসনা কালেও হলুম, খেলুম, খেতুম, প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করেন। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও তাহাই করেন। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কথা ছাড়িয়া দিতে হইবে কেননা তিনি বাঙ্গলা ভাষার

* "হস্‌সে" শব্দ সম্বন্ধে সন্দেহ আছে। সং-সং।

প্রমাণ (authority) নহেন। কিন্তু রবীন্দ্র বাবুকে উড়াইয়া দেওয়া চলে না। যে হেতু তিনি বাঙ্গলায় সর্ব্বপ্রধান লেখক। অপর পক্ষে শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় বক্তৃতাকালে হলাম, খেলাম, খেতাম প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করেন। ইঁহারা উভয়েই বক্তা, লেখক, পণ্ডিত ও চিন্তাশীল। অথচ উভয়ে ক্রিয়াপদের রূপ সম্বন্ধে পরস্পরবিরোধী। গেলুম, খেলুম বোধ হয় সুন্দর বা শ্রুতিমধুর শব্দ নহে। যদি তাহা হইত তাহা হইলে কবিতায় ইহাদের ব্যবহার হইত। কিন্তু এই সকল শব্দ কবিতায় পড়িয়াছি বলিয়া মনে হইতেছে না। কবিতায় বরং গেনু, খেনু প্রভৃতি শব্দ চলে কিন্তু গেলুম, খেলুম চলে না। কিন্তু খেনু, গেনু ও খেলুম, গেলুমের মত গাম্ভীর্য্যহীন (undignified) শব্দ। এই সমস্ত শব্দগুলিই সাহিত্য, ভদ্র লোকের কথোপকথন, বক্তৃতা ও উপাসনার ভাষা হইতে বর্জ্জিত হওয়া উচিত। সেই কারণে অন্যান্য প্রাদেশিক ক্রিয়া পদকেও বর্জ্জন করিতে হইবে—কেন না তাহাদেরও সৌন্দর্য্য ও গাম্ভীর্য্য নাই। সুতরাং অবশিষ্ট রহিল সেই লিখিত রূপ—হইলাম, খাইলাম ইত্যাদি। আমার মত এই যে ভদ্র ভাষায় ক্রিয়া পদের এইরূপ রূপ-ই প্রচলিত হওয়া উচিত এবং তাহাই বিদ্যালয়ে শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু আমি নগণ্য ব্যক্তি—পণ্ডিত ও নহি, গ্রন্থকার ও নহি। সুতরাং আমার মতের কোন মূল্য নাই। তবে সাহিত্যের সাধারণ তত্ত্বে সকলেই মতামত দিতে পারে বলিয়া আমার অনুরোধ এই যে পণ্ডিতগণ এই বিষয়ের আলোচনা করিয়া একটা মীমাংসা করেন। হইলাম, খাইলাম প্রভৃতি শব্দ যখন বঙ্গদেশের কোনস্থলেই কথোপকথনে প্রচলিত নহে তখন সেই সকল শব্দ ব্যবহার করিবার প্রস্তাবে কোন বাঙ্গালীর-ই অসন্তোষ বা ঈর্ষ্যা (বাঙ্গলা কথায় হিংসা) হইতে পারে না। কিন্তু কলিকাতা প্রচলিত হনুম কি হনু গ্রহণের প্রস্তাবে বঙ্গের অন্যান্য স্থানের লোক অবশ্যই অসন্তুষ্ট হইবেন। প্লেটো বলেন যে স্বর্গে একটা ideal ত্রিকোণ ক্ষেত্র (triangle) আছে যাহা সমকোণ ও নহে, স্থূলকোণ ও নহে, সূক্ষ্ম-কোণ ও নহে ; যাহা সমবাহু ও নহে, অসমবাহু ও নহে, সমদ্বিবাহু ও নহে। হইলাম, খাইলাম প্রভৃতি ক্রিয়াপদ সেইরূপ ideal বলিয়া বোধ হয়। (Ideal শব্দের বাঙ্গলা কি হইতে পারে তাহা জানি না। আদর্শ বলিলে হয় কি ?) বাঙ্গালী সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে থাকিতে চাহে না। তাঁহার ভাষাও সুতরাং প্রাদেশিক হইতে পারে না। কি আসামে কি পঞ্চনদে বাঙ্গালী যেখানেই গিয়াছেন সেখানেই বিদ্যাবত্তা ও বুদ্ধিমত্তার জন্য প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন। তাঁহাতে কিছু ideal না থাকিলে তাঁহার সেরূপ প্রতিপত্তি কখনই হইত না। বাঙ্গালীর ভাষা ও বাঙ্গালীর চরিত্রের অনুরূপ। যে ভাষা রাঁচি হইতে চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত ভূভাগে আধিপত্য স্থাপন করিতে চাহে, তাহাকে অনেকটা ideal হইতে হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বিহার প্রভৃতি অঞ্চলে এবং আসামে উচ্চারণানুযায়ী বানান হয়। কিন্তু বাঙ্গলা-ভাষায় সেরূপ হয় না। কেননা হিন্দী ও আসামী ভাষার বিস্তার লাভের ক্ষমতা অর্জ্জন করিবার প্রয়াস নাই। কিন্তু বাঙ্গলার সেই প্রয়াস বিলক্ষণ আছে। এজন্যই বাঙ্গলা-ভাষা উচ্চারণানুরূপ বানান লিখিয়া সঙ্কীর্ণ হইতে পারে নাই।

বস্তুর নাম ও বিশেষণ শব্দ এক এক প্রদেশে এক একরূপ হইলেও বাঙ্গলা-ভাষার বাঙ্গলাত্ব ঘুচিবে না। সহস্র চেষ্টা সত্ত্বেও প্রাদেশিকত্ব কিছু না কিছু থাকিবেই। কিন্তু তাহা বলিয়া প্রাদেশিকত্বকে চেষ্টা করিয়া সজীব রাখা উচিত নহে। শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে প্রাদেশিক বিশেষ্যবিশেষণ অপসারিত হইবে। কেবল ডার উইনের আবিষ্কৃত survival of the fittest নিয়মানুসারে যে সকল শব্দ সুন্দর লঘুকলেবর ও কার্য্যকর তাহারাই থাকিয়া যাইবে ও সার্ব্বভৌম হইবে—তাহা তাহারা সংস্কৃত মূলকই হউক বা খাঁটি বাঙ্গলাই হউক। ট্রেঞ্চের গ্রন্থপাঠে আমরা জানিতে পারি যে পূর্ব্বে ইংলণ্ডে ডিম্বের অনেকগুলি প্রাদেশিক পর্য্যায় ছিল। কিন্তু এখন egg ভিন্ন অন্য কোন শব্দের অস্তিত্ব ইংরেজেরাও অনেকে জানেন না। ইংরেজ শিশুরা ঘোড়াকে geegee বলে পিতাকে daddy বলে। কিন্তু বড় হইয়া লেখাপড়া শিখিয়া horse এবং father বলে। শিক্ষিত পিতামাতা

বা অন্য অভিভাবক অথবা স্কুলের শিক্ষক শুদ্ধ করিয়া কথা কহিতে এবং শুদ্ধ উচ্চারণ করিতে শিখাইয়া দেন। আমরা কি সেরূপ কিছু করিয়া থাকি? আমি একবার আমার এক পুত্রকে নুন না বলিয়া লবণ বলিতে শিক্ষা দিয়া এক বন্ধুর উপহাসাস্পদ হইয়াছিলাম। পড়িবার সময়ে বালকেরা "সত্য" উচ্চারণ করে কিন্তু কথা কহিবার সময়ে বলে "সত্যি"। কয়জন শিক্ষক বা শিক্ষিত পিতামাতা বালককে কথা কহিবার সময়েও "সত্য" বলিতে অথবা "কাঁচ" না বলিয়া "কাচ" বলিতে শিক্ষা দিয়া থাকেন? কলিকাতা অঞ্চলের স্ত্রীলোকেরা "বাস্তবিক" না বলিয়া "সত্তিকার" এই এক অপূর্ব্ব শব্দ বলিয়া থাকেন। শিক্ষিত অভিভাবক ঐ শব্দটা শুনিলে কোথায় বলিয়া দিবেন যে "সত্তিকার" অশুদ্ধ শব্দ, তাহার পরিবর্ত্তে "বাস্তবিক" বলা উচিত, না তাঁহারা নিজেই সেই শব্দটা ব্যবহার করেন। রবীন্দ্রবাবু বোধ হয় এই শব্দটা খুব ভাল বাসেন। তিনি ইহা সংশোধন করিয়া "সত্যকার" বলেন। হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে তিনি যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাহাতে চারিবার এই শব্দটা ব্যবহার করিয়াছেন। গত ১১ই মাঘ প্রাতঃকালে তাঁহার নিজ বাটীতে তিনি যে উপাসনা করিয়াছিলেন তাহাতেও দুইবার "সত্যকার" শব্দটা শুনিয়াছি। আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা দেবস্থানে পবিত্র বসন পরিয়া যাইতেন এবং সংস্কৃত স্তোত্র পাঠ করিতেন চিত্ত শুদ্ধির সহিত শরীর, বস্ত্র এবং বাক্‌শুদ্ধিও আবশ্যক মনে করিতেন। আমরা তাঁহাদের ভাববিবর্জ্জিত সন্তান, আমরা উপাসনা গৃহে যাইবার সময়ে বস্ত্র পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক মনে করি না—যাহা পরিয়াছিলাম তাহাই পরিয়া যাই এবং না ভাবিয়া চিন্তিয়া যাহা মুখে আসে তাহাই বলি—তাহা বিশুদ্ধ কি অশুদ্ধ একবারও ভাবি না।

গত আশ্বিন মাসের সম্মিলনে "সাধুভাষা বনাম চলিত ভাষা" শীর্ষক একটী সুচিন্তিত ও সুরস প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত ললিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কতকগুলি বস্তুর ভিন্ন ভিন্ন প্রাদেশিক নামের উল্লেখ করিয়াছেন এবং প্রাদেশিক শব্দের ব্যবহারে অর্থগ্রহের ব্যাঘাত ঘটিতে পারে বলিয়া আশঙ্কা করিয়াছেন। এইরূপ আশঙ্কা অকারণ নহে এবং এই আশঙ্কা অপনোদন করিবার জন্যই সমস্ত বঙ্গদেশে প্রত্যেক বস্তুর একটী মাত্র সাহিত্যিক নাম থাকা উচিত। যদি নির্ব্বাচন করিতে হয় তাহা হইলে সমান সুন্দর ও সমান কার্য্যকর শব্দের মধ্য হইতে সংস্কৃত মূলক শব্দ গ্রহণ করাই কর্ত্তব্য। "আদম শুমারি" না বলিয়া লোকসংখ্যা বা মানুষগণা বলা ভাল। সংস্কৃত শব্দ দুর্ব্বহ বা অপ্রাপ্য হইলে বাঙ্গলা, পারসী, ইংরেজী ভাষা হইতে শব্দ লইতে হইবে। খাঁটি বাঙ্গলা বলিয়া হতভম্বা, নাদুসনুদুস, গ্যামাগোমা, খ্যাঁট, গাপসা গোপসা, জ্যাঁদড় প্রভৃতি কুৎসিত শব্দকে সাহিত্য সমাজে বা ভদ্র লোকের মুখে থাকিতে দেওয়া উচিত নহে।

কলিকাতায় যাহা কিছু হয় তাহাই যে সুশ্রী এবং তাহারই যে সমর্থন করিতে হইবে এমন নহে। কলিকাতায় ভেঁটুকুলও ফুটিয়া থাকে। কিন্তু এমন একদল লোক আছেন যাঁহারা কলিকাতার সকল বস্তুই সমর্থন করেন। পূর্ব্ববঙ্গের লোক বেতনকে ব্যাতন বলেন, কলিকাতার লোক শুনিয়া হাসেন, অথচ তাঁহারা নিজে ঠিক সেইরূপ ভুল করিয়া বেটাকে ব্যাটা বলেন। রাঢ় দেশের লোক পোঁকা, শঁশা বলিয়া কলিকাতার লোকের হাস্যাস্পদ হন অথচ কলিকাতার লোক শাপকে শাঁপ ও কাচকে কাঁচ বলেন। কলিকাতার লোক অনেক স্থলে নকে ল ও লকে ন রূপে উচ্চারণ করেন, লুণকে নুন, মুসলমানকে মোছনমান, লুরিকে নুরি (পক্ষিবিশেষ, Luri), লোনাকে নোনা বলেন। অপরদিকে নৌকাকে লৌকা এবং নোকসানকে লোকসান বলেন। চৌদ্দপোনর বৎসর হইল ভারতীর এক প্রবন্ধে রবীন্দ্র বাবু লিখিয়াছিলেন যে নোকসান না বলিয়া লোকসানই বলা উচিত।

এই সকল পর্য্যালোচনা করিলে আমরা অনায়াসেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে উচ্চারণানুযায়ী বানান বাঙ্গলায় হইতে পারে না। কেন না এক এক জেলার উচ্চারণ এক এক রূপ। ঠিক সেই কারণেই ট্রেঞ্চ ইংরেজীতে উচ্চারণানুযায়ী বানানের পরিপন্থী। আর যদি বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র একরূপ উচ্চারণই প্রচলিত

থাকিত তাহা হইলেও কি উচ্চারণানুযায়ী বানান করা কর্ত্তব্য হইত? যাহারা বলেন "হইত", তাঁহাদের যুক্তিটা আমার এইরূপ বোধ হয়—আমরা যখন একটা ভুল করিয়াছি তখন আর একটা ভুল করা আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য, যখন আফিম খাইতে শিখিয়াছি তখন গাঁজাটাও খাওয়া নিতান্তই উচিত। এযুক্তির উপরে আর কথা চলে না, কিন্তু তথাপি আমার বোধ হয় যেন প্রথম ভুলটা সংশোধন করাই ভাল আফিমটা ছাড়াই উচিত আমাদের —উচ্চারণ সংশোধন করাই কর্ত্তব্য। নতুবা আমাদের নিজ জাতিকে স্বজাতি ও self-reliance এর বাঙ্গলা স্বাবলম্বন লিখিলে আমাদের situation টা বড় pathetic হইয়া পড়িবে।

Linguistic survey of British India র পঞ্চম খণ্ডের ১৬ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে যে, Bengalis themselves struggle vainly with a number of complex sounds which the disuse of centuries has rendered their vocal organ unable or too lazy to pronounce. The result is a number of half pronounced consonants, broken vowels not provided for by their alphabet amid which the unfortunate foreigner wanders without a guide and for which his own larynx is so unsuited as is Bengali for the sounds of sanskrit. বাস্তবিকই আমাদের এই দুর্নাম ক্ষালন করিতে চেষ্টা করা উচিত। এখন আমরা পুরাতন কার্য্য, পুরাতন দর্শন, ঋষি প্রণীত উপনিষৎ প্রভৃতির উদ্ধার সাধন করিতেছি। তবে পুরাতন উচ্চারণ উদ্ধার না করিব কেন?

উপরিউক্ত অসাধারণ ও মহামূল্য পুস্তকের আর এক স্থানে লিখিত আছে Bengali is sent out to the world masqueraded in the clothes of her grandmother, sanskrit. কিন্তু আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বহুল সংস্কৃত প্রয়োগে বাঙ্গলার গৌরব বাড়িয়াছে বই কমে নাই। তবে সুন্দর বাঙ্গালা শব্দ পাওয়া গেলে সংস্কৃতের পরিবর্ত্তে তাহাই ব্যবহার করা উচিত। "কুল" ও "পেয়ারা" প্রাদেশিক শব্দ হইলেও দেশে যখন সুশ্রাব্য ও সর্ব্বত্র প্রচলিত হইয়াছে তখন "বদরী" ও "বরাহ ফল" না লিখিয়া বা না বলিয়া "কুল" ও পেয়ারা ব্যবহার করাই উচিত। সেদিন কলিকাতায় আদি ব্রাহ্মসমাজের "দ্ব্যধিকাশীতিতম ব্রহ্মোৎসব" এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে "দ্ব্যশীতিতম" মাঘোৎসব হইয়া গিয়াছে। কিন্তু ঐ দুইটা দাঁত ভাঙ্গা সংস্কৃত শব্দের পরিবর্ত্তে বাঙ্গলা "বিরাশী তম" শব্দ ব্যবহৃত হইলেই বোধ হয় ভাল হইত।

মুষ্টিমেয় একদল লোকের ইচ্ছা যে দেবনাগর অক্ষরে বাঙ্গলা লিখিত হয়। সংসারে অমিশ্র ভাল কি মন্দ কিছুই নাই। দেবনাগর অক্ষরে বাঙ্গলা লিখিলে এই মাত্র লাভ যে আমাদের ভাষা ভারতবর্ষের অন্য লোক কিছু অল্পায়াসে শিখিতে পারেন। কিন্তু তাহাও সন্দেহ-স্থল। আসামী ও বাঙ্গলা এক বর্ণমালার সাহায্যেই লিখিত হইয়া থাকে কিন্তু বাঙ্গলাদেশে থাকিয়া অর্থাৎ আসামে না গিয়া কয়জন বাঙ্গালী আসামী শিখিয়াছেন? শিক্ষিত বাঙ্গালী মাত্রেই এখন দেবনাগর অক্ষর শিখিয়াছেন। অথচ সেই দেবনাগরে লিখিত হিন্দীভাষা কয়জন বাঙ্গালী ইচ্ছা করিয়া শিখিয়াছেন? অন্য পক্ষে বাঙ্গলা অক্ষরের অনেকগুলি ত্রিকোণ, সংস্কৃত অক্ষর চতুষ্কোণ। ত্রিকোণ অপেক্ষা চতুষ্কোণ অঙ্কিত করিতে শ্রম ও সময় অধিক লাগে। দেবনাগর অপেক্ষা বাঙ্গলা অক্ষরের আয়তন অল্প। দেবনাগর অপেক্ষা বাঙ্গলা দেখিতেও সুশ্রী। আমরা উত্তরাধিকার সূত্রে এই সুন্দর সম্পত্তি আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের নিকট হইতে লাভ করিয়াছি। কত শত বৎসরের ইতিহাস ইহার সহিত সম্পৃক্ত হইয়া আছে। তান্ত্রিকগণ এই বর্ণমালাকে কত উচ্চে আসন দিয়াছেন। কেন আমরা এই অমূল্য পৈত্রিক সম্পত্তি ত্যাগ করিব? একজন সিবিলিয়ান ইংলণ্ড হইতে এতৎ সম্বন্ধে ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে নবেম্বর মাসের ইণ্ডিয়ান্ ওঅর্ল্‌ড্ নামক পত্রিকায় লিখিয়াছেন The writer of the article in the modern Review proposes gravely to abandon the beautiful and clear Bengali script in favour of the

greatly inferior Devanagari whose thick lines and minute differences between letters, especially in compound letters, are extremely trying to the eye.

যে প্রবন্ধ হইতে উল্লিখিত অংশ উদ্ধৃত করিলাম তাহাতে বাঙ্গলা ভাষা সম্বন্ধে অনেক চিন্তা করিবার কথা আছে। যাঁহারা বাঙ্গলা ভাষার আলোচনা করেন তাঁহাদের সকলেরই সেই প্রবন্ধটী পাঠ করা উচিত। প্রবন্ধ লেখক নিজের নাম প্রকাশ করেন নাই কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে তিনি চট্টগ্রামের ভূতপূর্ব্ব কমিশনর শ্রীযুক্ত জে, ডি, এণ্ডরসন। ইঁহার দয়া, দাক্ষিণ্য, বিদ্যা, বুদ্ধি, বিনয়, সৌজন্য আমোদপ্রিয়তা, নানাভাষায় পাণ্ডিত্য এবং বাঙ্গলা ভাষায় অসাধারণ অধিকার ও অনুরাগ এবং বাঙ্গালীদিগের প্রতি সহানুভূতির জন্য পরিচিত বাঙ্গালীরা মুগ্ধ ছিলেন। কটন সাহেব ভিন্ন বাঙ্গালীদিগের প্রতি এরূপ সহানুভূতি আর কোন ইংরেজ প্রদর্শন করিয়াছেন কি না আমি অবগত নহি। আমি প্রসঙ্গ ক্রমে তাঁহার সদাশয়তার কথা বলিতে পারিয়া ধন্য হইলাম বলিয়া মনে করিতেছি। তিনি এবং কটন সাহেব কত দিন এদেশ ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন কিন্তু এখনও এ দেশের উপকার করিতে উভয়েই প্রস্তুত।

বঙ্গদেশের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে কত চলিত ও অপ্রচলিত সৌন্দর্য্যহীন শব্দকে সযত্নে রক্ষা করিবার চেষ্টা হইতেছে—তাহাদের ব্যাকরণ ও ব্যাখ্যা কোষ ও প্রস্তুত হইবে বলিয়া শুনিয়াছি। এই কার্য্যের সহিত আমার কিছুমাত্র সহানুভূতি নাই। শব্দগুলা যদি সুন্দর হইত তাহা হইলেও একটা কথা ছিল। "ভ্যাঁদোড়", "ব্যাদড়া" "হাবাগোবা" প্রভৃতি কুৎসিত শব্দের কোষ প্রস্তুত করিয়া লাভ কি? পূর্ব্বকালে গ্রীস্‌দেশে কোন কারুকার্য্য বা কাব্য অসুন্দর হইলে তাহা সাধারণ্যে বাহির করিতে দেওয়া হইত না একেবারে নষ্ট করা হইত। তাহার ফলে গ্রীস্ হইতে আমরা যাহাকিছু পাই তাহাই সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত। মহারাজ্ঞী এলিজাবেথ একবার একখানা কদাকার তরবারি দেখিয়া আদেশ করিলেন যে তাঁহার রাজ্য মধ্যে সেইরূপ তরবারি যত আছে সমস্ত নষ্ট করিতে হইবে। কলির বিশ্বামিত্র কালিফর্ণিয়ার শ্রীযুক্ত বারবঙ্ক শত শত প্রকারের নূতন বৃক্ষ, ফল, ফুল সৃষ্টি করিতে করিতে যদি কুৎসিত একটা কোন কিছু সৃষ্টি করিয়া ফেলেন তাহা হইলে তৎক্ষণেই তাহা নষ্ট করেন। কি সাহিত্যে কি অন্য সমস্ত বিষয়ে ইহা জানিয়া আমাদের শিক্ষা করা উচিত। আমরা যদি নানা ব্যক্তির নিকট হইতে উত্তরাধিকার সূত্রে টাকা, মোহর, মণি, শাল, বনাত প্রভৃতি পাই তাহা হইলে আমাদের পূর্ব্ব সঞ্চিত ছিন্নকন্থা, মলিন বস্ত্র ও ফুটা কড়ির প্রতি কেন আদর করিব?

আমার প্রথম প্রবন্ধে লিখিয়াছিলাম যে ইংরেজীতে শব্দে লিঙ্গভেদ নাই। সম্মিলনের সম্পাদক মহাশয় আমার সেই কথায় কিছু সন্দেহ করিয়াছেন। কিন্তু একটু মনোযোগ করিলেই বুঝা যাইবে যে আমার কথা সত্য। সূর্য্যের সর্ব্বনাম he হয়। এবং চন্দ্র, পৃথিবী নৌকা জাহাজ প্রভৃতির সর্ব্বনাম she হয়। তাহার কারণ ইহা নহে যে সেই সেই শব্দ পুংলিঙ্গ বা স্ত্রীলিঙ্গ। তাহারা রূপক চ্ছলে পুরুষ বা স্ত্রী বলিয়া বর্ণিত হয় এই জন্যই তাহাদের পরিবর্ত্তে he বা she ব্যবহৃত হয়। Trench স্পষ্টই লিখিয়াছেন যে ইংরেজীতে বস্তুর distincton of sexes আছে যাহা চিরকালই থাকিবে কিন্তু শব্দের distincton of genders নাই। মিল্‌টন্ তাঁহার Paradise Lost এ একস্থলে form শব্দের পর it ব্যবহার না করিয়া she ব্যবহার করিয়াছেন। ইহা হইতে জানা যায় যে পূর্ব্বকালে ইংরেজীতে শব্দের লিঙ্গভেদ কেহ কেহ করিতেন।

১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসের মডর্ণ্ রিভিউ নামক পত্রিকায় একজন লিখিয়াছেন যে বাঙ্গলা ভাষাই কালে ভারতবর্ষের Lingua Franca হইবে। সেই বৎসরেরই জুন মাসের ইণ্ডিয়ান ওঅর্ল্ডতে ও উক্ত কথার প্রতিধ্বনি হইয়াছিল। কিন্তু এ স্বপ্ন যে কখন ও সফল হইবে তাহা বিশ্বাস হয় না। বাঙ্গলা ভাষা নানারূপ সীমাবদ্ধ তাহা আমি প্রথম প্রবন্ধে দেখাইয়াছি। বাঙ্গলা যে

কখনও সম্পূর্ণতা লাভ করিবে তাহা কে বলিতে পারে? সম্পূর্ণতা লাভ না করিলে তাহা সর্ব্বভৌম ভাষা হইতে পারে না। *

শ্রীবীরেশ্বর সেন।

* মাঘ মাসের সম্মিলনে আমার যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে এমন কতকগুলি ছাপার ভুল হইয়াছে যে অর্থবোধের ব্যাঘাত হয়। আমি যত স্থানে দেবনাগর অক্ষরে অন্তঃস্থ ব লিখিয়া ছিলাম তাহার কয়েক স্থানে ছাপায় বর্গীয় ব হইয়াছে। ৩৬৭ পৃষ্ঠায় প্রথম স্তম্ভে ৩০ পুংক্তিতে গল ও গলা স্থানে গণ ও গণা হইয়াছে। ৩৬৫ পৃষ্ঠায় শেষ প্যারায় তৃতীয় পংক্তিতে শেষের ড ও চ ড় ও ঢ় হইবে। তাহার পর পংক্তিতে "পূর্ব্ববঙ্গের ড" স্থানে "পূর্ব্ববঙ্গে ড়" হইবে। তাহার পরের পংক্তিতে ব্ স্থানে র, ড্ স্থানে ড় এবং তাহার পর পংক্তিতে ব্ স্থানে র, চ্ স্থানে ঢ় এবং তাহার পর পংক্তিতে চ্ স্থানে ঢ় হইবে। সেই পৃষ্ঠায় দ্বিতীয় স্তম্ভে গৃহীয়াৎ না হইয়া গৃহীয়াত হইয়াছে।

আশীর্ব্বাদ

বৎসে!

এ নিখিল রচনার প্রথম প্রভাতে,
করুণ-নয়ন-কোণে হেরিলেন রাজ-
অধিরাজ, মঙ্গল-চরণ চুম্বী, মুক্ত-
অনাহত শক্তির বিকাশ, সুবিমল-
শান্ত-জ্যোতিবিভাসিত বিশ্ব সুশোভন;
অনন্ত-শৃঙ্খলাময়, শক্তি আর জড়ে
অবিচ্ছিন্ন মিলনের অভিব্যক্তি; সীমা-
শূন্য আকাশের কোলে, নিমিষে উঠিল
মহামিলনের জয়ধ্বনি; প্রতি অণু
ছুটিল প্রবল বেগে অণুর সন্ধানে,
বিশ্বপ্রেমিকের প্রেমকণা বক্ষে ধরি,
উন্মত্ত, নিয়মবদ্ধ;—গ্রহ হ'তে গ্রহে
উদার উন্মুক্ত প্রেম, আকর্ষণ-রূপে
ছাইল অসীম শূন্য! পৃথিবী পড়িল
বাঁধা সূর্য্য সনে, অচ্ছেদ্য বন্ধনে; শশী
স্নিগ্ধ প্রেমালোক উপহার লয়ে, হর্ষে
ডালি দিল পৃথিবীরে, বদ্ধ প্রেমপাশে।
ছুটিল তটিনী সিন্ধুপানে তীব্রপ্রেম-
ব্যাকুলতা লয়ে বক্ষে; অনল অনিলে
হ'ল সুমঙ্গল সম্বন্ধ স্থাপিত; চাঁদ
হেরি উড়িল চকোর সুধা-আশে; রবি
করে হাসিল কমল। করুণা রূপিণী
মূর্ত্তিমতী, প্রসূতি, সন্তানে কি আবেগে
চাপিল কোমল বক্ষে; মর্ম্মে মর্ম্মে তার
অনিরোধ স্নেহ-উৎস হ'ল উৎসারিত।
প্রেমের বিজয় মাল্য, প্রীতিভক্তিভরে
দিল সতী পরাইয়া স্বামীদেবতার
কণ্ঠদেশে; বিকাইয়া শ্রীচরণ তলে,
জানাইল শুদ্ধতার গভীর ভাষায়,
অসঙ্কোচে, অবিতর্কে আত্মবলিদান,
প্রেমদেবতার পুণ্যবেদিসন্নিধানে।
যে প্রেম দিতেছে শিক্ষা নিখিল সংসার
জীবের মঙ্গল হেতু, যুগ যুগান্তর
হ'তে, সুস্পষ্ট নীরব কণ্ঠে, শুন বৎসে,
তাই শিখে নিতে হবে; সেই বিশ্বপ্রেম-
গ্রন্থ অধ্যয়নব্রত আজি কর মা ধারণ;
ওই মহাগুরু, হের বৎসে, কর তাঁর
শিষ্যত্ব স্বীকার; বুঝ ভাল ক'রে
গৃহীর এ ব্রহ্মচর্য্য; দৃঢ় সাধনায়,'
প্রবল বিশ্বাসে, স্বামীদেবতার, কর
নিদেশ পালন, তাঁর জ্ঞানউপদেশ,
গুরুশিষ্যপ্রীতি-সম্মিলনফলে, লয়ে
যাবে সালোক্য মুক্তির দেশে; শোক, দুঃখ,
তাপ, ধরণীর ধূলা সনে পড়ে র'বে।
তুমি যাবে মুক্ত, বুদ্ধ, শুদ্ধ, অনাবিল
চিত্ত লয়ে, মহামিলনের যশোগানে
বিভোর, সে প্রেমময় চিদানন্দ পদে
করিবারে আত্মসমর্পণ; হে কল্যাণি,
বিলাসলালসাতৃপ্তি, এ নহে ক্ষণিক

মোহের বিজলিপ্রভা, নহে কভু সুখ-
দুঃখময় দুদিনের হরষ ক্রন্দন,
প্রভাতে উদয় যার, সন্ধ্যায় বিলয়।

৺ রজনীকান্ত সেন

আদর্শ শিক্ষা পদ্ধতি।

নৈতিক শিক্ষা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

চরিত্রগঠনের ব্যবস্থা করিতে হইলে ছাত্রকে ত্যাগের পথে চলিতে শিখাইতে হইবে। যে যে কাজে কিছু ত্যাগ স্বীকার করিতে হয় যে সমাজে থাকিলে পরের জন্য একটু একটু খাটিবার অভ্যাস জন্মে যেখানে পরোপকার করিবার সুবিধা হয়—তাহাকে সেই সকল বেষ্টনীতে থাকিতে হইবে। পূর্ব্বে আমাদের দেশে যে শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল তাহাতে ছাত্র গুরুগৃহে বাস করাতে কেবল শাস্ত্রেতে পণ্ডিত বা নৈয়ায়িক হইয়া বাহির হইতেন না ; সেখানে সংযম, শৌচ, কর্ত্তব্য পালন ও কর্ম্মনিষ্ঠা ইত্যাদি সকল প্রকার মনুষ্যোচিত গুণলাভের সঙ্গে শরীর বলিষ্ঠ ও কর্ম্মঠ হইয়া যাইত। গুরুগৃহের হাওয়াতেই অহঙ্কার নাশ ভক্তিশ্রদ্ধা ইত্যাদি নৈতিক জীবনের প্রধান বীজ থাকিত। আমাদের আজকালকার অবস্থায় ও ছাত্রদিগকে এই ব্রহ্মচর্য্য পালন ও পরার্থে জীবন যাপনের সুবিধা করিয়া না দিতে পারিলে বিদ্যা-শিক্ষার ভিত্তিই গঠিত হইবে না। তাই পঠদ্দশায়ই দেশের যাবতীয় কাজের প্রতি মন যাহাতে আকৃষ্ট হয় সমাজের সকল প্রকার অভাব মোচনের ছোট ছোট আয়োজন যাহাতে নিজেরাই করিতে পারে এরূপ কাজের ক্ষেত্র নির্ম্মাণ করিয়া দিয়া মনুষ্যত্ব বিকাশের সুযোগ করিয়া দিতে হইবে। নিঃস্বার্থ কাজ নৈতিক জীবন গঠনের প্রধান উপকরণ এবং ধর্ম্ম জীবনের অবলম্বন।

মনুষ্যকে সংসারে প্রবেশ করিয়া অনেক প্রকার কাজ করিতে হয়—পরিবার পালন, পরোপকার, ধর্ম্মচিন্তা, সন্তান সন্ততির শিক্ষাপ্রদান, ভিক্ষুককে অন্নদান, রোগীর শুশ্রূষা ইত্যাদি। অর্থ উপার্জ্জনই একমাত্র কর্ত্তব্য থাকে না। মানুষ কেবল ভোগীই নয় অনেক সময় ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক তাহাকে ত্যাগ স্বীকারও করিতে হয়। আবার ধর্ম্মই একমাত্র কর্ম্ম নয়—বৈষয়িক ব্যাপারেও মানুষ মনোনিবেশ করিতে বাধ্য হয়। তাহার মনুষ্যত্ব কেবল শরীর বা কেবল আত্মা লইয়া নয়—সেই জন্য একমাত্র উদরান্নের চিন্তা বা কেবল ধর্ম্মচর্চ্চাই জীবনের ব্রত হইতে পারে না। সমাজের সাধারণ মানুষকে সকল প্রকার কাজই করিতে হয়। অতএব যে বয়সে ভাবী জীবনের জন্য প্রস্তুত হওয়া যাইতেছে তখন হইতেই এই সর্ব্বতোমুখ কর্ম্মের দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। মানুষ যদি কেবল একপ্রস্ত কাপড় বা এক থালা ভাত বা কেবল জপমন্ত্র হইত তবে পঠদ্দশায় কেবল টাকা কড়ির বিদ্যা বা ধর্ম্মশাস্ত্রই পড়িলে চলিত। কিন্তু মানুষ নানা প্রকার ইন্দ্রিয়ের প্রবৃত্তির সমবায়ে সৃষ্ট—তাই সকলকেই চরিতার্থ করিতে হইবে। সুতরাং শিক্ষার উদ্দেশ্য এরূপ হওয়া উচিত যাহাতে ভবিষ্যতে সামাজিক ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় অর্থ সম্বন্ধীয় বা রাজনৈতিক প্রভৃতি যে সকল কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইবে—প্রত্যেকটীরই সাধনা হয়।

কেবল মাত্র পুস্তক পাঠ করাই ছাত্রগণের উদ্দেশ্য হইতে পারে না। শিক্ষা সমাজকে সাধারণের উপকার সাধনোপযোগী নানাবিধ কার্য্যের ক্ষেত্রে প্রস্তুত করিয়া দিতে হয়। এই সমুদয় কার্য্যে আন্তরিকতা রক্ষা করিবার জন্য উপযুক্ত সময় নির্দ্ধারণও আবশ্যক। বিশ্রামের সময়ে অথবা দিবসের অন্যান্য সকল কাজ সমাধা করিয়া প্রবৃত্তি ও সুযোগ থাকিলে সেই সময়ে পরের কাজে মনোনিবেশ করা যাইতে পারে এরূপ ধারণা থাকিলে এই সমুদয় বাজেকাজের মধ্যে গণ্য হইয়া পড়ে। সমা-জের হিতসাধন এবং পরোপকার ও যে নিত্য কর্ম্মের

মধ্যে একটি প্রধান কর্ত্তব্য এই ভাব হৃদয়ে জাগরূক রাখিতে হইলে দিবসের কার্য্যের জন্য সময় বিভাগের হিসাবে ইহার জন্য বিশেষ সময় রক্ষা করা উচিত।

এজন্য ছাত্রগণের পুস্তকাদি হইতে কোন নিয়ম বা সুন্দর সুন্দর উপদেশ মুখস্থ করিবার প্রয়োজন নাই। সর্ব্বসাধারণের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া স্বদেশের অবস্থা ও ইতিহাস সম্বন্ধে শিক্ষা দান করা, যে অভিভাবকগণ বিদ্যাশিক্ষা সম্বন্ধে উদাসীন তাহাদিগকে উৎসাহিত করা, প্রাথমিক বিদ্যালয়াদি স্থাপনের চেষ্টা করা ইত্যাদি যত প্রকার পরোপকার ও লোকহিতের অনুষ্ঠান আছে তাহাতে যোগদান করাই চরিত্র গঠনোপযোগী শিক্ষা। প্রথম হইতেই এইরূপ কর্ম্মের ভিতর দিয়া শিক্ষা না হইলে প্রকৃত নৈতিক জীবন এবং মনুষ্যত্বের বিকাশ হয় না।

বিদ্যালয়ের শাসন।

বিদ্যালয় স্থানীয় সকলেরই সাধারণ সম্পত্তি হওয়া উচিত এবং সকলেরই পরিচিত ও সম্মানিত ব্যক্তিগণের সমিতির হস্তে ইহার পরিচালনা ও শাসনের ভার ন্যস্ত থাকা সঙ্গত। তাহা হইলে সকলেই ইহার উন্নতি বিধানে যত্ন করিতে সুযোগ প্রাপ্ত হয়েন, সকল বিষয়েই অভিভাবকগণ, জন সাধারণ এবং শিক্ষকেরা সম্মিলিত হইয়া কার্য্য করিতে পারেন। এই উপায়ে ইহার ভবিষ্যতের জন্য সকলেই নিজ নিজ দায়িত্ব উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয়েন।

বিদ্যালয়ের কার্য্যনির্ব্বাহ, আয়ব্যয় বিধি-ব্যবস্থা প্রভৃতি সকল বিষয়েই কর্ত্তৃপক্ষ এবং অভিভাবকগণের মধ্যে সহযোগিতা থাকিলে পরস্পর পরস্পরের অনুকূল ও সহায় হইতে পারেন। ফলতঃ বিদ্যালয় সুশাসিত এবং ছাত্রগণ সুনিয়ন্ত্রিত হইতে পারে।

যদি ছাত্র ও শিক্ষকদিগের একত্র বাসের বন্দোবস্ত না থাকে তাহা হইলে ছাত্রদিগের সর্ব্বাঙ্গীন উৎকর্ষের বিধান করিতে হইলে কর্ত্তৃপক্ষকে অনেক বিষয়ে অভিভাবকদিগের সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। এ জন্য ছাত্রদিগের গৃহের চরিত্র ও পাঠাভ্যাস এবং গুরুজনাদির প্রতি আচরণ প্রভৃতি সম্বন্ধে অভিবাবকদিগের হস্তে সম্পূর্ণ দায়িত্ব অর্পণ করা উচিত। এ সকল বিষয়ে শিক্ষকদিগের শাসন অথবা বিদ্যালয়ের বিধান বিশেষ ফলপ্রদ হইতে পারে না। কিন্তু যে সকল ছাত্র বিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসে শিক্ষকদিগের তত্ত্বাবধানে বাস করে তাহাদের চরিত্রের জন্য বিদ্যালয় দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারে।

সাধারণতঃ ছাত্রদিগের চরিত্র ও শাসন সম্বন্ধে অভিভাবকদিগকে বিদ্যালয়ের যে যে নিয়ম পালন করা উচিত।—

(ক) তত্ত্বাবধানস্থ কোন ছাত্রকে বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করিবার সময়ে অভিবাবককে স্বহস্তে লিখিত অনুমতি পত্র প্রদান করিতে হয়। এবং সঙ্গে সঙ্গে ছাত্র পূর্ব্বে কোন বিদ্যালয়ে পড়িত কিনা,—পড়িলে সেই বিদ্যালয়ের বেতনাদি সমস্ত প্রাপ্য দেওয়া হইয়াছে কিনা, এবং সেই বিদ্যালয়ে ছাত্রের কিরূপ আচরণ ছিল ইত্যাদি বিষয়ের সার্টিফিকেট প্রদান করা কর্ত্তব্য।

(খ) বিদ্যালয়ের অবকাশ কালে ছাত্রেরা গৃহে কিরূপ আচরণ করে অবকাশের পর বিদ্যালয় খুলিবার সময়ে অভিভাবকদিগকে তদ্বিষয়ে মন্তব্য প্রকাশ করিয়া কর্ত্তৃপক্ষকে জ্ঞাপন করা কর্ত্তব্য।

(গ) স্থানীয় লোকহিতকর কোন কার্য্যে যোগদান করিতে হইলে, অথবা বিদ্যালয়ের উন্নতি কল্পে কোন কার্য্য করিবার জন্য, অথবা স্থানান্তরে যাইয়া সাহায্য সংগ্রহ করিবার জন্য অভিভাবকগণের অনুমতি গ্রহণ করিয়া কর্ত্তৃপক্ষের কার্য্য করা উচিত।

(ঘ) প্রতিমাসে অভিভাবকগণের নিকট ছাত্রদিগের যে দৈনিক পরীক্ষায় ফল বিজ্ঞাপন পত্র প্রেরিত হয় তাঁহাদিগের সেই ফল বিজ্ঞাপন পত্রে গৃহের চরিত্র সম্বন্ধে মন্তব্য লিখিয়া কর্ত্তৃপক্ষের নিকট তাহা পাঠান উচিত।

শিক্ষকগণ।

বিদ্যাদানই ধর্ম্ম মনে করিয়া যাঁহারা শিক্ষা বিস্তার কার্য্য জীবনের ব্রত স্বরূপ গ্রহণ করিতে পারেন না তাঁহাদিগের দ্বারা শিক্ষাবিভাগের কার্য্য সুচারুরূপে চলিতে পারে না। কিন্তু সেরূপ শিক্ষক অতি বিরল।

পুস্তকের সাহায্য না লইয়া অধিকাংশ শিক্ষা প্রদান করিতে হইলে শিক্ষকদিগকে বিবিধ পুস্তকাদি ব্যবহার করিয়া স্বাধীন ভাবে শিক্ষণীয় বিষয়ের পাঠ প্রস্তুত করিতে হয়। ইহারা এই সকল বিষয় শৃঙ্খলাকৃত করিয়া পুস্তকারে লিখিতে বাধ্য হয়েন।

কেবল মাত্র কয়েক ঘণ্টা বিদ্যালয়ে বসিয়া ছাত্রগণকে পুস্তকের উপদেশ গুলি মুখস্থ করাইয়া দিতে পারিলেই শিক্ষকদের কর্ত্তব্য শেষ হয় না। তাঁহাদিগকে একাধারে অভিনব সত্যের অনুসন্ধানকারী (Scholar) পরিচালক ও ধুরন্ধর (organiser) এবং শিক্ষাতত্ত্বজ্ঞ (educationist হইবার জন্য সাধনা করিতে হয়। এজন্য প্রকৃত বিদ্যোৎসাহী এবং বিদ্যাকাঙ্ক্ষীরূপে চিরজীবন ছাত্রের ন্যায় বিশেষ কোন এক শাস্ত্রের অনুশীলনে রত থাকিয়া বিদ্যা চর্চ্চায় মগ্ন হইয়া থাকিতে হয়। সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যালয়ের সকল প্রকার কর্ম্ম, ছাত্রগণের চরিত্রগঠন ইহাদের মধ্যে শৃঙ্খলা আনয়ন, সাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার কল্পে চেষ্টা প্রভৃতি বিবিধ শাসন ও পরিচালনা কার্য্যের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হয়। অধিকন্তু ছাত্রের কোন্ কোন্ বিষয় শিক্ষা করা উচিত, এবং কোন্ বয়সে কোন্ বিষয়ের কত অংশ সে গ্রহণ করিতে সমর্থ অর্থাৎ বয়স ও প্রবৃত্তির বিকাশ অনুসারে কখন কোন্ বিদ্যা আলোচিত হইলে মস্তিষ্কের উন্নতি ও জ্ঞানের পুষ্টি সাধিত হয় এই সকল বিষয়ে বুৎপন্ন হইবার জন্য শিক্ষকগণকে এডুকেশনিষ্ট হইয়া বিশ্বের সর্ব্ববিধ বিদ্যার প্রতিই অনুরাগী হইতে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। শিক্ষকগণের মধ্যে এইরূপ সর্ব্বোতোমুখী প্রতিভা বিকাশের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা প্রয়োজনীয়।

এই কারণে নিজেদের কার্য্যোপযোগী শিক্ষক তৈয়ারী করিয়া লইবার বন্দোবস্ত করা উচিত। এই উদ্দেশ্যে যে সকল ছাত্রেরা কলেজের উন্নত শ্রেণীতে পড়িতেছে এবং বিদ্যাদান কার্য্যে যাহাদের প্রকৃত প্রবৃত্তি আছে এরূপ শিক্ষানুরাগী অধ্যয়নশীল ছাত্রদিগকে উচ্চতর শিক্ষার ভার গ্রহণ করিয়া অধ্যাপনা কার্য্যে নিযুক্ত করিলে ভবিষ্যতে সুফল লাভ হইতে পারে।

শিক্ষার্থীদিগের কথঞ্চিৎ মানসিক উৎকর্ষ সাধিত হইবার পর সম্পূর্ণ স্বাধীনতার সহিত যুগপৎ অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা কার্য্য সম্পন্ন হইবার ব্যবস্থা থাকিলে জ্ঞানানুশীলনের উন্নতি সাধিত হয়। শিক্ষকতার কার্য্যে বিদ্যালয়ের পরিচালনা ও শিক্ষা প্রণালী প্রভৃতি শিক্ষা পদ্ধতি সম্বন্ধীয় বিষয় সমূহে অভিজ্ঞতা জন্মে; এবং উন্নত ছাত্রেরা ক্রমশঃ নিজ নিজ বিশেষ আলোচ্য বিষয় বাছিয়া লইয়া কেবল মাত্র সেই বিষয়েই সম্পূর্ণ মনোযোগী হইতে পারে। অধিকন্তু প্রয়োগের ক্ষেত্র পাইয়া পূর্ব্বোপার্জ্জিত জ্ঞান অনেক বিষয়ে সম্পূর্ণতা লাভ করে। এতদ্ব্যতীত শিক্ষা প্রচার রূপ লোকহিতকর কার্য্যে যোগদান করার ফলে পঠদ্দশায়ই প্রকৃত নৈতিক চরিত্র গঠনের সূত্রপাত হয়।

শ্রীবিনয়কুমার সরকার।

দেবতা

কোন্ রাজ্যে আছ তুমি, হে চিরকল্যাণময়ি,
হে আমার জীবন দেবতা !
আমার দুর্ব্বল কণ্ঠ ডাকিয়াছে কতবার,
প্রতিধ্বনি আনেনি বারতা !
মকরন্দ গন্ধময় তোমার চরণরেণু
শিরে বহি বিলায় মলয়;
নীরবে ফুটিয়া উঠে অযুত কুসুম হাসি,
বিশ্ব করে নিকুঞ্জ নিলয় !
কোন্ অজ্ঞাতের পারে ছড়াও কৌমুদী হাস্য,
জ্যোতিঃ তার নির্ম্মল ধবল
রচে বসুন্ধরা বক্ষে সুনীল সরসী জলে
লক্ষ যুথী কহ্লার কমল।
স্বপ্নের মদিরামাখা তোমার পীযুষকণ্ঠ
অলক্ষিতে কোথা হ'তে আসি
গুঞ্জিত প্রসূন পুঞ্জ বসন্তের কুঞ্জে কুঞ্জে
পিককণ্ঠে উঠে পুনঃ ভাসি !
বিপুল বিশ্বের এই শ্রান্তিহীন কর্ম্মযন্ত্রে
উঠে যেই মহা কোলাহল,
সেথাকার ঐকতানে বীণার ঝঙ্কার তব
শুনিতেছি বিস্ময় বিহ্বল !

এ বিশ্বের প্রতি অণু তোমার কুহেলি মেখে
কহে তব অব্যক্ত বারতা,
তবুত বুঝিনে আমি, হে নিত্য কুহেলিময়ি,
কোথা তুমি, হে মোর দেবতা!

শ্রীযশোদালাল বণিক্‌।

ছত্রের ব্যবহার।

অতি প্রাচীন কাল হইতে পৃথিবীতে ছত্রের ব্যবহার প্রচলিত আছে। আর্য্যসভ্যতার প্রথম উন্মেষের সহিতই প্রাচ্যভূখণ্ডে ছাতার প্রথম আবিষ্কার হয়। পাশ্চাত্যদেশে ছাতার ব্যবহার প্রচলন হইতে অনেক বিলম্ব হইয়াছিল, এবং বহুশতাব্দীকাল ছত্র তত্তৎপ্রদেশে সমাদর লাভেও বঞ্চিত হইয়াছিল।

সম্প্রতি "সায়েণ্টিফিক্‌ আমেরিকান" পত্রে "ছত্রের ক্রমোন্নতি" শীর্ষক একটী উপাদেয় প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। নিম্নে তাহার সারমর্ম্ম উদ্ধৃত হইল।

"গ্রীষ্মপ্রধান দেশের বড় বড় বৃক্ষপত্রের দ্বারা সর্ব্বপ্রথম ছাতার আবিষ্কার কল্পনা করা হইয়াছিল, এবং পাতলা বস্ত্র দ্বারা পাতার আকারে নির্ম্মাণ করিয়া, একটা যষ্টির অগ্রভাগে বাঁধিয়া প্রথম ব্যবহার্য্য ছাতা গঠিত হইয়াছিল। প্রাচ্যদেশে ঘন ঘন বৃষ্টিপাত হয় না, কিন্তু যখন বৃষ্টিপাত হয়, তাহা এত প্রবল ও দীর্ঘকালব্যাপী হয় যে ছাতার দ্বারা বিশেষ উপকার হয় না। সুতরাং তথায় সূর্য্যোত্তাপ নিবারণের জন্যই ছাতার আবশ্যকতা হইয়াছিল। এই সকল ক্ষুদ্র ছাতার বর্ণনা খৃষ্টপূর্ব্ব ১১৭০ সনের প্রাচীন মিশর দেশীয় খোদিত লিপিতে দেখিতে পাওয়া যায়।

বর্ত্তমান যুগের ছাতা একটী মাত্র বৃক্ষপত্রের অনুকরণ নহে; একটী বিস্তৃত ও প্রসারিত শাখাবিশিষ্ট বৃক্ষের অনুকরণ বলিয়াই বোধ হয়। সংকোচনশীল ছাতার আবিষ্কারকের নাম জনসাধরণের নিকট অজ্ঞাত। খৃষ্টপূর্ব্ব ৫ম শতাব্দীতে Aristophanes যে "দি নাইট্‌স্‌" নামক গ্রীক নাটক লিখিয়াছিলেন, তাহার একস্থানে একটা সংকোচনশীল ছাতার উল্লেখ আছে, এবং এইজাতীয় আতপত্র প্রাচীন গ্রীস দেশীয় কারুকার্য্য বিশিষ্ট পাত্রেও অঙ্কিত দেখা যায়। ছত্রের উন্নতির ইতিহাসের এখানেই পরিসমাপ্তি নহে, এই প্রয়োজনীয় দ্রব্যটী ক্রমেই বহু পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া আসিয়াছে। এবং বহু আইন-নজীরেরও আমলে আসিয়াছে।

রোমান গ্রন্থকারদের গ্রন্থাবলীতে দেখা যায় যে রোম-দেশীয় নারীগণ গ্রীকদের নিকট হইতেই ক্ষুদ্র ছাতা ব্যবহার গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই ছাতা একজন ক্রীত-দাস বা ক্রীতদাসী বহন করিয়া লইয়া যাইত। ছত্রের

দণ্ড বংশ দ্বারা এবং আবরণ রঞ্জিত বস্ত্রদ্বারা নির্ম্মিত হইত। এইরূপ ক্ষুদ্র ছাতার ব্যবহার কেবলমাত্র রমণীদিগের মধ্যেই আবদ্ধ ছিলনা। সে সময়কার (খৃষ্ট-পূর্ব্ব ৩৯৯ অব্দ) বিলাসী রোমান যুবকগণ ছোট ছোট ছাতা সঙ্গে রাখিত বলিয়া কবিবর Claudianus দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন।

এলকুইন নামক একজন উচ্চশিক্ষিত ইংরেজ Charlemagne র শিক্ষক ছিলেন। বৃষ্টি হইতে দেহ রক্ষার জন্য ছত্র ব্যবহারের উল্লেখ এলকুইনের পত্রাবলীতেই সর্ব্ব প্রথম দৃষ্ট হয়। ৮০০ খ্রীষ্টাব্দে সল্‌সবারীর বিশপের নিকট লিখিত তাঁহার এক পত্রে লেখা আছে, "বৃষ্টি হইতে বিশপের বহুমানাস্পদ মস্তক রক্ষার জন্য এলকুইন একটা "roof" অর্থাৎ ছই পাঠাইলেন।"

মধ্যযুগে ছাতা পদগৌরব ও সম্মানের চিহ্ন ছিল। ১১৭৬ খৃষ্টাব্দের পর, রৌদ্র থাকুক কি না থাকুক, ভিনিসের প্রধান শাসন কর্ত্তার অগ্রে অগ্রে একটা জমকাল ছাতা বহন করিয়া লইয়া যাওয়া হইত। ১৪১১—১৪১৮ খ্রীষ্টাব্দের Council of Constance এর বিবরণীর যে পাণ্ডু লিপি আছে, তাহাতে পোপ্ এর রাজকীয় ছত্রের প্রতিলিপি আছে।

১৫০০ খৃষ্টাব্দে Leonardo da Vinci তাঁহার নবাবিষ্কৃত প্যারাস্যুটের বর্ণনাচ্ছলে "তাঁবু" শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন, ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, ঐ সময় ইটালীতে ছাতার ব্যবহার অজ্ঞাত ছিল। ১৫৯৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্তও ফরাসীদেশে ছাতার ব্যবহার বিরল এবং উপহাসের বিষয় ছিল।

প্রায় এই সময়েই ইটালীদেশে ছাতার ব্যবহার আরম্ভ হইয়াছিল। ১৬১১ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ পরিব্রাজক টমাস্ করিয়েট্ লিখিয়াছেন, ইটালীর সম্ভ্রান্ত বংশীয়গণ সূর্য্যোত্তাপ নিবারণের জন্য সিংহাসনের উপরিস্থ চন্দ্রাতপের ন্যায় একপ্রকার রেশমী আবরণ ব্যবহার করিতেন। অশ্বপৃষ্ঠেও ছাতার ব্যবহার হইত, দণ্ডটা

অশ্বারোহীর পায়ের সহিত বাঁধিয়া দেওয়া হইত। ইংলণ্ডে ১৬১৬ খৃষ্টাব্দের লিখিত একখানা নাটকের অভিনয় কালে রঙ্গমঞ্চেও ছাতার অবতারণা করা হইয়াছিল।

বোধ হয় প্রাচ্যদেশ হইতেই ছাতার ব্যবহার ইটালীতে প্রচলিত হইয়াছে। ১৬২০ খৃষ্টাব্দে ফরাসী ইঞ্জিনিয়ার

সলোমন ডি কেয়াস্ যে সকল কৃত্রিম প্রস্রবণ দ্বারা হিডেলবার্গ ক্যাসেলের পার্ক সজ্জিত করিয়াছিলেন তাহার একটী প্রস্রবণ সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন যে তাহাতে যে মনুষ্যমূর্ত্তি আছে উহার মস্তকোপরি একটা আতপত্র অথবা ভারতবর্ষীয় মস্তকাবরণ রহিয়াছে, উহা হইতে জল নির্গত হইতেছে।

ইংরেজ দার্শনিক পণ্ডিত লকে তাঁহার ১৬৭৫ খৃষ্টাব্দের ফরাসীদেশ ভ্রমণ কাহিনী বর্ণনাচ্ছলে ফরাসী রমণীদিগের ব্যবহৃত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছাতার যে ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন. তাহাতে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, সেই সময়ে ইংলণ্ডে ঐ প্রকার ছাতার ব্যবহার প্রায় অজ্ঞাতই ছিল।

১৭১৯ খৃষ্টাব্দে ডিফো তৎপ্রণীত রবিন্সন ক্রুশে প্রকাশ করেন। ঐ পুস্তকে রবিন্সন ক্রুশোর ছাতার বর্ণনা সম্ভবতঃ তৎকালে ছাতাকে রৌদ্র ও বৃষ্টি নিবারকরূপে প্রসিদ্ধি দান করিয়াছিল।

প্রায় এই সময়েই বৃষ্টির সময়ের উপযোগী ছাতা ইংলণ্ডে সর্ব্বপ্রথম দৃষ্ট হইয়াছিল, এবং অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজের ছাত্রেরা তাহা ঘণ্টা হিসাবে ভাড়া করিয়া ব্যবহার করিত। ছাতা ব্যবহারকারী ছাত্রগণকে লোকে উপহাস করিত কিন্তু নির্যাতন করিত না। অতঃপর জনহিতৈষী জোনাস্ হ্যান্‌ওয়ে ছাতার ব্যবহার সমর্থন করিতে লাগিলেন। এবং স্বয়ং প্রাচ্যদেশীয় একটা চিত্রবিচিত্র বৃহৎছত্র সঙ্গে না লইয়া বাহির হইতেন না।

তাঁহার এই ব্যবহারে লোকারণ্যের দৃষ্টি তাঁহার দিকে আকৃষ্ট হইত, এবং গবাক্ষ হইতে অবজ্ঞাসূচক বিশেষণ হ্যান্‌ওয়ের প্রতি প্রযুক্ত হইত। এইরূপে হ্যান্‌ওয়ের চরিত্রবল এবং নির্ব্বিকার শান্তভাব ছাতাকে জন সাধারণে প্রচলিত করিতে সাহায্য করিয়াছিল। ক্রমে লোকে তাঁহার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিতে লাগিল। যদিও সাময়িক পত্রে তাঁহার ছাতার সম্বন্ধে বিস্তর ব্যঙ্গ প্রকাশ করা হইত, তথাপি বৃদ্ধবয়সে হ্যান্‌ওয়ে দেখিয়া সুখী হইয়াছিলেন যে লণ্ডন সহরবাসী অনেকেই ছত্র ব্যবহার করিতেছে।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ছাতার সংস্কার বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া হইয়াছিল। ফরাসী দেশই ছাতা নির্ম্মাণে প্রথম

স্থান অধিকার করে। তথায় একদল লোক এই বাণিজ্য এক চেটীয়া করিতে সচেষ্ট হয়। এদিকে সম্রাট্ পঞ্চম লুই নিজেই ছত্র নির্ম্মাণের জন্য এক বণিক্ সম্প্রদায় স্থাপিত করেন। এই সময়ে ভাঙ্গা ডাঁটের ছাতা বাহির হয়; সেই ছাতার দণ্ড না বাঁকাইয়াও রৌদ্র ও বৃষ্টি নিবারণ জন্য আবরণটা যথেচ্ছা অবনত করান যাইত। এই সকল ছাতা পেরিসে ১৭৫৫ খৃষ্টাব্দে ৩।৪ ডলার মূল্যে এক একটা বিক্রয় হইত।

জর্ম্মণীতে নিউরেম্বার্গ নগরে ১৭৫৫ খৃষ্টাব্দে প্রথম ছাতা তৈয়ার হয়। ধনীরা কিন্তু প্রথম প্রথম তাহা ব্যবহার করিতে আপত্তি উত্থাপিত করিলেন। তাঁহাদের আপত্তির কারণ, ছাতা দরিদ্রের চিহ্ন, ছত্র ব্যবহারে ইহাই প্রমাণিত হইবে যে ছত্রধারী ব্যক্তির গাড়ী ভাড়া করার উপযুক্ত অর্থ নাই।

১৭৯১ হইতে ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ফরাসীদেশে ছত্রের উন্নতি ও সংস্কার জন্য ৬০টী সনন্দ দেওয়া হইয়াছিল। এই সকল ছাতার মধ্যে যষ্টি, দূরদর্শনযন্ত্র, অপেরাগ্লাস, ও লিখিবার সরঞ্জাম এবং কল কব্জা সংযুক্ত ছাতাও ছিল। তখন এরূপ এক প্রকার ছাতাও বাহির হইয়াছিল, যাহার বোতামে চাপ দিলেই ছাতা খুলিয়া যাইত। ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে Abbe Bertholon de St. Lazare চুম্বক লৌহযুক্ত একপ্রকার ছত্র আবিষ্কার করেন, তাহা লইয়া তুফান ও বজ্রপাতকালেও বাহির হওয়া যাইত।

ব্যোমযান আবিষ্কারের পর প্যারাসুটের আবশ্যকতা প্রতিপন্ন হইলে সর্ব্বপ্রথম সাধারণ ছত্রের দ্বারাই পরীক্ষা করা হইয়াছিল। ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে লি নরম্যাণ্ড সাহেব দুইটী ছাতার সাহায্যে একটা বৃক্ষের অগ্রভাগ হইতে ভূতলে নামিয়াছিলেন; এবং ১৭৯৭ খৃষ্টাব্দে গেমারিণ সাহেব একটী প্রকাণ্ড ছাতা লইয়া বেলুন হইতে অবতরণ করিয়াছিলেন।"

উপরের লিখিত বিবরণ নিতান্তই কৌতূহলোদ্দীপক সন্দেহ নাই। কিন্তু লেখক মহোদয় কেবল মাত্র ইউরোপের বিভিন্ন দেশের বিষয়ই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, এসিয়ার ও আফ্রিকায় ছত্র ব্যবহারের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু উল্লেখ করেন নাই। আমরা এই প্রসঙ্গে এসিয়া ও আফ্রিকার ছত্র ব্যবহার বিষয়ে আলোচনা করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

ভারতবর্ষে স্মরণাতীত কাল হইতে ছত্র ব্যবহার প্রচলিত আছে। আর্য্যগণের প্রথম অভ্যুদয়ের সময়েই এই রৌদ্রতপ্ত ও বর্ষাস্নাত দেশে ছত্রের প্রথম আবিষ্কার হইয়াছিল। রামায়ণ ও মহাভারতে ছত্র ব্যবহারের ভূরি ভূরি উল্লেখ দৃষ্ট হয়। সেকালে রাজগণের সিংহাসনের উপর শ্বেতছত্র ধারণ করা হইত। পথিকগণও আতপত্র ব্যবহার করিত। বনেগমন করার প্রাক্কালে রামকে ছত্রবিহীন হইয়া পদব্রজে গমন করিতে দেখিয়া অযোধ্যার নাগরিকগণ শোকভারাক্রান্তচিত্তে নানাবিধ খেদযুক্ত বাক্যবিন্যাস করিয়াছিলেন। রাবণ রাজপথে বহির্গত হইলে তাঁহার মস্তকে পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় বিমল রাজছত্র ধারণ করা হইত। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞকালে সাত্যকি তাঁহার মস্তকে ছত্রধারণ করিয়াছিলেন।

পুরাণে ছত্রের জন্মবিবরণ আছে। তাহা এইরূপ—একদা মহর্ষি জমদগ্নির পত্নী রেণুকা সূর্য্যোত্তাপে ক্লিষ্টা হইয়াছিলেন। তদ্দৃষ্টে জমদগ্নি ক্রোধ পরবশ হইয়া ধনুকে জ্যারোপণ করতঃ সূর্য্যদেবকে বিদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলে, সূর্য্যদেব ভীত হইয়া ব্রাহ্মণের বেশ ধারণ পূর্ব্বক মুনিবরের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া স্তুতি করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু মহর্ষির ক্রোধ স্তব স্তুতিতে উপশমিত হইল না। তখন সূর্য্যদেব ছত্র নির্ম্মাণ করিয়া মহর্ষিকে প্রদান করিলেন, এবং বলিলেন "অদ্য হইতে লোকে ছত্র দ্বারা আমার কিরণ হইতে রক্ষা পাইবে।"

হিন্দুর ব্রতাদি যাগযজ্ঞেও ছত্রদানের উল্লেখ আছে। হিন্দুশাস্ত্রে ছত্রের বিভিন্ন নামও আছে, যথা—প্রতাপ, কনকদণ্ড, নবদণ্ড, দিগ্বিজয়ী প্রভৃতি। পাণিনির ব্যাকরণে "ছত্র" শব্দের এইরূপ ব্যুৎপত্তিগত অর্থআছে—"ছাদয়ত্যনেনাতপাদিকং ছদ্—ণিচ্—ষ্ট্রন্ উপধায়া হ্রস্বশ্চ।"

মহাকবি কালিদাস রঘুবংশেও ছত্রের অবতারণা করিয়াছেন। বৌদ্ধশিল্পী দিগের অঙ্কিত অজন্টাগুহা চিত্রাবলীতে ও প্রাচীন কালের ছত্র অঙ্কিত আছে। জনৈক অশ্বারোহীর মস্তকোপরি দীর্ঘ দণ্ডযুক্ত একটী ছত্র ধারণ করিয়া ছত্রবাহক পশ্চাতে চলিয়াছে, এইরূপ একটি চিত্র সহৃদয় বার্ডউড্ সাহেবের বিখ্যাত Journal of Indian Arts পত্রের অজন্টাগুহা চিত্রাবলীতে প্রকাশিত হইয়াছে।

চীন ও শ্যামদেশে ছত্রপূজা প্রচলিত আছে। ভারতবর্ষে সাঁওতাল জাতি ছত্রপূজক। সাঁওতালেরা একটা পরিষ্কৃত স্থানে একটা বাঁশের উপর ছাতা বাঁধিয়া তাহা ফুলপাতা দিয়া উত্তমরূপে সাজায় ও চতুর্দ্দিকে গীতবাদ্য ও নৃত্য করে। চীন ও ব্রহ্মদেশের ধর্ম্মমন্দির অনেকটা ছত্রের আকারেই গঠিত হয়। চীন দেশে রাজার অভিষেক কালে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ প্রত্যেকে এক একটি রেশমী ছাতা লইয়া রাজার অগ্রে অগ্রে গমন করেন। মৃত ব্যক্তির কবরের উপরেও চীনারা কাগজের ছাতি দিয়া থাকেন।

ব্রহ্মদেশে রাজকর্ম্মচারিগণ পদমর্য্যাদা অনুসারে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ ছত্র ধারণ করেন। জাপানে অতিসুন্দর কাগজের ছাতা প্রস্তুত হয়। জাপানী মহিলারা পদব্রজে কিম্বা "জিন্‌রিক্‌সায়" চড়িয়া কোথাও বাহির হইলেই সঙ্গে কাগজের হাত পাখা ও ছাতা লইতে ভুলেন না। পূর্ব্বে জাপান সম্রাট্ মিকাডো হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া যখন নগর ভ্রমণে বহির্গত হইতেন, তখন তাঁহার মস্তকোপরি স্বর্ণময় প্রকাণ্ড রাজছত্র ধারণ করা হইত, সেই ছত্রের চতুর্দ্দিকে শলাকার সহিত স্বর্ণময় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘণ্টা বিলম্বিত থাকিত।

মোগলদিগের রাজত্বকালে কেবল উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারিগণই ছত্র ব্যবহার করিতে পারিতেন, সর্ব্বসাধারণের প্রতি ছত্র ব্যবহারের অনুমতি প্রদত্ত হইত না। এতদ্দেশে অদ্যাপিও সময় সময় দুই একজন "ছত্রাতঙ্ক" রোগী দেখা যায়।

মরক্কো প্রদেশে সুলতান ভিন্ন অপর কেহ ছাতা ব্যবহার করিতে পারে না। অশান্তি দেশের রাজার একটি প্রকাণ্ড ছত্র বিলাতের উইণ্ডসর প্রাসাদে রক্ষিত আছে।

পূর্ব্বে আমাদের দেশে আড়ানী ছাতির ব্যবহার হইত। আফিসে যাইবার সময়ে পদস্থ কর্ম্মচারী, উকীল ও মোক্তার গণের পশ্চাতে বংশ নির্ম্মিত বৃহৎ ছাতা বহন করিয়া লইয়া যাওয়া হইত। অধিকাংশ সময়েই উকীল মোক্তারগণ সেই ছাতির ছায়া ভোগ করিতেন না, বেহারা ছাতা লইয়া তাঁহার বহু পশ্চাতে পড়িয়া থাকিত। তথাপি পশ্চাতে এইরূপ ছত্রধারী না থাকিলে সম্ভ্রম রক্ষা হইত না।

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র রায়।

সার্থকতা

যে পবনে ফুটে আঁখি প্রসূন কলির
সেই বায়ুভরে পুনঃ পড়ে সে ঝরিয়া;
যে তপন-করে হাসে প্রভাত শিশির
তাহে পুনঃ ধীরে সেই যায়রে মিশিয়া ?
তেমনি হে প্রিয়তম, তোমারি প্রভায়
উঠিয়াছি বিকসিয়া উজ্জ্বল, নবীন,—
তোমারি প্রীতির মাঝে, আজি এ জ্যোত্স্নায়
আনন্দ-বুদ্বুদ সম হইতে বিলীন !

শ্রীদেবকুমার রায় চৌধুরী

রেনেলের সমসাময়িক পূর্ব্ববঙ্গ

(ডাএরি)

সম্প্রতি রেনেলের ডাএরি কিরূপ ভাবে প্রকাশিত হইল তাহার একটুকু সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আগামী সংখ্যায় প্রদান করা যাইবে।

এই পুস্তক খানা প্রকাশ হওয়ায় বঙ্গ দেশের নদ নদী পরিবর্ত্তনের যে বিশেষ বিবরণ অবগত হইতে পারা যাইবে তৎসম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই, এজন্য আমরা নিতান্ত আগ্রহের সহিত উহার অনুবাদ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি।

২রা তারিখ। আকাশের অবস্থা প্রায় গত দিবসের অনুরূপ। প্রত্যূষে আমরা ঐ বৃহৎ নদীতে প্রবেশ করিলাম এবং উহার বিস্তারের বিশালতা এবং স্রোতের প্রাবল্য নিবন্ধন উহা পার হইতে আমাদের প্রায় ৪ ঘণ্টা লাগিল। পূর্ব্ব পার প্রাপ্ত হইবার পর আমরা ঢাকা পৌঁছিবার জন্য মুলুয়ার নিকট একটী খালে প্রবেশ করিলাম। জল মাটীর উপর চারি হস্ত পরিমাণ ছিল। ঢাকা আমাদের ২৪ মাইল উত্তর পূর্ব্বে অবস্থিত ছিল। অদ্য সন্ধ্যাকালে গঙ্গা হইতে ৫। ৬ মাইল দূরবর্ত্তী হাটখোলা নামক গ্রামে আসিলাম। অদ্য সন্ধ্যাকালে বাতাসের গতি পূর্ব্ব উত্তর পূর্ব্ব।

৩রা তারিখ। পূর্ব্ব ও পূর্ব্বউত্তর পূর্ব্বদিক্ হইতে অতি পরিষ্কার বাতাস বহিতেছে। অদ্য সন্ধ্যাকালে হাটখোলা হইতে ৪ মাইল দূরে দাগদিয়া পৌঁছিলাম। এখানে একটী উচ্চ শ্বেতবর্ণ দেব মন্দির আছে। রাত্রিতে পশ্চিমদিক্ হইতে প্রবল বাতাস বহিতেছে।

৪ঠা তারিখ। বাতাস দক্ষিণ এবং দক্ষিণ পশ্চিম দিক্ হইতে বহিতেছিল এবং উহার গতি প্রবল না থাকায় আমরা যতদূর সাধ্য ঢাকা অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। প্রাতঃকালে ১০টার সময় মীরগঞ্জ ও ইছামতী (১) নদীতে উপস্থিত হইলাম। এবং পোলের (২) নীচে দিয়া চলিয়া গেলাম। পোলের খিলান এরূপ প্রশস্ত ছিল যে তাহার নীচেদিয়া আমাদের বজরা অনায়াসে বাহির হইয়া গেল। এখান হইতে খাড়ি দিয়া ঢাকার নদী বুড়িগঙ্গার মুখে পৌঁছিলাম। ফিরিঙ্গী বাজার (৩) আমাদের ৩ মাইল পূর্ব্বে রহিল। সন্ধ্যা ৫½ টার সময় ঢাকা পৌঁছিলাম।

সেপ্টেম্বর, ১৭৬৪।

সাতপুরের নিকট যে স্থানে আমরা গঙ্গা ছাড়িয়াছিলাম সেখান হইতে মেঘনার সঙ্গম স্থল পর্য্যন্ত এবং মেঘনা নদী প্রভৃতি ও তথা হইতে ঢাকা পর্য্যন্ত জরিপ করিবার জন্য দ্বিতীয়বার যাত্রার বিবরণ। ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দের ১৯শে সেপ্টেম্বর তারিখ—আমি বেশ সুস্থ বোধ করায় নদীর জরিপ কার্য্যের জন্য প্রাতঃকালে ঢাকা রওনা হইলাম।

এক্ষণে দেশের অধিকাংশ জলমগ্ন থাকায় দেশের উপর দিয়া হাজিগঞ্জের বিপরীত দিকস্থিত গঙ্গাতীর আমাদের সোজা রাস্তা স্থির। ইহার পর (যখন দেশের জল সরিয়া যাইবে তখন) আমরা নদীর কূলের দিকে যাইব। হাজিগঞ্জ ঢাকা হইতে প্রায় ৩১ মাইল পশ্চিম দক্ষিণ (W B S) কোণে অবস্থিত।

১৯শে হইতে ২১শে—প্রায়শঃ দক্ষিণ পূর্ব্ব হইতে পূর্ব্ব দক্ষিণ পূর্ব্বদিকে নির্ম্মল বাতাস বহিতেছিল। বাতাস শুষ্ক ছিল।

ঢাকা হইতে রওনা হইয়া রাত্রিতে ইছামতী অথবা ধলেশ্বরী নদীর উত্তরপারে তাজিপুরে ছিলাম। ঢাকা দেখা যাইতেছে। এখান হইতে ৬ মাইল অথবা কিছু বেশী উত্তর পূর্ব্ব অর্দ্ধপূর্ব্ব।

ঢাকার দশ মাইল পশ্চিমে দেশ সহরের চতুষ্পার্শ্ব অপেক্ষা উচ্চতর। এখানে খালের তীর প্রায়শঃ শুষ্ক।

---

(১) গোয়ালন্দের বিপরীতদিকে গঙ্গা হইতে বহির্গত একটী খালের নাম।

(২) তালতলা (পূর্ব্বনাম মীরগঞ্জ) খালের উপর অবস্থিত তালতলার পোল। কথিত আছে যে ইহা মুসলমানগণ কর্ত্তৃক বঙ্গবিজয়ের পূর্ব্বে রাজা বল্লাল সেন কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। যদি ইহা সত্য হয় তবে ঐ পোল ৩০০ বৎসরের পুরাতন। ইহার তিনটী খিলান ছিল; মধ্যেরটীর পরিসর ৩০ ফিট্ ইংরেজ রাজত্বের প্রথম বৎসর কলিকাতা হইতে সোজাভাবে ঢাকা পর্য্যন্ত বড় বড় নৌকার যাতায়াতের সুবিধার জন্য বারুদের সাহায্যে ঐ খিলান উড়াইয়া দেওয়া হয়।

(৩) ফিরিঙ্গীবাজার ঢাকা জেলার মধ্যে প্রথম পর্ত্তুগীজ উপনিবেশ। এখন হইতে প্রায় ১০০ বৎসরের পুরাতন গ্রাম। পর্ত্তুগীজ ঔপনিবেশিকগণ প্রথমতঃ সৈন্য ছিল। তাহারা আরাকানের রাজার চাকুরী পরিত্যাগ করিয়া চট্টগ্রামের অবরোধকারী মোগল সেনাপতি হোসেনবেগের অধীনে আসিয়াছিল। গ্রামের বর্ত্তমান অবস্থা অতি সামান্য। ইহা নারায়ণগঞ্জের অপরপারে ইছামতীর একটী শাখার তীরে অবস্থিত।

কিন্তু ঢাকার চতুষ্পার্শ্বস্থ স্থল, জলের ৪।৫ হাত নিম্নে অবস্থিত।

২১শে তারিখ। প্রাতে সাড়ে এগারটার সময় হাজিগঞ্জের বিপরীতদিকের গঙ্গাতীরে পৌঁছিলাম। এখানে মৌসুদাবাদের নিকট একটি খাল আছে। আমরা একঘণ্টার কম সময়ে নদী উত্তীর্ণ হইলাম। আমাদের বজরা যেরূপ জখম হইয়াছিল এবং ঘণ্টায় ৫ মাইল গামী নদী স্রোতের বিরুদ্ধে প্রবল বায়ু প্রবাহিত হওয়ায় যেরূপ বিষম জলোচ্ছ্বাস হইতেছিল, তাহাতে আমাদের ঐ কার্য্য একটু বিপদ্‌সঙ্কুল ছিল। একটী খালের মূলের দিকে বাহিয়া কয়েক মাইল যাইবার পর আমরা বেলা ৩ টার সময় হাজিগঞ্জে পৌঁছিলাম। এখানে ভূমি জলের দেড়হাত উপরে। কিন্তু গ্রামের লোকের নিকট অবগত হইলাম যে বর্ষাকালে ভূমি জলের দেড়হাত নীচে থাকে।

২১শে তারিখের রাত্রিতে এবং পরদিবসে অতি পরিষ্কার বাতাস ছিল। মধ্যে মধ্যে দক্ষিণ হইতে, দক্ষিণ পূর্ব্ব দিকে বাতাস প্রবলবেগে বহিতেছিল। বোধ হয় ইহা "ইকুনক্স" এর বাতাস, যাহা হউক বায়ুর গতি ঠিকই ছিল।

২২শে তারিখ হাজিগঞ্জে ছিলাম এবং গতকল্য নদী পারি দিবার সময় যে পলারখানি জখম হইয়াছিল উহা মেরামত করিলাম।

২২শে হইতে ২৫শে হাওয়া আরও স্থির হইল। বাতাস প্রায়শঃ অতি সাধারণ ভাব ধারণ করিয়া দক্ষিণ পূর্ব্বদিক হইতে প্রবাহিত হইতেছিল। ২৩শে তারিখ প্রাতে হাজিগঞ্জ অতিক্রম করিলাম। এবং একটী খালের মূলের দিকে বাহিয়া "বিনেত্তি" চরের সন্নিকট বড় নদীতে আসিয়া পড়িলাম (১)। নদীর জল অনেক নিম্নে নামিয়াছিল উহাতে তাহার প্রকৃত খাত দেখা যাইতেছিল। আমরা যতই অগ্রসর হইতে লাগিলাম পার ততই উচ্চ বোধ হইতে লাগিল

(১) রেণেলের সময়ে নদীর এই অংশ যেরূপ ছিল বর্ত্তমানে তাহার বহু পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। এই বাঁকের মাথায় গোয়ালন্দে ব্রহ্মপুত্রের মূল স্রোত আসিয়া পড়িয়াছে বলিয়াই, এইরূপ পরিবর্ত্তন হইয়াছে।

২৫ তারিখ বেলা ৪টার সময় সাতপুরে আসিয়া পৌঁছিয়াছিলাম, এই স্থানে আমরা গত জুন মাসে (২) জরিপ কার্য্য শেষ করিয়া গিয়াছিলাম। বন্যার জন্য তীর এত অধিক পরিমাণে ভাঙ্গিয়া ছিল যে, ঐ স্থানটী প্রায় চিনা যাইতে ছিল না। এবং আমরা একটী প্রকাণ্ড বৃক্ষের সাহায্য ব্যতীত চিহ্নিত স্থান বাহির করিতে পারিতাম না। পূর্ব্ববারে আমি এই বৃক্ষটী পরিমাপ করিয়া ছিলাম।

২৬ তারিখ বুধবার প্রাতে সাতপুর হইতে নদীর দক্ষিণ তীরের জরিপ আরম্ভ করিলাম। দুই প্রহরে একখানা পলার ঢাকা হইতে চিঠী পত্র লইয়া আসিয়া পৌঁছিল।

সাতপুর হইতে প্রায় ১১মাইল (৩) পর্য্যন্ত নদীর গতি প্রায়শঃ পূর্ব্বমুখী ছিল এবং সাতপুরের চারি মাইল ভাটীতে নদীর পরিসর এই সময়ে অর্দ্ধ মাইলও ছিল না।

২৯ শে দুইপ্রহর বেলার পর হইতে প্রাকৃতিক অবস্থা ভয়ানক হইল। আমরা "কাল্‌কাপুরের" নিকট একটী বড় খালে যাইয়া পরিলাম এবং সেই স্থানে পর দিবস পর্য্যন্ত নৌকা বাঁধিয়া থাকিলাম। ঐ দিবস বেশ শান্ত এবং অত্যন্ত গরম ছিল। উপরিউক্ত খাল কাল্‌কাপুরের এক মাইল দূরে গঙ্গার দক্ষিণ তীর হইতে উৎপন্ন হইয়া, হাজিগঞ্জের (৪) নিকট পুনরায় গঙ্গায় পতিত হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে ইহা পূর্ব্বদিকে কুমার খালের সহিত মিলিত হওয়ায় ভূষণা যাইবার সুবিধা হয়। (৫) কিন্তু গ্রীষ্মকালে এই খালে দেড় হাতের অধিক জল থাকে না।

৩০শে সেপ্টেম্বর, অদ্য গবর্ণরের নিকট একখানা পত্র সহ, একখানা পলার (৬) ঢাকা প্রেরণ করিলাম।

১লা অক্টোবর। অত্যন্ত গরম। অদ্য রতনগঞ্জের খালের নিকট আসিলাম (৭) এই খাল উত্তর দিকে বড়

(২) রেনেলের চন্দনা খালের দিগে অগ্রসর হইবার পূর্ব্বের কথা।
(৩) গোয়ালন্দ অভিমুখে যেখানে দক্ষিণ দিকে ইহা বাঁকিয়াছে।
(৪) মরা পদ্মা যাহা গঙ্গার একটী পুরাতণ স্রোত।
(৫) ফরিদপুরের পশ্চিমে একটী বৃহৎ গ্রাম ও বাজার।
(৬) ঢাকার এক প্রকার নৌকা।
(৭) এই গ্রাম বোধ হয় একেবারে বিলুপ্ত হইয়াছে।

নদীতে পতিত হইয়াছে। যে খাল পাবনা দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে সে খাল এবং এই খাল (কুমার) একই। বোঝাই নৌকার পক্ষে বড় নদী অপেক্ষা খালের পথ নিরাপদ বলিয়া সুন্দর বন হইতে গ্রীষ্মকালে নদীর দিকে যে সকল নৌকা গমনাগমন করে তাহারা প্রায় এই পথেই যাতায়াত করে। খালের উৎপত্তি স্থলের পরিসর পাঁচ শত গজের উপর। তাহার পূর্ব্বভাগ অতিশয় প্রশস্ত, নৌকার পক্ষে সে স্থান নিরাপদ নহে।

১লা হইতে ৬ অক্টোবর। এই কয়দিবস বেশ প্রশান্ত। এই ঋতুতে অন্যান্য দিন অপেক্ষা বায়ু অধিকতর উষ্ণ।

৩রা একটী বড় খালের মাথায় আসিলাম। ঐ খাল জাফরগঞ্জের নিকটে (১) উত্তরদিক হইতে প্রবাহিত হইয়া অল্প পরেই রঙ্গপুর প্রভৃতি স্থান হইতে প্রবাহিত একটি বড় খালের (২) সহিত মিলিত হইয়াছে। এবং বুড়ী-গঙ্গা ও ইছামতী এই দুই শাখায় বিভক্ত হইয়া ঢাকা অভিমুখে অগ্রসর হইয়াছে। গঙ্গা হইতে এখানে যে খাল বাহির হইয়াছে তাহা সাধারণতঃ জাফরগঞ্জ খাল নামে পরিচিত। ঢাকা যাইবার সময় এই খাল ব্যবহৃত হইয়া থাকে। রঙ্গপুর হইতে প্রবাহিত খালের দুই মাইল উপরে জাফরগঞ্জ অবস্থিত।

এই খালের বিপরীত দিকে নদী তিন মাইল প্রশস্ত তাহার মধ্যে মধ্যে কয়েকটী বালির চরা আছে। এই স্থান হইতে ইহা বরাবর সোজাভাবে দক্ষিণ মুখে প্রায় ১৫ মাইল গিয়াছে। এই স্থানের পরিসর সাধারণতঃ কম। এখান হইতে গঙ্গার ভাটিতে উজান স্থানের ন্যায় নৌকা বেশী যাতায়াত করে না। ইহার কারণ এই যে ঢাকা, লক্ষ্মীপুর, অথবা চট্টগ্রাম যাত্রী অধিকাংশ নৌকাই জাফরগঞ্জের নিকটের খাল ভাটিদিয়া অগ্রসর হয়।

(১) এই গ্রাম এইক্ষণে গোয়ালন্দের ৭।৮ মাইল উপরে ব্রহ্মপুত্র নদের পূর্ব্ব পারে অবস্থিত।

(২) সম্ভবতঃ এই খাল দিয়া পূর্ব্বে ব্রহ্মপুত্র প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে। ইহা বোধ হয় "কার্গুসন" লিখিত জিনাই নদী।

এইক্ষণে আমরা গতবারের স্থান হইতে অনুমান ২২ মাইল জরিপ করিয়াছি। আমাদের কিঞ্চিদধিক পঞ্চাশটী গ্রাম অতিক্রম করিতে হইয়াছে। ঐ সকল গ্রাম অতিশয় ক্ষুদ্র। এই সময়ে দেশের অবস্থা বর্ণন করা অসম্ভব, কারণ এখন দেশের অধিকাংশই জলমগ্ন। যাহা হউক,নদীর তীরগুলি খুব উচ্চ এবং তাহার অনেক স্থানে তুলা জন্মিয়াছে ; কিন্তু অধিবাসীবর্গের যে পরিমাণ ধান্যের আবশ্যক তদপেক্ষা অধিক ধান্য জন্মিয়াছিল বলিয়া অনুমান হয় না।

৪ঠা বৈকালে উত্তর পূর্ব্বদিক্ হইতে সামান্য বায়ু প্রবাহিত হইতেছিল, এইকালে ঐদিক হইতে বাতাস প্রবাহিত হওয়ার বিষয় আমি এই প্রথম লক্ষ্য করিলাম।

৭ই প্রাতে বাতাসের অবস্থা ভয়াবহ বিবেচনা করিয়া এবং বায়ু পূর্ব্বদিক হইতে ক্রমশঃ অধিকতর বেগে প্রবা-হিত হইতেছে দেখিয়া আমি নৌকাগুলি একটী নিরাপদ স্থানে রাখা সঙ্গত বোধ করিলাম, এই জন্য জাফরগঞ্জের খালের বিপরীত দিক অবস্থিত দেওয়ালী খালে প্রবেশ করিলাম। ঐ খালে এখন চারি পাঁচ হাত জল আছে। রাত্রি এই স্থানেই যাপন করিলাম। প্রাতঃকালে আকাশ পরিষ্কার হইয়া গেল।

৭ই হইতে ১৩ই পর্য্যন্ত আকাশের অবস্থা পরিবর্ত্তন-শীল। বাতাস প্রায়শঃ নির্ম্মল, মধ্যে মধ্যে দক্ষিণ পূর্ব্বদিক হইতে বৃষ্টি ও প্রবল বায়ু বহিতেছিল।

৮ই তারিখ দক্ষিণদিকের সুদীর্ঘ বাঁকের জরিপ শেষ করিলাম। বাঁকের মাথায় একটী বড় চড়া দেখা গেল ; নদী ইহার পর দক্ষিণ পূর্ব্ব দিকে হাজিগঞ্জ অভিমুখে অগ্রসর হইয়াছে।

১২ই তারিখ উপরিউক্ত বড় চড়ার (বিনেতিচর) এবং উহার বিপরীতদিকে নদীতীরের জরিপ শেষ করিলাম।

বিনেতিচর দৈর্ঘ্যে অনুমান ৫ মাইল প্রস্থে প্রায় দুই মাইল। ইহা উত্তর পশ্চিম উত্তর এবং দক্ষিণ পূর্ব্ব দক্ষিণভাবে অবস্থিত। ইহার উপর এগারটী ক্ষুদ্রগ্রাম অবস্থিত কিন্তু একটীও বৃক্ষ নাই। জমি নিচু বলিয়া

অধিকাংশ স্থলেই ধান্য বপন করা হইয়াছে, এইরূপ অন্ততঃ সাড়ে তিন বর্গমাইল পরিমিত স্থানে ধান্য জন্মিয়াছে। নদীর যে শাখা ইহার উত্তর দিক দিয়া প্রবাহিত, তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা সোজা পথ এবং সেই পথ দিয়াই সাধারণতঃ নৌকাগুলি যাতায়াত করে। ইহা প্রস্থে প্রায় এক মাইল এবং এখানে স্রোত অতিশয় প্রবল। দক্ষিণদিকের শাখা (১) প্রস্থে অনুমান ¾ মাইল এখানে কতকগুলি বালুকাময় চড়া আছে।

দ্বীপের বিপরীতদিগের নদীতীরে অধিকাংশ স্থলেই ধান্য জন্মিয়াছে। নদী তীরে অনেকগুলি গ্রাম আছে।

১২ই তারিখ বিনেতি দ্বীপের নিকট রামচন্দ্রপুর নামক স্থানে আমরা অবস্থিতি করিতেছি।

১৩ই বায়ুর গতি স্থির হইতে লাগিল, অদ্য হইতে ২৬শে পর্য্যন্ত আকাশ বেশ পরিষ্কার ছিল। দক্ষিণ দিক হইতে মৃদুমন্দ বায়ু প্রবাহিত হইতেছিল, আকাশের অবস্থা সাধারণতঃ অতিশয় পরিষ্কার কেবল ২১শে প্রাতঃকাল কুজ্ঝটীকাবৃত ছিল।

বিনেতি দ্বীপের দক্ষিণ পূর্ব্ব দিক হইতে নদী প্রায় সোজা দক্ষিণ পূর্ব্ব পূর্ব্বদিকে প্রায় ১৭ মাইল অগ্রসর হইয়াছে। এখানে প্রস্থে—¾ মাইল হইতে ১½ মাইল পর্য্যন্ত—বিনেতি দ্বীপের প্রান্ত হইতে ৫ মাইল পর্য্যন্ত, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ এবং বালুকাময় চড়া আছে। নৌকার পক্ষে এই স্থানে নদী উত্তীর্ণ হওয়া বিপজ্জনক।

১৩ই একটী ছোট খালের মাথায় আসিয়া পৌঁছিলাম, এই খালটি রামচন্দ্রপুর নামক স্থানে নদীর দক্ষিণ দিক হইতে বাহির হইয়া আড়াই মাইল ভাটিতে কালীকাপুর হইতে বহির্গত খালে পড়িয়া হাজিগঞ্জের দিকে অগ্রসর হইয়াছে। এইখানে সারা বৎসর নৌকা যাতায়াত করিতে পারে। (২) অদ্য লোক সকল একত্র করিলাম এবং সিপাহী প্রভৃতিকে কার্য্য সম্বন্ধীয় শিক্ষা দান করিলাম।

১৪ই রামপুরে অবস্থান। ১৫ই হাজিগঞ্জ খালের মুখ পর্য্যন্ত জরিপ হইল। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, কালিকাপুরে যে খাল বাহির হইয়াছে, সেই খাল আর এই খাল একই। হাজিগঞ্জ একটী প্রসিদ্ধ গ্রাম, কারণ উহা কলিকাতা হইতে ঢাকা যাইবার পথে অবস্থিত একটী প্রধান আড্ডা। এজন্য গ্রামের প্রকৃত অবস্থান নিরূপণ করিবার উদ্দেশ্যে আমি ঐ খাল জরিপ করা প্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ করিলাম।

খালের শাখার ২॥ মাইল উপরে বড় নদীর দক্ষিণ অথবা দক্ষিণ পশ্চিম তীর হইতে স্থলপথে এক মাইলের মধ্যে এই গ্রাম অবস্থিত। হাজিগঞ্জ ঢাকা হইতে পশ্চিম দক্ষিণ দিকে ৩১মাইল দূরবর্ত্তী। খালের পশ্চিম দিকে একটী ক্ষুদ্র স্থানের উপর এই স্থান অবস্থিত। লোকের বাস ৮০ ঘরের অধিক নয়, এই স্থানে একটী ক্ষুদ্র বাজার আছে। ছয়শত মণ মাল ধরে এইরূপ নৌকা এইখাল দিয়া গ্রীষ্মকালে যাইতে পারে, ইহা প্রস্থে ½ মাইল।

জলঙ্গী নদী অতিক্রম করিবার পর এপর্য্যন্ত যত স্থান দেখিয়াছি, তন্মধ্যে বিনেতি হইতে এই স্থান পর্য্যন্ত নদীর দক্ষিণ পার অতিশয় রমণীয়। নদীরদিকে প্রসারিত অনেক গুলি মাঠ, ইতস্ততঃ অবস্থিত, কয়েকটী ঘনসন্নিবিষ্ট বৃক্ষশ্রেণী এবং কয়েকটী গ্রাম থাকায় এই স্থানকে রমণীয় করিয়া তুলিয়াছে। অদ্যরাত্রিতে দুইজন হরকরার মারফত গবর্ণরের নিকট হইতে একখানা চিঠী পাইয়া তৎক্ষণাৎ তাহার উত্তর প্রদান করিলাম। পত্রের উত্তরের সহিত সাতপুর হইতে এই স্থানপর্য্যন্ত নদীর এক খানা নকসা প্রেরণ করিলাম। মিঃ ভেন্সিটার্ট নদীর উভয় পার্শ্বের জরিপ সম্বন্ধে আমার মতের অনুমোদন করিয়াছিলেন; নদীর দুই দিক জরিপ করিতে হইবে, কি জলঙ্গী হইতে সাতপুর পর্য্যন্ত যেরূপ করা হইয়াছে সেইরূপ একদিক জরিপ করিতে হইবে, এ বিষয়ে, ইহার পূর্ব্বে পরিষ্কার কিছু বলেননাই।

১৬ই তারিখ কোচার পুরে অবস্থান। (১) ১৮ই তারিখ নদীর উত্তর দিকে এবং হাজিগঞ্জের ৯ মাইল

(১) ব্রহ্মপুত্র নদ আসিয়া পড়াতে লেখকের সময় হইতে এই শাখার গতি এখন বহু পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, কিন্তু সাধারণ গতি-ঠিকই আছে। বড় চড়গুলি এখনও দেখিতে পাওয়া যায়।

(২) এই খাল রেনেলের ম্যাপে প্রদর্শিত হইয়াছে বলিয়া বোধহয় না।

(১) হাজীগঞ্জের বিপরীতদিকে গঙ্গার বামপারে অবস্থিত।

ভাটীতে নবাবগঞ্জের খালের মাথায় আসিলাম। এই খাল প্রস্থে অনুমান দুইশত গজ। সারা বৎসর নৌকা চলিতে পারে, হাজিগঞ্জ হইতে ঢাকা, লক্ষ্মীপুর প্রভৃতি স্থানে যাইবার এই সর্ব্বাপেক্ষা সোজা পথ। ফিরিঙ্গী বাজারের উপরে ইহা ইছামতী অথবা ধলেশ্বরীর সহিত মিলিত হইয়াছে। ইহা হইতে কতকগুলি ক্ষুদ্র শাখা বহির্গত হইয়াছে।

নদীর উত্তর দিকে বির্নোত দ্বীপ হইতে এইস্থান পর্য্যন্ত বেশ মনুষ্যের বসতি আছে। এখানে ধান ও তুলা জন্মিয়াছে। হাজিগঞ্জের বিপরীত দিকে একটী রমণীয় স্থানে মৌসুদাবাদ (২) নামক একটী বড় গ্রাম বা পরগণায় উপস্থিত হইলাম।

নবাবগঞ্জ খাল নদীর আরও দক্ষিণ দিকে গিয়াছে এবং কয়েকটী বড় দ্বীপের দ্বারা কএকটী শাখায় বিভক্ত হইয়াছে। ঐ সকল দ্বীপ জঙ্গলে পরিপূর্ণ তথায় ব্যঘ্রাদিও আছে।

২০শে তারিখ একটী প্রসস্ত নাতিগভীর খালের মুখ পারহইলাম। ঐ খালটী নবাবগঞ্জ খালের একটী শাখা। উহা ৬ মাইল ভাটীতে চরকামার নামক স্থানে নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। ইহার চতুস্পার্শ্বে কোন কৃষি-কর্ম্ম দেখাযায় না। ২১শে প্রাতে এক ঘণ্টা পর্য্যন্তও অতিশয় কুজ্ঝটীকাছিল, তৎপর আমরা গোহালারকান্দী হইতে ১৪ মাইল দক্ষিণ পূর্ব্বে রাজনগরের দুইটী মন্দির দেখিতে পাইলাম।

শ্রীআনন্দনাথ রায়।

(২) বর্ত্তমান মৌসুদাবাদ এক্ষণে ফরিদপুরের পরপারে অবস্থিত।

আলোচনা

(১)

শঙ্করদর্শনের সমালোচনার উত্তরের প্রত্যুত্তর। *

আমি নগেন্দ্রকে মিডিয়ম করিয়া শঙ্করদর্শনের সমালোচনা লিখিয়াছিলাম। উহা ঢাকার 'সম্মিলন' পত্রিকায় প্রকাশ হইয়াছে। সম্পাদক মহাশয় উহার নীচে নীচে কিছু কিছু উত্তর লিখিয়া দিয়াছেন। আমি মনে করিয়াছিলাম যে, আরও প্রতিবাদ আসিলে একেবারে সকল কথার প্রত্যুত্তর দিব। কিন্তু তাহার প্রয়োজন দেখিতেছি না। এখন সম্পাদক মহাশয়ের কয়েকটি কথার উত্তর দি; তারপর যদি অন্য প্রতিবাদ প্রকাশ হয়, তাহার উত্তর দেওয়া যাইবে।

সম্পাদক মহাশয় প্রথম এই কথা বলিয়াছেন যে, মানুষ পরব্রহ্মের উপাসনা প্রকৃত ভাবে করিতে পারেনা বটে, কিন্তু ব্যবহারিক অবস্থায় তাহা সম্ভব। এ কথার উত্তরে বলি যে, শঙ্কর ব্যবহারিক অবস্থা বলিয়া একটি অবস্থা ধরিয়া লইয়াছেন। উহার কোন প্রমাণ দেন নাই। ব্যবহারিক অবস্থা বলিয়া যে একটি অবস্থা আছে তাহার প্রমাণ কি? শঙ্করের মায়াবাদ স্বীকার করিলে ব্যবহারিক অবস্থা বলিয়া একটি অবস্থা অবশ্য মানিয়া লইতে হয়। কিন্তু যদি মায়াবাদ স্বীকার না করা যায়, তাহা হইলে ব্যবহারিক অবস্থাও স্বীকার করা যায় না। আমরা মায়াবাদ স্বীকার করি না। এরূপ স্থলে ব্যবহারিক অবস্থার কথা বলা বৃথা। অগ্রে প্রমাণ করিতে

* কোন পরলোকবাসী আত্মা আমাকে মিডিয়ম করিয়া শঙ্করদর্শনের সমালোচনা লিখিয়াছিলেন। "ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন" পত্রিকায় উহা প্রকাশিত হয়। উহার সম্পাদক মহাশয় উক্ত প্রবন্ধের নীচে নীচে কয়েকটি কথায় উহার সমালোচনা করেন। আমি উহা সেই পরলোকবাসী আত্মাকে দেখাইলাম। তিনি ঐ সকল কথার প্রত্যুত্তর দিয়া আর একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। ঐ দ্বিতীয় প্রবন্ধটি "ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলনের" পাঠকবর্গের জন্য দিয়ে প্রকাশিত হইল।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

হইবে যে, মায়া বলিয়া কিছু আছে। যদি প্রমাণ হয়, তাহা হইলেই ব্যবহারিক অবস্থা মানিতে হয়।

মায়াবাদের প্রমাণ কি? একটি প্রমাণ এই যে, পরব্রহ্ম যখন নিষ্ক্রিয়, তখন জগৎ সৃষ্টি অসম্ভব। এই জন্য অসম্ভব যে, যিনি নিষ্ক্রিয়, তিনি কেমন করিয়া সৃষ্টি করিবেন? এখন প্রশ্ন এই যে, পরব্রহ্ম বাস্তবিক নিষ্ক্রিয় কিনা? আমি বলি তাঁহাকে নিষ্ক্রিয় বলা উচিত নহে। সম্পাদক মহাশয় তাহাকে নিষ্ক্রিয় বলেন; কিন্তু ভিন্ন অর্থে নিষ্ক্রিয় বলেন। পরব্রহ্মের কোন উদ্দেশ্য থাকা সম্ভব নহে। যিনি পূর্ণ, কেমন করিয়া তাঁহার উদ্দেশ্য থাকিবে? যিনি পূর্ণ, তাঁহার অভাব নাই। তাঁহাতে সকলই পূর্ণভাবে বর্ত্তমান। সুতরাং তাঁহার কোন অভাব নাই; এবং সেই জন্যই তাঁহার কোন উদ্দেশ্য থাকিতে পারে না। উদ্দেশ্য থাকিতে পারে না বলিয়াই তাঁহার ক্রিয়া নাই; এবং সেই জন্যই তিনি নিষ্ক্রিয়। নিষ্ক্রিয় যদি হইলেন, তবে জগৎ কি প্রকারে হইল? ইহারই উত্তর এই যে, ইহা মায়া। এখন কথা এই যে, মায়া কোথা হইতে আসিল? শঙ্কর ইহার পরিষ্কার উত্তর দিতে গিয়া বড় গোল করিয়াছেন। একবার বলিলেন, তিনি নিষ্ক্রিয়; আবার বলিতেছেন যে, তাঁহারই মায়াশক্তি দ্বারা ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্ট হইয়াছে। এই মায়াশক্তি তাঁহার শক্তি। তিনি মায়ার লক্ষণা করিয়াছেন, "অব্যক্তনাম্নী পরমেশ শক্তি।"

এখন কথা এই যে, একবার বলা হইল যে, নিষ্ক্রিয়; আবার প্রকারান্তরে বলা হইতেছে যে, তাহারই অব্যক্ত শক্তিদ্বারা এই ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্ট হইয়াছে। এই দুটি কথার মধ্যে পরস্পর অসঙ্গতি দোষ দৃষ্ট হইতেছনা কি? যদি বল, তিনি সৃষ্টি করেন নাই, মায়াশক্তি সৃষ্টি করিয়াছে; তাহা হইলে কি বলা হইল? আমি যদি বলি, আমি এ কাজ করি নাই, আমার একটি অব্যক্ত শক্তি আছে সেই করিয়াছে; তাহা হইলে কি বলা হয়? প্রকারান্তরে কি এই বলা হয় না যে, উহা আমারই কার্য্য?

এস্থলে আর একটি কথা এই উপস্থিত হইতেছে যে, এই মায়াশক্তি কাহার শক্তি? অবশ্যই বলিতে হইবে যে, উহা ব্রহ্মেরই শক্তি। যদি ব্রহ্মেরই শক্তি হয়, তবে ব্রহ্মের কার্য্য এ জগৎ নহে, তাঁহার শক্তির কার্য্য। এ কেমন কথা?

এ স্থলে দেখিতেছি যে, ব্রহ্মের কার্য্য ও তাঁহার শক্তির কার্য্য, এ দুই পৃথক নহে। তবে কথা এই যে, যদি তিনি নিষ্ক্রিয় না হইলেন, তাহা হইলে কেমন করিয়া বলিব যে, এ জগৎ ব্রহ্মের কার্য্য নহে, মায়ার কার্য্য? মায়াবাদ সম্বন্ধে এই পর্য্যন্ত।

এখন সম্পাদক মহাশয়ের অন্যান্য কথার উত্তর দিতে প্রবৃত্ত হই। আর একটি কথা এই যে, অনন্তের জ্ঞান মানুষের আছে কি না? সে বিষয়ে যাহা বলা হইয়াছে, তাহাই যথেষ্ট। সম্পাদক মহাশয় যদি সেই টুকু মনোযোগের সহিত পাঠ করিতেন, তাহা হইলে বুঝিতে পারিতেন যে, মানুষের অনন্তের জ্ঞান আছে।

ইহা তো নিশ্চয় যে, মানুষের পরিমিতের জ্ঞান আছে। তাহা হইলে ইহাও নিশ্চয় যে, মানুষের অনন্তের জ্ঞান আছে। কেন না, এই দুই আপেক্ষিক জ্ঞান। এ স্থলে তিনি বলিতে পারেন যে, এই দুটি আপেক্ষিক শব্দ। আপেক্ষিক শব্দ নহে; আপেক্ষিক জ্ঞান। দর্শন-শাস্ত্রে কোথাও আপেক্ষিক শব্দ, এমন কথা নাই। দর্শন শাস্ত্রের বিষয় জ্ঞান। জ্ঞানের আলোচনাই দর্শনের উদ্দেশ্য। সুতরাং আপেক্ষিক শব্দ নহে, আপেক্ষিক জ্ঞান। আপেক্ষিক জ্ঞানের অনেকগুলি দৃষ্টান্ত দিয়াছি। সে সকলের পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। এখন কথা এই যে, মানুষের যদি অনন্তের জ্ঞান না থাকিত, তাহা হইলে, পরিমিতের জ্ঞানও থাকিত না। যেমন, কাহারও যদি ভালর জ্ঞান না থাকে, তাহা হইলে, তাহার মন্দের জ্ঞানও থাকিতে পারে না। অধিক দৃষ্টান্ত নিষ্প্রয়োজন। ভালর জ্ঞান আছে বলিয়াই মন্দের জ্ঞান আছে। সেই-রূপ অনন্তের জ্ঞান না থাকিলে, পরিমিতেরও জ্ঞান থাকিতে পারে না। এ সকল কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি, সম্পাদক মহাশয় সে বিষয়ে মনোযোগ করিলেই বুঝিতে পারিতেন।

তারপর, আর একটি কথা এই যে, সম্পাদক মহাশয় বলিতেছেন, "মালব্রাঙ্ক, ডেকার্ট, ব্লার্ক্ষে প্রভৃতি দার্শনিকগণ বহু পূর্ব্বে এরূপ যুক্তি প্রয়োগ করিয়া-

ছেন; উহার পুনরাবৃত্তি করিয়া সবিশেষ লাভ নাই।" তিনি কয়েকটি নাম দিয়াছেন। যথা মালব্রাঞ্চ, ডেকার্ট প্রভৃতি। আমি যতদূর জানি, সকলেই যে idealism সমর্থন করেন, এমন নয়। তবে বর্কলি অবশ্য উক্ত মত সমর্থন করেন। এখন বক্তব্য এই যে, বর্কলির idealism এবং জর্ম্মান দেশীয় দার্শনিকদিগের idealism অনেক ভিন্ন। সে ভিন্নতা কি? তাহা এখন প্রদর্শন করিতে চাই না। তবে এই কথা বলি যে, জর্ম্মান দার্শনিকদিগের মতই যুক্তি সঙ্গত। জর্ম্মান দার্শনিকদিগের মধ্যে আমি হিগেলকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনে করি। সেই জন্য হিগেলের কথাই আমি বিশেষ করিয়া বলিয়াছি।

এখন কেহ বলিতে পারেন যে যাহা বলিয়াছি, তাহা হিগেলের মত নয়, শঙ্করের মতও নয়। এরূপ বলিবার কারণ আছে। কারণ এই যে, আমি যে সকল যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছি, তাহা আমার, অথবা অন্য দার্শনিকের। কেহ মনে করিতে পারেন যে, ঐ যুক্তি গুলিও হিগেল বা শঙ্করের। এরূপ ভুল হওয়া সম্ভব। আমি জানিতে পারিয়াছি যে, এরূপ ভুল কোন ব্যক্তির হইয়াছে। যুক্তিগুলি শঙ্করের নহে, হিগেলেরও নহে।

শঙ্করের মত এই যে, সকলই ব্রহ্ম। ব্রহ্ম ছাড়া কিছু নাই। এমত আমি মানি। কিন্তু ইহার মধ্যে একটি কথা আছে। কথাটি এই যে, এই অদ্বৈতবাদের মধ্যে দ্বৈত রহিয়াছে। তাহা কিরূপে সম্ভব হইয়াছে, তাহা আমি দেখাইয়াছি। সে সকল কথার কেহ উত্তর দেন নাই। যদি কেহ দেন, আমি তাহার উত্তর দিব।

এস্থলে একটি ভুল স্বীকার করিতে হইতেছে। সে ভুলটি যে কেমন করিয়া হইল, তাহা বুঝিতে পারি না। সকলেই জানেন যে, হিগেল শঙ্করের পরবর্ত্তী। আমি জানি, আমার মিডিয়মও জানেন। তবে এ ভুল কেমন করিয়া হইল, বুঝিতে পারিতেছি না। যাহা হউক, এ ভুল স্বীকার করিতেছি।

এখন সম্পাদক মহাশয়ের নিকট নিবেদন এই যে,আমি যাহা বলিলাম, তাহা অনুগ্রহ করিয়া একবার মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়া "সম্মিলন" পত্রিকায় প্রকাশ করেন। যদি অন্য কেহ ইহার অন্য প্রতিবাদ প্রেরণ করেন, এবং উহা 'সম্মিলন' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, আমি উহার উত্তর দিব। অদ্য এই পর্য্যন্ত।

কোন পরোলোকবাসী আত্মা।

(২)

একটী সংশয়।

গত কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণের "ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন" পত্রিকায় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য সুপ্রসিদ্ধ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় পরলোকগত ৺ রাজা রামমোহন রায়ের "শঙ্কর দর্শনের সমালোচনা" প্রকাশ করিয়াছেন। এই সমালোচনাটী নাকি রাজা রামমোহন নগেন্দ্র বাবুকে মিডিয়াম করিয়া পরলোক হইতে প্রেরণ করিয়াছেন। আমি নিজে পরলোকে বিশ্বাসী, নগেন্দ্র বাবুর কথাও অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ দেখি না; এখন এই প্রবন্ধ পাঠ করিয়া আমার মনে যে একটী গুরুতর সংশয় উপস্থিত হইয়াছে, তাহা নিম্নে বিবৃত করিতেছি।

কথা এই, ৺ রাজা রামমোহন রায় ব্রহ্মদর্শন লাভ করিয়াছেন কি না?

রাজা রামমোহন রায় ব্রাহ্মসমাজের প্রবর্ত্তক এবং সর্ব্ব প্রধান আচার্য্য। তাঁহার সম্বন্ধে আমার এইরূপ প্রশ্ন উত্থাপন করা ধৃষ্টতা মাত্র। কিন্তু নগেন্দ্র বাবু তাঁহাকে সাধারণের সমক্ষে যে ভাবে উপস্থিত করিয়াছেন তাহাতে এরূপ প্রশ্ন স্বতঃই মনে আসে। আপনারা আমার ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করিবেন।

শ্রুতি বলেন, ব্রহ্মদর্শন হইলে মুক্তি লাভ হয়। সেই মুক্তি কাহাকে বলে?

"ভিদ্যতে হৃদয় গ্রন্থিঃ
ছিদ্যন্তে সর্ব্ব সংশয়াঃ
ক্ষীয়ন্তে যাস্য কর্ম্মাণি
তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে।"

শ্রুতি।

ব্রহ্মদর্শন হইলে মানুষের হৃদয় গ্রন্থি ছিন্ন হয়, সর্ব্ব সংশয় বিদূরিত হয়, সমস্ত কর্ম্মক্ষয় হয়। ইহারই নাম মুক্তি।

"যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রেঽ
স্তং গচ্ছন্তি নাম রূপে বিহায়।
তথা বিদ্বান্নাম রূপাদ্ বিমুক্তঃ
পরাৎপরং পুরুষমুপৈতি দিব্যং॥"

শ্রুতি,

যেমন নদী সকল সমুদ্রে পতিত হইয়া পৃথক্ পৃথক্ নাম ও পৃথক্ পৃথক্ রূপ পরিত্যাগ করিয়া সেই সমুদ্রের সত্তায় বিলীন হইয়া যায়, সেইরূপ যাঁহার ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইয়াছে তিনি নিজের নামরূপ মূলক পৃথক্ অস্তিত্ব শূন্য হইয়া সেই পরাৎপর দিব্য পরম পুরুষের সত্তায় লীন হন।

ইহাই শ্রুতির মতে নির্ব্বাণ মুক্তি। ব্রাহ্মগণ মুক্তির অর্থ এরূপ বুঝেন কি না নিশ্চয় জানি না। তাঁহাদের লেখা পড়িয়া যতদূর বুঝা যায়, তাহাতে বোধ হয়, তাঁহাদের মুক্তির অর্থ কতকটা খ্রীষ্টধর্ম্মের Salvationএর মত। সে মুক্তিতে ও ঈশ্বর সামীপ্য আছে। এখন কথা হইতেছে, রাজা রামমোহন রায়ের ঈশ্বর সামীপ্য ঘটিয়াছে কি?

একথা অবশ্যই স্বীকার্য্য যে ঈশ্বর সামীপ্য ঘটিলে মানবাত্মার অপরিসীম উন্নতি লাভ হয়। সেই জ্ঞান স্বরূপের সমীপবর্ত্তী হইলে মানবের সর্ব্বপ্রকার অজ্ঞতা, সন্দেহ, ভ্রান্তি তিরোহিত হয়। সেই আনন্দ ঘন চিন্ময় পুরুষের সংসর্গে মানবাত্মা নিরন্তর আনন্দ ময় অমৃত রসে পরিপূর্ণ হয়। যদি তাহা না হইবে, তবে ব্রহ্মলাভের কোনই অর্থ থাকে না।

এখন কথা হইতেছে, রাজা রামমোহন রায় সেই "আনন্দ রূপমমৃতং যদ্ বিভাতি" পরম পুরুষের সামীপ্য লাভ করিলে, তুচ্ছ শঙ্কর দর্শনের সমালোচনার জন্য ও তাহা নগেন্দ্র বাবুর দ্বারা মাসিক পত্রিকায় প্রেরণের জন্য তাঁহার প্রবৃত্তি হইবে কি? যে আনন্দ ময়ের কণা মাত্র আনন্দের আস্বাদ পাইলে মানব সংসার ভুলিয়া পাগল হইয়া যায়, রাজা রামমোহন সেই আনন্দময়কে ক্ষণ কালের জন্য ও ভুলিতে পারেন কি? যে সত্যস্বরূপ জ্ঞান স্বরূপের সম্মুখীন হইলে সর্ব্বসংশয় বিদূরিত হইয়া পূর্ণ জ্ঞানের উদয় হয়, রাজা রামমোহন তাঁহাকে লাভ করিয়াও সংশয় এবং ভ্রান্তির হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিলেন না কেন? তিনি শঙ্কর দর্শনের যেরূপ সমালোচনা করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার পূর্ণজ্ঞান লাভ হওয়ার কোনই নিদর্শন নাই, বরং স্থানে স্থানে তাঁহার এরূপ ভ্রম হইয়াছে যে সম্পাদক মহাশয় স্বয়ং তাহা পাদটীকায় সংশোধন না করিয়া পারেন নাই।

সুতরাং প্রবন্ধ পড়িতে পড়িতে মনে হয়, ইহাই কি মুক্তপুরুষ রাজা রামমোহন রায়ের রচনা? অথবা রাজা রামমোহন কি যথার্থ-ই ভ্রম দর্শন লাভ করিয়াছেন?

ইহার সঙ্গে সঙ্গে আরও একটী কথা মনে আসে, ব্রাহ্মসমাজে প্রচলিত নিরাকার উপাসনার তবে এই কি পরিণাম? রাজা রামমোহন রায়ের ন্যায় মহাপুরুষ, যখন নিরাকার উপাসনা করিয়া পরলোকে গিয়া সত্য স্বরূপ ও জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মের দর্শন লাভ করিতে পারেন নাই, তখন সেই পথের পথিক সাধারণ উপাসক মণ্ডলীর আশা কোথায়? আমার মনে হয়, নগেন্দ্র বাবু ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচারক হইয়াও এইরূপ প্রবন্ধ প্রকাশ দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্মের বিশেষ হানি করিতেছেন।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ।

শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত। *

জাতীয় গৌরবস্তম্ভ জাতীয় ইতিহাস। জাতীয় ইতিহাসের অভাব জাতীয় দুর্ভাগ্য। পূর্ব্বপুরুষের কীর্ত্তিকলাপ ঘোষণা করিবার জন্য জাতীয় ইতিহাস লেখকের অভাব নিতান্তই জাতীয় দুর্ভাগ্যের বিষয়।

যে জাতি এক দিবস সমুদ্রের বক্ষেঃ পদাঘাত করিয়া ভারত সাগরের প্রবমান দ্বীপপুঞ্জ সমূহে বিজয়ী পতাকা উড্ডীন করিবার জন্য ধাবিত হইয়াছিল, যে জাতি এক

* শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত। পূর্ব্বাংশ। শ্রীঅচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি প্রণীত।

দিবস, পূর্ব্ব সাগরের তীর হইতে পশ্চিম সাগরের তীর পর্য্যন্তবিজয়ভেরী নিনাদিত করিয়াছিলেন,—যে জাতি দীর্ঘকাল বস্ত্র বিতরণ করিয়া জগদ্বাসী মানবগণের লজ্জা নিবারণ করিয়াছিলেন, সে জাতির জাতীয় ইতিহাস নাই;—যে জাতি হইতে রঘুনাথের ন্যায় নৈয়ায়িক চূড়ামণির উদ্ভব, যে জাতি হইতে শ্রীচৈতন্যদেব ও রামকৃষ্ণের ন্যায় মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সেই জাতির জাতীয় ইতিহাস নাই, ইহা অপেক্ষা দুর্ভাগ্যের বিষয় আর কি আছে।

ভাষা জাতীয় উন্নতীর মূল। ব্রিটীস শাসনে বাঙ্গালা ভাষার যেরূপ উন্নতী সাধিত হইয়াছে, তাহা চিন্তা করিলে হৃদয় আনন্দরশে আপ্লুত হইয়া থাকে। বাঙ্গালা ভাষা স্বীয় ভগিনীগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করিয়াছেন। ভারতের অন্য কোন প্রচলিত ভাষা বাঙ্গালার ন্যায় গৌরবান্বিত হইতে পারে নাই। ভারতের "লিঙ্গোফ্রেঙ্কা" হিন্দি বাঙ্গালার পশ্চাতে পড়িয়াছেন।

বাঙ্গালার জাতীয় ইতিহাস রচনার সময় অতি নিকটবর্ত্তী বলিয়া বোধ হইতেছে; কিন্তু প্রাদেশীক ইতিহাস সংগৃহীত না হইলে বাঙ্গালার ইতিহাস সঙ্কলন অতি দুরুহ বলিয়া বোধ হয়। ইতঃপূর্ব্বে ময়মনসিংহ ও সেরপুরের ইতিহাস পাঠ করিয়া আমরা প্রীতিলাভ করিয়াছিলাম। অদ্য আর একখানা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর প্রাদেশীক ইতিহাস আমাদের হস্তগত হইয়াছে। তাহা—"শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত।" এই গ্রন্থপ্রণেতা শ্রীযুত অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি মহাশয় সাহিত্যিক সমাজে অপরিচিত নহেন। পণ্ডিত শ্রীযুত পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় অচ্যুতচরণ বাবুর বিশেষ সাহায্যকারী। ইঁহাদের উভয়ের যত্নে এই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ইতিহাসখানা লোকলোচনের সম্মুখবর্ত্তী হইয়াছে। ইঁহারা উভয়ই আমাদের ধন্যবাদের পাত্র।

শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তকে আদর্শ করিয়া বাঙ্গালার প্রত্যেক জেলার ইতিহাস রচনা করা এক্ষণ আমাদের কর্ত্তব্য হইয়াছে। প্রত্যেক জেলাবাসী কয়েকজন শিক্ষিত ভদ্রলোক এই কার্য্যে যত্নবান হইলে আমরা বিশেষ প্রীতিলাভ করিব। বঙ্গবাসী তাঁহাদের নিকট ঋণজালে আবদ্ধ থাকিবে।

অধুনা শ্রীহট্ট জেলার পরিমাণ ৫৪৪৩ বর্গ মাইল। কিন্তু এতন্মধ্যে প্রায় ২০০০ বর্গ মাইল ত্রিপুরা রাজ্য হইতে গৃহীত। ইহার অধিকাংশ শ্রীহট্টের মোসলমান শাসনকর্ত্তাগণ ত্রিপুরেশ্বর হইতে কাড়িয়া লইয়াছেন। ব্রিটীস শাসনকালেও কিয়দংশ ত্রিপুরা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে।

উক্ত গ্রন্থের ২ ভাঃ ১মঃ খঃ ৪র্থ অধ্যায় এবং ৫ অধ্যায়ে প্রাচীন ত্রিপুরেশ্বরের প্রদত্ত দুইখানি তাম্রশাসন মুদ্রিত হইয়াছে। আমাদের বিবেচনায় উভয় তাম্রশাসনই জাল। বোধ হয় আসল তাম্রশাসন খোয়া জাওয়ার পর কোন অজ্ঞ ব্রাহ্মণ দ্বারা এই জাল শাসন পত্র প্রস্তুত হইয়াছে। প্রাচীন ত্রিপুরেশ্বরদিগের কোন সংস্কৃত তাম্রশাসন কিম্বা বাঙ্গালা তাম্রশাসন এই প্রণালীতে লিখিত হয় নাই। খৃষ্ট উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে কুমিল্লার নিকটবর্ত্তী ময়নামতী পর্ব্বত মধ্যে শকাব্দের দ্বাদশ শতাব্দীর একখণ্ড তাম্রশাসন প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। তাহা প্রথমতঃ Asiatic Researches পত্রিকায়, তৎপর কোলব্রোক সাহেবের প্রবন্ধ সংগ্রহে মুদ্রিত হইয়াছে। তদনন্তর চট্টগ্রামাধিপতি দামোদরদেবের ১১৬৫ শকাব্দের তাম্রশাসন ১৮০৪ খৃষ্টাব্দের Journal of the Asiatic Society of Bengal পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। তৎপর শ্রীহট্ট হইতে প্রাপ্ত দুইখণ্ড তাম্রশাসনের মর্ম্ম ও পাঠ ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র বাহাদুর এসিয়াটীক সোসাইটীর প্রসিডিং পত্রে প্রকাশ করেন। তৎসম্বন্ধে মিত্র বাহাদুরে ভ্রম প্রদর্শন পূর্ব্বক আমি ভারতী পত্রিকায় "শ্রীহট্টের তাম্রশাসন" শীর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলাম। এই সকল তাম্রশাসনের সহিত জাল প্রসস্তিদ্বারা পাঠের আলোচনা করিলে সহজেই প্রতীত হইবে যে প্রক্ত জাল প্রসস্তি প্রণেতা তাহার জীবনে কখনও প্রকৃত সনন্দ দর্শন করে নাই। এমন কি ৪।৫ শত বৎসরের প্রাচীন বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত তাম্রশাসন দর্শন করিলেও তিনি এরূপ কদর্য্যভাবে সনন্দ রচনা করিতেন না। ২৬১ বৎসরের প্রাচীন বাঙ্গালা তাম্রশাসনের প্রতিলিপি এস্থলে উদ্ধৃত হইল:—

৺ বিষ্ণু।

১।—৭ স্বস্তি—শ্রীশ্রীযুত কল্যাণমাণিক্যদেব বিষম-সমর বিজয়ী মহামহোদয়ি রাজনামাদেশোয়ং

২।—শ্রীকারকোনবর্গে বিরাজতে ইস্তত্‌ পরং রাজ-ধানী হস্তিনাপুর সরকার উদয়পুর পরগণা

৩।—নুরনগর মৌজে বাউরখাড় অজ্জঙ্গলতে সাত দ্রোণ ভূমি ৺ প্রীতে শ্রীমুকুন্দ বিদ্যা

৪।—বাগীশ ভট্টাচার্য্যকে দিলাম ইহা আবাদ করিয়া পুত্র পৌত্রাদিক্রমে ভোগ করিয়া আশীর্ব্বাদ

৫।—করিতে রহুক এহি ভূমির মালখাজানা গয়রহ সমস্ত নিষেধ ইতি শকাব্দা ১৫৭৩ সন ১০৬০ তাং ১৪ মাঘ।

এই জাল সনন্দদ্বয় আধুনিক চিটীদৃষ্টে জালকরা হইয়াছে। কারণ "সমাজ্ঞং" শব্দটী চিটী হইতে গৃহীত। একখণ্ড চিটীর প্রতিলিপি এস্থলে উদ্ধৃত হইল ঃ—

শ্রীগুরু আজ্ঞা।

নং ৭৮৪

চিঠী রুজু—তালুক নন্দকুমার চৌধুরীর ক্রোক তহশীলদার শ্রীদুর্গাশঙ্কর বিশ্বাসকে সমাজ্ঞেয়ং কার্য্যঞ্চ পরং তোমার সঙ্গের মোহরের শ্রীগৌরচন্দ্র চক্রবর্ত্তির কৈফিয়তে প্রকাশ যে উক্ত তালুক মধ্যে সালদটীকাটা খালের জমা গতসন মং ৬৲ ছয়টাকা লইয়াছ ইমসন অন্য কোন ব্যক্তি জমা বেশী করে নাই অতএব লিখা যায় ইমসনই ঐ খালের জমা মং ৬৲ ছয় টাকা শ্রীরা * * * ও রামগতি চন্দ হইতে লইবা অন্য কোন রকমে মজহ * * * * দৌরাত্য না করিবা ইতি সন ১২৬২ ত্রিং—১১ অগ্র * * *

মোকাবেলা শোদ

শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর (চৌধুরী)

(সেরাস্তাদার)

শ্রীযুগলকিশোর দত্ত।

আমাদিগের বিশ্বাস এবম্প্রকার কতগুলি চিটী দৃষ্টে উল্লিখিত জাল "সনন্দ" প্রস্তুত করা হইয়াছে। বিশেষতঃ জাল সনন্দ সমূহে ত্রিপুরেশ্বরের নাম যে ভাবে লিখিত হইয়াছে তাহা অত্যন্ত বিস্ময় জনক।

ত্রিপুরবংশে দুইজন "রত্ন মাণিক্য" রাজ্য শাসন করিয়া গিয়াছেন। ইঁহারা কেহই আপনাকে "আদিরত্ন মাণিক্য" বা "দ্বিতীয় রত্ন মাণিক্য" বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করেন নাই। আদি রত্ন মাণিক্য অবশ্যই জানিতেন না যে, তাঁহার বংশে অন্য এক ব্যক্তি "রত্নমাণিক্য" নাম ধারণ করিবেন। কিন্তু "দ্বিতীয় রত্ন মাণিক্য" অবশ্যই জ্ঞাত ছিলেন যে, তিনি আদি রত্ন মাণিক্যের বংশধর তত্রাচ তিনি সনন্দ প্রভৃতিতে দ্বিতীয় রত্ন মাণিক্য বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করেন নাই। তাঁহার কতকগুলি সনন্দ আমরা দর্শন করিয়াছি। এক খণ্ড সনন্দ হইতে প্রথম পংক্তি উদ্ধৃত করা হইল ঃ—

"৭। স্বস্তি—শ্রীশ্রীযুত রত্নমাণিক্য দেব বিষম সমর বিজয়ী মহামহোদয়ি রাজানামা দেশোয়ং।"

সনন্দ প্রভৃতির অব্দ দ্বারা ইহা কোন্ রত্নমাণিক্য প্রদত্ত তাহা স্থির করা ব্যতীত অন্য উপায় নাই। ধর্ম্ম-মাণিক্য ও বিজয়মাণিক্য সম্বন্ধেও ঐরূপ অবস্থা দৃষ্ট হইতেছে। দ্বিতীয় ধর্ম্মমাণিক্যের কতকগুলি সনন্দ আমরা দর্শন করিয়াছি, তাহাতেও "দ্বিতীয় ধর্ম্মমাণিক্য" এরূপ ব্যবহার নাই। অথচ এই জাল সনন্দ প্রণেতা এমনই বুদ্ধিমান যে তিনি সনন্দের প্রাচীনত্ব অবধারণ করিবার জন্য কিছুমাত্র চিন্তা না করিয়া "ত্রিপুরা পর্ব্বতাধীশঃ শ্রীশ্রীযুক্তাদিধর্ম্মপাঃ।" লিখিয়াছেন। "আদিধর্ম্মপা" এবম্প্রকার শব্দ কখনই তাঁহারা ব্যবহার করেন নাই। "ত্রিপুরা পর্ব্বতাধীশ" এই শব্দও তাঁহারা ব্যবহার করেন নাই। মোগলদিগের সৌভাগ্য সূর্য্য অস্তমিত হওয়ার প্রাক্‌কালে ত্রিপুরেশ্বরগণ ত্রিপুরা, শ্রীহট্ট ও নোয়াখালীর সমতল ক্ষেত্র হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন, কিন্তু এই জাল সনন্দে যে অব্দ প্রদত্ত হইয়াছে, সেই সময়ে তাঁহারা ক্ষুদ্র পর্ব্বতাংশ লইয়া সন্তুষ্ট ছিলেন না। *

* ৺ মহারাজা ঈশানচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুরের মোহর।

* প্রাচীন রাজমালা গ্রন্থে ত্রিপুরা রাজ্যের সীমা এইরূপ লিখিত হইয়াছে ঃ—

ব্রিটীস শাসন কাল হইতে ত্রিপুরেশ্বরগণ Raja of Hill Tippera নামে পরিচিত হইয়াছেন। প্রাচীন ইংরেজি ইতিহাসগুলিতে ত্রিপুরেশ্বর king of Tippera নামে পরিচিত রহিয়াছেন। আদিধর্ম্মমাণিক্য, আদিরত্নমাণিক্য, কিম্বাআদি আদিবিজয়মাণিক্য, এবম্প্রকার ব্যবহার কোন সনন্দে দর্শন করিলে আমরা যেরূপ তাহাকে জাল সনন্দ বলিতে বাধ্য হইব, তদ্রূপ "আদিধর্ম্মপা" দর্শন করত আমরা উল্লিখিত সনন্দকে "ডাহাজাল" বলিতে বাধ্য হইয়াছি। বিশেষতঃ প্রাচীন রাজমালা গ্রন্থে স্পষ্ট লিখিত আছে যে, আদিরত্নমাণিক্য হইতে ত্রিপুরেশ্বরগণ মাণিক্য উপাধি ধারণ করিয়া আসিতেছেন। ইহার পূর্ব্বে তাহারা আসামের আহুম নরপতি বৃন্দের ন্যায় "ফা" উপাধি ধারণ করিতেন। কিন্তু "পা" শব্দটী নিতান্ত অজ্ঞব্যক্তির স্বকপোলকল্পিত। কোন সনন্দ কিম্বা বংশাবলীতে "পা" শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয় না।

ত্রিপুর রাজবংশাবলী আমি প্রথমতঃ ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে "ত্রিপুরার ইতিবৃত্ত" নামক ক্ষুদ্র পুস্তকের সহিত প্রকাশ করিয়াছিলাম। তাহাই বিশ্বকোষাভিধানে উদ্ধৃত হইয়াছে। পণ্ডিত ৺ রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন মহাশয় শ্রীমদ্ভাগবতের ভূমিকায় যে বংশাবলী প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা বাবু রাধারমণ ঘোষ প্রভৃতির কল্পনা প্রসূত। কারণ তৎকালে ত্রিপুরার জল তরঙ্গে পূর্ব্ববঙ্গ তরঙ্গায়িত হইতেছিল। এই বংশাবলীর সহিত রাজমালার কোনরূপ সামঞ্জস্য নাই। ব্রিটীসাধিকারের আরম্ভে মহারাজ রাজধর মাণিক্য যে বংশাবলী প্রকাশ করেন; এবং মহারাজ রামগঙ্গা মাণিক্য বনাম মহারাজ দুর্গামাণিক্যের মোকদ্দমায় উভয় পক্ষে যে বংশাবলী প্রকাশ করিয়াছেন। তৎপর কুমার নীলকৃষ্ণ বনাম মহারাজ বীরচন্দ্রের মোকদ্দমায় যে বংশাবলী দাখীল করা হইয়াছে, এই সকল বংশাবলীর সহিত রাজমালা ঐক্য করিয়া আমি বংশাবলী প্রকাশ করিয়াছি এই দুই খণ্ড বংশাবলীর সহিত যে বংশাবলীর অনৈক্য হইবে তাহাই কল্পিত বলিয়া পাঠকগণ বিবেচনা করিবেন।

কিরাত নগরে রাজাবিধির গঠন।
রাজ্যের সীমানা কহি শুনহ বচন॥
উত্তরে তৈরঙ্গ নদী দক্ষিণে রসাঙ্গ।
পূর্ব্বেতে মেখলী সমী পশ্চিমে কাচবঙ্গ।
ত্রিবেগ স্থানেতে রাজা করিল একপুরী।
নানা মত নির্ম্মাইল পুরীর চত্তারি॥

শ্রীকৈলাসচন্দ্র সিংহ বিদ্যাভূষণ

অমরেন্দ্র।

উপন্যাস

ভ্রাতা-ভগ্নী

অদ্য শুক্লা ত্রয়োদশী; সন্ধ্যা অতীত হইয়াছে। যেন কাঞ্চন-কিরীট-বিভূষিতা, কাঞ্চন-মাল্যাম্বর-ধারিণী, ধূসরবরণা সন্ধ্যাসতী, শ্যামা বসুন্ধরার শ্রান্ত দেহে স্বর্ণাঞ্চল বিলুণ্ঠিত করিয়া সরিয়া দাঁড়াইল। চন্দ্রিকার শুভ্র রজত তরঙ্গে ক্রীড়া করিতে করিতে, রঙ্গে আনন্দময়ী যামিনী শ্যামাঙ্গিনী বসুমতীকে বুকে লইয়া যেন হাস্যোল্লাসে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। চন্দ্র কিরণ-স্নাতা বাসন্তী রজনীর কি শোভা! ফুল্ল রজনীগন্ধার সৌরভে আমোদিত মৃদুমন্দ গন্ধবহ, প্রকৃতি বক্ষে কি মাধুর্য্য ঢালিয়া দিল।

এ হেন সুন্দর সময়, সন্ধ্যার পর, কলিকাতা হইতে দূরবর্ত্তী, পশ্চিম বঙ্গের একখানি পল্লীগ্রামস্থ বাড়ীর ছাদের উপর তিনটি ভাইভগ্নী বসিয়া আছে। প্রফুল্ল কতগুলি যুঁইফুল লইয়া মালা গাঁথিতেছে; সেই সিত-রজত জ্যোৎস্নায় চম্পক-কলিকার ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঙ্গুলি সঞ্চালনে নরেশ কাছে বসিয়া ফুলগুলি লইয়া আনন্দে ক্রীড়া করিতেছে। কিন্তু নলিনীর চক্ষু এদিকে নাই; তাহার বিশাল, শান্ত, ফুল্লনীলোৎপল তুল্য আঁখি দুইটী নীল অনন্ত আকাশে ন্যস্ত রহিয়াছে। হেমকান্তির ন্যায় শান্তোজ্জ্বল বর্ণ, শান্তোজ্জ্বল বাসন্তী জ্যোৎস্নার বিমল আভায় যেন সমধিক মাধুর্য্য ধারণ করিতেছে। অযত্ন বিন্যস্ত কেশরাশি পৃষ্ঠদেশে আলুলায়িত; বালবিধবা নলিনীবালা আভরণ হীনা, তবু কি সুন্দর!

মানবের প্রতি দেবতার মঙ্গল আহ্বানের ন্যায়, অদূর দেবমন্দিরে আরতির মঙ্গল শঙ্খ ধ্বনি এখনও থামে নাই। জীব হৃদয়ের শত শত আশা বর্ত্তিকার ন্যায় সুদূর আকাশে শত শত তারকা দীপ জ্বলিয়া উঠিয়াছে।

প্রফুল্ল ধীরে ধীরে ডাকিল "দিদি"! নলিনী কোন উত্তর করিল না; এই বাহ্য জগত পরিত্যাগ করিয়া কোন অদৃশ্য বস্তুতে তাহার প্রাণ মগ্ন রহিয়াছে। প্রফুল্ল কোন কথা না বলিয়া মালা গাঁথিতে লাগিল। মালা গাঁথা সমাপ্ত হইলে, নলিনীর কোমল হাত দুখানা আপন হাতে লইয়া প্রফুল্ল আবার ডাকিল, "দিদি!" নলিনীর যেন ধ্যান ভাঙ্গিল। সস্নেহে কহিল "কি ফুলু!"

প্রফুল্ল কহিল,—"এ হাত দুখানা যে ফুলের চেয়েও সুন্দর, দিদি, তোমার এ হাত দুখানায় ফুলের বালা পরাইয়া দি?"

নলিনী ঈষৎ হাসিয়া উত্তর করিল "দূর পাগলি! এই অসার বস্তুতে শরীর সাজাইলে কি হইবে? যিনি ফুলের চেয়ে সুন্দর, কুসুম রাশিতে যিনি সৌন্দর্য্য দান করিয়াছেন; যিনি পরম পবিত্র, যাঁর সৌন্দর্য্যে এই জগত শোভাময় আমি তাঁকে লইয়া সুন্দর হইতে চাই। বোন্ এই বাহিরের শোভার চেয়ে কি প্রেম পবিত্রতার শোভা শতগুণে শ্রেষ্ঠ নয়?"

প্রফুল্ল,—"বিধাতা ফুল কেন সৃষ্টি করিলেন?"

নলিনী,—"দেবতার চরণে উৎসর্গ করিবার জন্য।" ভগবানের অনুপম প্রেম, ফুলের সৌন্দর্য্যে উপলব্ধি করিবার জন্য।"

প্রফুল্ল এ স্থলে দিদির সঙ্গে একমত হইতে পারিল না; মনে মনে ভাবিল, বাহ্য সৌন্দর্য্যের ও প্রয়োজন আছে; নতুবা বিধাতা নানা রস পূর্ণ বিবিধ সৌন্দর্য্যের আধার এই বাহ্য জগত কেন সৃষ্টি করিলেন?

ছোট ভাই ৮ বৎসরের বালক নরেশ এতক্ষণ চুপ করিয়াছিল। সহসা প্রশান্ত চন্দ্র নক্ষত্রশালী অনন্ত আকাশ তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। আকাশের দিকে চাহিয়া সে কহিল "দিদি, মানুষ মরিয়া না তারা হয়? আমাদের বেলী বোধ হয় এখন তারা হইয়াছে। ঐ টি? না ঐ টি? কোন্‌টি দিদি? আমরা কবে তারার দেশে যাইব?"

কিছু দিন গত হইল তাহাদের ছোট বোন বেলী সকলকে কাঁদাইয়া অমর ধামে চলিয়া গিয়াছে। একবৃন্তে প্রস্ফুটিত কুসুম গুচ্ছের ন্যায়, কয়তাই ভগ্নীর মধ্য হইতে, ভগবান তাহাকে তুলিয়া লইয়াছেন। সে বেল ফুলের মত সুন্দর ছিল।

নরেনের কথায় সেই দূর শোকস্মৃতি তাহাদের নিকট যেন নবীভূত হইয়া উঠিল। নলিনীবালা নরেশকে আপন কোলে টানিয়া লইয়া অশ্রু পূর্ণ লোচনে কহিল—"নরেশ! বেলী আনন্দময়ী মায়ের কোলে গিয়াছে। একদিন আমরা সকলেই সেই দেশে যাইব।'

এমন সময় সিঁড়িতে দাঁড়াইয়া তাহাদের মা ডাকিলেন "ফুলু, নীচে নেমে এস।" তাহারা সকলে ধীরে ধীরে নীচে নামিয়া গেল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বাল-বিধবা।

তাহারা নীচে নামিয়া আসিলে, মাতা কিঞ্চিৎ ব্যস্ততার সহিত কহিলেন—"নলু, আমরা আজই কলিকাতা রওনা হইব। রাত্রিতে খাওয়া দাওয়ার পর নৌকায় উঠিতে হইবে। তোমরা জিনিষপত্র গুছাইয়া সব ঠিক্ ঠাক্ কর। আমি দেখি সুমতি রান্নাঘরে কি করিতেছে। সে রাঁধুনীকে রান্না শিখাইতে গিয়া, অনেক সময় ঝগড়া বাধাইয়া দেয়।" এই বলিয়া-গৃহিনী চলিয়া গেলেন। প্রধানা ঝির নাম সুমতি।

তাহার দুই ভগিনীতে জিনিসপত্র গুছাইতে লাগিল। নরেন নিকটে বসিয়া ল্যাম্পের আলোকে নিজ পাঠ্য পুস্তকে দৃষ্টিপাত করিতেছে।

তাহাদের পিতা কালীনাথ বসু কলিকাতা সহরে কোন বড় কাজ করেন। দেশেও তাঁহার জমীদারী আছে। তিনি সহর ছাড়িয়া কিছুদিনের জন্য সপরিবারে বাড়ী আসিয়াছেন। আজ রাত্রিতেই কলিকাতা যাত্রা করিতে হইবে। বিশেষ কোন কারণ বশতঃ নৌকা পথে গমন করিবেন। তাঁহাদের সুন্দর বজরাখানা গঙ্গার ঘাটেই বাঁধা ছিল।

তাহাদের গ্রামখানি এমন ক্ষুদ্র নহে। ইহাতে ইতর ভদ্র অনেক লোকের বাস। কালীনাথ বাবু সাধ্যানুসারে, সকলেরই উপকার করিতে চেষ্টা করিতেন; গ্রামের উন্নতিকল্পে, তাঁহার অর্থব্যয়েরও ত্রুটি ছিলনা। এ নিমিত্ত অধিকাংশ লোক তাঁহার বাধ্য। তাঁহার সদাশয়তা, উদারতা ও স্বাভাবিক মিষ্ট প্রকৃতিতে জন সাধারণ আকৃষ্ট। কিন্তু গ্রামে একদল দুর্ব্বৃত্ত লোকের বাস; কালীনাথ বাবুর ধনসম্পত্তি, পদমর্য্যাদায় তাহারা হিংসাবিষে জর্জ্জরিত। প্রতিবেশীর অভ্যুদয় অনেকেই সহ্য করিতে পারে না।

নলিনীবালা অল্প বয়সেই সংসার সুখ বঞ্চিতা ব্রহ্মচারিণী। বিবাহের পর মাত্র ছয়মাস কাল তাহার স্বামী জীবিত ছিলেন; নব পরিস্ফুট প্রসূন জীবন প্রভাতে সৌরভ বিতরণ করিতে না করিতেই বৃন্তচ্যুত।

নলিনীর এই অষ্টাদশ বৎসর বয়স। কলেজে না পড়িলেও উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছে। তাহার পিতা মেয়েদিগের কলেজে পড়ার পক্ষপাতী নহেন। তাহার মতে বর্ত্তমান স্কুল কলেজ, স্ত্রীজাতির স্বভাবসিদ্ধ কোমলতা নষ্ট করিয়া দেয়। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ও ইংরেজী শিক্ষয়িত্রী রাখিয়া, গৃহেই কন্যাদিগের উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

নলিনীবালা পবিত্রতার প্রতিমূর্ত্তিরূপে পিতৃগৃহে বিরাজিতা, পতির মূর্ত্তিধ্যান, পতির পবিত্র স্মৃতির উপাসনাই তাহার আন্তরিক জীবনব্রত। এই হেতু প্রথম যৌবনেই সে কঠোর যতিধর্ম্মিণী ব্রহ্মচারিণী।

নলিনী দিবানিশি কর্ম্মে ব্যাপৃতা থাকিতে ভালবাসেন। যদিও তাহাদের গৃহে দাস দাসীর অভাব নাই, তথাপি সমস্ত বিষয়েই তাহাকে তত্ত্বাবধান করিতে হয়। পিতৃ মাতৃ সেবারূপ পুণ্য অনুষ্ঠান তাহার জীবনের অন্যতর ব্রত।—বালবিধবার পক্ষে ইহা অপেক্ষা উচ্চতর ধর্ম্ম আর কি আছে? বিশেষতঃ বেলীর মৃত্যুর পর তাহার পিতামাতা শোকে অতিশয় কাতর হইয়া পড়িয়াছিলেন। নলিনীর পবিত্র হৃদয়ের প্রেমজ্যোতিঃ সে অন্ধকার অনেক পরিমাণে দুর করিয়াছে।

পিতা বলিতেন, মা নলিনী আমার লক্ষ্মীস্বরূপা, বিধাতার কৃপায় আমি এমন কন্যারত্ন লাভ করিয়াছি। তাঁহারা একমাস বাড়ী ছিলেন; এই সময়টা নলিনীর বৃথা যায় নাই। গৃহকর্ম্ম সমাপন করিয়া যখন সে অবকাশ পাইত, অশিক্ষিতা মেয়েদিগকে নানা বিষয়ে শিক্ষা দান করিত। গরীব কৃষক দিগের কুটীরে যাইয়া তাহাদিগকে ঔষধ ও পথ্য দিত। অন্নহীনকে অন্ন বস্ত্রহীনকে বস্ত্র যোগাইত। সকলেই বলিত নলিনী যেন দয়ার প্রতিমূর্ত্তি।

মহিলাদিগের উপযোগী দেশীয় শিল্পের উন্নতিকল্পে গ্রামের কয়েকটী শিক্ষিতা বিধবা এবং সধবা মহিলা লইয়া নলিনী একটী মহিলা শিল্পসমিতি গঠন করিল। ইহা দ্বারা গ্রামের অনাথা ও নিরাশ্রয়া রমণীদিগকে শিল্প শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হইল। গ্রামের সক্ষম ব্যক্তিদিগ হইতে চাঁদা সংগ্রহ পূর্ব্বক তাহাদ্বারা এক জাতীয় ধনভাণ্ডার প্রতিষ্ঠিত হইল। এই অর্থদ্বারা নিতান্ত দরিদ্রদিগকে সাহায্য করা যাইবে। যাহারা পয়সা অভাবে তুলা ও চরকা কিনিতে পারেনা তাহাদিগকে তুলা ও চরকা কিনিয়া দেওয়া হইবে।

নলিনী নিজ হাতে অতি সুন্দর সূতা কাটিতে শিখিয়াছে। অনেককে সে নিজে সূতা কাটা শিক্ষা দিত। এই উপায়ে অনেক নিরন্ন বিধবার অন্নের সংস্থান হইল।

প্রফুল্লের বয়স চতুর্দ্দশ বৎসর অতিক্রম করিয়াছে। সে ছায়ার ন্যায় দিদির সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া তাহার অনুকরণ করিতে চেষ্টা করে।

নলিনী আপনার মহৎ চরিত্র বলে পরিবারে কত সুখ শান্তি বিস্তার করিতেছে তাহার সীমা নাই, কিন্তু হায়! শীঘ্রই সে সুখের অবসান হইল।

যখন এ কথা রাষ্ট্র হইল যে তাহারা আজই কলিকাতা রওয়ানা হইবে, অনেক গরীব নিরাশ্রয় স্ত্রীলোক নলিনী ও প্রফুল্লের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিল; অশ্রুপূর্ণ নয়নে তাহাদের নিকট হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতে লাগিল। তাহারাও সজল লোচনে সকলের নিকট বিদায় গ্রহণ করিল।

মহিলা—শিল্পসমিতির কার্য্যভার একজন উপযুক্ত শিক্ষিতা রমণীর উপর সমর্পণ করিয়া নলিনী বালা কলিকাতা যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হইল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

গঙ্গাবক্ষে।

কালীনাথ বাবু সপরিবারে রাত্রি ১০ টার পর নৌকারোহণে কলিকাতা যাত্রা করিলেন। নরেশ নৌকায় আসিয়াই মাতার নিকট ঘুমাইয়া পড়িল। তাহার পিতা অল্পক্ষণ পরেই নিদ্রিত হইলেন।

দুই ভগিনী জানালার নিকট একটা বেঞ্চের উপর গিয়া বসিল। প্রফুল্ল দিদির চুলগুলি হইয়া ধীরে ধীরে তাহাতে অঙ্গুলী সঞ্চালন করিতে লাগিল।

শুভ্র রজত চন্দ্রকর হিল্লোলে, শুভ্র বরণা গঙ্গা চঞ্চলা বালিকার ন্যায় নাচিতে নাচিতে উছলিয়া উছলিয়া খেলা করিতেছে। যেন কোন অশ্রান্ত, অক্লান্ত আনন্দ স্রোতে ভাসিয়া, কাহার আহ্বান ধ্বনিতে মাতিয়া, উন্মাদিনী গঙ্গা কাহার উদ্দেশে ছুটিয়া চলিয়াছে। আকাশে নক্ষত্র বালিকাগণ রূপসী অপ্সরার ন্যায় যেন সে দৃশ্য দেখিতেছে। সমস্ত স্থির ও শান্ত! আহা, প্রকৃতির কি ভুবন মোহিনী মূর্ত্তি। আজ পুণ্য সলিলা ভাগীরথীর অপরূপ সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করিয়া নলিনী ও প্রফুল্লের প্রাণ আনন্দে নিমগ্ন হইল।

বেঞ্চের উপর বসিয়া নলিনী কহিল—"ফুলু, জ্যোৎস্নায় গঙ্গার জল কি সুন্দর দেখাইতেছে। মানুষের প্রাণও তো এমন পবিত্র ও সুন্দর হইতে পারে।"

প্রফুল্ল,—"কই, মানুষকে তো এমন সুন্দর হইতে দেখি না।"

নলিনী,—"জগতের মহাপুরুষদের হৃদয় এই মত সুন্দর।—যোগ, ভক্তিজ্ঞানে তাঁরা প্রাণে কি অলোকিক সৌন্দর্য্য ধারণ করিয়াছেন।

প্রফুল্ল,—"সে দু চারিজন মাত্র। বেশী লোকই মন্দ। যেন মন্দ হওয়াই মানুষের স্বভাব।"

নলিনী—"বোন্ পাপ ও অপবিত্রতা জীবাত্মার ধর্ম্ম নয়। মানুষ যদি সাধনা করেন, আপনার চঞ্চল অপরিমার্জ্জিত বুদ্ধিকে মার্জ্জিত করেন, জ্ঞানালোকে অজ্ঞানতা দূর করেন, তবে মানুষ এই মর্ত্তলোকেই দেবতার ন্যায় সৌন্দর্য্য লাভ করিতে পারেন। দেখ এই ফুলগুলিকে ফুটাইয়া, সাজাইয়া তুলিতে প্রকৃতির কত যত্ন। মানবাত্মাকে নির্ম্মল করিতে কি প্রকৃতির যত্ন নাই? ভগবানের মঙ্গল হস্তদ্বারা চালিত হইয়া,প্রকৃতি দিবা রাত্রি পরিশ্রম করিয়া স্বর্গের দিকে পবিত্রতার দিকে জীবকে ধীরে ধীরে লইয়া যাইতেছে। একটী অন্যায় কর্ম্ম করিলে, প্রাণকে ভীষণ আঘাত করিয়া জানায়, ইহা আর করিও না। সে গম্ভীর বাণী লোকে বলে বিবেক; কিন্তু ইহা ভগবানের সাক্ষাৎ প্রত্যাদেশ।

প্রফুল্ল,—সে প্রত্যাদেশ কয়জনে শোনে?

নলিনী,—যাঁদের হৃদয় নির্ম্মল, তাঁহারা প্রাণে এ প্রত্যাদেশ স্পষ্টই শুনিতে পান। ঘড়ির কাঁটা যেমন অহোরাত্র টক্ টক্ করিতেছে, অবিশ্রান্ত অবিরাম কেবল টক্ টক্ শব্দ; সেই প্রকার প্রাণের প্রাণে, অন্তরে বসিয়া দিন রাত্রি একজন, জীবকে জ্ঞাত করাইতেছেন। 'এটী ভাল, এটী মন্দ, এটী ভাল, এটী মন্দ।'

প্রফুল্ল—"প্রাণ কেমন করিয়া নির্ম্মল হয়?"

নলিনী,—সাধনার দ্বারায় আত্মা নির্ম্মলতা লাভ করে। গভীর ধর্ম্ম সাধনা দ্বারা পূর্ব্বে মহর্ষিগণ আত্মার প্রকৃত নির্ম্মলতা লাভ করিয়াছিলেন।

নলিনীর এই ভাব পূর্ণ বাকগুলি প্রফুল্লের চিন্তারাজ্য অধিকার করিয়া হৃদয়কে আলোকিত করিতে লাগিল। এই প্রকারে কিয়ৎক্ষণ গত হইল।

আকাশপথে খণ্ড খণ্ড ছিন্ন বিচ্ছিন্ন মেঘ সকল ভিত্তিশূন্য একতাশূন্য উদ্দেশ্য বিহীন বাঙ্গালী জীবনের ন্যায় ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিল।

সহসা একখণ্ড কাল মেঘ চন্দ্রমাকে আচ্ছাদিত করিল। ক্রমে সে জলদ খণ্ড সকল ঘনীভূত অবস্থায় পশ্চিম গগনে ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করিল।

মাঝি ডাকিয়া কহিল,—"বাবু আকাশের অবস্থা ভাল নয়।

কালীনাথ বাবু উত্তর করিলেন,—তাড়াতাড়ি নৌকা বাহিয়া চল্। একটা নিরাপদ স্থানে নৌকা রাখিতে হইবে।

মাঝি,—"খুব ঝড় আসিবে বলিয়া বোধ হয়।"

কালীনাথ বাবু তখনই উঠিয়া বাহিরে গেলেন। দেখিতে পাইলেন, একখানা রক্তাভ ভীষণ জলধর বায়ুকোণে সাজিয়াছে। মেঘরাশি ধুঁয়ার মত অতিদ্রুত উপরে উঠিতেছে। ঝড়ের আর বিলম্ব নাই।

মাঝি ও মাল্লাগণ তাড়াতাড়ি নৌকা বাহিয়া তাঁহাদিগকে নিকটবর্ত্তী একটা খালের মধ্যে লইয়া গেল; এবং লঙ্গর ফেলিয়া নৌকা রাখিল।

শ্রীমতী কুমুদিনী বসু।

ঢাকার ইতিহাস।

[ভৌগোলিক বিবরণ]

নদ নদী।

ঢাকা জেলা নদীমাতৃক স্থান; বহু সংখ্যক নদ নদী এই জেলার বক্ষোদেশ বিদীর্ণ করিয়া প্রবাহিত হইতেছে। নদীগুলির মধ্যে ব্রহ্মপুত্র, মেঘনাদ, পদ্মা, কীর্ত্তিনাশা, যমুনা, ধলেশ্বরী, ইছামতী, লক্ষ্যা ও বুড়িগঙ্গা প্রধান। বংশী, তুরাগ, বালু, সিংসহ, এলামজানী, আলম, ভিরুজখা, রামকৃষ্ণদী, ইলিসামারী, তুলসীখালী প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী। এতদ্ব্যতীত সালদহ, লংনদহ ও গোয়ালিয়ার প্রভৃতি পার্ব্বত্য নদী মধুপুর জঙ্গলস্থিত কঠিন মৃত্তিকা রাশি ভেদ করিয়া প্রবাহিত হইতেছে। সাধারণতঃ যমুনা, ব্রহ্মপুত্র পদ্মা ও মেঘনাদ এই কয়টি প্রধান নদী হইতেই অন্যান্য সমুদয় নদী উৎপন্ন হইয়াছে। উক্ত চারিটি নদীর সহিত অপরাপর নদীগুলির সম্বন্ধ নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

১। যমুনা (ব্রহ্মপুত্রের প্রধান ও পশ্চিম দিকস্থ প্রবাহ হইতে উৎপন্ন—

(ক) এলামজানী (ধলেশ্বরীর উর্দ্ধতন নূতন প্রবাহ নদী হইতে উৎপন্ন—১। আলমনদী চৌহাট ঝিলে পতিত হইয়াছে।

১। গাজীখালি নদী ধলেশ্বরীতে পড়িয়াছে।
২। সুঙ্গার ,, ধলেশ্বরীতে পড়িয়াছে।

ধলেশ্বরী হইতে উৎপন্ন

৩। বুড়ীগঙ্গা ,, ধলেশ্বরীতে পড়িয়াছে।
৫। বয়রাগাদী ,, ধলেশ্বরীতে পড়িয়াছে।
তালতলা খাল তরতিয়া খালে পড়িয়াছে।
৫। সিঙ্গড়া নদী ধলেশ্বরীতে পড়িয়াছে।
৬। মীরকাদিমের খাল সেরাজাবাদের নদীতে পড়িয়াছে।

(খ) ধলেশ্বরী (উর্দ্ধতন প্রাচীন প্রবাহ) হইতে উৎপন্ন—১। ঘিয়রখাল ইছামতীতে পড়িয়াছে।

২। তরানদী কালীগঙ্গাতে পড়িয়াছে।
৩। ইছামতী নদী ধলেশ্বরীতে পড়িয়াছে।

(ইছামতী হইতে উৎপন্ন)

১। মহাদেবপুরের খাল কালীগঙ্গায় পড়িয়াছে
২। তুলসীখালী ধলেশ্বরীতে পড়িয়াছে
৩। গোয়ালখালী ,, ,,
৪। কুচিয়া মোড়ারখাল ,, ,,
৫। শ্রীনগরের খাল তরতিয়া খালে পড়িয়াছে।

(ক) কালীগঙ্গা নদী—এই নদীর সামান্য চিহ্ন মুলফৎগঞ্জ ও কোয়ারপুরের নিকট বিদ্যমান রহিয়াছে।

২। ব্রহ্মপুত্র (প্রাচীন ও পূর্ব্বদিকস্থ প্রবাহ) হইতে উৎপন্ন—১। বংশীনদী ধলেশ্বরীতে পড়িয়াছে।

(বংশীনদী হইতে উৎপন্ন)

(ক) তুরাগনদী বুড়িগঙ্গায়
পড়িয়াছে।
(তুরাগ হইতে উৎপন্ন)
(ক) টঙ্গীনদী লক্ষ্যাতে
পড়িয়াছে।
(টঙ্গী হইতে উৎপন্ন)
(ক) বালুনদী লক্ষ্যাতে
পড়িয়াছে।
(বালুনদী হইতে উৎপন্ন)
(ক) দোলাইখাল বুড়িগঙ্গায়
পড়িয়াছে।

২। বানার (এই নদীর নিম্ন প্রবাহ লক্ষ্যা নামে পরিচিত) নদী ধলেশ্বরীতে পড়িয়াছে।
৩। আরালিয়াখাল লক্ষ্যায় পড়িয়াছে।
৪। কাইঠাদী নদী ব্রহ্মপুত্রে পড়িয়াছে।
৫। আরিয়লখাঁ বা পাহাড়ী নদী মেঘনাদে পড়িয়াছে।

৩। পদ্মানদী হইতে উৎপন্ন—
১। মৈনটখাল ইছামতীতে পড়িয়াছে।
২। ইলিসামারী ,, ,,
৩। তরতিয়া খাল ,, ,,
৪। বহরের খাল ,, ,,
৫। কীর্ত্তিনাশা পদ্মায় পড়িয়াছে।

৪। মেঘনাদ হইতে উৎপন্ন—
১। সেরাজাবাদের নদী মেঘনাদে পড়িয়াছে।
২। কাচিকাটা, কীর্ত্তিনাশায় পড়িয়াছে।
(মেঘনাদ হইতে বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পয়ঃপ্রণালী বহির্গত হইয়াছে; উহাদের নির্দ্দিষ্ট কোনও নাম প্রাপ্ত হওয়া যায় না।)

৫। মধুপুর জঙ্গল হইতে উৎপন্ন—
১। সালদহ, তুরাগ নদীতে পড়িয়াছে।
২। লবনদহ ,, ,,
৩। গোয়ালিয়ার খাল ,, ,,

ব্রহ্মপুত্র—"১৮৪৭ খৃঃ অব্দে Lieutenant Henry Strachy এবং ১৮৭৮ খৃঃ অব্দে Mr. Jodinee মহাত্মদ্বয় তিব্বৎদেশীয় "যার কিউ সাংপো" কে ব্রহ্মপুত্রের মূলস্রোতঃ বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। এই যার কিউ সাংপো হিমালয়ের পূর্ব্বোত্তর প্রান্তে উপনীত হইয়া বঙ্কিম ভাবে গতি পরিবর্ত্তন করতঃ মিসমী জাতির বাস পর্ব্বতের মধ্যদিয়া পরশুরাম কুণ্ডে পতিত হইয়াছে। তদনন্তর ব্রহ্মপুত্র নামে পরিচিত হইয়া সদিয়া, ডিব্রুগড়, তেজপুর, গৌহাটী, গোয়ালপাড়া, ধুবড়ী প্রভৃতি আসামস্থ অনেক স্থান অতিক্রম করতঃ রঙ্গপুর ও ময়মনসিংহের সন্ধিস্থলে চিলমারীতে উপনীত হইয়াছে। এখান হইতে ময়মনসিংহের জেলার মধ্যদিয়া আসিয়া টোকচাঁদপুরের নিকটে ঢাকা জেলার উত্তর সীমায় পড়িয়াছে; এবং তথা হইতে পূর্ব্বাভিমুখে চারি মাইল পথ অতিক্রম করিয়া পুনরায় ময়মনসিংহ জেলায় প্রবেশ লাভ করিয়াছে। অতঃপর ময়মনসিংহ জেলার মধ্যদিয়া কতদূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া নারায়ণগঞ্জ মহকুমার উত্তর সীমা রক্ষা করিয়া পূর্ব্বাভিমুখে গমন করিয়াছে, এবং রায়পুরা থানার পূর্ব্বদিকে আসিয়া মেঘনাদের সহিত সম্মিলিত হইয়াছে। টোকচাঁদপুর হইতে মেঘনাদ ও ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গম স্থান প্রায় ২৬ মাইল হইবে। ব্রহ্মপুত্রের প্রাচীন ও পূর্ব্বদিকস্থ যে প্রবাহ ঢাকা জেলাস্থ টোক নামক স্থান স্পর্শ করিয়া ভৈরব বাজারের নিকটে মেঘনাদের সহিত সম্মিলিত হইয়াছে উহা এই জেলাকে ত্রিপুরা ও ময়মনসিংহ জেলা হইতে পৃথক্ করিয়াছে। কৈঠাদি হাটের নিকট হইতে ইহার এক শাখা দক্ষিণভাগে প্রবাহিত হইয়া ১২ মাইল পথ অতিক্রম করতঃ বেলাবর কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধে পুনরায় প্রধান প্রবাহের সহিত মিলিত হইয়াছে।

ব্রহ্মপুত্রের একস্রোতঃ মঠখোলা নামক স্থানে বানারের সহিত মিলিত হইয়া একডালার নিম্নে শীতল লক্ষ্যা নাম ধারণ করিয়াছে। অপর একস্রোতঃ দক্ষিণ মুখে সরল গতিতে সুবর্ণ গ্রামের অন্তর্গত নরসিংদী পাচদোনা, মাধবদী, মনোহরদী, বালিয়াপাড়া, মহজুমপুর, পঞ্চমীঘাট, লাঙ্গলবন্দ, কাইকারটেক হইয়া

সোনারগাঁও পরগণার দক্ষিণে শীতল লক্ষ্যার শেষ সীমায় মিলিত হইয়াছে। অনেকে অনুমান করেন, এই স্রোতঃ ও মেঘনাদ পুরাকালে এক স্রোতই ছিল।

বেলাব হইতে এক শাখা আইরল খাঁ নামে প্রবাহিত হইয়া গিয়া নরসিংহদীর নিকটে মেঘনাদে মিলিত হইয়াছে। ব্রহ্মপুত্রের অনতিদূরে এই আইরল খাঁ হইতে উৎপন্ন হইয়া হাড়িধোয়া নামে এক ক্ষুদ্র শাখা নাগরদী, গুপ্তপাড়ার নিকটে ব্রহ্মপুত্রে পতিত হইয়াছে।” ব্রহ্মপুত্রের একস্রোতঃ সোনারগাঁ পরগণাকে, স্বাভাবিক নিয়মে দ্বিধা বিভক্ত করিয়াছে।

ব্রহ্মপুত্রের প্রাচীন খাত প্রাচীন ব্রহ্মপুত্র টোক-চাঁদপুরের পূর্ব্বদিকে আসিয়া সোনারগাঁও মহেশ্বরদী পরগণার মধ্যদিয়া ঢাকা জেলায় প্রবেশ লাভ করিয়াছে। তথা হইতে দক্ষিণবাহিনী হইয়া সহর সোনারগাঁয়ের পশ্চিম দিক দিয়া প্রবাহিত হইত। এই প্রাচীন ব্রহ্মপুত্র কলাগাছিয়ার সন্নিকটে ধলেশ্বরীর সহিত মিলিত হইয়া মেঘনাদে পতিত হইত। এই নদী এখন মরা নদী বলিয়া অভিহিত হয়। ইহারই তীরে লাঙ্গলবন্ধ ও পঞ্চমীঘাট অবস্থিত।

মেঘনাদ—মেঘনাদ ময়মনসিংহ জেলার পূর্ব্ব সীমা দিয়া প্রবাহিত হইয়া ঢাকা জেলার পুর্ব্বোত্তর সীমায় ব্রহ্মপুত্রের সহিত মিলিত হইয়াছে। এই সম্মিলিত প্রবাহই মেঘনাদ নামে পরিচিত। মেঘনাদ অতঃপর ঢাকা জেলার পূর্ব্ব সীমা রক্ষা করতঃ দক্ষিণবাহিনী হইয়াছে। এই নদী দ্বারা ত্রিপুরাও ঢাকা জেলার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা হইয়াছে। মেঘনাদের প্রবাহ ঢাকা জেলার দক্ষিণ পূর্ব্ব কোণে আসিয়া পদ্মার সহিত মিলিত হইয়াছে। ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গম স্থল হইতে পদ্মার সঙ্গম স্থল পর্য্যন্ত মেঘনাদ প্রায় ৯০ মাইল দীর্ঘ। সাধারণতঃ কন্দর্প পুরের মোহানাই পূর্ব্বে পদ্মা ও মেঘনাদের সম্মিলন স্থান ছিল।

গাড়ো, কাছাড় এবং শ্রীহট্টের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহুসংখ্যক পার্ব্বত্য স্রোতস্বতীর সম্মিলনেই মেঘনাদের উৎপত্তি হইয়াছে। এই সম্মিলিত প্রবাহ শ্রীহট্ট ও ময়মনসিংহ জেলাস্থিত নিম্নভূমি ও ঝিল সমূহের মধ্যদিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। সমুদ্রের উপরিভাগ হইতে মেঘনাদের উপরি-ভাগের উচ্চতা অতি সামান্য মাত্র। এই জন্যই মেঘ-নাদের ন্যায় এরূপ সুবিশাল নদের প্রবাহ অতি মন্থর; এবং প্রবাহও একটি মাত্র খাত মধ্যে নিবদ্ধ না থাকিয়া বহুসংখ্যক শাখা নদী ও নালার সৃষ্টি করিয়াছে। শ্রীহট্টস্থ ঝিল সমূহ হইতে আনীত উদ্ভিজ্জ ও জান্তব পদার্থের সংমিশ্রণ হেতু এই নদীর জল ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ এবং অপেয়। কিন্তু এজন্যই মেঘনাদে মৎস্যাধিক্য পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। পৃথিবীর অন্য কোনও স্রোতস্বতীতেই মৎস্যের এরূপ প্রাচুর্য্য দৃষ্ট হয় না।

পদ্মা পদ্মানদী, পাবনা ও ফরিদপুর জেলার সীমা-রূপে আসিয়া ঢাকা জেলার পশ্চিম সীমায় যমুনার সহিত মিলিত হইয়াছে। মুলিডাঙ্গার নিকট “ভেলবারিয়া” ফ্যাক্টরির উত্তর পশ্চিমাংশ স্পর্শ করিয়া গোয়ালন্দের নিকট যমুনার সহিত ইহার সম্মিলন ঘটিয়াছে। এই সংযোগ সাধারণতঃ বাইশ কোদালিয়ার মোহানা নামে পরিচিত। বর্ষার সময়ে উহার জল-স্রোত এরূপ প্রবল ভাবে দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হইতে থাকে যে অতি বেগ-গামী আসাম ষ্টীমার পর্য্যন্ত উহা ভেদ করিয়া স্রোতের বিপরীত দিকে অগ্রসর হইতে পারে না। ১৮৬৯ খৃঃ অব্দের এক রিপোর্ট পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, এই বৎসর ৬ খানা ফ্লাটসহ ষ্টীমার পদ্মা-যমুনা-সংযোগ ভেদ করিয়া উঠিতে নাপারায়, কতক দিন পর্য্যন্ত গোয়ালন্দে লঙ্গর করিয়া থাকিতে বাধ্য হয়। কর্ণেল গেষ্টন কর্ত্তৃক পরিমাপে তৎসময়ে গোয়ালন্দের নিকটে পদ্মার প্রশস্ততা গ্রীষ্মকালেও ১৬০০ গজ বলিয়া অবধারিত হয়।

যমুনার সহিত মিলিত হইয়া পদ্মা এই জেলার দক্ষিণ সীমা রক্ষা করিয়া পূর্ব্বাভিমুখে প্রবাহিত হইয়া জেলার পূর্ব্ব দক্ষিণ কোণে মেঘনাদের সহিত মিলিত হইয়াছে এবং পদ্মা মেঘনাদ ও ব্রহ্মপুত্রের সম্মিলিত প্রবাহ দক্ষিণ বাহিনী হইয়া সাগরে পতিত হইয়াছে।

পদ্মার প্রচীন প্রবাহ—পূর্ব্বে পদ্মানদী ফরিদপুর জেলার মধ্যদিয়া প্রবাহিত হইয়া বাখরগঞ্জ জেলার মেন্দীগঞ্জ থানার অন্তর্গত কন্দর্প পুরের সন্নিকটে মেঘ-নাদের সহিত মিলিত হইত। এই প্রাচীন প্রবাহ এখন ময়নাকাটা ও আড়িয়ল খাঁ নামে পরিচিত।

"পদ্মার গতি পরিবর্ত্তন অতি বিচিত্র। উহার মধ্যে এমন সমুদয় চরের উদ্ভব হয় যে, কোন ষ্টিমার সপ্তাহ কাল পূর্ব্বে যে স্থান অতিক্রম করিয়া গিয়াছে, তৎপরবর্ত্তি সপ্তাহে আর সে স্থান অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না। পূর্ব্বে যে স্থান ক্ষীণতোয়া ছিল, উহাই আবার গভীর হইয়া পড়িয়াছে, পরিলক্ষিত হয়।

"এই নদী কোনও সময়ে মধুমতী ও হরিণাঘাটার সহিত সম্মিলিত হইবার জন্য একটি প্রধান শাখা অবলম্বন করিয়াছিল। ইহাতে নদীয়া ও যশোহর জেলার নদীগুলি প্রায়ই বন্ধ হইয়াছে। নৌকা যোগে পূর্ব্বে এই সকল নদী বাহিয়া পশ্চিমবঙ্গে, এমন কি, উত্তর পশ্চিম প্রদেশ সমূহেও যাতায়াত করিতে পারা যাইত এবং ষ্টিমার চলাচলেরও বাধা ছিল না। এখন মধুমতী ও হরিণাঘাটা অবলম্বনে সুন্দরবনের মধ্য অথবা নিম্ন দিয়া পশ্চিমবঙ্গে যাইতে হয়।"

কীর্ত্তিনাশা—পদ্মার যে অংশ বিক্রমপুর ভেদ করিয়া মেঘনাদের সহিত মিলিত হইয়াছে, উহার নাম কীর্ত্তিনাশা; প্রকৃত প্রস্তাবে পদ্মার গতি বিক্রমপুরের পশ্চিমদিক পরিত্যাগ করিয়া মরা পদ্মা নামে এবং প্রবলাংশ যাহা প্রায় শত বৎসর মধ্যে উদ্ভব হইয়া প্রাচীন কালীগঙ্গা নদীর বিলোপ সাধন করিয়াছে, উহাই কীর্ত্তিনাশা নামে পরিচিত।

মিঃ রেণেল ১৭৮০ খৃঃ অব্দে পূর্ব্ববঙ্গের যে মান চিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন, তাহাতে দেখা যায়, পদ্মানদী বিক্রমপুরের বহুপশ্চিম দিক দিয়া প্রবাহিত হইয়া ভুবনেশ্বরের সহিত সম্মিলিত হইয়াছিল। তখন "কীর্ত্তিনাশা" বা "নয়াভাঙ্গণী" নামে কোনও নদীর অস্তিত্ব ছিল না। বিক্রমপুরের অন্তর্গত রাজনগর ও ভদ্রেশ্বর গ্রামের মধ্যে একটি অপ্রশস্ত জল প্রণালী মাত্র বিদ্যমান ছিল। উহা প্রাচীন কালীগঙ্গার শেষ চিহ্ন মাত্র। শ্রীপুর, নওপাড়া, ফুলবাড়িয়া, মুলফৎগঞ্জ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ গ্রাম সমূহ কালীগঙ্গার তটে বিদ্যমান ছিল। পরে শত বৎসরের মধ্যে কীর্ত্তিনাশা নদীর উৎপত্তি হইয়া বিক্রমপুরের বক্ষদেশ ভেদ করিয়া এবং নয়াভাঙ্গনী নদী উদ্ভূত হইয়া ইদিলপুরের প্রান্তদেশ ধৌত করিয়া পদ্মা ও মেঘনাদ পরস্পর সংযুক্ত হইয়াছে।

ব্রহ্মপুত্র মেঘনাদের সহিত মিলিত হইয়া যখন প্রবাহিত হইত, তখন উহার স্রোতবেগ প্রবল থাকায় পদ্মাকে বহু পশ্চিমে রাখিয়াছিল। পরে আবার যখন ব্রহ্মপুত্রের সহিত মেঘনাদের ততটা সম্বন্ধ রহিল না এবং ব্রহ্মপুত্র যমুনার সহিত মিলিত হইয়া গোয়ালন্দের নিকটে পদ্মার সহিত সম্মিলিত হইল, তখন পদ্মার বেগই প্রবল হইয়া ক্রমে পশ্চিমদিক পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হইতে লাগিল, তাহার ফল স্বরূপই কীর্ত্তিনাশার ও নয়া ভাঙ্গনীর উদ্ভব।

মিঃ রেণেল কৃত ১৭৮০খৃঃ অব্দের মান চিত্রে কীর্ত্তি-নাশার নাম পরিদৃষ্ট হয় না। ১৮৪০খৃঃ অব্দে মিঃ টেইলার, তদীয় "টপোগ্রাফি অব ঢাকা" পুস্তকে "কাথারিয়া" বা "কীর্ত্তিনাশা" নদীর বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। চাঁদ ও কেদার রায় এবং নওপাড়ার চৌধুরী দিগের কীর্ত্তি-ধ্বংশ করায় উহার নাম কীর্ত্তিনাশা হইয়াছে। পরে মহারাজ রাজবল্লভের কীর্ত্তিনিকেতন ভগ্ন করিয়া নামের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছে। এই নদী প্রথমে রথখোলা, পরে ব্রহ্মবধিয়া পরে কাথারিয়া এবং সর্ব্বশেষে কীর্ত্তিনাশা নামে পরিচিত হইয়াছে। এই নদী দ্বারা বিক্রমপুর দুইভাগে বিভক্ত হইয়াছে।

ধলেশ্বরী—ধলেশ্বরী যমুনার একটি শাখা নদী। বর্ত্তমান সময়ে এই নদী যমুনার শাখা নদী বলিয়া পরিচিত হইলেও যমুনা হইতে এই নদী অনেক প্রাচীন। ধলেশ্বরী ময়মনসিংহের অন্তঃপাতী সলিমাবাদ নামক স্থানের নিকট যমুনা হইতে বহির্গত হইয়াছে। এই স্থান হইতে প্রথমতঃ দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়, তৎপর কিয়দ্দুর পর্য্যন্ত পূর্ব্ব বাহিনী হইয়া কিঞ্চিৎ উত্তর দিকে গমন করিয়াছে; এবং পুনরায় দক্ষিণ পূর্ব্বাভিমুখে মাণিকগঞ্জ পর্য্যন্ত আগমন করিয়া ক্রমে সাভার পর্য্যন্ত পূর্ব্বদিকে প্রবাহিত হয়। সাভার হইতে ফুলবাড়িয়ার কিঞ্চিৎ দক্ষিণে আসিয়া বুড়িগঙ্গার সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। এই সঙ্গম স্থান হইতে ক্রমে দক্ষিণ পূর্ব্বাভিমুখে রোহিতপুর, কুচিয়ামোড়া, পাথরঘাটা এবং রামকৃষ্ণদীর

নিকট দিয়া গমন করতঃ পাইনার দক্ষিণে সিংদহ নামক ইহার একটি শাখা নদীর সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। ঐস্থান হইতে পশ্চিমাদি, সরাইল, কোণ্ডা, প্রভৃতি স্থান দিয়া কতকদূর পর্য্যন্ত পূর্ব্বাভিমুখে প্রবাহিত হইয়া ভুইরার সন্নিহিত স্থান হইতে নারায়ণগঞ্জ এবং মদনগঞ্জ বন্দর দ্বয়ের দক্ষিণে লক্ষ্যানদীর সহিত সংযুক্ত হইয়া কিঞ্চিৎ পূর্ব্বদিকে মেঘনাদ নদের সহিত মিলিত হইয়াছে। লক্ষ্যা, ধলেশ্বরী, এবং মেঘনাদ এই তিনটি নদীর সঙ্গম স্থল অত্যন্ত ভয়ানক। এই স্থানকে কলাগাছিয়া বলে। মুন্সীগঞ্জ, ফিরিঙ্গিবাজার, রিকাবীরবাজার, মিরকাদিম, আবদুল্লাপুর, তালতলা, কুরশাইল, বয়ারাগাদী প্রভৃতি গ্রাম ইহার দক্ষিণ তটে অবস্থিত।

যমুনার উৎপত্তির পূর্ব্বে ধলেশ্বরী, করতোয়া ও আত্রেয়ী এই নদীত্রয়ের সম্মিলিত প্রবাহ হুরা সাগরের সহিত মিলিত ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে যমুনার উৎপত্তির পর হইতে করতোয়ার সহিত ধলেশ্বরী নদীর সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় এবং ময়মনসিংহ জেলার পশ্চিম দক্ষিণ কোণ হইতে যমুনার একটি শাখা আসিয়া ধলেশ্বরীর সহিত সম্মিলিত হইয়া উহাকে যমুনার একটি শাখা নদীরূপে পরিণত করিয়া ফেলে। আলমনদী খুলিয়া যাওয়ায় পাহাড়পুর এবং সাভারের মধ্যস্থিত ধলেশ্বরী নদী শুষ্ক হইয়া যাইতেছে।

বানার ও লক্ষ্যা বা শীতল লক্ষ্যা—এই নদীর উত্তরাংশ বানার বলিয়া পরিচিত। ইহা ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত এগার সিন্দু নামক স্থানের পশ্চিমে ব্রহ্মপুত্র নদী হইতে টোকের নিকট বানার নাম ধারণ করিয়া গমন করতঃ লাখপুরের নিকটে লক্ষ্যা নাম ধারণ করিয়াছে। এই লক্ষ্যা নদী পূর্ব্বে ব্রহ্মপুত্রের একটি স্বতন্ত্র শাখা নদী ছিল; কিন্তু আরালিয়া হইতে লাখপুর পর্য্যন্ত ব্রহ্মপুত্রের প্রাচীন প্রবাহ শুষ্ক হইয়া যাওয়ায়, একমাত্র বানারের প্রবাহই এই নদী দিয়া প্রবাহিত হইয়া ইহাকে বানারের সম্প্রসারণ মাত্র করিয়া ফেলিয়াছে। লাখপুর হইতে দক্ষিণ পূর্ব্বাভিমুখে ৫ মাইল পর্য্যন্ত আসিয়া একুটার সন্নিকটে দক্ষিণ পশ্চিম বাহিনী হইয়াছে। এই স্থান হইতে লক্ষ্যানদী পলাস, মুরাপাড়া, হাজিগঞ্জ, নবীগঞ্জ, প্রভৃতি স্থান দিয়া ১০ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া নারায়ণগঞ্জ ও মদনগঞ্জের দক্ষিণে ধলেশ্বরীতে পতিত হইয়াছে। ব্রহ্মপুত্রের প্রাচীন ও পূর্ব্ব দিকস্থ প্রবাহ শুষ্ক হইয়া পরিয়াছে; কেবল মাত্র বর্ষা কালেই নৌবাহন যোগ্য থাকে। সুতরাং এক্ষণে বানার ও লক্ষ্যানদীই ব্রহ্মপুত্রের পূর্ব্ব দিকস্থ পয়ঃপ্রণালীর প্রধান প্রবাহ বলিয়া পরিগণিত হইয়া পড়িয়াছে।

লক্ষ্যানদীর তীর-ভূমি অতিউচ্চ ও বৃক্ষরাজি সমাচ্ছন্ন। ইহার জল অতি নির্ম্মল ও সুস্বাদু এইজন্য এই স্বচ্ছ সলিলা স্রোতস্বতী শীতললক্ষ্যা নামে অভিহিত।

বুড়িগঙ্গা—বুড়িগঙ্গা ধলেশ্বরীর একটি শাখা নদী। সাভার থানার ৪ মাইল দক্ষিণে ফুলবাড়িয়ার নিকট ধলেশ্বরী হইতে বহির্গত হইয়া নারায়ণগঞ্জের ৪মাইল পশ্চিমে ভুইরা নামক স্থানে ধলেশ্বরীতে পতিত হইয়াছে। প্রথমতঃ এই নদী কিঞ্চিৎ দক্ষিণ পূর্ব্বদিকে প্রবাহিত হয়; তৎপর উত্তর পূর্ব্ব বাহিনী হইয়া কেরাণীগঞ্জের নিকট হইতে শ্যামপুর, মীরেরবাগ দিয়া ফতুল্যা পর্য্যন্ত পূর্ব্বদিকে গমন করিয়াছে। ফতুল্লার নিকট হইতে ক্রমে দক্ষিণাভিমুখে প্রবাহিত হইয়া ভবানীগঞ্জ দিয়া ভুইরা নামক স্থানে ধলেশ্বরীর সহিত পুনরায় মিলিত হইয়াছে। বুড়িগঙ্গা প্রায় ২৬মাইল দীর্ঘ। এই নদী ২৬মাইল দীর্ঘ ও প্রায় ৬মাইল প্রস্থ ভুখণ্ডকে একটি দ্বীপাকারে পরিণত করিয়াছে। এই দ্বীপাকার ভুভাগই পারজোয়ার নামে অভিহিত। বুড়িগঙ্গা ক্রমে শুষ্ক হইয়া চড়া পড়িয়া যাইতেছে।

যমুনা—যমুনা ব্রহ্মপুত্রের নূতন প্রবাহ। এই প্রবাহ রঙ্গপুরের কালীগঞ্জ ও ভবানীগঞ্জের নিকটে ব্রহ্মপুত্র হইতে বহির্গত হইয়া যিনাই বা যমুনা নাম ধারণ করতঃ ঢাকা জেলার পশ্চিম সীমায় পদ্মার সহিত সম্মিলিত হইয়াছে। পদ্মা ও যমুনার সঙ্গম স্থানের নাম বাইশ-কোদালীয়ার মোহানা। বর্ষার সময়ে এই মোহানা অতি ভীষণাকার ধারণ করে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে যমুনার উৎপত্তি হইয়াছে। কোনও সময়ে অতি বর্ষা নিবন্ধন মাঠে জলপ্লাবন উপস্থিত হইলে অনেক

কৃষক পরিবারের দ্বাবিংশৎটী লোক প্রত্যেকে এক এক খানা কোদালী সহ কৃষিক্ষেত্রে উপনীত হয়, এবং খনন কার্য্য অচিরে সম্পন্ন করিবার জন্য পদ্মা—যমুনাভিমুখস্থ ভূখণ্ড—খনন পূর্ব্বক ক্ষেত্র হইতে জল নির্গমনের পথ করিয়া দেয়। বর্ষার পূর্ণতা প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে যমুনার প্রবাহ ব্রহ্মপুত্রের দিকে মন্থর গতিতে চলিয়া এই পয়ঃ প্রণালীর সাহায্যে দ্রুতবেগে পদ্মায় পতিত হইতে থাকে, এবং ২।৩ বৎসর মধ্যে এইরূপে পদ্মা—যমুনার সংযোগে বহু গ্রাম ও প্রান্তর স্বীয় কুক্ষিগত করতঃ অত্যন্ত প্রশস্ততা লাভ করে। বাইশ কোদালে প্রথম উদ্ভব বলিয়া উহা "বাইশ কোদালিয়া" নমে পরিচিত হইয়া উঠে।

১৭৮৭ খৃঃ অব্দের প্রবল বন্যায় ব্রহ্মপুত্রের প্রবাহ পরিবর্ত্তন হইলে তিস্তা নদী গঙ্গা হইতে বিছিন্ন হইয়া ব্রহ্মপুত্রের সহিত মিলিত হয়। এই প্রবাহ যমুনার মধ্য দিয়া নূতন পথ প্রাপ্ত হইয়াছিল। বর্ত্তমান সময়ে ইহাই ব্রহ্মপুত্র অথবা যমুনায় প্রধান প্রবাহ।

তুরাগ—এই নদী ময়মনসিংহ জেলা হইতে আসিয়া দরিয়াপুরের নিকটে ঢাকা জেলায় প্রবেশ লাভ করিয়াছে। তথা হইতে দক্ষিণ পূর্ব্বাভিমুখে কিয়দ্দূর আসিয়া রাজাবাড়ী, বোয়ালীয়া প্রভৃতি স্থানের পার্শ্বভেদ করিয়া পূর্ব্ববাহিনী হইয়াছে। শেনাতুল্লার সন্নিকটে মোড় ঘুড়িয়া প্রায় সরল ভাবে দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হইয়াছে, এবং মৃজাপুর, কাশিমপুর, ধীতপুর, বিরলিয়া, উয়ালিয়া, বনগাঁও প্রভৃতি স্থান তীরে রাখিয়া মীরপুরের দক্ষিণে বুড়িগঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে।

টঙ্গী নদী তুরাগের শাখা।

বংশী—ব্রহ্মপুত্রের শাখা নদী; ময়মনসিংহ জেলা হইতে আসিয়া সাভারের সন্নিকটে ধলেশ্বরীতে পড়িয়াছে।

বালু—লক্ষ্যার উপনদী, রূপগঞ্জ থানার দক্ষিণে ডেমরার নিকটে লক্ষ্যাতে পতিত হইয়াছে।

ইছামতী—সাহেবগঞ্জের নিকট ধলেশ্বরী হইতে উৎপন্ন হইয়া মদনগঞ্জের পূর্ব্বদিকে পুনরায় ধলেশ্বরীতে আসিয়া পড়িয়াছে। পশ্চিম ও দক্ষিণ ঢাকাস্থ নদী সমূহ মধ্যে ইছামতীই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। পূর্ব্বে এই নদী জাফরগঞ্জের দক্ষিণে হুরা সাগরের মোহানার বিপরিত দিকে নাথপুরের ফ্যাকটরীর নিকট হইতে উৎপন্ন হইয়া মুন্সীগঞ্জের নিকটে যোগিনী ঘাট পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ধলেশ্বরীর প্রবল আক্রমণের ফলে এই নদীর অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইবার উপক্রম হইয়াছিল।

ধলেশ্বরী নদী ব্রহ্মপুত্রের প্রধান প্রবাহ বলিয়া পরিগণিত হইলে সিঙ্গের ও সাভারের মধ্যবর্ত্তী গাজীখালি নদী, বংশী নদীর কতকাংশ, পাথর ঘাটা ও রামকৃষ্ণদীর মধ্যস্থিত ইছামতী এবং বয়রাগাদী ও মুন্সীগঞ্জের মধ্যবর্ত্তি ইছামতী নদী ধলেশ্বরীর সামিল হইয়া পড়ে।

এলামজানি—যমুনার পশ্চিমদিকস্থ প্রবাহটি এলামজানি নামে সুপরিচিত। এই নদী তাসরির নীলকুঠীর পার্শ্বদেশ স্পর্শ করিয়া আসিয়া কেদারপুর গ্রামের মধ্যদিয়া তিল্লি গ্রামের কিঞ্চিত পশ্চিমে ধলেশ্বরীর সহিত মিলিত হইয়াছে।

আলমনদী—এলামজাদি হইতে উৎপন্ন হইয়া চৌহাট ঝিলে পড়িয়াছে। এই নদী প্রায় ২৮ বৎসর যাবৎ উৎপন্ন হইয়াছে। শালদহ, লবনদহ, গোয়ালিয়া নদী মধুপুরের জঙ্গল হইতে বহির্গত হইয়া তুরাগের সহিত মিলিত হইয়াছে।

এতদ্ব্যতীত আরও কয়েকটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী ঢাকা জেলার বক্ষদেশে উপবীতবৎ শোভা পাইতেছে। ঢাকার নদী সমূহ হইতে প্রায় ১৫০০০৲ টাকা জল কর আদায় হইতে পারে বলিয়া হাণ্টার সাহেব অনুমান করেন।

শতবৎসরের মধ্যে ফরিদপুর ও ঢাকার মধ্য ভাগে নদী কর্ত্তৃক এমন পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে যে তাহা ভাবিতে গেলে বিস্মিত হইতে হয়। স্থল ভাগ জলে, জল ভাগ স্থলে, এবং এক নদীর স্থানে অন্য আর একটা প্রাদুর্ভূত হইয়া পুরাতনকে সম্পূর্ণ নূতনে পরিণত করিয়াছে।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায়

হেড়ম্ব জনপদ ও হিড়িম্বিবংশ।

ভীম ও হিড়িম্বি সংবাদ মহাভারতে বর্ণিত আছে। হিড়িম্বির ভ্রাতা হিড়ম্ব রাক্ষসের বাসস্থান হেড়ম্বরাজ্য নামে প্রসিদ্ধ। কাছাড় জিলাতেই পুরাকালে হেড়ম্ব রাজ্য অবস্থিত ছিল এবং পাণ্ডববীর ভীম এই হেড়ম্ব আগমণ করিয়া হিড়িম্বির পানিগ্রহণ করেন ও উক্ত দম্পতী হইতে কাছাড়ী জাতির উৎপত্তি হয় এইরূপ বিশ্বাস এতদ্দেশের সর্ব্বত্র প্রচলিত। কাছাড় জিলাকেই প্রাচীন হেড়ম্বরাজ্যজ্ঞানে মাইবং ও খাসপুরের কাছাড়ী রাজগণ 'হেড়ম্বেশ্বর' উপাধিতে ভূষিত হইয়া আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করিতেন এবং সমগ্র কাছাড়ীজাতি আপনাদিগকে ভীম ও হিড়িম্বির সন্তান বলিয়া পরিচয় দিতে শ্লাঘা জ্ঞান করেন। সমগ্র কাছাড়ীজাতির মধ্যেও এই বিশ্বাস বংশপরম্পরায় চলিয়া আসিতেছে।

এবম্বিধ বিশ্বাস ও জনশ্রুতি কত দূর সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত এখানে আমরা তাহার আলোচনা করিব। বেদব্যাস বিরচিত সংস্কৃত মহাভারতে হেড়ম্ব রাজ্যের অবস্থিতি সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত হইয়াছে।—

"এদিকে পাণ্ডবগণ মাতৃসমভিব্যাহারে রজনীযোগে বারণাবত নগর হইতে বহির্গমনান্তর নৌকারোহণপূর্ব্বক অতি ত্বরায় গঙ্গা পার হইলেন। পরে নক্ষত্র দ্বারা দিক্ নিরূপণ করিয়া স্থলপথে ক্রমাগত দক্ষিণদিকে গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা পথিমধ্যে এক মহারণ্যে প্রবেশ করিলেন।" (পঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়।)

"ক্রমে সায়ংকাল উপস্থিত হইল, ঐ সময় তাঁহারা আর এক নিবিড় অরণ্যানী মধ্যে প্রবেশ করিলেন।" (একপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়।)

"ঐ বনের অনতিদূরবর্ত্তী বিশাল এক শালবৃক্ষ ছিল তদুপরি মহাবল পরাক্রান্ত নর-মাংসাশী হিড়িম্ব নামা এক রাক্ষস বাস করিত। * * * হিড়িম্ব পাণ্ডবগণের মাংসভক্ষণ ও রুধিরপান করিবার নিমিত্ত সাতিশয় ব্যগ্র হইয়া স্বীয় ভগিনী হিড়িম্বাকে আহ্বান করিয়া কহিল—যাও ত্বরায় উহাদিগকে মারিয়া আন দ্বিপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়।

[কালীপ্রসন্ন সিংহ কর্ত্তৃক অনূদিত।]

উপরে উদ্ধৃত বর্ণনা হইতে স্পষ্টই অনুমিত হয় যে হিড়িম্বা রাক্ষসের রাজ্য—"হেড়ম্ব," বর্ত্তমান পঞ্জাব প্রদেশে—দিল্লীর নিকটবর্ত্তী বারণাবত নগরের দক্ষিণে এক মহারণ্যে অবস্থিত ছিল। পাণ্ডবগণ বারণাবত হইতে এক দিবসেই তথায় উপনীত হইতে সক্ষম হইয়াছিলেন। ভারতের পূর্ব্ব সীমান্তে অবস্থিত সুদূর কাছাড়ে হেড়ম্ব রাজ্যের অবস্থিতি নহে। অন্ততঃ মহাভারতের উক্তি অনুসারে তাহা সমর্থন করা যায় না।

কাছাড়ীদিগের মধ্যে প্রচলিত জনশ্রুতি হইতে এই মাত্র অবগত হওয়া যায় যে অতি প্রাচীন কালে তাহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ ডালাওব্রা ও সাঙ্গীব্রা নদীদ্বয়ের সঙ্গমস্থলে, সমুদ্রের উপকূলে বাস করিত। সেই স্থানের প্রাকৃতিক দৃশ্য অতীব মনোহর ছিল। একটি বিশাল বটবৃক্ষ দিঙ্‌মণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া রাজ্যের শোভা বর্দ্ধন করিত। কালক্রমে রাজ্য জনাকীর্ণ হইলে পর বয়োবৃদ্ধগণের পরামর্শানুসারে রাজা রাজ্য পরিত্যাগের সংকল্প করিলেন। এবং অনতি বিলম্বে অধিকাংশ প্রজাবৃন্দ সমভিব্যাহারে তিনি সাঙ্গিব্রা উজান বাহিয়া নীলাচল অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন। কাহারও কাহারও সিদ্ধান্ত এই যে কাছাড়ীগণ মঙ্গোল জাতীয়। তাহাদের আদীম বাসস্থান চীনদেশ। কাছাড়ীদিগের কথিত জনশ্রুতি অনুসারে কেহ কেহ অনুমান করেন যে উক্ত চীনদেশের ইয়াংশিকিয়াং ও হোয়াংহো নদীদ্বয়ের মোহানায় তাহাদের পূর্ব্বপুরুষগণের বাস ছিল। পক্ষান্তরে এরূপ অনুমান করাও অসঙ্গতনহে—যে পুরাকালে লৌহিত্যসাগরের উত্তরতীরে লৌহিত্যনদের মোহানায় কাছাড়ীদিগের বাস ছিল।

যাহা হউক এই অনুমান দ্বয়ের যে কোনটী সত্য হউক না কেন এশিয়ার মানচিত্র খুলিলে স্পষ্টই বুঝা যাইবে যে মহাভারতোক্ত হেড়ম্ব রাজ্য প্রাচীন কাছাড়ে হইতেই পারে না।

হেড়ম্ব রাজ্য সম্বন্ধে বিশ্বকোষ—

ব্রহ্মখণ্ড ও দেশাবলী নামক সংস্কৃত গ্রন্থ অবলম্বনে বিশ্বকোষ হেড়ম্বরাজ্যের আলোচনা করিয়াছেন।

১। "ব্রহ্মখণ্ড নামক এক খানি ভবিষ্য পুরাণীয় গ্রন্থে হেড়ম্ব জন পদের প্রথম নামোল্লেখ পাওয়া যায়। যথা—

"বরেন্দ্র তাম্রলিপ্তঞ্চ হেড়ম্ব মনিপুরকম্।

লৌহিত্যশ্চৈপুরং চৈব জয়ন্তাখ্যং সুসঙ্গকম্"

এখানকার অধিষ্ঠাত্রী দেবী রণচণ্ডী।

"হেড়ম্ব দেশ মধ্যে চ রণচণ্ডা বিরাজতে।

বরবক্রা সরিৎ পার্শ্বে হিড়িম্বা লোক দুর্জ্জয়া॥"

ভং ব্রহ্মখণ্ড ২৫। ৪১

২। "দেশাবলী নামক (১৬৫০ শকে রচিত) সংস্কৃত গ্রন্থপাঠে জানা যায় যে, এক সময়ে হেড়ম্ব রাজ্য উত্তরে কামরূপ ও ধর্ম্মপুর, পূর্ব্বে মনিপুর সীমা, দাক্ষিণে মন্থরা এবং পশ্চিমে শিয়ালকোট পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল।"

দেশাবলী গ্রন্থে ইহাও বর্ণিত আছে যে রাজা সুরদর্প নারায়ণ ৫০ বৎসর রাজত্ব করিলে পর তৎপুত্র রামচন্দ্র সিংহাসন লাভ করেন।

কাছাড়ী রাজ্য কোন সময় হইতে হেরম্ব রাজ্য নামে পরিচিত হইয়া আসিতেছে বর্ত্তমানে নির্ণয় করা কঠিন। বস্তুতঃ প্রাচীন কাছাড় রাজ্য হেরম্ব নামে পরিচিত থাকা সম্বন্ধে জনশ্রুতি ব্যতিরেকে অন্য কোন বিশিষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় না।

অধিকন্তু, ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত কাছাড়ের সমতল ভাগ ত্রিপুরার অন্তর্গত ছিল। সেই সময়ে কাছাড়ের সমতল ভাগ হেড়ম্ব রাজ্য নামে পরিচিত হওয়া সম্ভবপর নহে।

কাছাড়ে কাছাড়ী জাতির আগম এবং ব্রাহ্মণ ধর্ম্মের প্রাধাণ্য হইতেই এই স্থানের নাম হেড়ম্ব হইয়াছে। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ কাছাড়ের সমতল ভাগ কাছাড়ী রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। তৎপূর্ব্বে বরবক্র উপত্যকা বা কাছাড়ের সমতল ভাগ হেরম্ব নামে অভিহিত হওয়ার কথা ব্রহ্মখণ্ড ভিন্ন অপর কোন গ্রন্থে দেখা যায় না। ইহা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে কাছাড়ের সমতল ভাগে কাছাড়ী দিগের আগমনের পর ব্রহ্মখণ্ড রচিত হইয়াছে। ইহা আধুনিক গ্রন্থ, অতএব ইহাকে প্রামাণিক গ্রন্থরূপে অবলম্বন করা যাইতে পারে না।

এক্ষণে বিচার করিয়া দেখা কর্ত্তব্য যে দেশাবলীর ঐতিহাসিক তত্ত্ব নির্ভরযোগ্য কিনা।

প্রথমতঃ সুরদর্পের ৫০ বৎসর রাজত্বের বিবরণ সম্পুর্ণ ভ্রান্তিমূলক; কারণ সুরদর্প নারায়ণ ১৭০৮ খ্রীষ্টাব্দে আহমরাজ রুদ্র সিংহ কর্ত্তৃক সিংহাসনে স্থাপিত হন ১৭৩০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার রাজত্বে নারদীয় পুরাণ বঙ্গভাষায় অনুদিত হয়। তৎপর তাঁহার পুত্র ধর্ম্মধ্বজ এবং তাঁহার পর কীর্ত্তিচন্দ্র ক্রমান্বয়ে রাজ্য ভোগ করেন। শেষোক্ত রাজা ১৭৩৬ খৃষ্টাব্দে মনিরাম নামক কোনও ব্যক্তিকে একখানা সনদ দান করিয়াছিলেন। এস্থলে ইহাও উল্লেখ যোগ্য যে, যে রামচন্দ্র কীর্ত্তিচন্দ্রেরে পরবর্ত্তি রাজা তিনি সুরদর্পের পুত্র নহেন। দ্বিতীয়তঃ ১৬৫০ শকাব্দের (১৭২৮ খৃঃ) রচিত দেশাবলী গ্রন্থে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের ঘটনা সমূহের উল্লেখ বড়ই সন্দেহ জনক এবং ইহাতে ভ্রম প্রমাদের অভাব নাই। সুতরাং এইরূপ আধুনিক গ্রন্থে হেড়ম্ব শব্দের উল্লেখ দ্বারা বর্ত্তমান কাছাড়ে প্রাচীন হেড়ম্ব রাজ্যের অবস্থিতি প্রমাণিত হইতেছে না।

আসামে কাছাড়ী ও অনুরূপ ভাষাবলম্বীজাতি-সমূহের শ্রেণীবিভাগ—

পৌরাণিক ও মধ্য যুগে এই সকল জাতি আসামে কিরূপ বিস্তৃতি ও প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল, নিম্নে উদ্ধৃত তালিকা * হইতে তাহার আভাস পাওয়া যাইবে।

সংখ্যা	ভাষা	মোট
১।	চুটিয়া (১)	২০৪
২।	গারো (২)	১,১৫,০৮০
৩।	হাজং	৯৯৫

(১) এই জাতীয় ৮৭,০০০ লোকের মধ্যে অধিকাংশই হিন্দুধর্ম্ম এবং জাতীয় আসামী ভাষা গ্রহণ করিয়াছে। বর্ত্তমানে ৩০০ মাত্র লোকভাষা ব্যবহার করিতেছে।

(২) এতদ্ভিন্ন পূর্ব্ববঙ্গে ২৮,৩১৩।

৪।	১। আসামের কাছাড়ী (৩)	১৭৭,৪৩০
	২। পার্ব্বত্য কাছাড়ী	৬৮৯০০
		২,৬৫,৯০১
৫।	কোচ (৪)	৫৮০০
৬।	লালুং	৪০১৬০
৭।	রাভা	৩১৩৭০
৮।	তিপ্‌রা (৫)	৮৩০০

ভাষা ৮ ; মোট ভাষাবলম্বী লোক —

আসামে ৪৬৭৯১০

পূর্ব্ববঙ্গে ১৫৮৮৭৪

৬২৬৭৮৪

উদ্ধৃত তালিকা হইতে কাছাড়ী ও তৎসম্পর্কিত জাতিসমূহের লোক সংখ্যা নিরূপণ করা কঠিন। কারণ পূর্ব্বভারতে এই সকল জাতীয় অসংখ্য লোক কৌলিক ধর্ম্ম, ভাষা এবং আচার ব্যবহার পরিত্যাগ করিয়া বর্ত্তমান হিন্দুসমাজের বিভিন্ন স্তরে প্রচ্ছন্ন ভাবে অবস্থিতি করিতেছেন। কেহ শাক্ত, কেহ বৈষ্ণব, কেহ বা ইস্‌লাম ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে এবং অনেকে আবার হিন্দু সমাজেও স্বতন্ত্র জাতি রূপে পরিণত হইয়াছে।

(৩) এতদ্ভিন্ন পূর্ব্ববঙ্গে ২৫,০১১।

(৪) এই জাতি উত্তরবঙ্গ ও আসামে বহু বিস্তৃত। ইহারা হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া জাতীয় ভাষা ও ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছে। বর্ত্তমানে ইহারা আসামী অথবা বাঙ্গলা ভাষা ব্যবহার করে, কেহ কেহ মুসলমান ধর্ম্মও গ্রহণ করিয়াছে। আসামে কোচজাতি সম্মানিত সুতরাং বহু পার্ব্বত্যজাতি হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াই কোচ বলিয়া আত্ম পরিচয় দিয়া থাকে।

(৫) এতদ্ভিন্ন পূর্ব্ববঙ্গে ১০,৫৫০।

পুরোহিত, শাসক বর্গ, এবং নিকটবর্ত্তী সভ্য জাতির ভাষা, প্রত্যেক জাতির ভাষা ও জাতীয় আদর্শের উপর অলক্ষিত ভাবে নানাবিধ পরিবর্ত্তন সংগঠন করে; ইহাদেরও সম্ভবতঃ এরূপ করিয়া থাকিবে।

এখনও কাছড়ী ‘ডি’ (জল) ধাতুর সহিত পূর্ব্ববঙ্গে প্রচলিত অনেক শব্দ জড়িত রহিয়াছে। ডাবর, ডাওর, ডাব, ডুব, ডিঙ্গি, ডগরা, প্রভৃতি শব্দ বাঙ্গলা ভাষায় কি ভাবে স্থান পাইয়াছে অনুসন্ধান যোগ্য। এস্থলে ইহাও উল্লেখ যোগ্য যে বহু শতাব্দী যাবৎ আসাম উপত্যকা হইতে কাছাড়াদিগের প্রাধান্য লোপ হইয়া থাকিলেও বর্ত্তমান অসামের নদী সমূহের নামের সহিত উপরি উক্ত ডি ধাতু জড়িত। ডিক্রু, ডিপু, ডিজু, ডিখু, ডিহিং ডিসাং, ডিক্রাং প্রভৃতি নদীর নামও প্রাচীনকালে এই জাতির দেশময় বিস্তৃতি ও প্রাধান্য ঘোষণা করিতেছে।

কাছাড়ী—কামরূপ হইতে পলায়নের পর ডিমচা কাছাড়ী জাতি বহু বৎসর কোচদিগের সহিত যুদ্ধ করে। অবশেষে তাহারা কোচদিগকে পরাস্ত করিয়া কচারির হাট স্থাপিত করে। “কোচ অরিগণ” কালক্রমে নিকটবর্ত্তী ব্রহ্মপুত্র উপত্যকাবাসিগণ হইতে তাহাদের বর্ত্তমান জাতি বাচক কাছাড়ী উপাধি প্রাপ্ত হয়।

পরে কাছাড়ীগণ দিমাপুরে একটি পরাক্রান্ত রাজ্য স্থাপন করিলে রামচা, লালুং প্রভৃতি আসামের কয়েকটি উপজাতি কাছাড়া উপাধি গ্রহণ করিতে আরম্ভ করে। সুতরাং এই জাতিবাচক উপাধির গৌরব হ্রাস হওয়ায় বর্ত্তমানকালে ডিমাচাদিগের মধ্যে এই উপাধি আদৃত নহে।

ডিমাচা—উত্তর কাছাড়স্থ কাছাড়ীগণ আপনাদিগকে ডিমাচা নামে অভিহিত করে। ডিমা চা (ডুই মা= বড় নদী ; ছা=সন্তান) শব্দে বড় নদীর তীরবাসী লোক অথবা বৃহৎ নদীর সন্তান বুঝায়।

কাছাড়ীরা ব্রহ্মপুত্র নদীকে ডিমা বলিয়া থাকে। এই নদীর উপত্যকায় বহুকাল বসবাস করার পর শিবসাগর জিলায় ডিমাপুরে রাজ্য স্থাপন করিলে ডিমাচাদিগের পুরী ডিমাপুর নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে।

বৰ্ম্মণ—ডিমাচা জাতির মধ্যে যাহারা আপনাদিগকে ভীমের বংশধর জ্ঞানে ক্ষত্রিয়োচিত উপনয়ন গ্রহণ ও হিন্দুধর্ম্মের অন্যান্য অনুষ্ঠান পালন করিতেছে তাহারাই বর্ম্মণ নামে আপনাদের পরিচয় প্রদান করে। উত্তর কাছাড়স্থ মাতৃ (হিড়িম্বি) ধর্ম্মাবলম্বিগণ ডিমাচা ও কাছাড়ী এই উভয় নামে পরিচিত।

ব্রহ্মপুত্রের উত্তর তীরে কাছাড়ী রাজত্ব—

কথিত আছে ব্রহ্মপুত্রের মোহানা পরিত্যাগের পর "ঘটোৎকচ বংশীয়" রাজা কৌণ্ডিলানারায়ণ ব্রহ্মপুত্র উজান বাহিয়া নদীর উত্তর পারে বর্ত্তমান নদিয়া জিলায় কৌণ্ডিল্য নগর স্থাপন করেন এবং এই স্থানে কাছাড়ী রাজগণ বহুকাল প্রতিপত্তির সহিত রাজত্ব করিতে থাকেন। এই রাজ্য কাছাড়ী ভাষায় হালালী (লালী-উজ্জ্বল) নামে অভিহিত হয়। রাজা মেঘবল নারায়ণ পর্য্যন্ত কাছাড়ী রাজগণ হালালীতে রাজত্ব করেন। ব্রহ্মপুত্র মোহানায় ২ জন মন্ত্রী ও অন্যান্য বহুলোক রহিয়া যায় কিন্তু ইহাদের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না।

হালালী রাজ্য পরিত্যাগ সম্বন্ধে একটি জনশ্রুতি আছে পার্ব্বত্য জাতির উৎপাতে উত্যক্ত হইয়া জনৈক কাছাড়ী রাজা ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণ পারে রাজ্য স্থাপন করিতে মনস্থ করিলেন, কিন্তু অসংখ্য প্রজা, গৃহপালিত পশু এবং দ্রব্যাদি সহ ব্রহ্মপুত্র নদ অতিক্রম করিয়া পরপারে যাওয়া দুষ্কর বিবেচনায় রাজা একান্ত চিন্তাকুল হইলেন। যাহা হউক দৈবানুগ্রহে এক দিবস রাত্রিতে রাজা স্বপ্নযোগে জানিতে পারিলেন যে কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে একহস্ত পরিমিত জলের নীচে একটি বাঁধ পাওয়া যাইবে কিন্তু যদি রাজা নদী অতিক্রম কালে পশ্চাৎদিকে দৃষ্টিপাত করেন তবে বাঁধ ভাঙ্গিয়া যাইবে। রাজ্য পরিত্যাগ সংকল্প 'বীর ঢোল' বাজাইয়া প্রজাবর্গকে জানাইয়া দেওয়া হইল। প্রায় অর্দ্ধেক লোক উত্তীর্ণ হইয়াছে এমন সময় নিষেধ সত্বে ও রাজা কৌতু-হলাক্রান্ত হইয়া পশ্চাৎদিকে ফিরিয়া চাহিলেন। তম্মুহূর্ত্তেই বাঁধ ভাঙ্গিয়া যায়। এবং বহু লোক প্রাণ-ত্যাগ করে। এক তৃতীয়াংশ লোক ও ৪ জন মন্ত্রী হালালীতে ফিরিয়া যায়, কিন্তু রাজা ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণ পারে একটি রাজ্য স্থাপন করিলেন। কালক্রমে কাছাড়ী রাজগণ এস্থান হইতে কামরূপ আক্রমণ ও অধিকার করিতে সক্ষম হন। যাহারা নদী গর্ভ হইতে বহু কষ্টে নল ও খাগরা অবলম্বনে তীরে পঁহুছিতে সক্ষম হয়, কথিত আছে তাঁহাদের বংশধরগণ নলবাড়ী ও খাগড়া বাড়ীর লোক বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করে;

প্রাচীন কামরূপ এবং কামরূপে কাছাড়ী রাজত্ব:—

অতি প্রাচীন কালে মহীরাং দানব, হটকাসুর, সম্বরাসুর প্রভৃতি অনার্য্য রাজগণ কামরূপে রাজত্ব করিতেন। তাঁহারা কাছাড়ী কি অন্য কোন জাতীয় ছিলেন তাহা বর্ত্তমানে নির্ণয় করিবার উপায় নাই। পুরাণে বর্ণিত কেভো জাতীয় ম্লেচ্ছ, কুবচ ও কিরাতগণ বর্ত্তমানে মেচ, কোচ ও তিপ্‌রা নামে অভিহিত হইতেছে কিন্তু কাছাড়ী জাতি পূর্ব্বকালে কি নামে অভিহিত হইত তাহা নিশ্চিতরূপে জানা যায় না। পুরাণে প্রাচীন কামরূপ সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক বিবরণ রহিয়াছে কিন্তু এই সকল পৌরাণিক কাহিনী হইতে ঐতিহাসিক সত্য উদ্ধার করা একান্ত দুরূহ।

৬৩০ খৃঃ কুমার ভাস্করবর্ম্মণ কামরূপে রাজত্ব করেন। কথিত আছে উপর্য্যুক্ত রাজা ব্রহ্মরাজবেশে শিলাদিত্যের যজ্ঞে গমন করিয়াছিলেন। ইহার কিছুকাল পরে কাছাড়ী রাজবংশ কামরূপের সিংহাসন অধিকার করেন।

কামরূপের ব্রহ্মপুত্রবংশীয় রাজগণের কথা আসামের সর্ব্বত্রই শুনিতে পাওয়া যায়। কাছাড়ী জাতিও আপনা-দিগকে ডিমাচা (বৃহৎ নদীর সন্তান) বলিয়া পরিচয় দেয়। এই দুই ঘটনার মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় হইবে সন্দেহ নাই।

'কামরূপে কাছাড়ী রাজগণ এক শত বিশ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিল' এইরূপ একটি জনশ্রুতি কাছাড়ীদের মধ্যে প্রচলিত আছে। কামরূপ পরিত্যাগ সম্বন্ধে এইমাত্র অবগত হওয়া যায় যে কোন প্রবল শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া কাছাড়ী জাতী কামরূপ হইতে পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়াছিল।

কামরূপ পরিত্যাগের পর হইতে কাছাড়ীদের মধ্যে বহু পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইতে থাকে। হুলুবাম, খাসায়-বাম, বঙ্গগড়া, গড়গাও, কচারীরহাট প্রভৃতি স্থান অতিক্রম করিয়া অবশেষে জোরহাট জিলার অন্তর্গত রেংমা পাথার নামক স্থানে তাহাদের রাজধানী স্থাপিত হয়। অতঃপর তাহারা ধলেশ্রী নদীর তীরে দিমাপুরে ১৫৪৬ খৃঃ পর্য্যন্ত রাজত্ব করে।

ব্রহ্মপুত্রের মোহনা ও হালালী রাজ্য পরিত্যাগে ইহাদের মধ্যে অনেক পরিবর্ত্তন হয়, কিন্তু কামরূপ হইতে দিমাপুর পর্য্যন্ত যে সকল স্থান অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইতে হইয়াছিল প্রায় প্রত্যেক স্থানেই ক্ষুদ্র বৃহৎ অনেক দল লোক রহিয়া যায়। এই ভাবে ব্রহ্মপুত্রের উভয় তীরে, আসামের নানা স্থানে কাছাড়ী জাতি নানা দলে বিক্ষপ্ত ও বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। কয়েকটি বৃহৎ শাখা পরাধীন অবস্থায়ও জাতীয়ত্ব রক্ষণে সক্ষম হয়। অপর সকলে পরাধীনতায় জাতীয় ভাষা ও ভাব পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়, অথবা পার্ব্বত্য অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া কয়েকটি উপজাতির সৃষ্টি সাধন করে।

এইরূপে কাছাড়ী জাতীয় একটীমাত্র অংশ শিবসাগর ও পরে কাছাড় জিলায় রাজ্য স্থাপন করত: আপনা-দিগের স্বাধীনতা রক্ষায় সমর্থ হইয়াছিল। ইহারাই কালক্রমে হিড়িম্ব বংশরূপে পরিচিত হইয়াছে।

শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র গুহ।

গ্রন্থ সমালোচনা।

শৈব্যা—শ্রীনরেন্দ্রনাথ মজুমদার প্রণীত। ঢাকা আশুতোষ লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত, মূল্য ছয় আনা। গ্রন্থ খানা দুই কালীতে, বড় বড় অক্ষরে ছাপা ও বহু হাফটোন চিত্রে সুশোভিত। গ্রন্থের বহিরাবরণও সুন্দর—মৃত পুত্র ক্রোড়ে অশ্রু পরিপ্লুতা শৈব্যার বদনে যে বিষাদরেখা ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা বাস্তবিকই শিল্পীর শিল্প চাতুর্য্যের পরিচায়ক হইয়াছে।

গ্রন্থকার মাসিক পত্রের পাঠকগণের নিকট পরিচিত। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে তিনি হরিশ্চন্দ্র ও শৈব্যার চির পরিচিত পুরাতন কাহিনী ভাষা ও ভাব সম্পদে সম্পূর্ণ নূতন জ্যোতিতে উদ্ভাষিত করিয়া তুলিয়াছেন—গ্রন্থের ভাষা সহজ ও সুন্দর, সরল ও সুখপাঠ্য। ভাষার লালিত্যে পত্নীর সহিষ্ণুতা ও আদর্শপ্রেম উজ্জ্বলরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। আমাদের ভরসা আছে এই বিলাসিতার যুগেও এইরূপ গ্রন্থ বাঙ্গালার ঘরে ঘরে অমৃত বর্ষণ করিবে।

মক্কা-সরিফের ইতিহাস—মৌলবী আবদুল জব্বার প্রণীত। বঙ্গীয় পাঠকগণের মক্কা-সরিফের ইতিহাস পাঠের সৌভাগ্য এতদিন ছিল না। মৌলবী সাহেব অতি প্রাঞ্জল ভাষায় তাঁহাদের এই ধর্ম্মক্ষেত্রের ইতিহাস বাঙ্গালার সাহিত্য প্রাঙ্গনে উপস্থিত করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের একটি গুরুতর অভাব দূর করিয়াছেন। মৌলবী সাহেবের সূক্ষ্মতত্ত্বান্বেষণের ফলে গ্রন্থখানি মূল্যবান এবং সারবান হইয়াছে। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে এই গ্রন্থের অভিনন্দন করিতেছি।

১ম খণ্ড। ঢাকা, চৈত্র, ১৩১৮ সাল। ১২শ, সংখ্যা।

ভারতবর্ষের বৈষয়িক তথ্য-সংগ্রহ *

আজকাল শিক্ষিত ভারতবর্ষ যেরূপভাবে স্বদেশ হিতৈষণায় অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিয়াছে তাহা ভাবিলে নিরাশ হৃদয়েও আশার সঞ্চার হয়। এই অভিনব প্রেরণা সমগ্রদেশের মধ্যে নানা প্রকারের আন্দোলন ও অনুষ্ঠান সৃষ্টি দ্বারা স্বকীয় শক্তির পরিচয় দিতেছে এবং ক্রমশঃ চরিতার্থতার দিকে অগ্রসর হইতেছে। ইহারই ফলে আজ প্রত্যেক শিক্ষিত বাঙ্গালীর জীবন কেবল পরিবার পোষণমাত্র কর্ত্তব্যের সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে আবদ্ধ না থাকিয়া এক বিশাল কর্ম্মক্ষেত্র লাভ করিয়াছে। এতদিন ভারতবাসী প্রকৃত মনুষ্যত্ব হীন হইয়া গৃহপালিত পশুর ন্যায় স্বীয় গৃহসেবায় নিযুক্ত ছিলেন। আজ তিনি চিরাভ্যস্ত ক্ষুদ্র স্বার্থচর্চ্চা বর্জ্জন করিয়া যথার্থ মানুষ হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। তিনি এখন বুঝিয়াছেন যে শুধু পারিবারিক জীবন মানুষের একমাত্র লক্ষ্য ও আদর্শ হইলে মনুষ্যত্বের পূর্ণবিকাশ হইতে পারে না—বরং তাহার বিপর্য্যয় অবশ্যম্ভাবী।

আধুনিক ভারতে সমাজ সেবা

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজের কল্যাণ সাধন মানুষের স্বাভাবিক কর্ত্তব্য। সেই কর্ত্তব্য লঙ্ঘন করিলে মনুষ্যস্বভাবকেও এক রকম নষ্ট এবং তৎপরিবর্ত্তে পশুত্বের প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই গভীর অতিপ্রয়োজনীয় তত্ত্বটী বহুকাল পূর্ব্বে সুপ্রসিদ্ধ গ্রীক্ পণ্ডিত য়্যারিষ্টটল সর্ব্ব প্রথম জগতে প্রচার করিয়াছেন বলিয়া শিক্ষিত সমাজের বিশ্বাস। দুঃখের বিষয় ভারতবাসীও জানেন না যে তাঁহারই দেশে প্রায় ২৫০০ বৎসর পূর্ব্বে কর্ম্মবীর ব্রাহ্মণ, সাম্রাজ্যসংস্থাপক বাৎস্যায়ন, তাঁহার অর্থশাস্ত্র ও বৃহৎ নীতিশাস্ত্রে মানব সমাজে ঐ তত্ত্বের

প্রাচীন ভারতে সমাজ সেবা

* চুঁচুড়া সাহিত্য সম্মিলনে পঠিত—ফাল্গুন ১৩১৮

প্রথম অবতারণা করিয়া গিয়াছেন। চাণক্যমতে "মনুষ্যাণাং বৃত্তিরর্থঃ—মনুষ্যবতী ভূমিরিত্যর্থঃ"। অর্থাৎ মানবসমাজ সংরক্ষণই মানবের স্বাভাবিকী বৃত্তি। তাঁহার মতে ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গের মধ্যে 'অর্থ'ই সর্ব্বপ্রধান। "'অর্থ এব প্রধানঃ' ইতি কৌটিল্যঃ—অর্থমূলৌ হি ধর্ম্মকামাবিতি।" হিন্দুসমাজ প্রতিষ্ঠাতৃগণ উক্ত সমাজ তত্ত্বের প্রচার আরও নানাস্থানে করিয়া গিয়াছেন তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহারা বেশ জানিতেন যে ধর্ম্মরক্ষার মূলে সমাজরক্ষা। যিনি সমাজ সেবা বিবর্জ্জিত তিনি নিশ্চয়ই ধর্ম্মবিচ্যুত। সুতরাং স্বদেশসেবা হিন্দুর ধর্ম্ম সেবান্তর্গত। হিন্দুর আদর্শচরিত্র রামচন্দ্রকে বাল্মীকি সদাই "সর্ব্বলোক হিতে রতঃ" দেখাইয়াছেন।

পাশ্চাত্য পণ্ডিত বেকন্ বলিয়াছেন যে মনুষ্যস্বভাবের উন্নতি বিধান এবং দোষসংস্কার অনেকটা জীবনে লক্ষ্য ও আদর্শের উপর নির্ভর করে। ভারতবাসীর জীবনে যতদিন গার্হস্থ্যজীবনই একমাত্র লক্ষ্য হইয়া পড়িয়াছিল ততদিন ভারতবাসী ঘোর স্বার্থপর বলিয়া জগতে পরিচিত ছিলেন। আজ নবযুগের সঞ্জীবনী প্রেরণায় ভারতবাসীর চরিত্র এক অপূর্ব্ব রূপ ধারণ করিয়াছে। সেইরূপ দেখিলে মনে হয় বিশ্বসংসারের নির্ম্মম জীবন-সংগ্রামে ভারতবাসীর লোপ অবশ্যম্ভাবী নহে।

এই আশায় কোন্ কোন্ উপায় অবলম্বন করিলে সর্ব্বতোমুখী স্বদেশহিতসাধনের চেষ্টা প্রকৃষ্টরূপে ফলবতী হইতে পারে তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। বলা বাহুল্য দেশের কল্যাণসাধন করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে দেশের প্রকৃত অবস্থা ও অভাব সম্যক্ পর্য্যালোচনা করা একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে এতদুভয় সম্বন্ধেই ভারতবাসী-জনসাধারণের অভিজ্ঞতা অত্যল্প এবং অনেকক্ষেত্রে ভ্রান্তিমূলক। আমাদের দেশ ও দেশের হিতসাধনে যত নিঃস্বার্থ শক্তি প্রয়োগ হইতেছে তৎসমুদয়ই অনেকস্থলে ব্যর্থ হইতে পারে এরূপ আশঙ্কা অসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে আমাদের বর্ত্তমান অবস্থার একখানি যথার্থ চিত্র অঙ্কিত করিবার চেষ্টা হইয়াছে।

আমাদের আধুনিক অবস্থা ও অভাব

আমাদের নিতান্ত দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে দেশের প্রকৃত অবস্থা জানিতে গেলে যে সকল উপকরণসংগ্রহ করা দরকার সে সমস্ত উপকরণ আমাদের দেশে এখনও উপযুক্তরূপে সংগৃহীত হয় নাই। উপযুক্ত তথ্যসংগ্রহের অভাবে আমাদের দেশের যথার্থ অবস্থা সম্বন্ধে এতই মতভেদ হয় যে অনেক সময়ে আমাদের দেশহিতৈষিগণ পরস্পর বিরোধী উপায় অবলম্বন করিয়া স্বদেশের কল্যাণ সাধন বিষয়ে পরস্পরের প্রতি বিরুদ্ধাচরণ করিয়া ফেলেন, এবং কার্য্যসাধিকা সংহতি একবারেই অসম্ভব হইয়া পড়ে। অন্ধকারে ঢিল মারিলে সে ঢিলটী বিঘ্নকে পরাস্ত করিতে সক্ষম হউক কি না হউক পরস্পরের গাত্রে বর্ষিত হইবার বিশেষ সম্ভাবনা। অজ্ঞানই অনৈক্যের মূল। আমাদের দেশ-হিতকরী যাবতীয় চেষ্টাকে সৎপথে, গন্তব্য ও লক্ষ্যের দিকে চালিত করিতে হইলে অগ্রেই যে নিবিড় অজ্ঞান-তিমির আমাদের কর্ম্মক্ষেত্রকে আচ্ছন্ন করিয়াছে তাহার অপসারণ করিতে হইবে। তবেই বহুধা প্রবাহিতা জাতীয় শক্তি এক মঙ্গলগঙ্গায় মিলিত হইয়া সফলতার সাগরসঙ্গমে উপনীত হইবে।

বৈষয়িক অবস্থা সম্বন্ধে আমাদের অজ্ঞতা

উপযুক্ত তথ্য সংগ্রহের অভাবে দেশের প্রকৃত অবস্থার পরিচয় পাওয়া এক প্রকার অসম্ভব এবং কোন্ কোন্ বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ আবশ্যক তৎসম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান না থাকাতে সংগ্রহ কার্য্যও বিশেষ কষ্টসাধ্য। বিজ্ঞানানুশীলনে অগ্রণী পাশ্চাত্য মহাদেশেও ধনবিজ্ঞান ও অর্থনীতি বিষয়ক শাস্ত্রের উৎপত্তি ও আলোচনা নিতান্ত আধুনিক। সুতরাং ইউরোপের অনুগামী ভারতবর্ষে ধনবিজ্ঞানের আলোচনা যে এখনও আরম্ভ হয় নাই সে বিষয়ে আর আশ্চর্য্য কি? কিন্তু ধনবিজ্ঞানের নিয়ম ও সিদ্ধান্তগুলির সহিত আমাদের উৎসাহী কর্ম্মিগণের সম্যক্ পরিচয় না হইলে তাঁহাদের চিন্তা ও শক্তির অপব্যয় অবশ্যম্ভাবী সুতরাং তাহার প্রতিবিধান সর্ব্বাগ্রেই কর্ত্তব্য।

এ কথা সকলেই স্বীকার করিবেন যে দেশের প্রকৃত অবস্থা না জানিলে দেশের শাসনকার্য্যও সুসম্পন্ন হইতে

পারে না। সুতরাং ভারতগবর্ণমেণ্টও তদ্বিষয়ে যে যত্নবান্ হইবেন সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি? গবর্ণমেণ্টের Statistical Department তথ্য সংগ্রহ বিভাগ হইতে প্রতি বৎসর কত সারুভে, বিবরণী এবং Blue book মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়া শিক্ষিত ব্যক্তিগণের সমক্ষে দেশের অবস্থার প্রতিকৃতি নানারূপে দেখাইতেছে। ঐ সমস্ত বিবরণী ধারাবাহিক পাঠ করিলে দেশের অবস্থা অনেকটা জানা যায়। কিন্তু আমাদিগের এবিষয়ে স্বতন্ত্র চেষ্টা করা প্রয়োজন, কারণ গবর্ণমেণ্টের সংগৃহীত তথ্য হইতে দেশের সম্পূর্ণ অবস্থা জানা যায় না।

ভারত গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক দেশের বৈষয়িক তথ্য সংগ্রহ

গবর্ণমেণ্টের Blue book গুলি হইতে আমাদিগের ধনী সম্প্রদায়ের খবর কতকটা পাই, রাজস্ব বৃদ্ধির কি কি উপায় ও পথ তাহারও সবিশেষ পরিচয় পাই। আমাদের দেশে অন্যূন বার্ষিক ১০০০৲ টাকা আয়সম্পন্ন ধনী কতজন আছেন, ইহা জানা গবর্ণমেণ্টের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজন। তাহা না হইলে আয়কর income tax আদায় করা অসম্ভব। কিন্তু আমাদের দেশে দারিদ্র্য বাড়িতেছে কি সঙ্গতি বাড়িতেছে এই বিষয়ের মতামত প্রকাশ করা এক প্রকার দুঃসাধ্য, অথবা এই বিষয় লইয়া এত তীব্র মতভেদ হইয়া পড়ে যে প্রকৃত সত্য লাভ করা সুদূরপরাহত। ভারতবর্ষের বর্তমান আর্থিক অবস্থার উন্নতি কি অবনতি ঘটিতেছে এই প্রশ্নের যথার্থ উত্তর দিবার সামর্থ্য আমাদের মধ্যে খুব কম লোকেরই আছে। তাহার কারণ তৎসম্বন্ধে সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইলে আমাদের যে যে বিষয় জানা আবশ্যক তৎসমুদয় আমাদিগের এখনও আয়ত্ত হয় নাই। ইহা কি কম দুঃখের কথা? সুতরাং দরিদ্র জনসাধারণের অবস্থাবিজ্ঞাপক তথ্যের জন্য স্বতন্ত্র চেষ্টা প্রয়োজন।

পাশ্চাত্য সভ্যদেশে জনসাধারণের প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে এইরূপ নিবিড় অজ্ঞানতা কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। সে সমস্ত দেশে গবর্ণমেণ্ট এবং দেশের নেতৃবর্গের সমবেত চেষ্টায় সমগ্র দেশবাসিগণের অবস্থার যথাযথ স্বরূপ ও গতি বিষয়ে জানিবার জন্য যে উপকরণ সংগ্রহ প্রয়োজন তৎসমুদয় নিয়মমত সংগৃহীত হয়। তত্তৎদেশের শাসনকর্তৃগণ উক্ত উপকরণ সমষ্টির প্রতি নিয়ত দৃষ্টি রাখিয়া শাসনতরী নির্ভয়ে চালাইতে থাকেন। আমাদের শিক্ষিত সমাজ অনেক বিষয়ে পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকরণ করিয়াছেন। সেই অনুকরণবৃত্তি যদি উল্লিখিত মঙ্গলপ্রদ বিষয়ে কথঞ্চিৎ নিয়োজিত হয় তাহা হইলে দেশের কল্যাণ সাধন হইবে সন্দেহ নাই।

জনসাধারণের অবস্থা পর্য্যালোচনার উপায়

পাশ্চাত্যদেশে যে প্রণালী অবলম্বিত হইয়া দেশের প্রকৃত অবস্থা নিরূপণ হয় সে প্রণালী ভারতবর্ষে অনায়াসে প্রযোজ্য হইতে পারে। উক্ত প্রণালী অনুসারে উপকরণ সংগ্রহকার্য্য সুসাধিত হইতে পারে। আশা করি ঐ কার্য্য এই সম্মিলন কর্তৃক অনুমোদিত হইয়া বঙ্গদেশের শিক্ষিত সমাজের কর্ত্তব্য বলিয়া গৃহীত হইবে।

কোনও ব্যক্তি দরিদ্র কিম্বা সঙ্গতিপন্ন ইহা স্থির করিবার এক অতি প্রশস্ত উপায় ধনবিজ্ঞানশাস্ত্রে উদ্ভাবিত হইয়াছে। অর্থ বিষয়ে কিঞ্চিৎ পর্য্যালোচনা করিলেই বুঝা যায় যে অর্থের প্রধান লক্ষণ 'অনর্থ' অথবা অভাবের দূরীকরণ। মানুষের অর্থাকাঙ্ক্ষা, অর্থের প্রতি আদর ও আসক্তি আছে—কারণ মানুষ বাসনার দাস, অভাবের অধীন। সেই বাসনাতৃপ্তি, অভাবমোচনের, একমাত্র উপায় বিষয়সম্পত্তি। এই জন্য মানবসমাজে অর্থের এত আদর।

এখন দেখা যাউক সাধারণতঃ মানুষের কি কি অভাব লক্ষিত হয়। সমগ্র ভূমণ্ডলে মানবজাতির জীবন যাত্রা বিষয়ে আলোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে মানবমাত্রের অভাব ত্রিবিধ—দৈহিক, মানসিক এবং আধ্যাত্মিক। যে ব্যক্তি যত পরিমাণে উক্ত ত্রিবিধ অভাবসমূহের মোচনোপযোগী উপায় আয়ত্ত করিতে পারেন সে ব্যক্তি তত পরিমাণে ধনী বা অর্থশালী। অপরদিকে যে ব্যক্তি স্বীয় নিতান্ত প্রয়োজনীয় দৈহিক অভাবগুলিও মোচন করিতে অক্ষম

মানবীয় অভাব সমূহের শ্রেণী বিভাগ

তিনিই প্রকৃত দরিদ্র। এই তিন শ্রেণীর অভাবের মধ্যেও একটী স্বাভাবিক সম্বন্ধ পরিলক্ষিত হয়। জীবমাত্রই শরীরী বলিয়া শরীর সম্বন্ধীয় অভাব অন্যবিধ অভাব অপেক্ষা, জীবের উপর অধিকতম আধিপত্য স্থাপন করিয়াছে। দৈহিক অভাবসমূহের তীব্র তাড়নায় মানুষ আপনার সমস্ত শক্তির নিয়োগ করিতে বাধ্য হয়। সেই সময়ে তাহার কোনও রূপ উচ্চ অঙ্গের অভাবানুভব করিবার অবসর বা অবকাশ মাত্র থাকে না। "তস্মিন্ তুষ্টে জগৎ তুষ্টম্"—অগ্রে "আদ্য ধর্ম্মসাধন" দেহের তুষ্টি সাধন, পরে অন্যবিধ অভাবের জ্ঞান। সুতরাং কায়িক অভাবের তাড়না হইতে নিষ্কৃতি পাইলে মানুষ পাশবভাবমুক্ত হইয়া মনুষ্যত্ববিকাশের সুবিধা এবং অবসর পায়। এ কথা অগ্রেই ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে মানুষের মন মানুষের অনেক কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করিয়া তাহার জীবনযাত্রা অধিকতর দুর্ব্বহ ও অর্থসাপেক্ষ করিয়া তুলে। সুতরাং দারিদ্র্য এবং সঙ্গতি নিরূপণার্থ আমাদিগের কৃত্রিম অভাবগুলি বাদ দিয়া জীবনের কেবল যথার্থ স্বাভাবিক অভাবগুলির প্রতিই লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

সেই প্রথম শ্রেণীর অদম্য, স্বাভাবিক, শারীরিক অভাবগুলি আবার সাধারণতঃ ত্রিবিধ বলিয়া অনুমিত হয়—যথা, গ্রাস, আচ্ছাদন এবং বাস। জীবনধারণ করিতে হইলে প্রথমতঃ উপযুক্ত খাদ্যসামগ্রী দ্বারা শরীরের পুষ্টিসাধন করিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ, প্রকৃতির শীতবর্ষাদি দুঃসহ প্রভাব হইতে নিষ্কৃতি এবং লজ্জানিবারণের জন্য শরীরকে উপযুক্ত আচ্ছাদন দ্বারা রক্ষা করিতে হইবে। তৃতীয়তঃ অশনবসনোপায়লব্ধ মানুষ গৃহাদি বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়া নানাপ্রকার বাহ্য অপায়াপদ্ হইতে আত্মরক্ষার চেষ্টা করে। শরীর সম্বন্ধীয় এই ত্রিবিধ স্বাভাবিক অভাবগুলির পূরণ হইলে কৃত্রিম এবং অন্যবিধ অভাবগুলি ক্রমশঃ অনুভূত হইতে থকে। বাসনার তৃপ্তি আছে—কিন্তু মানুষের তৃপ্তি নাই। প্রত্যেক বাসনা তৃপ্ত হইয়া লুপ্ত হইয়া যায় কিন্তু নির্ব্বাপিত বাসনার স্থলে আর একটী বাসনা

অভাবতত্ত্ব

উদ্দীপ্ত হয়। সুতরাং মানুষ সর্ব্বদা অতৃপ্ত। আর অতৃপ্ত মানবের তৃপ্তির জন্য সংসারে কৃষিশিল্পকলা বাণিজ্যাদির সৃষ্টি ও বিপুল বর্দ্ধমান আয়োজন। প্রাথমিক দৈহিক অভাবগুলি তৃপ্ত করিয়া শান্ত করা অতি সহজ। কিন্তু 'ভাল' খাওয়া, 'ভাল' পরা, এবং 'ভাল' থাকার নেশা মিটাইবার নহে। 'যতই করিবে ভোগ তত যাবে বেড়ে।'

এই ত গেল মানবের অভাবতত্ত্ব। ব্যক্তিগত কিম্বা সামাজিক দারিদ্র্যবিচার উক্ত মানববাসনাতত্ত্বদ্বারা শাসিত করিতে হইবে। তৎপরে কি প্রকার ব্যয়ের দ্বারা মানুষ আকাঙ্ক্ষাতৃপ্তি ক্রয় করে তাহার সবিশেষ বিবরণ প্রস্তুত করিতে হইবে। যদি দেখা যায় কোনও ব্যক্তির আয় তাঁহার দেহপ্রসূত অভাবগুলিকেও দূরীকরণ করিতে অসমর্থ, তবে সেই ব্যক্তি নিশ্চয়ই দারিদ্র্যগ্রস্ত পরন্তু যে ব্যক্তি আপনার আয় দ্বারা দৈহিক সকল প্রকারের অভাব মোচন করিয়া মানসিক এবং আধ্যাত্মিক উন্নতিবিধানের সুযোগ প্রাপ্ত হয় সেই ব্যক্তি নিঃসন্দেহই ধনী। কোন্ অনুপাতে আয়ের বিভিন্ন অংশ যাবতীয় অভাব মোচনে ব্যয়িত হয় তাহারও পর্য্যালোচনা করিতে হইবে। ইহা বোধ হয় সহজেই অনুমিত হইবে যে যে ব্যক্তি আয়ের যত বেশী অংশ কেবলমাত্র কায়িক অভাব পূরণ নিমিত্ত ব্যয় করিতে বাধ্য হইবেন সেই ব্যক্তিই তত দরিদ্র বলিয়া পরিগণিত হইবেন।

প্রাথমিক ও অন্যবিধ অভাবের সম্বন্ধ

উক্ত তত্ত্ব অবলম্বন করিয়া ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে ধনবিজ্ঞানবিৎ এঞ্জেল্ (Engel) বেলজিয়াম্ (Belgium) দেশবাসিগণের আর্থিক অবস্থা নিরূপণার্থ নিম্নে প্রদত্ত তালিকা প্রস্তুত করিয়াছিলেন :—

বেলজিয়মবাসীর আর্থিক অবস্থা

ব্যয়ের বিষয়	বিভিন্নবিষয়ে ব্যয়ের বিভাগ—		
	(ক) দরিদ্রশ্রমজীবীর	(খ) মধ্যবৃত্তির	(গ) ধনীর
১। অশন … …	৬২·০	৫৫·০	৫০·০
২। বসন … …	১৬·০	১৮·০	১৮·০
৩। আশ্রয় … …	১২·০	১২.০	১২·০

৪।	অগ্নি ইত্যাদি ...	৫·০	৫·০	৫·০
৫।	শিক্ষা, ক্রিয়াকলাপ	২·০	৩·৫	৫·৫
৬।	রাজশাসন ...	১·০	২·০	৩·০
৭।	চিকিৎসা ...	১·০	২·০	৩·০
৮।	আমোদ প্রমোদ...	১·০	২·৫	৩·৫
		১০০.	১০০·০	১০০·

এঞ্জেল নিম্নলিখিত আরও একটা তালিকা প্রস্তুত করিয়াছিলেন।

আয় (বাৎসরিক)	অশন	বসন	বাস	অগ্নি	অন্যবিধ অভাব
৮০০-৯০০ (ফ্রাঙ্ক)	৩৮·১	১৬·১	১৫·১	৫·৩	২৫·৫
৯০০-১০০০	৩৪·৩	১৪·৯	১৬·৮	৪·৭	২৯·১
১০০০-১১০০	৩৪·৭	১৫·১	১৭·৫	৪·৫	২৮·১
১১০০-১২০০	৩০·৭	১২·২	১৬·৫	৩·৯	৩৬·৭
১২০০ এবং তদূর্দ্ধে	২৮·৬	১২·৬	১৫·৭	৩·০	৪০·১
গড় পড়তা আয়	৪১·১	১৫·১	১৫·৩	৫·৯	২২·৭

উল্লিখিত তালিকাদ্বয় সবিশেষ আলোচনা করিয়া দেখিলে কয়েকটী অতিপ্রয়োজনীয় সিদ্ধান্তে আমরা উপনীত হই :—

১। কি ধনী, কি দরিদ্র, সকলেরই আয়ের অর্দ্ধাধিক অংশ শুধু খাওয়ার খরচে ব্যয়িত হয়। অন্নাভাব সকল অভাব অপেক্ষা প্রবলতম।

২। যে সম্প্রদায় যত দরিদ্র তাহার আয়ের তত বেশী অংশ খাদ্যসামগ্রীসংগ্রহের নিমিত্ত ব্যয়িত হয়। এই সত্যানুসারে আমরা দারিদ্র্যের পরিমাণ অনায়াসে করিতে পারি।

৩। আয়ের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাড়ি ভাড়া, আলোক এবং ইন্ধনের খরচ বৃদ্ধি পায় না। ইহার কারণ ঐ সমস্ত পদার্থ বিষয়ে আমাদিগের অভাবের একটা সীমা আছে। সে সীমা সহজে অতিক্রম করিবার প্রয়োজন হয় না।

৪। মানুষের আয় যে পরিমাণে বাড়িতে থাকে, খাওয়া পরা সম্বন্ধে খরচ সেই পরিমাণে বাড়াইবার প্রয়োজন হয় না। আয় বৃদ্ধি হইতে থাকিলে অন্যান্য নূতন অভাব পুরণের দিকে আমাদিগের দৃষ্টি পড়ে।

এঞ্জেলপ্রবর্তিত প্রণালী অনুসারে নানা দেশে জনসাধারণের প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে। আমেরিকার যুক্ত প্রদেশের গবর্ণমেণ্ট ঐ কার্য্যভার স্বীয় স্কন্ধে বহন করিতেছেন। তাঁহাদিগের Department of Labour কর্তৃক সংগৃহীত তথ্য সমূহ হইতে নিম্নে একটা তালিকা উদ্ধৃত করিলাম :—

আমেরিকা বাসীর আর্থিক অবস্থা

ব্যয়ের শতকরা পরিমাণ।

আয় (ডলার)	(ক) আয়বাবদ	(খ) বাসবাবদ	(গ) বসন বাবদ	(ঘ) অগ্নিবাবদ	(ঙ) অন্যান্য অভা
২০০ এবং তন্নিম্ন	৪৯·৬	১৫·৫	১২·৮	৮·১	১৪·০
২০০-৩০০	—৪৪·৩	১৪·৭	১৪·৩	৭·৬	১৯·২
৩০০-৪০০	—৪৫·৬	১৫·০	১৪·১	৭·০	১৮·৩
৪০০-৫০০	—৪৫·১	১৫·৩	১৪·৪	৬·৬	১৮·৬
৫০০-৬০০	—৪৩·৮	১৫·৩	১৫·৩	৬·৬	১৯·১
৬০০-৭০০	—৪১·২	১৫·৫	১৫·৯	৫·৯	২১·৬
৭০০-৮০০	—৩৮·৯	১৫·৬	১৬·৩	৫·৩	২৩·৯

যে সকল দেশের অবস্থা সম্বন্ধে তথ্যসমূহ উদ্ধৃত করা হইয়াছে তাহা পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে সে সকল দেশের জনসাধারণের অবস্থা নিতান্ত মন্দ নয়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে দারিদ্র্যের লক্ষণ সকল প্রকার দৈহিক, মানসিক এবং আধ্যাত্মিক প্রভৃতি মানুষের স্বাভাবিক অভাবমোচনে অক্ষমতা। পাশ্চাত্য দেশগুলিতে প্রায়ই দেখা যায় যে তথায় প্রত্যেক ব্যক্তিরই আয় হইতে কায়িক অভাবপূরণানন্তর কিয়দংশ উদ্বৃত্ত থাকে। তাহার ফলে অন্যান্য উচ্চতর অভাব উদ্ভূত হইয়া মানুষের নানারূপ সদ্বৃত্তির স্ফুরণ করে এবং মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশের পথ পরিষ্কার করিয়া দেয়।

যতদূর জানিতে পারা গিয়াছে আমাদিগের জনসাধারণের অবস্থা অতীব শোচনীয়। সাধারণতঃ তাহাদিগের যাহা আয় তদ্দ্বারা যেন তেন

ভারতবাসীর বৈষয়িক অবস্থা

প্রকারেণ তাহাদিগের গ্রাসাচ্ছাদন চলিতে পারে কিন্তু শিক্ষা ধর্ম্ম কর্ম্ম প্রভৃতির খরচ বহন করিতে তাহারা নিতান্ত অসমর্থ। সারাদিন ১০ ঘণ্টা, ১২ ঘণ্টা, পর্য্যন্ত কঠোর কায়িক পরিশ্রম করিয়া তাহারা যতটুকু পরিমাণ অর্থোপার্জ্জনে সমর্থ হয় তদ্দ্বারা এমন কি দেহপুষ্টি সাধনের উপযুক্ত পরিমাণ খাদ্য, বসন এবং আশ্রয়লাভ তাহাদিগের ভাগ্যে ঘটে কিনা সন্দেহ। পাশ্চাত্য দেশে অনেক স্থলে গবর্ণমেণ্ট বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদিগের দ্বারা মানব স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য আদর্শ খাদ্যের তালিকা বা বিবরণী (standard dietary) প্রস্তুত করাইয়া সেই আদর্শানুসারে জনসাধারণের খাদ্য বিষয়ে পরীক্ষা করা হয়। আমাদের দেশেও যদি ঐ প্রকার খাদ্য পরীক্ষা করা হয় তাহা হইলে নিশ্চয়ই প্রতীয়মান হইবে যে আমাদের মধ্যে ঘোর অন্নকষ্ট বর্ত্তমান। আর বস্ত্র বিষয়ে বলিতে গেলে আমাদের জনসাধারণ ইউরোপের আদর্শানুসারে হীন বর্ব্বর বলিয়াই পরিগণিত হইবে। তাহারা অধিকই "কৌপীনবন্তঃ—তবে তৎসঙ্গে 'ভাগ্যবন্তঃ' না বলিতে পারি না। যে নিঃসম্বল তাহার আবার ভাগ্য কিসের? অন্নবস্ত্রাভাবপূরণ বিষয়ে যেরূপ অসামর্থ্য, "বাস্ত' বিষয়েও তদ্রূপ।

যত দিন আমাদের দেশে উক্তপ্রকার আর্থিক অবস্থা সম্পর্কীয় তথ্য সংগৃহীত না হয় তত দিন আমরা স্বদেশবাসিগণের প্রকৃত অবস্থা

অনুসন্ধানের প্রয়োজন

সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকিতে বাধ্য হইব। এ নিবিড় অজ্ঞানান্ধকার আমাদের প্রকৃত কর্ম্মক্ষেত্র এবং গন্তব্য পথ আচ্ছন্ন করিয়া আমাদিগকে দিশাহারা করিয়াছে। আশা করি এই সম্মিলন আমাদিগের গবর্ণমেণ্ট এবং শিক্ষিত সম্প্রদায়কে উক্ত প্রকার জ্ঞানবিস্তারের জন্য আহ্বান করিবেন। অপ্রিয় সত্য হইলেও তাহারই আলোচনা করিতে হইবে। ঘরে চোর আসিয়াছে বলিয়া চোখ বুজিয়া থাকিলে চলিবে না আমাদের দারিদ্র্য যে কত গভীর, কত বিস্তৃত সেই বিষয়ে যথার্থ জ্ঞানই আমাদিগের কর্ত্তব্য বোধ জাগরিত করিবে।

এ কথা সকলেই স্বীকার করিবেন যে যে প্রকার বৈষয়িক তথ্যসমূহ সংগ্রহের ব্যবস্থা করা প্রয়োজনীয় বলা হইয়াছে উহা তত কষ্টসাধ্য নহে। তিন চারি বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতা ন্যাশন্যাল কলেজের (সম্প্রতি হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের) দুইটী ছাত্রকে আমি উক্ত প্রকার উপকরণ সংগ্রহ কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলাম। তাহাতে কার্য্য বেশ সুসিদ্ধ হইয়াছিল। আমার বিশ্বাস প্রত্যেক গ্রামের নেতৃবর্গ, শিক্ষার্থিগণ, টোল কিম্বা অন্যান্য সভাসমিতি এই কার্য্যভার গ্রহণ করিলে আমরা অনায়াসেই সমগ্র জনপদের আভ্যন্তরীণ অবস্থার প্রকৃত পরিচয় লাভ করিতে পারি। দেশে কত বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ ও অনুসন্ধান চলিতেছে। প্রাচীন পুঁথি, তাম্রশাসন, মুদ্রা, প্রবচন, কাহিনী প্রভৃতি সাহিত্যিক ঐতিহাসিক ও ভাষাবিষয়ক কত সংবাদ আমাদের উৎসাহী ব্যক্তিগণ উদ্ধার করিয়া দেশের হৃদয়কে, সমাজের অন্তস্তলকে আমাদের জ্ঞানগোচর করিতেছেন। এই উৎসাহ, এই অনুসন্ধিৎসা, এই কর্ম্মতৎপরতা কি অন্নসংস্থানের উপায় উদ্ভাবনের পথ পরিষ্কার করিবার উদ্দেশ্যে নিয়োজিত হইতে পারে না?

শ্রীরাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়।

শিশুর প্রতি।

১

হে শিশু ; তোমারে হেরি' মনে পড়ে---প্রথম সৃজনে
কারণ-ক্ষীরাব্ধি-নীরে অনন্তের অঙ্ক-চক্রাসনে
তোমারি মতন এক জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ-প্রবর
ছিল নিদ্রা-অভিভূত, হিরণ্ময় কিরণ ভাস্বর
অঙ্গ হ'তে ঝরে ;
অনন্ত সৌন্দর্য্যময়ী লক্ষ্মীরূপা প্রকৃতি সুন্দরী
তোরি মত রাঙা তার পা দুখানি কর-পদ্মে ধরি'
কত না যতনে মরি করে সেবা চাহি মুখ পানে,
সিন্ধুর ফেণিল শুভ্র উর্ম্মিরাশি লুটিছে কে জানে
কি আনন্দ ভরে !
সহসা কি ভাব ভরে প্রথম সে মেলিল নয়ন,
অমনি ধরিল চক্ষে মায়াময়ী সৌন্দর্য্য আপন,
কোটি সূর্য্য, কোটি চন্দ্র নভ-পটে হইল উদয়,
নেহারি' তা' শিশু যেন হাস্য-মুখে মানিয়া বিস্ময়
চাহে চিত্র'পরে !
একে একে নেত্র-পথে ধরে যত মাধুরী সম্ভার,
কৌতুকী নয়নে শিশু তোরি মত হেরে বারবার,
তারপর রাঙা পায় মুখরিয়া মণির মঞ্জীর
অব্যক্ত আনন্দ ভরে তোরি মত হইয়া অধীর
কি বা নৃত্য করে !
অমনি যে তালে তালে না জানি রে কোন আকর্ষণে
নাচিতে লাগিল নভে গ্রহপুঞ্জ চটুল চরণে,
সে নর্ত্তন-মাদকতা বিশ্বময় হইল সঞ্চার,
সৃজিত হইল তাহে চরাচর, ধরণী মাঝার
চেতনা সঞ্চরে।
তখন সে শিশু মরি নিল তুলি' অপূর্ব্ব মুরলী,
প্রতি রন্ধ্র হ'তে তার তুলিল কি উন্মাদ কাকলী,
অমনি জীবের হৃদে সুরে সুরে বহে প্রেম-ধারা,
পরস্পরে আলিঙ্গিয়া নাচে সবে প্রেমে মাতোয়ারা,
বেদনা পাশরে ;
হে শিশু ! তোমারে হেরি' সৃষ্টি-লীলা বিলসে অন্তরে।

২

তোরে হেরি' মনে পড়ে—ধরণীর শৈশব সময়ে
নাহি ছিল দ্বেষ হিংসা, তোরি মত, জীবের হৃদয়ে ;
ও তোর মার্জ্জার মত সিংহ ব্যাঘ্র লেহিত চরণ,
ফণা-ছত্রে তুলি' ফণী ছায়া-দানে মানবে কেমন,
করিত শীতল ;
ঘুম ভাঙা রাঙা চোখে প্রাতে যবে হেরি' রাঙা রবি
চাহিস্ করিতে কোলে, কিংবা সাঁঝে নভে স্বর্ণছবি
শশী হেরি' ধরিবারে তুই যবে বাড়াস্ দু'কর,
অথবা নির্ঝর-গানে মন্ত্র-মুগ্ধ নিদ্রায় কাতর
রোস্ অচঞ্চল,
ভাবি তবে—এই মত একদিন আছিল ধরার
যখন প্রকৃতি সনে ছিল বাঁধা নর-হৃদি-তার,
যখন প্রকৃতি-কোলে লতাফুলে সাজায়ে শরীর
দুলিত মানব-শিশু, শুনি মন্দ্র মেঘ-জলধির
হইত চঞ্চল।
ব্রাহ্মণের অঙ্ক হ'তে ঝাঁপাইয়া পড়িস্ যখন
চণ্ডালের ধূলি-মাখা নগ্ন বক্ষে সহাস-বদন,
সুদূর অতীত হ'তে ভেসে আসে সোণার স্বপন,
দেখি যেন—এক জাতি, প্রেম-সূত্রে জগৎবন্ধন,
বিদ্বেষ বিরল !
ওরে মোর সোণামণি ! সর্ব্বজীবে ও তোর করুণা
আনে রে স্মরণ-পথে জগতের ঊষা সে তরুণা,—
যে কালে সরল নর নেত্র-বারি মুছা'ত ধরার,
না তুলিত জয়-ধ্বজা দেশে দেশে হেন হাহাকার
বেদনা-বিহ্বল !
হেরি' রে উলঙ্গ শিশু ! ওই তোর নগ্ন কলেবর
মনে পড়ে সেই কাল—ছিল যবে অবিলাসী নর,
লজ্জাহীন সরলতা, স্বার্থহীন স্বাধীনতা যবে
নরের হৃদয়-পদ্মে নিবসিত স্বর্গের সৌরভে
হইয়ে উচ্ছল ;
অতীত-সমাজ-চিত্র তোরি মাঝে হয়রে উজ্জ্বল।

৩

মনশ্চক্ষে হেরি যবে মূর্ত্তি জিনি' তরুণ তপন,
ওই স্থূল বাহ্য বাস নারে আর করিতে গোপন

স্বরূপ রহস্য তোর ; দেখি যেন আত্মা নির্ব্বিকার
ক্ষীণ আবরণ খানি সবে মাত্র ধরেছে মায়ার
আসি' এ ধরায় !

আমাদের মত শিশু ! নহ তুমি ইন্দ্রিয়ের বশ,
মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ঢালে নাই ত্রি-তাপ পরশ
লক্ষজন্ম-সংস্কার আজো চিতে মুকুল মতন,
অহেতু-আনন্দ-রসে ভরপূর রয়েছ মগন,
তৃষা না নাচায় :

নাহি ধর নামোপাধি, নাহি কর জাতির বিচার,
নহ গৃহী, বনচর, নহে তব সন্ন্যাস-আচার
নহ যোগী, নহ ভোগী, শাক্ত, শৈব, হিন্দু, মুসলমান,
কনক-রজত-মুদ্রা ধূলি মুঠা কর সমজ্ঞান
মহেশের প্রায় ;

রিপু মিত্র, নৃপ ভিক্ষু, দুরাস্তিক, আপন বা পর,
বারি বহ্নি, বিষামৃত, নাহি ভেদ কর ধরা' পর,
পাপ পুণ্য, জন্ম মৃত্যু, দ্বন্দ্ব-ভাব না পরশে মন,
অফুরন্ত কামনার কর্ম্ম-চক্র আজো নিষ্পেষণ
না করে তোমায়।

তুমি যেন অতি শুভ্র, অতি স্বচ্ছ স্ফটিকের প্রায়,
রূপাদি বিষয় পঙ্ক, রঞ্জে যদি, না পরশে তায়,
তরল জলদ ভেদি' সুধাংশুর রজত-কিরণ
ফুটে যথা, সেই মত টুটি' সূক্ষ্ম তনু-আবরণ
চিৎ-শশী ভায় ;

হৃদয়-কমলে তব বদ্ধ যেন আনন্দ-ভ্রমর
অন্তরে নিভৃত সুধা করি' পান গুঞ্জে নিরন্তর
তারি যেন প্রতিধ্বনি হাস্যে তোর ভাসে বার বার,
সে গূঢ় অমিয়-মাখা ওষ্ঠ চুমি' পরাণ আমার
সব ভুলে' যায়।

আত্মার সে রসাস্বাদ পাই শিশু ! হেরিলে তোমায় !

শ্রীভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী।

বিদ্যালয়ে ধর্ম্মশিক্ষা।*

প্রায় দুই পুরুষ কাল ইংরাজী ধরণের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাবে ভারতবাসী শিক্ষিত ও দীক্ষিত হইয়া আসিতেছেন। এই শিক্ষাপ্রণালীর একটা ধর্ম্মশিক্ষার আয়োজনের অসম্পূর্ণতার দিকেও প্রথম হইতেই জন্য আকাঙ্ক্ষা সকলের দৃষ্টি পড়িয়াছে। সেটা বিদ্যাচর্চ্চায় ধর্ম্ম শিক্ষার অভাব।

দেশীয় লোকেরা অল্পকালের মধ্যেই দেখিলেন, সমাজ ভক্তি ও প্রেমের বন্ধন চলিয়া যাইতেছে, শ্রদ্ধার সম্বন্ধ কমিয়া আসিতেছে। তাহা নিবারণের জন্য ভারতবর্ষের স্থানে স্থানে বিদ্যালয়ের বোর্ডিং-গৃহে নীতি ও ধর্ম্মগ্রন্থ পড়াইবার আয়োজন হইল, এবং ছাত্রাবাসের মধ্যে দেবালয় ও মন্দির প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চলিতে লাগিল। ক্রমশঃ রাজপুরুষেরাও ভাবিলেন—'সমাজের এইরূপ নীরব প্রতিবাদসমূহ কি একেবারেই অমূলক ? শিক্ষিত সমাজে রাজদ্বেষের ভাব, নরহত্যার প্রবৃত্তির জন্য যে ধর্ম্মহীন শিক্ষাপদ্ধতিই দায়ী নয়, তাহা কে বলিতে পারে ?

ইতিমধ্যে জাতীয়-শিক্ষাপরিষৎ শিক্ষার আয়োজনে ধর্ম্মের ব্যবস্থা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন, আর এজন্য দুইটা নূতন বিশ্ববিদ্যালয়ই প্রতিষ্ঠিত হইতে চলিল। এই সকল কারণে বিদ্যার সঙ্গে ধর্ম্মশিক্ষা হইতে পারে কি না গবর্ণমেণ্টের শিক্ষাবিভাগও তাহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তাহা ছাড়া সরকারের অধীনে একটা স্বতন্ত্র 'রিসার্চ্চ ইনষ্টিটিউট' বা উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠারও আয়োজন হইতেছে। সেখানে আমাদের প্রাচীন ইতিহাস, সাহিত্য ও দর্শনের আলোচনায় বিশেষরূপ উৎসাহ ও সাহায্য দেওয়া হইবে। সুতরাং আশা করা যায়, শীঘ্রই দেশে ধর্ম্ম শিক্ষার ব্যবস্থা হইয়া যাইবে।

কিন্তু এই সঙ্গে আধুনিক ভারতের একটা বড় দুর্ভাগ্যের কথা মনে পড়িতেছে। আমাদের মঙ্গলের

* চুঁচুড়া সাহিত্যসম্মিলনে পঠিত, ফাল্গুন, ১৩১৮

আধুনিক ভারতের দুর্ভাগ্য

জন্য অনেক চেষ্টা হয় বটে, কিন্তু আমাদের সমাজের অভাব ও স্বভাবের সঙ্গে প্রায় কোন অনুষ্ঠানেরই যথার্থ সম্বন্ধ থাকে না। অন্যকালে বা অন্যদেশে হয়ত কোন অনুষ্ঠানে সুফল পাওয়া গিয়াছে। ভালরকম চিন্তা না করিয়াই তাহার প্রয়োগ আমাদের সমাজেও চলিতে থাকে।

এখানে কোনও আইন চালাইতে হইলে বিদেশ হইতে তাহার নমুনা আনা হয়, বিদেশেই তাহার খস্‌ড়া প্রস্তুত হয়। ভারতবাসীর আর্থিক উন্নতিবিধান করিতে হইবে?—বড় বড় ফ্যাক্‌টারী ও কারখানা তৈয়ারী আরম্ভ হইল, অবাধ-বাণিজ্যনীতি প্রচলিত হইয়া গেল। নিম্নশ্রেণীকে শিক্ষা দিতে হইবে? অমনি জাতিভেদ ভাঙ্গিবার প্রয়োজন বোধ হইল, অথবা অসংখ্য ম্যাজিক-লণ্ঠন কেনা হইল। স্বাস্থ্যরক্ষা করিতে হইবে? ফুটবল ডাম্বেলে বাজার ভরিয়া গেল। একতা বাড়াইতে হইবে। হিন্দু-মুসলমান ব্রাহ্ম খৃষ্টান এক টেবিলে বসিয়া 'ভাই ভাই এক ঠাঁই' হইয়া গেলেন। বাস্তবিক শিক্ষাই হউক, বা রাষ্ট্রীয় ব্যাপারই হউক, সামাজিক-আচার ব্যবহারই হউক বা বৈষয়িক কাজকর্ম্ম হউক—যাহাতে উন্নতির প্রয়োজন, তাহাতেই ব্যবস্থা করা হয়—নিজেদের 'ধাত', নিজেদের গতি, নিজেদের অতীতের সম্যক্ আলোচনা না করিয়া।

এইরূপ অস্বাভাবিক ব্যবস্থার কারণ আছে। প্রায় সকল বিষয়েই আমাদের চিন্তা ও কার্য্য এবং উন্নতির প্রবর্ত্তক—আমাদের শাসনকর্ত্তারা তাঁহাদেরই অধ্যাপক ও প্রচারক শিক্ষাব্যাপারে আমাদের নেতা। তাঁহাদেরই এঞ্জিনীয়র ও চিকিৎসকে আমাদের আধুনিক বৈষয়িক ও ভৈষজ্য কর্ম্মে আমাদের পথপ্রদর্শক। সুতরাং তাঁহাদের পশ্চাত্যজগতের অভিজ্ঞতা এবং স্বদেশের জাতীয় শিক্ষার প্রভাব ছাড়া তাঁহাদের নিকট আমরা আর কিছু আশা করিতেই পারি না। আর আমাদের দেশের যাঁহারা তাঁহাদের দৃষ্টান্তে, অধ্যাপনায় ও উৎসাহে কাজ করিতে আরম্ভ করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে বেশী লোক স্বাধীনভাবে চিন্তা করিয়া কর্ম্মে অগ্রসর হইতে সুযোগ পান নাই। আমরা এখনও অনুকরণের যুগেই আছি, আমাদের বিশিষ্ট চিন্তাপ্রণালী ও স্বাতন্ত্র্য-বোধ বিকাশলাভ করে নাই।

পশ্চাত্য কর্ম্মিগণের নেতৃত্ব

বিশেষতঃ আমাদের অনেকেই কার্লাইল, হুইট্‌ম্যান টলষ্টয় প্রভৃতি আধুনিক পাশ্চত্য চিন্তাবীরগণের ভাবুকতা ও অতীন্দ্রিয়তায় মুগ্ধ। তাঁহারা এই আধুনিক আধ্যাত্মিকতার সন্ধান পাইয়াই প্রাচীন হিন্দু-সভ্যতার মর্ম্মস্থল অধিকার করিয়া ফেলিয়াছেন এইরূপ তাঁহাদের ধারণা। সুতরাং এখন পর্য্যন্ত আমাদের প্রকৃত জাতীয় স্বাতন্ত্র্য, আমাদের সভ্যতার মূলমন্ত্র, আমাদের সামাজিক জীবনের বৈচিত্র্য বুঝিবার জন্য কেহই চেষ্টা করিবার প্রয়োজনই বোধ করেন না। উপনিষদ্ ও গীতার দুই চারিটা শ্লোক মনে রাখিলেই হইল—আর বৈদান্তিক উপদেশ, আত্মার অমরতা, জীবনের সাধনা প্রভৃতি আলোচনার জন্য ভাবনা কি? রুসো, ব্রাউনিং, এমার্সন, সোপেনহয়ার ঘাঁটিলেই চলিতে পারে।

স্বদেশীয়গণের চিত্ত-সংমোহন

আমাদের চিত্তে স্বাতন্ত্র্যবোধ এতই কমিয়া গিয়াছে যে আমরা আমাদের চারিদিক্‌কার অনুকূল অবস্থা বিচার করিতে পারি না। আমাদের প্রকৃতির উপযোগী কোন অনুষ্ঠান আবিষ্কার করিয়া লওয়া একপ্রকার অসম্ভব। ধর্ম্ম-শিক্ষার আয়োজন করিতে হইবে? অমনি পাশ্চাত্যসমাজের যুক্তিগুলি মনে পড়িয়া গেল—তাহাদের সমস্যাগুলি আমাদের সমাজে টানিয়া আনিতে আরম্ভ করিয়াছি। তাহাদের আশঙ্কাগুলিও মনের মধ্যে আধিপত্য বিস্তার করিয়া বসিয়াছে।

শিক্ষার ব্যবস্থায় ধর্ম্মসমস্যার মীমাংসা

ইউরোপ ও আমেরিকার নেতৃবর্গ মনে করেন—বিদ্যা ও ধর্ম্ম পরস্পরবিরোধী। বিদ্যালয়ের গণ্ডীর মধ্যে ধর্ম্মের প্রভাব বিস্তার করিলে বিদ্যার সর্ব্বনাশ করা হয়। আবার ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠানে বিদ্যার আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইলে ধর্ম্মভাবে জলাঞ্জলি দিবার জন্য প্রস্তুত হওয়া উচিত।

আশঙ্কা

দুয়ে কখনই মিলিতে পারে না,—বিদ্যা আলোক, ধর্ম্ম অন্ধকার। বিদ্যা যুক্তি ও তর্কের সন্তান, ধর্ম্ম শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের আশ্রিত। বিদ্যায় পৃথিবীর উপর মানুষের অধিকার বাড়াইয়া দেয়, ধর্ম্মে ঈশ্বরের অবতারণা করিয়া মানুষের শক্তিকে সংযত ও সঙ্কুচিত করিয়া ফেলে। বিদ্যায় ভবিষ্যৎকে দখল করিবার প্রবৃত্তি জন্মে, ধর্ম্মে অতীতের প্রতি মমতা বাড়িতে থাকে। বিদ্যা মুক্তির উপায়, ধর্ম্ম বন্ধনের কারণ। সুতরাং আমরা 'সোণার পাথরবাটী, অথবা 'কাঁঠালের আমসত্ব' বলিলে যেরূপ ধারণা করিতে পারি পাশ্চাত্যজগতের বিচক্ষণ ব্যক্তিরা বিদ্যালয়ের ধর্ম্মশিক্ষার ব্যবস্থায় সেইরূপই এক অসম্ভব অস্বাভাবিক সংযোগের ভয়ে ত্রস্ত হন।

তাঁহাদের আর এক ভয়ের কথা—ধর্ম্ম সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ এবং বিচিত্র ধর্ম্মসম্প্রদায়। শিক্ষার ব্যবস্থায় ধর্ম্মচর্চ্চার আয়োজন করিতে হইলে দেশের কোন্ সম্প্রদায়ের, কোন্ মতবাদের প্রশ্রয় দেওয়া হইবে? দলাদলি, সংগ্রাম ও বিরোধ যে তাহা হইলে সমাজে চিরন্তন হইয়া পড়িবে। পাশ্চাত্যজগতে ধর্ম্মসংগ্রাম, ধর্ম্মনির্য্যাতন, ধর্ম্মকলহের ইতিবৃত্ত পুনরায় অভিনীত হওয়া কখনই শ্রেয়স্কর নয়। সুতরাং বিদ্যালয়ের আবেষ্টনের মধ্যে ধর্ম্মের কথা তুলিয়া রাষ্ট্রীয় অনৈক্য ও মতভেদগুলি বাড়াইয়া তুলিবার প্রয়োজন নাই।

এই কুসংস্কার ও অনৈক্য বৃদ্ধির ভয় আমাদের নেতৃবর্গকেও আক্রমণ করিয়াছে। কেবল তাহাই নহে। পশ্চাত্যজগতে এই সমুদয় মীমাংসা করিবার যে কৌশল আবিষ্কৃত হইয়াছে আমাদের দেশেও

মীমাংসা

তাহারই প্রচলন হইবার উপক্রম হইয়া উঠিয়াছে। সেই সকল দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে একটা 'থিয়লজিক্যাল ফ্যাকল্‌টী' বা ধর্ম্মসমিতি গঠন করা হইয়া থাকে। যথাসম্ভব সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে একটা 'রফা' করিয়া কতকগুলি আইন করা হয়। ধর্ম্মশিক্ষা যাহাতে অত্যুচ্চ জ্ঞানবিজ্ঞানের নিয়মেই চলিতে পারে, যাহাতে ইহার মধ্যে সঙ্কীর্ণতা, প্রাদেশিকতা, সাম্প্রদায়িকতা প্রবেশ করিতে না পারে, তাহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি থাকে। জগতের অন্যান্য বিভাগের তথ্য আলোচনা যে উপায়ে হইয়া থাকে, তাহাই অবলম্বন করিয়া ধর্ম্মজগতের সত্যগুলিও অনুসন্ধান করিতে বিধান করা হয়। এই উপায়ে বিদ্যা ও ধর্ম্মে একটা সামঞ্জস্য সৃষ্টি করিবার প্রয়াস চলিতে থাকে। অধিকন্তু, সম্প্রদায়-ভেদে ধর্ম্মমন্দির, ছাত্রবাস বা পাঠাগারের আয়োজন হয়। আর স্থানে স্থানে মতবাদের প্রাবল্য অনুসারে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জন্য সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন বিদ্যালয়ই প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে।

অবশ্য পাশ্চাত্যসমাজের অভাব পূরণের উপযোগী বলিয়াই এইরূপ বিচিত্র ধর্ম্মশিক্ষা-পদ্ধতি অবলম্বিত হইয়াছে। ইহাতে তাঁহাদের

পাশ্চাত্য শিক্ষানীতি সমালোচনা

প্রয়োজন সিদ্ধ হইতে পারে বটে, কিন্তু এই এক বিধানের দ্বারা পৃথিবীর সকল সমাজেরই অভাব মোচিত হইবে এমন কোন কথা নাই।

মানবজীবনে ধর্ম্মের স্থান সম্বন্ধে পাশ্চাত্যগণের ধারণা বিচিত্র। তাঁহারা মনে করেন—ঈশ্বরচিন্তা, ভগবানের আরাধনা, ধর্ম্মকর্ম্ম মানুষের বিশেষ কতকগুলি কার্য্য,—অন্যান্য কর্ম্ম ও চিন্তা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তাহার মস্তিষ্কে ধর্ম্মচিন্তার জন্য একটা বিশেষ প্রকোষ্ঠ আছে, তাহার হৃদয়ে একটা বিশেষ বৃত্তি আছে, তাহার চিত্তে এজন্য একটা স্বতন্ত্র আবেগ ও আকাঙ্ক্ষা আছে। ধর্ম্ম অনেক কাজের এক কাজ মাত্র—জীবনের বিচিত্র বিভাগের মধ্যে একটি বিভাগ মাত্র। মানুষ ঘোড়ায় চড়িয়া শারীরিক আনন্দ উপভোগ করিল, অথবা বিদ্যালয়ে যাইয়া পদার্থবিজ্ঞানের বক্তৃতা শুনিল, কিম্বা সাহিত্যসভায় আসিয়া ভক্তিবাদ প্রচার করিল, অথবা রাষ্ট্রসভায় আলোচনা করিয়া দেশের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত করিল, কিন্তু তাহাতে ধর্ম্মকর্ম্ম করা হয় না। তাঁহাদের বিবেচনায় ইহাতে তাহার শারীরিক বৃত্তির, মানসিক শক্তির অথবা সামাজিক প্রবৃত্তিসমূহেরই অনুশীলন ও পুষ্টি হইল মাত্র।

তাঁহারা মনে করেন, ধর্ম্মের জন্য মানবকে অন্য কতকগুলি বৃত্তির অনুশীলন করিতে হইবে। এজন্য তাহার কতকগুলি মতবাদ গ্রহণ করা আবশ্যক। ধর্ম্মের

বিষয়ীভূত বিশিষ্ট কয়েকটি শাস্ত্র আলোচনা আবশ্যক। ধর্ম্মচিন্তা ও ধর্ম্মকর্ম্মের জন্য বিশেষ কোন সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখা আবশ্যক। ঠিক যখন সেই নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মগ্রন্থগুলি পড়া হয়, অথবা নির্দ্দিষ্ট দিনে ধর্ম্মসভায় বক্তৃতা শুনা হয়, অথবা ধর্ম্মবিষয়ক সমলোচনায় যোগদান করা হয়, কেবল তখনই মানুষের ধর্ম্মাচরণ করা হইল, এইরূপই তাঁহাদের ধারণা। সুতরাং সেই দিনে, সেই সময়, সেই গৃহে যাহা করা হয় হউক, তাহার সঙ্গে দিবসের অন্যান্য চিন্তা ও কর্ম্মের, জীবনের অন্যান্য বিভাগের কোনরূপ সংস্রব নাই। তাঁহারা বিবেচনা করেন, গৃহস্থের নিত্যকর্ম্ম-পদ্ধতির মধ্যে ধর্ম্মকে একটা বিশেষ মর্য্যাদা দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু সমগ্র গার্হস্থ্য জীবনে, পারিবারিক কার্য্যকলাপে, সৌজন্য শিষ্টাচারে, শিল্প ও ব্যবসায়ে, রাষ্ট্রীয় কর্ম্মে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র নীতিশাস্ত্র—অর্থনীতি, পরিবারনীতি, রাষ্ট্রনীতি মানিলেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে। এই সকল কার্য্য ও চিন্তার ক্রমান্বয় ও পৌর্ব্বপৌর্য্য স্থির করিবার জন্য ধর্ম্ম আলোচনা করিবার কোন প্রয়োজন নাই।

ধর্ম্ম মানবজীবনের বিভিন্ন বিভাগের একটি বিভাগমাত্র

আর, বাস্তবিক ধর্ম্মশিক্ষায় তাঁহারা কতকগুলি আলোচনা, গবেষণা, গ্রন্থপাঠ, সাহিত্যচর্চ্চা মাত্র বুঝেন। থিয়লজিক্যাল ফ্যাকালটির বিধানে শিক্ষার্থিগণকে তাঁহাদের ধর্ম্মপ্রচারকদিগের জীবনী সংগ্রহ করিতে হয়। কোন্ কোন্ মহাত্মা তাঁহাদের ধর্ম্ম-ইতিহাসের স্তম্ভস্বরূপ, কবে কোথায় কিরূপভাবে কোন এক মতবাদ বা অনুষ্ঠান বিকাশ লাভ করিয়াছে, কোন্ মহাপুরুষ কি উপদেশ প্রচার করিয়া গিয়াছেন, ইত্যাদি বিষয়ের ঐতিহাসিক অনুসন্ধান করা হইয়া থাকে মাত্র।

ধর্ম্মশিক্ষা ইতিহাস-শিক্ষার এক অধ্যায়

ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠই ধর্ম্মজীবন গঠনের উপায় বিবেচনা করিলে ধর্ম্মের ইতিবৃত্ত সঙ্কলনই ধর্ম্মকর্ম্ম হইয়া পড়ে। ইহাতে জাতীয় ইতিহাস অনেকটা স্পষ্ট ও বিশদ হইতে পারে, ইতিহাস-শিক্ষা কার্য্যকরী ও সুখদায়ক হইতে পারে। ইহাতে দেশীয় ধর্ম্মের পৌর্ব্বাপর্য্য, জাতীয় ধর্ম্মানুষ্ঠানের বিচিত্র অঙ্গগুলি হৃদয়ের উপর বেশ প্রবলভাবে অধিকার লাভ করিতে থাকে। জাতীয় শিক্ষার সার্থকতার পক্ষে ইহা যথেষ্ট প্রয়োজনীয়, কারণ ইহাতে সমাজের ও দেশের অতীত ও বর্ত্তমান অবস্থার প্রতি শিক্ষার্থী অতি সহজ ও স্বাভাবিক ভাবেই আকৃষ্ট হইয়া পড়ে।

এইরূপ ধর্ম্ম-গ্রন্থ-পাঠে আরও একটা লাভ আছে। দেশের পূর্ব্বপুরুষগণ কোন্ প্রণালীতে চিন্তা করিতেন, তাঁহাদের আচার্য্যেরা বিশ্ব, দেবতা, পূজা, মানবের ভবিষ্যৎ প্রভৃতি সম্বন্ধে কোন্ কোন্ মতবাদ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, বিভিন্ন সম্প্রদায় ও মতবাদের মধ্যে বৈচিত্র্য ও পার্থক্য কি উপায়ে সাধিত হইয়াছে, সেই মতবাদসমূহ সাহিত্যকে প্রভাবান্বিত করিয়াছে কি না, জাতীয় জীবনের অন্যান্য বিভাগের চিন্তা ও কর্ম্মসমূহ কি ভাবে তাহার ফলে রূপান্তরিত হইয়াছে ইত্যাদি দর্শন ও সমাজতত্ত্ববিষয়ক বিবিধ প্রশ্নেরও আলোচনা করিবার সুযোগ থাকে। এই উপায়ে দেশের পূর্ব্বাপর চিন্তাসমূহ ছাত্রের মনের মধ্যে অঙ্কিত হইয়া যায়। তাহাতে দেশকে চিনিবার পক্ষে, সমাজের প্রকৃতি বুঝিবার পক্ষে ছাত্রাবস্থায়ই সুবিধা পাওয়া যায়।

ধর্ম্ম-শিক্ষা দর্শন-শিক্ষার এক অঙ্গ

তাহা ছাড়া দর্শন ও মনস্তত্ত্বের আর এক বিভাগও এই উপায়ে আয়ত্ত হইয়া আসে। বিভিন্ন ধর্ম্মের তুলনামূলক আলোচনা দ্বারা 'ধর্ম্ম-বিজ্ঞানের' নিয়মগুলি ধরিতে পারা যায়। মানবের আদিম ধর্ম্মভাব, মানুষের চিরন্তন ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি এবং বিচিত্র ধর্ম্মকর্ম্মের মধ্যে কি সাধারণ লক্ষণ আছে, তাহা এই ধর্ম্ম-বিজ্ঞান আলোচনার মধ্য দিয়াই স্পষ্ট হইতে থাকে।

যাহা হউক, এই প্রকার ধর্ম্ম শিক্ষার আয়োজনে গণিত, সাহিত্য, রসায়ন প্রভৃতি অন্যান্য বিদ্যার ন্যায় ধর্ম্ম একটি বিদ্যা মাত্র। ইহাতে ধর্ম্মশিক্ষা ইতিহাস-শিক্ষারই বিশেষ এক অধ্যায়রূপে অথবা দর্শন-শিক্ষার এক স্বতন্ত্র অধ্যায় ভাবে শিক্ষা-পদ্ধতিতে মর্য্যাদা লাভ করে, ধর্ম্ম বিশেষ একটি শিক্ষণীয় বিষয় মাত্ররূপে বিবেচিত হয়। কাজেই গণিতের 'ফ্যাকলটি', ইতিহাসের ফ্যাকলটি চিত্রবিদ্যার ফ্যাকলটির ন্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন

ধর্ম্মালোচনার এক ফ্যাকলটি বা সমিতি প্রতিষ্ঠা করিলেই যথেষ্ট হয়। এই ধর্ম্মসমিতি বিবিধ উপদেশসংগ্রহ, ধর্ম্মতত্ত্ব-সঙ্কলন, ধর্ম্ম-গ্রন্থ-নির্ব্বাচন, ধর্ম্মচর্চ্চা-প্রণালী, ধর্ম্ম-শিক্ষার সময়-নির্দ্দেশ, ধর্ম্ম শিক্ষক-নিয়োগ প্রভৃতি যাবতীয় উপায়ে বিধিব্যবস্থা করিয়া থাকেন। গণিত, দর্শন প্রভৃতি বিষয়ে ছাত্রদিগের মাসিক ও বার্ষিক পরীক্ষা করা হয়। ধর্ম্মশাস্ত্র বিষয়েও এইরূপ পরীক্ষা গ্রহণ হইয়া থাকে। বিদ্যালয়ের মধ্যেই বিজ্ঞানালোচনার জন্য ল্যাবরেটরী আছে, শিল্পশিক্ষার জন্য ওয়ার্কসপ কারখানা আছে, পাঠের জন্য লাইব্রেরী, গ্রন্থশালা, রীডিংরুম আছে। ধর্ম্মের জন্যও সেইরূপ ডিভিনিটি গৃহ, ধর্ম্মালোচনার মন্দির ও ডিভিনিটি বিদ্যালয় নির্ম্মাণ করা হয়। পরীক্ষার ফলে, এম্, এ, পি, এইচ্ ডি, প্রভৃতির অনুরূপ, বি, ডি, ডি, ডি, উপাধি পাওয়া যায়। ধর্ম্মের '[illegible]'গণ বক্তৃতা করিবার শিক্ষা পান, প্রবন্ধ লিখিবার শক্তি লাভ করেন, তর্ক, যুক্তি দ্বারা সত্য প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হন, কি উপায়ে বিভিন্ন সমাজের মধ্যে ধর্ম্ম প্রচার করিতে হয় তাহা শিখিয়া থাকেন, লোকের সঙ্গে, ছাত্রের সঙ্গে, বিভিন্ন সমাজের সঙ্গে কিরূপ আচরণ করিলে সুফল লাভ হয় ও কার্য্য সিদ্ধি হইতে পারে তাহার বিষয়েও যথেষ্ট জ্ঞান লাভ করেন।

ধর্ম্মবিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি স্বতন্ত্র প্রকোষ্ঠ

এতদ্ব্যতীত পাশ্চাত্য ধর্ম্মশিক্ষা-পদ্ধতিতে আর একটা উপকার হয়। ছাত্র ও শিক্ষকেরা অনেকগুলি নূতন ক্ষেত্রে একত্র মিলিতে পারেন, ইহাতে তাঁহাদের সামাজিকতা ও লৌকিকতা বাড়িতে পায়, সমবেত চিন্তা ও কর্ম্ম করিবার শক্তি পুষ্ট হইতে থাকে, পরস্পরকে সহায়তা করিবার সুযোগ পাওয়া যায়! কিন্তু যাহাই হউক, এই শিক্ষাপ্রণালীতে ধর্ম্মশিক্ষা মানসিক শিক্ষারই একটি বিশেষ অঙ্গমাত্র। অন্যান্য বিদ্যাশিক্ষার ন্যায় ধর্ম্ম-শিক্ষায় ও মস্তিষ্কেরই সঞ্চালন হয়, চিন্তা করিবারই ক্ষমতা বিকশিত হয়, দার্শনিক ও ঐতিহাসিক গবেষণার সাহায্য হয়, আর সামাজিক জীবনের পুষ্টি হয়। সেক্‌সপীয়র ও কালিদাসের কাব্য সমালোচনা করিয়া, মনুসংহিতা বা প্লেটোনীতি পাঠ করিয়া, 'পিল্‌গ্রিম্‌স্ প্রোগ্রেস' বা হিতোপদেশের ব্যাখ্যা মুখস্থ করিয়াও ছাত্রগণ এই সকল বৃত্তিরই বিকাশ সাধন করে, এই সমুদয় শক্তিরই অনুশীলন করে, এই সমুদয় বিষয়েই যোগ্যতা ও সামর্থ্য লাভ করে।

ধর্ম্মশিক্ষায় মানসিক উন্নতি-সাধন

জার্ম্মাণি, আমেরিকা এবং ইউরোপের অন্যান্য দেশের থিয়লজিক্যাল ফ্যাকাল্টি বা ধর্ম্মসমিতি-গঠন, ডিভিনিটি মন্দির-প্রতিষ্ঠা এবং ধর্ম্মশিক্ষা-দানের অন্যান্য উপায়গুলি আলোচনা করিলে আর একটা বিষয় বুঝিতে পারা যায়। তাঁহাদের শিক্ষাতত্ত্বের মূল কথাটা ব্যক্ত হইয়া পড়ে।

তাঁহারা মানুষকে অতি ক্ষুদ্র ও সঙ্কীর্ণ ভাবে দেখেন। মানুষকে বড় ভাবে, মহৎ ভাবে দেখিবার প্রয়াস তাঁহাদের মধ্যে থাকে না। ইহজগৎই মানুষের সমগ্র লীলাভূমি ও কর্ম্মক্ষেত্র, এই জন্মেই তাহার সম্পূর্ণ বিকাশ। এই গণ্ডীর মধ্যেই তাহাকে চিন্তা করিতে হইবে, কর্ম্ম করিতে হইবে। ইহার অতীত, বর্ত্তমান-ব্যতিরিক্ত, শরীর-ছাড়া এবং মন-ছাড়া আর কোন জগতের অস্তিত্ব নাই। আত্মা তাঁহাদের নিকট মস্তিষ্কের একটা অলীক ধারণা মাত্র, অসীমের উপলব্ধি, আধ্যাত্মিক ক্রমবিকাশ প্রভৃতি বিষয় তাঁহাদের নিকট ভাষার একটা অলঙ্কার বা উপমা মাত্র। এই খানেই মানুষের শেষ, এই জীবনেই তাহার চরম সিদ্ধি।

পাশ্চাত্য মানবতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্ব

কিন্তু সমাজের মধ্যে থাকিতে হইলে সকল বিষয়েই প্রতিদিন দ্বন্দ্ব, বিরোধ, কলহ, অনৈক্য আসিয়া জুটে। তাহা নিবারণ না করিতে পারিলে সংসারের সুখ কোথায়? পৃথিবী যে দৈনিক সংগ্রামের রঙ্গভূমি হইয়া পড়িবে! কাজেই শারীরিক ও মানসিক অনৈক্যগুলি যথাসম্ভব কমাইবার চেষ্টাই পাশ্চাত্য সমাজের প্রধান লক্ষ্য। তাঁহারা ভাষা ছাঁটিয়া বেশ ভূষার আইন করিয়া, চালচলনের রীতি বিধিবদ্ধ করিয়া, দলে দলে চুক্তি করাইয়া যথাসম্ভব বৈচিত্র্যের উচ্ছেদ সাধন করিতে চেষ্টিত হন। জীবনের কোন্ কোন্ বিভাগের মধ্যে কোনরূপ দ্বন্দ্ব হইবার সম্ভাবনা নাই, কোন্ কোন্ অংশ

বাদ দিলে জোড়াতালি দিয়া একটা সামঞ্জস্য বিধান করা যায়, কোন্ কোন্ বিষয়ে একটা চলনসই সন্ধিপত্র দাঁড় করান যাইতে পারে, এই সব আবিষ্কার করাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য। পাশ্চাত্য-সমাজের অনুষ্ঠানসমূহের মধ্যে এইরূপে ঘসিয়া মাজিয়া, কাটিয়া ছাঁটিয়া, মাঝামাঝি করিয়া বিরোধ ঘুচাইবার, অনৈক্য দূরীভূত করিবার আয়োজন যথেষ্ট দেখা যায়। রাষ্ট্রসভায়, বিদ্যালয়ে, ধর্ম্মশালায় তাঁহাদের এই এক লক্ষ্য।

পাশ্চাত্য-জগতের এই বিচিত্র মানবতত্ত্ব ও সমাজ-তত্ত্বই তাঁহাদের বিশিষ্ট শিক্ষাতত্ত্বের মূল। তাঁহারা মানুষকে অতি ক্ষুদ্র ভাবে দেখিয়াছেন, সমাজকে এই সংসারের মধ্যেই আবদ্ধ করিয়াছেন। এইজন্য বিরোধের ভয়ে তাঁহারা এত বিব্রত। এইজন্য জাগতিক একটা ঐক্য প্রতিষ্ঠা না করিতে পারিলে তাঁহারা ব্যস্ত থাকেন। এইজন্য যে সকল বিষয়ে ঐক্য প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা অল্প সেই সকল বিষয়ে তাঁহাদের সাহস বড় কম।

কিন্তু মানবকে আর একভাবে দেখা যায়। কারণ মানুষ কেবল শরীরীই নহে। অসীম অনন্ত তাহাকে ঘিরিয়া আছে। দুই অনাদ্যন্ত জগতের মধ্যে তাহার অবস্থান। আর তাহার আত্মা তাহাকে অসীমেরই এক আত্মীয় করিয়া রাখিয়াছে। সুতরাং

প্রকৃত মানবতত্ত্ব।

কেবল মাত্র সসীমের কথা ভাবিলে, কেবল ইন্দ্রিয়ের বিষয় জানিলে, কেবল সংসার ও ভোগের জ্ঞান জন্মিলে সমগ্র মানবকে জানা হইল না। অতীন্দ্রিয়কে বাদ দিলে, অমরতাকে প্রত্যাখ্যান করিলে মানুষের ইতিবৃত্ত অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। কাজেই সমগ্র, সম্পূর্ণ মানবের চরম সিদ্ধি এই এক জীবনের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে হইতে পারে না। কত শত যুগযুগান্তর লইয়া তাহার লীলা, কত শত জন্মমরণে তাহার আত্মার সম্পূর্ণ বিকাশ, তাহার হিসাব কে রাখিতে পারে? ফলতঃ ইহজগতের বিরোধ, অসম্পূর্ণতা ও ক্ষুদ্রত্বই মানুষকে প্রকৃত প্রস্তাবে ক্ষুদ্র ও সংকীর্ণ করিয়া ফেলিতে পারে না। বৃহত্তর পূর্ণতা ও সমগ্রতার মধ্যে অসংখ্য পার্থিব সঙ্কীর্ণতাগুলির যথানির্দিষ্ট স্থান আছে। ইহাতে সাময়িক অসম্পূর্ণতায়ও সামঞ্জস্যের এবং সৌষ্ঠবের হানি হয় না।

এই বৃহত্তর সমগ্রতার সংবাদ আনিয়া দেয়—ধর্ম্ম। মানবের চরমসিদ্ধি এবং আত্মার সম্পূর্ণ বিকাশের উপায় আবিষ্কার করিয়া দেয়—ধর্ম্ম। এই উদ্দেশ্যে প্রতিদিনকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিন্তা ও সঙ্কীর্ণ

ধর্ম্মতত্ত্ব

কর্ম্মরাশির—মধ্যে ধর্ম্ম অসীমকে, যুগযুগান্তকে প্রতিষ্ঠিত করে। এই অনন্তোপলব্ধিই জীবনের প্রকৃত সামঞ্জস্য ও সৌন্দর্য্য বিধান করে। তাহার ফলে পার্থিবজীবনের সকল বিভাগই, সংসারের সকল চিন্তা ও কর্ম্মই, ভোগের সকল অনুষ্ঠানই সেই বৃহত্তর সত্তা, সেই অতীন্দ্রিয় জীবনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। ধর্ম্ম এই উপায়ে সসীমে অসীমের প্রতিষ্ঠা করে, ভোগে ত্যাগের প্রবর্ত্তন করে, জন্মে ও মরণে অমৃতের প্রভাব বিস্তার করে।

ধর্ম্ম সকল কর্ম্মের মধ্যে সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠা করে, জীবনের সকল অবস্থায় অমরতার প্রবর্ত্তন করে। সুতরাং ধর্ম্ম কখনও মানবীয় কোন বিষয়কেই বর্জ্জন করিতে পারে না। এজন্য মানবের কোন কর্ম্মই ধর্ম্ম-ব্যতিরিক্ত হইতে পারে না। জীবনের সকল চিন্তা ও কর্ম্মই ধর্ম্ম-নিয়ন্ত্রিত, সমগ্র জীবনই ধর্ম্মের ক্ষেত্র। মানুষ শরীরের সাহায্যে যাহা কিছু করে, যত কিছু চিন্তা করে, সকলই ধর্ম্মজীবনের বিভিন্ন অনুষ্ঠান। অন্তরিন্দ্রিয়ের দ্বারা যাহা কিছু করা যায় তাহাও ধর্ম্মেরই বিবিধ অনুষ্ঠান। এই সমুদয়ের ফলে সংসার পুষ্ট হয়, পরিবার গঠিত হয়, দেবতত্ত্ব সৃষ্ট হয়, রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয় ও শিল্পের বিকাশ হয়। সুতরাং বৈষয়িক জীবন ও রাষ্ট্রীয়জীবন, পারিবারিক জীবন ও ব্যক্তিগত জীবন সকলই ধর্ম্মজীবনের বিবিধ অভিব্যক্তি মাত্র। কেবলমাত্র ধর্ম্মগ্রন্থপাঠ বা দেবারাধনাই, মন্দিরপ্রতিষ্ঠা এবং ধর্ম্মসভায় বক্তৃতা করাই ধার্ম্মিকের সাধনা নহে। বিবাহ, শ্রাদ্ধ, দান, উপাসনা, পূজা, আলোচনা, ভ্রমণ, ব্যায়াম ও আচার ব্যবহার সকলই ধর্ম্মের সাধন। ধর্ম্মজীবনের পক্ষে কোন কর্ম্ম ও চিন্তাই অবজ্ঞেয় নহে। সুতরাং ইহাদের মধ্যে পরস্পর

বিরোধ ঘটিতে পারে না। ধর্ম্মানুষ্ঠানসমূহের মধ্যে পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা নাই।

প্রকৃত ধার্ম্মিক জীবনের সকল অনুষ্ঠানকেই অতি-প্রাকৃত ও অতিমানবীয় ভাবের দ্বারা সুন্দর, মহৎ ও অমর করিয়া তুলিতে পারেন। তিনি তাঁহার নৈসর্গিক ক্ষুদ্রত্বের মধ্যে, শারীরিক বন্ধন-সমূহের মধ্যে, ইন্দ্রিয়গত চিন্তা ও কর্ম্মসমূহের মধ্যে মুক্তি ও অতীন্দ্রিয় সত্যের প্রভাব উপলব্ধি করেন। তিনি ভোগকে, সংসারকে বর্জ্জন করেন না, ইহাকে ত্যাগের দ্বারা, বৈরাগ্যের দ্বারা সংযত ও সুশৃঙ্খলীকৃত করেন। তিনি প্রবৃত্তির উচ্ছেদসাধন করেন না—সন্ন্যাসের দ্বারা শান্ত ও নিয়ন্ত্রিত করেন। বাহ্য আচার তাঁহার উপেক্ষার বস্তু নহে, রূপকল্পনা তাঁহার অনন্তোপলব্ধির প্রতিবন্ধক নহে। তিনি এই সমুদয় স্বাভাবিক অসম্পূর্ণতার ভিতর দিয়াই অসীম অনন্তের উপলব্ধি করেন। এইরূপে তাঁহার জীবনের সকল কাজেই অনন্তমুখীনতা থাকিয়া যায়; জীবনের সকল অবস্থায়ই, সকল স্তরেই সন্ন্যাস ও সংসারের, বাসনা ও নির্ব্বাণের সামঞ্জস্য ও সমন্বয় সাধিত হইতে থাকে। 'দেহাত্মক বুদ্ধি'র ক্রমিক লোপ সাধন তাঁহার সমগ্র কার্য্যকলাপের উদ্দেশ্য, সমগ্র জীবনে ত্যাগের নিয়ম পালন তাঁহার একমাত্র সাধনা।

প্রকৃত ধর্ম্মজীবনের বিচিত্র সাধন

সুতরাং জ্ঞান ও ধর্ম্মের মধ্যে বিরোধ ঘটিতেই পারে না। আয়ুর্ব্বেদই আলোচনা করা হউক, অথবা নাস্তিকতার সমর্থনই করা হউক, ভৈষজ্য প্রস্তুত করাই হউক অথবা রাসায়নিক পরীক্ষাই করা হউক, দর্শনচর্চ্চাই করা হউক বা দেবতত্ত্বের তথ্য সঙ্কলন করাই হউক, পরমাণুবাদ আবিষ্কার করাই হউক, অথবা সমাজের নেতৃত্বগ্রহণই করা হউক, 'প্র্যাগম্যাটিজম্' প্রতিষ্ঠা করাই হউক বা কোন কর্ম্মকেন্দ্রের সৃষ্টি ও পরিচালনা করাই হউক,—প্রকৃত ধার্ম্মিকের সকল চিন্তা ও কর্ম্মই অনন্তমুখী, সকলই এই ত্যাগের আকাঙ্ক্ষা, অমৃতের সাধনা, মুক্তির ইচ্ছার দ্বারা পরিচালিত, সকলই ধর্ম্মশাসনে সুনিয়ন্ত্রিত। কাজেই ধর্ম্ম কোন চিন্তা বা কর্ম্মেরই প্রতিবন্ধক নহে, কোন বিদ্যারই প্রতিদ্বন্দ্বী নহে, কোন বিজ্ঞানেরই বিরোধী নহে।

অতএব ধর্ম্মশিক্ষার জন্য মানবের সমগ্র জীবনের হিসাব রাখিতে হইবে। ভাবিতে হইবে—কি উপায়ে মানুষ ইন্দ্রিয় সুখকে পরমার্থের অধীন করিতে পারে, শরীরকে আত্মার আয়ত্ত করিতে পারে, তাহার নৈসর্গিক ভোগপ্রবৃত্তিকে ত্যাগের আকাঙ্ক্ষা দ্বারা শুদ্ধ, পবিত্র ও সংযত করিতে পারে, তাহার স্বাভাবিক দুর্ব্বলতাকে, সসীম ধারণাশক্তিকে, সঙ্কীর্ণ অনুষ্ঠান-গুলিকে অতি-প্রাকৃত ও অসীম উদারতার দ্বারা পূর্ণ, পুষ্ট, সবল ও সজীব করিয়া তুলিতে পারে। ইহাই প্রকৃত ধর্ম্মশিক্ষার যথার্থ উদ্দেশ্য।

প্রকৃত ধর্ম্মশিক্ষার উদ্দেশ্য

কিন্তু মানুষ একেবারেই চরমের ধারণা করিতে পারে না, অসীমের উপলব্ধি করিতে পারে না, সূক্ষ্মতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। তাহার সর্ব্ববিধ ক্ষমতারই সীমা আছে, এজন্য সকল বিষয়েই সে পঙ্গু। এই কারণে তাহাকে স্থূল সত্য, খণ্ডসত্য, আংশিক তথ্য সংগ্রহ করিতে করিতে অগ্রসর হইতে হয়। তাহার জীবনের সকল বিভাগেই তাহাকে একপ্রকার 'আরোহপদ্ধতি' অবলম্বন করিয়া চলিতে হয়।

উদ্ভিদ্‌সমূহের সাধারণ নিয়মগুলি প্রথমেই শিক্ষার্থীর আয়ত্ত হয় না। জড়জগতের পরিবর্ত্তন সমূহের মধ্যে যে কি সত্য নিহিত আছে তাহা সে একেবারেই উদ্ধার করিতে পারেনা। ধর্ম্মজীবনের সমগ্র সত্যও সেইরূপ কোন মানবই প্রথম উদ্যমে অধিকার করিতে পারে না. তাহাকে অন্ধের মত, পঙ্গুর মত, নিঃসহায়ভাবে ক্রমে ক্রমে বিচিত্র পথের ভিতর দিয়া চলিতে হইবে। প্রথমতঃ, দেহকে যত উপায়ে সম্ভব বশীভূত করিতে হইবে। শরীরই যখন সকল প্রকার কর্ম্মের ভিত্তি, তখন নানাবিধ সংযমের উপায় অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মচর্য্যের শাসন দ্বারা ইহাকে নিয়মিত ও শান্ত করিতে হইবে। এজন্য দৈহিক বৃত্তিসমূহ নিরোধ করিবার বিচিত্র কর্ম্ম অভ্যাসের ব্যবস্থা দ্বারা চিত্তের স্থিরতা,

আরোহপদ্ধতির ধর্ম্মশিক্ষা-প্রণালী

ধীরতা ও তিতিক্ষা প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। তাহা হইলেই শারীরিক ও বৈষয়িক ভিত্তি প্রকৃত আধ্যাত্মিকতার, ত্যাগমুখীনতার ও অতীন্দ্রিয়তার অনুকূল হইতে পারিবে। দ্বিতীয়তঃ, নানা উপায়ে পরোপকার ও লোকহিতের বাসনা হৃদয়ে জাগরিত করিয়া দিতে হইবে। ত্যাগ ও সেবার বিচিত্র কর্ম্ম অভ্যাস করিতে করিতে হৃদয় হইতে স্বাভাবিক রূপেই অহঙ্কারের লোপ সাধিত হইবে। এই উপায়ে তাহার বহিরিন্দ্রিয় ও অন্তরিন্দ্রিয় শুদ্ধ হইয়া গেলে জগতের পরম সত্যের উপলব্ধি করিবার পক্ষে মানব যোগ্যতা লাভ করিবে। সেই অবস্থায় অতিমানবীয় ও অতিপ্রাকৃত জীবনের ঘটনাগুলি সে বুঝিতে পারিবে, সর্ব্বদা অসীম ও অনন্তের মধ্যে অবস্থিতি করিয়া অমৃতের ও মুক্তির ভূমানন্দ উপভোগ করিতে পারিবে।

সুতরাং বলা বাহুল্য কোন প্রকার ধর্ম্মগ্রন্থপাঠ ধর্ম্মশিক্ষার প্রধান উপকরণ নহে।

ধর্ম্মশিক্ষার উপকরণ ও অনুকূল অবস্থা

মহাপুরুষগণের জীবনালোচনা, ধর্ম্ম ইতিহাসের বিভিন্ন অধ্যায়ের বিবৃতি অথবা ধর্ম্মতত্ত্বের বিশ্লেষণ ধর্ম্মশিক্ষার মুখ্য উপায় নহে। তাহা ছাড়া কোন ঐক্যবদ্ধ আইন-কানুন এইরূপ ধর্ম্মশিক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারে না। কারণ সাধারণ কোন নিয়ম দ্বারা সকল লোকের উপযোগী বিধি নির্দ্দেশ করিয়া কোন ব্যক্তির ধর্ম্মজীবন গঠন করা যায় না। চরমে প্রত্যেক ব্যক্তির স্বারাজ্যসিদ্ধির জন্য ভিন্ন ভিন্ন সাধন অবলম্বন আবশ্যক। তাহা কোনও ধর্ম্মসমিতির অনুশাসনে সিদ্ধ হইতে পারেনা, আর এই জন্য কোনও বিদ্যালয়েই প্রকৃত ধর্ম্মশিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে না।

পাশ্চাত্য দেশে যাহাকে 'ডে-স্কুল' বলে, আমাদের দেশের আধুনিক বিদ্যালয়গুলি সেই শ্রেণীর অন্তর্গত। আর এক প্রকার বিদ্যালয় আমাদের দেশে প্রচলিত করিবার চেষ্টা চলিতেছে, তাহাকে সেই সকল দেশে 'বোর্ডিংস্কুল' বলে। সেখানে ছাত্র ও শিক্ষক সর্ব্বদা এক সঙ্গে বাস করে। আমাদের এখানে 'রেসিডেনশ্যাল' প্রথা নামে ইহা অভিহিত। এই দুই প্রথার বিরুদ্ধেই ইহাদের জন্মস্থানে যুক্তিও আছে। সে যাহাই হউক, ইহাদের কোনটিই প্রকৃত ধর্ম্মশিক্ষার অনুকূল নহে। দ্বিতীয় প্রথায় সামাজিকতার কথঞ্চিৎ বিকাশ হয় বটে। কিন্তু ইহাতেও প্রত্যেক শিক্ষার্থীর বিচিত্র ধর্ম্ম-জীবনের বিকাশ ও পুষ্টি সাধনের ব্যবস্থা হইতে পারে না।

বৈচিত্র্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে হইলে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র আয়োজন করা প্রয়োজন। শিক্ষার্থীর প্রতিদিনকার প্রত্যেক কর্ম্ম চিন্তা ও তাহার শিক্ষকের চিত্তে স্থায়িরূপে প্রবেশ করা আবশ্যক। এই কাজ আফিসের কেরাণীর রিপোর্টে সুসিদ্ধ হইতে পারে না। মুদ্রিত ফল-বিজ্ঞাপনপত্রের সাহায্যে শিক্ষার্থীর সমগ্র জীবনের চিত্র অঙ্কিত হইতে পারে না। তাহা ছাড়া নানা লোকে মিলিয়া কোনও এক ব্যক্তিকে গড়িয়া তোলা যায় না। এজন্য হৃদয়ের যে সম্বন্ধ প্রয়োজন, ভক্তি ও স্নেহের যে বন্ধন আবশ্যক তাহা কেবল ব্যক্তিগত আদান-প্রদানেই সংঘটিত হইতে পারে।

গুরু-গৃহ

যদি কোন ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে শিক্ষার্থীরা সমবেত হইয়া তাহাদের সমগ্র জীবনের কর্ত্তব্য শিক্ষার জন্য তাঁহার উপদেশের প্রার্থী হয়, যদি কোন ব্যক্তি শিক্ষার্থীকে উৎসবে, রোগে, পারিবারিক কার্য্যকলাপে, সেবায়, শুশ্রূষার সঙ্গী, সহায়ক, সেবক ও ভৃত্য ভাবে পরীক্ষা করিতে, তাহার প্রবৃত্তি সমূহ নিয়মিত করিতে সুযোগ পান, যদি তাহার সম্পূর্ণ সাধনার জন্য সেই ব্যক্তি একাকী দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারেন তাহা হইলেই এরূপ অন্তর্মুখী, বৈরাগ্যপ্রসূতি ধর্ম্মজীবন গঠনের অনুকূল ক্ষেত্র প্রস্তুত হইতে পারে। এই প্রথাকে 'ডোমেষ্টিক' বা গুরুগৃহবাসরীতি বলা যাইতে পারে।

অতএব যাঁহারা ধর্ম্মশিক্ষার জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে হয় প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতির আমূল পরিবর্ত্তন করিতে হইবে অথবা ধর্ম্মশিক্ষার চেষ্টা একেবারে পরিত্যাগ করিতে হইবে।

শিক্ষাপদ্ধতির আমূল পরিবর্ত্তন আবশ্যক।

বিশ্ববিদ্যালয়কে কেবল মাত্র পরীক্ষামন্দির না রাখিয়া প্রকৃত শিক্ষামন্দিরে, 'টীচিং ইউনিভার্সিটি'তে পরিণত করিলে জ্ঞানের মাত্রা বৃদ্ধি হইতে পারে, ত্যাগের আকাঙ্ক্ষা বিকশিত হইবেনা। শিক্ষক ও ছাত্রের একত্র বাসের ব্যবস্থা করিলে একটুকু

লৌকিকতা ও সৌজন্যশিষ্টাচার এবং সামাজিকতার শিক্ষা হইতে পারে, কিন্তু জীবনের সাধন খুঁজিয়া বাহির করিবার সুযোগ ঘটিবে না।

নূতন নূতন বিশ্ববিদ্যালয় সৃষ্টির দিনে আমি যে অপরূপ প্রস্তাবের উত্থাপন করিতেছি, তাহাতে অনেকেই হাস্য সংবরণ করিতে পারিবেন কিনা সন্দেহ। যে সময়ে পৃথিবীর সর্ব্বত্র মানুষ গড়িবার জন্য বড় বড় 'ফ্যাক্টরী' খুলিবার বিপুল আয়োজন চলিতেছে, শিক্ষার বৃহৎ বৃহৎ প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়া এক সঙ্গে বহু ফল প্রসবের ব্যবস্থা হইতেছে, সেই উন্মাদনার যুগে পরিবারবদ্ধ শিক্ষানীতি গৃহ-গত বিদ্যাদানরীতি উপেক্ষিত হইবারই সম্ভাবনা। গুরুগৃহে কতটুকুই বা শিক্ষা হইতে পারে? কয়জনই বা শিখিতে পারে, কয়টা বিষয়ই বা শিখান যাইতে পারে? গুরুশিষ্যে হৃদয়গত সম্বন্ধ না হয় প্রতিষ্ঠিত হইল, কিন্তু সমগ্রদেশের শিক্ষার ভার কি ইহার দ্বারা নির্ব্বাহিত হইতে পারে? ইহাতে যে ঘোর অনৈক্য ও বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করিবে! বিভিন্ন গুরুগৃহের পাঠচর্চ্চা ও পরীক্ষা-প্রণালীর হিসাব রাখিবে কে? গৃহস্থ হইবার সময় সমাজ শিক্ষার্থীকে সম্মান করিবে বা তাঁহার বিদ্যা ও বৈচিত্র্যের মূল্য নির্দ্ধারণ করিবে কি উপায়ে?

এই সকল প্রশ্নের উত্তর প্রাচীন ইউরোপ দিতে পারিত না, মধ্য যুগের এবং বর্ত্তমান কালের ইউরোপ এই সমুদয় তত্ত্ব আলোচনা করিতে অসমর্থ। আমেরিকার শিশু সভ্যতা এই শিক্ষাপদ্ধতিকে আদিম মানবসমাজের সরল-সহজ প্রতিষ্ঠান বলিয়া গায়ে হাত বুলাইবে মাত্র। জগতের ইতিহাসে এই সমুদয় সমস্যার মীমাংসা করিয়াছে—এক ভারতবর্ষ। ভারতবর্ষ যে বিচিত্র শিক্ষাপদ্ধতি আবিষ্কার করিয়াছিল তাহাতে ধর্ম্ম ও জ্ঞানের মধ্যে পরস্পর বিরোধের সামঞ্জস্য করিতে হইত না, তাহাতে ধর্ম্মের জন্য কোন গ্রন্থপাঠ একান্ত আবশ্যক ও একমাত্র উপাদানবোধ হইত না, তাহাতে ধর্ম্মের ব্যবস্থা করিবার জন্য দশে পাঁচে মিলিয়া কমিটি গঠন করিতে হইত না, তাহাতে ব্রহ্মচারীর ধর্ম্মভার উদ্বদ্ধ করিবার জন্য শিক্ষক-সম্মিলন, 'টীচার্স বোর্ড' বা ছাত্রাবাস-শাসনসমিতি, হোষ্টেল-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের প্রয়োজন হইত না।

এই নূতন শিক্ষাপদ্ধতি ভারতবর্ষের পক্ষে নূতন নহে

শিক্ষাজগতের সেই অপূর্ব্ব আবিষ্কার, ভারতবর্ষের সেই বিশিষ্ট দান উঠিয়া গেল কেন? সেই শিক্ষাপদ্ধতি দ্বারা কি ভারতীয় মানবের বিবিধ অভাব দূর হইত না? তাহার সাহায্যে কি ভারতসমাজের স্বভাবোপযোগী বিধি ব্যবস্থা করা যাইত না? তাহার নিয়মে কি যুগপরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে নূতন নূতন বিদ্যার, নূতন নূতন বিজ্ঞানের, নূতন নূতন দর্শনের আলোচনা হইত না? তাহার নিয়মে কি প্রদেশভেদে, ভাষাভেদে বুদ্ধিশক্তির বিকাশভেদে শিক্ষণীয় বিষয়ের বৈচিত্র্য অনুষ্ঠিত হইত না,—আলোচনাপ্রণালীর বিভিন্নতা সাধিত হইত না? তাহার প্রভাবে কি শিক্ষার্থীরা কেবল বৈরাগী ফকীর হইয়া গুরুগৃহ হইতে সমাবর্ত্তন করিত? তাহার ফলে কি সংসারের বিচিত্র ভোগ্য বস্তুর সৃষ্টি হইত না—ভোগের আকাঙ্ক্ষা তৃপ্ত করিবার জন্য বিচিত্র শিল্প ও ব্যবসায় অবলম্বিত হইত না? তাহার দ্বারা কি রাষ্ট্রীয় কর্ম্মে সহায়তা করিবার উপযোগী জ্ঞান লাভ হইত না? তাহার বিধানে কি শবচ্ছেদ করা হইত না;—উদ্ভিদবিদ্যা অধীত হইত না? -জড়জগতের তথ্য সংগৃহীত ও আলোচিত হইত না?—রাসায়নিক প্রক্রিয়াগুলি পরীক্ষা করা হইত না?

প্রাচীন ভারতে শিক্ষা

তাহা না হইলে ভারতবর্ষে এতগুলি ধর্ম্মবিপ্লব হইল কি উপায়ে? তাহা না হইলে ভারতসমাজে বিভিন্ন জাতি মিশ্রিত ও অঙ্গীভূত হইয়া গেল কি উপায়ে? তাহা না হইলে ভারত মহাদেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত এক বিচিত্র সামাজিক ও ধর্ম্মজীবন প্রতিষ্ঠিত হইয়া সকলকে শৃঙ্খলীকৃত ও ঐক্যবদ্ধ করিল কি উপায়ে? তাহা না হইলে আপামর জনসাধারণ ধর্ম্মের কথা, নীতির উপদেশ, দেবদেবীর আরাধনা, সমাজপ্রতিষ্ঠা, পরিবাররক্ষা, বিষয় কর্ম্ম শিখিল কি উপায়ে? নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে বিভিন্ন যুগে নূতন নূতন আকাঙ্ক্ষা জাগরিত হইয়া নূতন নূতন ভাষা, নূতন নূতন পুরাণ-তন্ত্র-সংহিতা, নূতন নূতন দেবতত্ত্ব সৃষ্টি করিল কি

উপায়ে? তাহা না হইলে চিকিৎসা, রঞ্জনশিল্প, বয়নকার্য্য, মন্দিরপ্রতিষ্ঠা, মূর্ত্তিগঠন, নৌবাণিজ্য, অস্ত্রশস্ত্র নির্ম্মাণ প্রভৃতি জড়বিজ্ঞানমূলক কাজ কর্ম্ম চলিত কি উপায়ে? তাহা না হইলে কি মহারাষ্ট্র ও পঞ্চনদ, অন্ধ্র ও বঙ্গদেশের অধিবাসিবৃন্দ বিভিন্ন ভাষায় কথা কহিয়া, বিভিন্ন সাহিত্যের পুষ্টি বিধান করিয়া, বিচিত্র রীতিনীতি, বিচিত্র ধর্ম্মকর্ম্ম, বিচিত্র সামাজিক প্রথা অবলম্বন করিয়াও সকলকে এতকাল একই সভ্যতা ও সমাজ-কলেবরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ মনে করিতে পারিত?

যুক্তিকে অবজ্ঞা না করিলে বলিতে হইবে—ভারতবর্ষের শিক্ষাপদ্ধতি কালধর্ম্মের অনুসারে নিজকে গুছাইয়া লইতে পারিত। ইতিহাসের সাক্ষ্য বিশ্বাস করিলে বলিতেই হইবে—ভারবর্ষের যুগে যুগে নব নব অবস্থাসংঘটনের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষকগণ উপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়া লইতে জানিতেন। তাহারই ফলে ভারতবর্ষের বিদ্যালয়সমূহ আজকালকার অক্সফোর্ড, বার্লিন এবং আমেরিকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যায় সমগ্র পৃথিবীর শিক্ষালয় হইতে পারিয়াছিল—ভারতবর্ষের পল্লীসমূহ সেই সময়কার চিন্তাজগতের রাজধানী হইয়া বিরাজ করিতেছিল। তাহারই ফলে ভারতবর্ষের শিল্পব্যবসায় ও কারুকার্য্য দেশের অভাবমোচন করিয়া পৃথিবীতে অন্ন, বিলাস ও সভ্যতা বিতরণ করিতে পারিত। ভারতীয় পল্লীর গুরুগৃহে শিক্ষাপ্রাপ্ত গ্র্যাজুয়েটগণ রাষ্ট্রগঠন করিতেন, বৈষয়িক জীবনের ধুরন্ধর হইতেন, সাম্রাজ্য-নীতির সংস্থাপন করিতেন, ব্যবসায় বাণিজ্যের প্রবর্ত্তক হইতেন। তাহারই ফলে তাঁহারা মহাভারতের, এবং ভারতবর্ষের বাহিরে বৃহত্তর ভারতের প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়া অশিক্ষিতকে শিক্ষিত, বর্ব্বরকে সৌজন্যবান্, অসভ্যকে সুসভ্য করিয়া তুলিয়াছিলেন। তাহারই ফলে তাঁহারা সমাজবিজ্ঞান ও মনস্তত্ত্বে পারদর্শী হইয়া লোকের ধারণাশক্তি ও প্রবৃত্তির বিকাশ অনুসারে সমাজে বিচিত্র ধর্ম্মপ্রণালী, বিচিত্র পূজাপদ্ধতি ও বিচিত্র ধর্ম্মানুষ্ঠানের প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। তাহারই ফলে আমাদের আদর্শ নরপতি—

ভারতীয় শিক্ষাপদ্ধতির ফল

"জুগোপাত্মানমত্রস্তো ভেজে ধর্ম্মমনাতুরঃ।
অগৃধ্নু রাদদে সোঽর্থমসক্তঃ সুখমন্বভূৎ॥"

তাহারই ফলে ভারতীয় প্রদেশসমূহের ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক বিভিন্নতা অনুসারে তাঁহারা ধর্ম্মবন্ধনের ও সমাজ ব্যবস্থার বৈচিত্র্য রক্ষা করিতেন। আর এই জন্যই ভারতবর্ষে কখনও প্রতিভাসম্পন্ন চরিত্রবান্ নরনারীর অভাব হয় নাই। আর্য্যযুগের বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্র হইতে রামপ্রসাদ, রামকৃষ্ণ পর্য্যন্ত,—পাণিনি, চাণক্য হইতে চন্দ্রকান্ত তর্কলঙ্কার পর্য্যন্ত, মৈত্রেয়ীর কাল হইতে অহল্যাবাই, রাণী ভবানী পর্য্যন্ত,—সুদাস, চন্দ্রগুপ্ত হইতে শিবাজী পর্য্যন্ত বিচিত্র কর্ম্মক্ষেত্রের জন্য বিচিত্র চিন্তাবীর ও কর্ম্মবীর আবির্ভূত হইয়া ভারতের জাতীয় চেতনাকে জাগ্রত করিয়া রাখিয়াছেন, ভারতবর্ষের সাধনাকে বিভিন্ন অবস্থার মধ্য দিয়াই অমর, অক্ষয় ও জীবন্ত করিয়া রাখিয়াছেন।

আর আধুনিক যুগের মানবসমাজকে এই শিক্ষা প্রদান করিবার জন্যই ভারতবর্ষ এখনও বাঁচিয়া আছে। পৃথিবীতে যে সকল দেশে প্রাথমিক শিক্ষায় প্রত্যেক ব্যক্তির অধিকার ও সুযোগ আছে, তাহাদের শিক্ষাপদ্ধতি ও ইহার দ্বারা সম্পূর্ণ করিতে হইবে। জার্ম্মাণির শিল্পবিদ্যালয়ে, আমেরিকার কৃষি-কলেজে, এই বিচিত্র বাণী প্রচারের জন্য ভারতবর্ষ এখনও তাহার বৈচিত্র্য ও স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতেছে। এই শিক্ষাপদ্ধতি এখনও সম্পূর্ণ লুপ্ত হইয়া যায় নাই, কেবল যত্নাভাবে মলিন ও নিস্পন্দ হইয়া রহিয়াছে। ভারতবর্ষ তাহাকে সঞ্জীবিত করিয়া পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করিবে। এই নূতন যুগের মানবজাতি অন্যান্য দেশে কয়েকটি বিদ্যা ও শিল্পের বিশেষ উৎকর্ষ সাধন করিয়াছে—তাহা এই দেশের পক্ষেও একেবারে নূতন নহে। সেই সমুদয় সত্যও এই শিক্ষাপদ্ধতি নিজের অঙ্গীভূত করিয়া লইয়া নিজের বিশিষ্ট উপায়ে এই সমাজে প্রচলিত করিবে।

মানবের ভবিষ্যৎ ও আধুনিকভারত

আমরা নূতন নূতন শিল্পের সন্ধান পাইতেছি; রেলগাড়ী, ষ্টীম এঞ্জিন, ছাপাখানা, তড়িৎশক্তির প্রভাব দেখিতেছি; স্বায়ত্তশাসনের, রাষ্ট্রীয় ঐক্যের সংবাদ

পাইতেছি। কিন্তু এই সমুদয় আসিয়া ভারতবর্ষকে অভিভূত করিতে পারিবে না—ইহাদের উৎকট ক্ষমতার নিকট ভারতবর্ষ আত্মসমর্পণ করিবেনা—ভারতবাসী ইহাদের প্রভাবে স্বাতন্ত্র্য হারাইয়া বিশ্বকে দরিদ্র করিবে না। আমরা রেলগাড়ী আয়ত্ত করিব—প্রতিদ্বন্দ্বিতা, অসাম্য এবং জীবনসংগ্রাম বৃদ্ধি করিবার জন্য নহে, দ্রুতগতিতে সমগ্র পৃথিবী ভাবুকতার দ্বারা অভিভূত করিবার জন্য—ধর্ম্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে দিগ্বিজয়ের সুবিধা-সৃষ্টির জন্য। আমরা শিল্পের উন্নতি বিধান করিব, নবাবিষ্কৃত বিজ্ঞানালোচনায় যত্ন করিব—পার্থিব সুখ-ভোগের দাস হইবার জন্য নহে,—নূতন নূতন নিষ্কাম কর্ম্মের পন্থা আবিষ্কারের জন্য। আমরা স্বদেশকে ভালবাসিব, জাতীয় সভ্যতার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিব—বিরোধ ও বিদ্বেষকে প্রশ্রয় দিবার জন্য নহে, মানবসমাজের বৈচিত্র্য ও ভগবানের ঐশ্বর্য্য প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য। আমরা বিজ্ঞানসম্মত শাসন প্রণালী অবলম্বন করিব—ইউরোপের অনুকরণে সমাজগঠনের জন্য নহে, পাশ্চাত্য সমাজ-তত্ত্বের 'বুক্‌নি' লাগাইয়া জগৎকে বিজ্ঞান ও প্রকৃতিপুঞ্জের স্বায়ত্তশাসনের সঙ্গে ভক্তি, বৈরাগ্য ও প্রেমের অদ্ভুত সমন্বয় বুঝাইবার জন্য।

ভারতবর্ষের বাণী

আমরা দেখাইব যে সাম্য—যথেচ্ছাচার ও অনৈক্যের নামান্তর মাত্র নহে, ভেদবুদ্ধি ও অসাম্য মাত্রই—ঐক্য, সহানুভূতি ও প্রেমের প্রতিবন্ধক নহে—আমরা জগৎকে দেখাইব যে সারা জীবন সংসারের কর্ম্মে ব্যয় করিয়াও যথাসময়ে সকল বাসনা ত্যাগ করা যায়, জড়জগতের তথ্য আলোচনা করিয়াও ভগবদ্ভক্তির অনুশীলন করা যায়, বিজ্ঞানে পণ্ডিত হইয়াও বিচিত্র নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া আস্তিক্যবুদ্ধি রক্ষা করা যায় এবং গার্হস্থ্যাশ্রমে রাষ্ট্রের পরিচালক, সমাজের নায়ক ও বৈষয়িক ব্যাপারসমূহের ধুরন্ধর হইয়াও বার্দ্ধক্যে মুনিবৃত্তি অবলম্বন করিয়া অবশেষে যোগাভ্যাস দ্বারা তনুত্যাগ করা যায়।

হিন্দুসমাজ সেই উদ্দেশ্যেই বাঁচিয়া আছে। ভারতীয় প্রভাব বিস্তৃত হইলেও ইউরোপের ভারতে পদার্পণ সার্থক হইবে, কারণ তাহারই পরে জগতে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যসম্মিলনের ফল ফলিতে আরম্ভ করিবে। আধুনিকযুগোপযোগী ভারতগঠনের অর্থ ইউরোপের অনুকরণ নহে—ভারতের স্বকীয় আত্মপ্রকাশ, নিজ বিশেষত্বের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা।

বিশ্ব-মানবের হৃদয় মধ্যে আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছে—যন্ত্র ও উপলক্ষের অভাব হইবে না।

শ্রীবিনয়কুমার সরকার এম্, এ।

দরিদ্র-দম্পতী।

"কার তরে বল দেবি! এত আয়োজন?
ভুলে গেছ মোরা দীন হীন?
জীর্ণ পর্ণশালা মাঝে তুমি আর আমি
কত কষ্টে যাপি নিশিদিন!
একিএ নৈবেদ্যরাশি! কুসুমের কান্তস্তূপে মোদের কুটীর
কেন গো সাজাও দেবি! এ'ত নয় দেবগৃহ, ভবানীমন্দির,
কোন্ দেবতারে আজি করিবে ভজন?
কার তরে এত শ্রম এত আয়োজন?

"মুষ্টিমেয় অন্ন লাগি সারা দিবানিশি
খাটি মোরা কত প্রাণপণে;
কোন দিন অনাহারে, কভু একাহারে
কত দুঃখে আছি গো দুজনে!
সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই; ক্ষিপ্তা, বিহ্বলার মত প্রত্যহ উষায়
ফুলসাজি লয়ে করে ছুটে যাও পুষ্পতরে বনালি সীমায়!
বল মোরে, বল দেবি! কার আমন্ত্রণ?
কার তরে এত শ্রম এত আয়োজন?

"বুঝি না কিছুই ওগো, কিছুই বুঝি না
চেয়ে থাকি প্রত্যহ উষায়,
কত দৈববাণী শুভ, নির্ম্মাল্য পুজার
হেরি তব নেত্র নীলিমায়!

আহিত-অগ্নিকা-সমা তব শিবতরা মূর্ত্তি কুটিরে আমার।
প্রত্যহ আনিয়া দেয় নন্দন উপান্ত হ'তে পারিজাত হার!
বল মোরে, ওগো দেবি, কার তরে এত
লইতেছ আনন্দের এত পুণ্যব্রত!

"বড়ই দরিদ্র মোরা; নিখিল সংসার
বিঁধে যায় শত উপেক্ষায়;
মোদের হৃদয়পদ্ম দলিত, আহত হয়
রাজপথে শত লাঞ্ছনায়।
হে সুন্দরি, হে কল্যাণি, বসি তুমি অকাতরে জীর্ণ গৃহদ্বারে
কার তরে এতমাল্য, সচন্দন লতাপুষ্প রাখ ভারে ভারে?
ধূলি বিমলিন দেহে, মলিন বসনে
পশিতে তোমার গৃহে ভয় হয় মনে!"

"একি কথা? ভয়? কেন? দেবতা আমার
ছদ্মবেশে আর কতদিন
ছলিবে আমায় প্রভো? হেরি তব কত
দেবমূর্ত্তি প্রত্যহ নবীন!
সত্য শ্রমজীবী মোরা; দিবানিশি প্রাণপণে সংসার প্রাঙ্গণে
যত্ন পরিশ্রম করি, যত দুঃখদৈন্যে ভুগি মিলিয়া দুজনে।
সকলি উড়িয়া যায় দিগন্ত সীমায়,
ডুবিলে তোমার বুকে প্রত্যহ নিশায়।

তাই দেব, প্রতি প্রাতে আসে এতবল
স্বর্গ হ'তে প্লাবিয়া হৃদয়!
তুমিই রচিয়া যাও অজ্ঞাত ইঙ্গিতে
প্রাণে মোর শত দেবালয়!
তোমার দেবতামূর্ত্তি আশীষ কল্যাণ ভরা অনিন্দ্য সুন্দর
প্রত্যহ অপূর্ব্বরূপে দেখা দেয় প্রাণপদ্মে কমনীয় তর!
তাহারি পূজায় প্রভো, তাহারি পূজায়,
এত শ্রম, আয়োজন প্রত্যহ ঊষায়।"

শ্রীগঙ্গাচরণ দাসগুপ্ত বি, এ।

আয়ুর্ব্বেদ ও আধুনিক রসায়ন।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

রৌপ্য (Silver)

প্রাচীন ইতিহাস—পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে বৈদিক গ্রন্থ সমূহে স্বর্ণের যেমন ভূরি ভূরি উল্লেখ আছে, রৌপ্যের উল্লেখ তদপেক্ষা অনেক অল্প। অথর্ব্ববেদে রজস্ শব্দের উল্লেখ আছে এবং বিবিধ ব্যাধি নিবারণের জন্য রৌপ্যের কবচ ধারণের ব্যবস্থাও আছে। প্লিনী সিন্ধুদেশে স্বর্ণ ও রৌপ্যের খনির উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু ষ্ট্রাবো গুজরাট অঞ্চলের বর্ণনায় লিখিয়া গিয়াছেন, যে, "রৌপ্য অন্য দেশ হইতে ঐ স্থানে আমদানি হইত।" ষ্ট্রাবোর বহুশতাব্দী পরে লিখিত "আইন আকবরীতেও লিখিত আছে যে, গুজরাটে রোম ও ইরাক প্রদেশ হইতে রৌপ্য আমদানি হইত। আইন আকবরীতে আগ্রাসুবা, দিল্লী সুবা ও লাহোর সুবাতে রৌপ্যের খনি ও কারখানা ছিল বলিয়া লিখিত আছে। সংকলিত প্রাচীন মুদ্রা দৃষ্টে দেখা যায় যে, প্রাচীন হিন্দুরাজাদের রাজত্বকালে স্বর্ণ, তাম্র, ও রৌপ্য এই তিন প্রকার ধাতুর নির্ম্মিত মুদ্রার প্রচলন ছিল। আয়ুর্ব্বেদে সুশ্রুতের সময় হইতেই রৌপ্য ছয় ধাতুর মধ্যে অন্যতম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

ধাতু প্রস্তুত প্রক্রিয়া—(metallurgy)—রৌপ্যের প্রস্তুত প্রক্রিয়া আজ পর্য্যন্ত বিশেষ ভাবে আলোচিত হয় নাই; তাহার কারণ রৌপ্যের কোন খনিজ পদার্থের উল্লেখ বৈদ্যকে পাওয়া যায় না। আমার মনে হয় প্রাচীন ভারতে রৌপ্যের কোন খনিজ পদার্থ আবিষ্কৃত হয় নাই। সীস ধাতুর খনিজ পদার্থ স্রোতোঽঞ্জন (galena) হইতেই রৌপ্য আহৃত হইত। এই অঞ্জনে অল্প পরিমাণ রৌপ্য প্রায়ই থাকে এবং উহা হইতে আজ পর্য্যন্ত অনেক পরিমাণে রৌপ্য আহৃত হইয়া থাকে।

সহজ রৌপ্য—(natural silver) রৌপ্য স্বর্ণের ন্যায় অসংযুক্ত ভাবে পৃথিবীর স্থানে স্থানে পাওয়া

যায়।* ভারতেও ঐরূপ রৌপ্য অসংযুক্ত অবস্থায় পাওয়া যাইত। রসরত্ন সমুচ্চয়কার লিখিয়াছেন রৌপ্যম্ সহজং খনিসংজাতং কৃত্রিমং চ ত্রিধা মতম্ "অর্থাৎ রৌপ্য ত্রিবিধ —সহজ, খনিজাত ও কৃত্রিম। অধ্যাপক রায় মহাশয় "সহজ" অর্থে কাল্পনিক (of mythical origin) করিয়াছেন। কিন্তু ঐরূপ অর্থ করিবার কোনও কারণ দেখা যায় না। "সহজ" অর্থে natural স্বাভাবিক হওয়াই উচিত।

খর্পরীকরণ—(cupellation) পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে খুব সম্ভবতঃ স্রোতোঞ্জন (galena) হইতেই রৌপ্য আহৃত হইত। এই স্রোতোঞ্জন সীস ধাতুর একটি খনিজ পদার্থ অতএব সীস ও রৌপ্যকে পৃথক্ করিতে না পারিলে রৌপ্য বিশুদ্ধ অবস্থায় পাওয়া যায়না। অধুনা যে উপায়ে সীস ধাতু হইতে রৌপ্যকে পৃথক্ করা হয় তাহাকে cupellation বলে। আমি ইহার বাঙ্গালা প্রতিশব্দ "খর্পরীকরণ" করিলাম। বৈদ্যকেও আধুনিক খর্পরীকরণের অনুরূপ প্রক্রিয়াতেই রৌপ্য ও সীস পৃথক্ করিবার উপদেশ দৃষ্ট হয়।

প্রথমে খর্পর বা মূষা প্রস্তুত করিবার নিম্নলিখিত উপায় রসার্ণবে বর্ণিত আছে—"মোক্ষবৃক্ষের ভস্ম দুই ভাগ, ইষ্টকচূর্ণ এক ভাগ ও মৃত্তিকা এক ভাগ মিশাইয়া মূষা প্রস্তুত করিলে উহা রৌপ্যশোধনার্থে উত্তম হইবে।" † অধুনা হাড় পুড়াইয়া যে ভস্ম পাওয়া যায় (bone-ash) তাহার দ্বারা রৌপ্যশোধনার্থ খর্পর (cupel) প্রস্তুত হয়।

তৎপরে রৌপ্যশোধন করিবার জন্য সীসক ও সোহাগা মিশাইয়া ঐ খর্পরে অগ্নির দ্বারা জ্বাল দিবে। রসার্ণব, রসেন্দ্রচিন্তামণি, রসরত্নসমুচ্চয়, রসেন্দ্রসারসংগ্রহ প্রভৃতি সকল রসগ্রন্থেই এই প্রক্রিয়া উল্লিখিত হইয়াছে: রসরত্নসমুচ্চয়ে এই প্রক্রিয়ার বিশদ বর্ণনা দৃষ্ট হয়।—

"একখানি খর্পরে গোল করিয়া ভস্ম ও চূর্ণ সাজাইতে হইবে এবং তাহার উপর রৌপ্য ও সমপরিমাণ সীস রাখিতে হইবে। পরে যতক্ষণ পর্য্যন্ত সীস দূরীভূত না হয় ততক্ষণ অগ্নিতে পুনঃ পুনঃ পাক করিতে হইবে।*

আইন আকবরীতে এই প্রক্রিয়ার অতি সুন্দর বিশদ বর্ণনা আছে।† ইহার সারমর্ম্ম এখানে লিপিবদ্ধ হইল। প্রথমে গোবর ও বাবুল কাঠ পুড়াইয়া যে ভস্ম পাওয়া যায় তাহার দ্বারা খর্পর প্রস্তুত করা হইত: পরে তাহাতে অশুদ্ধ রৌপ্য সমপরিমাণ সীসের সহিত মিশ্রিত করিয়া অগ্নিতে উত্তপ্ত করা হইত। প্রথমে চতুর্থাংশ সীসক মিশ্রিত করিয়া কয়লার আগুনে জ্বাল দেওয়া হইত এবং ফুঁ দিয়া বাতাস দেওয়া হইত। যতক্ষণ ধাতুদ্বয় গলিয়া না যাইত ততক্ষণ উত্তাপ ও বাতাস দেওয়া হইত। এই উপায়ে চারিবারে সমস্ত সীস দেওয়া হইত ও ভস্ম করা হইত। রৌপ্য খুব চক্‌চকে হইলে জানা যাইত যে উহা শোধিত হইয়াছে। সীস ভস্ম হইয়া খর্পরে লাগিয়া যাইত। এই সীস ভস্ম (litharge) হিন্দুস্থানীতে "ফেরেল" ও ফার্সীতে "ফেরে" বলা হইত।‡

আইন আকবরীতে এই খর্পরীকরণ ব্যতীত স্বর্ণ হইতে রৌপ্য আহরণ, উপরোক্ত সীসভস্ম হইতে রৌপ্য সংগ্রহ তাম্র হইতে রৌপ্য পৃথক্‌করণ প্রভৃতি প্রক্রিয়ার বিশদ বিবরণ লিখিত আছে। বাহুল্যভয়ে সে সকল উদ্ধৃত হইল না।

রৌপ্যের শোধন—উপরে বিশুদ্ধ রৌপ্য প্রস্তুত প্রক্রিয়ার আলোচনা করা হইয়াছে। ভাবপ্রকাশে রৌপ্যকে শোধিত করিবার জন্য রৌপ্যের পাতকে অগ্নিতে উত্তপ্ত করতঃ যথাক্রমে তৈল, তক্র, কাঁজি

* "Silver is found uncombined, occasionally in masses weighing several cwts."—Newth's Inorganic chemistry.

† মোক্ষক্ষারস্য ভাগৌ দ্বৌ ইষ্টকাংশসমন্বিতৌ।
মৃদ্ভাগভাগশুদ্ধার্থমূষা বরবর্ণিনি ॥ রসার্ণব।

* নাগেন টঙ্কনেনৈব বাপিতং শুদ্ধিমৃচ্ছতি।
খর্পরে ভস্মচূর্ণাভ্যাং পরিতঃ পালিকাং চরেৎ ॥
তত্র রূপ্যং বিনিক্ষিপ্য সমসীসসমন্বিতম্।
জাতসীসক্ষয়ং যাবদ্ধমেৎ তাবৎ পুনঃ পুনঃ ॥
রসরত্নসমুচ্চয়।

† Gladwin's Ayeen Akbari, Vol. 1. p. 14.

‡ আধুনিক প্রক্রিয়ার বর্ণনা—"When the argentiferrous.

প্রভৃতিতে তিন তিন বার নিক্ষেপ করিবার ব্যবস্থা আছে। এই প্রক্রিয়া নিতান্ত নিরর্থক বলিয়া মনে হয়।

রৌপ্য মারণ—দুইটি প্রক্রিয়া প্রধানতঃ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

প্রথম প্রক্রিয়া। কণ্টকবেধ্য অতি সূক্ষ্ম রৌপ্যপত্র দ্বিগুণ পরিমিত হিঙ্গুল দ্বারা লেপন পূর্ব্বক উর্দ্ধপাতন যন্ত্রে পাক করিলে উপরিস্থ হাঁড়ীর তলভাগে পারদ সংলগ্ন হইবে এবং নিম্নস্থ হাঁড়ীতে রৌপ্য ভস্ম পড়িয়া থাকিবে।" এই প্রক্রিয়ায় রৌপ্য হিঙ্গুলের গন্ধকের সহিত সংযুক্ত হইয়া সিল্‌ভার সল্‌ফাইডে (Silver Sulphide) পরিণত হইবে এবং পাতনযন্ত্রে পারদ সংগৃহীত হইবে।

দ্বিতীয় প্রক্রিয়া। "হরিতাল, গন্ধক ও রৌপ্যপত্র সমান পরিমাণে লইয়া গোঁড়ালেবুর রসে মর্দ্দন পূর্ব্বক মুষামধ্যে পূরিয়া তিনবার পুটপাক করিয়া লইলে রৌপ্য ভস্ম হইয়া থাকে।" এখানেও রৌপ্য গন্ধকের সহিত সংযুক্ত হওয়াতে সিল্‌ভার সল্‌ফাইড' (Silver Sulphide) প্রস্তুত হইবে।

মারিত রৌপ্যের রাসায়নিক পরীক্ষা।

প্রথম নমুনা। দেখিতে কৃষ্ণবর্ণ গুঁড়া। আশ্চর্য্যের বিষয় উহাতে আদৌ রৌপ্য নাই—কেবল তাম্র ছিল। উহা কপার সল্‌ফাইড (Copper Sulphide)।

দ্বিতীয় নমুনা। উহাও উপরোক্ত নমুনার মত কপার সল্‌ফাইড (Copper Sulphide)—রৌপ্য আদৌ নাই। এই দুইটি নমুনা কলিকাতার দুইটি বিভিন্ন বৃহৎ দোকানে হইতে ক্রীত হইয়াছিল। এরূপ হইবার একমাত্র কারণ হইতে পারে এই যে বাজারে যাহা রূপুলি পাতা বলিয়া বিক্রীত হয় তাহাই রৌপ্য পাতা বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকিবে বলা আবশ্যক যে এই সকল রূপুলি ও সোনালি পাতায় রূপা বা সোনা আদৌ নাই-উহারা তামা হইতে প্রস্তুত ও রং করা। আশা করি রূপুলি পাতা লইয়া কেহ যেন রৌপ্য ভস্ম প্রস্তুত না করেন বিশুদ্ধ রৌপ্য হইতে পাত প্রস্তুত করাইয়া যেন তাহা হইতে রৌপ্য ভস্ম প্রস্তুত করেন। আধুনিক রাসায়নিক পরীক্ষা যতদিন আয়ুর্ব্বেদে গৃহীত না হইবে ততদিন এইরূপ নমুনা বিভ্রাট ঘটিতে থাকিবেই থাকিবে।

তৃতীয় নমুনা।—উপরোক্ত দুইটি নমুনা পরীক্ষা করিয়া বিশুদ্ধ রৌপ্য ভস্ম পাওয়া সম্বন্ধে হতাশ হইয়া পড়িয়াছিলাম। কিন্তু সম্প্রতি কলিকাতার আর একটি দোকান হইতে আর একটি নমুনা পাইয়াছি, তাহা বিশুদ্ধ রৌপ্য ভস্ম। দেখিতে কৃষ্ণবর্ণের গুঁড়া। পারদ বা আর্সেনিক নাই।

বালুকা ...	... ৩·৮	শতকরা ভাগ।
রৌপ্য ...	... ৮০·৬	"
গন্ধক ...	... ১৫·৬	"
	১০০·০	

তাম্র নাই বলিলেই হয়। উহা সিল্‌ভার সল্‌ফাইড, অসংযুক্ত গন্ধক থাকাতে রৌপ্যের ভাগ কিছু কম।

শ্রীপঞ্চানন নিয়োগী।

lead is rich in silver, the alloy is submitted to *cupellation,* which consists in heating the metal in a reverberatory furnace, the hearth of which consists of a movable, oval-shaped shallow dish, made of bone-ash, known as a *cupel* or *test.* The alloy is fed into this cupel from a melting pot and a blast of air is projected upon the surface of the molten metal. The lead is thus converted into litharge and the melted oxide by the force of the blast is made to overflow into iron pots. As the oxidation of the lead reaches completion ......leaving the brilliant surface of the melted silver Newth's Inorganic chemistry.

ত্রাণ।

ত্রাণ কর মোরে ওগো ত্রাণ দাতা
বন্ধন দাও খুলিয়া,
থাকি না ক যেন পথে পথে আর
তোমার চরণ ভুলিয়া!

দাও হৃদে তুমি দাও নব বল
জীবন কর হে সহজ সরল
তোমার শুভ্র শুভ নিরমল
দীপ্ত আলোকে তুলিয়া!

বেদনা বাজুক্ হৃদয়ে আমার
তোমার পুণ্য-স্মরণে
জীবন জাগাও, হে জীবননাথ!
হরণ কর' এ মরণে!

মরণে নিত্য আছি হয়ে মৃত
মরতে ছিটাও অমর অমৃত
আঁধার হইতে কর জাগ্রত
তোমার উদার কিরণে!

শ্রীত্রিগুণানন্দ রায়

শুকতারা।

একদিন অপরাহ্নে সংসারের কোলাহল হইতে একটুকু দূরে গিয়া বসিলাম। সম্মুখে কল্যাণ তটিনী, অদূরে শস্যশ্যামলা ধরণী, উপরে নীল আকাশ, আর দূরে কোন কোন স্থানে প্রস্ফুটিত শ্যাম শোভা। তখন বসন্তের অবসান। প্রকৃতির অধরে হাসির রেখা একটুকু ম্লান, চারিদিক প্রসন্ন ও শান্তিময়। সেখানে দুদণ্ড বসিয়া বড়ই আনন্দ বোধ করিলাম। শান্তির শীতল ছায়ায় হৃদয় জুড়াইয়া উৎফুল্ল মনে কতবার নদীর লহরী-লীলা দেখিলাম, কতবার আকাশের পানে চাহিয়া উহার অনন্ত বিস্তার ভাবিয়া বিস্ময়বিমূঢ় হইলাম, কতবার ধরণীর শোভা দেখিয়া অন্তরে প্রীতিলাভ করিলাম।

দেখিতে দেখিতে দিনের আলো নিবিয়া গেল। সন্ধ্যার শ্যাম অঞ্চলের শীতল ছায়ায় চারিদিক আবৃত হইল। জল ও স্থলের শোভা ক্রমে আঁধারে ডুবিল। অন্ধকার আকাশে একে একে ছোট বড় কত নক্ষত্র জ্বলিল। অন্তরীক্ষে অতুল শোভা ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিল। সে রহস্যময় দৃশ্য কতবার দেখিয়াছি, আবার দেখিলাম। কি সুন্দর! কি স্নিগ্ধোজ্জ্বল। নক্ষত্রের পর নক্ষত্র, তারপর নক্ষত্র! অসীম ব্যোমব্যাপী অনন্ত নক্ষত্র! তন্মধ্যে দেখিলাম একটী নক্ষত্র দিব্যপ্রভায় সমুদ্ভাসিত হইয়া সন্ধ্যার মুকুটমণির মত পশ্চিম গগনে হাসিতেছে! বাল্যকালে ভাবিতাম ওটি তারা নয়; কার্ত্তিক মাসে সন্ধ্যাকালে লোকে লক্ষ্মীনারায়ণের উদ্দেশ্যে শূন্যে যে প্রদীপ দেয়, উহা বুঝি সেই 'আকাশ প্রদীপ'; আবার সন্দিহান চিত্তে অনেকক্ষণ এক দৃষ্টিতে সে সমুজ্জ্বল জ্যোতির পানে চাহিয়া থাকিতাম, মনে করিতাম উহা সে প্রদীপ নয়, উহা আকাশস্থ অবলম্বহীন জ্যোতিষ্ক, শূন্যে আকাশ প্রদীপের ন্যায় সমুজ্জ্বল প্রভায় জ্বলিতেছে। যাহা হউক, এত শুভ্রোজ্জ্বল দীপ্তি আর কোন তারায় দেখি নাই। সকল নক্ষত্রই যেন ইহার তুলনায় হীনপ্রভ ও ম্লান। চক্ষু ভরিয়া ইহার সুখ শীতল রূপ ও স্থির জ্যোতিঃ বারে বারে দেখিলাম; কৌতুহলের নিবৃত্তি হইল না। তৃষিতনেত্রে আবার ইহার পানে চাহিলাম, ভাবতরঙ্গে হৃদয় নাচিয়া উঠিল। বোধ হইল যেন ফুল্ল মল্লিকার শুভ্র সৌন্দর্য্য বিলসিত উপবনে ইহা গন্ধরাজ, অথবা যেন যামিনীর হীরকখচিত শ্যাম অঞ্চলে ইহা কোহিনুর!

নির্ম্মল নৈশগগনে চাঁদের সুধাময় বিমল হাসি দেখিয়া কতদিন প্রাণে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ অনুভব করিয়াছি। প্রদোষে আকাশের পশ্চিম কোণে সন্ধ্যার তারা' দেখিয়াও কম আনন্দ উপভোগ করিলাম না। বুঝিলাম ইহা অন্তরীক্ষের অন্যতম সম্পদ্। চাঁদ দেখিলে যেমন কবির হৃদয়ে কবিত্ব ফুটে এবং বিরহিণীর প্রাণ আকুল হয়, 'সন্ধ্যার তারার পানে চাহিলেও ভাবুকের হৃদয়ে ভাবের তরঙ্গ খেলে এবং প্রেমিকের প্রাণে প্রেম উথলিয়া উঠে। বুঝিলাম ইহাও দেখিবার জিনিষ; ইহারও রূপের গৌরব আছে।

নিস্তব্ধতার কোলে সাঁঝের তারার নির্ম্মল হাসি অনেকক্ষণ দেখিলাম মনে অনেক কথা জাগিয়া উঠিল। গ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষত্র, সৌরজগৎ—এ সব একে

একে মনে পড়িল। বুঝিলাম সন্ধ্যার এ প্রদীপ্ত তারাটি তারা নয়। যাঁহারা সুদূর অন্তরীক্ষের পানে চাহিয়া প্রতিভা ও চিন্তার বলে সেখানকার সংবাদ সংগ্রহ করেন, তাঁহাদের চক্ষে সাঁঝের এই তারাটি গ্রহরূপে পরিচিত। তাঁহারা বলেন—এক একটি গ্রহ আপাততঃ এক একটি নক্ষত্রের ন্যায় প্রতীয়মান হইলেও গ্রহ ও নক্ষত্র পরস্পর ভিন্ন শ্রেণীর নভশ্চর। রাত্রিকালে দুই চারি দিন নির্ম্মল আকাশ স্থির চক্ষে লক্ষ্য করিলে দেখা যায় নক্ষত্রসকল পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম দিকে গমন করিয়া অস্তমিত হয়। কিন্তু তাহাতে উহাদের পরস্পর আপেক্ষিক অবস্থানের পরিবর্ত্তন ঘটে না। আজ রাশিতে যে নক্ষত্র যে স্থানে আছে, পূর্ব্বেও উহা সেই স্থান অধিকার করিয়াছিল। যুগের পর যুগ, ও শতাব্দীর পর শতাব্দী চলিয়া যায়, তথাপি নক্ষত্রের অবস্থান উহার পার্শ্ববর্ত্তী অন্যান্য নক্ষত্রের মধ্যে চিরদিন একরূপ দেখায়। * সময় ভেদে উহা আকাশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু চতুর্দ্দিকের নক্ষত্র হইতে উহাকে কখন সরিয়া পড়িতে দেখা যায় না। গ্রহ সেরূপ নহে; উহা স্থূল দৃষ্টিতে তারার মত দেখা গেলেও নক্ষত্র সকলের মধ্যে উহার অবস্থান স্থির নহে। আজ উহা যেখানে অবস্থিত, কাল ঠিক সেইখানেই উহা দেখা যাইবে না। দুই চারি দিনেই নক্ষত্র সকলের মধ্যে উহার অবস্থানের ব্যতিক্রম দেখা যায়। সাঁঝের তারারও এইরূপ গতি আছে; ইহাও গ্রহ। প্রাচীনকাল হইতে এই সাঁঝের তারা শুক্র গ্রহ নামে পরিচিত।

সাঁঝের তারার পানে চাহিয়া ভাবিতে ভাবিতে 'প্রভাতের তারার' কথা মনে পড়িল। মানসপটে আর এক বিচিত্র দৃশ্য ফুটিয়া উঠিল। বুঝিলাম সন্ধ্যাকালে পশ্চিম গগনেই যে সর্ব্বদা এই সুন্দর দৃশ্য ফুটিয়া উঠে, তাহা নহে। বৎসরের কয়েক মাস রাত্রিশেষে এই স্নিগ্ধ শোভা পূর্ব্ব আকাশেও বিকাশ পায়। তখনকার সে দৃশ্যও বড় মনোরম। চারিদিক নিস্তব্ধ, গম্ভীর, ও শান্তিময়: নীচে পৃথিবীতে অন্ধকারজনিত অস্পষ্টতা, আর উপরে অসীম অন্তরীক্ষে নক্ষত্রনিচয়ের মৃদু হাসি। তন্মধ্যে যখন একটী শুভ্রোজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক অঙ্গের স্নিগ্ধ মাধুরীতে বিলসিত হইয়া আকাশের পূর্ব্বপ্রান্তে প্রভাতের তারারূপে ফুটিয়া উঠে এবং স্বচ্ছ, শীতল, ও মৃদু ছটার মধ্যে বসিয়া উষার আগমন ঘোষণা করিতে করিতে আপন পথে অগ্রসর হয়, তখন সে দৃশ্য কত সুন্দর দেখায়! তখন মনে হয় যেন হিম, কুন্দ, ও মৃণালের আভা প্রভাতের তারার গায়ে ললিত লাবণ্যে ফুটিয়া আছে, অথবা যেন বারিধি-বক্ষঃস্থিত নির্ম্মল ফেনপুঞ্জের শুভ্রশ্রী উহার অঙ্গে দেদীপ্যমান। বস্তুতঃ প্রভাতের তারার শান্ত, শীতল ও কমনীয় রূপ প্রকৃতির সৌন্দর্য্য সমুদ্রের একটি চারু তরঙ্গ।

যাঁহারা বিশ্বযন্ত্রের গতিবিধি ও কার্য্যপ্রণালী জানিবার সাধনা করেন, তাঁহারা 'প্রভাতের তারা' ও 'সাঁঝের তারাকে' দুইটী পৃথক্ নভশ্চর বলিয়া মনে করেন না। তাঁহাদের চক্ষে দুইই এক এবং একেই দুই। শুক্র-গ্রহের গতিবিধি সূক্ষ্মরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছেন যে এই গ্রহই কয়েক মাস প্রত্যহ সূর্য্যাস্তের পর সাঁঝের তারারূপে পশ্চিম গগনে শোভা পায় এবং তৎপর কিছুকাল প্রত্যহ সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে আকাশের পূর্ব্ব কোণে প্রভাতের তারারূপে উদিত হয়। শুক্র নামের সংস্রবে লোকে প্রভাতের তারাকে "শুক-তারা" বলে। যাহা হউক, শুক্রগ্রহ অন্যান্য গ্রহের ন্যায় সূর্য্যকে কেন্দ্র করিয়া উহার চারিদিকে বৃত্তাভাস পথে পরিভ্রমণ করে। আমাদের আবাসভূমি এই পৃথিবীও একটী গ্রহ। ইহাও শূন্যে আপন পথে চলিয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ে সূর্য্যের চারিদিক ঘুরিয়া আসে। পৃথিবীর এই পরিভ্রমণ পথ বা কক্ষের অন্তর্দ্দিকে বুধ ও শুক্রের কক্ষ। এই দুই গ্রহ সূর্য্যের অপেক্ষাকৃত নিকটে অবস্থিত। এজন্য রাত্রে সকল সময়ে ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহারা তখন সূর্য্যের সন্নিহিত আপন আপন কক্ষে

* আধুনিক অনুসন্ধানের ফলে স্থিরীকৃত হইয়াছে যে আপাত নিশ্চল নক্ষত্রসকলেরও গতি আছে। উহাদেরও অবস্থানের পরিবর্ত্তন হয়। কিন্তু সে পরিবর্ত্তন এত কম যে স্থূল চক্ষে তাহা দুই চারি সহস্র বৎসরেও লক্ষ্য করা যায় না। জ্যোতিষের আরম্ভকালে জ্যোতিবিদের চক্ষে রাশি সকলের যে দৃশ্য প্রতিভাত হইয়াছিল, স্থূলদৃষ্টিতে এখনও তাহাই আছে। লক্ষ বৎসরে সে দৃশ্যের কতক পরিবর্ত্তন বোধ করা যাইতে পারে।

অবস্থিত রহিয়া সূর্য্যের সঙ্গে সঙ্গে প্রায়ই আমাদের দৃষ্টির বাহিরে থাকে। ইহারা নিজ নিজ কক্ষে চলিতে চলিতে যখন সূর্য্যের পশ্চিম দিকে উপস্থিত হয়, তখন আকাশের পূর্ব্বপ্রান্তে আমরা ইহাদিগকে দেখিতে পাই। এই দু'য়ের মধ্যে তখন শুক্রগ্রহই 'প্রভাতের তারা' বা 'শুকতারা' রূপে পূর্ব্বগগনে শোভা পায়। বুধগ্রহ ছোট বলিয়া লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে না। বিশেষতঃ ইহা সূর্য্যের অতি নিকটে অবস্থিত, এজন্য সূর্য্যোদয়ের অতি অল্পক্ষণ পূর্ব্বে ইহা দিগ্‌বলয়ের অল্প উপরে প্রকাশ পায়। শুকতারাও বেশীক্ষণ দেখা যায় না। ইহা পূর্ব্ব আকাশে কয়েক দণ্ডের জন্য উজ্জ্বল প্রভায় বিরাজ করে। আকাশে যে বিন্দু আমাদের মাথার ঠিক উপরে, শুকতারা তত উপরে দেখা যায় না, ইহা তাহার অনেক নীচে থাকে। বস্তুতঃ, আপনার গন্তব্য পথে চলিতে চলিতে যখন ইহা সূর্য্যের যথাসম্ভব পশ্চিমে উপস্থিত হয়, তখনই আকাশের পূর্ব্ব দিকে আমরা ইহাকে খুব উপরে দেখি। তখনও ইহা আকাশের সে বিন্দুর কাছে পৌছিবার অর্দ্ধেক পথে থাকে। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে কখন শুকতারা ইহা হইতে আর অধিক উপরে উঠে না। সূর্য্য হইতে ইহার প্রভান ৪৭ ডিগ্রীর বেশী নয়। ইহাকে ক্রমান্বয়ে কয়েকদিন এই সীমায় পৌছিতে দেখা যায়। অন্যান্য সময়ে ইহা সেখানে না যাইতেই তরুণ তপনের কিরণচ্ছটায় পূর্ব্বদিক আলোকিত হইয়া উঠে এবং শুকতারা নিষ্প্রভ হয়। তখন ইহা নগ্নচক্ষে আর দেখা যায় না; তখন ইহা আমাদের দৃষ্টিপথে থাকিয়াও অদৃশ্য হয়। নচেৎ দিবাভাগে আমরা ইহা দেখিতে পাইতাম। যাহাহউক, শুক্র আপন কক্ষে চলিতে চলিতে যতদিন পর্য্যন্ত সূর্য্যের পশ্চিম হইতে সরিয়া পূর্ব্বদিকের পানে না যায়, ততদিন আমরা ইহাকে গগনের পূর্ব্ব প্রান্তে শুকতারা রূপে উদিত হইতে দেখি; ততদিন ইহার শান্তশীতল কিরণচ্ছটায় সন্ধ্যাকাশ অলঙ্কৃত হয় না; ততদিন ইহা সন্ধ্যাসমাগমের পূর্ব্বেই আমাদের দৃষ্টিপথের বাহিরে চলিয়া যায়। পক্ষান্তরে যে সময় হইতে পূর্ব্ব গগনে শুকতারার আবির্ভাব না হয়, তাহার পর হইতেই সাঁঝের তারা পশ্চিম গগনে উঁকি মারিতে থাকে! তখন শুক্রের অবস্থান সূর্য্যের একটুকু বামে। এজন্য তখন শুক্র শুকতারা রূপে প্রকাশ পাইবার পূর্ব্বেই প্রভাত হয়; পরে একটুকু বেলা হইলে ইহা আমাদের নগ্ন চক্ষুর অদৃশ্য থাকিয়া পূর্ব্বাকাশে উঠে এবং সারাদিন সূর্য্যের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিয়া সন্ধ্যাকালে আকাশের পশ্চিম প্রান্তে উপনীত হয়। তখন দিনের আলো থাকে না। তাহাতেই তখন ইহা সাঁঝের তারারূপে পশ্চিম আকাশে ফুটিয়া উঠে। এইরূপে এক শুক্রই পর্য্যায়ক্রমে কিছুকাল 'প্রভাতের তারা' ও কিছুকাল 'সাঁঝের তারা' সাজিয়া শুভ্র শীতল ও সমুজ্জ্বল রূপে ঊষা বা সন্ধ্যার শোভা বৃদ্ধি করে।

শুক্রগ্রহ দেখিতে সমুজ্জ্বল বটে, কিন্তু ইহার নিজের কোন জ্যোতিঃ নাই। অন্যান্য গ্রহের ন্যায় ইহাও নিষ্প্রভ জড়পিণ্ড। আলোকের প্রত্যক্ষ বিগ্রহ মহাদ্যুতি ভাস্কর সকল গ্রহের পরিভ্রমণ পথের কেন্দ্রে বসিয়া সকল দিকে অবিরাম আলোক বিতরণ করিতেছে; সেই আলোকেই ইহারা আলোকিত; তাহার অতুল প্রভাবেই ইহাদের দীপ্তি। গ্রহের যে অর্দ্ধ যখন সূর্য্যের সম্মুখীন হয়, তখন সেই স্থান আলোক পায়, অপরার্দ্ধ অন্ধকারে থাকে। আমরা পৃথিবী হইতে সকল সময়ে সেই অলোকিত অর্দ্ধের সমস্ত স্থানটুকু দেখিতে পাই না; যখন যেটুকু দৃষ্টি পথে আসে তখন তাহাই উজ্জ্বল দেখায়। সূর্য্য প্রদক্ষিণ করিতে শুক্র যখন সূর্য্য ও পৃথিবীর মধ্যবর্ত্তী স্থানে উপস্থিত হয়, যখন উহার যে অর্দ্ধ আলোক পায়, তাহা আমাদের দৃষ্টি পথের বাহিরে, এবং যে অর্দ্ধ আমাদের দিকে থাকে, তাহা অন্ধকার,—তখন সেখানে সূর্য্যের কিরণ আসিতে পারে না। তখন শুক্রগ্রহ অমাবস্যার চন্দ্রের ন্যায় আমাদের অদৃশ্য। তখন যদি শুক্র সূর্য্য ও পৃথিবীর ঠিক বরাবরে আসে, আমরা ইহাকে একটি কাল গোল দাগের মত সূর্য্য-মণ্ডলের সম্মুখদিয়া সরিয়া যাইতে দেখি। সূর্য্যগ্রহণের সময় সুধাংশুর যে অবস্থা, তখন শুক্রেরও সেই অবস্থা। আমরা প্রায়শঃই চন্দ্রকে এই অবস্থায় দেখিতে পাই কিন্তু শুক্রের এ অবস্থা সচরাচর ঘটে না। প্রত্যেক ২৪৩ বৎসরে শুক্র চারিবার এই অবস্থায় পতিত হয়। খ্রীষ্টীয়

১৮৮২ অব্দের ৬ই ডিসেম্বর তারিখে এই দৃশ্য একবার দেখা গিয়াছিল। ইহা যথা ক্রমে ১২১½ বৎসর, ৮ বৎসর, ১০৫½ বৎসর, ও ৮ বৎসর অন্তর এক একবার হইতে থাকিবে। পূর্ব্বেও ইহা এই নিয়মিত সময়ের ঠিক এক এক অন্তরে ঘটিয়াছিল। যাহাহউক, শুক্র ও পৃথিবী যখন সূর্য্যের এক দিকেই অবস্থান করে, তখন শুক্র পৃথিবীর খুব নিকটে উপস্থিত হয়। তখন ইহার অবস্থান পৃথিবী হইতে আড়াই কোটী মাইল দূরে। এই সময়ে ইহার আলোকিত অর্দ্ধের সমস্ত স্থানটুকু আমাদের দৃষ্টিপথে থাকিলে ইহা অপেক্ষাকৃত অনেক বড় দেখাইত। আবার যখন শুক্র ও পৃথিবী সূর্য্যকে মধ্যে রাখিয়া পরস্পর বিপরীত দিকে অবস্থান করে, তখন শুক্রের আলোকিত মণ্ডল পূর্ণ মাত্রায় আমাদের সম্মুখীন হয়। কিন্তু তখন ইহা বড় দেখায় না। তখন ইহা পৃথিবী হইতে যথা সম্ভব দূরে অবস্থিত। তখন পৃথিবী হইতে ইহার ব্যবধান ১৬ কোটী মাইল। ফলতঃ সূর্য্য প্রদক্ষিণ করিতে শুক্র কখন আমাদের নিকটে আসে এবং আবার সরিতে সরিতে আমাদের নিকট হইতে বহু দূরে চলিয়া যায়। ইহা পৃথিবী হইতে যতই দূরে যাইতে থাকে, ইহার আলোকিত মণ্ডল অল্পে অল্পে ততই আমাদের দৃষ্টি পথবর্ত্তী হয়। বস্তুতঃ আমাবস্যার পর কলানিধির কলা যেমন দিন দিন বৃদ্ধি পাইয়া পূর্ণিমায় পূর্ণতা লাভ করে, এবং তৎপর ক্রমে আবার ক্ষয় পায়; অবস্থান ভেদে শুক্রেরও সেইরূপ পরিবর্ত্তন দেখা যায়। শুক্র যখন শুকতারা, তখন ইহা যেন শুক্ল পক্ষের চন্দ্র,-ইহার অঙ্গ অল্পে অল্পে পূর্ণ হইতে থাকে; অবশেষে শুকতারার জীবনে এমন এক সময় আসে, যখন অন্যান্য দিনের মত ইহা প্রভাতের পূর্ব্বে আকাশে উদিত হয় না। পূর্ণিমায় চন্দ্র সূর্য্য যেমন পৃথিবীকে মধ্যে রাখিয়া পরস্পর বিপরীত দিকে অবস্থান করে, এই সময়ে শুক্রেরও সেই অবস্থা এই সময়ে ইহার মণ্ডল পূর্ণ দেখায়। ইহার পরই শুক্রতারা সাঁঝের তারায় পরিণত হয়। সাঁঝের তারা যেন কৃষ্ণপক্ষের শশী,—দিনে দিনে ক্ষীণতনু। কয়েক মাস পরে অতিক্ষীণা এই সাঁঝের তারা সন্ধ্যাসমাগমেও দিগ্বলয়ের উপরে প্রকাশ পায় না। অমাবস্যার চন্দ্রের যে অবস্থা, তখন শুক্রেরও সেই অবস্থা।

ক্রমশঃ—

শ্রীরাজনারায়ণ দাস।

সার্থকতা।

আমার মাঝারে বিশ্বের ছবি
সকলি রয়েছে আঁকা,
কত বিচিত্র রসবন্ধনে
পীযুষ অমৃত মাখা!
আমি আছি, তাই রহিয়াছে সব,
আমারে লইয়া বিশ্বমানব,
মোরে ছাড়ি কোথা রূপ অপরূপ,
সকলি শূন্য ফাঁকা।

অসীমে সসীমে গঠিত প্রতিমা
রয়েছে বিশ্ব ব্যাপি,
নিত্য নূতন গন্ধবরণ
উঠিছে নিখিল ছাপি!

তাহারি আভাস জীবনের মাঝে
ধ্বনিয়া উঠুক মোর সব কাজে,
হৃদি অম্বর করুক প্লাবিত
অমৃত চন্দ্র রাকা!

শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা

অমরেন্দ্র।

(উপন্যাস)

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

বিপদের মুখে

(২)

কয়েক মিনিট পর প্রবল ঝড় ও বৃষ্টি আরম্ভ হইল; আর কিছুকাল বিলম্ব হইলে নৌকাখানা নদী গর্ভে ডুবিয়া যাইত।

যেমন সমাজবক্ষঃস্থিত কোনও বদ্ধমূল কুসংস্কারকে কোন ব্যক্তি দূর করিতে যত্নবান্ হইলে শেষে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হয়, তেমনই প্রবল বায়ু তাড়নে তটিনী তীরস্থ তরু গুল্ম বল্লরী আন্দোলিত হইয়া উঠিল। দুরন্ত অত্যাচারী লোকের নিপীড়নে নিরীহ শান্ত হৃদয়ের সদ্‌ভাবগুলির ন্যায় ত্রস্ত বিহঙ্গমের আকুল আর্ত্তনাদে কানন পূর্ণ হইল।

ঝড়, বৃষ্টি, অন্ধকার, মেঘ গর্জ্জনে প্রকৃতি কি ভীষণমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। প্রফুল্ল একবার জানালা খুলিয়া দেখিল, ক্ষণিক পুণ্যালোকে পাপরাশির ন্যায় বিদ্যুতালোকে সে অন্ধকার আরও ভীষণতর দেখাইতেছে। গঙ্গার সে কৌমুদীরঞ্জিতা উল্লাসময়ী শান্তমূর্ত্তি কোথায়; তরঙ্গ গুলি যেন রোষভরে উন্মত্তের ন্যায় সঘনে উল্লম্ফন করিতে করিতে গর্জ্জন করিতেছে।

প্রফুল্ল উঠিয়া গিয়া সভয়ে মাতার নিকট বসিল। প্রফুল্লের মাতা ব্রহ্মময়ী তাড়াতাড়ি নিদ্রিত নরেনকে টানিয়া তুলিয়া ক্রোড়ে লইয়া বসিলেন।

কালীনাথ বাবু কহিলেন—"কেন ঘুমন্ত ছেলেটাকে বিরক্ত কর? এখানে কোন ভয়ের কারণ নাই।" নলিনীবালা তখনও ভাববিহ্বল হৃদয়ে জানালা দিয়া সেই উন্মত্তা রণরঙ্গিণী প্রকৃতির পানে চাহিয়া নীরবে পদদেখিতেছিল।

পিতা সস্নেহে ডাকিলেন—"নলু, এখানে এস।" নলিনী উঠিয়া জানালা বন্ধ করিয়া দিল, ও পিতার প্রান্তে উপবেশন করিল।

এই প্রকারে কিছুকাল গত হইলে ঝড় অপেক্ষাকৃত শান্ত মূর্ত্তি ধারণ করিল। কিন্তু বায়ুর বেগ একবারে থামিল না। এবং বৃষ্টিও অল্প অল্প রহিল। আজ আর গঙ্গায় নৌকা ধরে কাহার সাধ্য? আর একখানা নৌকাও তথায় ছিল না।

মাঝিরা কহিল—"বাবু এ জায়গাটা তত ভাল নয়। এই নিকটেই গ্রামে কতকগুলি দুরন্ত লোক বাস করে।"

কালীনাথ বাবু ভৃত্যদিগকে কহিলেন,—"ওরে, আমার বন্দুক দুটা আনিয়াছিস্ তো? এক একটা বন্দুকের দ্বারা পঞ্চাশ জন লোক ফিরান যায়। ভাল করিয়া প্রস্তুত করিয়া রাখ্।"

কিন্তু অনুসন্ধানে জানা গেল ভৃত্যদের অসাবধানতায় বন্দুক আনা হয় নাই। তাঁহাদের দুইটী পাশ করা বন্দুক ছিল; এ সময় তাহা কোন কার্য্যকর হইল না। এই প্রকারে কিছুকাল গেল।

বায়ু তখনও প্রবল বহিতেছে। অল্প অল্প বৃষ্টিতে কুলায়হীন পাখীর চীৎকার মাঝে মাঝে শুনা যাইতেছে। দুঃখরাশিতে সুখের হাস্য রেখার ন্যায়, চঞ্চলা চপলা ক্ষণে ক্ষণে চমকিয়া উঠিতেছে।

কালীনাথ বাবু কহিলেন—"ধৈর্য্য ও সাহস মানবের মনুষ্যত্বের একটা দিক্। যেমন বিশ্বাস দয়া, ধর্ম্ম দ্বারা মনুষ্যত্ব বিকসিত হয়, তেমনই বিপদে ধৈর্য্য ও সাহস দ্বারা মনুষ্যত্বের বিকাশ হয়।"

ব্রহ্মময়ী—"অনেক সময় অন্যায় সাহসে বিপদ্ ঘটে।"

কালীনাথবাবু—"বিপদে সাহস ও ধৈর্য্যের দ্বারা, অনেক সময় বিপদ হইতে মুক্তি লাভ করিতে দেখা যায়।"

ব্রহ্মময়ী—"হৃদয়ে পুণ্যবল থাকিলে সাহস আপনা হইতে আসিয়া উপস্থিত হয়।"

কালীনাথ বাবু—"একবার কোন এক ভদ্রলোকের বাড়ী দস্যু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিল। বাড়ীতে পুরুষ কেহই ছিলেন না। দস্যুরা বিনা বাধায় কপাট ভাঙ্গিয়া অন্দর মহলে প্রবেশ করিল। উপায়ান্তর না দেখিয়া একজন স্ত্রীলোক তখন তরবারি হস্তে বাহির হইলেন, সেই তরবারির আঘাতে একজন দস্যু গুরুতর রূপে আহত হইল। তখন ভয়ে সকল দস্যুরা প্রস্থান করিল।"

ব্রহ্মময়ী—পাপের শক্তি অপেক্ষা পবিত্রতার শক্তি স্বভাবতঃ প্রবল। পাপের শক্তি ভিতরে বড় কম।"

কালীনাথ বাবু—"তথাপি সাহস ও ধৈর্য্যের বিকাশ সাধন নরনারী সকলেরই কর্ত্তব্য। নিতান্ত নিম্ন শ্রেণীস্থ রমণীদিগের মধ্যেও এ প্রকার সাহসের পরিচয় পাওয়া যায়। একবার একটী নিম্ন জাতীয়া রমণী কাষ্ঠ আহরণের জন্য জঙ্গলে গিয়াছিলেন; তখন এক দুর্ব্বৃত্ত দুরভিসন্ধি পরায়ণ হইয়া সেই রমণীকে আক্রমণ করে। রমণী হস্ত-স্থিত অস্ত্রের সাহায্যে তখনই তাহাকে বধ করিয়াছিল।"

ব্রহ্মময়ী—"সেই অবলা কোথা হইতে এই শক্তি লাভ করিল? ভিতরের পুণ্যবল হইতে, পবিত্রতা রক্ষার আকাঙ্ক্ষা হইতে যে শক্তি লাভ হয়, তাহার বল সামান্য নয়। কারণ স্বয়ং ভগবান্ পবিত্রতার রক্ষক।"

কালীনাথ বাবু—"সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি? নারীজাতীর ধর্ম্মের বল অসামান্য। যুগে যুগে, জগত্ ইহার দৃষ্টান্ত দর্শন করিয়াছে। বিশেষতঃ ভারতের অলৌকিক হৃদয়বল শালিনী ধর্ম্মশীলা নারীগণ ধর্ম্ম রক্ষার জন্য অনায়াসে জীবন বিসর্জ্জন দিতে পারেন। চিতোরের সূর্য্যবংশীয়া রমণীদিগের অপূর্ব্ব রোমহর্ষণ কাহিনী শুনিয়াছ তো? তাঁহারা হাসিতে হাসিতে অলন্ত অনলে জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছেন। তথাপি ধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন নাই।"

ব্রহ্মময়ী—"বর্ত্তমান সময়ে কি ভারতরমণী সেই অদ্ভুত হৃদয়বল হারাইয়াছে?"

কালীনাথ বাবু—"কখনই নহে। ভারতের অবিনশ্বর পুষ্পোদ্যানে আজও স্বর্গীয় মন্দারের অভাব নাই। সীতা, সাবিত্রী, কর্ণবতী, পদ্মিনী প্রভৃতির অভাব হয় নাই।"

এই প্রকার কথাবার্ত্তা হইতেছে, প্রফুল্ল পিতার পুণ্য জ্যোতি বিমণ্ডিত স্নেহময়, প্রশান্ত মুখ মণ্ডলে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক মনে মনে ভাবিল আমরা সৌভাগ্য ক্রমেই এমন পিতা, মাতা, লাভ করিয়াছি।"

এমন সময় "দুম" করিয়া অদূরে একটী বন্দুকের আওয়াজ হইল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।
ঘোর বিপদে।

"গুম—গুম—গুম," সেই গঙ্গাতীরস্থ নির্জ্জন অরণ্য প্রতিধ্বনিত করিয়া, গভীর নিশিথিনী বক্ষে আবার বন্দুকের আওয়াজ সকলের কর্ণে প্রবেশ করিল। নিবিড় তরু শাখা পল্লব হইতে বিহঙ্গমগণ ভীতস্বরে কলরব করিয়া উড়িতে লাগিল এবং মশাল জ্বালিয়া বহুসংখ্যক লোক নৌকার দিকে আসিতেছে দৃষ্ট হইল।

মাঝিরা ডাকিয়া কহিল "বাবু আর রক্ষা নাই, নৌকায় ডাকাত পড়িয়াছে।

সেই নৌকায় বেশী লোক জন ছিল না। একজন দারোয়ান, দুইজন ভৃত্য, দুইজন আরদালী ও মাঝি মাল্লাগণ। পুরুষ এই কয়জন মাত্র।

কালীনাথ বাবু দাঁড়াইয়া জলদ গম্ভীরস্বরে কহিলেন—

"ভৃত্যগণ তোমাদের সহায় কেহ নাই, কিন্তু ভগবান্ আছেন। স্মরণ রাখিও, তিনি বিপদে রক্ষা কর্ত্তা। স্মরণ রাখিও এই নৌকার ভিতর তোমাদের জননী ও ভগিনীগণ রহিয়াছেন। শরীরে এক বিন্দু রক্ত থাকিতে কাহাকেও নৌকায় উঠিতে দিবে না, প্রতিজ্ঞা কর। প্রতিজ্ঞা কর, মাতা, ভগিনীর সম্মান রক্ষার্থ, জীবন বিসর্জ্জন দিতে কুণ্ঠিত হইবে না।"

ভৃত্যগণ এবং মাঝি মাল্লাগণ এক বাক্যে কহিল, "প্রভু তাহাই হইবে, আমরা নিমকহারাম নহি।"

পাপ প্রবৃত্তি যেমন অজ্ঞকে বেষ্টন করে, নানা প্রকার দুষ্কৃতি এবং পাপাচারসমূহ যেমন সমাজকে বেষ্টন করে; সেই প্রকার প্রায় ৪০।৫০ জন ভীমকায় দস্যু দেখিতে দেখিতে কালীনাথবাবুর এই অরক্ষিতা বজরাখানা বেষ্টন করিয়া ফেলিল। তাহারা বন্দুক রিভলভার, তরবারি প্রভৃতি নানা অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত। দস্যুদের মধ্যে কয়েকজন মুখস্ পরা,—ছদ্মবেশী।

প্রফুল্ল ভীষণ বিপদ নিকটে দেখিয়া মাতা ও দিদির নিকট দাঁড়াইয়া ভয় ব্যাকুলপ্রাণে কাঁদিতে লাগিল।

ব্রহ্মময়ী কহিলেন—"মা বিপদের সময়ে নারায়ণকে স্মরণ কর। বিপদভঞ্জন নারায়ণ এক্ষণ আমাদের রক্ষা-কর্ত্তা। তিনিই অকূল বিপত্ সাগরে একমাত্র কাণ্ডারী"।

ভক্তি, বিশ্বাস এবং নির্ভয়ের নির্ম্মল আলোকে তাঁহার মুখমণ্ডল সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল। প্রফুল্ল নলিনীর মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল,—এক আশ্চর্য্য স্বর্গীয় পবিত্রতার আভা সে মুখ কমলে দীপ্তি পাইতেছে, যেন অগ্নিরাশি তাহার চক্ষু দিয়া নির্গত হইতেছে। তাহার ভীমমূর্ত্তি দর্শন করিয়া প্রফুল্ল ভীতা হইল।

নলিনী বাক্স হইতে দুইখানা ছুরিকা বাহির করিয়া একখানা আপন দক্ষিণ করে গ্রহণ করিল, অপরখানি প্রফুল্লের হস্তে দিয়া গম্ভীর স্বরে কহিল—"প্রফুল্ল! এই অস্ত্র গ্রহণ কর। এখন আর খেলার সময় নাই, তুমি এখন ছোট নও। এই অস্ত্র বিপদে শত্রুর হৃদয়শোণিত পান করিবে, অথবা আপন হৃৎপিণ্ড ছেদনপূর্ব্বক নিজ অবিনশ্বর ধর্ম্ম রক্ষা করিবে।"

প্রদীপালোকে সে সুতীক্ষ্ণ ছুরিকা ঝলসিয়া উঠিল। প্রফুল্ল সুতীক্ষ্ণ ছুরিকা খানা হস্তে ধারণ করিয়া ভক্তি-ভরে ও বিশ্বাসব্যাকুল হৃদয়ে, একমাত্র সেই বিপদ্‌ভঞ্জন নাম স্মরণ করিতে লাগিল। সে বালিকার চক্ষুতে তখন আর জল ছিলনা; কি এক অনির্ব্বচনীয় সাহস ও তেজোরাশিতে সেই সুকুমার প্রাণ পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

শ্মশানবিহারিণী প্রেতিনীর ন্যায় সেই ঘোর তমসাচ্ছন্ন রজনী নৌকারোহীদিগকে ভীতি প্রদান করিল। চন্দ্রমার শুভ্রকান্তি নিবিড় জলদ্‌ জালে আচ্ছাদিত; ততোধিক ত্রাসে তাঁহাদের হৃদয় সমাবৃত হইল। দস্যুদিগের আনন্দ উল্লাস জনিত চীৎকার ধ্বনি, নিশীথিনীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া সেই জনমানবশূন্য কানন এবং গঙ্গাতরঙ্গ বিকম্পিত করিয়া যেন গগনস্পর্শ করিল।

ব্রহ্মময়ী যুক্ত করে ঊর্দ্ধমুখে বলিতে লাগিলেন—"এই ঘোর বিপদে, হে অসহায়ের সহায় তুমি কোথায়? হে অনাথের নাথ শ্রীহরি, তুমি কোথায় রহিলে? ধন, প্রাণ, সম্মান সব যে যায়!

এমন সময় অকস্মাৎ একি! একটা নীল আলো বাহিরে নৌকার উপর দেখা দিল। তৎসঙ্গে একটা ভীষণ দুর্গন্ধ বজরার মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল। নিমেষ মধ্যে নৌকারোহীদিগের শরীর যেন অবসন্ন হইতে আরম্ভ করিল। অল্পক্ষণ মধ্যে সকলে সংজ্ঞাশূন্য হইয়া নৌকায় পড়িয়া গেলেন।

যখন তাঁহাদের চৈতন্য হইল, তাঁহারা দেখিতে পাইলেন অধিকাংশ জিনিষপত্র অপহৃত হইয়াছে। কিন্তু নলিনীবালা কোথায়?

প্রফুল্লবালা, পিতা ও মাতাকে সম্মুখে দেখিতে পাইয়া চীৎকার করিয়া কহিল—"মা! দিদি কোথায়?" কাপুরুষ নরাধমগণ সেই দেবীকে লইয়া প্রস্থান করিয়াছে।

মুহূর্ত্ত মধ্যে ব্রহ্মময়ী সংজ্ঞা শূন্যা হইয়া পুনর্ব্বার নৌকা মধ্যে পতিতা হইলেন।

হায়! তাঁহাদের সেই সময়ের অবস্থা বর্ণন করিতে পাষাণও ফাটিয়া যায়।

প্রফুল্ল! রোদন করিতে করিতে কহিল—'হা বিধাতঃ! তোমার মনে কি এই ছিল?'

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

শোক তিমিরে।

এ সংসার অরণ্য অদৃষ্ট দেবীর লীলা স্থান। ফুল্ল কুসুমিত, ভ্রমর গুঞ্জরিত, কোকিল কলধ্বনি নিনাদিত, জীবন বসন্তে, মানব আত্মহারা হইয়া যখন সৌভাগ্য-নন্দনকাননে বিচরণ করিতে থাকে, তখন তাহার সময়-নাট্যের পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদের পৃষ্ঠা পূরণ নিমিত্ত অদৃষ্ট দেবী বিরলে বসিয়া কি লিখিয়াছেন কে বলিবে? অদ্যকার এই পুষ্পোদ্যান, কল্য যে মরু স্থানে পরিণত হইবে না, কে জানে? হৃদয় দর্পণে প্রিয়মুখচ্ছবি-ধ্যাননিরত প্রবাসী যুবা, আনন্দ উল্লাসে ভাসিতে ভাসিতে, যখন তটিনী তরঙ্গে, তরণী বক্ষে সুখ স্বপ্ন দর্শন করিতেছে, কে জানে তাহার এই সুখ নিদ্রা মহাযাত্রার ভাঙ্গিয়া যাইবে না?

অদৃষ্টের লীলাচক্রে কালীনাথবাবুর সুখময় গৃহ ঘোর দুঃখতিমিরে নিমগ্ন। সেই দেবীরূপিণী নলিনীবালার অভাবে, তাঁহাদের এই বহু দাসদাসী পরিবৃত সুন্দর প্রাসাদ যেন শূন্যময়। হায়, সেই স্বর্গের ফুল কোথায়?

যাহার পবিত্র মুখ কমল দর্শন করিয়া পিতা ও মাতা সকল দুঃখ বিস্মৃত হইতেন, যিনি সংসারে শান্তি

নিঝরিণীস্বরূপাছিলেন, যাহার প্রশান্ত তীক্ষ্ণ বুদ্ধি বিপদে নিত্য সুপথ প্রদর্শন করিত, সেই লক্ষ্মীস্বরূপিণী আজ কোথায়?

নলিনীর মাতা প্রায় সর্ব্বদাই ক্রন্দন করেন। দিদিকে হারাইয়া আনন্দময়ী বালিকা প্রফুল্লের প্রাণ বিষাদে আচ্ছন্ন হইয়াছে। সকলেরই প্রাণ বিষাদে নিমগ্ন।

এই ভীষণ বিপদেও কালীনাথ বাবুর কি অপরিসীম ধৈর্য্য! তিনি অটল অচল পর্ব্বতের স্থায় স্থির শান্তভাবে সকলই সহ্য করিতেছেন।

কালীনাথ বাবু কলিকাতা আসিয়া ডিটেকটিভ পোলিশ কর্ম্মচারী দ্বারা এই দস্যুতার অনেক অনুসন্ধান করাইলেন, কিন্তু দস্যুদল ধৃত হইল না। দস্যুতার কোন চিহ্নই প্রাপ্ত হওয়া গেল না। নলিনীরও কোন সংবাদ মিলিল না।

যেমন অতল পারাবার তলে হীরক খণ্ড নিমগ্ন হইলে উহা অদৃশ্য হইয়া যায়, তেমনই নলিনীবালা অদৃশ্য হইল।

আজ রবিবার! বেলা তিনটার সময় কালীনাথ বাবু তাঁহার দ্বিতল প্রাসাদের একটী সুসজ্জিত কক্ষে খাটের উপর শয়ন করিয়া একটা খবরের কাগজ দেখিতে ছেন। প্রফুল্ল পিতার পাদপ্রান্তে বসিয়া তাঁহার পদসেবা করিতেছে, ভার্য্যা ব্রহ্মময়ী গালিচা পাতা মেজের উপর বসিয়াছেন; সকলেই নীরব।

কালীনাথবাবু খবরের কাগজ খানা রাখিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন- "হা অদৃষ্ট লিপি!"

ব্রহ্মময়ী কহিলেন—"আমার অদৃষ্ট দোষেই নলুকে হারাইলাম, ইহার পূর্ব্বে আমার মৃত্যুই শ্রেয়ঃ ছিল; না জানি তাহার কি দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে।" এই বলিয়া তিনি অশ্রু বিসর্জ্জন করিলেন।

কালীনাথবাবু খাটের উপর উঠিয়া বসিলেন। স্থির স্বরে উত্তর করিলেন—"তোমরা আমার নলুকে চিনিতে পার নাই। সে আপনার তেজে আপনি সুরক্ষিতা। অগ্নিকে কে স্পর্শ করিতে পারে?"

ব্রহ্মময়ী—কি আশ্চর্য্য! এত বড় একটা ডাকাতি হইয়া গেল, আজ পর্য্যন্ত তাহার কোন কিনারা হইল না।

কালীনাথবাবু—" দেখিয়াছি দস্যু দলের মধ্যে কয়েকজন মুখস পরা ছিল। ইহাদের মধ্যে যে অনেক পরিচিত লোক আছে তাহার সন্দেহ নাই।"

ব্রহ্মময়ী—'নতুবা ছদ্মবেশ ধরিবে কেন? এই সমস্ত লোক বনের বাঘ ভাল্লুকের চেয়েও ভয়ানক। বাঘ, ভাল্লুক বেশী কি অনিষ্ট করে? কিন্তু এই সকল মনুষ্যনাম-ধারী হিংস্রক জীব জনসমাজের কত অনিষ্ট করে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।"

কালীনাথবাবু—"আমাদের গ্রাম হইতে ঐ স্থান ৪ মাইলের অধিক হইবে না। গ্রামের দুর্দ্দান্ত হিংস্রক প্রকৃতি কোন কোন লোকের সঙ্গে এই দস্যুদের যোগ থাকা অসম্ভব নয়।"

ব্রহ্মময়ী—"অসম্ভব কি? তুমি সাধ্যমত সকলেরই উপকার করিতে চেষ্টা কর; তথাপি অনেকেই আমা-দিগকে বিদ্বেষের চক্ষে দর্শন করে।"

কালীনাথবাবু—"বর্ত্তমান সময়ে পল্লীগ্রামের নৈতিক অবস্থা কি শোচনীয়! হিংসা, বিদ্বেষ, কলহ প্রভৃতি পাপে প্রত্যেক পল্লী যেন নরকের স্থায় বোধ হয়। প্রতিবেশী প্রতিবেশীর অভ্যুদয় দর্শন করিতে পারে না। পরস্পর পরস্পরের শত্রুতাচরণই যেন তাহাদের স্বভাব।"

ব্রহ্মময়ী—"কেবল দলাদলি! এই দলাদলির আবর্ত্তে পড়িয়া মানব হৃদয়ের উচ্চভাব সকল একেবারেই বিনাশ পায়। পল্লীগ্রামে নিরীহ ভদ্র লোক যাহারা আছেন দুষ্ট লোকের হস্তে পড়িয়া তাহাদেরও কত নির্য্যাতন সহ্য করিতে হয়; সর্ব্বত্রেই দুর্ব্বলের প্রতি অত্যাচার দেখিতে পাওয়া যায়।"

কালীনাথ বাবু—"বঙ্গের প্রায় প্রতি পল্লীগ্রামেরই এই অবস্থা। তবে ইদানীং কোন কোন উন্নতিশীল পল্লীগ্রামের নৈতিক দুর্গতি অপেক্ষাকৃত কিঞ্চিৎ দূরীকৃত হইয়াছে। কোন কোন স্থানে শিক্ষিত লোকগণ কর্ত্তৃক কিছু কিছু জ্ঞানালোচনা দৃষ্ট হয়।"

নরেন নীচে খেলা করিতেছিল। সে দৌড়াইয়া আসিয়া কহিল ---"বাবা, অমরেন্দ্র দাদা নীচে দাঁড়াইয়া আছেন।"

কালীনাথবাবু—তাহাকে উপরে লইয়া এস। কিয়ৎ-ক্ষণ পরে অমরেন্দ্রনাথ রায় সে ঘরে প্রবেশ করিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

অমরেন্দ্র নাথ রায়।

অমরেন্দ্রনাথ রায় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী, নব্য যুবক। সমস্ত পরীক্ষাগুলি গৌরবের সহিত সমুত্তীর্ণ হইয়া, গবর্ণমেণ্টের কোন উচ্চ শ্রেণীর কলেজে এম্, এ পড়িতেছিলেন। পরীক্ষার কয়েক মাস বাকী থাকিতেই তিনি কোন কারণে কলেজ পরিত্যাগ করেন।

অমরেন্দ্রনাথ পশ্চিম বঙ্গের কোন সম্ভ্রান্ত কায়স্থ বংশ সম্ভূত। শৈশবে পিতৃ মাতৃ হীন। বিধবা পিতৃষসা কর্ত্তৃক প্রতিপালিত। পিতার যে কিছু সম্পত্তি ছিল, তাহা দ্বারা অমরেন্দ্রের বিদ্যাশিক্ষা উত্তমরূপ চলিতেছিল। তিনি যখন কলেজ ত্যাগ করিলেন, তাহার কিছুদিন পরে দুর্ভাগ্য বশতঃ পিসীমাতা ঠাকুরাণী পরলোক গমন করিলেন। সংসারে অমরেন্দ্রের নিকট আত্মীয় আর কেহ ছিল না।

কিন্তু বিধাতা তাহাকে দৈব ভূষণে ভূষিত করিয়া দিয়াছেন। প্রতিভার প্রদীপ করে লইয়া তিনি আপন আলোকে আপন পথ আলোকিত করিয়া লইলেন। সে আলো অতি উজ্জ্বল, অতি পবিত্র।

শিল্প সভা, কায়স্থ সভা প্রভৃতি যে সকল সভা স্থাপিত হইয়া, দেশে কল্যাণ সাধন করিতেছে, অমরেন্দ্র নাথ কলেজ ত্যাগের পরই তাহার কোন একটী সভার সভ্যপদ গ্রহণ করিলেন। তাহার নাম "হিতসাধিনী সভা।" যদিও শিল্প চর্চ্চা এবং হিন্দু সমাজে সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি ইহার সাক্ষাৎ কার্য্য তথাপি এই সভার কার্য্যকারকগণ জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে সকলেরই উপকার ব্রতে ব্রতী। সার্ব্বভৌমিক প্রেমের প্রতিষ্ঠাই তাঁহাদের প্রধান ব্রত। হিন্দু, মুসলমান, ইংরেজ প্রভৃতি সকলেই পরস্পর জাতিগত এবং ধর্ম্মগত পার্থক্য ভুলিয়া যাহাতে সম্মিলিত হন, তাঁহারা প্রাণপণে তাহার চেষ্টা করিয়া থাকেন। এই সভার অধিবেশনের সময় অনেক সহৃদয় মুসলমান এবং দুই একজন ইংরেজকেও হিন্দু ভ্রাতাদের সহিত আনন্দে যোগদান করিতে দেখা যাইত, কারণ এই সভার প্রতিষ্ঠাতা হিন্দুগণ যেমন হিন্দু সমাজের প্রতি, তেমন মুসলমান ও ইংরেজদিগের প্রতি আনুকূল্য প্রদর্শন করিতেন।

সর্ব্বসাধারণের অর্থসাহায্যে এই সভার অধীন একজন ডাক্তার প্রতিষ্ঠিত এবং প্রধান কার্য্য কারকগণের অবস্থানের জন্য এক আশ্রম স্থাপন করা হইয়াছে। কয়েকজন জনহিতৈষী পবিত্রহৃদয় যুবক এই আশ্রমে বাস করিয়া দেশের কল্যাণ সাধন করিতেছেন। অমরেন্দ্র তাহাদিগেরই অন্যতম।

শ্রীমতী কুমুদিনী বসু।

একই ব্যক্তির একই সময়ে
বহু প্রতিরূপ দেহ ধারণ
ও একই সময়ে তাহাদের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কার্য্য সম্পাদন।

আমরা সকলেই বহুরূপীর একদেহে বিবিধ রূপ ধারণ দেখিয়া আমোদ অনুভব করি এবং কখনও বা তাহার আশ্চর্য্য কৌশল দর্শন করিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিয়া থাকি। কিন্তু এখানে আমরা যে একজনের বহু প্রতিরূপ ধারণের বর্ণনা করিব তাহা বহুরূপীর তামাসা অপেক্ষাও অধিক কৌতুকাবহ অথচ বহুরূপীর রূপের ন্যায় কৃত্রিম উপায়ে নিষ্পন্ন নহে, আমাদের স্বাভাবিক শক্তির দ্বারাই নিষ্পন্ন। ইহা অনেকেই অসম্ভব মনে করিতে পারেন কিন্তু ইহা আমাদের দেশের কুসংস্কারাপন্ন স্বল্পজ্ঞানবিশিষ্ট কোন লোকের কথা নহে ইহা পাশ্চাত্য সভ্য শিক্ষিত সমাজের কথা এবং গণ্যমান্য ব্যক্তিদিগের বিশেষ পরীক্ষা ও প্রমাণের পর প্রকাশিত হইয়াছে। গত ১৯১০ খৃঃ অব্দ আগষ্ট মাসের রিভিউ অব্ রিভিউজ্ (Review of Reviews) নামক জগদ্বিখ্যাত পত্রিকায় তৎসম্পাদক প্রবর ষ্টেড্ (Stead) সাহেবও পূর্ব্বোক্ত বিবরণে আস্থা স্থাপন করিয়া ইহার সম্যক্ আলোচনা করিয়াছেন। আমরা তাহা হইতেই আমাদের উপস্থিত প্রবন্ধটী সঙ্কলন করিয়া দিলাম।

কষ্ট-রিকা (Cost Rica) নামক স্থানেই বর্ণয়িতব্য অদ্ভুত ব্যাপার সঙ্ঘটিত হয়। তথাকার মেরী ব্রাউন্ নাম্নী যোগীনী বহু লোকের সাক্ষাতেই কেবল যে স্থুল প্রতিরূপ পরিগ্রহ করিতে পারেন তাহা নহে পরন্তু তিন কি চারিটী প্রতিরূপ একবারেই উৎপাদন করিতে পারেন অথচ সকল গুলিই একসঙ্গেই পরিদৃশ্যমান হইয়া থাকে : মেরী ক্রমে চারিটী প্রতিরূপ উৎপাদন করিলে পর ইহাদের মধ্যে তিনটী কোন একজন পার্শ্ববর্ত্তী লোকের হস্ত গ্রহণ করিয়া তাহার সহিত একই সময়ে ভিন্ন ২ বিষয়ের আলাপ করিতে লাগিল যেন ইহারা পরস্পর হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ব্যক্তি। তৎকালে চতুর্থটী একটু দূরে গান করিতে লাগিল।

তদীয় স্বাভাবিক একত্ব বা পূর্ণত্ব পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইলে মেরী বুঝাইয়া দিলেন যে ইচ্ছা শক্তির পরিচালনা দ্বারা লিঙ্গশরীর দুই বা ততোধিক ভাগে বিভাজিত হইয়া থাকে। ইহারা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাবে স্থুলত্বগ্রস্ত হয় এবং চৈতন্যসংরক্ষণ করে। সকলেই আবার ডবল সংযোগ সূত্রের দ্বারা মূলের সহিত সম্বদ্ধ থাকে এবং এই সূত্রের দ্বারাই ইহারা যদৃচ্ছাক্রমে মূললিঙ্গ শরীরে উপসংহৃত হইয়া সাধারণ ব্যক্তিত্ব পুনঃ সংগঠিত করিয়া থাকে।

মেরী একটী জানালা খুলিয়া আপনাকে দেখাইলেন, তাঁহার নিকটেই তাঁহার দ্বিতীয় প্রতিরূপ নিশ্চল ও নিঃশব্দভাবে অবস্থিত রহিল। এদিকে তিনি তথায় সঞ্চরণ করিতে লাগিলেন এবং পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন দর্শকগণ তাঁহাকে এবং তাঁহার দ্বিতীয় প্রতিরূপ দেখিতে পাইতেছেন কি না। উভয় মূর্ত্তিই স্পষ্টরূপেই দেখা যাইতে ছিল এবং অভিন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হইতে ছিল।

করেলিজ (Corrales) নামক জনৈক সাহেব যখন প্রথম পূর্ব্বোক্ত ব্যাপার প্রত্যক্ষ করেন। তখন তিনি ইহাতে অনাস্থাবান্ ছিলেন ও জড়বাদী ছিলেন। পরে তিনি উক্ত ব্যাপারের সত্যতা সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে প্রত্যয়বান্ হন। তিনি লিখিয়াছেন আমাদের অভ্যন্তরে যে দ্বিতীয় তরল দেহ বর্ত্তমান আছে তাহা ইতঃপূর্ব্বেও সাধারণ লোকের উপকথা বলিয়াই আমার ধারণা ছিল। উহা সামান্য পরীক্ষায় ও উত্তীর্ণ হইবে না ইহাই আমি মনে করিতাম। এখন আমাদের সমাজে যে সমস্ত পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে, তাহাতে প্রতিরূপ বিক্ষেপের সত্যতা সম্বন্ধে আমার অণুমাত্রও সন্দেহ থাকিতেছে না। ইহাকে আমি বরঞ্চ ব্যক্তিত্বের দ্বিধাকরণই বলিতে চাই।

হয়ত এরূপ মনে হইতে পারে যে মধ্যবর্ত্তী বা মন্ত্রবশ্য ব্যক্তির (medium) পক্ষেই দ্বিতীয় প্রতিরূপ বিক্ষেপ সম্ভবপর কিন্তু তাহা কিছুই নহে। ডন্ এলবার্টো ব্রিনিস করডোবা (Don Alberto Brenes Cordova) নামক আমাদের জনৈক অনুসন্ধানসহযোগী এক রাত্রিতে তাঁহার দ্বিতীয় প্রতিরূপের বিক্ষেপ করেন। ইহা এরূপ অবস্থায় এরূপ যথাযথভাবে ও প্রমাণবাহুল্য সহকারে সঙ্ঘটিত হইয়াছিল যে তদ্দ্বারা একটীকে অপরটি হইতে চিনিয়া লইয়া কোন্‌টী আমার প্রকৃত বন্ধু আমি তাহা বলিতে পারিলাম না। উভয়ে একইস্থলে অবস্থিত ছিলেন ; ঠিক একই পরিচ্ছদ পরিহিত ছিলেন ; ইঁহারা পরস্পরের সহিত কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলেন এবং এমন কি করমর্দ্দনও করিতে লাগিলেন।

অফেলিয়া নামক রমণীকে স্টেড্ সাহেব পৃথিবীতে অসাধারণ যোগিনী (medium) বলিয়া আখ্যাত করিয়াছেন। এই যোগিনী পূর্ব্বোক্ত কষ্টরিকা নামক স্থানেই আপনার অদ্ভুত যোগ-বলের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। তিনি প্রদর্শন করিয়াছেন যে দ্বিতীয় প্রতিরূপ এরূপভাবে জড়ত্বগ্রস্ত হইতে পারে যে তাহা জোনাকীর আলোতে প্রতিফলিত হইতে পারে, তখন এরূপই অদ্ভুত ও বিচিত্র বিষয় সংঘটিত হয় যে তাহা পরীরাজ্যের ব্যাপারের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। তখন আমরা একই সময়ে দুইটী অফেলিয়াকে দর্শন শ্রবণ ও স্পর্শ করিতে সমর্থ হই এক জনকে আমরা গৃহের ভিতরে আমাদেরই সঙ্গে দেখিতে পাই। অপর জনকে আমরা গৃহের বাহিরে দেখিতে পাই। শেষোক্ত মূর্ত্তি তাঁহার নিত্য পরিচ্ছদ পরিহিত কিন্তু অপরটী অর্থাৎ প্রতিরূপ উজ্জ্বল ধবল বসন পরিহিত হইয়া নব-বধূর ন্যায় দৃষ্ট হয়। ইহাতে কোন কুহক সম্ভবপর নয়, জড়-ভাব পূর্ণমাত্রায় বিরাজিত, উপলব্ধির বিষয় এবং স্পর্শের দ্বারা অনুভূত।

আমাদের সম্মুখে বাহিরের অফেলিয়ারই ন্যায়, রক্তমাংস-অস্থির অফেলিয়া অবস্থিত। ভ.ব, বর্ণ ও পরিচ্ছদ ব্যতীত একটীর সহিত অপরটীর আর কোন পার্থক্যই লক্ষিত হয় না। কেবল প্রতিরূপটী অধিক গাম্ভীর্য্য-যুক্ত, ইঙ্গিতপ্রধান ও আধ্যাত্মিক বলিয়া বিবেচিত হয়। দর্শকেরা জলপাত্র, রুমাল, পেন্সিল, নিজ নিজ ব্যবহারের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জিনিষ ইত্যাদি বস্তু সকল প্রতিরূপের নিকট প্রদান করিলে তাহা তৎক্ষণাৎ এরূপভাবে দেওয়ালের অপর পার্শ্বে অফেলিয়ার হস্তে আগত হয় যেন তথায় কোন দেওয়ালই বিদ্যমান ছিল না। ইহাতে, চিহ্নার্থ, বস্তু সকলের উপরি মুদ্রিত ছাপ (Seal) সকলও অপরিবর্ত্তিতই থাকিয়া যায়।

উপরিউদ্ধৃত বিবরণ পাঠের পর আমাদের পুরাণাদি বর্ণিত মায়া-দেহ ধারণ বোধ হয় আর অলীক কল্পনা বলিয়া কেহ উড়াইয়া দিতে চাহিবেন না।

এখানে আমরা কৃত্তিবাসের রামায়ণ হইতে অঙ্গদ রামের দৌত্যকার্য্যে রাবণ সভায় উপস্থিত হইলে, রাবণ যেরূপে সমস্ত সভা রাবণময় করিয়াছিলেন তাহার বৃত্তান্ত উদ্ধৃত করিতেছি। পাঠকবর্গ পাশ্চাত্য বর্ণনার সহিত তাহা মিলাইলে বড় পার্থক্য দেখিতে পাইবেন না।

> "অঙ্গদকে দেখে রাবণ ছলে মায়া পাতে।
> শত শত রাবণ হয়ে বসিল সভাতে॥
> যেদিকে অঙ্গদ চাহে, সেদিকে রাবণ।
> দশমুণ্ড, কুড়ি বাহু, বিংশতি লোচন॥
> সবাই রাবণ, ভেদ নাহি একজনে।
> অঙ্গদ বলেন কথা কব কার সনে॥"

এরূপ কাহিনী আছে শ্রীরামচন্দ্রের অশ্বমেধযজ্ঞে ষাইট্ হাজার মুনি নিমন্ত্রিত হইয়া সমাগত হন—তাঁহাদিগের বিদায়ের সময় অগ্রে কাহার বরণ হইবে এই প্রশ্ন লইয়া বিষম গোল বাঁধিয়া যায়। ভগবানের অবতার ধার্ম্মিক-শ্রেষ্ঠ লক্ষ্মণ বিদায়ের কর্ত্তা ছিলেন, তিনি ইতিকর্ত্তব্যতা নির্দ্ধারণ করিতে না পারিয়া একেবারে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। কিন্তু দৈববলের নিকট কিছুই অসম্ভাবিত নহে। তিনি ষাইট্ হাজার লক্ষ্মণমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া একই সময়ে ষাইট্ হাজার ঋষির নিকট উপস্থিত হইয়া সমভাবে সকলের বরণ করিলেন তখন কাহারও আর কোন আপত্তি বা অসন্তোষের কারণ রহিল না।

আমাদিগের পূর্ব্বোক্ত সমস্ত উপাখ্যান হইতে আমরা এই তথ্যটী লাভ করিতে সমর্থ হই যে এক সময়ে আমাদের মধ্যে আত্মবিদ্যার অনুশীলন প্রচলিত ছিল এবং পাশ্চাত্যদিগের অপেক্ষাও এই বিদ্যার অধিক উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল। কারণ পাশ্চাত্যদিগের বিবরণে আমরা এক সময়ে কার্য্যতঃ চারিটীমাত্র প্রতিরূপ সৃষ্টির উল্লেখ পাইতেছি কিন্তু আমাদিগের বিবরণ হইতে যদৃচ্ছাক্রমে অসংখ্য প্রতিরূপ সৃষ্টিও যে সম্ভবপরছিল তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারিতেছি।

শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

পুত্রহারা

(চিত্র)

গ্রামে একটা স্কুল খুলিয়া একটা উপসর্গ ঘটাইয়াছিলাম। তাই নয় মাসে ছয় মাসে যখনই বাড়ী যাওয়া ঘটিত, তখনই খাতাপত্র লইয়া লেখা পড়ায় আর এ বাড়ী সে বাড়ী ঘুরিয়া বাকী চাঁদা আদায়ে ছুটির দিন কাটিয়া যাইত।

সহর হইতে তাড়িত হইয়াও শীত পল্লীগ্রামে অক্ষুণ্ণ প্রভাবে রাজত্ব করিতেছে। ভোরে অনিচ্ছায় শয্যাত্যাগ করিয়া ঘাটে বসিয়া পুকুরের হিম জলে অতি সন্তর্পণে হাত ডুবাইতেছি আর ভাবিতেছি আজ প্রাতর্ভ্রমণ উপলক্ষে কাহাকে চাঁদার তাগাদা দেওয়া যায়! পঞ্চম বর্ষীয়া এক ভগিনী তাহার অর্দ্ধোচ্চারিত ভাষায় কি যেন একটা নালিশ করিতেছে, এমন সময় পশ্চাৎ হইতে কে ডাকিল "বাবু।"

"বাবু, নির্ম্মলের মা আপনাকে একবার যেতে ব'লেছেন।"

নির্ম্মলের মা! সেই নির্ম্মল বাবু, একদিন যাঁহার যশোগীতিতে গ্রামের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত

মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল। যিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধিভূষিত হইয়াও গর্ব্ব কাহাকে বলে জানিতেন না! হৃদয়ের প্রশস্ততা এবং পরদুঃখকাতরতা যাঁহাকে অল্প সময়ের মধ্যেই দীন দরিদ্রের বন্ধু করিয়া তুলিয়াছিল। হায় মাতা! একমাত্র পুত্র এমন নির্ম্মলকে হারাইয়া না জানি তুমি কেমন করিয়া বাঁচিয়া আছ! লোকটিকে বলিলাম "একটু রোদ উঠিলেই আমি যাইব, তুমি যাও।"

(২)

একটা অসাধারণ ব্যাকুলতামাখা কণ্ঠে নির্ম্মলবাবুর মা জিজ্ঞাসা করিলেন "ঠাকুরপো, তুমি সত্য করিয়া বল তোমার স্কুলের পণ্ডিতটীকে তুমি কোথায় পাইয়াছিলে।" আমি একটু অবাক্ হইলাম। বলিলাম "কেন, আমরা কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়াছিলাম, তাই দেখিয়া সে সহরে আমার বাসায় যায়। তার পর তাহাকে এখানে পাঠাইয়া দিয়াছি।"

কথাটা যেন তাঁহার মনোমত হইল না। তিনি কতক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন, তার পর বলিলেন, "ঠাকুরপো, তোমায় একটা কথা বলি। শুনিয়া হয়তো এই হতভাগিনীর প্রতি তোমার দয়া হইতে পারে; যদি হয় তাহা হইলে একটু উপকার করিও। তুমিই পারিবে, আর কেউ নয়। ঠাকুরপো যখন আমার সর্ব্বনাশ—হায়, কেমন করিয়া আমি সে কথা বলিব? —আমার নিমু যখন আমায় ছাড়িয়া গেল—তখন এ বাড়ীটাতে আমি দিন রাত্রি পড়িয়া থাকিতাম; খোঁজ রাখিতাম না কখন ভোর হয় আর কখনই বা সন্ধ্যা হয়। কয়েকদিন পর এই ঘরে আর থাকিতে পারিতাম না। বুকের উপর আমার একটা পাথরের চাপের মত বোধ হইত। আর যখন তার প্রিয় জিনিসগুলির প্রতি আমার চোখ পড়িত তখন কাঁদিবার—চীৎকার করিয়া কাঁদিবার একটা প্রবল ইচ্ছা আমাকে পাগল করিয়া তুলিত; মনে হইত না কাঁদিলে বুঝি আমার পাঁজরাগুলি ভাঙ্গিয়া যাইবে। তাই তখন ছুটিয়া আমি ঐ বেড়ার আড়ালে গিয়া বসিয়া থাকিতাম; ফাঁক দিয়া দেখিতাম পুকুরের চারি পারে লোক যার যার কাজে ব্যস্ত। এ পারের এই খোলা জায়গায় ছেলেগুলি খেলিতেছে, ওপারে চৌধুরীদের বাঁধাঘাটে যুবকেরা জটলা করিয়া বসিয়াছে, মেয়েরা অন্য অন্য ঘাটে কেউ বা কাজ করিতেছে, কেউ বা গল্প যুড়িয়া দিয়াছে—সংসার তেমনি ভাবে চলিয়াছে, কোন পরিবর্ত্তন নাই কেবল আমার প্রাণেই অনির্ব্বাণ এই চিতা। ঐখানে বসিয়া তবু যেন একটুখানি স্থির হইতে পারিতাম। বিকালে প্রায়ই দেখিতাম তোমার স্কুলের ছাত্রেরা দুই একজন মাষ্টারের সঙ্গে ফুটবল লইয়া ঐ দক্ষিণ পারের উপর দিয়া মাঠে চলিয়া যায়। তাহাদের উল্লাস কোলাহল আমার কাছে বিরক্তিজনক বোধ হইত।

তারপর একদিন—সেদিন আমার নিমুর জন্মদিন—আমার বুকের পাষাণভার দ্বিগুণ হইয়া উঠিল, পুকুরের ধারের জায়গাটুকুও আমার প্রাণে শান্তি দিতে পারিতেছিল না; ছেলেগুলি আমার সম্মুখ দিয়া কলরব করিয়া যাইতেছিল, আর তাহাদের পাছে—আমি চমকিয়া উঠিলাম—এ যে আমার নিমু—সেই শরীর, সেই রং, সেই সব—আমি চীৎকার করিয়া উঠিতেছিলাম নিমু, নিমু—হঠাৎ জ্ঞান হইল—হায় সে তো আমায় ছাড়িয়া গিয়াছে, তাকে যে আমি চিরকালের মত ঐ সহরে রাখিয়া আসিয়াছি!—আমার বুকের পাষাণ ভার বাড়িয়া গেল, আমি অস্থির হইয়া উঠিলাম, ভাবিলাম বুঝি বা পাগল হইয়া যাই। চৌধুরীদের সুরেন আমার সম্মুখ দিয়া যাইতেছিল, তাহাকে ডাকিলাম। সে বলিল ঐ ছেলেটি তোমার স্কুলের পণ্ডিত, তাদের বাড়ীতেই থাকে। ঠাকুরপো, তোমাকে কি বলিব—অপরিচিত বিদেশী সে, কিন্তু সে জ্ঞান আমার ছিল না। আমি সুরেনকে বলিলাম তাকে যেন বলে আমার কাছে আসিতে।

সে দিন আমার কি যে সুখে কাটিল কি বলিব! মনে হইল আমার নিমুকে খবর পাঠাইলাম; সে কাল আসিবে। রাত্রে জাগিয়া আমি তার জন্য খাবার তৈয়ারী করিলাম। আনন্দে আমার চক্ষে নিদ্রা আসিল না।

রাত্রিশেষে যখন ঘুমাইলাম, স্বপ্নে দেখিলাম ঠাকুরপো, —তোমার দাদা, ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বের সেই পোষাকে

তোমার দাদা আসিয়া বলিতেছেন "নিমুর জন্য তুমি কাঁদ কেন? সে তো তোমার কাছেই আছে। সর্ব্বদা তোমার কাছে থাকিতে পারিবে বলিয়াই তো সে পণ্ডিতি লইয়াছে। তুমি তাকে বুঝি চিনিতে পার নাই?" তুমি কি বুঝিবে ঠাকুরপো, ঘুম ভাঙ্গিলে পর কি দুঃখে, কি আনন্দে, কি শোকে, কি সান্ত্বনায় আমার বুক ভরিয়া উঠিয়াছিল?

পরদিন সুরেন তোমার পণ্ডিতকে লইয়া আসিল। আমি দেখিলাম আমার নিমু। তাকে খাওয়াইয়া আমার সাধ মিটে না, তাকে দেখিয়া আমার সাধ মিটে না। সর্ব্বদা আসিতে বলিলাম।

পরের ছেলে সে, কত আসিবে?

সে আসে না।

ঠাকুরপো, আমি ঐ বেড়ার আড়ালে দাঁড়াইয়া থাকি, দেখি কখন সে ঐ চৌধুরীদের বাঁধাঘাটে স্নান করে; কখন সে ঐ পশ্চিম পার দিয়া স্কুলে যায়, আবার কখন সে তার ছাত্রদের সঙ্গে খেলিতে যায়! শতকাজ, শতবাধা আমায় ঘরে রাখিতে পারে না। নয়টা বাজিতে না বাজিতে আমি বেড়ার কাছে যাই, আর সে স্কুলে না যাওয়া পর্য্যন্ত সেখানে বসিয়া থাকি—কি জানি উঠিয়া আসিলে যদি সে ইতিমধ্যে চলিয়া যায়! আবার তিনটার পরেই আমি সেখানে যাই—সে স্কুল হইতে ফিরিবে—খেলিতে যাইবে।

ঠাকুরপো, সে যে আমার নিমু। সে আসে না বলিয়া কি আমি তার উপর অভিমান করিতে পারি? তবু—সে যদি রোজ আসিত! তার বোধ হয় মা আছে, তাই সে মায়ের আদর চায় না। যার মা নাই সেই মায়ের আদর চায়!

কিন্তু হায়, আমার নিমু যতদিন ছিল আমি যে তাকে আদর করিতে পারি নাই!

"সে কি আসিবে না ঠাকুরপো?"—

অসাধারণ ব্যাকুলতাপূর্ণ সেই কণ্ঠ। মনে হয় যেন প্রশ্নের উত্তরের উপর জীবন মরণ নির্ভর করিতেছে। এই প্রশ্নের উত্তরে "না" বলিতে পারে এমন কঠিন মন কি কাহারও আছে? আমার চক্ষু আর্দ্র হইয়া আসিয়াছিল, আত্মসম্বরণ করিয়া বলিলাম, "আপনি ভাবিবেন না, আমি তাকে আসিতে বলিয়া দিব।"

একটা আশার জ্যোতি তাঁহার চোখে মুখে খেলিয়া গেল। আনন্দে তিনি কহিলেন "ঠাকুরপো তুমি দীর্ঘজীবী হও। তুমি বলিলে সে নিশ্চয়ই আসিবে।"

বাড়ী ফিরিতে ফিরিতে চিন্তায় আপনাকে হারাইয়া ফেলিতেছিলাম। মনে হইতেছিল "ঠিক্, যার মা নাই সেই মায়ের আদর চায়। হায় আমিও যে শৈশবে মাতৃহীন।"

শ্রীগিরিজাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য।

ময়ূর ভট্টের সূর্য্যশতক।

যদি শতশ্লোকাত্মক কোন ক্ষুদ্র কাব্য লিখিয়া, সংস্কৃত-সাহিত্যে, কেহ সুপ্রসিদ্ধ ও মহাকবি বলিয়া গণ্য হইয়া থাকেন—তিনি 'অমরুশতক' নামক আদি-রসাত্মক কোষ-কাব্যের রচয়িতা অমরু। অমরু-কবি জন্ম দ্বারা কোন্ দেশ বা কোন্ বংশ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন এবং কোন্ সময়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন তৎসম্বন্ধে কোন বিশ্বাসযোগ্য বিবরণ পাওয়া যায় না। তিনি যে নৈষধ-কার শ্রীহর্ষ ও গীতগোবিন্দের রচয়িতা জয়দেব প্রভৃতি কবিগণ হইতে প্রাচীন ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই; কেন না, মম্মট-ভট্ট রচিত সুপ্রসিদ্ধ অলঙ্কার-গ্রন্থ কাব্যপ্রকাশে শ্রীহর্ষ, জয়দেব প্রভৃতি কবিগণের রচিত কোন শ্লোক উদাহৃত হয় নাই,—কিন্তু অমরু-শতকের শ্লোকাবলি উদ্ধৃত হইয়াছে। শ্রীহর্ষ আদিশূর নৃপতির দ্বারা কান্যকুব্জ হইতে সমাহূত পঞ্চগোত্রীয় পঞ্চ ব্রাহ্মণপ্রধানের অন্যতম ছিলেন বলিয়া বঙ্গদেশে কিংবদন্তী আছে; তদনুসারে তাঁহার আবির্ভাবের সময় খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগ বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে; সুতরাং অমরু-কবি যে তদপেক্ষা অনেক প্রাচীন অর্থাৎ খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর পরবর্ত্তী ছিলেন না ইহাই অনুমান হয়। বস্তুতঃ তিনি যখনই জন্ম-গ্রহণ করিয়া থাকুন না

কেন, রস-ভাব সমুজ্জ্বল, প্রসাদগুণযুক্ত আদি-রসাত্মক কবিতা-রচনায় সংস্কৃত-সাহিত্যে তাঁহার কেহ প্রতিদ্বন্দ্বী নাই। স্বর্গীয় পূজ্যপাদ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার রচিত সংস্কৃত কবিগণের বিবরণ পুস্তিকায় লিখিয়াছেন যে, এই শত শ্লোকাত্মক ক্ষুদ্র কাব্যখানা রচনা করিয়া অমরু সংস্কৃত-সাহিত্যে অমর হইয়াছেন। সূর্য্যশতকের কবি ময়ূর ভট্টের সম্বন্ধেও এই কথা বলা যাইতে পারে। সূর্য্য-শতক ব্যতীত ময়ূর কবির অন্য কোন গ্রন্থ বর্ত্তমান নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয় ময়ূর ভট্টের কাব্যের ওজস্বিতা, অনুপ্রাস পারিপাট্য ও কবি-কল্পনার চমৎকারিত্বের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন; সহৃদয় পণ্ডিত মাত্রেই যে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কথার অনুমোদন করিবেন তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু ঐরূপ অসাধারণ গুণসম্পন্ন বলিয়াই সূর্য্যশতক কাব্যটি সাধারণ পাঠকবর্গের তাদৃশ সমাদর আকর্ষণ করিতে পারে নাই। কথাটি আপাত-বিরুদ্ধ বলিয়া প্রতীত হইলেও—নিতান্ত সত্য। কাব্য-রসজ্ঞ ব্যক্তিগণকে প্রায়শঃই আদিরসের পক্ষ-পাতী হইতে দেখা যায় এবং সেরূপ হওয়াও নিতান্ত স্বাভাবিক; কেন না, কাব্যের বর্ণনীয় আর যত বিষয়ই থাকুক না কেন, নায়ক নায়িকার প্রেমের ন্যায় সর্ব্বব্যাপক, সুমধুর ও চিরন্তন বিষয় আর কি আছে? সূর্য্যের রশ্মি, মণ্ডল প্রভৃতির বর্ণনাই সূর্য্য-শতক কাব্যের বর্ণনীয় বিষয়; ইহাতে আদি-রস কেন, আলঙ্কারিক বর্ণিত শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ প্রভৃতি কোন রসেরই অবতারণার সমীচীন অবসর নাই। তবে কি সূর্য্যশতককাব্য রস-শূন্য? রসাত্মক না হইলে সাহিত্য-দর্পণ-কার কোন রচনাকে কাব্য বলিয়া স্বীকার করিতেই সম্মত নহেন; কিন্তু তিনিই আবার বিচার করিয়া বলিয়াছেন যে, অদ্ভুতকে আর একটিরস বলিয়া স্বীকার করা আবশ্যক। সুন্দর ও মহীয়ান্ (Beautiful and sublime) বস্তুর সন্দর্শনে সহৃদয় ব্যক্তির অন্তঃকরণে বিস্ময়াত্মক যে আনন্দের আবির্ভাব হয় তাহাই এই অদ্ভুত রসের প্রাণ। সূর্য্যের ন্যায় সুন্দর ও মহীয়ান্ পদার্থ জগতে আর কি আছে? কিন্তু দূরত্ব হেতু সাধারণ দৃষ্টিতে সূর্য্যের সেই মহত্ত্ব আমরা সর্ব্বদা অনুভব করিতে পারি না; ময়ূর কবি তাঁহার অসাধারণ কল্পনা নেত্রে ভাস্করের অতুলনীয় সৌন্দর্য্য ও মহিমা দৃষ্টি করিয়া, তাঁহার অনন্যসাধারণ অনুপ্রাস—বহুল, ওজঃপূর্ণ, সুদীর্ঘ স্রগ্ধরা ছন্দে সূর্য্য-রশ্মি, সূর্য্যমণ্ডল প্রভৃতির যে অপূর্ব্ব বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার তুলনা-স্থল সুসমৃদ্ধ সংস্কৃত সাহিত্যেও সুদুর্লভ। অনুপ্রাস-বহুল ওজঃপূর্ণ রচনার কাঠিন্য পরিহার করা অনেক স্থলেই অসাধ্য হইয়া পড়ে; সূর্য্যশতক কাব্যেও তাহাই ঘটিয়াছে।

এই কাঠিন্য ও বর্ণনীয় বিষয়ের অসাধারণত্বই সাধারণ পাঠকের নিকট সূর্য্যশতক কাব্যটিকে সুদুর্গম করিয়া রাখিয়াছে; সুতরাং ইহার অনুবাদ দূরে থাকুক মূল গ্রন্থখানাও যে আজ পর্য্যন্ত বঙ্গাক্ষরে এদেশে প্রকাশিত হয় নাই—ইহাতে বিস্মিত হওয়ার কোনও কারণ নাই।* যাহাহউক, "সূর্য্যশতক" কাব্যখানার অপূর্ব্বত্ব ও চমৎকারিত্বে মোহিত হইয়াছি, তজ্জন্যই এ স্থলে সংক্ষেপে উক্ত কাব্যের পরিচয় দেওয়া হইল। অন্যান্য অধিকাংশ সংস্কৃত প্রাচীন কবির ন্যায় ময়ূরভট্টের জীবন বৃত্তান্ত সম্বন্ধেও অধিক জানা যায় নাই। তবে "শার্ঙ্গধর পদ্ধতি নামক সংগ্রহগ্রন্থের একটি শ্লোকের বর্ণনা অনুসারে ময়ূর ভট্ট সুপ্রসিদ্ধ কাদম্বরীরচয়িতা বাণভট্টের সম-সাময়িক এবং তাঁহার ন্যায় নৃপতি শ্রীহর্ষ অর্থাৎ মহারাজ হর্ষবর্দ্ধনের অন্যতম সভাপণ্ডিতছিলেন বলিয়া জানা যায়। প্রচলিত কিংবদন্তীও শার্ঙ্গধর পদ্ধতির উক্তিরই সমর্থন করে। জন-প্রবাদ এই যে, ময়ূর ভট্ট নাকি সম্পর্কে বাণ-ভট্টের শ্বশুর ছিলেন। একদা ময়ূর ভট্টের কন্যা কোন কারণ বশতঃ বাণ ভট্টের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া গৃহকার্য্যাদি পরিত্যাগ করিয়া একান্তে অবস্থান করিলে, বাণভট্ট

---

* "সূর্য্যশতক" স্বর্গীয় জীবানন্দ বিদ্যাসাগরের সঙ্কলিত কাব্য সংগ্রহ" নামক পুস্তকে অন্যান্য ক্ষুদ্র কাব্যের সহিত দেবনাগর অক্ষরে ৩ খণ্ডে মুদ্রিত হইয়াছে। সূর্য্যশতক যুক্ত ২য় খণ্ডের মূল্য ২৲ টাকা।

† অহো প্রভাবো বাগ্দেব্যা যন্মাতঙ্গ দিবাকরঃ।
শ্রীহর্ষস্যাভবৎ সভ্যঃ সমং বাণময়ূরয়োঃ॥

শার্ঙ্গধর পদ্ধতিঃ।

অনেক সাধ্য সাধনা করিয়াও তাঁহার পত্নীর কোপ অপনীত করিতে না পারিয়া অবশেষে তাঁহার চরণ ধারণ করিতে উদ্যত হইলে, তাঁহার পত্নী ক্রোধে কাণ্ডজ্ঞান শূন্যা হইয়া তাঁহাকে চরণ-প্রহার করেন। ময়ূর ভট্ট দৈবাৎ দূর হইতে তাঁহার কন্যার এই বিসদৃশ ব্যবহার দৃষ্টি করিয়া কন্যাকে নিতান্ত ভর্ৎসনা করেন। তাঁহার কন্যা ইহাতে নিতান্ত অপ্রতিভ ও লজ্জিত হইয়া, পিতাকে বলেন, যে "জামাতা ও কন্যার নির্জ্জন ব্যবহার দর্শন করা পিতার পক্ষে নিতান্ত দূষণীয়—তুমি যখন তাহা দেখিয়া নিতান্ত নির্লজ্জের ন্যায় আমাকে আবার তাহা বলিতেছ, এই পাপে তোমার অচিরে কুষ্ঠরোগ হইবে।" ময়ূর ভট্ট নাকি অতঃপর কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত হয়েন। "আরোগ্যং ভাস্করাদিচ্ছেৎ" শাস্ত্রের বিধান আছে, এবং পুরাকালে শ্রীকৃষ্ণতনয় শাম্ব কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত হইয়াও সূর্য্যের উপাসনা ও স্তব দ্বারা রোগ মুক্ত হইয়াছিলেন এরূপ পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে—ইহা জানিয়া ময়ূরভট্ট শত-শ্লোক দ্বারা সূর্য্যের স্তুতি করিয়া অচিরে সেই ভীষণব্যাধি হইতে মুক্তি-লাভ করেন। ময়ূরভট্টের কৃত সেই শত-শ্লোকাত্মক সূর্য্যের স্তবই সংস্কৃত-সাহিত্যে "সূর্য্য-শতক" নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। "সূর্য্য-শতক" গ্রন্থে এই জন-প্রবাদের সমর্থক কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না;—তবে কবি অন্তিম অর্থাৎ ১০১ সংখ্যক শ্লোকে * বলিয়াছেন যে ভক্তি-যুক্ত হইয়া এই গ্রন্থ পাঠ করিলে লোকে সকল প্রকার পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া আরোগ্য-সৎকবিত্ব প্রভৃতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। নিজের কাব্য গ্রন্থখানা গীতা, চণ্ডী প্রভৃতি ধর্ম্ম-গ্রন্থের ন্যায় সর্ব্বত্র সমাদৃত হউক—বোধ হয় এই আকাঙ্ক্ষাতেই কবি প্রচলিত ধর্ম্ম-বিশ্বাস মূলে স্ব-রচিত সূর্য্য-স্তবের ঐরূপ মহিম-কীর্ত্তন করিয়াছেন। সম্ভবতঃ শাম্বের পৌরাণিক আখ্যায়িকার দৃষ্টান্তেই, ময়ূর কবির কুষ্ঠ-রোগ প্রাপ্তির কাহিনী কল্পিত হইয়া থাকিবে। জন-প্রবাদের স্বধর্ম্ম এই যে যাহা সাধারণতঃ সত্য তাহা ব্যক্তি-গত সত্যে পরিণত না করিয়া উহা নিবৃত্ত হয় না। এজন্যই আমরা দেখিতে পাই যে কৃষ্ণ-কর্ণামৃত-প্রণেতা বিল্বমঙ্গল ঠাকুর, শান্তি-শতক-কার শিহ্লন মিশ্র, * কিম্বা সুবিখ্যাত হিন্দী রামায়ণ-রচয়িতা তুলসীদাস প্রভৃতি যে সকল মহাত্মা শান্ত-রস-পূর্ণ কাব্য-গ্রন্থ রচনা করিয়া সুপ্রসিদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহাদের সকলের সম্বন্ধে প্রায় একই রকম গল্প প্রচারিত হইয়াছে; তাহা এই যে, তাঁহারা সকলেই প্রথমে নিতান্ত বিলাসী ও স্ত্রৈণ ছিলেন, পরে প্রণয়িনীগণকর্ত্তৃক স্ত্রৈণতার জন্য ভর্ৎসিত হইয়া তাঁহারা হঠাৎ পরম বৈরাগ্য ভাব অবলম্বন করেন। ময়ূরভট্ট ও বাণভট্টের সমকালীনতা পূর্ব্বোক্ত প্রমাণ ব্যতীত উভয়ের রচনার তুলনা দ্বারাও সুন্দর প্রমাণিত হয়। বাণভট্টের রচিত চণ্ডী-শতক" কাব্যের বিষয় স্বতন্ত্র হইলেও উহার অনুপ্রাস-বাহুল্য, ওজস্বিতা ও অর্থালঙ্কারের মধ্যে উপমা, রূপকাদির অপেক্ষা উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কারের প্রয়োগাধিক্য ঠিক সূর্য্যশতকেরই অনুরূপ। বাণ ভট্টের উৎপ্রেক্ষার প্রাচুর্য্য ও চমৎকারিত্ব কাদম্বরীর পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন; সূর্য্য শতকের উৎপ্রেক্ষাগুলির সংখ্যা ও মনোহারিতাও বড় কম নহে, সুতরাং আমরা নানা কারণেই ময়ূর ভট্টকে বাণভট্টের সমকালীন ও সমধর্ম্মা কবি বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছি। সূর্য্যশতকের কতিপয় শ্লোক ও কাব্য প্রকাশে উদ্ধৃত হইয়াছে। চৈনিক পরিব্রাজক হুয়েনসাংএর লিখিত ভ্রমণ বৃত্তান্তের সাহায্যে মহারাজ হর্ষবর্দ্ধনের রাজ্যকাল খৃষ্ট সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভে স্থিরীকৃত হইয়াছে; সুতরাং ময়ূর ভট্ট খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভেই প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন ইহা একরূপ নিঃসন্দেহে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। উপসংহারে বক্তব্য এই যে, আমাদিগের

* শ্লোকা লোকস্য ভূত্যৈ শতমিতি রচিতা শ্রীময়ূরেণ ভক্ত্যা
যুক্তশ্চৈতান্ পঠেদ্যঃ সকৃদপি পুরুষঃ সর্ব্বপাপৈ বিমুক্তঃ।
আরোগ্যং সৎকবিত্বং মতিমতুল-বলং কীর্ত্তিমায়ুঃ-প্রকর্ষং
বিদ্যামৈশ্বর্য্যমর্থং সুখমপি লভতে সোঽত্রসূর্য্য-প্রসাদাৎ॥
সূর্য্যশতকম্।

† ভক্ত-মাল প্রভৃতি গ্রন্থে বর্ণিত বিল্বমঙ্গলের জীবন বৃত্তান্তে তাঁহার চিন্তামণি বেশ্যা ঘটিত যে কাহিনীটি বর্ণিত হইয়াছে শিহ্লন মিশ্র সম্বন্ধেও অবিকল ঐরূপ কাহিনী প্রচলিত আছে। জীবানন্দ বিদ্যাসাগরের প্রকাশিত "কাব্য সংগ্রহ ২য় খণ্ডে শান্তিশতকের তৃতীয় শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য।

অক্ষম চেষ্টা দ্বারা সহৃদয় পাঠকবর্গ যদি সূর্য্যশতকের মূলের কিঞ্চিমাত্রও সৌন্দর্য্য অনুভব করিতে পারেন তাহা হইলে আমাদিগের শ্রম সফল বোধ করিব।

শ্রীসতীশচন্দ্র রায়।

অকৃষর বিভীষিকা.

(বংগীয় সাহিত্য সম্মিলনের পঞ্চম অধিবেশনে পঠিত.)

আশা বৈতরণী নদীর ন্যায় অপার। তবু বলি, কাল যদি দয়াময় ভারত-সম্রাট আরও একটি 'করোনেশন বুন' দিয়া বাংগালী প্রজাদের বলেন, "তোমরা 'স্বরযুক্ত' বাবু কেজি গুপ্তকে গবর্ণর লইয়া খাঁটি বাংলা ভাষায় যুক্ত-বংগের সমস্ত রাজকার্য পরিচালন কর।" তাহা হইলে বিষম মুসকিল; এক দম সব কাজ বন্ধ।* কারণ ইংরাজ বাহাদুর হইতে অনুনয় বিনয় করিয়া আমাদের বর্ণমালার সংখ্যা কমাইবার লাইসেন না পাইলে বাংলায় টেলিগ্রাফ চালানো দুঃসাধ্য হইবে। আর তারের খবরই যদি না চলে, তবে রেলের গাড়ী ও অচল। কাজেই ডাকঘরের কাজও প্রায় বন্ধ। সুতরাং সভ্যতা রূপ ঘড়ীর কাঁটা পেছনদিকে ফিরাইয়া ঘোড়ার ডাকের প্রবর্তক সের শাহের আমল হইতে পুনরায় আরম্ভ করিতে হয়.

বিন্দু বিসর্গ উপসর্গাদি লইয়া এবং এক 'ব' কে দুইবার গণিয়া আমাদের মৌলিক বর্ণই পঞ্চাশের উপর। তা ছাড়া, মূল হইতে সুদূর শাখা প্রশাখায় অনেকটা কাণ্ডাকাণ্ড-সম্বন্ধ-বিহীন কত বহুরূপী যৌগিক বর্ণ আছে তাহা অনেকেরই ভাবিয়া দেখিবার অবসর নাই। মিশ্রবর্ণের মধ্যে য-র-ল-ব ফলা যুক্ত গুলি আমাদের বিশেষ পরিচিত। এই য-র-ল ব দের একটি সহচর আছে, সেটি হ। য র ল ব হ পরে থাকিলে যে একটা রাসায়নিক কাণ্ড সঙ্ঘটিত হয় তাহা যাঁহাদের মনে ব্যাকরণের সন্ধি-সূত্র জাগ্রত্ আছে তাঁহারা অবশ্যই বুঝিবেন। বস্তুতঃ, অন্তঃস্থ বর্ণ চতুষ্টয়ের ন্যায় 'হ' ও একটি ফলার বর্ণ। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, এই "হ-য-ব র-ল" গোষ্টির আদি ও প্রধান হ ফলাটা ঋষিদের চোখেও ধূলি দিতে সমর্থ হইয়াছে। বর্গের দ্বিতীয় ও চতুর্থ বর্ণ গুলি হ-ফলা যুকত বই আর কিছুই নয়। ক্‌হ=খ, গ্‌হ=ঘ ইত্যাদি। শুনিতেছি, বাংলায় গ্রামোফোনের আশাতিরিকৃত কাট্‌তি দেখিয়া টাইপ-রাইটার প্রচলন প্রয়াসী কোম্পানিগণ হ এর এই ছদ্মবেশ ধরাইয়া দিবার জন্য সাহিত্য পরিষদের বড় কর্তাদের নিকট শীঘ্রই একটা সওলা পরামর্শ উপস্থিত করিবেন। কিন্তু 'হ' দমন করা সহজ ব্যাপার বলিয়া বোধ হয় না। এ পর্য্যন্ত ইহার পদে (ু ৃ উকার, ঋকার) শৃঙ্খল কিছুতেই পরানো যাইতে পারা যায় নাই। দূর হইতে ভয়ে ভয়ে অতি 'সন্তর্পণে' শেকল ফেলিবার চেষ্টা করা হইয়াছে; কিন্তু নিক্‌ষিপ্ত শেকল উহার, হয় মাথায়, না হয় পিঠে ঠেকিয়াছে; পায়ে পঁহুছায় নাই। যথা, হুমায়ুন, হৃষীকেশ। আবার অন্যদিকে দেখুন, দন্ত্য স ও দন্ত্য ন এর দন্তের দংশনে কিংবা পদাঘাতে থরথরি কম্পমান থ বেচারীর যে প্রকার অংগ হানি ঘটিয়াছে তাহাতে এস্থলে থ কে চেনাই দায়; হ ফলা বলিয়া ভ্রম হয়। এটিও হ এর নষ্টামি। সংস্কৃত গ্রন্থে "থ" এর বেশ সুস্থ অবয়ব দৃষ্ট হয়.

সুখের বিষয়, বংগভাষা ও সাহিত্যের অন্যতম নেতা সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয় বাংলা হরপের প্রতি শুভ দৃষ্টিপাত করিয়াছেন। তাঁহার লেখনীর সাহায্যের জন্য কতিপয় টাইপ কাউণ্ডারও মনোযোগের সহিত হস্তসংযোগ করিয়াছেন। যে সব মিশ্র বর্ণের জটিল অবয়ব দুর্বোধ্য অথবা যেগলির বর্তমান রূপ

---

† ক্ষ এই যুক্ত অক্ষরে ষ বিকৃত। বিকারদশাগ্রস্ত হরপের প্রতি সকলের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ জন্য অনন্যোপায় হইয়া ঐরূপ মুদ্রিত হইল। টাইপ কাউণ্ডারগণ "প্রকৃতরূপ উদ্ভাবন করিবেন। ত্‌্র, ঞ্চ, স্থ, হ্ব ইত্যাদির পক্ষেও এই মন্তব্য.

দেবনাগর যুক্ত অক্ষরগুলি পরীক্ষা করিলে পাঠক দেখিবেন তাহাতে একটি আর একটির নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া জীবন্মৃত বা বিকলাঙ্গ হয় নাই। সংস্কৃত বর্ণ বিকৃত নহে, প্রত্যেক বর্ণেরই আত্মসম্মান জ্ঞান আছে। তবে বলিতে বাধ্য, সংস্কৃত 'ক্ষ' টি হৃদয়ঙ্গম করিতে কিঞ্চিৎ কষ্ট হইতেছে.

অসংগত, কারিকরগণ তাহাদের সুখবোধ্য সরল ও সহজ কলেবর দিউন। 'কুদ্দালকে কোদাল বলা'র ন্যায় 'ক্র' কে 'ক্‌্র' লেখাই উচিত.

দেবনাগর বিধান মতে 'ক' এ র-ফলা দিয়া সোজা-সুজি রকমে ক্‌্র গড়াই নিয়ম। সংস্কৃত 'ক্‌্র' (क्र) দেহের একটি অস্পষ্ট ছায়ার ফটোগ্রাফ হইতে বাংলা 'ক্র' এর জন্ম। ইহাতে সবই আছে, কেবল ক এবং র নাই.

এখনকার উন্নতির দিনে টাইপের সংখ্যা কমাইলে নানাদিকে শ্রীবৃদ্‌ধি নিশ্চিত। যাঁহারা প্রেসের খবর রাখেন তাঁহারা জানেন বাংলা ছাপার কাজে কত ঝঞ্ঝাট। কম্‌পোজিটারকে অর্‌ধ সহস্রাধিক খোপ হাতড়াইয়া ব্যতিব্যস্ত থাকিতে হয়। পরন্তু দুই লাইনের ভিতর বেশী করিয়া লেড না দিলে ি ী ঁ গুলি আস্ত রাখা দায়। সংযুক্‌ত হরপের ষ্টক্‌ও বেশী রাখা অনেকের দুঃসাধ্য। আমাদের নামের মধ্যে মহেন্দ্র, উপেন্দ্র, নরেন্দ্র চন্দ্রের এত বাড়াবাড়ি যে যখন সপ্তাহিক খবরের কাগজ-ওয়ালারা এণ্টেনেস্ (মাতৃকুলাশন ?) পরীক্‌ষার পাশের তালিকা ছাপেন তখন ইন্দ্র চন্দ্র উধাও হইয়া নিরাকার হইতে বাধ্য হন। পাঠকদের মধ্যে হয়তো অনেকেই জানেন না যে আকার ও একারের যুগল বেশ। যথা, া া এবং ে ে। এক সাজ্‌ ঘরের ভিতর, আর এক পোষাক ঘরের বাহিরে। মাত্‌্রা বা কার্ণিশ যুক্‌ত গুলি শব্দের ভিতরে, এবং মাত্‌্রাবিহীন ে শব্দের প্রথমে ও া অন্তে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আমার মনে হয় হরপ কমাইবার চেষ্টায় প্রথমে মাত্‌্রাবিহীন ে া কে এই দণ্ডেই জবাব দেওয়া উচিত.

খণ্ড ত (ৎ) আমাদের অনর্থক নূতন সর্জ্জন। দেব-নাগরে নাই। ইহাকেও এখনি বিসর্জ্জন দেওয়া যাইতে পারে। ৎ "পুসির গায়" ছিল, উহা পুসির গায়েই থাক্‌। কেবল এক ত এর জন্য বিশেষভাবে হসন্ত বন্দোবস্ত কেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের হস্তলিপিতে ৎ এর ব্যবহার নাই। তিনি স্বহস্তে লিখিতেন ত্‌। তাঁহার অনুস্বার ও সংস্কৃতানুযায়ী ং এইরূপ। অনুস্বারের অকারান্ত উচ্চারণ নাই, সুতরাং হসন্ত চিহ্ন দিয়া ং গঠন 'হসুকরণ' হইয়াছে। চন্দ্রবিন্দু ঁ উঠাইয়া দিলে হরপ অনেক কমিতে পারে। 'চাঁদ' না ছাপিয়া 'চংাদ' ছাপিলে দেখিতে দেখিতে চোখে সহিয়া যাইবে। হরফ কমাইতে হইলে আর্ক ফলা টাকেও মাথা হইতে কংাধে নামান উচিত.

দেবনাগর য ফলা অতি প্রকট। বাংলায় তাহার পেছন দিকটার ছায়া। বিদ্যা অবিদ্যা, ন্যায় অন্যায়, দৃশ্য অদৃশ্য, সহ্য অসহ্য প্রভৃতি মুদ্রিত শব্দে য ফলার খাম-খেয়ালি উল্লেখ যোগ্য। কেহ ছাপেন "উদ্যোগ" আবার কেহ কেহ উচ্চারণের প্রতি নজর রাখিয়া ছাপেন "উদ্‌্যোগ।" যখন দেখি 'অল্প' তখন তাহার পার্শ্বেই দেখি 'গল্প'। যখন দেখি ষ এবং ট শিষ্টভাবে একাসনে উপবিষ্ট, আবার তখনই দেখিতে পাই ষ ও ট পরস্পর বিষম জড়াজড়ি করিয়া 'বৃষ্টি'তে 'কষ্ট' পাইতেছে। ঐ প্রকার পর্ব্ব ও পূর্ব্ব। হায়, ছাপাখানার ভূত এত দিনে হরপ ঢালাই কারখানাতেও প্রবেশ লাভ করিল.

সমশ্রেণী হরপগুলির মধ্যে একীভাব নাই। এক উকারেরই কতরূপ দেখুন। গু, শু, হু, দু, সু, মু, রু, রূ। ইহাদের স্বপক্‌ষে কোন যুক্‌তি আছে বলিয়া বোধ হয় না। দুঃখের বিষয়, শিশু শিক্‌ষার শিশুকে কু ও খু এর পরিচয় দিয়া তত্‌দণ্ডেই বিনা introduction এ "শু" এর সংগে আন্তরিকতা বিহীন আলাপ করিতে দেওয়া হয়। অতঃপর গুপ্তকে গুপু পড়িলে কিংবা পশুকে পশ্‌ত পাঠ করিলে, কেবল অষ্টাবক্‌্র "গুরু" মহাশয় ব্যতীত আরকেহই বোধ হয় অপোগণ্ডের গণ্ডে চপেটা-ঘাত অনুমোদন করিবেন না। বস্তু, কিন্তু, কদ্রু, দ্রুত, অশ্রু শ্মশ্রু প্রভৃতির ভ্রুকুটি বা ভ্রূভংগি অসহনীয়। বস্তু লিখিতে হানি কি ? যথাস্থানে উকার দিয়া ত্রু টি, লিখিতে যদি অপরাধ হয়, তবে দীর্ঘ-উকার যুক্‌ত 'অক্রূর'এ সে অপরাধ হয় না কেন ? সংস্কৃত উকার চিহ্‌ন অনেকটা মাত্‌্রাহীন ত এর মত। জীবন্ত ভাষায় আসিয়া আলস্য ভংগের চেষ্টায় উহা বাংলাতে অনেকটা ঋজুভাব ধারণ করিয়াছে। পুনরায় উহার কুকুর লেজত্ব বা বক্‌ভাব ভাল নয়।

শ্রীহট্টের ভট্টাচার্য্য 'মক্কা' 'দিল্লির লাড্ডু' 'ভগবচ্চরণ দত্ত' প্রভৃতি বাক্যে হরেক রকমারি ডবল হরপ লক্ষ্য করিবার বিষয়। একীভাবের অভাব। কেহ কেহ বলিতে পারেন, কিছু পূর্ব্বে ইংরাজীতেও ডবল s (ss) এর বিসদৃশ অবয়ব ছিল। তাহা ছিল একটি বর্জ্জিত বিধির মত। তবে দ্রুত কম্পোজিশনের জন্য fi, ffi, fl, ffl, কএকটি মিশ্র গঠন এখনও চলিত আছে। আমাদের মধ্যেও 'করিয়াছে, গিয়াছে' ইত্যাদির "য়াছে" ও 'করিবেন' যাইবেন প্রভৃতির "বেন" এবং দ্রুত শব্দ গ্রন্থনের সহায়তা কল্পে অন্যান্য মিশ্র গঠন যাহা আবশ্যক হয় (যথা শ্রী) তাহা টাইপ ফাউণ্ডারগণ এক বডিতে ঢালাই করিতে পারেন। তাহাতে আপত্তি নাই। যাহাই গড়ুন সহজ অবয়ব দিতে হইবে, কিম্ভূত-কিমাকার বিভীষণ গড়িবেন না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ; কোথায় রহিল ক, কোথায় ষ, উহাদের একটিরও সত্তা নাই, অথচ দেখি দশ-মুণ্ড কুড়ি-হাত বিশিষ্ট ক্ষ। ক আর ষ যুগপত্ উচ্চারণের প্রথা নাই, তবু জোর-জবরদস্তি করিয়া আমদানি করিতেছি, সেক্ষপীয়র, মোক্ষমূলর। কিন্তু পালোয়ান খোদাবক্সের কাছে এই জোর-জবরদস্তি খাটে না.

ক আর ষ কে আস্ত ভক্ষণ করিয়া ক্ষ রাক্ষস বসিবার চেয়ার ম-ফলাখানিকেও গ্রাস করিতে উদ্যত! এই জন্যই লছমনকে সংগে লইয়া লছমী বংগদেশ হইতে বাল্মীকির দেশে চলিয়া গিয়াছেন.

এখানেই বলিয়া রাখি যে বাংগলায় অনেক স্থলে উচ্চ বর্ণের চাপে পড়িয়া নীচ বর্ণের মাথা তুলিয়া কথা কহিবার শক্তি নাই। এই দেখুন, দন্ত্য স ও দ এর চাপে পড়িয়া বেচারী 'ম' কেমন লা-চার ও লা-জওয়াব (silent)! যথা ভস্ম, পদ্ম ইত্যাদি। Elevation of the depressed classes যদি করিতে হয়, তবে 'ভস্মে' পতিত মুচীদের আদি বর্ণ 'ম' হইতে সুরু করিয়া 'ভস্‌ম' ছাপাই উচিত। হিন্দু (-পীঠ) স্থানে ঐ রকম উচ্চারণ। আসামেও 'পদ্ম'কে পদুম ফুল বলে। সেই প্রকার বোধ হয় 'সদ্‌ব্যবহার' লেখাই ভাল। নতুবা 'সদ্ব্যবহারের' প্রতি ছেলেরা শিশুকাল হইতেই 'বিদ্বেষের' ভাব পোষণ করিতে পারে। সেইরূপ 'উদ্‌যোগ', উদ্যোগ নহে.

হ আর ম, দুইয়ে মিলে হ্ম। স্বয়ং ব্রহ্মা ও ব্রাহ্মণের উপাদান। সুতরাং প্রণব ওঁ এর ন্যায় 'হ্ম' তেও বোধ হয় একটা গুপ্ত বীজমন্ত্র নিহিত আছে। নতুবা শুধু 'হ' আর 'ম' তে অমন নয়নাভিরাম মনোগ্রাম তৈয়ারি হয় না। এই জন্যই বোধ হয় "আহ্‌মদ" নামের প্রচলিত বানানে বীজমন্ত্র দিতে নাই ; কেবল হ আর ম দিয়াই কাজ সারিতে হয়.

জ এর বাঁ দিকটা এবং ঞ এর ডান দিকটা লইয়া জ্ঞ। "জ্ঞানাত্ (বা গানাত্) পরতরং নহি।" অর্থাৎ এই নশ্বর সংসারে জ্ঞান বা গান (গীতবাদ্য) হইতে বড় কিছুই নয়। এই 'গেয়ান' আজকাল ভূ-ভারতের অনেকেই বিলাতের অরগ্যান কিনিয়া শিখিতেছেন। দুঃখের বিষয়, বিজ্ঞ সাহেবেরা জ্ঞ এর মর্ম্ম ঠিক বুঝিলেননা। তাই সম্প্রতি সরকার বাহাদুর সরাসরি ভাবে আদেশ জারী করিয়া দিয়াছেন যে যাহাদের নাম জ্ঞান বা জ্ঞানেন্দ্র তথৈবচ আর কিছু, তাহাদিগকে অতঃপর Jnan, বা Jnanendra না লিখিয়া বিনা ওজরে Gyan অভ্যাস করিতে হইবে। (Vide সিবিল লিষ্ট).

ঙ এর আর সে দিন নাই। সরস্বতী-তীরে বেদগানের দিন চলিয়া গিয়াছে। লয়-ভীতলঙ, লৃঙ্ লকার-গুলি তর্কালঙ্কারের টোলে আশ্রয় লইয়াছে। ঙ এখন জরাগ্রস্ত, সুতরাং অকেজো। স্ববর্গের গায়ে ভর না দিয়া ইনি মোটেই দাঁড়াইতে পারেন না। গ ইঁহার প্রধান ভৃত্য। গ এর সঙ্গ না পাইলে একদণ্ডও চলে না। অথচ ইনি গ এর অঙ্গে চাপিলে গ বেচারীর সশরীরেই গঙ্গালাভ। তখন অনুবীক্ষণের সাহায্যেও গ কে দেখিতে পাওয়া যায় না ; আর ঙ কেও দেখিতে পাওয়া কঠিন। উভয়েরই তখন জীবাত্মা উড়িয়া যায়, থাকে কেবল স্থূল দেহ। তাও কি যেমন তেমন স্থূলদেহ ? টিকি-কাটা দীর্ঘ ঊর ন্যায় বিরাট-বপু! কোথায় ঙ আর গ, আর কোথায় ঊ! 'শৃঙ্খলা', 'লঙ্ঘন' যদি সহ্য হয়, তবে গা-ঘেসা

'ঙ্গ' কেও অনায়াসে বরদাস্ত করা যাইতে পারে। দেবনাগরে ঙ এর অধীন গ কায়-ক্লেশে আত্মাকে সতত রক্ষা করিয়া আসিয়াছে; অঙ্গ ভঙ্গ হয় নাই.

ঞ ঙ এর ছোট ভাই। তত স্থবির হয় নাই। কএক বৎসর পূর্ব্বে ইনি হিন্দুদের 'গোসাঞি' ঘর হইতে সুদূর মুসলমানদের 'মিঞা' বাড়ী পর্য্যন্ত একাকী পদব্রজে যাতায়াত করিতেন, বাহন বা বাহক আবশ্যক হইত না। ঞ এখন চঞ্চলার অঞ্চল গ্রহণ করিয়া চ কে বঞ্চনা করিতেছেন। ইহাঁর আওতায় পড়িয়া চ কে চর্ম্ম-চক্ষে চেনা ভার। 'সান্ত্রা'য় যদি মান না যায়, 'ঝঞ্ঝাবাতের' 'ঝঞ্ঝাট' যদি সহিতে পারি, তবে স্পষ্টাস্পষ্টি ঞ এর তলায় চ কে মাথা হেট করিয়া চরণ ধূলি লওয়াইতে লজ্জা কি? প্রাচীন মুদ্রিত পুস্তকেও শেষ কথিত রূপ হরপ দেখিতে পাওয়া যায়। দেবনাগরেও তাই। (ঞ্চ).

ঞ বোধ হয় তাঁহার পিঠের পরম-ধন মাঝে মাঝে ণ এর হেপাজতে রাখিয়া দেন। তাই আমাদের 'কৃষ্ণ', 'বিষ্ণু' দর্শন লাভ। সুখের বিষয়, দেবনাগর শ্রীকৃষ্ণে ণ এর এই 'নিপট কপট' ভাব নাই; প্রকট ভাবেই বিরাজমান, যথা ষ্ণ.

সাহেবেরা তিন চারি জন রাস্তায় একত্র ভ্রমণে বাহির হইলে সকলে সমভাবে পাশাপাশি এক কাতারে যাইয়া থাকেন। আর এদেশীয়গণ একজনের পাছে অন্য জন, তত্পশ্চাতে আর এক জন ইত্যাদি ক্রমে গমন করেন। এই যাত্রা-পদ্ধতির নাম Indian file. বর্ণ যোজনায়ও এই জাতীয়ত্বের ছাপ দেদীপ্যমান। আমাদের দেশে সাম্যভাব কম, উচ্চ-নীচ ভেদাভেদ বেশী। ইংরাজীতে, এক বর্ণের পর দক্ষিণে আর একটি, তার পর দক্ষিণে আর একটি এইরূপে বর্ণ যোগ হয়। ইংরাজিতে বর্ণস্য দক্ষিণা গতি, বাংলায় অধোগতি। যথা; সান্ত্বনা, ঊর্দ্ধ, স্ক্রু (screw) ইত্যাদি। চীনদেশে এই অধঃস্রোত ভয়ানক বেগময়। ভগবান চীনকে রক্ষা করুন। পারস্যে বামা গতি। বামা গতির ফলও ভাল বোধ হইতেছে না.

আমাদের হরপের গা-ঘেসা ইয়ারী বা সাম্যভাবও আছে। যথা, আহ্লাদ, আহ্বান, ধ্বনি, লঙ্ঘন, উড্ডীন, খড়্গ, মুদ্গর, উদ্ঘাটন, ইত্যাদি। এগুলি বেশ সুখদর্শন। 'উচ্চ নীচ' জাতীয়দের মধ্যে প্রফুল্ল, বিম্ব, যত্ন, ঝঞ্ঝা, উদ্ভিদ, এগুলিও সুখ-বোধ্য। ইহাদের চেহারা অবিকৃত বলিয়া শিশুরা অনায়াসে বানান বলিতে পারে। এস্থলে দেশী বিদেশী প্রথম শিক্ষার্থী-দের মিছামিছি সময় অপব্যয়ের সম্ভাবনা নাই। কিন্তু "ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, গুপ্ত, কায়স্থ, দত্ত, মিত্র" জাতীয়দের বানান শিক্ষা বড়ই বিভীষিকাময়। স্বর-বর্ণের উপর রেফ টানা যাইতে পারে, তাহা নৈর্ঋত শব্দ দেখিয়া জানিয়াছি। কিন্তু স্বরবর্ণের "ও" এবং "এ" র উপর মাত্রা টানিয়া 'দত্ত, মিত্র' বানান হয় তাহা শিশুদের মুখে শুনিতে বাকি ছিল। হায়, সেই মানসে অনুদিত বাসনাটি গত—তারিখে পূর্ণ হইয়াছে। এই জন্যই এই অতি সামান্য প্রবন্ধটি লেখা। গুরু গম্ভীর সাহিত্যিকেরা তুচ্ছ ভাবিয়া ক্র ক্ত ত্র ক্ষ গুলার প্রতি আর উদাসীন থাকিবেন না। 'অট্টালিকা' বিরোধী অথচ 'গড্ডলিকা' প্রেমিক হরপের কর্ত্তাগণ আর কতকাল প্রবাহে গা ঢালিবেন?

শ্রীপরমেশপ্রসন্ন রায়.

গ্রন্থপ্রাপ্তি ও সমালোচনা।

"আমিত্বের প্রসার"—রায় যদুনাথ মজুমদার বাহাদুর প্রণীত—পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয় লিখিত ভূমিকা। দ্বিতীয় ভাগ মূল্য ৸৹ আনা মাত্র।

গ্রন্থখানি সাহিত্য জগতে প্রসিদ্ধ "হিন্দু পত্রিকার" সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত রায় যদুনাথ মজুমদার বাহাদুর মহাশয় প্রণয়ণ করিয়াছেন। মাননীয় জজ শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে এই গ্রন্থ উৎসর্গ করা হইয়াছে। যদু বাবুর "আমিত্বের প্রসারের প্রথম খণ্ড সকল সাহিত্য-সেবী ও সংবাদ পত্র একবাক্যে প্রশংসা করিয়াছিলেন। সুতরাং আমরা দ্বিতীয় খণ্ড আগ্রহের সহিত পাঠ করিয়াছি। কিরূপে অদ্বৈতাত্মভাব জাতীয় জীবনে ওতপ্রোত ভাবে মিশিয়া সমগ্র মানবজাতিকে একটী বিরাট মানবে পরিণত করিতে পারে, তাহা যদি কেহ সরল ও প্রাণস্পর্শিণী ভাষার সাহায্যে বুঝিতে চান, তবে তিনি যেন এই সারবান্ পুস্তক পাঠ করেন। বস্তুতঃ বেদান্ত শাস্ত্রের অনেক সারতত্ব এই গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে।

শ্রেয় ও প্রেয়, দেবাসুর সংগ্রাম, বৈরাগ্য মেবাভয়ম্, কুকুরের স্বর্গারোহণ, কোকিলের অভিশাপ, নিশীথ-স্বপ্ন-সংবাদ, মধুবিদ্যা, প্রজাপতির আদেশ, মায়া, বৈরাগ্য ও আত্মজ্ঞান আনন্দ ও ঈশ্বরের স্বরূপ কি? এই কয় পরিচ্ছেদে বিভক্ত। গ্রন্থকার সত্যই বলিয়াছেন "অধুনা পাশ্চাত্য জগতে সামাজিক সাম্যনীতি লইয়া অনেক আন্দোলন চলিতেছে, এবং অপব্যবহার-ফলে অনেক স্থলে 'নিহিলিষ্ট', 'সোসিয়ালিষ্ট' প্রভৃতির সৃষ্টি—পুষ্টি হওয়ায়, পাশ্চত্য সমাজে অনুদিন অশান্তি উৎপন্ন হইতেছে, কিন্তু, ভারতবর্ষে প্রাচীনকালে সর্ব্বশাস্ত্রকার সিদ্ধান্ত সম্ভূত আমিত্বের বিনাশ বা তাহার বিশ্ববিস্তার তত্বের শিক্ষায় সাত্বিক দান ধর্ম্মের সাধনায় আর্য্যসমাজ শান্তি ক্রোড়ে সুষুপ্তছিল। সেই শিক্ষাসাধনার ধ্বংশাবশেষ এখনও ভারতকে রক্ষা করিতেছে।"

পূজনীয় গ্রন্থকারের সহিত আমাদের ২।১ স্থলে মতভেদ থাকিলেও গ্রন্থকারের প্রতিপাদ্য বিষয় "আমিত্বের প্রসার" পড়িয়া আমরা অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি এবং সকল শিক্ষিত ব্যক্তিকেই ইহা পাঠ করিতে বলিতেছি।

হিন্দুজীবন—স্মৃতি, সাঙ্খ্য, মীমাংসা তীর্থোপাধিধারী পণ্ডিত কেদারনাথ ভারতী প্রণীত। মূল্য ১৲ টাকা। যশোহর গ্রন্থকারের নিকট প্রাপ্তব্য।

লেখকের উপাধি দেখিয়াই মনে হয় যে, গ্রন্থকার "গোড়া হিন্দু।" কিন্তু পুস্তকখানি পাঠ করিলে সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, গ্রন্থকার যদিও হিন্দুর সর্ব্বশাস্ত্রে অভিজ্ঞ তত্রাপি তাঁহার গোড়ামির অভাব। গ্রন্থকার স্বীয় প্রতিপাদ্য বিষয় প্রমাণ করিতে যেমন শাস্ত্রের দোহাই দিয়াছেন, তেম্নি ইউরোপীয় বিজ্ঞানের প্রমাণ উল্লেখ করিয়া উভয় মতের সমন্বয় করিয়াছেন। আবশ্যকমত তিনি ডাক্তারী শাস্ত্র হইতেও প্রমাণ প্রয়োগে ক্রটী করেন নাই। গ্রন্থখানি মূলতঃ তিন অংশে বিভক্ত—শিক্ষাজীবন, কর্ম্মজীবন ও ত্যাগজীবন। তৎপর এই তিন অংশকে অনেকগুলি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করিয়া হিন্দুর দৈনন্দিন কর্ত্তব্যের সমালোচনা করিয়াছেন। কঃপন্থা, প্রকৃতশিক্ষা, প্রাচীন ভারতে শিক্ষা, স্ত্রীশিক্ষা, কর্ম্মজীবন, আত্মা, জন্মান্তর বাদ, ধর্ম্মজীবন, প্রেম ও শান্তি প্রভৃতি পরিচ্ছেদে তিনি অনেকগুলি জ্ঞান গর্ভ কথা বলিয়াছেন। গ্রন্থের ছাপা, কাগজ ভাল।

তীর্থযাত্রা—উপন্যাস, শ্রীকেদারেশ্বর সেন বি, এল প্রণীত। মূল্য ১৷৹, কলিকাতা গুরুদাস বাবুর দোকানে প্রাপ্তব্য।

আজকাল অসার উপন্যাসে বাঙ্গালা সাহিত্যের জঞ্জাল বৃদ্ধি হইতেছে; সুখের বিষয় এ পুস্তক খানি সে শ্রেণীর নহে। এই গ্রন্থের সর্ব্বপ্রধান বিশেষত্ব এই যে, উপন্যাসের আখ্যান ভাগে বিকৃত প্রেমের গন্ধও নাই সুতরাং অসঙ্কোচে পুত্রকন্যাদিগের সম্মুখে পাঠ করা যায়। চরিত্র চিত্রণে গ্রন্থকারের কৃতিত্ব বিশেষ প্রশংসনীয়। রাণী পদ্মমণি আদর্শ সতী। পুস্তকখানির বিস্তৃত সমালোচনা করিবার স্থান আমাদের নাই। সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে এই গ্রন্থ ও গ্রন্থকার বঙ্গসাহিত্যে উচ্চ স্থান লাভের যোগ্য।

DACCA REVIEW" Office,
5, Nyabazar, Dacca.

In placing the first number of the "DACCA REVIEW" before you, I beg leave to express the earnest hope that you will be pleased to encourage our enterprise—the first of its kind in Eastern Bengal and Assam—by becoming a subscriber.

Our aims and aspirations are foreshadowed in the "foreword" to which I invite a reference.

I shall be very grateful also if you will kindly occasionally contribute to our pages. It is requested that all articles intended for publication may be sent to Professor S. N. Bhadra, Nyabazar, Dacca.

All business communications should be addressed to the undersigned.

ABONIMOHON SEN,
Asst. Manager.

NB.—I take this opportunity of expressing our sincere gratitude to the numerous gentlemen of light and leading who have encouraged us in this venture, either by the assurance of their warm and sympathetic support or by offering to contribute to this Magazine. Among others, we may mention the names of:—

The Hon'ble Mr. H. LeMesurier, C.S.I., C.I.E., I.C.S.
" Mr. R. Nathan B.A., C.I.E., I.C.S.
" Mr. H. Sharp M.A.
" Mr. N. D Beatson Bell C.I.E., I.C.S.
" Nowab Sir K. Salimullah Bahadur, K.C.S.I.
" Mr W. J. Reid I.C.S.
" Mr. N. L. Hallward M.A.
" Col. R. N. Campbell C.I.E., I.M.S.
" Mr. L. J. Kershaw I.C.S.
R. B. Hughes Buller Esq. C.I.E., I.C.S.
Major W. M. Kennedy I.A.
K. C. De Esq., B.A., I.C.S.
H. M. Cowan Esq, I.C.S.
W. L. Scott Esq., I.C.S.
J. R. Blackwood Esq., I.C.S.
Dr. J. C. Bose C.I.E.
W. A. J. Archbold Esq., M.A., L.L.B.
Dr. P. K. Roy D.Sc.
Professor J. R. Barrow B.A.
" R. B. Ramsbotham B.A.
" T. T. Williams B.A., B.Sc.
" B. N. Das, M.A., B.Sc.
Principal Evan E. Biss M.A.
" Kumudini Kanta Bannerji M.A.
" Lalit Mohon Chatterji M.A.
The Maharaja Bahadur of Shushung.
Raja Monmotho Nath Rai Chaudhury of Santosh.
The Hon'ble SyedNawab Ali Chowdhuri Khan Bahadur.
Babu Ramendra Sundar Trivedi M.A.
" Akshoy Kumar Moitra.
" Hirendra Nath Dutt M.A., B.L.
" Jaladhar Sen
Rai Bahadur Sarat Chandra Das C.I.E.
Babu Chandra Sekhar Kar Deputy Magistrate, Nadia.
" Jatindra Mohan Sinha Deputy Magistrate, Jungipore.
Khan Bahadur Syed Aulad Hossein.
Mahamahopadhaya Dr. Satis Chandra Vidyabhushan M.A., Principal, Sanskrit College.
" Rajendra Chandra Sastri, M.A.,
" Pramatha Nath Tarkabhushan.
" Prasanna Chandra Vidyaratna.
Babu Pramotha Nath Rai Chaudhuri of Santosh.
" Charu Chandra Choudhuri, Sherpur, Mymensingh.
" Ananda Chandra Roy
" Rakhal Das Banerje, Calcutta Museum.
" Panchanon Nyogi M.A., P.R.S.
" Hemendra Prosad Ghose.
" Radha Kumud Mukurji, M.A., P.R.S.

View of Kanchanjanga

(By kind permission of Babu Prabhat Chandra Dobe

ASUTOSH PRESS, DACCA.

FOREWORD.

It is the custom of the trembling aspirants for public favour who are about to embark on some new literary venture to explain to their constituents the high moral motives which actuate them and the benefits which they propose to confer upon a society which has been unconsciously awaiting their guidance. They say, for instance, that politics must be drawn out of the mire of party faction and party strife and exhibited in the light of pure reason which they alone are able to shed upon it. Or again the social world is out of joint and they are the skilled surgeons who can set it aright and remodel it in a form of symmetrical beauty to which it has never previously aspired. We fear we can make no such high promises. We are no giant knights prepared to ride hither and thither to put the world aright, and we can hazard the guess that the star of Eastern Bengal and Assam is fully capable of rising high in its predestined orbit without any kind assistance on our part. We trust that this unusual modesty will not prejudice our readers against us and that they may even be inclined to agree that modesty in journalism is possibly a more desirable and even (for we must not let our eye wander too far from the main chance) a more paying attribute than is ordinarily conceived to be the case.

With this preliminary apology we may lay bare our breast and admit that we have no very definite aims before us except to give to the many residents of this province who have ideas which they are willing and even anxious to impart to one another a convenient opportunity and an agreeable medium for this social and genial purpose. Our sole claim is to be the servants of the intellectual public of Eastern Bengal and Assam and beyond, and in this humble capacity we may surely call upon those whom we wish to serve to take free advantage of our profferred service. No class of educated persons should hesitate either to contribute to our pages or to purchase them. The busy Collector should be ready to tell us things interest-

ing and curious which occur in his charge. The Judge will doubtless reveal to us the result of his searchings at the bottom of the well. The planter and the lonely Political officer might beguile the weary hours by recounting for the benefit of our readers thrilling adventures by "flood and field," or their interesting experiences of the semi-savage tribes amongwhom they live. The archaeologist and the historian we will welcome with open arms. There is much that the landholder, the lawyer, the professor, the doctor, the engineer, the merchant and even the student can tell us that we find it difficult to pick out from this ample store points on which we can lay a preliminary stress.

Our table of contents will thus be marked by a broad catholicity and all will be grist that comes to our mill. We shall take as our model that great legendary conversation which took place on the too abundant sands of a smiling ocean, and as at that glorious festivity which had so tragic an ending, we will without let or favour allow our topics to range over the wide interval which extends over all conceivable subjects between cabbages and kings, at the same time promising our friends that after they have contributed to the intellectual feast we shall not treat them like the oysters and devour them with harsh criticism. We hope to impart a subtle and pleasant literary flavour to our production, but scientific, engineering, scholastic, mercantile and whatever other subject you may wish, will be received with our kindliest favour. Our objects are not political but should a contributor deal in an interesting fashion with some political topic of deep and general interest, we shall not push our timidity to the point of being pusillanimous.

Having now explained our comparatively humble motives, the nature of the public whom we hope to serve and by whom we hope to be supported and the wide hospitality we are prepared to extend to the literary wanderer, it now only remains for us to make our bow and in placing the "DACCA REVIEW" before the public, earnestly to beg for its suffrage and its favour.

THE DACCA REVIEW.

VOL. I. APRIL, 1911. No. 1.

The future of Universities in India.

WITH regard to higher education, though it may not at first sight seem so, India possesses a comparatively clean slate. We have had much earnest and successful effort but it cannot be said that we have a system sanctioned by the veneration of centuries, the expression of a nation's thought and aspiration, the result of many and well tried experiments. The Universities Act recognised that such was the case and wisely left ample freedom for the future, reminding us that we must be guided by a progressive revelation. At present the people of India are gazing westwards for illumination, and we, trembling at times before such a responsibility, are trying to supply what is wanted. We ought it is true never to forget the India that lies behind but our mandate is to create a system whose counterpart is to be found in Europe and America. Whether if the last hundred years had to be lived again we should do exactly as we have done is not to the point, nor can I see any advantage to be gained by prowling in the decades sacred to Macaulay. Let the dead bury their dead. We are here and now. If mistakes have been made we are still able to correct them. We are in the early days of University life and institutions can be moulded. We must 'examine ourselves and see if there be any wicked way in us', in other words we must ask what is our view of the nature and functions of an Indian University.

If we consider the ideas which are implied by the word university we are first met by a certain universality or catholicity. The notion that students are drawn not necessarily from one place but from many; we might almost say from any. The old name given to a university, studium generale, implied this. Cambridge was never the University for the county still less for the town of Cambridge. Oxford and Paris drew adherents from many lands, and though for convenience's sake most Universities are named after the town in which they are situated it has never been admitted or desired that this should in any way limit their sphere of influence. This characteristic is very important in India. To a certain extent it supplies the place of foreign travel. Many Indian students come from remote villages and the presence in their College of some who may come

from other parts of India teaches valuable lessons, for the future as well as for the present. The circumstances of life will prevent an abuse of the privilege, but it should always be possible for students from the Punjab, and Madras to be found in the Colleges of Bengal.

The idea that a University should teach, as well as examine is fundamental. It was somewhat obscured, it is true, by the strength of the College system at Oxford and Cambridge; and the success of the old London University and the constitution of the new University of Wales gave colour to a different view. But the western movement is generally towards the medieval idea. One needs only to mention the important changes of the last forty years at Oxford and Cambridge, all in the direction of increasing the part taken in actual instruction by the University. The same aim is kept in view in India though it is more difficult of realisation owing to the geographical situation of the Colleges. But the regulations of Calcutta foreshadow what is to come and we have all seen something of a beginning made. If the University is to be a real living force stimulating to higher effort it must lead the advanced teaching and shew the way. Otherwise one of two things must happen. Either there will be no higher teaching; or the University will be left behind by the most brilliant of its children the Colleges, and they in turn but for the accident that they do not examine for degrees will become the real centres of illumination, the true Universities. No one will contend that a University should undertake elementary work; that would be a mistake and a usurpation. If one may be allowed to prophesy I think that the way in which the intentions of those who drew up the Universities Act will be carried out in this respect will be somewhat as follows.

Advanced classes and seminar work will be carried on in the university town itself and the professors of the university will be resident and accessible, ready that is to say to give informal instruction and direction. For the Colleges in the country it is difficult to see any better solution than the sending out of University Lecturers from time to time who in the course of a residence of say three months in a year could do something to supply the necessary oversight. The problem is not a simple one. We wish to encourage higher studies in all possible Colleges not only for the sake of those who directly benefit but also for the sake of each College as a whole, students and staff. At the same time we do not wish to confine the benefits of the University to those who live in its immediate neighbourhood.

All this theorising involves the notion, a basic one, that the B.A. curriculum should be reasonably complete and sufficient in itself; so much so as to make it a passport to government service or to other business or profession. The student ought to decide whether he will attempt higher things and become something of a specialist, not merely a decently well educated young man. If he does so decide he must be assumed to be able to read for himself, to make with a certain but not very large amount of guidance independent use of authorities. He is getting to the stage at which working for an Examination ceases to be of advantage, and possibly whatever Examination there is to be for M.A. might come at the end of the first year and be followed by essays or theses taken together with a record of study. In a word the standards and the nature of iustruc-

tion are entirely different from those in use in the undergraduate life.

The doctorate again is on an entirely different plane. The doctor ought to be one who goes still further and who makes some direct addition to or better arrangement of some branch of knowledge.

What then is the relation of the University to this highest work? We certainly look to the University for the teaching of our teachers. We also no less certainly look to it for the advancement of learning. The Education of the average man, the most important work of all perhaps, it must necessarily leave to the various Colleges, trying to see that they do their business properly. But it is to the University that we look for the creation of a learned society. Without the influence of one mind on another and the stimulus which such intercourse affords there can be no real life. On the other hand it is to the University that we look for the encouragement of research. If the work done is ever to rise above the routine level there must be a body of men who, whether they happen to be teachers or not, are and remain for ever students; working, some of them at all events, on the very edge of their subject, and looking occasionally into the unknown. This is constantly forgotten. Money will not make a University. Buildings will not make it. It is essentially a society of learned men and unless we secure their presence it is vain to expect any real love of learning, the love of learning for its own sake, to be created in those who belong to it.

The wind bloweth whither it listeth and ways of research are past finding out. No endowment will make a man of genius. All we can say is that the University and some of the Colleges ought to have funds at their disposal to help those in whom originality is clearly discerned. Now as it will only be the largest Colleges that can help in this direction the burden will and ought to rest mainly on the shoulders of the University. The Universities Act clearly contemplate that a larger share in the intellectual life of the country shall be taken by the Universities than is the case now. There will be professorships, lecturerships, and followships in days to come and the brilliant student will not work with his eye ever fixed on some attractive sidewalk.

It is sometimes said that a University should express a creed. Whilst he would be a rash man who would say that such a University is not a perfectly possible institution, one can only record that the experience of the West seems in favour of the freedom of religious belief. It is satisfactory therefore to see that the proposals for a Moslem University, so far as they have appeared, contemplate the admission of men of all faiths. Any other conception is bound to be tinged with a certain narrowness, and and in India where it is of the first importance that men of various creeds should learn to respect each others beliefs it might be unfortunate. One surely of the great lessons of life which the years spent in a University ought to teach is that of toleration, and toleration is not always learned where all possess the same opinions. The danger obviously in the present day is that toleration should become a fine name for indifference. But no one has ever questioned the value of a religious basis for College and hostel life. All that the Universities Act tries to secure is that there may be possibility of life for all denominations within the fold of each University.

We have still left the important question of the relation between the University and its Colleges. Is it to be that which subsisted between Father O'Flyn and his flock? Or are the great Colleges to gradually grow till they become important enough to claim to be Universities themselves. I do not think that the Act contemplated either of these positions. The key to the situation is expressed in the simple statement that it is the Union of the Colleges that constitutes the University. From this it follows, as the act endeavoured to secure, that the government should be representative. This is all important if we are to keep the conception of the University with all its educative force, clearly before us. On any other theory the University becomes possibly merely an office, possibly an absolute monarchy, possibly an oligarchy. We are perhaps too much in the habit of regarding the University as representing studies and too little in the habit of regarding it as a collection of Colleges. It is possible at present for a College to be affiliated and yet to have no direct representative on either the Senate or the Syndicate. The freedom of nomination allowed in the Act will no doubt in due time change this but I can not help thinking that under the general words of the Act it might be possible to assign certain duties, as to a kind of standing Committee, to the Principals of Colleges In this way the Syndicate might be relieved of much detailed work and the influence of the University over the Colleges deepened and strengthened. It cannot be doubted that a large power of consultation exists and is intended to exist, and the Principals of the Colleges form a natural corporation which could easily be summoned for the purpose say twice a year. I speak as a man; and as the Principal of a College. The natural tendency is for the University to mean a great deal to those who live in the capital of the Presidency, and very little more than an Examining and Inspecting body to those who live in the Country. The balance can never be entirely adjusted, but we ought to try to get the most we can from our system. We must enlarge the influence of the University on the one hand and deepen the sense of membership on the other.

Why it may be asked has not some attention been devoted to the important aspect of the University as a benevolent court of appeal—the fountain of mercy to the sick and sorry, the *deus ex machina* for the hard case whose woe expresses itself to two places of decimals, so pathetic, so accurate. Well I answer that the subject is unpleasing to me. When I vote in favour of these unfortunate gentlemen and bow myself in the house of Rimmon, I seem to remember some words of Doctor Pusey on the value of 'strictness'; and then there is a time worn proverb about hard cases, and I wonder whether it would not be a more valuable moral lesson, things being as they are, to stick to the rules that we have instead of spending so much time over no doubt entirely *bona fide* exceptions. Moreover the Indian student as I have met him seems to me, I may of course be mistaken, to deserve better treatment at our hands.

W. A. J. Archbold.

SOCIAL AND ECONOMIC CONDITION OF INDIA IN THE 4TH CENTURY, B.C.

Mrs. Rhys Davids in an article ten years ago in "The Economic Journal", wrote that "till within the last quarter of a century, the

Economic Historian when coping with the subject of Early civilization in the East was no better off than the Early Israelite, who was ordered to make bricks and was given no "straw." Circumstances have changed since then, owing to the researches of a multitude of European scholars and some straw has been given to the workers by the timely publication of the Sacred books of the East : More straw is being added year by year and now a days scarcely a year passes when more and more materials are not brought before us throwing floods of light on the so-called pre-historic days of India. In fact, we have made a bit of solid progress aud though to quote the words of the talented lady with whose name we have commenced this paper "to attempt a complete economic survey or special monograph from these materials is not feasible," but still it is possible to present in a succinct form some traits and characteristics relating to early Indian social and economic condition.

A book has recently been brought to light. The little known but very valuable *Artha-shastra* or the science of Politics written by Chanakya the Brahmin minister of Chandra Gupta, Maurya, once the paramount power in Northern India. It will not be possible for me to deal with the details of this book in this paper. An English translation of this book is being published in "the Indian Antiquary" and a Bengali translation, the first volume of which will be shortly ready for the press by the writer of this article, has also been serially published through the columns of a Bengali Journal. We shall endeavour to-day to place before our readers a short account of the social and economic condition of India in the fourth century B.C. when the Magadan Empire was being consolidated by Chandra Gupta.

We take up first *The king*. Kingship was known to India and the Indians from very earliest times and though at the time there were various petty kings at the extremeties of Chandra Gupta's kingdom, and in the south, Chandra Gupta, as we have said before, was then the paramount power in Northern India. The king as our author describes him, was to be an ideal personage 'He shall restrain the organs of sense, acquire wisdom by keeping company with the aged, see through his spies ; establish safety and security by being ever active ; maintain his subjects in the observance of their respective duties by exercising authority, keep up his personal discipline by receiving lessons in the sciences ; and endear himself to the people by bringing them in contact with wealth and doing good to them." His duties judging from this standpoint as well as the consideration of other things were evidently very difficult. He was to avoid lustfulness even in dream and likewise falsehood, haughtiness and evil proclivities.

His duties were really multifarious. He was himself to receive revenue in gold, to appoint the Superintendents, to receive secret emissaries and send out spies to supervise military operations and check receipts and expenditures. The King is enjoined personally to look to the petitions of complaints and to make himself accessible to his people. In all things he should look to the welfare of his dear subjects, for in the happiness of his subjects lies his happiness and in their welfare his welfare."

The King's Palace should be situated on the best site and it should be properly guarded with parapets and ditches. There should be secret passages and various arrangements are to be made so that the King may be always safe from fire and poison. The Guards are

to be, inside the harem, female ones. Women with personal cleanliness fresh from the bath and becomingly dressed should attend the Harem. There were also to be women armed with bows. Only those whose fathers and grandfathers had been serving the Royal family loyally were to guard him and foreigners should be rigorously excluded.

There were *Councils and ministers* of the King. The King was to have a well formed council the deliberations of which were to be secret, so secret that even birds were not to see or hear them. The council was to consist of only three or four members but in extraordinary cases it should consist of as many members as the needs of his dominions required. Besides this council, there were also ministers and in matters of emergency the King was not only to summon his ministers but the assembly or council as well and the opinion of the majority would prevail in such cases.

The qualifications of the councillors of the King were to be the following. " Native, born of high family, influential, well trained in arts, possessed of fore-sight, wise, of strong memory, bold, eloquent, skilful, intelligent, possessed of enthusiasm, dignity and endurance, pure in character, affable, firm in loyal devotion, endowed with excellent conduct, strength, health and bravery, free from procrastination and ficklemindedness, affectionate and free from such qualities as excite hatred and enmity." The ministers shall be born of high family and possessed of wisdom, purity of purpose, bravery and loyal feelings. These ministers and councillors were to be severely tested before appointment and with ascertained purity the king shall employ in corresponding works these ministers whose characters has been tested under the three pursuits of life, religion and wealth, by love and underfear.

As regards the *other officers* of the King we get the *amatyas* who were in fact next to the ministers and councillors. The following were also the officers of the King: Chamberlain, Collector, General Accountants, Superintendents of Gold and Superintendents of Armoury, Tolls, Weaving, Agriculture, Liquor, Prostitutes, Slaughter-house, Boats, Cows, Horses, Elephants, Chariots, Infantry, Seals and Passports, pasture lands, Revenue Collectors, City Superintendents (or our Lord Mayor) Commander-in-Chief (with whom the King was to consider every day various plans of military operation) Envoys, and last but not least, the spies.

In fact *the institution of Spies* forms an important and a powerful factor. Chanakya and Chandragupta we may note here, had risen from humble position and as we see in Mudra Rakshas both of them had to suffer much at the hands of plotters. No wonder then that specific and definite instructions should have been laid down regarding these spies. The Spies were divided into eight classes. These were: Spies in the guise of fraudulent disciples, recluse spies, householder spies, merchant spies, spies in the garb of ascetics practising austerities, apprentice spies, fire brand spies, prisoner spies and women spies. The king was to honour the spies with awards of money and titles. It appears from Chanakya that some of them were even good linguists for we find that spies " possessed of many languages and parts shall be sent by the king ", to espy the movements of the King's ministers, priests, commanders of the army, the door-keepers, in fact of all, high or low and not excluding even the heir-apparent.

In speaking of the King's officers, we omitted one important factor and that is the *priests*, which I should say was and is the most important factor in Hindu daily life. The qualifications of a priest in those days were as follows: "Him whose family and character is highly spoken of, who is well educated in the Vedas and the six angas, is skilful in reading portents providential or accidential, is well-versed in the science of Government and who can prevent calamities providential or human by performing such expiatory rites as are prescribed in the Atharbaveda; the King shall employ him as High priest." It is evident from the mode of employment that the priestship was not hereditary, neither was it confined to one family as it is now in India.

We then turn to the *Prince*. Even before his birth *i. e.*, as soon as the queen is big with child, the King is to observe the instructions of mid-wives and after delivery there was to be purifications. The King was to be carefully trained after attaining the necessary age. In all cases the Prince was to be carefully guarded by spies who were to watch his movements. Chanakya advocates that in the case when the King had an only son who was either averse to worldly pleasures or was a favourite child the King might keep him in chains. The King, however, was enjoined to be favourabiy disposed towards his son and the son was also to follow his father except in the following cases *viz.*, when it endangered the son's life, when it enraged the people or caused any other serious calamities. The King was in no case to instal a wicked son on the royal throne.

As is well-known, India had despatched many an Embassy to foreign courts. Transmission of missions, maintainence of treaties, issue of ultimatum, gaining friends, intrigue sowing dissension among friends, carrying away by stealth relatives and Gems, gathering information about the movement of spies, and winning over the favour of Government officers of a foreign state—these were the duties of an envoy. The envoy was to have a suitable allowance. He was bound to be a very clever and competent man, for whatever information he could gather by all possible means, such as through spies or by observing the talk of beggars, intoxicated and innocent persons, he was to test carefully by intrigues.

It appears from Chanakya's Arthashastra that even in those days there was a system of *census*. Not only the houses, but the total number of the inhabitants of all the four castes in each village was counted, and an account of the exact number of cultivators, cowherds, merchants, artisans, labourers and slaves was kept. The Collector-General in whose hands was entrusted this important task of census, had also to keep an account of the number of the young and old men that resided in each house, their history, occupation, income and expenditure. This was highly creditable and an Anglo-Indian writer rightly observes that "even the Anglo-Indian administration with its complex organisation and European notions of the value of statistical information did not attempt the collection of vital statistics until very recent times and has always experienced great difficulty in securing reasonable accuracy in figures."

We have devoted a great portion of our space in dealing with the king and kingly affairs. But we must always remember that (even in modern times) kings must occupy the most prominent position. We now turn to the *various occupations* of the people and

we find the following mentioned, *viz* physicians, carpenters, borers, horse-tamers Elephant-tamers, blacksmiths (who were all to live in the same locality), pickle sellers, rope-makers, snake-catchers, weavers, barbers, washermen, scavengers, musicians, buffoons, hunters, vintners, sellers of cooked flesh, butchers, female cooks and female servants. Let us speak a word or two about some of these.

Physicians undertaking medical treatment without intimating to the Government (hence we see Government interference in this case and in fact in all important matters) the dangerous nature of the disease shall, if the patient dies, be fined. There was of course, as we have now a Royal physician whose duty was to attend on the king every day. References have also been found to *Veterinary surgeons and midwives.*

Besides weaving ordinary cloths of cotton, *weavers* had also to weave broad cloths (Dripatavanam) linen and silk cloths (khauma kanseyanam), fibrous and woolen cloths and garments, blankets and curtains. They had to carefully guard against loss in weight, loss in length and substitution of other kinds of yarn, for which they were liable to fine. One sort of garment (Bhingisi) is mentioned as rainproof. This swas produced in Nepal .Blankets it may be mentioned, were made of the wool of wild animals.

Washermen, an important element in society were enjoined to wash clothes either on wooden planks or on stones of smooth surface. For selling, mortgaging, or letting out on hire the clothes of others a fine was imposed while in cases of substitution they were not only to pay a fine equal to twice the value of the clothes but also to restore the true ones— a serious penalty indeed! Judging from the regulations we are led to think that in times gone by our forefathers had a decided superiority over us, for in those days not only were the charges very moderate but the time within which the washermen had to return the clothes was also very limited. We find that "for keeping more than a night, clothes which are to be made as white as a Jessamine flower or which are to attain the natural colour of their threads on washing on the surface of stones or which are to be made whiter merely by removing their dirt by washing, proportional fines shall be imposed." Some clothes were to be given their colouring, some as white as flowers, or as beautiful and shiny as lac, saffron or blood. I am led to think from this the duties of the washerman and the dyer were combined in one person.

We then turn to the topic of *Art Manufacture* and *Commerce.* We find the following as worthy of special mention. Mining:— The King was enjoined to carry on mining operations which were conducted under the supervision of an officer known as the Superintendent of mines. "Possessed of the knowledge of the science, dealing with copper and other minerals, experienced in the arts of distillation and condensation of mercury and of testing gems, aided by experts in Mineralogy and equipped with mining labourers and necessary instruments the Superintendent was to examine mines." Of the ores we find reference to gold, bitumen, silver, copper, lead, tin and iron. Reference is also made to precious stones. There was another officer known as the Superintendent of Ocean-mines whose duty was to collect conch-shells, diamonds, precious stones, pearls, corals and salt.

From the regulations laid down by Chanakya we can safely come to the con-

clusion that *commerce* was in an advanced stage—The regulations were so specific and definite. An attempt was made to give an impetus to foreign commerce for we find that the Superintendent of commerce was to show favours to those who imported foreign merchandise. Mariners and merchants importing foreign merchandise were to be favoured with remission of trade taxes. Foreigners importing mercandise were exempted from being sued for debts. There was navigation not only on Oceans and mouths of rivers but also on lakes.

We have already mentioned the subject of *Weaving* in connection with the occupation of the people and we have also noticed that there was an officer of the king known as the "Superintendent of weaving," who had to employ qualified persons to manufacture threads, coats (Varma), cloths and ropes. There is one thing we particularly notice: there was no such thing as the weaving-caste. We find that widows, cripple women, girls, mendicant or ascetic women, women compelled to work in default of paying fines, mothers of prostitutes, old women servants of the king and prostitutes who had ceased to attend temples or service, were to be employed to cut wood fibre, cotton, hemp and flax. In fact we are led to suppose that caste system had not as yet taken a firm hold during the Maurya period.

Regarding the important question of *Agriculture* we find that the King's superientendent was to keep in stock all kinds of grains, flowers, fruits, vegetables, bulbous roots, fibre-producing plants and cotton. India has always been an agricultural country and it is no wonder that we find in this valuable book not only instruction to the people but we find in it a reference to what was undoubtedly an attempt to gauge the quantity of rainfall and regulate the sowing of seeds according to the amount of rainfall. This was something which likethe census, which we can be veritably proud of. Incidentally in taking leave of the question of arts and manufacture we may mention that there are references to guilds and corporations and co-operative concerns in this book.

Of the three Elements of Production—*Land, Labour and Capital* we find that the King was the sole and undisputed possessor of land. Lands however were donated to many of the King's servants as well as to those who performed sacrifices and to spiritual guides, priests and the learned in the Vedas. As it appears the King's share was large for the King was to bestow on cultivators only such favour and remission as would tend to swell the treasury and to avoid such as would deplete it. At the same time he was to protect agriculture from the molestation of oppressive fines, free labour and taxes.

Of the second element *i.e.* labour we find the following kinds mentioned—free labourers, hired labourers, ordinary labourers, slaves, prisoners and servants. Slaves were of many kinds. Ordinary slaves included persons who had voluntarily enslaved themselves, and sons of born slaves. An *Arya* could tide over family troubles by mortgaging himself out he was soon to be redeemed by his kinsmen for "Never shall an Arya be subjected to slavery." We may add here that evidently the slave was permitted to have private property, to inherit the property of his father. He was entitled to enjoy not only whatever he earned without prejudice to his master's work but his condition was not subjected to carry the dead or to sweep ordure, urine or the leavings of food. He was to be

properly clothed, he was not to be abused and the chastity of a female slave was not to be violated.

We do not find mention of any capitalist other than the King and we are therefore led to presume that he was the only capitalist under whose auspices all undertakings were carried on.

In my next paper, I shall endeavour to speak on law and legal matters, crime and criminals, arms and armour and some other interesting subjects.

JOGINDRANATH SAMADDAR,
B.A., F.R.E.S., F.R. Hist. S.

GAUDA AND KAMARUPA.

KAMARUPA is defined in the Kalika Purana as the country that lies to the east of the river Karatoya and extends as far as (the shrine of) Dikkaravasini, being three hundred *yojanas* in length, hundred *yojanas* in breadth, triangular in shape, dark in aspect, studded with numerous hills and watered by a hundred streams;"* and Gauda proper is ancient Pundra and modern Varendri or Varendra.† Ancient Kamarupa is, therefore, represented in modern maps by the Assam Valley division and the Jalpaiguri and Rangpur Districts of the Rajshahi division and Gauda by the other districts of the Rajshahi division. As the creation of the new province of Eastern Bengal and Assam has placed these provinces together with parts of ancient Vanga or Samatala (Dacca Division) under a single administration, it may not be unprofitable to look back and see what were their relations in the past.

As the Karatoya, which formed the boundary between Kamarupa and Gauda, played an important part in determining the relations between these two ancient kingdoms, the history of this river demands our attention first. We obtain a glimpse of the Karatoya in the work of the Chinese pilgrim Yuan Chwang who visited Kamarupa about 643 A.D. Yuan Chwang writes that from Pun-na-fa-tan-no (Pundravardhana, the chief city of Pundra or Gauda) he travelled "east above 900 li, crossed a large river, and came to Ka-mo-lu-po (Kamarupa)." This "large river" is no doubt *the Karatoya* as it then was. Watters adds in his commentary* of the pilgrim's accounts that in the *Tang-shu*, an old Chinese Chronicle, Kamarupa is described "as lying 600 li to the south-east of Pundravardhana with the river Ka-lo-tu between that country and Kumarupa. Six hundred years after Yuan Chwang, in A.D. 1243, Minhaj, author of Tabakat-i-Nasiri, came to Gauda country then known as the imperial province of Lakhnawati, and remained there for about two years. In his account of Mahammad-i-Bukhhtyar's ill-fated expedition to Tibet (1205 A.D.), in course of which he marched along the western bank of the Karatoya for ten days till he reached the mountains, Minhaj writes of it, "a river flows in front of that place, of vast magnitude, the name of which is Begmati; and, when it enters the country of Hindustan, they style it, in the Hindi dialect, Samund (ocean); and in magnitude, breadth and depth, it is three

* Kalika purana, Bombay, 1907, Chapter 53, 77-79.

† For the synonyms of Gauda see the sanskrit exicon Trikandasesha.

* Watters, "on Yuan Chwang," Vol. II., P. 186.

times more than the river Gang." * The present condition of the Kāratoya, a rivulet fordable throughout the dry seasons, dates from 1787. Up to that time the main stream of the Tista flowed south down the bed of the Karatoya. But in the destructive floods of 1787, the Tista swelled by incessant rains, suddenly forsook its channel and ultimately found its way to the Brahmaputra.†

The earliest authentic glimpse of Kamarupa is obtained from the Allahabad Asoka Pillar inscription of Samudra Gupta (about A.D. 325-375) where Kamarupa finds mention in the list of frontier states that acknowledged the suzerainty of and paid tribute to that Emperor. The dated history of Kamarupa, however begins from 606 A.D., in which year Rajyavurdhana king of Sthanisvara (Thanesar) was murdered by Sasanka, king of Gauda, whose capital, Karnasuvarna, is represented by Rangamati (twelve miles south of Murshidabad) and Harshavardhana, the younger brother of Rajyavardhana succeeded him. Soon after that tragedy Rajyasri, the widowed sister of Harsha, had escaped from Kanauj and was wandering in the Vindhyas. Harsha was on his way to the Vindhya range in search of his sister and camping on the river Sarasvati when an envoy from Kamarupa reached his camp. According to Bana, the contemporary author of ‡ *Harshacharita*, the envoy thus narrated the history of the ruling house of Kamarupa to Harsha :—

"In former times, Your Majesty, the holy earth, having through union with the Boar [incarnation of Vishnu] became pregnant, gave birth in hell to a son called Naraka... It was he who won this umbella, the external heart of Varuna. In the posterity of this hero, when many great Meru-like kings, such as Bhagadatta, Pushpadatta, and Vajradatta passed away, there was born a Maharajadhiraja named Susthiravarman a splendid hero, famous in the world as Mriganka : great grandson of Maharaja Bhutivarman, grandson of Chandramukhavarman, and son of Sthitivarman, who wore the unshaken majesty of Kailasa...To this auspiciously named king was born by his queen Syamadevi a son and heir Bhaskaradyuti otherwise named Bhaskaravarman, as Bhishma was born to Santanu by Bhagirathi.

Another contemporary, the Chinese pilgrim Yuan Chwang, also tells the same tale in a different language : "The reigning king, who was a Brahman by caste, and a descendant of Narayanadeva, was named Bhaskaravarman, his other name being Kumara ; the sovereignty had been transmitted in the family for 1000 generations." Bana refers to a period when Bhaskaravarman's father king Susthiravarman was still living and Bhaskara varman was acting as the regent, while Yuen Chwang speaks of a later period when he had succeeded his father but was still known as Kumara-Raja (prince-regent) in popular parlance. Bana names five generations of the king of Kamrupa and carries the history back to the beginning of the sixth century A.D. Yuan Chwang's reference to 1000 generations indicates that the dynasty had been ruling in Kamarupa from time immemorial. Naraka the mythical founder of the dynasty, is called a *danava* (demon) in Ramayana (4. 42. 30-31) and *asura* (demon) in the Mahabharata, Harivamsa, and the

* Raverty *Tabakat-i-Nasiri*, P. 561 ; Blochmann's contributions to the History and Geography of Bengal III in the *Journal of the Asiatic Society of Bengal*, 1875 Part I.

† *Eastern Bengal and Assam Gazetteer*, Calcutta, 1909, Ph 174-175.

‡ *Harsha-carita*, translated by Cowell and Them as, Chap VII pp 216-218.

Puranas. The Varman kings of Kamarupa who did not scruple to trace their descent from a mythical demon, may have been of non-Aryan Mongoloid origin, Aryanised by Brahman immigrants. Brahman influence was so strong among the Mongolid inhabitants of ancient Kamarupa that it had succeeded in preventing the Buddhist Sramana from obtaining a foot-hold there. Yuan Chwang writes of the people and their religion : "The men are of small stature, and their complexion a dark yellow. Their language differs a little from that of mid-India. Their nature is very impetuous and wild; their memories are retentive, and they are earnest in study. They adore and sacrifice to the Devas, and have no faith in Buddha." Bana writes of the religion of Bhaskaravarman, "New from childhood upwards it was this prince's firm resolution never to do homage to any being except the lotus feet of Siva." Yuan Chwang's statement that the king of Kamarupa was a Brahman by caste does not seem to be correct, for 'varman', the hereditary title of the king indicates that he was a Kshatriya.

The Brahmans of Kamarupa were immigrants from Gauda and Samatata (Vanga), for, if we are to believe the sacred books of the Brahmans, free migrations of men of higher castes from any part of the upper Gangetic valley to Magadha, Anga (south & south-eastern Bihar), Pundra and Vanga, to say nothing of Kamarupa that lay beyond, was unknown. Vaudhayana enjoins in his Dharma Sutra that he who has visited the countries of the Pundras, Vangas and other nations living outside the holy Madhyadesa should perform certain expiatory ceremonies. Devala (quoted in Mitakshara on Yajnavalkya Smriti 3. 292) enjoins that he who has visited the countries of the Angas, Vangas &c, should go through the ceremony of initiation afresh. Another familiar text gives this rule in a modified form, exempting from expiatory initiation those who go to these countries for visiting the places of pilgrimage. In Harivamsa (194, 29-33) it is predicted of the degenerate men of the iron (Kali) age that pressed by hunger and fear they would cross the Kausiki (Kusi) river and take shelter in the lands of Angas and Vangas. Even if these injunctions did not actually prevent emigration they at least reflect the public opinion of an age when free migration to outer countries was not the fashion. Brahmans of ancient Pundra and Vanga were probably mostly of indigenous origin or "made" Brahman, for the traditions that trace the origin of the great bulk of the Brahmans of Bengal, viz. Radhi, Varendra, and Vaidika Brahmans from a few immigrants from Kanauj who settled in Bengal thirty to forty generations (eight to ten centuries) before, indicate as much.

To return to Bhaskaravarman of Kamarupa, the reason that led him to send an envoy to Harsha just after his accession amidst such tragic circumstances was evidently to form an alliance against the common enemy, Sasanka, the mighty and ambitious king of Gauda, though Bama does not say so explicitey. Though this alliance proved effective as a weapon of defence, yet Harsha failed to avenge his brother's death or curb the Gaudians as long as Sasanka lived, for a set of copper plates *found in the Ganjam District of the Madras Presidceny and dated in the Gupta era 300 (619 A.D.) bears witness to the fact that Sasank's supre-

* Epigraphia Indica, vol. VI. P. 144.

macy extended as far south as Kalinga even up to that time when Harsha had been in power for twelve years, and Yuan Chawing's statement that Sasanka died of sores on his body brought on by his attempted destruction of the image of Buddha in a Vihara near the Bodhi tree at Bodh-Gaya indicates that he retained possession of Magadha till his death.

After the death of Sasanka his dominions fell an easy prey to Harsha, and Bhaskaravarman had to acknowledge the suzerainty of his powerful ally. Harsha died in 648 A.D. and it is not likely that king Bhaskaravarman survived him long. Not long after Bhaskaravarman's death the old dynasty was overthrown by Satastambha, called "a great chief of the Mlechhas" in the Bargaon grant of Ratnapala. * We seem to recognise a scion of this first dynasty of Kamarupa in Harshadeva," "of the family of king Bhagadatta," and "the ruler of Gauda, Udra, Kalinga, Kosala and other countries," whose daughter Rajyamati was married to king Jayadeva Paracakrakama of Nepal according to a Katamunda inscription of the Harsha year 153 (A.D. 758).† Omission of Kamarupa from the list of countries ruled over by Harshadeva indicated that it was not included within his dominions; and it may also be surmised that driven out of Kamarupa by Satastambha his ancestors were living in Gauda where, taking advantage of the confusion that followed the death of the king of Gauda who died fighting against Yasovarman king of Kanauj,‡ Harshadeva carved out a kingdom for himself.

The subsequent history of the Kamarupi

* Journal A. S. B., 1898, Part I, P. 114.

† *Indian Antiquary*, Vol. IX., P. 178.

‡ *Gandavaho* of Vakpati (Bombay Sanskrit Series, no. 34)

dynasty of Gauda is unknown. It was probably over-thrown by Vatsaraja, the Pratihara Gurjara king of Rajputana, who, according to Rashtrakuta inscriptions,* "with ease appropriated the fortune of the royalty of Gauda" The second dynasty of Kamarupa founded by Satastambha was in power up to the end of the eighth century A.D.

It was overthrown by Pralamba, who traced his descent from Narak,† about 800 A.D., for the Tezpur rock inscription of his son and successor Har aravarman is dated Gupta year 510(A.D.829). Harjara was succeeded by his son Vanamalaverman who in turn was succeeded by Jayamala Virabahu.‡ During the reign of Virabahu, Kamarupa was invaded by Prince Jayapala, on behalf of king Devapala, the third Pala king of Bengal and Bihar, who began to reign from about A.D. 865. Of this expedition we are told in the Bhagalpur plate of Narayanapala.§ "When by order of his (Jayapala's) brother (Devapal,) he started with an army in order to subdue all quarters, the lord of the Utkalas left his capital, driven to despair from afar by mere name; and the king of the Pragjyotishas enjoyed peace at last, surrounded by friends, bearing on his lofty head (i. e. being much obliged for) the command of that (*Prince*), which bade (*his foes*) cease to plan battles." Virabahu's successor Valavarman is the last Prince of the dynasty of whom we have any record and who may be regarded as reigning up to the end of the first quarter of the tenth century A. D. The subsequent

* *Epigraphia Indica*, Vol. VI. Pp. 239--251.

† Journal A. S. B, 1840, P. 766.

‡ Hœmbe, and following him Gait, regard Virabahu as the son of Jayamala. The error is pointed out by Kielhorn in Gottinger Nachrichten, 1905 P. 470.

§ Indian antiquary, vol. XV, 308.

history of the third dynasty is obscure. The direct line probably came to an end towards the close of the tenth century with Tyaga-Simha, who, according to the Bargam grant of Ratnapala, "departed to heaven without (*leaving*) any issue (*nirvamsam*)." on this "his subjects, thinking it well that a Bhauma (*i. e. one of Naraka's race*) should be appointed as their lord, chose Brahmapala, from among his (*Tyaga Simha's*) kindred, to be their king on account of his fitness to undertake the government of the country." Brahmapala was succeeded by his son Ratnapala in whose reign Kamarupa was again invaded by the army of Gauda without success, for we are told in his land grants that the rampart of his capital town was fit "to give fever to the untameable elephants of the chief of Gauda." Ratnapala was succeeded by his grandson Indrapala.

The fourth (*Pala*) dynasty of Kamarupa was probably overthrown by Ramapala, king of Gauda. In the reign of his successor Tigmyadeva, the governor of Kamarupa revolted. We read in the Kamauli plates of Vaidyadeva of Kamarupa :—

"He (*Vaidyadeva*) chief among the virtuous, sternly keeping in mind the kingdom in all its parts, was minister, dearer even than life, to king Kumarapala the Lord of Gauda ......The aforesaid renowned Vaidyadeva was appointed ruler by the Lord of Gauda in the room of Tigmyadeva, who had been treated with honour in the east, and of whose disaffection the Lord of Gauda had heard. This victorious Vaidyadeva having placed upon his head, garland-wise, the command of his glorious master, marched speedily in a few days, and having defeated that king (*viz Tigmyadeva*) by the energy of his own arm, became king and appeared like the valiant Indra himself (*verses* 12—14) "*

Mr. Venis, the editor and translator of the Kamauli plates, while working out the dates of the grant observes :—"Now, the years 1077, 1096, 1115 and 1123 may at once be rejected as altogether too early for Kumarapala, by whom Vaidyadeva was made King." Then to reconcile his view of the chronology of the later Pala Kings of Bengal with that of the Sena Kings, the first of whom, Vijayasena, held possession of Varendra, Mr. Venis thus proposes to reconstruct the history of the period :—

"Briefly, this is what I suppose the drift of events to have been. At first, *i. e.*, roughly from 1060-1130 A. D. the Palas were driven westward by the Senas. Then the Senas began to lose ground rapidly and were driven back by the Palas into a small corner of Bengal, where they were finally demolished by the Muhammadans at the beginning of the 13th Century A. D. Thus the conquest of Janakabhumi (Mithila) by Ramapala, recounted in verse 4 of the Vaidyadeva grant, may have been an historical fact, marking the return of power to the Pala line. And thus, too, the Pala culmination under Kumarapala about 1142 A. D., would synchronise with the Sena decadence under Kesavasena or his successor."

Here the writer touches upon some very knotty problems of chronology that still await solution. But the Sarnath inscription of Kumaradevi, † Queen and King Govinda Chandra of Kanauj, enables us to determine that Ramapala and his successor Kumarapala proceded Vijayasena, the founder of the Sena dynasty. From this inscription we

* Epigraphia Indica, Vol. II, Pp. 364—365.

† Epigraphia Indica, Vol. IX, Pp. 319—328.

learn that Mahana the maternal grand-father of Queen Kumaradevi, was a contemporary of Rampala, for in verse 9 of this record it is said of him that he was the governor of Anga (*angapa*) in Gauda (Kingdom) and restored the royal fortune of Ramapala in war. Calculating backward from Kumaradevi wife of king Govinda Chandra of Kanauj whose dates range from 1114 to 1154 A. D, we may say that Mahana and Ramapala were contemporaries of Chandradeva, grand-father of Govindachandra and the first Gahadavala king of Kanauj of whose reign only one date, A.D. 1097, is known. The reign of Ramapala, therefore, can not be assigned to an age later than the last quarter of eleventh century, the epoch in which Vijayasena's rise is, with good reasons assigned. Ballalasena, son of Vijayasena, writes in his introduction to Danasagara, that Vijayasena flourished in Varendra and the should be recognised as the king of Gauda" whom Vijayasena, "made to run away," and Vaidyadeva the king of Kamarupa" whom Vijayasena defeated according to the Devpara stone inscription (verse 20).* The title of Maharajadhiraja *Paramesvara Paramabhattaraka* assumed by Vaidyadeva in the Kamauli grant indicates that it was executed after Vaidyadeva had been released from the vassalage of the Pala king of only record of his reign, the Devparastone inscription, has also been found in Varendra (within thana Gadagari, Rajshahi District). Now it is hardly credible that Vijayasena could have established an independent kingdom in Varendra in the life-time of Ramapala or of his successor Kumarpala whose minister, Vaidyadeva, conquered Kamarupa. Kumarapala, therfore, must be placed before Vijaya Sena, and his brother Madanapala Gauda with the occupation Varendra by Vijayasena. The Kamauli grant should therefore be assigned to 1096 A.D., and the fourth year mentioned in the concluding fortin of the grant may be considered as dating from the assumption of independence by Vaidyadeva.

Vaidyadeva ruled over the whole of the Kamarupa country then officially known as the kingdom of Pragjyotisha. The two villages donated by his grant are described as lying in the Kamarupa *Mandala* in the Pragjyotisha *bhukti*. In the seal of their inscriptions the Pala kings, Ratnapala and Indrapala, call themselves "the lord of Pragjyotisha" and in the seal of the grant of Balavarma he is described as belonging to "the race of the kings of Pragjyotisha."

There is a gap however, of about half a century in the annals of Kamarupa after Vaidyadeva's grant till we obtain glimpses of another dynasty in a copper-plate grant dated Saka-samvat 1107 (A.D.1184—85).* The dynasty was founded by Bhaskara of "the lunar race" (*chandravamsa*), evidently an immigrant from the west, for had his ancestors been natives of Kamarupa Bhaskara would have claimed descent from Naraka and not from the moon. Bhaskara's ancestor probably followed Vaidyadeva to Kamarupa and Bhaskara seized the sceptre of Pragjyotisha when Vaidyedeva's line was extinct. He was succeeded by his son Rayarideva-Trailokyasimha of whom we are told: "He, king Rayarideva, the frontal ornament of the kings in Bhaskara's race it was, who, at the gorgeous festival of battle which was fear-

* Epigraphia Indica, Vol. I. P. 307.

* Assam Plates of Vallabhadeva, *Epigraphia Indica*, Vol, V., Pp. 181—188.

ful on account of the presence of the lordly elephants of Vanga, made the enemy abandon the entire practice of arms in the battle-field (*verse 5*)." Who despatched " the lordly elephants of Vanga" to Kamarupa it is dificult to determine with certainty. King Lakshmana Sena succeeded his father Ballalsena in A.D. 1119, the initial year of the Lakshmanasena era, and held both Gauda proper (Varendra) and Vanga. It was either Lakshanasena or his successor Kesavasena who made this attempt to reconquer Kamarupa and was repulsed by King Rayarideva. Rayarideva was succeeded by his son Udayakarna-Nihsankasimha. The copper plates record the foundation of an alms-house by Prince Vallabhadeva at the command of his father Udayakarna in Saka year 1107 (A.D. 1184—85). About fourteen years after, Gauda proper, which from the seventh century onward had given its name to mighty kingdoms that at times assumed imperial dimensions, fell a prey to the Turks who followed Mahammad-i-Bukhtiyar and turned into a province of the Delhi Empire. Not long after, a fresh horde of barbarians, the Ahoms, transformed Eastern Kamarupa into Assam.

Rama Prasad Chanda.

FROM THE NORTH POLE TO THE ISLES OF THE SOUTH.

It was at one time believed, by Horace Hayman Wilson among others, that if Railways were constructed in India they would be unable to pay their way. Wilson based his opinion on what then seemed inborn and ineradicable traits in the Hindu character —the stay-at-homeness of the Hindus, their horror of outlandish novelties, devotion to caste rules and prejudices with regard to food, drink and contact. In our own days too, Lieutenant-Colonel U. N. Mukharji seems to have associated the disinclination evinced by the modern Bengali Hindu to settle in the new Churs or islets in the south of Bengal with the supposed love of the Hindu for his paternal acre. In my judgment both these thinkers formed their estimates of Hindu character from the most decadent periods of Hindu history, for the fact is obvious that, in these days, it is the Hindu spirit of colonisation that is partly responsible for tde present friction in South Africa and Canada and is causing no inconsiderable embarrassment to His Majesty's ministers in England. In this paper, evidence will be adduced to show that, except during the age of anti-Buddhistic revival under Rajput patronage and the succeding period of Muslim rule, the Hindus were always remarkable for a genius for colonisation, absorption of alien races and the diffusion of their own civilisation and religion. In other words it will be shown that from their original Arctic home they migrated to the vast sub-continent of India which they filled with their colonies and the halo of their spiritual civilisation, and that from India, in historic times,they founded colonies in Ceylon, Indo-china and the island of Java in the Indian archipelago. It will then become clear that their present desire to form settlements in several parts of the British dominions outside India is but the renascence of that old colonising spirit in the favourable conditions brought about by civilised and progressive British Aryan rule.

The discovery of Sanskrit by Western scholars and the foundation of the Asiatic society at Calcutta in 1784 were followed quickly by the perception of such striking similarities in language, mytho logy, religion and social customs among the ancient Hindus, Persians, Greeks, Latins, Teutons, Celts and Slavs as to leave no room for doubt that at some pre-historic time the ancestors of all these peoples lived in the same land, spoke a common language and followed the same religion and social observances. As regards where that primeval home was, opinion differed from the very first. India, central Asia, the Caucasus, Armenia, South Russia, Central and North Germany, Finland, Scandinavia and the whole of northern Europe from the Atlantic to the Ural has, at one time or other, one may say almost consecutively, been regarded by scholars as the original seat of the Aryans. But none of these countries seems to fully suit the traditions preserved in the oldest monuments of the Aryan mind, the Vedas and the Zend Avesta ; and, what is equally important, none of the reasons assigned for the abandonment of the primeval home and the dispersion of the Aryan peoples is sufficient and convincing. The question however is no longer an open one. The last word on the subject, I venture to think, has very nearly been said by Bal Gangadhar Tilak, a brief abstract of whose principal arguments is given here, mostly in his own words.

A close examination of the dawn-hymns in the Rigveda discloses the fact that Ushas or the Deity presiding over the dawn is often addressed in the plural number. This com be accounted for only on the supposition that the Vedic dawns were a closely connected band of many dawns. This supposition is borne out by passages in Vedic literature which state in unambiguous terms that the Vedic dawns were thirty in number and that, in ancient times, a period of several days elapsed between the first appearance of light on the horizon and the rising of the sun. Further, the dawn is described as moving round like a wheel, a characteristic which is true only in the case of the polar dawn. These facts sufficiently prove the acquaintance of the Vedic bards with the physical phenomena witnessible only in the Arctic regions. To make assurance double sure, there are other Vedic passages which go to prove that the long Arctic nights and the corresponding days of varying duration, as well as, a year of ten months or five seasons, were equally known to the poets of the Rigveda. An examination of the sacrificial system and especially of the annual sattras and night sacrifices further shows that in old times yearly sacrificial sessions did not last for 12 months as at present, but were completed in nine or ten months ; and the hundred-night sacrifices were really performed, as their name indicates, during the darkness of the long Arctic night. In short, the half year long day and night, the long dawn with its revolving splendours, the long continuous night matched by the corresponding long day and associated with a succession of ordinary days and nights of varying lengths, and the total annual period of sunshine of less than 12 months are the principal peculiar characteristics of the polar and the circum-polar-calendar and when express passages are found in the Vedas showing that every one of these characteristics was known to the Vedic bards, who themselves lived in a region where the year was made up of

360 or 365 days, one is irresistibly led to the conclusion that the poets of the Rigveda must have known these facts by tradition and that their ancestors must have lived in regions where such phenomena were possible· It is not to be expected that the evidence on each of these points will be equally conclusive, especially as we are concerned with facts which existed thousands of years ago. But if we bear in mind that the facts are astronomically connected in such a way that if one of them is firmly established all the others follow from it as a matter of course, the cumulative effect of the evidence summed up here cannot fail to be convincing.

Besides, there are numerous points in the Vedic myths which are inexplicable on the theory of a diurnal struggle between light and darkness, or the conquest of winter by spring, or of the clouds by the storm—god, but which can be well-explained with the help of the Arctic theory. For instance, in the light of this theory, we can well understand why Mitra and Varuna were originally conceived as two correlated deities; for, according to this theory, they would represent the half-year long light and darkness in the Paradise of the Aryan race.

Again, the first fargard or chapter of the Vendidad enumerates 16 lands created by Ahura Mazda, the supreme god of the Iranians. As soon as each land was created, Angra Wainyn, the evil spirit of the Avesta, created various evils and plagues and made it unfit for human habitation. The Airgana Vaego was the first created happy land and its name signifies that it was the birth-place (Vaego-seed) of the Iranian race. But Angra Mainyn invaded it and there was in consequence a sudden change in the climate of the Airyana Vaego, which converted ten months summer and two months winter into ten months severe winter and two months cold summer. Now it is a settled scientific fact that the Arctic regions were once characterised by warm and short winters and genial and long summers, a sort of perpetual spring; and that this condition of things was totally upset or reversed by the advent at about 8000 B.C. of the Ice age which made the winters long and severe and the summers short and cold. The climatic changes introduced by Angra Mainyn into the Airyana Vaego were, therefore, just what a modern geologist would ascribe to the appearance of the Ice Age.

The second part of the second fargard of the Vendidad describes a meeting of the gods at which the fair Zima, the son of Vivanghat (the Indian Zama, the son of Vivasvat) was present with all his excellent mortals. It was at this meeting that Zima was distinctly warned by Ahura Mazda that fatal winters were going to fall on the happy land and destroy everything therein. To provide against this calamity, the Holy one advised Zima to make a vara or enclosure and remove there for preservation the seeds of every kind of animal and plant. Yima made the enclosure and the fargard informs us that in this enclosure the sun, moon and the stars rose but once a year and that a year seemed only as a day to the inhabitants thereof.

This description of the enclosures serves unmistakably to fix its geographical position in the region round the North Pole; for nowhere else on the surface of the earth can we have a year-long day and night except at the pole. We have it on the authority of the Mainyo-i-Khard that Zima's vara must have been situated in the Airyana Vaego. Here is therefore another argument for

locating the Airyana Vaego at or near the Pole. Yima's Vara might well have been mythical, but we cannot suppose that the knowledge of a year-long day and of the single rising of the sun during the whole year was acquired simply by a stretch of imagination. The authors of the *fargard* may not have themselves witnessed these phenomena but there can be no doubt that they know these facts by tradition and if so, we must suppose that their remote ancestors must have acquired this knowledge by personal experience in their home near the north pole. When therefore the Avestic traditions regarding the destruction of the primeval Arctic home by glaciation are found to be in complete accord with the latest geological researches, there is no reason why we should not hold that the original home of the Aryans was situated near the north pole and that the ancestors of our race abandoned it not out of irresistible impulse or over-crowding as has been commonly supposed, but because it was ruined by the invasion of snow and ice brought about by the advent of the Glacial Epoch.

Further corroborative evidence is supplied by the pre-eminence of fire-worship in the religion of the Aryan peoples as also by the mythologies and the ancient calendars of the European Aryans. Thus in the Lettish mythology, the Dawn is called the Diewo Dukte or the sky-daughter and the poets of the Letts speak likewise of many sky-daughters. Max-Muller tells us that in Greek mythology we can easily find among the wives of Heracles significant names, such as Ange (sunlight), Xanthus (yellow), Chryseis (golden), Iole (violet), Aglaia (resplendent), and Eone which cannot be separated from Eos, dawn." We learn from Plutarch that the Roman year contained at first ten months only and not twelve. We have a proof of it in the name of the last December or the tenth month. That March was the first month is also evident because the fifth from it was called Quintilius, the sixth sentilius and so the rest in their order. Numa added the two months of January and February and Julius Cæsar changed Quintitilus into July. In short, we may multiply instances to prove that many traces of the Arctic Calendar are still discernible in the mythologies of the Western Aryans, and, as a matter of fact, Prof. Rhys has shown that the traditions of the western Aryas point to Finland or Scandinavia as the original Aryan home. The Vedic and Avestic traditions carry us still further to the north; for a continuous dawn of thirty days is possible only within a few degrees of the north pole. But though the latitude of the original home can be thus ascertained, yet there is unfortunately nothing in these traditions which can enable us to determine the longitude of the place, or, in other words, whether the original home was to the north of Europe or Asia. But having regard to the tradition of an original Asiatic home among the races of Europe as also to the fact that the traditions of the Polar home are better preserved in the sacred books of the Brahmans and Parsis, it is perhaps not unreasonable to suppose that the primeval home was situated to the north of Siberia rather than to the north of European Russia or Scandinavia.

Philological research has put us in possession of a trustworthy picture of Aryan civilisation as it existed in the undivided northern home. But when the light of history first falls upon some of the European Aryans, they are seen to be in a rather bar-

barous condition. This was no doubt due in part to the unfavourable climates in which they settled, but it was no less due to their having migrated last from the primeval home, after having experienced the disastrous effects of the glaciation of their original country and lost their best men and the best parts of their traditions and civilisation. On the other hand, the Asiatic Aryans, if not the Greeks and Latins also, seem to have been the first to feel the premonitions of coming danger and leave their doomed country in quest of a better land to the South. This period of their wanderings is called, in a passage of the Aitareya Brahmana, the Krita Yuga and the passage declares that "Kali is lying, Dvapara is slowly moving, Treta is standing up, and Krita is wandering! The authors of the Puranas, living in a much later age and mistaking its true significance, gave it the name of Satya Yuga and described it as an age of ideal happiness.

Nevertheless, a shadowy outline of the course of the southward migration of the Eastern Aryans is still preserved in the nine Varshas or countries mentioned in the Puranas. Six or seven of these Varshas form almost a continuous series from north to south and may be reasonably supposed to correspond in the main to the successive post-glacial settlements of the Iranians mentioned in the first fargard of the Vandidad Uttarakuru is the northernmost of the varshas and corresponds to the Airyana Vægo of the Iranians. Ptolemy in his Geography, called it Ottorokarrah. The next country is Ramyaka, called Sughd in the Vendidad. Both the names mean a happy land'. The Vandidad further informs us that it was the country where the Iranians settled after the destruction of their original home by Angra Mainyu. In later times, the Greeks called this country Sogdiana and it has been identified with Somarkhand or the modern Khanate of Bokhara. Mc Crindle tells us that the Sanskrit name for the Oxus is Vokshu and that the essential part in the name of the river Jaxartes is the Sanskrit root, Kshar, to flow. The Hindu name for the river was Sita. Astronomical calculations based on the interpretation of some Vedic hymns enable us to fix approximately the date of the Aryan settlement in this country at about 5000 B.C. The countries in which, according to the Vandidad, the Iranians next settled, were Merv and Balkh. Merv is the same as the Sanskrit Meru (not the Polar Meru), G.K. Margiana, and Balkh stands for the Sanskrit Bahlika, G.K. Bactria. Collectively they mean the Ilavrita varsha of the Puranas. Then comes Harivarsha or Herat (G.K. Aria) which, the Vendidad tells us, was the next country made by Ahura Mazda for the accommodation of the Iranian race. The main body of the Aryan immigrants seems to have crossed the Hindukush from Balkh and formed settlements in Kabul, the Helmund country and Kandahar. From the Kabul valley they entered Hapta Hindu (Sansk. Sapta Sindhu), now called the Punjab.

It is fairly certain that in the course of these wanderings while the bulk of the Aryan tribes or the more enterprising of them moved southward in search of better lands, large bodies of stragglers were left behind in all or most of the above-mentioned countries. Indian scholars have not generally deigned to sufficiently notice the later history of these peoples. It is none the less true that some of the most famous of the Rig-vedic kings flourished in these trans-Indian colonies, for instance, Pururava in Balkh and Divodasa in

Kandahar. These stranded tribes long continued to dwell in what are, in short, the modern countries of Turkestan and Afghanisthan, even after the final separation of the Indo-Aryans and Iranians and the development of their similar and yet different civilisations. Until the advent of the Turanian races introduced further complexity and made these countries in a sense the battle-fields of Iran, Turan and Hind, they exhibited the spectacle of a mixed civilisation in which Indian and Iranian elements had equal shares.

But these remarks do not apply to all the tribes left behind on the route to India. In the course of inter-tribal conflicts which were not infrequent, the less powerful tribes were thrust into the northern fastnesses of the Himalayas where they remained in a more or less stationary condition. To the later Indian mythologists they were known as Pis-achas and their countries, modern Chitral, Gilgit, Kashmir, as the Nishada Varsha. The modern Kaffirs & Kohistanis are their descendants. These men are Aryans in race and speech and were so in religion too, until quite recent'y when some of them were forcibly converted to Islam. It was the necessity of having to account for their Aryan dialects that led Dr. Hoemle and Dr. Grierson after him to assume a second Aryan immi-gration into India. Benfey also had to postulate a second Aryan immigration from the northern valleys of the Himalayas in order to account for the peculiar sanctity of Brahmavarta in Brahmanical literature.

The precise determination of the time and place of the final separation of the Indo-Aryans and Iranians presents a problem of same complexity. To the Greeks of a later age, the Iranians were known as composed of four principal divisions; Sogdians, Bactrians, Medes and Persians. We have seen the Sagdians and Bactians. Left behind on the route to India; and it is not improbable that the Aryan tribes that settled in Merv and Herat and became known in later history as Parthians or Pahlavas, threw out offshoots, in early times, into Iran. But the Zoroastrian religion, that afterwards became the distinctive feature of Iranian civilisation, originated in the South Eastern Punjab, in a protest against the early indications of a pantheistical turn that was visible in the old Aryan nature-worship in the changed conditions of life in the river plains of the Punjab. New gods and new modes of sacrifice were coming into prominence and new mythological incrustations were obscuring the old Aryan myths. Zarathustra, son of Pourousasva of the tribe of Mada, was the head of this religious revolt. His principles which were in favour of a reformed Soma sacrifice and a dualistic view of the universe were supported by his own tribe as also by the friendly tribe of Parsas. The religious war that followed is probably referred to in the passages of the Satapatha Brahmana which speak of the struggle between the Devas and Asuras, both sons of Prajapati. The later Pauranik tradition magnified this basis of fact into a stupendons contest between supernaturnal beings. It was in reality a struggle between the worshippers of the Devas and the worshippers of Ahura. The latter were vanquished and forced to migrate. The Gandheras and other trans-Indian Aryan tribes, who were never remarkable for a scrupulous respect for Brahmanical institutions, would seem to have offered no moleslation to the out-going Madas and Parsas, or Medes and Persians,

and we learn from the Vendidad that after their sojourn in Hapta Hindu, the Iranians found their last resting place in Rangha, which, according to Hang, must have been in Iran. To the northern mountains of their new country they gave the name of Demavand, perhaps in memory of the grand old Himavan, both names meaning literally 'the abode of snows.' The Zend-Avesta itself admits that the old law of the Aryans yielded place to the new law of Zarathustra in the new home in Iran.

But to return to our main theme. Indologists are agreed that the completion of the Aryan immigration intc the Punjab, as far south-east as the Saraswati, was the work of five or six enturies ; and the latest calculations based on astronomical data besides the evidence furnished by the computation of dynastic lists and changes in language and religious worship, enable us to place this period between 3000 to 2500 B.C. Some of the Aryan tribes, as the Gandharas and Mujarats, remained to the west of the Indus ; and others, like the Tritsus did not cross it till some time after. To the Purus, Druhyus Anus, Turvaens, Yadus, Matsyas, Srinjayas, Ucinaras and other tribes that pressed on south-eastward, the big rivers presented formidable difficulties ; and the opposition offered by the natives, whom the latest researches have shown to have been comparatively civilised, was very great. The Rig-veda speaks of many bloody battles and the wholesale destruction inflicted upon the Dasyus. Modern ethnological and lingustic researches concur to show that the aboriginal Dravidian population in the Punjab was nearly wiped out. An enquiry into the land system of the Punjab shows that the tribes must have settled down in the fertile river valleys under their tribal kings and purohitas in villages as agricultural communities They were husbandmen and warriors and each man was priest in his own house where the sacrificial fire was always kept lighted. In these respects, the nature of the Aryan conquest of the Punjab did not materially differ from the previous conquests of the race in the countries through which they had migrated into India ; for, in each of these countries, the aboriginal population seems to have been almost exterminated, the few survivors being made slaves. But what distinguished the colonisation of the Punjab from previous attempts at colonisation was that in the altered conditions of existence of a mountain people brought about by residence in the river plains, the old Aryan religion was slowly under going a great transformation ; a priestly class was growing in importance ; the national character was softening ; and, in short, the old Vedic civilisation was taking a Brahmanical complexion. But this did not become evident till the Aryans had occupied for some time the South-Eastern Punjab.

In the meantime, the successes of the early invaders allured tribes from the other side of the Indus to cross that river and push on, in some cases, beyond the limits of the Punjab. Some of the tribes settled in Sindh which was in those days a well watered country. But, in spite of a consciousness of their unity in race, religion and language, in spite of their common pride in the possession of a fair colour and superior civilisation, the Aryan tribes were often at war with one another. We have evidence that in these fierce internecine conflicts, they were excited by the war-songs of their tribal bards or Purohitas who were believed to have the power of securing the aid of the gods by their invoca-

tions. But one effect of these struggles was that many of the small tribes were amalgamated into large units resembling nations. Sometimes the necessity of having to offer a united front to the common enemy in the acquisition of new territory would bring about a coalition of some tribes; and, in some cases, the union of the tribes wou d be cemented by wholesale marriages between the marriageable young men and girls of the uniting tribes. Certain it is that the Kurus and the Panchalas were each formed into a powerful nation by the coalescence of several tribes. Along with the Matsyas, Surasenas, Videhas, Kosalas and other tribes they pushed on towards the middle of northern India and founded great kingdoms. But these states were in many vital respects dissimilar to the tribal monarchies or aristocratic republics that had been set up in the Punjab. In the Punjab, we have seen, the native population had been nearly exterminated; in the middle country, a large part of the Dravidian population was spared, and made to till the soil and do other manual labour for their new masters. The conquering tribes or nations settled down as landlords over a subject race and found leisure to devote themselves to the development of the Brahmanical institutions which their new circumstances had rendered necessary. The Kurus or Bharatas were extremely partial to the sacrifices and the preservation of the old traditions; and a grateful priesthood has immortalised their name by extending it to the whole Indian Peninsula. It is probable that it was under the patronage of the Kurus and for the guidance of the Aryans in the middle country that the rules of caste were laid down and a peculiarly Indian character given to the old civilisation by Brahmamical families living between the Saraswati and the Drishadvati (the modern Sirhind District). In proportion as the Aryans advanced further towards the east, the economical, social and political advantages of having a subject population became more and more obvious; and larger numbers of Dravidians and Mongolians were spared. But there was good reason for the apprehension that the fair-skinned Aryans might be engulfed in the large dark-skinned and flat-nosed subject race; and it was primarily to guard against this probable evil that caste-rules were framed, prohibiting inter-marriage between Aryans and Dasyus, especially in the reverse direction. Further, with the growth of Aryan power and the rapidly diminishing resistance of the natives, the necessity for composing hymns in honour of the gods was felt less and less. The language of the Rig-vedic poets had become antiquated and somewhat obscure in meaning and the hymns were now believed to have supernatural efficacy when used, in parts, at sacrifices; and, with the growth in the revenues of the kings, the sacrifices began to assume an elaborate and costly character. The Yajurveda or the sacrificial veda proper and the early Brahmanas were composed in the middle country; but, by the time the Atharva veda was completed, the Aryans had advanced eastward as far as the confines of western Bengal. The Matsyas had settled near Jaipur, the Surasenas near Mathura, the Kosalas in Oude and the Kasis near Benares. The Satapatha Brahmana describes how the videhas carried the sacred fire of Aryan civilisation into the swampy land beyond the the Gandaki; and the Atharva Veda refers to the fever-stricken areas in which the Angas and Magadhas had fixed their abodes. Brahmans from the middle country, who,

as custodians of the sacred traditions and the national sacrifices, were fast eclipsing the Khattriyas in importance, were not slow to bring their peculiarly Brahmanical institutions into the new homes of the Aryan race in the East. But like the Vedism or Aryanism of the Punjab, the agnosticism of eastern India seems to have more or less repelled from the very first the Brahmanical cult of the region near the Saraswati and the Yamuna. The eastern countries as also the countries in the extreme west were, in consequence, declared impure.

For one-thousand years if not more, Brahmans and Khattriyas co-operated in the establishment of Aryan supremacy in Aryavarta or the region between the Himalayas and the Vindhyas. But with the secure establishment of Aryan authority and the closer differentiation of function attendant on the growth of the community in civilisation, the Brahmans were led to increasingly devote themselves to what they considered their special vocation,—the preservation of the old traditions, the elaboration of the national religion and worship, and the inculcation of the superiority of a civilisation that preferred the invisible to the visible. On the other hand, from the nature of their circumstances, many of the Khattriyas were inclined to make the old Aryan ideal of the glorification of physical might the philosophy of their lines; and a civil war was inevitable. But the old fighting strength of the Brahmans was yet unimpaired. Moreover, they commanded greater respect among the other members of the community, both Visas and Dasas. The legend of Parasu Ram shows that the Brahmans were victorious in the struggle and placed in possession of the sovereign power. But the practical work of government and war were distasteful to them; and, as in after ages in Kashmir and Malabar, they restored the Khattriyas to power and themselves returned to the duties of their Brahmanical life. To such lengths did their abhorence for the profession of arms proceed, that it was declared unlawful for Brahmans to touch weapons even for the sake of examining them out of curiosity.

In the colonisation of the south, the Brahmans appear as the pioneers. Agastya is traditionally believed to have carried Aryan civilisation to the south, and Parasu Ram is said fo have conquered Malabar and established Brahmanas in that country. The story of Ramchandra presupposes that there were Brahmans in Kishpindhya (the modern Bellary District to thk north of Mysore) and Lanka (or Ceylon) to whom gifts were given in coronations and other ceremonial occasions. But the Brahmana settlements that are found in the Ramayana to lie scattered in the forests of the Deccan plateau as also in the more open country to the south of the Krishna, and which may be presumed to have inspired the Dravidians with some respect for the superior sanctity of the fair-skinned Aryans and predisposed some of them to Brahmanism, seem to have laboured under the great disadvantage of suffering occasionally from the capricious tyranny of obnoxious princes or tribes. It was therefore necessary that the strong arm cf the Khattriya should protect the peace-loving Brahmana in the distant hermitages in the south. Deputations of learned and pious Brahmans would at times seek the aid of some Kshattriya prince in northern Indian to protect them from their oppressors. If tradition is to be believed, Ramchandra was such a prince. He led no vast army ef Aryans against the Dravidians

of the south, but, by forming alliances with some of the southeru princes who appear to have been inclined to the Aryan culture of the north, would seem to have carried the torch of Aryan civilisation as far south as Ceylon. It is true that the Deccan to the north of the Krishna was one vast forest in Rama's time, but the Karnatic plains or the Tamil country proper as also Malabar were probably peopled by fairly civilised Dravidians By the time of the Pandava conquest of these regions, small bodies of Aryan immigrants had established themselves in Saurastra (modern Guzrat and Marhatta country), Avanti (Malwa), Nidarva (Berar), Chedi (Central Provinces), Kalinga (Northern Circars) and Andhra or Telingana. It was therefore possible for Khattriya princes or Dravidian princes who had begun to rank as Khattriyas to attend the Raja Shuya sacrifice of Yudisthira and take part in the Kuru Panchala war which expert critical enquiry has placed in the 14th century, B.C. It is significant that the dynastic annals or chronicles found in some parts of India date their beginning from the time of this great war.

To be continued.

OLD DACCA.

A lecture delivered by Khan Bahadur Sayid Aulad Hasan.

IT was towards the close of the rainy season, in the year 1601, that one morning a fleet of Gharabs, Kosas, Pansis, Chhips and other boats. many of them manned by as many as a hundred and fifty oars, escorting state barge, started from Rajmahal eastward bound. The Lion and the Sun waved proudly form the masthead of the barge, and the golden Mahi-Maratib glittered on her prow. She had on board no less a personage than the ruler of Bengal, Behar, and Orissa, Shaikh Alauddin Chishti Faruqi Ptizad-ud-Daulah Nawab Islam Khan, who was going to visit the eastern part of his territories in search of a site for his future capital. Alauddin was the son of Shaikh Badruddin, and grandson of the famous saint Shaikh Salim Chishti of Fatehpur, at whose hermitage Jahangir was born, and after whom he had been named Salim. His wife. Ladli Begam, was the sister of Abul Fazl, the famous Minister of Akbar and the author of the Aini-Akbari and the Akbarnamah. He was a foster brother of the Emperor Jahangir who in the first year of his reign, had appointed Alauddin Governor of Behar, and conferred on him the title of Islam Khan and the command of five thousand horse. His administration of Behar was so successful that in 1607-08 on the death of Jahangir QuliKhan Lala Beg, the Governor of Bengal and Orissa, Jahangir was pleased to appoint Islam Khan Viceroy of Bengal, Behar, and Orissa. The first act of Islam Khan on assuming charge of the government of the United Provinces, was to arrange for the removal of the seat of Government to some place near the eastern frontier, as events in that quarter urgently necessitated this step. It is known to every reader of Indian History, that Bengal had been finally conquered by the Mughals only during the preceding reign. The former rulers of the Province, the Pathans, driven from Western Bengal and Orissa, had retired to the head quarters of their chief, Usman Khan, in Eastern Bengal. They

had established themselves in the forts of Ganakpara, Gauripara, and Dhamrai, and were showing signs of turbulence. It was necessary to deal with them promptly and with a strong hand. There was besides another and a newer danger threatening to devastate Easten Bengal. The Mugs and the Portuguese, having joined forces under the command of Sebastian Gonzales, a Portuguese Adventurer, had taken possession of the country in the vicinity of Bhuluah and Lakhipore. Taking advantage of the general confusion consequent on the struggle between the Afghans and the Mughals, they had taken to boldly sailing up the great rivers and robbing and plundering in every direction, and practising every from of cruelty and oppression on the unfortunate inhabitants who fell within their reach. In order to cope with these dangers, Islam Khan had rsolved upon taking up his head-quarters at the very centre of the scene of disturbance. Sailing from Rajmahal for the Eastern Province, he visited many places in search of a site for his future Capital. At last on coming opposite the place where the city now stands, he found it to be a spot of great strategical importance, and determined to build his capital here. The boats were brought near the bank of the river and moored, and Islam Khan landed and inspected the site. The place where he landed is still called after him Islampore and is an important quarter of the city. On his way back to the boat, he met a party of Hindus performing their puja with the accompaniment of music and Dhaks (Drums). An idea struck him. Calling the Drummers to-gether, he made them stand at a central place, and ordered them to beat the drums as hard as they could. At the same time he commanded three of his attendants to go, one to the east, another to the west, and the third to the north each with a flag staff, and plant it at the place where the sound of the drums would cease to be audible. This being done, he called the place "Dhaka" from "Dhak," a drum and ordered boundary pillars to be erected at the places where the flagstaffs had been planted. These he fixed as the boundaries of the north, the west, and the east, the river Buriganga forming the southern boundary. Subsequently, in honour of the reigning monarch, he gave it the alternative name of "Jahangirnagar." Here he fixed his capital. Some writers have referred the etymology of Dacca to Dhak, the name of a tree, said to have been plentiful here in ancient times, though we have not got a single specimen of it now, whilst others suppose the city to to have been called after Dhakes-vari, the temple said to have been built by Raja Ballal Sen in honor of the goddess Durga, in the western part of the city. As if Constantinople had given the name to Constantine and not *vice versa*. This temple still exists, but it is not known in what year it was built. The style of the architecture, however, appears to me to be of the Mughal period. Whatever be the etymology of the word (and the one given first appears to be the most likely of the three), it is certain that the name Dhaka waa first given to the place by Islam Khan, as it does not occur in any of the ancient histories, and there is no mention of it in the Ain-i-Akbari. The Dhakka Bazu mentioned in the Ain, is a different place. It is now a hamlet lying some six miles to the north of Narayan-ganj. Besides, Dacca lies in Shah-Ujial Bazu and not in Dhakka Bazu. Dacca remained the capital of Bengal from this time till 1639,

when the Prince Sultan Shuja, the then viceroy of Bengal, removed his headquarters to Rajmahal, leaving most of the public offices here.

IN 1560 Nawab Muhammad Said Muazam Khan Sepah Salar Khanan-i-Khanan Ameer Jumla, better known in history as Mir Jumla, became the Nazim. of Bengal, and moved the capital of the Province back to Dacca, which remained the seat of Government till 1704' when the then Nazim of Bengal, Mutaman-ul-Mulk Alaud Daulah Kartalab Khan Jafar Khan Nusairi Nawab Murshid Quli Khan Nasirjang, removed the court to Murshidab which hence-forth became the capital of Bengal.

DACCA was now made the seat of a Naib Nazim (Lieutenant Governor). The first Naib Nazim, properly speaking, was Prince, afterwards, Emperor, Farrukh Siyar, who represented his father the Prince, afterwards, Emperor, Farrukh Siyar, who represented his father the Prince Azimush Shan, the last Nazim of Dacca for a short time after the latter had removed his head quarters to Patna under the order of his grandfather the Emperor Aurangzebe in consequence of his quarrel with the Dewan Kartalab Khan afterwards Murshid Quli Khan,

To each province or *Subah* the Mughal Emperors appointed two principal heads of administration, the Nazim and the Dewan. The Nazim was the Viceroy of the Province he was the executive and military head of the Province, and administered Criminal Justice ; whilst the Dewan, independent of the former and directly subordinate to the Emperor, held the portfolio of the Finance and was responsible for the revenue administration of the Province and also for Civil Justice. Under the Nazim, there was a chain of subordinate officials called Naib Nazims, Sarlashkars, Faujdars, Kotwals. Thanadars &c. Under the Dewan, on the Judicial side, were Qazi-ul-Quzzat, Qazis, Muftis, Miradls Sadri-Sudurs and Sadrs ; and on the revenue side were Naib Dewan, Amils, Shiqdars, Karkunis, Qanungos, and Patwaries. At the time I am speaking of, 1702, Prince Azimush-Shan, the grandson of the Emperor was the Nazim of Bengal, and Kartalab Khan, the future founder of Murshidabad, was the Dewan. He had already distinguished himself elsewhere as a good financier. One of his first proceedings was the disbandment of the household troops known as Nagdis, consisting of 3000 horse. By this act and because of the reductions which he made in the different departments of the state, he had made himself unpopular both with the Nazim and the majority of the officials. The result was a plot to get rid of him. It is said that the plot was countenanced by the Prince. Early one morning in the year 1702, when the Dewan was on his way to pay a visit of ceremony to the Prince, at the Poshta residence, where the latter was then residing, Abdul Wahid the late commandant of the Nagdis and some of the men, hoping to catch him at a disadvantage, surrounded the state palanquin in which he was riding and clamoured for arrears of pay. Kartalab Khan and his escort, being well armed, managed to push their way through the hostile band,and reached the palace in safety. There he openly accused the Prince of complicity in the design of Abdul Wahid and his soldiers, and placing his own dagger before the Prince said. " If you desire my life, here is the dagger. Let us try the contest." But Azimush-Shan declined. On returning home, the Dewan drew up an

account of the morning's proceeding and submitted it to the Emperor, and considering that his life would no longer be safe here, left with all the revenue offices for Makhsudabad, as the place was then cslled, and established his head-quarters there. The Viqayah Nigar (daily newswriter) also reported the affair to His Majesty. Aurangzebe's was no respecter of persons, and his near relationship to the Emperor did not save Azimush-Shon, on whom Aurangzebe's anger fell in full force. He was not only reprimanded, but was ordered to leave Dacca forthwith and take up his head quarters in Behar. Accordingly Azimush-Shan started for Behar leaving his son, Farrukhsiyar, to act as his deputy. With him departed the glory of Dacca. Its interests henceforth became purely local. It remained no longer the city to which all eyes turned, and from which all orders issued throughout the length and breadth of Bengal, Behar, and Orissa. As stated above, Dacca now became the seat of a Naib Nazim, and continued as such till 1843, when the last Naib Nazim dying childless, the family became extinct. The English acquired the Dewani of Bengal in 1765. That very year Lieutenant Swinton, still remembered here as Sooltin Sahib, on behalf of the East India Company, came to Dacca and took over charge of the Dewani from the then Naib Nazim Nawab Jasarat Khan. In 1768 commenced the administration of affairs of the Naib Nizamat by the Naib Nazim in conjunction with a member of Council representing the East India Company. This arrangement continued during the time of his successors, Hashmatjang and Nusratjang. On the death of the latter in 1822, the English took sole charge of administration, and his successors, Shams-ud-Daula, Qamar-nd-Daula, and Ghaziuddin Haidar remained Naib Nazims in name, getting a monthly pension of Rs 6000 from the East India Company. The jurisdiction of the Naib Nazims extended from the Garo-Hills on the north to the Sundarbans on the south ; and from the Tipperah Hills on the east to Jessore on the west. In 1820 the population of the city was estimated at 200000. When Dacca was the capital of the Province, its limits, including the suburbs, extended from the Buriganga in the south, to the Tangi River in the north a distance of nearly fifteen miles; and from Jafarabad in the west, to Postgolah in the east, a distance of nearly 10 miles. Its population then is said to have been close upon 900000.

THE English, the French, and the Dutch had factories here. The English factory, built in 1668, was situated at the place where the old College building stands. The French factory was situated at the place whcre stand the Zanana Quarters of the pressent Nawab of Dacca. It was taken possession of by the English in 1778. The Dutch factory stood at the south-west corner of the Mitford Hospital compound by the river side. It was takeh possesssion of by the English in 1825.

THE DACCA REVIEW.

VOL. I. MAY, 1911. No

SOME OF OUR EDUCATIONAL NEEDS.

(A paper read before the Dacca Teachers' Association.)

The learned lecturer* of the previous meeting treated some of the problems of Indian education more or less from the Western or European point of view. It was natural for him to do so. And it is a very important point of view. For we must remember that the education which the Indian youth is receiving is English education. By far the most important part of it was initiated and is controlled by men of Western Universities. With all their historic imagination the founders of modern Indian Education could not but think that the education which they had received and which they had found so good was the best education to give to India. They brought us the fine flower of the culture that they had gathered at Oxford or Cambridge—a noble gift if ever there was one.

* Mr. Archbold, Principal of the Dacca College.

But one thing they could not bring. We see the finished product—the Oxford or Cambridge graduate—but we have not seen him in the making. We do not understand him. He is among us but not of us. England might give us her great books, her great teachers, her scientific investigation but she could not give us her Oxford or her Cambridge. For what is Oxford worth without her filiation with English history, without her chequered past, without her cherished traditions, without the atmosphere that surrounds the colleges,—nay without her glamour? If you take away these from Oxford training—what is left? A little learning perhaps—but no education. They could not bring the general feeling about Oxford or Cambridge which pervades all England, which is shared by every father who wishes to send his boy to one of the Universities. They could not bring the air of freedom, that pride in their college as a thing of their own making. And I say that without these Oxford and Cambridge are only names.

Are we then to be surprised that

though the rudiments of English education are being imparted in our schools and though Oxford and Cambridge scholars are teaching in our colleges, the fruits of that education, taken collectively, are markedly different from the crop that is yielded in England. I think every English Professor will bear me out if I say that the poorer yield in India is not due to comparative dulness of the Indian student. It is due to want of filiation with the past; it is due to want of vital and organic connection with social and domestic life; it is due to the absence of that "larger ether," that openness to the four winds of heaven without which true education cannot flourish.

I do not here raise the question whether Oxford or Cambridge education, even if it could be obtained in India, would really fit the Indian youth for the peculiar duties of *his* life—whether the interests of our country would be truly furthered by it. What I wish to say is that European culture has not sunk—perhaps cannot sink to the roots of our being—and therefore cannot directly mould our lives.

But one thing European culture and modern Indian education *can* do—and I think *are* doing for us. They are bringing on an intellectual awakening, an illumination, a renaissance. It will take up into itself the *disjecta membra* of ancient Hindu and Mahomedan culture and shape from them a new form of beauty. Even now a strange awakening is on us, an awakening as from the sleep of centuries—an awakening that is manifesting itself in strange and wild ways.

For our situation is unprecedented. We have here the clashing of two race instincts, two civilisations, two ideals -the one dominant and forceful the other subtle and pervasive—the one instinct with the energy and knowledge of the West, the other inspired by the ancient wisdom of the East. These opposing forces are the warp and woof and with them the Norns are weaving the web of Indian life.

Rudyard Kipling says—"The East is East; the west is west: and never the twain shall meet." And this is the faith of many Indians to-day. They think that the salvation of India lies in shaking itself free from the influence of the west and in recovering the life of the past, the ideals of the past, the culture of the past. They say we must walk back, we must unlearn—we must go to our old school if we want the training that will really mould our inner life.

In my humble opinion, even if it were possible it would not be wise. To my mind Tennyson is a much higher prophet than Kipling :—

And East and West without a breath
Mixt their dim lights like life and death
To broaden into boundless day.

If there is providence in the fall of a sparrow are we to think that this bringing together of two great peoples is a mere chance, a freak of

circumstance, a purposeless thing? Nay there is Providence in History. And with the utmost earnestness I can command I would say both to my English friends and Indian— 'let us look at this mystic union of East and West with the eye of faith, let us not regard it lightly or selfishly or with a slavish mind—but in hope and faith.

Out of such union are the issues of Indian life—this is my apology for dealing with questions which at first sight seem to have no connection with Indian Education. In fact the connection is very vital. These are the forces that will mould and shape the Indian student of the future. No doubt the shaping process is now going on—but we now see him in the rough—he is in the potter's hand.

We all know the Indian student as he is now—loveable and teachable enough but with a pathetic helplessness—and moving about in a world not realised. His home, perhaps, with its squalor, its untidiness, its want of method and order, its bad sanitation and its unscientific ways—is still a home warm with the wife's devotion, the mother's love—who loves not wisely but too well—the brother's and sister's affection, the father's care. The sanctity of a thousand daily sacrifices fills the air like the smoke of incense, the selfless service of the young widow rises like a "still sad music not harsh or grating but of ample power to chasten and subdue." The sublime philosophy of ancient India with its pathetic touch of fatalism is imbibed by young and old, by men and women. In such a home the needs of the body are not sufficiently considered. It is not so ordered as to help the student in his daily work. No one understands his work at home. The master comes home from his work tired, not necessarily because he is overworked—but, perhaps, he has entered the catacombs of clerical service. He is ill-paid, he is worried. He has daughters to marry.

Well the Indian boy at last is sent to school and is booked as a drudge for the next ten years. Let us turn for a moment to our schools. Nothing is farther from my mind than to decry our schools. Nor am I insensible to the very important advances that education in all its grades has made in this country since the plantation of the British flag. Further, the University Reforms recently inaugurated are full of happy augury. But I may be pardoned for saying that the reforms have been begun at the wrong end. The base should have been strengthened and broadened before raising the superstructure. What is chiefly lacking in our school education is, I think, training. If our boys were more poorly equipped in information, if they had fewer subjects to read, if the ground covered in each subject were more limited—but if they were broken to methodical habits, if they were taught more to help themselves—in my humble opinion, it

would be a decided improvement. At present slovenly work, want of clearness-and precision are tolerated in the school boy—or, at least, are not regarded as the chief defects to be removed. It is not remembered that clear and logical language means clear and logical thought. Even in the lower classes of the school every boy should be trained to read with correct accent, should be able to understand and write and speak very simple English sentences ; should be able to do simple sums in Arithmetic, neatly and correctly ; should know and should be able to tell in main outline the story of his country. In order to train a boy on these lines the master should himself have been properly trained. It is not much good, I am afraid, to send the master to a Training College when he is too old to unlearn his School and College habits. In the case of the Teacher, nothing can supply the want of a proper training in School and College. If I may make a suggestion there should be at least *one* model school maintained in each Province. Cost should be no consideration. The classes should be just as large as is good. The teachers should be qualified Englishmen. The first five classes should be entirely separated from the lower classes. There should be no fixed curriculum except in the top class. Only the standard to be reached at each stage should be fixed. The teacher should have a free hand. From the sixth class downwards the Kindergarten system should be employed and there should be lady teachers. I think it might be well to make these classes—mixed classes. This is the proper place for the training of a teacher. Let every promising teacher have his turn for a year to work with the other teachers of this school. And every Headmaster should have been previously in charge of a school Hostel.

But there is no proper Boarding school in India for Indian students. There *are* boarding houses attached to some of our schools. But the boarding house is regarded as of secondary importance compared with the school itself. In my humble opinion the reverse should be the case. The *best* man on the staff should be placed in charge of the hostel. The whole life of the school boy should be regulated there. There should be found wholesome food, strict discipline, habits of self-help, thorough training in conformity with Indian ideals, moral and religious education—in fact all that large residue that mere teaching in the class must miss.

School games and sports and excursions should be properly organised. I know that now-a-days there are cricket, football and hockey in every important school. But I mean that they are not a vital part of school life. Every boy on his admission into school should be placed in the hands of the school doctor and the school gymnastic master. And the two together should, after examination

draw up a scheme of physical training for him. This part of the boy's training should be as seriously and carefully attended to as his progress in his studies. If a boy mopes, if he lolls on his bed in the day time, if he becomes pale and sickly, if he is irregular in his habits the school should pull him up. The eye of the school should be on him. Proper organisation of games, the development of an *esprit de corps*, the habit of obedience, a high sense of honour — these are the things we should strive after. Instead of a dull uniformity, each school should be noted for something and every school should be a centre of noble training. The Headmaster should be a man with a personality. He should impress a special stamp on all the boys that pass through his hands. His pupils should cherish his memory in love and reverence to the day of their death. It was so in the Sanskrit *tols*, it was so in the Mahomedan *maktab*, it is so in the great English schools. Without it school life is chill and bare indeed. Of course every school cannot be a Rugby nor every Headmaster a Dr Arnold, but neither should personal influence be at a discount. Let there be some warmth and colour. Let not every school be bleached in the official wash-house or tinted a neutral grey.

And in this connection I may be permitted to say a word about what is becoming the besetting vice of many schools now — I mean that they are becoming more and more examining bodies and less and less teaching bodies. Examinations and even frequent examinations may be necessary and good (— we may safely say so as our Examination days are over!) — but a boy is sent to school mainly that he may be taught. The day's lesson is perhaps hurriedly gone through in the class — but the main task of teaching is left to the private tutor at home or to the guardian. In many cases there is no money for a good private tutor. Perhaps a student of the third year class or even of one of the intermediate classes — is engaged — with disastrous effect both to the boy and to his tutor. The guardian is either too busy or he may be illiterate.

And then, who do you think comes to the rescue of the poor, helpless, neglected boy ?—why the Key-maker—the help of the helpless. You have no idea how early this habit is contracted — almost as soon as the child can spell through his words. When a boy goes to buy the books prescribed for his class these pitiful little key-books are smuggled in. They are thin enough, in all conscience, thin in every sense of the word — to escape detection. If the police raids that we hear of now-a-days were directed to the hiding places of these creatures of darkness — I mean the note-books not the boys — I think we might be sure of a good haul. Are we to wonder that in our Colleges also, we find our students helpless without note-books. If we begin to dose a child with opium

and continue that habit for eight or ten years—can he, when he grows older overcome his craving for the drug? As with the drug habit, so with the key-habit. I once met a college student who, I found, could not produce one single correct English sentence out of his head. It was such a curious phenomenon that I asked him how he had passed his Entrance examination. He kept a guilty silence but I pressed him hard for an answer—and then he confessed that he had got by heart a book of model questions and answers—and he had simply reproduced the bad English of the note-maker for what is was worth. Alas! these good old days of the Calcutta University are either gone or are fast passing away.

Now there would be no necessity for buying these note-books if in every school the teacher really taught. I have been told that in some cases it is mathematically impossible. Take the number of hours available during the session for teaching a subject. Divide by it the number of pages of readable and unreadable matter. The quotient would show that good teaching is impossible. In the Government schools the length of the course is prescribed. In the private schools there is, I believe, a freer hand—But surely the Government schools set the fashion and—furnish the standard of judgment.

But there is a deeper evil than this. The teacher's work has become more or less mechanical. Give him a free hand and make him responsible.—Let him choose the books for his class, let him choose the scope of his teaching, let him, as far as possible, use his own methods but let him turn out well-trained boys, let him be tested by that. Each of his boys should be able to stand all tests in respect of good manners, obedience to discipline, methodical habits, neatness and precision of work. Every one of his boys should be able to read well, to talk intelligently, do his sums neatly and correctly. His thoughts should be clear and he should be able to express them. If he can turn out such boys we shall say his work is well done.

Of course it is a high trust and the teacher should be worthy of it. But I feel sure there is much talent and much power among our teachers. Let us make an earnest demand for noble work from our teachers—and I feel sure the demand will be met. Let us give our teachers the respect that is due to them.

And, in god's name let us pay them! Let us place them above ordinarry wants, let us enable them to live respectably and decently. "Plain living and high thinking is, no doubt, a very pretty text for a sermon. But too much of plain living does not conduce to high thinking—nay, it may put a stop to thinking altogether. When one talks of improving the pay of our teachers one is often put off by being referred to the simple life of the ancient Brahmin teachers of India. But it is forgotten that they were the uncrowned kings of the country.

The king delighted to endow lands and revenues for their maintenance and bent his crowned head to take the dust of their feet. If his gifts were accepted he thought he had secured a good place in Heaven. Presents poured in from all sides. If the life of the teacher was simple—all life was simple.

And this latter point furnishes matter for reflection. In modern India life is not what it was. To live decently and above common wants is not easy. But if you wish that a teacher should be respected by his boys, that he should work with a will and settle down to his work, and, indeed, that he should put life into his work—you must place within his reach a decent life.

If I thus dwell for a moment on the needs of Indian Education it is not because I am insensible to the great work that has been done or of the enormous difficulties of the task. The greatest difficulty is the tremendous scale on which things are in India. Any scheme that is to cover the whole area of education means expenditure that is prohibitive. Even the cost of supervision and inspection—which are, of course, absolutely necessary,—comes to a formidable total. Then, a difficult administrative question might be raised —*viz.*, whether or not Education is becoming too centralised. Of course such a question will have one answer in the case of schools and another in the case of colleges. And in this connection I may advert for a moment to the advisability of having a really good Model school for each province which should set the fashion for all schools in respect of method of teaching, examinations general training and hostel organisation —and with which all other schools should be brought into touch by regular turns.

We left the poor Indian boy drudging at his school. I think it is time that we brought him through to the threshold of a College. But before he has completed the journey through the school or, perhaps, immediately after he has crossed the thershold of his college something has happened—namely the marriage of the boy. For the mother's heart has been yearning for a little girl-wife for her son—to fondle, to train, to tyrannise over. And perhaps the father has had to ruin himself in marrying daughters and he now wants to have his revenge on society. However piteously the father of his son's girl-wife may plead—his heart is hard like the nether millstone. He will exact the full market price for his son. Also it is an important, I might say a critical event in the educational career of the boy because the compact with the girl's father is that he should bear the expenses of his son-in-law's education. But for such a financial arrangement the collegiate education of many a Indian youth would have been cut short.

I am not going to take up collegiate education to-day but I would ask you all to consider if we are not too apt to

think that the Indian student is what his school and college have made him. This is true; but this is not the whole truth. He is also what his home, his society and even his political circumstances have made him. Take early marriage. Its defenders claim for it that it promotes the pieties of domestic life. It is also argued that, after all, it is only boy and girl love. Yes. But the romance of this boy and girl love and of the occasional visits to the father-in-law's house does constitute a disturbing element that is not particularly helpful to studies. By the time the student makes his way to the B.A. classes unstudentlike cares begin to weigh upon his mind. The poverty of the Indian student is in itself a heavy enough burden, why then add to it? The energy and buoyancy of student life are not for him. The free pursuit of knowledge is gone, scholastic ambition is a luxury permitted only to the few. It was not so in ancient India Celibacy and a life of purity and abstinence were enjoined upon the student. It must be so in all true ideals of student life. The two greatest ideals that were ever held forth before the world were the ancient Hindu ideal and the ancient Greek ideal—so different, yet each self-contained. It is too noble a part of our ancient student life to lose entirely.

But we must look to the future as well as to the past and I wish solemnly to ask one question—what is the aim of the Indian student? To what do his studies lead? Is it only that he may earn his livelihood? Well, a college is not the best place for that. Few careers are open to the mere graduate, the avenues of government service are thronged. To earn one's livelihood special training is necessary. It is necessary to develop and organise our industrial and commercial life.

But whatever walk of life we may choose -there is one aim that justifies and demands the noblest culture and furnishes the best corrective for the defects of our modern education—*viz.*, that of being a gentleman and a good citizen. The rights and duties of citizenship—are unknown to us yet. Let us hope that they will not remain so. When the clouds have rolled away and the petty squabbles of the present hour are hushed, when under wise and far-reaching reforms the vigorous national life of India is wedded to the power of government, when the high spiritual ideal of the East is enriched and interpreted by the knowledge and historic sense of the West—then a new ideal of communal life will rise, more restful than that of modern Europe, more broadbased than that of ancient India—in tune both with the voices that call us from the hoary past and the new voices of modern democracy. It is not a dream of my imagination—it is the future which will surely come and of which the present is the prophet. And all our education shall prepare us for the citizenship of such a state.

Lalit Mohon Chatterjee.

AN EAST BENGAL WORTHY:

NAWAB BAHADUR ABDOOL LUTEEF

BY

HIS SON

A. F. M. ABDOOL ALI, M.A., F.R.S.L., ETC.

Among the eminent Mahomedans of India who flourished in modern times one of the greatest names is that of the late lamented Nawab Bahadur Abdool Luteef, Khan Bahadur, C.I.E., of Calcutta. As "the most distinguished Mussalman Reformer of the day;" * as the pioneer of English education pre-eminently among the Mahomedans of Bengal, and in a sense of India; as the indefatigable promoter of friendly feelings between the rulers and the ruled and the different sections of Indian Society; as the trusted adviser of Government in regard to all questions affecting Indian interests and particularly those of his own co-religionists; as the most jealous watcher of the welfare of the community to which he belonged, Abdool Luteef occupied a singularly remarkable position among his contemporaries. He was a distinguished servant of Government too, but, as the *Times* so aptly remarked, "it was as a leader of his own community rather than as a Government Servant, however able and successful, that Abdool Luteef won his unique position and influence." * "He loved to call himself," wrote that Prince of India Journalists, Dr. Shambhu Chandra Mukerjee, "a representative of the Mahomedans. He was their guide, philosopher and friend. Nay he their all in all. The Mahomedan Society and interest of the day is of his making. Everything that Mussalmans now are or enjoy, they owe to Abdool Luteef Khan whether they know it or not, whether they choose to confess it or not." †

The Nawab Bahadur belonged to one of the most respectable families of Bengal. The family traces its descent from the celebrated Generalissimo of Islam, Khalid-bin-Waleed, who won the *sobriquet* of the Sword of God for his courage and valour. The first member of the family who came to India and settled at Delhi was Shah Aynuddin of Baghdad renowned for his piety and erudition. During the reign of Aurangzeb, his son Abdoor Rasool was appointed, by Imperial Sanad, *Kazi* of the parganahs now forming the District of Faridpur in East Bengal, and granted rent-free lands in the locality. His descendants continued to act as Judges in and around Rajapur where they had settled. Kazi Fakir Mahomed Saheb, sixth in descent from the first colonist, came down to Calcutta and joined the Bar of the Sudder Dewanee and Nizamat Adalat and practised with

*Sir W. W. Hunter once wrote thus of the subject of the present sketch.

* *The Times*, September 4, 1893.

† *The Reis and Rayyet*, July 15, 1893.

distinction for 28 years. He was a well-known man of letters of his time and the author of several works chief among which is a Universal History in Persian called the *Jami-ut-Tawarikh* which was published at Calcutta in 1856. The merits of the book were recognized at Delhi and other centres of learning in India and it was twice lithographed at Lucknow. Kazi Fakir Mahomed died in 1844 leaving three sons. The second was the Nawab Bahadur Abdool Luteef and the third and youngest Moulvi Abdool Ghafoor Khan Bahadur *Nassakh.**

Abdool Luteef was born in March 1828. He came to Calcutta at an early age and received his education at the Calcutta Madrasah, an institution to which he remained greatly attached to the end of his days and rendered very considerable service. On completing his education he accepted temporarily the post of Private Secretary to the Amir of Sind who was residing at Dum Dum as a political pensioner. He next officiated as a teacher at the Dacca Collegiate School. His next employment was with a Commission of Enquiry under Mr. Samuells, I.C.S. Shortly after he returned to Calcutta as Anglo-Arabic Professor at the Calcutta Madrasah. In March 1848 he was appointed Deputy Magistrate of the 24-Parganahs, in April 1852 invested with full Magisterial powers and in the following July made a Justice of the Peace for Bengal, Behar and Orissa. In 1853 he was promoted by Lord Dalhousie, in his capacity as Governor of Bengal, to a higher grade and placed in charge of the newly-formed Sub-division of Kalaroa. While there he was the first to bring to light and attempt to arrest the oppressions practised by the Indigo Planters on the rural population. This, as in well-known, eventually resulted in the closing of the numerous Indigo factories in Lower Bengal. After a year and a half's service here he was transferred to the turbulent Subdivision of Jahanabad which was in those days notorious for dacoities and the despair of the Government of Bengal. After a very successful administration of this troublesome Subdivision he was made a Deputy Collector and transferred to Alipur. On the eve of his transfer the leading landlords of the place headed by Babu Ramapershad Roy (the first Indian Judge of the Calcutta High Court) presented to him a farewell address—the first of such documents—expressing their gratitude for what he had done and regretting the severance of his official connection with the Sub-division. * From this time till his retirement from Government service which took place in 1884, he remained in

* Moulvi Abdool Ghafoor Khan Bahadur Deputy Collector is better known as *Nassakh* the oriental poet, literary critic & *tazkirah* writer. For an account of his life & work see *Wahshet's* articles, *Journal of the Moslem Institute* Vol. IV, No. I, and *Urdu-i-Moalla*, Vol. 9, Nos. 4 and 5. Also in *Sham Anjuman* by Nawab Sidiq Hasan Khan.

**See* The Englishman, 11th January, 1860.

Calcutta, discharging his magisterial duties sometimes in the Police Court at Alipur or at Sealdah, sometimes as a Presidency Magistrate at Calcutta. His promotion in the service was exceptionally rapid, for in less than thirteen years he found himself in the first grade. Thus for many years before his retirement he was at the top of the Bengal Excutive Service. On his retirement from Government Service the Secretary of State was pleased to grant him a special pension of Rs. 6000/ a year "in recognition of the exceptional value of his services." The best commentary on his career as a police magistrate is that Europeans brought up before him invariably waived their right to be tried by a Magistrate of their own nationality. One very remarkable fact connected with his official career may be mentioned here: during 36 years' service he was absent from work only for four months on sick leave.

In 1862 when the Legislative Councils were created Abdool Luteef was appointed a member of the Bengal Council, being the first Mahomedan ever appointed to any of the Legislatures, Local or Imperial. A contemporary writer thus describes his impressions:—

"Of Lieutenant-Governors, Bengal alone as yet possesses its own Parliament, and this machine being purely local in effect, it is but just that the interests of Bengal trade should have a powerful voice in its deliberations. A fitter member, therefore, than Mr. John Nult Bullen, as President of the Calcutta Commerce Chamber, could not have been selected. In this Council, Natives have as yet been chosen with almost equal wisdom, and among them one must here be mentioned. Moulvi Abdool Luteef, Khan Bahadur, a Mahomedan, as his name denotes, had won distinction as a classic jurist and supporter of British Institutions in Bengal, and Lord Elgin had availed himself of an early opportunity to appoint him to the Senate of the Calcutta University in the Faculty of Law. Of each successive honor his past conduct has well proved him worthy. Somewhat young in years, and younger still in looks, he never lacked detractors, covert and avowed; but in corrupt Bengal this can hardly be considered as matter for surprise, and all admitted to his intimacy must acknowledge that this keen Mussalman formed a valuable element in the Bengal Council, not only as a fluent native counterpoise to special Hindoo interests, so largely represented in that province but further, as a zealous advocate of well-considered Legislation." *

On two other occasions he was called to this Council. On the third occasion the Lieutenant-Governor in offering the office wrote to him as follows:—

"I do not think the Mahomedan community could be better represented

*See *The Company and the Crown* by the Hon'ble T. T. Howell-Thurlow, (afterwards Lord Thurlow) Private Secretary to Lord Elgin; Ed. 1866, pp. 63.

in the Legislative Council than by yourself." It has truly been remarked that "as a legislator he did more valuable work than almost any native member of either the Bengal Chamber or the Viceregal Council." One instance should suffice. The abolition of the posts of *Kazi-ul-Kuzat*, Mahomedan Law Officers and Town and Mofussal Kazis by Act XI of 1864 had dehrived a large number of Mahomedan gentlemen of the learned class of their appointment and in many cases the sole means of subsistence, and at the same time disestablished the one class of functionaries upon whom the Mussalman population relied for the preservation of a record of their marriages and divorces. Abdool Luteef's unceasing efforts culminated in the passing of the Bill for the Voluntary Registration of Mahomedan Marriages and Divorces.*

On the expiration of each term in the Legislature he received the special thanks of the head of the administration for the work done by him in the capacty of a councillor. Besides matters legislative "he was often consulted by Government as the most progressive and enlightened among the Mahomedans of Bengal whose interests he never ceased to urge."†

*Vide the Nawab Bahadur's *Minute* on the working of the Mahomedan Marriage Registration Act I (B.C.) of 1876 ; Cal. 1890.

†See *Dictionary of Indian Biography*, by C.E. Buckland, C.I.E., Lond., 1906. This is practically a quotation from Sir Richard Temple Bart, G.C.S.I.

The best years of Abdool Luteef's life were however spent in furthering the cause of Indian education and particularly the education of those who like him belonged to the Mahomedan religion. In 1852 and 1853 when the question of imparting English education to Mahomedan youths was engaging the attention of the late Council of Education he had the privilege of assisting them in no small a degree in solving the problem. All previous attempts to introduce English into the Calcutta Madrasah, in fact to impart English education to the Mahomedans of India had hopelessly failed but Abdool Luteef was determined to leave no stone unturned to convince his co-religionists of the folly of their action. "Finding the authorities timid and his countrymen unwilling even to listen to him, he hit upon the simple device of advertising a prize of Rs. 100 for the best essay in Persian on the advantages of English education to Mahomedan students." A discussion arose, indeed raged for a time among his co-religionists but the net result was that essays came in from every part of India, and when the tempest subsided it left behind a new Mahomedan party in Bengal. This new party it was the business of Abdool Luteef to develop into an effective power among his countrymen.*

*See *The Times* (Lond)., September 4, 1893. Mr. J. R. Colvin was the President of the Committee of Judges. As he was appointed Lieutenant-Governor of the N.W.P. (now the United Provinces of Agra and Oudh) before the essays were received, Sir Fredrick Halliday, Lieutenant

The enormous difficulties he encountered in his self-imposed task can best be gathered from what his life-long friend, Sir Ashley Eden, Lieutenant Governor of Bengal, once wrote to him : "I should like to take this opportunity of conveying to you my thanks......... and also my sense of the great benefits which you have conferred on your own co-religionists, by your constant endeavours to promote the cause of Mahomedan improvement, *in the face of great opposition.*"*

The Nawab Bahadur's service in the cause of education attracted the attention of the Viceroy as early as 1863 when Lord Elgin appointed him a Fellow of the Calcutta University. In offering the appointment on behalf of His Excellency, the Private Secretary wrote to him thus : "Your nomination to this body would be attended with benefit to the University and would be regarded by all as a public acknowledgment of the services which it has already been in your power to render to the encouragement of letters and to the promotion of the interests of general education."*

In 1853 he helped the authorities in establishing the Anglo-Persian Department of the Calcutta Madrasah. Shortly after he pressed upon Government the necessity of giving higher education to the Mussalman students than was afforded by the Anglo-Persian Department. The other communities had colleges of their own but there was no institution where Mahomedan students could prosecute their higher studies. It is not generally known that the Nawab Bahadur was instrumental in bringing about the establishment of the Presidency College at Calcutta.—an institution which has done considerable good to Hindus and Mahomedans alike—or that the now premier College in India was originally created to afford facilities for higher education to students belonging to the Mussalman community.* Shortly after this he took an active part under orders of Government in the reorganization of the Arabic Departments of the Calcutta and Hooghly Madrasahs and the establishment of a Boarding House for the students of the latter institution.†

For many years ere this Abdool Luteef had been impressing upon the authorities the necessity of utilising for Mahomedan education the princly endowment of Haji Mahomed Mohsin of Hooghly. This was being spent on the

---

Governor of Bengal and an oriental scholar of great repute considered the matter sufficiently important to take his place. The successful essayist was a Bombay teacher.

*See *A short account of my public life*, by Nawab Abdool Luteef Khan Bahadur ; Cal : 1885.

*Ibid.

*See the proceedings of the Laying of the Foundation stone by H. E. Lord Northbrook and the speech of the Nawab Bahadur delivered on that occasion : *The Indian Daily News*, March 1, 1873. Also *The Indian Echo*, February 6, 1885.

†*A Minute on the Hooghly Madrassah* by Moulvie Abdool Luteef Khan Bahadur ; Cal : 1877. Also *Mahomedan* Education in Bengal by the same writer ; Cal : 1868.

Hooghly College an institution chiefly resorted to by Hindu students. His unceasing efforts at last met with success and during the administration of H. E. Lord Northbrook the Mohsin funds were liberated and Madrasahs at Dacca, Chittagong, and Rajshahi were founded. A large number of scholarships for Mahomedans throughout Bengal were also created and it was found possible to pay from the fund two-thirds of the fees of all Mahomedan students prosecuting their studies in the College classes of the Province. * This was one of Abdool Luteef's greatest services to his community. Speaking of this service of the Nawab Bahadur's to his community a well-known Hindu gentleman declaimed in one of his speeches as follows : "I am a teacher of youth ; and I know something of the struggles of poor students...I am a daily witness of them ; and I will say this...that he who has helped to lighten the burden which presses * so heavily upon poor students is a benefactor of his race."

In 1883 he took advantage of the Marquis of Ripon's visit to the Calcutta Madrasah and used his influence in collecting over Rs.28,000 for founding a large number of permanent prizes and scholarships for the benefit of Mahomedan students passing the Entrance Examination of the Calcutta University.

* See *Journal of the Moslem Institute Vol* 1, No. IV. Also Mr. Syed Hosain's Prize Essay on Haji Mohd. Mohsin in *Bengal : Past and Present.*

(*1*) See *The speeches of Mr. Surendra Nath Banerjee* ; Calcutta.

With the objects of educating Mussalman public opinion, of quickening the interests of his co-religionists in western learning and progress and of affording them an opportunity of cultivating social and intellectual intercourse with Europeans and Hindus, Abdool Luteef founded in 1863...with the encouragement and co-operation of the then Viceroy Lord Elgin, the Mahomedan Literary Society of Calcutta. This association has been the parent of a large number of similar institutions all over India. Since its foundation up to the present moment it has been receiving the support and appreciation of the public as well as of the highest officials in the land. It was at the sixth monthly meeting of the Mahomedan Literary Society that the late lamented Sir (then Moulvi) Syed Ahmad Khan of Aligarh, then Principal Sadr Amin of Gazipure made his first appearance before the public in the role of an educationist and delivered a lecture in Persian on "Patriotism and the necessity of promoting knowledge in India." In the course of his speech Sir Syed referred to the subject of the present sketch in the following words : "Gentlemen, I would here record publicly the great kindness and hospitality which I have received from one of your body, who is, I may say, and I think you will endorse what I say, the chief flower in your blooming, thriving garden (I need scarcely mention his name as you have no doubt guessed it already), the Honourable Moulvi Abdool Luteef

Khan Bahadur, who reflects fame and distinction upon us, his co-religionists. Could my whole body become one vast tongue, were the hair of my head to unite in a chorus of praise, even then, gentlemen, words would fail to express my thanks."

The first Conversazione of the Society was the first socio-educational gathering of its kind in India. They have been for many years one of the most brilliant annual functions of the metropolis. The annual Conversazione of the society was till recently a regular institution in the capital of British India. His Royal Highness the Duke of Edinburgh attended the sixth annual Conversazione and was pleased to present the society with a photographic likeness of himself as a souvenir of his visit. His Majesty the King of Siam and some princes of his family attended the eighth annual conversazione in the company of the then Viceroy, Lord Mayo. Most of the ruling chiefs of India have not only attended this function but have also co-operated with the promoters by lending exhibits from time to time. Successive Viceroys, Commanders-in-Chief and Lieutenant-Governors have attended this annual gathering of the Society. When Sir John Lawrence was about to leave the Town Hall after staying for about an hour at the third Annual Conversazione of the Society on the 2nd March 1867, the Lieutenant-Governor, Sir Cecil Beadon, addressed the Viceroy to the following effect :—

" With your Excellency's permision I wish to take this occasion to bring formally to your notice the valuable services which have been rendered by Moulvie Abdool Luteef to the cause of Native Education, especially the education of those of Her Majesty's subjects who, like himself, profess the Mahomedan religion. The exertions of Moulvie Abdool Luteef in this cause have been constant and unwearied for many years and have been repeatedly recognized by the Government ; but I will now only allude especially to the intelligence which led him to conceive the idea of founding the Mahomedan Literary Society, and the steady perseverance with which he has organized it and brought it to its present condition of vitality and usefulness. The Society meets for the discussion of Literary and Scientific subjects, and is otherwise actively engaged in the encouragement of ancient and modern learning. It comprises about 500 members, and the example it has set has been followed as Your Excellency is aware, in other parts of India. The large numbers now assembled in this Hall to witness the display of experiments in Physical Science, carried on under the auspices of the Society, bear witness to the success of the movement and the general interest with which it is regarded. The credit is chiefly due to Moulvie Abdool Luteef, and I shall be very glad if your Excellency should deem him deserving of special approbation."

Sir John Lawrence then addressed Abdool Luteef in the following terms :—

"Moulvie Abdool Luteef,—It is with much pleasure that I comply with the wish of the Lieutenant-Governor by expressing my hearty approbation of your efforts, to which Sir Cecil Beadon has alluded and the great interest I take in them. I am satisfied that much good may result from such well-directed endeavours. This meeting is of itself an evidence that those efforts have not been in vain, calculated as it is to create an interest in Physical Science which may prove very valuable. It has been, and it will ever be, a pleasure to me to encourage in every way the friendly meet ing together of Europeans and Natives of all classes and creeds ; for I am sure that much benefit must ensue from such assemblies. You have my hearty good wishes for the extension and success of the Mahomedan Literary Society. It will afford me pleasure to bestow upon you, through the Lieutenant-Governor, a suitable token of my approbation of your services in this good cause."

The token alluded to by His Excellency took the form of a complete set of the *Encyclopaedia Britannica* with the following autograph inscription on the fly-leaf of the first volume :—

"Presented to Moulvie Abdoof Luteef in recognition of his services in promoting Native Education, especially the Education of those who like himself belong to the Mahomedan Religion.

John Lawrence, Governor-General.'

This was forwarded to Abdool Luteef with the following letter :—

No. 1893.

From S. C. Bayley, Esq.,

Offg. Secretary to the Government of Bengal.

To

Moulvie Abdool Luteef,

Khan Bahadur,

Fort William, the 23rd April, 1867.

Sir,

I am directed by the Lieutenant-Governor to present you with the accompanying Medal * and set of books (*The Encyclopædia Britannica*) in recognition of your public services in the cause of Education.

2. On the flyleaf of the first Volume of the *Encyclopædia* is an Autograph Inscription by His Excellency the Viceroy and Governor-General, setting forth the reasons for which this gift has been bestowed upon you.

3. A still more gratifying reward of your exertions consists in the desire now shown by the Mahomedans of Bengal for the acquisition of sound and useful knowledge, and their growing appreciation of Modern Science and the

* The following is the Inscription on the Gold Medal :—

"Presented by the Hon'ble Sir Cecil Beadon K. C. S. I. Lieutenant-Governor of Bengal, to Moulvie Abdool Luteef, Khan Bahadur. (1867)."

On the reverse :—

"In recognition of his services in promoting Education among the Mahomedans of Bengal."

Learning of the Western Nations.

4. By founding the Mahomedan Literary Society (a society which now comprises of nearly 500 members, and has become the parent of similar societies in other places), you have successfully led the Mahomedans, not only of Bengal, but of India generally, to look beyond the narrow bounds of their own system, and to explore those accumulated treasures of thought and feeling which are to be found embodied in the English Language; while by your active and reasonable exposition on many occasions, you have led them to form a just conception of the policy and intentions of the Government, and to express their opinions freely, not only on questions of Literary and Scientific interest, but on those affecting their own Social and Political condition and the general welfare of the Country.

5. In this way, you have materially promoted a good understanding between this class of the community and their rulers and fellow-subjects; and so far as the present altered state of feeling is owing to your active and liberal exertions, to the judicious exercise of your influence, and to the force of your example, the Lieutenant-Governor considers you entitled to the gratitude of your countrymen and the cordial acknowledgments of the Government.

I have etc.,

S. C. Bayley

Offg. Secretary to the Govt. of Bengal.

It did not take the Mahomedan Literary Society long to become a power in the land and its fame even travelled across the seas. In 1889 the well-known Professor Vambery of the Budapest University wrote, among other things as follows to the Nawab Bahadur:—

"As one who is deeply interested in the welfare and cultural development of the Mahomedan world, I have for a long time watched and paid the greatest attention to the activity of the Society created and led so admirably well by you, and I need scarcely say that I am much obliged to you for having afforded to me the opportunity of entering into relations with a man of your abilities, patriotism and true devotion to your nation........................and you sir, who leads that movement, you do certainly the best service to your nation and religion in encouraging the Mahomedans on the path of Western culture and sciences. I wished my age would permit me to visit India, for I have not yet given up the idea of delivering a few lectures in Persian, which I speak like my mother-language, to the Mahomedans of India, and if I come to India, I shall appear there under the patronage of your Society, trying to contribute a small stone to the noble building raised by your efforts." *

* See *Reis & Rayyat* September 7. 1889, & the daily papers of that date. It was about this proposed visit of his to India that Professor Vambery spoke to Mr. Sheikh Abdul Qadir of the *Punjab Observer* when the latter paid him a visit during his continental tour a few years ago: (see an account of the interview

The importance which Government still attaches to the work which is being done by the Mahomedan Literary Society of Calcutta may be gathered from the fact that Lord George Hamilton, the then Secretary of State for India, in the Debate on the Address in the House of Commons on the 18th February 1898, characterised the Society as "representing Mahomedan feeling in its best form both in Calcutta and throughout India." On a subsequent occasion His Lordship stated in Parliament that the Mahomedan Literary Society of Calcutta was a "great body which was well-known."

The views expressed by some recent Viceroys as to the importance and usefulness of the Mahomedan Literary Society and the praiseworthy exertions of its founder, late Nawab Bahadur, may not prove uninteresting to the readers.

Replying to the Farewell Address of the Society, His Excellency Lord Lansdowne, G.C.S.I., G.C.M.G., G.C.I.E., spoke among other things as follows on the 24th January, 1894:—

"During the last five years my relations with the Society have been of the most friendly character. I have been glad to give it any recognition which it was in my power to give, both on account of the importance which I attach to the principles upon which it was founded, and also on account of my sympathy and regard for many of its members with whom I have had the honour of being personally acquainted. Conspicuous amongst them was your late founder and Secretary, Nawab Bahadur Abdool Luteef, to whom you have referred in such feeling terms, and who has, alas! lately been taken from you. Let me take this opportunity of noticing the remarkable demonstration of the public feeling provoked by his death, and the manner in which testimony was borne to his many admirable qualities, not only by persons of his own faith, but by conspicuous representatives of almost every class and creed. Nawab Abdool Luteef owed his position not only to his official services, or to his connection with numerous public bodies or to the distinctions and decorations which had been bestowed upon him, but to the fact that he devoted his life to the promotion of two great principles-the encouragement of education amongst his Mahomedan fellow-subjects, and the promotion of confidence and good-will between those who professed his own religion and their Hindu and European neighbours. He recognized that we are, all of us, alike interested in advancing the prosperity of this great Empire, and in securing its good government. In these days, when strained relations have, as you have reminded me in your address, unfortunately arisen in many parts of India between Hindus and Mahomedans, too much importance

in the *Makhzan*). It may be mentioned here that Professor Vambery has given a very prominent place to the Nawab Bahadur in his recent publication *Western Culture in Eastern Lands*.

cannot be attached to the services of men, who like the late Nawab, throughout their lives, inculcated upon us the value of harmonious action and mutual good-will. It is most satisfactory to me to learn that your Society regards with approbation what I have said in public upon this most important subject."

The following is an extract from the reply of His Excellency Lord Elgin to the address of welcome presented by the Society on the 6th February, 1894 :—

" The address which you have been so good as to present to me, the cordial terms of which, I desire sincerely to reciprocate, derives additional interest from the circumstance to which you call attention, that the Mahomedan Literary Society of Calcutta was founded at the time when my father held the high office to which I have had the honour of being appointed by Her Majesty. It was I think one of the characteristics of his administration of public affairs that he lost no opportunity of encouraging the spread of education and increasing the means of the diffusion of culture and knowledge, and I am convinced that it must have been a satisfaction to him to co-operate with the distinguished founder of your Society, the Nawab Abdool Luteef, whose own ability and learning is well-known, in a work calculated to promote intellectual, moral and social advancement of this important section of the Community. It is naturally nothing but a pleasure to me to think that I may be permitted to take up the work thus begun—and I hope and expect to find that the labour of our predecessors has not been thrown away. "

In his reply to the Society's Farewell Address presented on the 31st December, 1898. His Excellency Lord Elgin referred to the Annual Conversaziones in the following terms :— " I turn for a moment to the more personal and social side of our relations, and I desire to assure you that I look back with pleasure on the occasions on which you have been good enough to invite me to the entertainments of your Society in the Town Hall. These entertainments serve a useful purpose, both in the varied character of the amusing and instructive sights which are prepared for us, and in the assembling together of those who otherwise might not find it easy to meet in friendly intercourse. I shall not forget these occasions, and I hope you will be able to continue them in the years to come.

His Excellency Lord Curzon's reply to the address of welcome presented by the Society on the 13th January, 1899, is considered to be one of the best speeches he delivered in India. In the course of it he said :—

" I am acquainted with the history of your Society, which indeed is only a little younger in years than myself, and with the admirable exertions of your late founder."

On the 22nd December, 1905, His Excellency Lord Minto received an

address of Welcome from the Mahomedan Literary Society of Calcutta. In his reply His Excellency said, among other things, as follows :-

"I am well aware of the excellent work which has been done by your Society since it was founded nearly fifty years ago by its distinguished Secretary, Nawab Bahadur Abdool Luteef, to whom not only the Mahomedan population, but the whole thinking community of India, owe a debt of gratitude, for I believe, gentlemen, that efforts such as his—efforts your Society has so ably supported—though devoted primarily to Mahomedan interests, cannot but shed a beneficial light on all educational questions, and will prove a guiding star to many, no matter of what race or creed who are striving their best to raise India. Dissociated as your society is from the struggles of political warfare, you can claim nevertheless to have done much already to direct the higher life of the people on broad lines, which whilst affectionately guarding the wealth of your own oriental literature, have at the same time recognised the value of western Education in the solution of the many problems surrounding the development of modern culture and civilization. Much has, I know been done directly through Mahomedan effort. The college at Aligarh, the noble work of Sir Syed Ahmed Khan, will always bear evidence of broadminded Mussalman thought, and the recent movement for the encouragement of the study of Arabic given further proof of a care for Eastern culture. But from the point of view of an adminstrator, from which perhaps I naturally address you, the highest value of your efforts would appear to be deeply based on the example you are so ably demonstrating of a liberal appreciation of the combined Educational advantages of the East and the West. Aims such as yours have well deserved the confidence and the appreciation they have always received from Government, and I feel that I may rest assured of receiving from you the able assistance and advice which your society is so competent to give—It will be a great pleasure to me to continue to the Mahomedan Literary Society of Calcutta the confidence which my predecessors have always so gladly bestowed upon them."

The Mahomedan Literary Society of Calcutta was the first public body in India to present Addresses to Royalty on appropriate occasions. The Society has been the recipient of gracious acknowledgments the last of which, it may not perhaps be out of place to quote here. The following gracious message was sent to Nawab (then Mr.) A. F. M. Abdur Rahman, Khan Bahadur, the eldest son of the Nawab Bahadur, and the present Secretary of Mahomedan Literary Society, by his Majesty King George V on the occasion of his visit to this country as Prince of Wales a few years ago :—

"The Princess of Wales and I are greatly touched by the kind words of

your letter of the 5th instant, to Sir Walter Lawrence, and sincerely thank the members of the Mahomedan Literary Society of Calcutta for their hearty welcome to the Metropolis of the British Empire in India to which it gives expression.

"As you truly say, we have been received everywhere throughout our interesting journey with sincere and affectionate enthusiasm, and have received unbounded proofs of devoted loyalty to the Crown. And it is specially gratifying to hear from the Mahomedan Literary Society of Calcutta that the "reanimated sense of personal fealty" which as the Society thirty years ago assured my dear father had dawned over all classes, is now so amply extended to us."

"To receive from such an important community an expression of grateful appreciation of British rule over an empire broad-based on the will of a happy and contented people, and a generous recognition of that unity of races which it has accomplished, is an assurance which we shall always value. It will inspire an ever recurring and refreshing thought, and serve to knit our hearts still more closely to the peoples of India in days to come when thousands of miles separate us from this great Continent."

But to return to the subject. In 1870 when there was considerable excitement among the ignorant classes of Mahomedans owing to the Wahabi movement and the matter was engaging the earnest attention of Government, the Nawab Bahadur induced one of the most eminent and influential preachers of the day Mowlana Keramat Ali of Jownpur to deliver a lecture before the Mahomedan Literary Society on "The Duty of the Mahomedans in British India towards the Ruling Power." *

Thousands of copies of this lecture were circulated throughout India and Sir E. C. Bayley wrote to Abdool Luteef that Lord Mayo had expressed himself pleased with his efforts to calm the excited feelings among the Mahomedans of Lower India.

On the out-break of hostilities between Turkey and the States of Servia in 1876 Abdool Luteef, at considerable risk to his official position, convened a monster meeting of the Mahomedans of Calcutta at the Town Hall, presided over it and devised means for raising funds in aid of the Turkish wounded as well as for the submission of a Memorial on behalf of her Mahomedan subjects to Her Majesty the Queen requesting her to extend her support to His Imperial Majesty the Sultan of Turkey. It was one of the largest and most representative meetings ever held at the Calcutta Town Hall and those who had the opportunity of attending it, still remember the great

* See Hunter's *Indian Mussalmans*. Also Proceedings of the meeting: Cal. Erasmus Jones, 1871.

speech delivered by the Nawab Bahadur on that occasion. The movement was followed up by similar demonstrations in other parts of India. The Turkish authorities in their official correspondence regarded Abdool Luteef as the recognized representative of Islam in India. He received among others the following letter of thanks from the Turkish Government* :—

Sir,—The amount of subscription for the families and orphans of the soldiers of the army of His Imperial Majesty the Sultan, killed in the late war in Servia and for the wounded which had been collected and remitted by you, has been received in full and made over to the Special Committee for the purpose of distribution to those who were deserving of the same. Your energetic efforts, prompted chiefly by your religious zeal, have afforded great pleasure to all the Ministers of the Ottoman Government, and have been a source of special satisfaction to me. The amount remitted by you has not only alleviated the sufferings of the indigent and needy, but those who have received shares of this relief, have, on finding that in the far distant regions of India, there are persons professing their own religion who feel sympathy for them in their distress, and who have applied the ointment of consolation to their wounds, inflicted by the enemies of the Moslem faith, while receiving their shares expressed their deep gratitude with tears of thankfulness in their eyes. I therefore pray to God, who helps all those that believe in Him, that He may bless your exertions, and that you may receive ample reward for the same in this world and the next.

Ibrahim Edham—Grand Wazir.

In recognition of these services to his faith, the Sultan conferred on Abdool Luteef the Imperial Order of the Medjidie, this being the first instance on which an Indian was so honoured.

As an instance of the confidence reposed in Abdool Luteef's ability and judgment by Government, it may be mentioned that in 1873 when Lord Northbrook was asked by the Secretary of State for India to send a few qualified Indians to give evidence before a Select Committee of Parliament appointed to enquire into the finances of India, he was invited by His Excellency to proceed to England for the purpose. Every arrangement had been made, even a successor nominated, but before he could start from Calcutta the whole plan fell through on the dissolution of Parliament early in 1874.

In January 1877 Lord Lytton conferred on Abdool Luteef the title of "Khan Bahadur" and presented him with an "Empress Medal" on the occasion of the Imperial Assemblage at Delhi. His Excellency followed this up in April 1880 by bestowing on him the title of "Nawab." On the 1st of January

* See *The war* by E. E. Wyman, Cal., 1877.

1883 the Marquis of Ripon honoured him with a " C. I. E. " In 1887 on he occasion of the Jubilee of Her Majesty Queen Victoria, he was made a " Nawab Bahadur "—the highest Indian title to which a Mahomedan can aspire. " The British Government gave him what it had to give in the shape of titles and honours, but it was as a Mahomedan who led forth his countrymen into new fields of achievement and new realms of knowledge, without losing his own orthodoxy that Abdool Luteef has won his place in Indian history.* "

In December 1885 at the request of the late lamented Sis Lepel Griffin K. C. S. I., Agent to the Governor-General in Central India, the Nawab Bahadur left Calcutta at a day's notice to take up the temporary charge of the office of Prime Minister of Bhopal. On his retirement from Bhopal the Agent conveyed to him the following remarks from the Secretary to the Foreign Department † of the Government of India :—" I am to request you to inform Nawab Abdool Luteef that the services which he has rendered to the Bhopal State under trying and difficult circumstances, are fully appreciated by the Government of India. His Excellency the Viceroy has consented to appoint an English Minister in his place ; but this appointment involves no disapproval of the Nawab's action, which appears to His Excellency to have been marked by ability and uprightness. Nawab Abdool Luteef will leave the Bhopal State with a reputation, not only unimpaired but increased by the occurrences of the last few months."

Whatever movement, we are told, has been started or established in Calcutta with a view to the general improvement of the Community, Moulvie Abdool Luteef, Khan Bahadur has either been the originator or the chief promoter of it. A list of the honorary offices held by the Nawab Bahadur and the public bodies to which he belonged, would make a small booklet in itself. Only a few may be mentioned here. As a member of Philological Commitee of the Asiatic Society of Bengal, as a member and trustee of the Indian Association for the Cultivation of Science and of the District Charitable Society he did substantial work. For his services as Municipal Commissioner for Calcutta and its Suburbs, and Chairman of the North Suburban Municipality, two new roads in Calcutta and Belgharia were named after him and votes of thanks recorded in his favour. He was instrumental in the establishment of the Alipur Reformatory for Juvenile Offenders and had a seat on its Board of Management. He was the first Mahomedan to be appointed to the Board of Examiners for the Civil and Military Services. He was one of the most important

* See *The Times*, Lond., Sept. 4, 1893.

† See *A short account of my Public Life* by Nawab Abdool Luteef, Khan Bahadur, Cal., 1885.

members of the Bengal Social Science Association and more than once acted as its Honorary Secretary and saved the institution from falling into pieces. He served on many Government Commissions of wide and far-reaching importance. He was also member of the Executive Committee of the Countess of Dufferin Fund, member of the Council of the Bengal Branch of the National Indian Association, member of the Directing Council of the Scientific Society of Aligarh, Member and Secretary of the Committee for the management of Calcutta and Hooghly Madrasah and Trustee of the Albert Temple of Science.

Dr. Shambhu Chandra Mookherjee described him thus :—

" He was present at every public ceremony or demonstration of any of the several communities in the country or of the general community. On such occasions he represented his fellow Islamites well, usually making a short speech. That was no public meeting which Abdool Luteef did not attend : that was no-Committee of which Abdool Luteef was not one : there was no social, educational, or learned institution of which Abdool Luteef was not a member. He was nobody in Calcutta whom Abdool Luteef did not know. He not only knew the members of the different creeds, races and tribes, but knew them intimately. He was everybody's friend —not in the vain, conventional way, but with a genuine desire to help all who approached him. He was at home with all peoples classes, ready to the call of each, sympathising with each, in joy as in sorrow. So it was all through the Empire. He had been to all its Provinces and great cities and made friends with their notable men. No other man was so well-known throughout the vast continent. All over Eastern and Northern India, from Dacca to Delhi, in all the great cities of Rajputana and Central India,and Guzerat in Bombay and Madras, in Hyderabad and Mysore, and all down the peninsula to Madura there is not a man of any pretensions who did not know him or of him. At Patna and Benares and Lucknow and Rampore and Agra and Delhi, at Bhopal and Gwalior and Alwar and Ajmere, at Hyderabad or in Mysore, his name was a household word. He was the only Bengali who was best and most widely known out of Bengal. Thus with his fine healthy nature and his infinite tact, he was enabled to do, directly and indirectly, more good to the land than dozens of men could effect. The pleasure and happiness he contributed to the world by his social qualities was obvious even to the blind and simply incalculable. *" A recent writer says : " The Mahomedan Community owes a debt of gratitude to Nawab Abdool Luteef Bahadur which it behoves it never to forget—To Nawab Abdool Luteef will always remain the honour of having been among the first to point out the road of progress along

which the Mahomedan Community has since made such great strides."

The Right Honourable the Marquis of Ripon once wrote to him to say that "the Government of India has not had a more faithful, zealous and loyal servant than yourself and I congratulate you on your long and honourable career. * "

Another well-known writer wrote thus of him :—"He was altogether a very remarkable man in many ways. Since his death in 1893, his place, in his community can hardly be said to have been exactly filled.† "

The Nawab Bahadur felt unwell on returning home one day in April 1893, after delivering a lecture at the Madrasah College, and called in medical advice. In the beginning of May his condition became very critical but he rallied and was declared almost cured. He continued fairly well till Monday the 10th July when there was a sudden relapse to which he succumbed at 2-30 p.m. In spite of the shortness of time the news spread so rapidly that thousands and thousands of Mahomedans and a large number of his European and Hindu friends followed his remains to the family burial ground where they were committed to their last resting place the same evening at 7 p.m. All Government and private schools and colleges in Calcutta were closed the next day in honour of his memory. Meetings were held at various places in Calcutta and in all important towns of Bengal to do honour to his memory.

On the 11th of August following a public meeting of the citizens of Calcutta was held at the Town Hall to consider what steps should be taken to perpetuate the Nawab Bahadur's memory. The Meeting was presided over by Sir W. Comer Petheram Kt., Chief Justice of Bengal and was one of the most largely attended and influential meetings ever held in that historic building. Sir Henry Cotton (then Chief Secretary to the Government of Bengal) testified both on behalf of Government and the people to the many valuable public services rendered by the Nawab Bahadur during his long and honourable career and the general sense of sorrow which had been felt at his death. "It will be long," he said, "before we forget his dignified appearance and courteous charm of manner, his wise and friendly counsels, his judicious action on all questions of public policy, his loyal assistance to Government on all occasions and, above all, his admirable and incomparable zeal in furthering the interests of his own countrymen.*" Several leaders of the Hindu community testified to the

* *Glimpses of Bengal*, by Claude Campbell, Cal., Campbell and Medland.

† Bengal Under the Lieutenant-Governors; by C. E. Buckland, C. I. E., Cal., 1901.

* *Sir Henry Cotton's Indian Speeches.* Calcutta, S. K. Lahiri & Co.,

popularity of the Nawab Bahadur in Hindu Society. "The late Nawab Bahadur," said one of the speakers, "was a familiar figure at Hindu gatherings and social parties. He was the guide, philosopher and friend of many a head of a Hindu family. He had, so to speak, been adopted into the bosom of many Hindu families. If there was one creed more than another which was the creed of his heart and of his affection, which he lovingly cherished and devoutly followed, which he earnestly invited his co-religionists to accept—it was this—that Hindus and Mahomedans should live together in peace, and amity and concord, and in the cultivation of those mutual charities which contribute alike to the happiness of the people and the purposes of an enlightened and beneficent administration.*" An influential Committee was formed for collecting subscriptions for a suitable memorial in honour of the Nawab Bahadur, under the Chairmanship of the Maharajah Bahadur Sir Jotindra Mohun Tagore K.C.S.I. A large sum of money was collected and it was made over to the Director of Public Instruction, Bengal, for the purposes of the Elliott Madrasah Hostel under certain conditions. The Government of Bengal accepted the offer of the Memorial Committee and ordered that the Western wing of the upper story of the new Hostel be called after the late Nawab Bahadur, and that a memorial tablet be placed in a conspicuous position in the Memorial Wing. The inscription of the tablet was settled by Sir Charles Elliott K.C.S.I., Lieutenant-Governor of Bengal and was approved of by his successor Sir Alexander Mackenzie K.C.S.I. Sir Alexander Mackenzie further allowed the Committee of the Mahomedan Literary Society to nominate sixteen boarders who should belong to the better class of the Mahomedans for accommodation in the Memorial wing. The Memorial tablet was unveiled by Sir John Woodburn K.C.S.I., Lieutenant-Governor on the 13th August 1898. In doing so His Honour spoke, among other things, as follows:..."I am very glad to think that the name of my old friend, Nawab Abdool Luteef is associated with a wing of this building. His services to the Mahomedan Community were only a part of the services he rendered to his country. I think his many friends and admirers have decided well in making a wing of the institution a memorial to his honoured name, because it is an institution characterized by that spirit of benevolence which was the idea of his whole life." The inscription, at the head of which are the Medals and Orders possessed by the deceased, runs as follows :—

With the concurrence of
The Government of Bengal

* The speaker was Mr. Surendra Nath Banerjee. It may not perhaps be out of place to quote here what the Hindu Patriot once wrote (June 7, 1880):—"The Nawab though a Mahomedan, is not less part and parcel of Hindu Society." Moulvie Saheb's name "is a household word with many a Hindu family.

this Tablet
is erected by the Memorial Committee
to the memory of
A great benefactor of the
Mahomedans of Bengal
Nawab Bahadur Abdool Luteef, C.I.E.,
in grateful commemoration of his
lifelong services in the encouragement of
Western and Oriental Education among
his co-religionists and his
warm interest in
the Calcutta Madrasah and Hostel.
He was foremost in every good work
calculated to promote the moral,
Social and intellectual advancement of
the Mahomedans of India.
Born, March, 1828 : Died 10th July 1893.

FROM THE NORTH POLE TO THE ISLES OF THE SOUTH.

(*Continued from page 25 of last issue*).

Three great wars stand out as prominent landmarks in that period of Hindu history which, in the absence of recorded dates and purely historical compositions, western scholars have felt compelled to characterise as legendary. In each the supremacy of Brahmanism was assailed by the rebellious spirit begotten of a preference for the old rough and ready Aryan civilisation, but from each of these struggles Brahmanism emerged triumphant. The Deva-Asura of the Treta Yuga resulted, we have seen, in the expulsion of the worshippers of Ahura from Indian soil and their migration to Iran. The Brahman-Khattriya war of the next age or Treta led to the Eastern Himalayas and the Mongoloid countries of Eastern India, as far as Pragyotisha or Kamrup. The great war of the Mahabharata was likewise followed by the migration of vast bodies of Khattriyas who, unwilling to bear the predominance of the Pandavas and their ally Srikrishna, crossed the north-western passes and disappeared for ever from the view of their countrymen. Pockocke devoted a life-time to prove that these expelled Khattriyas were the Pelasgians of the Mycenian age and his conclusion was at one time accepted as mainly correct by scholars more renowned than Pockocke himself. Universal Hindu tradition also says that after the death of Srikrishna, some of his descendants migrated to Sakadwipa (or Central Asia) and founded Bajrapuri; and it seems to be the opinion of Rai Sarat Chandra Das Bahadur of Thibetan fame that Yudisthira himself, at the end of his reign, retired into Thibet where he was made King by the unanimous voice of the people. But these northern migrations as also the supposed colonisation of Egypt from Sindh before the Great war do not come within the purview of the present paper and I shall not therefore pursue them further.

The immense diminution in the military strength of the country caused

by the Great war and the subsequent migrations was followed by some centuries of exhaustion or political lethargy during which no great empire was formed, but princes, great and small, Aryan and non-Aryan, ruled and fought in every part of India. Jejune Brahmanical learning alone flourished in this general decadence of warlike prowess and political ambition. The Hindu Kings of this age, as of all later ages, took as their models the great heroes of the epics and largely patronised the Brahmanical sacrifices to facilitate the performance of which Sutra manuals were composed towards the end of this period. But the most important work of the eight centuries between the Kurukshetra war and the advent of Buddha was the thorough organisation of the more advanced among the Dravidians of the south and their preparation for taking that part in the spread of Indo-Aryan civilisation and religion, which the Turks of a much later age took in the propagation of Islam. The small bodies of pure Aryans from the north that had settled in the previous age in Kalinga, Trikalinga or Andhra and possibly also in Dravida or the Tamil country, seem to have been merged in the mass of the non-Aryan population; and the extant Manava Dharma Sastra which, we have reason to believe, was based on a Mana Dharma Sutra composed in the latter part of this age, is probably right when it says that the Andhras and Dravidas were fallen Khattriyas. But Brahmans and Khattriyas grew in the ranks of the Dravidians themselves; the north-Indian *tirthas* and cities were reduplicated in the south, and the great sacrifices and feasts to which learned and pious Brahmans from all parts of India were invited, as well as the Swaymbaras of royal princesses which used to be attended by princes from all parts of the Hindu world, (besides matrimonial and political alliances between Aryan and Dravidian sovereigns), contributed not a little to engender and foster that sense of Hindu solidarity in consequence of which all feeling of racial difference disappeared and the non-Aryans of the south came to regard the glories of their instructors in civilisation and religion as their own. But the influence exerted by the Dravidian on his Aryan brother, especially in navigation and foreign trade, was no less pronounced. Professor Rhys Davids has shown that in the 8th century, B.C., Dravidians trading to the countries on the Persian Gulf brought from thence the Phoenician writing which they introduced into Southern India, from which, in the next century, the knowledge of it spread to the north. In times equally early, their kinsmen on the eastern coast were remarkable as bold sailors and adventurous traders in the Bay of Bengal and the Southern Burmese coast. The example of their success on the sea, no less than the nearness of the sea to their countries,

powerfully attracted the Angas and Vangas to a life of maritime adventure, and when in the middle of the seventh century, B.C. the period of dated history may be said to begin, adventurers belonging to these nations and the Kalingas and Andhras are disclosed to view as the pioneers, by land and sea, of Hindu colonisation in Ceylon, the Trans-Gangetic Peninsula and the Indian Archipelago.

No express mention is found in the Puranas of this outburst of colonial activity, nor do the chronicles of the countries to which the Hindus carried their civilising mission throw light on the cause or causes that gave rise to this spirit of colonial enterprise beyond the bounds of India. At the same time it cannot be maintained with any show of reason that all possibilities of colonisation and expansion within the limits of India had been exhausted, for, vast tracts in the country were still covered with forests or inhabited by primitive races not far removed from savagery. In all ages of Hindu independence, not excepting this or the age of Rajput ascendency to which a reference has been made in a previous part of this paper, these parts of the country have been exploited for political purposes by disinherited or ambitious scions of princely families, daring robber-chieftains or by tribes or parts of tribes expelled from their abodes in consequence of tribal dissensions. There is therefore no other way of accounting for this expansion of the Hindu race into regions beyond the sea except by relying on reasonable conjecture. Some basis for conjecture is furnished by the evidence of literary history which shows that the centuries immediately preceding the birth of Buddhism were characterised by an intense practical spirit which found vent in the open-eyed philosophy of Kapila. Hindu society appears to have revived at this time from the death-like trance into which it had been thrown for centuries by the Kurukshetra war; and the fanciful accounts of Ceylon and the eastern regions inserted in the Puranas, which were put into their present shape in the Gupta period, would seem to indicate that sailors and traders belonging to the energetic maritime nations of the eastern sea-board and also Saurasthra or Guzrat were bringing back stories of the savage races which in those days lived in Ceylon, South Eastern Asia and the islands. Popular imagination must have magnified these foreign countries as the abodes of demons, of cannibals, of men with one eye or one foot or ears large enough to cover the whole face; and the tradition of the Pandava conquest of these countries must have powerfully excited Hindu princes whose constant endeavour was to emulate the exploits of those by-gone heroes. As a matter of fact, the Hindus were now about to transfer their civilising activities to countries inhabited by Mongolians and Malayans. Into all these countries

Brahmanism went first, Buddhism next; and the latter religion has so effectually obscured all traces of the former as to make it exceedingly difficult to disentangle their different contributions to the civilisations of these countries. For obvious reasons of space, I shall confine myself mainly to a brief account of the work of Brahmanism in each of these countries beginning for the sake of facility of exposition, with Ceylon, though chronologically, Ceylon does not appear to have been the first country to be colonised.

The earliest traditions of the Sinhalese regarding their island are preserved in the Dipavansa and the later and more celebrated work, the Mahavansa dating from the 5th century, A.D. Both these works are altogether unware of the Brahmanical tradition of the conquest of the island by Sri Ram Chandra. But it would be unfair to conclude from this that the story of Rama's exploit is wholly mythical. For, though the Mahavansa says that the country was originally peopled by Savage Zakhos and Nagas, yet from stray passages it appears that these people had some form of Government under chiefs or a supreme chief and that the Naga king had a throne set with gems. These and other indications would seem to show that the country must have relapsed into barbarism after a brief period of civilisation during which its communication with India was maintained. According to the Mahavanso, however, the Hindu colonisation of the island dates from the landing of Vijay in the year in whic Buddha attained Nirvana. The story of Vijay is thus given in the Mahavansa:—

Sinhabahu, ruler of the Vangas in Lala or Rarh (near the Gandaki), had a son named Vijoy who was descended on his mother's side from the royal house of Kalinga. Prince Vijoy committed so many acts of fraud and violence that the people complained of him to the King and demanded his execution. The King, however, caused the heads of Vijoy and his 700 companions to be shaved as a sign of punishment. The prince and his companions were then placed on board a ship and sent adrift in the Bay of Bengal. Vijoy seems to have tried to land near Tamraparni, the modern Tinnevelly district, but failing in this, he went to Ceylon. To the part of the island where he first landed he gave the name of Tamraparni which was afterwards extended to the whole island. He then married the daughter of a Zakho chief and with her help slew the principal chiefs of the country at a marriage feast and made himself king. Discarding his Zakho wife, he married a Pandayan princess from the opposite coast but had no children by her. In his old age he wrote to his father to send his younger brother to succeed him on the throne. His father was dead, but prince Panduvasa, the youngest grandson of the dead king, was sent

to Ceylon.

Panduvasa married a Tamil princess from India. Her seven brothers came with her and founded principalities in the island. One of them founded Anuradhapur, the later capital whose ruins still attract tourists. Panduvasa was succeded by his son Abhoy and the latter by his nephew Pandukabhoya. The grandson of Pandukabhoya was Tisshya, at whose solicitation, the great Maurya Emperor Asoka sent prince Mahendra and princess Sanghamitra to convert the island to Buddhism. The life-long labours of these royal missionaries were rewarded with the conversion of the entire country to the new faith. In after times, the Tamils or Dravidas, who were fervent worshippers of Siva and hated Buddhists with a burning hatred, made frequent descents on the island and carried their devastations far and wide. As a result of their invasions, a large Tamil population, professing the Hindu religion, was deposited in the north-eastern and central parts of the island. But it is to the early Hindu colonists that the Sinhalese are indebted for the name of their race and their country, their language and their first start in civilisation. The early colonists constructed cities, temples and tanks as large as lakes which still excite wonder. From Megasthenes, during whose residence in India Ceylon was a Hindu kingdom, we learn that Taprobane produced gold, large pearls and elephants larger than those found in India; and a later Greek writer, who presumably derived his information from the account of Megasthenes, says that the elephants used to be transported in boats built for the purpose and sold to the king of Kalinga. In social matters too, the influence of the early Hindu conquerors was profound and far-reaching; for so deeply did they implant the caste-system among the pure Sinhalese that in spite of later Buddhistic teachings to the contrary and in defiance of the efforts of the Portugeese, Dutch and British Governments to discountenance and extinguish it, no appreciable progress has yet been made towards its modification or abandonment.

The colonisation of Burma preceded that of Ceylon. A critical examination of the Maharajweng or the chronicle of the Burmese Kings shows that, long before Buddha, a Kshattriya prince of Gangetic India of the name of Abhi or Abhoya, led an army through Eastern Bengal and Manipur, and subjugating the rude Mongoloid tribes that inhabited the country of the Middle Irawady, founded, on the eastern bank of the river, the city of Tagaung. The Kshattriya settlers appear to have begun the work of civilising the natives by teaching them the cultivation of the cotton plant and spinning and weaving. But the Aryan colonists were few and were lost before long in the Mongolian population; not however, before they had united the tribes into a nation and given them and their country their own

caste-title of Varma. Varma is now written Meramma and pronounced Bama. The Maharajaweng tells as that the Kshattriya colonists spoke in Sanskrit and the tradition is borne out if we bear in mind the time of their arrival which was anterior to Buddha and also the fact that not a few Sanskrit words occur in Burmese without any connection with Buddhism. Thirty-three Kings are said to have reigned at Tagaung; but from the fact that Buddhist images, bricks stamped with the effigy of Buddha and Pali inscriptions in ancient Devanagari character have been discovered in its ruins, it would seem that, towards the close of the dynasty, said to have been overthrown by foreign invasion, Buddhism must have made its appearance at Tagaung.

Burmese tradition tells of the arrival of a second band of Kshattriya colonists under the leadership of Daja (or Dhaja) Raja during the life-time of Buddha. It would seen that they too were Hindus and not Buddhists, for Buddhism was confined to a few only during the life-time of its founder. All that we know of them, however, amounts to very little. Daja Raja is said to have married the widow of the last king of Tagaung and built the city of Pagan near the old capital. The dynasty of 17 kings founded by Daja Raja was overthrown by civil war but a descendant of the last king migrated southward along the Irawady and established the kingdom of Prome of which Tharekhetara or Srikshetra became the capital. The later kings of Burma derived their descent from the kings of Prome.

Among the Hindu contributions to the civilisation of the Burmese may be mentioned, besides those stated above, the Burmese alphabet which is essentially based on the Devanagari. The Burmese system of astronomy and the method of computing time were also derived from Indian Hindus. The Hindu custom of having a Yuvaraja or Second King was adopted by the Burmese as also by other Indo-chinese nations. The Burmese literature too has been greatly enriched by translations from the Sanskrit, *e.g.*, Thammasat Menu, Lokasara, Brahmesara, Hitopodesa. The adventures of Rama and the Pandava brothers are still the favourite topics in their dramas.

Of Arakan only a few words need be said. The natives call their country Rukhaing or the land of the Rakshas. To the Hindus also it was known as Rakho or Zakhodesa and also as Rajatabhumi or the Silver country. Ptolemy called it Argyre. The chronicles of Arakan derive the race from the elder son of Raja Abhoy, the founder of the Indo-Burmese monarchy at Tagaung, and claim that the Arakenese are the elder branch of the Burmese. The Burmese admit the claim which is also confirmed by the evidence of ethnology and language. The literature of both

peoples is the same and the course of civilisation in both countries has been similar, first Hindu, then Buddhistic. But Arakan appears to have shown greater propensity to Brahmanical doctrines. From coins with Hindu symbols found in the country, it is fairly certain that under the kings of the Chandra dynasty Arakan was for one-hundred and sixty-nine years a Hindu kingdom. Buddhists from Magadha seem to have ruled in Arakan for some time, from which Bengalis have given the Arakanese the name of Magh.

Pegu is the Suvarna Bhumi or Gold country of Brahmanical and Buddhistic tradition, the Khryse or Golden Kherso-nese of Ptolemy. Hindu traders preceded Hindu princes in the colonisation of Pegu. In times anterior to Buddha, Telegu traders from the lower courses of the Krishna and the Godavery crossed the sea and formed settlements in the delta of the Irawady and on the neighbouring coast. The natives were Rakshashas or savages, but there was gold in the soil and the metal seems to have been also exported from south-western China down the Irawady into India. According to the Talaing chronicles, Prince Tishya, of Kornata, a contemporary of Buddha, was the first Hindu Prince who came to the land and built the city of Thatun or Subarna Bhumi, whose ruins still exist. The natives seem to have been early civilised under the Karnata dynasty but the Indian colonists, were merged in the Mongolian population and adopted from them the national name of Mon. In the 3rd century, B.C., the missionaries Sono and Uttora were sent by the Emperor Asoka to preach Buddhism in Suvarna Bhumi. The new religion was at first violently opposed but ultimately spread in the valley and in time penetrated to Burma and Arakan. During a later revival of Brahmanism in Pegu, it was called the Ramanyadesa. In the eleventh century king Aniruddha of Burma conquered Pegu and since then it has formed a part of Burma.

The colonisation of Cambodia brings us to a date near the beginning of the Christian era. Kamboja adventurers from the country round Takkasila, to the northwest of modern Rawalpindi, appear to have started from a port in Saurastra or Guzrat, and eventually founded a kingdom bearing their name in the south-eastern corner of Asia, with Indraprasthapuri for their capital. The present natives of the country still call themselves *kan-pu-chi*, which is evidently a corruption of Kamboja, but the name of the capital was changed long ago into Ankur. The kings of Cambodia ruled despotically; the caste-system was maintained in all its rigour; and the enslaved aboriginal population was forced to labour in the construction of great walled cities, vast temples and palaces, stone bridges and artificial lakes enclosed by walls of cut stone. The colonists rapidly extended their power and founded principalities which they

called Champa (Cochin China), Anima (Annam) and Shyam or Dwaravati (Siam). They built Ajodhya, the old capital of Siam and forced Brahmanism upon the people of this as of every other part of their empire. But as time wore on, Northern Buddhism found its way into this Hindu colony. For centuries, however, down to the 14th, the Siamese, Annamese and Cochin Chinese remained tributary to the powerful Cambodian empire. But intestine divisions and the growth of Siamese power completed its ruin and the fame of this once great people now lives in the stupendous ruins of Ankur, some faint idea of which may be formed from the following brief description :—

"About 15 miles north of the great lake, buried in forest, is the ancient capital, commonly called Ankur. Its walls from a quadrangle of nearly eight and half miles in circuit, and thirty feet in height, surrounded by a very wide ditch. There are five gates of very grand architecture. About five miles south of the city is the great temple, one of the most extraordinary architectural relics in the world. It is enclosed by a quadrangular wall about two miles in compass, outside of which is a wide ditch. There are 1,532 columns and the mountain which yielded the stone is thirty-two miles distant. The joinings are scarcely perceptible—no sign of mortar, no mark of chisel, the surface is polished as marble. The corridors towering from 180 feet upwards, lordly flights of steps, carved walls, griffins, pillars, halls and noble sculptures representing scenes from the Ramayana and the Mahabharata present an overwhelming spectacle.

The Siamese call themselves Thai, but the name Siyem occurs in their language though it is now obsolete. In the days when Cambodia was great, the Siamese received from the former country their first lessons in civilisation and their original Hindu culture. Buddhism came afterwards, probably from Ceylon and has long been dominant in the country. But the basis of the Siamese alphabet and sacred script is still Indian; their metrical compositions, notably their cheritras, still abound in stories taken from the Ramayana; and the form of their Government too, was, until recently, based on the Hindu model of a king, a second king and Senapatis including ministers and military commanders. There is a tradition of Bengali trade with Siam, and this finds support besides other things, in the observations of a recent Indian traveller who says that in appearance the Siamese Brahmans resemble lower-class Bengalis; their names are corruptions from the Sanskrit and their domestic observances are entirely Hindu. Brahmans are still employed in Siam in divination, in fixing fortunate days, in business transactions, marriages and in arranging festivals. Traces of Brahmanism still appear in nearly all the national festivals, at the seasons of

ploughing, harvest and thanks-giving for the floods. In the rites attending these festivals and in all court ceremonies, coronations, royal hair-cuttings, processions and cremations the chief officiators are Brahmans and not Buddhist monks."

Java was colonised by Hindus from Kalinga about the middle of the first century, B.C. The rude Malayan natives were easily subdued and the colonists distributed themselves in settlements that spread over the greater part of the country. The fame of their achievements must have reached India for the Ramayana, in a passage which, I think, belongs to this period, makes a distinct allusion to the seven kingdoms of Java. Ptolemy, who wrote in the second century, A.D., was aware of the name of the island, Java Dwipa, and of its literal meaning, the island of barley, though he does not seem to have known that no barley grew in it but only a kind of millet. According to him, the country was exceedingly fertile; it produced gold and its capital was situated in its western part. The oldest inscriptions of Java have been found in this part; they are in Sanskrit, on stone, and relate to Vaishnavism. But the Saiva temples on the northern coast, constructed at an elevation of 6,500 feet, point to an equally early occupation of central Java by Saiva Hindus. Fa Hien, the first Chinese who appeared in the Archipelago, resided for five months in 414 A.D., probably in Western Java. He found Brahmanism flourishing. But the states of Western Java, though early conspicuous, never reached the development attained by the states in the eastern part of the island; nor did Vaishnavism ever raise its head in the presence of an aggressive form of Siva worship that was always more or less predominant in the country.

The first Buddhistic attempt at the colonisation of Java is said to have been made by a powerful Saka Prince of Guzrat named Aji or Ajaya who landed at about 78 A.D. and was believed to have founded the Indo-Javanese Calendar. But he returned soon, a pestilence having broken out among his followers. The next attempt was made, about five centuries later, in 603 A.D., by a prince of the same family who possessed a written account of Ajaya's adventures. The prince sailed from Guzrat in six large and upwards of a hundred small ships, with about 5,000 followers, comprising people skilled in agriculture, artificers, men learned in medicine, able writers and military men. The enterprise was successful and the prince founded a strong kingdom at Mataram in Central Java with its Capital at Prambanam. His successors constructed the great building at Barobodur which, from the basement to the seventh story, was adorned with a series of wonderful sculptures and bas-reliefs, extending in the aggregate for a length of nearly three miles, and expounding in ordered sequence the history,

mythology and philosophy of the Buddhist faith. The trade with China and the custom of sending envoys to the Chinese Court with presents which Chinese vanity construed into tribute had been begun by the Hindu princes of Western and Eastern Java. They were continued by the Kings of Mataram and, in the year 992, we find the reigning prince sending as presents ivory, pearls, silk embroidered with flowers and gold and of different colours, sandal wood, cotton goods in various colours, tortoise shell, betel trays, short swords with hilts of rhinoceros horn or gold, rattan mats plaited with figures, white parrots and a small pavilion made of sandal wood adorned with all kinds of precious materials." But the glories of Mahayana Buddhism declined with the power of the rulers of Mataram and the Hindu states of Daha or Kedieri, Tumapel, Jangala and Kirupan emerged into prominence, possibly at the beginning of the 11th century.

Saiva Brahmans were powerful in the Kingdom of Kediri but Buddhist Brahmans occupied a subordinate position and co-operated with the former in giving literary polish to the beautiful Kavi language that grew up out of the mixture of Sanskrit and the Polynesian speech of the natives. The Arjuna vivaha and Barata Zuddha were written at Kediri, but the Javanese poets transferred the scene of the great war to their own country. Towards the close of the 13th century, the king of Tumapel tattooed the face of the Chinese envoy and this led to the despatch of a punitive expedition into Java by the Mogul Emperor Kublai Khan. In the course of the struggle that ensued and which was further complicated by an internal feud between Tumapel and Kediri, the latter kingdom disappeared and the former shrank into insignificance but the last great Indo-Javanese empire, that of Majapahit or Vilvatikta, was founded. For the greater part of a century during the rule of the princes of Majapahit, the power of the Javanese Hindus was supreme in the eastern seas. They extended their conquests to Sumatra, Borneo and even as far as the Moluccas. But towards the close of the 14th century or the beginning of the 15th, the kingdom of Tumapel again rose to great strength and weakened Majapahit and Arab traders and missionaries began to appear in increasing numbers. They found ready converts in the mass of the Javanese population who were perhaps ill-satisfied with the position assigned to them under the caste system. At last some of the principal native chieftains embraced Islam and overthrew the last Hindu sovereign of Majapahit in 1478. With the fall of Majapahit, Hindu rule vanished from Java but the young son of the last king crossed over with his followers of all the four castes to the dependency of Bali. The Balinese are Hindus to this day, but the last shred of

their independence was destroyed by the Dutch in 1905.

There can be no doubt that the islands of Madura (or Mathura) and Bali were colonised at an early date by Hindus from eastern Java; the islands of Lampaka and Sambaba were colonised from Bali. The Sanskrit inscriptions of the 5th century found in West Borneo also point to a settlement of Javanese Hindus in that part of the islands and it is highly probable that the state of Gandhari or Sambhuti (Kandali or Sambotsai) in Eastern Sumatra, from which the states of Jambu, Indragiri and Samudra or Sumatra seem to have been subsequently derived, was originally founded by Indo-Javanese conquerors early in the 5th century. The manners and customs of the people of these states were like those of Java. The rulers of Gandhari called themselves Kshattriyas, cultivated Sanskrit and sent presents to the Chinese Court which included letters written in golden characters or on gold leaves, Sanskrit books folded between boards, pearls, ivory, different kinds of perfume, rose-water, glass-bottles, white sugar, crystal finger-rings besides other things. The people of Gandhari used no copper cash, but traded in all kinds of things with gold and silver. But the state of Poli or Puri that existed in Northern Sumatra from the beginning of the sixth century to the beginning of the tenth seems to have been an exception. The family name of the early rulers of this state was Kaundinya; their religion was a form of the later Mahayana; and they seem to have immigrated from Northern India attracted by the love of gold which was plentiful in those days in Sumatra. As to the settlements in Malaka and Sinhapuri (Malacca and Singapore), it is probable that they were indirectly Javanese; having been founded from Kandari (mod. Palembang) and of the Malay Peninsula as a whole it may be asserted with greater confidence that many of the most ancient Malay states were founded by adventurers from Java. It is beyond doubt that the influence of Javanese Hindus on the language and literature of the Malay country was profound, but the same language and literature, notably the Malay Panchatantra and Parang Pandava Jaya, bear witness to the intimate relation which subsisted between that country and Kalinga. The Kalingas or Telegus went there for trade and we have reason to believe that Bengalis, Tamils and possibly also Guzratis participated in this trade. In fact, along with an active commerce with Ceylon and the eastern countries, intercourse between India and her over-sea colonies appears to have been kept up when necessary, roughly speaking, during the first thousand years of the Christian era. Not a few stories of daring mercantile adventure now form a part of the fabulous literature of India or live as village folk-lore. But foreign

testimony is decisive as to the maritime activity of the Hindus in this period. Thus, we learn from the Fokwoki that Fa Hien, early in the 5th century, sailed from the Ganges to Ceylon, from Ceylon to Java, and from Java to China, in ships entirely manned by Hindus. In his time pirates had already appeared on the eastern waters. The official history of the Liyang dynasty of the first half of the 6th century speaks of the countries beyond the Ganges that traded in Tunsun, a part of the Malay Peninsula. The chronicles of Java relate that the Guzrati Prince who founded the Kingdom of Mataram wrote to his father announcing his success and obtained from India a reinforcement of 2,000 persons. They likewise also speak of an extensive commerce with Guzrat. The construction of the splendid shrine of Borobodur which is generally referred to the second half of the eighth century was effected, we are told, with the aid of artists brought from India. As late as 1025, the fleet of Rajendra Chola Deva Gangaikanda crossed the Bay of Bengal and captured the Capital of Pegu and several towns on the coast. But the neo-Hindu revival that followed in the wake of the Vedantic propaganda of Sri Sankaracharya in the 8th century was generally unfavourable to maritime enterprise and, owing to the fierce hostility of rival Arab traders, the Hindu empire of the seas withered away.

DISTRIBUTION OF INDIAN FOSSIL FISHES.

Fish-life begins from the Silurian and is represented by the Selachii and the primitive Ostracodermi, *e.g.*, Pteraspis and Cephalaspis. Fossiliferous lower Palæozoic rocks of a wide extent have been met with in Burma but these beds have as yet yielded no fish fossils. There are many other exposures of lower palæozoic beds but these are either practically unfossiliferous, or completely metamorphosed with a perfect recrystallisation of the rock material and consequent obliteration of ali traces of animal life or these rocks whenever fossiliferous do not contain any evidence of piscine fauna.

Among the earliest Indian beds which contain any evidence of fish fauna must be mentioned the Gangamopteris beds of Khunmu in Kashmir. Besides yielding a large number of Gangamopteris and some other plant fossils, these beds are remarkable for the piscine and amphibian fauna, but it is only the former which need detain us here. Dr. Smith Woodward described the fishes discovered in these beds by Dr. Nœtling and he established two species *viz.*, *Amblypterus symmetricus* and *Amblypterus Kashmirensis* both being very closely related to the type-species *Amblypterus latus* and both having affinities with previously described lower

Permian forms (1). A third form of Amblypterus decidedly more slender than any of the two described above with lower Pamian affinities has also been found in these beds which have also yielded an *ichthyodorulite* with the impression of a *cestraciontid* tooth and it is just possible that the spine and the tooth belong to the one and same individual (2).

The remarkable Productus-limestone beds of the Salt range so well-known for the rich suite of brachiopod fauna has also yielded a few remains of fish (3) but they are nowhere abundant nor very well preserved and generic determinations have often been a matter of doubt. A ganoid fish has been found in the magnesian sandstone group and has been named as *Sigmodus dubius*. This is perhaps the oldest fishlife of which we have any evidence in India and it very much resembles the tooth of some mesozoic saurian reptiles but the nearly entire absence of a distinct enamel layer covering the surface of the tooth goes far to prove that this tooth originally belonged to a fish. The specimen was obtained from the Chel hill, a locality also remarkable for yielding ice-scratched boulders (4). The few other remains were obtained from the lower, middle and upper, Productus limestone beds and three species of *ichthyodorulites* were also obtained from these beds all belonging to a single genus *Xystracanthus*. In the ceratite beds of the Salt range a few scanty fish remains have been met with and in this formation was discovered a limestone slab by Wagen (in the lower ceratite formation) which contains the scales and few other traces of three ganoid fishes. The ceratite bed material is also very scanty and includes the cestraciontid *Acrodus* which is represented by three species (5).

The Kota and Maleri beds of the Gondwanas have been very well-known from their abundant fish remains. The Maleri beds from their fish fossils seem to have a distinct upper triassic facies and from the presence of red-clay these beds have been correlated with the Panchets. The Maleri fossils consist of Ceratodus teeth which were first discovered by Vira, the collector of Mr. Hislop, one of the pioneers of early Indian geology. These Ceratodus teeth were specifically described by Dr. Oldham though doubts are entertained if all his species can stand. These teeth are very abundant at Maleri and Mr. Hughes reported having obtained 43 specimens from an area a little over half an acre in extent. A few fish fossils have been obtained from the Kota beds which include some forms very beautifully preserved. The Kota fossils are more numerous and point to a middle mesozoic facies. They were obtained chiefly from the Wardha Valley coal-field and

(1) Pal. Ind. New. Ser., vol. ii, mem. 2.
(2) Jour. A, S. B. vol. vi. No. 4. 1910.
(3) Pal. Ind. Ser. xiii, vol i.
(4) Pal. Ind. Ser. xiii, vol. iv.
(5) Pal. Ind. Ser. xiii, vol. ii.

almost entire skeletons of *Lepidotus* and *Dapedius* were discovered in these beds by Dr. Walker in 1850 and the fossils include a few species of *Lepidotus* and one of them *L. pachylepis* has some similarities with *Lepidotus* minor of the Purbeck beds. *Tetragonolepis* is represented in these beds by three species and of them one, *T. Oldhami*, is so well preserved that it has been rightly styled as quite the gem of the collection (6).

The fish fossils of the infratrappean beds of Dongargaon have been described by Smith Woodward and they include a new genus *Eoserranus*, allied to *Serranus* and one *Lepidotus indicus* which is very much allied to Lepidostens found in the English upper Eocene. The fish fossils should place the Lametas between the Danian and the upper Eocene beds; the age of the Deccan trap has been definitely found out to be upper cretaceous and this possibly points to an earlier development of similar fish-life in the Indian rivers (7).

From the miocene beds of Mayurbhanj detached portions of the dental plates of *Myliobatis* have been found. The portions belong to a median dental plate and the species seems to be very closely related to *M. reglay Agas* and *M. suturatis* Agas.8 The miocene beds of Burma have also yielded fish fossils. A large *charcarodon* tooth was obtained in the Pegu group as also numerous small squaline teeth (9). While this list has been of late augmented by numerous genera including *Lamna* (10). These Burman miocene beds have also yielded a few more fish remains, *e.g.*, *Oxyrhina*, *Hemipristis*, *Carcharias* and *Myliobatis*. An otolith was obtained at Yenangyat (11) while the so-called orbitoides-like Twingonia has also been demonstrated to be an otolith (12).

The Siwalik fish-remains are very scanty. An *Arius* has been described from the Punjab Siwaliks (13) while from the Siwaliks from Nahan was recovered a fossil which was variously described by different authors but its true nature was understood only when it was found to be specifically identical with the recent *Bagarius Yarrelli*, captured in the Hugli (14).

Hem Chandra Das-Gupta.

(6) Mem. G.S.I., vol. iii, p. 202; Mem. Geol. Surv, Ind., vol. ix, p. 327; Mem. G. S. I., vol. xiii, p. 86; Pal. Ind., Ser. iv, vol. i.

(7) Pal. Ind., New Ser., vol. iii, Mem. 3; Rec. G. S. I., vol. xxiii, p. 24.

(8) Cal. U. Mag. Aug. 1906.

(9) Mem. G. S. I., vol. x, p. 278.

(10) Rec. G. S. I., vol. xxxviii, pt. 4.

(11) Pal. Ind., New. Ser., vol. i.

(12) Rec. G. S. I., vol. xxxvi, pt. 3.

(13) ¶ Rec. G. S. I., vol. xiv, p. 240.

(14) Rec. G. S. I., vol. xv, p. 105.

The ruins of Jaysingh's Fort in the Forests of Madhupur.

The Fort in ruins—another view.

SANNYASI REBELLION IN BENGAL.

A FORGOTTEN EPISODE.

IT was in the year 1176 B. S. (1769 A. D.)—that sad year for Bengal—when a terrible famine visited her—that a band of wandering ascetics overran the country and made themselves notorious by their plundering habits. They are well-known to all readers of Bankim's '*Ananda Math*.' In Bankim's novel, the main scene of their activities is laid at Rangpur; but their ravages were not confined to Rangpur alone. The very interesting and picturesque photographs illustrating this article give us a glimpse of the secret strongholds, now in ruins, of this once powerful band of Sannyasis, "deep in the shady sadness" of the dense primeval forests of Madhupur which link together as it were the districts of Dacca and Mymensingh.

In the year 1772, during the rains, over fifty thousand armed Sannyasis sallied forth from their secret fastnesses, looted villages and put countless numbers to the sword. Warren Hastings, the then Governor-General of India, sent a force under Captain Thompson to suppress the Sannyasis, but unfortunately Captain Thompson was killed and the Sannyasis, maddened by victory, carried on their depredations with greater ferocity than ever. The following year, the Governor-General despatched another regiment, but its captain shared the fate of his predecessor. So long the Sannyasis had been satisfied with looting villages, but now emboldened by success, they seized the Government land revenue while in transit from Dacca, Sylhet, Chittagong and Jessore. The sufferings of the people knew no bounds. At length the Governor-General sent three regiments under Captains Edward, Stewart, and Jones with orders to attack the Sannyasis from the north, west and south respectively. Thus hemmed in on three sides, the Sannyasis fled towards the east and being unable to cross the *Brahmaputra*, sought shelter in the thick jungles of Madhupur and there set themselves to build a fort.

For a time they lived quietly in their forest abode; but in 1781 they again issued forth and spread over the country like a swarm of locusts. It was at this period that they ravaged the Alapsing and Jafarsahi pergunnahs. On January 30, 1782, the oppressed zemindars applied to the authorities for relief. On February 14, the Board ordered the Chief of Dacca to suppress the rebels; and he accordingly sent troops in the direction of Jafarsahi. But they were routed and had to return to Dacca after having sustained heavy losses. When the news of this disaster reached the head-quarters, the Board sent Mr. Henry Lodge—the

resident of Luksmipur and Bullooah against the insurgents. On his arrival at Mymensingh the Sannyasis boldly attacked him and carried him captive. The zemindars, utterly demoralised, surrendered to the rebels and were imprisoned in their secret fort. Not till then did the Directors realise the gravity of the situation, and as a consequence of these repeated outrages, Mymensingh was made a seat of Government on April I, 1787.

In 1790, the Collector of Mymensingh sent an armed force against Jay Singh Giri, the Sannyasi leader of Madhupur. The fort fell into the hands of the English and Jay Singh was captured and hanged. With the death of Jay Singh, the Sannyasi rebellion collapsed. Up till now the descendants of these Sannyasis hold rent free land which their turbulent ancestors forced the zemindars to cede to them. Even to this day in the dense forests of Madhupur may be seen the "*Nabaratna Math*"—a splendid monument of the religious fervour of Jay Singh—now standing in the wilderness as a mute memorial of the stirring times in which this celebrated outlaw lived and flourished.

The ruins of the Navaratna.

SREENATH PRESS, DACCA.

THE DACCA REVIEW.

VOL. I. JUNE, 1911. No.

THE CENSUS.

MR. WALKER, who supervised the Census of the United States in 1871, wrote that "the labour of organising a Census is such that no man can conceive who has not himself undertaken it or, at least, stood by and watched the machine in full operation." This labour, which is obviously much more severe here than in other countries, has decreased considerably since 1872, the date of the first Census of India, mainly owing to the experience gained at each successive enumeration. The burden of starting the organisation lies on the shoulders of the Census Commissioner for India who issues orders to his lieutenants, the provincial superintendents, in the different provinces. On them lies the responsibility of carrying out their Chief's instructions while adapting them where necessary to local conditions and of seeing that they are understood by the thousands of actual workers from the district officer down to the enumerator. Everyone knows, I presume, that he or she was counted on the night of the 10th March last: but few people outside those who actually took part in the work of enumeration know all that had to be done beforehand. In each district, one of the deputy magistrates was appointed as Census Officer in January 1910: he and the Subdivisional Officers, who were Census Officers for their subdivisions subject to the control of the district officer, had to draw up lists of the villages with the number of houses in each and had to locate these on thana maps: this was particularly difficult in riverain areas where there is much diluvion and alluvion and in jungly tracts where population is scanty or migratory. After all these lists were thoroughly tested, thana areas were divided into

blocks of not more than fifty houses, into circles of 10 to 15 blocks, and into charges of about 20 circles. The superintendents of charges were usually police sub-inspectors: each circle was under one non-official supervisor, and the man who counted the people in each block was the enumerator. The instruction of all these workers and the provision of the maps of their *elakas* and of the necessary forms had to be undertaken by the district officer and his staff. The forms were supplied from the Provincial Superintendent's office in Dacca and were estimated on the returns of houses submitted from each district. Needless to say this was a difficult task in many ways: enumerators were inclined to waste forms and Census officers to over-estimate their requirements, while the Provincial Superintendent had to turn away from all blandishments and to insist on economy; hence many tears and many wails, but the work eventually terminated. On the day after the Census the enumerators assembled under their supervisors and added up the totals of the males, females and the houses in their *elakas*; and the supervisors assembled in the same way under the Charge Superintendents and added up the same totals for their circles: finally the totals for the Charges were sent to the headquarters of the district or subdivision and when the district totals were added up, they were telegraphed within a week, in most cases, to the Census Commissioner and to the Provincial Superintendent. The accuracy of their totals cannot be guaranteed, but in the last Census the error discovered in them was only ·004 per cent and we may hope for similar accuracy this time. In some districts in the hills, it took many days to get the totals in owing to difficulty of communication and hence there was a delay of a some days in telegraphing their figures.

It is interesting to note that the population of Eastern Bengal and Assam is 34,554,930, or, exclusive of the States of Hill Tippera and Manipur, is 33,978,308. The increase in the province since 1901 is 11·58 per cent, which was shared by all parts. The worst district was Pabna which showed an increase of ·08 per cent only and the next was Rajshahi with 1·37 per cent; the third was Dinajpur with an increase of 7·47 per cent. The greatest increase, 46 per cent, was in the Naga Hills, but this was mainly due to the annexation of territory: the next, 30 per cent, was in Goalpara, which received a large number of immigrants from Mymensingh. The latter is the biggest district in India and has now a population of nearly four and half millions, entailing an increase of 14.54 per cent since 1901 and of nearly one million within the last twenty years. The City of Dacca has now a population of 108, 188 and is over 20 per cent larger than it was ten years ago.

Having got to this stage the Census disappears from the eye of the public,

who, if they hear of it at all again, wonder why it takes twelve or fifteen months to publish the report. Well, it takes all this time to compile the figures; a rough summary of the method follows.

The problem is to prepare certain statistics of age, civil condition, religion, caste, infirmities, education and occupation. The method adopted in India is known as the slip system, which was introduced from Europe in 1901. Briefly the entries in the enumerators' schedule for each individual are written down on a separate slip, 4½ inches by two; these slips are of a different colour for each main religion (Hindu, Muhammadan, Christian, Animist, and Buddhist, all others being lumped together), and contain certain symbols to denote the unmarried, the married, and the widowed: these symbols, which are modifications of the square block denoting a married person, are solid for males and hollow for females: so that the religion, sex, and civil condition of the person are already denoted on the particular slip chosen. The entries written on the slip are the number of the charge, circle, block and the individuals' number in the block, his age, caste, means of livelihood whether primary or secondary, district of birth, his language, whether he is literate or not, and whether he knows English. A good many of these entries are indicated by abbreviations, which are prescribed beforehand. The entries relating to infirmities are copied in separate slips. The copying of the slips was done at most district head-quarters and also in the central offices at Dacca, Chittagong and Gauhati. A good copyist could do as many as one thousand slips in a working day of six hours and the average for the province in some weeks was over six hundred, in spite of some very low outturns. Roughly, fifty copyists can complete one million slips in about forty-eight working days or eight weeks in all from the beginning: if the copyists were as competent at the start as they become after two or three weeks, they would be able to complete the work in forty working days.

The next stage which began in the early part of May was sorting for the different tables. The slips are all collected in the central offices: each sorter is given about twenty-five thousand slips usually of one sex and one religion, which he keeps until all the tables are completed. He is provided with a set of pigeon holes, which are labelled according to the statistics required: for example, when he sorts for the table of civil condition by age, he enters the different age periods (0, 1, 2, 3, 4, 5-9, 10-14, &c.), and taking up the slips, distributes them amongst the pigeon holes according to the age entries on them: he then counts up the slips in each pigeon-hole and enters the number on a ticket. Similarly for caste, he labels the holes with the names of the different castes and counts them up in

the same way. The table for occupation gives the greatest trouble; there were in 1901 no less than five-hundred and twenty occupational groups each of which had to be compiled separately; in this Census the number has been reduced to one hundred and seventy by amalgamation. The new system is based on Bertillon's occupational scheme which is now being adopted by all other countries and will thus afford opportunities for comparison. Many problems arise in the preparation of this table; is a man who makes and sells a thing, a maker or a seller? he cannot be shown as both. Why should you put the seller of lanterns as a trader in hardware and show the seller of candles under the head of trade in firewood, charcoal, &c.? Countless are the problems and countless the chances of mistakes. However, it may be stated here that the sorter sorts the occupations as he finds them entered in the slips. The classification of those occupations under the prescribed groups is done by individuals known as compilers and this brings us to the third stage of the work.

The figures on the sorters' tickets for each table are added up by thanas and towns by compilers, and eventually the figures for each subdivision and district are arrived at. So that it is not until this stage, which it takes at least six months from the enumeration to reach, that we get at the statistics which form the basis of the report. Besides the tables showing actual figures, many tables showing proportional figures, percentages, averages, &c., have to be compiled, so that no consideration may be omitted.

It takes thirty-three men three to four months to sort one million slips for all the tables, so that our staff of sorters runs up to one thousand and two hundred men, divided into gangs of ten each under one hundred and twenty supervisors, who are again looked after by twenty inspectors. In addition, there are men copying out the tables of population by sex and religion for every village in the province and the compilers. It will be obvious that it is no easy thing to organise the central offices, which are under four Deputy Superintendents of Census recruited from the Provincial Civil Service.

The general lines on which the report is to be written are prescribed beforehand by the Census Commissioner. The Government of India prescribe the main tables, and the Local Government can add statistics for provincial details, such as for thanas, &c., provided the cost is borne by provincial revenues: all other expenses are imperial.

Now that we have got to the material for the report, nothing remains but to write it, and that has to be done yet. Before ending, I might mention that one of the great difficulties in an Indian Census is the question of caste. The enumerator is often apt to lord it over his fellow villagers and to insist on

entering a man as of a lower caste than the latter claims to be, while many a man thinks that if he can get himself entered as of a higher caste than he is, Government will keep a record of it and ensure his rise in the social scale. I am afraid that many a bitter tear was shed in February and March this year over caste entries and many an enumerator found in the Census a means of inflicting a slight on his enemy. However one cannot have one's omelette without breaking the egg, and one must have statistics even at the cost of a few tears. The main cause of the keenness of the people on the question of the caste entry was the attempt made in 1901 to draw up a list of caste social precedence: added to this is the general modern tendency of the lower castes to rise and claim an equality with the higher castes. No attempt will be made this time to indicate social precedence,—because it gave rise to too much ill-feeling at the last Census. Whether caste will eventually disappear is another question: while it lasts, it is an unique organisation and India owes it to the rest of the world to provide an account of the system and statistics of its component parts. But the claims of individuals and of communities to be recorded as different from what they are usually known adds very considerably to the labour of the Superintendent. Many persons, including even some rather well-educated people, seem to be under the impression that the recognition by Government of their claims will immediately ensure their position in Hindu society. They forget that the days of King Ballal Sen are past and that the object of the Census is to record facts as they are, whether these facts are fair or otherwise to individuals. They also forget that reading back into history or to the Shastras will not alter the facts of the present day and that claims to be descended from Khattriyas, for example, cannot be accepted unless Hindu society of now and to-day recognises the persons making the claim to be Khattriyas now and to-day.

The most striking point in all these controversies is that in spite of all that is said to the contrary, the caste system shows no great signs of breaking up: the lower castes are claiming higher positions, it is true: but that caste will stand the shocks of many generations to come is hardly in doubt.

J. McSWINEY.

LEAVES FROM THE DIARY OF AN INDIAN POLICEMAN.

(I)

THE BAZAAR.

THE Bengal Bazaar of the reality and the Bengal Bazaar of the visionary who has never landed on the shores of India are places of very different aspects.

The stories of magnificent mosques and golden temples, the pictures of long clean streets with placid Hindus smoking sweet-scented *hukahs* as they display for sale their variegated merchandise are, for the most part, but fanciful creations of a romancer's brain. What is the real state of affairs ?

Picture one long, dirty, pathless street, with houses of all sizes and shapes and in every state of dilapidation on either side. Most of them are made of mud with roofs of tin though verily not a few have mat walls and roofs of thatch. Here and there a more imposing whitewashed, doubie-storied house, the property of a thriving Marwari merchant or well-to-do Indian Pleader attracts attention while the temples with their spires and the mosques with their huge white domes stand out prominently from amongst the squalid surroundings. Crude mud huts open direct into the street and their owners pulling at *hukahs* or chewing the betel-nut squat lazily on dirty mats.

At the corner of a crooked lane is the shop of the sweetmeat seller. It is not a pleasing sight to behold, for, full of sugary messes it attracts swarms of flies and wasps which feed on the unwholesome produce displayed for sale. This is an establishment which never closes, day or night, and on the advent of a customer the flies are temporarily fanned away and having paid his two or three pice he receives some of the doubtful luxuries carefully placed between two plantain leaves. Not very far away is the butcher's shop. Carcases of cows and goats hang round the walls and mangy pariah dogs prowling and slinking in the gutter seek for any refuse that may be dropped or thrown to them.

Gramophones are in great demand since within three hundred yards there are no less than five agents who advertise these musical machines for sale, while of Commercial Academies there are two. It is here that the "plucked F.A.'s" study "Shorthand, typewriting and book-keeping" and thus prepare themselves for what may be a useful existence in a commercial house or Government office.

In contrast to his murky surroundings the policeman in his white *dhuti*, blue blouse and red *pagri* looks particularly smart. He does not forget to make the most of his position and no doubt the ghari-wala to whom he is now turning his attention will find it advisable to pay one or two pice before proceeding on his way. And look at those semi-naked mud-plastered individuals seated on leopard skins beneath the pepul tree. They are *Jogis* (wandering mendicants) who are held in superstitious dread and holy fear by their numerous illiterate followers. Living on the generosity of the populace they are said to obtain large sums by threatening with frightful curses those who refuse to comply with their extortionate demands.

At every corner are beggars who endeavour to excite the pity and com-

passion of pedestrians by displaying ghastly deformities and offensive sores. Muscular coolies cleverly balancing heavy loads on their heads are rushing hither and thither and it is quickly apparent that the women folk have to work much harder than their lords and masters. Here and there low caste children, squabbling and chattering all the time are to be seen filling water-vessels at the roadside pumps and wells. Kabulis wearing long, loose, white smocks and baggy blue pants are strutting about as if they were masters of creation. Their greasy hair hangs in unkempt locks over their shoulders. They have come from far-off Afghanistan to sell cloth to the villagers from whom they neither expect nor obtain ready money. They will, however, make the unfortunates pay handsomely for the privilege when subsequently they return to realise their dues. The Kabuli is not kind by nature and tales of his cruelty are common.

The narrow thoroughfare is nearly always impassable owing to the seemingly interminable procession of bullock-carts and ekka-gharis, the latter being the conveyance generally patronised by the local travelling public. It is a springless two-wheeled contrivance drawn by a half-starved pony decked out in what were once gaudy colours : the reins are made of rope while the art of driving consists in an irregular series of jerks at the unfortunate animal's mouth. The jehu alternately beats and curses his semi-starved tat and never fails to make disparaging remarks about the female relatives of any pedestrian who has the temerity to cross his path.

That the busy bazaar with its sounds and smells, the fluttering white garments of the babu, the lithe muscular semi-nude bodies of the coolies and the men at work in their shop-fronts presents an interesting spectacle, the western traveller will never deny but at the same time he will be constrained to confess that it fails lamentably on comparison with the fanciful bazaar created in his mind by the pens of those who had never visited the murky cities of the so-called Golden East.

(II)

THE MUHARRAM OF THE MOSLEMS.

The Muharram—the great annual festival of the Moslems is a time of more than ordinary anxiety for Indian officials, and to the Superintendent of Police, especially, it is a great relief if the ten days' *tamasha* comes to an end without any untoward event occurring to mar the quiet of his district. On the occasion of a recent festival, there were several riots in various places and race-feeling ran very high indeed at Titagarh near Calcutta where a serious outbreak was only prevented by the action of the local officials and the weighty words of an influential Muhammadan Nobleman.

The Muharram is perhaps at once the best known and most picturesque of all Indian festivals. It is the mournful anniversary of the tragic death of Husain, grandson of the Prophet, which took place upon the fatal plains of Kerba la on the 10th of Muharram, A.D. 680. It is an event which is mourned throughout the whole Muhammadan world, though it is often difficult to reconcile the painful details of the sad event with the manner of commemoration now adopted.

The festival is spread over the first ten days of the month of Muharram, but it is the last day of the period which is specially celebrated. Each of the ten days has allotted to it a certain solemnity, corresponding with one of the events which took place previous to the death of Husain, who earned his great reputation by helping the people in a war against the Caliph Yezid who "killed and tortured for the pleasure he derived from human suffering." He refused to acknowledge the authority of this cruel despot, and agreed to lead a rebellion against him, so gathering together a small but devoted band of followers he successfully crossed the Arabian desert without having to take part in any engagement. It was not until he reached Kerbala, which is near the western bank of the Tigris that he was overtaken by an army under the command of one Obaidullah. There, his camp was surrounded and he and his devoted band were cut off from the waters of the river. Their sufferings became so terrible that at a conference with Obaidullah he suggested a surrender on honourable terms but the latter would hear of no such conditions for his cruel nature was devoid of all merciful and chivalrous instincts. Hossain and his followers, men, women and children, were thus doomed to death, and before long he was the only surviving male defender in the little encampment. About to die, he dragged himself to the river-side for a last drink of water. On his return he clasped his infant child to his breast, but the latter was killed on the instant, pierced by the arrow of an enemy. The unhappy father no longer capable of resisting his foes seated himself at the door of his tent: he was handed a cup of water, and as he lifted it to his mouth, his lips were transfixed by a dart. Then recognising the inevitable, he with difficulty mounted his steed for one last charge, and strong with the strength of justice fell upon his enemies who retreated on every side. Soon, however, weak from loss of blood, he sank to the ground to be horribly mutilated by his fiendish enemies, who cut off his head and submitted his body to all the infamous ignominies practised in that inhuman age. Such was the death of Hussain whose memory is perpetuated throughout the entire Moslem world by the annual festival in the month of Muharram.

The trials to which Hossain was subjected are vividly represented in the

processions which are held on the seventh, eighth and tenth days of the commemoration. The cortege is generally preceded by a large glass-case which is hidden from the public gaze by many shawls. Inside this case are placed a turban, sword and other articles emblematical of the accoutrements and clothes worn by Hossain, while on each side are men bearing flags and banners made of costly variegated cloths. The next feature of the procession is a number of ponies on whose saddles richly studded with precious stones are placed a sword and shield, which are meant to represent the death of the Prophet's grandson. Last, but by no means least, there appears on the scene a led white horse draped in black trappings, escorted by *bhistis* (water-carriers) carrying *massacks* of water. The animal is emblematical of the steed on which Hossain was mounted when he made his last fierce charge, while the *bhistis* are to recall to the minds of the populace the dreadful agonies of thirst to which he was subjected while within sight of the waters of the Tigris. Myriads of devout Moslems, terrible in their earnestness, then follow and woe to any one, be he black or white, who wittingly or unwittingly comes in contact with the procession.

During this period of mourning commemorative funeral services, so to speak, are held whereat *Maulvis*, the Moslem priests, read excerpts from the life of Hossain and the congregations take an opportunity of publicly atoning for past misdemeanours and indulging in acts of charity. The effect of these recitations on the audience is amazing, and as the story proceeds, real tears are shed and breasts lacerated. It is one of the most impressive of sights and shews in no doubtful way the extent to which religious frenzy can affect the Muhammadan.

The foregoing is the manner in which the Muharram is commemorated by orthodox Muhammadans, and more especially by the Shia community which is particularly devoted to Imam Hossain. It is however an indubitable fact that the celebration of the festival is in different places becoming quite changed from what it has been in the past. This, perhaps, is a fact to be regretted, and may be due in no small measure to the action of the illiterate section of the Musalmans who are now apt to regard the commemoration of the occasion not so much as a time for religious devotion but as a period for turbulent amusement.

P. LEO FAULKNER.

A PILGRIMAGE YARN.

It was long—long ago upon the occasion of a particularly auspicious conjunction of certain planets, vast numbers of pilgrims were assembled at

Hardwar for a dip in the sacred waters and for the performance of the collateral religious rites. The fakirs were also there in countless hordes.

On the day held sacred the *bunia* was very busy doling out by handfuls, flour, rice, *dal*, &c., to all seekers for food by order of rich almsgivers every one of whom had a *bunia* of his own.

About mid-day there came before a particular stall a Fakir carrying a *thombi* or calabash in his hand and held it out before the *bunia*.

"Fill it to the brim," said the master to the *bunia*.

"That he will find rather hard to do, my son," said the Fakir.

"We shall see, *babaji*," answered the rich man. Whereupon the Fakir held out his calabash, and the *bunia* began to fill it with flour. But quickly as he threw the flour in, it disappeared in some mysterious manner, the calabash still remaining empty, and it nearly took his breath away to note that the quantity in his basket did not seem to get less with all the drain upon it. The owner of the booth who was well-known as a *pohoncha admi* (a sage) watched the little game with wonder and interest. At length he begged the fakir to stand back a pace or two and ordered his *bunia* to pour down into the calabash the contents of the whole basket and make its flat bottom parallel with the roof of the house. But the result was just the same; the little calabash was never filled while the basket, like the cruise of oil you have read of in the Scriptures, suffered no diminution.

By this time a large crowd had gathered in front of this particular booth and there was great excitement. The news of the miracle had spread like wildfire and was still spreading.

Babaji, said the master of the booth at length, "I beg you will come this way into my humble dwelling that I may speak to you in private."

"To what purpose, my son?" asked the Fakir.

"You have a *guru* (master) in this neighbourhood, I suppose" said the almsgiver. "I have, but what of that, my son?"

"Only this that I should like to see him. If you who are his *chela* (pupil) can perform such a miracle as this, what is there under the sun which he—the master cannot accomplish?"

"My son, I can make no promises; but I will entreat the master to comply with your wish; farewell."

So saying, the Fakir vanished into the surging crowd, nobody knew where.

About dusk that evening the holy man returned to the almsgiver and said that the *guru* had consented to meet him under certain conditions which were that he should go unattended into the middle of the sacred stream that flowed by Hardwar and that the *guru* would come from the opposite bank and meet him in mid-stream.

"But the river is deep and I shall be drowned," tentatively objected the alms-

giver. "Fear not, my son; the master has willed it; place your trust in him and no harm will come to you. Be there at mid-day to-morrow." Wherewith the Fakir seemed to melt into thin air.

At the hour appointed the almsgiver, dressed as a fakir and armed with the sacred iron tongs affected by the religious mendicant order, appeared on the bank of the river on which vast crowds had assembled and where the greatest excitement prevailed. Without deigning to exchange a word with the sight-seers he boldly entered the stream; but to his astonishment he found that the water only reached up to his waist. He carried his tongs in his left hand and a glittering object in his right.

As he splashed through the water, an individual of extraordinary appearance was seen to approach the river-bank on the opposite side and get into the water.

A more grotesque or weird personality never presented itself before human eyes—swarthy in complexion, of hideous features, with one ear of enormous size and the other of less than the natural dimensions. His long unkempt locks fell in wild profusion, round his head. He was in Adam's garb but for a strip of dirty cloth around his loins while his body looked painfully thin and emaciated,—may be, by long fasting and the practice of stern austerities. His bloodshot eyes shone with unnatural lustre and had a wild hungry look about them; the nails on his finger, were of fearsome length.

This uncouth strange-looking being met the almsgiver in mid-stream and asked: "What would you of me?"

"*Guruji*, I have heard of your fame and I have sought this opportunity to offer my homage to you. Deign to accept this humble offering, the fruit of a life-long search as a token of my submission to your sublime wisdom." With these words he presented the holy man with the glittering object he held in his right hand.

"Away with such trifles!" exclaimed the *guruji* as he flung the thing into the river. "What have you done, thoughtless man" cried the almsgiver horror-struck, "surely you did not realise that the object you just wantonly cast away was the *paraspathar* (the philosopher's stone) I had discovered after years and years of patient labour and study."

"Banish thy look of sorrow, my son, and grieve not. Mine own right hand is a *paraspathar*." And stooping down he fetched up a handful of sand from the bottom of the river and lo! the sand turned into gold forthwith. "Behold! art still sorrowful?" he ejaculated as he marked a melancholy look still lingering on his companion's countenance. "Dost thou still doubt the virtue of my right hand? Then let me hold thy iron tongs." With this he grasped the tongs which became golden at his touch. "Behold, doubter! as thou hast doubted, go thy way; thou shalt have no more of me. Farewell!"

So saying he turned round and walked back the way he had come leaving the sceptic standing in mid-stream with the now golden tongs in his relaxing grasp and the waters rising every moment. He hurried to the bank, however, in time to save himself from drowning and joined the eager multitude to whom he detailed his conversation with the Yogin. A wild rush was made by the people to reach the opposite bank; but when they got there, they saw the holy man go behind a small bush, and when they went to seek him there, he was nowhere to be seen.

The almsgiver, they say, still lives and carries the golden tongs in his hand to this day and will do so to the end of time. You may see him at the annual gathering of pilgrims at Hardwar.

DWIJENDRANATH NEOGI.

OLIVER WENDELL HOLMES.

(AN APPRECIATION.)

INTRODUCTION.

"Nature was active in the year 1809, like a stirred volcano, casting forth upon the world" some of the representative men that have made the history of the nineteenth century in various fields of human activity. Writing to Tennyson in 1890, O. W. Holmes says "I am proud of my birth-year, and humbled when I think of who were and who are my coevals. Darwin, the destroyer and creator; Lord Houghton, the pleasant and kind-hearted lover of men of letters; Gladstone, whom I leave it to you to characterise, but whose vast range of intellectual powers few will question; Mendelssohn, whose music still rings in our ears; and the Laureate, whose "jewels five words long"—many of them a good deal longer—sparkle in our memories."

Holmes's list is by no means exhaustive and we must add for completeness' sake the names of John Stuart Blackie the eminent Scotsman and Elizabeth Barrett Browning the poetess and Holmes's own distinguished countryman Edgar Allan Poe the poet and Abraham Lincoln the statesman, no unworthy compeers of Tennyson and Gladstone. This is a brilliant constellation of talents to have shot up out of a single year and that year exactly a century later than the birth-year of Samuel Johnson. With the exception of Poe and Mendelssohn, they were a long-lived race. The centenary of four of these great men, Gladstone and Abraham Lincoln, Tennyson and Darwin has been celebrated in this hall and the agreeable duty of winding up the celebrations of the year with a loving tribute to the honour of that wise and witty writer, Oliver Wendell Holmes has devolved upon me. *

* Written for the Centenary Celebration and read at the Overtoun Hall, Calcutta.

Methinks I hear my readers impatiently ask at the start: wherein lies Holmes's greatness? How does he deserve our loving admiration? He was no originator like Bacon or Newton, Descartes or Comte, Spencer or Darwin; he was no teacher like Carlyle or Ruskin or his own country-man Emerson; he was no world-poet, no creator of universal and immortal types like Homer or Dante or Shakespeare; he was no vivid painter of human manners like Chaucer or Fielding, Scott or Dickens. He came with no message, no glad tidings from the world of peace and bliss. He did not drink deep of the fountain from which Wordsworth and Shelley and Browning drew heavy draughts of that living water whereof whosoever drinketh shall never thirst? Where then, should we seek for the secret of Holmes' greatness, his originality, his charm?

The answer is very simple. He was a *humourist* and belongs to that noble band of happy and happy-making souls which include. Aristophanes and Lucian, Rabelais and Moliere, Voltaire and Swift, Smollett and Sterne and last not least Addison and Charles Lamb.

But in this humour of his, there is no low buffoonery, no coarse vulgarity, no Mephistopheles—like sneer, no corroding cynicism or pessimism, no malice, no misanthropy. In this he is own brother to Mr. Spectator and gentle Elia. At the same time he has nothing in common with his compatriots Mark Twain and Artemus Ward and Bret Harte or with the old-world type of Joe Miller and Punch, Douglas Jerrold and Theodore Hook, James and Horace Smith and other men of their kidney. His humour is the humour of the scholar and the philosopher, of the man of culture and the man of science—a humour in which wit and fancy and learning are transmuted into "something rich and strange". In every word that he has uttered, in every phrase that he has coined, we find the subtle aroma of scholarship with none of its affectation, the profound wisdom of philosophy with none of its pedantry. Like his old England double, Charles Lamb, he is fit to be mated with Marvell, Browne, and Burton. We admire the sparkling wit all the better because we perceive beneath it the rockbed of solid learning from which it issues fountain-like.

Like the genial humourists, Goldsmith and Smollett, and the poets Keats, Garth and Akenside, Dr. Holmes was one of those "two-fold disciples of Apollo" who make ample amends for prescribing nasty drugs for the *bodies* of friends or enemies by ministering to the '*mind diseased*' literary cordials more palatable and medicinal than senna or rhubarb. But of all his predecessors in this two-fold function he most resembles the Norwich physician Sir Thomas Browne, in the possession of a quaint humour, of a style richly freighted with a learned vocabulary and of a mind fond of speculating on the nature of all

curious phenomena and bold enough to dig deep the foundations of faith in order to build high. The correspondence of the medical student Mr. Bernard Langdon with his professor in *Elsie-Venner* or the record of Dr. Butts's talk with Miss Lurida Vincent in *A Mortal Antipathy* on *Tarantism* might very well have come from the author of *Pseudodoxia Epidemica*.

To Charles Lamb too he bears a very close resemblance. Both were charming egotists and quaint humourists. Both wrote in a highly artificial style which however was quite natural to them occurring not only in their performances meant for the public eye but also in the private letters addressed to intimate friends. Many are the parallel passages that a busy search among their respective writings is sure to be rewarded with. The impartial judge will, however, readily admit that in gentle Elia we miss that broad many-sided sympathy and that consummate grasp of science and withal that profound wisdom which characterises the genius of his New England successor. Be that as it may, both must be ranked among the highest benefactors of humanity, never-failing consolers in hours of trouble, "ministering angels when pain and anguish wring the brow." Let us remember with gratitude "How often—

The gloom from off our hearts his smile has lifted ;
How well he knew our harder mood to soften
With gleams of sunlight when the storm-clouds drifted."

Well might we address Holmes too in the affectionate verses of an admirer of Charles Lamb,—

"From mouth to mouth has the exhaustive flow
Of thy original mind, its worth revealing
With quaintest humour and deep pathos healing
The world's rude wounds, revived life's early glow ;
And mixed with this, at times, to earnest thought,
Glimpses of truth, most simple and sublime,
By thy imagination have been brought
Over my spirit."

Does Holmes enjoy a wide-spread popularity ? Will he ever be a universal favourite ? The answer, one is constrained to say, must be in the negative. To the man in the street his humour is much too subtle to be appreciated, his wisdom much too profound to be fathomed. Wit such as his is not much understanded of the people. He is thus "caviare to the general." With another and a greater man than he, he will "fit audience find, though few." Like Walter Savage Landor, the delightful author of the *Imaginary Conversations*, he must own "I shall dine late ; but the dining-room will be well-lighted, the guests few and select." Those who love and admire and honour his name and find pleasure and profit in his poetry

and prose must needs console themselves with that half-serious, half-humorous observation of Charles Lamb: "You cannot make a *pet* book of an author whom every-body reads" or with that of Holmes's own creation Mr. Byles Gridley in *The Guardian Angel* "that he felt more at ease with an author, and loved him all the better, if he found him a little neglected by the world of readers."

(*To be continued.*)

LALIT KUMAR BANERJEE.

THE MAHAPURUSHIYA SECT OF THE VAISNAVAS IN ASSAM.

(*A summary of an article contributed to the Bengali portion by Professor Padmanath Bhattacharyya, Vidyabinod, M.A.*)

ASSAM, with the numerous relics of the greatness and splendour that once were hers, has been more or less a sealed book to the general public of Bengal—and her claim to a high position among the classic lands of the East has for long been ignored. But fortunately, of late, she has been engaging the attention of several scholars whose labours have been rewarded by a plentiful return. It is hoped that an enquiry into the evolution of the Mahapurushiya sect—to which belongs a fairly large portion of the people of Assam, will not be found uninteresting.

In the Ramayana, the Mahabharata, and the Puranas, Assam has been styled "Pragjyotisha" and Naraka is mentioned as its first Aryan King. This King Naraka was the issue of the amours of the Divine Boar (the form assumed by the Deity in his third incarnation) and Dame Earth. The legend runs that after Durga had committed suicide, her dead body was borne from place to place by her divine consort Siva, and this dead body cut to pieces by Visnu with his discus fell at different places—each of which came to be consecrated to the worship of the goddess. A certain portion of the goddess's body happened to fall in Naraka's kingdom and in commemoration thereof stands the temple of Kamakhya—built on a hill known as Nilachala rising from the banks of the Brahmaputra. The temple doubtless from its commanding and romantic position, has always held a high place among the holy places of the land. And not far off lies the Oomanund—in the Brahmaputra—the *Isola bella* of the scene—the delight of Ooma—famed throughout India as a holy island.

It is said that King Naraka was directed by his divine father to worship the goddess Kamakhya. It is further

stated in the *Jogini Tantro*, a work of high repute in Assam that Naraka for his devotion to the gods was made the guardian of the temple of Kamakhya. And so it is that the earliest king of Pragjyotisha was a worshipper of Siva and his divine consort, Sakti.

Close to Pragjyotisha, there existed the kingdom of Sonitapur—the modern Tezpur (in Assamese, Sonita-blood is called Tez—energy)—popularly known as the kingdom of Ban. King Ban, of Sonitapur, famed in the Puranas, was a worshipper of Siva, and even to this day, at Tezpur, may be seen the temple of Maha-Vairab, the erection whereof is fabulously attributed to him. Here also stands the temple which his daughter Usha built to the goddess Durga.

The next King of Pragjyotisha—Bhagadatta—figures in the Mahabharat. Nothing is however known about his religion—the particular god or goddess he worshipped. But we have it on the authority of a celebrated inscription that his son Bajradatta was a worshipper of Siva.

In the Kalika Purana it is said that King Naraka married the daughter of the King of Vidarbha—which is identified by modern scholars with the tract of land lying on the North-Eastern frontier of Assam—near Sadiya—where the Kundila falls into the Brahmaputra. On the bank of the Kundila are visible the ruins of a city supposed to have been at one time the capital of Vidarbha. The past is mostly wrapped up in the mist of legend or myth; but the conclusion seems irresistible that from the earliest times the worship of Siva and his divine consort has been the religion of the land.

The celebrated Chinese tourist, Huen Tsang, in the course of his travels in India in the seventh century, A.D., visited Kamrup, and it appears from his description of the place that the people had no faith in Buddhism—that they worshipped many gods and goddesses—that the whole country was dotted with temples and that the king was a patron of letters. He also speaks of religious toleration. But his narrative throws little or no light on the state-religion or the religion of the king. However in the biography of Harshabardhan, King of Aryabarta at the time of his travels, written by Banabhatta, it is stated that his contemporary Vaskara Varma, the King of Kamrup, would bow his head to none but Siva.

Numerous copperplates and statues have recently been unearthed, but unfortunately very few of them do bear any dates. Specialists have, on an examination of the characters, &c., inscribed thereon, referred them to the 10th or the 11th Century, A.D. These inscriptions mostly embody hymns to Siva and to Visnu in the form of the Boar—the divine progenitor of King Narak. It may therefore be asserted that though the worship of Siva was the prevalent religion of the land—that of Visnu was not altogether neglected.

But Kamrup was fated ere long to be the scene of wild commotion which lasted for about three centuries. Hordes of barbarians—the Kaccharis—the Chutyas—the Ahoms and others swarmed in from all quarters and wiped off almost all traces of civilization in the country. And it was after the Ahoms and the Kochs had settled themselves in the eastern and western frontiers, respectively, of the Brahmaputra valley—that peace and order were again restored. Bishvasingh, the Koch king rebuilt the temple of Kamakhya and made the worship of Sakti the religion of the [illegible]. But ere long the temple fell a prey to the fierce iconoclastic zeal of Kalapahar; and the temple as it now stands was built by Raja Nara Narayan - Bishvasingh's son and successor. The Ahoms, originally professing the Buddhistic faith, were to some extent idolatrous and they in course of time accepted the religion of their new domicile. As the Koch kings gloried in their descent from Siva—the Ahom kings proudly traced their origin to Indra.

From the above it will appear that from time out of mind, the worship of Siva prevailed side by side with that of Visnu. That they were not the only deities worshipped is conclusively borne out by the numerous figures of other gods and goddesses found carved on hillsides all over the land. But during the dark period of about three hundred years when the country was overrun by hordes of barbarians, piety and religious feelings were at a discount and vice and immorality reigned supreme and though the Koch and Ahom kings did much to revive the Hindu religion, its taper burnt but dimly—it appealed to a microscopic minority consisting mostly of the cultured classes of the time. And it remained for Sankara Deb—the mighty founder of the Mahapurushiya sect—the great Apostle of the Vaisnava creed—to give to it a force and a vitality such as it had never attained before; and thus resuscitated, it permeated the different strata of society and shed over all Assam a flood of light that lightened the dark land and made the dead world live.

Sankara Deva was born at Baradoa in the district of Nowgong in 1449. He was a Kayestha by caste. His ancestors came to Assam from a place named Kanaijpur and distinguished themselves even in those days of widespread unrest and disorder alike by their erudition and prowess. Sankara Deva evinced religious proclivities in his infancy and made a thorough study of the Hindu Scriptures. He made a tour round India and that at a time when a prodigious tide of Vaisnavism was rolling from one end of the country to the other. In Bengal, Adyaitacharjya was preaching the religion of the Bhagabat. Fired with this spirit of Vaisnavism, Sankara returned to his country and there inspite of strenuous opposition from various quarters and specially from

the Brahmins, gave a popular interpretation to the teachings of the Bhagabat and translated it into his native tongue. His great coadjutor in this noble undertaking was the great Madhab Dev—popularly known as Mahapurusha and after whom the mighty sect of which we are speaking, has been named. Born in 1489, Madhab was in his earlier days a worshipper of Sakti and Sakti-worship was the religion of his family. It is said that being defeated in a controversy by Sankara Deb, he embraced Vaisnavism and became a staunch disciple of Sankara. The two began to preach the new faith with renewed vigour; but Madhab's apostacy created a host of enemies who sought the earliest opportunity to lodge several complaints against him to the Ahom King. The King, though usually indifferent to matters of religion, was for some reason or other greatly incensed against Sankara and Madhab—who had to flee for their lives to Barpeta—thenceforth the chief centre of Vaisnavism in Assam—in the state of the Koch raj. This flight like that of the Great Prophet of Islam was destined to be an ever-memorable episode in the history of the Mahapurushiyas and the Vaisnavas generally of Assam. There in course of time they were joined by another Vaisnava reformer—Damodara Deb by name and a Brahmin by caste;—and the trio pushed on their activities with boundless energy and unprecedented success. Here too, Sankara had his enemies and he was summoned before Nara Narayan the Koch king to answer the charge brought against him of creating disaffection towards the goddess Kamakhya by his preachings. But the king was so much impressed with his profound erudition and piety that he expressed a desire to be a disciple of Sankara. Sankara, however, did not agree to it as it was against his principle to enlist as disciples, Brahmins, kings and women. Thenceforward he met with little opposition and after accomplishing the mighty task to which he had set himself, died full of years and honours in 1568.

True it is that Visnu had been worshipped in Assam from the earliest times as is evidenced by the numerous statues of the deity recently exhumed—and among others by the figure of Janardana carved on a rock at Gauhati. But the point wherein this primitive faith differed from the Vaisnavism of Sankara consisted in the fact that Sankara laid special stress on the worship of Narayana as the only God to be adored in a spirit of love and meekness. His main object being to popularise the faith—to make it intelligible to the masses steeped in ignorance and barbarism as they were, he studiously eschewed all controversial and knotty points. That the different gods and goddesses were but the manifestations of the same Eternal Spirit formed no part of his code. And the unlettered hill-tribes of which there are so many in

Assam, finding in the religion he preached an instrument which raised them in the scale of society—made them "touchable," flocked to his standard in large numbers and embraced a faith they could appreciate and which appealed to them.

It is maintained by some that the religion of Sankara is but a reflection of the Vaisnavism of Chaitanya Deb. In fact the two faiths are kindred and possess many traits in common, but what constitutes the main difference is the introduction of the amours of Krishna and Radha into the system of Chaitanya. This Sankara had very wisely left out—for its introduction would have had very baneful effects upon a society the morals of which he had found so loose. The lives of these two great reformers afford striking points of difference:—Chaitanya, a Brahmin by caste, left his wife and renounced the world as vain at a very early age. Quite early in life he set about preaching the faith he had inaugurated. Sankara on the other hand did not desert the world. He lived the life of a householder and it was after he had acquired considerable experience in the course of his travels and studies that he launched upon his career as a reformer. He did not believe in renunciation of the world and it is said that when his favourite disciple Madhab expressed a desire to lead the life of a celibate, he sharply rebuked him. Chaitanya is regarded by his followers as an incarnation of the Deity; Sankara on the other hand is looked upon only as an ideal reformer prescribing rules of conduct which hold good even to this day. Again the Vaisnavas of Bengal mostly eat fish but do not take meat; but they of Assam take meat as well though of course they generally do not take the flesh of domesticated animals. Neither do they allow slaughter of animals.

There is a class of Vaisnavas vowed to celibacy after Madhab Deb, called the "Kebalia Bhakats." They are like the Bairagis of Bengal; but whereas the Bairagis of Bengal bury their dead and do not perform the Sradh ceremony according to Vedic rites, the Kebalia Bhakats burn their dead and perform the Sradh.

After the death of Sankara Deb, his followers became split up principally into two sections—the followers of Madhab, known as Mahapurusha—being called the Mahapurushiyas and those of Damodara—the Damodaryas. Besides these two principal sections there are others among which the "Moa-moria" and "Ratikhoa Bhakats" can boast of a fairly large following. The Mahapurushyas and the Damodariyas, inspite of their rivalry in certain matters, intermarry; and it is this social intercourse that has considerably minimized their differences. But the Mahapurushiyas are more orthodox, deeming it a sin even to look at any other deity save Visnu or his incarnations. The Damodaryas on the other hand are more

catholic in their views. They do not scruple to offer sacrifices to Sakti even. This is partly to be accounted for by the fact of the presence of many educated men among the Damodaryas. And while the Damodaryas would accept the discipleship of none but Brahmins, the Mahapurushiyas would not object to being initiated even by a Sudra.

As in Bengal, so in Assam, there are "Satras" (places where food is gratuitously supplied) maintained by munificent donations from wealthy landlords and sometimes out of the proceeds of land dedicated to them. These lands are similar to what are known as "Debutter" lands. Of the Mahapurushiya "Satras" the biggest one is that of Madhab at Barpeta. There are other important "Satras" of this section of the Vaisnavas at Bardoa, Sankara's birth-place, Sundardia, in Kamrup and Kamalabari in Sibsagar. But the most flourishing and prosperous "Satras" in Assam are those of the Damodaryas—at Auniati, Dakshinpat, Garmur and Kurnabati—all situated on a chur in the Brahmaputra in the Sibsagar district. The two sects, the Mahapurushiyas and the Damodaryas have followers all over Assam valley; but beyond it, they are to be found only in Cooch Behar. At the census of 1901, the population of the Assam Valley came up to twenty-three lacs of whom nineteen lacs were Hindus and among them again thirteen lacs were Vaisnavas—four lacs being of the Mahapurushiya sect and the rest of the Damodarya.

It is often maintained by European scholars that the Mahapurushiyas do not practise idolatry, nor is the caste system among them at all rigid. But it should be remembered that in almost every "Satra" there are images of gods and goddesses and that in offering worship to them, Brahmins officiate as priests. Again all the Mahapurushiya satras contain also the foot-print of Sankara which is regularly worshipped. We have it on the authority of their own writings that Sankara Deb and Madhab believed in the doctrine of incarnation which lies at the root of all idol-worship. Besides, Sankara's biography tells us that he caused the image of Jagannath to be set up in his birth-place by Brahmins with great pomp. What more conclusive evidence than the above can be adduced in favour of idol worship? Now to come to the caste-system. In this respect, the actions of the Mahapurushiyas—not to speak of the Damodaryas—are more in accordance with the scriptures than those even of the Vaisnavas of Bengal. Sankara Deb, though himself a Mahatma refused to initiate Brahmins himself. Moreover he caused the members of his family to be initiated by the Brahmin Damodar. Madhab was rather lax in this respect and he placed in the hands of Kayestha "Atas" vowed to celibacy the management of the "Satra" at Barpeta—the chief centre of Mahapuru-

shiya Vaisnavism. But on the death of the last "Ata" appointed by him, it was decided on the unanimous verdict of the entire Mahapurushiya community that thenceforth the descendants of Ram Ram, the priest of Sankara, should be the managers of the satra at Barpeta—posts which they have since then been filling. A satra where the manager is not a Brahmin is hardly to be found and even there the idea is that Brahmins alone can officiate in the worship of the idols and initiate Brahmins. All this is unmistakable evidence as to the observance of the caste system by the Mahapurushiyas.

Both Sankara and Madhab were vastly read in the Sastras, and by translating the scriptures into their vernacular, did much to propagate and popularise religion. They never countenanced any act which had not the sanction of the scriptures. On the contrary, their followers appear to have guided their lives more in accordance with the *sastras* than their brethren in Bengal.

P. B. RUDRA.

DURGA MOHAN DAS

AN EAST BENGAL REFORMER AS I KNEW HIM.

The personal history of my friend Durga Mohan Das, briefly told, is as follows :—He was born of a highly respectable Vaidya family of Vikrampore. His father occupied a very high place amongst the legal practitioners of Barisal, where Durga Mohan received his first education. He was subsequently taken to Kalighat, in the southern suburbs of Calcutta, to live with his uncle who was a Muktear of the Calcutta High Court. There he finished his school career and went up to the Presidency College. Passing the law examination from there, he went to Barisal to join the local bar in the early sixties of the last century. In Barisal he effected quite a revolution in matters of religion and social reform. In the early seventies he came down to Calcutta to practise in the High Court. Here commenced a new career of reform which closed only with his death.

The exact date when I was personally introduced to my esteemed friend Durga Mohan Das I do not quite remember. It must have been sometime between 1869 and 1870, when he came to Calcutta from Barisal to join the High Court as one of its pleaders. But his name had been known to me, from

some years back, I think from 1865, when I began to take an interest in the Brahmo Samaj. We, the young men of Calcutta, were admiring him from a distance for the great things he was doing at Barisal, as a religious and social reformer. Such thorough-hearted advocacy of the cause of reform we had seldom seen. Born in a high and respectable Vaidya family of Vikrampore in the Dacca District and the son of a father, who occupied a very high place amongst the influential citizens of Barisal, Durga Mohan was naturally expected to be an upholder of the old order. But his love of truth and its fearless advocacy were so great, that as soon as his sympathies were awakened for the principles of the Brahmo Samaj he at once threw himself, head and heart, soul and body into those principles and girded up his loins to live them out at all costs and all hazards. That spirit marked him out as a hero to us. A hero he really was, quite worthy to be placed in the front rank of the remarkable men of Bengal.

There are some interesting particulars about his conversion to Brahmoism which need be related here. Whilst studying in the Presidency College, Calcutta, in the early sixties, he came under the personal influence of Mr. E. B. Cowell, then a professor of that College and the Principal of the Sanskrit College, Calcutta. Mr. Cowell was known at the time as a model professor and an eminent Sanskrit scholar. But those who knew him privately knew that he was an earnest and pious Christian as well, contact with whom was spiritually inspiring. As a boy of the Calcutta Sanskrit College, I came in contact with him only one day in 1858 or 1859 and that day is ever memorable in my life. He gave such an impetus to my moral nature that it has carried me forward ever since. This story has been related in Mr. Cowell's life, published in England.

At the time when my friend was reading in the Presidency College a number of students were specially drawn towards Mr. Cowell and began to meet him for private conversation in his house or in the College common room, at other hours than college hours. Durga Mohan Das was one of them. The result of these private meetings, was that they were drawn towards Christianity. One of them, as far as I know, actually underwent the ceremony of baptism. Durga Mohan was also on the way to it. But there was a difficulty in his way. It was not his nature to do things by halves. He loved his wife Brahmamayi too well to be able to desert her and go over to Christianity. He wanted to take her over to the Christian fold with him. With the progress of his new convictions he began to preach Christianity to her ; but she was slow to receive the new message. She was loth to stand in the way of her husband, but felt herself unable to give her full consent to the new course proposed. At last my friend decided to place her in the house and under the

charge of a Christian preacher, a personal friend of his, with the request to try to win her over to his cause. In her anxiety to please her husband she agreed to this proposal. He removed her to that Christian friend's house, and made every arrangement to leave her there and himself to go to Barisal to join the courts there as a lawyer. At this stage there came another great change. Failing to dissuade him from his intended course, his eldest brother, the late Kali Mohan Das, a well-known pleader of the Calcutta High Court, placed in his hands a copy of Theodore Parker's Sermons and Prayers, with a request to give it an earnest study before deciding upon the new course. On his way to Barisal in a country boat, which at that time took eight or ten days in reaching that town, Durga Mohan made a careful study of that book. He was struck to find high, pure, and spiritual religion in that book, freed from the dogmatic accretions of orthodox Christianity. He saw something he had never experienced before, and began to reflect upon it. It made him to stand and wait. He earnestly took to the study of Parker's other works. The more he read the more his mind was impressed with the truth of pure, spiritual and universal theism and the more was it weaned from current forms of orthodox Christianity. At last he changed his mind, gave up the idea of Baptism, took his wife to himself from under her Christian guardianship, joined the Brahmo Samaj and commenced a career of reform unprecedented in Bengal.

I have already said that my friend hated doing things by halves. Accordingly when he took to Brahmoism, he at once made up his mind to practically carry out its reformatory principles. Thus, chiefly through his influence, Barisal became a seat and centre of practical Brahmoism. Under the new inspiration men came forward to discard idolatry, to abolish caste, to promote the education and social emancipation of women, and to get up widow-remarriages and inter-marriages between different castes. His attention was specially directed to the education and elevation of the female sex; and he opened something like a school for grown-up ladies, mostly the wives and sisters of his friends, where he engaged the services of some Brahmo missionaries whom he took from Calcutta. All this was done long before a similar attempt was made by Brahmananda Keshub Chunder Sen at Calcutta, by the establishment of the Adult Female School in the *Bharat Ashram.* It was under his influence that two young men belonging to a family of land-lords, of Lakutea, in the District of Barisal, came forward to give their wives social liberty and took them out to dine with some English officials of the station. A number of people also came forward to contract inter-marriages and widow-remarriages;

the whole movement culminating in the crowning act of my friend's celebrating the remarriage of his widowed step-mother, with a medical friend of his on whom she had placed her affections. It was altogether a romantic affair, in which the late Pandit Iswar Chandra Vidyasagar also had his part. As soon as the intended marriage came to be known, the widow's relatives stealthily removed her to Benares and kept her a prisoner. But the emissaries of Durga Mohan soon traced her out; communications were opened with her and a plan of escape was arranged. Pandit Iswar Chandra Vidyasagar, who earnestly entered into the plan, kept his arrangements ready for the celebration of the ceremony as soon as the widow should arrive and the day she came back it was duly solemnised. Such a thing had never even been dreamt of by the most advanced reformers. That act of reform produced wide-spread sensation and the whole of Eastern Bengal resounded with songs and ribaldries, holding up the daring reformer to public ridicule.

Another Barisal incident is worth relating. After his step-mother's marriage Mr. Das was ostracised by the local public; old familiar friends deserted him, his court practice fell off from its old affluence; and men began to pour abuse publicly on him when going to the courts; people would not talk to him. During the dark days of that persecution, one of his bitterest persecutors was residing in his immediate neighbourhood. The wife of this man died within a short time leaving behind her a little infant with none to take care of him. The father's circumstances did not allow of the engagement of a qualified nurse; so he had personally to take care of the infant with extreme difficulty, at times feeding it with his own hands, and leaving it to the care of a rude and ignorant country midwife. This state of things went on for a number of days, till it last Mr. and Mrs. Das interfered to save the life of the child. From the window of their house they were witnesses to their neighbour's suffering and offered to take charge of the infant if its father would leave it to them. But Mrs. Das herself was then nursing her first baby, a girl who has latterly grown to be a distinguished lady. The father of the motherless infant accepted the offer as a timely relief and made over his sacred charge to my friends. So Mrs. Das began to nurse two infants together, a girl on one side and a boy on the other. The boy grew up for a year or two under Brahmamayi's maternal care, after which he fell ill and died. This act of kindness was a lesson to their persecutors, and brought on a change in their attitude towards him. Durga Mohan soon became the popular leader of Barisal. When Durga Mohan settled down in Calcutta, in 1869 or 1870, he came as a marked man, whose zeal for social reform was unbounded and the

social reform party amongst the progressive Brahmos at once gathered round him. His house became a rendezvous for that party. It was then that I made his acquaintance and was at once drawn into friendship. His house was a place of attraction for us not only on account of his own inspiring company, but also for that of his wife, Brahmamayi, who fully shared her husband's aims and aspirations. Her unostentatious goodness, her loving and generous disposition, her sympathy with every righteous cause and her sisterly affection for all her husband's friends were a never-failing charm for all of us in that house.

Soon arose an occasion for active reformatory work to the loving pair. There came the female emancipation movement in Keshub Chunder Sen's Church. Mr. and Mrs. Das and their young friends began to feel, that the custom of screening ladies during public worship in the *mandir* was an objectionable practice. They wanted to sit with their families outside the screen amongst the general congregation. That desire, through privatley communicated to the *Mandir* authorities, was not attended to for some time; perhaps those who had charge of keeping order during service in the *mandir* were afraid to bring in, what they considered to be, an *element of disturbance.* At last Mr. and Mrs. Das made up their minds to sit with their family outside the screen amongst the general congregation without waiting for permission.

When they commenced doing that there was an agitation amongst the male members of the congregation; for they were unused to such practice. After two or three Sundays the ladies were prevented from taking their seats outside the screen; whereupon Mr. and Mrs. Das, and also the other ladies who were taking part in the forward movement with them, seceded from the *mandir* service and opened a weekly service of their own in another part of the town. Though living in the *Bharat Ashram* under Mr. Sen at that time and acting as one of the teachers of the Adult Female School in the *ashram*, my sympathies were rather with the forward party and drawn by the friendship with Mr. and Mrs. Das, I agreed to conduct Divine service in the secessionist Samaj more than once; which certainly was not liked by Mr. Sen's party.

This secessionist service was kept up by Mr. and Mrs. Das and their friends for some months till at last Mr. Sen's party consented to reserve seats for ladies in the Brahmamandir outside the screen; when the separate service was given up and they returned to Mr. Sen's *mandir*.

But another cause of difference soon arose. Durga Mohan Das and his friends of the advanced party, amongst whom the late Dwarkanath Ganguly, another East Bengal hero and latterly the well-known Assistant Secretary of the Indian Association was prominent, were not satisfied with the ideal of

female education followed in the Adult Female School of Mr. Sen's *Bharat Ashram* and decided to start an Adult Ladies' School of their own in another part of the town. Accordingly a Ladies' School under the name of "Hindu Mahila Vidyalaya" was started, principally through the exertions of Dwarkanath Ganguly, and the pecuniary support of Durga Mohan. This school whose name was subsequently changed into "Banga Mahila Vidyalaya," and which at its beginning secured the valuable unpaid service of Miss Akroyd, a distinguished student of Girton College in England, newly arrived, and subsequently married to Mr. Beveridge of the Indian Civil service, did excellent service for some years. Mr. and Mrs. Das were its principal supporters. They not only made the largest contribution of funds, but kept an active supervision over its affairs and helped its work in various other ways. Verily Mrs. Das became a mother to the girls of its Boarding Department, many of whom were young Hindu widows of Eastern Bengal rescued by their male relatives from their lives of misery. On holidays and also on other occasions when there was no class work, these boarders would find shelter in my friends' house and then it was a sight to us, visitors of the family, to see Mrs. Das surrounded by a pretty large number of young women, who all received from her the same treatment as her own daughters. I delight to remember at this distant date, how she would introduce them to me one after another, and how she would hold consultations with me in secret about their future prospects and the probable chances of their matrimony. On the whole, we were so much pleased with the "Banga Mohila Vidyalaya," that I placed my eldest daughter there in 1870, when she was scarcely more than eight. She at once became a daughter to the Das family. She would be often taken to their house, and would be kept there for days together, thus growing up with the Das children fully sharing the paternal and maternal affection of the old members of that family.

After my removal from Harinavi to Bhowanipore as Head-Master of the South Suburban School and settlement there, I became a constant visitor to the house of my friend. Of course in these visits Mrs. Das was a great attraction. When calling there in the mornings I found my friend deeply engaged in his professional work, scarcely able to look up and have a talk with me; but in his excellent wife I always found a ready welcome, and a few moments of quiet talk, in her store-room where I would find her quietly seated and attending to her domestic duties.

One day's pleasant incident I just remember. On that occasion I called on Durga Mohan accompanied by a friend from Bhowanipore. We went that day on a philanthropic errand. We were thinking of starting something like

of such sanctity and antiquity that it is said to have been rehearsed in all the three Buddhist synods held at various intervals between the death of Buddha and the middle of Asoka's reign (circa. 543-255 B.C.).

In course of time the capital of Magadha was shifted from Rajagriha to Pataliputra, but Nalanda remained a prosperous city, and its situation gained a twofold advantage. It was easy of reach from Pataliputra, yet not so near as to be disturbed by its political changes, its busy life, and its hubbub of people with their pomp of dress and rich umbrellas.[1] On the other hand it was in close touch with the memories of the vanished glory of the old capital, Rajagriha, the scene of many of Buddha's labours and a place of pilgrimage to all after generations. Thus while it could be reached by new life and new activities, it was not shut away from the memories and traditions of the past. Nalanda, thus situated, and adorned moreover with all beauties of nature—with translucent sheets of water studded with blue lotuses and with a scent of the blossoms of its mango-groves in the air—was a place well-suited to religious contemplation and pious studies. Long afterwards when the grand University was founded here and 'richly-adorned towers and fairy-like turrets'[2] arose on its bosom, it looked verily like the 'sweet city of the dreaming spires' of the East.

1. *See* the account of Megasthenes who says that the people were fond of gaudy dresses and attendants followed them with umbrellas.

2. Hiouen Thsang.

We learn from the accounts of Chinese travellers that two traditions were current to account for the name of the place. One tradition, accepted by I-Tsiang, referred its name to that of a dragon which was supposed to live in one of its many vast tanks. But this was rejected by Hiouen Thsang who accepted the other tradition which accounted for its name by the story that Sakya who ruled here in a former royal birth acquired the sobriquet of Nalanda 'insatiable in giving' through his boundless generosity. This tradition would seem to invest the place with an antiquity remoter even than the time of Buddha.

THE ESTABLISHMENT OF A UNIVERSITY.

About the beginnings of its great University we have conflicting traditions coming on the one hand from certain Thibetan and Chinese sources and on the other from two travellers, Hiouen Thsang and Hwui Lun, who seem to have given the local traditions with scrupulous accuracy and detail. It is necessary to decide between these two sets of traditions, specially as the determination of the exact time when this University arose is very important in connection with the course of the history of learning in ancient India.

The first set of traditions centres round the misty name of Nagarjuna, the founder of the Madhyamika school of Buddhism. According to a Thibetan tradition a Brahman named Suvishnu, a contemporary of Nagarjuna, established 108 temples at Nalanda so that the Abhidharma of the Mahayan might not decline.'[1] Another Thibetan tradition makes it a famous establishment even before Nagarjuna's time, for Nagarjuna who was a native of Southern India, is said to have come here to study under the then high-priest, Sahara Bhadra and stepped into his shoes after the latter's death.[2] Sir Samuel Beal, deriving his information from Chinese sources, says, "Between the time of Nagarjuna and Asamga, this monastery (at Nalanda) had been destroyed by the opponents of Buddhism on three different occasions. Yet the establishment had survived after each overthrow and established itself as a centre of learning. It was here that Arya Deva, a native of Ceylon, attached himself to the person of Nagarjuna and adopted his form of doctrine."[3] It is necessary now to enquire what basis there is in the Nagarjuna traditions of the commencement of the Nalanda University.

Nagarjuna figures in Buddhist traditions more as a name than as a personality, possessing, as Kern truly says, 'a double character'—it is on the one side the name of an influential person, the first leader of a school imbued with Hinduism and the methods of Indian scholastic philosophy; on the other side Nagarjuna is simply a comprehensive name in the activity of Mahayanism in the first phase of its outward course.[4] His date is a matter of very wide conjecture. According to Tibetan traditions, he was born a century before Chandra Gupta's accession to the throne of Magadha, which would be placing Nagarjuna in the 2nd century, A.D., as Chandra Gupta was supposed to have ascended the throne in 320 A.D.[5] But in Chinese traditions, the date is pushed a good deal further back. In the rather apocryphal line of succession of Buddhist patriarchs in Chinese, he is placed as the 14th patriarch and is said to have died in 212 B.C. Hiouen Thsang makes him a contemporary of Kumarlabdha for whose use the king of Ka-pan-to, a country near the Pamir valley, is said to have given up his old

1. Taranath's Indian Buddhism, pp. 70-86 quoted in S. C. Vidyabhusan's 'Indian Logic: Medieval School,' Appendix A. But the authority of Lama Taranath who wrote in the 18th century and merely boiled down floating masses of tradition is not reliable.

2. J. A. S. B.—Vol. I, pt. I; 'Life and Legend of Nagarjuna, by S. C. Das.'.

3. 'Catena of Buddhist Scriptures,' pp. 370-71. Ten Successions of Patriarchs (*i.e.*, about 200 years) intervene between Nagarjuna and Asamga. Beal puts Asamga's date at circ., 400 A.D. (Ibid, p. 410, footnote).

4. 'Manual of Indian Buddhism.'

5. J. A. S. B., vol LI, pt. I, S. C. Das. In Taranath we find that Nagarjuna was contemporary with the 5th king in the line upwards from Chandra Gupta. S. C. Vidyabhusan says that the reigns of these intervening kings were supposed to be very short. *See* 'Logic' p. 69.

palace, emulating the example of his contemporary king, Asoka, who built a *tope* in the palace.[1] Now setting aside the patently absurd idea of Alberuni that Nagarjuna was born about a century before his time, two things about his date seem to be pretty certain—that he was a contemporary both of the Indo-Scythian king, Kaniksa and of a South Indian king named Satavahana or Sulivahana.

The *Rajatarangini* makes Nagarjuna flourish about the time of the Turkish kings, Hushka, Jushka and Kaniksha.[2] Hiouen Thsang makes him a contemporary of Ashaghosha, Deva and Kumaralabdha, who together with Nagarjuna are said to be the 'Four Shining Suns' of that time;[3] and Ashaghosha and Parsha lived certainly in Kaniksha's time.[4] But the date of Kaniksha himself is hopelessly problematic. As specimens of the widely divergent conjectures that have been made, the following may be cited—58 B.C. (Fleet in '*Traditional date of Kaniksha*'—*J. R. A. S., Oct.* 1906), 78 A.D. (*i. e.*, the beginning of the Saka era—Cunningham and others), 120 A.D. (Vincent Smith in '*Early History of India,' 2nd Ed., p.* 240 *and also footnote, p.* 241) and 278 A.D. (Bhandarkar in '*A peep into the early History of India*'). Thus the fact of Nagarjuna's being a contemporary of Kaniksha does not very much help us to fix his date.

Now again one Tibetan and three Chinese versions exist of an epistle addressed by Nagarjuna to Satavahana, a king of South India. This epistle, entitled '*Sushillekha*' was a most famous text-book on Buddhist morality and doctrines in the latter half of 7th century, A.D. and I-Tsiang says, "it was got by heart by young men and made life-long study by adults'.[5] A chemical work has also been discovered entitled '*Rasaratnakara*, ascribed to Nagarjuna, which Dr. P. C. Ray assigns to the 7th or 8th century, A.D. In this work chemical processes are described in the form of a dialogue between Sulivahana and Nagarjuna, and Ratnaghosha and Mandhavya.[6] But here again we are confronted with the problem—who was this Satavahana or Sulivahana? It was the dynastic name of a succession of kings of Southern India who ruled from 73 B.C. to 218 A.D.,[7] and no clue has yet been discovered with which we can identify the friend and contemporary of Nagarjuna. The date of this patriarch however cannot be put beyond the middle of the 4th century, as his life was translated into Chinese by Kumarajiva (the professed translator of the '*Lankavatra Suttra,*' one of the Nava Dharmas or nine

1. Watters's on Yuan Chawng, vol. II, p. 286.
2. Stein's Translation, vol. VI, pp. 30-31.
3. Walters's on Yuan Chawng, vol. II, p. 286.
4. *Vide* Takakasu's Introduction to his translation of I-Tsiang, p. IX.
5. Takakasu's I-Tsiang, p. 158 ft.
6. P. C. Roy's History of Hindu Chemistry—vol. II, p. XL-XLI.
7. Bhandarkar's 'Early History of the Deccan.'

canonical books worshipped by the Mahayanists, in the final verses of which the career of Nagarjuna is prophesied) who left India in 383 A.D.[1] Nagarjuna's date as a matter of fact must remain problematic till further discoveries throwing light on the subject are made.

Not only is the date of Nagarjuna uncertain, his personality also is so thickly encrusted with legendary matter that the substratum of fact can hardly be got at. In respect of the number of works ascribed to him, he is a sort of Buddhist *Vedavyasa.*[2] He figures in Tibetan traditions not only as a great disputant and propagandist in Southern India and Philosopher, but also as an alchemist and magician who feeds the monks of 'Nalendra' in a time of famine by the exercise of magical arts. In Chinese legends he figures as a doctor also, specially an eye-doctor.[3] He figures in fact as the representative of nearly all Buddhistic learning. It is therefore not unlikely that the beginnings of this famous university should come to be associated in traditions with the supremely great and legendary name of Nagarjuna, by a process very familiar in India. But the Tibetan legends become highly suspicious when we are told to gulp down the fact that Nagarjuna, who is said to have preceded Chandra Gupta by a century, refuted the doctrines of Sankaracharya who flourished in the 8th and 9th centuries A.D.![4] This glaring anachronism indicates a late origin of the tradition and the probability is that the legend connecting Nagarjuna with 'Nalendra' grew when that monastery had already become the principal seat of learning in India and acquired an Asiatic reputation. If there had actually existed some educational institution at Nalendra, it must have been so totally destroyed (why it should have been so we have absolutely no historical data to imagine) by the beginning of the 5th century, that Fa-hian who came to India with the express purpose of collecting Buddhist canonical books and came so near as Rajagriha, does not seem to have paid a visit to it and he vaguely mentions a village called Nalo where there was a monument to Sariputtra.[5]

Hiouen Thsang's account of the origin of this University does not however offer much historical difficulty. His account moreover is borne out by another traveller who came here from Corea. As we have already shown by a quotation from the *Dialogues of Buddha* that Nalendra was a very ancient place famous for its Pavarika or Mango-Park. Buddha is represented in the Pali Buddhist Scriptures as residing from

1. Watters, vol. II, p. 204 and Takakasu's I-Tsiang, p. lix.

2. In Nanjio's Catalogue 24 books are ascribed to him and he is the supposed author of a host of Tantric and Chemical Works and a recension of Susruta.

3. Watters, Vol. II, p. 206.

4. J. A. S. B., Vol. II, pt. I, S. C. Das, p. 117.

5. Beal's Buddhist Pilgrims, 1869 Ed., p. vi.

time to time with his followers in this beautiful Sylvan retreat.[1] The grounds of this Mango-Park, according to Hiouen Thsang were bought by 500 merchants for 10 *kotis* of gold coins and presented to Buddha and this became, afterwards the site of the Nalanda monastery.[2] The place had also, besides those connected with Buddha, other holy associations. It was associated in later times whether rightly or wrongly with the names of two of Buddha's most prominent disciples, Sariputtra and Madgallayana. Fi-hian makes it the birth-place of Sariputtra and the scene of his entrance into *Nirvana*; while Hiouen Thsang, making Katapunaka the birth-place of Sariputtra speaks of Nalanda as the birth-place of Madgallayana.[3] In the Thibetan *Dulva*, we find that the maternal grand-father and mother of Sariputtra hailed from Nalanda[4] which is his birth-place in the *Matravastu*. The place in short was classic ground to the Buddhist and no wonder that it became a resort of devout pilgrims and pious students.

Hiouen Thsang speaks of six kings of Magadha belonging to the Gupta dynasty as having contributed to the buildings of this splendid University. The first monastery was built by Sakraditya. His son and successor, Buddha Gupta, built a second one to the south of the former. Tathagata Gupta built a third monastery to the east of Buddha Gupta's monastery and to the north-east of this Baladitya added a fourth (the King himself is said to have been a brother of this monastery). To the west of this again Vajra built another and to the north of this a King of Mid-India afterwards built another large monastery. The whole was afterwards enclosed by a lofty wall, forming a group of six Buddhist Conventual Colleges. Cunningham from various epigraphical and numismatical researches places the dates of the Gupta Kings mentioned by Hiouen Thsang at 452, 480, 510, 540 and 570, respectively.[5] Without binding ourselves down to Cunningham's Chronology, the date at least of the first monastery at Nalanda may be placed about the middle of the fifth century. We cannot ascertain when the last monastery built by a King of Mid-India was completed and the whole was surrounded by a lofty wall, but by the beginning of the seventh century the university was complete and its work was going on in full swing. This account of Hiouen Thsang's is borne out also by Hwui Lun, a Corean who visited India during the latter half of the seventh century. He says about the Nalanda establishment which he visited, that it 'was started by an old

1. *See* Rhys Daivds's Buddhist Suttas (S. B. E.) pp. 12, 15 and Dialogues of Buddha, pp. 1,276. *See* also references to Nalanda in Pali scriptures cited by Watters, vol. II, p. 164, footnote.

2. Watters, vol. II, p. 164.

3. Beal's 'Buddhist Pilgrims,' p. 111, and footnote.

4. Rockhill's 'Life of Buddha,' p. 44.

5. 'Bhilsa Topes,' p. 141.

King Sri Sakraditya for a *Bhiksu* of North India named Raja-bhoja. After beginning it was much obstructed but his descendants finished it and made it the most magnificent establishment in Jambudvipa.'[1] He adds the interesting detail that this was the only temple where by imperial order a water clock was kept. Thus the Nalanda University took its rise about the time when in Europe with the dissolution of the Western Roman Empire, Græco-Roman learning was eclipsed and from the 'frozen loins' of the 'populous north' barbarians were pouring forth on the fair countries of Europe and rapidly changing their history and civilization. It is interesting also to remember that when Nalanda in the 7th century was at the height of its glory, by far the most prominent seat of learning in India, the resort of numerous foreign students and scholars with 10,000 as its numerical strength, Europe was in the darkest watch of the long night of the Middle Ages—the Saracenic Schools and Arabic learning had not yet been founded,[2] the Crusades had not brought the first tidings of eastern learning into Europe, Abelard and others had not begun to teach in Paris and the Universities of Oxford and Cambridge had not been so much as dreamt of.

The buildings of the University of Nalanda, when they were complete, were a marvel of architectural skill and beauty. As the visitor entered through the gate, he was ushered into the great college standing in the middle of eight other halls. Beyond these were the outside courts which were the residences of the priests, all of seven stages, having 'dragon projections and coloured eaves, the pearl-red pillars carved and ornamented, the richly-adorned balustrades and roofs covered with tiles that reflect the light in a thousand shades.' Within the premises stood the observatories 'which seemed to be lost in the vapours of the morning and the upper rooms towered above the clouds.' Its three grandest buildings, according to Thibetan tradition, were called *Ratnasagara*, *Ratnododhi* and *Ratnaranjaku*: of which *Ratnodothi* in which were kept sacred scripts called Prajnaparamita sutra and Tantrika works, such as Samaja-Guhya, &c., was nine-storied.[3] We have also indirect

1. Originally found in a work by I-Tsiang giving accounts of 52 pilgrims who visited India about his time from China and adjoining countries which has been abridged in English in Beal's Introduction to the Life of Hiouen Thsang. *See* Intro., p. xxvvii.

Jambudvipa is of course India. It was an old belief in India that the earth was divided into four 'dvipas' or continents, *viz.*, (1) Uttara-kuru-dvipa (square, 8,000 yojans in extent, on the north of Maha Meru—probably Ptolemy's ottoro Korrkai, Eastern Turkistan) (2) Purva-Videha (Crescent-shaped, 7,000 Yojanas, on the east of Maha Meru), (3) Apara Godaniya (round, 7,000 Yojanas, on the west of Maha Meru), (4) Jambudvipa (Triangular, 10,000 Yojanas, on the south of Maha Meru)—*see* Hardy's 'Manual of Buddhsim' p. 4.

2. "The foundation of Arabic literature was laid between 750-850 A.D."—Prof. Sachan's preface to Alberuni 1888 Ed., p. xxviii.

3. *See* S. C. Vidyabhusan's 'Logic,' Appendix A., taken from Pog-sam-jon-zang, edited by S. C. Das.

evidence of the wealth of Nalanda's library in the fact that many foreign students like Hiouen Thsang, I-Tsiang, Taou-hi, Hiuen-ta and others either copied or carried away from here volumes on volumes of sacred works to increase the literary wealth of their own country.[1] 'The richly-adorned towers and fairy-like turrets,' as Hiouen Thsang picturesquely describes, 'were congregated together like pointed hill-tops.' The panoramic view from the top was one of ineffable beauty. From the windows one might see above 'how the winds and the clouds produced new forms and the conjunction of the sun and the moon' and below 'the translucent ponds bearing on their surface the blue lotuses intermingled with *kanaka* flowers of deep red colour and the gentle shade of the mango-groves spreading over them all.[2]

THE EDUCATION IMPARTED AT NALANDA.

The education imparted at Nalanda was both religious and secular. Prizing highly the freedom of the human mind which has been the greatest glory of India as it was of ancient Greece, discussions and debates on religious questions were freely entered into by all students here. The religious part of the education imparted was probably far from the cold and formal ecclesiastical training of the church schools of ancient Europe. I-Tsiang also speaks of the religious discussions and debates held by "eminent and accomplished men who assemble here in crowds to discuss possible and impossible doctrines."[3] We have it from Hiouen Thsang's biographer that not only the Buddhist canonical books, but the doctrines of all the eighteen sects of Buddhism and even the Vedas and other works were studied in the monasteries of Nalanda. In this connection it would be instructive as well as interesting to cite a parallel from the history of education in Europe. In the Middle Ages in Europe when education passed into the hands of the church, the question raised early between the School of Origen and the school of Tertullian was keenly debated whether heathen literature was to be admitted into the curriculum and the weight of church opinion leaned to the negative view. Literature was clipped and trimmed of its heathen decorations and a system of education was set up in Europe which, excluding the works of the great Greeks and Romans, encouraged the study of second-rate Christian poets who wrote in the 4th and 5th centuries on orthodox scriptural themes. We know to what extent this stripping was effected by a description happily preserved in the verses of Alcuin of the library of York

1. *See* Watters, vol. I, p. 12; Takakasu, Intro. p. xvii; Intro. to Beal's Life of Hiouen Thsang.

2. The description is mainly taken from Beal's Translation of the Life of Hiouen Thsang. *See* also Hwui Lun's description in the Introduction to the same book, p. xxvii.

3. Takakasu, p. 162.

as also by an interesting incident of a monk who was castigated by this Mæcenas of Charlemagne for having stolen the pleasure of reading the heathen works of proscribed Virgil.[1] Almost the same conditions were present in India under the suzerainty of the Guptas: education passed into the hands of the Buddhist monks. But no attempt was ever made to stifle or discourage the literature or learning of the rival sects—Nalanda, for example, where opinion could meet opinion and their conflict could give impetus to intellectual activity.

Scholastic education about this time in India was divided into the five great sciences, just as the Hellenic Encyclopædic education was divided by Alexandrian scholars into the trivium of arts, *viz.*, Grammar, Rhetoric and Logic, and the quadrivium of sciences, *viz*, Arithmetic, Geometry, Astronomy and Music. Both Hiouen Thsang and I-Tsiang speak of this five-fold classification and it is found in other Chinese books also.[2] Even in Thibetan literature this classification is found. We read for instance of a Tasi Lama named Sakya Pundita that he was proficient in the five great sciences, *viz*, the Mechanical Arts, Medicine, Grammar Dialectics and Sacred Literature. This Lama died so late as 1252 A.D., and he is believed to have introduced Buddhism into the land of Hor of Mongolia.[3] Now at Nalanda all these five sciences were taught except the 'Science of the Arts and Crafts (*Silpasthana* vidya).[4] Thus with the preliminary exclusion of technical education, the curriculum included the following :—

(*To be continued.*)

SUKUMAR DUTT.

THE NEW-YEAR.

Another year, that brought us weal
And woe in shapes untold, and grew
Infirm and old, is dead and gone,
Succeeded by a suckling babe
Whose birth has been proclaimed by booms
Of cannon, fired from forts and fleets,
All o'er the world, from East to West,
And North to South, to wake up men,
And beasts, and birds; and those that live
In rivers and the mighty main,
To bid them greet the baby-year,
And we have hailed the New-Year's Day;
But did we miss the parting year?
Did we compare our gain and loss?
As with the year, so with ourselves—
We don't remember those we loved
And lost, and who'll ne'er ne'er return.

B. AHMED.

1. *See* Courthope's History of English Poetry, vol. I, chapter on Medieval Poetry.

2. Watters, vol. I, p. 156.

3. J. A. S. B., vol. II, p. I, *see* S. C. Das's contributions on Tibet, pp. 19, 20, 66.

4. Beal's Life of Hiouen Thsang.

THE DACCA REVIEW.

VOL. I. JULY, 1911. No. 4.

THE WEB OF OUR MODERN LITERARY LIFE: A STUDY.

"Our age is bewailed as the age of Introversion. Must that needs be evil? . . . . If there is any period one would desire to be born in—is it not the age of Revolution; when the old and the new stand side by side, and admit of being compared; when the energies of all men are searched by fear and by hope; when the historic glories of the old can be compensated by the rich possibilities of the new era? This time, like all times, is a very good one, if we but know what to do with it."

—*Emerson.*

THE cry has gone forth that our Literature must be pushed forward and already our professional men of letters are on the war-path. The literary chisel and hammer have been busy and signs of an increased literary activity are visible all round. The atmosphere seems thick with novel schemes and experiments and we have even had an Academy of Literature in the "Bangya Sahitya Parishad" whose membership has swelled in numbers very appreciably of late and which has its own literary organ and its branch organisations even in some remote mofussil centres. Our practical genius has shewn itself equal to the task of organising spectacular and really imposing literary conferences where hundreds of our cultivated countrymen and even a sprinkling of our nobility have met and talked and treated each other to social and literary convivialities.

All this is very exhilarating. There is certainly a soul of good in these entertainments and enterprises: they serve to foster a spirit of comradeship amongst our intellectual men and give occasion, at worst, for the display of intellectual pyrotechnics. So much of

enthusiasm cannot run to waste; the effervescence of literary culture is no doubt latent in the effervescence of the soda-water bottle broken on these occasions; "the feast of reason and the flow of soul' no doubt goes side by side with their more material counterparts and the guest at the banquet carries away with him memories not only of the grateful odours of the kitchen but perchance stray bits of the literary myrtle and ivy.

2. One thing is sure: the literary cauldron has been set boiling and is fast cooking dishes of diverse taste and flavour. We have got to be wary, however, that it does not prove a veritable witches' cauldron. Monstrosities and freaks of nature will in the very necessity of things come out occasionally from the literary cooking-pot: we have got to see that they do not strangle the healthy, delicate off-spring of our tender-limbed Muse.

3. It is thoughts and gentle fears like these that have prompted the present writer to dip his pen in ink. The critic is always an unpleasant phenomenon; all his sincerity, all his disinterested love of culture and truth are not enough often to shield him against imputations of jealousy and pitiful spite. But we are living in times when the critical effort must rouse itself to pave the way for another burst of genuine and high-toned creative effort in our Literature. Our society is now being swept by a variety of cross-currents which are introducing chaos and disorder into its long sterilised channels; the old and the new, the modern spirit of Europe and America and the old rules and standards of our Indian life are jostling each other; there is being infused into our social life an element of high-soaring ambitions and ideals; but a corresponding amount of clearness of vision and the aptitude to handle and organise the materials lying confusedly about, for the realisation of our fondest hopes and convictions is wanting. The unquestioning pupilage to the west is now fast disappearing; but the spirit of a healthy trust in the genius of our Race is yet only in the making. In certain quarters, this joyous and modest trust in the permanent elements of our social life is taking deplorably aggressive forms; in others again, this is only a superficial catch-word raising no warm sensations in the heart and modifying none of the practices of life. Our ideas are yet mostly floating about in a dream-land of our own without a habitation in the inner deeps of our life. There is thus a wide gulf between our ideas and practice. The result is seen in our present-day literature. Literature has been divorced from life or at best represents the life of the microscopic minority of the so-called cultivated few. A stock-taking of our literary gains and losses, our literary assets and liabilities, has thus become imperative. We want in our midst the genuine, clear-eyed

critic, who knows that criticism is a sacred function and implies as the law of its being a disinterested endeavour to learn and propagate the best that is known and thought in the world—and in every department of human knowledge, "to see the object as in itself it really is."

4. The web of our present-day literary life suggests several problems to those who have watched it from a sympathetic distance and have thus had the advantages of a more or less philosophic detachment to bear upon their visions and interpretations of its phenomena. It is with great trepidation of heart and in all humility and sincerity, that the present writer ventures to suggest the following questions as worthy of careful attention from all lovers of our language and literature.

First, if our high-paced literary organisations are not attempting too much and if their programme of work is not somewhat too wide in range;

Secondly, if the vociferous talk about popularising Science in our literature and making it the vehicle of scientific discoveries, truths, and researches, is not premature;

Thirdly, if it is not really jeopardising the higher aims and objects of Literature to include all manner of ill-assorted, mechanical putting of scientific facts in the designation of Literature;

Fourthly, if an orgnisation so well launched as the "Bangya Sahitya Praishad" might not more profitably turn its attention to properly fulfil the functions of a central authority, a paramount and recognised organ of literary opinion which would, like the French Academy in the days when it was started, give the tone to our standard Literature, check the unruly excrescence of the literary novice, and discipline and train the taste of a growing literary public. It would have, of course, if it wants to do this, to set limits to the scope of its activities, but a proper economising of our resources and energies is essentially necessary for the well-being of our literary life at this crisis.

5. The time has certainly come when we should make a determined effort to discountenance *literary dilettantism*, the pursuit of literature in a holiday humour. We have got to array our literary forces and not to fritter away our intellects in attempts of too ambitious a nature, which might give a cheap notoriety to the literary adventurer but are not calculated to help the cause of 'sweetness and light'—a broad-backed and manly spirit of culture.

The task of embodying scientific research and the study of the facts and phenomena of nature in our own language is certainly a laudable one; but any immediate attempt in that direction is yet too early when the vast bulk of our educated countrymen live in blissful ignorance of the bewildering and

wonderful developments of modern science and in some cases have to plead guilty to a crass ignorance of even its elements. Such an attempt is foredoomed to comparative failure, for it will fall on a soil that is not yet ready to assimilate it and die of malnutrition. To give the higher truths of modern science a Bengalee vesture with a portentous array of English foot-notes and of elaborate quotations from English and continental sources, and a hideous Bengalee nomenclature such as might make the spirits of our literary masters—the makers of our modern Literature—'stare and gasp' in the other-world—may have its allurements to certain minds; but such a literature —'if literature it might be called, that literary form has none'—would be a mushroom growth sticking like burrs to the delicate-woven garments of the Bengali Muse and would strike no roots into the linguistic soil. How such publications would help those for whom they seem to be intended, *viz.*, our countrymen who are strangers to English education and are more or less lost to the modern spirit, is not easy to see. It would not do to blink at the hard, stern fact—*viz.*, that English Literature with all its subtle aroma of influence in all planes of our national life, ***has come to stay*** with us and as the language which has conquered a large part of the globe, is bound to be the vehicle, as the years roll on, of the highest findings of science which is nothing if not cosmopolitan in its interests. To attempt a literary *tour de force* here would be perhaps sheer futility. And then where, I ask, is the necessary scientific atmosphere? we have got to create one; a beginning has been made but it is still a stretch of long years before we shall be able to claim for ourselves a distinct place as an Indian school of chemistry or of botany, or of any other science. Where again, is the man of science amongst us who writes in the language of his countrymen, to find that steadying environment of co-partners and rivals which in Europe and America keeps the lover of truth from losing himself in the miry ways of self-conceit and blundering egotism? That the atmosphere of scientific research in our country is already getting a bit clouded with the mists of egotism and the petty jealousies and bickerings which are its natural offspring, we have had already evidence before us to show. And lastly, where is the scientific public to whom he would appeal?

Take again the scientific studies which are more allied to pure literature —*e.g.*, archæology and Ethnology, comparative philology, &c. Here again the specialist must be content to be a silent worker for many laborious years to come, before he can, with any appreciable chance of catching the public ear, publish his theories or re-distribution of facts in the light of new investigations; for the specialist can appeal only

to those who have themselves after preliminary training taken to these neglected but important corners of our national existence. And so long as more accurate foundations are not laid of our ancient history, a stray bit of old crumbling masonry or an isolated vestige of an exploded social feature may be utilised with effect by literary brilliance and may serve to raise fine fancies, but it will have to wait long, long indeed, as mere fuel which the fire of a future historical genius might light up into accepted truth and give it proper history, measure and setting. The genuine worker in these fields may meet only with cool disdain at the hands of his contemporaries while the busy, advertising, bustling antiquarian and researchist will sail in the fair gale of popular recognition and praise, if only for a time.

There is again, a distinct danger to our Literature from persons—very estimable and able in their own line—but without a literary training and all its far-reaching implications—arrogating to themselves the functions of a Bengalee litterateur. A scientific education is a valuable asset to every man and fosters habits of precision and penetration into the minutæ of things and events such as no other training possibly can; yet it must be admitted by all candid persons—though it is a misfortune that in certain circles such a plain truth is sought to be discredited or ignored—that the training which fits one to manipulate the Leyden jar or to use the spectroscope or again to classify genera and species in the plant and animal kingdoms or even to light upon an undiscovered element or a new interpretation of physical activity—does not imply or include the training necessary for manipulating the instruments of language with quiet dignity and a habitual sense of proportion. More qualities of the intellect and of the heart go to give that harmony and elegance, that proper disposal of light and shade, that propriety of phrase, that flexibility of expression, that subordination of parts to the whole, to a literary composition which is after all its soul,—than are amenable to quantitative and qualitative analysis in the chemical test-tube or to accurate weighing in the balance of the physicist. Writing—the art of expression in words—is indeed a most difficult art and can be trained and harnessed to proper control only by long, patient, and arduous discipline. This fact, so patent to many of us with a literary training, is evidently made light of by many of our budding scientists who are fired with the noble zeal of lighting their torches at the flame of our Literature. But look at what such an eminent man of science as Lord Rayleigh said on a certain occasion :—" At Cambridge we need our specialists and we are proud of them, but even a specialist is none the worse for having a command of language and even for the grace of style. I know

many specialists have those qualities, but I am sure there are a great many others who have not. On that side perhaps Cambridge is still, or at any rate, was rather deficient. This is one of the matters as regards which, I think, we might learn something from the sister University."

There are men amongst us who are not only eminent as scientists but have at their command the "art of expression' in an eminent measure but the number of others who rush into print on matters inside or even outside the pale of science without having properly trained their literary powers is not small. They forget that there is no working by the rule of thumb in literary manipulation; they delude themselves into the pleasant belief that anything is good enough as long as the main idea is roughly indicated somehow. But—no! —Literature has its amenities and graces the subtle laws of which are as inexorable and mysterious as the laws of the "magnetic fields" and of the "X-ray" and like nature's laws take revenge on those who violate them. The naive violation of the common laws of literary propriety and correctness—not to speak of elegance or finesse—the loose jumbling up of facts and ideas without an attempt to give them an organic unity and cohesion—that characterise some of the literary attempts of this tribe of the learned—are patent enough: their "lean and flashy" writings "grate on their scrannel pipes of wretched straw" and irritate the literary nerves of every man of taste. And yet some of our leading organs shelter such performances in their pages without a word of comment. The scientific papers read or "taken as read" at our literary conferences make up a very respectable file; some of them are no doubt very brilliant, yet he who runs may read the glaring defects of arrangement and expression in many of them.

In themselves, individual vagaries and fatuities in literature are of small moment; but their combined influence on a literature that yet is making and absorbing many diversified materials into its growing structure is not negligible. The learned scientist who presided at the functions of this year's literary conference said—in a vein of delicate apology (before introducing some of his eminently interesting and brilliant contributions to a new chapter of physical science—contributions which are perhaps destined to modify our conceptions of life and its manifestations—into his presidential discourse)—that the scope and significance of Literature has got to be widened amongst us—and in his irresistibly charming manner illustrated the theory that the man of science is a seer and a poet—perhaps in a higher sense—and thus poetry and science are allied by subtle bonds of intimacy. This is very true; still it is a truth which has, like all human statement of truths, to be accepted with

limitations; for its natural and logical corollary might to some minds appear to be that the man of science can take up the role of a literary master and impose his will on Literature; and that he can do it without any special innate gift or trained aptitude. At another of these literary conferences (there is some looseness by the way, in this name given to a hybrid association of men of talent and influence—many of whom do not cultivate literature, of all shades of opinion and varied walks and pursuits in life—) another eminent scientist adumbrated the proposition that the Bengalee asristocracy of intellect, *viz.*, the much-maligned Brahmins spent away their time in barren and unproductive "logic-chopping" while the Sciences of Europe were knocking at at their doors and that this was a besetting sin the woful harvest of which we are now gleaning in the shape of languishing industries and a dying race.

Such pronouncements should not go unchallenged simply because they come from men of mark; rather it is on that score that they should be sifted clean. Hasty generalisations or explanations of social phenomena, however brilliant, should always be avoided; and the present writer humbly ventures to think that the eminent scientist has been in this instance betrayed into an exhibition of unscientific spirit in laying on the shoulders of the highly intellectual Brahmin of the "logic-chopping" period (give it as bad a name as you please!) what was perhaps the outcome of mightier forces than the Brahmin with all his intellectual foresight could stem.

There may be persons even so unregenerate as to believe that the intellectual gymnastics afforded by the dialectical subtleties of *Navya Nyaya* helped to keep intact the brains of the Bengalee Brahmin and that perhaps without them the pursuit of science aud the idea of its application to practical fields of industry would have been still more belated in pressing its claims on Modern Bengalee Society.

But this only by the way. To go back to our main theme. The alliance of Science with pure Literature is one prolific of good results; but the temple of Literature, to parody a well-known passage of Burke's, ought to to seated on an eminence: any "confused heap of jarring atoms" even though it be of the literary laboratory of the man wedded to science, should not, before it takes enjoyable and appreciable form and combination, be allowed to erect itself on the Literary Parnassus. Those serene heights must be kept immune from vulgarising influences, from ambitious philistinism under whatever specious disguises it comes. Let it be understood that the sciences and the humanities, though they have many points of contact, (for truth is after all one, though approached by different men and different activities of the soul through separate key-holes) are yet situate on different planes and are

disparate attempts of the human intellect to realise and unfold itself. Verily, Science and Poetry are allied and are only two ways of reaching to the heart of Truth and Beauty—Verily, Poetry is, as Wordsworth said, "the impassioned expression which is in the countenance of all Science" and true it is that science opens up before our bewildered gaze ever-new beauties and wonders that the poet sees through an emotional veil—yet one works by the forces of intuition and inspiration and the other mainly by a slow, long, laborious dissecting and analysing process. The man is after all more than nature and the activity which seeks to give a voice to the higher aspirations of our inmost self and to deepen and widen the current of our spiritual existence has and should always have precedence over the activity which seeks to know the outworks and environment of Man. Yet they are both parts of that human endeavour which, through the countless ages, is seeking to elevate and purify man into the Divine and both will profit by working in consultation and harmony. Literature is gaining in depth and meaning, the visions of the poetic and literary imagination are being more and more confirmed and deepened by the findings of Science, and Science also will be humanised and sweetened, made not the tyrant but the pliant slave of the human soul—as time goes on, as the ruts of culture are widened,—by the fine efflorescences of poetry and literature. Let the man of letters and the man of science join hands in tolerance and sympathy and let it be laid to heart that truth of science is not truth of literature until it is made literary, *i.e.*, brought into line with our inner spiritual experiences and given a shape and a form that literature recognises as her own.

To come to the "Bangya Sahitya Parishad." The Parishad is now attempting too much: it is trying to realise in its being the duplicate functions of an Academy of Literature, and an Academy of Science. The programme, is in all conscience, too stupendous for one body and it is time that there should be two separate organisations which may have the choice of sending representatives to the committees of each other. The Parishad has immediately in hand such diverse tasks as the gathering of materials for an up-to-date Dictionary of the Language, the formation of Scientific nomenclatures, the publication of the relics and remains of our older literature, the restoration of the missing links in our social evolution by the exploration of old artistic remains, the study of old social rites, and our tribal and communal differences, the discovery of old coins, old script, &c., &c. This is a work gigantic in the undertaking and in its possibilities; some of it has been attempted by foreigners but the history of a people's evolution can not be unravelled with justice and insight by foreigners reared up among wholly

alien influences and ideas and we shall have to do it afresh, thankful certainly for the ground already broken for us by these enthusiastic pioneers.

But the task to which the Parishad as an academy of our literature should address itself is to check the forces of alien influence and of vulgarity, the vapid inanities and mechanical standards to which our literature is now subjected. The literature has already been anglicised in its turns of expression, perhaps a bit too fast; the woful result is that to the ears of large masses of our literate countrymen accustomed to the simple and direct appeals of our genial old *Kritibas* and *Kasidas*, the literary outpourings of even our periodicals have a strange, uncanny note; and as a reaction against the over-charged Sanskritic diction of an earlier day, a fashion has set in of embedding vulgar colloquialisms in language. The result is, in many cases, a monstrosity, unintelligible to the masses, and unsavoury to the trained literary taste. A fixity must be given to the vocabulary by a really authoritative dictionary or the entire tone of the Literature may be vulgarised. The Parishad should, more and more, attempt to act in concert and to erect itself into a final court of appeal in matters literary and affix the seal of its approbation to whatever pretends to pass current as literature before it is printed and palmed off on the public as a standard book. We ought to have a very strong and representative committee for this purpose which should try to induce the Government to delegate to itself the functions of a text-book committee. For it is an open secret that our elementary text-books are not always of the purest literary quality. Let the leading members of the Parishad concentrate for some time to come all their energies on this question and the Parishad will earn the gratitude of the entire community.

NRIPENDRA CHANDRA BANERJI.

MUSSOORIE.

One often hears that there is no better educator than travel. The traveller, like the school-boy, wants his lessons as short as possible and sighs for the end. The end was within sight when the train stopped in the early morning at Dehra Dun station. All was astir and in a short time the platform was littered with piles of baggage between which it was difficult to make one's way. It was not necessary to go far for a tonga; indeed, if one was not careful he would be hustled into half a dozen contracts before the valuable word "Kitna" was uttered. A dozen coolies pounce upon the baggage while you are put into a crazy vehicle. A pleasant obliging assistant gives you assurance that all is right, and with a deafening rattle you leave the station to the usual benediction of "bakshish." "Kitna" and

"Bakshish" are the incantations which melt away one's store of potential energy. But what does that matter! The scorching plains are left behind and the cool green hillocks come forward to invite you to the darker, sterner hills beyond. The lover of nature finds no barrier between him and his goddess. She is everywhere and will reveal herself in her splendour and majesty to every wooer. He who wishes to know men finds barriers which cannot be scaled, except by a long tedious course of grammatical monotony, and after scaling, only a few peaks show themselves above the surrounding mist. Oh! for an esperanto!

The drive from Dehra to Rajpur in the tonga in the early morning through the cool breeze refreshed the soul. The hedges, the broad white road, the trees with their ample foliage, the shrubs and their blossoms, the ripening corn and the distant towering hills recalled a drive on an August morning through one of the lovely valleys of North Wales. But the people were different. The old driver's weather-beaten face was a few shades darker than the bronzed face of a British peasant. He wore the same immovable expression, but mounted it by a tailed puggree instead of a felt hat. To get to Rajpur was his sole object, to see the scenery was mine; and I allowed him to bear all my burdens.

The tonga and dandy agents are full of anxious solicitude for one's health. "Don't risk heart troubles, take a pony or a dandy but by no means walk up." They emphasize their injunctions by harrowing tales of men who fell dead for their temerity. Who would dare walk from Rajpur to Mussoori? Some are born horsemen, some have horsemanship thrust upon them and others dare not ride a strange horse on the brink of a precipice, so they hire a dandy. The agent is appeased and you get in. What is a dandy? It is a seat in which you can sit uncomfortably. Its means of locomotion is derived from the sturdy limbs of four coolies. Two sweat in front of you and two blow a yard or so behind. It is so delicately poised on their shoulders that you cannot take liberties with your own limbs without running the risk of precipitation. And that is a piece of gymnastics which the supple Japanee would hesitate to perform when dangling over a thousand foot precipice. And the coolies are strong. The steep slopes have no terrors for them. One feels ashamed of the flabby heat-softened limbs they carry in their dandy. But up, up they go, until Mussoori is reached and the 3,500 feet from Rajpur are surmounted. One feels a little regret at parting with the dandy and its human appurtenances. Their good humour and their incomprehensible jokes, their strenuous life and hard fare all appeal to one's better feelings; the regret at parting is deepened by the usual demand for Bakshish.

We were at Mussoori and the dandy coolies were stretching their limbs in the shade. But where was the baggage? Up it came on two legs. The baggage cooly will carry his maund up the long steep slopes with no sign of exertion other than his bent back and moistened brow. He is brother to the more aristocratic dandy-walla. He carries a greater burden at a less remunerative rate. They live a hardy life. At night they are frequently seen sleeping on the road side, sheltered from the wind by a piece of rock. They wrap themselves in their dark coarse blanket which seems to be their home. Why does no railway or wire-rope run to Mussoori and thereby reduce their burdens? Ask the engineer and the capitalist? No, ask the cooly. His livelihood and his price answers the question.

Leave the coolies and let us see Mussoori. The bearer will look after the baggage.

But one does not see Mussoorie on the first day and perhaps not during the first week. The Mall may be reached but no notice is taken of its windings nor of the numerous buildings dotted on either side. The eyes are directed to the deep steep glen running to the plains. There one sees the road from Rajpur as a yellow streak on the valley sides. Then deep below one's feet is a cart track winding in long loops in and out the "Khuds." The dark green foliage of the woods, the russet brown of the hills, the yellow patches of corn on those crazy terraced slopes are a source of wonder and speculation. The head of this valley is closed in by a horseshoe-like range of hills from Landour to Vincent Hill. The Mall with its extensions is a horizontal way cut along the range at a height of 6,500 feet above sea level. It makes a pleasant walk when the sun is low, but not so during the middle of the day. The Mussoorie people forgot when they made it that trees afford a pleasant shade. They now suffer unending remorse, at least, when they walk along it. Scattered on the hills forming the horseshoe and on the two spurs running in a north-westerly direction are the hotels, boarding houses, private residences and other buildings which go to make up Mussoorie. These buildings stand prominently on knolls, or they hide themselves in woods or behind spurs of rock and were it not for numerous sign-boards and steep paths, no one but a shikari could find them.

There are four main roads out of Mussoori. Don't imagine they are broad macadam roads; they are a little better than bridle-paths along which coolies and mules bring in food and fuel for the community. The first in importance is the road to Rajpur and then on to the plains. The next, though perhaps not the most traversed, descends to the Jumna valley and leads on to Chakrata and Simla. The road to Tihri goes east following the range of

hills on which Mussoori stands and which flank the southern side of the Aglar Valley. The other goes west on the same range, passing Cloud End to a point where this line of hills ends and where the Jumna leaves the mountains for the plains.

The bracing effect of the cool air produces a crop of good resolutions, as does also the cold bleak first of January in Europe. One resolution is that a daily "constitutional" will be taken and interesting points in the neighbourhood visited. The first morning the noted Camel's back road is taken. It is a level path on the north side of the range and overlooking the Aglar Valley. The road is shaded and pleasant and here one sees for the first time the snow-capped peaks peeping over the shoulders of the lesser hills in front of them. The road leads to a gorge connecting it and the Mall. There are other horizontal circular roads,—that rounding Vincent Hill; that, at a higher altitude, rounding Landour, and those on the Castle Hill estate. Good level walks may be had from Charleville to the Municipal gardens and beyond to Snowdon. All of these are full of interest to those who enjoy scenic beauty. Before long all the neighbouring walks will become familiar and a desire to see the world beyond will arise.

On a cool evening, while waiting for dinner one decides to take a long walk or pony-ride the next day. These resolutions are always made when the sun is out of sight and before satisfaction with things as they are creeps from the dinner to the blood. The danger of such resolutions is that preparations may be made and one finds oneself on the way before the sun frowns in his wrath. And so it was. The cool morning gave the strength which the sun begrudged.

Bunog is a hill to the North-West of Mussoori. It is approached by the road which follows the range of hills to Cloud End and beyond. The road is fairly well shaded until you reach the slopes of Bunog. It passes under a hill called Snowdon, then within sight of Mackinnon's Brewery, the Toll house. On the left is a bungalow formerly used by Colonel Everest when making his Great Trigonometrical Survey. After a gentle rise for some distance beyond the Toll house a steep shaded path leads one to a neck joining the Cloud End line of hills and Bunog which stands on the north side. The path now zigzags up the slopes and the sun frowns. No water can be found and the water-bottle you are wise enough to carry is soon emptied. Perspiration and thirst make one doubt the wisdom of seeking pleasure in such a way. The ridge is reached and there the breeze comes as a gentle goddess to cheer you to the heights above. No regret is felt, for the mighty Himalayas reward you with their smile. Down deep below your feet is the winding gorge of the Jumna. As a

faint line on the hills beyond can be seen the road to Chakrata. Above the dark and russet neighbouring hills are the glistening snows, not peeping over the shoulders of lesser hills but towering above them in their majesty. In the opposite direction are seen Mussoori, dotted with its white buildings. The Dun and the Siwaliks, and beyond them the larger Gangetic plain, spreading away to a misty horizon. The thirst disappears, blown away by the cool breeze and the fatigue is forgotten in the wonderland about you.

The road to Tehri rises gradually to to the mountains. It passes through the wooded slopes of the Jaberket estate to Jalki and beyond. At a point about five miles from Mussoori a magnificent view of the mountains is obtained. The road leads to "neck" joining one mountain mass and its neighbour, and turns sharply to continue its winding course high up on the precipitous mountain slopes. Immediately in front of you is Top Tiba. It stands about 1,000 feet above any of its neighbours for some miles around. Between Top Tiba and the mountain on which you stand is a depression, through which the snows can be seen. At Jalki water can be had. The Brahman who looks after it will pour you water into your hands, and if you are not practised in drinking from such a bowl it will disappear between the fingers more rapidly than over the tongue. Although he will not allow you to drink from his bowl he gives the water freely and looks elsewhere for his reward. Sitting near, you may see him pour water for the many hill-men who pass that way. They, kneeling, hold a hand to form a runnet to the lips, and scarce a drop of the precious fluid falls to the ground. Leaving the road a mile or so beyond Jalki a way to the summit can be made over steep grass slopes and by rounding the rocks. Here few picnic parties ever disturb the solitude. A kite may circle round the intruder or a group of monkeys may chatter as they follow him, keeping at a distance on the tree-covered cliff which he might be skirting. On Top Tiba, one is on the mountains, and surrounded by them. The snow-ranges again show themselves above a confusion of valleys and dark mountain tops.

The walks or rides to valleys about Mussoori and the picnics to the waterfalls may alternate with the trips to the mountains, and bolder spirits equipped with tents and provisions may make their way to Gangotri, to Jumnotri, to the Kedarnath temple or to Simla; but the amusements nearer home will always attract the many.

Sitting on the verandah after breakfast the pedlar, after begging your permission, spreads at your feet all the treasures of the East. A Kashmiri shows you his woollen or silken goods. "Hand-made Sahib and very cheap" is his motto. "Only thirty rupees—very cheap" Breakfast has a mollifying

effect, especially if the cook is in a good humour. You offer fifteen rupees for the article of no utility to yourself; but some fondly imagine that it might make a nice present. You buy it and feel that, for once, you have succeeded in making a bargain. The vanity! For much to your chagrin, Mrs. So and So tells you shortly after that she bought a similar thing for five. Another day the metal-worker comes to sell his brass and white metal ornaments and again the rupees go. Then the juggler sits before you and with his one! two! the Monkey Steal! Kapadar! causes the ball to vanish from under the cup, draws from his mouth yards of coloured paper and plays a tune on his quaint pipes while a cobra bobs up and down in its basket.

The Rink with its skating and dancing, with its bioscope plays and carnivals affords amusement and diversion. The Library has a good collection of fiction and magazines and on its verandah, three times a week, one gets an opportunity of sipping tea with one's best girl while the band plays.

Mussoori has developed from a shooting hut on Camels back to a spreading town in the course of a century. Landour and Mussoori once separate have now coalesced. The history of the station is of interest only as the story of the growth of a town and the development of local properties.

The cool air, the extensive views, the wonderland of mountains and valleys, the charms of the wooded slopes and grassy peaks and the glimpses of the snow-capped ranges are what make Mussoori well worth a visit.

T. T. WILLIAMS.

EDUCATION AND OUR WOMEN.

The Indian world moves. Slow and tardy has been its progress in the past and even to-day a passionate adherence to existing institutions and an immovable apathy to changes and innovations are its salient features; but, nevertheless it moves. Its dead bones are again instinct with life and the forces of transformation have given birth to a new spirit which has thrilled it through and through. Waves of reform are sweeping over the land carrying away all the wrecks of superstition and worn-out traditions. Chains are falling off and shackles are being torn asunder in the name of fair liberty. The veil of Erebus' darkness has been uplifted and the vista of a new life, lighted by an era of hope is exposed in the vividness of reality, to the clear vision of the Indian humanity. The immortal words of Browning are echoed and re-echoed throughout the length and breadth of the Indian continent :—

"'T is time new hopes should
animate the world
New light should run from new
revealings."

We really stand at the parting of the ways. A struggle seems to have ensued between the old and the modern forces and must keep pace with the tide of evolution. The moment has come when we must cleanse the grate to stimulate the sluggish coal into activity and thoroughly over-haul the machinery of of our social system. In one word, we must put our house in order. The first and the foremost step should be to ameliorate the condition of our fellow countrywomen; for Tennyson, who was verily the soul of the age he lived in, has truly said :—

"The woman's cause is man's
they rise or sink
Together, dwarfed or God-like,
bond or free."

Education is the universal solvent and is sure to remove the difficulties we shall have to confront to raise our womankind to a higher level. Lord Macaulay with prophetic instinct and foresight proposed to leave many things to the slow but certain operation of time and his prediction has been well justified by the fact that the majority of our countrymen have ceased to hug and fondle the old prejudices and effete superstitions in regard to the question of female education. The old attitude has been abandoned and the subject of female education is no longer looked upon with that suspicious and positive dislike which unfortunately characterised the majority of our male population in the time of Lord Dalhousie. The difficulties with which great champions of female education like the authorities of the Fort William College, Lady Amherst, Mary Carpenter, Bethune and the great Keshub Chandra Sen were confronted, no more exist as bars to our social progress and advancement. Even in those days such an opposition on the part of the Hindus was most unnatural; for, time was when Hindu girls used to receive a first class training in all the different branches of knowledge. If we compare the legal position of Hindu women, as described in the Institutes of Manu, with that of the women of the country to which we naturally look for instruction and guidance in almost every social question, we at once find that the birthright of women was nowhere more respected than in ancient India. A perusal of Mill's "Subjection of women" will convince one of the truth of this statement. At all events there are very few among the modern generation of Educated Indians who cannot fully appreciate the importance of the following words which rightly find place in the History of the Reformation in the Sixteenth Century :— "Those who say *change nothing!* are champions of slavery." True it is that India still abounds with many Jeffreys' dens but the efforts of stop-watch critics to arrest the progress of female education in this country are now, by the grace of God, few and far between. At all events they formed what may rightly be called a negligible minority and we can

well afford to treat with contempt their unreasoning prejudices and senseless idiosyncracies. In these days of progress and liberalism it is hardly conceivable that a man with growing liberal ideas would allow his daughter to sink into the hollow of ignorance and her God-given parts to remain undeveloped by the dismal gloom of illiteracy. Nor is it imaginable that he would care to take a wife who at best is only able to solve the "cold rice" and "funeral cake" problems and boast of what Milton calls in his inimitable language, "a fugitive and cloistered virtue," but is utterly incapable of sharing with him to the fullest possible extent his joys and sorrows, hopes and aspirations, or to stand by his side as a true helpmate in moments of doubt and difficulty, keeping away doleful despair by sweet encouragement and words of comfort and hope. After all who is more fit than an ideal wife to help a man to mould his thoughts and ideas, or to build up and foster his best ambitions, shielding them against the critics' pointed and poisoned arrows which so often destroy the main-spring of their life ? Undoubtedly our existence in this world is full of struggles and turmoils. True happiness seldom falls to the lot of man and oftener than not we smart under the stings of sorrow and disappointment. Friends are few, very few indeed, whereas enemies—both open and insidious—are plentiful as blackberries. Hypocrisy, deceitfulness and jealousy embitter our lives. A vast unfathomable ocean of bewildering troubles, without a ray of beacon light, howls in front of us and a bleak desert of endless expanse lies behind us shrouded in impenetrable gloom. These are verily the ills of life and who is more fit than a thoroughly cultured and devoted wife to guide and comfort us in our voyage through the battering waves of the mid-sea to the calm and tranquil waters of the harbour, or to quench our thirst when our lips get parched in our journey through the dreary and desolate wilderness of the world ? Her soothing words of solace her noble counsels and, her sympathetic understanding are worth a King's fortune, nay they are priceless. There is really no doubt that the touchstone of education can make an angel of a woman.

Besides, it is impossible for a thoughtful member of the community to forget that our girls will be the mothers of the next generations and so the future greatness and prosperity of our people depend on them to no small extent. It is to the mother that her children look for guidance and inspiration. They follow her examples more than that of their father. Her actions and movements are automatically copied by the little ones and her virtues or vices imperceptibly leave their stamp on their tender hearts. The father generally keeps away from home during the greater portion of the day and so the

leading strings and in fact the reins of the household are in the hands of the mother. Her influence is therefore most keenly felt and that is why the great Napoleon wrote to France from the battle-field of Austerliz that what France needed most was good mothers. In fact when a mother ceases to be the guardian-angel of a house courage, morality, happiness and prosperity bid adieu to it and hypocrisy, selfishness and other vices creep in as precursors of ruinous moral degradation.

All these are admitted facts and it is well-known that if the noble cause of female education is not prospering in this country to the desired extent, it is not because Indian public opinion is hostile to it but because competent female teachers are not available and there are very few girls' schools where our girls can have proper facilities to make themselves fit for the duties of life.

Thoughtful people consider that the irrational training, absolutely secular and mercenary in its character, which our girls generally receive in our existing educational institutions will undoubtedly cramp their intellectual and physical powers and make them lamentably unfit to approach those ideals which ought to be theirs. What is most objected to is that the very same methods are adopted to educate our girls as are chosen and employed for the training of our boys in our public schools, without any modifications whatsoever. This is rightly considered to be a practice open to serious objection. The nature and temperament of a boy and those of a girl are not exactly the same and their respective functions in society are altogether different. Such being the case, a system of education intended to develop manhood cannot in that very shape be wisely adopted to promote womanhood. The inevitable result of such a course will be that the charming softness and delicacy of the fair sex will be converted into prosaic hardness and unbecoming intrepidity. We have scant regard for the *New woman* with a masculine intellect and it is not quite an edifying spectacle to see ladies carrying long tails of letters without those qualifications which are peculiar to their sex. At all events our girls are too delicate to run in the harrowing races of our universities or to carry on their backs university trophies. Spencer in his "Education" makes the following impressive remark which may be read with profit in this connection:—

"Indeed when we examine the merciless school-drill frequently enforced, the wonder is not that it does extreme injury but that it can be borne at all."

Those scathing remarks were levelled against a routine which is by all means more liberal than what is generally followed in our public schools and which according to Sir John Forbes is the average sample of the girls' schools system throughout England. On the other hand the felicitous words of Sir Frederic Pollock in regard to the

frittering away of valuable time and energy for success in examinations should be engraved in bold letters on the portals of our universities. The young lady-graduates and under graduates, call them bloodless emaciated prodigies if you please, which the wonderful machinery of examinations turns out every year, may delight the authorities of our universities but after all they fail to commend themselves to the judgment of thoughtful people who understand what there should be in the fitness of things.

What is needed now is the establishment of a central university *exclusively for our females* with a decent number of feeder institutions scattered all over the country where, instead of Algebra, Conics and Trigonometry, Logic and Chemistry our girls may be taught those real lessons *of life* which will widen their sympathies, stimulate their womanly instincts and make them good wives and good mothers--I mean institutions where girls will not only be given such book lessons as are suited to their peculiar requirements but instruction will also be imparted in the various useful arts such as cooking, sewing, embroidery, music and painting. A tolerable acquaintance with the nature of the human constitution is specially needed by women for the rearing of children and this should not be lost sight of in dealing with the question of female education. To be brief the new university will adopt the most practical mode of training, having due regard to the peculiar requirements of Indian girls and thus prevent *black-despair succeeding brown study* in their subsequent careers. It will seriously endeavour to Indianise English education *from the Indian point of view* without depriving our girls of its peculiar advantages. It will not merely make them familiar with the wonderful literatures and sciences of the West but will also strive to make the dead Indian virtues live again in the hearts of our women. Cramming must be done away with and the fatal fascination of enchanting keys and catechisms must be completely shaken off. Honest and independent labour must be encouraged and rewarded and for the rest the education of our girls should relatively to that of our boys proceed upon the principle of variety. If proper educational institutions are established, male teachers are replaced by female instructors and the order of examinations is brought into accordance with the needs of *real life*, it may be reasonably expected that female education will assume an universal character and no body will mind even if it is made compulsory. At the same time, in framing any system of female education it should be borne in mind that slow and steady evolution is the order of nature and sudden radical changes forced upon a society by impulsive imitators are apt to convulse it and revolutionise the existing order of things by producing conflicts in the national

mind in respect of accepted beliefs and time-honoured traditions.

The forthcoming Coronation of Their Majesties the King and the Queen in India bids fair to be an event of great historic importance. It must bring with it a forecast in issues and results which are bound to be chronicled in the imperishable pages of history. It will be an event of permanent value to the millions of Indian women if an university exclusively for them could be established as a memorial of Her Majesty's coronation. to be called "Queen Mary's Coronation University for Indian women." The initial capital expenditure and the cost of maintenance of the proposed university will not be very great and if the Government is appealed to in the proper way, Her Majesty may be persuaded to associate her honoured name with the proposed university and a Charter may be obtained; for, the Queen-Empress takes a keen interest in the welfare of Indian women and there is absolutely no chance of an university like the one proposed to become the Silent Sister of Bengal or a One-horse university. It is the need of the moment and the whole of India should make a supreme effort to call forth such an Institution into existence—

"Stand not then upon the order
of your going
But go at once."

MANMATHA NATH ROY
CHAUDHURI.

OLIVER WENDELL HOLMES.

II

I have undertaken in these pages the humble task of presenting the broad facts of his life with a view to make my readers realise for themselves what sort of a man he was. My task has been rendered considerably easier by the appearance of his biography in two volumes by Mr. J. T. Morse from which I have made copious extracts for my present purpose. Ample materials are also to be found in his own published writings, in the letters he wrote to his friends and in certain notes and memoranda he once prepared for an intended autobiography, for he was a genial egotist like Montaigne, Addison, Cowper, Goldsmith and Lamb (A Boswell writing out himself) and has left unsaid little of the incidents of his life—a life singularly uneventful and tranquil, the ideal life of a poet and a man of letters. "His life" says his biographer, "was so uneventful that the utter absence of any thing in it to remark upon became in itself remarkable. He passed two years of his youth in Europe studying medicine; in his old age he went there again for three months; otherwise he lived all his years, almost literally all his days, in or near Boston, within tethering distance so to speak of that State House which he declared to be "the hub of the solar system." All his intimate friends lived within a few miles of him, save when some one of them went abroad, as

Motley and Lowell did. He was not, like so many English and a few American men of letters, connected in any way with political affairs; he never held any office; nothing ever happened to him. Fortunately the picturesqueness of poverty was never his, nor the prominence of wealth. Days and years glided by with little to distinguish them from each other, in that kind of procession which those who like it call tranquil, and those who dislike it call monotonous. Such is the panorama which awaits the reader."

I propose now to make him tell his own story by drawing copiously upon his own utterances. My paper claims no originality; all that I have added to the words of Holmes and his charming biographer consists of such occasional comments as will naturally occur to the Indian mind and will be likely to interest the juvenile part of my readers.

Birth and ancestry.

Oliver Wendell Holmes came of the best New England stock and belonged —like the writer of the present paper— to the Brahmin caste. Let not the phrase startle or scandalise my readers, for it is Holmes' own phrase, used in no odious sense. This is how he elaborates the idea in a wellknown passage in the first number of the *Autocrat* and in the opening chapter of *Elsie Venner*. "There are races of scholars among us, in which aptitude for learning is congenital and hereditary. Their names are always on some college catalogue or other. They break out every generation or two in some learned labour which calls them up after they seem to have died out. At last some newer name takes their place, it may be—but you inquire a little and you find it is the blood of some of the old historic scholars, disguised under the altered name of a female descendant . . . . . . A scholar is, in a large proportion of cases, the son of scholars or scholarly persons; our scholars came chiefly from a privileged order, just as our best fruits come from well-known grafts. . . . They will take to their books as a pointer or a setter to his field work. In fine Holmes was a man of science and was in consequence a firm believer (with a wise reservation though) in the general truth of the doctrine of hereditary transmission, sharing the opinion of Carlyle that "a really able man never proceeded from entirely stupid parents," in "the controlling influence of inherited tendencies" as he phrases it, in that law of heredity which in the hands of his great co-eval Darwin was to be reduced into a system. This leads him to make the startling assertion that "a man is born at least a hundred years before he sees the light." "The nest is made ready long beforehand for the bird which is to be bred in it and to fly from it." "I go for the man who inherits family traditions and the cumulative humanities of at least four or five generations." "Each of us is only the footing-

up a double column of figures that goes back to the first pair. Every unit tells and some of them are *plus* and some *minus*. We are mainly nothing but the answer to a long sum in addition and subtraction." Let us test his theory, by enquiring a little into his own "ante-natal history."

The great-great-grand-father was one of the first settlers of the town of Woodstock, Connecticut and came over in 1686. He was a man of great energy and great resources, "one of your self-made men whittled into shape with his own jack-knife." The great-grand-father was a Deacon ; the grand-father fought in Canada in the "old French War" in which Wolfe fell. The father graduated from Yale College and embraced the ministry. He had a weakness for writing poetry (an amiable weakness inherited by the son, let us add) and produced besides the *Annals of America*, a careful, accurate and useful history. Thus like Addison, Cowper, Goldsmith, Coleridge and Tennyson, Holmes was the son of a scholarly clergyman and like some of them narrowly escaped being a clergyman himself. To quote his own inimitable words, "he tumbled about in a library, staggered against books as a baby," was "brought up in a library where he bumped about among books from the time when he was hardly taller than one of his father's or grand-father's folios." "All men are afraid of books, that have not handled them from infancy" when "virtue passes through the hem of their parchment and leather garments whenever he touches them, as the precious drugs sweated through the bat's handle in the Arabian Story." Again, "I like books—I was born and bred among them and have the easy feeling, when I get into their presence, that a stable-boy has among horses." I may observe in passing how closely this picture resembles the kindred picture of Charles Lamb, who too, with his sister, was "tumbled early into a spacious closet of good old English reading and browsed at will upon that fair and wholesome pasturage."

Holmes' mother, like the present-writer's, was his father's second wife. She came of a Dutch stock, her family having settled in Albany in 1640 and the names of Wendell (a variant of Vondel ?) and Oliver came from this family. She was the daughter of a citizen of Boston of high social connections, a graduate and a Fellow of Harvard University. She was a bright vivacious woman and withal of sympathetic and somewhat emotional temperament; in Holmes there was much more of the intellectual quality of the mother than of the father.

The "old gambrel-roofed house" in Cambridge, a historic mansion, the birth-place of Holmes, is well-known to the readers of the *Break-fast Table*. "This house held him in dreamy infancy, in restless boyhood, in passionate youth." The house afterwards became one of

the investments of Harvard University and was torn down. He tells us in his touching way that he had "struck his tap-root deep down into the soil, and the radicles of affection and association entwined themselves about everything there, even to the stone with a whitish band" in the pavement of the back-yard. Our hearts are held down in our houses by innumerable fibres, trivial as that I have just recalled; but Gulliver was fixed to the soil, you remember, by pinning his head, a hair at a time." For such strong local attachment we must go to the Olney recluse or once again to Charles Lamb, who born in another historic mansion, voices forth his feelings thus: "My house-hold gods plant a terrible fixed foot, and are not rooted up without blood. They do not willingly seek Lavinian shores."

The above account of his ancestry and his birth-place will give us an adequate idea of "the intellectual atmosphere into which Holmes was born and from which he drew the breath of his early mental life." I shall now deal with the next factor in the formation of his nature—his education.

Education—General.

Holmes' schooling began at a Dame's school. Like another tender-souled creature, Oliver Goldsmith, he learnt his alphabet from the lips of a woman. The writer of the present paper had had a similar privilege and tenaciously holds to the modern educational doctrine that the earliest lessons should be inculcated upon children's minds by affectionate mothers or matronly school mistresses. From ten to fifteen Holmes was at school at Cambridgeport. Thence he was removed to Phillips Academy, Andover, where he contracted friendship with Phineas Barnes and to him in later life Holmes addressed several letters, which give us a foretaste of the shrewd observation, the quaint humour and the inimitable style that were afterwards to obtain celebrity in the Breakfast Table papers. Unfortunately Phineas did not attain greatness. Otherwise this pair would have occupied as memorable a place in the history of school friendships as did Milton and Charles Diodati, Addison and Steele, Gray and Horace Walpole, Cowper and Thurlow, Charles Lamb and Coleridge. Holmes' sketch of his first school-master is fit to take rank with Lamb's humorous portrait of his teachers at Christ's Hospital. As a school-boy he had one great fault, he tells us, he was an inveterate whisperer at school. At the school at Andover he received a famous feruling but this was only once and his teacher expressed sincere regret for it long afterwards when Holmes had become famous; Holmes' be it said to his credit, bore no malice to his teacher for this act of chastisement. Among his reminiscences of boyhood he tells us of his fear of ghosts and demons which strongly reminds us of Lamb and Leigh Hunt, and the present writer would fain add his

own obscure name to those of the illustrious trio.

From Andover he went to Harvard University, the Cambridge of New England in 1825 where he resided for four years and graduated as a member of "the famous class of '29"—"no more distinguished class ever emerged from the nursery of Cambridge" says Holmes' biographer. The annual dinners of this set were afterwards enlivened by Holmes's odes, sometimes convivial, later on pathetic. At College he joined a club which was a singular contrast to the '*Apostles*' so familiar to readers of Tennyson's life. His account of the gay license of this convivial club over which Bacchus presided oftener than Minerva is so very like Ruskin's account of the College life of his days that the Hindu reader is unable to decide with regard to University life in old England and in New, as to "which was *grosser*, which was worse." But let us think with Ruskin that such things are no more.

Holmes describes himself as lazy at College but adds "I have been learning a little of almost everything and a good deal of something." His first literary experiment belongs to this period. The Collegers got up a little monthly concern called the *Collegian* and he "wrote poetry fiercely for the first four numbers."

(*To be continued.*)

LALIT KUMAR BANERJEE.

ANNALS OF THE CHANDRADWIP FAMILY.

Bakarganj with all its notoriety in the world of criminality and its reputation as a great hunting-ground for the highly-placed-in-office, still affords some scope for research to the modest lover of antiquity. Perhaps nothing in Bakarganj is more interesting in the world of antiquity than the history of Chandradwip. Various are the stories about the origin of its name, and of these two deserve special notice. In both of them Chandra Sekhar Chakravarty figures prominently. Chandra Sekhar Chakravarty was a Brahmin of Vikrampur. According to one story he happened to marry a lady who bore the name of his tutelary deity, Bhagabati. Chandra Sekhar could not discover this till after his marriage when he met his wife. This set him thinking and the best way, to expiate the sin he had committed was, he thought, to leave his home and annihilate himself. With this end in view he set out in a small boat towards the South, for the South of Vikrampur was then imagined to be the endless sea. He proceeded southward in this way for full one day and one night till he really found himself on the open sea. In the midst of the sea he descried at some distance from him a small fishing boat plied by a solitary woman. He was naturally astonished at this and proceeded towards her. He questioned her as to how she could venture so far

out into the sea alone and in a small boat. She replied that it was nothing unusual for her,—the daughter of a fisherman. On the other hand she asked the Brahmin the cause of his unusual excursion. Whereupon he narrated his whole story. The fisherman's daughter listened to him attentively and then gave him a sound retort as follows :—

"How foolish has it been of you to desert your wife simply because she happened to bear the name of your tutelary deity, Bhagabati! But O son of man, are you not aware that "Bhagabati in the shape of Shakti resideth in every woman!" The Brahmin was very much put out of countenance by this intelligent retort and wondered how such intelligence could dwell in one belonging to the fisherman's caste. Through this wild wonderment he suddenly jumped to the conclusion that she must be a goddess in disguise. He at once jumped into the boat and clasped her feet praying to her to reveal to him who she was. All attempts on her part to dissuade the Brahmin from thinking her otherwise than as a mortal failed. At last she was compelled to disclose her identity and it was the most pleasant surprise for the Brahmin to find that the woman he spoke to was no other than his own *Istadevata* Bhagabati. The goddess then told him that the place where they stood would one day become dry land and called "Chandradwip" after him. The prophecy came true and Chandradwip grew into a flourishing island-home of the Rajas.

According to another story Chandra Sekhar Chakravarty, a Brahmin of Vikrampur, was a restless wanderer. With his favourite servant and companion, Dhanuj Mardan De, he once sailed far into the sea in his frail boat. One night he had a dream in which he was commanded to pick up the images of some goddesses from the bed of the sea. The next morning he bade his servant Dhanuj Mardan De to dive into the water and bring up the idols. He dived twice and brought up the two images, *viz.*, Kattayani and Madan Gopal, which are still preserved by the descendants of the Chandradwip family at Madhabpasha and worshipped by Hindu devotees. It is said that if he had dived a third time, he would have fished up the idol of the goddess of prosperity. The Brahmin also dreamt that the place would one day become land and be named after him.

The above story has been somewhat differently stated by some people. They say that Chandra Sekhar Chakravarty was a devout worshipper of Kattayani and Madan Gopal. He was commanded in his dream to recover their images from the bed of the river South of Vikrampur. With the help of his faithful servant Dhanuj Mardan De, he recovered them but would have lost his life in the enterprise but for the help of the goddess Bhagabati. The river where the idols had lain subsequently became land and was called after him.

Whichever story be correct, the fact remains that Chandradwip was an island formation in the wide and endless river, South of Vikrampur, and Dhanuj Mardan De, whatever might have been his earlier life, was its first Raja. He was the founder of the Chandradwip Raj family and the forerunner of the Bangaja Kayasthas. He is said to be one of the 5 Kayasthas who accompanied the 5 Brahmins from Kanouj during the reign of Raja Ballal Sen. He flourished in the 12th and 13th Centuries. Sir Henry Elliot, the the great historian of the Mahomedan period of Indian History, is of opinion that this Dhanuj Mardan De was the same as the Rai of Sonargaon who met Emperor Balban in 1280 A.D. while the latter was on his march against Sultan Maghisuddin and that he was appointed the ruler of the principality of the Chandradwip which extended up to the Meghna to guard against the the escape of Tughril Khan to the west. Dhanuj Mardan De was succeeded by Raja Ramaballabha Ray and the latter by Raja Krishnaballabh Ray.

Raja Krishnaballabh Roy had a daughter named Kamala Devi who gained a world-wide reputation on account of the Celebrated tank that was excavated under her instructions. The site of the tank still exists in Kalaiya, a village opposite Kachua across a channel. The tank is called Kamala Dighi. It is a mile off from the renowned mart of Kalaiya. The term 'dighi' is now a misnomer, for it is now a big field enclosed by high banks on which the tenants of Rajendra Mohim Babus, the Zamindars of Choud-darashi in the district of Faridpur, have built comfortable houses. Compared with the low-lying fields which smile with corn in winter, the banks of the dighi, overgrown with fruit-bearing trees of all kinds, look like precipices. It is said that during the abnormal flood 1876, when the headquarters of the Bhola Sub-Division at Daulatkhan were washed away, and the masonry buildings in and about Bauphal went under water, these steep banks afforded relief and shelter to thousands of villagers. The area occupied by the tank is three drones 13 kani or 293 standard bighas, or $\frac{1}{7}$th of a square mile. Kamala Devi spent heaps of money in the excavation of this tank. It was made as deep as possible, but still no water came out. At last she had a dream that water would come out if she personally got down to the middle of the tank. She did as commanded in the dream. The dream was literally fulfilled but she lost her life. While in the middle, water gushed out so furiously that she was drowned in a trice to rise no more. Her babe and husband survived her. Tradition says that she used to appear every noon at the landing steps of the tank to suckle her child. But once her husband having attempted to catch hold of her, she disappeared altogether. In the North-eastern portion of the tank there is a *khal* through

which it is said she made her exit out into the Bay.

The *dighi* is now situate in a portion of Kalaiya, but formerly this portion of the village was included in Kachua, the historic village over across the channel called the Kalaiya Done. Kachua had been for many years the capital of the whilom Rajas of Chandradwip. The channel which now separates the portion of Kalaiya in which the dighi is situate from Kachua did not exist in former times. The tank was therefore excavated in Kachua proper and not in Kalaiya. There were many magnificent buildings and temples in Kachua which have been washed away by the boisterous waves of the Tetulia. It may be presumed that Kachua continued to be the capital of Chandradwip till 1583 A. D. when it was ruined by a terrific cyclone. Paramananda Roy was the Raja of Chandradwip at the time. His miraculous escape during the cyclone has been described in the Ain-i-Akbari and he himself is mentioned as the son of the Zamindar of Bakla (Chandradwip). It was Paramananda's grand-son Kandarpa narayan Roy, who was one of the 12 Bhuiyas of Eastern Bengal to whom the administration of the Eastern territories had been consigned by the Mughal emperors. Tradition says that during the cyclone of 1583 a big river almost as wide as the sea itself appeared all on a sudden to sweep away the Hindu capital. This is of course, a hyperbole, and what had really taken place was probably the appearance of a channel which gradually widened into a river on one side and the gradual encroachment of the Meghna. The Rajas had to leave Kachua and repair to a neighbouring village called Rajnagar where there are still some mouldering remains of temples and other buildings. Rajnagar was, however, only a halting station before there final removal to Madhobpasha, a village 8 miles off from Barisal town, where the descendants of the family are still living.

It is said that there was a temple in in Kachua of which the foundation was made of golden bricks, and before its complete destruction by the waves of the Tetulia, many people derived wealth from this temple. Story goes that the ancestors of the present wealthy and influential Zamindars of Bauphal owed their rise to the Kachua House. Udhap Chandra Shaha, the ancestor of these Zamindars had a small shop at Bauphal, and Bauphal is very close to Kachua' now separated by the Kalaiya Done. He was one day walking near Kalaiya when he happened to come across an old woman, who was carrying a brick of gold (of course, not knowing what it was) to fix a post to which her cow was to be tethered. He asked for the brick which the woman refused to part with, as she required it urgently. She directed him to get as many such bricks as he liked from the temple where she had got it from. Udhop Shaha went there and

found quite a lot of such bricks. He collected them and at once became a wealthy man. After this windfall he underwent a sudden change. He became saintly and devoted most of his time to religious contemplation. The place where he used to sit absorbed in such religious reveries is still held sacred by his descendants. His descendants who made a name were Rajendra Chandra Roy, and Mohim Chandra Roy ordinarily called Rajendra Mohim Baboos. Their home is Chauddarashi, within the thana jurisdiction of Palong in the district of Faridpur. They are the land-lords of the whole of Kalaiya, Bauphal and a a number of other villages, yielding an annual income of nearly two lakhs of rupees. Besides they have extensive business in oilman's stores and rice in Bakarganj and Calcutta Such is the story of one of the beneficiaries of the Kachua house, but the descendants of that house are themselves living in comparative obscurity and poverty in Madhabpasha. Though possessing none of the wealth and influence of a Raja, they are still called Bara Raja and Choto Raja by courtesy and the British Government too with its characteristic beneficence gives them the highest seats in Durbars and othes similar functions that are held at Barisal.

SYED ABDUL LATIF.

MUSALMANI BENGALI AS THE MEDIUM OF INSTRUCTION IN ELEMENTARY SCHOOLS IN EASTERN BENGAL AND ASSAM.

A good deal of controversy has raged round the question as to whether Musalmani Bengali should not be the medium of instruction for Muhammadan pupils in elementary schools in this Province. Time and again this question has been ventilated. This formed a subject of discussion at a sitting of the Provincial Educational Conference. It was also raised in connexion with the curriculum of Muktabs which engaged the attention of the Committee that considered the question of reform of Madrasahs and Muktabs in this Province. On both these occasions the decision was not favourable. I see the question has again been raised by the Muhammadan Association of Malda in a pamphlet with the heading "Language question for Bengali Muhammadans." The Association has dealt with two aspects of the question namely what should be the language used as the medium of instruction for Muhammadan children in Elementary schools and how to reduce the number of languages which have to be learnt, by Muhammadan pupils so that they may be in a better position to compete with students of other persuasions. The latter aspect of the question has been disposed of by making Arabic the only

compulsory language. But the matter has not been fully discussed; hence I am unable to refer to it at length. The former has been treated of at length. Indeed the pamphlet deals mainly with the former aspect of the question. The conclusion at which the Association has arrived is that Musalmani Bengali should be the medium of instruction for pupils in Elementary Schools. In short what they want is that the Bengali primers for Lower Primary Schools should be written in the simplest possible Bengali with a large mixture of Urdu words like that used in writing petitions, &c., for presentation in courts. The reasons that have been advanced for introducing the mixed Bengali may be summarised as follows:—

(*a*) By making Musalmani Bengali the medium of instruction, the Muhammadan pupils will be taught in their *Mother tongue*. It has been urged that Muhammadan pupils experience very great difficulty in understanding the Bengali in which the primers and readers for Lower Primary schools are written.

(*b*) The introduction of Musalmani Bengali will help pupils in acquiring a knowledge of Urdu which is said to be the goal of Bengal Musalmans.

(*c*) The introduction of such mixed Bengali will help largely in the reorganisation of Muktabs.

(*d*) The adoption of Musalmani Bengali will arrest the rapid denationalisation of Muhammadans that is said to have set in with the use of pure Bengali.

2. The pamphlet has been written in questionable taste and savours strongly of party feeling. The proposal if given effect to, will tend to widen the gulf that exists between Hindus and Muhammadans, and may render impossible any fusion of the two races in future. Nor is it possible to teach separate courses for Hindu and Muhammadan pupils in each school. It is not also feasible to start separate schools for Hindus and Muhammadans. Apart from these facts the arguments put forward in favour of the introduction of Musalmani Bengali if examined critically will fall to the ground. I propose to deal with each in the succeeding paragraphs.

3. The Malda Association has urged the introduction of Musalmani Bengali as the medium of instruction because it is said to be the *mother-tongue* of Muhammadan pupils. Musalman pupils are said to experience great difficulty in learning the language in which text books are written at present, this sort of Bengali not being their mother-tongue. The Association has no doubt succeeded in disproving that the mother tongue of Bengali Musalmans is not Bengali as it is written in the primers and readers used in the Lower Primary Schools, but at the same time it has not succeeded either in proving that Musalmani Bengali is the mother tongue of the Musalmans of Eastern Bengal. The specimen of Chittagong dialect that has been used in

illustrating the difference between the Bengali as written and spoken seems to prove that the Chittagong dialect is as far from Musalmani Bengali as from pure Bengali. If the principle of teaching pupils of Elementary schools in their mother-tongue as enunciated by the Malda Association be carried out, separate text books will have to be written for each district, and for each section of the community in each district, for the spoken language of no two districts is alike, and even in the same district the dialects used by the Hindus and Muhammadans are often quite different. If Musalmani Bengali be taken as the medium, the task is not simplified since the Musalmani Bengali used in different districts often varies in shade and complexion. Indeed the question of writing text-books for each district in the local dialect was considered by the Government of Bengal before the formation of the new Province, and dropped as being beyond the range of practical politics. Surely the Malda Association does not want to have it re-opened. It seems that the Association does not take into account the distinction that must always exist between the spoken and the written languages every where. In Scotland Gaelic is the spoken language, but English is the medium of instruction even in Elementary schools. In Ireland and Wales English is the medium of instruction, though the people there speak different dialects. If we look to other countries it will be found that the same state of things prevails. Moreover, the higher education of Musalman pupils who use the Elementary schools for the purposes of preliminary education will be seriously retarded, if they learn through the medium of mixed Bengali even in the elementary stages, for the books for higher classes cannot be written in such Bengali. Above all what is most important is that the object of learning a language--the linguistic culture—will never be attained if pupils in their early stages are brought up under a system in which vocabulary is made unduly elastic, and the shackles of Grammar and Idiom are considerably loosened. The Madrasah Reform Committee were also convinced of the utter worthlessness of such a suggestion, and rightly decided in favour of Standard Bengali even in Muktabs or Seminaries of pure Mahammadan education. The pamphlet cites instances of such mixed language in the works of Early Bengali authors and considers them as palatable on account of the peculiar language in which they are written. Of course tastes vary. Probably those who have read modern authors will not appreciate these works. Those who have read Hem Babu's lyrics will not appreciate Bharat Chandra's Annandamangal. I do not mean to say that these works have no value whatever. What I say is that these authors are read from a comparative point of view as showing the gradual development and improvement of the language rather than as finished

specimens of Bengali style. I do not know much of Sakuntala. Hence I can not test the accuracy of the statement made in the pamphlet.

4. The Association advocates the adoption of Musalmani Bengali on the ground that it will help the pupils in acquiring a knowledge of Urdu which is said to be goal of Bengali Musalmans. In other words what the Association means is that the medium of instruction of Musalman children should be in the long run Urdu, and the process of transition from Bengali to Urdu would be much facilitated if Musalmani Bengali were adopted as the medium. There are two distinct issues involved in this argument. First it is assumed that Urdu should be the vernacular of Musalmans of Bengal. Secondly, Musalmani Bengali if adopted will facilitate the introduction of Urdu. Both these propositions have not been proved and require demonstration. It is not stated why Urdu should be the vernacular of Musalmans of Bengal, or what necessity has arisen for this change. Urdu is never spoken in rural tracts of Eastern Bengal. Nor is there any desire on the part of the people to change the vernacular into Urdu. At present it is an accomplishment, and is rarely used except in towns and in polished societies. The masses have never taken to it. Nor will they ever take to it for aught I know. Even supposing for the sake of argument that Urdu is to be the vernacular of Bengal Musalmans it does not appear how the process of transition of the vernacular will be facilitated by the adoption of Musalmani Bengali as the medium of instruction in Elementary schools. Musalmani Bengali is, I understand, helpful in so far as it teaches pupils some words used in Urdu. If this be the case, I think it can be accomplished without changing the medium, as according to the Malda Association people in villages speak Musalmani Bengali which abounds in Urdu words and may very well serve the purpose of furnishing some vocabulary for intending Urdu pupils.

5. Nor is it understood in what way Musalmani Bengali will help in the re-organisation of Muktabs. As far as is known, the difficulties in the organisation of Muktabs do not lie so much in the form of the Bengali that is to be taught as in the desire on the part of *Mianjis* to confine themselves to subjects like the *Quoran*, and the *Resalas*. What appears to be the case is that they, as a body are opposed to what is known as secularisation of these institutions. The reasons are not far to seek. First by confining themselves to purely religious subjects they escape from Departmental control which they can hardly brook. Secondly by the introduction of secular subjects they become losers since they have to call in the aid of teachers of secular subjects to whom they have to yield a certain part of their income. If the Malda Association means that by the introduc-

tion of Musalmani Bengali the *Mianjis* should be able to teach secular subjects, I think they are grossly mistaken, for it is plain that they should be able to do as much justice to Musalmani Bengali as to pure Bengali. As for the teaching of Arithmetic and other subjects they are hopelessly incompetent.

6. The last argument in favour of the introduction of Musalmani Bengali is that it will arrest the process of denationalisation that is said to have set in with the use of pure Bengali. The Malda Association complains that Musalmans are now Musalmans only in name, and that they are becoming Hinduised. The gist of the complaint, as far as I understand it, appears to be that the rising generation of Muhammadans is growing up in a spirit of irreverence, and irreligiousness. If this be the meaning of the Association I think I can safely say that the process is not confined to the Muhammadan section of the population alone. This is perceptible in other communities also. The truth seems to be that the whole social fabric in India seems to be in the melting pot. The old patriarchal system has given way before the strong spirit of individualism, manifested by the rising generation as a result of English education. The same cause has also operated to produce a rational frame of mind which no longer takes for granted the hereditary beliefs, but seeks to examine every article of faith carefully before accepting it. The remedy for this state of things lies elsewhere than in the sort of language to be taught in Elementary schools.

7. The Malda Association does not seem to have taken the right view of the situation. Instruction in one's mother tongue does not mean instruction through the local dialects. If this were done, there will be an endless variety of dialects in which books will have to be composed. The ultimate result will be that a pupil educated in one district or one subdivision of a district will not understand a pupil in the neighbouring district or subdivision, and intercourse between people of one subdivision or district and those of another will become an impossibility, and impassable barriers will be set up between them dividing them from one another. Moreover the object of learning a language will be ill-realised if every one is permitted to twist it at his pleasure. The Bengali language has reached its present stage of development after years of patient and disinterested labours of eminent men, and bids fair to become one of the rich and progressive languages of the world. To deface it in the manner proposed will surely be a retrogade measure and setting the progress of the country a century back. If the pupils in the Elementary schools find difficulty in understanding pure Bengali, recourse may be had to the local dialect for

explanation as is done in Scotland, Wales and Ireland. What I think may reasonably be insisted on is that the Readers should contain subjects interesting to Muhammadans. If this be done, I think a large number of Muhammadan words is sure to be incorporated into the Bengali language. The poems of Muhammadan interest occurring in many recent publications, notably, by Muhamahopadhyaya Prasannachandra Vidyaratna, Haranath Ghose, Rasik Chandra Basu and others will bear out the facts stated above. A large number of words of Persian and Arabic origin has been used in composing these pieces.

8. As to the place of Urdu in any scheme for Muhammadan Education, I think I voice the feelings of the majority when I say it is only a luxury, and should be indulged in by those pupils who can find time for its cultivation. But personally I think it should be taught as a compulsory subject in secondary schools along with English. In other words what I propose is that either Urdu or Hindi should be an additional language to be taught along with English, just as in England French and German form compulsory language study in Educational institutions of all grades. I do not mean to confine my remarks to the Muhammadan section of the pupils alone. All the pupils irrespective of caste and and creed should take up either Urdu or Hindi. Such a step is likely to strengthen the linguistic faculty which is so essential to the mental well-being of our pupils.

MATLOOB AHMED.

THE UNIVERSITY OF NALANDA.

The Curriculum of Nalanda and its most distinguished Alumni.

1. Grammar.—The Science of Grammar, it is well-known, was given a very prominent place in the curriculum of colleges in ancient India. Even to-day in the educational institutions of Benares, Mithila and Nadia—the survivals of the old order—Grammar is the first and a very important subject of study. It was not otherwise in the University of Nalanda. We are fortunately in possession of a list of text-books on Grammar supplied by I-Tsiang who studied at Nalanda probably from 675 to 685, from which we may form an idea of the extent of the grammatical curriculum prescribed at Nalanda. But for a proper understanding of I-Tsiang's list, some acquaintance with Sanskrit Grammatical literature is necessary.

Students of Sanskrit are aware that there were eight ancient Schools of Grammar as mentioned by Bopadeva in his *Kabikalpadruma*. Of these by far the most important was that of Panini. "No work," says Goldstucker, "has struck deeper roots than his in the soil of the scientific development of

India,"(1) and this view is borne out by all competent Sanskritists. His work entitled the *Ashtadhaya* is laid out on such strict scientific principles that not the least doubt can be entertained about the 3996 aphorisms which it contains being the product of a single mind.(2) This is wonderful indeed considering the fact that the date of this grammarian is so remote that he has become a fabulous sage of the Puranas and Goldstucker who has given the subject of Panini's date a very careful and elaborate consideration (refuting Max Muller's view that he was a contemporary of Katyayana, who, according to Max Muller, belonged to the middle of the 4th century, B. C.,) places Panini somewhere in the 8th or 9th century, B. C. at the latest. But we have evidence in the work of Panini that even before him grammarians flourished in India and he himself names Sakalya, Gargya, Kasyapa, Galava, Sakalayana and others.(3) Researches into the antiquity of Sanskrit Grammar must therefore lead us back a good deal into the Vedic age. The system of Panini has been enriched by an enormous amount

(1) 'Panini: His place in Sanskrit literature' —p. 87.

(2) *See* Colebrooke's Essays, vol. II, p. 5. Goldstucker is of opinion that only 3 or 4 'Sutras' out of 3996 are not Panini's—'Panini' p. 29.

(3) *See* Colebrooke's Essays, vol. II, pp. 4-5.

of scholia,(1) but the place next to Panini is accorded by common consent to Katyayana. His emendatio.s and annotations on Panini called the *Vartikas* carry almost equal authority. A long stretch of time divides Panini and Katyayana and, it is probable, that this great scholiast was one of the ten great disciples of the founder of Buddhism, at whose instance he is said to have composed a grammar of the Prakrita language entitled *Prakrita Prakasha* or *Chandrika*, attributed to Vararuchi. This biographical detail is supplied to us by a quotation from the ancient work of Katyayana given by Buddhapriya in the *Rupa Siddha*, the oldest Pali Grammar now extant, of which the work of Katyayana forms the original.(2) The name Vararuchi must have been the real name of the Grammarian and Katyayana the patronymic. In the 2nd century, B. C., Patanjali, the high-priest of Pusyamitra and the next supreme grammarian of India composed the voluminous commentary on Panini known as the *Mahavasya* which is a monument of

(1) A list of Sanskrit Grammars and their commentaries may be found in Colebrooke's Essays, vol, II, pp. 40-49.

(2) This quotation in the *Rupasiddhi* is cited in Turnour's Introduction to the *Mahawansa*, p. 26, referred to in Cunningham's 'Bhilsa Topes,' pp. 44-45. The identification of Vararuchi with Katyayana has been made also by Colebrooke, Lessen and others as well as in the *Kathasarit Sagara*, a book of fables supposed to be the original of the *Pancha-tantra* and written in the 11th century.

Indian Scientific genius.(1) He has used in this work a 'perfect scientific and philological apparatus'(2) and as we shall see later on, his fame was well-nigh eclipsed by a most distinguished grammarian of the University of Nalanda. With these three—Panimi, Katyayana and Patanjali—is placed in the same rank a latter-day grammarian of the 7th century, A.D., Bhartrihari, a Buddhist of no very rigid principles who oscillated many times between the monastery and the household. He is the author of the metrical aphorisms called the *Karika* and also of the three centuries of lyrical poetry, entitled the *Neeti Sataka*, the *Sringara Sataka*, and the *Bairagya Sataka*. In the long role of Indian Grammarians, there are several who profesed Buddhism and who stand like Jayaditya, the author of the *Kashika Vritti*, Amara Singha the lexicographer, Durga Singha, the commentator of *Kalapa* and others, in the very first rank, and grammars now lost in India have been discovered in Nepal and Tibet. (1)

Now, the works, of these grammarians of the Paninian School including those of the founder of the School himself formed, as even now in the Sanskrit *tols* outside Bengal, the staple of grammatical study at Nalanda. They are thus mentioned in I-Tsiang's list: 1 The Sutra of Panini containing 1000 aphorisms. Children, says I-Tsiang, begin to learn it when they are eight years of age and can repeat it in eight months' time. This book was probably a selection from Panini intended for beginners; the more advanced scholars must have mastered all the 3996 aphorisms; 2 The Kurni or the Mahavasya of Patanjali (24,000 Slokas) which advanced scholars learnt in three years; 3 The Vritti Sutra or Kashika vritti which boys of fifteen begin to study and understand after five years; 4 The Vartrihari *Sastra* or karika (25,000 slokas). It is certainly curious that I-Tsiang does not make mention of the *Vartikas* of Katyayana. The other grammatical works I-Tsiang mentions are: 5 The Book on *Dhatu* having 1,000 slokas; 6 The Book of the Three *khilas* divided into Ashtadhatu (1,000 slokas),

(1) Goldstucker found out the date of Patanjali long ago—*see* 'Panini'—p. 234. After him, the researches of Dr. Bhandarkar (who based his conclusion on internal evidence) and others have settled his date once for all. *See* Dr. Bhandarkar on the date of Patanjali, Indian Antiquary, 1872, pp. 299-302 and also Smith's Early History of India, 2nd Ed. p. 204-5.

(2) Dr. Brojendranath Seal. The methodology of Patanjali has been the subject of a masterly exposition by Dr. Seal in a part of his paper on the Physical and Scientific Methods of the Hindus, incorporated in the second volume of Dr. P. C. Roy's History of Hindu Chemistry.

(1) *See* Preface to Bendell and Haraprasad Sastri's Catalogue of Manuscripts belonging to the Durbar Library of Nepal and S. C. Vidyabhusan on "Sanskrit works etc. preserved in Tibet" in J. A. S. B., New Series, vol. III, No. 2, 1907 and also Ibid in J. A. S. B., 1908, p. 594.

Manda or Munda (1,000 slokas) and Unadi (1,000 slokas); 7 The *Vakya* discourse or Vakyapadiya by Bhartihari (1,000 slokas); 8 The Veda vritti by Bhartrihari and Dharmapala. Some of these books have not yet been identified and some are lost beyond recovery. These grammatical works, says I-Tsiang, "were studied by both priests and laymen and without a knowledge of these no one could gain the name of 'Bahushruti' (*i.e.*, well-informed)." These text-books may fairly be taken to cover the grammatical curriculum of Nalanda. "Thus instructed by their teachers," says this same Chinese Savant, "and instructing others they (the students) pass two or three years generally in the Nalanda monastery in Central India? Or in the country of Valabhi in Western India."(1)

So far about the teaching of grammar at Nalanda. But the actual achievments of an Academy in any department of learning are measured not by the course it prescribes, but by the expansion of the limits of knowledge or learning which it can effect. It may naturally be expected that in a University like Nalanda, where the utmost freedom of intellectual exercise was allowed, something new, something original would be contributed to the sum of world-letters. But here the historian is faced by no common difficulty. As Emerson says, no fence, no bar is strong enough 'to keep a fact' and time is always grinding it to 'shining ether'? Even then the records of Kings, battles and political changes survive for us in coins and inscriptions to be explained by the numismatist and the epigraphist. But the only records of a man of learning are those found in his works that come down to us, and the works of ancient Indian literature that have survived barbarian devastation are scanty indeed, specially when we consider its original richness and variety as the translations of lost works preserved in Tibet, Nepal and China amply attest. We have thus no means of judging the exact extent of Nalanda's contributions to the science of grammar, yet the name of one great grammarian of Nalanda has lasted down to our time.

Chandra Gomin was the founder of one of the eight ancient schools of Sanskrit Grammar. He studied at Nalanda under Sthiramati, a very distinguished professor of the University and mentioned by Hiouen Thsang among others as having added lustre to his *alma mater*. Chandra Gomin did not specialise in grammar alone, but was a very versatile genius, who mastered many branches of learning. He is said to have been a worshipper of the goddess *Tara* and the story is preserved in a Tibetan history of Indian Buddhism of how he was offered the hand of the King's daughter in marriage and rejected it because the name

(1) For this list (of which however we have not preserved the order) and the quotations, *see* Takakasu, pp. 170 ff.

of his prospective bride was the same as that of the goddess of his worship. The King is said to have been much incensed at the insult, and he beheaded him and threw the head enclosed in a pot into the Ganges. The pot floated down the stream and was stranded on an island (now in the district of Backergunge) which took the name of Chandradwipa from this tragic inci dent.(1) The reader will no doubt be reminded of a somewhat similar legend about Orpheus whose "gory visage down the stream was sent, down the swift Hebrus to the Lesbian shore."(2) The date of Chandra Gomin has been a matter of much disputation and Dr. S. C. Vidyabhusan places him from Tibetan calculations at about 700 A. D. But this appears to be inaccurate as he is clearly mentioned by Bhartrihari (circa 650 A.D.) whom Chandra must have preceded.(3)

Chandra Gomin lives chiefly by his *Chandra Vyakarana* which is his *magnum opus.* It is in six *Adhayas* (chapters) each subdivided into four *padas* (sections). This work is parallel to Patanjali's *Mahavasya* with which Chandra is said to have found fault on the score of verbosity and was intended to supersede the work of Patanjali. The grammatical works of Chandra Gomin are lost in their originals and survive only in Tibetan translations, *viz* : *Bimsatyupa sarganama* (a commentary on the twenty prefixes), *Barnasutranama* (aphorisms on the alphabet), *Chandra-vyakarana-sutra-vritti* (a commentary on the aphorisms of Chandra, the author himself), etc., etc.(1)

Of other grammarians, we know of one Chandra Kirtti whom Chandra Gomin met at Nalanda and who also had written a grammatical work. Chandra Gomin is said to have been so much struck by the superiority of the other's grammar that he threw his own into a well from which it was rescued in a miraculous manner. Another grammarian of Nalanda was Dharmapala, the master of Silabhadra, the head of the Nalanda University at the time of Hiouen Thsang's visit. He and Bhartrihari collaborated on a grammatical work called *Veda Vritti*, in prose and verse, which was a popular treatise in India about I-Tsiang's time.(2)

2. *Logic or the Science of Reasoning* (*Hetuvidya*).—After the preliminary intellectual discipline perfected by the study of grammatical and philological works, the student, as I-Tsiang tells us, took up the study of Logic and Meta-

(1) *See* S. C. Vidyabhusan's 'Logic'—pp. 121-122.

(2) Milton's Lycidas, 66, 62-63.

(3) *See* the translation of the reference by Bhartrihari to Chandra Gomin, Goldstucker's 'Panini,' p. 238. The date of Bhartrihari has been settled from I-Tsiang's reference to him. *See* Max Muller's letter to Takakasu inserted at the beginning of his translation of I-Tsiang.

(1) *See* 'Logic'—pp. 121-122—and S. C. Vidyabhusan on 'Sanskrit works etc., preserved in Tibet' in J. A. S. B., New Series, vol. III, No. 2, 1907 and also Ibid, p. 584.

(2) Takakasu, p. 180.

physics.(1) Indian Logic, founded long, long ages ago by Aksapada Gotama, was about the time when Nalanda University rose and flourished entirely in the hands of the Jainas and the Buddhists. In the Pali literature of early Buddhism however, logic hardly figures as a science. (2) But with the rise of the Mahayana when metaphysical problems on which Buddha had been very reticent came to the fore-front, Logic at once rose in importance. The process was the same as in the Christian Church which at first looked upon this science with abhorrence as an inconvenient intruder on the special preserves of faith. It was only when the famous dispute arose on the nature of Universals, that the Church perceived the necessity of defending itself with systematic reasoning and the rise of Logic as the most important of all sciences in the hands of the Schoolmen, reaching its apogee in St. Thomas Aquinas, is too well-known to need detailed mention. Similarly in ancient India in later times, public discussions on metaphysics and theology formed the most important episodes in her religious history. Numerous more or less legendary accounts of such discussions have been given by Hiouen Tsang and we learn from him that even the fates of monasteries sometimes depended on the success in a debate. The great Chinese traveller himself was invited by Harsavardhon to hold a debate with the Tirthikas (the opponents of Buddhism) in his capital. It is but natural that under conditions like these, the science of reasoning should receive enormous impetus. The school of logic which arose as the result of this state of things has been styled the Medieval Schools, founded by Dignaga. The vast literature of Buddhist logic of this school has however nearly disappeared from India, but a large portion of it exists in faithful Tibetan translations.

Nalanda, as we have already said, was a great centre of philosophical discussions and this at a time when the tide of intellectual activity in India was almost at the flood. It is but natural that here if anywhere in India, the science of reasoning should be immensely developed. Studying the history of the university, one cannot but come to the conclusion that its greatest and most brilliant achievements were in the field of Logic, as the long role of Nalanda logicians prove beyond any doubt. (1)

Legend connects the name of the founder of the Medieval school of Indian logic, Dignaga, with the University of Nalanda. It was here that this 'Bull in

(1) Ibid, 172.

(2) *See* Vidyabhusan's 'Logic.'

(1) I freely acknowledge my indebtedness to S. C. Vidyabhusan's 'Indian Logic: Medieval school' for the accounts here given of the logicians of Nalanda and their works. The book is of unique value on account of the fact that its materials are drawn (in the second part which deals with Buddhist logic) almost entirely from Tibetan books none of which has been translated and very few published.

Discussion' is said to have defeated Brahmana Sudurjaya and other Tirthya dialecticians and won them over to Buddhism and acquired the above *sobriquet.* The greatest logical treatise of Dignaga entitled the Promana-Samuchchaya (which is said to have been originally written in a cave in Orissa) forms the text of a vast amount of scholia all written by Buddhist logicians. He was the inventor of the wheel of logic (Hetuchakra) in which nine possible relations between the Middle and the Major terms are set forth and the reputed author of a vast number of other logical works. "Logic is said to have been handed down by Dignaga, through (his pupil) Samkara Svamin and ten other masters to Silabhadra," (1) the teacher of Hiouen Thsang and the head of the Nalanda monastery, during the early part of the 7th century. Dharmapala, Silabhadra's predecessor as the head of the Nalanda monastery, was also a distinguished logician and composed several works some of which were translated into Chinese in 650 A. D. Among his pupils was the famous Dharmakirtti who was received into priest-hood by Dharmapala before he was perhaps quite out of his teens. He figures as a logician and debater, as the most distinguished name after Dignaga and he is the author, among other works, of *Nyaya-bindu*, a monument of logical acumen and the only surviving work of this school that has come down to us in the original, and which became the text for numerous scholia. His pupil Devendrabodhi was another famous logician, a popular writer on logic and the preceptor of another logician named Sakyabodhi. After Dharmakirtti another most distinguished logician of Nalanda was Vinitadeva, the author of *Samaya-bhedo-parachana-chakra* and eminent as a scholiast who studied here about 700 A. D. Next we may mention Chandra Gomin (whom we have already met as a distinguished grammarian of Nalanda) who was also the author of a logical treatise. We know also of two other eminent logicians of Nalanda in the latter half of the 8th century after which the University seems to vanish suddenly from view—Santa Rakshita and Kamalasila. We shall have occasion to speak of these two *savants* of the Nalanda University in detail later on. Santa Rakshita was the author of two logical treatises one of which contains thirty-one chapters. His follower was Kamalasila, a professor of the Tantras at Nalanda, who wrote a commentary on one of his master's works and wrote also a summary of criticisms on Dharmakritti's *Nyaya-bindu*. All these logicians of Nalanda take their place in the very front rank of the School and the marvellous development of Indian logic must in a very great measure be attributed to them, although their works may have to all intents and purposes perished. Nalanda's place

(1) 'Logic', p. 101.

must, therefore, be pronounced to be pre-eminent in the development of Indian logic.

I-Tsiang prescribes the following list of logical works for those who are desirous of gaining distinction in Logic and it will give us some idea of the logical course in the curriculum of his *alma mater*. But it would require the assistance of a Chinese scholar to examine the exact extent of this course, as most of the books mentioned by I-Tsiang are extant in Chinese alone and a few are lost beyond recovery:—

1. The Sastra on the Meditation of the three worlds (Lost).
2. Sarva-lakshana-dhyana-sastra (Karika) by Gina.
3. The Sastra on the Meditation of the Object by Gina.
4. The Sastra on the Gate of the cause (Hetudvara) (Lost).
5. The Sastra on the Gate of the Resembling cause (Lost).
6. The Nyaya-dvara-tarka-sastra by Nagarjuna.
7. Praguapti-hatu-sangraha-sastra by Gina.
8. The Sastra on the grouped inferences (Lost ?). (2)

Judging by the mere names of these logical treatises, it would seem that in their treatment they soared into those higher regions, where Logic and metaphysics blend into one (compare Hegel).

3. The science of Medicine (*Chikitsa-vidya*—embracing exorcising charms, medicine, the use of the stone, the needle and moxa).

The science of medicine was a very old science in India. References not only to medicine, but also to the practice of it is found in the Rig-veda the oldest of the Vedas. A *Rishi* in a hymn of Rigveda gives in the following words an interestingly naive autobiographical detail:—

"I am a poet, my father is a doctor, and my mother a grinder of corn. With our different views seeking to get gain, we run after (our respective objects)"(1). In the Atharva Veda "plants and vegetable products in general are fully recognised as helpful agents in the treatment of diseases." The word *Ayurveda* and its adjective *Ayurvedic* occur in Panini's grammar and in the same work is also to be found a list of technical terms which prove that even in his day some sort of medical system was in vogue. (2) Before Charaka, whom Dr. P. C. Roy places from internal evidence based on the manner of treatment, the text and the diction, in a pre-Buddhistic era, flourished other writers on medicine,

(1) See Takakasu's Intro. to I—Tsiang. Mr. Takakasu thought that the 8th book in this list was lost. May it not be the same as Dignaga's *Promano—Samuchchay* (of which we have already spoken) now discovered to be extant in in Thibetan ?

(1) *See* P. C. Roy's History of Hindu Chemistry, vol. I, Intro., p. 1 ff. and also Mrs. Manning's Ancient and Medieval India, vol. I, p. 335 ff.

(2) P. C. Roy, vol. I, p. IV.

such as Agnivesa, Bhela, Jatukarna, Parasara and others on the first of whom Charaka's work was based. But although Hindu medicine was cultivated before the birth of Buddha, its development is rightly attributed to Buddhism—so much so in fact that Govindacharya, the devout Hindu author of *Rasasara*, writing probably in the 13th century, A.D., speaks of the Buddhists as authorities on the subject, *e.g.*, " এবং বৌদ্ধ বিজ্ঞানন্তি ভোটদেশনির্ব্বাসনঃ' and বৌদ্ধমতং তথা জ্ঞাত্বা রসসারঃ কাতো ময়া। (1) Buddha in fact himself became the healing deity of the Buddhists—the " King beautiful as Baidya, the supreme Physician " of the Tibetans who worship him under this aspect in the temple of Medicine at Lasha, (2) the Binzuru Sama of the Japanese and the Won-chiang-sse (*i.e.*, the unsurpassable Doctor) of the Chinese.

(To be continued)

SUKUMAR DUTT.

GLEANINGS

TIME.

If you love your Life, do not waste Time, for your Life consists of Time. We waste far more time than is necessary in sleep and always forget, that a sleeping fox never caught a bird. Because Time is the most costly of all things. So wasting Time is the most shameful dissipation, for lost time can never be found again by any one and what we call " Time enough " is truly translated " Too little Time." So let us rise early and work and so work at what we have to do, that we shall be able to do more of it and do it better.

JEAN PAUL.

THE THREE GLASSES.

In an open room belonging to the wise seventy years old Solomon, three glasses were placed on a stand.

On the first the name "Contentment" was painted, it was thick and dull and had only a faint glitter about it.

On the second glass, in very clear bright colours was the inscription "Gaiety." But on the third glass was written "Pleasure" and it was sparkling bright like the dew and diamonds and its colours were like Sapphires and Rubies.

Suddenly a hurricane threw all three on the ground. Then was the glass of "Pleasure" broken into a thousand splinters, "Gaiety" was cracked and only " Contentment " remained undamaged.

HERDER.

(1) Quoted in P. C. Roy's 'History,' vol. II, p. lxvii, footnote. The meaning of 'Bouddha' here was called in question, but Dr. Roy has successfully set the doubt at rest.

(2) *See* Waddel's Ancient Anatomical Drawings preserved in Tibet, in the Asiatic Quarterly Review, Oct. 1910, and his 'Buddhism in Tibet,' pp. 353-354.

ir Lancelot Hare, K.C.S.I., C.I.E.

WE take this opportunity of bidding a regretful farewell to SIR LANCELOT HARE, K.C.S.I., C.I.E., who is shortly laying down the reins of the high office which he has held during a momentous period in the history of the Province. This is neither the time nor the place to enter into a critical survey of his administration ; but it would appear even to the casual observer—that what the Province is to-day and bids fair to be at no distant date, is the result of the ripe experience and large-hearted sympathy which he and his trusted advisers brought to bear on the difficult task of administering a newly-created Province.

First and foremost, the cause of education has always found in him a generous patron. The Saraswat Samaj—the principal centre of orthodox Sanskrit learning in the Province, has been liberally endowed and put on a secure basis.

The Dacca College of to-day with its magnificent buildings—the noble Curzon Hall, its splendid Hostel accommodation, and Laboratory equipment, ranks second to none in India. Its efficiency has been largely increased by the appointment of several members of the Indian Educational Service to its staff.

Colleges which had been in a moribund condition were granted liberal grants-in-aid, and relief came to them at a time when relief was urgently needed owing to the operation of the New University Regulations.

The Jagannath College of Dacca, the Ananda Mohan College of Mymensingh and the Victoria College of Comilla will always remain standing memorials of the far-sighted and beneficent educational policy inaugurated during His Honour's administration.

The keen interest which he has ever displayed in the spread of education among the Mahomedans, will, we hope shortly take practical shape in the foundation of the long-deferred Mahomedan Hall.

Female education, too, has received a great impetus during this period, as is evidenced by the remarkable increase in the number of girls at school. The Eden High School of Dacca, which in point of strength of its teaching staff and in the quality of teaching can hold its own with any similar institution in either Province, owes its present standing to the per sonal interest of Sir Lancelot Hare.

It is gratifying to learn that as further evidence of this good will the Eden School will shortly have a splendid building erected for it, which will stand in extensive grounds of its own. Over ten acres of land have been acquired by Government for this purpose.

Among the more prominent administrative measures we might mention, the strengthening of the general Police, the inauguration of an organised system of River Police, with a fleet of steam-launches to patrol the river high-ways, and above all the judicious though stern measures adopted to check the growth of sedition—these are measures which must commend themselves to all who have the best interests of the country at heart.

Nor must we forget to mention that questions of sanitation are constantly in his mind, as is shown by the various measures he adopted to improve the health of towns and villages—specially the vigorous attempt to fight Malaria and to popularise the Quinine treatment.

Water-works have been provided at a number of places where the want of good drinking-water had long been keenly felt. The improvement of the Municipal system of Dacca,—a noticeable feature of which has been the extension of the Waterworks, has largely been due to the solicitude which he has always evinced for the well-being of the town which looks back with pride to the days when he was its District Officer.

At Dacca, in particular, the impending departure of His Honour will evoke sincere regret. Dacca had known him intimately—even familiarly—for such a length of time and in so many varied capacities, that his appointment five years ago was hailed with genuine enthusiasm.

His sleepless vigilance and vigorous activity in Municipal affairs, while he was District Magistrate, are still remembered. Many of us will recall too, his achievements in the cricket field at a time when Dacca was noted for its cricket, and the vigour and dash of his play at Polo.

He will carry all our good wishes with him for the life of retirement which he has so well earned by his long and faithful labours in the service of this Province.

THE DACCA REVIEW.

VOL. I. AUGUST, 1911. No.

THE PROPOSED DENOMINATIONAL UNIVERSITIES.

Schemes of Hindu and Mussalman universities are in the air and are being received with mingled feelings by the Indian public. They necessarily imply a judgment on the existing secular universities. A suspicion which has never been very far from the Indian mind about the social and religious aspects of our educational system is at last assuming an articulate form. The suspicion was in the earlier stages confined to those who stood outside the system, being scouted as philistines by the children of light who were identified with it. But now it has come to invade the educated mind also where it is gradually taking the form of a definite accusation against the University enlightenment. An education is to be judged not simply by its immediate effects on the individual but also by the measure of adjustment that it promotes to his society. Whatever the University system may have been worth, it has not connected itself with our social and religious life. It has mainly by the adventitious aid of economic causes drawn off the best intellects of two generations and alienated them effectually from their past and from the bulk of their community wedded to this past. It has effected this alienation primarily by standing aloof from our historical life, helped by a certain prestige which it could reckon on from the very beginning and secondarily by an inculcation of ideas and principles hostile to our traditions which themselves at the same time have been condemned to die of inanition. Such in fact is the judgment—largely yet a matter of sentiment—on which the present proposals for denominational universities are tacitly or expressly based.

Half a century—for that is about the age of our universities—may not be a sufficiently long period in the history of a society but so far the new thought cannot be credited with having embodied itself in any living institution. Religious reconstructions such as we have had under its influence have never shaken off a certain abstract unreal air that they have about them and never gained a foothold outside the educated clique. Schemes of social reform have been flapping idly in the air for so long a time that people have come to imagine that they were never intended to be anything more than the festive flags and buntings of the new Enlightenment. Politics having passed out of the comfortable stage of debating club declamation have been sharply brought to what one is tempted to call their *reductio ad absurdum.* This *reductio* may have for all we know been reached in the other two spheres also, though it is not so easily perceived because perchance the steps of the demonstration are more involved. It requires pride and a robust type of optimism to keep out the choking sense of failure that presses upon us from every direction.

The sterility of the Enlightenment has come to reach upon its charm. The expansive ideas that in default of the reality wove for us such a fair dream of a new life have begun to lose their freshness and power. A disillusionment is coming over the educated mind: behind all indifference and slackness, there is the unmistakable "pale cast of thought." The suspicion has been aroused and there is now hardly any thought, any aspiration or hope which we can call ours with absolute assurance. In our strivings after sincerity we turn ourselves inside out and yet we never know our own mind.

Meanwhile the struggle for existence has been growing keener and keener. For the sons of the middle classes, despite all pious sermons, the way to the solution of the bread-problem lies through the universities alone. The money-value of university-degrees—what alone raised them in the estimation of the people at large—is no longer sufficient to keep up the self-respect and the isolation of the educated caste. Industrial openings do not offer themselves for the mere wishing and there has been enough of this wishing for the matter of that of late years. It now appears that if we would be any good industrially, we have to begin at the lowest stages and be prepared for a measure of social levelling more drastic than is ordinarily imagined. Unless however the economic pressure lightens by a miracle, such a social rearrangement is inevitable. It will necessarily spell spiritual degradation for us in the first instance. It will involve the abandonment of much that we cherish as necessary to the health of the soul as ill-timed luxuries. To undergo this ordeal without losing our identity. without being false to the type of civilization

which we hold in trust, we must have a large saving faith to rest in, a faith in our corporate identity which the Enlightenment has so far undermined instead of strengthening. There have been worse times in our history and it is such a faith that has kept us alive through them all: it has kept our society intact through centuries of political disorder. The bread-problem has to be solved even though it oblige us to be hewers of wood and drawers of water; but unless we have forgotten ourselves entirely, we need not despair of keeping the spirit alive in the body. We have to renounce our faith in mere industrial nostrums. Industries alone, supposing they could be evolved by a rub of Aladdin's lamp, will not work our salvation: necessary though they might be, they cannot by themselves induce social cohesion. On the contrary they can come into being only through social cohesion, only through the socially felt need to have a continued life for ourselves, only through a realization of the spiritual and not merely political danger of a social dissolution.

Such a realization though very dim yet, is coming to be more and more explicit everyday. It is the positive side of the suspicion of the Enlightenment which has come to trouble the children of light themselves. The imperative need of increased social cohesion is pretty generally recognized. The bankruptcy, in spite of some desperate gambling in recent years, of the social and political movements started by the new thought has been demonstrated by the logic of facts. We require other guidance than that of the enlightenment. We must lay our finger on the secret of the social cohesion that has resisted the mouldering influences of the environment through so many centuries. This would be the real power that we have to harness to work any new machinery that we employ to suit modern conditions. Mere machinery, however up to date, will not work by itself.

This power is the power of religion. The most advanced thought of the Enlightenment seeks to substitute nationality for it. Indian nationality is however only an aspiration—an aspiration confined to the educated section—but not a reality yet. Religious union within each of the great denominations in our country is however a living fact continued from all the past and representing an enormous store of power for good or for evil. It is no wisdom to ignore this real power because perchance it has not been stowed away after the heart of the Enlightenment. Denominations we must have to the end of time and in our country especially where religion and society are identified with one another, the two great religious communities represent two distinct types of social life which have not only the right but are under an inviolable obligation to maintain their individuality. Each now looks forward to a university of its own to conserve and develop its

historic life and each would base it on religion as the source of its distinctive social unity.

The movement for denominational universities was bound to come and it has not to our mind come a day too soon. The movement for a national University such as we have had represents a transitional stage. It too has been a protest against the exotic character of our education and a demand for a binding organic idea. Nationality as this idea was formulated was however merely one of the abstract ideas of the Enlightenment The present movement based on religion —on actual established religion—is a more fundamental protest. Ideal in its aspirations as every University movement must be, it proposes to trust to a real and not merely an ideal power for their realisation.

The demand for a change of methods and ideals in our education is intelligible enough. Yet the issues involved are so large and complex that one feels diffident in anticipating with anything like fulness the proposed change. It is a case more of faith than of vision, of sentiment rather than of rational calculation. All that we can look for is a certain negative assurance that the objections to denominational universities are not so strong as they appear; that they are neither undesirable nor impracticable institutions, and that there is at least room for them as supplementing the existing institutions.

The present movement is judged from various standpoints. Objection has been taken from the point of view of culture and of nationalism which is bound up with this culture, from that of expediency, and even from that of religion. The protest in the name of culture is the loudest. To restrict a university to a particular denomination is to encourage narrowness and to stultify its essential purpose. If truth is neither Hindu nor Mussalman, where is the place for a Hindu or a Mussalman university? In point of religion too, is not the whole effort of the modern mind directed towards working itself out of sects and denominations? This narrowness again has momentous practical consequences in this land of chronic religious feuds. The new education has so far been the most important agent in softening down these feuds and in making for a national fusion. Sectarian universities would accentuate differences and indefinitely postpone the realisation of the national idea. Then supposing the existing universities have done destructive work, has not this work proceeded too far already to enable us to simply retrace our steps? Do the present educated class who will of necessity have to begin the work of the proposed universities feel interest enough and reverence enough for their traditional religion? If some sort of selection or reconstruction of doctrine is wanted, where have we to look for competent authority and if it is nowhere

yet, by whose sanction is it to be constituted? If somehow it can be constituted, will it not be expedient to provide religious education through this agency outside the secular institutions—in denominational hostels, for example to avoid the difficulty about the subordination of secular learning to religious which is necessary unless the proposed universities are to be mere reduplications of the existing institutions? Finally there is the difficulty about the justification of the state with an alien religion actively supporting and not merely tolerating the proposed religious institutions.

So far as the objection of narrowness is concerned, it is worth remembering that there may be a liberalism at the expense of reality and it is precisely this abstract liberalism that we associate with our university enlightenment. It is not denied that the association of students and teachers nurtured on different traditions on the common platform of learning has a broadening effect but it may be a calamity also if no special attention is directed towards fostering the distinctive culture of communities of ancient historical standing. Difference is not necessarily an evil and there are types of social life as there are types of organic life. There are natural limits and established differences between communities to which education, if it is to be real and concrete, must have a reference. Education is real when it promotes an assimilation of culture with life and it promotes this only when it is concrete, addressing itself to the special spiritual needs of the community, and is not abstractly cosmopolitan. It is through such education alone that there comes a liberalisation of the soul as distinct from the luxury of mere liberal thought.

A university to be a living institution must connect itself with social life and have a unity of social purpose. An indefinite widening of its limits may well defeat this end. A sufficiently large community of historical standing and representing a distinctive type of social life requires a university or universities of its own. The religion of a community especially in our country is the explicit embodiment of its vital social ideals. Hence the unity of purpose demanded by a university in a society like ours must be a religious unity.

There is, however, nothing to prevent such an institution from dispensing as much of secular culture as any of the existing universities. Within certain limits also it should always be prepared to admit on the secular side students and teachers of alien religions. It is clear too that in the present circumstances of our country, a denominational university cannot, to begin with, be much more than an ordinary secular university with a religious side as an addition. As it develops however, it will demand a subordination of the secular side to the religious. Much will depend on the nature of this subordina-

tion and it is here that injury to the interests of culture may be specially apprehended.

Unless however culture necessarily implies belief in the worthlessness of religious learning, it might be expected in the name of liberalism itself to promote at least a co-ordination of sacred and profane learning. Our education has, instead of promoting, positively hindered such a co-ordination. It has been contended that religious education is the look out of the people themselves and not of the State and that the experience of the West has taught that it is best imparted outside the universities. But it is doubtful how far the experience of the West has a clear application to the conditions of our country where the place of religion in society is very different; and it may not be reasonable to expect of a dependent community like ours what may be expected of a free community in the matter of providing for its own religious education.

Whether in theory religious and secular education should be controlled by separate institutions is a question which admits of being discussed and it would be dogmatic to hold that the history of the Church and the University in the West points clearly to the affirmative answer. The question in our country is however more specific: it is about the danger of a *premature* secularization of education. Where the Church has the resources for organising on its own account an efficient system of religious education, it may be expedient under certain circumstances to confine the State-chartered university to the work of secular education. For two very definite reasons however, the religious denominations in our country cannot evolve an efficient system of religious education while the secular universities are there. So long as the university pass continues for the sons of the middle classes to be the one key to the solution of the bread-problem, these universities must continue to attract the best intellects of the country and through their traditions produce in them an indifference to our ancient religion and a contempt for the professors of sacred learning who must be generally their intellectual inferiors. The competition again which is inevitable with these institutions must be unequal, being practically between the dependent communities on the one hand and the State on the other. For religious purposes the communities have been disorganised mainly in consequence of their political subjection. In theory, the temporal sovereign was always the religious head of the Hindu community who supported the professors of scriptural learning, settled their order of precedence and enforced their decisions. Although in practice during the periods of political subjection this function of the Sovereign devolved on the Hindu nobility, the traditional system of education, secular and religious—these never having been

separated—was left untouched by the State. If not actively supported by the State, the system was at least not opposed by the establishment of a system with antagonistic aims and purposes. Under the present rule, while a higher conception of State-responsibility in education has been operative, the adoption of the policy, supposed to be necessary, of religious neutrality has amounted to a very definite though unintended opposition to the religious organisation bound up with the traditional system, an opposition which has been more successful than any direct work of proselytism which the State might have undertaken.

So then, our education has been secularised when our community cannot from the nature of the case evolve institutions for religious education which can resist the disintegrating influences of the State-supported system. It is sometimes urged that the very success of the present system is a justification of the Government policy. It is a demonostration of the effeteness of the Social system which the policy has without intending it, left to die a natural death. The logic of such a contention is not quite obvious.

The shrinkage of faith that is attributed to culture is often due not so much to the culture itself as to its antecedent bias, to an exclusive preoccupation with it and to certain accidental beliefs accompanying it.

How far indifference to our traditonal religion has been legitimately brought about by our University culture and how far it is due simply to our want of acquaintance with it and to certain phrases and catchwords of the New learning which passes current, though they may have no real applicaton to our life, is an inquiry which has never been properly undertaken. It is not intended to deny that the University culture has swept away a mass of superstitions and prejudices and has broadened our ideas in certain directions. But it is contended that under its influence and through a too exclusive preoccupation with it there have been fostered a phenomenal ignorance and misunderstanding of our religious and social ideals, which have acted very prejudicially to our development and progress. It is no good even in the interests of culture to condemn them without a hearing; and in any case the bulk of the community who still believe in them have a right to complain of the destructive work done by the education policy of the State in this connexion.

A Co-ordination of sacred and secular learning within a university may be an intelligible demand but a denominational university, if it would be true to its principle, must have even a more specific aim. It must subordinate the secular side to the religious. It may be apprehended that such a subordination contradicts the very idea of a university as it has so far evolved. Whether it

does so will appear from an analysis of what it precisely implies.

It is demanded by none that a university should teach a demonstrated falsehood. It would not be accurate therefore, to say that its function is to teach and discover truth unless truth is taken in a very loose and rhetorical sense. For one thing, for example, poetry has always been included in university curricula and it is worse than a straining of terms to say that it is a branch or department of truth. It would be nearer the truth to say that the work of the university is to impart and advance *learning*. Learning consists in human views of truth organised into a tradition. They need not be cognitive or scientific views only: they may be aesthetic and religious views also. Such views of truth may be however more or less adequate and the traditions in which they are embodied may be sterile or fruitful or puzzlingly variable. Accordingly learning requires to be validated by some central authority certified by a presumed witness of the truth. Such a witness in the last resort must be the university.

With this explanation of the function of a university, the ineptitude of the platitudes about the absurdity of Hindu or Mussalman truth becomes apparent. The different branches of learning scientific, æsthetic, and religious—have reference to one another and under normal conditions tend to constitute a unified outlook on truth and a distinctive spiritual attitude. Science as such has no caste or creed: Intellectual activity by reason of its abstractness is cosmopolitan. Still even here the direction is given by our spiritual interests; the varying proportion of attention given to different subjects is determined by predilections or faiths from other regions of the spirit than the intellectual; and the speculative unification and gradation of the branches of knowledge are clearly regulated by ideals which lead but do not follow knowledge. As to æsthetic or religious views of truth, whatever objectivity they might claim, it would be idle to deny their individuality. Each nation has its distinctive image-material, attuned to its traditional hopes and fears, in which its art must be embodied; and however piously we may talk of a universal or essential religion, the fact remains that it has not yet come and that so far the religion of every community betrays individuality in its vital imagery, practices, and speculations. There is indeed no Hindu or Mussalman truth but the unity of learning—scientific, æsthetic, and religious—and the spiritual attitude that it implies may well be Hindu or Mussalman.

In such a unity of learning authority in a very special sense is claimed for religious learning, by which we mean not the 'science of religion' nor the mere history of the church but a theology claiming to yield truth in respect of the objects of religion. It cannot be pretended that as yet any such branch

of learning has been developed on the universal basis of reason and has received the assent of all denominations: Religious truth, if attainable at all, has not so far been freed from its denominational forms. Philosophy is but the process of freeing it and it cannot be affirmed that the process has been completed or ever will be completed. Meanwhile each denomination believes in its Revealed Theology as embodying truth of a specially authoritative character.

The controversy—reason *versus* faith has not been declared to be closed A denominational university will have a reason for existence at the present day only in so far as it will accept a particular solution of it. It will be committed to the view that there is no real conflict between reason and faith and that the whole direction of the activity of reason—its regulative ideal though not its constitutive method or procedure—must come from faith and necessarily from denominational faith, that being the only concrete form of it. The subordination of reason to faith will not in this view involve any tampering with truth but will imply only a control of intellectual development which is liable to be erratic by certain intuitions of of values as embodied in the traditional faith. That this traditional faith may include in its outer embodiment elements of secular learning of a bygone age, which are now exploded, does not make any difference; for religion as religion, however inseparable from its embodiment, is not belief in secular truth at all.

Accordingly in such a university there would be no justification for interference with the independence of teaching in the branches of secular learning. It should certainly however exercise general control in the matter of the appointment of teachers and the prescription of the courses of instruction, in which latter there would be considerable room for the application of its distinctive ideals. To be more specific, it should be possible in the subject of Philosophy, for example, to give special stimulus to the study of our own systems so that they with their intimate bearing on our religion may be brought into line with modern thought. Our own classical literature should here have its rightful place not merely in consideration of its artistic value for us and for the world but also in view of its being the repository of all our sacred learning. In History, more stress might be laid on the study of our own past, the general perspectve might require to be altered from our standpoint and certain extra faiths prejudicial to our self-respect might be discouraged. In the determination, further, of the amount of general learning to be acquired obligatorily by all before beginning to specialise, it may be expected that our social needs will receive more consideration than they do now.

It would be presumptuous to go into detail but it is obvious that the

Theological Faculty in such a university must have a specially authoritative position which may be in the first stages at any rate difficult to harmonise with the position of the other faculties. On it, in a large measure, will devolve the work of determining the general policy of the university. Its special work will be, on the one hand prescription of an authoritative course of religions instruction and discipline obligatory on all and on the other, over and above the conservation of scriptural learning, the authoritative development and unification of religious doctrine. This last may be regarded as the most urgent necessity of our society—we speak mainly of the Hindu society, the *sine qua non* of an efficient religious organisation, which if it would live at all, it has to develop. It is the one thing needful for the social and religious reconstruction that will adapt us to the times. If schemes of social and religious reform have failed so far, it is because this work has not been undertaken and it cannot possibly be undertaken under the conditions of our society without something like a university to serve as its centre or nucleus. It is mainly for this reason also that it has not been yet possible to organise an efficient system of religious education.

How this authoritative body is to be constituted is a problem the difficulty of which may well stagger us. Supposing that the state could see its way to sanction a denominational university, on whom would it rely in deciding as to the authoritative and representative character of this Theological faculty? There is no religious head of the Hindu community, either among the doctors of sacred learning or among their lay supporters. Everything depends on whether we have enough of corporate spirit and respect for our religion to be able to organise such a Board of religious control within the community. It is not a question of machinery only. The important point however is that such an organisation, if feasible, while it is a condition of the denominational university, would have its most powerful support in the university itself with the State recognition that is essential to its being.

The question of the subordination of the secular side to the religious is one not only about instruction but also about life. In fact subordination in life is much more important and presents fewer difficulties than that in respect of instruction. The existing universities, both on account of their geographical size and of their lack of unity of social purpose do not offer much facility for the development of a university life. It is this detachment in principle from social life that prevents the growth even of a healthy college-life such as we can really understand as distinct from the galvanic life which we seek to stimulate by institutions like the Common Room, games, and theatricals. Hostels, because they are necessarily denominational, are

much more efficient institutions in this respect, though the spirit of the education that is received—not to speak of other causes—hinders the success of any endeavours after religious training that may be made in them. A denominational university will positively favour the institution in hostels of a system of obligatory religious discipline such as may be adapted to the spirit of the times.

The apprehension of a danger to nationalism in the formation of the proposed universities appears to be as unfounded as that of a danger to liberal culture which we have already examined. Both are based on the assumption that difference is an unmixed evil and that development and union necessarily require an elimination of it. Yet just as there may be a liberalism in culture without a liberalisation of the soul, so there may be a fusion of communities without a living corporate sense emerging in the product. As things stand, each of the religious communities in our country, despite much disintegration still possesses a very concrete kind of corporate sensibility. The nationalist sentiment brought about by the Enlightenment compares as yet very unfavourably with it. It is confined to the educated class and is mainly negative in character having its roots no deeper than in the dissatisfaction with foreign rule. The effect of our education has been a weakening of this living sensibility in our communities without the formation of any unifying sentiment that can claim reality. One may still retain more or less faith in the future but it may be said that an adequate justification for this denationalising work of our education has not yet appeared and in the work of nation-building, one might have looked for a more assuring amount of realism than is in evidence. There does not seem to be much prospect, so far as this is a matter, of human calculation, of a strong and puissant nation being brought into existence by the emasculation of the groups that are to constitute it through the elimination of their actual unifying sentiments which go by the name of differences. For the individual as well as for the community, if the choice were given, one should far rather desire a living religion with all its intolerance than a liberal culture going with indifference. But the choice does not necessarily lie between them. It argues a poor faith in religion to hold that it promotes difference only and it is a miserable quackery that would cure religious intolerance by the nostrum of mere culture without strengthening the religion itself. Denominational universities would begin by strengthening this religion; and by making it assimilate culture prepare the way for a real widening of ideas—real because communal—without prejudice to the established unity of each community and thus render possible the growth of a real nation with a solidarity that is

intimately felt and is more than a mere luxury of thought. The education of each community along its own lines is itself calculated to foster mutual toleration; far from prejudicing, it would add the zest of life to the necessary unifying work to be effected by a secular culture which must be largely common to the communities and by their life in a common country under identical political conditions. The evolution is bound to be slow and in the eyes of an impatient Enlightenment, it would appear to involve in the first stages a shrinkage of culture and nationalism. Meanwhile however such speculation about our political future is coming to be unprofitable when one important community at least is refusing point-blank to be lulled by this dream of abstract nationalism. Any businesslike concern of nation-building must take account of present facts.

A more formidable objection is the practical one: the existing universities having done their work—it may be very destructive work, is it now possible to beat a retreat? The demand for denominational university has come indeed from the educated class. They would have to man it, if it could be constituted, but have they any vital touch with their religion, anything thicker than a yearning sentiment for them, to be able to carry out the policy of the university in the concrete? It is the old difficulty about the formation of an authoritative religious organisation, about which it is not possible to judge *apriori* if it is capable of solution or whether the present educated class have enough of the reverent spirit of compromise to be able to cooperate with the *pandits* and the orthodox masses who follow them is a point which experience alone can clear up. It should however be remembered that the experiment has never been really tried and has not been proved to be impossible. There is justification for experiments in denominational universities, considering that there is a fairly widespread sentiment in their favour, provided of course the necessary funds be forthcoming. The worst that we have to expect is that they will lapse into ordinary secular universities with a national religious side or to be more accurate, will not develop beyond that stage. There is room enough for a multiplication of universities in our country where the existing ones are too vast in size and too heterogeneous in their clientele to be more than mere nominal unions of colleges.

The most difficult point we have placed last. Can the State with its alien religion support by its sanction and not merely by its toleration the proposed universities which would be in some sense religious institutions? In a free country where the people have demonstrated by their history their capacity and their right to control their religious affairs, the State is justified in adopting the policy of non-interference in matters of religion. In a dependent country where the political handicap affects the

capacity of the people to maintain an efficient religious organisation, the State policy of neutrality is bound to act as a disintegrating agency. Non-interference here would amount to substantial interference. That is the case in our country where with the best of intentions, the State policy, in respect at least of education, has operated both positively and negatively to the detriment of our society and religion, which whatever they might be worth could at least claim to have a free hand in adjusting themselves to the new civilisaton. So the question comes to whether in view of its actual consequences, the State with a formal justification only for its policy can plead an easy conscience. In our judgment mere formal justification here is very much like an excuse for a shirking of obligation. The State has to interfere and the only question is how it will interfere. It cannot take up proselytising work and so the only alternative open is to uphold without distinction all the religions of its subjects, to actively help each community to cherish and conserve its religion—what in fact a sovereign belonging to it would have done. Imperialism is justified by a certain universality of faith and as the Roman Empire was the occasion and the preparation for the emergence of Christianity, so who knows a world-religion might be anxiously looking to the British Empire of to-day to usher it into existence?

KRISHNACHANDRA BHATTACHARYYA.

A STUDY "*IN POSSE*" BENGALI HISTORY.

IN the obscure ages of European culture—or rather in the ages which posterity clothed in a fictitious legend of primitive culture the great god Zeus took unto himself to wife (amongst others one Metis, the embodiment of Counsel; for Zeus was the arbiter of his own promiscuity. And fearing lest the offspring of Counsel might overcome his own authority—for Zeus was modern enough to understand the weakness of mere brute strength—he devoured his wife, when great with child. But even thus, brute strength triumphed not over learning; for there came a champion, some say Hephæstus, others Prometheus; to suit our allegory let Prometheus, the type of Human Forethought, be our champion. He clave the head of Zeus; and there leapt forth Athene the Goddess of learning, in the fulness and vigour of youth. How Zeus recovered from the blow, I know not; mythology however implies that his recovery was speedy and complete, that his ill-gotten and dreaded daughter (if such a beginning can constitute the elements of daughterhood) proved to be his great friend and ally. In fact they lived happily ever after. Perhaps my allegory may not be quite obvious in its application; let me explain. Suppose that Zeus is the Bengali nation; let Metis be the modern system of

education; it will not be necessary for me to prove that out Athene must be Bengali Literature. Who our Prometheus would be, is not a matter of much importance, probably due to the fact that I am not quite certain myself; perhaps it would not be asking too much of the reader to select his own hero; his interest in the allegory will then be greater; for he will claim t—part of it at least—as his own.

The reader might ask me, why I have not dispensed with an allegory, why I have not merely stated that Bengali literature is not the result of gradual growth, but a product discovered, let me say, in the immaturity of youth, rather than in the maturity of age; for that is the only part of the allegory in which we are at present interested. In the first place a statement of fact is often overlooked, more often still contradicted, while a clothing of imaginative verbiage may give it a specious advantage in the fight for interest and credibility; in the second place the allegory does, I think, apply to the subject in more aspects than the one under discussion, and may thus afford food for thought. Finally the allegory will remain, whether its right to remain is vindicated or not.

It may be disappointing to learn that the allegory has really been introduced only "*apologiae causa*;" it is not the purpose of this article either to sing the praises, or to criticise the faults of Bengali literature; in fact its sole purpose is to press the claims of a scientific study of Bengali History; the meaning of the *apologia* is that a full-grown product, if suddenly introduced into national life. may prove successful, but its success must depend on its adaptation to facts as they are. Athene was not in origin a Greek goddess; few deities, if any, of the Greek pantheon could boast that claim; introduced at a very early date, she was moulded to suit the facts of early Greek life and gradually became crystallized (as is so often the case amongst primitive tribes,) into a figure of Greek mythology. She not only crystallized, but became a crystal of some value, of some complexity as the ancient Athenian would have told one. Our Athene of the allegory is no less complex; the nature of her mother would ensure that. To simplify the complexity, let us abstract all her component parts, except the study of Bengali History. Can we see in that a crystal of any value? It will need a powerful glass to discover even the germs of crystallization; and in this we are fortunate; there is still time to mould our Athene before the process of crystallization has commenced. It was doubtless a shock to Zeus, no less than to Metis, when he swallowed his wife; the renewed shock caused by Prometheus must have caused Zeus to look aghast at the result. Substitute again the Bengali nation for Zeus; modern education for Metis, our hero whoever

he may be, for Prometheus, and the study Bengali History as part of the result, and we find a Bengali nation aghast at its own production. It stands amazed as it delves into the past. It gathers together stories; for the past affords pretty stories. A pageant of folk renowned for valour, for learning, for piety, pass through places, glorious in their unreality and lost in the mists of time, before the nation's gaze. But to be frank, their glory lies in their impossibility; the people are phantoms, not men; the places are visions, not facts; between phantom and phantom, between phantom and vision, there is is no sequence, no connection of cause and effect. We must really admit that our allegory was somewhat premature; our Athene has not yet crystallized into being; probably we were right alone in failing to identify our Prometheus; for finally we must admit that he has not yet wielded his axe; that our allegory in short is nothing but a prophetic possibility.

Let it not be thought that I wish to disparage work that has already been done; if I maintain that the study of history in Bengal has not yet reached the standard of excellence of modern Europe, the defect has a natural explanation. The study of history in Europe is a direct development of a seed planted in Greece some 2,500 years ago. The plant has been crossed and nourished with care; but it was not till some 100 years ago that the comparative and critical spirit was introduced, which has raised the study to so high a level. Mommsen is not a direct descendant of the Meistersingers and the authors of the Rhineland Saga. Gibbon, and Grote owed little to the Arthurian legend. The minds of Greece and Rome, of Italy, Germany, France and England have been blended together to produce the the science of Modern History. If I suggest that Babu Rasik Lal Gupta has attempted to create a saga of Raja Raj Ballabha; Babu Jogendra Nath Gupta a parochial chronicle of Bikrampur, and Babu Ananda Nath Rai has pieced together the disconnected legends of Faridpur, I am merely stating that they possess that "*Lust Zum fabuliren*," the love of story-telling, which is the necessary predecessor of true history. If Khan Bahadur Syed Aulad Hasan would but string together the pearls, that have fallen from his pen, the history of Dacca would take a leading place in the science of Bengali history. To avoid the odium of omission, let me add that the above names are merely typical, not exhaustive.

Now our primary object is to make the Athene of our allegory crystallize; otherwise the allegory remains a prophetic impossibility, and our Zeus will never suffer his head to be cloven open with such admirable result. If my methods of crystallization do not quite conform to the laws of physics, the more learned reader will pardon my ignorance—which I still cloak in the veil of allegory. We only require two factors, one the true

spirit of inquiry, the other the subject matter. If the two can unite, in what is known as a chemical combination, we have our Athene, and the brain that effects the combination, will be that of our Prometheus.

The spirit of Enquiry. Let us return to ancient Greece. The origin of history is, as usual, the Saga, as expressed in the Homeric and other poems; before the age of writing, verse could be remembered more easily than prose; even in later days Solon wrote his political exhortations in verse; the political poem is not unknown in the present generation. I do not however recommend the study of history in verse. The Saga merely states facts, describes the conditions of life and as it is handed down distorts them. The Saga was followed by the chronicles of the various cities; their merits were less, their distortion greater; one can imagine the value of a history of Shaista Khan, written by the favourite court-eunuch. The next step is a great advance, the age of the great travellers. They travelled to enquire and learn; their enquiries were multifarious; some of them doubtless resembled in their quest the translator of the Seir Mutaquerin; other interests were the gods, geography, astronomy, history. This was called "historia" or "philosophia;' the former means enquiry, the latter love of knowledge; the one implies the other. Mill's Logic and Stewart's History of Bengal were identical in their origin. The "philosophos" who enquired into geography and the facts of the places which he visited, was the first historian. The man who compared the stories of different places in order to reconcile discrepancies was the first great historian; his name was Herodotus. He was however still a story-teller. The man who introduced the critical method, who could find a theory in or a policy for every event, who could narrate current events in a disinterested spirit, who accepted nothing merely because he had heard it, was the greatest historian of the world; he is known to the world as Thucydides. The modern study of history is founded on the work of Thucydides, but it is unnecessary to detail each stage of the development. Rome did not produce his equal; mediæval Europe was, on the whole, content to chronicle events; it remained for modern Europe to develop the study. Motley and Prescott can claim little superiority, if any, over Thucydides; Gibbon, Grote, Mommsen, Meyer, Duncker, Oman and a host of modern names, however, have raised the study of history to its present exalted level. Ancient texts have been read, criticized and compared to attain a greater truth; literature has been ransacked, (even the poet and the comic writers,) to make history live, to afford a true insight into the life of the times; the study of geography has been developed to aid the study of history; archæology and numismatics have

assumed the place of honour in the study of ancient peoples; and it is only some 50 years ago that Schliemann commenced that study. A statue, the ruins of a building, a coin, an ancient custom, a jest in a comic writer may afford more historic fact, if rightly applied, than a volume of uncriticized tradition. The history of ancient Egypt is a history that lives in the true sense of the word. How many people are aware that it has been built up entirely by archaeological research, which has been applied to criticize the very unreliable series of fables handed down, many years after the event, by Herodotus? The history of the early Mediterranean owes its life to the study of archaeology and of ancient geography, by which legend has been converted into living history. Even the Odyssey, most fantastic of legendary poems, has been shown to be founded on the log-book of a Phœnician merchant vessel. It is this spirit of enquiry, the spirit to criticise and compare fable against fable, tradition against tradition, to compare the result of one's criticisms with the facts afforded by archæology or geography, to find a reasonable connection between one fact and another, to disentangle the thread of meaning from the entangled skein of fact and traditions —it is this spirit, which is necessary for the study of history. Dates, except in so far as they show the sequence of facts need not trouble us; let us not idolise a man, merely because he was our ancestor, or damn him because he murdered our kinsmen or looted our homes; he may have had good cause. Historical criticism must be dispassionate. Let us not record a fact without understanding its place and meaning in the series. Historical research must develop theories; and theories must be based on fact; it is only a genius, like Mommsen who can mould his facts to suit his theories; and it is fatal to commence a study under the conviction that one is a genius.

Such should be the spirit of research; the enquirer must not be petty; he may be of good family, which he thinks should find a place in history; he may know others of even better stock; he cannot overlook their claims. But he must develop a sense of historical proportion; his mind must be national, not parochial. The family traditions may interest his friends; they may not interest the nation, much less the world. History must not be sacrificed at the altar of family pride. Perform the sacrifice, and the result will be a partial, biassed narrative of facts, which are exaggerated out of all proportion to their importance. Biography, especially autobiography, is a science, differing from the study of history; the historian would not buy (much as he might enjoy the selling of) the autobiographer at the latter's price. In the study of history one must be sure of one's facts and the theories founded thereon; the characters will fit into such a ground-work without

difficulty. Bengali history, so far as it has been written, has hitherto been an idolisation of the individual; in one case it has rightly been called Romance; in the majority of cases it has debased the meaning of Itihas ইতিহাস। The object of history is to describe the conditions of life, the character of the nation, its changes from time to time. Is there any one who could fulfil this task for Dacca from 1000 to 500 years ago? What are Ekdala, Rampal, Bakla, Bengalla, Kotwalipara or even Sonargaon except romantic names? Who are Bikramaditya. Adisur or Bollal Sen but heroes of romance? Their history still remains to be written.

The *Subject Matter* is a different question, not the subject matter of history; every nation, every country has a past; every past has a history. But is there any subject matter for the study of history in the light of the modern scientific methods? Let us confine ourselves to the old "Province of Dacca;" so-called histories and romances have been published with long list of "the more important authorities," upwards of 25 in number; these authorities still await the purge of historical criticism. Their numbers may be added to; there is a rumour of early Chinese travellers whose records have been handed down; the Sanskrit poet Kalidasa can supply material of geographical and historical interest. Over the last century and a half, there are Government records, still undigested. The records of the Ghataks, old property deeds and grants are all of value.

From literary authorities to oral tradition is but a short step. I have heard traditions, clearly much older than the Mahommedan invasion, which placed the coast of the Bay of Bengal within the district of Dacca; the tradition is of value, for it is supported by geographical evidence. Tradition points out the route taken by Moghul armies as they plundered their way to Dacca; it can be verified by present local conditions, even apart from the remnants of an ancient road. There are few countries in the world so rich in valuable tradition as the surroundings of Dacca: there is probably no country where such value has been turned to so little account. The story of the Kachkikata Darja between Dhaleshwari and the Padma Rivers is, in its present form, a childish fiction; it is none the less capable of a very simple and rational explanation. Islam Khan again violated a Hindu maiden the story has been handed down by Hindus and is accordingly probably true; its truth is indignantly denied by the aggrieved family; it wounds their dignity but that is not the method of applying tradition to historical research. The tradition of Bengalla has been allowed to die; the place is lost; and interests have become purely local. The tradition of Dacca forms a vast and valuable mine; to work it with the implements of historical research will require much care.

In a country where geographical changes are so frequent, it is not unnatural to suppose that a study of geography will afford facts of the utmost historical importance. One can identify the Madhupur jungle with the Barind or Varendra of Sanskrit geography. A study of geography may show us, how the *bil* area of Faridpur was once habitable, as it undoubtedly was. Changes in the courses of big rivers, if traceable, may explain many an historical fact, and changes in the methods of life of early peoples. There is literary authority for the condition of the delta some 1,500 years ago, which would postulate habits of life, different from what the present conditions demand.

It is unnecessary to discuss the value of numismatic, archæological, and epigraphic evidence; the history of ancient Egypt is a sufficient example. Coins have been found in our area; inscriptions are not unknown; four of great age, each one of them proved to be genuine, have been found in the Faridpur district. Old inscribed stones are frequently met with, most of them still undeciphered. The past has left its remains; Dhamray, Ekdala, Rampal, Sonargaon, Kotwalipara, Idrakpur and Sribari, are the first that one calls to mind. The list is sufficient to show that material does exist, which awaits the attack of the archæologist. A large mound of earth near Rajabari, the victim of a fatuous tradition, would not in many countries have escaped the attack of the spade for so long a period. Is it, one is led to think, the fetish of tradition, unreal but romantic, which the people fear to destroy?

The above sketch is sufficient to show that the material for the study of Bengali history does exist. Is it necessary to add that hitherto the materials have been neglected; that they have been misapplied or allowed to be at the side of the road to historical truth, while the wayfarer, for he has been little more, has passed on, little thinking how necessary they were, to enable him to reach his goal? The Bengali student of history has not to struggle with the difficulties that confronted the ancient Greeks. They were inventing a new science; the Bengali has merely to adopt that science as developed in modern days, and to apply it to the wealth of story and tradition, which has been handed down to him. The solution necessary for the crystallization of our Athene is no wonderful elixir beyond the reach of aspiration. Modern Europe has prefected it; it only remains for our Prometheus to arise, and apply it to our yet-unformed Athene; even Metis will then feel well digested; and at Prometheus' stroke, Athene will leap forth from the head of Zeus. The prophetic possibility of our allegory will be transformed to present fact.

F. D. ASCOLI.

THE DELIVERANCE.

(TRANSLATED FROM THE BENGALI OF RABINDRANATH TAGORE.)

Gouri, brought up in affluence and luxury, was the beautiful daughter of an ancient and wealthy family. It was only recently that her husband Paresh, had, by dint of conscientious and hard labour, succeeded in somewhat elevating his pecuniary condition from a state of indigent poverty to one of comparative ease and competence. Her parents, solicitous of their daughter's well-being, did not think it worth while to send her to her husband's house as long as he was unable to earn his living. She had already reached the years of adolescence when at last she came to grace her husband's home.

Probably for these reasons Paresh had secret misgivings as to whether his youthful wife would prove wholly dutiful and obedient to him, and perchance a suspicious temperament was one of his native shortcomings.

Paresh practised as a pleader in a small out-of-the-way up-country town. He had few or no relatives of his own and so his heart often grew strangely anxious for his lonely wife at home. Now and then he would come back from the court at unexpected and unusual hours. At first Gouri could scarcely divine the cause of her husband's sudden returns.

Days rolled on. The humour that had come to possess Paresh gradually strengthened, until it completely overmastered him. He changed his servants one after another without any ostensible reason; nor would he retain the services of any one for long. Often it did so happen that Paresh would turn out of the house any servant for whom Gouri showed any special preference and the retention of whose services she, on the score of household difficulties, had urged on her husband with any degree of insistence. The more the high-souled wife felt aggrieved the more the jealous husband became obstinate and at times irresponsible in his conduct.

At last goaded to desperation and past all self-control, when once Paresh called the servant-maid to him in secret and questioned her closely on many points which had excited his suspicion, the incident quickly reached Gouri's ears. Like a trodden snake, like a wounded lioness, the sensitive, habitually taciturn woman's heart began to burn with indignation, and this black shadow of doubt descended on them like the scimitar of universal destruction, estranging the one from the other for ever.

When Paresh had once so far forgotten his sense of self-respect and decency as to hint the sad and bitter suspicion to his wife, he let not a day pass without some unpleasant bickerings with her on the slightest provocation.

Her frank, ingenuous nature rebelled against a constant pitiless surveillance in her own home, and the more she resented it with silent scorn and angry

looks, the keener grew his jealous apprehensions.

Thus bereft of conjugal felicity and without a child to be the solace of her solitude, the unfortunate girl dovoted herself to religious austerities. She besought the help of the Bhahmachari Paramananda, the young preacher of the Hari Shabha; became initiated into the sacred mysteries of his religion, and sat rapt and totally oblivious of her surroundings, listening to his interpretations of the Bhagabat. All the baffled love and affections of the woman's heart crystallized into an abiding feeling of piety and reverence which centred round the sacred feet of her spiritual preceptor.

The aroma of Paramananda's saintliness had spread far and wide. None questioned it: every one adored him. Paresh dared not openly express any doubt as to the Brahmachari's morals, but his own latent misgivings gradually ate into the very core of his inmost soul.

One day in an unguarded moment and on a very trivial cause, the poison welled out. Paresh thoughtlessly cast aspersions against the character of Paramananda in the presence of his wife, called him an abandoned hypocrite, and asked if she could swear on the *Salgram* (the Holy Stone) whether or not she inwardly loved this artful impostor.

Like a serpent trampled underfoot, she flared up in a moment and hiding her real sentiments under a false note of defiance and challenge, showering sharp and piercing words of scorn on her husband, said in a voice well-nigh choked with emotion—"yes, I do love him, do your worst!"—Paresh immediately locked her up in the room and went his way to the court.

Under the stress of bitter and ungovernable anger Gouri managed to force open the door with a mighty effort and rushed out of the house forthwith.

Paramananda was reading the holy sastras in the quiet seclusion of her room in the still hours of the noon. In the midst of her Guru's studious meditations Gouri burst in on him like the flash of lightning from a cloudless sky!

Taken aback the Guru asked, "How now, what's it?"

The disciple rejoined, "Sire, deliver me from this disgraceful life, I will dedicate myself wholly to the service of religion under your guidance."

Paramananda reprimanded her sharply and sent her back home. But, alas, O Gurudeva! could the thread of your devotional studies, thus suddenly torn asunder, ever come together again?

Returning home Poresh found the doors open and inquired, "Who came here?" "None, I went to Gurudeva,"—replied Gauri.

A moment Paresh grew pale but immediately reddened with anger, and said "Why did you go?"

Gouri retorted, "If pleased me, what of that?"

From that day forth Poresh used to lock her up in the room and keep strong guards at the door and commenced harassing her in such a way that the voice of scandal spread through the town in no time.

When rumours of these vile insults and atrocities reached him, all thoughts of the divinity fled from Paramananda's mind. He thought it expedient to quit the town without delay. But he could in no wise reconcile himself to the idea of leaving the persecuted to her fate. Heaven alone knew how racked and tortured was the Sanyasi's mind those long days and nights.

At length a letter came to Gouri while she was yet in a state of captivity. It ran as follows:—"Dear one, after deep reflection I find that many chaste female devotees have ere this renounced the world out of their exuberance of love for Sri Krishna. If your mind is alienated from the lotus feet of God owing to mundane distress, I will, if you so wish and care to inform me, endeavour, by the help of the deity, to redeem his devoted one and consecrate her to the safety and protection of his sacred feet. If you assent you will find me waiting by the side of your pond on the 26th of Falgoon, Wednesday, at 2 P. M."

Gouri tied the letter in her hair and consigned it to the secrecy of her *chignon*. When she was about to untie her braided locks at bathing time on the fated afternoon, she fonnd the letter missing. It flashed through her mind that the letter might have fallen off from her ringlets on the bed and come to the possession of her husband. Realising that the perusal of it would inflame him with indignant jealousy, she felt a secret delight not unmixed with wrath; but she could not bear the thought that the letter she cherished as a valuable treasure, should have been desecrated by the foul touch of an ungenerous, unsympathetic man. She entered into her husband's room.

Entering she found her husband lying prone upon the ground, foaming and writhing in agony, with the eyes fixed in a vacant stare. She snatched away the letter from the firm grip of his right hand and hurriedly sent for the doctor. The doctor came and said the disease was apoplexy,—By the time the doctor came, it was all over with the patient.

On the day he died, Paresh had an urgent call from the mofussil. The Sanyasi was so fallen that he was emboldened by the news of Paresh's death to seek an interview with Gouri.

The newly widowed Gouri hung her head in shame struck as though by a thunder-bolt, when she descried though the window her Guru standing at the appointed place by the water-side. Fallen, fallen, fallen from his high state!! The very thought of her Guru's downfall, did, at it were, in a moment dart through her mind like a flash of lightning.

The Guru called, "Gouri!"
She answered, "Yes, sire."

When the friends and neighbours assembled for the cremation of Paresh's earthly remains, lo! there lay the beautiful wife beside her dear husband, —dead in the hope of a blessed re-union after all earthly sorrows and tribulations! Blessed are those that love—and blessed were those who saw such a magnificent picture of self-immolation, unprecedented in the annals of modern times!

KESHAB CHANDRA BANERJEE.

ENGLISH EDUCATION AND ITS GREAT INFLUENCE.

BEING THE REMINISCENCES OF A SEPTUAGENARIAN.

(I)

The forces that have been at work in India ever since she came into contact with England have been firstly, that of British commerce, secondly that of British arms, thirdly that of British administration, and lastly that of English education. The last but not least is the subject upon which I would dwell at some length. I need hardly mention that my remarks will be confined to the introduction and spread of English education in East Bengal on which its light began to dawn in the thirties of the last century, and it was towards the end of the forties that its great influence began to be felt by the gentry among the people through the well-known senior scholars of the time like Babus Ram Sanker Sen, the two Bhagavan Chandra Basus, Shakespeare Govinda (so christened by Mr. Lewes, the then Principal of the Dacca College) and Uma Charan Das. Prominent among others of less note were Babus Abhoy Kumar Datta, Ram Kumar Basu, Abhoy Kumar Das and Braja Sundar Mittra. The first three shone at first as teachers and were appointed Deputy Magistrates in recognition of their meritorious services in the education department. It must be noted here that the English education imparted in those days was chiefly literary. Consequently proficiency in Literature was preferred to that in Mathematics (study of Science being then out of court); so much so that while the proficient in Literature would boastfully say "I have no taste for Mathematics," the proficient in Mathematics would humbly confess "I am deficient in Literature." But it must be said to the credit of the latter class that from a moral point of view they were better off than the former; for, among the literary men of the time there were not a few who fell victims to the so-called fashionable vice in imitation of English manners and customs, then popularly recognised as such. Verily, a bottle of brandy was then regarded as an accompaniment of

Shakespeare. Notwithstanding that, English education wrought a marvellous change for the better in regard to the formation of the character of those who received it, inasmuch as regard for truthfulness, honesty and courage of convictions proved to be the characteristic feature of the educated few who were thereby able to attain the respectful regard of not only the younger generation and the public, but likewise of the orthodox elders and superiors.

The great drawback in those days was blind admiration for what was foreign or rather English and consequent hatred of what was native. In consequence of such a wrong impression the study of the mother-tongue and with it the learned Pundits of old-fashioned ideas were looked upon as worse than useless. The sad result of such a state of things may be better imagined than described. Properly speaking the light of education was then confined to few, and those who sought it generally did so with no higher ambition than that of becoming school-masters and *keranis* or clerks. They rested satisfied with Reading, Writing and Arithmetic in the literal sense of the terms. The reason of this was that the main object of giving and receiving English education was then to make and become fit for Government service. It was during this period that the motto of the life of the English-knowing people generally was "Think wrongly if you please, but think for yourself." Hence it was that that there prevailed 'free thinking' in in matters religious and social (especially in eating and drinking), among the educated few of the time. Consequently old religious ideas and caste prejudices lost all hold upon their minds. Thus it was that the nucleus of the educated community or for the matter of that, of the now called middle-class was formed. And as from the very beginning religious neutrality was strictly observed by Government in its schools and colleges, English education proved to be secular; and rationalism, if not agnosticism and scepticism, began to obsess the minds of those who received the light of education and unhinge the proverbially conservative Hindu society. It may safely be said that the false doctrine of "Eat, drink and be merry" fascinated the educated minds, especially those to whom "a little learning proved to be a dangerous thing" indeed. And among those few who drank deep, not of "the Piœrian spring" but of Hume and Bentham, materialism began to spread its baneful influence. It must, however, be said to the credit of some of the above-mentioned educated gentlemen that they became pioneers of not only of intellectual and social but likewise of moral and religious advancement of their mother-country. It was the late Braja Sunder Mitra in Dacca, Ram Sankar Sen in Chittagong, Bhagaban Chandra Basu in Mymensing, and last but not least Amrita Lal Gupta in Comilla, who proved themselves instru-

mental in establishing Brahmo Samajes for the worship of one Supreme Spirit God in those towns.

There was a great evolution of education in this part of the country in the latter end of the fifties by the establishment of Normal Schools in towns for the training of teachers and Anglo-Vernacular and Vernacular Schools in Subdivisional towns and villages, in which Junior Scholars of the Dacca College and Pundits from the Normal Schools imparted English and Vernacular education to the children of the soil contributing, as they thereby did, to the spread of education among the people. The introduction of Minor and Vernacular scholarships at this juncture paved the way of many a poor schoolboy receiving higher education, as it enabled them first to prepare themselves for the Entrance Examination in Zilla schools and then to enter the College after the establishment of Universities in India. It need hardly be mentioned that the introduction of the University system of education (though to all intents and purposes the University was then merely an examining body) brought about a great change for the better in the education of the youth, broadening as it did its very basis. It thus converted the mere literary education of old into the education of the whole man, so far as his mental faculties and moral susceptibilities were concerned. But it must, however, be noted here that the University system was in the beginning jeered at by the old Senior scholars as a means to the end of making a student "Jack of all trades but master of none." What brought about a marvellous change in the moral tone of the University education was the fact of the well-known educationist Drinkwater Bethune being placed in charge of it, at whose instance well-chosen English books and well-written Vernacular books were included in the curriculum of studies in schools and Colleges alike.

The rising generation of the period began to think and feel and express their thoughts and sentiments in words and deeds, really as the brighter future hopes of their mother-country. Among these, many an illustrious name may be mentioned, but before mentioning the names of light and leading among them, it is worth while to dilate in brief upon the fact that but for the religious neutrality adhered to in imparting education in Government Schools and Colleges, the changes referred to above could not have been brought about; for the better class of educationists of this period were thereby enabled to steer clear of scepticism on the one hand and sectarianism on the other, in freely inculcating sound ideas and infusing right sentiments into the aspiring minds of their pupils as they thought best. Thus it was that there arose a galaxy of right-thinking men among the educated classes of this period.

THE CURZON HALL, DACCA.

We read in Fairy Tales
That magic wands
Conjured up golden halls,
Within a belt of hills
With summits high
And silver founts and falls,
Beneath the Tree of Life
With Leaves of age
And tantalizing fruits,
With heaps of emeralds
And rubies rare,
To guard its tangled roots ;
But eye hath never seen
What fiction weaves
In fancy's magic loom,
Nor ear hath ever heard
The music sweet
That lifts the mystic gloom.
Yet what the hand of man
Can build with bricks,
In this inventive age,
Will, like a fairy scene
On Romna's plain,
Burst on our wond'ring gaze.
Where once the owl did hoot,
The jackal yell,
In thickets dwarf and tall,
There stands to-day, in state,
A sentinel—
The splendid Curzon Hall.
Whose portal shuts from view
A gorgeous room,
So beautiful and grand :
A marvel of the age—
A memorial
In India's ancient land.
'Twill bear from age to age,
In Hindostan,
The e'er illustrious name
Of one whose glorious deeds
Have won for him
An everlasting fame.

B. AHMED.

UNDERGRADUATE LIFE AT OXFORD.

Oxford, "the sweet city with the dreaming spires" though not one of the most ancient of English cities, shows more clearly than the rest, the impress of many ages. The convenient site among the interlacing waters of the Isis and Cherwell, has commended itself to men of one generation after another. Each age has used it for its purposes—for war, for trade, for learning, for religion ; and war, trade, learning and religion have left their distinctive marks on Oxford. None of its occupants were anxious to deface or destroy the work of its predecessors. Old things were turned to new uses or altered to suit new tastes ; but they were not overthrown or carted away. Thus the life of England for some eight centuries may be traced in the buildings of

Oxford. But this paper does not profess to sketch the history of Oxford. It is merely a record of the impressions made by this or that aspect of the University; a hundred pictures have been drawn of undergraduate life and probably a hundred caricatures. An author generally introduces some Oxford scenes when he writes his first romance after taking his degree. He writes about his own experiences and his own memories. Probably he becomes his own hero and idealises himself and his friends. But his characters are too learned, too extravagant, too prodigious, like the kings of Egypt, overshadowing the crowd of Dons, cricket-field or riverside cads. The mildest of men pose as heroes of the Guy Livingstone type who "screw up" timid Dons and read all night with wet towels round their fevered brows. The sketches, however, are not true. Moreover there are many varieties of undergraduates who have various ways of occupying and amusing themselves. A steady man who reads six hours a day and takes his pastime on the river, finds that his path rarely crosses that of him who belongs to the Bullingdon Club, hunts thrice a week and hardly dines in hall. Then the pale student who is hard at work in the Bodleian all day and who has only two friends with whom he walks and takes tea—he sees existence in a different aspect. The Union politician, who is dividing the house on questions of blotting-paper and intriguing for the place of librarian—to him Oxford is a soil prepared carefully for the growth of that fine flower, the Union. These are the causes which increase the difficulty of describing the undergraduate life with truth.

The subject may possibly be best approached by considering the intellectual influence brought to bear upon undergraduates and the way in which they work. In the first place some thing must be said about the Tutors, a delicate subject—because in dealing with so eminent a body criticism requires courage while praise is superfluous. Every undergraduate, besides having to attend a certain number of lectures has a special Tutor to whom he takes work. Happy those who are under a first-rate man! In his earlier days at Oxford, a man may have a shy school-boy feeling towards his tutor but in his last year this barrier melts away and the relations between teacher and pupil become quite unrestrained. Thus the undergraduate finds himself admitted to terms of friendship and even familiarity. The half-hours which are spent cheerfully are looked forward to as a pleasure, not as a toil. Many an Oxford man will treasure up these things as among his precious memories. In his tutor, he finds a true friend, whose advice will be of use to him all his life. Lectures are the most important feature of intellectual Oxford which demands our attention. Thirty years ago, a combination system of lectures was started; several colleges

arranged that all the lectures at each one of them were open to members of all those Colleges. This has now expanded into a vast system of inter-collegiate lectures, which practically throws open almost all lectures to all undergraduates irrespective of the particular college to which he belongs. These are known as "private lectures." The term "Public lecture" is reserved for such among the Professor's lectures as are of popular character and delivered to a mixed audience. Many of the public lectures draw large audiences owing partly to the popular character of the subject and partly to the fame of some of the lecturers. Such are the lectures of the professors of Poetry and of Fine Art. They are very important in as much as undergraduates enjoy the privilege of being instructed by some of the greatest minds of the age. Thus many generations of Oxford men have listened to Ruskin and the present generation has heard Herkomer and Bradley. The lectures on Poetry and Art are sometimes delivered in the Sheldonian theatre with plenty of room for a large audience. Mr. Bradley's lectures on Shakespeare have been delivered to such audiences—alike of graduates and of undergraduates,-as have never been gathered by any Professor of Poetry since Matthew Arnold. Among the professors the most conspicuous figure of late years has been Professor Freeman whose loss left a sad gap in Oxford life. The energy of his views aroused both interest and amusement.

No account of the intellectual life would be complete without any reference to the examinations, the keystone of the Oxford educational system. All that can be attempted here is to touch upon a few salient features of the various examinations with a view to bring out the intellectual influence they exert on the men who read for them. The first examination is called Responsion or "Smalls," an ordeal which all undergraduates alike have to pass. It is a narrow gate through which all Oxonians must pass and where Greek is unrelentingly demanded as part of the toll. The "pass" schools which may be taken next in order, opens up the question whether Oxford does her best for "pass" men. It is quite evident that a pass degree, if honestly worked for will involve a considerable amount of instructive work. Thus most "pass" men read along with many other subjects, the Apology of Plato, and half of the Ethics of Aristotle; they study the Campaigns of Cæsar, and are introduced to the problems of Inductive Logic and Political Economy. Of honour-men in Oxford there are two kinds, those who take one honour school only and those who take two. The former are generally specialists though Oxford is quite alive to the possible dangers of over-specialisation. The second kind are the truest sons of Oxford. The usual course is to select the Classical school in Mo-

deration and Literae Humaniores in Finals. The school of Literae Humaniores is by far the most successful examination in Oxford, happily blending the subjects of Classics, Philosophy and Ancient History. Even the highest class of students, who look beyond University examinations must surely derive benefit from reading for this school. It is sometimes objected to Oxford that her degrees are won too easily and the range of subjects is less wide than in corresponding Universities *e. g.* London University. To this the answer is that residence in Oxford is in itself an important part of education. Intellectually speaking, the air of Oxford is wholesome and bracing. Though some of the phenomena are peculiar and perhaps repellent, yet the whole tone of thought leads to broadness of view. All opinions are subjected to the test of reason and all who hold certain opinions will justify them by reasons and will never shelter themselves under the plea of authority. Another feature is the unpractical character of much of Oxford thought. Based as it is, on pure reason it neglects the practical side of the question. This is specially remarkable in practical thought. Again, the critical tone of Oxford is a thoroughly characteristic feature and one admitting of much amusing illustration. One of its effects is a curious reserve in expressing opinions. Thus there is free criticism blent with this spirit of reserve. The ways in which these influences work have often been described. The process is usually that of every newly—awakened mind and is found in the history of every nation. To the age of faith when opinions are accepted on authority follows an age of inquiry and doubt. Then finally the doubts disappear and an age of reason follows. Oxfordmen generally go through this process during the period of their residence. The freshman who was in school a few days ago took his opinion on authority. Arrived at Oxford he is bewildered to find free discussion everywhere; the belief which he regarded as sacred, is only a matter of argument. He is worsted when he tries to maintain his own opinion. Thus he is compelled to reason for himself. Some few, intoxicated by new ideas, abandon their own convictions and join whatever school of thinkers they are most attracted to. The usual case, however is that the intellect is awakened; a period of doubt and enquiry follows and the mind congratulates itself on its newly-found powers. Many will look back to that period and feel

"That time is past
And all its aching joys are now no more
And all its dizzy raptures."

It now only remains to trace the influence of philosophy, politics, literature and the drama. There is no special examination in Philosophy. It it only a part of the Literae Humaniores school. The method of teaching has

this characteristic. The student is taken first to the ancient philosophy. He is to appreciate Plato and Aristotle and thence he is led down the stream of history to modern times. It is the singular characteristic of Oxford that she draws no line between the ancient and modern thought but encourages the study of both side by side. Led by the bent of their minds and the guiding hands of their tutors they fall into one or other of the two great schools of philosophy. At the present time no system is supreme in the schools at Oxford ; the new philosophy, pragmatism, has many ardent followers. The philosophy of Professor Green exercised potent intellectual influence in Oxford during the last thirty years.

Another marked feature of Oxford is the growth of societies of all sorts The following list is copied from a number of the Oxford Magazine: Oxford Union Society, O. U. Musical Club, O. U. Musical society, Newman society, Ruskin society, Junior scientific club, St. Hilary Essay Society. Society of Historical Theology, Guild of St. Matthew, O. U. Chess Club.

S. K. Sen.

KALI PRASANNA VIDYASAGAR.*

Today we are here to do honour to the memory of one who lived and moved amongst us till this day last year. He was one of us, and I find it difficult to realize that the late Kaliprasanna Vidyasagar is no longer with us. He was so fond of meetings and of addressing them, that I often fancy he would suddenly get up from amongst the audience and forthwith begin to address the meeting. It was only the other day that we met in this very Hall to express our indignation at the foul murder committed within the precincts of the Calcutta High Court. Rai Bahadur Kali Prasanna was in the chair. I remember only too well how affectionately he asked me to address the meeting in Bengalee and how after the meeting, he congratulated me and requested me to try to improve the Bengalee literature by contributing to the different Bengalee magazines. It was only the other day while we were organising the now defunct Dacca Social Club at the Johnson Hall, that the old Kali Prasanna with the vigour and enthusiasm of a young man encouraged us. His last appearance in public was on the melancholy occasion of the death of His Majesty the late King-Emperor when we met in thousands at the Sadar

* Substance of a speech by Mr. R. K. Doss, Bar-at-Law delivered at the Northbrook Hall, Dacca, on Saturday the 29th July 1911.

Ghat to express our heartfelt grief at the sudden loss of a beloved Sovereign. Kali Prasanna in spite of his failing health took an active part in the solemn proceedings of that day.

Today we specially remember him as a great literary man of Eastern Bengal. We specially remember today his splendid services to the Bengalee literature. Owing to his thoughtful writings he was known as the Carlyle of Bengal. In his younger days he used to edit a magazine called the "**Bandhab**." And those who have studied the history of Bengalee literature will readily admit that Bankim Chandra Chatterjee's "**Banga Darshan**" and Kali Prasanna Ghosh's "**Bandhab**" contributed very largely in moulding the Bengalee language, and with it Bengalee thoughts. His প্রভাত চিন্তা (Morning thoughts) and his নিশীথ চিন্তা (Thoughts by Night) and a number of other well-written thoughtful books earned for him a reputation as one of the foremost Bengali writers of the day.

Kali Prasanna Vidyasagar was also a gifted speaker, a rather rare virtue in a good writer. As a Bengali speaker he he was second to none in this province. But he could speak with remarkable ability and force in English also.

He was pre-eminently a self-made man. He had very little University education to start with, yet towards the end of his life he rightly enjoyed a high reputation as a great scholar. The Government in recognition of his high scholarship decorated him with a C.I.E. and the Pandits of Bengal honoured him with the title of Vidyasagar.

Kali Prasanna was a great believer in Spiritualism. He has written a highly interesting book "ছায়া দর্শন" in which he has discussed at great length the great problem of after-existence. In that book he has quoted many concrete instances how the dead communicated with the living. I must candidly confess that I do not comprehend all that the spiritualists preach. But if what they say is correct then I have no doubt that Kali Prasanna's Soul is today witnessing the solemn proceedings, and if the soul still retains human sentiments I am sure he is rejoicing to find that his lifelong services to literature are being appreciated not only by his own countrymen but also by his European friends.

I do not want to mince matters. I know there are many in this city who would perhaps question the propriety of holding such a meeting. But on an occasion like this we have to look only at the bright side of the deceased. Who among us is free from faults? I must say that his whole-hearted devotion to literature, his life-long honest endeavours to uplift national character through a nation's own language, will for ever serve as a stimulating example to the rising generation.

I do not want you to detain you any longer. I would only ask you to read

his works, and I can assure you that you will find it profitable to read them.

THE UNIVERSITY OF NALANDA.

The Curriculum of Nalanda and its most distinguished Alumni.

The earliest Buddhist treatise on Medicine as well as references to the practice of the healing art is to be found in the *Mahavagga* which "must have been in existence within thirty years earlier or later of at least 360 or 370 B.C. (1)" The sixth chapter (Khandaka) of the *Mahavagga* is wholly on medicaments. From this early era, the science of medicine continued to be cultivated and developed by the Buddhists and the court of every Buddhist king had its court-physician. Jivaka, the renowned alumnus of the Taxila University, was attached to the court of Bimibisara in the life-time of Buddha. A physician named Charaka was attached to the court of Kaniksa and was his spiritual guide.(2) A young doctor named Rasayana of the Punarvasu race was the court-physician of Harshavardhana Siladitya. 'He had mastered Ayurveda in all its eight divisicns and being naturally of an acute intellect was pecfectly familiar with the diagnosis of diseases." (1) A physician named Narayana attached to King Nayapala successor of Mahipala, who ascended the throne of Bengal about 1040 A.D. This physician was the father of Chakrapani Datta, a learned commentator of Charaka and Susruta and author of a great medical work which bears his name.(2) The list of eminent Buddhist doctors may indeed be swelled to any length. But what is more important is that the whole science of Indian medicine has been stamped indelibly with the hall-mark of Buddhism.

No one knowing anything of Indian medicine need be told that the science of medicine in India provided two kinds of treatment, *viz.*, by herbs, salts, &c., and by chemical preparations. The development of the latter mode of treatment was almost entirely in the hands of Buddhist monks of the Tantric period of Buddhism. But the old Ayurvedic treatment also received a Buddhistic handling. The name of Nagarjuna, the great patriarch whom a set of legends connects with

(1) Rhys Davids and Oldenburg's Preface to the Vinaya Texts in the S.O.E. Series.

(2) *See* Journal Asiatique, 1896, T. viii, pp. 447-51. This Charaka, mentioned somewhere in the Chinese Tripitaka, has been sought to be identified with the reputed Father of Hindu Medicine by M. Sylvain Levi.

(1) Cowell and Thomas's Translation of *Harsha Charita*, pp. 143-144.

(2) We learn this from a colophon in his work, quoted in Dr. P. C. Roy's 'History,' vol. I, p. lv. and footnote.

the University of Nalanda, is prominent in connection with this revisionary activity. As Dalhanacharya, the commentator, has freely admitted, the recension of *Susruta* that has come down to us, is the work of Nagarjuna. This surgical treatise which must have been in existence before 400 to 500 A.D. (as the researches of Dr. Hœrnle have proved) was edited, systematised into parts (স্থান) and enlarged by him and an *uttaratantra* or supplement—a most important section of the whole work—was added. This *uttaratantra* provided most of the materials for Madhavakara's *Nidana* which was among other Indian medical works rendered into Arabic under the Caliphate of Bagdad. A host of other Buddhist writers on medicine (Ayurvedic) flourished in India of whom the most eminent are—Vagbhata, the author of *Ashtanga-hridaya*, (who is probably referred to by I-Tsiang as the epitomist of eight books on medicine); Vrinda, the author of *Siddhayoga* (which is modelled closely on the order and pathology of Madhavakar's Nidana), Chakrapani Datta (a learned commentator of Charaka and Susruta and a follower of Vrinda), and others.

But side by side with this Ayurvedic system was growing up the peculiar kind of religio-medical system embodied in the Hindu and Buddhistic *tantras*. We have some evidence that the University of Nalanda latterly became a stronghold of this Tantrism. This system which was iatro-chemical and consisted chiefly in mercurial preparations came afterwards to predominate the old Ayurvedic treatment by herbs and simples. It is difficult to characterise this system of medicine which consisted on its religious side in a belief in incantations and demonology and on its medical side in a mystical worship of iatro-chemistry with mercury as its basis. The Atharvaveda is generally believed to be the original of this mysterious system and the discovery of some palm-leaf Mss. in a monastery of Japan which were taken there from Central India and also of another Mss. Tantra named Kubjika tantra in the Durbar Library of Nepal (written in Gupta characters and copied about sixth century, A.D.)(1) leaves no doubt that *Tantras* in their origin must go back to at least the fourth or fifth century, A.D. These *Tantras* were Buddhistical as well as Brahmanical, but afterwards a fusion took place between the two and gave rise to such hybrid *Tantras* as *Mahakalatantra*, *Rasaratnakara* and *Rasarnava*.(2) It is not relevant to our subject to sketch the development of Buddhist tantrism, which was, as Kern says rightly, "a popularised and at the same time degraded form of Yoga"

(1) See P. C. Roy's 'History,' vol II., pp. XXXV, foot-note and also preface to Bendell and H. P. Sastri's catalogue of manuscripts belonging to the Durbar Library of Nepal.

(2) See P. C. Roy's "History" vol. I., P. LXXXviii.

(originated by Patanjali and adopted into Buddhist philosophy by Asamga, the founder of the Jogachara School), and to tread over again the ground so thoroughly explored by Wassilief.(1) But that Tantric Buddhism was very much cultivated at the time of Hiouen Thsang (who took away from India and presented to the Chinese emperor 657 books of palmyra leaves and birch-bark mostly Tantric in their character (2) and carefully studied, as a Thibetan historian of China says,(3) the Jogachara philosophy with Danta Bhadra at Nalanda) and reached most extravagant excesses in the regime of the Palas in Bengal is is a well-attested fact. "There are indeed," says Dr. P. C. Roy, "a great many names, scattered throughout the mass of chemical and medical literature, some of which have been handed down to posterity, sometimes because of the important processes which they invented and sometimes again because of the metallic preparations which they introduced. * * * * * * Most of these were Buddhist monks." Among these the most famous was the name of Nagarjuna, a great alchemist and doctor, who is always cited as a legendary authority in such Buddhist chemical works as *Rasendrachudamani*, *Rashaprakasha-sudhakara*, *Rasaraja-lakshmi*, *Rasaratnasamuchchaya*, &c. (3)

Now, in the history of Indian medical development, Magadha held a prominent place. The weights and measures to be used by the physician are expressly enjoined to be either those employed in Magadha or those current in Kalinga: whence we may fairly presume that it was in these eastern provinces * * that medicine received its special cultivation." (4) Nalanda was from its foundation, about the middle of the fifth century, to its final disappearance in the ninth century the intellectual centre of Magadha, and for the matter of that, of India. It is, therefore, most probable that Nalanda made some not inconsiderable contribution to the science of medicine, although its extent cannot be precisely determined at the present stage of our knowledge. Of the later Tantric development of Buddhism, Nalanda became a great stronghold in the seventh and eighth centuries. It appears that the Yogachara system was much in vogue in the university of Nalanda where as we have already said Hiouen Thsang studied this system under Danta Deva. Tantrism was carried from Nalanda to Tibet at three different times by three great *savants* of this university—Dharmakirtti, Santa-rakshita and Kamalasila. The dates of these three *savants* may be

(1) "Buddhismus."

(2) See Watters, vol. I, p. 12.

(3) See Translation of Dub-Thah Salkyi Melon by S. C. Das in J. A. S. B., vol Li, pt. 1. Danta Bhadra is no other than Silabhadra.

(3) P. C. Roy, vol II., Lv, Lvii, Lix; and Vol 1. Chapter V.

(4) See Weber's History of Sanskrit literature, 1892., P. 269.

placed about 700, 750, 786 A. D. respectively. As we shall have occasion to speak of these professors of Nalanda later on, we need not dilate on them at present. Hiouen Thsang, speaking of *Chikitsya-vidya*, includes in it the exorcising of charms as well as medicine. This refers no doubt to the Tantric system which was cultivated by Buddhist monks at Nalanda as well as elsewhere in India about Hiouen Thsang's time.

4. Internal science or philosophy and Metaphysics *(Adhyatma Vidya).* When the University of Nalanda arose, the atmosphere of all important monasteries in India was surcharged with a speculative and controversial spirit. Since the time of Kaniksa, Buddhist philosophy had been defining itself round four schools of thought and the distinction between the Mahayana and Hinayana becoming more and more pronounced into the distinction between the Realist and the Idealist Schools of philosophy. The Vaibhasika school was specially developed under the patronage of Kaniksa. In the famous council convened under his aegis, a syndicate of scholars, including Vasumitra, Dharmatrata and others composed an elaborate commentary on Katyayaniputra's *Jnana-prasthana-sastra*, called *Maha-Vibhasa-Sastra* which became the fundamental work of the Sarvastivada section of the Vaibhasakas. (1) Literature on the doctrines propounded in this work continued to grow, and a famous controversy was carried on in the fifth century between the Vaibhasika Sanghabhadra and the Mahayanist Vasubandhu. This latter Scholar had been an adherent of the Vaibhasika School and had studied it under Sanghabhadra. But in his later years he changed his views and refuted the doctrines of the Vaibhasikas in his *Abhidarma-Kosha-Sastra*. (1) His former teacher Sanghabhadra devoted twelve years to the study of this work and in refutation of Vasubandhu's views composed the Nyayanusara or *Kosha-Koraka-Satra*. Taking this work with him, he started out with some of his disciples to meet Vasubandhu at Sakala ; but Vasubandhu fled at the prospect of the controversy to Mid-India where he hoped to obtain popular support. Sanghabhadra died on the way, bnt not before he had forwarded the manuscript to his opponent who with characteristic magnanimity duly honoured it. (2) About the same time that the Vaibhasaka School arose under the patronage of Kaniksa, the Sontrantika School was founded by Kumaralabdha (3) who attempted at a

(1) *See* Watters, vol. I, pp. 273-74.

(1) This was a very famous and important work Poramartha and Hiouen Tsang twice translated it into Chinese. The work, we are told, was originally of a Vaibhasika character and was much appreciated by the Kashmirian Vaibhasikas who however asked Vasubandhu to expand his aphorisms for the sake of lucidity. In the meantime Vasubandhu had been convested to Sontrantika views, and in the prose expansions of his aphorisms, he criticised Vaibhasika doctrines which roused the ire of Sanghabhadra.—*See* Watters, vol. I, pp. 210-11.

(2) *See* Watters, vol. I, p. 325.

(3) According to Hiouen Thsang ; Watters, vol. II, p. 286.

greater purity by basing his doctrines not on the commentaries but on the Sutrantas themselves. A later teacher of Kashmira named Srilabdha much developed the ideas of this school in a work entitled *Vibhasa-Sastra.* (1) But these two schools—*Vaibhasaka* and Sontrantika—belonged to the Hinayana and were realists in their views, acknowledging the real existence of the phenomenal world, the difference between the two being only that while the former held the Direct Perception theory, the latter held the Representative view. (2) But besides these two Hinayanist Schools, the Madhyamika School, of the Mahayana was founded about the same time by the great Nagarjuna who, according to Tibetan legends, imbibed his doctrines from Sarahabhadra at Nalanda. Nagarjuna's work, the *Madhamika karika* was based on the moreancient and voluminous work, the *Prajnaporamita,* attributed to Maha-Kasyapa, the great disciple of Buddha, a redaction of which still exists in the *Prajnaporamita Hridaya.* The importance of this School in the history of Indian philosophy can hardly be overrated and its theories of নামরূপ, সংবৃত্তি, পরমার্থ, নির্ব্বাণ, etc. were bodily adopted with changed nomenclature in the Vedanta system of Hindu philosophy; the very cordinal point of Vedantism, the doctrine of মায়া, was only another name for Buddhist প্রজ্ঞা, and the fact has been noticed by Vijnana Viksu in his *Samkhya Pravachana Vashya, e. g.,* মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নবৌদ্ধমেবচ। The Madhyamika school arose, as we have said, in the aphorisms of Nagarjuna and upon it a structure of expository works was soon erected. Among these a few works are extant out of which the following may be enumerated: (1) *Madhamika-Sastra* by Pingala, (2) *Prajna-dvipa-Sastra-Vyakha* by Khayatiprabha, (3) *Madhantamagama Sastra* by Asamga (4) *Mahayana-Madhyamika-Sastra-Vyakha* by Sthiramati of Nalanda, (5) *Madhyamika-karika* by Chandrakirtti of Nalanda; of which the last commentary (divided into 27 chapters corresponding to 27 chapters of Nagarjuna's, work) is the standard one. Most of the above works are extant in Chinese.

Now these three schools all arose in the time of Kaniksa. But later on about the middle of the fifth century (1)—just about the time when the foundations of a university were laid at Nalanda—the fourth school of philosophy belonging to the Mahayana was founded by Asamga. Lama Taranath in fact makes Aasamga a *Pundita* of Nalanda, (1) and considering that he

(1) Schiefner's Taranath, p. 67, 4; Watters, vol. I, p. 355.

(2) *See* Kern's Manual of Buddhism, p. 128.

(1) Paramartha, in his life of Vasubandhu, makes him the spiritual guide of Vikramaditya of Oudh and his son. (Takakasu, J. R. A. S., 1905, p. 44) Vincent Smith identifies Vikramaditya with Skanda Cupta and his son with Baladitya (*see* 'Early History of India,' 2nd ed., p. 292). Skandagupta according to Vincent Smith, came to the throne in 455 A.D.

(1) Sciefner's Taranath—p. 122.

lived for the most part of his life at Ajodhya and breathed his last at Rajagriha, there is nothing inherently improbable in this statement. He and his brother Vasubandhu, (1) twenty-five years his junior, (who is said by his biographer Pramartha to have been the spritual guide of king Skanda Gupta and King Baladitya Narasingha of Oudh, the donor of one of the monasteries of Nalanda,) are two most illustrious names in the history of Mahayanism. Asamga was the founder of the Jogachara school of Philosophy, which however had been vaguely begun before him by the Saints Nanda, Uttarasena and Samyaka-Satya. (2) The chief works of this school are the (1) *Lankavatara*, (2) *Mahasamayasutra*, (3) *Bodhisattvacharya-nirdesa*, (4) *Dasabhumiswara*, (5) *Samadhiraja*, (6) *Gandhavyuha*, (7) *Mahasamaya*, (8) *Sapta-dasa-bhumi-sastra-yogacharya*, etc. Now these two Mahayanist Schools — the Madhyamika and the Jogachara — were both idealists, recognising no real existence of Phenomena. But there was a fundamental difference between the two which gave rise later on to vigorous covtroversies in which, as we shall presently see, the University of Nalanda also had a large part.

Now these four schools, with a larger twofold division, gathered volume, like rolling snowballs, in their onward progress and a new set of canonical writings arose almost replacing the old. Nay, the older doctrines were pronounced to be groundless and futile, and Nagarjuna refuted the Four Noble Truths, Eightfold comprehension, the theory of Nirvana, etc. in the concluding chapters of his Madhyamika aphorisms. (1) This new literature was constantly fed by expository and polemical writings and in the 6th and 7th centuries, when Buddhist scholastic philosophy reached its climax, (2) the spirit of polemics strongly permeated the quiet atmosphere of all Buddhist monasteries. The antagonism between the *Vaibhasika* and the Sontrantika Schools, however could not give rise to so much controversial heat as the two Mahayanist Schools, both of them being founded on old canonical Texts and the metaphysical element—the element the Indian mind delighted in—being very little in them. The controversy that raged in the 6th and 7th centuries, was a triangular controversy—between the Hindus and the Buddhists, between the Buddhist Mahayanists and the Buddhist Hinayanists, and between the Mahayanist Madhyamikas and the Mahayanist Vaibhasikas. The history of these controversies has yet to be written. But what concerns us here is the interesting fact that during the period of its greatest prosperity, Nalanda

(1) Asamga, Vasubandhu and Bilindibhava were three brothers, sons of Konsika and Bilinda (Walters, vol. I, p. 210).

(2) *See* Schlagintweit in Journal of the Buddhist Text Society, vol. III, p. 14, App.

(1) *See* Chapters, xxiv, xxv, xxvi and xxvii.

(2) *See* Kern's 'Manual,' p. 128.

became famous for the controversial ability of its philosophers.

One controversy between the Jogachara and Madhamika schools, connected with the University of Nalanda, was very famous, as it was waged between two of the greatest intellects of India about the middle of the 6th Century. The controversy centred round the doctrine of *Alaya vijnana* which was the fundamental point of difference between the Madhaymika and the Jagochara schools. We shall proceed to a brief explanation of this metaphysical doctrine.

The Mahayana schools generally recognised the principles of *Vidya matra* (*i.e.*, the identification of all things with mental phenomena). Now objects or rather mental phenomena were divided into two kinds—(1) knowable (*i.e.*, the so-called objective world) and (2) unknowable (*i.e.*, the so-called subjective world, consisting of " habitual delusions,' " subtile ideas,' etc.). These again lent themselves its another kind of classification, viz. mental operations depending on (1) the eye (2) the ear (3) the smell (4) the taste (5) the touch (6) the thinking (*manas*) (7) on subtile and ceaseless operations and (8) the whole in which all essences are contained. (1) This last was regarded by the Jogacharist as the *parinispanna* or Perfect Reality aud was styled the *Alaya Vijnana*, as all things were supposed to come from and to be contained in this operation (hence *Alaya* = Home, *i.e.*, Home of all phenomena). This *Alaya Vijnana* " reflects itself in everything like the Moon in clear and tranquil water." It was only through impurity of this *Vijnana* that the phenomenal existences, arose, and by self-meditation (*Yoga*) it was to be brought to its pristine purity when all the illusory existences would vanish.

This all-containing consciousness was Perfect Reality with the Jogacharist. But here the Madhyamika school bifurcated from the Jagachara. The Reality, according to the Madhyamika, was not the *Alaya Vijnana*; in fact nothing at all that can be predicated of. This idea existed in the very germs of the Madhyamika philosophy—in the *Prajna paramita*. According to the *Vajracchedika*, the Real admits of no verbal definition, but it may be only partially expressed by a course of negations (ch. xxi.). The ordinary predicates of coming and going do not apply to the Real (Ch. xxix. of *Prägna p.*) which is the Prajna paramita (*perfection*—Wassilief; *Intelligence*—Burnouf) corresponding to the Parinispanna of the Jogacharist. Nagarjuna makes his Buddha say, " What description can be given and what knowledge derived of an object which cannot be represented by the letters of the alphabet? Even this much of description that it does not admit of

(1) *See* the Outline of Mahayanism drawn up by Khuroda for the Congress of Religions at Chicago in 1893. This Outline has been accepted by the Japanese Buddhists as authentic.

representation by the letters of the alphabet, is made by means of illusory attribution." It will thus be seen that whereas the Jogacharist makes the Reality a predicable positive the Madyamika makes it an unpredicable negative.

Now Dharmapala, the head of the Nalanda University, was about the middle of the 6th Cent., one of the greatest champions of the Jogachara School in India. His exalted position and his eminent dialectical skill served to spread his name and fame all over the country. The Metaphysical views of Dharmapala were defined in the *Parinispanna-Laksana-Sastra* which became very famous. At this time another great scholar, named Bhavaviveka, (1) belonging to the Madhyamika School was residing at Sridhanya Kataka in Southern India. The resounding fame of Dharmapala reached him in his monastic retreat and he set out 'staff in hand' to meet him face to face in controversy. But Dharmapala at that time was staying in Gaya and in spite of repeated entreaties refused to be disturbed and so Bhavaviveka returned home foiled in his purpose. Hiouen Thsang, who gives this story, (1) here trails off into myth, but probably on return home Bhavaviveka betook himself to his pen to answer his opponent and wrote the famous *Mahayana-tala-ratna-s a s t r a*. In this work, in which the dialectical part of the Mahayana was greatly developed, Bhavaviveka developed the theory of the three criteria by which the Reality can be known from the Unreality, viz, (1) *Parikalpita* (supposed), (2) *Paratantra* (conditioned or concatenated) and (3) Parinispanna (perfect, the *Sumum bonum*). (2) The controversy must hare been a famous one, for the controversialists were at that time both leaders of the schools that they represented, and the traditions of it were vivid at the time of Hiouen Thsang, and the great histriographer of Tibet, Sumpa, also referred to it in his history of Indian Buddhism in 1747. (3) Bhavaviveka is mentioned also by Chandrakirtti in his commentary as well as by I—Tsiang, and some of his works, displaying vast erudition and subtle dialectical powers are preserved in the Chinese. (4) It seems that controversies on the *Alaya Vijnana* were habitually carried on in the University of Nalanda and we are told that when Chandra Gomin, a Jogacharist and follower of Asama and Chandra Kirtti, a Madhyamika and follower of Nagarjuna, entered upon discussion, people used to observe, "Alas! thh text of

(1) Watters from the Chinese aud the Tibetan versions of the name of this scholar infers that it was not Bhavaviveka, but Bhaviveka (*i.e.*, of clear understanding—*see* Watters, vol. II, p. 222.

(1) *See* Watters, vol. II, p. 215.

(2) *See* Schlagintweit in J. B. T. S., vol. III, p. 14, App.

(3) 'Pag-Sam-Jon-Zong,' ed. by S. C. Das. *See* also S. C. Das's Intro. for the life and date of the author.

(4) Watters, vol. II, p. 222.

Arya Nagarjuna is medicine to some, but poison to others, whereas the text of Arya Asamga is ambrosia to all men.' (1) thus showing their preference of the Jogacharist view. We know how out of the results of these controversies, the science of Logic emerged and was highly developed by the scholars of Nalanda.

Hiouen Thsang provides us with a list of the names of the most renowned philosophers of Nalanda up till his time and some biographical points about them can he gathered from various sources. Gunamati is probably the oldest in point of time among the philosophers mentioned by Hiouen Thsang. He was a senior contemporary of Sthiramati, the teacher of Dharmapala who was contemporary with Bhartrihari. Now as Bhartrihari flourished abont 650 A. D. we shall not be far wrong if we place Gunamati about 80 years earlier. This would be just about the time when the University of Nalanda rose into great prominence. In the *Abhidharma-Kosha-Vyakha*, he is said to have been the master of Vasumitra, presumably the scholar who flourished in Kashmira about this time. (2) Gunamati probably was the author of *Lakshananusara-Sastra*, (3) preserved in the Chinese, a work showing intimate acquaintance with Sankhya teachings. He and Sthiramati were said to have erected a monastery at Valabhi and resided there for a long time. (1) Sthiramati was a junior contemporary of Gunamati and was master of two most distinguished scholars of Nalanda—Dharmapala and Chandra Kirtti. He, Dharmapala and eight other scholars collaborated on an elaborate commentary on a work of Vasubandhu, and he was also the author of *Abhidharma-Kosha-Vashya-tika-tattva*, (2)*M a h a y a n - M a d y a m ika-Sastra-Vyakha*, " Introduction to Mahayanism," (3) etc. Dharmapala, his pupil, we have already met as the opponent of Bhavaviveka. He was one of the finest flowers of dialectical culture that Nalanda produced. The eldest son of a high official of Kanchi in Southern India and a young man of precocity, he fled from home on the very day of his marriage with a princess, yearning for a higher and nobler life. (4) He was ordained at Nalanda and there gained distinction as one of the acutest dialecticians of his time.

(*To be continued.*)

(1) See Vidyabhusau's 'Logic', P. 122, translated from 'Pag-Sam-Jon-Song'.

(2) Were there many Gunamatis who were 'Sastra-masters? Kern says that about the time when Gunamati flourished, according to Hiouen Thsang, a scholar rose in Kashmira named Vasumitra. Hiouen Thsang's Gunamati may be the master of this Vasumitra.

(3) Watters, Vol II, P. 109.

(1) I bid, p. 246. See I-Tsiang also Chs 9 and 11.

(2) *See* Watters, vol. II, p. 327. Taranath ascribes the work to Sthiramati and he is borne out by I-Tsiang (Takakasu, p. 180).

(3) *See* Watters, vol. II, p. 169. This last mentioned work is said by Watters to have been translated into Chinese about 400 A.D. (!)—a strange anachronism.

(4) Ibid, p. 226.
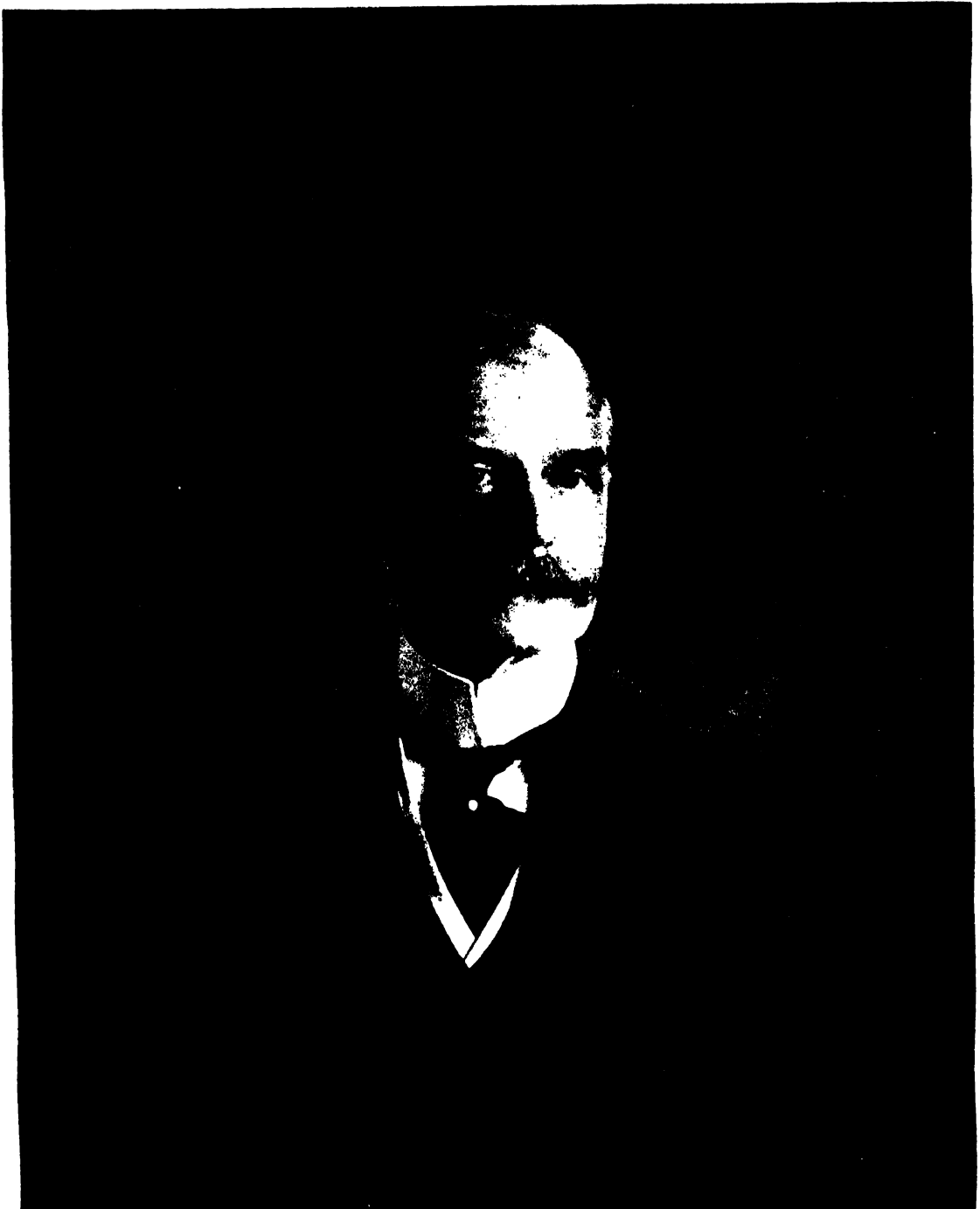
Sir Charles Stuart Bayley, K.C.S.I.

WE offer a cordial and respectful welcome to SIR CHARLES BAYLEY, K.C.S.I., our Lieutenant-Governor. Sir Charles is happily no stranger to the Province. When he came amongst us in 1908 to officiate for Sir Lancelot Hare, with a brilliant record of past services behind him, he succeeded in winning the esteem and regard of all classes of people by his accessibility, the genial suavity of his manners and his firm and tactful administration.

Not the least flattering tribute to his personal qualities was the address of welcome presented to him by those orthodox and staunchly conservative votaries of Sanscrit learning—the Pundits of the E. B. Saraswat Samaj.

The generous and effective support which he gave to the members by granting official recognition to the Samaj, at once won for him the grateful homage of the simple-hearted Pundits, and the address of welcome which he received was in the nature of a personal triumph.

A line from Sir Charles' reply to the address is well-worth quoting :—" It is a very great pleasure to meet a body of teachers and students, who remind one, that the learning, the philosophy and the quiet contemplative life for which India has been famous in the past, have not yet ceased to exist—I hope the day may never come when learning for its own sake ceases to be honoured in India."

Another incident—one particularly fitted to touch the oriental imagination —was the feeding of about 10,000 poor people in the city of Dacca by His Honour—who personally supervised the arrangements.

His visit to the Dacca College and the inspiring words he addressed to the assembled students have not yet been forgotten.

The Province has been passing through a period of storm and stress, but the clouds are fast rolling away, and there is reason to believe that a period of comparative tranquillity and calm will synchronise with the beginning of His Honour's administration. Protection of life and property of the people has ever been regarded as the primary duty of a Government and we feel sure that His Honour's Government will receive the active and willing co-operation of all thoughtful people in stamping out the class of crime which has stained the fair fame of the Province.

The New Province is as yet undeveloped but full of glorious possibilities. The progress it has made in the course of the past five years justifies us in the hope that a bright future awaits it. It has many urgent needs. The questions of Education, Sanitation—rural and urban, administrative reforms, the improvement in the pay and prospects of the officers of the various branches of the Public Service—these are only a few that will call for His Honour's immediate and sympathetic consideration.

We wish His Honour godspeed in the work before him and trust that his wise and sympathetic rule will secure to the people of this Province the enjoyment of the fruits of their labour in peace and tranquillity—will give an impetus to commerce and agriculture and enable this growing Province to work out its own destiny.

THE DACCA REVIEW.

VOL. I. SEPTEMBER, 1911. No. 6.

A PLEA FOR THE INCLUSION OF PSYCHOLOGY IN THE *CURRICULUM* OF MEDICAL STUDIES.

"Canst thou not minister to a mind diseas'd,
Pluck from the memory a rooted sorrow,
Raze out the written troubles of the brain,
And with some sweet oblivious antidote,
Cleanse the stuff'd bosom of that perilous stuff,
Which weighs upon the heart?"

MACBETH.

Psychology is no longer identified with Metaphysics, which had necessarily no place in the classification of the sciences, by M. Auguste Comte in his Positive Philosophy. It has been denuded of its mystic garb, and it now stands on the same pedestal as the other exact sciences. Though its claim to be treated as an exact and a positive science, such as Physics, Chemistry, Geology or Zoology may not be so strong, there is no denying the fact that it has almost all the characteristics of it. *A priori* reasoning or deduction is no more its method, than it is to the exact sciences. Observation and Experiment are at the present moment, as much the instruments, with which the exact sciences are studied and formulated, as Psychology. By the introduction of induction and *a posteriori* reasoning in Psychology, it has attained the dignity of an exact science. The study of Psychology as a branch of Philosophy or Metaphysics may or may not be deprecated, but there is no reason why the science of Mind, which is so closely allied to the science of Body, should be excluded from the "Curriculum' of those, who make the study of the human Body their speciality. Physiology and Pathology are included in the curriculum but there is no room for Psychology.

To quote the words of an eminent doctor :—" Already many of the most intelligent physicians have come to doubt the efficacy of most of the drugs commonly used, and the question is

much discussed, whether in the main, it is the drug, or the effect through the patient's belief in the drug, which produces the most salutary results. It is hoped that the physician with his knowledge of Anatomy, Physiology, Surgery, Hygiene and Materia Medica, will lay aside his prejudices and add to his stock of useful information and practise the intelligence and use of psycho-therapeutics." The scepticism about the efficacy of drugs, expressed in the above quotation may or may not be justified, but the fact that psycho-therapeutics, plays an important part in the treatment of many diseases, specially those connected with the nervous system, is beyond the pale of controversy.

There was no doubt a time, when mental introspection alone *i.e.* each one looking into his own mind and propounding as philosophy what he thought he observed there, was adhered to and the external observation of mind in all its various manifestations, and the bodily conditions of all mental actions, was ignored. But those days are gone by; and the exclusive application of the introspective method in Psychology, if not altogether abandoned is very much discredited. Modern researches in Physiology both human and comparative, Biology, Sociology and other sciences have revolutionised Psychology, which has now every right to be called the Science of Mind and have also given birth to what is now called 'Experimental Psychology.' It is now admitted on all hands, that a systematic study of the abnormal states, has thrown a flood of light on the many dark and obscure recesses of the human mind.

A close and thorough study of the complex nervous system is as much a *sine qua non* for the students of Psychology as for those of the Healing Art.

Laboratory work in connection with Biology and Physiology and post-mortem studies in the Dissection-rooms, have as much enriched Psychology as the researches of the "Psychological Societies." It cannot be denied that rambles into the so-called occult sciences, have not been altogether unprofitable to real students of Psychology.

The dual theory of mind, which has now a recognised place in every system Psychology, is the result of the researches into the so-called occult phenomena. That there is a subconscious mental region, which has been variously described as the 'Subliminal self' 'the objective mind' or the 'latest mental modifications' &c. is now an incontrovertible fact. Dr. Carpenter ascribes the phenomena of these unconscious region to a physiological process, called "Unconscious cerebration."

The recognition of this unconscious region does not at all conflict with the views of those physiologists, who regard mind, as denoting the sum-total of those functions of the Brain, which are known as thought, feeling and will. On

the other hand, "whatever opinion may be held concerning the essential nature of mind and its independence of matter, it is admitted on all sides, that its manifestations take place through the nervous system, and are affected by the nervous parts which minister to them."

It is a fact that the physician does nothing more than bring to bear his skill upon a patient in helping Nature in all her efforts to cure and to recuperate; it must also be admitted that the great healing powers of the patient's individual mind, should be roused and properly directed.

A close and careful study of the patients' physical conditions and symptoms, precedes every diagnosis by a votary of the healing art, but if to such a study, is added a scrutiny into the mental conditions, habits, and peculiarities of the individual, it is certain that the physician will find means, besides drugs, for bringing about the cure, which he wants so much to effect.

By setting if possible, the patient's mind towards his own cure, the physician lends a helping hand to Nature. It is said that the organism (physical) itself makes a determined and combined effort to get rid of the disease. It is not a case of a house divided against itself i.e. Mind contributing nothing towards the cure of the Body and Body contributing nothing towards the cure of the Mind. In the language of Bacteriology, the friedly germs try to kill the germs of diseases, and the battle is often a very protracted and sanguinary one. The physician, by a careful application of nutrition and drugs, really supplies the sinews of war and ammunition to the rest of the organism, to carry on its operations against the diseased parts.

Similarly, the physician may by rousing the whole mental organism into activity, by directing its attention to the disease or the diseased parts, and by setting the will forces (to use the language of some thinkers, who see no distinction between, force and will) to the combat, do an immense good to the patient. Generally speaking, the proposition—No *Psychosis* without *neurosis* or that every mental process has as its condition a bodily process, some change in the central nervous system and more particularly, in cerebral cortex, is an expression of a great scientific truth. Professor Bain says, "we have grounds to believe that for every mental shock, every awakening of consciousness, every mental transaction, there must be a concomitant nervous shock; and as the one is more or less intense, so must be the other."

There have occurred many instances of death or mental derangement from a shock of grief, pain, or calamity; this is in accordance with the general law.

If this is so, we can safely assume that the mental processes can be treated as remedial agencies of no mean order.

It is not denied that many medical practioners, by their general culture and practical knowledge of the human mind, consciously or unconsciously make use of this remedial agency. By directing the attention of patients into proper channels, by rousing hope and faith, and by timely words of encouragement, as well as by humouring the patients, they sometimes obtain most wonderful results. If that is so, it is all the more reason why medical students should also be careful and close students of Psychology. Faith cures and other occult cures, are really mental cures or cures effected by a resort to this remedial agency. The 'Christian Scientists' have carried on their propaganda by an exclusive use of this agency and it must be admitted that their successes have been phenomenal. The cures effected by *Ojhas* in this country are of a similar type. Is it not shameful that this subtle agency should be left entirely in the hands of uncultured, uneducated unscientific charlatans? Instead of allowing men of doubtful education and character to play upon the credulity of the uneducated and uncultured, is it not desirable that our educated medical men, should be masters of the art and prevent these questionable characters from causing, sometimes more mischief than good? Hypnotism has often been resorted to by medical men, as a curative agency and many have been ardent labourers in the study of hypnotic phenomena. Mesmer, Charcot, Heidenhain, Bennett, Gurney, Liebault, Braid, Bernheim, Binet, Janet and a host of others have been among the pioneers in such study. At one time it was thought that hypnotism might supersede the use of Choloroform and other *anaesthetics.* But whatever may be the remedial value of hypnotism, it is certain that a knowledge of its method &c. is simply invaluable to practical physicians. The Scientific value of its study is immense.

Dr. Moll speaks of its importance and value as a therapeutic agency in the following terms:—

When the practical importance of mental influence becomes more generally recognised, physicians will be obliged to acknowledge that Psychology is as important as Physiology.

Now if we turn our attention to mental diseases or mental derangements —such as, Idiocy, Imbecility, Kleptomania, Pyromania, Monomania, Melancholia, Dementia, &c., what do we find? Are they purely diseases of mind and as such beyond the jurisdiction of medical men and entirely within the sphere of influence of moral teachers?

To quote the very strong language of Dr. Maudsley, "Insanity being a disease, which cannot exist apart from disorders of bodily organs and functions, the diagnosis of it must belong to the physician; for he alone is competent to investigate and appreciate these disorders." If even the derangements of mind are to be dealt with by physicians, is it not a very strong argument that

the Science of mind, should form an indispensable part of a medical student's studies? Amnesia or diseases of memory are also amenable to physical laws. Memory, though it is not the whole mind, constitutes the major portion of what we call our "Self." In the opinion of certain philosophers, it is memory alone which gives us the idea, of a continuous and identical "self," for our thoughts and ideas are in a "state of continuous flux." However, even if we want to avoid the vexed question of the Ego or Self, we are bound to admit that memory is a general function of the nervous system. Even the dissolution of memory follows a definite law. It is needless to say that if diseases of memory have to be cured, a knowledge of such law is indispensable. Physiologically considered, memory is based upon the faculty possessed by the nervous elements, of conserving a received modification and of forming associations. This conservation is assured by nutrition. Psychical memory is nothing but the highest and most complex form of organic memory. The practical utility of a Scientific study of Psychology is nowhere more visible than in a scheme of medical studies. Psychology has outgrown the tangle of metaphysical speculations, which made it a horror to students of the exact sciences. But after all, is medicine an exact science? Certainly not. It is yet empirical and will continue to be so for sometime to come. And why should students of medicine entertain a horror of the study of Psychology?

Avoid, by all means, idle speculations and unprofitable abstractions; steer clear of vapid inanities and logic-chopping; but to shut your eyes, to real, solid and substantial contributions to science from unknown quarters and sources, is more reprehensible than what is disregarded as Metaphysical speculations.

Then again there is a great advantage in having psychological studies, always tested by observations and experiments, carried on in the dissection rooms and laboratories, by students of Anatomy, Physiology, Surgery, Chemistry and Biology. The results of such observation and experiment, are sure to put a healthy check upon the excesses of abstract speculations in Psychology. Speculations regarding some basic ideas of Psychology must continue till the end of time and such speculations are properly within the domain of Philosophy and Metaphysics. But they should not scare us away from the practical application of Psychology to Pedagogy and the Healing Art. Let there be a chair of Psychology in every Medical College and let the medical students study Psychology with as much profit as Anatomy or Physiology. The study of the Sciences is resorted to more for their application to the practical side of life, than for their speculative interest.

Surely, there are more things in mind, than are dreamt of in our every-day philosophy. The transactions of Psychological Research Societies, have brought to light many phenomena that have hitherto been relegated to the category of the 'Mysterious'. But is it not the mission of Science to unravel the so-called mysteries of Nature? Those phenomena, though most extraordinary and wonderful are none the less amenable to Scientific treatment. It is certainly not the object of this short paper to turn medical students into 'Mystics'; all that is advocated is a free uabiassed and practical application of the Psychological truths, to the curative and preventive efforts of medical men, for the good and benefit of Humanity.

A familiarity with the therapeutic value of mind-activity will hasten its employment among the regular Physicians, and thereby give to the public, a far superior treatment to that given in ignorance of the true relation existing between the mind and the body.

NIBARAN CHANDRA DAS GUPTA.

FREE PRIMARY EDUCATION.

The subject of this paper is a very wide one involving very large principles, such as the relation of the State and the Individual, upon which much has been written and said and thought. It is with no intention to be exhaustive or dogmatic that I have ventured to touch this question on its financial and educational sides, but only in the hope that a warning and a suggestion may be of value at a time when the people of India, who are in a position to do so, are turning over the matter in their minds, or at least in the pages of their journals.

That there is some demand for free primary schools can scarcely be denied, though the demand is not clearly articulate from the very fact that the masses have not the education to make it so. It seems reasonable that the extent of this demand should be gauged to some extent, and an endeavour made, so far as funds permit, to supply it. It does not seem reasonable to plunge into compulsory education till existing demands have been satisfied, and till funds become available for such an enormous extension of State activity.

In any system of education, there are three points that need most careful consideration. They are (i) the quality of the teachers, (ii) the content of the curriculum in relation to the child, and (iii) the cost to the State.

The teacher is the school, and the school is the teacher. That is a point which the world, and perhaps especially the world from which we are just emerging, has failed to grasp; for public authorities often spend more on buildings and apparatus than on the teachers; and the people put doctors, lawyers,

commercial men, soldiers, and even clerks all above teachers, at least while they are alive. Surely man-makers are greater than quill-drivers, provided they do their work properly. That is the first point for consideration and it is closely connected with the third.

At present primary education is conducted by teachers on the pay of coolies. It is almost as bad in secondary schools and yet we hear complaaints that our education system is not productive of all the good results that are to be expected. It is as if a man should buy, boasting his bargain, a motor car for ten rupees, and then complain that it does not go well. In a system of Secondary Education cheapness is not necessarily economy.

If on the other hand, the country is to be supplied with free primary education it must of necessity be cheap, and the question of economy must be considered as a first essential. That is for the consideration of Financial Secretaries and Directors of Public Instruction, but it is a problem that will bear thought from us all. It would seem that the solution of the problem is not to be sought in the erection of multitudes of small schools with ill—paid teachers, whose grant may depend on the manner of their entertainment of ill paid Sub-inspectors, but in the evolution of a different type of school in the case of the larger centres of population. This can only be come at by experiment under rigorous, but sympathetic observation, and it would probably pay Government well to institute a series of trials so that when the time comes (it may be fifty years hence or more) for the commencement of free education, there will be a body of experience gathered from different types of schools. One type that holds in it hope of success is a modification of the Lancaster system, which was itself Indian in origin.

Imagine a long building of matting and grass. Along each side fifteen sections of the floor are marked off, each large enough to seat twenty children on mats. A fairly wide aisle passes up the middle. Each class of twenty infants is being taught by a boy of, say, twelve to fourteen. Thirty boys each teaching twenty makes a total of six hundred boys under instruction. In charge of the whole would be a thoroughly well-trained graduate teacher who would continuously superintend all the classes, helping, suggesting, maintaining discipline and generally regulating the work of the young teachers. School would only meet for one and a half or two hours daily and no lesson would exceed half an hour's duration. With short hours and brisk work the children might be taught in two years to read, write and calculate intelligently.

If the graduate teacher were paid Rs. 90 per month and each boy teacher say Rs. 2 as pocket money we should be educating six hundred children for

Rs. 150 a month, that is, at four annas a head.

The boy teachers would meet again after an interval and would receive free instruction for two to three hours at the hands of the Head Master, so that they could rise higher up the educational ladder, and secure special scholarships to carry them, if deserving, to the very top.

This scheme postulates a desire for education and a corresponding willingness for hard work. It is a mere suggestion, and I am not prepared to be cross-examined on its merits. What seems to me necessary is that experiments should be made now so that when the time comes a well-considered and tried scheme can be put forward on a large scale.

The curriculum of such a school would of necessity be of a most limited character and very largely utilitarian in its aim. The Agricultural Department may experiment, and the Co-operative Credit principle may be of immense value, but neither can become effective till the people have the means to understand the publications, and to work the Committees by Chairmen and Secretaries from amongst themselves. This both shews the necessity, and indicates the curriculum for primary Schools.

The work of Education is almost entirely concerned with the formation of habits of discipline leading to conduct and skill on the one hand, and on the other with the dividing up that part of the world that is presented to the individual, so that he may best assimilate it in just proportions. Both must go on together, but the second, which is formative in character, is impossible without the first, which is instrumental.

To the infant newly born, the world is probably a mass impression—a stimulus against which it organically reacts. Education in its wide sense from birth till death seems to be the emergence of parts of that mass into special relation with the reacting organism, and their re-relation to each other in a more or less conscious system. The mother's breast as a source of supply, the mother's face as associated with comfort, the lighted candle, the pleasures or otherwise of an evening toilet as associated with that light, are some of the first emergences from the mass-impression.

By the time the child goes to school this process of differentiation through stimulus and reaction has proceeded far. The most advanced scientist is only a man in whom this process has been carried to a high stage owing to the curious and complicated structure of his brain, and the intensity of his experience in a definite direction. It is the same with the literary man, the commercial man, the Judge and the Governor.

Though primary education (using the term not as pre-secondary, but as of a separate kind) owes its existence almost everywhere to secondary and university

education, it has none the less suffered in quality and character from this relationship. It has been overwhelmed by the grammar master and the scientist. The academic costume of a moral teacher should be rather a smock frock than a cap and gown. In India the evil has been aggravated by the fact that the higher education itself has been brought from afar.

We must endeavour to get away from western "subjects" and western methods in the elementary schools and yet induce the western spirit which makes demonstration, the resting place of belief.

At this point we are confronted by the question as to whether there is any one in Bengal or Assam who knows the western education in its spirit and modern tendencies, and at the same time knows the world that presents itself to the children of the villages of this province. There must be many who have at all events a partial knowledge of both and to such we must appeal to come forward and to devise the work of the primary school in that large extension which seems to be in the womb of the near future. To institute a large or unsuitable system would be an irretrievable wrong to the country, while a good system founded on the life of the people and leading back to that life as its natural result, only enriching and ennobling it with greater fulness, would be an inestimable boon. The rural school must not become a mere avenue to the town, but must fill the country so full for the child that his interest will remain there.

To the village child the world is identical with the country. We want men who will soon know the country that they can open the child's eyes to see more of it. Very few such men exist and I venture to appeal to teachers in this province to search and find the riches of the country world. Men of great scientific attainment can scarcely help unless they "become as little children," and so enter into the kingdom, the realm of Nature. Their analysis of the world has gone too far, and that in special derections, to enable them to get back to the point of view of the little child whose analysis is only just beginning, and whose synthesis, if it has begun, is quite sub-conscious.

And here I find myself compelled to introduce the term "Nature Study." But let me hasten to explain that it is not to be understood as another "subject of instruction." 'Nature' in this sense includes every thing in heaven or earth, or elsewhere that can profitably come within the range of a child's experience in his ordinary surroundings.

"Nature study is not science. It is not knowledge. It is not facts. It is spirit. It is concerned with the child's outlook on the world." It is essentially the possession of the lower classes of schools, though, since it includes so wide a range, human and non-human, animate and inanimate, it forms a good foundation for later work whether in science or

the humanities. Education reformers of all times have had to fight the battle of the spirit against the formalism and flesh of books, and the battle has got to be fought here again. We have become slaves of examination, slaves of text-books, slaves of the inspecting officer, slaves of the regulations. Many of us are afflicted by that horrible and infectious disease caused by the red-tape worm. Who among our teachers will come forward to *work* for the future by making a beginning with Nature Study? So only can our children be put into intimate touch with the external world and make it their own.

In the Training College at Dacca we have now got a gentleman of high scientific qualifications, Dr. Gupta, Ph,D. (Vienna), who is working along these lines, and he will be delighted to hear from any teachers interested in the work.

At this point some may exclaim " but you said the primary school curriculum was to be strictly limited to reading, writing and calculating, and now you extend it to the universe." That is a mistake that is often made. People imagine reading, writing and calculating can be done in themselves, that one can read without reading anything, that one can write or calculate without writing or calculating anything. The two are but outside and inside of the same thing; skill and habit on the one hand and content on the other; means of expression and the thing expressed.

One of the laws of the child's being seems to be that the dominant interest must find external expression. The Bushman and the Esquimaux, the children of the race, must depict their most cherished animals and implements on cave walls and bones. The child or stunted adult writes his name or mark in places in which he is interested, whether clean or unclean. Nothing pleases a little child more than to draw his mother, his brothers and sisters, his house and so on.

Let us lead the children's interest to the things about them, and their desire to express them will manifest itself. If we can teach them to notice what they have formerly only seen, to enquire the reason for what they notice, to alter conditions and produce altered results, and to express what they have done, we shall have done much for the children and much for their country. The cheaper the method and machinery by which this can be brought about, the wider will be the blessing.

EVAN E. BISS.

THE CENSUS AND CASTE.

Mr. J. McSwiney writing in the *Dacca Review* for June expresses some surprise that there should be so much trouble about caste entries in the Census operations. "The main cause of the

keenness of the people" says he, "on the question of caste entry was the attempt made in 1901 to draw up a list of caste social precedence : added to this is the general modern tendency of the lower castes to rise and claim an equality with the higher castes. No attempt will be made this time to indicate social precedence,--because it gave rise to too much ill-feeling at the last Census. Whether caste will eventually disappear is another question : while it lasts, it is an unique organisation and India owes it to the rest of the world to provide an account of the system and statistics of its component parts. But the claims of individuals and of communities to be recorded as different from what they are usually known adds very considerably to the labours of the superintendent. Many persons, including even some rather well-educated people, seem to be under the impression that the recognition by Government of their claims will immediately ensure their position in Hindu society. They forget that the days of king Ballal Sen are past and that the object of the Census is to record facts as they are, whether these facts are fair or otherwise to individuals".

He concludes by saying, "The caste system shows no great signs of breaking up : that caste will stand the shocks of many generations to come is hardly in doubt." This is a truth which is so often forgotten that we are glad that Mr. McSwiney begins his work with such a strong conviction on his part. It would have been more pleasing still if he had dived a little deeper into caste sentiments and their exact nature and strength, a knowledge of which would have helped him better to appreciate the ceeling on caste-entries in the census.

It would strike an Englishman as rather strange that a man who belonged to the Depressed classes and on whom the society has for ages done its worst should show any the slightest inclination to stand by his status such as it is and to resent its infringement by anybody. To one brought up in the traditions of England the most natural thing for a man who had that amount of a sense of dignity in him would be to shake off all this nonsense and have nothing to do with any branch of that system that has used him so ill. But we do find that caste-feeling and a sort of a sense of dignity that it implies runs strong in these very classes. If a Brahman were to drink water from the hand of a Muchi, not only would the Muchi not feel the least grateful for the liberality shown by him but would cease to have any respect for him. To a certain extent this feeling has affected even the humblest class of Mahomedans at least in Eastern Bengal. I have an experience of it which it would not be out of place to recall here. I had once the misfortune to walk over seven miles of desert *chur* without anything more ambitious in the way of

foliage than small *jhau* trees, under the blazing noonday sun of Baisakh. I had meant to cycle but as I could not discover a road all round I had to be content with dragging the wheel by my side. At last I could stand it no longer and when after six miles of tramping up and down with the heavy load of the cycle beside me I found a small empty thatch, I hastened into its shade and soon lay at full length. My head was swimming and my whole body sinking—I was so thirsty that I smiled at all the petty thirsts that I had in my life. In short I had a very bad half an hour and would not care to have it again. I opened a lemonade bottle I had with me but the water was almost boiling. A number of girls and boys gathered round me and presently an older face or two showed themselves. I begged them to give me some cool water from their well. They were all Mahomedans and they looked at one another's face. They were very reluctant to destroy my caste by giving me water. It was after repeated remonstrances that one of them took pity on my condition and brought a *lota* full of cold water which saved my life.

This is what caste-feeling means. A sort of instinctive dread of breaking caste puts the idea of doing without caste absolutely beyond the range of possibilities to their minds. And within the limits thus imposed to their self-respect they would fight to death over their precedence over the lower classes.

Take with this another sentiment which is strong in every Indian. In India people are exceedingly sensitive to abuse or to words in any way derogatory to their dignity such as it is. If law is the unconscious record of the sentiments of a people we can trace this feeling far back into history as we read of the many varieties of abuse that are provided for under the section on *Vakparushya* (abuse) in the Codes of Manu, Narada, Yajnavalkya. Then we find that while the imputation of great sins (*Mahapatakas*) to a person of a higher caste is only a crime of the second degree, abuse in respect of any man's caste or community such as saying for instance to a Vaisya that he is a Sudra is an offence of equal gravity and telling a man from Benares that he came from Patna would be an offence of the lowest degree. When we remember that it was a graver offence to abuse a man of higher caste than one of one's own caste, we shall see what enormous importance was attached to reflections on the caste of a person or of even calling him by a caste-name not his own.

When we remember this we should be in a better position to understand the feeling of resentment that a Hindu feels to this day when for instance a *Bhuimali* is entered in the Census with unclean feeders which he is not or a Saha of Eastern Bengal with the *Saundickas*. I have known a very sensible, highly intelligent pleader friend of mine

belonging to the *sadgopa* caste flare up to an unwonted degree when a Judge of the High Court in connection with a case of certain *sadgopas*, asked in his ignorance, "Are not these men Sonthals?" So that even if the Census reports do not aim at giving a table of caste precedence, and assuming that they have no bearing on the question of social status, the sentiment in the case of a wrong entry is bound to be strong, specially as it is not the work of a private person but a public record from which authors will draw their conclusions, on which political philosophers will base their theories and on which in the long run, perhaps some globe-trotter from across the Atlantic, will base some sweeping generalisation about a particular class.

To say that Caste status is not in any way affected by Census reports is to ignore the vast importance that records like these attain in the eyes of the public. Although it does not profess to lay down a table of caste precedence, in all questions in controversy relating to caste the Census report comes in handy and conclusions are based on it of which the makers of the reports had no idea. Sir H. Risley's work on Castes and Tribes is a case in point. In the long run the conclusions drawn by authors like these are bound to permeate the people to some extent and to react upon their treatment of the castes. A public entry of today will have quite another interest twenty years hence, and if it does not affect the rights of the castes, the mere record may well be turned to use as an authority on the status of the caste in question. To take a concrete case, I shall take it as well-established and beyond doubt that the Sahas of Eastern Bengal are not *Saundikas*. They have been recorded with the *Soundikas* however simply because people did not care about Census operations in the past. It has now become necessary for them to exert themselves for all they are worth to get themselves recorded as a class distinct from them. Now in this case the Census reports of the past have not settled any question of caste precedence but the *Sahas* feel, and I conceive rightly, that they have been degraded by being classed with *Saundikas*. And then the mere fact of the record being made unconsciously reacts upon the popular mind and people begin to think that after all they must have been *Saundikas*. It is therefore of some importance even for purposes of social status to have a correct entry in the Census reports.

I may add in this connection that the case of the Sahas is in a special sense one that needs more than usual consideration in entering them in the Census records. For while almost every other caste has got a caste-name, the Sahas of Eastern Bengal have none, but their caste is named by the surname which the members of the community bear. Every one in Eastern Bengal

speaks of the Saha caste. This surname is not however free from confusion as that of Banerjee or Bhattacharyya or Basu or Mitra is. The surname of Shah is borne alike by the Shaha and the Saundika and by Mahomedans, and with occasional variations by many other castes in the rest of India and even by Mundas (who use Sahi). The origin of the word itself is not free from obscurity. It is perfectly clear that the surname of Sahu or Sah as found in Behar is derived from Sadhu a class name for merchants. It seems reasonably clear that the title of Shaha in Eastern Bengal was similarly derived. The peculiar form may perhaps be accounted for by an attempted assimilation with Shah, the Moslem title of dignity during the Moslem rule, in the same manner as the surnames Dott, Gosse and the like are framed even at this day by some Duttas and Ghoses to give an English accent to their names. So while the purposes of an curate record can be served by merely aming the caste, in the case of the other classes in this case it is not enough to enter them as Saha a title which they bear in common with Saundikas, but they must be distinguished by some sign showing their distinction from Saundikas.

What Mr. McSwiney however seems to complain of is the anxiety displayed by some of the castes to have themselves entered as better than they are reputed to be, and to support their claims by reference to ancient history. "Reading back into history or to the Shastras," he says "will not alter the facts of the present day and claims to be descended from Khattriyas, for example, cannot be accepted unless the Hindu society of now and to-day recognises the persons making the claim to be Khattriyas now and to-day."

To a great extent this is true and just, but there are circumstances in the history of the growth of the Hindu social organism which would make it imprudent to brush aside all considerations of history in determining the caste of some people. And again, the social status of the classes does not remain the same through all ages in any country. The hated usurer of the middle ages of Europe is now the adored banker and millionaire and the soldier of fortune or knight-errant has ceased to fill any place in the social estimation of to-day. The determining factor in these variations is generally the different estimation in which an occupation is held in different ages. In India, where social status has formally been for ever determined by the order of four primitive classes these changes seem to have taken the form of subsuming a particular class under this or that original caste. There is some reason to think that Khattriyas have fallen in estimation by following prohibited trades, that Brahmans have fallen

likewise and that Vaisyas gained the status of Sudras. On the other hand an accession of dignity of other classes who were originally held in lower estimation does not seem unlikely either. Whenever a political revolution placed a king of a lowly caste on the throne, it must have resulted in the wholesale upheaval of that class. At periods of renascence like that for instance in Bengal in the period following Adisur there have undoubtedly been considerable readjustments of the social organism. Even now the process is going on and the strenuous endeavours amongst all classes to improve their social status are bound to cause some changes.

What should be the attitude of the Census officers to these changing conditions? It cannot be denied that some record of these transitional stages ought to be kept, if only to show the gradual transformation of a caste. The claims of today may be recognised facts of tomorrow, and if the census report of today fails to take account of that claim, and a future report records the claim as a recognised fact there will be a disagreeable *hiatus*, an important link in the chain of progress of that caste would be lost. Thus for instance let us suppose that at the last census a caste was recorded by a name which suggested that they belonged to the class of untouchables and that now they claim to have a name recognised in the Shastras and which would give them a place in better society. If the claim is widely made and if it is backed up by reasonable arguments there is no reason why the census officers should not record that claim. If not, to a future student of sociological history the entries would be puzzling and misleading and by missing the transitional link he may altogether fail to identify the new caste with the old one with another name. As a matter of record alone, apart from any question of adjudication of status therefore, the claims of the different castes ought to be entered so as to render intelligible the subsequent history of the caste.

So far as the history of the Hindu society is concerned there is nothing inherently wrong in the endeavour of the castes to improve their status. There can be no question that many of the so-called mixed castes and the more degraded classes are really descendants of the better three classes of the Hindus and that their occupations which happened to be looked upon with disfavour in those days caused their social degradation. When the degradation had taken place, fanciful theories of the origin of the castes were formed. In other cases the fallen castes were undoubtedly *vratyas*. But habits and occupations which were regarded as disgraceful then are not so now and there is no reason why a class degraded by reason of its occupation should not attempt to rise to its proper place when that occupation has so far ceased to be dishonourable

that the best men in society delight in following it. But right or wrong, such a movement is bound to take place and a census report of India would be inadequate if it failed to record the stages of this progress of castes to improved status, in which considerations of history must play an important part.

It is no doubt annoying to the hardworked Census officer to be troubled about decisions of these fine points of caste precedence. But they are really not called upon to decide these questions and if they did decide their decisions could have no sort of authority with the people. I fancy the Census officer might record any claim made on behalf of a caste, provided that the claim is widely made by the caste and it is reasonably backed by argument. For the rest the decision may well be left to history.

I will conclude with one remark as to how this endeavour to improve the status of the castes strikes me from the point of view of social reform. I hail the movement as making entirely for progress. It no doubt shows the Vitality of caste but the life that is in it has germs which are bound to destroy the most invidious features of caste if not caste itself at a distant date. For the movement is one of awakened self-respect amongst the classes who are more or less kept under by society. When once this feeling begins to inspire a class there is no limit to which it may develop if properly nurtured and it is bound to have an abiding influence in elevating the nation by elevating its depressed millions.

At any rate it is bound in the long run to produce more of a sense of equality among the different classes by breaking down barriers which separate the lower classes from the higher. At the present time the educated Brahman Vaidya and Kayestha feel themselves to be very much as equals and an intermarriage between these classes would not be a millionth part as shocking as that of one of these classes with a Saundika. If the other classes can elevate themselves by degrees to this standard of equality, the problem of social equality would be more than half solved. For the really evil feature of the caste system is not that a caste like the Brahmans is kept apart from that of the Vaidyas or Kayesthas but the great disparity in social status between these and the inferior castes which results in their social degradation. If these classes are raised from their depths to anything like equality with the upper classes the problem of their ultimate fusion would be only a question of time and in any case the most disagreeable features of caste would entirely disappear.

It is in this view that the endeavour of the castes to raise themselves should receive encouragement and assistance from all interested in the social advancement of the Hindu race.

N. SEN GUPTA.

W. L. BOWLES.

Sir Sidney Lee has recently told us in an admirable lecture on the chief occupation of his own life that "the biographer has to forswear the measuring rods of the family hearth, of the hospitable board, of journalistic advertisement." I was meditating on this great subject the other day in the New Market at Calcutta when appropriately enough I came upon a nice edition of the poems of William Lisle Bowles. I dont think that anybody has written a life of Bowles at any length. The edition I am speaking of has a short memoir prefixed, the work of one who himself certainly merited a biographical monument, George Gilfillan, the author of a hundred volumes or pamphlets and the bold pioneer of "sunday walks" in Dundee. One of George's sermons on Hades went up to the Dundee Presbytery but came through triumphant and it was rather unkind of him to write some twenty years later that "the standards of the church contained much dubious matter and a good deal that is false and mischievous." His only poem of importance seems to have been that entitled "Night," of which the writer of the notice which lies before me says somewhat cautiously that it "found favour among his friends." So much for this stout-hearted old Scotchman. I read too that one of the numerous projects of Alaric Watts was that of a joint life of Bowles, but it never seems to have appeared. Perhaps it is as well as that adventurous gentleman had only a limited sense of perspective and was doubtless busy with the first edition of a biographical summary in which three times as much space was given to the editor as to Tennyson.

Bowles' life was the evenly successful one which marks the divines of the eighteenth rather than the nineteenth century. He was fostered at Winchester by Joseph Warton an easy-going and not altogether successful headmaster but a man of parts who had very considerable taste in literature. Remembering Warton's cautious attitude towards the giants of the eighteenth century it is not difficult perhaps to recognise his influence in what Bowles gave to the world. After Winchester, Oxford, where he was under the other and better Warton, Thomas, of Trinity. This Warton, who had long left the days of "The Oxford Sausage" behind him, had just published the third Volume of his excellent "History of English Poetry," and soon afterwards become Poet Laureate; he followed no less and no greater a bard than William Whitehead, whose dusty lines may still linger on the top shelves of country libraries. Warton had life and vigour and was, with occasional breezes, a friend of Dr. Johnson. Bowles no doubt paid more attention to literature than to the studies of the place and

was one of those who are euphemistically described as "long connected with the university;" he took eleven years to get his degree. The usual series of livings ended at Bremhill in Wiltshire where, with a canonry at Salis bury, we can leave him. There can have been very few other men who remembered the American war of Independence and yet lived after the Revolution of February.

Bowles lives as ivy lives because his name is inseparably connected with the history of greater men. Coleridge made forty copies of the Sonnets when he was at Christ's Hospital and Coleridge had probably a finer mind then than Bowles in his prime. Coleridge amply repaid the debt he felt and if Bowles had no other hope of immortality he would live for ever in the fine lines beginning

"My heart has thanked the, Bowles! for those soft strains,
"Whose sadness soothes me like the murmuring
"Of wild bees in the sunny showers of spring!"

Southey like the other Lake poets was an admirer, with limitations, but Bowles never hit it off with Byron. Witness the English Bards and Scotch Reviewers

"Delightful Bowles! Still blessing and still blest,
"All love thy strain, but children like it best."

or again

"Let sonneteering Bowles his strains refine,
"And whine and whimper to the fourteenth line;" and in the 'Hints from Horace'

"For you, young bard! whom luckless fate may lead
"To tremble on the nod of all who read,
"Ere your first score of cantos time unrolls,
"Beware-for God's sake, dont begin like Bowles!

Bowles took a fine revenge as the following lines from "Childe Harold's last Pilgrimage will show. Though not without artificiality they are pleasing as well as generous:—

" I will not ask sad pity to deplore
His wayward errors, who thus early died;
Still less Childe Harold, now thou art no more,
Will I say aught of genius misapplied;
Of the past shadows of thy spleen or pride.
But I will bid the Acadian Cypress wave.
Pluck the green laurel from Peneus' side
And pray thy spirit may such quiet have,
That not one thought unkind be murmured o'er thy grave."

Bowles published a great deal in the course of his long life including an edition of Pope famous in its day owing to a controversy which it excited and in

which Byron, Campbell and Roscoe took part. The question at issue was the poetic claim of Pope and the faithful Gilfillan has to admit that as a controversialiast our author was rather noisy flippant and fierce." But all these things are forgotten. His living poetry, if such a state of suspended animation can be so described, goes into a very small compass; a few early poems which pleased those who belonged to the coming age, notably the sonnets of 1789.

I do not suppose that there are many men living who have read through "the spirit of Discovery by Sea: a descriptive and historical poem." There is certainly a good deal in it to justify Byron's pleasantry:—

" Awake a louder and a loftier strain,
Such as none heard before, or will again!
Where all discoveries jumbled from the flood,
Since first the leaky ark reposed in mud
By more or less, are sung in every book,
From Captain Noah down to Captain Cook."

The first line above is that with which Bowles begins the poem. It is quite true, though hard to believe. "The first book opens with the resting of the ark resting on the mountains of the great Indian Caucasus, considered by many authors as Ararat." We are led on to Thebes and Ophir and Tyre. The mention of the last emporium brings the poet oddly enough to England, chiefly because she is now great and glorious whereas Tyre is but a place for fishermen to dry their nets. The euloguim finished, he is carried away again. Tyre suggests Acre and its siege.

Why beats my heart
With kindred animation? The warm tear
Of patriot triumph fills mine eye. I strike
A louder strain unconscious, while the harp
Swells to the bold involuntary song.

This Bowles admits to be a digression but it is one that appeared to the author not only natural but in some measure necessary to break the uniformity of the subject. And so back to Tyre again and Alexander and the Indian account of the Deluge and the inevitable but misty Nearchus. A vast but convenient leap, with which no reader will quarrel, brings us to Henry the Navigator and Columbus and Captain Cook. Thus we are the author tells us, led back "from the point whence we set out—the Ark of Noah; and hence we are partly enabled to solve, what has been for so many ages unknown, the difficulty respecting the Earth's being peopled from one family." Partly!

This is not the folly that it sounds. Bowles was only following out a theory of which Wordsworth too often shews the influence or which Southey was a victim, the theory which considers that a subject necessarily becomes poetic because poetry is written about it.

There is fashion too, changing fashion, in poetry as in other things, and what our grandfathers loved to read about we most emphatically do not. Some subjects it is true, are everlastingly fresh.

Nature in her varying moods we follow from Gray to Tennyson with unfailing delight; given sincerity, the variations in treatment only add a charm. This is where Bowles had his really important influence. The sonnet on the "Bells, Ostend," that on Netley Abbey" breathe the spirit of the Romantic Revival. That on the approach of summer has the minute touches which shew the student of nature; it also is marked with the sadness which oddly enough was one of the elements to which Bowles owed his popularity. The spiritualisation of Nature in the sense of Wordsworth add Coleridge lay outside his province. He dared to challenge comparison with Gray as a verse from his elegy will shew :—

"Perhaps to these gray rocks and mazy springs
Some heart may come, warmed with the purest fire!
For whom bright fancy plumes her radiant wings,
And warbling Muses wake the lonely lyre."

But one is constantly, brought up short by this question of subject. "Abba Thule's lament for his Son Prince Le Boo" may pass, though mysterious till we discover that the scene is the Pacific. But what are we to say to a couple of hundred lines on the philanthropic society? The verses to Burke recall Johnson. For instance,

It is the lot of man :—the best oft mourn,
As sad they journey through this cloudy bourne:
If conscious genius stamp their chosen breast,
And on the forehead shew her seal impressed,
Perhaps they mourn, in bleak misfortune's shade,
Their age and cares with penury repaid;
Their Errors deeply scanned, their worth forgot,
O! marked by hard injustice with a blot.
If high they soar, and keep their distant way,
And spread their ample pinions to the day,
Malignant faction hears with hate their name,
And all her tongues are busy with their fame.

Nearly all poets have shewn precocity. How many boys leaving Winchester for Oxford could write the following thoughtful and pretty lines?

The spring shall visit thee again,
Itchin! and yonder ancient fane,
That casts its shadow on thy breast,
As if, by many winters beat,
The blooming season it would greet,
With many a straggling wild-flower shall be dressed.

But I, amid the youthful train
That stray at Evening by thy side,
No longer shall a guest remain,
To mark the spring's reviving pride.
I go not unrejoicing ; but who knows,
When I have shared O world ! thy common woes,
Returning I may drop some natural tears ;
As these same fields I look around,
And hear from yonder dome the slow bell sound
And think upon the joys that crowned my stripling years !

If we expect from these pioneers any first-hand dealing with the emotions we shall be disappointed. The time had not yet come for the deep and direct expression of human feeling in in the modern way, whilst the passion of the writers of the 16th and 17th centuries had found few echoes in the 18th. The nearest that we get to modern standards in this respect seems to be found when the object of affection is dead. The well-turned Elegy prepares the way for "One word more" and "Oh! that it were possible." The distance is great, but it is equally great between Bowles' "Picture of a young lady" and "Take oh! take those lips away." Bowles tells as in the preface to "St John in Patmos" that it is a consolation to him at the close of his life to think that he had not departed a moment from the severer taste which he imbibed from the simplest and purest models of classical composition. What might have been is to be judged from occasional lines and verses such as

Go, tell that pining boy to cast
His willow wreath away ;
For though life's spring too soon is past
Though youth's sweet roses fade too fast
They shall not fade to-day.

W. A. J. ARCHBOLD.

THE IDEAL OF HINDU WOMANHOOD :

Look up, there's a small bright cloud
Alone amid the skies
So high, so pure, and so apart
A woman's glory lies.

—(MRS. BROWNING).

A noble and beautiful picture is before me rising high above all Womanhood and before I attempt to depict it let me breathe the prayer, that Hindu Womanhood on its path to perfection may attain this ideal. From the annals of the Past, from the living Present I shall make an humble effort to paint this beautiful dream of the Future.

The ideal Hindu Woman must have the unequalled devotion, the contented spirit and all the sweet noble qualities of the immortal Sita, who though a queen, followed her royal consort in the forests cheerfully and went through numerous trials and endless suffering.

She must have the dignity and noble spirit of Draupadi who, though the mistress of a humble home, bore herself under all circumstances with a spirit worthy of a queen.

She must have the constancy of the faithful Savitri, who was unmindful of of all dangers and conquered the Lord of Death himself in her deathless love for her beloved husband.

She must have the faith and wisdom of the great Maitreyi who preferred the true knowledge to all worldly riches.

She must have the brave daring of Grace Darling, the patriotic and fearless courage of the Rajput maidens, the kind and patient and loving charity of Florence Nightingale, and the generosity of Maharani Swarnamayi. The days of romantic and heroic adventures are over, but the beautiful and noble spirit of Sita, Savitri, and others come wafted to us with imperishable fragrance from the Past. May all Hindu women breathe it into their lives. Human thought, love, joys and sorrows are ever the same, and even in our daily lives, experiences come which call forth deeds of self-sacrifice and and self-control, labours of love, fearless and noble actions, and all the good qualities of the heart.

The ideal Hindu woman must possess a good sound education suited to the times, and yet preserve her distinctive nationality. She must possess all the particular qualities for which Hindu women have been admired in all ages.

A Perfect Daughter makes a Perfect Wife and Mother, and in the three blended together is the Ideal of Womanhood.

First, let us turn our eyes to the perfect daughter. A good sound education and a religious training are the two things essential to our girls. By education I do not mean mere book-learning. Only for a few women, whose mission in life is to teach, are University degrees necessary. For the majority of Hindu girls the home is the battlefield of life, therefore we must give her that kind of education which will develop the intellect and will best equip her for her future—an education of the mind and heart, and useful practical knowledge. For the Hindu girl at a tender age finds herself suddenly in a large unknown family, with new duties before her, and University degrees will avail her very little then. We must *instil* into the minds of our girls the principle that their sole aim in life is not to be eligibly married but to be good and noble women and to fit themselves to the making of a home. They must understand that their education is not be discontinued *with* marriage but continued in real earnest *after* marriage, when the grave and responsible duties of wife and mother begin. A religious training is necessary too. Whatever may be the individual beliefs, our girls should have firm faith and devotion, for religion is a source of strength and comfort in the trials and pleasures of

life. The qualities of a perfect daughter are unselfish love, obedience, truthfulness, patience, and the loving care of her brothers and sisters. As a daughter-in-law in her husband's family all these are essential.

In the gradual gradations of her position in her husband's family the Hindu girl must know how to rule well as well as to obey. For the time comes when she becomes the mistress of a large household and it rests with her only, whether the home will be peaceful and happy or one of discord and unhappiness. It is no easy task to manage a Hindu joint family, with its numerous members of various dispositions. A forgiving, cheerful, unselfish nature, a tactful, sympathetic, well-balanced mind are necessary and with these safeguards only can she be happy and make others happy.

From the perfect daughter let us pass on to the perfect wife.

The Hindu girl has been a good wife in all ages. But with the change of the times she must adapt herself to it, so that she can be the true helpmeet and companion of her husband. If he be well-educated and enlightened, she must acquire these qualities so that she can truly be one with him in mind and heart. "Bear and forbear" is the best motto for married life. The Hindu girl was always a good housewife, clever in all household accomplishments and she must not lose these while acquiring modern ones. For without them she cannot care for the physical comforts and health of her family, nor make the home pleasant and attractive. The great Bard of the land where women are free, educated and as enlightened as the men, has told us,

> "Thy husband is thy lord, thy life, thy keeper,
> Thy head, thy sovereign * * *"
>
> (Taming of the Shrew,)

From the wife the woman comes to the common but honoured state of motherhood, without which womanhood is not perfected. The Hindu woman finds herself a mother when yet a girl, too young and ignorant to understand fully her grave responsibilities. Only a good education will improve her mind, create broader sympathies, make her thoughtful and give her forethought, all of which is necessary for the upbringing of her children. The reading of good and useful books should be taken up after marriage. The thoughts of great and noble men and women have a direct influence on our minds. Girls, who have to mould innocent minds, to train the intellect of future men and women, and to guide the young soul to purity and God, need this influence. "The bearing and training of a child is woman's wisdom," and she must be wise, thoughtful, intelligent and well educated to be an ideal mother.

There are a few more qualities which every woman must have, whether as daughter, wife, or mother. These are love of the mother country and hospitality.

Hospitality is a virtue for which the Indian people have ever been distinguished. There are many beautiful sayings in Sanskrit on the subject. I shall quote only two to show how greatly hospitality was prized.

"Thou shalt extend the rites of hospitality even to thine enemy, even as the tree does not withhold its shadow from the woodcutter who destroys it."

"When a wanderer turns away from a home unwelcomed, without receiving the rites of hospitality he leaves behind him his sins, and departs with the righteousness of the house." Hindu women, however educated and enlightened, should practise this virtue as their forefathers always did.

The ideal Hindu woman must love, serve, and revere her mother country, so that she can bring forth patriotic sons. True to the kindred points of Heaven and home, as she undoubtedly is, or ought to be, she has her own limitations. A Hindu woman cannot go about making speeches but she can serve her country in a worthier and more useful way, by keeping harmful exotic customs from the Indian home and holding up nobler ideals of life and conduct before the rising generation. By blindly imitating unsuitable modes of foreign life she runs the risk of losing her distinctive nationality. The wave of Western education which is entering every nook and corner, threatens to sweep away all the good old ideals, and it is for the woman to preserve them and cling on to them. She should restrain her impulses towards extravagance by the thought that hundreds of her countrywomen might at the very moment be suffering from the pinch of hunger or are being decimated by plague or pestilence. She should turn her thoughts to her less fortunate fellow countrymen and set an example to her sons and the inmates of her family.

I shall now speak of the Ideal Hindu woman in society—such as it is, imperfect and unformed in India. With education is felt a longing for independence, and liberty to a certain extent ought to be given to the educated Hindu woman. An ideal Hindu society, where men and women move in their own grooves and yet meet together with proper freedom, men and women who live simple, earnest lives, working conjointly for the good of mankind, for the country and for each other, has not yet come into existence. It rests with Hindu women to form such a society. The Hindu woman must keep pace with the times —to linger behind is injurious, to rush on ahead, infinitely worse. The "Rights of Women" have been greatly talked about of late years. I quote a few lines from a poem about "Woman's Rights." It brings into relief the true rights of women.

> The rights of woman—what are they ?
> The right to labour, love and pray !
> The right to weep with those that weep
> The right to wake when others sleep.

The right to dry the falling tear !
The right to quell the rising fear
The right to smooth the brow of care
And whisper comfort in despair.
The right the intellect to train
And guide the soul to noble aim.
The right to brighten earthly homes
With pleasant smiles and gentle tones,
Are these thy rights ? Then use them well
Thy holy influence none can tell.
If these are thine, why ask for more ?
Thou hast enough to answer for !

And indeed she has much to answer for ! If the Hindu girl knows not how to use her true rights and the advantages of education worthily, she is a hundred times better behind the Purdah.

During the long years of the subjugation and dependence of India, the condition of the Hindu woman has been greatly changed from what it was in the ancient days when our Ayran forefathers led simple, noble and unfettered lives. But the days of darkness are over and in the clear light of the New Dawn we see the greatness of the Past behind us, and the hope of the new Future before. The Ideal of Hindu Womanhood, such as I try to conceive her, stands out noble and high—the Mother of the future Hindu Nation ! Its realization is a dream of the future. The education and training of our girls are in our hands and *therein* lies the means of its realization. Let all thoughtful men and women labour for it for—

"The woman's cause is man's
They rise or sink.
Together, dwarfed or God-like
bond or free."—(TENNYSON).

SNEHALATA SEN.

HYMN TO AGNI, GOD OF FIRE.

अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम् ।

Agni I praise, the Priest divine:
Over the sacrifice He reigns
The Boon-bestower most benign,
Whom young and old alike should sing,
May He the Gods of Heaven bring
Here to accept our offering.
Agni ! by Thee a man obtains
Riches, and prospers day by day,
And sons, the best of blessings, gains ;
From every side Thou dost pervade
High sacrifice by mortals made :
Agni ! approach and give us aid.
To Agni, Lord of wisdom, pray :—
"Oh God among the gods draw near
Chief homage due to thee we pay ;
Before Thy face the shadows flee,
Sure are Thy Gifts to men, and we
Come day by day to worship Thee.
Oh ! messenger of Heaven appear,
Resplendent Ruler of the rite,
In this Thy temple take delight ;
As fathers with their children, hear,
To us, Thy children, lend an ear,
And make our fortune fair and bright.

Rigveda I.

E. N. BLANDY.

UNDERGRADUATE LIFE AT OXFORD.

(2)

Turning to the subject of politics, we find contradictory views about the tendencies of Oxford. To some she is the incarnation of rigid conservatism and to others a hot-bed of mad radicalism. From the point of view of an election agent, the constituency of Oxford presents an unbending conservative front. This is due to the number of non-resident country clergymen in Oxford. But among the resident M.A.'s it is difficult to assert which party is in the majority. The opposite view is due to the enthusiasm with which the advanced section of undergraduates expresses its opinions. The great body of under graduates who come from school are traditional conservatives. It is quite natural that those who are converted to the opposite camp should be the most eager politicians and have most to say in support of their opinions. The debating societies are the great outlets for political energy. Foremost of these is the famous Union which has a history of 70 years behind it. Among its celebrated presidents the most famous are Archbishop Tait, Bishop Wilberforce, Cardinal Manning, Rt. Hon. W. E. Gladstone, Rt. Hon. G. J. Goschen, Lord Dufferin and Lord Sherbrooke. The Union is partly a literary club, partly debating society. Like all long-established institutions it has its ups and downs. The level of the debates varies but is on the whole well-maintained. A Union debate is singularly an Oxford scene. The debating-hall is large and new. At the centre of the upper end of the hall is the president's chair, on the right of which are the conservative benches, on the left, the liberal. The lower end is taken up by cross-benches which are for those who are of no declared political colour. A gallery runs above to which ladies are admitted. During the day the room is used as a reading-room but every Thursday night the newspapers are cleared away and the room rapidly fills. Then the president and other officers enter and the cries of "order" "order" are raised against the members who have not removed their hats. Before the debate there comes what is known as private business which affords an opportunity for the younger members to show off their wit. The president seriously enquires whether any honourable member has any question to ask of the officers of the Society with regard to their official duties. One member will demand, with a voice quivering with emotion when the Treasurer is going to rise to the level of the age and supply reply post-cards for the members' use. Another will suggest that the president cannot be aware that the Clock was on Monday, a minute and a half behind time. When this is over the real debate begins. The mover

of a question is allowed half-an-hour for speaking and the other members are restricted to 20 minutes, towards the end of which time a warning Electric bell is rung by the president as a hint that the speaker should bring his remarks to a conclusion. Four speeches are always arranged beforehand—those of the mover and opposer and one other speech on each side. When this is over, any body is allowed to speak, and the interest as a rule slackens. The union audience is one of the most critical to be found and no nervous or affected speaker has a chance before it. Sentiment is never tolerated and rhetoric very rarely fits in with the views of the hearers.

Till quite recently there was no direct teaching in Oxford on the subject of English literature and it was about 15 years ago that a final Honours School in English language and literature was established. So far it has not become popular ; for, the largest number of under-graduates has been six ; the women candidates are about 3 times as numerous. The lectures, however, of the professor of English literature (Prof. Raleigh) are very interesting and under his influence the school is likely to develop rapidly. Oxford has always tried to educate the taste and form the judgment in literary matters. Vast libraries lie around the student to which he may easily gain access. He hears all sorts of books talked of and criticised and soon desires to read and judge for himself, if only to take a worthy part in his friends' conversation. Thus undergraduates totally unacquainted with English literature, rapidly learn to read and admire. The tone of literary comment is perhaps too critical. If a writer has several marked defects, his possible good qualities are not thought of. A good instance of this is the low reputation which Dickens has in undergraduate Oxford. Anybody with the least turn for criticism can discover faults in every page of Dickens and thus may now speak slightingly of the author of "David Copperfield" and "Bleak House." Undergraduate wit from time to time, tries to find vent in the publication of journals and pamphlets. A journal called "The Pelican" has appeared in Corpus—the first instance of an individual college making such an experiment. Similar papers are now run by Non-Collegiate students, by Wadham, and by Exeter.

The Drama has received a great stimulus in Oxford during the last 8 or 10 years. The influence of Professor Jowett, the late Master of Balliol, who was the Vice-Chancellor was largely instrumental in effecting a change. Under his auspices a theatre was established inaugurated by a performence of "Twelfth Night" by undergraduate amateurs.

Such are the intellectual aspects of Oxford. Some are lighter and some more serious but all characterised by that which is her principal charm, the bright and many-sided play of the

newly-awakened intellect. Only let us hope that while Oxford intellectual life is made fuller, purer and more national, her peculiar excellences may not disappear.

NOTE ON THE DACCA AGRICULTURAL RESEARCH LABORATORY.

(COMMUNICATED BY S. G. HART ESQ., I.C.S.)

The Central Agricultural Experiment station for Eastern Bengal and Assam is situated about 5 miles north of Dacca on the Mymensingh Road. It consists of an estate of about 400 acres, which is being devoted to investigations in connection with Practical agricultural problems in the Province, and a Research Laboratory. The latter is situated about 300 yards from the Mymensingh Road entrance to the estate. It is a massive double-storied masonry building of red brick faced with white, and stands on a three-foot plinth, about 50 feet to rhe north of the private road through the estate, in a compound of about two acres.

On either side of the laboratory are two bungalows, 4 in all, the residences of the European Expert officers of the Agricultural Service.

The dimensions of the laboratory building, the front of which faces nearly due south, are approximately as follows :—

Length	...	...	...140'
Breadth	...	...	... 47'
Height	...	...	... 40'

A verandah runs along nearly the whole of the southern side, both on the ground floor and on the first floor, and a useful extension of the first floor verandah is made on to the roof of the porch. The north side has no verandah on either storey, the object being to interfere as little as possible with the northern light, which is so essential for laboratory work in general, and especially that portion of it which involves the use of microscopes.

The roof of the building is flat and, on it, are placed the 16 water tanks which supply the laboratory and the bungalows with water. The source of the water-supply is a large well at the back of the laboratory compound and the water is pumped from the well to the tanks on the laboratory, by means of a small motor-engine driving a centrifugal pump.

The laboratory building is divided into four sections which were designed respectively for :—

(1) The Agricultural Chemist.

(2) Economic Botanist.

(3) Fibre Expert.

(4) Superintendent of the Veterinary Department.

Of these the Agricultural Chemist and the Fibre Expert are on the ground floor, whiie the Veterinary Superinten-

dent's and Economic Botanist's sections are on the first floor.

The three first-named officers are occupying the sections assigned to them; but the remaining space has not been taken up by the Superintendent of the Veterinary Department. Two rooms of this section are occupied for office purposes, by the Deputy Director of Agriculture, and two others are used by the Entomological Collector, who is working under the supervision of the Diputy Derector of Agriculture. Of the remaining rooms two are intended to afford space for a museum of Economic products for the province of Eastern Bengal and Assam, a third will become the library, as a nucleus collection for which 150 volumes of standard chemical literature have just been purchased by a special Government grant. A fourth room has been converted into a photographic developing room.

The arrangement of the rooms in each section is similar, excepting in the case of that of the Economic Botanist, where a slight alteration has been made to suit the particular requirements of his work.

Each section of the ground floor comprises the following rooms:—

Main laboratory about	...	30 × 25 ft.
Balance-room ...	...	12 × 10 ft.
Small laboratory	...	15 × 12 ft.
Offices (a) ...	...	15 × 12 ft.
„ (b) ...	...	12 × 10 ft.
One store room ...	...	15 × 10 ft.
One godown ...	...	15 × 10 ft.

There is in addition a distillation room, used jointly by the Agricultural Chemist and by the Fibre Expert.

In the Fibre Expert's section the small laboratory is fitted up for bacteriological work.

The arrangement of the rooms on the first-floor is generally similar to that on the ground floor; excepting for the slight difference, already mentioned, in the Botanical section and an increase in the size of another room (the library), owing to the utilization of what is corridor space on the ground floor.

The erection of the internal fixtures of the laboratory, as well as the installation of the gas, and water-pumping plants was superintended by the Agricultural Chemist. Each section is fully provided with all necessary benches, fume chambers, cupboards and shelves for apparatus etc., made in teak, with brass fittings. The interiors of the fume chambers are lined with lead and efficient draught flues lead up to the open air on the roof in each case.

In the balance-rooms marble takes the place of teak for the benches, to hold the balances. For this purpose great steadiness is required and slabs of marble have therefore been let into the wall. Each slab is supported by iron brackets, also bolted into the wall.

In the bacteriological room the walls, up to a height of six feet are lined with white glazed brick; a granite bench, with a draught hood, is provided for

heat sterilizing apparatus, and the shelves and the top of the working benches are made of thick plate-glass. The object of all these elaborate fixtures is, of course, to ensure easy and thorough cleaning, as well as to afford as little space as possible for the accumulation of dust.

The distillation-room is equipped with an asbestos topped bench and a draught hood. This room is chiefly used for the manufacture of the large quantity of distilled water required, and apparatus is installed capable of distilling nearly ten gallons a day.

Gas and water pipes are laid on to every part of each room, where either is likely to be required; and provision has also been made for lighting the whole building with gas. The gas is made by bubbling a current of air through petrol, about 5% of which volatilizes, causing the mixed gas to become inflammable but not explosive. The manufacture of this form of gas is very simple and the gas provides a hot, colourless flame, which is excellent for Bunsen burners and for incandescent lighting purposes. The system however has serious disadvantages and it is not as well-suited, as coal gas, or oil gas, for all the phases of laboratory work.

It would take too long to describe the equipment of apparatus, which is not yet complete. It will suffice to say that, in each section, there is a nucleus which is constantly being added to, and which will eventually be sufficient for all the purposes of modern research in the respective branch of science to which attention is given.

The cost of the whole building, with its fixtures and equipment, is approximately as follows :—

Capital cost of the laboratory...	Rs.	1,02,040- 0
Cost of fittings for „ ...	„	33,502- 0
Water installation ...	„	14,109-10
Gas installation ...	„	8,556-10
Total ...	„	1,58,208- 4

The ultimate object to be gained by spending so much money is the improvement of the agriculture of the province, *i.e.*, to so improve either the outturn of agricultural produce, or its quality, or both as to yield an increased monetary return. Experience, not only in agriculture but in all branches of industry, has proved, beyond all possibility of doubt, thst the best way to attain this end, equally desirable from the point of view of Government as well as for the cultivator, is to make as complete a study of the subject as modern methods of scientific research will allow. Such an undertaking involves a careful study of the soil and its peculiarities and deficiencies, as well as an investigation into the possibility of improving the crops grown on it. All these points are receiving attention from one or other of the officers concerned. Very large sums of money are now being spent in all western countries, also in Japan, on Agricultural research and the results obtained, it is agreed, justify a continual increase of
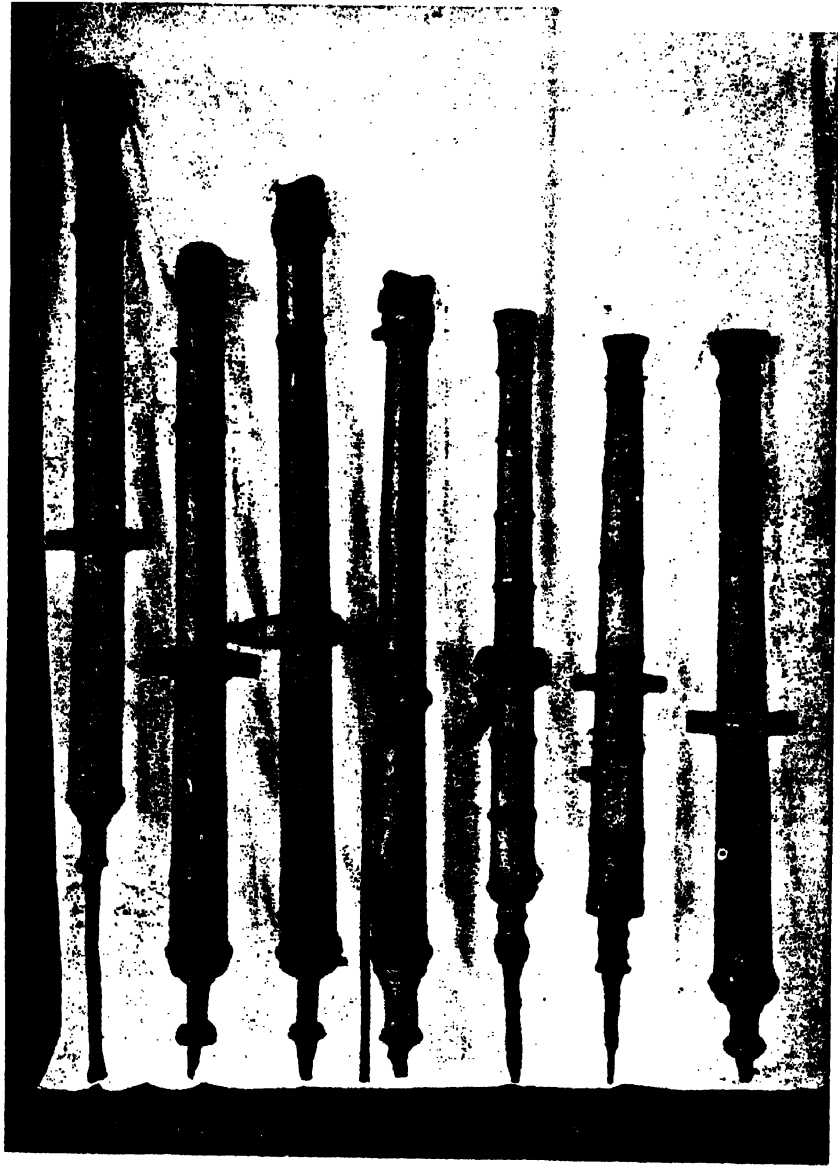
expenditure. The reason is that the amount of any one kind of agricultural produce is so great that even a very small improvement, either in a crop or in the soil producing it, means a vast return when calculated over the whole of the country. For instance, a 5% average improvement in the yield of jute, whether by the introduction of an heavier yielding variety, by better treatment of the land or, by an equivalent betterment of the quality of the fibre, would mean an annual increased net profit of about a crore of rupees to the two Bengals. Such a return, which is well within the bounds of possibility, would pay many times over for the cost of years of research.

R. S. FINLOW.

THE SEVEN SIXTEENTH CENTURY CANNON DISCOVERED IN THE DACCA DISTRICT IN 1909.

In the Journal of the Asiatic Society, Bengal for October 1909, there appeared a very informing and interesting article on the seven sixteenth century cannon unearthed, in 1909, in the interior of the Narayanaganj sub-division of the Dacca District, from the pen of Mr. H. E. Stapleton, Inspector of schools, Dacca Division. That a busy man like Mr. Stapleton should have found time, in the midst of multifarious activities, to engage in research work with so much assiduity, reflects the highest credit on him. The article which I have read with great interest, will amply repay perusal. But I am afraid I connot quite follow him in his arguments which appear to me inconclusive and which to a certain extent tend to diminish the historical value of an otherwise very readable paper.

A few words here about the cannon themselves, may not be without interest to those of my readers who have not read Mr. Stapleton's article. They are seven in number, and have been unearthed at Diwan Bagh, in the Narayanganj Sub-division of the Dacca district. They vary in length from 3 ft. 11 inches to 5 ft. 9 inches and in weight from 1 to 2 maunds. Four of them have muzzles shaped like tigers' heads. Taking the guns from left to right, the order in which they are arranged in the accompanying plate No. 1 contains the following inscription on the entire upper portion between the backsight and the muzzle :—

در عهد بادشاه عادل شیرشاه
خلد الله ملکه وسلطانه در تاریخ
نهصد چهل نه عمل سید احمد رومي
شیرشاه عادلے کاندر جهان
نام نکویش بماند جاودان

During the reign of the just king
Sher Shah
May God perpetuate his kingdom and
his rule!
Administration of Saiyid Ahmad
Rumi in the year 949.
Sher Shah the Just one throughout
the World,
May his good name live for ever."

This inscription is interesting, but not for the reason given by Mr. Stapleton in his article. He is evidently under the impression that عمل means "work" on "workmanship." I might point out that عمل never means "work" in the sense in which it is employed by Mr. Stapleton. The word means "Work" only in the sense of "deeds" e.g. عمل نیک "good deeds" عمل بد "bad deeds."

عمل means "rule," "administration" "Jurisdiction," and is in common use in Persian and Urdu in that sense e.g. فولر صاحبکے عمل میں means "during the administration of Fuller Shahib." درعمل بهادر شاه means during the rule of Bahadur Shah."

The inscription is historically important in the sense that it gives us the name of Sher Shah's governor of this part of the country in the year 949 H. 1542 A.D.) or of the head of the artillery.

Sher Shah had parcelled out Bengal into several divisions, and had placed each under a separate governor—all under the superintendence of the famous Kazi Fazilat, the Governor-General.

Saiyid Ahmad Rumi mentioned in the inscription was evidently the governor of this division in 942 H. or in charge of his artillery. عمل سید احمد رومی does not mean "work of Saiyid Ahmed Rumi" as Mr. Stapleton would make it mean, but "administration of Sayed Ahmad Rumi."

There are three inscriptions on the lower side of the gun. The first, below the muzzle, reads از فضل غازي (from Fazl Ghazi). I wonder how Mr. Stapleton could read the name of Rifat Ghazi in this inscription. The letters stand distinct for Fazl Ghazi," evidently the same of whom Dr. Wise speaks in his admirable article on the Bara Bhuiyas of Eastern Bengal in J. A. S. B. 1874, p. 199.

A word here about the Ghazis of Bhawal may not be without interest; there cannot be much that can be added to what Mr. Wise has already stated in the article referred to above. By the way, Dr. Wise appears to be wrong in calling the founder of the family Pahlawan Shah. The present representative of the family and the *Bhawaler Itihash* are both agreed that his name was Pahnun Shah.

Fazl Ghazi apparently lived in the Pre-moghul days. From a *sanad* granted by the Emperor Aurungzebe, which is now in the possession of the present representative of the Ghazi family,
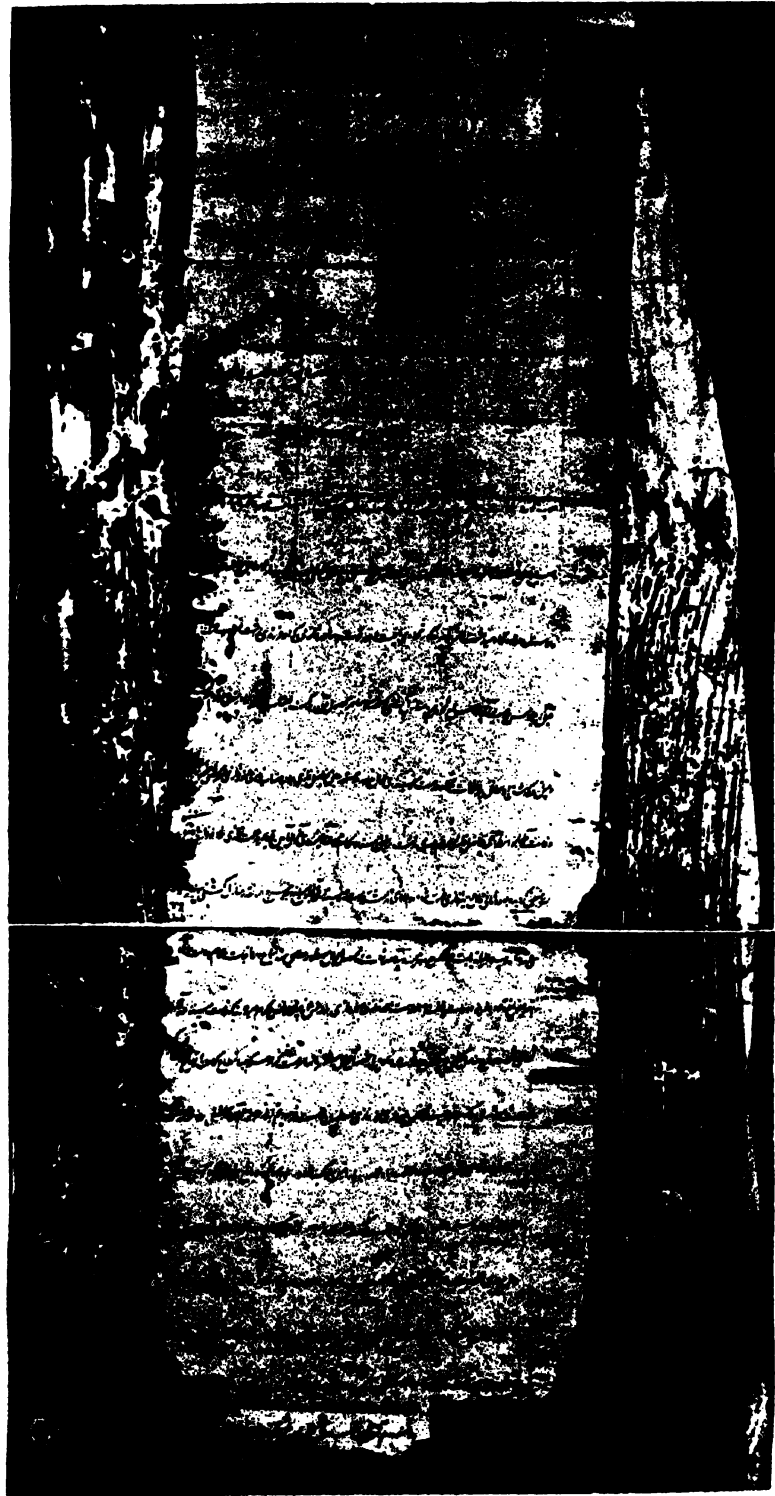
Facsimile of the Bhawal Sanad granted by Aurangzebe.

(plate II) it would appear that Bahadur Ghazi was the first to obtain settlement of the Bhowal parganah from the Emperor Akbar, on condition of keeping up for active service thirtyfive *Sundar* and *kosa* war-boats at a cost of Rs 48,379 per annum. As Bahadur Ghazi died childless, the zamindari was settled with Mahtab Ghazi, his brother. On the death of the latter, it was settled with his brother Fazil Ghazi, and his son Nur Ghazi. After the death of both of them, and Fazil Ghazi having died childless, the zamindari was given to Daulat Ghazi and Hira Ghazi, the brother and the son respectively of Nur Ghazi. Hira Ghazi died childless during the viceroyalty of the Prince Sultan Shah Shuja, when the property appears to have been settled with Doulat Ghazi, on payment annually of Rs 33,000 as *Peshkash* and Rs 10,000 as *Hissazat* besides the upkeep of the war-boats as before. In the second year of Aurangzeb's reign, on the death of Daulat Ghazi the property was settled on the above conditions with his brothers, Ahmad Ghazi and Nur Ghazi. The story of how this fine property passed out of the hands of the Ghazis into those of the present owners, is a romantic one, and must be reserved for a future article.

As stated above, Fazl Ghazi appears to have lived in the days before Akbar. Probably he was a contemporary of Sher Shah and tributary to him. The present representative of the family tells me that Fazl Ghazi lived in the times of Humayun Badshah. This supports my contention that he was a contemporary of Sher Shah.

It seems a legitimate inference that the gun was cast under Fazl Ghazi's orders, either for his own use or intended as a present to the Government, and that being a tributary of Sher Shah, he naturally put the names of the Emperor and of the governor of the Division on the top and his own name underneath.

Of the remaining guns, No. V. and VI. are similar in appearance, but differ widely from Nos. I to IV. They both measure 3 ft. 11 inches, No. V. has the following words inscribed on it:—

সবকাব শ্রীযুত ইছা খাঁ
শমসনন্দাব্বি সন হীজাব
১০০২

Mr. Stapleton appears to have misread the above inscription. He mistakes the ম after খাঁ for ব and ব্বি after দা for ফি. The old practice was to write ব where we should now use র. Many old-fashioned people even now write আল্লা as আব্বা and আলি as আব্বি. The translation of the inscription would be not "The high-born Governor I'sa Khan on the Masnad etc., as Mr. Stapleton has it, but, "The Government of Srijut Isa khan Masnad-i-Ali year of the Hijra 1002."

On page 372 Mr. Stapleton says that Man Singh had marched from Sherpur Mericha in Bogra to Egara Sindhu and besieged I'sa Khan there. But such was not the case. Man Singh had come to Dacca first. He had his camp some

three miles to the N. E. of the present temporary Government House. The place is still called Rajar Bagh. He dug a tank here, and tradition says that he consecrated it with the holy water brought from the twelve sacred streams of the Hindus. Bathing in the tank on the *Baruni Snana* days, still regularly takes place every year. A banyan tree said to have been planted by Man Singh is still pointed out (Masnad Alir Itihas page 4).

I'sa Khan had his capital at Khizirpur (modern Narayanganj). On the arrival of Man Singh he fell back on Diwan Bagh, the place where these guns were found, and where he had a fort. The first battle with Man Singh was fought here. On his defeat Isakhan retreated to Egara Sindhu, where the final battle was fought and lost (Masnad Alir Itihas page 4).

On the same page of the article Mr. Stapleton says that the titles "Diwan" and "Masnad-i-Ali" were conferred on Isa Khan by Akber, when he had appeared before the Emperor after his defeat at Egara Sindhu. This gun (No. 5), as stated in the inscription, was cast in 1,002 H., the year of the battle with Man Singh, and must have been cast before the battle actually took place. Isa Khan was taken prisoner by Man Singh immediately after the battle, in 1,002 or the following year, and was taken to Agra, where he was detained for some time. It is extremely unlikely therefore that he returned and cast the gun in the course of the same year. Besides Isa Khan was reduced to the rank of a zamindar after the battle, and as such he could not have the incentive or the opportunity for casting guns. The gun must have therefore been cast before the battle actually took place. Having nothing to do with the *Diwani*, he could not have been given the title of Diwan, and history does not record any instance of the Mughal Emperors having conferred the honorary title of Diwan on any one. The balance of probabilities therefore lies in favour of the theory that the guns were east before the battle, and that Isa Khan possessed the titles of Diwan and Masnad-i-Ali then. From Masnad-i-Alir Itihas, page 1, it appears that the title Diwan was conferred on I'sa Khan's father, Kali Das Gajdani by Bahadur Shah, the then King of Bengal, whose Diwan he was. The family still retains the title.

The title Masnad-i-Ali must have been assumed by I'sa' Khan on his declaring his independence, just as the title Hazrat-i-Ala' was assumed by one of his predecessors, Sulaiman Karra'ni'.

There is an old saying in Mymensingh, পশ্চিমে বল্লালী পুবে মসনদালি, *i.e.*, "To the west (of the Brahmaputra) is Ballal's and to the east Masnad-i-Ali's" (Mymensingher Itihas, p. 26). This also shows that I'sa Khan possessed the title Masnad-i-Ali when he was ruling as an independent ruler, *i.e.*, before his defeat at the hands of Man Singh.

(The seventh is a plain gun without any inscription. Its length is 4′-6″.)

SAYID AULAD HASAN.

THE LITTLE WONDERS.

A little more observing if we be,
In little things what wonders can we see!
It is the little sands that make the hill;
It is the little springs that oceans fill;
From banks of clouds descend the little drops
That help the earth to yield abundant crops;
It is the little flow'rs that please the eye;
It is the little stars that gem the sky;
It is the little birds' melodious songs
That lend a charm to life amid its wrongs;
It is the little baby's infant wiles
That win from harden'd lips the sweetest smiles;
It is the moon's enchanting silver light
That sets us dreaming of the joys of night;
It is the little seed that hides the tree,
More wonderful than these what might there be?
This world of ours, itself a wonderland,
Proclaims that there's a mighty skilful hand
That works these little wonders, night and day,
The gloomy thoughts of life to chase away.
We see not things we deem we see so clear,
We hear not sounds we think we hear so near;
Seek seeker, in thyself, and try to find
Thy bread in stones, and heaven in peace of mind.

BAHAR-UD-DIN AHMED

We are indebted to the courtesy of our distinguished countryman Dr. Brojendra Nath Seal for a copy of his memorable Address to the Universal Races Congress, London, which we have much pleasure in reproducing below:—

Representatives of the World's Civilisations, Old and New.

At this world congress, this epitome and image of mankind in council, I bear the greetings of the East to the West, of Asia to Europe, of the venerable mother of races to her teeming youthful progeny. Heralding as it does the cyclical return of the Orient to the Occident, of age to youth, of memory to hope, of the Past to its heritage in the Future, in one word the first faint gleams of the return of justice and peace, of Astraea and Concordia, to

these sublunar regions, the First Universal Races Congress will be remembered as a historic landmark of the completion of one cycle, and the commencement of a new. Yes, we are present to-day at the baptism of a new era, a new Humanity. We are assisting at a solemn function, the conferring of a new charter, the charter of the modern conscience, on each Race and Nation as member of the world-system. And it is the *Zeit-geist*, the spirit of the Age, that presides over this world-convention. For the modern Spirit is with us here in all its formative agencies, in all its world-building forces. Science, commerce, diplomacy, legislation, the press, world-literatures and world-languages, International Law and those Virgin Priestesses of Humanity, International Arbitration and Universal Peace, are assembled here in their accredited organs, vehicles and instruments. But not alone the Present:—Past and Future Humanity have sent their delegates to this Congress,—Shades that hover expectantly around this Council of Man, ancestral voices prophesying the Cessation of War! Clouds of unseen witnesses are round us here to-day. The ghosts of Universal Empires and Universal Churches in all human history, the ruined dreams of an Alexander or a Charlemagne, of an Asoka or an Akbar, prophetic and apocalyptic visions of the City of God, democratic vistas of a world Federation or a Parliament of Man, sung by Vates or Poets,—all the unfilled longings, all the unrealised potencies, of Humanity through hundreds of thousands of years, hail us from the corridors of the past, or the dawning vistas of the Future. From this watch-tower of Humanity, we seem to hear the measureless tread of generations behind and before, to witness the universal march and procession of Humanity, at the opening of a new era, which inaugurates the Kingdom of Man.

The broad course of evolution of Races and Nationalities, of States and Polities. in the world's history, has been always making for a goal like this. In modern times, the movement of Colonial expansion in the eighteenth century, and of the consolidation of Nationalities in the nineteenth, has been the dominating factors of the political world, its centripetal and centrifugal forces; and they have brought us face to face with a situation of grave difficulty, which, unless our disciplined humanity grapples with it successfully, threatens to end in the re-barbarisation of the world under huge military despotisms. Races, Empires, Nationalities, are in perpetual collision to-day, as the claims of each to independent conservation as well as to world-wide expansion, claims equally primary and vital, are, *prima facie* irreconcilable. How to reconcile these seemingly irreconcilable claims is the international problem of to-day. And the collective wisdom, the collective charity, the collective virtue, the collec-

tive humanity, of the world assembled in Congress is no more than adequate to point the way out of this quandary. This is the Sphinx's riddle proposed to our civilisation, our science and our conscience, which they must solve or be swallowed up in barbarism and brutishness.

Some would frankly give up the nations to perpetual strife and discord, the ruthless forces of the struggle for existence and the survival of the fittest. If Machiavelli divorced the state from the ethics of private life, his successors in our day having advanced so far as to accept national ethics, banish all this from the international arena. Others preach a universal decadence, the cult of degeneration, to which every race, the most virile, must succumb in its turn, until the Chaos of a Universal *Nirvana* is attained as a devoutly wished-for consummation. Others believe in blood and iron, in the domination of one or a few chosen races placing the heels on the neck of a supine world of imbeciles and incapables. Others again prophesy of Federations, *Zollvereins*, multiple alliances, armed neutralities, arbitration treaties, and arbitration Committees, international balances of Power, Parliaments of Man, and a hundred other projects and speculations.

Who is to be heard amidst this Babel of prophetic voices? Who or what has *the first claim to be heard?* The answer is clear and emphatic—the science and the philosophy of man. If modern civilization as I put it, is distinguished from all other civilizations by its scientific basis, the problems that this civilisation presents, must be solved by the methods of Science. The evolution of Universal Humanity through the concourse and conflict of nationalities and empires, is too vast and complex for the analytical methods of Aristotelian or Machiavellian Politics, the so-called Historical schools of Montesquieu or Vico, the arbitrary standards of the Law of Nature or of Nations, or the learned decisions of international jurists. Modern Science, first directed to the conquest of Nature, must now be increasingly applied to the organization of Society. But in this process, Science is no longer in the purely physico-chemical, or even the merely biological plane, but is lifted to the sociological and historical platform. A scientific study af the constituent elements and the composition of races and peoples or their origin and development, and of the forces that govern these, will alone point the way to a settlement of inter-racial claims and conflicts on a sound progressive basis, the solution of *many an administrative* problem in the "Composite" United States, and the "heterogeneous" British Empire, and even the scope and *methods of social legislation in every* modern State.

A dispassionate examination of the anthropological and sociological data,

from various points of view, has been systematically attempted in the papers published by the Congress, in the Volume on inter-racial Problems. Broadly speaking of the fundamental considerations bearing on these problems, three stand out as most fundamental, in a scientific aspect. These are :—

(1) The fundamental unity of the Races of man.

(2) Their existing differences, bodily and mental, with an explanation of the origin, character and extent of these differences.

(3) The possibility of indefinite development for every important ethnic division of mankind.

In this Session of the Congress, which we devote to Scientific issues, the discussion may be usefully confined to these main points.

The fundamental unity of the Races of Man (I do not mean a mere metaphysical unity such as may interest the philosopher in his closet) is claimed under the following heads :—

(1) The radical unity of origin :— whether the Monogenist or the Polygenist is correct, the first men were descended from one or more varieties of man-like apes.

(2) Fundamental anatomical physiological and biological unity. A protohuman type with primitive characters may be assumed as the starting-point, a generalized type from which all the pure primary stocks of Man may be derived by further differentiation and specialization along different collateral lines in different environments.

(3) The essential psychological unity of the Races, as established by Comparative and Experimental Psychology, and their basal spiritul unity, as established by Comparative Philosophy and Comparative Religion.

(4) The ultimate economic, æsthetic sociological and political unity of the Races of Man as forming one intra-dependent composite living organism This is established by the Science and the Philosophy of History, and is true as much in a dynamic as in a static aspect. In other words, in spite of divers ethnic developments, the general history of human culture and progress shows the unfolding of a single ideal plan or pattern. Human progress has one law, one direction, one movement, and the Races move towards one goal, "the one far-off divine event, to which the whole creation moves."

But the unity of Races is not homogeneity or uniformity. Universal Humanity, though present in each race,—is diversely embodied, reflected in specific modes and forms. And dynamically speaking, Universal Humanity is not to be figured as the crest of an advancing wave, occupying but one place at any moment, and leaving all behind a dead level. For Universal Humanity is immanent everywhere and at every moment.

This leads us to consider ths second main point— *existing differences*

among the Races. Any light thrown on the origin, character and extent of these differences will help us to see what part ethnic and national divisions may be expected to play in the future development of Humanity.

These differences are, (1) bodily, (2) mental, (3) social, including language, religion, customs and morals.

The diversity of physical types is explained through long isolation in special environments, migration, colonisation, and miscegenation. Professor Luschan thinks that all types are adapted to their surroundings ; and of thorough-bred types no one is inferior to another. Professor Lyde would ascribe differences of skin colour to climatic conditions, light, heat, and humidity. Professor Boas finds after careful investigation among American emigrants that the geographical and social environmetts influence the form of body, and the development of the central nervous system including the headform. The old idea of the absolute stability of physical types, must, he says, be given up, and with it the belief of the hereditary and immutable superiority of certain types over others. Racial mental differences are similarly the product of adaptation to different environments.

Dr. Myers's experimental investigation leads him to the following propositions :—

(1) That the mental characteristics of the present races throughout Europe are essentially the same as those of primitive communities.

(2) That such differences between them as exist are the result of differences in environment and in individual variability ; and

(3) That the relation between the organism and its environment is the ultimate cause of variation, bodily and mental. These propositions are, however, open to dispute.

Professor Fouillee points to the operation of race-consciousness and racial personality in producing a feeling of superiority and hostility, but holds that a human and social, not to say, a human and cosmic consciousness, is being generated by scientific and philosophical ideas, as well as by commerce, industrial technique and social morality and Law. As for differences in language, Dr. Margoliouth points out that a separate language is not essential to a separate Nationality, and that the world must be made bilingual before it is made unilingual. Like Language, Religion too, not only separates but also consolidates :—as a creed, Dr. and Mrs. Rhys Davids think, "religion may become racialized and intensify cleavage, but as an instinct deep-rooted in the heart, religion transcends the barriers of race and offers a bond of common aspiration." As for differences in customs and morals, Professor Sergi points out that under the collective action of heredity, sngesgestion, imitation, educability, gregariousness and sociability, the whole

psychological organism of the individual assumes the character of an automatism, and acquires psychical inertia or power of resistance to change; and that this resistance becomes much greater in a group taken collectively, varying according to the square of the mass of which the group is composed. From this acute analysis, Professor Sergi draws the momentous practical conclusions :— (1) that direct interference with the forms of social life of one people by another ought to be avoided even under the pretext of superior civilisation or superior morality, and (2) that the customs of different peoples should be respected. In fact, as I note elsewhere, the diverse ethnic types are all essential to the full unfolding of the plan and pattern of universal humanity, under our multiform geographical and historical conditions. The ideal of humanity is not completely unfolded in any race, for each Race potentially contains the fulness of the ideal, but actually or explicitly renders a few phases only, involving other aspects more or less implicitly. To trace the outlines of the Universal Ideal, we must collate and compare the fragmentary imperfect-reflections, not at all in eclectic fashion, but as we seek to discover a real species or genus among individual variations and modes. The loss or absence of a single note in this harmony would mar it fatally;—each colour is complementary to the rest; each geographical and historical environment requires its own type for perfect adaptation. The whole system of Nature, the entire process of History, would show a gap, a discontinuity, a wound, if one such thorough-bred type were suppressed or obliterated, and the recuperative processes of evolution would slowly re-evolve the type, with proper modifications, and painfully heal the wound in the centuries to come.

And this introduces me to the third issue before us,—the possibility of indefinite development for every race, even the most backward, under favourable conditions of environment, physical and social. Dr. Myers holds that, as the relations between organism and environment is the cause of variation bodily and mental, the possibility of the progressive development of all primitive peoples must be conceded, if only the environment can be appropriately changed. This proposition requires an obvious qualification, namely, that Heredity sets a limit to the amount of improvement that can be effected in each single generation. In fact, Heredity secures an 'Unstable equilibrium,' except where natural selection and the forces of environment and education co-operate for the improvement of the breed.

In my opening paper, I traverse the entire ground of Anthropology and plead for a new view of Race and Nationality on experimental grounds and data of biological, psychological and sociological Science. And I arrive

at a new view of Race, a synthetic view, which considers Race not as a statical but as a dynamical entity, plastic, fluent, growing, with energies not exhausted, but superimposing layer upon layer like the Earth, subject to the primal forces that have built up the bed-rocks in their order of sequence and distribution. This is the point of view of what I have named Genetic Anthropology. It will study Race and Racial types as developing entities tracing the formation of physical stocks or types as radicles, their growth and transmutation into cultural units (clans, tribes, peoples), and finally the course of their evolution into historical nationalities. A study of genetic conditions and causes, of the biological, psychological and sociological forces at work, which have shaped and governed the rise, growth and decadence of Races of Man, can alone enable us to guide and control the future evolution of Humanity by conscious selection in intelligent adaptation for the system and procedure of nature.

But Nationalism is only a halting stage in the onward march of Humanity. Nationalism, Imperialism, Federationism, are world-building forces, working often unconsciously, and in apparent strife, towards the one far-off divine event, a realised Universal Humanity with an organic and organised constitution, superintending as a *primum mobile* the movements of subordinate members of the World-system, each within its own sphere and orbit. Respecting each National Personality, and each scheme of National values and ideals, Universal Humanity will regulate the conflict of Nations, of National Ideal and Values, on the immutable foundation of Justice, which is but the conscious formulation of the fundamental bio-sociological law: that every National Personality (like every individual personality in the Nation) has a right to the realisation of its own ideal ends, satisfactions and values, within the limits imposed by the similar rights of others, (individualistic Justice), and also a right to co-partnership and co-operation for the common good and common advantage, (socialistic Justice), within the limits imposed by the preceding clause.

Such is the fundamental principle of International Jurisprudence. A realised Universal Human ity on this immutable basis is the goal of a Universal Races Congress like this.

A new Anthropology, a new Sociology, a new History of Racial Cultures and National Civilisations on this dynamical basis, will be quite in accord with the demands of the modern conscience and the modern spirit. For the note of that spirit and that conscience is not merely sympathy and fellow-feeling, not merely fairness and reciprocity, and equality of opportunities, but above all, a respect for Personality, for Humanity, for the Spirit. These are the ideals we reverence in our dealings with our fellowmen in

domestic, social and national life, and these must extend their sway to the international arena, where the great fight of a modern, and therefore a spiritual, civilisation is to be fought against the ape and tiger in man. But when I think of the paralysis of the conscience the palsy of the heart, that seems to have stricken us down in our cities and our marts,i n the very centre and core of our civilisation, I look round in faintness of spirit and ask—whence will come this renovated sensibility of conscience, this regenerate man, who alone can fight the forces of rebarbarisation that are fast turning whole continents into armed hostile camps. For, after all, it is neither the inexorable pitiless oracle of Science, nor the siren lure of commerce, neither the blandish ments of a sense-born Art, nor the feverish Hope of a hunger-born Socialism, it is neither cold calculating Reason, nor a paralytic Modernity, it is neither the Spirit of this Age, nor the Time-Spirit itself, that will go forth as the Knight of Humanity to redeem the nations from this bondage to cunning force and stark violence, to blind Matter and brutish Sense. It is the Spirit of Sacrifice, which makes its inexorable demand on the Nations of the Earth Yea, a greater sacrifice than that of the soldier for his country or of Woman as the mother of the Race. It is this sacrifice of Redemptive Love, that casting away National Pride and National Hate, *National Vainglory* and National Self-Righteousness, must go out in quest of a weak, an ignorant a fallen Humanity. There is no deliverance for the Nations, from within or without, except such as comes from the consciousness of a common Humanism and a common Cosmism, a sense of the Universal Procession of Humanity as an everliving symbol, an ever-fresh embodiment, of that mysterious and stupendous Life which is at once immanent and transcendent in us, is the system of Nature and the Evolution of History and which makes our finite spirits participate here and now in the Infinite and the Absolute ; before which the historic process, the historic Eternity, if I may so put it, of Man and the world, sinks into nothing, and all this fever and fret, this "Sturm und Drang" this rush and roar, of an iron-clad and blood-stained civilisation, cease in the hush of a new Dawn, the dawn of a spiritual illumination and irradiation.

Fellow Delegates ! be patient with me for a moment, as I deliver to you the message of India to this World Congress. I come from that centre of the Orient, and I would represent the genius, the intuition, the vision of the land and the people of the Himalaya and the Ganges. The harmony of the World Congress would not be complete without that note. For what does India represent ? Not Universal Empire like the Eternal City, not Universal spiritual domination like the Motor of all the Churches. *India, in the shadow of*

the · glacier-clad Himalayas, and the roar of the Southern Ocean has ever dreamt of other than a historic Eternity. India dreamt of building of the foundations of the Life Sipiritual preaching *Ahimsa*—the sacredness and inviolableness of all Life and Sentiency, not for their own sake merely, but as progressive manifestations of the Life Eternal. India sought to organize the successive stages of life as in a Social Ampitheatre, so as to lead up to the high tableland, the Sinai Peak, the rare and pure air, in which the Universal Self, the Self of all that lives and moves, reveals itself to the searching gaze of Man. That fair fabric of a Nationality on the basis of Universal Peace, peace between man and man, and between man and every sentient creature was cruelly shattered by the shock and collison of Historic forces. For it was necessary that the world should painfully learn the cult of a painful historic development from the brute to the man.

And now that we are organising the World's Peace again, on an inter-ethnic, international, historical basis, our resources are far ampler and vaster than ever before. Science, invention, industry commerce, diplomacy, alliances and arbitration treaties, the very forces of Imperialism and Federationism themselves, are working for the unification of Mankind. But behind all this pomp and circumstance, all this historic procession and panorama, there is the silent background, an invisible Humanity of the Ages, an inaccessible cosmic centre, a circumambient Unknown ;—there are the unutterable instincts of Reverence, Awe and Adoration for what is above us, the mysterious longings of Reverence, Love and Sympathy for what is below us, without which International Diplomacy and Commerce and Science would be but Valkyrian inciters to Havoc and Desolation. To this silent background points India, standing alone in the background of historic nationalities and teeming millions. From this silent background, India undergoing the Passion of Humanity through the ages in bearing witness to the life of the Spirit, calls us to the Cult of the Spirit, calls the mighty nations of the Earth to lay down their pride and hate, their sceptres and swords, and to share in the great mystery of redemptive sacrifice and the life-giving service of loving humility, in which alone Nations like individuals will find Rest and Peace.

THE DACCA REVIEW.

VOL. I. OCT. & NOV. 1911. NOS. 7 & 8.

THE PALAS OF BENGAL.

INTRODUCTION!

IT is generally stated in text-books on Indian History that the Empire of Harsavardhana was the last Empire in India before the Muhammadan Conquest. But now the question has arisen that if that is taken to be a fact, what becomes of the vast and mighty Empires of the Gurjaras and Palas? These Empires lasted for a much longer period than the Empires of the Goths or the earlier Saracen Houses. New records are coming to light every day and we are compelled to change our notions of Chronology and modify our ideas of dynasties and Empires. Jackson and Bhandarkar have established definitely the period and the locality of the Gurjara Empire. Side by side with the Empires of the Gurjaras and the Rastraketas, there was another vast and very powerful Empire well-known but little recognised. This was the Empire of the Palas in Bengal. Notices of the kings of this dynasty in contemporary records chiefly Rastraketas and Gurjaras have at last enabled us to settle the Chronology with a tolerable degree of certainty. I have endeavoured to narrate the events in Eastern India from the 8th to the 12th centuries A. D., in strictly Chronological order. The students of ancient Indian History should always bear in mind that the entire Chronology was enveloped in darkness till only half a century ago. Imagine a murky December night and the darkness being gradually dispelled by the appearance of the stars one by one. Strong rays of light at once attract attention and make the surroundings comparatively clearer. So in ancient Indian History at first the Chronology is barely intelligible, but with the gradual appearance of fresh facts a comparatively well-connected chain of events can be discerned. If some event by the merest chance throws a stronger ray of light on a knotty point, the

point itself as well as surroundings at once becomes clear and lucid It is impossible to enumerate the different theories enunciated about the Palas of Bengal, their sequence, dates, chronology, period of existence and causes of downfall. The literature on this subject is too vast and at the same time not worth quoting as it is antiquated. The advanced student who wants to probe into the origin of the facts recorded in the following pages will have to grope through the whole series of Sir Alexander Cunningham's reports and the Journals of the Asiatic Society of Bengal.

THE NATURE OF THE EVIDENCE.

WE have the following materials at our disposal for the construction of a history of the events of the Pala period :—

1. Six copper plate grants : of which five were issued by the kings of this dynasty and the remaining one by a minister of one of them.

2. Stone Inscription : A large number of stone inscriptions were incised in different parts of Northern India during the ascendancy of this dynasty. But these are for the most part of very little importance because they do not record the exploits of the kings or record their genealogy but record the name of the donors and in some cases that of the reigning sovereign. Owing to the scantiness of the material available for the reconstruction of a narrative of the events of this period, the meagre information supplied by these votive records are of great help in as much as they enable us to determine the extent of the dominions of the kings of this dynasty. This applies to all the stone inscriptions of the princes of this dynasty with the exception of Badal pillar inscriptions of Gurava Misra, the prime-minister of Narayanpala. This important record supplies us with very accurate information about the wars of the first two princes of the Pala Dynasty and their relation with their prime minister.

3. Many manuscripts within the limit of the Pala Empires found their way to Nepal and Tibet, at the time of the Muhammadan invasion of Northern India. The patient labours of scholars are bringing to light such manuscripts every day. The historical importance of these manuscripts lies in their colophons which very often contain names of the reigning sovereigns and their dates in regnal years.

4. Notices of Pala Kings or the kings of Gauda and Vanga in the records of the contemporary dynasties of Northern and Southern India,

5. Notices of Pala kings in Tibetan literature specially in the history of Lama Taranath,

II. THE INTERPRETATION OF THE EVIDENCE.

A connected narrative of the events in Bengal and Bihar under the Pala

Empire has not been written so long inspite of the existence of so many materials simply because the dates in the stone inscriptions, copper plates and manuscripts are for the most part given in regnal years and only in one solitary instance the date has been found to be given in one of the well-known Indian eras. On account of this difficulty, the Chronology and the history of the Palas of Bengal are entirely dependent on synchronisms with kings of other dynasties. Recent research has thrown much light on so many synchronisms during recent years that now it is possible to give some idea of the chronology of Eastern India during the last four centuries immediately preceding the Muhammadan Conquest.

CASTE IN BENGAL.

The concluding paragraph of Mr. McSwiney's interesting article entitled *The Census*, published in the June number of the Dacca Review, demands careful attention from all students of sociology and all friends of social well-being. The claims of individuals and communities, "including even some rather well-educated people" to be recorded as different from what they are usually known, merit careful consideration. Mr. McSwiney rightly traces the present widespread social unrest to the attempt made in 1901 to draw up a list of caste social precedence. It will be noticed that the European Sanskritists had prepared the way long before 1901 by putting forward the hypothesis that the three twice-born castes are the descendants of the Aryan invaders and the Sudras represent the conquered aborigines. This hypothesis has found its way into text-books on Indian history as a historical fact and consequently made "some rather well-educated people" of non-Brahman castes anxious to prove their non-Sudra origin.

The present social unrest is mainly confined to non-Brahman castes who are desirous of tracing their descent from one or other of the twice-born castes such as Kshatriya, Vaisya, Ambastha, or Mahisya, mentioned in the Brahmanic codes. The questions involved in these claims are questions of social history that should be dealt with, like all other historical questions, in a truly scientific spirit and without any bias. But this critical spirit is conspicuous by its absence in the *Vyavasthas* and the counter-*Vyavasthas* of the pundits and in the tracts that are being published by the aspiring castes or their opponents.

The sacred book of the Brahmans, the Sruti (Veda), Smriti (Codes), and the Puranas are the main, if not the only, sources of information for the early history of castes. But a wide gulf separates the castes and systems as described in the *Sastras* and as it now exists, an overwhelming majority of the names of modern castes being absent

from the old lists on the one hand, and many of the castes, named in those lists being actually non-existent on the other. This fact is thus explained by Raghunandan in his Suddi-tattwa. "The Kshatriyas also of modern times have turned into Sudras.........On account of the abandonment of the rites the Vaisyas and so also the Ambasthas have degenerated into Sudras." Roghunandan is not alone in holding this view. Madhova, who flourished more than a century before Raghunandan, writes in his Commentary on Parasara Smriti, "the Kshatriya and Vaisya castes have altogether disappeared," but does not quote chapter and verse in support of his opinion. Kamalkara Bhatta, who wrote about a century after Raghunandan, in the concluding portion of his *Sudra-Dharma-Tottwa*, better known as *Sudra-Kamalakara*, endeavours to prove by pressing into his service several texts from the Puranas, that there are no Kshatriyas and Vaisyas in the *Koli Yug*, although there are Brahmans and Sudras, but fails to cite a single text that plainly says so. This is done by a grammarian, Vaidyanath, the author of the commentary on Mahabhashya-prodipadyotu of Nagoji who writes :—

"কলৌ ন ক্ষত্রিয়াঃ সন্তি কলৌ ন বৈশ্য জাতয়ঃ
ব্রহ্মণাশ্চেব শূদ্রাশ্চ কলৌ বর্ণ দ্বয়ং স্মৃতম্" ॥

(ইতি স্মৃতিঃ)

"In the Koli age there are no Kshatriyas and Vaisyas ; it is said that there are only two castes, Brahmans and Sudras, in the Kali age." So runs the the Smriti text.

Both Roghunandan and Kamalakara were groping for such a text and had it been known at the time when they wrote they could hardly have failed to quote it. The origin of this text throws curious side-lights on the history of the sacred books of Brahmans.

The social organisation of most provinces of Northern India—the Punjab, Kashmir, Gujrat, Rajputana, the United Provinces, Behar, and the Hindi-speaking areas of the Central Provinces is at variance with the practice of social life in Koli age given by these writers. These provinces are the home of the Rajputs who are recognised as the modern representatives of the ancient Kshatriyas and of trading castes who consistently follow usages laid down for the Vaisyas. But in other provinces of India, in the South and in the South-east, the structure of society nearly agrees with the description given by Madhova, Raghunandana, Kamalakara and author of the stanza quoted by Vaidyanath. The Marathas of the Deccan have not yet succeeded in obtaining universal recognition as Kshatriyas, though they have been persistent in their efforts since the time of Sivaji's grand-son Shahu. As regards the the Madras Presidency Mr. Francis writes in the report on Madras Census of 1901, "strictly speaking, there are very few persons who have any real title to name, and it has been returned mainly

by the Pallis or Vanniyas of Vizagapatam, Godavary and Chingleput, who say the are Agnikula Kshatriyas, by the Shanans of Tinnevelly, and by some Mahratis in south Canara. In Tinnevelly, Kammans and Balijas have also retained the name."

The same authority writes about Vaisyas in Southern India, "It is doubtful whether there are any true Dravidian trading castes (with the little Chetti), notably the Komatis, are treated as Vaisyas by the Brahman, though the latter do not admit their right to perform the religious ceremonies which are restricted by the Vedas to the twice-born, and require them to follow only the Puranic rites. The Muttans (trading caste in Malabar) formerly claimed to be Nayars, but they recently have gone further, and some of them have returned themselves as Vaisyas and added the Vaisya title of Gupta to their names. They do not, however, wear sacred thread or perform any Vedic rites, and Nayars consider themselves polluted by their touch."

Society in Southern and South-eastern India is orgainsed mainly on the two-fold basis of Brahman and Sudra without considerable bodies of Kshatriya and Vaisya. Almost all the great dynasties that held sway in Deccan, the Andhras, Chalukyas, Rastrakutus, and Yadavas asserted Kshatriyahood either by performing great sacrifices or claiming descent from the sun or moon. The Chola Kings claimed to be Kshatriyas of the solar race and the Pandya kings of the lunar race. In Bengal the Pala Kings were recognised as Kshatriyas of the solar race and the Sena kings Kshatriyas of the lunar race from Karnata. Coming to our own time, the ruling families of Mysore, Cochin and Travancore are recognised as genuine Kshatriyas, and Maratha Brahmans admit the Kshatriyahood of the ruling Maratha houses and perform their ceremonies according to Vedic texts.

The practical absence of Kshatriyas and Vaisyas in the South-east and the South is not due, as Raghunandan would have us believe, to the abandonment of rites and usages that were never abandoned in the north, but to the ethnical difference of the bulk of the inhabitants of these regions from the so-called Aryas of Aryavarta where the caste system originated. The Kshatriya and Vaisya rites never obtained general acceptance in the South-east and the South. Brahmanic scriptures from the Vedas downward lend indirect support to this conclusion. In the Vedic literature, even in the latest works of that group, the Upanishads, the land of the Videhas (Modern Tirhut) is fixed as the south-eastern boundary of Vedic India, and natives living beyond are only occasionally mentioned with contempt. Thus in the Atharva Veda (5,22/4) of takman or fever we are told, "To the Gandharis, the Mujavants, the Angas and the Magadhas we deliver over the Takman, like a servant, like a treasure." In the Ai-

tareya Brahman (7, 18), the Pundras, after whom Northern Bengal was named and the Andhras of the south are mentioned along with the Savaras and the Pulindas of the Vindhyas as barbarians, Dasyus, living beyond the pale of civilisation. In the Aitareya Aranyaka (2. 1. 1.) the Bangas are included among three classes of creatures who do not follow the Vedic religion. These texts go to show that during the Vedic period vedic culture had not made its way to south Behar,* Bengal, and Deccan. It was evidently owing to the prevalence of Non-vedic culture that in the Smriti literature migration to these countries is strictly forbidden. I have already referred to some of these texts in an article (*Gauda and Kamrupa*) published in the April number of the Dacca Review. Vedic civilisation made its way to these outlandish regions in the post-Vedic or Buddhist age when the Vedic sacrificial religion had lost its hold on the common people. While therefore, with the advent of Vedism the priesthoods of Bengal and Deccan organised themselves on the Vedic model and formed the Brahman caste, the laity, evidently under the influence of the Non-Vedic or Anti-Vedic religions, remained outside the pale of Vedic sacrificial religion and did not accept Upanayana or initiation into Vedic rites and studies.

The existing structure of society in South Behar and Guzrat, shows, that though originally lying outside the pale of Vedic Varnasrama civilisation, these provinces have subsequently been totally moulded in the Hindustani model with castes representing not only Brahmans but also Kshatriyas and Vaisyas owing to migrations from the north. In Bengal alone, survive social institutions that in their outline bear greater resemblance to those of the various divisions of Southern India than of the neighbouring provinces of the north. The Dravidian Speech of the inhabitants of Southern India shows that at one time they were casteless and they adopted Varnasrama at a time when it was profoundly modified by non-Vedic religions. The survival of the marriage of maternal uncle's daughter among the Desharth and Karhada Brahmans and of the worship of the totemistic *kula Devaks* among the Marathas, who are Aryans in speech, also points towards the same conclusion, and indicates that the nucleuses of the different castes in the practically Kshatriyaless and Vaisyaless Bengal were formed by people who were originally casteless and adopted the caste-code at a time when the Vedic sacrificial religion was on the decline.

Thus a comparative study of the social orders of the different provinces of India, as well as the evidences of Sruti and Smriti, converge in indicating that we can not look for the modern representative of not only the Kshatriya, Vaisyas, Ambastas, and Mahishyas, but also of the Sudras mentioned in those texts, among the non-Brahman castes of Bengal. But

society in Bengal is no longer disposed to stand still but is pervaded by a strong desire for change.

Now the question is, what should be the attitude of the Census authorities towards these new social movements. The present attitude is thus explained by Mr. McSwiney "They (the aspiring castes) forget that the days of king Ballal Sen are past and that the object of the Census is to record facts as they are, whether these facts are fair or otherwise to individuals. They also forget that reading back into history or to the Shastras will not altar the facts of the present day and that claims to be descended from Kshattriyas, for example can not be accepted unless Hindu Society of now and to-day recognises, the persons making the claim to be Khattriyas now and to-day." (p. 75). I am afraid "The claims to be descended from Kshatriyas" cannot be accepted as valid even if "Hindu society of now and to-day recognises the persons making the claim to be Kshatriyas now and to day," for the question of descent is a question of history which can be solved by historical research and not by vote. But leaving the question of descent apart, if a community chooses to adopt Kshatriya usages and rites, it is at liberty to do so provided it can get Brahman priests to initiate its members into Kshatriya rites, and the Hindu Society of to day can not prevent it from doing so by withholding its recognition. As for the Census authorities, where the society is stationary, they have got nothing more to do than "to record facts as they are." But when society is in a state of transition, the Census should also record changes or facts *in being* along with facts as they *are*. India owes it to the rest of the world not only to provide an account of the caste system as at rest but also as in motion when it is actually undergoing changes.

RAMA PRASAD CHANDA.

THE SIMPLE LIFE.

The identification of higher civilisation with a complex life is a familiar modern phenomenon. Journalists proceed upon this assumption, orators take it for granted that the one connotes the other. And by complex life they usually understand, not the intricate evolution of mind and thought and feeling, but the multiplication of material needs and the means of satisfying them. The immigration of Indian labourers and traders into the colonies is resented on the ground that their simple needs betoken a lower civilisation, though they are admittedly temperate, sober and industrious. The white settler fears, or professes to fear, that the coloured immigrant will drag down his white neighbour to his own lower plane. It is time that this false standard of

judgment which confuses civilisation, essentially a condition of the mind and the spirit with external material possessions, should be exposed. Again, England, the wealthiest country in the World, now rules over our destinies. The luxurious and costly style of living adopted by Englishmen in India has found imitators not only among our noblemen but also among the middle classes many of whom have imbibed the fashion of living beyond their means. It is necessary they should know what thinking men of the most highly civilised western countries are saying of the mad craving for worldly possessions which characterises the West.

The tocsin has been sounded in the very centre of modern civilisation—Paris by a writer named Charles Wagner, whose recently published book on "The Simple Life" * we cordially recommend to Indian readers. In the past, India has always been the land of plain living, and the exhortations of this Parisian author appear to an Indian like the sayings of one of her ancient Rishis come to life again. It is a common place of philosophy that the conscious pursuit of happiness never yields happiness. The Hindu sage truly says that desires are never appeased by their satisfaction, and that he who wants to be happy must learn to control his desires. This is the same thing as to say that happiness is in the mind, and not in outward objects. He who has a hundred, wants a thousand, he who has a thousand, wants a million, and so on, says another Hindu sage. As soon as the object you were hankering after is gained, your satisfaction ceases, and you crave for more. To control your desire for material possessions, that is to say, to live a simple and plain life, is therefore the only means of attaining that peace of mind without which high thinking becomes impossible. Hence plain living and high thinking have always been associated together, and all the great minds of the east and the west illustrate the truth of this association. Prince Siddhartha had to abjure his throne and take shelter under the Bodhi-tree before he could become enlightened and propound his high philosophy. Mahammad was a child of the desert, the Son of Man did not know where to lay his head. The philosophers, scientists and poets who are noted for their depth of thought and breadth of vision have all led austere lives, communing in their lonely heights with their own self and Nature.

The means and forces which science has placed at our disposal for sustaining and defending our material life should have resulted in an increase of independence and therefore of happiness and a decrease in competition for worldly goods. The justification of all modern labour-saving inventions is that through the simplication of life brought

* Translated from the French by Marie Louise Hendee. London: Sir Isac Pitman & Sons, Limited. *1911.*

about by them, a higher degree of morality would be made possible. But, says M. Wagner, 'none of these things have come to pass.........Never has the question of food and shelter been sharper or more absorbing than since we are better nourished, better clothed, and better housed than ever.' You must go among those who are beginning to enjoy a little ease to learn how greatly satisfaction in what one has may be disturbed by regret for what one lacks. And if you would see anxious care for future material good—material good in all its luxurious development——observe people of small fortune, and above all, the rich. The more assured is a man of the morrow, the more exclusively does he concern himself with how he shall live and provide for his children and children's children. All the hampering futilities of our unprofitable life, under pretext of increasing our comforts, have ended by shutting out our sun. Our physical needs have become like parasites, they live at our expense and engross us completely, thus enslaving our moral nature, whose growth is the chief factor in the progress of human civilisation.

The lesson which M. Wagner is never tired of preaching is that the worth of a civilisation is in the worth of the man at the centre, and not in any external environments. 'We are men and citizens, not by reason of the number of our goods, but by virtue of the strength of our moral fibre.' 'The important thing at the centre of shifting circumstances is that man should remain man.' We are loaded with external goods, and miserable in spiritual life; we have an abundance of that which if must be, we can go without, but are infinitely poor in the one thing needful. We confuse the secondary with the essential. Material well-being is the outward frame of civilisation; but the frame no more makes the picture than the frock the monk or the uniform the soldier. 'Here the picture is man, and man with his most intimate possessions,—namely his conscience, his character, and his will. And while we have been elaborating and garnishing the frame, we have forgotten, neglected and disfigured the picture. What shall it profit a man if he gain the whole world and lose his own soul?

We consider education to be the panacea for all evils. But education is merely a tool, it is good or bad according to the use to which it is put. Education which is mercenary in its scope and aim, which is directed towards the improvement of our material condition, enkindles vain ambition and luxurious desires. It makes us self-centred. Egoism grows more maleficent as it becomes more refined. Do not the very sinews of virtue lie in man's capacity to care for something outside himself? By education is often understood the outward customs of life, the style of house, dress,—an education which is only skin-deep. If it makes you dislike the duty

which lies nearest to hand, ashamed of the honest and useful work by which your father used to earn his livelihood, disdainful towards your humble relations, and disdainful to open your purse-strings for them, it is indeed a soul-killing education. Much of the aversion which conservative people entertain towards our modern university education is due to its purely mercenary character. Consider the life of self-abnegation led by the best type of our Pundits even to-day—how few their needs, how full of contentment they are, how ready to spend their all for the benefit of their poor relations. It would be easier to find out a student of European philosophy who has gone astray than an Indian pundit who can be accused of leading an immoral life. It is in the spirit of course to suit modern needs, that all true education should be conceived and organised.

We should cultivate greater simplicity of speech if we want to lead a simple life. 'In politics, finance, business even in science, art, literature and religion—there is everywhere disguise, trickery wirepulling; one truth for the public, another for the initiated. The result is that every body is decided." Truth-telling is at a discount in civilised society, language is regarded as an art to conceal rather than to express one's thoughts. The weakest cause is buttressed up by sophists, casuists and quibblers to gain some ulterior object. The conventions of conversation in civilised society are such that honest speech has become well-nigh imposible. Sincerity, moderation, and simplicity in the expression of one's feelings is regarded as unfashionable. Superlatives are flung about with the utmost freedom, without evoking any corresponding intensity of feeling in the mind of the speaker or the listener. Our overexcited nervous systems require the shock of strong speech to rouse them from their torpor. "In private life, in public, in books, on the stage, calm and temperate speech has given place to excess." We should learn to cultivate the golden gift of silence, for those who make the least noise generally do the most Work.

Pleasure and simplicity are two old acquaintances. We must not confound pleasure with the instruments of pleasure. One cannot buy happiness. To be happy, one needs the faculty of being happy. Whoever possesses it is amused at slight cost. This faculty is destroyed by artificial living and excessive indulgence, and fostered by moderation and normal habits of thought and action. Order your life so as to keep, amid toil and suffering, this faculty of happiness. "Wherever life is simple and sane, true pleasure accompanies it as fragrance does uncultivated flowers. Be this life hard, hampered, devoid of all things ordinarily considered as the very conditions of pleasure, the rare and delicate plant, joy, flourishes there." Take, for instance, the case of the simple rustic who visits the theatre.

" Ask actors what audience is happiest at the play; they will tell you the popular one. The reason is not hard to grasp. To these people the play is an exception, they are not bored by it by over indulgence. And then, too, to them it is a rest from rude toil. The pleasure they enjoy they have honestly earned, and they know its cost as they know that of each *sou* earned by sweat of their labour. More, they have not frequented the wings, they have no intrigues with the actresses, they do not see the wires pulled. To them it is all real. And so they feel pleasure unalloyed. I think I see the sated sceptic, whose monocle glistens in that box, cast a disdainful glance over the smiling crowd. " Poor stupid creatures, ignorant and gross !" And yet they are the true livers, while he is an artificial product, a mannikin, incapable of experiencing this fine and salutary intoxication of an hour of frank pleasure.

The author puts in a strong plea for home-life and family feeling. 'To give up the ancestral hearth, to let the family traditions fall into desuetude, to abandon the simple domestic customs, for whatever return, is to make a fool's bargain.' One can derive one's originality only from one's own family, and deprived of originality, society becomes a mere flock. Destroy the assemblage of memories and practices whence emanates for each home an atmosphere in miniature, and you sap up the sources of character. All those fine and simple virtues on which depends the strength of social institutions lie in germ in the family. At the very base of family feeling lies respect for the past; for the best possessions of a family are its common memories. 'An intangible, indivisible and inalienable capital, these souvenirs constitute a sacred fund that each member of a family ought to consider more precious than anything else he possesses.' But now-a-days, in the West, few people like to stay at home—— there is the appointment at the club, the play and the races. The home thus becomes a sort of half-way house where one comes to rest a little between two prolonged absences. There are others who have a rage for going abroad. The horror of homelife possesses them to such an extent that they would rather pay to be bored outside than be amused gratuitously within. In this way society slowly gravitates towards life in herds, where all resemble one another and banality reigns supreme. The remedy is to learn to live the homelife and value our domestic traditions. 'Let us light again the lamp put out on our hearths, make sanctuaries for ourselves, warm nests where the children may grow into men, where love may find privacy, old age repose, prayer an altar, and the fatherland a cult.'

It is a common error to think that simplicity and lowly station, plain dress, a modest dwelling, poverty——these things go together. Livery counts for nothing: we must see the heart.

Simplicity is a state of the mind. A man of slender means who is consumed with the desire of getting rich, and who keenly feels his want of the good things of the earth, cannot be said to benefit in the least from the simple life he is forced to live. Luxury in the rich has its uses——it is said to be the fostering mother of arts and of the graces of civilised society. It is selfish use of wealth that is objectionable. The quest of the superfluous by those who have the greatest need of taking thought of the necessary, the love of sumptuous living on the part of those whose means are limited, which is so general a characteristic of our times, is what is deplored. Simplicity is not synonymous with ugliness, anymore than sumptuous, stylish, and costly is synonymous with beautiful. Artists have admired the simple decorations of a Japanese house, and observed a decadence of culture and taste in the innumerable *bric-a-bracs* with which an European drawing-room is filled, reminding one of nothing so much as the showroom of a miscellaneous fancy goods shop. Even wealthy men may be simple and at the same time have beautiful appointments. In India, says the late lamented Sister Nivedita, the simple life of the commonwealth as a whole, and not the artificial and luxurious routine of courts, has always been regarded as the norm of society. The noble master of a beautiful Indian mansion, dressed in a piece of simple *dhoti*, is accessible to all. The rich lady in India is distinguished from her humbler sister only by the jewel on her neck,——like her, she cooks for those near and dear to her, takes pleasure in feeding them with her own hands, and in nursing her children. That is an ideal well worth preserving, for to employ one's wealth, as in Europe, in substituting the service of love by paid and mercenary service is to deprive oneself of the poetry and joy of life. Women know how to put witchery into a dish, heal an wound with kindness and love. It is a truly feminine art to give a soul to things which have none. She knows how to give her home a dignity and an attractiveness that the dwelling of princes, if everything is left to mercenaries, cannot possess. To put a soul into the inanimate, and to give to the spirit of things those subtle and winsome outward manifestations to which the most brutish of human beings is sensible, is her peculiar province. To be one's real self, and to realise in one's natural place, the kind of beauty that is fitting there——is not this better than to covet what one has not and to give one's self up to longings for a poor imitation of other people's finery?

India has in all ages been more immune than other countries from the pride of wealth. The caste system which compels the master of millions to sit at dinner with a starveling and marry his daughter to a humble neighbour, and a certain deeply ingrained

sense of the vanity of all worldly possessions, have largely contributed to bring about this result. In the West, "society" is made up of big fortunes, the middle class of medium fortunes; then come people who have little, then those who have nothing. 'All intercourse is regulated by this principle. And the relatively rich man who has shown his disdain for those less opulent, is crushed in turn by the contempt of his superiors in fortune. So the madness of comparison rages from the summit to the base. Such an atmosphere is ready to perfection for the nurture of the worst feeling.' This feeling manifests itself in violent protests, such as nihilism and anarchism. There is a certain delicacy in not making contrasts too marked. The harshness of the fact may often be softened by the spirit. This is forgotten by most wealthy men. Suppose there is nothing wrong in enjoying a large superfluity. Is it indispensable to display it, to wound the eyes of those who lack necessities, to placard one's magnificence at the doors of poverty? If the rich are wanting in this tact, should they complain of envy, after having done everything to provoke it? They complain that respect is diminishing. But they forget that the only true distinction is superior worth—a proposition the truth of which has been brought home to the meanest intelligence in this democratic age. So it comes about that those who demand the most homage make the least effort to merit the homage they demand That is why respect is diminishing.

The author winds up with a few words regarding the right education of children. If it is a mistake to bring up our children as if they were a part of our property, to gravitate round us by the suppression of all their individuality and to grow up as our exact prototypes, leading a life of perpetual minority without ever being able to think for or take care of themselves, it is a mistake not less grave and serious to bring them up in the exactly opposite way, entirely for themselves, as if they were the hub of the Universe, a law unto themselves. Parents, teachers, servants, everybody is at the command of such a child. He accepts the homage and even the immolation of his neighbour as his due; he treats like a rebellious subject any one who does not step out of his path. Too late we find that we have evolved a master, incapable of sacrifice, without respect, even pity. It is a grave error to suffer little children to treat the servants without due respect. The cultivation of this form of pride, which finds pleasure in humiliating the humble, is responsible for a crop of evils in mature life. The Indian custom of calling an elderly servant not by his name but by some title indicative of kinship should not be allowed to decay. Though your wealth would permit you to dress your children richly, remember the evil you might do by exciting their

vanity and increasing the distance which already separates them from other children. Make them understand that distinction lies in worth and not in dress. How dangerous to accustom your children to a style of living beyond your means and theirs! It develops a contemptuous feeling in the very bosom of the family. Any fashion of instructing children whose obvious result is to lead them to despise their parents and the customs and activities in the midst of which they have grown up is a calamity. With the idea of making life pleasant for their children some parents bring them up in habits of sloth and idleness, accustom them to sensations not meant for their age, multiply their parties and entertainments,– sorry gifts these. In place of a free man you are making a slave. In some capital encounter of life, he will sacrifice manly dignity, truth and duty from sheer love of ease. A too easy life brings with it a sort of lassitude in vital energy. One becomes blase, disillusioned, an old young man, past being diverted. Let us therefore bring up our children simply, almost rudely. Let us entice them to exercise which gives them endurance—even to privations. 'So we shall make men of them, independent and staunch, who may be counted on, and who will have withal the faculty of being happy.'

THE UNIVERSITY LIFE.

(A Contrast. Read before a gathering of the Northbrook Hall Society, Dacca.)

Sometime ago I was reading the speech delivered by the Hon'ble Mr. Justice Stephen in connection with the Thackeray Centenary. In that speech he made use of an expression which, I find, accurately describes the fare which I am about to set before you this evening: the expression is—"thrice-served cabbage"!

My present lecture is "*thrice served cabbage*"; and I could have had no justification for placing such fare before you if I had not had the assurance of the Director of Public Instruction,—who has done me the singular honour of inviting me to address you to-night,—that a lecture on the subject would interest you. The subject is one which can be repeatedly served,—more than three times,—without rendering it noxious; but I am trembling at the thought that I might prove a bad server. I have, however, no choice but to submit to the command of my superior, hoping that the importance of the subject itself will enable you to overlook the shortcomings of my efforts to serve you.

When a young Indian goes either to Cambridge or Oxford, he is most forcibly impressed by a thing the like of which he has never seen in this country, *viz.*—the University Life. There is *all* life at an English University and *no* life at an Indian University! To some of you

this may sound a bold assertion, if not a pure misrepresentation of facts; but I propose to give you an account of my own experiences at Cambridge and show you by contrast what life there is at an Indian University; you will then judge whether my assertion is correct or not.

Cambridge is essentially a University town. The local jurisdiction extends over a circle the radius of which is only a mile and a half. Within this comparatively small area, there are 19 Colleges, the earliest of which was founded in 1284 and the latest in 1884, covering a period of 600 years in the course of the development of the University.

The College which I joined, was founded in 1584, just at the middle of this period. In the course of the first 300 years 14 colleges came into existence which were followed, in the next 300 years, by 3 colleges and two Hostels, these latter having gradually developed into colleges during the last 20 years of the 19th century. It may interest you to notice here that my college was the first college of Protestant foundation,—all the earlier ones having originally been founded for the propagation of Roman Catholicism. Religious differences are no longer the distinguishing features of the colleges at Cambridge; but originally they were the basis on which the colleges were founded; and each college had some religious ideal for its foundation. There are some colleges which still object to admit non-Christians. In modern times religious ideals have been gradually giving way to secular ones; but a college without an ideal, whether religious or secular, is a thing unknown at Cambridge; and what I say about Cambridge equally applies to Oxford. I should particularly wish you to bear this in mind as I shall have occasion, later on, to refer to Indian Colleges which are without any ideal.

After having given you the above brief outline of the existence and development of the University of Cambridge, I will now proceed with my subject.

I arrived at Cambridge in the third week of one September; the annual session does not commence there till about the 10th of October, after a long midsummer vacation which entirely covers the months of July, August, and September. Do not for a moment believe that the summer vacation is needed there because it is too hot for work! But it is given because the summer is the best time in Europe for the enjoyment of life out of doors: it is the time when one can recoup one's energy, lost by incessant indoor occupations during the long winter months, (and winter is pretty long there!) when out-door occupation is rendered impracticable by the dreariness of the weather: it is the time when people move about and travel to gain knowledge of the world; and, to sum up, it is the

time when a student can go abroad and verify his learning by observation of facts, both in Nature and in Art! Students visit Italy, Greece, Egypt, and various other places of historical and classical interest: Some even go the length of climbing the Alps, all for the purpose of getting rid of the stiffness of body as well as of mind, which is the inevitable consequence of "minding one's book" too much.

The University and the College Examinations are all over before the end of May, and all the annual functions of the University (such as Convocation, etc.,) come to a close before the third week of June; so that the long vacation becomes a period of real enjoyment of life *outside* the university! I say 'out side' because the University Regulations prohibit one's living *in* the university-town during this period without a very special permission of the authorities of his college. There is a vulgar expression applied to men who do not take advantage of this opportunity of expanding their minds, but, on the other hand, utilize their vacation for reading their books: they are said to "work like a nigger.'.

It was more than a fortnight before the end of such a long vacation, that I went to Cambridge armed with a letter of introduction to the Tutor of the College which I joined afterwards. I was cordially received, and was invited to stay in the College for 3 days, with a view as the Tutor put it, to making my acquaintance. I found several other candidates for admission there, who had been invited like myself to come up and stay at the College and, incidentally, to be briefly examined for a test of fitness for admission. Here I must mention that there is no University Matriculation or (Entrance) Examination either at Cambridge or at Oxford: the test of a student's suitability for matriculation at the university is left entirely to the colleges, the authorities of which will invite an intending candidate before the commencement of the session, make his personal acquaintance, test his capabilities, and, on approval, admit him as a member of the College; and then on a fixed day during the first month of the session, present him personally to the university. A student thus presented has to sign his name *with his own hand* in the University Register at the Senate House :— *this* is called Matriculation! Here you notice that the University admits you as a *person*, ushered in and introduced by a tutor who is supposed to have made your previous acquaintance, and recognised the existence of of a life which he could mould: the matriculation at an English university is a *real ceremony!* it is a ceremony which (including the preliminary Examination) pertains to the college which a candidate is going to enter, and not to the school from which he had come!!

Look at the contrast at an Indian

University : here you send up an application from a school *on a piece of paper*,—the university comes to know you as mere *name* : you are then examined (*by means of paper*) by a set of examiners whe come to know you as a mere *number* : and then you are "matriculated" with *a piece of paper* ! The whole "maternalization" of the university is performed by means of *pieces of paper*, which can hardly be calculated to bring forth life ! There is no more pitiable sight than a matriculated student of an Indian University sent adrift into the world, with *a piece of paper* certifying that he has passed the Entrance,—but entrance to what ? In truth, he looks like a child who has been forsaken by his mother *at his birth*, with a parchment tied round his neck testifying to the identity of his cruel and unnatural mother !! Some go adrift never again to be recognised by their mother who matriculated them ; others go to seek admission into a college which is given no choice but to admit them, because, forsooth ! they present themselves at the door of the college with a piece of paper as their certificate of Entrance ! Thus you observe that an Indian university, on the pretext of becoming your mother by matriculating you, instead of giving birth to a life in you, begins her maternal functions in a way which is no more, no less than a *paper-currency* business : there is no life in the transaction !!

At an English university, by matriculation you become a *member* of the university, as by admission you become a member of a college : matriculation is always a sequel to your admission to to a college, where it is that you first appear as a living personality, and not as a mere name or number, nor as a piece of paper ! In the college, there is an officer called the Tutor who with paternal care looks to your wants by making necessary provision for your living, guides you by advice, and generally conducts you through the labyrinth of a mass of rules and regulations: he selects the lectures which you should attend and the subjects and courses which you should take up, and occasionally advises you to change your course or subject if he finds you unfit for it ; he will send for a doctor when you are ill, and do various other things which your own father would have done for you if you had been at home. In the college the Tutor will keep you within the bounds of the University Regulations and outside the college you are watched by the University authorities ; daily, after sunset, University patrols, headed by officers called Proctors, parade through the town to see that you do not so behave in public places that your behaviour might be regarded as derogatory to the position and dignity of a member of the university. It is thus that a student begins his life as an undergraduate at a University !

Every member of the university whether he is a student or a teacher, must

dress in a peculiar cap and a gown, in order to distinguish him from an ordinary citizen of the town. Different colleges put different distinctive marks on the gowns of their undergraduates These robes must be put on when going to lectures or to dinner ; they are invariably put on every day when going to out in the streets after sunset, and throughout the day on a Sunday or any other religious holiday. Students are punished with fines for violating these regulations, and also for doing such things, while *in* cap and gown, as are considered unworthy of the dignity of a university man : for instance a student is fined for smoking in cap and gown.

One of the rules requires that every student must have his daily dinner in the common Hall with all the other members of his college : in fact his attendance at the dinner table is of greater consequence than his attendance at the lectures, in so much that absence from the *dinnertable* for more than two days in any week, no matter how reasonable the cause of absence may be, will disqualify the student from counting that week for his residence at the University. You may think that the origin of this regulation of compulsory dinner lies in the inordinate partiality of an Englishman for his *dinner* ; but be assured that the regulation has got a great educative value. It is much easier to maintain discipline in a class-room than in a dnining-room, since people become more free in their behaviour at dinner than in a class-room. The object of the common dinner is to teach, what I may call, the "discipline of freedom", which can only be learnt by examples and not by precepts : teaching, by example, of the correct rules of conduct is of immense importance in the formation of of character. Moreover, compulsory dinner waits for nobody ; courses come and go in succession but if you are not there when and as they come, you have to do *without* them when they go. No excuse is accepted for being late at dinner : one has merely to take one's chance of catching any of the courses before it is gone ; and if he is too late to catch any, he misses not only his dinner but also a day's attendance in addition to it. Thus you will observe that the life one leads is of greater consequence at an English university than mere attendance at lectures and the passing of the examinations. No one can take his Degree without being in residence at the University for a prescribed number of terms, although he may have passed his examinations much sooner. Even the "non-collegiates" have also to count their residence by their presence in the town. But, in all cases, residence is more essential for a Degree than mere passing of an examination.

Residence is an essential part of a student's career at an English University. Every undergraduate must live within the precincts of the University,

which extends, as I have said before, over a circle of a mile and a-half radius: even a private student who does not wish to join a college, but wishes to go up for the University examinations, must go and reside within the jurisdiction of the University, under the title of a "Non-Collegiate" student. There is a Board appointed by the University to look after such students, take their daily attendance, and supervise them generally. Thus it will be observed that the essential part of the constitution of a University is that all its affiliated colleges must be within its precincts, and all members of the University who wish to go up for any of its examinations must live at the University; and that none but members who are in residence are permitted to go up for any of its examinations. The Academical year of the University is divided into three regular terms, at the termination of each of which there is a vacation when every student is compelled to leave the town. A student's career is counted by the number of terms he is in residence at the University.

An undergraduate, in his first term is nicknamed a "Fresher," meaning a "Freshman." There is always a certain amount of bashfulness and timidity which appertains to the behaviour of a "fresher"; but the oppressive feeling of being marked out as a "fresher" does not take long to wear off,—and in a very pleasant manner too! My first experience was a deluge of visiting-cards, bearing the names of senior students of my college—3 or 4 on each card, which also bore the number of a room in the college in which one of them was living; a day of the week, such as Monday, Tuesday, or some other day, and an hour in the evening such as 5-6 or 6-7, each card bearing a different day or hour. This deluge meant that I, a fresher, was invited by the senior students, who for that purpose, divided themselves into batches of 3 or 4, on a particular day of the week, and at a particular hour, to attend an evening entertainment. The object of these entertainments is this:—the senior students having been a longer time at the college, regard themselves as established members of it, and, as such, take upon themselves the duty of receiving and entertaining, introducing them to others, informing them of all college traditions, and generally paving the way for social intercourse between the old and the new members of the college,—in short, initiating the novices into their new life at the college. To do all these things, they group themselves into several parties for an hour or less daily, so that this sort of entertainment goes on for some weeks, until the fresher forgets his "freshness" (or what is vulgarly called his "greenness,") and a common brotherhood is established in the college. These entertainments which consist of light refreshments and unreserved conversation,—(to use a current phrase) "break the ice" not

to mention here that no person of active habits takes more than one full meal a day, *i.e.* the dinner, which comes at 7 in the evening. The Science students work at the Laboratory from 9 in the morning till 4 in the afternoon. They get little time for lunch, and usually carry something in their pockets which they eat at some convenient interval. The afternoon is given to physical exercise, which occasionally involves a long walk of several miles. No student is permitted to stay out after 10 o'clock at night except under a penalty, which is sometimes very severe according to circumstances; but none may stay out for the whole night under any circumstances. These rules equally apply to students in lodgings, the resident owners of which have to render an account every morning to the Tutor of the College. In the case of "private" students, the account is rendered to the "Non-Collegiate Board."

The administrative head of a College is called the Master, or in some colleges Provost, and the executive authority the Tutor. A Tutor is directly concerned with your life at the University: he is always accessible to you for guidance and advice. I have already told you that he acts as your guardian at the University. You must not confound the duties of a . Tutor at an English College with the tuitional work now introduced into some Indian Colleges under the name "tutorial." A Tutor's work is purely executive. In Indian Colleges there is nothing corresponding to an English Master or Provost; the Principal's duties being, to some extent, analogous to those of an English Tutor. But, unlike Indian Colleges, when the number of students in any English College is large, there is more than one Tutor: a few of the Colleges at Cambridge have as many as 5 or 6 Tutors, one of them being, by the seniority of his appointment, the Head of the body. The members of the general governing body of a College are called its Fellows.

The aim of a Tutor is not so much to increase the number of "passes" from a College, nor simply to make a pupil attentive to his studies, as to infuse into his mind the ideal of a Higher Life, so that his whole character may be elevated and upheld by personal contact with a superior individuality. The resident Fellows divide the lecturing work among them and generally supervise the literary part of a student's education.

At an English University, the learning is your own concern: the Tutor, the College, and the University will arrange to give you every facility to acquire as much knowledge as you desire; but they will not *cram* you with it. If your Tutor finds that you are not getting on with the course which you have chosen, he will, instead of putting pressure on you to work harder at it, ask you to change it, so that you may do what you have a capacity for, and not go up in the subjects you are unfit for. A

University gives every facility to all kinds of intellect, from the highest climber to the lowest crawler; it endeavours to develop a spontaneous and healthy growth of intellect in you, and not a forced and sickly one. You are left to choose your own course and find your own level, which you do by letting yourself get into the current of life at the University. The College and the Tutor will guide you to the right end, but the work must be yours and not theirs: it is you who should do the learning *freely*, under their guidance, and not under their *compulsion*. Thus it is, that the life and the learning get blended together, so that the life is moulded by the learning and is advanced with the advancement of the learning: it is for this reason that, apart from the degree value of one's education at an English University, great stress is laid on the life led at it!

I have used the word "cram" and I have found from experience that the word requires definition. Many Indian teachers have got quite a wrong idea about the significance of the word: some say "committing to memory without understanding" is cramming; others say "committing to memory" itself is cramming. In giving these definitions of cramming, it is forgotten that these are the natural processes of the beginning of education: every child employs them in its infancy when it commences to pick up the mother-tongue! What is there then so objectionable in cramming? If you look into an English dictionary you will find that cramming literally means "pressing" or "compressing." If you compress a mass of information in your mind in order to facilitate your passing an examination you have crammed,—hence the figurative meaning of the word. Compression always distorts the natural shape of an object; it is for this reason that cramming is found objectionable as a process of education. Assimilation is necessary for education, and compression prevents assimilation. Looking into the teaching-methods adopted in the majority of Indian Colleges it will be observed that cramming is more the rule than the exception. The Indian student chooses a subject for study, not from an aptitude for it, but for the facility it affords him in passing an examination. It is this predominance of examinations in the selection of a subject as well as in its teaching that is called cramming. In an English College an optional subject is intended for specialisation; and a college with limited resources never attempts to take up too many optional subjects, but tries to attain high proficiency in those which it takes up. In an Indian College specialisation is generally unknown; and optional subjects are utilised as a means of attracting a greater number of students to the College: No College in India possesses a Tutor in the proper sense of the word; and the students are guided by no one in the proper choice of their studies: the result is inevitable,

the student's work gets into a chaotic state, and he finds nothing but examination to look forward to; it is the demon of *examination that dominates* his *whole career*. Unless the examinations are duly subordinated, it will not be possible to infuse educational life into our colleges. I have just mentioned that an English lecturer at a University, does not lecture simply for the purpose of preparing you for an examination, but for the purpose of generalising your ideas in order to make you master of the subject; an Indian lecturer, on the other hand, is supposed to do nothing if he does not cram you purely and simply for the examination. Thus you will observe that, while at an English college a student is taught to become the master of his subject and of his studies, at an Indian College the examination becomes the master of the student himself as well as of his studies. Even when the student is supposed to have an unguided mastery over the choice of his subject, it is always the examination which eventually determines his choice.

I consider it a pernicious system of education which leaves the students without guidance on the threshold of a college, making them,—quite immature and ignorant as they are,—masters of their own choice; it is owing to this that after entering a college some months are wasted by the student before he realises the suitability (or otherwise) of his choice. There are many colleges where such a discovery is treated as being beyond the domain of the Professor, who remains totally indifferent to. or unaware of it, until the accident of an examination! Moreover the schoolmaster never realises his own responsibility in directing his pupils to the right choice of the courses and of the college, because his relation is with the university and not with the college; and the university is serenely unconcerned with any special choice which may lead a pupil to a particular course or college. If a student requires guidance at any one time more than another it is just when he is on the threshold of a college; and, most curiously, it is just there that he is forsaken by his guide and preceptor.

If I had a voice in the matter, I should propose the abolition of the present system of examination for matriculation, leaving it to the college to hold an examination at a prescribed time, and on the result of it, to admit as many undergraduates as it thinks fit; and then to send up the names of such admitted members, with a certain prescribed fee, to the University, for what may *then* be called Matriculation.

There should be an examination at the termination of a school-course for such of the school-boys as are unprepared or unable to go in for College education: this may be the concern of the Government Educational Department; and such boys as pass this examination, should be given a "school-leaving certificate" to enable them to

go in for some profession or otherwise. But they should be no concern of the University. My contention is that there should be no "University Matriculation *certificate*:" it is a fiction and a mockery: it destroys life, and reduces education to what I have elsewhere called a paper-currency business!

I wish to emphasise what I have just stated, that a student should not be allowed to leave a school quite undecided as to his future course, and then to experience a bewildering loneliness (or it may be a reckless independence) on the threshold of the College. This has proved to be the cause of the wreck of many a youthful life, for which the system, more than the individual, is responsible.

As an illustration that the passing of an examination is not sufficient for one's admission to a degree, I may mention that there are two Women's colleges at Cambridge, which are allowed to send up female candidates for the various University examinations; but the women have no status at the University, and are not admitted to the degrees or to other privileges which men enjoy at the University. They are even permitted to attend lectures with the men at the different colleges, but their status is not recognised in the current of life at the University: you will find no mention of the two Women's colleges in the University Calendar, although the names of women who pass the examinations for Honours, are published in the classified list. There is a very amusing anecdote regarding the first classical lecture to which women-students were admitted. It was at King's college at which the Hon'ble Mr. Hallward was a pupil, and I owe the anecdote to him, which I give in his own words: "I was present at the first college lecture at Cambridge to which women-students were admitted. The lecturer was Mr. (-afterwards Bishop) Welldon; the subject, Cicero's Academics. It so happened that the Lecturer had occasion to refer to one of Cicero's absurd derivations of Latin words, *viz.*, the alleged etymology of the name Venus, the Goddess of Love. Cicero's etymology was "*Quod venit ad nos*"—"because she comes to us." You can imagine the audible smile that ran round the lecture-hall."

Education, to have its full effect on the life of a man, must be both physical and mental; hence both phases are very prominent at an English College. Every college possesses various clubs for physical education, as there are societies for intellectual education. These are all, without exception, of spontaneous growth, sprung out of and fostered by the undergraduate life. In my own college we had, on the physical side,—the boat club, the cricket club, the tennis club, the foot-ball club, and a general athletic club, and, on the intellectual side,—a Debating society, an Essay society, a Classical society, a Science society, and

a Theological society: there was, besides, an aesthetic side, on which we had a Musical society.

These clubs and societies are very common and are found in every college. There can hardly be a student who does not belong to more than one of these clubs or societies. In fact students take a keen interest in their proceedings: they consider their attendance at the games and the societies as important as their attendance at the lecture-rooms. There are some amongst you who think that those who excel in athletics are generally the less intellectual men in a college-class. Whatever basis there may be for the existence of such an idea in India, it does not exist at an English University. The second Wrangler of my year represented Cambridge that very year at the Inter-university Cycle-race between Oxford and Cambridge. I can mention more than one Senior Wrangler who has rowed in the Inter-University Boat-race. Then, some of you may ask,—how do they manage to find time for all this? Here I am going to tell you the secret of English University life:—It is the *regulation of life*! Unless you can regulate your work in such a manner as to be able to attend to all the different bearings of your life, your education proves fruitless!! In this respect our Indian Education has proved abortive: we have not learnt to regulate our lives; hence the education which we receive does not touch the life we lead. You will seldom find an English College man who is irregular in his habits. It is this trait of character, *viz:* the regulation of life, which one acquires at a University and which is valued more then the book-learning: it is another phase of what I have called the "discipline of freedom." This element is altogether lacking in our ordinary Indian life; hence we ought to take the greater pains to acquire it in our educational life.

Of course, it cannot be denied that some men excel in athletics at the expense of their intellectual education. But, then, it must be understood that such men go to the University for the purpose of acquiring proficiency in athletics. I can mention one noted instance of an Indian gentleman whose name is not wholly unknown to you,—I mean the great cricketer, Ranjit Singhji, the present Jam of Nawanagar.

In my time a unique club existed in my College which requires special mention: it was called "The Club." Some members of my College conceived the idea of having a quiet evening occasionally, to contrast with those of the Debating and other literary societies, which were very largely attended by the students; so they contrived to organise a club of 12 members only. They used to meet quietly of an evening, and sometimes read papers written by themselves or at other times to discuss some good standard book on general literature in a conversational

manner. The club was called the "XII Club" because it would not admit more than 12 members, and would not even admit a guest to any of its meetings. This will illustrate how the students found their own means of educating themselves, apart from the teaching which was imparted in the class-rooms.

At Cambridge almost every college has got a Magazine of its own, which is published once a term and contains the records of all college functions and a summary of the doings of all the College clubs and societies, besides many articles written partly by the Fellows, but principally by the students.

Each College is a society in itself with the above-mentioned clubs and societies as its minor appendages. But there are other institutions of the nature of these clubs and societies which are organised and fostered by the united members of the entire University: these tend to bring together men from different Colleges and the non-collegiates into a wider brotherhood. It is in these institutions that the non-collegiate student finds his position and status recognised, and his life at the University influenced by the general current. The Union club is one of the kind mentioned here, and I have seen more than 500 undergraduates,—members of different colleges as well as non-collegiates,—and many graduate-Fellows of different colleges, sitting together at a meeting of it, to hold a debate!

The Colleges come in contact with one another in various competitions. These healthy competitious between different colleges at the same university, and also between different Universities such as Oxford and Cambridge, tend to add to the variety of interests in student-life and make one feel like a real man! The competitions between colleges are of frequent occurrence; and those between the Universities are annual functions. One's relation with his college or his University is so binding that migration from one college to another at the same University, or from one University to another, is very rare, and never lightly thought of. As I have said before, the relation is regarded as between the lives of men; and hence it can only cease with the cessation of life: Sentiment plays no unimportant part in it. It must be understood that the relationship is one of *life* and *living*, and not of *paper-currency*!!

Compare with this the attachment shown by an Indian student for his College which is far form being a society or a fraternity. Young Indian students do not, as a rule, feel any sentimental attachment for their college: they change their college as they would change their bed-sheet. In India Education and sentiment are as wide apart as the poles, since sentiment is not one of the things which the present system of education in India professes to encourage. There is hardly anything beyond a pecuniary consideration, or

an easy way of passing an examination which determines the choice of a college by a matriculation of an Indian University. To him the College is as it were made to order like a clay-god with nothing of life in it to evoke anything like attachment to it: he comes and goes and on leaving, thinks no more of the college than of the road he treads in a long journey. Moreover, the college obeys the dictates of the University like a mechanism worked under its thumb: it does nothing more than pursue what the University prescribes as its course, and like a clogged mechanism (as all inane artificial mechanism are apt to be), *does even less*! This is the general picture of an India college. If there are exceptions, they amply serve my purpose of a justification for an effort to shew how a college can be made to develop signs of life in itself, and be an instrument for imparting life to its inmates.

It is now my purpose to touch upon another and more important phase of University life, *viz*: the development of thought: it is the Inner life at a University. This can be summed up under two heads, which I shall call "Individuality" and "Ideality". I shall explain. I have already said that a students' first experience of university life is a direct contact with a higher plane of mind in his Tutor; the idea forces itself upon you that he is constantly watching your interests, and that the sole purpose of the existence of a Tutor is the furtherance of your interests. Such single-hearted devotion to your interests creates a kind of "self-consciousness" in you, which is emphasized and developed by your repeated contact with such a superior type of mind. At every turn of your life at the University you can experience different currents of thought running into various channels. It is a critical moment of your life when you awake to the realisation of the existence of these currents: the Tutor, with all possible assiduity, endeavours to make you conscious of that critical moment. The currents are always there, but it requires what may be called an auspicious moment, to perceive them: consciously or unconsciously you come in daily contact with them. But it is at a supreme moment, that you take a headlong plunge, and let your life flow into one of those channels. Then it is, that *self-consciousness* comes to you, and you gradually realise that there is a necessity for your existence in this world: that there is a definite place in the universe, in your country, in your nation, in your society, which you can fill: it has been kept vacant for you, and it is your duty to fit yourself for it. You realise that, far from being one too many in this world, you are wanted to take your place in it; and that there is enough work for you to do in the world, and for the advancement of the world. This awakening of the self and the realisation of the importance of your own existence is what I

have called "Individuality." This self-consciousness is a sublime and healthy growth of thought which leads to the advancement of humanity! A person who is conscious of the fact that he has been brought into this world for some good purpose, however humble, and that it is within his capacity to fulfil that purpose, is in the proper frame of mind to seek it out, and to educate himself for the fulfilment of it. This is termed one's "vocation" in life, and education ought to be directed towards its realisation. To get one's life imbued with such a consciousness, and to lead it to the accomplishment of such a purpose,—in other words, to seek a vocation and ensue it—these are the objects the pursuit of which tends to humanise the University life of an undergraduate! It was this Individuality which made Sir John Herschel resolve, when he was taking his Degree as Senior Wrangler in the year 1813, "to leave the world wiser than he found it."

You must not confound "self-consciousness" with "self sufficiency:" The latter is a pitfall covered by the *under-growth* of the University life, and is known by the name of 'Egotism.' There are men to be found almost in every University, who have taken very high places at the examinations, but have been at a very low level in the general life of the University. Egotism is their *forte*!

As a superb instance of egotism may be cited the following, for which I am indebted to the Hon. Mr. Hallward: Dr. Thompson, who was Master of Trinity for 20 years, after the famous Dr. Whewell, was singularly egotistic in the exaggerated sense of his own importance, and was conceited enough to conceive the idea that he was almost a second Whewell at Cambridge. He was offered a bishopric which he refused and a flattering friend of his at a large dinner-party loudly expressed his surprise at the refusal. "Sir," replied Dr. Thompson magnificently, "there are many bishops but there is only one Master of Trinity."—The voice was such as to make one imagine that "Master of Trinity" was pronounced all in capitals! An irreverent Tutor of Caius College, with a squeaky voice not well under control, said in what was meant to be an aside but was audible to the whole dinner-table "and a very good thing too!"

Once a friend of mine, who was a practising Barrister in London, and a University man of my own College, remarked to me that, "Mathematicians were very narrow-minded." There was another friend present (he took his Degree in Natural Science)who remarked that inspite of their narrow-mindedness Mathematicians were very sharp. I retorted that "sharpness could only be obtained by narrowing the edge." It is quite true that a person who plunges into any one exclusive current of thought and tries to attain its depths, is sure to become narrow-minded,—be the

current mathematical or otherwise; but it is the life at the University, which brings about the clash of mind with mind: this is the result of a residential University life, in which such different currents of thought are brought into harmony, and the marked ruggedness of different subjects of study is smoothed down by its humanising influence. The regularity of attendance and the keen interest shown at the Debating and Essay Societies, clearly manifest how the different currents of thought are getting blended together to mould the life of the next generation. Self-consciousness awakens by degrees, until a man finds himself a custodian of the prestige, of his class, creed, and nation. In reality, it is humanity which awakens in him, and his whole life and character are upheld by a moral force which is the resultant of these conscious kinds of prestige!! If you, as a foreigner, go to an English University, and *keep your eyes open* you cannot but see around you the signs of such an awakening of life: this is the value of a University life!

Circumstances have forced themselves upon us during recent years, which prove that the germ of individuality has not been altogether missing from our life. I feel, under these circumstances, the necessity of referring to another pitfall to which a peculiar kind of individuality may lead us. I prefer to call it *misguided individuality.*

It is a poisonous offshoot which deflects individuality from its legitimate path, which lies towards the progress of society and humanity *i.e.* towards the building up of nationality. This misguided individuality is born of degeneracy and of an unhealthy condition of life which I am inclined to ascribe to the "paper-currency" system of our Indian University. As an educationist, I am bound to be an Optimist; I believe in the progressive state of the world. The attainment of a Higher Life is the goal of our existence. If we are to attain the right kind of individuality which our education should lead us to seek, it can only be done by means of a moral force acquired by education!

It is puerile to suppose that physical force will ever enable us to acquire manhood and take our place in the advancement of the world. On the other hand, I fully believe that degeneracy cannot be a permanent feature of the existence of any class of people. The question arises:—Will our Universities impart life, produce Individuality and reclaim misguided Individuality for a better and more glorious purpose, to devote the energy of their alumni to the betterment of the world at large and of the country and the people in particular?

The other head under which the development of thought has been classified, is what I have called "Ideality." It is what the University teaches, and its effect on the life of a student is the individuality which he acquires. The University teaching does not acquaint

you with what is *actual*, *i.e.* existent in '*esse*' (reality,) but with what is ideal, *i.e.* existent in "*posse*." I will take a simple instance to illustrate my point: here in India a University degree in Law qualifies you to practise as a pleader; but in England it is impossible to practise without other qualifications. The University teaches the Ideal of Law,—the principles of it which would tend to constitute a perfect humanity. Although the acquisition of such an ideal serves as a good asset in the life of the student, it gives him no qualification for the technicalities of his profession, for which he must apply to one of the Inns of Court, whose duty it is to qualify him in the actual and existing law. You know the distinction between Science and Art (by the latter I mean the application of the former to practice). Now at a University the teaching is for the development of the science alone *to its perfection*, and not of the Art *in its application*. It is worth while to mention here that this feature of an English University is a development of the past. The Indian Universities have yet to outgrow their present dual functions in order to devote themselves to pure Ideality!

At a University you are made acquainted with the Ideal,—you are taught what a thing *ought to be*,—and your life is moulded into a semblance of that ideal, so that in your after-life, you can take up a thing *as it is* and try to realise your ideal by improving it into *what it ought to be*; it is thus that the world prospers and humanity advances! Ideality serves as a mirror in which a life casts its own reflection in order to discern its defects, so that the inner self may be moulded into a higher semblance. Individuality grows in the face of that mirror, and, in the end, the individual comes out a better man! This is the *profit* of a University life!

A brief survey of the different ways of teaching at the University will inform you how the Ideality is obtained. Broadly speaking, there are 3 classes of teachers *viz.*, (1) the University Professor (2) the University Lecturer and (3) the College Lecturer. A College Lecturer takes up a subject generally prescribed for the Degree examinations, and prepares an analysis of it which he delivers to his class. The University Lecturer supplies information on a wider basis, giving the analysis of some such portion of the subject as is in the course of development: it is rendered in such a manner as to appeal to the critical judgment of the student, to enable him to form an independent opinion of his own. A student does not go to a University Lecturer to receive help, but to learn how to help himself. The University Professor lectures only on such matters as involve his own original thought. At a University a person is not thought qualified to lecture on any subject on which he cannot generalise and express an independent view of his own. One cannot become a Professor until he has

shewn capacity for *creating* thought: to a Professor, his subject possesses religious sanctity,—he *professes* it, as he does his religion! Thus it will be observed that a Professor is a living symbol of Ideality, who devotes his life to the perfection of his ideal by the creation and advancement of thought!

There is another class of teacher who is called a "coach." He is a sort of private teacher paid by the pupils by means of fees; and his duty lies in rendering personal help to a student in his preparation for an examination, by solving his difficulties and giving him exercises. Here you see that, at an Indian University, the best of us try only to approach a College lecturer, but many of us only do the duty of a "coach,"—all under the pretentious title of a Professor! There is no wonder, therefore, that we fail to idealise ourselves to the imagination of our students.

Here I may parenthetically observe that a College is not worthy of its name unless its staff consists of such men as can create or stimulate thought. It may be contended that every man who *elects* to become a College Professor cannot be supposed to be able to *create* thought,—to be an original thinker or discoverer. But it must be admitted that unless a habit of thinking grows on a man he is not fit to teach. What do we teach after all? Is it not purely how to think? A teacher cannot suppose himself to be in possession of absolute truth: he must concede that knowledge is progressive; and that it is by habitual thinking that one generation after another, may contribute to the progress of knowledge. One cannot teach others to think, unless he practises thinking himself: he must regard himself as a perpetual student and learn while he teaches! "*Homines dum docent discunt,*" is a wise saying of Seneca which every teacher should bear in mind. Moreover there is no dead-level in the region of thought,—it must flow or stagnate: to quote John Morley, "standing still spells retrogression." It is a teacher's vocation to keep his thought flowing, or else he must abandon the profession. The main characteristic of a teacher should be his own habitual thinking: it is not so much the mode of his rendering a text as the manner of his thinking which will enhance the value of his teaching; in other words it is he who should possess individuality, so that his mere presence may add to the individuality of the College to which he is attached. It is the personality of the teacher more than the subject or author of a text, which can infuse life into the teaching and the taught: and it is the elimination of this personality which reduces all teaching to an intellectual void;—a mere *cram!* No man can impart life who does not possess a living thought in himself!

One word more about tne Examinations: at Cambridge no student can go up for an Honours examination more than once: if he fails once, he may not

appear at the same examination again; and no one can obtain Honours unless he does it before the completion of his third year of residence. Even illness during the period of the examination makes no excuse for extending the privilege of appearing at an examination. (This does not apply to a Pass Degree examination). Thus it is made an essential point that a student must shew his capacity for doing Honours work within a certain time; otherwise he is disqualified from obtaining Honours. It is a test of "Power," and not of mere 'energy,' and the test abides in your ability to do the work *within the limited time*. This element of University life compels one to learn the regulation of life!

The first degree conferred by the University is the B. A. degree, which is never given to anyone who is not present in person to take it. There is no certificate granted by the University; the paper-currency finds no favour in tne eye of the University. The degree-conferring is, in reality, a religious ceremony, grand and imposing! I had to take my degree, kneeling down before the Vice-Chancellor, with my folded hands placed between his, when he declared me to be a graduate of the University "in the name of the Divinity!" It was not *a piece of paper* which I received there, but a status in life, which was bestowed on me by Divine Grace! The status is conferred on one's *life* and not on one's *paper relation* with the University.

The interest attached to the function of conferring the degree is unique: people from different parts of the Kingdom,—come to the University to witness the ceremony, which is as imposing as a marriage ceremony in an Indian house-hold. The time is one of general festivity. Many a friendship contracted between individual students finds occasion at this time to ripen into closer bonds of intimacy between families; this is the growth University life!

I must tell you that the B. A. degree is merely a probationary one: the real and substantial degree is the M. A. degree, which is conferred 3 years after the B. A. The degree pertains to the life and not to the result of an examination. A. B. A. at the University has to be more circumspect in his behaviour than he was as an undergraduate; because, for any infringement of the regulations, a B. A. is punished twice as severely as he would have been as an Undergraduate. This probation may be said to test the effect on the life of the probationer of the "discipline of freedom." It is thus clear that, at an English University, from the matriculation to the degree, there is nothing but *life* which the education aims at! You offer your immature and, in some cases, erratic life to the University, to nourish and bring it up, and the University gives it back to you as a Higher Life!

I have now completed my endeavour to place before you the picture of an *Ideal life* at an English University. I do not pretend to say that this is the actual life of every student at the University. True to my profession, I have tried to be Idealistic in my discourse, by referring to such phases of an ideal students' life as can be profitably adapted to the requirements of our own colleges. I shall conclude with the hope that the youthful section of my audience may realise some ideal of their own in the picture which I have placed before them.

A. C. DATTA.

SOME ASPECTS OF POPULAR HINDUISM.

The inferior gods of nature and other minor deities whose name is legion have no recognised place in the Hindu pantheon. The *Itu* of the highest caste and the *Bhajai* of the lowest *Dom* are hardly known outside the circle of the individual castes who worship them. Some of these gods found in the district of Beerbhoom, where the writer lived for some time are mentioned below:-

DHARMARAJ.

The peasantry of Beerbhoom, owe allegiance to *Dharmaraj* more than to any other deities. He is a shapeless stone smeared with red lead and *ghee* and placed under a tree. This sanctum is known as *Dharmaraj tola* and every village of any pretension must possess one. No old man would pass by the place or its neighbourhood without remembering the presence of the deity. With folded palms and eyelids closed, he reverently bows his head every time he passes before the God. Then he draws a deep sigh of reverence and passes on. *Dharmaraj* guards the village, gives the people good crops and keeps diseases from them. He also rewards the meritorious and punishes the wicked. This most popular deity is worshipped on the full-moon nights in *Baisakh* and *Jaistha.* The devotees must fast on the day of worship. The lower castes are fond of intoxication,and *Pachwai* or rice-beer offering is the *sine qua non* in this worship. On the morning of the appointed day each devotee repairs to the *Dharmaraj tola* bringing with him a new small earthen pot and waits for the arrival of others. When all have come, one of them takes all the pots to the nearest *Pachai* shop. The vendor pours a small quantity of undiluted beer into each potand waits for the function till evening. During the day the devotees amuse themselves as much as they can. An hour before sunset they adjourn to a tank where the deity is bathed and worshipped on the bank with much pomp. Then a procession is formed and the deity is bodily carried

on one's head to the *Pachai* shop where the Dharmaraj is placed before the pots and is allowed to drink his fill. When he is supposed to have taken a deep draught he is carried back to his sanctum under the tree amidst loud music. The devotees then return home and break their fast by eating some fruits. Cooked food is partaken next day which is spent in great revelry with the flowing bowl.

MANASA.

The castes *Muchi*, *Hari* and *Dom* while declaring their allegiance to all the deities of the Hindu pantheon seem to prefer *Manasá* the goddess of snakes for special worship. The reason is that snakes abound in the country and the people are interested in propitiating her; the personal name *Manasaram* is very common among men of the lower classes of the districts of Beerbhoom and Murshidabad. Besides the above castes, *Sadgops*, *Jelias* and *Sundis* also join in the worship. The puja takes place on the fifth of the light half of Bhadra. The day is popularly known as *Bagapanchami*. The story of the devoted wife *Behula* is too well known to need repetition. Through the favour of the goddess *Manasà*, she resuscitated her husband *Lakhindar* who died of snake-bite on the night after his marriage. *Lakhindar* was a *gandhabanik* by caste. To this day the *Benias* of Beerbhooun specially worship *Manasa* on all ceremonial occasions and chiefly before a marriage is celebrated.

People keep vigil on the night previous to the day of worship, singing songs relating to the story of *Behula*. This night is called *Jagaran ratri* (or night of waking). The songs are generally sung by the *Jelias*. At noon of the day of worship the image of the goddess made of clay with some hooded snakes before her, is carried with music and songs (chian) to an *Asath* tree outside the village. The devotees who carry the image walk round the tree seven times, the women carrying earthen pitchers of water following in their train. This part of the ceremony is called *ganch mangala*. An interval follows when one of the devotees sits *dharna* before the tree, his head tossing to and fro as if in a trance. The man then gives oracular responses and gives the names of the accursed men or women whose promises of offerings to the goddess remain still unfulfilled.

The party then return home with the goddess who is now worshipped with flower offerengs in the recognised style. Puja over, a goat is sacrificed at the altar and its severed head is appropriated by the village chowkidar for the trouble he takes in keeping the sacrificial block in his custody during the year.

Manasa is also worshipped in some places an the last day of Sravan. This worship which is known as *Sa'on-dali* takes place at night. The *ganch mangala'* ceremony is omitted.

This goddess is considered very dangerous, for she takes offence on the slightest provocation. Hence the often-quoted Bengali proverb "*Eke manasa' tate dhunar' gandha'*" cautions one against the danger of provoking a person who is naturally cross and of excitable temper.

SITALA.

Besides *Manasa* the other goddess who receives special attention is *Sitala* the goddess of small-pox. There is no fixed day for her worship. One day is as good as any other. When there is an outbreak of small-pox or cholera, the wrath of *Sitala* must be appeased. The villagers assemble together, place an image of clay in the open air ; she may not be worshipped under any roof. The idea is to avoid contagion A *ganak acharya* i. e., a degraded Brahman is appointed to do the *puja* A goat of white colour is sacrificed in her honour. In the *santhal* neighbourhood the people employ a witch-finder to divine who has cast the spell, and various modes of divination are resorted to.

In some parts of the country, a poor devotee may be seen going a-begging from door to door. He carries a bamboo-pole on his shoulder to one end of which is suspended a small litter containing the goddess and on the other a basket, in which offerings are received. This is a small wooden image be-smeared with vermilion and oil and strewn with flowers. Brass pins are stuck into her body to represent small-pox eruptions.

BRAHMA-DAITYA.

Demon worship has a strong hold among the *Bagdis* who outnumber other castes in Beerbhoom. The word Bagdi is from the Sanskrit word Bagatita (not amenable to counsel) the robber who was a disobedient son of a *Kshattrya* father, according to the *Brahma Vaibarta puran*, Brahma Khanda. *Mals*, *Bauris* and even some of the Navasaks also join in this worship. The majority of the demons are supposed to have been human beings, especially those Brahmans and Vaishnabs who met with a sudden or violent death. These are the *Brahma-daityas.* They are powerful, malicious and interfering. They inhabit large trees from which they indulge in the pastime of pelting stones on dark nights at the houses of the honest and simple folk. The tree which is the abode of the Brahma-daitya stands generally in the midst of an open field or by the side of a *Kandar* or rivulet. Under the tree may be seen a collection of brickbats and earthen clods which the villagers have brought as offering to the evil spirit. All misfortunes

in the neighbourhood are ascribed to his mischievous actions and the poor rustics would do their best to keep him in good humour. They believe that the deity is a good rider and is fond of excursions on dark nights. They have therefore supplied him with gifts of earthen ponies which may be seen under the tree.

On the first day of Magh of each year the worship is held with pomp. All castes share in the festivity and *Melas* are held in honour of the deity. The *Bumka* fair near Rampur hat, the *Nagor* mela near Suri and the *Deka* and *Ulkunda* melas in thana Moureswar are connected with the worship of *Brahma-daitya.*

GANDHESWARI and VISKARAM.

The presiding deity of the *Gandhabanik* or Benia caste is the goddess *Gandheswari.* The Benias were originally assistants serving under the Vaidyas the physician caste. They are now generally all shop-keepers. The goddess is worshipped in Baisakh on the *Purnima* day. An earthen image of the deity with ten arms riding on an elephant is set up and a Brahman is appointed to do the *puja.* Many however discard the image and worship the scales and weights instead, just in the same way as books, pens and inkpots are substituted for the image of the goddess *Saraswati.*

The goldsmiths, blacksmiths carpenters and the weavers also similarly honour their patron deity *Viswakarma* or simply *Viswakarm* by worshipping their respective tools and implements. The *Tantis* and *Sekras* fix their day of worship on the Bijoya Dasami or the last day of Durga puja, while the other castes do so on the last day of Bhadra.

No animal sacrifice takes place before Gandheswari. The devotees of Viskaram, who is the architect' of the gods, offer a gourd or pumpkin which is cut in two in his honour. He is not blood-thirsty and is easily pleased. That is why the shop-keepers thrive.

ITU.

This is one of the *Bratas* or vows of obscure origin which is observed by the females of the Brahman and Kayastha families of Beerbhoom and neighbouring districts. It is held on the last day of Agrahayan. The family priest comes and in the fore-noon worships the goddess. *Itu* is believed to be identical with *Lakshmi.* The women go to an elderly matron to hear her recite the story of the deity. The latter is rewarded for her trouble by the offer of a betel-nut which everybody must carry in her hand while listening to the story. If any one of the fair devotees is unavoidably absent, the relation of the story proceeds without her all the same, provided the absentee sends a betel-nut which is then placed on the ground

over a mark made on the earthen floor by the nail.

The story is told how a Brahman had two daughters whom he abandoned in the forest and how they were found and were married to the King. The Brahman who happened to be the family priest of the King is soon reunited and reconciled to his long-lost daughters and acquires immense riches through the favour of the goddess *Itu*.

BHAJAI.

Bhajai is an obscure female deity of the lowest castes; *Bhajai* or *Bhadai* is derived from Bhadra in which month on the twelfth day of the light half the worship commences and then it continues for several days. A few days before the puja a few seeds of mustard are sown in an earthen pot filled with earth, which soon sprout. Puja is offered before this pot. *Pachai* drinking forms an important part of the festivity. The men play on the drum and fiddle and the women dance singing obscene songs and the party collect alms from door to door. This *deity* is of lascivious character.

PARAMESH PRASANNA ROY.

THE RIVER-DAUGHTER.

Boating with the stream,
Like a floating dream,
O whither away so fast?—
Whither, with the gleam
Of tangled hair
About thy spangled bosom cast?

2.

Scatter'd hues of even—
Breaking as from heaven
In many a scarlet curl—
Kiss the streaks of levin
Divinely fair,
That thy blue heavenly eyes now hurl.

3.

From the whispering South,
Freshening thy lips' drouth,
A mellow sky-breath blows;—
Deep, thro' parted mouth,
One shining row
Of teeth divine divinely shows.

4.

Crisping billows come,
Bubbling out in foam,
To lick thy gliding keel;—
All in pleasure dumb,
The foamlets low
Round thy red feet supinely reel.

5.

Azure vapours dim
By the barge's rim
In sweet emotion hover,
Jewell'd with the glim
Of diamond sparks
That flash the leaping ripples over.

6.

Swift, as on the back
Of a sailing rack
The quick sky-daughters ride—
Lashing with a crack
The lazy sharks—
On thy bark seated thou dost glide'

7.

Murmurs from the stream,
Sweet as of a dream,
Rise to thy plashing oar,
As the dolphin team
Shake up their heads
Thro' billows dashing on each shore.

8.

Thus, in the bard's mind,
Heavenly hues combined
Will ever make thee bright,
Ever round thee wind
Those magic threads,
Thou child of Homer, sunset-dight!

ROBY DATTA.

OLIVER WENDELL HOLMES.

III.

Holmes describes himself as "sitting with Wistar's Anatomy beneath my quiescent arm, with a stethoscope on my desk and the blood-stained implements of my ungracious profession around me, attending Medical lectures, going to the Massachusetts Hospital, and slicing and slivering the carcasses of better men and women than I ever was myself or am like to be. It is a sin for a puny little fellow like me to mutilate one of your six foot men as if he was a sheep but *Vive la Science*!" This is is a graphic though a somewhat gruesome picture of our Medical student. These serious pursuits stood in the way of his cultivation of poetry. Here are his wise and weighty words—he was but twenty when he penned them, which such of our young men as are gifted that way should ponder well. "The force which is required for continuous and prolonged application is rapidly dissipated in the act of poetical composition. The labour which produces an insignificant poem would be enough to master a solid chapter of Law or a profound doctrine of science. I mean, of course, if the poem is written with any amount of lyric passion. The mere stringing of rhymes together, as is done by so many young persons, is hardly an intellectual employment." Remember that in after-life he found ample leisure for writing high-class poetry.

This is how Holmes felt after he had made some progress in his medical studies. "There is something very solemn and depressing about the first entrance upon the study of medicine. The white faces of the sick that fill the long row of beds in the hospital wards saddened me, and produced a feeling of awe-stricken sympathy. The dreadful scenes in the operation theatre—for this

was before the days of ether—were a great shock to my sensibilities, though I did not faint. as students occasionally do. When I first entered the room where medical students were seated at a table with a skeleton hanging over it, and bones lying about, I was deeply impressed, and more disposed to moralise upon mortality than to take up the task in osteology which lay before me. It took but a short time to wear off this earliest impression. I soon found an interest in matters which at first seemed uninviting and repulsive, and after the first difficulties were overcome, I began to enjoy my new acquisition of knowledge."

In some of his earliest letters he talks of love and of "a young lady, or what sounds sweeter, a girl" hailing from Maine. He even talks of engagement and marriage but after all it was a false alarm and nothing came of it. He writes a little while later "about this taking wives, I think a man who had to swim without a cork-jacket had better not put lead into his breeches pocket" When the professor talks in *Elsie Venner* how" poor *young* fellows who could just keep themselves afloat have hung a matrimonial millstone around their necks, taking it for a life-preserver ;' was Holmes thinking at that late time of the day of the fate he so narrowly escaped in early years? Well, after all, the *beau-ideal* of a lover Romeo, did not marry his first love, nor did Spenser or Scott or Byron or Burns or Poe for the matter of that. And so if Holmes errs. he errs in good compony. After having attended two courses of lectures in the Medical school, he determined to avail himself of the greater advantages offered in Europe for a finished Medical education and his parents came gallantly to the mark, made such sacrifices as they had to make—their purse was not a very long one and equipped him for the two years' stay in Paris (1833.)

Holmes took a bird's-eye-view of England on his way to Paris and then settled down to a life of strenuous labour and whole-hearted devotion to science. Many are the letters to his father, crisp, chatty (though somewhat more free-spoken than they are likely to be among us Indians) in which he gives a good account of himself and pays glowing tributes of praise to the first-rate men of European reputation he was studying under, totally unlike the fictitions narratives sent by Goldsmith to his loving uncle Contarine. There were of course natural misgivings with regard to the son's residence in a city where "the Devil gave gratuitous instruction with alluring illustrations" likely to be more fatally attractive to a young mind than the lectures delivered by the first pathologists of the world with demonstrations. At one time the father finding the course on which his son had launched was costing so much beyond the forecasting and fearing political complications—a war was just then imminent between the

two countries—insisted on his coming back before his time. But the son's earnest, almost pathetic pleadings and the good report he gave of his progress finally won the father over. "I am more and more attached every day to the study of my profession and more and more determined to do what I can to give my own country one citizen among others who has profited somewhat by the advantages offered him in Europe." He took his work with all his might, and his pleasure very modestly—and this in a city like Paris so full of pleasing distractions. He very seldom went to the theatre and never mixed in politics, now or in after-life. *Our young men should take note of these two facts.* He said in after-life that he "saw little outside hospitals and lecture-rooms." "I devote nearly two hours to investigating a difficult case, in order that no element *can* escape me and I have always a hundred patients under my eye. Add to this the details and laborious examination of all the organs of the body in such cases as are fatal, which in the course of two months has called on me for memoirs to the extent of thirty thick-set pages. almost all facts hewn out one by one from the quarry." "I have employed my time with a diligence that leaves no regrets. My aim has been to qualify myself so far as my faculties would allow me, not for a mere scholar, for a follower of other people's opinions, for a dependant on their authority, but for the character of a man who had seen, and therefore knows; who has thought, and therefore has arrived at his own conclusions." "What better can be done with money than putting the means of instruction—the certain power of superiority, if not of success, into the hands of one's children?" "I told you that it is not throwing away money, because nine-tenths of it goes straight into my head in the shape of knowledge." "A boy is worth his manure as much as a potato-patch." What loving father who considers the money spent over his son's education a good investment can resist such an appeal as this, backed with such a report of steady work done? How many sons studying in this great city of ours I feel tempted to ask, can send such a good report to the anxious parents at home?

In the Spring and Summer of 1834, the courses of medical instruction being over for the time being, he undertook the conventional trip down the Rhine and visited the Low countries and Switzerland and Italy. This is the grand tour so familiar in the biographies of English Men of Letters, Milton and Addison and Gray and Goldsmith, all the more necessary in the case of a New England Youth who must drink deep at the fountain of a culture which is the growth of centuries and assimilate all that is noble in it. Thence he crossed over to England. He stayed a few weeks in London, saw something of English hospitals and got some idea

of English teaching. "As for the Science of England and France, or rather Paris and London, the Frenchmen are half a century in advance." "I have been at different hospitals, looking at the different manifestations of the spirit of quackery." So wrote he in those days. Who knows how matters stand in our century? He saw Edinburgh and the beautiful country immortalised by the pen of Walter Scott, then the English Lakes and somewhat more of the English country 'before the mill began to grind again in Paris.'

In the Autumn of 1835 he returned home. "He had used time and money conscientiously, had gathered memories both useful and pleasant, knew the French language almost like his own (French is a second mother-tongue to me almost) and had as much professional knowledge and skill as hard work could master in two winters."

This brings us to the close of an important chapter of Holmes's life-story—his education. I have given a greater prominence than what is demanded by a sense of proportion, to the period of preparation, as my paper is mainly intended for a juvenile audience who should see for themselves what honest work means and thus derive a valuable lesson of self-help and self-culture from the life of one who like most of them belonged to the middle class of Society.

Professional Career and work.

"I would never return until I could go home with the confidence of placing myself at the head of the younger part of my profession,—as much for your sake as my own, for I am not only ambitious, but I long to pay for my tedious and expensive education." Thus runs one of his letters to his father. This ambition, however, met but a partial fulfilment. 'He built up a very fair business but hardly more,' says his biographer. At no time did he obtain what is vulgarly called 'a roaring practice.' Who knows how much of personal regret is concealed under the genial satire in his sketch of a successful medical career in an early chapter of *Elsie Venner?*—"No home, no peace, no continuous meals, no unbroken sleep, no Sunday, no holiday, no social intercourse, but one eternal jog, jog, jog, in a sulky, until you feel like the mummy of an Indian who had been buried in the sitting posture, and was dug up a hundred years afterwards."

It is the old story of Goldsmith and Smollett, Akenside and Keats. 'It was of course a hindrance to be a wit and a poet; the wise world had made up its mind that he who writes rhymes must not write prescriptions, and he who makes jests should not escort people to their graves. Or as Holmes himself puts it 'people wont employ A man that wrongs his manhood by laughing like a boy.' The Doctor who could perpetrate such a pun as 'the slightest favours (or fevers) were welcome' could hardly be trusted with lives. "Do not

dabble in the muddy sewer of politics, nor linger by the enchanted streams of literature, nor dig in far-off fields for the hidden waters of alien sciences. The great practioners are generally those who concentrate all their powers on their business." This is the weighty advice—derived no doubt from sad experience he gives to young medicoes.

It should be said in justice to him that whatever his emoluments and the attractions of literature, he was a genuine member of that profession which 'had won the love of his youth and still held the loyalty of his mature, even his declining years'. Like Dr. Kittredge in *Elsie Venner* and the nonagenarian Dr. Hurlbut in the *Guardian Angel*, he was 'the most anxious, painstaking, conscientious physician that ever counted pulse or wrote the mystic Re.' It is matter for congratulation that he obtained certain honours in his line. He won the Boylston and other prizes against the competition of two veterans of those days. (Barnard Langdon in *Elsie Venner* winning prizes is no doubt Dr. Holmes's own case under a thin veil.) In 1838 he received the appointment of Professor of Anatomy at Dartmouth College and held it for 1839-40. A still greater honour came in 1847 when he became Dean of the Medical School and obtained the Chair of Parkman Professor of Anatomy and Physiology in the Medical School of Harvard University which he occupied for thirty-five years. The over-loaded condition of his chair led him to say in his facetious way that it was not a chair but a whole *settee*. In 1871 a separate chair was at last established for Physiology and Holmes had henceforth charge only of Anatomy.

HOLMES AS PROFESSOR.

Some of his pupils and demonstrators have left records of his work as a teacher and they give ample evidence of his efficiency, success and popularity. When he entered the lecture-hall, he was greeted 'with a mighty shout and stamp of applause'; "then silence, and then begins a charming hour of description, analysis, simile, anecdote, harmless pun, which clothes the dry bones with poetic imagery, enlivens a hard and fatiguing day with humour, and brightens, to the tired listener the details of a difficult though interesting study. We say 'tired listener' because the student is now listening to his fifth consecutive lecture that day, beginning at 9 A. M. and ending at 2 P. M.; no pause, no rest, no recovery from the dazed senses, which have tried to absorb Materia Medica, Chemistry, Practice, Obstetrics and Anatomy, all in one morning, by five learned Professors. One o'clock was always assigned to Dr. Holmes because he alone could hold his exhausted audience's attention."

"As a lecturer he was accurate, punctual, precise, unvarying in patience over detail; while the wealth of illustration, comparison and simile he used was unequalled. He was always simple and

rudimentary in his instruction. His flights of fancy never shot over his hearers' heads." Iteration and re-iteration was his favourite motto in teaching. His own words are:—"My advice to every teacher less experienced than myself would be: Do not fret over the details you have to omit: you probably teach altogether too many as it is. Individuals may learn a thing with once hearing it, but the only way of teaching a whole class is by enormous repetition, representation and illustration in all possible forms. Now and then you will have a supremely clever young man on your benches,—but you cannot pretend to lecture chiefly for men like that. To meet his wants you would have to leave the rest of your class behind, and that you must not do. Instruction will be successful in proportion as it is elementary. It may be a humiliating statement, but it is one which I have found true in my own experience." I have quoted these sound words in full so that the teachers of youth in our land may give them due consideration. In all that he did he studied accuracy and thoroughness which he had been taught by his French teacher Louis to believe as the first and highest of the virtues of the intellect. He waged unresting war against smatterings and the conceit of half-knowledge which rise, says his biographer, to the dignity of a national characteristic in America. Well, if matters are so bad in America, I leave it to my readers to judge how much worse they are here in India where needy key-makers and half equipped teachers overstock the market.

Though in occupation of his chair for an over-long period, Dr. Holmes was keenly alive to such changes and advancement as were going forward. 'The lectures were revamped every year with genuine hard labour. Keeping abreast with new ideas, even in anatomical studies, meant something.' "The Professor's Chair," he had once said in his inimitable way, "is an insulating stool, so to speak; his age, his knowledge, real or supposed, his official station, are like the glass legs which cut it off from the common currents of the floor upon which it stands." Again: "The wood of which academic chairs are made has a narcotic quality, which occasionally renders their occupants somnolent, lethargic or even comatose." Be it said to the credit of Dr. Holmes that he never yielded to this fatal coma.

'He loved Anatomy as a mother her child. He was never tired, always fresh, always eager in learning and teaching it'—the true ideal of a teacher. 'Gladly would he learn and gladly teach' as the old English poet has it. He was tender-hearted and 'always manifested great abhorrence for death and tenderness for animals.' 'When it became necessary to have a freshly-killed rabbit for his lectures, he always ran out of the room, left the demonstrator to chloroform it and besought him not to let it squeak.' He recognised the neces-

sity of dissection, nay of vivisection even, 'a mode of acquiring knowledge justifiable in its proper use, odious beyond measure in its abuse'—to quote his words—but still he used to say that the part of anatomy he liked best was 'the bones—for it is the cleanest.' He was totally unlike the young surgeon 'Fresh from the surgery-schools of France and of other lands Harsh red hair, big voice, big chest, big merciless hands, Happier using the knife than in trying to save the limb' whom we all know so well from Tennyson's poem (*In the Children's Hospital*). Let us hear him speak through his mouth-piece the *Professor at the Breakfast Table*: 'you may be sure that some men, even among those who have chosen the task of pruning their follow-creatures, grow more and more thoughtful and truly compassionate in the midst of their cruel experience They become less nervous but more. sympathetic. They have a true sensibility for others' pain, the more they study pain and disease in the light of science. I do hope that I grow tenderer in my feelings as I grow older.'

LALIT KUMAR BANERJEE.

THE EVILS OF LIFE.

Stray Thoughts

1. As, in the merry month of May,
A cloud may shut the orb of day,
And drench us with a show'r of rain,
By stealth may come some evil hours,
To tease us on our beds of flow'rs,
And prick us with unrest and pain.

2. And, order'd by a loving God,
Unknown, unseen, may come the rod,
To scourge the sinner for his guile;
A sunnier time may come again,
To heal the wound and soothe the pain,
And cheer him with a gracious smile.

3. Our troubles come so thick and fast,
And sorely do we fret and moan,
Long, as they do not ever last,
Why should they make us weep and groan?
The storm will not outlast the morn,
Nor pouring rain outlive the noon,
Why should we feel ourselves forlorn
While there may come a change so soon?

4. Simoom breathes fire, and then comes quick,
The breath of Heaven to softly blow;
Clouds threaten with a thunder-bolt,
But rain refreshing falls below
To fill all things with life anew,
The ills of life, how very few!

BAHAR-UDDIN AHMED.

স্নান মন্দির।

Snan-Mandir, Khaspur—(*Cachar*).

DHRUVA'S CORONATION:

(A Vedic Hymn).

And thus we lead thee on, to crown thee King,—
Come forth amidst the people of thy land,
And o'er us reign unmoved and for long;
May all thy subjects love thee evermore,
And so thy kingdom never be impaired.
Secure on this thy throne, sustain the realm
With *Indra's* strength or of the Hima'lay,—
8 And never mayst thou come down from thy height.

Behold ye *him*, our new—anointed King,
Upheld bp *Indra's* grace by off'rings won,
And blest by Priests and *Soma*, first of kings;
The earth is firm, and firm the firmament,
These rocks are firm, and so the Universe,—
14 As firm is *he*, the lord of all of ye.

May Mighty *Indra*, *Agni*, Lord of Wealth,
The Ancient *Deva* Sage *Vrihaspati*,
And King Varuna, Dweller in the Law,
Preserve thy Kingdom safe and sound.
Behold, O King, with ample offerings
We pour the *Soma* wine in copious streams;—
And now hath *Indra* to thy sole control
22 Consigned the people waiting with their gifts.

SUBIMAL CHANDRA SARKAR, M.A.

ঋক্‌সংহিতায়াম্ ।ম-১০।১৭৩। ১-৬। ধ্রুবঃ।রাজ্ঞঃ স্তুতিঃ।অনুষ্টুপ্।

আত্বামাহার্ষমন্তরেধি ধ্রুবস্তিষ্ঠাবিচাচলিঃ।
বিশস্ত্বা সর্ব্বা বাঞ্ছন্তু মাত্বদ্রাষ্ট্রমধিভ্রশৎ ॥
ইহৈবৈধি মাপচ্যোষ্ঠাঃ পর্ব্বত ইবাবিচাচলিঃ।
ইন্দ্র ইবেহ ধ্রুবস্তিষ্ঠেহ রাষ্ট্রমুধারয় ॥
ইমমিন্দ্রো অদীধরদ্ধ্রুবম্ ধ্রুবেণ হবিষা।
তস্মৈ সোমো অধিব্রবত্তস্মা উ ব্রহ্মণস্পতিঃ ॥
ধ্রুবা দ্যৌ ধ্রুবা পৃথিবী ধ্রুবাসঃ পর্ব্বতা ইমে।
ধ্রুবম্ বিশ্বমিদম্ জগৎ ধ্রুবো রাজা বিশাময়ম্ ॥
ধ্রুবম্ তে রাজা বরুণো ধ্রুবম্ দেবো বৃহস্পতিঃ।
ধ্রুবম্ ন ইন্দ্রশ্চাগ্নিশ্চ রাষ্ট্রম্ ধারয়তাম্ ধ্রুবম্ ॥
ধ্রুবম্ ধ্রুবেণ হবিষাভি সোমম্ মৃশামসি।
অথো ন ইন্দ্রঃ কেবলীর্বিশো বলিহৃতস্করৎ ॥

THE DACCA REVIEW.

VOL.   DECEMBER, 1911.   No. 9.

SOME THOUGHTS ON RELIGIOUS EDUCATION.

One of the gravest charges brought against modern education in India is that it makes no provision for religious instruction. We have been repeatedly told that modern education is godless. It is making young men irreligious if not positively atheists or sceptics.

Education like everything else must be judged by the ultimate results it produces. Has it really produced a very large number of atheists among us? I wonder how western education could produce a religious thinker and reformer like Ram Mohan Roy, Keshab Chandra Sen or Swami Vivekananda? Leaving aside the present day political movements I think religious movements in India have always been in the forefront. The Brahmo Somaj, Arya Somaj, Theosophical Societies, among others are a few instances of the kind. There is a greater tendency today to study the religious literature of the past than it was ever before. The Vedas were almost unknown and unknowable. What education was it which made the late Romesh Chandra Dutt translate the Rigveda into Bengali? The Bhagabat Gita has now become almost a Hindu Bible—a copy of it is to be found in almost every Hindu household.

The education is to be judged not only by the results but also by the teachers who have been our educators. We must admit that we have been all brought up under the influence of Shakespeare, Milton, Wordsworth, Tennyson, Emerson, Carlyle and others. These authors are constantly on our lips. Probably it will not be an exaggeration to say that in our everyday life we think their thoughts. Our character and life have been very largely shaped by them. Now were these men godless? On the contrary I am inclined to think that they were, to use the expression

used very often in connection with Spinoza, God-intoxicated men. How could such men make us atheists? Many of us no doubt have read the works of Mill, Spencer, Comte and suchlike writers. But the insufficiency of their Philosophy has been sufficiently exposed to us under the influence of Kant and Hegel. We hear now a-days more of Kant and Hegel than of Comte or Mill. That distinctly shows which way the wind blows.

I think therefore that the charge that modern education is godless is not founded-ded on facts. But at the same time it must be admitted that it is doing a considerable amount of destructive work. Whether that work is good or bad posterity will judge. The chief characteristic feature of modern education is that it is founded on reason. Anything unreasonable or irrational it rejects. Religion, as it has hitherto been understood is based upon authority—the authority either of the scriptures or of the priest or of both. Sometimes it is based on the authority of tradition as well. Now education tells us in an unmistakable language that unless the authority can stand the test of reason it will be rejected. It is not the voice of the authority that makes the thing reasonable but it is the reason that makes authority authoritative. Even if the so-called Revelation does not reveal itself through reason it is rejected. Before this terrible attitude of education religion stands trembling. This is not the case in our country only but it is to be found all over the educated world. There was a time when religion dominated education. That period is now characteristically described as the age of darkness. We are living in an age when education is dominating religion. Has religion much to be afraid of this?

Religion *is* afraid in some quarters. Some of our countrymen have raised a war-cry against the present system of education, and have taken a decided attitude to bring back religion to dominate education. The vision of a religious University is a case in point. We are still in the dark what in the name of religion will be taught in that University. A Hindu University will of course teach Hinduism, a Mahomedan University Mahomedanism. But the question which I am inclined to ask is this: What is the source from which the religious teachers will derive the test of the truth which they will teach? If it is reason I unhesitatingly affirm that it is education which will continue to dominate religion and the result will be the same as it has hitherto been. In some cases the result may be worse. Religion may find itself in a very awkward position. It may find its existence threatened. If, on the contrary, it is the authority which will be the test of the truth we in many cases will have to shut our eyes on things which we have learnt from the so-called secular education. One would wonder if reason has no place in religious education or it has

a very subordinate place; why should it be otherwise in matters of secular education? If the fact that the world is only a *Maya* can be proved by a reference to Vedanta or Sankaracharya or that the caste system is good by a reference to Manu why should we adopt the "critical method" to know that space is subjective or that we have 'a priori' ideas to understand the Universe? A reference to Kant may be sufficient. Perhaps I may be told that I am going too far, that the religious University contemplates nothing of the sort. It wants only to create a Theological Faculty and in other respects the University will be the same as the existing Universities. I admit that a Theological Faculty is a good thing if it is meant for critical and historical study of Theology. But if it is meant to make the pupils religious the desired results may not be attained in all cases. Besides, few will pay University fees simply to become religious. What further prospect is there in the world for the religious man? When a Scotch student graduates in Divinity he becomes the minister of a church and is sometimes handsomely paid. What will our poor Hindu Theologian do when he leaves the University?

But a critical and historical study of Theology is a different matter. It may serve a commercial purpose. It may secure for the Theologian a professorship in a college. But if that be the object of establishing a denominational University I think the end might be reached by a shorter road. Why not create a Theological Faculty in each of the existing Universities? The money that is intended to be collected for the new University will, I am sure, be sufficient to create endowments for Theological Faculties.

From what I have said let none understand that I am opposed to religious instructions. But the religious instructions to be effective and healthy must be consistent with the spirit of modern education. Otherwise it will come as an antagonistic force to rational and scientific education. If it has really been found that western education is inimical to our spiritual interest why not take the drastic measure of shutting the door of this education altogether? Of course this will go against our commercial interest. But anyhow dogmatic Theology and Scientific or rational education will not work peacefully side by side.

But has really the western education done the mischief of which we are so much afraid? I have already referred to the destructive work which education is doing. The test of truth being reason we have been obliged to reject many things which have been found unreasonable. Is it a loss or a gain? I unhesitatingly affirm that it is a distinct gain. The object of education must always be enlightenment. It must enable us to discriminate between truth and error. That which is false must always be

rejected. If we in the light of education have found in our Theology or religion things which must be rejected why should we not do so? Why should we be afraid of that? A man must be blind indeed and susceptible of no education if he is not prepared to admit an error in his religion however profound or Divine. If human nature is progressive, religion is bound to be progressive and one of the indispensable conditions of progress is the discovery of imperfections.

I may here refer to one or two points: If modern education has pointed out to the majority of the educated Hindus that the present system of caste in India is antagonistic to the highest interest of man why in the name of religion should we cling to it or by sophistry try to vindicate it? A sincere and truth-loving Hindu will do well by rejecting it. He will do a real service to his religion. If caste is showing signs of decay under the onslaughts of education let it die peacefully. If it was one of the foundations on which Hinduism rested all that we need do is to revise our definition of Hinduism and try to find out a new foundation. The scientific world did not lament over the death of Ptolemaic Astronomy and the substitution of Copernican, nor over the death of the earlier vortex theory as an explanation of the movements of the heavenly bodies and the substitution of the theory of attraction. If truth is the end of science why should superstition be the end of religion?

We lament over the fact that our educated men have given up prayers to God. The thing is indeed lamentable. But at which door should we lay the blame? Is it to education or the mode of worship itself? If education has discovered that the existing method of prayer does no spiritual good why should the educated man adhere to it? Give him a more enlightened and rational form of prayer he will perhaps accept it. The revolution in this respect is more universal and far-reaching than the revolution in caste. Here we touch the point at which irreligiousness comes most prominently into view. But who is responsible for the result? Is it education or the form of worship?

The irreligiousness of which we complain has a deeper root. The education has brought about a revolution in our idea of God. The worship of God does no longer mean worship of 33 millions of gods and goddesses. The educated Hindu hates to be called an idolater. He is now a monotheist. An image of God is to him only a symbol But a symbol does not always attract. The Hindu in his inner life is thirsting for a living God. Give him that God and he will worship. This is the positive service which education has rendered in the field of religion. Nay, there is something more than that. The Hindu by nature is a philosopher. The rational education combined with the spiritual philosphy of the land has

taught him to recognise an immanent Reason in the Uuniverse which is also transcendent. The world in which we live is rational and the God whom we should worship is perfect Reason. Popular and traditional Hinduism is in need of reconstruction in the light of the Philosophy. Wiil the new University undertake to do this? If so, I for one hail it with all my heart. If not, let us cry 'Halt.' Let us not in the name of religion try to bring back the reign of darkness. Leave us alone, and the light of education which is shining among us will lead us to all truth and goodness.

P. CHATTERJEE.

REFORM IN THE HINDOO SOCIETY.

The word "reform" has owing to various reasons, and specially to the ill-advised and ill-planned attempts of some ardent spirits at sweeping changes in the structure of the Hindu society, acquired a bad odour among the Hindoos. In the inspiriting dawn of the modern civilisation in India, at the advent of the English, after ages of darkness and ignorance, there was a new awakening in the Indian world and a new spirit of reform in the Indian mind. The old and crumbling edifice of the Hindoo Society was about to be swept away by the flood of new thoughts and ideas which overran the whole country. It was felt on all hands that the Hindoo society must be mended or ended. Many set about the work of mending, but owing to want of skill and knowledge they failed to reconstruct what they had rashly pulled down. It was, therefore, natural that these inepts and in-experts were looked upon as bungling busy-bodies, and were strongly resisted in their work of reform by the Hindoos, who would rather cherish the dilapidated mansion of their forefathers than lose it altogether. This state of things has continued up to the present time, and the Hindoo has a natural terror of the reformer.

There are many other reasons why reform is so distasteful to the average Hindoo. For a long time past the Hindoo society has been extremely exclusive and restrictive. It has been bounded by strict geographical and ethnological limits set by its Sastras. The actions and movements of the Hindoo have, in most matters, been prescribed for him by authority. In many matters of life he is only an automaton having no independence or judgment of his own. The inevitable effect of such a system of restraint and limitation acting upon the mind for centuries and centuries has been the debilitation of the power of independent thinking and acting. The average Hindoo can in very few matters act on his own account or take the initiative. He must have a quotation from the Sastras in support of an argument or a dogma before he will be prepared to accept it. It is thus that he has

become the slave of custom and tradition and the priesthood which is the interpreter and administrator of the Sastras, both religious and social, has come to occupy a position of absolute predominance over him. The Hindoo is priest-ridden aud custom-ridden. He is thus a conservative of conservatives; the forms and rules and the customs and traditions of his society, whether reasonable or not have grown into his very system and have cast their roots deep into his being. They have become part and parcel of him and he can no more break away from these than he can escape from his own self.

This exclusiveness again, has, by circumscribing the world of the Hindoo, also narrowed his mental horizon. He long believed the world to be co-extensive with his own and even when he heard of new countries and new nations he looked upon them as barbarians. This want of contact with the outside world and the consequent want of emulation led to contentment and self-sufficiency and ultimately to dogmatism and ignorance. This ignorance has been the entailed inheritance of the average Hindoo and has been the fruitful mother of innumerable superistitions and absurd customs in the Hindoo society; and like Milton's Chaos has ever resisted the incursion of light into its sacred domain of disorder and darkness.

The Hindoo priesthood also has tended to make the spirit of reform so rare among the Hindoos. The priests being looked upon as the guardians of the society the common man has no business to trouble himself with its affairs; nay, he even looks upon a reform or change which does not emanate from the priest class as unlawful and dangerous. This class which under the present conditions enjoys a monopoly of power and privileges and which in some cases even trades upon the ignorance and superstitious beliefs of the common people, must be opposed to any changes in the existing order of things. Thus, again, the ordinary reformer has no place in the Hindoo polity.

The caste system is another great obstacle in the way of reform. Though the Brahmins, perhaps, did not devise it they at least helped to perpetuate it. Economic reasons may have first given birth to it; but it is the Brahmins who set their holy imprimatur upon it and made it a permanent institution of the Hindoo society. Though, while giving it the stamp of their authority, they did not conceive the policy of 'divide and rule'; in its ultimate effect it came to make the Brahminical superiority absolute by rendering united resistance to their authority impossible. Each caste considered itself as only a petty member of a mighty body and it never entered into its head even in dreams to set itself in opposition to the central authority. Humble as it might be it was content to share the glory of belonging to the proud hierarchy. A man had no place in society unless he belonged to

a caste; everyone therefore, looked upon his caste as a valuable privilege, and no one would be fool-hardy enough to lose this by offending the Brahminical authority. Excommunication was the most terrible of all punishments. Rebellion in a caste against Brahminical authority, therefore, has been an unheard of thing in the history of the Hindoo Samaj; and reform which would mean the ignoring of this authority and sometimes even a curtailment of it, also has been extremely rare in the community, in the course of its long existence. Things have drifted in their own way; time and circumstances have had their share in modifying and remodelling the Hindoo society; but very little conscious human effort has been put forth to give it a new direction, or to infuse a new spirit into it. There have been great religious reformers, mostly from the Brahminical class, from time to time, but they have left the social organisations severely alone. Religious emotion is an impetus from within; it does not reck of external obstacles; hence in religious matters there have been reforms now and then in the Hindoo community. Yet as these movements are generally originated by Brahmins who could not altogether divest themselves of their Hindoo spirit these have been more in the nature of new interpretations of the Sastras than real innovations in religion. Hence inspite of these apparent revolutions the community has sustained but very slight shocks in its religion. In its social side the changes have been still less marked; for in social reform the motive of reform originates in reason and worldly calculations and where reform is not acceptable to the majority of a community one is not likely to bear the standard of it in teeth of a terrible array of power set firmly against it, merely for the sake of glory. Thus the number of social reformers in the Hindu Samaj have been very few indeed.

The depressed condition of women in India is another circumstance unfavourable to reform. Even among the higher classes female education has always been almost a proscribed thing; and although now its necessity is being recognised by all, it is still a rarity among the Hindoo women. The majority of them are illiterate and wedded to the old superstitions and antiquated and effete customs. It is no use that our men in the higher classes are more or less enlightened; they cannot counteract the evil influence and degrading tendencies of their homes. They have been brought up in veneration of foolish things by their mothers and when their education is just beginning to wean them away from these they come under the influence of their wives, and are for ever tied to them. Even where the mind has been sufficiently enlightened to see through the dark veil of superstition and false belief, it gives a tolerant assent to the ignorant creed of the mistress of

the house to whom it owes a natural allegiance. Man must rise or sink with his natural co-partner in life, the woman; and where the woman-kind have scarcely emerged from the very rudest stage of culture and civilisation it is impossible for the community to attain to any high social development. Fortunately for the Hindoo society the forces of ignorance and barbarism which are at work in it have not led to their natural and logical consequences. The society, in fact, is not so degraded as the ignorance prevalent in it must make it under normal conditions. The reason for this is that the Hindoo household is so regulated by a comprehensive code of social, moral and religious laws prescribed by the Sastras, that the Hindoo maintains a fairly high level of conduct and manners, not in consequence of his ignorance, evil customs and superstitions as many believe, but inspite of them.

Next the universal tendency of the human mind to make much of old things, to cling to the beaten track and to regard with distrust new and untried experiments, accentuates the conservatism which is an indigenous product of the Hindoo soil. The human mind every where is averse to innovations and it is still more so in India where it has long been used to look upon the past ages as the golden eras of Gods, as the iron era of Kali—an era in which pigmies and dwarfs and all kinds of sin and corruption are destined to flourish. The ordinary Hindoo regards his social organisation as the handiwork of gods and inspired saints and cannot conceive that it can be improved by any reform which has a human origin. Unless a man claims to be a god and is recognised as such he has no chance as a reformer here.

The Hindoo has so long had no authentic history of the past stages of his community and consequently he cannot realise that the present structure of his society is vastly different from what it was at different periods in the past; he, therefore, believes that it has always been as it is and will continue so to the end of time. It is, in his imagination as constant as the sun and the moon and as likely to change as they. The reformer who talks of any defect in such a society is regarded as a fool and visionary.

However averse the Hindoo may be to reform, whatever may have been the forces of conservatism imparting a rigidity of structure to the Hindoo society and religion both of these have moved along with the times and however gradual and slow the changes may have been their accumulated mass now has made the Hindoo of today vastly different from his ancient forbears. The wheel of change though retarded in its motion by counteracting forces has still had many revolutions within the Hindoo society and imperceptible though they have been they have still measured a great distance, for good or for evil from the starting point. The unhistoric al

Hindoo may look upon the existing structure of his society and religion, made up of an infinite variety of parts belonging to different ages, as unchanged and unchangeable ; but they have been no more constant than the waters of the Ganges since they first began to flow. Now the question is : is any active reform in the Hindoo society necessary today ? or should it be allowed to drift as hitherto down the stream of time ?

One thing is certain ; it is that both conservatives and reformers want ideal perfection in their institutions ; the difference between them lies in the fact that while the former regard these institutions as the nearest possible approach to perfection, the latter look upon them as very far from the ideal stage. The reformer may be a little too sweeping and precipitate in his plans of reform ; but the orthodox Hindoo is on the other hand too much enamoured of the old forms. The forces of the West, however have made deep breaches in his citadel of superstition, and he is uneasily looking about for a safer and more unassailable position for his society and religion. Hence were the attempts on his part a few years ago, to discover spiritual and scientific significance in all his practices and customs. These spiritual and scientific interpretations were very popular for a time and paraded with great exultation in the face of the opposite camp. But such yarns as these could not long hide the internal rottenness of his affairs; and it is more patent now than ever in the broad light of the new dawn. What is to be done now ? Should we set about putting our house in order or stand by and see its ruin ? No one would willingly prefer the latter alternative ; but there is very little apprehension of the danger visible even among the more enlightened Hindoos. They have a great faith in the inherent vitality of their society and they believe that things let alone will right themselves in time. Only occasionally is there a little misgiving that all may not be right. But the uneasiness is not at all proportionate to the magnitude of the danger ; for while we are sleeping in our fools' paradise the world is marching on with long and rapid strides and leaving us far behind in the race of life. A few who are awaking now and then are trying to give the alarm, but the stupor which has been induced by deep draughts of vanity and self-satisfaction is too deep to be broken. Are we not the descendants of the old *rishis* and heroes of India ? Are we not the inheritors of the glorious Hindoo civilisation of the past ? Are we now to forget the past and sit at the feet of others in the humble role of learners ? The slightest suggestion of such an idea is an insult to our birth and time-honoured name. This being the attitude of many, any attempt at reform from outside is resented as an impertinent interference and is never tolerated. Thus the well-meant efforts of Christian and Brahmo

missionaries to remove some of the evils of the Hindoo society have proved abortive. We are thus stagnating in the midst of universal progress. We ourselves are stricken with the paralysis of indolence and apathy and we refuse to accept help from others. It is indeed a most desperate state of things. If we had our eyes fully open we might be staggered at the sight of the dangers with which we are beset. It is the duty of every true Hindoo who has a spark of love for his society and religion, to raise his voice in warning against these dangers and though he may be like one crying in the wilderness, the time will come when the gospel of truth and light will spread over the whole land.

The Hindoo society has one peculiarity arising from its extreme exclusiveness. Paradoxical as it may seem, it is a fact that while it has ejected from its pale all who have in any way broken away from it, it has also opened its arms wide to embrace the successful reformer who has given fatal blows to its old institutions. Because it has set a barrier round it, it has now and then opened a stake in it to admit a formidable foe into its pale rather than expose the whole to his battering ram. The power of assimilation and adaptation is the great virtue by means of which it has been able in all ages to propitiate its rebel sons and to accept their reforms and take its stand on the new and wider basis laid down by him. Thus it has escaped disruption and disintegration by bending before the storm and by converting enemies and opponents into friends by a conciliatory policy. So we see that in spite of its severe conservatism and rigidity of customs it has always been most tolerant and liberal whenever it has deemed it prudent to be so. It has the knack of compromising with a foe and of yielding with grace where resistance is unavailing. In the modern Hindoo society we see innumerable instances of this sort of compromise with western habits and modes of life. It is in this trait of the Hindoo society that the hope of the reformer lies. If he can tackle successfuly with it he is sure of a hearing; but woe unto him if he is weak-hearted and quails in the fight. Every ordinary Hindoo, therefore, feels that the task of reform is not for him and with his inherent faith in destiny he quietly submits to evils of the society he has been born in rather than quarrel with it. But the strong and earnest reformer need not despair. He need not fear to strike the giant; let him but strike home and the giant will cry for a truce. What we require is pluck and an appreciation of our power.

Every true Hindoo should actively pursue the work of social reform. We have followed the policy of *laissez faire* too long and the results of it have been disastrous. We see only signs of decay and decline all around us; if we want to save our society from ruin and dissolution we must remove the loose and crumbling rubbish from it and put new

cement in its place. But we must proceed about the work cautiously. Our watchword should be reform and reconstruction and not revolution. Hindooism will not tolerate revolution as long as it has a spark of life in it; but judicious reform has always been acceptable to it provided it has been enforced with sufficient strength and vigour.

The orthodox Hindoo must overcome his prejudice against reform. He must remember that society was made for man, not man for society. Society must be changed to conform to the changed nature of man; not he to adapt himself to a rigid form of society. The past has led to the present; bnt the present cannot go back to the past. We can remodel the past, improve upon it and change it, but to try to restore the past or to perpetuate it and bid the wheel of time stand still, must be a useless labour. We often despair of reform for want of a central authority to enforce it; but as the advancement of knowledge has utilised the hitherto unknown power of steam and worked wonders with it, so the light of the new learning has awakened new powers of self-help and self-confidence in us which may also work wonders in the field of reform, if only we can muster sufficient courage for the undertaking.

The relation between the orthodox and the liberal Hindoo should be one of co-operation and sympathy and not that of antagonism and aversion. They are the two necessary counterparts to a living society and it is the forces of conservation and new-moulding that can really conduce to the upbuilding of it. The modern is not to be blamed for his breaking away from the old and effete forms, nor is the orthodox to cling passionately to the petrified customs of old. A duty rests on both of them. While the one should appropriate all that the reformer has achieved, the other should in all reasonable matters respect the susceptibilities of the former. The work of reform can never be smooth; a good deal of dust must be stirred and a good deal of conflict and antagonism must arise; there comes a time when the atmosphere clears and the blood cools; it can not be difficult then, for the honest men of the two parties to come to a compromise and mutual understanding. The assimilation of many Brahmo ideas by the Hindoo society is an instance in point. Although the orthodox will not drift into the camps of the reformer and the latter also will not consent to retrace his steps to the fold he left long ago, fairminded men on both sides can always meet each other half-way. Casting stones at each other will harm both sides. Let us recognise the truth of this and let us work together for the regeneration of our society.

On the educated Hindoo rests the great duty of moving in matters of reform. Let him not cherish and hug to his breast the evil customs of his society out of a mistaken sense of filial

piety. Duty should prevail over sentiment and it is to this call of duty that every nerve and muscle of his body should tingle with response.

JATINDRA CHANDRA GUHA.

THE STORY OF SUDASA.

[THE GREATEST EMPEROR OF VEDIC INDIA.] (INTRODUCTORY).*

The literature of any period cannot be fully comprehended in its full import unless we know something of the history of the times. The Vedic literature, as interpreted by philological methods dissociated from history, appears to have been but imperfectly understood. A preconceived notion of the extreme primitiveness of the people of those times has prevented the revelation of the inward meaning of the sacred texts to modern savants, first as a similar notion of the religious nature of the entire Vedas prevented our mediaeval annotators from grasping the real sense of these in relation to place, time and person. Read properly from the common-sense point of view, and with a due measure of the spirit of higher criticism, the Vedas (atleast the Rig Veda) do not seem to bear out the hypothesis, that they are a compendium of "Shepherds' songs" merely, or an exposition of their "Natural Religion;" nor can it now be said that the Puranas of later times developed a mass of myths and legends from a misreading of Vedic names alone.

The placing of the Rks in time has been for long a disputed question. Some scholars (*e.g.* Jacobi) have tried to solve it by astronomical calculations based on certain conditions indicated in some of the ancient texts. Some (the Philologists) have sought to give a 'rough idea' of the age of the Vedas by expounding the wonderful evolution of Brahmanical Sanskrit from the Vedic, as if under the wand of a magician. Others have made the matter simple enough by assuming that the age of the Vedas was removed from that of the Buddha only by a few generations. That Indian antiquity can reach far beyond the first millenium B. C., has been but slowly and reluctantly admitted.

The best way, however, of ascertaining approximately the times of the Vedic compositions, seems to us to be a critical historical study of the Riks themselves.

* In order not to encumber the article by detailed references, the principal works consulted may be here briefly indicated:—Rig-Vedo (supplemented by informations gleaned from Aitareya Brahmana and Aranyaka, Satapatha Brahmana, Vrihaddevata, Sarvanukramani, Vedarthadipika &c.,) Ramayana (Gorr. Edn.), Mahabharata, Puranas—chiefly Vayu, Vishnu, Matsya, Agni and Markandeya, Vedapravesika (Vatovyal), Pargiter's Article in J. R. A. S., 1910, I., Muir's Sanskrit Texts, &c. &c.

It is a mistaken notion of history misread that has classed the Rig Veda amongst purely theological scriptures. Although there is much that is exceptionally devotional and spiritual in the Riks (*e.g.* of Vamadeva and Madhuchehhanda), the greater number of them have been composed on given occasions, such as, a great sacrifice, a memorable battle, or a remarkable episode (*e. g.* the sacrifice of the Queen of Purukutsa, the fight of the ten Eastern Kings with Sudasa, or the wooing of Syavaswa).

Even at the first reading the recurrence and prominence of several names cannot but fail to impress the reader. On closer study we paid that most of them are closely connected in events, and reflect a definitive period in the history of Indo-Aryan civilization. The Rig Veda, in fact, is not wholly an anthology of verses, scattered in time far and wide; but most of it has been composed by persons who were contemporaries or little removed from one another, and they appear to have recorded in song great synchronic events (*e.g.* colonizations under Bharata-Daushyanti, the conquests of Sudasa, or the prosperity of Mandhata's successors).

The "seers" of atleast six of the socalled Mandalas, and many of the "Satarshis" too, are either contemporaries or nearly so; and these mostly appear round the distinctly central figure of Emperor Sudasa, whose greatness and achievements form the theme of many a Rik.

Leaving out a few Riks which may have been composed earlier or later, we find that the Rik-literature arose amidst the flux of life consequent on the dispersion of the Yayatyas from Pratisthana and the beginnings of a new expansion of the race in the basins of the two great river-systems of North-India; and that it perished in the almost universal devastation spread by the Bhrigus under Parasurama (to all appearances aided by the Haihayas of the S. West). If any similar compositions continued to be made after the calamity, by the time of Krishna-Dvaipayana-Vyasa, the fountain had entirely failed, and the Vedas had to be compiled into Samhitas.

The most glorious period of Vedic India was that which saw two great empires rise and fall, viz., those of the Paurava, Sarvadamana-Bharata, and the Panchala, Sudasa-Raghu, inaugurated respectively by Dirghatama and Vasistha.

Bharata had an easy task to become an Emperor. He had inherited a large kingdom from Dushyanta, who, as successor to Emperor Marutta by adoption, had combined the dominions of the Turvasas and the Purus; and the territories of the Eastern Pauravas, passed to him when that line failed. The expansion of Bharata's dominions is alluded to by Dirghatama, and it appears to have been mainly colonial. Warrior-settlers advanced to the East under Bharata's protection and active

assistance. But it was not conquest in its true sense.

Sudasa, however, rose from a petty chief to be a Samrat ; and, like Alexander and Napoleon, he made wide and splendid conquests. It must be here understood that India was then a vast congeries of states, only a few of which were purely Aryan, and it appeared not to be a single country but a great continent (stretching from the Oxus to the Brahmaputra) affording ample field for an ambitious career. And it seems probable, that the royal practice of marching forth on conquering expeditions, known as "digvijaya" in our literature, had its rise in the initiative given by Sudasa, who appears to have been identical with "Raghu."

II.

[A SHORT SKETCH OF THE PERIOD PRECEDING SUDASA'S.]

The circumstances and trend of events that made the rise of such a man possible were unique and interesting. The empire of Sudasa was perhaps the inevitable sequence of conditions originated by the preceding period of history.

All acquainted with the earliest annals of ancient India know, that the imprecations pronounced on his sons, by Yayati-Nahusha, did not come to be fulfilled to any great extent. The lines of Yadu, Turvasu and Anu became famous inspite of his malediction, and we find several great names in them [*e.g.*, Kirtaviryya, Arjuna-Sahasravahu, Talajangha, Gritsamada-Saunaka, Sasavinda and sons, Jyamagha, Hari, Vidarbha, Vala-Rama, Vasudeva-Krishna,—in the Yadava line ; Marutta,—in the Turvasa line ; Usinara, Sivi, Kekaya, Jitikshu, Vali and sons, Lomapada-Dasaratha, Karna-Kamteya (adopted),—in the Anava line]. The line of Puru, who had been blessed by his father, did not last longer than about four generations, after which the Paurava possessions to the son-in-law (Tritsu) or daughter's son (Ailina) of the last direct successor, Matinara.

Here it is necessary to go into some detail to make matters clearer.

Janamejaya I. (or Raudrasva, according to other versions) succeeded Puru at Pratisthana (later, "Portospana," modern Kabul), when the Yadavas, Turvasas and Anavas had already left N. W. India in pursuance of a new life in the plains.

The Yadavas followed the Susoma-Sindhu to the sea, and moving along the coast reached the Saurashtra country and the Narmada ; thus the entire South-west and Central India fell within the sphere of Yadava influence. The Anavas in moving along the foot of the Himalayas left a branch at Girivraja, which spread along the Sindhu (founding "Yaudheya," "Sivipura" and 'Sauvira' among others), and finally settled beyond Mithila and Kikata in the far east under Titkshu. For there

was no place for them in the territory between the Gomoti and the Kausiki, which had already been occupied by Princes of the so-called "Solar" race. The Turvasas kept a middle course, and although urged forwards by Paurava pressure at the back, grew rich and powerful enough to found a modest empire under Marutta (apparently in the Ganges valley). * The Druhyas retired to the West of Pratisthana, but, as we shall see, later events favoured their return. Many of the Pauravas, however, perhaps envious of the plenty which the elder branches enjoyed, issued forth from the North-West under the lead of Prachinvan far to the East, and it is very probable that they founded, at the confluence of Jamuna and the Ganga, the second Pratisthana, named after their original seat.

The main stock of the Pauravas continued in the old Protisthana for some time; but as the East, then a sort of "no man's land," had been given to Puru's race by Yayati, and as Nahusha-Indra had already brought the Saptanadi basin under his sway, † it was not long before the two branches met. The Druhyas now stepped into the old shoes of the Pauravas, and settled in the Kubha valley (to which they gave the name of Gandhara after one of their princes), when the latter removed their capital to the Prayaga; a few generations later, they had become lords of the entire mountainous North-West.

Meanwhile, the direct line of Puru was on the verge of extinction. Matinara's grandson Kanva, afterwards a famous Rishi, was at first blind and deaf, so disqualified as a prince. * Of the daughters of King Matinara, Gauri was married to Yuvanasva II. of Ayodhya, and became mother of Gaurika and Mandhata of wide fame. The other daughter, Ilina, appears to have been married to Tritsu (of whom nothing else is known); and he, jointly with his wife, becme the ruler of the Paurava kingdom.

From this new comer, the Purus derived an alternative appellation, the "Tritsavas." The son of this Tritsu was the famous Dushyanta-Ailina, who has been in more senses than one called the "Paurava-Vamsakara."

Just about this time, Sudyunna of the Puru-Prachinvan line also called

* It is not known at what period the Turvosas left the company of the Yadavas with whom they crossed the sea and came to Surashtra; ultimately they appear as far as down the Ganga as Vaisali.

† The great sacrifice of Nahusha on the Sarasvati, and his conflict with the settlers in the Punjub plains, on whom he first imposed taxes, are well known events in the Rig-Veda.

* Kanva was son of prince Nrisadha or Apratiratha, who is the Rishi of several hymns in the Rig-Veda, Kanva is said to have been, either born-blind, or blinded, while a prisoner. He was ultimately rescued, and by divine grace, his eyesight was restored and he was turned into a sage delighting in "divine music.'

Dhundhu, was overthrown by Kuvalayasva of Sravasta (hence surnamed Dhundhunuara). Most probably the two Paurava kingdoms were then amalgamated under Dushyanta, for New Pratisthana appears to have been the capital of his immediate successors.

It so happened, to the good fortune of Dushyanta, that Marutta, the emperor of the Turvasas, was childless, and had to turn, to the Paurava line near at hand for an adoption. Marutta's dominions therefore were bequeathed to Dushyanta whom he adopted as his son. In the genealogies, Dushyanta's name appears in succession of Marutta's. Dushyanta however reverted to his own clan, and established the Paurava race anew as it were, greatly augmenting its power and glory.

But this greatness lasted for another generation only—it ended with the death of Bharata. The valiant son of Sakuntala sent forth his arms far and wide, and gave his name to the land under his sway. But the House of Puru was apparently doomed to great reverses ; for, although Bharata had numerous (at least nine) sons, their extreme incapability as princes of royal blood cast a gloom over the latter part of his reign.

Several Puranas state that all the sons of Bharata were killed by his queens, as they were weaklings. This does not seem to be true ; and, like the anecdote of Asoka and his ninety-nine brothers may contain a deal of exaggeration. But there is no doubt that Bharata performed a "Putreshti" sacrifice for obtaining a 'capable' son, wherein Dirghatama officiated as priest ; but he certainly did not get one. The names of three of his sons are known from the Rigveda : Asvamedha, Devasrava, and Devarata ; probably they lived in exile. Asvamedha, alone of his brothers, seems to have made a systematic effort to raise himself from obscurity.

At all events, when Bharata died, there was none to save the empire from disruption and internecine war. Bharadvaja-Mamateya (the well know Rishi), whom Bharata named as his successor, had been adopted into the Royal family, perhaps at the instance of Dirghatama, the royal Chaplain, who as half-brother of Bharadvaja, gave him away. This graft form a family of "Maghonas," under the changed name of Vidathin, assumed the nominal charge of the vast dominions left by Bharata to him, in supersession of the claims of his several sons (Asvamedha and others), who appear to have left the intruder, and joined Sambarana the famous son of Riksha. Vidathin, however, was evidently no match for the powerful newly formed confederacy of the Panchalas, who, along with other claimants, soon reduced his possessions to a few districts round about New Pratisthana (the capital). There Bharadraja and his successors continued to rule as subordinate chiefs, and one of the House

was visited by Rama-Dasarathi when he was on his way to exile.

The Pachalas, who broke up the Paurava empire, were perhaps later comers into India, and, like the Gauls that upset Rome, were 'barbarians' of the Aryan stock. This is evident, in the first place, from the peculiar name-endings of their earliest leaders ; they are all "Midhas" ('Milh', 'Medha,' optionally):—e.g. Aja-Midha, Deva-Midhas' Pura-Midha, Pruja-Midha, Su-Midha, Nri-Midha, several of whom are known to have been brothers. [Were they Medes from Central Asia ?]. But curiously enough, this peculiarity vanishes in the next generation, and the names now become indistinguishable from the common run of Indo-Aryan names, except for a few crudities here and there (*e.g.* Vadhri-asva). [The same Indianization of names is noticeable, in later ages, in the lists of Kushana kings of North-West India and the Satraps of the South-West. What is more remarkable is that, by that time, they had changed their clans (gotras), if they had any, and accepted those of the well-known "Rishis" of the time ; for example, the Priyamidhas began to call themselves as belonging to the Kanvas ; and Ajanudhas, Puramidhas and Nrimidhas affiliated themselves to the Angirasa clan, to which Samvartta and Diraghatama belonged. This was perhaps done with a shrewd practical object ; for the Kanvas (descendants of Matinara) and the Angirasas were politically connected and influential in imperial circles, while the former had legal claims to the Paurava empire. [We shall presently see that it was from this Angirasa clan that Emperor Bharat chose his successor, and this may account for the close and lasting alliance between the 'Tritsava-Bharatas' and Divodasa and Sudasa.]

That the Midhas were so rapidly assimilated into the existing Indian communities, is not surprising when we know that they were not far removed in race and religion from their neighbours of the plains.* They too used 'Agni' as a medium of worship, and composed hymns for sacrifices. Ajanudha and his brothers were 'Rik-makers,' and the number of their compositions is considerable.

In the second place, inspite of certain general *similarity*, there were several important differences in custom and constitution. The Midhas seem to have been governed by a sort of Pentarchy, five princes of the same House ruling jointly at the same time. This seems to be the origin of the name Panchala given to them, and many apparent discrepancies in the genealogies of the Panchala princes can be explained only by the hypothesis of this pentarchical

* According to Herodotus, the Armenian writers, and Rawlinson, the Medes were the only people, except Indians, who called themselves "Aryas." Indeed, the Medes were known to classical literature (e.g., Æschylus) under the of name "Aryas."

system. Like most of the Himalayan tribes (Aryan or otherwise) the Midhas probably brought with them a relic of the primeval custom of Polyandry, which might have been found a convenient concomitant to the institution of five co-rulers. This peculiar custom, however, soon died a natural death in India, being lost in the midst of a higher civilization and different social and economic conditions. It was therefore with some difficulty that popular opinion, a few generations later, could be persuaded to acquiesce in the marriage of the Panchala princess Draupadi with five husbands at one and the same time, which was then a political necessity for both the Pandavas and the Panchalas.

It is not very clear when these Midhas first made their appearance in the plains. There was no room for inroads during the reigns of Dushyanta and Bharata. The opportune moment for their immigration seems to have been the interval during which the Paurava kingdom (then the westernmost in India) changed hands, and ultimately devolved on the Princess Ilina and her consort. This conclusion is confirmed by the lists of Panchala princes in the Puranas, and notices of them in the Rigveda. Divodasa and Bharadvaja (5th from Ilina) were contemporaries, and the latter speaks of Vadhri-asva as the father of Divodasa; again Vadhri-asva was one of the "Panchalas" (*i.e.* the five co-rulers) who were sons of Ajamidha. Thus Ajamidha and his people would come directly after the time of Jhina and Tritsu, and may well have sided with and befriended the Kanvas.

This Aja, the Mede, was a remarkable person. He was a Prajapati (patriarch) in the truest sense of the word. He was the progenitor of at least two famous princely families, *viz.*, the Kurus and the Panchalas.

The first of Ajamidha's wives was Nila, who bore to him *five* sons, Santi, Susanti, Purusanti, Arka, and Vadhri-Asva, the fifth (whose name is variously read). In the Rig-Veda, Vadhri-Asva and Devavan are one and the same person, and father of Divodasa, surnamed 'Atithigva' (sometimes 'Puru' or the Prince Bountiful), and also known as Chyavana or Pijabana. Divodasa must be identical with Mudgala, instead of being that person's son (as some lists have it); for his son Sudasa was also called "Indrota", and Mudgala's wife was the warrior-queen Indrasena; and in a heroine like her is the mother of a hero like Sudasa to be sought. ["Mudgala seems to be a complimentary appellation (meaning 'strong as a club', or 'the great club-fighter') given to Divodasa after the battle wherein Indrasena took a leading part; this is apparent from the passage in the Rig-Veda where the fight is described.]

The Kurus were in all probability a mixed race, the result of an irregular union of Ajamidha, in his later years, with a 'Dasa' girl, who is described as "Dhumini," or the smoke-complexioned

one.' Their offspring was Riksha, who, finding no scope for activity among the Naileyas (and his other half-brothers) during Bharats's strong rule, went to the Southern Hills, perhaps among his mother's race, to whom he gave his name. The Rikshas of Central India fought with Jyamagha-Sasavindava beyond the Narmada. A few generations later, we find Risha tribes helping Rama-Dasaratha in his Southern expedition; and later still making allowances with Krishna-Vasudeva. Riksha's son Sutarvan, however, reappears in the Punjab, on the Parushni, probably when at Bharata's death he had made himself master of the South-west of his dominions, with the help of the emperor's rejected son Asvamedha, who must have been backed by Vidarbha as the son of a Vidarbhi princess. This alliance may have been contracted in Central India. Arksha-Sutarvan is most probably the same person as Arksha-Sambarana; and Sambarana, whom the Mahavarata states to have been driven out by the victorious Panchalas, is certainly to be identified with the Sambarana, whom Divodasa expelled from his possessions in the Northern Plains, and whom Sudasa killed in the Southern Hills, forty years later. Sambarana made amends for his mixed descent by assiduously courting, and afterwards marrying, Tapati, a princess of the 'Solar' line of South Kosala (perhaps daughter of Trasadasyu, the grandson of Mandhata) and made a final stand, on the strength of this royal alliance, against the Panchalas, who hated this rival claimant to the North Indian Territories. But his enemy's son Sudasa was more than a match for him, and when he was killed, his son Kuru was a boy. *Here*, was sown the germ of the long-lasting and finally fatal quarrels of the Kuru-Panchalas, which ended in the destruction of both the Houses, and along with them of nearly all the ruling families of Aryavartta.

THE UNIVERSITY OF NALANDA.

IV.

The Curriculum of Nalanda and its most distinguished Alumni.

Gunamati won in a controversy at Nalanda while yet young; at Visoka he is said to have held a debate with the Hinayanists for seven days (1) and near Kosambi also he gained a victory in a famous controversy, (2) not to mention his written controversy with Bhavaviveka. We have already referred to his famous work on Jogachara and he may also be the author of the commentary, called *Paramartha dipini*, on the *Theri Gatha.* (3) Chandrapala is next mentioned by Hiouen Thsang, but we neither get any biographical notice of him anywhere nor is any of his works extant. The most renowned disciple of Dharmapala was Silabhadra the fame of whose vast erudition has been perpetuated by

(1) Watters, vol. I, p. 374.

(2) Ibid, p. 372.

(3) Kern's 'Manual' p. 129.

his pupil Hiouen Thsang. As a young man he is said to have been fond of learning and of exemplary principles. He travelled throughout India seeking the wise and met Dharmapala at Nalanda. He soon became very well-versed in Buddhist philosophy and his fame extended to foreign countries, (1) and in China, he was known as Danta Deva. He showed great originality by attempting a genetic treatment of Buddhism in collaboration with Manaprabha and he divided Buddhism into three stages of which the third stage he believed to be final. (2) While studying with Dharmapala, he is said to have defeated in controversy a Brahmin from Southern India whereon the king to mark his victory offered him the revenues of a whole city. Silabhadra refused it, but on the king's importunity, he accepted the sum only to spend it in erecting and maintaining a monastery near Gaya known after his own name. (3) Next is mentioned Jinamitra who made a valuable compendium of the Vinaya of the Sarvastavada (4) and added some verses to the *Sardha-Sataka--Buddha--Stotra*,—a work by many hands—both translated by I-Tsiang. (5) Another of Hiouen Thsang's contemporaries was Prabhamitra, a Khatriya of Magadha. He translated into Chinese a treatise by Asamga containing Asamga's exposition and defence of Mahayanism. It is in verse with a prose commentary throughout and the translation is pronounced by Watters to be of great merit. (6) Hiouen Thsang closes the list with the mention of Manachandra who may be the famous teacher of West India, mentioned by I-Tsiang. (7) To Hiouen Thsang's list, we may add Chandra Gomin, Chandra Kirtti, Ratnasingha, the master of I-Tsiang at Nalanda, (8) Santa Rakshita and Kamalasila—who all flourished during the Tantrika period of the Nalanda University.

It would involve a misnomer to speak of the philosophical curriculum of the University of Nalanda. Philosophy was not studied here in the same spirit as Grammar, Logic or the Medical science. It was the very breath of the life of a monastery, its raison d'etre. The highest religious ideal of a monk was based on the right comprehension of the particular system of philosophy to which he belonged ;—the ideal set in his chosen system was the ideal of his religious life. Hence philosophy was studied not in the spirit of a scholastic learner but in the spirit of religious devotee. It was the object both of study and practice, both of intelligent comprehension

(1) Watters, vol. II, p. 109.

(2) See Suzuki in J. B. T. S., Vol VI.

(3) Watters, Vol II, P. 169.

(4) Ibid, P. 169.

(5) See Takakasu, Into. under 'The Great Nagas'

(6) Watters, Vol I, P. 357.

(7) Takakasu, P. 184.

(8) Ibid.

and of perfect realisation. I—Tsiang prescribes a course of training for a priest (1) who, he says, should be able to defend religion against heretics and must contemplate Twofold Nothingness, study Eight Noble Paths and Four Meditations and observe Seven Skandas, thus showing that he was not an opponent of Hinayana methods. In his list, he prescribes the works both of the Mahayana (specially Jogachara) and the Hinayana Schools :—

(1) *Mahayana (Jogachara) works*:

(i) Vidyamatra Vinsati (Gatha) Sastra or Vidyamatra-siddhi by Vasubandhu.
(ii) Vidyamatra-Siddhi-Tridasa Sartra-Karika by Vasubandhu.
(iii) Mahayana Samparigraha-Sastra-Mula by Asamga.
(iv) Abhidharma (Sangiti) Sastra by Asamga and commentary by Sthiramati.
(v) Madhyanta-Vibhaga-Sastra by Vasubandhu.
(vi) Nidana Sastra by Ullangha; by Sthiramati.
(vii) Sutralankara—Tika by Asamga.
(viii) Karma-Siddha Sastra by Vasubandhu.

All these books are extant in the Chinese and are given in Nanjio's Catalogue.

2. *Hinayana works.*

(i) Six treatises all of Sarvastavada School relating to Metaphysics (Abhidarma) (1).
(ii) The Agamas or the Nikayas of the Pali Tripitaka, *viz.*,
(*a*) Dighagama—30 sutras (cf. Dighanikaya, 34)
(*b*) Madhyamagama—222 sutras (cf. Majjimanikaya, 152)
(*c*) Samyuktagama (cf. Samyuktanikaya, 7760 Suttantas).
(*d*) Ekottaragama (cf. Anguttaranikaya, 9557 Suttantas).

But this list of I—Tsiang's can in no sense be called exhaustive or comprehensive. A monk belonging to the Madhyamika school would study a different set of works and so on. Besides, we are told by Hiouen Thsang's biographer, that the 'Vedas and other works' were also studied at Nalanda. A Buddhist priest to be able to defend his religion against heretics with any measure of success could not afford to give the go by to the doctrinal views of his opponents and Hindu philosophy must have been studied at Nalanda side by side with Buddhist philosophy.

Criticism of the Curriculum of Nalanda.

We have now come to a close of our review of the curriculum of Nalanda. Four subjects as we have seen, were specially cultivated at Nalanda, *viz.*, Grammar, Logic, Medicine and Philo-

(1) See Takakasu, Ch. XXXV. The Classification of the coonical studies given in the list is mine.

(1) All extant in Chinese: Nos. 1276, 1277, 1281, 1282, 1296, and 1317 in Nonjio's Catalogue.

sophy. The other subjects are included by Hiouen Thsang's biographer under the general heading of miscellaneous. Probably they included Sanskrit and Pali prose and poetical literature. We at-once observe the' *disecta membra* of the curriculum ; the technical sciences (*silpasthana vidya*) or, as Hiouen Thsang calls it, 'the Science of the skilled professions including the principles of the mechanical arts, the dual processes (?) and astrology' were not cultivated. There is nothing strange in this, considering that Nalanda was a monastic university, and a learned Indian monk of the 6th and 7th centuries was a man of liberal culture versed in Sanskrit and Pali, profound in the speculative philosophies of India and possessing a good amount of dialectical skill. He had no cares about food, lodging or raiment which were supplied to him gratis and he had therefore no need to turn his hand to the arts and crafts for livelihood. His whole life was devoted to study. At Taxila in the 6th cent. B.C., sixteen branches of learning were taught, we need not therefore conclude that Nalanda was a deterioration from Taxila. In fact, it was not so much in the *variety* as in the *depth* of learning that the scholar of Nalanda excelled. The subjects which he studied were vast in their scope and were calculated to develop his intellectual powers to the highest degree. He came out of the University not an intellectual jack—of-all-trades, but a master of some of the most highly developed branches of Indian learning. He drank deep' and not tasted merely the 'Pierian Spring'; and although the rich assortment of subjects in our modern universities may dazzle our eyes, there is no reason to cast a slur on the system of study which gave to India consummate scholars like those we have already mentioned.

It now behoves a historian of the University of Nalanda to attempt to concentrate what rays of light may be derived from various sources and exhibit as much as possible of the life actually led by the famous religious community of Nalanda which gave to India scholars of such gigantic intellectual powers and of such wide-spread fame. It is a deplorable circumstance that neither Hiouen Thsang nor I-Tsiang has cared to enlighten us in any satisfactory manner about the rules, customs, manners, habits, and methods of study that obtained among the scholarly monks of the University of Nalanda. We of the twentieth century at this distance of time can perceive the great importance of this University in the history of Indian intellectual development in its true perspective. But to Hiouen Thsang and I-Tsiang, it probably appeared to be no more than a pre-eminent monkish institution and seat of learning—only a glorified specimen of what nearly all monasteries in that century were. We are thus thrown back on our own ingenuity to piece together chance bits of information

available about the academic life of Nalanda which cannot afford us a full and complete view, but merely interesting glimpses. We may however even to-day observe some faint image of our ancient Buddhistic Universities in the present Tibetan Universities of our Zashi-Lhunpo, (1) Dupong etc. As we shall have occasion to narrate later on, it was on Indian Universities like Nalanda, Odantapuri and Vikramasila that the Universities of Tibet were modelled, and cut off by natural barriers from the changing influences of the Time-Spirit, Tibet still hearkens after the past, the bygone days that would return no more of Nalanda, Odantapura and Vikramasila.

Like the modern Tibetan Universities, the University of Nalanda was first and last a monastic University, it raison d'etre being not secular but spiritual good. The University as a rule admitted only those who had embraced monastic life, and so when Chandra Gomin went to join the community of Nalanda, he was cold-shouldered because he was only a lay devotee (upashaka). It was only through the influence of his friend Chandra Kirtti that he was enabled to gain admission. (1) But its doors were always wide-open for the reception of monks, no matter from whatever quarter of the globe they might come. Monks from different parts of India, from China, from Tibet, from Central Asia, from Bokhara, from Corea—all found free board, lodging and instruction under its hospitable roof. In its palmiest days there were 10,000 names on its rolls. It was this catholicity of spirit that made it a University of Asiatic fame. The rules for the admission of a monk into the community of Nalanda are thus given by I-Tsiang : (2) " Any strange priest who arrived at the monastery was treated by the Assembly with the best of their food for five days, during which he was desired to take rest from his fatigue. But after these days he was treated as a common monastic. If he was a man of good character the Assembly requested him to reside with them and supplied him with comforts suited to his rank. But if he was not learned, he was regarded as a mere priest ; if on the contrary he was very learned, he was treated as above stated (i.e., with the best rooms of the monastery and with servants) then his name was written down on the register of the names of the resident priests. Then he was just

(1) See the description of this monastic Universities of Tibet in S. C. Das's 'Indian Pandits in the Land or Snow'—pp 6—11. But the reader is cautioned not to suppose the Tibetan Universities as they are to-day to be copies of our ancient Buddhistic Universities. They must have changed much from their original character in system and organisation, but the atmosphere, I should think, still remains the same.

(1) See Vidyabhusan's 'Logic'—P. 123

(2) See Takakasu's 'I-Tsiang'—P P 62-63

the same as the old residents." Thus there was no *fresher's* trouble in this University.

After being thus enrolled in the Register of the University, the monk had to enter and assiduously study in one of the 'schools,' if he at all cared to be respected by his fellow-monks, for we are told that 'backward students felt much disgrace and kept aloof through shame.' (1) Unless a monk was learned, he was not entitled to enter into the intellectual life of the community. The Schools were held in the Six Colleges of the University, each under a separate Professor. At each of these schools, a particular subject was taught and discussed, the four principal subjects being, as we have said, Grammar, Logic, Medical Science (specially Tantric) and Philosophy. The Professors, selected from among the community, were venerable monks who might have distinguished themselves by eminent intellectual abilities, old age and noble character. Their privileges were conspicuous. (2) They were freed from business imposed on monastics; they were assigned the best rooms in the monastery and had body-servants to attend upon them; when they went out they could ride a sadan-chairs, but not on horseback; and were generally treated with great veneration. Each Professor made a special subject his own, as Silabhadra was Professor of the Jogachara Philosophy, Kamalasila of the Tantras, etc. The students attached themselves to one Professor or another according to the subject in which they wanted to specialise. But a general average knowledge was required in all principal subjects. Each Professor had his own class who learnt from him from day to day till the course was finished, which might be even in ten years—the period for which I-Tsiang studied here. Of the 'schools' of Nalanda the most difficult were the schools Discussion or Logic. The biographer of Hiouen Thsang says: (1) "Of those from abroad who wished to enter the Schools of Discussion, the majority beaten by the difficulties of the problems withdrew; and those who were deeply versed in old and modern learning were admitted, only two or three out of ten succeeding." It was these Schools of Logic at Nalanda where Buddhist logic was to a great extent developed and which turned out fine scholars, like those we have already named, skilled in the subtlest of dialectics. No wonder that the greatest achievements of the University of Nalanda were in the field of logic. To be a logician of Nalanda at that time was a passport to the highest honours in scholarly circles in India and even in the Courts of Princes. All the schools were under the guidance of a principal; the last principal

(1) See Beal's 'Life of Hiouen Thsang'

(2) See Takakasu, P. 62

(1) Beal's 'Life of Hiouen Thsang.'

as far as records go was Viradeva (1) and the first principal the legendary Saraha Bhadra, master of Nagarjuna.

The regular routine of these schools was sometimes diversified by the appearance of distinguished personages from outside, sometimes emissaries of princes like Siladitya, who came to invite some very distinguished scholar to the royal court, sometimes famous and learned monks like Dignaga who came to hold debates and discussions here with opponents, sometimes scholarly and reputed monks like Hiouen Tsang who came here to study, sometimes devout Chinese or Tibetan Pilgrims who had taken long and weary journeys at the risk of life and limb simply for the intense desire to see, to learn and to know. When some great scholar from outside came here to distinguish himself by defeating his opponents in controversy, he was met not only by the monks of Nalanda, but even opponents from outside (as in the case of Dignaga and Sudurjaya) with all the zest of the literary pugilist, for success in controversy at Nalanda meant a wide-spread advertisement.

Besides attending these schools and discussing and preparing their studies, for which, as the biographer of Hiouen Thsang tells us, they found the day all too short, (1) the student had to observe all monastic rules of the community. In fact, the monks of Nalanda looked up to by all India as the models of monastic dicipline. (2) I-Tsiang attributed the greatness of Nalanda to the strict observance of the Vinaya. (3) I-Tsiang, with charming naivete of admiration, tells us that he never imagined that on coming to West India, he would prove to be but an ignoramous. "Had I not come to the West," says he, (4) "how could I ever have witnessed such correct manners as these!" Hiouen Thsang's biographer also waxes eloquent in praise of the discipline of the Nalandan monks who are "naturally dignified and grave as body" and among whom there has never occurred during a long time "any guilty disobedience of the rules." For any deliquent, expulsion was swift and and sure: he was expelled from the monastery "without sounding the *Gantha* (bell)." (5) Time was regulated by observing a clepsydra, (6) which being rather costly and requiring some experts to observe and adjust, was generally the gift of the king, the experts also being assigned by the King. It

(1) Of the Gosrowa inscription discovered by Kittoe in 1848. As we shall have occasion to speak of this Gosrawa inscription and Viradeva, we hold over at this point.

1. Beal's 'Life of Hiouen Thsang.'
2. Ibid
3. See Takakasu, P. 63
4. Ibid.
5. Ibid
6. I—Tsiang gives a pretty description of this instrument which he says, was in use in all important monasteries. The regulation of the Clepsydra was a delicate motter which required expert handling. See Takakasu, pp 144-146.

was the duty of an officer called *Karmadana* to announce time by beating a drum in a loft of the monastery, while sunrise and sunset hours were announced by two servants beating drum outside the gate. (7) The *Karamadana* or steward was the general controller of the domestic affairs of the monastery. It was his duty not only to announce time but also to allott duties to the monastics and otherwise to exercise a general supervisory control. In the early forenoon and late afternoon, the monastics took some amount of physical exercise, either strolling outside the gates of the monastery or within along the corridors called *Chankrama.* (8) The dinner had to be finished before noon and the whole remaineder of the day was devoted to studies. The congregational worship in the evening, the description of which is given by I-Tsiang, was of special solemnity. As the number of residents at Nalanda was immense, it was impossible to gather all of them together in one place. So the worship took place conveniently in each separate room. "Thus" says I-Tsiang, (1) "it is customary (at Nalanda) to send out every day one preceptor to go round from place to place chanting hymns, having preceded by monastic lay servants and children carrying with them incense and flowers. He goes from one hall to another, and in each he chants the service, every time three or five *Slokas* in a high tone and the sound is heard all round. At twilight he finishes his duty. This preceptor generally is presented by the monastery with some special gift (*Puja*). In addition there are some who, sitting alone, facing the shrine (Gandhakuti) praise the Buddha in their heart. There are others who going to the temple (in a small party) kneel side by side with their bodies upright, and putting their hands on the ground touch it with their hands and thus perform the three-fold salutation." How picturesque and beautiful is this custom of evening service and what a contrast it is to the

---

The Clepsydra seems to me to have been a foreign importation to India. It is the oldest device in the world for measuring time. It was said to have been known to the Egyptians. It was in common use among the Greeks and the Romans and was generaly employed to set a limit to the speeches in Courts of Justice and hence the Latin phrases 'Aquam Dare' and 'Aquam Perdore.' There was a large clepsydra in the Tower of Winds at Athens and the Philosopher Plato did not think it a compromise of his idealistic Philosophy to turn his hand to the making of a real though rather complicated clepsydra. In its simplest form, among the Greeks and Romans, it was a short-necked earthen-ware globe of known capacity, pierced at the bottom with several small holes through which the water 'stole away' (Hence the name 'Clepsydra' or 'water stealer'). Among the Indians it was a thin copper bowl placed in a copper vessel full of water, the hours being regulated by the bubbling in of water through a whole in the bowl which was made greater or less according to the time of the year. One immersion of the bowl indicated one hour.

7. Takakasu, p. 144

1. Takakasu, pp 154—155

cold, dusty atmosphere of mere learning, without that culture of heart which alone can make learning effective in the service of humanity, that pervades the present-day exotic universities of India!

The academic work of the Nalanda monastery did not, however, go on all the year long. The session began every year before the *Varsha* (Pali *Vassa* or Rain) retreat—a custom which had come down from the time of Budhha—covering a period of full three months from the 16th of the fourth or fifth month to the 16th of the eighth or ninth month. During this period the monks were expected under ordinary circumstances to keep inside their respective monasteries. Before this period of rain-retreat began, rooms were assigned to each member on the principle of the best rooms being given to the eldest and most learned and so gradually all along the line (1) The session of rain-retreat came to a period at the end of three months during which the work of the University went on in full swing, all eminent scholars and teachers being present. When however this full session was over, the work was likely to be carried on more or less desultorily, as monks migrated from place to place and a break-up would ensue during seasons of pilgrimage: During these seasons one might see the old and venerable professors of Nalanda, going in sedan chairs with attendants carrying their necessary baggage along the high roads to visit the Vajrasana or the Bodhi-tree, the *Chaityas* of Rajagriha, the Vulture Peak, the Deer-park, 'the holy place where the *Saua* trees turned white like the wings of a crane at Kushinara,' the Calantaka Nivapa or Venu Vana, etc. (1) When these seasons of pilgrimage were over, the Nalanda monastery again swarmed with students and professors from all quarters till it was in full session at the beginning and during the period of the Rain-retreat.

The monastery of Nalanda was always in affluent circumstances, giving free board, lodging and instruction to thousands of resident monks. This is quite easily accounted for by the fact that it was directly under royal patronage and Siladitya remitted for the perposes of this monastery the revenues, paid in kind, of one hundred surrounding village. (2) Thus the monks had hardly any secular care and their whole endeavour was given to intellectual and spiritual improvement.

(To be continued.)

(1) See Takakasu, p. 86.

(1) See Ibid, p. 30.

(2) See Beal's 'Life of Hiouen Thsang' and Takakasu's 'I—Tsiang'—P. 63. I—Tsiang puts the figure at 200 and says that they have been bestowed by kings of many Generations which I think to be more credible. But Hiouen Thsang was friend with Siladitya and his statement also erries much weight and is Generally quoted in histories of India when the University of Nalanda is spoken of in preference to I—Tsiang's statement, not so populerly knokn.

A ROUGH PLAN OF THE KHASPUR REMAINS (NOT TO ANY SCALE.)

A. Bathing Temple
B. Unfinished house
C. Arched Gate
D. Temple of Ranachandi
E. Temple of Syama-thakurani

N

W.

F. Temple of Vishnu
G. Double storyed temple of the twelve Chakras.
H. Place of Siva.

TALIGRAM-BAZAR.

R. MADHURA

WAY TO THE TALIGRAM TEA ESTATE

TALIGRAM T.E.

A

DITCH

Tank

B

Road from Silch

Ditc

C

D

Tanks

Can

E

F

H

G

Tea plantations.

Notes on the Ruins at KHASPUR the Last Capital of the Kachari Kings.

On the 9th of June last I visited Khaspur the last capital, worth the name, of the Kachari Kings.

Khaspur lies about 12 miles North of Silchar; six miles from the town just midway, a big market called the Udharband Bazar was found: a little after, we had to leave the broader road with telegraph posts and take to one which could not even boast of the mile-stones.

It took us nearly four hours to reach the site of the Khaspur ruins, as we travelled on foot. After crossing the Madhura a tributary of the Barak, for the second time by the way, we entered into a tea-garden called the Sibarband Tea Estate after the Mauza that includes Khaspur. There is a tea-estate named Khaspur but curiously enough that is situated a few miles off the locality that still contains the ruins of the whilom capital of Cachar.

On the left side of the road from Silchar, we saw a small dometopped building which is known as the Snan-Mandir of Raja Gobinda Chandra, the last King of Cachar. The Snan-Mandir or the bathing-temple might have been used as a Bath of the King himself or it might have been a temple where the family gods of the King were brought on festive occasions specially on the Snana-Jatra day, for being washed. The Mandir, however, occupies a beautiful site commanding the view of the meandering Madhura, and of the hills a little way off on the other side of the river. The Snan-Mandir is 9 feet square and 15 feet high and open on all sides: the top is shaped like a dome in the fashion of a Moslem Mosque. The Snan-Mandir was easily accessible as it was on the road side: but the other buildings lying a furlong or two inside the dense jungle eastwards of the road, we should have totally faield to reach them, had not Babu Bipin Chandra Laskar a scion of the family of the Minister of the Kings of Cachar and Babu Nandalal Barman a Hinduised Kachari of high social position, with kindly foret hought and energetic devotion come to our help: both these gentlemen accompanied me in my excursion and Nandalal Babu managed to collect a large number of Kacharis who cleared the jungle to make a temporary route and bore us on their shoulders when a ditch—which encircled the whole palace—had to be crossed and recrossed several times. In fact the season was not favourable for an excursion to such a place: and many people advised me to postpone my visit to the dry season when there would be less of jungle and least of water: but my policy was "now or never" and so I cheerfully undertook this adventurous

task—with a burning Sun overhead and a miry road underneath, besides dense jungle, water-logged ditches, malarious vapours and every chance of meeting with the unwelcome denizens of the forest.

Having entered into the forest, that forms part of the Siberband tea-estate, we saw the Northernmost brick structure. This is an unfinished building 20 feet by 12 feet facing East: the walls rose about 9 feet. This is attributed to Gobinda Chandra the last King of Cachar who ascended the throne in 1813 and this seems quite possible. Gobinda was an unfortunate King who never knew peace until his death in 1830. At the commencement of the Burmese invasion Gobinda Chandra had to quit Khaspur and eventually to establish a new place of residence at Haritikar on the Barak that formed there the boundary between Cachar and Sylhet. It is difficult at this distance of time to say for what purpose this building, if completed, would have been used. Its dimension shows it to be too small for a Sovereign's residence : and the measurement of length and breadth is exactly the same as of a building dedicated to Ranachandi, of which hereafter. So Gobinda Chandra left unfinished what would have been a temple of some deity.

I may mention here that the locality is popularly divided into three parts called "Pats" (places) and the Southern portion is called Raja Harischandra's "pat", the middle portion, Krishnachandra's 'pat' : but these are not very sharply defined divisions and often one and the same building is attributed to different Kings by different people. The next building we visited was the Sinhadwara or the lion-gate which was the ordinary name of a *pucca* archway even if—as here—it did not contain any figure of a Lion. This gate measures 30 feet by 12 feet, and is 18 feet high : but there are rooms on each side of the entrance which is 9 feet by 12 feet. This archway forms a contrast to that at Dimapur in having no walls in continuation on either side, and and also in having habitable side-rooms with openings that are mere small pentagonal windows which, the Kacharis said, were used to support cannon. A Photo of the gate showing the right half will be found elsewhere A photogravure and also a description of the Dimapur Gate will be found in Mr. Gait's History of Assam P. 245. There was also a gate-way at Maibang probably with walls, but the vandalism of the Assam Bengal Railway authorities has left no trace of either of these : the only evidence of the existence of the gate-way was found last year in the jungle behind the Ganja-shop at Maibang in the shape of two slabs of stone containing the same inscription in different writings from which we know that Megha-Narayan Deb of the Hachengsa clan became King and

constructed a Sinhadwara in stone on the 26th of Ashara, Sakabdah 1498 (11th July 1576). This gate also is attributed to Gobinda Chandra: and it may be that the unfortunate King wanted to circumvallate his place of residence but no sooner had he finished the gate-way than he had to quit the place for reasons already stated. From this gate-way we could see a couple of tanks side by side towards the East, at present choked with dense acquatic weeds and hardly accessible.

* শুভমস্তু শ্রীশ্রীযুত মেঘনারায়ণ দেব হাচেঙ্গসা বংশত জাত রাজাই মাইবঙ্গি রাজ্যতে পাথরে সিংহদ্বার বান্ধাইলেন শকাব্দঃ ১৪৯৮ বিতারিখ আষাড় ২৫ ।

Thence we went a little South-West to the spot where there is the temple of Ranachandi the tutelary Deity of the Kachari Kings. Like Bhabani of Sivaji or nearer home, Som-Deo of the Ahoms, Ranachandi was a sword worshipped by the Kings of Cachar. It is said that King Nirbhaya Narayan —a very old and devout Kachari King-dreamt one night that the goddess Chandi appeared before him and asked him to go to the riverside in the morning, and when he would see a serpent, to catch hold of it. Caught by the head the serpent would transform itself into the real shape of the goddess: or else, if caught by the tail, it would turn into a sword. The king failed to catch the serpent by its head and so he got the sword by holding the disguised reptile's tail.

The temple of Ranachandi is 20 feet by 12 feet with an average height of 15 feet. The photo will clearly show the fashion of the building which faces West. This falls presumably within the precincts of the Pat of Raja Krishna Chandra, Gobinda's elder brother and predecessor: but the Kacharis told me that this temple had existed before that King from very olden times. This statement, however, is not confirmed by the external appearance of the temple which appears to be similar to and coeval with the other temple attributed to Raja Krishna Chandra. This is the temple of Syama-thakurani, and measures exactly the same as that of Ranachandi, and as would appear from the photo, it bore thereto a resemblance in the fashion of its architecture. Raja Krishna-chaudra was reputed to have been a very pious King and devoted to the Sakta Deities, Ranachandi and Syama thakurani. His predecessor and uncle Raja Harischandra Narayan was of the Vaishnava tendency as will be evident from the two temples attributed to him—the Vishnu-Mandir (temple of Vishnu) and the Dwadas-chakra-Mandir (temple of 12 chakras or Salgramas). The Vishnu Mandir is bigger in size than the two Mandirs of Ranachandi and Syama-thakurani: it measures 24 feet by 15 feet and the height is about 20 feet: it also looks older and has suffered greater damage than the two others of Krishna-chandra's buildings to which it seems

to have been a model in construction. The temple of 12 chakras that we visited last is in a dilapidated state as will be seen from its photo. One smart shock of earth- quake and the whole fabric would be a heap of rubbish. But this was twostoried, a stair-case led to the upper story which measured 18 feet by 10 feet with a height of 15 feet. There was an open Verandah of 7½ feet on each side of the upper story. The lower story measured 33 feet by 25 feet and the height was about 10 feet. The roof of the upper story was of the shape similar to that of the other temples.

None of the buildings contained any inscriptions. I was told, however, that a stone containing the inscriptions relating to the temple of 12 chakras was removed by Mr. David Scott: and I believe the same is what is preserved in the Deputy Commissioner's office at Silchar. From these inscriptions we learn that in the month of Kartika (October-November) of the Saka year 1693 (1771 A. D.), by the will of Krishna, the Queen-mother Lakshmi Prabha Devi athirst of the honey of his lotus-feet, had the construction finished, of a beautiful building of brick in the city named Khaspur within the prosperous kingdom of Hari-chandra Narayana the lord of the Hedambas.

* শ্রীনন্দনন্দনাজ্ঞয়া নেত্রাঙ্করস চন্দ্রমিতে শাকে কার্ত্তিকস্থিতি ভাস্করে হেড়ম্বাধিপতি শ্রীশ্রীযুক্তহরিচন্দ্র নারায়ণাভ্যুদয়িতি রাজ্যে তদন্তর্গত খাসপুর নামনগরে ৺ তৎপদ পঙ্কজ মকরন্দ লোলুপমানা শ্রীশ্রীমতী রাজমাতা লক্ষ্মীপ্রভাদেবী সাধিতেষ্টকাদি নিয়ম নির্ম্মিত বিচিত্র প্রাসাদাভিরামঃ ॥

This Harischandra Narayan had built the solid stone temple at Maibang ten years before wherein he is described as a "bee to the lotus feet of Ranachandi" which shows that the Vaishnavite tendency mentioned already developed in him in the later days of his life.

And there was some reason for this perhaps. Raja Harischandra was childless and was of a very religious turn of mind. He abdicated in favour of his younger brother Lakshmi-chandra who however died shortly after his assumption of the royal power. His children Krishnachandra and Gobindachandra were very young: hence Harischandra had to resume royal duties with much unwillingness. Such a turn of mind would favour Vaishnavism more than the sterner creed of a Sakta.

Having finished this block we went to see another temple which was not very far off if we could directly go from the Pat of Harischandra. But a dense impenetrable jungle lay between and we had to resume our journey northwards by the Local Board Road until turning East we got the way to the Taligram Tea-Estate. We crossed the canal that formed the Eastern boundary of the palace and then turned southwards. Our way lay through a path-less cultivated field and we soon came across a small pond full of white lotuses : this tank is said to mark the

place where there was a camp of soldiers located permanently probably to guard the palace. We then came to the spot where there was a temple of Siva now completely destroyed by the Sacred *Bat* tree that now shades the lingam of Siva underneath it. Only the traces of the plinth indicate the whilom existence of a temple that contained the Symbol of the Deity who had given name to the Mauza (Siber-bund). The photo will show the symbol beneath the canopy of a piece of cloth.

Before concluding this note on Khaspur I do not consider it out of place to make a few general statements about this place. Some say that when a Kachari King of old had once defeated the Koches, some of the captives of the latter tribe settled at this place and so the locality was called at first Kochpur which changed into Khaspur afterwards. But this seems to be improbable. Mr. Gait in his *History of Assam* (p. 247) says that the Kachari King Satrumardan defeated the Jaintia King Dhan-Manik and kept the latter's nephew as prisoner at this place then called Brahmapur; and that the name changed afterwards into Khaspur. The Jaintia Kings belonged to the Khasi-Synteng race, so I think, the place wherein a Khasi prince resided went by this new name. This took place about 1610 A. D. when the capital was at Maibang which by the way, was also renamed "Kirtipur" by the same King Satrumardan to commemorate his victories over the Ahoms as well as the Jaintiapuris. Khaspur became a place of residence of the Kachari Kings about a hundred years later, (1708) when, during the reign of the Ahom-Akbar Rudra-Sinha, the Kachari King Tamradwaja fled thereto and the brick fort at Maibang was demolished by the Ahoms. But Maibang was not wholly abandoned as, even in 1761, a solid rock-temple was as already stated, built there by Haris Chandra Narayan. It is strange that although Khaspur has "pats" of Haris Chandra and his successors it has no traces of any of that King's predecessors. It may be that the Kings who ruled Cachar after Tamradhwaja and before Haris Chandra, found no time nor perhaps peace to build brick works which alone could preserve the memory of a ruler for a considerable time. The present state of the buildings at Khaspur, is deplorable as will be evident from what has been stated in these notes as well as from the pictures. It would be still more so, had not the Kacharis of the plains—who are mostly Hinduised—made periodical visits to the temples of the Deities worshipped by their rulers in the hey-dey of their power, though there are no images now in any of the temples except the lingam already mentioned. The Siva's place belongs to a Bengali trader of Undharband and the rest forms part of the Siber-

bund Tea Estate. The Garden authorities do not look on with a favourable eye—so the Kacharis say—at their intrusion, once or twice a year, into the precincts of this Estate with Sankirtan (Singing) parties, and they object to the Kacharies, cutting off the trees and jungles to make their way to the temples and to preserve the temples from sure destruction. The Kacharis are very grateful to the Government for the preservation of the ruins at Dimapur and they earnestly hope that Government would make these places Khas and bring these temples under the Act for the preservation of ancient monuments.

The Last Place of the Kachari King's Residence.

Having visited Khaspur the last capital of the Kachari Kings I felt very much inclined to visit Haritikar where the last Kachari King Gobinda Chandra lived during the final period of his troublous reign. The place lies on the right bank of the Barak about five miles down Badarpur-Ghat which can be reached by train or steamer from Silchar or Karimganj. From Badarpur Ghat the convenient journey is by a country-boat.

There is a small hillock just standing on the Barak : probably its surface was levelled to look like a plateau about two acres in area, and here Gobinda Chandra retreated after the Burmese invasion. There are no traces of any pucca building which was out of question under the circumstances. A raised square plinth in the middle marks the spot where a house for the family gods stood. On the East there was a tank which is now being silted up. On the West the king had his harem and a tank there is still called Ranir Pukhur (Queen's tank). At present the Western part of the hillock is used as a *hat* or periodical market place and near it there are some kutcha houses where the Mauzadar of Haritikar holds his office. Before leaving this place I took a stroll over the hillock and met an elderly husbandman who lived near the place. On my asking if he could help me any way in my investigations he struck the ground with the spade he had with him and from underneath the blades of grass he gave me a handful of charred rice, that I took with me as a sort of memento, which he said was the evidence of the burning by the Manipuries of the residence of Raja Gobinda Chandra with its vast granary

During the Burmese invasion hordes of Manipuris entered Cachar and settled in it : they were oppressed by Gobinda as the King of Manipur was inimically disposed towards him. The Manipuris headed by their King Gambhir Sinha invaded Haritikar, killed Gobinda and destroyed by fire the last residence of that unfortunate King. Gobinda was childless and hence his territory came under the British Administration after his demise in 1830.

PADMANATH BHATTACHARYYA.

THE FUTURE OF THE RACES.

Principal Seal's opening speech :—It is impossible to read Principal Seal's opening speech at the Universal Races Congress, recently held in London, without being impressed by a feeling of admiration for the profound culture of the speaker, and by a sentiment of kindliness inspired by his expanded sympathy with fallen humanity and by his appreciation of the ultimate unity of man as the ideal of human civilization. A glance over it will convince the reader that the privilege and honour of delivering the opening Speech was not conferred on him as a hollow compliment inspired by pity for those branches of the human species for whose conservation he has presented a strong and well-reasoned plea, but was the result of sincere conviction closely associated with the success of the congress, which depended to a large extent, on the comprehensiveness, the ability and learning the sympathy and broadmindedness and in a word, the humanity with which its deliberations were introduced to the world. It must be a source of sincere satisfaction to all who take an interest in these deliberations, that the expectations of the congress, have been fully fulfilled by the prolegomena laid before it with such consummate skill and erudition.

The speech gives a complete survey of man made with the eagle eye of a philosopher, rapidly glancing over his past, present and future, fixing his gaze of the totality of existence, turning backward into the nebulous region of his half-articulate infancy, and forward into the hazy distance of his possibilities ; suggesting the heights where the telescope of knowledge should be set for the clearest vision, at present available to man, of his self as an individual, a society and a humanity ; piercing into the chaotic simplicity of the begining, and the orderly complexity of his development, with a clear perception of the unity, which runs throughout his existence, increasing in power, intensity and reality within, with growing diversity without.

Fully conscious of the conflicting character of the forces which control the movements of universal man, of the forces of progress and regress, of the ups and downs to which he is liable in his march through eternity, the speech is enlivened by a wonderful faith in the superior strength of these forces, which in spite of occasional lapses into supineness and imbecility, are continually urging him forward in the direction of the ultimate goal to which he is destined by an inscrutable power.

2. *The outlook* :—The speaker is at the same time so deeply impressed by the forces of disintegration which, with advancing civilisation, seem to be gathering strength with a rapidity and

circumstance unprecedented in the past history of man, threatening to deal with him more drastically and more widely than ever before, that he does not care to wear a mask of decent confidence, while a sincere desire for the good of humanity demands not merely a perception, for his own edification, of the potentiality of these forces, but an unequivocal expression of that potentiality to serve as a warning to universal man and as a training for the volition of those fragments of humanity who are supposed to hold in their hands the power of averting their baneful effects. The grim ogling spectre of war casting amorous glances at civilisation, frightens the speaker with such an unspeakable fright that the thought of possible temporary retrogression makes him shudder like a child dreaming of the presence of an unclean spirit hovering over his cradle.

3. *Social and antisocial forces* :—And here it might be possible to dissent from the speaker, who almost seems to forget that evolution is not a continuous process forward but an oscillating movement in which the forward is more prominent than the backward, that civilisation moves round an axis as well as along an orbit, but also (and this is more important) that social evolution is largely the result of anti-social primal forces acting in apparent conflict with what are commonly regarded as forces of progress but are in reality, their playmates, without whose companionship they would be cheerless, nerveless, inert. But the speaker hastens to dispel this misapprehension by informing his critical audience that the companion-ship of the social with the anti-social forces must become loose and the former forces must unambiguously assert their superior, conscious strength before humanity can make further advance towards the goal to which it is destined. He impresses upon the reader the necessity of acquiescing in the proposition that humanity has passed that stage in civilisation up to which anti-social forces unconsciously contribute to the progress of society and that further progress will demand a clear and growing preponderance of the conscious forces of progress, viz, love, sympathy and self-sacrifice, which gradually gathering sthrength should ultimately cause the utter annihilation of the anti-social forces of hate, jealousy and baneful rivalry.

4. *Partial Concord implies Discord* :— To this crucial position he has been impelled by the mathematical truth that multiplicity in its march towards absolute unity must pass through a stage of duality ; applied to the progress of Humanity, with Myriads of individuals constituting a primordial chaos, slowly running into order by the formation of groups, at first very small but gradually increasing in mass, which assume the different names of classes. tribes, nationalities, Empires and Federations according to the stage of

progress attained, until one solid organisation called Universal Humanity is evolved. He is animated also by the truth that the process, which will bring about the transmutation of duality into absolute unity, must be different from the process which enables multiplicity to reduce itself to duality as applied to the advance of primitive, mutually repellent, chaotic, cosmic, individual humanity to peaceful contented, mutually attracting, Ethical, harmonious, Universal humanity. Dr. Seal seems to feel, more than any one else, that though humanity is far from the stage of pure duality, it is rapidly developing a false duality, by a juxtaposition of certain social and antisocial forces which threatens to turn Humanity into its primitive condition of chaotic Nirvana, like a peal of thunder reducing Earth, and Sky into the neutral electric condition. He seems to be disturbed by the thought that in this combination, the antisocial are more powerful than these social forces, which alone reduce the duality into an absolute unity. His referencce to this situation of grave difficulty with which civilisation has been brought face to face, and which unless our disciplined humanity grapples with it successfully, threatens to end in the rebarbarisation of the world," has no meaning unless he means that preponderance of the antisocial forces in the unconscious development of humanity, thus far, has a sinister, deeplaid, significance, which will manifest itself in the opposite direction, unless curbed in time, in its further evolution.

5. *Complete concord implies complete absence of discord.* —His noble exhortation to the civilized world to adopt a course of conscious devolopment in supersession of the unconscious development of nature, hitherto relied upon; his noble appeal to Redemptive Sacrifice which Christ alone practised but did not preach to, or demand from, his followers as too high for them, loses its meaning unless the speaker has in his mind what I ascribe to him above *viz*, that the process of transmuting duality into unity in the advance of Humanity, must be essentialy different from the process' which has so far tended to turn and may eventually turn plurality into duality. Duality lies at the back of partial unity, whereas complete unity implies the annihilation of this primordial support. The method employed in the one process must therefore be distinct from what enables the other process to be successfully carried through. It is obvious also that the new method must begin to be applied long before plurality has been reduced to unmixed duality in the march towards complete unity; for stagnation is impossible in the course of evolution, which if it loses its power of moving forward must begin to move backward. Principal Seal strongly urges the necessity of changing the method of unification followed so far. He feels that unless a change of method is

started at once, Humanity is bound to take a retrogressive course, violent or slow, and to go back to the primitive war of one against all, either by the abrupt process of extensive war involving multiple alliances or by the sluggish process of decadence, both of which he looks upon with very grave anxiety and apprehension. He is pessimistic in his study of the present; he is optimistic in his anticipations of the future. He shows the way in which the darkness of the present may be converted into the light of the future, and is delighted by the thought that the universal Races Congress marks the starting points in the new cycle of social evolution as a clear manifestation of Zeitgeist. He may be right or he may be wrong, but the message of hope, whether standing on the solid rock of memory or on the soft, unstable, pedestal of a priori reasoning, always has a fascination about it. If the new evolution were only continuation of the old, the thought of its approach might delight humanity with an unblended light of cheerfulness, as the coming dawn following the gloom of night, but fear darkens the horizon as we come to think that the present is to mark a cleavage between the past, and the future evolution of man, that a change in the mode of evolution, though it may be counsel of perfection must be a big jump into the unknown with its manifold possibilities of failure.

6. *Modern Socialism*—This fear is not much soothed by the tone of deprecation with which the speaker refers to modern Socialism. He contemptuously speaks of this low parentage of this new phase of social evolution by calling it hunger-born. His respect for individualism on which civilization has so far rested, shows its soughy condition, when it is associated with tribalism, nationalism, imperialism, federationism and multiple alliances, threatening to culminate in rebarbarization. The new evolution of society is neither to be socialistic nor individualistic. It is not to be a mixture of the two.

Civilised society troubled by the economic forces generated by pure individualism, has been slowly moving towards socialism, walking with cautious footsteps and feeling its way in quest of peace, light and happiness. It has sometimes walked with hasty, impatient steps and brought devastation and dilapidation on an extensive scale. The past has taught it the lessons of caution, but inspite of experience it is continually falling into the mire of strikes and lock outs, dislocation of traffic and curable convulsions. What at present looks like a delicious blend of individualism and collectivism may at any moment prove to be an explosive composition, which may shatter society and humanity like Rupert's tail in the laboratory into fragments of inconceivable minuteness.

(*To be continued.*)

H. E. Lord Hardinge

Viceroy and Governor-General of India.

[By courtesy of Babu Abinash Chadra Gupta.]

Sreenath Press, Dacca.

His Excellency The Viceroy's Visit.

ON the 29th of January for the first and last time as a Capital, Dacca will receive the visit of a Viceroy of India. Whether in days to come she will be fortunate enough to enjoy such an honour, we can safely leave to the prophets who are just now so busy with our future destiny. Our obvious duty is to serve our day and generation, and in good report and evil report, and especially in evil report, to shew ourselves loyal and sensible citizens of no mean City.

We have no doubt of the heartiness of the welcome which our distinguished visitor will receive. It is a kindly thought that leads His Excellency to come here, to the scene of so many activities, and of so many problems, of one kind and another. Dacca will be delighted too, that he should see what has been done in the last few years ; for there have been great progress and many changes, in men as well as in things.

Gratitude, we all know, is sometimes coloured with a faint hope of favours to come, and that element, let us frankly confess it, is not entirely absent from our thoughts today. We all want something. Dacca too, has boons to ask. What are they ? We see that a youthful contemporary indicates as a high water mark of local aspiration that Excise, Land Records, Agriculture, and Prisons, to use the disrespectful terminology in vogue, should not be taken from us. Whilst entirely at one with our contemporary in his esteem for these respectable departments and delighted to hear that they have made themselves so popular, we must decline to limit our horizon in this negative fashion. The potentiality of Dacca is, we firmly believe, greater than that which is required to shore up a few Government offices left as monuments of our departed greatness. No. We are delighted to have them, and more, but we must have some policy of our own as well. If we have become in one sense the widow of Bengal we have excellent precedent for our importunity.

It is well-known that the 'Dacca Review' when it touches even the dew of political moisture, walks with a certain delicacy and therefore neither our Hindu nor our Mahomedan friends need fear that we are going to say anything that will divide them. But surely our way is clear. We have in Dacca the beginnings of a great educational organisation. In many ways our city is peculiarly well-suited to become an Oxford or a Cambridge, whether with or without a University of its own. We have the Colleges and schools of the present, and we have great possibilities for the future. It is these possibilities, which we hope that Lord Hardinge, whose fate like that of his grandfather it has been to make great and far-reaching changes, will appreciate. We shall have buildings enough and to spare. We shall have land. Even the academic calm, which our enforced withdrawal from the pomps and vanities of high official surroundings will bring to us, will not be without its value. We live at the centre of a large population of intelligent students. What an opportunity, surely, for making Dacca the seat of a number of residential teaching establishments and of shewing India, for the first time, what schools and Colleges ought to be !

We cannot, we fear, for a long time expect to produce anything like "Poemata auctore Nicolao Hardinge" but we can confidently appeal to the spirit which breathes in a family of Scholars and Statesmen. Having said so much we feel we are voicing the opinions of every one of our readers when we wish to the august Representative of our beloved King-Emperor long life and all that his heart can desire : chiefly that he may have strength to bear the heavy burden of administration in the great office to which he has been called for our sakes.

THE DACCA REVIEW.

VOL. I. JANUARY, 1912. NO. 10.

THE KHASIS.

In many respects the Khasis are one of the most interesting of the Assam tribes. They have little or no affinity with the Garos, their neighbours on the west or the Kacharis, Kukis and Nagas who inhabit the hills towards the east. Their country is peculiar like themselves. The Garo and the Naga Hills consist for the most part of ranges of mountains whose sides slope steeply to the narrow valleys that intersect them. The typical Khasi country is a high plateau, a country of rolling grassy downs, such a country as cannot easily be imagined by the inhabitants of Lower Bengal.

The Khasis themselves are of Mongolian origin, and have much more in common with Europeans than with the inhabitants of the plains of India. To say that their women-kind are allowed complete freedom would be stating the case in terms unduly mild. For amongst these sturdy hillmen it is the woman who is the head of the house. A man's children do not belong to him but to his wife, and the sons of their *sirms* or chiefs are mere nobodies, the chief's successor being either his brothers, the son of his mother, or his sister's son. Such land as is owned, is nearly always owned by women. The houses belong to the women and the lists of owners of houses from whom house-tax is collected, contain nothing but women's names. To a European coming from the plains it is indeed refreshing to travel in a country where the women will converse as frankly and pleasantly as the men, without any suggestion of sex, any hint that a man is likely to entertain improper feelings for a woman simply because he sees and talks with her. But the system has its bad side too. Women are proverbially firm all the world over, and much of the litigation in the Khasi Hills would not be contested so obstinately as it is, were the

litigants not women. Most unprejudiced observers would I think admit that though the position accorded to the Khasi woman is from the social point of view in every way desirable, their predominance in business and in local politics has bad results.

The ordinary Khasi house is oblong in shape with walls of planks, or sometimes of stones, or reeds plastered with mud and roof of thatch. The villages are composed of clusters of these houses close together, for the Khasi has no desire for privacy and there are no areca palms or plantain trees around his dwelling. The village paths are filled with fowls, pigs and children, strong-limbed, sturdy, jolly little beggars. Many of these hamlets are situated in very lovely sites, on the side of a hill perhaps, a few hundred feet above a broad valley down which a river hurries with a pleasant murmur as it flows by rocks or gleams over the pebbly shallows. But these rivers require careful watching. A heavy thunderstorm often converts a smiling stream some three feet deep into a raging torrent in the space of a few hours, and every year adventurous travellers lose their lives in trying to cross fords which are no longer safe.

One of the most striking characteristics of the Khasis is their exceptional ability as porters. A driving road runs through the hill from Gauhati to Cherra Punji; but the greater part of the country is too rough and rugged to admit of the use of carts. Here there are rough tracks made by the hill-men sometimes along rolling downs or over rounded hills, sometimes creeping up sheer cliffs, the path nothing but a rude stair-way with here and there a wooden ladder up the walls of rock. Along these tracks the Khasis, men and women alike, are constantly carrying their merchandise from one market to another. And what loads they carry! They think nothing of taking a maund of potatoes as much as thirty miles in a day, and the stronger amongst them will bring a man on their backs up the steepest hill. They do not carry their loads like plainsmen on a *bhar* across the shoulder but put a strap round the bundle and place this strap across their foreheads thus keeping their burden in position on their backs. A hundred years ago the Khasis were a source of terror to the inhabitants of the plains. The letters of Mr. John Willes, the Collector who carried out the Permanent Settlement in Sylhet, are full of the outrages committed by the turbulent hill-men upon the people of that district. They established a regular reign of terror amongst the villages near the foot of the hills which they raided and plundered, returning beyond all possibility of pursuit to their mountain fastnesses. Gradually however they were won to more peaceful ways and in 1829 two British officers were engaged in the construction of a road through the hills from Assam to Sylhet. The foolish utterances of a Chaprassi angered the rude tribesmen who suddenly attacked and killed

the two officers and their followers, fifty or sixty in number. The usual expedition followed but military operations are not easy in mountainous and sparsely peopled country and the last recalcitrant chief was not hunted down till 1833. Since that date the peace of the Khasi Hills has been undisturbed. But the Khasis still maintain their skill with their national weapon, the bow, and archery meetings are the great amusements of the hills. One village or party challenges another, and after keen contest the winners execute a wild and most attractive dance, marching in a compact body they stamp on the grass, brandish their bows and shout and sing in unison. There is a wonderful swing and go about the whole affair, and the sight of such a party advancing and retiring, wheeling and circling round in perfect unison on a stretch of green swards, their bodies often sharply outlined against the setting sun, is a sight that those who have seen it will not easily forget.

The Khasi is a jolly, cheerful fellow if he is taken the right way, but he has little affection for the people of the plains, and a plainsman visiting his villages often meets with a far from hospitable reception. This perhaps is partly due to the curious superstition that prevails amongst them with regard to a mysterious snake that is styled a Thlen. This snake is supposed to bring wealth and prosperity to the families with whom it takes up its abode but at certain seasons of the year it must be propitiated with human blood. A person is killed, a little blood is taken from the nostrils, and is offered to the snake upon a plate. The snake which at other times is no bigger than a worm swells enormously in size and swallows the ghost of the victim which gradually materializes from the blood. Strangers visiting a village are sometimes suspected of being murderers hired to secure victims for the Thlen and with such people the Khasi has but a short way. By tribal custom it is no offence to kill a Thlen murderer and in these sparsely peopled hills no hint ever reaches the authorities of the sudden disappearance of the stranger.

B. C. ALLEN

ANNALS OF THE CHANDRADWIP FAMILY.

II.

In my last article on the subject an attempt was made to place before the reader some of the traditions connected with the origin of the Chandradwip-family, and the episode relating to the excavation of a tank by Kamala Devi the daughter of Raja Krishna-ballabh, with whom the direct male line from Rajah-Danujmardan De, the founder of the family, became extinct. * In this I would recount some of the incidents

* According to most reliable accounts the following were the male descendants of Raja Danujmardan De :—

in the lives of the successors of Kamala Devi on the gadi of Chandradwip; for the romance of story-telling lies not so much in the description of battles and revolutions as in the narration of deeds and incidents connected with the lives of distinguished personages who may be considered to be the makers of history.

The Rajas that came after Kamala Devi † belonged to the Basu family of Dehergati, a village almost contiguous to Madhabpasha. The first Rajah of this family was Paramananda Roy. There was nothing eventful in his life save his frail attempt to change the order of priority among the Kulin Kayastas, as follows, in order to give precedence to his own family;--Bose, Ghose, Guha and Mittra (the usual order being Ghose, Bose, Guha and Mitra). There is a tradition connected however with his son, Jagadananda Roy. Raja Jagadananda Roy is reported to have been a very religiously minded man. He was a most devout worshipper of *Sakti.* Once in the ecstacy of devotion he prayed :--"Mother Ganga! the heart-felt desire that I cherish is to meet thee while dying. So fail not, out of thy grace, to fulfil the desire of thy son." It so happened that years after the waters of the Ganges rose so high as to reach the steps of the palace. This reminded Jagadananda of his prayer to the goddess. With folded hands he stood up and said: "Mother! if my death has approached, take me in." Pleased at his righteousness, the goddess spread her arms and clasped him in her embrace. In a moment he disappeared and the water of the ver receded to its normal level.

Raja Ram Chandra Roy made himself famous in history by his connection with Raja Pratapaditya of Jessore. It is said that the Kayastha Samaj of Jessore was formed by a handful of Kayasthas whom Pratapaditya's father, Vikramaditya, had recruited from Chandradwip. There was always a spirit of rivalry between the two Kayastha Societies in Jessore and Chandradwip. The Rajas of the two places also considered themselves to be superior to each other in point of social rank and position. It chanced, however, that Raja Ram Chandra Roy was to marry the daughter of Raja Pratapaditya. It is said that on the night of the marriage, immediately after

1. Ramballabh, 2. Sriballabh, 3. Hariballabh, 4. Krishna ballabh. They are called the 'De-bangshia' Rajas. According to some of the match-makers of the Chandradwip family, the following were the "De-bangshia" Rajas :—

1. Denujmardan De, 2. Ramballabh Roy, 3. Krishna ballabh Roy, 4. Hariballabh Roy, 5. Joydeb Roy, who is said to have had no son and was succeeded by his daughter's son Paramananda Roy.

† The following are the Rajas of the Basu family that are said to have reigned in Chandradwip:— 1. Paramananda Roy, 2. Jagadananda Roy, 3. Kandarpa Narayan Roy 4. Ram Chandra Roy, 5. Kirtinarayan Ryy, 6. Basudeb Narayan Roy, 7. Pratab Narayan Roy, 8. Prem Narayan Roy.

the ceremonies were over, Raja Pratapaditya hatched a plot to murder Ram Chandra, with a view to usurp the kingdom of Chandradwip and amalgamate the Kayastha Samaj of Chandradwip with that of Jessore and ultimately to become its president. The cause of the plot is, however differently stated by others. They say that among the retinue that accompanied Raja Ram Chandra Roy to Jessore there was a court-jester of the name of Ramai Bhar. In accordance with a previous arrangement, which had Ram Chandra's sanction, the jester, disguised as a woman went inside the family quarters of Pratapaditya, on the night of the marriage, and mixed with the ladies that had assembled, according to the usual custom, to greet the bridegroom; and taking advantage of his position indulged in a fit of jesting which affected even the Rani of Pratapaditya. The jester was detected and reported to Pratapaditya. Nothing could more offend the dignity of an arrogant and masterful Raja like Pratapaditya. At once he took a vow of revenge upon Ram Chandra Roy whom he considered to have abetted this conduct on the part of the jester in order to humiliate the family pride of the renowned royal house of Jessore. Somehow or other Ram Chandra came to know of this plot. Some say it was Ram Chandra's wife that informed him about it and according to others it was Pratapaditya's uncle, Raja Basanta Roy. It is said that in order to prevent all possibility of escape, Pratapaditya had not only locked up all the outer gates, but also had the *khal* in which the sixty-four-oared barge of Ram Chandra lay, strewn with logs of wood and other obstacles. Ram Chandra managed to get out of the Palace through a back door of the inner quarters which had not been locked from out-side, and it was left to the heroic courage of a bodyguard of his, Ram Mohan Mal * by name, to pilot

* It may not be uninteresting to follow briefly the family history of Ram Mohan Mal. He was a Kshatria by caste, and it is said that he belonged to a place called "Singer-Gaon" in the district of Noakhali. His ancestors, who came from the North-west of India, had settled there, and were the Zemindars of the place. The place was named after the family title of his ancestors. For want of written documents, which were very meagre in those days, one has to grope in the region of hearsay. It is quite possible that his ancestors got some *jagir* from the Emperor of Delhi. Ram Mohan Singha, for that was the name of our hero, was known to be very restless and turbulent in his younger days. He used to lead the life of a *lathial* and was therefore turned out of house and home. He crossed over to the Kingdom of Chandradwip, where his prominent figure was a sufficient recommendation to secure him the post of the Raja's bodyguard. Kandarpa Narayam Roy was then Raja. He was a great favourite of the Raja, and his sons were also honoured with the title of "Mir Bahr." He left two sons Pran krishna Mir Bahr and Jiban Krishna Mir Bahr. Pran Krishna was granted by the Raja a taluq in 72 Mouzahs. Pran Krishna left two sons, Ratneswar Roy and Narattan Roy. Ram Mohan Singha had settled at Jagatdal, a village not very far from Barisal and very close to Bukhainagar. But his sons

him safe through the *khal.* Ram Mohan Mal is reported to have been full 8 ft high. He was a man of extraordinary physical powers. Undaunted by all the obstacles put in the way, he encouraged his master to get into the boat, and the crew to join hands with him in lifting the barge bodily out and carrying it into the open river. This was an extraordinary feat which a modern Sandow or Samson may well be proud of. Going out of the *khal*, the inmates of the barge announced Ram Chandra's escape from the kingdom of plots and machinations by deafening shots of cannon.

Returning safely to his kingdom of peace and plenty, Raja Ram Chandra no longer thought of getting the royal spouse from Jessore. Pratapaditya also, foiled in his attempt on the life of his son-in-law and burning with rage at the conduct of those through whom his plot had leaked out, gave up the idea of sending his daughter to Chandradwip. A few years rolled on in this way, till Ram Chandra's wife tired of her pitiable solitary life in Jessore, left her father's house on the pretext of going to Benares, and went very near the capital of Chandradwip. She halted at a place very close to Panchakaran near Jhalakati within the Sadar Sub-division of Bakarganj, in the expectation that her lord would come and escort her from there with usual pomp and grandeur. There was a pretty large retinue with her and the place where she halted soon became the centre of a hat called after her name "Bau-Thakuranir-Hat". The hat existed for many years and used to meet twice

---

removed to Rukhudia, a village 10 miles off from Barisal. His grandsons again did not like Rukhudia, and transplanted themselves to Wazirpur, by ousting (some say by killing) one Seikh Wazir who was a rich man of the place and held the whole village, just in the same way as Raja Kandarpa Narayan Roy established his capital at Madhabpasha by removing and killing a Cazi who reigned there. Ram Mohan's eldest grand-son Ratneswar was a recluse. His second grand-son Narattam Roy looked after the Zamindari. He was not however, pulling well with the Raja, and got a Sanad for the Taluq he held, direct from the Nawab of Bengal (Nawab Ali Verdi Khan), and since then (1700 A.D.) it became a *Kharija Taluq* of the Chandradwip Pargana. It was named Ratandi-Kalikaput, after Ratneswor Roy who was a devout worshipper of Kali. Narattan Roy died childless. Ratneswar Roy left four sons *viz* 1. Krishnaram Roy, 2. Kandarpa Narayan Roy, 3. Kirtichand Roy, 4. Ram Kishore Roy. Krishna Ram has two living representatives in the person of Swarna Kumar Roy aud Rasik Chandra Roy, both of whom are now in poverty. One is a native Doctor and the other a Pleader's clerk at Barisal. Kandarpa Narayan Roy died childless. Kirti Chandra Roy's representative (being his great grand-son) is Babu Akhil Chandra Roy, who was for many years the Khas Mahal Deputy Collector of Bakarganj and is now living in retirement in Calcutta. Ram Kishor Roy has his representative in Bhupesh Chandra Roy, who is now working in Calcutta as the Superintendent of Babu Rabindra Nath Tagore's Estates. The old house of Ratneswar Roy is still in the occupation of Babu Akhil Chandra Roy's family. But his representatives have lost most of the Zamindary of Ratandi Kalikapur.

a week but is now no more, though the place is still called by the same name. Leaving this place she removed to a village called Sarashi, where she had a large tank excavated. The Raja took no notice of her movements, till her mother-in-law, knowing all about her, personally went to her boat and escorted her with due honour to the Palace at Madhabpasha. But the Raja was unmoved. He was so much affected by the incident in Jessore that anything connected with Pratapaditya was most hateful to him, and he never condescended to see his wife. She stayed at Madhabpasha for some time, till at last, disappointed and disconsolate, left for Benares where she passed the remaining days of her life.

Babu Rabindra Nath Tagore, the renowned poet novelist of Bengal, has immortalised the above episode of Raja Ram Chandra's life in his famous novel "Bau-Thakuranir-Hat". The principal characters are the same in the novel as well as in the real story, and other factors that exist in the former have been introduced to suit the purposes of the novel.

The above story will give some idea, of the feelings of the different rulers towards one another. It was this deep-seated grudge which they bore one another that brought about their fall. If the ruler of Jessore was jealous of Chandradwip, the Rajah of Bhulloah* considered the latter to be very insignificant. And there is a story about Raja Lakshman Manikya, the Raja of Bhulloah, which justifies the saying that "pride goeth before a fall." Rajah Lakshman Manikya was the contemporary of Ram Chandra's father, Raja Kandarpa Narayan Roy. Lakshan Manikya was known to be a stout, stalwart and handsome person, and was conscious of his strength. Being senior in age, he used to look down upon Ram Chandra, and by his conduct, and behaviour also made the latter feel that he was beneath notice. Ram Chandra, sensitive creature as he was, could not stand this, and once thought of making his superiority felt by the Raja of Bhulloah. He challenged Laksham Manikya to a fight and marched against him with a handful of followers. This very much incensed Lakshman. As soon as news reached him of the advent of Ram Chandra on the outskirts of Bhulloah, he at once

* He was one of the twelve Bhuiyan Rajas to whom, during the Moghul period, the administration of Eastern Bengal had practically been left. The following were the 12 Bhuiya Rajas :—1. The Raja of Chandradwip (Kandarpa Narayan Roy), 2. The Raja of Jessore (Pratapaditya), 3., The Raja of Bhulloah (Laksham Manikya), 4. The Raja of Vikrampur (Chand Roy) 5. The Gazi of Chand Pratap (Chand Gazi), 6. The Raja of Bhusna (Mukunda Roy), 7. The Raja of Khisarpur (Isa Khan). The Zamindars of Haibatnagar-Jangalbari in the district of Mymensingh are his descendants, 8. The Ruler of Bhawal (Fazl Gazi), 9. The Raja of Satail (Ram Krishna), 10. The Raja of Putya (in Rajshahi district), 11. The Raja of Taherpur (in Rajshahi) and 12, The Raja of Dinajpur.

proceeded towards his boat unaccompanied by his usual retinue. So anxious was he to pounce upon the boy Raja and kill him at once, that he abruptly jumped into the boat of Ram Chandra, which had its board planks removed for the time being, and in doing so fell into the keel of the boat. The adherents of Ram Chandra, taking advantage of the situation at once fell upon him, tied his hands and feet, and took him as a captive to Chandradwip. There it was proposed to kill him, but at the intercession of Ram Chandra's mother his life was spared. He was however kept confined in an iron cage. After some months when he was detected in an attempt on the life of Ram Chandra, it was thought unsafe to spare him, and he was slain.

SYED ABDUL LATIF.

PADMINI.

(ADAPTED FROM THE BENGALI OF MR. ABANINDRA NATH TAGORE.)

Rana Bhimsing of Chittore, the uncle of Rana Lakhman Sing, had wedded Padmini the Princess of Ceylon. The Lotus of the island from over the seas, thus transplanted in the garden of Chittore, bloomed into greater loveliness and spread its fragrance over the whole land of Bharat.

At this time, one evening at Delhi, the Pathan, Badshah Alauddin was reclining on an ivory couch on the terrace of his palace inhaling the cool breeze of spring. The moon had risen. By his side sat his favourite Piari Begum, while at his feet sat a new slave girl who chanted an Arabic Ghazal * to the sweet strains of the Saranghi. Suddenly the Badshah exclaimed

" I care not for the songs of Araby. Sing me a song of Hindustan." The musician tuned the strings again and sang thus—

" There blooms a flower in Hindustan lovely beyond compare! What is this flower? It is the Lotus! Gods and men gaze at it enraptured, while the waves of the boundless sea dash around it. Who dare pluck this beauteous flower guarded by the billows, and and by the great King who rules there?"

Here Alauddin tuned to his favourite Begum and exclaimed,

" I will dare, Piari—I will pluck this radiant flower! I fear no King!"

The slave girl sang on—

" Who is the favoured one, who crossed the seas? Who is the brave who plucked this flower? It is a son of Mewar—the peerless, the dauntless Rana Bhim sing!"

Alauddin sat up erect on his couch and listened.

In joyous strains the song ended thus

" In the garden of Chittore blooms

* A love song.

the Lotus—the Poets of Bharat sing its praises. Glory to Padmini in the garden of Chittore!"

The song ceased but the last eches lingered in the Badshah's ears and a hundred voices seemed to echo "Glory to Padmini in the garden of Chittore!" He exclaimed after a while: Hast thou seen this beautiful Lotus? Is the flower in truth as lovely as thou sayest?"

"Yahanpanah! I come but now from the Palace of Chittore and from the wedding feast where I danced and sang." "Piari," said Alauddin to his queen, "I long to have this lovely Lotus," "Shahenshah, I long for the Moon, and to keep it in a golden casket' replied the Begum—but the words pleased not the ear of the Badshah who ruled over half the land of Bharat.

With a countless army Alauddin set forth for Chittore. Destruction and devastation marked its path. It was spring and Rajasthan was full of joy and feasting. Chittore was gay with abir* and basanti colored robes on all. In the midst of this rejoicing came the news that the Badshah Alauddin was advancing towards the city with a large army. Like a light blown out by a gust of wind died in an instant all the joy of Chittore. The play of spring ceased, the red abir was flung away, and in the homes of Chittore was heard the clash of arms and preparations made for another play fierce and stern. The play with men's lives, red blood, the glitter of swords, the clash of arms in the open battle field.

At last one day like the shadow of the Vulture the black flag of the Pathans overshadowed the desert of Mewar. Rana Bhimsing ordered the gates to be closed and with a loud clang the seven gates of Chittore were closed.

Alauddin had thought to go and pluck the Lotus he coveted, but securely as the heart is guarded by the ribs so the Rajput swords guarded their dear queen Padmini. It was easier to cross the waves of the ocean, than to cross the seven gates of Chittore and bring away the flower within.

The Pathans pitched their Camp at the foot of the hill. That night Bhimsing went to Padmini and said

"Wouldst thou see the waves of the Sea, Padmini?—the blue waves which lie around thy father's palace?"

In a voice full of sweetness and with a smile on her lips she answered

Mock not, my Lord—Can there be waves in this thy land of deserts?"

Bhimsing took hold of her fair hand and led her to the terrace of the Palace. The night was dark, and under the black sky lay the dark rising waves of an unknown sea! In wondering tones Padmini exclaimed,

"What means this, Rana? I knew not of a sea here!"

"This is no common sea, Padmini" said the Rana with a short laugh. "It is a sea of Pathan soldiers. Look; there lie their tents like the billows of

* The red powder used in the Holi festival spring—coloured *i. e.* saffron-coloured.

the ocean. Hark, there comes their noise like the roar of the waves. It seems to me that the blue waves from the midst of which I bore thee away, have come here to snatch thee from my arms. How shall I cross them?"

A black owl flew over their heads screaming as it went. Its cold black shadow fell on them. With a trembling heart at this omen of evil Padmini went below.

At dawn next day a Rajput soldier rode into the Pathan Camp. The news reached the Badshah and the messenger was taken into his presence. Saluting the Badshah he said,

"The Rana desires to know the reason of Badshah Alauddin's coming with an army. He knows no cause of enmity."

"I bear the Rana no ill will" replied Alauddin. "I come for Padmini the wife of the Rana's uncle Bhimsing. On my request being granted I shall depart hence."

"Shahhenshah" replied the messenger proudly "Thou knowest not the Rajput. Even the poorest will not give up his honour. Cast aside thy desire for our honoured and beloved queen. If there is anything else the Badsha desires to"—but Allauddin exclaimed, "The word of the Emperor of Hindustan changeth not. Padmini or war!"

That eve a council of the Brave and Wise sat in the court of Chittore. How was the city to be saved from the Pathans? Chittore—the crown of Rajasthan! Chittore—the beloved of the Rajput?

All the Hindu kingdoms had bent under the yoke of the Moslem, only Chittore yet stood firm and free.

At last Bhimsing said, "It is for Padmini that this great danger threatens us. Let her be given over to the Pathan. The welfare of Chittore first! What says the Rana?"

"If the Rajputs so will it, let it be as thou sayest" said Rana Lakhman sing,

There was deep silence for a while. The chief Rajput Sirdar then rose and said.

"Insult to Rana Bhimsing, is insult to us. Rani Padmini does not belong to him alone but to us too. Shall we send the Rani to the Pathan? Will it be said that the Rajputs of Chittore could not protect their queen? No, Maharaj, we are ready to fight and await but thy bidding. "So be it, but let there be no fight yet. Keep the gates of the city closed and let Alauddin besiege us as long as he can," said the Rana. With shouts of "Victory to the Rana. Victory to Bhimsing. Glory to Rani Padmini" the assemblage broke up.

From behind the marble latticed screen on one side of the Council Hall was flung a crimson silk handkerchief broidered with a Golden Lotus. It fell fluttering in the midst of the Rajput chiefs. With shouts of "Long live our queen" they bore it away on the point of a spear.

Days passed, months passed and still Alauddin's camp remained at the foot

of the hill, and those within the city waited. Allauddin had expected them to yield. A new year came round and spring was approaching again ; yet he had not even once beheld her whom he had come for. The Pathan soldiers grew impatient. Instead of the pleasures and luxuries of Delhi here they were for months in the hot, dry desert of Rajasthan. They longed to return.

One day while hunting, Alauddin's hawk captured a green Parrot which he put into a cage. Its mate had followed the hunting party crying piteously. At last the affrighted and trembling bird flew down and settled on the cage. Such is the power of love even in animals! Alauddin gazed in wonder at this incident and then like a flash of lightning a thought came into his mind!

The bird had yielded its freedom at sight of the danger of its mate. Perhaps if Bhimshing could be captured Padmini might be caught.

Two days after this a compact was made with the Rajputs that the Badshah would return to Delhi with his army if Alauddin were allowed to see Padmini in a mirror. Moreover the Rajputs would give their word that no harm should come to the Badshah during his visit to and departure from Chitore.

Robed in brocade and velvet, perfumed with attar and rose, adorned with precious gems the Badshah Alauddin mounted a white horse and with an escort of 200 Pathan soldiers, who cared naught for death, set forth for Chittore. At the foot of the hill he parted from them and mounted the hill alone. The Pathans then returned to the Camp only to return by stealth at night and hide in the thick jungle near by.

Allauddin entered Chittore and was received by Rana Bhimsing who led him to Padmini's marble palace after sunset. It was brilliantly illuminated. Bhimsing offered him a cup of *amal.* (a decoction of opium). Aluaddin took it, but held it in his hand for he feared to drink its contents. Perhaps it was poisoned! Reading his thoughts the Rana said with a laugh,

"Fear not, Badshah, we have given thee our word. Wert thou to roam alone unarmed in Chittore tonight, none would harm thee. We hold the guest as a God."

"Rana," said the wily Badshah. "It is not for this I pause. I was wondering if thou couldst trust us as we have done thee to-day." Saying so he sipped the *amal*, but with a sinking heart. Instead of the agony of death he had expected, it warmed his blood and cheered his spirits.

What need of delay Rana! Let me behold once the far-famed beauty of Rani Padmini and depart in peace." Said Alauddin.

Then the Rana rose and removed the covering from a great mirror brought from Aleppo. From its clear surface flashed forth the beauty of Padmini, the reflection of thousand

lights falling on it. Ah what loveliness! what grace! what perfection! Was it a human form or some celestial being?

Fascinated, enraptured, Alauddin rose as if in a dream and advanced with outstretched arms towards the bewitching form—like * *Rahu* coming to grasp the moon!

"Shahenshah, touch not the Rajput queen" rang out the loud stern voice of Rana Bhimsing. It seemed to him as if the Pathan Badshah was in truth going to touch his Padmini. With flashing eyes he rose and taking up a heavy golden cup flung it with great force at the beautiful mirror. With a loud crash it was shattered to fragments.

Ashamed of his folly and fearful of the consequences, the Badshah apologised to his host and begged to be forgiven. At midnight he bade farewell to the Rana and rose to go. But Bhimsing who was overjoyed that all hostility with the Badshah of Delhi was at an end and under the influence of the *amal* he had drunk lost his head. To show him that he also trusted the Badshah he rose too, in order to accompany Alauddin outside the gates of Chittore escorted by twenty Rajput soldiers on horseback.

The sound of the horse's hoofs broke the deep stillness of the night. The little party passed the gates and rode down the hill. They had gone down half way, when hundreds of Pathan soldiers stole out of the dark bushes and jungles and surrounded the Rana. The twenty Rajputs fought desperately, but in vain. At last only five returned to Chittore.

Alauddin's wish was fulfilled. As the hawk had captured the green Parrot, so did be bear away the husband of Padmini. Would she be caught now? But Alauddin was mistaken and had not counted on desperate and faithful woman's wit matched against his own!

Tidings reached Rana Lakshan Sing that his uncle was a captive in the Pathan camp and would be released only on Padmini being given to the Badshah of Delhi.

Rani Padmini sat all night on the terrace of her palace gazing at the Pathan camp below. The sun rose and tinged the tents spread over the desert with a rosy hue. A Rajput soldier came into her presence and bowing low stood with folded hands.

"Does the Rana agree to my proposal" asked the Rani.

"Yes, Raniji, and at his bidding I go to the Moslem camp to inform the Badshah of thy coming" replied he.

"Go, then, and tell the Badshah to build a new palace for Padmini in Delhi!" said the Rajput queen with a smile. Then glancing towards the Pathan camp she said in low firm tones, "It is war between thee and me, thou wily Pathan, we shall see who wins!"

A message came to Alauddin from Rana Lakhman Sing that Padmini would be delivered to him, on condition

* The Demon who is said to devour the moon during an eclipse.

that Bhim Sing be set free. Moreover that all the noble ladies of Chittore should be allowed to accompany their beloved queen to the camp and leave her there, and until the ladies returned to Chittore, all the Pathan soldiers should be removed to a distance.

Alauddin was delighted and ordered all the soldiers to leave the camp and depart to a distance for that day. The next day at dawn there issued from the gates of Chittore seven hundred Palankeens, each borne by four bearers. In the midst of them was the queen's, covered with a red cloth richly embroidered in gold; a Rajput soldier rode on either side. As they neared the Pathan camp one of the soldiers rode to Alauddin's tent where he sat watching the scene.

"Shahenshah", said he, "when the Rani is the Badsha's Begum she will never more see Rana Bhimsing. She therefore desires to see him once and bid him farewell."

"Her wish is granted" said the Badshah "but let her not tarry there more than half an hour."

Half an hour passed and then the seven hundred palankeens wended their way back to Chittore, leaving the richly-covered palankeen of Padmini in the Pathan Camp.

At last his heart's desire was fulfilled-the beauteous Lotus, the coveted flower was his! With a beating heart Alauddin attired himself in his richest robes and jewels and went forth to meet Padmini to behold the peerless beauty he had seen in the great Aleppo mirror. But Padmini was nowhere—her Palankeen lay empty! Rana Bhimsing had vanished too.

The seven hundred palankeens had contained *not* the gentle ladies of Chittore, but a Rajput sirdar in each and the bearers were brave soldiers. They had resolved to rescue their Rana by this strategy and had they met with opposition would have fought to the death. And it was Padmini's woman's wit which had compassed it! Like a tiger deprived of its prey seemed the Pathan Badshah. Scarcely had the seven hundred palankeens entered the gates, when the Pathan army with cries of "Din, Din" attacked Chittore.

With desperate bravery did the Rajput soldiers keep the seven gates of the city. The shadows of night gathered over hill and desert and at last Alauddin Emperor of half of India returned with his army to his camp below.

But meanwhile grave tidings had come from Delhi, and a letter from Piari Begum. It ran thus "Shahenshah, no more! Relinquish all hopes of Padmini, Oh thou foolish *Bee! while* thou didst seek for the Lotus in the Desert, the Bear from the Jungle has come to rob thy cherished bee-hive! such is Allah's will! He who is King of Hindustan today, may be a beggar tomorrow. Alas! that Badshah Alauddin's Peari Begum should be the Moghul Robber's slave!"

While Alauddin tarried in the Desert of Rajasthan the Moghul invader was advancing towards Delhi. Alauddin was amazed and stunned. That night the Pathan army left Rajasthan for Cashmere.

Thirteen years after this, the drums of the Pathan army were heard again from Chittore. Famine and plague had visited the land and many of its bravest gone, but the brave Rajputs held out for a month. At last no hope remained and the Rajputs resolved to die fighting rather than yield.

One night the Rajput women of Chittore gathered in front of the Temple. A great pyre was ready and Padmini, the beautiful Rajput Queen with folded hands thus invoked the Fire-God.

"Oh thou holy Celestial Golden Agni! thou destroyer of darkness, thou Bright and Beautiful God, come thou to our aid! Thou art the Help of the Helpless. We seek thee in our hour of danger and despair! Thou art the Refuge andthe End of all earthly bodies. Receive us oh! Pure and Bright Flame, oh! great and terrible God!" She ceased and then twelve hundred Rajput women, the beauty and virtue of Rajasthan entered the flames chanting hymns in Praise of Agni. A better fate than that which awaited them—the slaves of the Pathans!

All the life and light, joy and sweetness of the homes of Chittore went out. The Rajputs rent the sky with shouts of "Glory to the Sati!" The sound reached far into the Pathan camp. With desolate hearts they bade farewell to their beloved Chittore, and like streams of water along the hillside, they issued forth from the gates. With cries of "Hara Hara!" terrible to hear, echoed by the hills around, they fell furiously, desperately on the Pathan army below.

As the waters of the river are lost in the waves of the boundless sea, so the handful of Rajput soldiers were lost ere long amidst the countless numbers of the Pathan Army!

Chittor was taken. As Alauddin entered the gates, a thousand birds of prey overshadowed the battlefield strewn with dead bodies. Immense Riches were looted. But where was Padmini? Where was the priceless gem for which Alauddin had left his gay capital for the desert?

Three days later he departed from Rajasthan with his Army. A great serpent guards the spot where Padmini and the 1200 Rajput women perished in the flames.

SNEHALATA SEN.

OLIVER WENDELL HOLMES.

IV.

His scholarship and service to medical Science.

Dr. Holmes was a great lover of the old medical writers and like the retired Professor Byles Gridley in his *Guardian*

Angel had a good deal of acquaintance with old doctrines and authors and purchased them, sometimes going to the verge of extravagance or even beyond the annoying frontier. In this love of buying rare books, too, he resembled Charles Lamb whose charming Essay *Old China* is the *locus classicus* on the question. Both were biblio-philes and 'cuddled old books and hugged them close.' His dearly loved collection of '965 volumes and and many pamphlets' he finally made over to the Boston Medical Library 'though it cost him a little heart-ache to take leave of such old and beloved companions, to everyone of which ran a twig from some one of his nerves,' to quote his touching words.

Dr. Holmes was a microscopist at a time when the instrument was something of a rarity in the medical world and 'was no mean authority on the subject in his day' says Dr Cheever. Besides he so far went out of his way as to institute a series of experiments in Experimental psychology.

Dr. Holmes's greatest service to the cause of medical science was the publication in 1843 of his Essay on the *Contagiousness of Puerperal Fever* in which he 'held up to the professional public the damnable facts connected with the conveyance of poison from one young mother's chamber to another's' 'and entreated those who held the keys of life and death to listen to him in behalf of the women whose lives were at stake.' The pamphlet provoked as great and as bitter hostilities as the announcement of Darwin's famous doctrines did in England and Holmes was as patient and unruffled as his great English co-eval. He knew that 'every real thought on every real subject knocks the wind out of somebody or other. As soon as his breath comes back, he very probably begins to expend it in hard words.' 'I take no offence and attempt no retort. No man makes a quarrel with me over the counterpane that covers a mother, with her new-born infant at her breast. There is no epithet in the vocabulary of slight and sarcasm that can reach my personal sensibilities in such a controversy. I ask no personal favour ; but I beg to be heard in behalf of the women whose lives are at stake.' These were his calm and dignified words in the introduction to his reprint of the Essay in 1855. Fortunately for multitudes of women who were to become mothers, truth triumphed at last and his principle has now become universally accepted and the Doctor has been enrolled among the practical benefactors of mankind.'

We may be pardoned for an observation we venture to make in this connection. Many of our young men—and a few older men, I suspect—think that wit and poetry, a capacity to write novels and a fitness for the production of entertaining literature do not naturally co-ordinate with powers of

constructing close, clearly put, well-proportioned arguments, weighing and stating evidence, in short, all that drudgery that genius is supposed to kick at. Holmes' paper is a refutation once for all of such queer notions about the aberrations of genius.

MEDICAL ESSAYS AND APOPHTHEGMS.

Dr. Holmes's *Medical Essays* are delightful and sparkling with cleverness in the Doctor's best vein. This is perhaps the best place where a few of his medical apophthegms occurring in the *Medical Essays* as well as in other productions of his may be conveniently given for the delectation of my readers. They form beautiful specimens of his shrewd observation, quaint humour and consmumate grasp of science and will prove as delightful to the man of literary proclivities for their exquisite finish as to the man of scientific habits of thought for their profouud truth.

One of his pet aversions was *Homœopathy.* He always spoke of it as a pseudo-science and found little difference between a maniac and a '*Hahne-maniac*'. The satire he indulges in at its expense is administered in by no means Homœopathic doses. It would perhaps not be a very safe thing (however enjoyable it may be to the present writer) to serve Holmes's caustic sayings on this head before the educated public of Bengal, considering that one of Bengal's greatest men of science deliberately adopted Homœopathy out of clear conviction of its soundness, after a splendid training in the older system and that it has since then obtained a large following in our community among the best educated. Yet I do it in the hope that these brilliant passages will be enjoyed even by the staunchest advocates of the system for the sake of their wit, or at best treated by them as evidence of the regrettable fact that even the strongest brains may 'squint' at times (to use Holmes's own happy phrase).

Here are the specimens. The argument that some patients have been actually benefited, said he, would be as 'applicable in justifying the Counterfeiter in giving circulation to his base coin, on the ground that a spurious dollar had often relieved a poor man's necessities.' The analogy drawn by Homœopathists from action of the tiny particle of vaccine matter and their extension of this principle to their minute preparations of minerals, of inorganic matter like silex or sulphur, were met by Holmes with the remark 'this is arguing that a pebble may produce a mountain, because an acorn can become a forest.' 'When the French Academy discovered as the result of experiment that the ten-trillionth part of a drop of septicæmic poison would kill a guinea-pig and this was termed by advocates of homœopathy into an argument in favour of their infinitesimal doses, Dr. Holmes retorted 'The arguments from the effects of animal poison to medicinal substances in

general is like saying that because a spark will burn a city, a mutton-chop will feed an army.'

The following are more innocuous. (1) "The physician is like a watch-maker having charge of watches that he cannot open; he must make the best guess he can."

(2) "The doctor who talks of *curing* his patient (except in its true etymological sense of taking *care* of him) belongs to that class of practitioners known in our common speech as 'quacks.' It is in medicine as in surgery,—nature heals, art helps, if she can; sometimes hinders, with the best intentions; oftener is entirely ignored by the great remedial agencies ordained by the shaping intelligence which gives form and life to mortal organisation. 'I dressed his wound and God healed him.' This was an old surgeon's saying."

(3) "A man no sooner gets a cut, than the Great Physician, whose agency we often call Nature, goes to work, first to stop the blood, and then to heal the wound, and then to make the scar as small as possible. If a man's pain exceeds a certain amount, he faints, and so gets relief. If it lasts too long, habit comes in to make it tolerable. If it is altogether too bad, he dies. This is the best thing to be done under the circumstances. So you see the doctor is constantly in the presence of a benevolent agency."

(4) "Nature was before man with her anaesthetics; the cat's first shake stupefies the mouse; the lion's first shake deadens the man's fear and feeling; and the rattle-snake paralyses before he strikes."

(5) "The way a patient snatches his first look at his doctor's face, to see whether he is doomed, whether he is reprieved, whether he is unconditionally pardoned, has really something terrible about it. It is only to be met by an imperturbable mask of serenity, proof against anything and everything in a patient's aspect. The physician whose face reflects his patient's condition like a mirror may do well to examine people for a life-insurance office, but does not belong to the sick room."

But great as is the temptation of treating my readers to choice quotations from Holmes, I must resist it betimes. For however feasible the plan of producing specimen bricks from the superb edifices of other builders in noble prose may be, it is a well nigh impossible one with regard to Holmes without dismantling the entire edifice. On every page, in every paragraph, there is so much that is excellent and original that an admirer cannot hope to do justice to his range, his depth, and the keenness and brilliancy of his wit without quoting every sentence and every phrase. This perhaps accounts for the rather surprising fact that whereas handy volumes like the wit and wisdom of Dr. Johnson, the wit and wisdom of of the Earl of Beaconsfield and the wit and wisdom of the Rev. Sydney

Smith have been compiled, no attempt has been made, so far as I am aware, at giving a similar volume of select passages from Holmes. You may count the stars that stand far apart from one another in the constellations great and small, but who has ever catalogued the unnumbered host that thick-stud the Milky way?

LALIT KUMER BANERJEE.

THE STORY OF KHAMBA AND THOIBI.

A MANIPURI ROMANCE.

To those who are interested in the study of the frontier languages of India, the written literature of a tribe, wherever this is available, has an importance which cannot be over-estimated, as it represents the ideas and manners, the sentiments and modes of thought of the people and the generation to which it belongs. The story of Khamba and Thoibi, (1) "the national romance of Manipuri" a story the events of which according to the (2) Manipuries happened about 400 years ago,-has been handed down from generation to generation in the songs of the national bards of Manipur. "Manuscript copies of the story written in the ancient Methei character are" says Porteous, (3) "still to be found here and there in Manipur, but they are few, and their numbers constantly diminishing." The old Methei character which according to Damant was introduced in the reign of (4) King Charairongba about 1700 A.D. has in later years been almost entirely superseded by Bengali. To Haodeijomba Chaitanya Singh belongs the credit of printing in the current character this valuable piece of Manipuri literature, and this is the first time that the text has ever been printed. The version of the story given in this work is, we are told, taken from a manuscript in the possession of Laisraba Chauba Hanjaba of Leimajamleikai, Imphal, and Mr. Porteous, I.C.S., has written a very appreciative introduction to the publication. The writer of the present article has taken some pains to study the story in the original Manipuri text, as printed by Chatanya Singh in 1900, and the difficulty with which the single copy which is with him was obtained, brought home to him the painful suggestion that the literary world, outside the Manipuri tribe, has (5) so far hardly done much to preserve this relic of ancient literature

(1) Porteous's introduction to Khamba and Thoibi by Chatanya Singh.

(2) Porteous thinks, the incident is at least as old as the end of the 17th or the beginning of the 18th Century.

(3) Porteous's Introduction.

(4) Grierson's Linguistic Survey of India. Vol. 3. Pt. page 21.

(5) Grierson Lingustic survey (Vol 3. Pt. 3. page 24): "An annotated edition of a greater

from oblivion, though the Manipuries themselves have still in their possession, kept in reverential care the pictures of Khamba and Thoibi and the various scenes of Khamba's adventures. An account of the incidents forming the plot of the work will possibly be of interest to the general reader.

Moirang was once a principality in the Manipur State, under a ruling king of its own. Tradition says that the city of Moirang was built by God Thanjing, the patron deity of the Moirang tribe, whose temple can still be seen in the village of that name to the south of the Manipur Valley. (1)

Thoibi, the beautiful princess, was the daughter and only child of Chingkhuba, brother of Purik the Raja of Moirang. The Raja was childless and his brother Jubaraj Chingkhuba's only daughter was therefore naturally a great favourite in the family. Khamba was the son of Purenba,—a scion of a branch of the royal family of the clan of Khumal. Those were days of struggle between clan and clan, between Moiran and Khumal, beteen Methei and Luyang, for final supremacy in the *Methei Leipak* (Valley of Manipur), and the branch of the family which Purenba represented was living in comparative obscurity and was hardly known as an off-shoot of a royal family at all at (2) the time of Khamba's birth. When Khamba was a little baby, both his parents died, and he was brought up from his infancy by his elder sister and only living relation Khamnu, who had often to beg from door to door to get food for herself and her brother.

As time went on the princess Thoibi grew into an exquisitely beautiful young lady, accomplished in the arts of dancing and singing, skilled in riding and hunting, and yet conversant with the domestic duties of ordinary life. Khamba in his turn grew to be a handsome young man, —tall and muscular,—" so swift that none could race against him, so strong that he alone dared to seize a mad bull that was raging in the land." The story of the love between Thoibi, the Moirang princess, and Khamba, the Khumil, hinges on that point of romantic pathos which gives its charm to the story of Romeo and Juliet, and the end of all this passionate affection in the one case is tragic as it is in the other in Shakespeare's immortal play.

part of some old manuscript, if possible with an interlinear translation would certainly be a most useful undertaking. Could not this suggestion be carried out with " Khamba and Thoibi "?

(1) হজিক কাওবা মোইরাং হাইবা লৈপাক অসিদা থাংজিং লাইগি লাইসং লৈরি। Page 1 Introduction to Khamba Thoibi.

(2) Hodson ("The Methie's"—page 132) describes the struggles between the Moiran and Khumal class and tells us how at the instance of two Khumal women King Thanga Ipenthaba of Moiran slew a Khumal King of his time. "In a later reign," says Hodson " Moirang was invaded by the Khumals who assembled a force in boats. This boat was defeated and in return the Khumal Villages were fired."

To proceed with the story. Thoibi one day went out to catch fish in Logtak lake by way of sport, and she asked Khamnu whom she had met in the bazar before, to go with her too. The king hearing that Thoibi and her female companions were going out to sport on the Logtak issued orders forbidding male persons to go to the lake on that day. Khamuu told her brother Khamba of this and quietly came out to meet the princess at Logtak. Khamba however dreamt through the inspiration of Gods Panthoibi and Thangjing that he should go out to the lake too, and he went out accordingly. Suddenly there rose a mist, and when it cleared up Thoibi saw that Khamba was standing by her side ! (1) Her fishing net fell from her hand. The two looked at each other and loved,—it was a case of love at first sight. Thoibi told Khamba to go home at once, for she feared that the king who had ordered the exclusion of male folk from the lake that day might in his wrath punish him ; and yet when Khamba was gone she felt a pang in her heart at not seeing him by her side.

Thoibi next visited Khamba's dwelling, and inspite of the humble life of its occupant of which it gave proof, Thoibi swore that she would marry none but Khamba ; for God Thangjing had brought about the union of their hearts.

Her father Chingkhuda however favoured Nongban (also called Kongyamba), a rival suitor to the hand of Thoibi, in preference to Khamba. Then follows a series adventures,—trials of strength between Nongban and Khamba,—the *Lomjen Chenba* (the long race), *the Kao Phaba* (seizing the wild bull), *the Kei Phaba* (seizing the tiger) and so forth,—at all of which Khamba defeated his rival. Seeing that Khamba was winning in each combat with his rival, Thoibi's angry father had him tied to an elephant's feet, while Nongbon (Kongyamba) pricked the beast (1) from behind, but by the grace of God Thangjing Khamba stood the ordeal though indeed he had been wounded in body. The King got angry with the Jubraj, Thoibi's father, at this unjust treatment accorded to Khamba, tried him in open Durbar and sent him to jail. When the Jubraj obtained his liberty again, he sent Thoibi into exile and sold her off to one Kubo who lived in a distant part of the country. On the way she met Khamba and they wept, and Khamba gave her a staff which Thoibi planted on the roadside and commanded it to blossom forth with leaves and foliage if their love remained true. Time passed on, and then her father took pity on her and sent for her. The Jubraj however secretly advised Nongban (Congyamba) to meet Thoibi on the way and try to win her to himself. Thoibi saw the

---

(1) থম্বাবু শাম্বু খোং য়েংপা পন্‌হপ্‌
page 46, Chaitanya Singh's Edition. The plot of the story as given by Hodson is about the same as in Chaitanya Singh's Edition.

staff, she had planted,—green with foliage. Nongban came with a litter to meet her. As he came with a message from her father, she met him, feigned friendship with him, and sat on his red cloth, with a stick between him and herself (by way of keeping aloof from one who was not her husband). She asked Nongban to allow her to ride on his pony which was going along without a rider. Suddenly she got up on the pony, and leaving Nongban behind, galloped off to Khamba. (1) Poor Nongban !

Then comes the final trial of strength between the rival lovers. For Nongban appears before the King, and the latter, in open Durbar, asks him to settle the matter with Khamba on the point of the spear. There was a fierce tiger in a neighbouring jungle. The King declared that whichever of the rivals could kill the tiger with a spear would win the hand of the beautiful Thoibi. Nongban was killed by the tiger, but Khamba single-handed slew the animal and won the hand of Thoibi.

Thus were they married, but this happy union was destined to have a tragic sequel. Shortly after the marriage, Khamba unhappily took it into his head to test his wife's fidelity. So while one night she was waiting for her husband in bed, Khamba came pretending as if he was some one else, pushed a stick through the wall, and attempted to enter the house by stealth and try her virtue. Thoibi, indignant and infuriated, took up her spear to defend her honour." "I am a chaste wife, you fool," she cried, "take this for your pains." So saying she hurled the spear at the intruder, who, she did not know was her own husband in a stranger's disguise. Her spear pierced through the heart of Khamba, and it was only when he cried out in the agony of death that she recognised him by his voice. Finding out her fatal error—alas, too late !—she pierced herself through the heart with the self-same weapon and put an end to her own life. The two died together and their bodies were burnt on the same funeral pyre.

To this day the story is sung about by the "Ojha pena isei sakpa" "ওঝা পেনা ইশৈ সেক্পা" (national bards of Manipur) in all parts of the Manipur Valley, and young and old, rich and poor, listen to its recitation with rapt attention. To this day the shrine of God Thangjing is a place of pilgrimage to all, specially to young lovers, and certain robes and weapons preserved through centuries with veneration and care are pointed to by tradition as the garments worn and weapons used by Khamba and Thoibi. Pictures of Khamba and Thoibi are to be found in Manipur

(1) Hodson has given in his book "The Metheis" some excellent portraits illustrating this and other scenes. The present writer has seen beautiful pictures of Khamba and Thoibi in the possession of a Manipuri, about 2 miles from Sylhet town.

homes, whose inmates would not part with them for love or money, and the sacred awe, with which these are preserved in the family, are proofs sufficient of the popular belief in the attributes of Divinity with which, the hero and heroine have long been invested, in the imagination of generations of men and women.

S. C. GHATAK.

SOCIAL AND ECONOMIC CONDITION OF INDIA IN THE FOURTH CENTURY B. C.

II.

To a Hindu, marriage is the most important function of life. Not only does its issue provide "water" to the manes of his ancestors but its also saves him from falling into one of the hells. It is therefore, no wonder that Chanakya gives great prominence to *marriage*. 'Marriage,' he says "precedes the other calls of life." He then goes on to classify the eight sorts of marriage prevalent amongst the ancient Hindus and needless to say that he follows closely his predecessors in defining the eight forms of marriage-viz Brahma, Daiba, Prajapatya, Arsha, Gandharva, Asura, Rakshasa and Paisacha.

Turning to *Stridhana*, our Machiavelli says "Means of subsistence or jewelry constitutes what is called Stridhana or property of a woman." As regards subsistence, it should be valued at above two thousand but there is no limit to jewelry—a fact, which, I am sure, pleased all our Eves. Chanakya cites specific instances when this Stridhana could be spent by the owner. It was no guilt for the wife to make use of this property in maintaining her son, or her daughter-in-law or herself, *whenever her absent husband has made no provision for maintenance.* Similary, in calamities, disease and famine, in warding off dangers and in charitable acts, the *husband* too could use the property in any way he liked.

We find in Chanakya that like men, *widows were permitted to marry* though under special circumstances. Wives who belong to Sudra, Vaisya, Kshatriya or Brahman Caste could marry though after stated periods. Women, we also notice, could marry the younger brother of her husband. If there were a number of brothers to her lost husband she was to marry such a one of them as was next in age to her former husband or as was virtuous and was capable of protecting her, or one who was the youngest and unmarried. In fact, women were given a wide latitude in these cases, for not only were they permitted, as we have seen just now, to marry their husband's brothers, but they were also allowed, if there were no brothers to their dead husbands, to marry those who belonged to the same *Gotra* as their husband's relatives. In case where there were many, 'she' could select one who was the nearest relation of her deceased

husband and the choice lay with her and not with her relatives.

Divorces, it appears were allowed in the time we are speaking of. If there was enmity between the husband and the wife, divorce could be obtained. But a woman, hating her husband, could not dissolve her marriage against *his* will. Neither could a man dissolve his marriage with his wife against *her* will. That seems to have been the general rule; but there were exceptions too. We find that if a man apprehended danger from his wife and for that reason desired divorce, he was authorised to do so, but he should in that case return to his wife whatever was given to her on the occasion of her marriage. Likewise, the wife could get a divorce, if she sacrificed her claim to her property if she apprehended danger from her husband, But it must be remembered, that *marriage contracted in accordance with the customs of the first four kinds of marriage could not be dissolved.*

We then turn to the question of *Inheritance.* In inheriting, both *assets* and *liabilities* were to be equally divided and division was made of all that was in existence. Certain persons *e.g.* outcasts, eunuchs, idiots, lunatics, blind men and lepers, were excluded, these being entitled to only food and clothing. Property for which there was no claimant went to the king. The general rules for partition of ancestral property seemed to be this :—when a man had no male issue, his own brothers or persons who were living with him, were to get his movable property, while his daughters would get the immovable property. If a man had only sons, the entire property went to them and if a man had only daughters who had been married according to the proper rites, they were entitled to the property. On failure of sons and daughters, the man's father, if living, was to inherit and if he was not living, the brothers and the sons of his brothers were to get it.

No distinction was to be made by the father in allotting shares of his property to his sons and allotment was to be made when the inheritors had obtained their majority. The shares of minors or of absent brothers would be properly guarded while unmarried brothers were to be paid their marriage expenses *equal to that incurred in the marriages of other brothers.* Daughters used to get dowries on the occasion of their marriages.

There were also special shares of inheritance. *e.g.* the eldest son used to have entire claim over the *goats* of his father among Brahmans, *horses* among Kshattriyas, *cows* among Vaisyas and *sheep* among Sudras. The father's *carriage and jewelry* were the special portion of the eldest; his bed, seat and bronze plate in which he used to take his meals, to the younger sons; iron ware, domestic utensils, cows and carts were reserved for the youngest. Daughters as

we have mentioned before, were excluded from inheritance, although they were to get dowries and the bronzeplates of their fathers. There were also other rules relating to particular cases but space would not permit us to go into details.

The Administration of justice, as we see in the Arthashastra, was carried on by 3 members acquainted with sacred law who were assisted by three ministers of the king. We notice that like the procedure which obtains now a days in the present courts, in the time of the Maurya kings an almost similar procedure was followed. There were the witnesses who were paid the expenses incurred by them during their journeys, the oaths, and even the adjournments. The year, the season, the month, the *paksha*, the day, the nature the place and in civil cases, the amount of the debt as well as the home the residence, the *gotra*, the name, occupation of both the plaintiff and the defendant were entered. Both the plaintiff and the defendant must be fit to sue and their statements were thoroughly scrutinized.

It was obligatory to produce three *reliable, honest and respectable witnesses.* Wife's brothers, Co-partners, prisoners, or persons once punished by the Government were exlcuded, as well as the blind, the deaf, the dumb, the females, government servants and even egotistic persons. We then see that only those whose evidence could have been thoroughly relied on were admitted. Judging from what Arrian said about the honesty and truthfulness of the Indians of the Maurya period, we must say that the evidence adduced, was undoubtedly *the best.*

The witnesses had to take *oaths.* They were taken before Brahmans, vessels of holy water and fire. There were different ways of administering oaths according to the caste of the witnesses. A Brahmin was simply told. 'Tell the truth". A Kshattriya or a Vaisya witness was told "If thou utterest false-hood, may you not attain the fruits of war, nay, wander as a beggar,with a skull in thy hand." A Sudra witness was thus warned "Whatever thy merits are, shall they go to the king and whatever sins the king may have committed, shall they go to thee, if thou utterest falsehood ; fines also shall be levied on thee, for facts as they have been heard or seen will certainly be ultimately revealed." If even after this, witnesses were found to have made false statements, they were heavily fined.

It was the supreme duty of the king to see that justice was properly administered for only its observance could lead him to heaven. Certainly with such injunctions to obey we can fairly surmise that justice was administered properly and impartially by the king *"either over his son, or his enemy."*

On the question, whether *torture* was resorted to to elicit confession, authorities

vary. Mr. Elphinstone and some others are of opinion that torture was never allowed. We, find however in Chanakya's Arthashatra, that *torture was allowed.* Chanakya says that there were four kinds of torture. As to persons who committed grave offences, the form of torture was of nine kinds of blows with a cane—12 strokes on each of the thighs; 24 blows with a twig of the tree *Naktamala*; 32 cuts on each palm of the hands and on each sole of the foot, two on the knuckles, the hands being joined so as to appear like a scorpion; two kinds of suspensions; burning one of the joints of a finger after the accused had been made to drink rice gruel; scorching his body before a fire after he had been made to drink oil; and lastly causing him to lie on coarse green grass for a night *in winter. But never was a Brahmin offender tortured.*

It appears also that in some cases offenders were tortured to death. When a man murdered another, the offender was tortured to death. Any person who aimed at the kingdom, who forced entrance into the King's harem, who instigated wild tribes or enemies against the King, or who created disaffection in forts or in the army was *burnt alive* and as the author graphically puts it "burnt alive from head to foot."

Of the many things which strike one in reading this valuable book of Chanakya, nothing is more striking than the *Asumritaka Pariksha* or what is called now a days "Post mortem Examination." That shows the high level of Civilization which India and her sons attained in that age; we find that in *cases of sudden death*, the corpse was to be smeared over with oil and examined and then whether the person died by hanging, or by drowning, whether he had been killed with "sticks and ropes," or had been thrown down, or poisoned, should be carefully examined by the respective marks of each sort of death. For example, any dead person with stiffened arms and eyes, with tongue bitten between the teeth and with belly swollen, was considered as having been killed by drowning. A person with fractures and broken limbs was regarded as having been thrown down. Similarly, any dead person with dark coloured hands, legs, teeth and nails with loose skin, hairs fallen, flesh reduced, and with face bedaubed with foam and saliva was regarded as having been poisoned.

In death due to poison, the undigested portion of meals was examined in milk. In some cases, the food was extracted from the belly and thrown on fire and if it made "Chit chit" sound and assumed the rainbow colour, that man was assumed to have been poisoned. I am afraid, I am not competent to pass any opinion on such sort of postmortem examination. Neither had I the good fortune to see any body emitting such "Chit chit" sounds our author says. I leave these to learned Doctors, but I venture to say, what

I have urged in the beginning that India must have attained the high water-level of Civilisation.

Fines were realised in almost all cases and in some cases in lieu of *mutilation of limbs*, fines were imposed. We thus see that "when a person steals or destroys cocks, mongoose, cats, dogs, or pigs, he shall have the edge of his nose cut off or pay a fire of 5 4 panas." Likewise we find that when a person stole a cart, a boat he had either to lose one of his legs or pay a fine of 300 panas. When a Sudra called himself a Brahmin or when a person stole the property of the Gods, or conspired against the king he was deprived of both his eyes; but he could pay a fine, instead, of 800 panas and save his eyes.

I shall deal with only one more topic to-day, leaving the rest for another paper.

The topic, is *Defamation.* Calumny, contemptuous talk or intimidation constituted defamation. If the blind, the lame &c were insulted with such ironical expressions as 'a man with beautiful eyes, a man with beautiful teeth,' that constituted defamation Nowadays if we can prove the truth of the allegation in a defamation case, we are safe. Such was however not the case in those days. Abusive expressions in general, no matter whether *true*, *false*, were construed as defamatory and were penalised. But in case, the abuse was due to carelessness, or intoxication or loss of sense &c, the amount of fine was reduced. Defaming one's own village or nation was visited with the lowest amercement, while that of one's own caste or assembly with the next higher and that of Gods or temples with the highest amercement.

JOGINDRANATH SAMADDAR

HYMN TO SAVITRI.

Divine Savitri's radiant fire
Of Piety may we obtain,
May He with holiness inspire
Our Hearts, and exaltation glow
Within us as we near His fane:
That He their gratitude may know,
To Savitri the Pious throng.
And with uplifted spirit bring
In ecstasy their offering
Of sacrifice and sacred song.

Rigveda III. 62. The "Gayatri" hymn.

E. N. Blandy.

THE STORY OF SUDASA.

[THE CHANGEFUL PERIOD FROM THE DEATH OF BHARAT TO THE RISE OF SUDASA].

III.

Having now treated at some length of the relations of the main parties to the strife that followed Bharat's death, let us, from that momentous event follow the history of the times, that show the evolution of a great empire consolidated out of a dismembered mass of principalities, and emerging prosperous from the ravages of internecine struggles.

During the disorders that must necessarily have followed from disputed succession after Bharat's demise, Abhyavarti, son of Chayamana *(said to be of Prithu's race) made himself master of a big slice of territory to the west of the Asikui-Parushui tract. He assumed the rank of a 'samrat,' probably over the Anavas of Western Punjab and the Druhyavas of Gandhara. Bharadvaja records in the Rig-Veda that Abhyavarti fought successfully against the Varaukhas on the Hariynpiya river. These Varasikhas are described as hostile to "Indra"-worship and breakers of sacrificial vessels; thy are therefore very probably no other than the Parasikas, who, as is well-known, entered Persia through the Caucassus after rounding the Caspian Sea, thus crossing the Ural River, which is to be identified with the Hariynpiya (Europa-Ural). We can thus form an approximate idea about the Western frontier of what must have been Bharatas' Empire. [We must remember that a few generations ago, the Paurava capital was at Pratisthana (Kabul), and that Dushyanta is traditionally known to have rendered valuable assistance to the "Indra" of his time in his wars.]

When Chayamana's son was crowned Emperor of the West, Bharadvaja lost no time in making a friendly alliance with this newly-arisen power, and received many presents from his ally.

The Midhas had apparently come as a band of peaceful settlers into the Indian plains, like the Parsis of later times. Under the Paurava emperors, they were suffered to maintain their own constitution and customs, and the Panchalas formed a sort of 'Tributary Mahals' under the empire of Bharata. The Panchala chiefs had been content to be *within* this empire solong as

* The same name as Chahamana (Chauhan). Another great "barbarian" had a similar name, Toramana (Turan ?).

* *The 'Indra'* was the Bretwalda of Central Asia, and the recognised paramount Sovereign of all the Deva-Aryans. This honour was attained by three of the predecessors of Dushyanta, u 2. Nahusha (whose general was a "human" Agni), his brother Raji, and his son Yayati. By the time of Bharata, "the Indra" had perhaps beeome a thing of the past.

a strong arm wielded the rod ; and they had peacefully spread their settlements as far as the Upper Ganga basin, till their progress was blocked by pre-existing Aikshakava settlements. When, at the passing of Bharata, the veil was lifted, the whole tract from the Parushui to the Ganga was parcelled out into several independent Panchala principalities.

The pentarchical system of the Panchalas was lost in the scramble for more land (for we no longer find groups of five princes in ihe dynastic lists), and several Panchala Royal Houses made their appearance at different capitals,—the Vrihadisavas at Kampilla, the Srinjayas at Ahi-chchhatra, and so on. Accordingly we find Vadhri-asva and Divodasa masters of the territory between the Parushui and the Sarasvati.' The capipal (or rather original seat) must have been little removed from the confluence of the Vipasa and the Satadru (where, as we shall see later on, Visvamitra's progress was interrupted on his way back from Sudasa's great sacrifice). This is confirmed by the Ramayana, which places the 'janapada' of the Sadasas close to the Kekaya country (mod. Karigra' valley in the Bari Doab) and to the South of it.

Thus far the Panchala princes had shown no other activity than making their position secure. The first to come forward were Divodasa and Srinjaya, his brother (of Ahi-chchhatra). Vadhri-asva, like a simple foreigner, had been duped and entrapped by the Panis (or Vaniks ; the Phœnicians of subsequent ages)—the ancient merchants of the East. His able son, Divodasa, however, not only repaid the debts of his father, but (taking advantage of the absence of any checking supreme power) succeeded in rooting them out of the land. Divodasa soon made his name as a sturdy warrior. At the same time that Abhyavarti' became lord of the North West, Srnjaya extended his sway over the Turvasas (who had been incorporated in the Paurava empire by Dushyanta). This is the reason why we find a Srnjaya and a Sahadeva amongst their princes after Marutta and Trinavinda in Vaisali.'

Meanwhile, Bharadvaja had been greatly weakened by dissensions in the state. [In one of his 'Suktas' Bharadvaja complains of refractory relations]. Asvamedha was sore at heart at his rejection in favour of a stranger, and could not bear to be a 'pensioner' in his father's dominions. He cultivated an alliance with the son of Riksha, probably while both were in Central India, and he must have obtained the support of the Vaidarbha Yadavas as well. The son of Riksha and Asvamedha succeeded in wresting from Bharadvaja the entire S. W. portion of the former empire, and that was how Arksha Sutarvan waxed great on the Parushu. Asvamedva did not probably live to enjoy the Sovereingty of the newly-acquired territories, and Sambarana assumed the reins of the Paurava rule in the name of

Asvamedha's minor son, or was named 'regent' by Asvamedha. Thus Riksha' son and Asvamedha's son are known to have performed jointly the same Sacrifice. · Sambarana lost no time in making friends with Atithigva-Divadasa, his cousin of the North, whom he invited to that sacrifice with his son Sudasa-Indrota (destined in aftertimes to take his life); even the officiating priest was old Priya, the Mede, a grand-uncle of the rivals.

But Divodasa, the Panchala, saw how powerful Sambarana had become, and the alliance was broken off as soon as the afflicted Bharadvaja sought the protection of the Panchalas. Soon afterwards the Panchalas, now doubly strong in their young leader Sudasa, came down upon him, and his Kingdom passed away as it had come. Bharadvaja records in the Rig-Veda how his sons were received with all attention by Prince Prastoka, son of Srinjaya, who made valuable presents to him along with Divodasa, who had now conquered Sambara; Bharadvaja further says that he accepted these presents in the interests of universal peace; in the same 'Sukta' we find Bharadvaja making preparations for leading out an assemblage of chiefs and armies (perhaps the Panchalas, against Sambara). In his 'Sukta' Srihotra (afterwards a successor of Bharadvaja) says how Divodasa and Bharadvaja both grew prosperous after Sambara's defeat. Hence-forward the Bharadvajas (Trtsavas or Bharatas) remain closely attached to the Panchalas, or rather to Sudasa, except for a short interval (as we shall see later on).

Sambarana betook himself to the hills on the Sindhu River in Central India with his followers. There after a time he met a Vasistha (presumably Sakta) and implored his aid to retrieve his lost fortunes. That sage, born in a family of diplomats, gave him his counsel, and Sambarana was again a king. Those counsels must surely have been (i) to make an alliance with the 'Sruryya-vamsi' 'sovereign on the Narmada' * on the borders of whose kingdom he had taken refuge, † and (ii) to obtain control of several of the strong hill-forts of Central India at whose mercy the northern plains lay. This is evident from subsequent events. Sambarana records of himself that by the favour of 'Rajarshi Saktr' he gained the goodwill of king Trasadasyu, son of Purukutsa, and also of several other local princes; the alliance with Trasadasyu of the Ikshaku race refers to the marriage of

* This Aikshakava dynasty was founded by Mandhata of wide fame, the daughter's son of Matinara-Paurava. (Vide infra).

† It may reasonably be supposed that Sakti was sent as agent of his father to the S. Kosala Prince, Trasadasyu, to deliver Vasisthas request that Tapati be given in marriage to Sambarana, in order that he might thereby be won over to the side of Vasistha and his new friend and ally Sudasa (vide infra). The plan seems to have temporarily succeeded, as Sambarana did not issue forth against Sudasa for a long time, presumabiy until Trasadasyu's reign ended.

Sambarana with his daughter Tapati', whose hand he won after waiting for long years.—and this courtship of his has become famous in tradition. Again, we find repeated mention in the Rig-Veda of the strongholds and rock-girt cities of Sambara, which were all stormed by Sudasa in one campaign. In fact Sambarana lived in seclusion in the Southern Hills for a space of nearly forty years, after which he ventured once more to show his face in Northern India, and that was for the last time.

[Sudasa's conquest of the S. W. and the N. W.]

IV.

During these forty years, the North was gradually being brought under one rule by Sudasa, who had succeeded Divodasa as the leader of the Panchalas: and, young as he was, had already surpassed his veteran father in valour and pluck. In him was concentrated the genius both of his father and of his mother Indrasena. That brave lady used to go with her husband Divodasa in his wars; and the Rig-Veda describes how on one occasion, when in the midst of the fight his chariot was deprived of its animals, Divodasa alighted, and club in hand drew the chariot along, while his heroic wife with flowing tresses sent showers of arrows against thousands of enemies, and the soldiers followed the undaunted pair into victory.

The province of Matsya, which passed over to Sudasa presumably after Sambarana's flight to the South, excited the cupidity of the chief of the Turvasas, who, in concert with the Bhrgus and the Druyavas, invaded the land of rich pastures and vast herds of cattle. But his plans of expansion were put an end to along with his life, when Sudasa gave battle to the allies and the Turvasa chief fell.

This defeat of the allies marks a crisis in the history of the period. If Sudasa had lost the contest, the Bhrgus would have become masters of Northern India as they were of the Southern. The situation will be explained, if we digress a little into the history of the Yadavas.

The elder branch of the Yadavas in S. W. India became turbulent and aggressive after Bhadrasena, from whom the Haihayas derived their new appellation of "Bhadrasenyas." The Bhrigus were a race of warrior-priests, who are found allied with the Yadavas from the very beginning, * and whom the latter employed on state service and intermarried with, as well. The alliance of these two peoples gave rise to a

* The Bhrgus had brought about the fall of Nahusha—Indra They followed the sons of Devayani and Yayati into exile ; remained on good terms with the Yadavas till the time of King Mahishman-Haihaya (vide infra.), when some of them broke off.

power that rarely met with reverses. Kanaka-Bhadrasenya, surnamed the 'Durdama' (afterwards famous as 'Kritaviryya') led the Haihayas and the Bhrigus in conquering expeditions as far as Varanasi,' and dispossessed its prince, Divodasa-Bhimaratha. Divodasa sought the protection of Bharadvaja. who was a close ally of Sudasa. [Bharadvaja continued to be a well-wisher of the Kasi line, specially of Pratardana and his son Kshatrasri who put an end to the Haihayas a few decades later] This might have been a secondary cause of the Sudasa-Bhargava conflict. The downfall of Kasi emboldened Krtaviryya to greater attempts, and Ahamyati, the petty Eastern Paurava prince who had married Bhanumati, his daughter, must have encouraged him in his ambitions. The next step therefore was the formation of the 'Triple Alliance' with the Druhyavas and the Turvasas, the neighbours of the Yadavas on the North-West and the North-East respectively. But defeat destroyed these schemes, and the Haishya-Bhargava domination in North Eastern India declined to such an extent as to allow the Rakshasa tribes of the Vindhya Hills * to take possession of the City of Varanasi itself. The Yadavas were ultimately persuaded to acknowledge the supremacy of Sudasa.

The Druhyavas, otherwise known as the Gandharas, however, gave Sudasa more trouble. Their country at this time formed the larger part of the Chayamana dominions, which would naturally be called the Druhyava kingdom. The vigorous tribes of these Gandhara highlands have traditionally been known to be nothing loth to plunder the plains whenever possible; and the Druhyns of the time could not lose the opportunity when the Bhrigus gave the signal. Their frontier did not cross the Parushui so long, because the Panchalas were quite as martial a race; but now the alliance with another great power supplied the requisite motive force, and Kavi, son of Chayamana (either the successor or the general of Abhyavarti), invested Matsya from the West, but as we have seen, with no success.

* (According to the tradition brought to light by Pandit S. C. Vidybhusana) the Rakshas (Known among themselves as Tamilas or Dravidas) were in possession of N. India before the Aryans with whose advent they retired into the Deccan. The famous Ravana is said to have transferred his capital to Pulastya pura, named after his grand-father in the, islan of Lanka (mor. Polonmur; Pali,—Pulatthipura); the Rakshasa territories in the Deccan were governed by a viceroy. Long before this event, the Siva-and Ganesa-worshipping Rakshasas had possessions near about Varanasi; its prince Divodasa, having broken down a Ganesa temple, incurred the vengeance of the Rakshasa chief Kshemaka, and the city of Varanasi was deserted for a temporary capital on the Gomati. Varanasi then fell under Bhadrasena and his sons, but Divodasa killed them all in battle, save Krtaviryya who survived.

SUBIMAL CH. SARKAR.

THE FUTURE OF THE RACES.
II

7. *Inadequate appreciation of economic condition* :—But inspite of all this danger, the deprecation of Socialism as hunger-born comes with a bad grace from a philosopher, whose heraldry of evolution carries back the ancestry of humanity to families of manlike apes. The very foundation of evolution lies in lowness of origin and elevation of end.

If a certain kindliness of spirit consciously advancing against the tide of natural Selection, which is a decent Euphemism for natural Rejection of and feebly preaching the preservation of the weak against the strong, of the uncivilised and the semi-civilised against the destructive advance of the civilised races, forms part of the *zeitgeist* of present century, it is certainly part of that time-spirit that impels civilisation to help the poor against the rich, the hungry labourer against the hankering dyspeptic suffering from unsatisfying satiation. It is somewhat irreconcilable with reason that a philosopher who pleads for the preservation of the backward races, should forget the claims of the backward classes. The truth seems to be that Principal Seal in the immensity of his studies in anthropology Sociology, Psychology, and other sciences, has drowned the little science of Economics, more distracting in its practical operation than dismal in its reputation. This little science deals with social forces more powerful than those which a Races Congress can deliberate upon. It were devoutly to be wished that Dr. Seal in his anthropological enthusiasm had left modern Socialism to take care of itself; had found wisdom in sedate forbearance and golden silence. I wish this sally into the dark region of Economics did not substantially take away from the value of the appeal in favour of the backward races. If the speaker himself did not show forbearance, I wish we could show it ourselves. I wish the passage in which this sinister thrust at socialism occurs could be left out in the reading. But, alas ! this is the passage in which the speaker rose to the highest elevation of thought, the grandest display of language, into which he has focussed all the light with which he fixes his gaze on the future of Humanity.

8. *Irreconcilable Sentiments*—It is into this passage that he concentrates all his highest thoughts, all his philosophy, his acute analysis of the actual, his astute anticipations of the potential, his fulminations levelled against the present, his blessings lavished on the future, his deep-rooted pessimism, his flighty optimism, his consciousness of the hard reality of the devil's domination and his faint expectation of the possibility of the advent of the kingdom of God, his limpidity of sight, and the mistiness of

his visions, the pious ebullitions of his higher emotions, and his economico-sociological disquisitions, his estimate of the forces of nationalism, and his forecast of those of Humanism, his fear of world-wide rebarbarization, and his hope of universal humanization,—a pocket edition of a gigantic encyclopœdia of transcendental adumbrations. The truth seems to be that his complete, contemptuous ignoring of the economic forces which, more than any other social forces, control the movements of humanity, has led him into a quandary of his own creation. He looks like a Darwinian divested of Malthusianism, an advocate of natural selection without a belief in the inadequacy of subsistence, a follower of Spencerian Justice with his fixed belief in the survival of the fittest, a respecter of personality and a hater of socialism, a moralist with equal respect for conscious and natural selection, an advocate of altruism resting upon egoism with a full belief in the necessity of self-sacrifice for social regeneration, a strong individualist with a stronger socialistic undercurrent, a high priest of Idealism preaching, not the identification of neighbour with self but the sacrifice of the self for the benefit of the former, a Christian not loving neighbour as self, but sacrificing self for the sake of his neighbour, a transcendental materialist, a commercial spiritualist.

9. *An appeal to the higher Emotions*—But we must not forget that the paragraph under criticism is a peroration,—an appeal not to the logical faculty, but to the higher Emotions without whose aid the Intellect remains dull and lifeless, and in this view no human being can fail to admire the lofty tone of thought, the melting heat of the feelings, the lucidity with which the unsatisfactory state of the present is laid bare and the anxious hopefulness with which a better state is urged for humanity. We must not forget that this peroration was addressed to an assembly of representatives mostly of the civilised races, who had the power of making or marring the backward races, and whose training in the past with reference to their world-embracing problem is only just now showing a change for the better. We must not forget the value of a higher teaching however feebly conveyed to a Christian people, absent-mindedly standing on the crest of a commercial civilisation, like one who has lost his way in his journey back Home.

10. *The plea for the preservation of the Races*:—"The diverse ethnic types are all essential to the full unfolding of the plan and pattern of universal humanity under our multiform geographical and historical conditions. The ideal of humanity is not completely unfolded in any race, yet each race potentially contains the fulness of the ideal but actually or explicitly renders a few phases only, involving other aspects more or less implicitty."

Later on Dr. Seal realizes "Universal Humanity as an organic and organised

constitution, superintending a *primum mobile* the movements of the subordinate members of the world-system, each within its own sphere and orbit." He next amplifies the idea as follows :—Respecting each national personality, and each scheme of natural values and ideals, Universal Humanity will regulate the conflict of nations, national ideals and values, on the immutable foundation of justice." He defines• justice as the conscious formulation of the law that every national personality has a right to the realisation of its own ideal ends, satisfactions and values within the limits imposed by the similar rights of others, and also a right to co-partnership and co-operation for the common good and common advantage."

Perhaps in this adumbration the words corporate good and corporate advantage would express the idea more suitably. The idea of personality is first carried from the individual to the Nation and next from the nation to the federation of nations : The personality of the nation is not the aggregate of the personalities of the individuals, but an abstraction, which disregards, and in case of *need* must sacrifice the individual personality for the good of the national personality. The so-called respect for personality which is said to be part of the modern conscience and modern spirit loses its primary character as representing a feeling towards a distinct concrete, sentient entity. When personality is further elevated to Humanity it loses this primary character still more plainly and the eulogy lavished on the *ahimsa* of the Indian character loses all its meaning. The respect for personality becomes an object for the intellect to deal with, with which the emotions have very little to do. And if morality is associated with this respect for abstract or corporate personality, it becomes a department of philosophy ; and right and wrong must leave the arena of practical life and become a subject of study for the federal legislature of Universal Humanity. The term federal legislature has been used here deliberately ; for Dr. Seal's Universal Humanity appears to be but an indistinct, obscure expression for the idea which Sidgwick expresses more precisely in the other way. The activities of the ideal legislature will be directed either towards a higher ideal or in merely preserving itself, involving the preservation of the composite united states,—what this higher ideal may be, unless it be a state in which conflict has ceased to exist, with all its generating forces, I need not here inquire. But the mere preservation, in the alternative, seems to imply the cessation of evolution, the cessation of the process which has brought forth the man out of manlike apes, and which is destined to evolve Universal man out of his present defective condition.

The conflict of interests which threatened to rebarbarise the world to the

horror of the speaker, will remain as a fundamental element in the Universal Humanity of the future, and will continue to disturb the parts, the disturbance being from time to time settled by the Supreme Legislature of Humanity. Whether the legislative activities of this body will be directed towards preventive or punitive measures, we are not told. We only see that it will be an imperfect legislature, a partially Universalised Humanity composed of still more imperfect parts, striving for higher perfection. The ideal will be a road-side terminus in the broad railway line of evolution.

The ideal differs from Sidgwick's federalism by the fact, that while the latter recognises the existence of external relations as supplying the primary forces in the origination of a federation, Dr. Seal ignores them altogether. He recognises conflicts between national personalities but is silent on the subject of federal personalities. It makes no direct or pointed suggestion how duality is to be reduced to absolute ultimate unity in the advance of Humanity. It accidentally calls attention to redemptive love and sacrifice, but relies for the consummation chiefly upon a combination of individualistic and socialistic justice which will be administered in judicial character by the Privy Council of Universal Humanity. There are, in short, numerous apparently irreconcilable ideas adumbrated in the speech which we may reasonably hope Dr. Seal will take the trouble to explain and reconcile in a future paper. In the meanwhile we recognise the profound erudition and genuine culture which Dr. Seal has evinced in the short paper which is before us. The subject is too vast to be comprehensively dealt with in a speech, and we are proud to acknowledge the ability and humanity which characterises it : The ideal is a thorny question for the evolutionist to deal with, for he deals with continuous progress and not with the end of it, which the ideal implies.

The appeal; its historic aspect.

I shall now examine the need for the appeal on behalf of the backward races. In the conflict of conscious and natural selection, the backward races have for the last 3 or 4 centuries become a subject of experiment and study to the civilized nationalities. Natural selection operated more powerfully at first, but as in the evolution of modern civilization humanity asserted itself with increasing strength against the indiscriminate, destructive influence of natural selection, modified and strengthened by the introduction of different races within the same physical but different psychical and social environments, new ideas sprang into existence with the result that conscious selection began to play an increasingly important part in the game of destruction and conservation. Conscious or artificial selection is the

same thing as natural selection working with a definite object. Natural selection is blind ; it has no purposive character in its activity, though it has a general tendency towards a definite end. Natural selection eliminates weakness by the destruction of the weak ; conscious selection places the weak in favourable environments to transmute weakness into strength. The danger of conscious selection lies in imperfect foresight and in failure to distinguish between the immediate and possible remote results of any course of action ; to understand what is really good and deserves selection or preservation. Conscious selection has the furthur characteristic of creating a longing for the quickest attainment of the object outlined by it, called the ideal or goal of existence. This longing for the quickest march to the ideal occupies a prominent place in the thoughts of Dr. Seal. Indeed when conscious selection is mixed up with the evolution of natural selection their sentiment is bound to be strong : Pained by the thought that the suppression of a simple race would delay the attainment of his ideal by several centuries, he exclaims in his characteristic feeling way, "the whole system of nature, the entire process of history, would show a gap, a discontinuity, a wound, if one such thoroughbred type were suppressed or obliterated, and the recuperative process of evolution would slowly re-evolve the type with proper modification and painfully heal the wound in the centuries to come." It is noteworthy that to this longing may be traced in part at least the rapidity with which the American Races succumbed to the forces of conscious selection operating in the same direction as natural selection.

But as already indicated the process of obliteration by direct extirpation has to a large extent given place to a new process which works silently and invisibly in the direction of transmuting one type into another or what would be more correct, of fusing all types into a single type unlike any of them. This newly-evolved type necessarily has in its composition more of the elements of the stronger types than of the weaker ones, which lose their typical character more visibly than the latter and seem almost to be swallowed up in them. Dr. Seal's ideal being diversity in unity, more than unity in diversity, he bitterly complains of this process of fusion. He would keep each type intact cleaving to every other type but not getting fused with it or chemically compounded with it so as to evolve a wholly new type. An attempt to prevent this fusion or chemical combination while the several types are placed in juxtaposition galvanising one another and thereby changing this molecular condition seems more than what conscious effort can effect. Dr. Seal himself does not believe in the character of a race as a statical entity, immobile, immutable and absolutely fixed in an everlasting stagnation. Dr.

Seal says "I arrive at a new view of Race, a synthetic view which considers race not as a statical but a dynamical entity, plastic, fluent, growing etc." This dynamical view of Race seems to knock the bottom of the complaint to a leaky support. Since the dawn of civilization a process of fusion has been going on in the different parts of humanity. This process has in modern times assumed a world-wide character and has been gathering strength with the progress of the centuries. It seems too late now to think of checking this process, though the desire of the weaker races who are losing their racial personality faster than the stronger ones, to give a turn to this world-wide movemevt, seems to be natural, as the out-come of a deeprooted sentiment that has grown out of an imbecile historic pride, the growth of a few centuries or a few thousand years, which torments the soul by loss of that strength which in historic times exacted respect from such personalities by its own power and pre-eminence more than by any persuasive exhortation or appeal to redemptive love or redemptive sacrifice. Dr. Seal seems to be unaware of the redemptive virtue of competition and friendly rivalry partially contributing to the continued existence of backward races and these forces do not imply redemptive love but the negation of it.

Conscious Selection inconsistent with Redemptive Love.

The advocate of selection, conscious or natural, cannot claim to be a very kind-hearted man. Redemptive love must be meaningless to his inner consciousness. Selection implies rejection, conscious selection implies conscious rejection. Nature rejects and exterminates the weak. Whom is conscious selection to reject?

The weak or the strong? The very idea of rejection must be repugnant to redemptive love. If in opposition to the course of nature the strong and those who are fit for survival in nature's sense are rejected in favour of the weak and the fallen, society must begin to move backward and towards annihilation until nature reasserting herself will begin to preserve the strong against the dead weight of the weak. Conscious selection can give no undertaking for the preservation of the backward races generally or of any backward race in particular.

The success of conscious evolution must depend upon the degree of clearness with which human vision can penetrate the future,—the immediate, the remote, the ultimate future. A growing perfection of this vision will increase the power of conscious selection to make the course of humanity smooth in the direction of its destined goal. Dr. Seal urges upon the Congress the necessity of perfecting this vision and

suggests methods for perfecting it. So far his position is unassailable. He next urges with great force and reason the necessity of substituting conscious evolution for unconscious selection practised by nature. But when before the Congress has perfected our vision he chalks out a particular course for conscious evolution, he exposes himself to the charge of being guided by sentiment which rests upon something other than reason.

METHOD OF PRESERVATION.

I shall next examine the method suggested by Dr. Seal for the preservation of the backward races. He borrows it from Prof. Sergi who is of opinion that direct interference with the forms of social life of one people by another ought to be avoided even under the pretext of superior civilization or superior morality. Now if direct interference includes commercial intercourse or galvanizing social juxtaposition the isolation involved will have something like the same effect in regard to the humanization of mankind as the isolation of individuals would have in regard to the socialization of man. Economic intercourse once allowed will bring in its train intercourse of all other kinds and slowly or rapidly change the social character of the weaker partner who will lose part at least of his racial type. Again if a race is a plastic, fluent, growing substance it must change and if it must change in the direction of a more improved type by direct commerce with a higher race.

THE HISTORIC VIEW OF UNIFICATION BY EXTERMINATION.

But unfortunately the locality of new environment brought about by commerce between a weaker and a stronger race does not always produce a favourable variation for the former but often increases its weakness and ultimately effects its annihilation or a change for the worse. Can the civilized race afford to leave the uncivilized races to themselves to abuse or inadequately use the opportunities afforded by nature for the rapid advancement of civilization? If such scruples guided the conduct of Europeans in the 16th, 17th, and 18th. centuries, the contributions made by the United States of America to the civilization of the world would have been absent. I do not know how Dr. Seal's appeal was received by the American representatives of the Congress, but it seems they either felt that Dr. Seal's theory was fundamentally wrong or it was the happy result of an unhappy blunder in the conduct and course of civilization. The test of the soundness of Principal Seal's appeal

may be judged by considering whether humanity lost or gained by the annihilation of the Red Indians. One who believes in modern civilization, in its power for good, in its beneficence and in its happiness-increasing character can have only one answer to this question. It is possible to conceive that modern civilization has the temporary glitter of a polished base metal but lacks the permanent lustre of gold, that the happiness it produces is illusory and ephemeral ; but to hold that the extirpation of the Red Indians has made humanity worse would be to imply that modern civilization is leading humanity into a quagmire of sloughy existence.

A COMPARISON.

It would be inconsistent to admire modern civilisation and at the same time to cry over the annihilation of a number of thorough-bred types of races affected by it, or to appeal for the preservation of other types which are being slowly squeezed and cramped to death in the grand world-embracing overcrowded procession of civilized humanity. The capital of civilization requires the labour of primitive life for its profitable development, nay for a continuance of its progressive existence. To ask civilisation to give up its claim to this labour is to ask for sacrifice which is more than redemptive in character, which implies in fact half annihilation. The appeal for the preservation of the backward races amounts in short, in the above view of the problem, to a demand for the levelling down of civilization for the hastening in a different form of that re-barbarization which the speaker anticipates from a failure of civilisation to adopt the magnanimous source of redemptive love and redemptive sacrifice. Christ did not ask man to damn himself for the benefit of his neighbour but only to love the latter like himself. Civilization would appear to be coursing along a channel between the devil and the deep sea. It is possible the reduction of duality to unity in the evolution of humanity will demand a fresh experiment starting from the beginning of social organization.

THE FUTURE OF THE RACES.

But to most minds the solution of the race problem forecasted by history disclosing a vast panoramic procession of ramifications and unifications succeeding each other, would seem to point to the predominance of one race, in political duality obliterating or assimilating all other races and overspreading the surface of the entire planet followed by a process of racial differentiation worked by the slow pressure of environments in a new cycle, repeating history in a fresh experiment, similar in kind to what humanity is passing through in the present,

with modifications destined in the course of fresh cycles to bring about the consummation of universal humanity, the final resting place of philosophic hope. What are called by Principal Seal "gaps, discontinuities, wounds to be painfully healed by the recuperative process of nature in the centuries to come" do not seem to indicate a diseased condition of humanity but only a necessary process in its development. The centuries are mere drops in the ocean of eternity and a mere longing for the goal of existence can not help to hasten its advent. Imperfect man can not see the whole of his existence and the future half of eternity can not be supposed to be shorter than the past half while we cannot conceive Humanity to live after death happening in the *Kasi* of its ideal goal of ambition, at the terminal station of the unending Railway of evolution. We can see a small portion of the past history of man, judge from it of a small portion of his future history. That history enables us to see the advance towards racial unification, effected more by obliteration carried on by natural selection which destroys the weak to strengthen the strong than by the assimilation of ethical selection.

THE VALUE OF THE CONGRESS.

But whatever direction the future development of humanity may take, the value of the study of the past history of man, of his origin and of the forces of the social organization through which he has passed, and the fundamental character of the forces which have guided him in his world-wide procession, can not be overestimated and in this aspect the Congress will, it is hoped, be able collect facts which will enable man to determine to what extent conscious selection can help to modify the action of natural selection and to chalk out the paths in which conscious selection should move in quest of the happiest results destined for him by the hand of that inscrutable power which is moving the universe in its never-to-end course of evolution.

K. C. SEN.
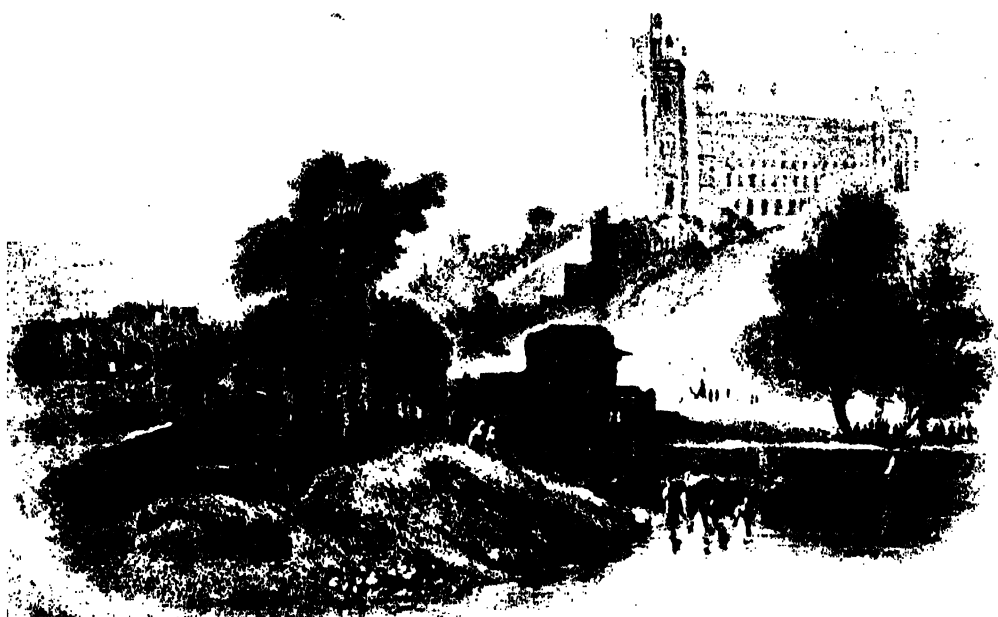
View of Fatehpursikri.

Sreenath Press, Dacca.

THE DACCA REVIEW.

VOL. FEBRUARY, 1912. NO. I

THE TYRANNY OF THE CLASSICS.

(A PAPER READ BEFORE THE DACCA EDUCATIONAL UNION).

When your President informed me that I have been selected to read a paper before your distinguished Union, I was somewhat taken aback although of course greatly honoured and all that. In the first place, I have never read a paper before in my life ; in the second, I do not claim to be regarded as an expert in "matters connected with education," whereas I understand I am surrounded by experts.

These would be trifling drawbacks if I possessed the paper-reading type of mind. The complete paper-reader requires two qualifications. For his own satisfaction he should be ready to form, or at any rate express decided views on any subject that presents itself and should delight to impress his conclusions on an admiring world. For that of his audience, I need hardly add the more novel and startling his views are, the more likely he is to produce what I suppose is the effect desired, a pleasing titillation of the intellect.

The capacity to form (or express) decided views is of course a necessity of practical life ; but it is I think to some extent a necessary evil, since their formation (or expression) must so often be the result of the occasion and not the "long result of time." Shall I damn myself completely as a paper-reader if I confess at the start that I am not absolutely convinced of the perfect soundness of the views which I am going to express to-night ?

I recognise further that my own mind is on the whole of the platitudinous order.

I do not make this confession entirely in a spirit of humility. I think there is a good deal to be said for platitudes, which after all have very often the virtue of being true—not always a

characteristic feature of new and startling opinions. I admit of course that a person who should be constantly calling the attention of his friends to the fact that we shall all of us be dead a hundred years hence would rightly be regarded as an unutterable bore. Yet as a matter of fact, there can hardly be a more striking subject for reflection except perhaps this even odder fact that we were none of us alive a hundred years ago. I doubt whether platitudes receive as much attention as they deserve. I like myself to think how we shall all be dead in a hundred years and so forth. I like to get hold of a platitude and chew it.

Having thus conclusively demonstrated that I am not cut out for a paper-reader, let me proceed. I should first explain clearly what I mean by the title of my paper—The Tyranny of the Classics. My object is not primarily to tilt against the teaching of classical languages, though I admit that is a subject in which I am doubtful it connects itself at certain points with my paper : or against the manner in which they are taught in this country. I am not enough of an expert for that. The classics to which I refer are those writers in living languages, and in particular English who have a deserved and established reputation ; whose works "no gentleman's library should be without ;" and who fill a large place—much too large in my opinion in the curricula of High Schools and Colleges. I think that on little boys and men such writers exercise something of a tyranny.

I want first to consider in the most general way the value of such authors to us who have left school, the place they should reasonably fill in the life of a person who is fond of reading and then to consider more especially their utility as instruments of education in Schools and Colleges.

(1) First then consider our relations to the great artists of various kinds and degrees, Chaucer and Shakespeare and Fielding and Scott, Spenser and Keats and Tennyson, Milton and Wordsworth, and other innumerable names. (I shall find it most convenient to take my instances from English literature, but of course any literature, and any form of art would do equally well). Why did then people write, and is there any particular reason why they should be read ?

Art, I take it, is the expression of feelings and ideas through certain invented media—invented and elaborated in the course of ages because the natural and instinctive modes of expression by action or voice or gesture have been gradually found inadequate for the ever-growing complexity of men's feelings. Kick a dog and it will howl. Kick a poet and he will howl too : but being a more complex organism than a dog, he will find that the mere act of howling and rubbing the injured part does not satisfactorily express his sense of the outrage done to Grub Street in his person ;

and accordingly he will supplement the natural mode of expression with one more artificial—a sonnet or an Ode to Fortune. "If a poet", said George Washington, "gets a pain in his side from too good a dinner, he bellows *Ai Ai* louder than Prometheus." In many cases of course, the circumstances of modern life do enable men to express their feelings in a natural, and not an artificial, manner. Nelson, being a supremely capable sailor, was enabled to express the intense patriotism which dominated him by drubbing the French—a mode of expression far more satisfactory to himself and to everybody (excepting the French) than if he had written the finest poem in the world. But it might not have been possible for him to enter the King's Service at all; or he might have been unlucky or incompetent; in which case perhaps he would have become a minor poet, and written patriotic songs.

That then is the primary function of art—that it satisfies for the artist the instinct for Expression. But as the majority of men are not artists, it is of more interest and importance for most of us to consider its secondary function, its value for the general public which reads books and looks at pictures and listens to music. This instinct for expression is the desire that feelings or thought should be embodied in a manner perceptible to outsiders through one of the five senses. That instinct is no doubt most completely satisfied by personal action, by our really giving the feeling a perceptible shape. But if that is out of one's power, a fair substitute may be obtained by perceiving and appreciating the shape given to your own feeling by somebody else. Thus if you dislike a man excessively, the most satisfactory thing would of course be to hit him hard yourself; but if he is so large and powerful as to make any such attempt foolhardy, you may still derive considerable satisfaction from seeing a more competent ally do what you would like to do yourself. Just so the would-be artist who lacks command of his medium does well to refrain from attempts at expression which will produce only a sense of failure in himself and ridicule from others, and to look for satisfaction in the work of men more skilful than he.

The value of the artist to the public therefore is that he expresses for them thoughts and feelings of which they are capable, but which they cannot express themselves. The artist goes direct to nature, by which I mean the whole world of external influences that affect the brain, and puts into words or shape or sound or colour the feelings of which he is conscious. The less fortunate, less skilful majority must be content to appreciate the work of others and if, as is probably most often the case, they have vaguer and less sensitive feelings, as well as less skilful hands than the artists, they will find in the definiteness, the selections of art a satisfaction which Nature that inspired

the artist, cannot give them. This is what Browning meant when he wrote :—

"For don't you mark, we're made
so that we love
First, when we see them painted,
things we have passed
Perhaps a hundred times, nor
cared to see ;
And so they are better, painted—
better to us
Which is the same thing. Art
was given for that."

Art therefore is to the appreciative critic what Nature is to the artist.

And of course it is clear that the rungs of the ladder between Nature and the inarticulate crowd may be indefinitely multiplied. This is the justification of art criticism. When Matthew Arnold for example writes about Shelley or Wordsworth, he performs for his readers the function which Shelley and Wordsworth perform for him, and which Nature performed for them. Inserted below Matthew Arnold it is easy to imagine a lecturer discoursing on "Essays in Criticism" and so forth.

Big fleas have little fleas upon
their backs to bite 'em'
And little fleas have lesser fleas,
and so *ad infinitum.*

The Duchess in *Alice in Wonderland* sagely remarked "everything's got a moral, if you can find it." And the moral of the foregoing platitudes is that the first necessity in art and not less in the appreciation of art, is absolute sincerity. Unless the feelings which a writer expresses are his own genuine feelings his work is still-born : while the critic who from motives of vanity or timidity or what not professes to admire what does not appeal to him and conceals a genuine preference, barters his own soul for a mess of most insipid pottage—the half-hearted and suspicious applause of his own little cultured clique—thoroughgoing humbugs like himself.

You will say perhaps, it is an abuse of language to style this extortion of homage by the great artists, tyranny. It is a tyranny for which our own weakness and insincerity are responsible, but I think it is one none the less, and rather serious too. Consider how many thousands and even millions of people have lived, are living and will live, who though they do not care to open Shakespeare or Milton from one year's end to another, would yet be ashamed to confess that they have never got through the first act of Hamlet or fifty lines of Paradise Lost. If that sort of thing does not appeal to them, why should they ? And is not the motive which prompts people to profess an admiration which they do not feel low and degrading in every imaginable case ?

Nature is very wide and all aspects of Nature, in man's present state of imperfect development, do not and cannot appeal to all alike even to those who, by our standards of comparison,

are highly sensitive aud gifted. Contrasting himself with Milton, who was at least equally at home in more majestic surroundings,

"Me rather", says Tennyson

"all that bowery loneliness,
The brooks of Eden mazily murmuring,
And bloom profuse and cedar arches charm."

Nature is like a huge book of which scarcely the greatest can read more than a few pages. And though it is of the highest importance to cultivate one's capacity as much as one can, it is at least equally important to recognise without undue waste of time, after fair experiment, one's limitations. It may be less noble to be an epicure than to be a "watcher of the skies." But if one has a really sensitive palate, and little capacity for reflecting on the immensities of Time and Space, surely it is far better to devote oneself to scientific dining than to bore oneself by contemplating the "lone splendour" of a star.

There are then two obvious requisites for the appreciation of any work of art. Firstly the critic (I use the word, of course, in its proper sense, not in the narrow, hostile sense which it has acquired through generations of misunderstanding by critical writers of their own most important business) must have a trained appreciation of the artist's craft: the medium in which the artist works must be one of which he can understand the use, even though he cannot use it himself. Secondly there must be a natural sympathy of mind between the artist and the critic—they must both be responsive to similar chords in Nature, interested in the same pages of the great book.

From all this it is clear that the critic's appreciation of art should be as individual and distinctive as the artist's appreciation of Nature. Well-meaning persons have been known to make out lists of the "Hundred Best Books." Such a task is surely the climax of ineptitude: and those who engage in it not less impertinent and misguided than if they should take upon themselves to select for you your friends. A book, to take that particular form of art, is simply the expression of personality, only through a rather artificial medium, just as a man's speech and conduct in daily life reveal his personality through a more natural medium. A youth asked me the other day if I would advise him to model his style on Macaulay or R. L. Stevenson. He might as well have asked whether he should copy the tones and gestures of Mr. Balfour or Lord Curzon. You may be completely out of sympathy with an excellent book, just as you may be completely out of sympathy with an excellent man. Elia has dealt with the latter painful situation, with his usual perfection of touch, in the Essay on the Old and New Schoolmaster. He, for one, candidly confessed: "There

is nothing which I dread so much as the being left alone for a quarter of an hour with a sensible, well-informed man that does not know me." And you remember the acute discomfort which the company of the New School master caused him.

So much for nature mutually irresponsive. But there is another obstacale to satisfactory intercourse on which Lamb moralizes later on in the same Essay, namely, the too patent superiority of one mind to another. "The habit of too constant intercourse with spirits above you, instead of raising you, keeps you down. Too frequent doses of original thinking from others restrain what lesser portion of that faculty you may possess of your own. You get entangled in another man's mind even as you lose yourself in another man's ground. You are walking with a tall varlet whose strides outpace yours to lassitude. The constant operation of such potent agency would reduce me, I am convinced, to imbecility." And Edward Fitzgerald, speaking in one of his letters of a visit which he had paid in Tennyson's company, makes a precisely similar confession. "I felt what Charles Lamb describes, a sense of depression at times from the overshadowing of a so much more lofty intellect than my own." It follows that just as in real life your friends should be, first, responsive to the same impressions as yourself and secondly not so superior as to bring home to you too clearly a sense of your own littleness. So in art it is desirable to avoid too wide a range and too high an aim.

If men of the intellectual standard of Charles Lamb and Edward Fitz-Gerald could feel this so strongly, surely lesser men need not be ashamed to consider whether it is really for their ultimate good that you should seek the company of the great classics : whether a fifth-rate mind will not get more from a good third-rate writer than from Shakespeare : whether it is really natural and fitting and right that the grubby schoolboy and the literary man-in-the street should be hail-fellow-well-met with "Thrones, Dominations, Princedoms, Virtues, Powers"—the great orders of the hierarchy of literature.

I do not wish to press this point too far. Milton indeed puts it in its extreme form :—

Who reads
Incessantly, and to his reading brings not
A spirit or judgment equal or superior—
And what he brings, what need he elsewhere seek?—
Uncertain and unsettled still remains,
Deep versed in books and shallow in himself.

No one, that is to say, except an author's equals or superiors, should read him, and it is unnecessary for them to do so.

But this is a *reductio ad absurdam* : and doubtless most great authors, who

are not always quite indifferent to the number of their readers, would hasten to disagree. One practical distinction between reading and conversation has to be remembered, that in reading you can take your own time, whereas in conversation, if you lag behind, you are lost. I am sure that one may come in time to hold profitable intercourse through books with minds very far indeed superior to one's own. But there are limits and I hold that progress should be cautious and slow.

But it will be objected,—have not the admitted masters of literature and art some distinctive virtue which you miss by narrowing and lowering your selection? I do not see it: but it is necessary to guard against a misconception here. The differences between the greater and lesser artists are rather of degree than of kind. The greater men have a longer range, a greater width, a finer subtlety. But by the lesser men I do not mean those whose work has a greater proportion of what is radically unsound and perishable. Their work may be just as pure and true, though simpler and on a smaller scale, than that of their superiors, and the critic, even though he is capable of appreciating greater and finer work will recognise these qualities of purity and truth. Purity of taste is common to the simple liver and the epicure, though the latter's is far more subtle and refined. An epicure could appreciate good bread and clear spring-water: and though a continuance of such a diet might seem to him insipid, it would never be disgusting.

Again it may be objected that I am urging a low, degraded course of practice which would be fatal to the progress of the individual mind,

"That low man goes on adding one to one

His hundred's soon hit,
This high man, aiming at a million,
Misses an unit."

But the question is, if a man does go on *adding* one to one—and after all he need not stop at a hundred—is it fair to call him low? I shall call him sensible. I am not protesting against effort but against wasted effort. I do not think Browning's "highman" would be much use on a rifle range or a cricket field, or wherever he takes his rather complicated metaphor from. And the point is that one's width and range, if one uses common sense to start with, may be gradually extended. Only all motives such as a snobbish desire for erudition (which is exactly like the desire in real life for the company of distinguished persons which really affords you no pleasure) or a mistaken sense of duty —all such motives as tend to force the pace unduly must be carefully avoided. And there is this encouraging feature to be noted, that whereas in real life the growth of friendship or sympathy is liable to obstruction from two sides, in the region or art, it is so liable on one side only. Your book cannot take a dislike of you—it has to accept just so

much appreciation as you choose to give it; and you can treat it as you please. You remember the enthusiastic outburst of a true book-lover on this point: "That placid intercourse is disturbed by no jealousies or resentments......With the dead there is no rivalry. In the dead there is no change. Plato is never sullen. Cervantes is never petulant. Demosthenes never comes unseasonably. Dante never stays too long."

In parenthesis, I should observe that of course the reading of authors who do not really appeal to you may be necessary in some cases—in the case-for instance-of schoolmasters and the like: and they may even afford a certain pleasure. Such pleasure is however historical or scientific. It is not the proper function of a work of art to afford pleasure of this kind: nor is the degree of pleasure so afforded any criterion of the intrinsic value of a work of art. It goes without saying that a work may be very important historically which possesses little or no intrinsic merit. The simple conclusion then at which we have arrived so far is that if a man is to extract any real value from a work of art, firstly he must have a familiar acquaintance with the medium in which the artist works; and secondly he must be able to form a bond of sympathy with the artist; and that not only will the formation of such a nexus be impossible where the artist type of mind is completely other than his own, but it will also be extremely difficult and uncertain, to say the least, if he attempts to throw a bridge, so to speak, suddenly across the chasm that separates a firstrate mind from his own. Contact between an inferior and a first-rate mind can only be gradually, if at all, attained by the help of intermediate minds.

Now let us try to apply all this to the teaching of English in Schools and Colleges.

And first, since I feel that the only excuse for an utterer of platitudes is absolute sincerity, let me make something in the nature of a personal statement or confession with regard to my own attitude towards the greatest figures in English literature. I would say then that until very recent years, I got far more out of Sir Walter Scott than I can get out of Shakespeare; that I would rather have read anyday about Di Vernon and Rebecca and Lucy Ashton even (though they say Scott's heroines are so poor, and doubtless many of them are) than about Rosalind Cordelia and Desdemona. It was in fact, for years after I was introduced to Shakespeare, only a very few and limited sides of his art—some of those displayed in the Midsummer Night's Dream for one and Much Ado for another, one or two more, that appealed to me at all. Much later a sense of the breadth and geniality of Henry IV began to dawn upon my mind. Now I would say that while I cannot suppose there can be anything more affecting than

Lear, I feel that I have no adequate appreciation of Othello, and Macbeth leaves me almost cold. Antony and Cleopatra seems to me one of the amazingly splendid things ever invented. There is little that I care about Julius Cæsar.

I am aware that this will seem a pitiful confession: but I do not see why even a Professor of English Literature should not be honest in his off moments. And after all there is always the hope that I may come to something like a due appreciation of Macbeth and Julius Cæsar in time—and that is a moment worth waiting for—"when a new planet swims into his ken." All things considered I would not like to be one of those competent persons who at 25 or so know all about the great writers. We others whose minds develop slowly (if I may assume that they do develop) have I believe, our compensations.

I have not of course attempted to classify the works I have mentioned, or to analyse the reasons why I personally can, as I think, appreciate some of them, and cannot, as I am certain, appreciate others. That would be an egotistical exercise which would have no interest for you. All I wish to do is to emphasize, by the effort involved in a confession of my own deficiencies—which after all are no concern of yours — my belief that the reading of books where one cannot establish a clear and strong personal relation with the author, is so much waste of time.

I readily admit that when you have to select books to be read by hundreds and thousands of school or college boys, you cannot choose books which will be "sympathetic" to all of them. But I think we donot take nearly enough care to avoid books which are certain to be beyond the mental range of the great majority. Possibly it may be necessary to make allowance for greater rapidity of development in the mind of the average Indian boy. Even so, they have to read through the veil of a foreign language, and to adopt by force of imagination a mental attitude which is alien to them. Candidates for the next I. A. Examination at the present time are reading Wordsworth, Milton, Scott and Tennyson; candidates for the next B. A. Examination—Shakespeare, Coleridge, Gray and so forth. I do not think it is necessary to go into much detail on this point, as I expect you will all agree that what we try to do is from an early stage to teach the English language through the medium of English literature. And that is just what I think is wrong.

But it will be said, you cannot have everything. Granted that these boys are not very likely to appreciate Shakespeare and Milton if left to themselves, they have their teachers to explain what they cannot understand —what are they paid for? And further what we are trying to do first is to teach them the English language—not the love of art: that will come later, if

God wills. These people, Shakespeare and Milton and the rest, are those who wield the language with the greatest power and skill, and how can we do better than put them into the hands of those whom we wish to teach the fine points of the language ?

I venture to say on the first point that a teacher cannot explain the beauty of music to a deaf man : and on the second that, if you are teaching a boy cricket, you donot give him a full-sized bat to start with : nor if you are wise, do you take him to see the greatest players and expect him to appreciate their play. You start with the rudiments, and proceed very slowly to the refinements.

In our manner of introducing school boys to the new medium of expression, the English language, we seem to blunder almost from the start.

What precisely, in the first place, is our object in teaching English at all ? "Our object", we shall reply with that command of beautiful sentiment that marks the idealist in his defence, "is to open to them the treasures that lie hid in the English language." Quite so. But let us put the matter a little more plainly. Our object is partly utilitarian, partly in a higher sense educational.

The circumstances of this country make it necessary that there should be a considerable body of Indians—in government employ and so forth—with a familiar acquaintance with business or official English, sufficient to enable them to read and understand Rules and Orders and Manuals and to read, write and comment on official letters. Official work gives scope, I need hardly say, for any amount of intelligence, but it does not demand a specially fine knowledge of the intricacies of the language in which it is carried on. An intelligent person with quite a moderate acquaintance with a language will, I think, after no long period in an office, acquire quite enough command of the stereotyped official phrases which recur again and again to feel perfectly at home with his files.

To teach this sort of practical English to a number of persons sufficient to meet the practical necessities of each part of India, and to look to studies other than the English language to supply "higher education," would be an intelligible policy : but it is not ours. It has been decided—and I think quite rightly—that English is to be the main pillar of the structure of "higher education," : that as we believe we possess in English a literature which is unsurpassed, it is our business to give students a chance of making its acquaintance.

My complaint is that our aim is not defined with sufficient clearness, and our methods are muddled—partly because our aims are undefined, partly because our methods would probably be muddled even if our objects were more clear.

Who are the students to whom we think it is our business to give a chance

of enjoying English Literature? Are they those who want to learn enough of the language to equip them for a subordinate clerkship? Surely not. Or are they those who go further but whose tastes are scientific? Surely not. Yet those unhappy beings are introduced to "standard" English authors at quite an early age. And even if we only put such authors in the hands of the really literary section of schoolboys—could they be separated from the rest—would it be right to do so in their tender youth? I think not.

The fact is that we are trying, as I said before, to teach the language through the medium of the literature not the literature through the medium of the language. We are proceeding in a totally unnatural manner.

I believe that the doctors still disagree a good deal about the manner in which the power of speech developed in the race and developed in the child: and in the presence of so many experts I am rather shy of exposing my ignorance of the subject. I understand however that it is generally held that the instinct of imitation and the wish to express emotions or desires are the two chief motives which co-operate; while the long period of so-called "babbling" which pervades the utterance of intelligible words serves a distinct purpose in training a child's vocal organs in the production of the various vowel and consonantal sounds.

It seems probable that the development of speech in a civilized child does not quite correspond to the process by which it has developed in the race. In the race for example it was only by very slow degrees that general or abstract terms were evolved. The child of a highly developed race acquires a fairly wide use of such terms at a comparatively earlier stage. But this general rule may, I suppose, be laid down with regard to the learning by a child of its mother-tongue *that its vocabulary widens step by step with its experience.* It learns words that it wants and no others. It acquires an instinctive grasp of grammar while its vocabulary is still very small. Its range of thought and feeling is not wide: but what it wants to say it can say with fluency and correctness.

Later when it begins to read, its vocabulary, it is true outruns its *practical* experience but reading, so long as one reads with sympathy and comprehension—and only so long—is itself a province of experience: and by this time the child has acquired a confident colloquial use of the language' and instinctively differentiates between the words or the uses of words which it comes across in everyday life and those which it comes across in books.

I suppose that every one would agree in theory that, in learning a foreign language the best method is that which approximates most nearly to the way a child learns its mother-tongue. And if one can manage to live among people who speak the language one is

learning, it is to a great extent possible to follow that method. There is however this initial difference between the position of the baby learning its mother-tongue and that of an older person learning a foreign language, that the latter, being older and having a wider experience, requires a larger stock of words to express himself. The danger therefore into which such persons generally fall is that they try to go too quick. Instead of being content slowly to form the basis of their vocabulary through the ear, by the process of conversation, they try at least to supplement their store of words so acquired by reading: and the result can only be to blur the faculty of discrimination.*

'There are no synonyms.' No word in a language is the equivalent of another word.

If even those who have an opportunity everyday of learning the language they wish to learn are apt—as I think they are—to fall into this danger and to spoil the delicacy of their taste for words, how much greater must the danger be for those whose circumstances compel them to acquire their knowledge of a language mainly through the medium of books: and what elaborate pains should be taken by those responsible to ensure that the flaws in such a method of learning should be minimized.

That is our position in this country: and we labour under an additional difficulty in that the language is taught by men to whom it is foreign.

(1) That under these circumstances, the pronunciation, if I may digress for a minute, should be extremely defective is only to be expected. I believe under present conditions that is inevitable: but perhaps we might do something to improve it, or at any rate impart greater fluency of speech by care and practice in reading aloud. That a language if not properly pronounced must lose much or its characteristic beauty is of course true: but I do not think defective pronunciation necessarily deprives a language of all beauty provided it can be read fluently and with the accent in the right place. Thus we do not know how the ancient Greeks and Romans pronounced their languages, but an English boy can pronounce the words fluently in his own fashion and so far as the laying of stress is concerned I suppose correctly: and I venture to say he can to a great extent appreciate the movement of Greek and Latin prose and verse. The movement of French on the other hand seems much more difficult, for whatever reason, for English people to appreciate. Whether the movement of English is particularly difficult for the Indian ear to capture I do not know; but I am sure the majority are not nearly fluent enough to appreciate it as things are: and I believe if it were not for the rhymes and the appearance of printed lines many college boys would be unable to distinguish prose from verse. It would be an interesting experiment to write out a para, say of Paradise Lost,

as if it were prose, and see how many members of the first and second year could divide it correctly into blank verse lines and how long it would take them to do so.

We take very little pains then to do what Nature does by so long and laborious a process viz, to train the vocal organs in the production of the required sounds. But this is a digression. It is when we come to the storing of a boys' mind with a vocabulary that seems to me to be not only careless but utterly misguided. Our method I suppose is inherited from the classical schools in England. The dead language of Greek and Latin have for centuries been the basis of a literary education in Europe: and in teaching a dead language you can, I suppose, hardly avoid the unnatural method of teaching it through the medium of so much of the literature as survives. This manner of teaching the dead languages has infected the method of teaching living languages French and German in England, and English in this country. We in Dacca have inherited the tyranny of the classics from Oxford and Cambridge, Winchester and Eton.

Of course I readily admit that the first readers put into the hands of school boys are simple enough; but they hardly begin to read simple prose before they are given verse: and soon—far too soon—the fetish-worship of the classics grips hold of us and we stuff them with Tennyson and Wordsworth and Milton and Shakespeare. My own opinion, let me plainly say is first that in all high schools, poetry should be eschewed like poison and secondly that they should read no prose but perfectly plain modern stuff, the more colloquial and conversational, the better. That the subject should be such as may be expected to interest them, and that the thought should not be difficult follows from what I said in the beginning.

This it seems to me is the nearest approach we can make to the natural method, by which a child acquires familiarity with the plain colloquial uses of a small range of simple words, such as its limited experience requires, and afterwards, when it begins to read, by a scarcely conscious process of comparison and contrast, tries and relishes the subtler suggestions of words with which it is familiar, and the fine distinctions between so called synonyms. Almost any word in the language would illustrate my point. To take a very simple instance—consider the various words descriptive of the appearance of fire or light—shine, gleam, glimmer, glitter, glow, sparkle, blaze, shimmer, flame, flash, flicker, flare etc. The differences between some of these words are fairly wide; and perhaps boys in the college could distinguish glimmer from glitter, flare from sparkle, flash from glow; but the finer distinctions between, say, gleam and glimmer, shine and glow, flame and flare—are not these bound to escape boys who learn words out of a dictionary? Take one more simple instance—the

next that occurs to me—the adjective 'strange.' Look it up in a dictionary and you will find various synonyms given for it—foreign, new, wonderful, odd, unusual, surprising and so forth: and in ordinary, colloquial English the word is equivalent to these other words. But—

> The antechapel, where the statue stood
> Of Newton with his prism and silent face,
> The marble index of a mind for ever
> Voyaging through strange seas of thought, alone.

> Whispering I know not what, of wild and sweet,
> Like that strange song I heard Apollo sing
> While Ilion like a mist rose into towers.

Substitute for 'strange' in either of these passages any alleged synonym and observe the horrid ruin that results. "Voyaging through new seas of thought"— "That wonderful song." You deaden utterly the note of mystery and meditative wonder which the word 'strange' may carry with it.

Much—by no means all, of course—of the subtle difference that exists between so-called synonyms depends on their comparative commonness or rarity: and it is only after hearing a great deal of talk, or, failing that reading a great deal of ordinary, every day prose, that one comes to understand how, out of a set of words equal in the eyes of the dictionary-makers, some are stale and common-place, others less so, others again rare. An English child hears the word 'strange' and its synonyms used, some with greater, some with less frequency, hundreds or thousands of times, attached to all manner of nouns. Gradually he comes to differentiate between them in his own speech or writing. Later when he reads Wordsworth or Tennyson, he realises, by a process of testing and contrast and comparison, how impossible would be the use of any 'Synonym' in either of the passages I have quoted. But Indian School boys, set down before they have acquired any everyday vocabulary of their own to read Wordsworth and Tennyson, come across Newton voyaging through strange seas or Apollo singing his strange song, look up 'strange' in a dictionary, find that it means wonderful or new, and never awake to a sense of its distinctive character at all. Like Mr. Bultitude at the dancing class, they are leaving out all the steps. In a word, the teaching of a language through the medium of its literature inevitably means the formation of a 'Gradus Vocabulary.'

A Gradus Vocabulary! Let me pause for a moment to meditate on that delectable work, the *Gradus ad Parnassum.* I should explain that in English Schools there is a practice, the like of

which I am glad to say, we have not imported into this country, of making school boys write Greek and Latin verses. Boys,—very few of whom ever attempt to string rhymes together in their own language for their own amusement—are expected to turn out poetry in a dead language. Naturally such a horrid infliction has produced an acute demand for help, and the supply has been duly forthcoming. Some gifted being—why do I not know his name?—if the blessings of countless groaning school boys may avail, I feel sure, he sits now in the front row in the Islands of the Blest—produced this master-piece—the priceless possession of every boy on the classical side of English Schools, and blandly named it the *Gradus ad Parnassum*, the path up the Muses' Hill. I feel that we have lost in him one of the masters of the ironic method.

The word 'sea' we will suppose, occurs in the copy of English which you have to turn into Latin verse: and the ordinary Latin word for 'sea' does not meet your requirements. It only gives you two paltry syllables, when you want to fill up half a line. Accordingly, you look up the Latin for 'sea' in your Gradus, and you find a number of 'Synonyms'—warranted sound—ocean, main, wave, Neptune and so forth: also a number of paraphrases, ocean-wave, the realm of Neptune also a number of epithets, any of which you may select at pleasure,—blue, gray, purple, stormy, peaceful, angry, terrible, beautiful, wet, wide, deep, unbounded—half a page of them. Having decided precisely what conglomeration of syllables you require to fill your line up and make it scan, you search with care, and presently, with ordinary luck, light upon a combination that will suit—unruffled wave, unlimited Neptune, or something of that sort—and joyfully insert it.

It is the limit—you may think. It puts the lid on, as they say now-a-days. It reduces verse-making to the level of a game of Jig-saw in which every piece is of equal value, its only virtue is to fit in and fill a gap. It is odd really to think that able men in England spend their lives thinking they are developing in their pupils a sense of the care, the restraint, the fine frugality of the classical writers, in the use of words, while all the time by permitting this extraordinary practice, they are doing their best to blur, if not obliterate, all preception of the difference between one word and another.

And yet there is not, I think, any essential difference between the way they teach Latin and Greek in England, and the way we teach English here. We have gone a step back, that is all. And that is some thing, but it is not enough. We teach English as if it was a dead language—we teach it through its literature.

Surely, if one comes to think of it, the teaching of verse to boys who cannot use a language correctly for the simplest purposes, whether in speech or writing,

is an utterly pointless proceeding. Not only in verse, or at any rate good verse, high poetry, are many words fraught with hints arising from all manner of subtle sources, derivation, assonance, association, the suggestion of sense by sound, which they can hardly be said to carry when they are about their more humdrum colloquial business: but verse has actually to a large extent a vocabulary, as it has an idiom and an arrangement of its own. For my part I do not see why an Indian boy should know the difference between sea and ocean; why he should not address his companions in the second person singular; why he should not put his verbs at the end of every clause. And if he avoids the pitfalls laid for him on every side by his early introduction to verse, I think it greatly to his credit.

And the work of the great masters of prose shares with verse some at least of these drawbacks: since when the thought to be expressed is deep or subtle, the words are meant to carry, and do carry—but only carry to a carefully trained ear—more than their usual weight of suggestion. Further many of the great writers of prose are not only dead, but have been dead a long time, so that their use of words and idioms is archaic.

Yet again the reading of such works may have a special danger for the really able student, with an ear for style, tempting him to "play the sedulous ape" as Stevenson said, perhaps for life! never realising that style should be as individual and distinctive as the tones of a man's voice.

It occurs to me that possibly the persons I see around me realizing that they have themselves a delicate ear for the finer shades of English may consider that I have been making a mountain out of a mole-hill. To them I have only to say that there are exceptions to every rule: and their perception of the finer shades of the language must in my opinion, have been acquired inspite of obstacles which I would desire to remove.

At any rate, had I the luck to be a despot, it is this that I should do. Some few carefully selected poets and prose writers of distinction, I might admit into Colleges: but from schools I should rigorously banish every writer of verse without exception, and every writer of prose that any one had ever heard of.

J. R. BARROW.

THE PALAS OF BENGAL.

CHAPTER I.

The state of Northern India at the time of Harsavardhana's death was indeed deplorable. Immediately after the assassination of this monarch his first empire fell into confusion and if we are to credit the Chinese chronicler, it became possible for a small body of Chinese and Tibetan troops to penetrate

into the heart of India from the Himalayas and reach his capital to avenge his death. This fact alone shows that with the death of one man harmony disappeared from Northern India and the various units fell apart, which one man's personality had served to wield into a vast and mighty empire. Historians yet declare that the century which immediately followed the fall of the dynasty of Sthanvisvara, though not a complete blank, is yet one of the darkest and most intricate periods of ancient Indian history. We are concerned immediately with the history of North Eastern India represented in modern times by the Provinces of Assam, Bengal and Bihar. We know from the Aphsad Inscription of Adityasena that his father Madhavagupta was one of Harsa's contemporaries. (1) The same inscription informs us that Adityasena assumed imperial titles and it is inferred that similar titles were used by courtesy in mentioning his father's name. The now lost Shapur Image inscription provides us with a definite date of the first Emperor of the second Gupta Dynasty (Harsa year 66=672 A. D.) (2) The evidences of these two inscriptions jointly prove that Madhavagupta's son succeeded in creating a smaller empire in the Eastern Provinces on the ruins of Harsavardhana's empire. It is not known whether Eastern Bengal was included in the dominion of this line

1. Fleet's Gupta Inscription. P. Pl.

2. Ibid. P. Pl.

of Princes, and the discovery of fresh records must settle this disputed point, but the Deo-Banarak Inscription of Jibitagupta II. proves that for the next three generations the Princes of this dynasty continued to assume imperial titles. Very little is known of their lengths of reign and extent of dominions, and we are still at a loss to account for the cause and fix the date of the last known King of this family. It seems that the second Gupta Dynasty remained in power for six decades after the death of Harsavardhana. The Eastern Provinces of North India were overrun by that mighty conqueror, Yasavarmmandeva of Kanauj. (1) The invasion of the Eastern part of North India seems to have taken place in the first or second decade of the 8th century A. D. The invasion from Kanauj was quickly followed by similar ones from different parts of the country and these, no doubt, led to the fall of the second dynasty of the Guptas, of whom we have to accept Jivitagupta II. as the last King. The invasion from Kanauj was followed by another from Assam. King Harsadeva of that country conquered Gauda, Orda, Kalinga and Kosala, (2) that is, Bengal, Orissa, and Northern Circars. Jayadeva the Licchavi King of Nepal, who was the daughter's son of Harsadeva of Assam, records his grand-father's exploits, and as the former was reigning in

1. Journal of the Asiatic Socy, of Bengal, 1908. P. 75.

2. Indian Antiquary Vol. IX. P. 178.

the sixth decade of the 8th century A.D. his maternal grand-father must be placed at least two decades earlier. Most probably this invasion from Assam closely followed on the heels of that from Kanauj, or we may one day be surprised to learn that both armies invaded Bengal jointly. Harsadev must have held Bengal for a sufficiently long period, so as to enable him to pass through that country and conquer Orda, (Orissa,) Kalinga (Northern Circars), and Kosala (Orissa Hill Tracts). The Gaudabaho and Kalhana's Rajatarangini has familiarised us with the story of the banished King Jayadeva, who came to Bengal, married the daughter of the King and freed him from the subjection of his liege lord. (1) According to the able translator of the Rajatarangini the true date of this King lies between 1760 and 1800 A. D. Finally Bengal was conquered by the Gurjara and Rastraketa Kings of Western and Southern India.

GURJARA EMPIRE.

The Gurjara King Vatsaraja, is said to have snatched away the imperial sway from the house of Bhundi. In a newly discovered inscription of Bhoja I. of this dynasty, we find the following verses:—

" Khyatad-Bhandi-kulan = madotkata-kari-prakara durllanghato YahSamrajyam = adhijya karmmuka-sakha-sankhye hathad = agrahit" (2) Most probably after the fall of Harsavardhana, the family of his uncle Bhandi succeeded to the remnants of the Empire. Bhandi is mentioned in the Harsacharita as the mother's nephew of Harsa:—

" About this time Yasovati's brother presented his son Bhandi, a boy about 8 years of age, to serve the young princes." (1)

According to the newly discovered Gwalior Inscription (2) quoted above, Vatsarja drove the house of Bhandi from the territories which were left to them. Mr. V. A. Smith in his admirable synopsis of the History of Gurjara Empire mentions Vatsaraja as the fourth Prince of the dynasty. No inscriptions of Vatsaraja have been discovered as yet, but he has been mentioned in a Jaina work, the Hari vamsa-purana :—

" Sakesvabdusatesu saptasu disam panchottaresuttaram
Patindrayudhanamni Krsnanrpaje Srivallabhae daksinam ;
Purvam Srimad-Avanti-bhubhrti nrpe Vatsadiraje param
Sorya namadhimandale jayayute vire varahe vali." (3)

So indeed Vatsaraja must have been alive in 783-84 A. D.

The original home of the Gurjaras seems to have been a part of Rajputana from which the Kings issued from time

1. Memoirs of the Asiatic Socy. of Bengal, Vol. III. P. 3 Note 2.

2. Annual Report, Archaeological Survey of India, 1903-04. P. 281.

1. Harsacarita of Bana. Oriental Translation Fund Series, Cowell and Thomas, P. 116.

2. Annual Report, Archaeological Survey of India, 1903-04 P.

3. Bombay Gazette, 1896, Vol.I. Pt. II. P. 197.

to time for the conquest of Northern India. (1) The Northern Indian conquests of Vatsaraja and his son Nagabhata II. were mere raids. It was not till the time of Bhoja I. that permanent conquests were made in Northern India. (2) In the present instance, Vatsaraja's conquest was terminated by the invasion of Northern India under Dhruvaraja, surnamed Bharavarsa, commonly known as Dhora, the Rastrakuta King of Manyakheta. In the Wani Grant of the Rastrakuta King Govinda III. his father Dhruba is said to have taken away the royal umbrellas of Gaudha from Vatsaraja and driven him away to the deserts :—

"Helasvikrita-Gauda-rajya-Kamala-
mattam pravesya
Cirad=durmmargammaru-madhyam-
aprativa valair-
Yo Vatsarajam valaih Gaudiyam
saradindu-pada—
Dhavalam chatradvayam kevalam
tasman-nahrtam
Tad-yasopi kakubham prantesthitam
tatksanat."

"Having with his armies, which no other army could withstand, quickly caused Vatsaraja, intoxicated with the Goddess of sovereignty of the country of Gauda that he had acquired with ease, to enter upon the ball of misfortune in the centre of the deserts of Maru, he took away from him not only the two royal umbrellas of Gauda, that were as radiantly white as the rays of the autumn Moon, but almost at the same moment, his fame that had reached the extremities of the regions." 1

The late lamented Mr. A. M. T. Jackson was of opinion that the Gauda country referred to in the verse quoted above was identical with modern Thanesar. 2 The following verse, which refers to Nagabhata II., the son and successor of Vatsaraja, shows that the name Gauda at that time denoted Western Bengal, because Vanga, the well-known name of Eastern Bengal, is coupled with it :—

Gaudendra-Vangapati nirjjya-durvidagdha sad=gurjjaresvara digarrggalatam ca yasya,

Nitya bhujam vihata malava-raksanartham syami tat=anyamapi rajyaphalani bhunkte. (Baroda Plates of Karkaraja II. 3

According to the Wani and Radhanpur Grants Dhruva, father of Govinda III., drove Vatsaraja into the trackless desert and wrested from him the two white parasols of the King of Gauda, (4) which he had acquired easily. The cause of the war between the Rastrakuta and the Gurjjara Kings is not yet apparent. It may be that the Gurjjara

1. Journal of the Asiatic Socy. of Bengal. 1909. P. 63.

1. Ibid. P. 264.

1. Indian Antiquary. Vol. XI. P. 157.

2. Journal of the Asiatic Society of Bengal. 1905. PP. 103-04.

3. Indian Antiquary. Vol. XII. P. 160. 11. 39-40.

4. Epigraphia Indica, Vol. VI. P. 243. Rastrakuta Invasion.

The Election of a King by the people.

King's inroad into Northern India incensed the Rastrakuta King, because

(1) the expedition increased the power of the Gurjjara King, a powerful neighbour of the Rastrakutas, and

(2) Some dispossessed monarch might have sought the aid of the Rastrakuta King and thus brought him into conflict with the Gurjjaras.

This brings us to the fourth foreign invasion of this period, the Invasion of the Rastrakutas. It is evident from the verses quoted above that Vatsaraja's conquest was not a lasting one. Close on his heels followed the Southerner and compelled him to disgorge his recent conquests, and what was still more, he obliged him to retire to the desert country, which was his original home. When the double white umbrella of Gauda and Vanga was snatched away from Vatsaraja, the kingdom must also have passed into hands of the new conquerors. Nothing is known definitely about the close of the Rastrakuta occupation, and most probably it did not last long. As soon as the Rastrakuta army was withdrawn, the native princes must have reasserted their authority.

During this period of anarchy and foreign invasions the native royal dynasty must have come to an end and the harassed population felt the necessity of having a strong able ruler. For this purpose they held an election, the details of which have not come down to us. As a result of this election Gopaladeva I., the son of a successful soldier named Vapyta, was elected King. The composer of the verses of the Khalimpur Grant of Dharmmapala puts the cause of this election very nicely :—"Matsya-nyoyam-apohitum," "to escape from being absorbed into another kingdom, or to avoid being swallowed up like a fish," as Mahamahopadhaya Hara Prasad Sastri translates it. (1) That the danger of being swallowed up into the kingdom of a powerful neighbour was not exaggerated, is amply evident from the foregoing account of the foreign invasions of Bengal during this dark period.

Nothing is known about the origin of this new line of Kings who continued to hold sway in Bihar and Bengal till the final conquest of the country by the Muhammadans. In the oldest inscription of this dynasty Dayitavisnu the grand-father of Gopaladeba, the first King of the dynasty, is called the progenitor of this line of Kings, and that he was sanctified by all sorts of knowledge,—"Sarvva-vidyavadatah." (2) Most probably even the names of Dayitavishnu's forefathers were forgotten in Dharmmapala's time. In later inscriptions and historical works, such as the Ramacarita of Sandhyakara Nandi and the Kamauli Copper-plate of Vaidya-deva of Kamarupa, mythical accounts

1. Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1894, Pt. I. P. Epigraphia Indica, Vol. IV. P. 248, Memoirs of the Asiatic Society of Bengal, Vol. III. P. 3.

Origin of the dynasty.

2. Epigraphia Indica, Vol. IV. P. 248.

arẹ given of the origin of the Palas. The Kamauli Grant shows very distinctly that the Vigrahapala III. was born in the race of the Sun. (1) The Ramacarita and the Bengali work Dhạrmmamạngala give a different origin of this dynasty. The account is given fully in the Kanurpala of the Dharmmamangala by Ghanarama, and in the Ramacarita the King Dharmmapala is mentioned as "the light of the race of the sea." (2) The tradition given in the Dharmmamangala is not very coherent as Mahamahopadhaya Hara Prasad Sastri has shown. But it shows distinctly that long after the destruction of the Pala Empire the tradition about their origin was remembered in Bengal.

R. D. BANERJEE.

1. Ibid. Vol. II. P. 350.

2. Memois of the Asiatic Society of Bengal, Vol. III. P. 20.

A POET OF EASTERN BENGAL.

ROJANI KANTA SEN.

The poet "Kanta"—as he likes to call himself was born at Bhangabari—a village in Serajgunje Subdivision, District Pabna. He came of a respectable Vaidya family which was noted for its wealth and culture. The family seems to have met with some reverses for we learn that the poet's father Guru Prosad and his uncle Govinda Nath had to struggle with poverty during their student days. However through their own personal efforts and manly perseverance both of them were successful in life. Govinda Nath subsequently came to be the leader of the Rajshahi bar and Guru Prosad became a Munsiff and eventually rose to the position of a subordinate Judge. In 1884 Rojani Kanta passed the Entrance Exmination of the Calcutta University with distinction and received a stipend. He lost his father soon after passing the First Examination in Arts. After taking his B.A. and B.L. degrees he joined the Rajshahi Bar in 1892, but his *penchant* for literary pursuits stood in the way of his making any serious efforts for success in his profession. The sportsman's instinct which was strong in him likewise frustrated attempts to tackle a brief or baffle a witness. So Dame Fortune never smiled on him.

Rojani Kanta suffered long from malarious fever and his health broke down. For two or three years he visited several well-known Sanatoria and returned to Rajshahi in renovated health in 1908. He was however not long destined to enjoy the healthy pleasures of life. In May, 1909 he began to suffer from an affection of the throat. The attending physicians at first regarded it as a mere case of sore-throat but as continued treatment brought no relief the poet was removed to Calcutta. There the disease was diagnosed to be far more serious and specialists pronounced it to be Cancer.

He was next removed to Benares for a change and placed under the treatment of a noted Ayurvedic physician. The treatment did him no good and there was a serious relapse. He was taken back to Calcutta and placed successively under Kaviraji and Homeopathic treatment. Later on he was removed to the Medical College Hospital where an operation was performed on his throat. The patient suffering and the heroic cheerfulness displayed by our poet during the last few days of his life were truly admirable. He could not speak yet he did not cease his labours—either of writing to the promptings of the Muses or playing on his favourite musical instrument to the accompaniment of his own music sung by his friends. He breathed his last on the 13th September, 1910 surrounded by his admirers. Thus was a young life full of promise cut short in its very hey-day.

"Poets are born not made." This truth was exemplified in Rajani Kanta's case. His father Guru Prosad Sen was a devout Baishnab and a poet of no mean repute. Deeply versed in Baishnab traditions he composed a collection of devotional songs in Maithili language under the title of *Pada Chinta Mani Mala*. The book was very highly thought of by his contemporaries. The well-known *Savant* Pandit Madan Gopal Goswami of Navadwip considered that it deserved a permanent place in the hymnology of the sect beside the immortal lays of Vidyapati and Chandidas.

Rajani Kanta's poetic gift and his ardent religious temperament seem to have manifested themselves in early childhood. When a mere mite of four years he composed a song in praise of Goddess Kali which would have done honour to a poet of maturer age. The story goes that in his schoolboy days he was so fond of poetical exercises that he used to render stories from his text-book into fluent Bengali verse.

Rajani Kanta threw himself with enthusiasm into the study of Sanskrit and in fact he acquired so much proficiency that even before he became a matriculate he composed a Sanskrit poem of no mean merit, on the self immolation of Sati—the consort of Mahadeva. The poet continued his study of Sanskrit literature even after the completion of his university career and his rich imagery and the variety of his rhythm seems to have been drawn from the perennial fount of Sanskrit poetry. In one of his most powerful poems—the lament of a dying king over the powerlessness of riches to prolong his life—the language and the metre remind us irresistibly of Joyadeva the last Sanskrit poet of India, although the themes are so very dissimilar.

One of the most interesting features of the modern School of Poetry is a conscious attempt to bring about a revival of the classical spirit. The poetic vocabulary now-a-days, is also largely drawn from Sanskrit sources. Even Rabindra Nath who may rightly be

termed the father of the new movement, shows in his poetry as much influence of Kalidas and Bhababhuti as that of Wordsworth and Shelley.

Rajani Kanta does not seem to belong to any particular school though like most of his contemporaries he was susceptible to modern influences. He was both a musician and composer. His Bani is not so much a volume of mere poems as a collection of songs set to tune. His poems generally fall into three distinct classes—(1) Humorous, (2) Patriotic, (3) Spiritual or devotional.

It is unfortunate that some of our modern poets attach too great an importance to the tender passion much to the exclusion of other sentiments. Rabindra Nath's lovesongs still exercise a strange fascination over the younger generation and many a young aspirant to poetic fame has tried to emulate the great bard simply by the trick of copying his mannerisms. The mere use of jingles containing euphuistic vocables is not poetry though pleasing to feminine ears. This was percieved by our poet in an eminent degree and he tried to counteract the tendency by striking a more virile note. "Kanta" may no doubt plead guilty to the composition of a few love-poems but none of them are of a morbidly sentimental character. In his "Invocation to the muse." the poet wants to see the Goddess amidst the stern grandeur of Nature, high-enthroned on a lofty peak with the lotus sheen around her and prays that she might impart a manlier tone to poetry instead of always tuning her lute to soft amorous measures.

Rajani Kanta's humorous poems enjoy a high popularity and have secured for him the nickname of "D. L. Ray of Rajshahi." It is unfair, we think, both to Mr. Ray and Kanta to bracket them thus together. Mr. Ray is admittedly the pioneer of Modern humour in Bengalee poetry but the comic element in his writings is undoubtedly based on British banter. We have found in some of his poems a rather strong echo of Barham's Ingolds by legends. Rajani Kanta was more true to the indigenous method. He essayed occasionally to write in Mr. Ray's vein but his humour as in the case of our orthodox humorists depends also on a skilful use of local dialects of which—by the way—he had a complete mastery. The complaint of the much married dotard who has not been able to propitiate his girl-wife even by purchasing all the new-fangled toilet requisites that the village mart could supply, and the letter of the old fashioned father giving his civilized son, the student of a Calcutta College, the whole budget of domestic and agricultural news and complaining incidentally of the high price of 'Engelap' (Eng Envelope)—an oft-recurring item of his son's expenditure—are both exquisite instances in point. Quite of a different order is the "Dream of the Gourmand." It depicts the *gourmanp magnifique* who hopes that through the

magic aid of Western science cakes and sweetmeats of Fancy-show size would in course of time be made to grow like gourds and pumpkins. His regret—that he would then be dead and gone or perhaps reborn through his sins—as a dog or jackal, be unable to enjoy the taste thereof—is exquisitely refreshing. When sung with proper 'action' to the accompaniment of music the song would make even a gaunt stoic shake his sides with laughter.

The poet is also a master of social satire. His sketch of the grasping father of a prospective bridegroom who plumes himself on his generosity, after supplying the luckless father of the bride with a list—the most exhaustive that his avarice could suggest, is as true to-day as it was a decade back, inspite of the vaunted zeal of all our social reformers.

As for Kanta's patriotic songs opinion might well differ regarding the incursion of a poet into the contentious domain of politics. This much however can be said in their favour that they teach no subversive doctrines and are apparently inspired by the poet's sincerity of conviction. The most popular of them rather advocate a return to the simpler life of our fore-fathers—their homely meal of ghee, rice and rocksalt on a plantain-leaf platter and their garments of coarse homespun—and deplore in a Wordsworthian manner the gradual disappearance of plain living and high thinking.

The moral and devotional poems of Rajani Kanta are the most characteristic of his writings. In spirit he prostrates himself before his Maker in profound adoration. He walks in humility before the Lord. This meek and humble spirit of self—abasement is found again and again. In one of his most well-known songs he expresses diffidence as regards his fitness for the poetic vocation in this sacred land of sages.* In his poetic vision he sees the whole universe emerging out of chaos merely at a compassionate glance of the Almighty signifying his creative impulse, and finds the "orbs of light and shade" arranging themselves in due order and precision and spinning in space,-round and round, each in its own proper orbit. The ordered frame of the universe in which there is no break or irregularity, no loss nor waste, always fills him with deep reverence. He finds Nature's God behind every beautiful aspect of Nature, in flowers bird song and in moonlight. He can not enough express his gratitude that inspite of his own unworthiness he can hold communion with the Oversoul in every act of deep perception and in every shade of poignant feeling. This is the mystery of his Job-like patience in affliction and misery. Though ever awake to the reality of spirtitual

* An attempted translation of the first two lines is given below.

„ How in this sacred Land of Sages dare I
„ lift my voice and sing,
„ Where of yore the distant skies with *Om*
„ and *Shama* hymns did ring."

existence he reproaches himself with wasting his life in a Maya-trance. He has always a lurking suspicion that he is much attached to the material comforts of life. This was the dominant note of one of his latest poems published in the Probashi sometime before his death. The poet seemed to believe that the Lord disencumbered him of his health and riches in order merely to wean him from his self-love, his egotistical idea that his countrymen were partial to his writings-and his foolish belief that his perishable body was a part and parcel of his real self. Such resignation we make bold to say is unique in the annals of Bengalee Poetry.

GURUDAS SARKAR.

ON SOME ASPECTS OF MODERN LIFE.

We are always somewhat loth to part with our illusions, with the little bundle of dreams we have carried hidden deep down in our hearts ever since the days of credulous childhood. One by one, however, we drop the dreams on the pathway of knowledge and press forward unburdened. Of late our modern research,—whether historical, scientific or critical—has brought many of our dearest fancies to the hammer to be sold as useless rubbish. Literature has lost its ardour and its inspiration. It has become critical rather than invigorating. sceptical, questioning, sometimes with an appearance of frivolity, sometimes torturing itself with angers and despairs. The note to-day is that of a time of disenchantment. Here is reaction after the fashion of high hopes: indignation at the bankruptcy of things which promised much and accomplished so little;—a conviction that the zest and sparkle has gone from a society which suddenly feels itself growing old. Our science, philosophies and inventions and manufactures and infinite complexities have all conspired to make us more discontented, even if we have not actually more cause for misery. The verdict of the sceptic from the heart of a civilization advancing in material triumph is a verdict of weariness and vanity. In some respects, however, we have made such excellent progress that we now begin not only where our fathers left off, but a point beyond, where even their dreams never carried them, and we look back with pity upon the past of ignorant content that was all our forefathers knew of life. We are very much better off than they ever were, live more luxurious lives and are far better educated; we hear it said so often that at last we almost grow to believe what we hear, for it is difficult to withstand the tyranny of a popular tune. We may hate the vulgar air with its meaningless catch-penny refrain, but sooner or later, we whistle it with the best of them, and, what is far worse, learn to appreciate

the sound of our own whistling. And so with the creeds and theories and affectations of the moment. We come upon them unawares. They peep out at us from the pages of the latest books, they stare at us boldly in the columns of the newspapers, until, too tired any longer to resist the force of opinion, we begin to wonder if there may not be some little grain of truth in these new gospels that are being shouted into our ears by millions of voices. The average man and woman do not even try to think, for they greatly prefer that some one else should think for them; and so newspapers direct our politics; magazines and advertisement columns tell us what books to read and what to say about them when read. Societies teach us the way to be charitable; lecturers instruct us how to improve and preserve our health and strength. There is no need to-day for any one to remain ignorant on any single subject, unless indeed it be the mystery of life itself that still eludes us, because we have neither the time nor the leisure to try and understand it. In politics, in ethics, in religion, we fight, most of us, under banners whose signs we have never learnt to read, and our allegiance is as easily given and as easily denied as an Italian *condottiere's*. Our boasted intellectual liberty has come to mean that we may change our beliefs for as little reason as we please. We are becoming creatures of chance without any scheme of life.

The ideal of to-day to which we are to make either voluntary or involuntary sacrifice is uniformity. At whatever cost, we must all be cut out after the same pattern,—a good enough pattern, perhaps, but through its very monotony threatening to weary the eye and deaden the heart. We must all,—the fit and the unfit, the wise and the foolish, the weak and the strong—receive a uniform training; be forced to learn the beginnings of those sciences for which we have neither aptitude nor possible future need, just because it is the theory of to-day that Nature made a great mistake in not turning each one of us out as the exact counterpart of the other. So this wise, sensible, highly civilised age of ours intends to rectify the mistake and teach Mother Nature a lesson, and never stops to ask whether she is not rather old, by this time, to begin going to school.

Certain virtues are lacking in us to-day that were a part of the very web and fibre of the human life of the past,—virtues we have outgrown and for which we have seemingly no longer any use;—virtues so simple that none thought it worth the while to give them names. They were part of a man's soul-fittings, and without them he would have gone forth unarmed into the battle; but now that we have lost them, we are beginning to wonder what they really were,—those virtues that were the heritage of the men of old time. Perhaps the best answer is that, properly speaking, they were

not virtues at all, any more than beauty is a virtue or a soft voice or a strong arm. They were rather birth-gifts now withheld from us by the wiser spirits that watch over the cradles of new-born souls, because they know the conditions of life have changed, and they must bring us other gifts more fitted to the measure of our needs. For of what use it is to dower a man with a brave heart when all he needs is a calculating crafty mind, so that he may able to outwit his comrades in the struggle for daily bread; or of what use to fill him with a delicate sense of honour when he has to earn his bread in the mire of the market-place? Of what use to grant him a generous spirit when he must fight ceaselessly for bare standing-room among an ever-thickening crowd, or of what use to give him a soul that loves the peace found in silence when all the green corners of the earth are being built upon to satisfy the Socialists' dream of a life lived in common? So from most of us the wise spirits have withheld the old-world birth-gifts that we may learn to be content and grow ever more closely in touch with our environments (as scientists tell us plants and animals do) through a change in ourselves;—a change so subtle that we have not even guessed at it, until some chance word, some unforeseen happening, shows us our real nature. The whole of modern life has the accusation resting upon it that it is moved by no ideal inner springs. Some find satisfaction in political energies, others in religious ardours; others again in the mere play and triviality of wealth accumulation. Pursuit of knowledge claims a tiny remnant with a high intellectual hunger. But to the general these ideal inner springs are wanting. They feel confused in a world of confusion Social unrest affects large masses of them whose restlessness finds no clear fruit in action. Literature proclaims a disenchantment. Man wanders unsatisfied in the specious palaces of his new material splendour. Many, after a rebellion at the time of adoloscence, settle down into making the best of it in a world hard to understand, but on the whole, easy to endure. Others still refuse to relinquish the past for the intangible, elusive promises of the future. Some, on the other hand, are so zealous that they discount the cherished traditions of men. "Have done" cry they, "with religion and visionary schemes. These have been holding back the progress of man. Let us feed the people with stouter food; let us give them purer air; let us teach them hygiene and physiology. Then a fitter progeny will be bred and the people rush onwards in their ever-enlarging conquest of environment to grow in stature and wealth and moral virtue." True we suffer from material evils even amid this age of material progress. But the sources of our discontent are far more moral than material and it is only those who can live without

conscious moral hopes and aspirations who can breathe freely and easily in the modern atmosphere. For the rest, they must do the best they can with the thick medium which surrounds them, since they can reach no other. And for their comfort they may choose a philosophy of life according as their character inspires them,—the philosophy of indifference or of regret or of hope.

Some also of the science-world are nigh mad with horror at the awful growth of the demon called Progress,—this Juggernaut-car beneath whose wheels the eternal traditions are mangled. "Back let us go", they say, "to those simple days, before steam had blinded man to beauty, before hunger for gold had devoured the old-time rights in service. Painters are forgetting the traditions of art; writers are scorning the ancient sincerity; doctors in the progress of science are fogetting the appeal of suffering." It is not in itself a perfectly wise philosophy. To live in the past, to dream of modes of life and forms of thought which have irrevocably vanished, to muse over the past and to sicken with desire for a departed serenity and grace is certainly the mark of a visionary We ought not, however, to reproach those who would revive in our minds the memories of what men have been. Such reminders can only be painful to us when we need to be reminded, when in some way we have become inferior to our predecessors. And thus the philosophy of regret which looks back to the past and inspires us to meditate on a more rounded culture than our own, justifies itself, for it shows us where our culture is incomplete. It yields a standard of judgment and a point of aspiration.

Science in its buoyant beginnings had provided great inspiration, of wonderful gifts for man's enjoyment, of wonderful knowledge of the universal secret. Sixty years ago it seemed to be offering humanity not only control of material forces and coming invention, but also the interpretation of the secret of life and destiny. But science to-day protests in literature the affirmation of a bankrupt creed. Great and small philosophers preach pessimism; it is insinuated in difficult treatises, in flippant conversations and in novels with or without a purpose. Serious young people pause in the midst of their conversation to confide in their elders that they would just as soon never have been born. . . . . .

How is the art of life, which is the art of happiness, to be carried on in the midst of this dismal propaganda? Can science help us to stem the tide of social human misery, including the crime and vice, the perverted moral perception and misery? Can she aid to diminish the gulf, ever deepening and widening between the rich and the poor; the monstrous and growing contrast between misery and luxury; between the gilded splendour and perfume, the pomp and pride, the varnished vices and forgiven sins of the elect of the social heaven on one side, and on the other

the dismal dwellings and pinching privation, the squalor and stench, the unforgiven sins and shams of the unfortunates of the social Inferno which stretched wide and hopeless outside the gates of the social Paradise? What mechanical invention, what mechanical skill, we ask, have any promise to offer of immediate and large improvement? Will the cunning ingenuity of man which embarked upon the path of scientific exploration with such large hopes of service to humanity as well as attainment of truth, be able, through the multiplication of machinery to eliminate poverty, through the development of the art of healing to eliminate pain? Or if this be unattainable and delusive, can we find through these and other progressive agencies, a permanent healing for the sick soul of humanity? Is the twentieth century to advocate a scheme of life which will itself provide a consolation in the loss of the older faiths and redeem mankind from a mere animal struggle for the apparatus of material pleasure?

Contemporaneously with the great discoveries of science, with the march of invention, with the wonders of steam and electricity, in an age of boasted general advance and improvement, this philosophy of despair has appeared. A strange portent surely. What may it mean that in these days of telegraph and railways, of constant discoveries in science and inventions in the useful arts, in an age of diffused knowledge, diffused material comfort, in an age of general enlightenment and progress in all directions, there should suddenly appear and find acceptance, among the cultured and fortunate clsses, a philosophy affirming the nullity all of things and the worthlessness of existence, however supplemented by progress? Does the phenomenon portend that modern civilization, hollow and despairing at its heart, of which such philosophy is a symptom, is about to perish as former civilization have perished, to sink as religion has already sunk? Is it the symptom of a state of things gravely amiss and deep-sected, not in our spiritual state, but in our social constitution, with its terrible contrasts of want and luxury, which points to the social revolution as its only cure? Or finally, is it merely an exceptional product in philosophy, phantasmal and ephemeral, an *offspring* of the abysmal individual melancholy of a man of genius who has made it attractive to a large circle of readers just as the despairing poetry of our century has been found attractive;—a philosophy which, on the whole, had better been cast in the poetic than the philosophic form, and which will dissipate itself anon without producing other than a poetic result, a momentary and not unpleasant agitation in the mind of the reader?

It would, we think, be strange if this mood became general, if it were anything more serious than a black and passing cloud. For, after all, inspite of

all our failure of faith, existence is not less a good, the banquet of life is not less royally spread or decked than in the most halcyon days of the happiest former civilizations. Assuredly, neither the Greek of the time of Pericles, nor the Roman in the days of Augustus, nor the Arabian in the golden prime of of Al-Raschid, had as much reason, on the whole, as we to-day to enjoy existence. Neither the Greek, nor Roman, nor Arab, in the palmiest days of their civilizations, possessed the multiplied comforts and luxuries, the expanded sciences and literatures, the increased treasures of art, the more developed and refined social life which are accessible to-day to greater numbers than under any former civilization. Nor was their art so highly developed nor had they our modern feeling for the endless beauty in external nature—that great new sense with which our modern poets and painters have endowed us. And yet we cannot enjoy. We have lost our appetite at the feast of life, which the Greek, with a less rich and varied repast, enjoyed so much, though he had no more hope of future felicity than our present unbelieving generation.

It is not, however, so much what science has told us, as what she has not told us that contributes a distinctive element in our unrest. We are suffering the reaction from a day which dawned full of hope and ended for many in bitter disappointment. Sixty years or so ago it seemed as though a new dispensation was at the doors. A wave of intellectual impulse which had been gathering long and obscurely, suddenly crested and broke, invading the whole coast-line of knowledge, and filling recesses hitherto impregnable with fruitful seethe and turmoil. And, for a time, while the tide was at flood, men were carried away as by a new thing under the sun. Every brilliant generalisation seemed an advance towards life's secret. Ultimate questions which, in the course of this activity, were inevitably divested of their old-time answers and laid bare to the approach of reason, were about to receive a new and infallible answer. For a time all was excitement. Men wrought and inquired in the serious belief that the Golden Age had dawned. The sanguine—sometimes, it must be confessed, the smug—temper of the *Saeculum Realisticum* has its echoes even now.

It may well be wondered why no one has taken in hand some studies in Reaction, because it seems so plain that one great cause of human restlessness is our bondage to extremes. The thing we call Progress is, to be sure, a succession of reactions, but why we should continually leap from one extreme to the other without taking stock of what we have learned, or garnering the grains of truth which a whole epoch has yielded, is a thing yet to be explained. Perhaps that is why we have to say of Progress as they said of the great Congress of Vienna, "*Il danse, mais il ne marche pas.*"

We are now for example, living in the very heyday of reaction. Except in severely technical quarters "exact thought" is taboo. And yet the concentrated energies of sixty years surely had something to contribute to our stock of experience! why should we disregard their clearness of vision and keenness of method simply because we have naturally eacted from their limitations?

We know little of the forces fermenting in that strange laboratory which is the birth-place of the coming time. We are uncertain whether civilization is about to blossom into flower, or wither in tangle of dead leaves and faded gold. We can find no answer to the enquiry, whether we are about to plunge into a new period of tumult and upheaval, whether we are destined to an indefinite prolongation of the present half-lights and shadows,—whether, as we sometimes try to anticipate, a door is to be suddenly opened, revealing unimaginable glories.

In face of such uncertainty, the verdict is often one of criticism and despair. The wisest man has warned us— so runs a mournful verdict—not to expect the world ever to improve so much that the better part of mankind will be the majority—"No wise man ever undertakes to correct the disorders of the public estate."

Optimism and pessimism, in face of any civilization in a changing world, are equally untrue, equally futile. All human societies mingle selfishness and sacrifice, exultation and weariness, laughter and tears. No one age is especially wicked, especially tired, especially noble. Progress is always impossible and always proceeding. Preservation is always hazardous and always attained. Austerities and simplicities breed virtues and devotions which are the parents of prosperity. Prosperity breeds arrogance, extravagance and class hatreds. Opulence and pride in their turn bring national disasters. And these disasters engender the austerities and simplicities which start the cycle again. It is not only that we owe it to our private selves to be free intellectually, to make the most of ourselves, or that we owe it to our family. *We owe it to the state.* What would be our lot to-day if all our ancestors had been content to sloven through life in ignorance and intellectual serfdom? The world of knowledge, the realm of thought are not our property, but a heritage under a strict entail. It will be for ourselves and our guides to remedy our inner defects, to recover a more sane and balanced culture, to learn to accept the facts of life with neither revolt nor despair, and to throw away our idle scepticism which says there is no good because a tiny portion of the human race seems to itself for a little while to have lost its way.

Jatish Chandra Mukherjee.

MORAL INSTRUCTION IN INDIAN SCHOOLS.

The battery of western civilization, by its incessant activity, sending a constant current of electricity to revivify the paralyzed limbs of eastern society; the arterial system of steam-ships and railways accelerating the circulation of the world's social blood; the nervous system of telegraphs increasing and quickening the world's social sensibility; the volcanic press in Europe in ever-lasting eruption, propelling out lava, whose temperature defies the philosophic thermometer and whose composition defies scientific analysis; the percussion of occidental thought upon the death-like serenity of the oriental mind; these have produced a state of confused progress, in which confusion and discord are more conspicuous than progress and harmony. The passing generation stands stupefied and bewildered. The coming generation is alternately brightened by hope, and thrown into melancholy by fear. A feverish state, throughout, demands the immediate attention of the physician. The old European physician with his thermometer refusing to come down to 95°, sits aghast. The pulse beats high. But that is evident. No doctor is needed to prove it. The Indian physician says bile motion is more prominent than phlegm in the pulsation. Common sense interprets this as the expression of disharmony between intellectual activity and moral activity, of a difference of temperature between Reason and Emotion. The remedy suggested is moral instruction.

That there is a tumultuous social commotion disturbing not merely India, but the entire world, is an undeniable fact. Whether this indicates a disease or a mere passing but natural, though disagreeable, phase in the progress of civilization, it is difficult to say. The remedy of moral instruction is not a new suggestion. But the subject is worth discussing. Is it possible to give moral instruction in Indian schools, as at present constituted? Is it possible to introduce into the curriculum of Indian schools a course of study in general morality, with the special object of directing the so-called moral faculties and of constraining them to move in a straight groove to be chiselled out somehow? An appeal, it would appear, has been made to the Government of the country to assist the people in their present difficulty, and an enquiry appears to be under contemplation to gather information respecting the present moral situation and to obtain suggestions as to the best preservation or if possible, ameliorative course to be followed in the future development of Indian advancement.

The subject is beset with almost insurmountable difficulties. I think, however, not without due misgivings, that it is possible to give moral instruction to school boys, especially

of the lower forms, though the necessity of any special measures does not seem to have arisen at least in any urgent shape, while the conviction is general that a perfectly consistent code of morality cannot be framed in the coagulated confusion, which now prevails in the world, of types of ethical theory with distinct accounts of the origin and sanction of conduct, each of which represents nothing short of a religion. The nominal orthodox code of morality is closely allied to the theistic forms of religion now followed in India, viz idolatrous, polytheistic Hinduism, monotheistic Islam with an amphi-theistic tinge and Christianity which combines the elements of monotheism, amphitheism, and refined polytheism, and without offending any religious sensibilities it may be affirmed that the common character of psychological anthropomorphism runs through all of them, with the result that the sanction of morality is also common. This unity in diversity is a great redeeming feature in the moral situation of India which raises hopes of the possibility of a common moral code. These forms of religion, although they are giving way to various forms of naturalism, such as Pantheism, Agnosticism, Idealism, and other forms of religion of the reasoned, as distinguished from the revealed type, will continue to be the ruling religions of India for many generations yet to come. The type of morality inculcated by these religions is also the same for all societies whose political and economical morality is derived from the individualistic system, which inspite of the slow modifications it is undergoing, will continue to be the ruling type of society as long as the anthropomorphic type of religions, with its theories of Divine Emotion and of Eschatological existence, continues to dominate human feelings and will. Naturalistic ideas are, no doubt, rapidly penetrating into the pores of society, in the domain both of religion and of morality, but the duty of Government, as more concerned with order and preservation than with progress and approximation to an ideal, is to do all in its power, short of risking a revolution, to prevent the tide of evolutionary naturalism by giving to the mind of the new generation a firm direction on orthodox lines.

I shall deal later on with the difficulties presented by freedom of thought and freedom of expression, the divine right of Humanity, which by the warm light of expanding knowledge drew out of the unknown deep, clouds of invisible vapour to pour them in the tangible form of rain to enliven society with crops of new ideas, which by their mutual relations, cohering to or repelling one another, produce social orders and disorders of types unknown to, and undreamt of by the orthodox intellect. Governments are in perpetual conflict with advancing ideas of social progress, for although they may have to adapt themselves to them in the long run, they cannot afford to lend their aid to any of them until they are

ripe and diffused enough to agree with the general social stomach.

The chief danger in this conservative scheme of instruction would seem to lie in the fact that the teachers, probably densely permeated with naturalistic ideas might fail to discharge their duties efficiently though disposed to be nothing but loyal to the Government which they serve. The common literature taught in the schools is largely leavened with these ideas, and the Hindu mind nursed on a mixture of Pantheism and Idolatry has a special aptitude for naturalistic ideas of morality. It is to be hoped that any new text-book of morality that may be approved for general use will be able to avoid this mixing up of ideas and every tendency to provincialise morality will be discouraged, the old imperial idea of an undecentralised kingdom of God being constantly kept in view as ever at hand, solemnly and incessantly calling upon humanity to repent in the 20th century with the same earnestness as in the first.

It is evolutionary morility only that can be provincialised. Says Herbert Spencer (page IX, Principles of Ethics)—"Throughout this work therefore the tacit assumption will be that the beings spoken of have that substantial unity of nature which characterises the same variety of man and the work will not, save incidentally or by contrast, take account of mixed societies such as that which we have established in India, and still less *of slave societies*."

Herbert Spencer evidently means that justice and morality differ in character according to the character of the parties concerned. One cannot help admiring the open single-mindedness of this naturalistic philosopher any less than his wisdom which prompted him to select India for an apt illustration. But although the Hindu must be grateful—for the scientific explanation here offered of the moral difference between the Brahmin and the Sudra, and of the odious character of the code of Manu—Herbert Spencer's estimate of the Indian character and his theory of provincialized morality cannot be openly accepted by the Government of India without producing an extremely painful sensation, specially in the upper strata of society.

The position of government as a propagandist in the domain of moralily is beset with difficulties which need not disturb the missionary or the ordinary reformer. The most difficult branch of moral conduct is always in the hands of Government by virtue of its fundamental character concerning the preservation of peace and order. The high imperial idea of equality of rights affirmed in the Civil and Criminal law of the country can not be dispensed with in a moral text-book taught at school. Another difficulty to which I may refer here incidentally is that utilitarianism (jurists from Bentham downwards) being the type of the Ethical theory which constitutes the foundation of law, a different type of Ethical theory will

present immense difficulties, if it is attempted to make it the corner stone of the ordinary moral instruction imparted at school. The object of moral instruction is to prepare childhood for the duties of manhood. If two types of morality are adopted, not merely intellectual collision but practical friction may frequently arise; but the adoption of the utilitarian type of general morality, while it may be consistent with the theory of morality as embodied in law, may accelerate those troubles which have suggested necessity of the contemplated enquiry.

If 'conscience' the voice of God in man, is showing signs of weakness and decay it is absolutely necessary to rejuvenate it. If the 'will' is showing signs of misdirection, it must be deflected to the right line. If the higher emotions are betraying signs of enervation or paralysis they must be galvanised and re-invigorated. If the intellect of man in India is showing signs of bluntness it must be sharpened, if of narrowness, it must be widened. The different evils here indicated must have different causes, and although the causes will require different methods of treatment for complete eradication, general moral instruction is not unlikely to be a valuable element running through all of them; and if moral instruction of an unmixed type is found to be impossible a mixed type cannot be more injurious than no instruction at all. The school boy when he grows to manhood may be expected to analyse the mixture and hold to that which most suits his stomach. Even an uncompromising materialist, like Huxley, admitted the usefulness of mixed education as contrasted with no education. He says (Essay on School-Boards):—If I were compelled to choose for one of our own children between a school in which real religious instruction is given, and one without it, I should prefer the former, even though the child might have to take a good deal of theology with it. Nine-tenths of a dose of bark is mere half-rotten wood; but one swallows it for the sake of the particle of quinine, the beneficial effect of which may be weakened, but is not destroyed by the wooden situation unless in a few cases of exceptionally tender stomachs."

It seems hard to believe that conscience, the moral sense or the impulse to do that which is supposed to be right is showing any signs of decadence. If young men are sometimes found to do wrong, it is more probably because their intellect tells them that what they do is right than that they deliberately take the wrong course with full consciousness of its being wrong. In most difficult cases, the moral choice involves a balancing of concurrent evils. Anarchy is often inspired by a moral sense aspiring to transcend the orthodox sense of the community. What requires training and direction is not so much the impulse to do right, as the intellect which by reason of its narrowness and

onesidedness considers wrong to be right. The moral element which enters into the anarchist's conduct is the pride which inspires him with a sort of contempt for what is orthodox which he erroneously considers to be vulgar and common-place.

As regards the emotions a distinction has to be made between decadence and refinement. Even a great thinker like Matthew Arnold is apt to fall into the error of forgetting their distinction. He seems to attribute to the decadence of emotion the decadence of religion, which he defines as "morality touched by emotion." But the emotions seem to be in no peril of extirpation from their home, well built in human nature. The truth seems to be that the emotions by their progressive refinement or spiritualization are decaying in coarseness. The external, effusive, impulsive demonstrations of the emotions are disappearing. Anger does not throw a civilized man into an outburst of vociferous unparliamentary language. Sympathy does not bring forth a copious flow of tears. Annoyance does not produce a contraction of the eyebrows. Repugnance does not produce muscular movements in the shoulders. Loathing does not throw out of the stomach undigested food against the force of gravity. The sight of a good dinner does not send forth a current of gastric juice to the surface of the tongue. Love does not impel an immediate embrace. Admiration does not find expression in voluminous exaggeration, nor awe and reverence in an undignified horizontality of the human frame; but anger, sympathy. love, annoyance, admiration and reverence do still exist and exist in a more effective form. They do not immediately express or expend themselves in mechanical movements passing through the flesh, but work within. They have acquired inwardness unknown before. This process is going on with increasing strength in proportion as the activities of the human feelings are increasing in comprehensiveness of scope, and in proportion as the emotions, instead of losing themselves in the good or the evil of an individual or a small number of individuals are embracing in their wholesome energising the good or evil of classes, of society or of Humanity.

Human activity is either preservative or ameliorative. Preservative activity, implying a combat with evil divides itself into preventive and curative. The emotions which set all human activity in motion, in their progress from the primitive to the civilized condition, have slowly narrowed the field of curative activities,—which find most external expression in a vulgar, visible, tangible from,—by directing their energies to preventive and ameliorative fields. This deflection of the emotions is sometimes interpreted even in very high circles as the indicative of a moribund condition with nothing before them but the well-reasoned prospect of an

approaching death. Modern civilization owes its life and all its glory to the preventive and ameliorative activities of the human spirit, which by the power of its refined emotions and developed intelligence and prevision anticipates and circumvents the movements of evil affecting society and humanity and not merely individuals. Man is increasingly realizing the character of society as a unified whole, as a single consciousness, a single organism, a single life, a single spirit and the activities direct themselves towards the ideal of universal amelioration effected by comprehensive schemes of improvement and progress. Salvation for the whole spirit is the motto substituted for salvation for the individual spirit, which is taught by the morality of the anthropomorphic type which provides for supernatural selection and rejection adjudged immediately after the terrific, crucial moment, which separates life in this world from life in the next. The new idea of the underlying unity and ultimate salvation of society is based by biologists of a certain type on what they call natural selection and natural rejection. The supernatural rejection being more horrifying than natural rejection, implying consignment to eternal suffocation in a sulphurous bath, is slowly losing its hold on the human mind.

Benjamin Kidd is anxious for the future of modern civilization on the ground that intellectual penetration and diffusion are demolishing ultra-rational sanction of morality, that Reason is slowly strangling the Reason. He might as well make a grievance of the light of dawn, which slowly chases the darkness of night into the western sky. But the intellect can not stay the emotions without committing suicide. The idea of society as a unity has been rendered possible only by the idea of man existing as an indivisible spiritual entity, identifiable with other entities and capable of realising an ultimate real unity in immense apparent diversity. Society is only a larger spirit than the individual spirit, aspiring to transcend to the condition of a single spirit embracing entire humanity. No psychic experiment has yet been made to demonstrate that the intellect can exist without the emotions. The development of the intellect has been accompanied by the refinement and spiritual comprehensiveness of the emotions, and this has given rise to what I venture to think is an illusion that the development of the intellect is counterbalanced by the decadence of the emotions. But in truth if this law of inverse development had any convincing truth in it, society would be faced by a terrific dilemma, presenting no ideal except between the emotional primitive barbarism and unemotional civilised intellectuality. Any person loathing this intellectuality and earnestly desiring to return to the state of nature, might, like the old man wishing to be young, find many things

in civilization which he could not leave behind. The condition of Indian humanity is and can be no exception to this law. What really requires amelioration in India is the intellect of man, which, lacking the wider prevision of civilised people with whom she has been brought into close and permanent contact, fails to support him efficiently in the new struggle for existence, the inevitable result of that very contact.

Is sympathy disappearing from the world ? I think not. The hospitals, the alms houses, the old age pensions, schools or colleges, sanitariums, ambulance societies, municipal arrangements, industrial organizations, all indicate the existence of sympathy refined by the intellect, the Minister of conscience. These institutions have narrowed that field of sympathy where formerly it displayed a conspicuous presence in the face of evils affecting individuals, without much effectiveness of action. It would be an evil day in the world if under the influence of an illusion the development of the intellect were arrested in order to strengthen those complex faculties, which pass by the name of religious and moral faculties. The development of the intellect is essential in the refinement of the moral faculty. The remedy for the evils from which Indian society is at present suffering lies in widening the character of the intellectual education and not in narrowing it to any particular mode of education. We recollect the drunkenness which prevailed in the middle of the last century among the so-called educated people of Bengal who knew Shakespeare by heart but knew nothing of practical life viewed comprehensively as the life of a citizen, passed in an everlasting battle-field, where man fights against nature and against neighbour for his very existence.

What seems most necessary in this department of educational activity in India is to instil into the oriental mind of young India corporate sentiment, that part cular frame of mind which not only subordinates the well-being of the individual to the well-being of the corporate whole, but recognises the occasional necessity of the sacrifice of the individual to the well-being of the corporation. This no doubt is a non-theistic or non-supernaturalistic idea, being most prominent in that branch of naturalism which recognises the sacrifice of the part as a necessary condition of the well-being of the whole, the sacrifice of the shortlived individual for the benefit of the long-lived race. This non-theistic idea provides for virtue the reward of the prospect of a perfect social organization, a social millennium, in place of the theistic heaven which provides a life of eternal bliss for the selected few who practise the virtues. It has an altruistic end of an egoistic beginning, whereas theism has an egoistic end of an altruistic beginning. But the preservation of the social order, apart from the question of social

progress, absolutely requires the diffusion of the corporate idea, which by thickening into what may be called the corporate sentiment may become intuitive in the individual character and assume the form of a new conscience—a rational and natural conscience, as distinguished from the ultra-rational, supernatural conscience moulded and formed by the practice and profession of any form of anthropo-morphic religion.

I shall make some short quotations, from Dr Clifford's 'Scientific basis of morals' to explain the character of this new conscience based on Darwin's Natural Selection :—" Ethics is a matter of the tribes or community, and therefore there are no self-regarding virtues. The qualities of courage, prudence etc. can only he rightly encouraged in so far as they are shewn to conduce to the efficiency of a citizen...and any diversion of conscience form its sole allegiance to the community is condemned *a priori* in the very nature of Right and Wreng." 2. "The end of ethics is not the greatest happiness of the greatest number......happiness is not to be desired for its own sake, but for the sake of something else. If any end is pointed to, it is the end of increased efficiency in each man's special work, as well as in the social functions which are common to all". 3. "Again, piety is not Altruism. *It is not the doing good to others as others, but the service of the community by a member of it, who loses in that service the consciousness that he is any thing different from the community.* 4. "Although the moral sense is intuitive, it must for the future be directed by conscious discovery of the tribal purpose which it serves." 5. "Now suppose that a man has done something obviously harmful to the community. Either some immediate desire or his individual-self, has for once proved stronger than the tribal self. When the tribal self wakes up, the man says, "In the name of the tribe I do not like this thing that I as an individual have done. This self-judgment in the name of the tribe is called Conscience."

This type of morality and conscience is no doubt subversive of anthropomorphisim in religion, but inspite of the obvious disharmony, the corporate sentiment must be deeply implanted in the Indian mind, if India is to live and not merely to vegetate. Some other incongruities will also have to be put up with, for the limitations of human-capacity cannot aspire to perfect harmony. The rule should be that the theistic type of morality, applicable to Christians, Mussulmans and Hindus should be taught with as little mixture of naturalistic ideas, relating to the origin and sanction of morality as may be found practicable. The distinctive moral injunctions of the several creeds must also he avoided. For instance, the Kaffir in the eye of the followers of the Prophet deserved only slightly better treatment than the

poisonous reptile that furnished the garment of disguise for the ignoble rival of God, while deceiving the mother of mankind. .The idolatrous Hindu cannot tolerate or easily submit to the idea of equal rights accorded to the Brahmin and the Sudra, to say nothing of the Mleccha or Javan. As to Christianity, although the Founder preached nothing short of universal brotherhood and unqualified forbearance, his followers in course of time recognised the necessity of Crusades as a practical method of establishing and maintaining that brotherhood. All these ideas which have for their object the strengthening of one part of Humanity at the cost of another have essentially a naturalistic foundation, whether openly avowed or not. These distinctive ideas underlying the creeds must therefore be avoided as far as practicable, on the same ground on which general morality of naturalism must be deprecated.

It is to be noted that the old pantheistic ideas of religion with their progressive morality based upon the progress of the intellect and of knowledge, developing and spiritualising the emotions and controlling the course of volition by the extended power of prevision are being rapidly revived in the Hindu Society, superseding the orthodox ideas of the origin and sanction of morality. The idea of rebirth of which the naturalism of Europe does not yet seem to be fully aware, gives to the Pantheistic or idealistic idea of India a strength and persuasive charm which are unknown in Europe, where the rationality of egoism slowly expanding into altruism, and covering not merely the well-being of the present generation of humanity but that of all future generations with increasing density of benificence, lacks, by the force of its eschatological agnoticism, the firmness of conviction. A. T. Balfour (late Prime Minister) unconsciously forecasts the advent of the idea of rebirth into European Naturalism in the following passage (p. 129 Foundations of Belief) :—"Those who hold, as I do, that reasonable self-love has a legitimate position among ethical ends; that as a matter of fact it is a virtue wholly incompatible with what is commonly called selfishness; and that Society suffers not from having too much of it, but from having too little, will probably take the view that, until the world undergoes a very remarkable transformation, a complete harmony beteewn egoism and altruism, between the pursuit of the highest happiness for one's self and the highest happiness for other people, can never be provided by a creed which refuses to admit that the deeds done and the character formed in this life can flow over into another, and there permit a reconciliation and an adjustment between the conflicting principles which are not always possible here."

(To be continued).

KSHIRODE CH. SEN.

A SHILLONG VIEW.

Sreenath Press, Dacca.

THE DACCA REVIEW.

VOL. I. MARCH, 1912. NO. 12.

SECTARIAN UNIVERSITIES IN INDIA.

What is our ideal of a University?

Ideals vary in different ages according to the stages of culture the people have attained. All human institutions take their shape and colour from the culture of the age to which they belong. Universities are no new inventions. They have existed since the dawn of civilisation and have contributed towards its expansion, growth and development. If we peep through the vistas of the remotest ages, we find assemblages of men, endowed and equipped with all that was best and useful in the culture of the period, bent upon expanding their area of knowledge and restricting that of ignorance. In fact the University movement is an expression of the indwelling spirit in Humanity,—moving toward its goal of self-realisation. We had Universities in old Babylonia and Assyria, we find them in Egypt and we had our own in the primeval forests in the sacred land of the five rivers in our *Brahmavarta* and *Aryavarta*. Greece and Italy, the cradle of modern European civilisations, had them; and in the middle ages, we had no end of them, scattered all over Europe. Islamic culture was also represented by well-known Universities. In our own country, the great *Bharatavarsa*, since the time of the *Aranyaks* and the *Upanishads*, till the age of the great Raghunandan of Navadvip, we had a succession of Universities, representing the various phases and vicissitudes of Hindu civilisation. We have all read about the great Buddhist Universities, particularly that of Nalanda in Bihar. Its popularity was so great that it attracted scholars from different countries. In 643 A. D. the great Chinese traveller and pilgrim, Hiuen Tsang visited this great University, a second time. The great Harsa had an assembly at Kanauj, attended

by one thousand learned Buddhist monks from Nalanda alone. (Vide V. A. Smith's Early History of India)

But the early conception of a University (*Universitas*) underwent great modifications, before we reach a period, when something akin to our present-day idea of a University, providing complete courses of study, in all the recognised branches of learning was developed. Religion is indeed a great fact in human life. It was so in the beginning, and it will be so till the end. Its civilising and humanising influences are felt in every department of life. It was the beginning of wisdom, as well as of learning. All the earlier seminaries of learning in every climate, were religious in their character and learning was identified with the knowledge of the sacred scriptures. It had been so in Pagan Europe, and it was so in early Christian Europe. Both Semitic and Aryan civilisations in Europe and Asia, owe their peculiarities to the religions, which the two great branches of the human race professed. The division of knowledge between Human and Divine, indicates a much later development. The temples, the monasteries, the mosques and the churches, were the great seats of learning and cradles of civilisation. There was corporate life, there were all the self-abnegation and self-effacement and the pursuit of an ideal for its own sake, which a perfect university career involves. The earlier seminaries were jealous of all secular training and learning. It was a profanation and a blasphemy to put secular learning by the side of ecclesiastical. The disputations of the *schoolmen*, referred to the methods by which the scriptures have to be studied. History repeats itself and human nature is at bottom, the same all over the globe. That is also what happened in our own country. *Nyaya* and *Mimansa* systems, though at times soaring to the region of pure Logic, mainly concerned themselves, with the rules and methods of interpreting the sacred scriptures and portions of the Civil Law that emanated from the laws ecclesiastic.

But the question is whether we have outgrown that stage or not. A march from homogeneity to heterogeneity, has been said to be an indication of evolution and evolutionary process. The distinction between learning, secular and religious, is surely then a step in advance, and marks a stage in the evolutionary process. We have now universities, which concern themselves mainly with what we call secular learning, though a theological side has not altogether been divorced from them.

A rapid survey of the history of universities, is meant to prepare the way for a fuller discussion of the question which is intended to be considered in this short article. The question is a vital one and it is a pity that it has not engaged the attention of all thoughtful men in the country, which its importance deserves.

The question about the establishment of a Hindu and a Mahomedan University in India is a burning one and erelong it will come before the Government for its solution.

Education is a crying need of the hour. There is a mass of illiteracy in the country that has to be combated; there is the proverbial *inertia* of the East, that has to be removed. The East never moves is a copy-book-maxim, that is being always dinned into our ears. We have got to "move". The world is moving very rapidly and we cannot afford to lag behind. Any movement that makes for the enlightenment of the people, for the advancement of learning, for the removal of the *Cimmerian* darkness that envelops us on all sides, and for our progress along the lines, on which our brethren all over the world have been moving, must have the fullest sympathy and whole-hearted support of all right thinking and patriotic men.

Up till now it was a serious charge against our national character, that the wealthy and the rich do not open their purse-strings for elevating the masses or for advancing the people. Very few chairs have been provided for, in our existing universities, very few colleges endowed, and a fewer steps taken for educating the masses, by the rich people of this country. We have always looked up to Government for supplying our educational needs. Is it not cheering and is it not refreshing that money is pouring in with unprecedented rapidity, as soon as cries for the establishment of Hindu and Mahomedan Universities have been raised and started?

The Hon'ble Mr. Gokhale's Bill for free primary education is very likely to founder in its passage through the Legislative Council, on the rock of financial difficulties. Though it has been receiving the unstinted support of educated men all over the country, the question of costs will prove a stumbling-block which is not likely to be removed within the lifetime of a generation. Would any appeal for the spread of education amongst the illiterate masses, be so liberally responded to, at the present moment? I think not.

This is surely an anomaly that loudly calls for some explanation. Before I attempt to explain this extraordinary phenomenon according to my own limited lights, it may be useful to recapitulate the history of the movement which is bound to throw some sort of light on it. The Alighur movement, started by the late Sir Syed Ahmed of pious memory, was the first articulate expression of a desire on the part of the Mahomedans, to have an educational institution, where the tenets of their religion could be taught with the Science, Literature and Philosophy of the West. The Alighur M. A. O. College, was the embodiment of that desire. It attracts students from different parts of the country; and by its success, it stands as a mounment to the patriotic and philanthropic efforts of

the late grand old man of Alighur. Here was the *nucleus* of a Mahomedan University. It is a noteworthy fact that at first the orthodox portion of the Mahomedans looked at the movement askance and regarded it as a great *denationalising* agency. The results have amply justified their misgivings. The *Alumni* of the M. A. O. College, with their knowledge of Western Science, Literature, History and Philosophy garnered at the feet of European professors, could not be the Mahomedans of the old orthodox type. They had to outgrow the narrowness of the orthodox school. This was inevitable. In their search and thirst after knowledge, they could not fetter themselves by dogmas. They could not resist the liberalising influence of education. Instead of being denationalised, for aught we know, they became intensely national and patriotic. Their hearts went forth in sympathy with the "Young Turks" and the national movement in Egypt. Now, His Highness the Aga Khan, appeared on the scene and started the movement for a Mahomedan University. The sympathetic attitude of the authorities towards it, gave it an impetus, unparalleled in modern Indian history. It grew in volume and intensity and a very large amount of money has been subscribed endowing the university. The true inwardness of the movement is to be sought in the growing self-consciousness of the Moslems in India and also in their efforts to evolve a distinct nationality apart from the Hindu. This is how I read the movement. It is certainly not the aim of the promoters of this movement to encourage Oriental studies as represented by the Arabic and Persian literatures, nor can it be their aim to encourage orthodoxy. The products of the M. A. O. College must have by this time disillusioned those, if there be any who still think that exclusively Mahomedan schools, colleges and universities, are calculated to strengthen and not to undermine orthodoxy.

Mrs. Annie Besant of Theosophic fame, had also been maturing her plans for getting a charter for her College--the Hindu College of Benares. With all the profoundest respect for the Theosophists, for Hinduism or rather Hindu Mysticism it cannot be said that Theosophic ideas exactly tally with what we understand by Hinduism. The two *cults*, may agree in certain respects but they are never identical nor do they coalesce in any way.

Then came the scheme of Pandit Madan Mohan Malavya, a quondam President of the Indian National Congress and a leader of orthodox Hindu opinion in the United Provinces. The position of the Hon. Pandit as an old Congress-man, enabled him to enlist the sympathy of Congress-men in favour of his pet scheme. It should also be noted that this idea of starting a movement for the establishment of a Hindu Univer sity was floated in a Province where the Hindu-Mahomedan question is the

keenest. It dit not originate in Bombay or in Bengal, or in any province where there is no University such as the Central Provinces or the newly-created Province of Eastern Bengal and Assam. There is some significance in this matter of local origin. May not sceptics ask—"Is it not an expression of the keenness of the Hindu-Mahomedan question in the land of its origin?"

It seems now that the movement is very influentially supported. The whole of Northern India including Bengal has responded to the call of the Hon. Pandit in no uncertain voice. Only we have heard nothing yet about the sympathy of the region south of the Vindyas, with this movement. I have no doubt in my mind that the movement inspite of a few of its detractors, will have in general the support of Hindu-India. The Government after its declaration of sympathy for a Mahomedan University, cannot consistently with its profession of neutrality, discountenance this movement for a Hindu University. Mrs. Besant has joined hands with Pandit Malavya.

Now we come to the question, rather the question of questions. What is the necessity for these sectarian universities? I do not for a moment suggest that two more universities in India, are not wanted, nor will there be too many, if two more universities are founded. If the vast mass of illiteracy that prevails in in the country, if the gloom of ignorance that enshrouds it, if the apathy of the ages, have to be removed, I believe that a hundred universities will not be too many, for a country or continent like ours.

The universities are being defended by thoughtful men principally on the ground, that the education which the universities impart, should be such, that the special features of the civilisation of each nationality or race, should be maintained and that a purely secular education is not conducive to the well-being of the people. Are the existing universities then really denationalising agencies? Are they really machines for crushing out of their graduates and undergraduates their peculiar national characteristics and for effacing the old types? Are they really moulding men in one and the same cast? If these questions are answered in the affirmative, then and then only, the defence of the projects as outlined above may have some plausibility about it.

But I am not prepared to say that the existing universities can wipe away our national peculiarities or have even been successful to remove our orthodoxy. Are not the Hon. Pandit Malavya, the late Hon. Krishnaswami and a host of other distinguished supporters of the Hindu university movement, the best products of the existing non-sectarian secular universities? The broad basis of modern culture (call it European, if you like) is not calculated to obliterate anything that is real and genuine or to disturb anything that should be stable

or anything that should be conserved in any nationality or race.

I hold no brief for the existing examining bodies, miscalled Universities, ; nor do I hold that our Universities should not expand or develop on other lines. But what I fail to understand is how modern Universities with their pretensions to diffuse learning on board bases or to impart universal culture can be run on sectarian lines. Universities started and supported by particular sects or comunities are not necessarily sectarian if they raise aloft the high standard of culture that should be our aim and if they instead of giving a sectarian bias to it, invest it with that amount of Univęrsality which we desire.

It may be said that the proposed Hindu or Mahomedan universities are to be established on these broad and wide bases. If so, there is nothing to be said against them.

We may not approve of the strong denunciations of Justice Sankara Nair but we fully share his suspicions and misgivings regarding the objects of the promoters of these schemes.

India is a land of schism—racial and communal differences. We should not do anything that may accentuate such differences. Our educational efforts, like Cæsar's wife should be above suspicion. The Government cannot and should not countenance any movement that is not beyond all cavil. We want more light, more culture, more knowledge and necessarily better and higher education. Let us have as many teaching universities as we can provide, with a galaxy of learned professors, at whose feet our youngmen can sit to learn all that is worth learning, but not universities which only give the hall-marks and not the genuine article,—which are calculated to foster racial and communal acrimony and which instead of helping us in developing a robust manhood, will tend towards crippling whatever manhood we possess.

N.B. This was written long before His Excellency's declarations in favour of a University at Dacca or before the Hon'ble Mr. Butler received the deputations of the promoters of the Hindu and Mahomadan University movements.

NIBARAN CHANDRA DAS GUPTA.

SOCIAL LIFE AT OXFORD.

Oxford has always been a home of movements rather than of learning. In other countries boys go to the University to learn but in England they go to develop. The modes of development, however, are various. Sometimes the development is only retrogressive or sham but as a rule it is real and the time spent at the University fulfils the task of forming a young man's character. To show how this is done it is necessary to give a picture of the life at the University from its social aspect.

Among those who come up to Oxford there are several types. In the first

place there is the "public school" boy who is born in the purple. Under the genial warmth of opportunity he indulges in the fashionable pleasures of the day. To him Oxford is a stepping-stone from the supposed restraint of a public school to the supposed freedom of manhood. Then there is the ordinary young man whose ambition lies in the athletic rather than in the studious line. A third type is to be found in those who come up to Oxford as to a larger field for their action and try to work out their own ambition with diligence and perseverance. But these classifications are somewhat arbitrary. The fallacy of cross-division makes it exceedingly difficult to present a picture of Oxford which will be at once true to the life and at the same time intelligible to the outside world. It seems, however, if any adequate account of Oxford social life is to be given, the subject must be approached by discussing the various occupations, pursuits and pastimes that attract the different types of men and by considering the social side of each.

An Oxford day is divided into three parts; the morning is devoted to work, the after-noon to play and the evening to social intercourse. The system of inter-college lectures gives an undergraduate the opportunity of mixing with men of other colleges.

To come now to the various occupations of an Oxford undergraduate. The river is the chief feature in the life of amusement, Boating men are the salt of the university. They are not selfish; their sport has nothing personal in it. Men row for their College or their University. They are not like running men who run as it were, each for his own hand. Whatever may be his work in life, a boating-man will stick to it. His favourite sport is not expensive or luxurious. He is often a reading man though it may be doubted, whether "He who runs may read" as a rule. The river is the place where undergraduates enjoy the society of the other sex during the nights and at the numerous water-parties interspersed through the Summer term. The river is in fact instinct with the social side of Oxford life. Between the members of different colleges there is a healthy rivalry which nourishes the energy of succeeding generations of Oxford men. There is of course in rowing as in every pursuit, that contempt of others, less trained by practice, or less favoured by nature, which causes the rowing enthusiast to regard his Eight or Torpid as the be-all and end-all of existence and to despise the duffer who rows for exercise or pleasure. But this contempt is harmless and does not lessen the feelings of enthusiasm which encourage the college crew. In some colleges the Boating set keeps by itself; in most it is mixed up with the mass of the college. This is caused and kept up by the almost uni versal custom of giving breakfasts to the Torpid or Eight; it is a means to social intercourse which often enables men of different types to see and know each

other. For weeks the boating men take their meals and live much of the day together. Some men find this arrangement a considerable trial to their temper; but on the whole those who have rowed in Torpid or Eight will look back with gratitude to the pleasure and good they derived from those periods of intimate society among the members of the same crew. Jealousy and egotism must gradually give way before the genial warmth and physical energy of a training.

After rowing, Cricket may be taken as the most popular and universal pursuit at Oxford. While rowing may be learned at Oxford, Cricket is, in fact, confined to those who have played at school and can hardly be learned at the University. It is, therefore, the pastime of the few rather than the occupation for the college as a whole. In fact the cricketing element in a college is more of a set and lives a life more apart from the rest of its contemporaries, than does the rowing element. Except for those who have a chance of getting into the 'Varsity Eleven' it is a much more indolent occupation than rowing. Whereas rowing acts as a bond between the various sets and types of men who come from public schools and elsewhere, breaking down the somewhat exclusive tendencies of public school associations, Cricket tends rather to form more or less exclusive sets who find their own society pleasant enough and rather hold aloof from the rest of college life.

Criticism passed upon Cricket as distinguished from Rowing applies with equal force to Athletics, Hunting and Foot-ball. The athletes of the University do not form an important element in any college by itself but gathered together from the different colleges they are a considerable and well-known part of that social aristocracy of Oxford which centres at Vincent's and to a certain extent look down on those who from circumstances or inclination have either been unable to join that select circle. Hunting and riding are a declining element in Oxford life; with a few exceptions in other colleges, they are now almost confined to Christ-church men. The reasons of of this is of course partly the want of means on the part of the ordinary undergraduate to indulge in an expensive sport. Another cause is, however of a deeper character. Whereas 50 years ago the aristocratic class formed ihe most important constituent in Oxford, now it forms a comparatively unimportant element. The result is that riding and hunting are no longer the natural pursuits of any large number of Oxford undergraduates. Football 50 years ago was practically unknown at Oxford and regarded as a school-boy's game; but it is now a recognised and very popular institution for a large proportion of every college during the Winter terms. In its different forms of Rugby or Association, it excites much interest in the University as well as in the town. It affords amusement, exercise and its attendant social amenities

for the multitude of folk who require more violent and more exciting recreation than the afternoon's walk of the reading man. Football has the further advantage of bringing together men who hail from different schools and thus to break down the walls of public school caste.

There are several other games such as Lawn Tennis and Hockey, these have little to do with Oxford life in its social aspect. We have already discussed the other occupations and pursuits of a purely social or semi-intellectual character to which an undergraduate devotes the rest of his leisure time. Social, Political or Literary clubs show how they spend their evenings and generally that part of the day which is not devoted to actual reading or to play. The social side of University life is in fact a curious tissue of clubs woven upon a general framework of college life. But there is a good deal of informal social intercourse which forms far too large and important a part of university life to be passed over in silence. Clubs and societies exist for special purposes and consist of particular sets. They are also, with the exception of the Union comparatively small collections of men. Yet the mass of the members of every college as well as the unattached have much mutual society and indulge in a considerable amount of mutual hospitality. It will therefore be well to dwell for a while on what may be called the more universal and less formal part of undergraduate intercourse.

On his coming into residence the freshman speedily finds himself launched into the general society of his college by frequent invitations to breakfast, lunch or wine. It is usually considered by the senior men incumbent on them to do something in their way to help the new comer over his first few weeks and there is a general tendency to ask all freshmen even though they be perfect strangers to their host. The particular kind of hospitality which a man will adopt depends entirely on the custom of his particular College. In some cases they are set invitations, in others they are more or less impromptu ; they often assume the form of a common breakfast or lunch served in one particular room. Those unpremeditated collections of undergraduates for breakfast and lunch are among the most pleasant forms which Oxford society assumes and do more than anything to promote a thorough intimacy between those who thus unite. But the only objection to them is that men tend naturally enough, to confine themselves to a particular circle of friends which after a while hardens into a set the growth of which is most hostile to the true well-being of a College. It would be impossible to enter into a full account of all the varieties of entertainments which come under the category of breakfast or lunch and such account would be wearisome. It will probably be best, therefore to pass on to describe some of the more general forms of College entertainments.

First comes the wine. This essentially university function may range from a bump supper in an ordinary College common room to the more moderate proportions of a feast of Bacchus given by some enterprising undergraduate in his own room to his friend. The first of these species of entertainments has decreased in popularity and been much discouraged. The tendency towards decorum, so marked a feature in modern Oxford and perhaps the leaven of temperance reform that pervades the society is against such wild forms of entertainment as the old Bump supper. The function of such feasts has been filled by the more spirited Bonfire or a college Ball. The college wine in a more orderly and regular form is to be found in the junior common Rooms now possessed and elaborated by several colleges. These are fruitful grounds for social intercourse and pleasant means of entertainment without too severely taxing a hosts' purse. The private wine is on a different footing. It is essentially a gathering of friends who for the most part know each other well. It may be only nominally a wine and actually a musical smoke and talk or it may sometimes be a regular symposium mixed with card and music.

Oxford is not now what is was, the training ground of the aristocracy of the country. It is the meeting ground of many classes, the furnace that blends them into a sort of social amalgam in which the constituents, though gaining a common type of character, still retain their individuality. Oxford on its social side is a leveller and thoroughly democratic in its tone. In short it is mutual tolerance and tolerance of every kind—that is the chief characteristic of Oxford social life.

THE RELIGIOUS AND SOCIAL DIVISIONS AMONG THE MUSALMANS OF DACCA.

There is no caste system among the Musulmans, at least of the kind prevalent among the Hindus. There are certain religious and social divisions, but the different sects intermarry.

Religious Divisions.

As elsewhere in India, the Musulmans here are divided into two principal sects viz. the Shia, and the Sunni. There are no Shias in the interior, and the number of them in the city is not large. They are known as *Mughals* and are the descendants of the former dominant race, the Naib-Nazims since the time of Nawab Alivardi Khan, the Nazim of Bengal, having been Shias, and of the Persian merchants and adventurers who used to flock in large numbers in the days of the Naib-Nazim. Their number is decreasing, and the majority of them are poor.

The Sunnis are divided into three sects viz. the *Muqulladi*, the *Ghair Muqulladi*, and the *Farazi*. The first are the followers of one of the four *Imams* viz. Imam Abu Hanifa, Imam Shafii, Imam Malik, and Imam Hambal. The followers of the last three are scarcely to be found in this district.

The *Ghair Muqulladi* are in reality the *Wahabis* i.e. the followers of Abdul Wahab of Najd in Arabia. They are also known as *Rafiyadain* because they lift their hands to their ears each time the words "Allaho Akbar" are pronounced in the course of prayer, whilst the other sects do so only at the beginning of the invocation. They also call out the word "Amin" in a loud tone at the end of each supplication. They are found in large numbers in Bangsal, Nazirerbazar, and Shamsabad quarters of the city, and in the interior in and around Dhamrai, Panchgaon, and Mirpur.

The *Farazis* are the followers of Haji Shariyatullah of Bahadurpur in Faridpore, who founded the sect about 1824. Shariyatullah was born of poor and obscure parents. When eighteen years of age, he went on a pilgrimage to Mecca and stayed there some twenty years studying theology under the *Wahabis* who then held the sacred city. He returned about 1820, and shortly afterwards he commenced preaching his doctrines which differed a good deal from those followed by the Musalmans in the District. His apparent sincerity of convictions and the simplicity of his character, soon gained him a band of devoted adherents. The chief *Wahabi* innovations introduced by him were non-observance of the Friday and the two I'd prayers in congregation, and of the Muharram. On Shariyatullah's death his son Muhammad Muhsin alias D'ud'u Miyan succeeded him. He was a man of different character from his father. His quarrels with the neighbouring Zamindars and indigo planters led to his incarceration in the Faridpore Jail in 1857. He established his head-quarters at Bahadurpur where his descendants still reside. He died at Dacca in 1860, and lies buried in the compound of his house at Mahawattuli in that city. His followers, are to be found in Faridpore, Pabna Backerganj, Dacca and Noakhali and number seven lakhs.

Till the year 1889 Farazis did not submit to vaccination, considering it a sacrilege to get themselves or their children vaccinated. At Mr. (afterwards Sir Lancelot) Hare's desire I took up the matter in 1889 and succeeded in getting vaccination introduced among them the following year. There are no more "vaccination riots" among them now.

Social Divisions

The social divisions among the Musulmans are the Saiyid, the Shaikh, the Mughal, the Pathan and the Kutti.

The Saiyids claim descent from Fatima the daughter of the Prophet and are considered the most respectable

among the Musalmans There is a large number of Saiyids in the city, but their number in the interior is small. The majority of the Musulman population of the district are Shaikhs. The Mughals, as stated above, are to be found in the city only. The Pathans are the descendants of the settlers of the Pre-Mughal days and are to be found in large numbers in thanas Sabhar, Manikganj, and Lesraganj. The last battle between the Pathans under Usman Khan their last chief, and the Mughals under Islam Khan, the founder of Dacca, was fought near Dhamrai in thana Sabhar, and resulted in the defeat of Usman. His followers spread themselves in that quarter and settled down there exchanging the sword for the ploughshare. The majority of the Pathans of to-day are their descendants.

The Kuttis (so called from *Kutna* to husk) are to be found chiefly in the Bansal, Shamsabad, and Rahmatganj quarters of the city. Their sole occupation formerly was husking paddy. At present many of them do business in hides. As a class they are fairly well-to-do. The number of Kuttis in the Mofussil is small. They hold the lowest position in society and are probably the descendants of the converted Hindus and aborigines.

SAYID AULAD HASAN

OLIVER WENDELL HOLMES.

Holmes was an essentially marrying man and like Barnard Langdon in *Elsie Venner* he entered into matrimony before he had fought his way into eminence and prosperity. This was in 1840. His wife was to him all that Lady Tennyson was to the poet-laureate. By her he had two sons and a daughter.

He had to pay the penalty of a long life by the loss not only of his wife (1887) but also of his daughter (1889) and his second son (1884.) In person he was of short stature and only in his later years somewhat inclined to be stout. His almost boyish countenance indicated the eternal summer in the poet's heart. One remarkable feature of his mature was its many-sidedness. He was not only fond of scientific pursuits but also of such various things as playing on the violin, photography, and boating and took a lively interest in boxing, horse-racing and trees. He constructed a hand-stereoscope and once bound a book with his own hands!

Holmes's life, I have already said, was singularly uneventful. Since his entrance into professional life as a follower of Æsculapius he lived all his years, almost literally all his days, in or near Boston. The even tenor of his life being only occasionally broken by those lecturing tours which form such a notable feature of American life. Once only he left his familiar New England

surroundings when he visited Europe with his daughter as his companion ; a record of the tour is to be found in one of his latest works "*Our hundred days in Europe*".

He worked off his superfluous steam a little through the exaggerated local patriotism of *Little Boston* in the *Professor* but it would be readily conceded that by his brilliant writings he made Boston culture respected abroad just as a knot of clever young men had in an earlier part of the century justified the claim of Edinburgh to be called 'Modern Athens' by their brilliant literary performances. He had a large circle of friends, many of them illustrious men like Emerson, Lowell, Motley, Whitier, Longfellow, Prescott, Hawthorne, Professor Agassiz, and they came to form the Saturday Club or Atlantic-club (the members dining together on the last Saturday of every month) a club that deserves to be as widely known as the famous 'Club' of which Johnson and Burke and Goldsmith and Reynolds and others of their set were members.

Many, perhaps all, were contributors to the famous *Atlantic Monthly*, whence the secondary title of the club. Some outsider gave it the nickname of the *Mutual Admiration Society* and this drew forth from Holmes the philosophic defence worthy of the author of Hero-worship with which we are all familiar in the *Autocrat*. Here as in Johnson's famous club there was ' the feast of reason and the flow of soul' ; of all who sat at the Saturday table Dr. Holmes was by far the most brilliant talker. The pages of the *Autocrat* are but a faint adumbration of the brilliant talk, which, alas, there was no Boswell to record. All this will fall rather flat upon an Indian audience since the brilliant table-talk of Johnson and Burke, of Coleridge, of Sydney Smith and Macaulay is an unknown quantity in Indian life where such a gift will come to be stigmatised as talkativeness. 'Remember' as Holmes has said 'that talking is one of the fine arts—the noblest, the most important and the most difficult, and that its fluent harmonies may be spoiled by the intrusion of a single harsh note. This is what Mr. Edmund Gosse says of Holmes's conversational powers. 'Perhaps no man of modern times has given his contemporaries a more extra-ordinary impression of wit in conversation. We are told that he never overpowered companions, never held the talk in monologue, but that he listened as brilliantly as he spoke, taking up every challenge, capping every anecdote, rippling over with an illuminated cascade of fancy and humour and repartee.'

Another habit of his which made his company pleasant was that of reading aloud his poems—a habit shared by him with the late poet-laureate. ' He read them with much simplicity, yet with a sympathy of expression in voice and feature which was very charming. '

Holmes was not a great poet, but he was a charming lyrist. His melody was absolutely perfect. As a writer of occasional verses he was unrivalled. Although he took no part in public movements and active politics ('associated action is alien to my tastes and habits', he once wrote to his friend Lowell who taxed him with indifferentism) his heart was stirred to its depths in the great days of the momentous struggle which resulted in the abolition of slavery from the United States by no peaceful process as in the struggle of Wilberforce and Granville Sharp in the old country but by a cruel civil war—in which Lowell heard the clash of Michæl and Satan. His eldest son, like the rival lover of his story the *Guardian Angel* enlisted among the first and Holmes wrote war-lyrics with the spirit of a Tyrtæus unmindful of the fun he had poked at *Gifted Hopkins* who instead of marching in the ranks in obedience to his country's call is pursuaded by his sweetheart to aid his country with his pen. A favourite habit was that of scattering short poems through the papers of the *Breakfast-Table Series*, of closing a brilliant paper with a charming poem. Of these, the *Chambered Nautilus* and the *Last Leaf* are 'booked for 'immortality', to use the happy phrase of Whittier. A genuine poet as he was, he had no patience with the pseudo-poet weaving 'by night and day' his 'magic web with colours gay' like a veritable Lady of Shallott and the exquisite caricature of such a *role* in Gifted Hopkins (in *the Guardian Angel*) deserves to be studied by some of our youngmen. Many are the occasional flings too that he casts at this busy race in the pages of the *Autocrat* and of *Over the Tea-Cups*. At the same time he had a boundless admiration for the genuine article and the exquisite analysis of a poetical mood and its rich product given in the *Autocrat* deserves to be studied as a protest against Poe's mechanical 'philosophy of composition' and is not less profound than the famous theories of Coleridge and Wordsworth.

Dr. Holmes was more ambitious to be thought a poet than anything else but the world has judged differently. The famous *Breakfast-Table series* is considered and justly considered to be his *magnum opus*, the corner-stone of his literary reputation, his genuine passport to the temple of Fame. Yet it was a mere accident that brought it into being. In 1857 the publishing firm of Philips, Samson and Co. Boston, invited Lowell to act as editor to a literary magazine they were going to start. He accepted, but 'made it a condition precedent' that Dr. Holmes should be 'the first contributor to be engaged.' Holmes yielded to Lowell's friendly pressure and the result was what we all know. He christened the unborn babe as the *Atlantic* and the twelve bucketsful bailed out of the running stream of his thoughts in twelve months into the

Atlantic form what the present-day reader knows as the *Autocrat of the Breakfast Table.* Next year the sparkling current flowed as spontaneously and as exuberantly as before and the *Professor at the Breakfast Table* was the outcome. In 1871, the *poet* took the vacant chair at the Breakfast Table. To Lowell, then, the world owes a mighty debt for having tapped the unsuspected soil and discovered an 'inexhaustible vein of the finest gold.' It reads almost like the old story of a similar service done by Steele to Addison and the world —a service the result of which have been the *Tatler* and the *Spectator*.

The *Autocrat* is a unique production of the soil of New England. There is nothing even remotely resembling it in the literature of old England. *Noctes Ambrosianæ, the Recreations of Christopher North* contain much brilliant talk, beautiful word-painting and all that—but compared with the *Autocrat* they are "as moonlight unto sunlight and as water unto wine". The whimsical discursiveness of the book, the restless hovering of that brilliant talk over every topic, fancy, feeling, fact, the abundance and the rare orginality, the wit, beauty and infinite variety of its similes, the atmosphere of piquancy and freshness clinging around it make it the best of Holmes's prose works. There is no laugour in it and it permits none in the reader, who must move along the page warily, lest, in the gay profusion of the grove, he miss some flower half-hidden, some gem chance-dropt, some darting bird'. What Emerson says of Montague's Essays is eminently true of this. It is the language of conversation transferred to a book ; cut these words, and they would bleed ; they are vascular and alive'.

The *Professor* chose more serious topics, he was much graver and expected much closer attention from his readers, he was less enterprising, more thoughtful and more profound, though the lively conversational style was retained and the flashes of wit and humour were never apart. Well, after all, the second temple was not like the first.

The *poet*, coming eleven years later, met formidable rivals in his predecessors and could not come up to the old pace "The three Volumes stand like the three successive pressings of the grapes from an illustrious vineyard. The *premier cru* is the best, the second is very nearly as good ; but by the third squeezing the difference in quality cannot escape notice, still even then one says : 'They are indeed grapes from a rare good soil."

Over the Tea-cups coming still later (1888) forms a sort of aftermath to the better-known *Breakfast Table series.* 'It would be idle to pretend that they are as good as the talk of the Autocrat but they make very pleasant reading, with abundant infusion of the old time wit, wisdom and humour.'

Lalit Kumar Banerjee

UNIVERSITY OF NALANDA.

Its influence on Asiatic culture.

During the period that the university of Nalanda was in existence, there were three nations in Asia that could boast of any civilization—the Indians, the Chinese and the Tibetans. The civilized nations of central Asia that are in existence to-day were then only in the process of making, out of the nomadic tribes against whom the great wall of Peking was built and who made such frequent descents into the rich plains of India. It is an historical fact which may well be called marvellous that all these three nations were influenced to a considerable extent by the culture and learning of the university of Nalanda, in a century in which intercourse between nations was impeded by so many difficulties of journey and communication. Apart from all other considerations,—its vast numerical strength, the surpassing grandeur of its buildings, the eminent scholars it turned out and the exemplary perfection of its monastic virtues, this fact alone—that it considerably influenced the intellectual life of three civilized nations of the age—would entitle it to the highest importance among all monastic institutions of India. We shall now proceed to describe how and in what way the university of Nalanda influenced all the civilized Asiatic nations of that age.

1. The influence of Nalanda on India:—

It would perhaps involve only a recapitulation of all we have said before to speak at this stage of the influence of the Nalanda University on India. Three points, however, emerge prominently into view in this connection—*first,* it was by far the most prominent seat of learning in India during the latter half of the sixth, the whole of the seventh and the first half of the eighth centuries, *i. e,* about 200 years. Here flocked from various quarters Indian monks desiring to learn under the highly learned Professors of this University. It was the custom of Buddhist monks to migrate from one monastery to another and these perigrinations contributed to a large extent to the diffusion of the learning of Nalanda all over India. Its students, as Hiouen Thsang's biographer tells us, were looked up to as models by all India and those who stole the name (of Nalanda brother) were treated with respect wherever they went (1) I-Tsiang tells us that some three years' residence at Nalanda or Valabhi was considered to be essential for the completion of education ; (2) *Second,* it turned out by far a greater number of illustrious scholars than any other monastic college in India—scholars who not only

(1) See Beal's 'Life of Hionen Thsang'

(2) See Takakasu, P. 172.

taught and educated others but also made some substantial contributions to the various branches of Indian learning of that age. This we have already dealt with in the section on the curriculum of the University and its most distinguished alumni ; *third*, it imported a healthy intellectual vigour to all monasteries like Tilodha and others round about it and out of it some off-shoot monasteries arose and Valabhi specially rose to be a seat of learning rivalling Magadha through intellectual intercourse, as I shall show, with Nalanda. We shall deal only with this third point here.

The history of Valabhi has been made out to a large extent from local records from which it appears that an enlightened prince named Sīladitya I. ruled over Valabhi from 595 to 615. He was a man of eminent wisdom and great learning and was a zealous Buddhist. "By the side of his palace, he had built a Buddhist temple, remarkable for its artistic design and rich ornament, in which the images of the seven Buddhas were enshrined. It was his custom to hold a great assembly every year at which the canonical dues and gifts were presented to the monks with liberality. This pious practice had been continued for successive generations to the time of Hiouen Thsang's visit."[1] It is so probable as to amount to certainty that it was during the reign of this enlightened prince that the two great scholars of Nalanda, Gunamati and Sthiramati migrated to Valabhi and it may be on royal invitation. These two eminent Nalanda scholars lodged in the large monastery of Achara near the capital and "composed treatises which had great vogue."[2] It is to them that the rise of Valabhi as a great seat of education rival with Magadha must be attributed just as later on the rise of Lasha as the intellectual centre of Tibet was due to two other Nalandan scholars, Santa Raksita and Kamalasila. Learning, however, continued to be cultivated at Valabhi after the death of Gunamati and Sthiramati and it was again afterwards brought within the pale of Magadha influence through the marital connection of Dhruvavata, king of Valabhi, with Harsavardhana Siladitya during the first half of the seventh century. Both Hiouen Thsang and I-Tsiang name Magadha and Malabha (*i e*, Valabhi) in the same breath as pre-eminent seats of Indian learning.[3]

As regards the off-shoot monasteries of Nalanda, it is best to deal with them separately. Near Gaya the Silabhadra monastery was founded and maintained

(1) Smith's 'Early History', 2nd Edition, P. 306.

(2) See Watters, Vol. II, P. 246. I have already given my conjecture about the dates of Gunamati and Sthiramati. Hiouen Thsang saw the ruins of the Achara monastery and he is our only informant about Valabhi's intercourse with Magadha.

(1) See Watters, Vol. II, P. 242 and Takakasu, P. 172 ; Also Smith's 'Early History', 2nd Edition, Ph. 296, etc.

by Silabhadra. There was also near it a monastery named Gunamati monastery which was built to commemorate the victory of Gunamati in a controversy with Madhava.[1] Jnana Chandra, a scholar of Nalanda mentioned by Hiouen Tsang, is included among the four great teachers of his time by I-Tsiang and is said to have been resident in West India where he was highly renowned as a teacher.

2. The influence of Nalanda on Tibet[2] :—

The influence of the University of Nalanda has so deeply worked into the intellectual life and civilization of ancient Tibet that we cannot properly appreciate it without first forming a distinct and connected idea of the history of Tibetan civilization during the period that the Nalanda University was in existence. Even the snow-summits of the Himalayas proved to be an ineffectual barrier to the intellectual intercourse that Tibet carried on with the Nalanda University from the first dawn of civilization in that country to the final eclipse of Nalanda.

(1) See Watters, Vol. II, P. 108. Watters identifies this Gunamati with the famous scholar of Nalanda of thatname.

(1) The materials for this section are drawn chiefly from Rockhill's 'Life of Buddha', S. C. Das's 'Indian Pandits in the Land of Snow', This contributions on Tibet in J. A. S. B., Vol. L and L, both Part I and his analysis of the contents of 'Pog-sam-Jon Zong', Part II. This last book has not been translated from Tibetan, but it richly deserves to be.

Buddhism, although said to have been first introduced into Tibet in a miraculous manner in the 4th or 5th century A. D., did not become the predominant religion till the reign of the famous monarch, Srong-btsam-sgam-po . who ascended the throne in 631. It is during his reign that we get the first account of Tibet's connection with India and the University of Nalanda in particular. The very earliest act of his reign is recorded to have been the despatching of a mission of seven nobles to India to fetch an alphabet, who however, having lost their route on the return journey, were unable to return home. In 616, another mission of seventeen was sent out by the same monarch under the leadership of the famous Thoumi Sambhota, who with great difficulty succeeded in reaching Southern India and learning Indian characters from a Brahmin scribe named or surnamed Lipidatta. Having thus equipped himself with a preliminary training, Thoumi Sambhota naturally proceeded to complete his education at the great monastery of Nalanda. There he placed himself under a professor of that University named Devavid Simha and studied Brahmanical as well as Buddhistic literature—just at the time when Hiouen Thsang from China was studying the Jogachara Philosophy here with Silabhadra.[1] On his return to Tibet, this ardent scholar, trained at Nalanda,

(1) S. C. Das's 'Indian Pandits in the Land of Snow'—P. 48.

laid the foundation of Tibetan learning by forming the Tibetan alphabet on the basis of the Ranja characters of Mithila and Kashmirian characters[1] out of which he took 24 letters with slight modifications, adding 6 of his own invention. The king himself is said to have acquired some proficiency in writing and is credited with authorship. But while the king thus introduced the first elements of civilization into Tibet, it was left for his two queens Chinese and Nepalese to popularise the cause of Buddhism in the country. His Nepalese queen built the great Lasha cathedral at Lasha, where the capital had been removed by Srong-letsan, after it is said the Vikramasila monastery;[2] while the Chinese queen, whom he had won by prowess of arms, brought over from China Chinese missionaries and Buddhism as well as silk-worms and Chinese silk—a luxury enjoyed as much by the Indians as by the Romans of old.[3] Learning thus founded by Thoumi Sambhota continued to flourish in Tibet, being helped by Chinese missionaries who translated Buddhist books into Tibetan. The work of Srong-btsan and Thou-mi was carried on in the reign of Kilisotsan who came to the throne in 705. He tried but unsuccessfully to introduce monachism into Tibet and some emissaries whom he had sent to India to invite to Tibet two Indian *Pandits*, Buddhaguhya and Buddhasanti, committed to memory while in India five volumes of the Mahayana Sutras and reproduced them afterwards in their own language. The king also had also several Chinese works of medicine, astrology, etc., translated. He died leaving the throne to his son Ki-li-tsan in 755. It was during the reign of Ki-li-tsan that a professor of Nalanda vastly advanced the cause of Tibetan civilization in conjunction with a *Pandita* of Udyana.

Ki-li-tsan greatly favoured Buddhist missionaries and Buddhism, even to the persecution of the national Bon-po religion. In order to establish his favourite religion, he invited from Nalanda a professor of that University named Santa Raksita who was in fact to be the pioneer of a host of other Indian Buddhist missionaries in the land of snow. Owing, however, to the volume of opposition which his doctrines met at Tibet, Santa Raksita had to depart to Nepal whence he was shortly afterwards summoned back by the king. At his instance Padma Sambhava, an adept in occultism and *pandita* of Udyana, also was called in to render him

(1) Pag-sam-John-Zong, Part II,—P.-167.

(2) Ibid, P. 168. This is a glaring anachroo nism. Vikramasila was founded by Dharmapala and his date can by no manner or means he pushed back to the time indicated.

(3) A pound of silk in the time of Aurelian sold for a pound of gold—See Gibbon, XL, iii. Virgil in his *Georgics*, ii, 121, describes silk as the soft wool combed from the trees of the seres or Chinese. Cf. Lat. *Sericum* (—silk) and Sans. *Chinamsuka*, as in Kalidas's *Avidjnana Sakuntalum* : চীনাংশুকমিব কেতোঃ প্রতিবাতনীয়মানস্য ।

assistance. These two friends together built in 749, the splendid monastery of *Sam-ye* (lit. অচিন্ত্য বিহার, cf, Ajunta, i.e., *Achinta*) at Lasha after the fashion, it is said, of the Odantapura monastery[1] which built by Gopala (circa. 730). must have been then in all the splendour of new construction. Twelve monks also from Magadha were invited to come and tenant it and for the first time seven young Tibetans were taken into the monastery as novices. Santa Raksita and Padma sambhava ran the Sam-ye monastery for thirteen years and so great was the veneration of the Tibetans for Santa Raksita that they traced his patriarchal descent on the walls of the Sam-ye monastery from Buddha's great disciple Sariputra. Sanskrit learning also was diffused in Tibet through the efforts of these two scholars and those versed in sanskrit learning were called *Lochavas.* With the help of these *Lochavas*, the two comrades translated several Buddhist Sanskrit works and Sam-ye became the centre of great intellectual activity. Some Kashmirian *panditas* superintended the rules of Vinaya residing in one temple, some Chinese monks performed *Dhyana* in another, the work of writing and grammatical study was done in another, preaching in still another and so on. The propaganda of translation went on in full swing. Dharma Kirtti the renowned logician of Nalanda, also was later on invited to Tibet and introduced there the Vajra-yoga cult according to which the king himself received coronation. Some of Santa Raksita's works are found in the Tibetan encyclopaedia called *Bestan-hgyar*, e. g., among others a commentary on *Satyadvaya-vibhanga* by Djanagarbha, comentaries on Madhyamika theories, etc. Tibet was hardly recognised about the middle of the 8th century, as a Buddhist country,[1] and to Santa Raksita and his comrade belongs the glory of civilizing it and bringing it into line with the Buddhistic civilization of Asia at the time.

About 786 however, in the reign of Mu-Khri-btsan-Po, schism broke out in Tibetan Buddhism. Santa Raksita belonged to the Svatantra Madhyamika school, founded by Bhavya, the opponent of the Prasanga Madhymika school of Buddhapalita, and had preached the doctrines of that school in Tibet. But now there appeared in that country a certain philospher from China who preached a curious kind of heterodox philosophy having absolute inactivity as its central doctrine. "Want of Vikalpana (absence of thought)," he said " was equivalent to the state of Niravalamba (total isolation)." Before his powerful dialectical powers, the school of Santa Raksita steadily dwindled away, and the king felt called

(1) Rockhill says after the Nalanda monastery, but see Pog-sam-jon-zong, part II, p. 171.

(1) As is evident from "the epistle of Master Budhaguhya to the king of Tibet" in the Bstan hgyur—see Rockhill's 'Life of Budha'—p, 221.

upon to summon Kamalasila, a disciple of Santa Raksita and professor of Tantras at Nalanda, to come and rally the deserters. Kamalasila defeated the Chinese heretic in a great public controversy in which the king himself acted as umpire. After this royal proclamations were issued recognising and confirming the Svatantra Madhyamika school of Buddhism in Tibet which prevails there even to this day.

The next king Ral-Pa-Chan or Khri-ral ascended the throne in 846. His reign was the Augustine era of Tibet. He made treaty with China with which country his predecessors had been at war, paid attention to the annals of the land and maintained profound peace in his realm. He called from India the Buddhist *panditas*— Jina Mitra, Silendrabodhi (both disciples of Sthiramati, the renowned scholar of Nalanda), Danasila Prodjnavarman, Surendra bodhi and others, who in conjunction with the *Lochavas* contributed an immense number of works to the Tibetan collection of Buddhist literature. Not only the canonical works, but the works, of Nagarjuna Vasubandhu, Asvaghosha etc,, were made kuown by them to the Tibetans. They also corrected previous translations and sometimes substituted their own in their stead. During this period the priest-hood also was regularly organised into a hierarchy.

But this royal patron of learning and literature died in 860 by the hand of assasins and was succeeded by a worthless profligate monarch named Landharma who persecuted Buddhism. With his death ended ignominiously the monarchy of Tibet founded by Nah Thi tsan-po and his descendants became only local rulers. The Tibetan nation, civilized to such a great extent by efforts of the Indian scholars of Nalanda and other places, supplemented by its own efforts, had vanished, and even in 928 no one could be found in the court of China who could read a letter written in Tibetan.[1] Buddhism also during nearly a whole century was allowed to be overlaid by Tantrick and Bon mysticism. There was however a revival in the reign and under the patronage of Lha Lama Yes'es hod, brought about chiefly by the Lamas of Upper Tibet and Ladak. In 1013, the Indian *Pandita* Dharmapala with several of his disciples came to Tibet and the famous Dipankara Srijnana *alias* Atisha was summoned in 1042. But at that time the University of Nalanda was no more and the Tibetan emissaries came to the Vikramasila monastery, to which Atisha belonged, to find a savant.

(To be continued).

SUKUMAR DUTT.

(1) See Rockhill's 'Life of Budha—p. 226

THE PHILOSOPHY OF BABU RAMENDRA SUNDAR TRIVEDI.

The particle *nach* (after) in the German word *Nachdenken* (reflection) clearly indicates the fundamental characteristic of philosophy. Philosophical thought is always *Nachdenken*, thought which comes after the field has been cleared of other thoughts, thought which thinks the products of other thoughts. Philosophical thought comes always after other forms of thought, not only historically but also logically. That philosophical thought is historically the latest to appear is so well-known to all students of the *Entwicklungsgeschichte* of the human race, that we need hardly do more than mention it here. But that it is logically also posterior to other forms of thought is perhaps not so evident. The logically first stage of thought is the stage of uncritical acceptance of facts, the stage in which things are accepted in their isolation just as they appear. The second is the stage of scientific thought, in which things are viewed, not in their isolation but in their relations with one another, and an effort is made to systematise these relations. The third is the stage of philosophical thought, the stage in which things are brought into relation with the self. The connections of things which Science generalises into Laws, are here viewed in their relation to the thinking mind. The three divisions of the Hegelian logic, the Doctrine of Being, the Doctrine of Essence and the Doctrine of Notion follow these three stages of thought.

Now in the subject of our essay we notice this process of the development of thought. Principal Trivedi made his *debut* as a writer on scientific subjects. The great advance made by Natural and Physical Science in the nineteenth Century attracted his attention as it did that of many others before and after him. The great discoveries of Faraday, Helmholtz Darwin, Kelvin, Clifford held him spell-bound. The results of his scientific studies are embodied in his admirable collection of essays called *Prakriti* in which the chief results of scientific speculation are set forth in clear Bengali. The essay on জ্ঞানের সীমানা which is one of the essays in this collection, deserves special mention here, as containing a masterly account of the position of Science at the end of the nineteenth century. The essay on প্রকৃতির মূর্ত্তি is more philosophical than scientific and does not properly belong to Ramendra Babu's scientific period. We shall not dwell long upon this stage of development of Ramendra Babu's mind, but we cannot dismiss it without remarking that however much science might have charmed him, he was never carried off his feet by scientific theories.

After the scientific, came the philosophical period. The results of scientific

speculation were examined with a view to arriving at their ultimate meaning. In *Satya* which, though not in point of time, is yet logically the first of Ramendra Babu's philosophical essays, he undertook the task of examining the current scientific notions regarding truth. After examining Herbert Spencer's definition of truth and the doctrine of the Uniformity of Nature, Principal Trivedi came to the conclusion that none of these could serve as a criterion of absolute truth. But this was due to no fault of those doctrines, but to the fact that absolute truth is unknown in the phenomenal world. The true in this world is relative. It is in fact that which tends towards the preservation of our lives. "That is true" says Principal Trivedi in সত্য "without believing in which we cannot live." "It is to some extent for fear of death that we have to accept the Uniformity of Nature as a truth" (সত্য, জিজ্ঞাসা P. 8) The conclusion of the essay is stated as follows :—

Truth is therefore related to man's life. It is because man has to live that he has to call this true and that false. There is no truth or falsehood outside the life of man (সত্য, জিজ্ঞাসা p. 9).

How very near this comes to the pragmatist view of truth will appear from the following quotation from James's *Pragmatism* :

The true to put it very briefly, is only the expedient in the way of our thinking, just as the right is the expedient in the way of our behaving. (P. 222).

Our account of truth is an account of truths in the plural, of processes of leading, realised in *rebus* and having only this quality in common, that they pay. (P. 220)

Principal Trivedi therefore anticipated James's theory of truth.

But he did not stop at this view of truth. The philosophical reflection which led him to an examination of the current scientific concepts regarding truth did not allow him to rest here. In জগতের অস্তিত্ব, the second of the essays in the collection called জিজ্ঞাসা, the external world is shown to be nothing more than a connected system of sensations and perceptions, and consequently, to have no reality independent of the self. This idea also runs though সৌন্দর্য্য-তত্ত্ব, where it is shewn that beauty is not something inherent in things, but is an attribute given to things by the perceiving subject. "In this way, man's mind creates beauty, makes the ugly beautiful. Beauty is not a natural quality of things." (সৌন্দর্য্যতত্ত্ব, জিজ্ঞাসা P. 48) In আত্মার অবিনাশিতা the idealistic interpretation of the world is carried a step farther, and Space and Time are shown to be subjective modes of grouping things and not objective qualities of things. It follows that the question whether the soul is immortal or not is meaningless, as it presupposes the independent existence of time. "Those who believe in the destruction of the soul" says Ramendra Babu, "as well as those who do not believe in the existence of a

substance independent of the soul, called Time. According to one party according to those who believe in the destruction of the soul, the soul occupies only a certain portion of Time; according to the other, according to those who believe in the immortality of the soul, it occupies the entire portion of Time." (আত্মার অবিনাশিতা, জিজ্ঞাসা P. 67). The conclusion of these essays, therefore, is that the world exists for the self and has no independent existence.

But what is this self? What is the 'I' for which everything is, but which is not for anything? In আত্মার অবিনাশিতা it is identified with the aggregate of states of consciousness.

Can it not be said that the name of this aggregate of states of consciousness which appears in one place as in some respects similar and in another, as in some respects dissimilar is the soul or I? (আত্মার অবিনাশিতা জিজ্ঞাসা p. 59).

In another place it is called জ্ঞানের প্রবাহ বা চৈতন্যের ধারা (stream of consciousness). From this one may conclude that, like Hume, Principal Trivedi is a phenomenalist. Nothing, however, is farther from the truth. Ramendra Babu fully recognises that the states of consciousness are not everything but that there must be a principle of unity underlying them to make our mental life at all possible. Thus in এক না দুই Ramendra Babu says :—

I act, I eat, I laugh, I dance, I sing; I see, I hear, and for the purpose of seeing and hearing, I imagine this world as the object of my seeing and hearing; for the purpose of laughing, singing and dancing, I make this vast playground, and remaining behind, I observe this laughing, weeping, singing, dancing, seeing and hearing. (এক না দুই, জিজ্ঞাসা p. 139). In the same essay he further says :—"That the 'I' as subject placing the 'I' as object before it, observes its play, its actions cannot also be easily denied." (জিজ্ঞাসা, p. 140). Again in Mukti he finds fault with James's philosophy because it does not recognise the principle of unity underlying mental states (vide জিজ্ঞাসা p. 307). Ramendra Babu, therefore, is not a phenomenalist. In fact, by calling the self an aggregate of states of consciousness, he only means to assert the absolute identity of the empirical with the transcendental self. To call the self something else is, in Ramendra Babu's opinion, to make a distinction between the self as thinker and the self as subject to the changes of the world. To assert a self as thinker etc. as distinct from the states of consciousness is, he thinks, to lose sight of the absolute identity of the self as subject with the self as object of thought. And Ramendra Babu asserts as strongly as any body the absolute identity of the transcendental with the empirical ego. Thus, in এক না দুই he says "Both the 'I's are identical; the 'I's are one and the same. The 'I' that sees and the 'I' that is seen are one and the same." (এক না দুই, জিজ্ঞাসা p. 141). In fact, the

identity of the transcendental with the empirical ego is the central idea of মুক্তি. In this essay Ramendra Babu says—"I see myself, the 'I' that sees is the পরমাত্মা, the 'I' that is seen is the জীবাত্মা ....He who sees and he who is seen are the same person. There is no difference between the two. 'I see myself'—here the subject and the object of seeing are one and the same person. This is called monism. There is only one 'I' and not two. One and without a second" (মুক্তি, জিজ্ঞাসা p. 297) This identity of the 'I' that sees and the 'I' that is seen makes knowledge of the self possible. The preception of this led Kant to say "Ich als Intelligenz and denkendes. Subject erkenne mich selbst als gedachtes Object"* (Kritik der Reinen Vernunft 2nd edition p. 155), and to say further that the process by which I come to know of this identity is no other than that by which I become an object to myself, i. e., know myself (Kritik derR einen Vernunft 2nd edition pp. 155-156). And as essential to the knowledge of the self, this identity is also essential to the knowledge of the world for, as Caird says, according to Kant, the consciousness of the self is primarily the consciousness of the activity whereby we bind all the data of sense into the consciousness of one objective world (See Critical Philosophy of Kant Vol. I. p. 413).

But there is another reason why Ramendra Babu identifies the self with the aggregate of the states ef consciousness. He thinks that to call it anything else, to call it the known, for instance, is to ascribe some attribute to it, which is against his view of the attributelessness of the self. "Knowledge exists, I exist, but the knower does not exist. I am not the knower. I am not the enjoyer. If I ascribe to myself the quality of being knower and enjoyer, it is an error, it is false knowledge. I have not the quality of being knower or enjoyer. I am neither the knower nor the enjoyer. I exist, this much I can say" (আত্মার অবিনাশিতা, জিজ্ঞাসা p. 70.) This idea occurs repeatedly in মুক্তি. We quote only one passage here :—

To think of a thing as something other than what it really is, is called *adhyasa*. The rope is not the snake, to take it for a snake is *adhyasa* or false ascription. The soul has no quality, no attribute. To attribute omniscience etc to it is *adhyasa* or false ascription of qualities. The rope is not the snake, though it appears to be so; the soul does not possess any attributes, although it seems to do so; in reality, it is attributeless (মুক্তি, জিজ্ঞাসা P. 290) Principal Trivedi's view, then, is that the soul. is absolutely attributeless, and that consequently nothing can be said of it except that it is. The best way of describing it, therefore, is to point to the states of consciousness in which its activity is

---

* English translation :—

I as intelligence and the knowing subject know myself as the object thought.

manifested. This is also the view of Kant. The "Urspringlich—synthelische Einheit der Apperception" is a merely formal unity and is absolutely without any content. Of this unity of apperception, only this can be said that it is.

Dogegen binich mir meiner selbst in der transcendentalen Synthesis des Mannigfaltigen der Vorstellungen uberhanpt, mithin in der synthetischen urspriinglichen Einheit der Apperception bewusst, nicht uri ich mir erscheine, noch wie ich an mir selbst bin, sondern nur doss ich bin. * (Kritik der reinen Vernunft 2nd Edition P. 157). The synthetic unity of apperception is only the formal condition of possibility of knowledge, and can give no content to knowledge. Cohen replying to Schopenheuer's objection to the words *muss konnen* which occur in a passage of the *Critique of Pure Reason* says that the combination 'muss konnen' is significant, as it takes into accuont the fact that self-consciousness gives only a power, a logical condition of the possibility of knowledge.

Das Ich wurde nur als ein 'Vermogen," als die transcendentale Bedingung fiir die Moglichkeite des logischen Urtheils hingestellt; von seiner Wirklichkeit wurde ansdriicklich abgesehen. Keineswegs sollte gesagt sein, dass das Ich als wirkliches Bewusstsein allem anderen Bewusstseln vorausgchen miisse; sondern das Selbstbewusstsein wird im Gegenteil erst in die Synthesis des Mannigfaltingen der Vorstellungen gesetzt † (Cohen's *Kants Theoric der Erfahrnng* P. 318).

The 'I' therefore is a merely formal or logical principle without any real content. This barrenness of self-consciousness is regarded by Caird as the principal defect of the Kantian philosophy, and is shown by him to be the cause of the opposition between the Critiques of pure and practical Reason. The 'faith' of Kant, he says, in the second volume of his *Kritical Philosophy of Kant* is the analytic unity of self-consciousness; it is opposed to knowledge, as it can give no consciousness of objects· This barrenness is removed by Hegel and the result ts absolute rationalism. Bnt the root of the barrenness or attributelessness of the self lies very deep and a perfectly rational system is often the result of a shallow view of the world. To this we shall return presently.

* On the contrary, I am conscious of myself in the transcendental synthesis of the manifold of representation in general, and consequently, in the synthetic original unity of apperception, not as I appear to myself nor as I am to myself, but only that I am.

† English translation :—

The 'I' was represented only as a power, as a transcendental condition of the possibility of logical judgment; the question of its reality was expressly omitted. By no means should it be said that the 'I' as true consciouaness must precede all other forms of consciousness, but that the 'I' on the contrary, is first put into the synthesis of the manifold of representations.

We have seen how Ramendra Babu subsumes objective existence under the forms of subjective thought. His next step is to identify this subject with God. In this way he escapes from the narrowness of subjective idealism. The conclusions of জগতের অস্তিত্ব are those of subjective idealism, but Principal Trivedi rises to a higher level of thought in এক না দুই, where he for the first time definitely identifies the self with God. There is, however, no opposition between the standpoints of these two essays. The object of জগতের অস্তিত্ব was to refute realism; the important point was to prove the subjective reference of objects of experience. The question of the nature of the subject did not then arise, but when it arose, the answer was always the same, namely, that the subject is absolutely indentical with Brahman. This Vedantic identification of the soul with Brahman, of জীবাত্মা with পরমাত্মা is the central idea of মুক্তি and is made in a way which is somewhat peculiar. The জীবাত্মা and পরমাত্মা are both taken within experience, and the problem of মুক্তি is to establish the identity of the opposed elements of experience and thus to get rid of what Professor Ward calls duality in the unity of experience. After this identity has been established, the cause of our generally regarding the জীবাত্মা and পরমাত্মা as distinct is clearly indicated. We generally regard the জীবাত্মা as subject to all sorts of change and to all influences from the external world, whereas the পরমাত্মা is regarded as absolutely unchanging and as absolutely above all external influences. But this is due to ignorance. "It is through ignorance that we regard the *jiva* as inconstant and subject to the world which is conceived as extended in space and revolving round the wheel of *Samsara* conceived as extended in time. With the awakening of knowledge we come to know that it is not so. For it is I who know myself. Here, just as the knowing subject has no attribute, so also can the subject that is known have really no attribute" (মুক্তি, জিজ্ঞাসা P. 310). The way to emancipation is the removal of this ignorance. One need not therefore wait till death for emancipation. Emancipation takes place in this life.

We return now to the question to which we were led in the course of our discussion on the nature of the self. The question is whether the world is perfectly rational. Principal Trivedi adheres to the Vedantic opposition between the পারমার্থিক and the ব্যবহারিক truth, between what is absolutely true and what is true in the sphere of practice. The truths of Science are only truths in the realm of practice. In বিজ্ঞানে পৌত্তলিকতা Ramendra Babu says, "But we have to bear in mind this fundamental fact that none of these truths which are obtained by experiment and observation contains anything absolutely true. All is mere practice; not finding our god we have

imagined certain idols and have imagined a form of each of these idols." The definition of truth given in সত্য is the definition of scientific truth, of truth in the realm of practice. The true for practical purposes is that which conforms to the conditions of our practical life; the absolutely true, that which in the ultimate analysis reveals itself as true. Now, what is absolutely true is Brahman or *atman*, or, as it may also be called, Reason. The world has not an absolute reality, but only a reality in the region of practice. But what does this mean? It means that Reason does not find itself completely in the world, it means that the world cannot be brought into perfect harmony with Reason. In ধর্ম্মের জয় Ramendra Babu shows this with regard to the moral ideal. The moral ideal, which is Reason in its practical aspect, is shown, by illustrations from the great epics, the Ramayana and the Mahabharata, to be incapable of realisation in the world. It is a mistake to suppose that Rama attained happiness or success in this world. His was a most unhappy life and the lesson to be learned from it is not that virtue always triumphs in this world, but rather that virtue does not triumph. The same lesson is to be learned from the lives of the Pandavas. The essay therefore concludes with words "নিবৃত্তির জয় হউক." Thus, what was proved in সত্য with regard to Reason in its theoretical aspect is here proved with regard to Reason in its practical aspect. Combining the conclusions of the two essays, we get this: Neither in its pratical nor in its theoretical aspect does Reason perfectly manifest itself in this world. This is also the central idea of the Kantian philosophy. By limiting knowledge to what is obtained through experience, Kant means that Reason does not manifest itself in the world of experience. The unity of knowledge is not the unity of Reason. There is always more or less opposition between the several elements of knowledge. Hence Reason is not satisfied with it. Caird says:

In our consciousness, as Kant maintains the forms of sense, like its matter, stand unrelated to the conceptions under which they are brought; and these again, though derived from the forms of judgment, and so from the analytic unity of self-consciousness, are yet so dependent on the unity of the self being brought in relation to an extraneously given manifold, that their number and nature cannot be explained from that unity alone. It appears, then, that the subject reacting on the peculiar forms that belong to its peculiar sensitive constitution, synthetically combines that manifold; and that in opposition, though in relation, to the objects so determined, it becomes conscious of its own self-identity. But this return upon its own pure identity, upon the 'I am I' of self-consciousness is, in Kant's veiw, a negative ruturn, *i e*, it is the recovery of the bare identity of self out of the

foreign element in which it has become involved through its connection with sensibility. The final effect of the synthetic action of thought and of the return from it upon the unity of the self is, therefore, not to appropriate to the self the matter of sense taken up into consciousness (which is impossible, owing to the alien nature of that matter) but to repel it and with it the phenomenal world of objects (the consciousness of which has been attained through synthesis) from the self." (*Critical philosophy of Kant* Vol I PP. 400–401) This is true, not only in the realm of knowledge, but also in the realm of morals. Says Kant :—

If we, however, consider the same actions with reference to reason, and not with reference to sepeculative reason, in order to explain their origin, but solely so far as reason is the cause that produces them ; in one ward, if we compare them with this with reference to our practical life, we find a rule and order altogether different from the order of nature. For it may be that, in this view, everything ought not to have happened, which according to the course of nature has pappened, and according to its empirical grounds would inevitably have happened.

The conclusion, then, is that the world of objects cannot be comprehended by Reason. Science tries to catch hold of it, but it always eludes its grasp. Dr. Ludwig Stein says :—

Science is not the last word but even in the most favourable case only the last word but one. Whilst our thirst for knowledge is unquenchable, we create see water, the saline contents of which not only do not quench our thirst but always quicken it anew. It seemed that Science ought to succeed in fathoming the unfathomable exhausting the inexhaustible. In the end it is still the old vessel of the Danaides. "An dessus de dien il y a le divin" (Above God there is the divine) cries Ernest Renan. The sum, world, does not go without a remainder (that is, is not completely merged) in physics and chemistry. A residue remains, something whose origin cannot be found, something inexplicable, which the Romanticists, though mystical excess of felling pretend to comprehend through intuitive vision.

There can thus be absolutely no talk of an *a priori* construction of the world. The facts of experience do not lend themselves to a logical scheme. The world is much more complicated than Hegel and rationalists like him thought. No formula is adequate to represent the world. In this respect Spencer errs no less than Hegel. The law of Evolution is a perfectly determinate law, a perfectly intelligible law, and as such, cannot comprehend the world which is not wholly determinate not wholly intelligible. The French philosopher, Bergson fully recognises the complicated nature of the world. Every state of existence, says Bergson, is a state of transition.

La verite est yu'on chauge sans cesse, et que l'etat lui-meme est deja du changement (L' Evolution Creatrice p. 2).*

The change from one state of existence to another is consequently not

---

* English translation :—

The truth is that one changes without ceasing and that the state of existence is itself already a change.

clearly distinguishable from persistence in the same state.

C'est dire qu'il n' y a pas de difference essentielle entre passer, d'un e'tal a un untre et persister dans le meme etat. Si l'etat qui reste ls meme est plus varie qu'on ne le croit, inversement le passape d'um etat a un antre ressemble plus qu'on ne se l'imagine a un meme etat qui se prolonge*

(L' Evolution Creatrice p. 2).

Moreover, we create our states of existence and are ourselves modified by them.

Chacun d'eux est une espece de creation. Et de meme que le talent du peintre se forme on se deforme, en tous cas se modifie, sous l'influence meme des œuvres qu'il produit, ainsi chacun de nos etats, en meme temps qu'il sort de nous, modifie notre personne, etant la forme nouvelle que nous venons de nous donner. On a donc raison de dire que ce que nous faisons depend de ce que nous sommes : mais il fant ajouter que nous sommes, dans une certaine mesure, ce que nous faisons, et que nous nous creons continuellement nous-memes.†
(L' E'volution Creatrice p. 7).

The result is that the nature of the world is a very complicated one, and that the evolution of the world is a much more complicated affair than one generally supposes. Says Bergson :—

> The evolutionary movement would have been a simple thing, we would have quickly determined its direction, had life described a single trojectory comparable to that of a whole bullet hurled by a cannon. But we have to do here with a shell which at once bursts into fragments, which being themselves of the nature of shells, have burst in their turn into fragments, destined still to burst, and so on for a very long time.

It is the great merit of Ramendra Babu's philosophy that it perceives the complex nature of the world and does not aim at simplicity at the cost of truth.

---

* English Translation :—

It is to say that there is no essential difference between passing from one state to another and continuing in the same state. If the state which remains the same is more variable than one thinks, inversely, the passage from one state to onother resembles more than one imagines one and the same state which prolongs itself.

† English Translation :—

Each of them is a creation. And just as the talent of the painter shapes itself or is deformed, in all cases is modified, under the influence of the works themselves which are produced by him, so also, each of our states while it proceeds from us, modifies our personality, being the new form which we have just given us. One may therefore say with reason that what we do depends upon what we are, but one must add that we are, to a certain extent, what we do, and that we create ourselves continually.

FIRST IMPRESSIONS OF DACCA BY A PUNJABEE ONLOOKER.

A short discourse with a brother in the Dacca Bar Library helped me in gleaning the following information. Dacca is the capital of a province which has in these days produced some of the best men in Bengal. Bikrampur they say, has contributed a larger number of graduates than any other town in India; while the number is large the quality is also in keeping with it. The famous scientist Dr. Bose belongs to it. The great educationist Dr. P. K. Roy claims it as his birth-place. A further examination would show that it contains in its bead-roll of fame Doctors and engineers and leaders of thought in other departments of life of no less repute. In the proud possession of scholars in the ancient lore of india it claims a place perhaps next to Nuddea only, if not equal. While science finds its votaries here, art is not neglected. In times gone by it was famous for its muslins and other manufactures which brought to it traders from Phœnicia., Armenia and other distant lands. The evidences of this are still to be seen. If it was famous then it is the only place in these days also where the hand and eye are no less trained than the mind and the heart. We find muslin work of a superior quality, we find muga work of high finish, churis and rings and buttons made of sanks (conchshells). We find beautiful cane-work. This and others which my birds-eye-view may not have laid bare indicate how people can find occupation in manufacturing articles from things which may appear useless to others. This reminds me of the *dovero* stationed at Allahabad who chiselled out paper weights, pens, handles of sticks and other things too numerous to detail from stone they found in that part of the country by means of an ordinary knife only. While the hand and eye are thus busy the mind and the heart, which led the two first, occupy themselves not only in these useful ways but in beautifying themselves. Till this is done the exquisite productions from cane and sankh, ivory and cotton cannot be made. There must be harmony inside to produce the same outside. The muses find their devotees here. There is perhaps no house in Hindu Bengal where the harmonium is not played. The sitar and sarangi find their lovers here and are willing to yield the best music to the delicate hand that touches them. The Bhadrolok is an expression now peculiar to this province, for it is here only we find the *shades* of old type. Kind and sweet in the use of his tongue, respectful to his elders, meek to his subordinates and affectionate to all. Were it not so how could the joint family system which has broken up in other parts, is loosening in West Bengal, we found prevailing largely in this province? All this shows

a training of the mind and heart which should be developed in other parts and preserved and improved here.

To make this pious wish a possibility it is necessary to study the people which present such a phenomena in the present day—a beautiful orchard in the midst of the ruins of an ancient civilization.

The quotation I gave from the Ramayana of the race which peopled Ajudhia may be referred to in this connection to give us some guidance. Why was it that the people were so happy and prosperous in those days? The very same book tells us when giving an account of Rama's education that he learned the Vedas first and other sciences and arts afterwards. It is education of this nature which produces right-minded men like Rama. Where the heart and soul are neglected and intellect only is developed the harmony in man which is essential to produce harmony outside cannot be produced. In fact harmony in nature always exists, the disharmony comes only from man. It is only he that strikes the unmusical note.

Shatpatha says when setting forth the rules of life laid down for all beings by Prajapati that the gods, the fathers (the Pitars) and beasts all observe the law; it is man only who in some cases transgresses What was the state of things in some cases in the times of that Rishi has become the rule now. But where those laws are best observed that is the place where mutual good-will remains as the basis for all the other good things of life. My idea is East Bengal presents this view because the Shastras which alone contain the science and art of life find more adherents in this Province. Within the home their injunctions are more scrupulously observed than in other parts of India.

But there are signs of a falling-off from ancient ideals. I was told by my friend, that this has been going on at a rapid pace even in these parts. I would request my brethren to awaken before it is too late. If you allow yourselves to be influenced by it you will be soon materialised. The self will begin to predominate in you. Each man will be for himself; none for the family. There is another danger—the unrest in the land. It is not the place to retrace its history or to divine its causes. One thing is clear: it was not and could not be a production of the country. It was an exotic which could not flourish in the land of peace and contentment which India ought to be made by the joint efforts of the people and the Government. A people full of the kindness and sweetness which has preserved that word *Bhadra-lok* still in the vocabulary of the land, busy in arts and sciences and the production of the best men in every department of learning, could not as a class be what their critics believed them to be, an impression which does not seem to have been yet removed

in certain quarters. But as I have stated it is not necessary to discuss this question any further.

The proposition I have laid down for the consideration of my country men is what steps should be taken to preserve and improve the condition of things in this Province and to develop them in others.

The only way to do it is to spread the knowledge of the laws which had made Ajudhia what it was, the observance of which distinguishes the people of this Province from those of others. As yet it is an unconscious observance. If we knew the beauty of those laws, the sound foundations on which they are based, the prototypes of what is found going on in nature, their conscious observance would do us more good. The only way to know them is to study them and spread their knowledge in the country so that their usefulness may became apparent. It is then that the loosening of the ties that is going on will be stopped and a greater unity between all sections will be brought about, not only between the different classes among the Hindus, but between them and their Mahomedan brothers and between them all and our brothers from the west, between the people and the Government. If this is not done and the unloosening goes on, your arts and industries will begun to fade, greater poverty will prevail, the spectacale which the *Misl,* the jalus or the procession of *Ashtmi* presents of all classes—Hindus and Mahomedans alike united together lending help to each other to make a display of the best we have in arts and industries in this province will become a thing of the past. A voice from the South says a revival of Hinduism would produce unrest in the land, would result in wider differences between the different creeds and between the Hindus and the Government. East Bengal tells us it will not be so. It is not the old ideals which have resulted in the breaches of peace between brothers; for such the Hindus and Muhamadans had become even in the Muhamadan period, and between them and our rulers. It is the new gospel of materialism, which is responsible for this disorder. The *misl* to which I have referred bears ample proof of the truth of this proposition. If any more were needed it is supplied by the encouragement given to arts and industries by the grants of big zeminderies to Hindus, by the existence of *Tols* where Sanskrit education is given of a very high quality. The existence of a Gurdwara of the Sikhs close to the Shahbagh, the residence of the Nawab gave me another proof of this. When I paid a visit to that sacred place I was wondering how adjoining the walls of the residence of the Nawabs, a Sikh preacher was allowed to establish his head-quarters and how a large piece of land, a part of which has been acquired by Government, was granted to him.

What is wanted then is that a society

should be started for research into ancient Sanskrit literature for translating these books with commentaries into English and into all the vernaculars of India, for rendering the truths contained in these treasuries of ancient lore available to every individual in the land. Work in this direction is going on in Germany and America and in a small scale in England and other countries. In our country also people are awakening to its great need and efforts are being made here and there to do something. But there is no co-operation no collaboration.